

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনঃ

১৯৭৩-২০০৩

গবেষক

প্রবুদ্ধ ঘোষ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- A00CL0100916

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Certified that the Thesis Entitled

“বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনঃ ১৯৭৩-২০০৩” submitted by me for the award of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Kunal Chattopadhyay, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata- 700032, And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor:

Candidate:

Dated:

Dated:

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	4
শুরুর কথা	7
প্রথম অধ্যায়ঃ	
রাজনৈতিক উপন্যাস ও উপন্যাসের রাজনীতিঃ বিভিন্ন উপাদান	22
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	
বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস এবং	174
আখ্যাননির্মাণের রাজনীতি	
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	
সত্তর দশকের পরে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসের নীতিবদল এবং অভিমুখ	429
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	
আখ্যানধর্মে বিবর্তন- বৈশিষ্ট্য, নতুন উপাদানসমূহ এবং প্রত্যাহ্বানের ধরন	683
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	
বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা, নিম্নবর্ণের প্রতিরোধ এবং	968
আখ্যানের নবায়ন	
উপসংহার	1137
গ্রন্থপঞ্জী	1155

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লিখতে গিয়ে বহু মানুষের উৎসাহ, ভালবাসা ও সৎ পরামর্শ পেয়েছি, যা আমার গবেষণাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

আমার মা শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ এবং বাবা শ্রীপ্রবীর কুমার ঘোষের নিরন্তর উৎসাহ ছাড়া এই গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। অভিসন্দর্ভটি লেখার কালপর্বেই মা প্রয়াত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর শুভকামনা আমার আজীবনের পাথেয়। অন্যান্য আত্মজনকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার জন্য আমার শিক্ষক অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সবিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। তিনিই আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক এবং পথপ্রদর্শক। অভিসন্দর্ভের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থপাঠের নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। রাজনৈতিক বাস্তবতার নানান দিক নিয়ে মূল্যবান আলোচনা থেকে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী নিবন্ধ লেখায় নিরন্তর উৎসাহদান- কুণালদা দিশা দেখিয়েছেন।

তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ যাঁদের কাছে নিয়েছি এবং নিরন্তর নিয়ে চলেছি, তাঁদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপিকা ঈশ্বিতা চন্দ, অধ্যাপিকা সুচরিতা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা কবিতা পাঞ্জাবী, অধ্যাপিকা সুচেতা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক সায়ন্তন দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক, অধ্যাপক অতীক মজুমদার, অধ্যাপিকা দেবশ্রী দত্ত রায়, অধ্যাপিকা ঈশ্বিতা হালদার এবং প্রয়াত অধ্যাপক স্যমন্তক দাস সহ অন্যান্য শিক্ষকরা আমাকে তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ দিয়েছেন। নিবিষ্ট পাঠের পদ্ধতি যেটুকু শিখতে পেরেছি এবং প্রায়োগিক কৌশল যেটুকু আয়ত্ত্ব করতে পেরেছি, তা এঁদের জন্যই। বিভাগীয় গ্রন্থাগারের

শ্রীনিতাই মণ্ডল এবং শ্রীসুদীপ বৈদ্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের নমিতাদি ও গোবিন্দদাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই ইস্কুলবয়স থেকে আজ অবধি আমার সামান্য বিদ্যার্জনের পথে যাঁরা আমায় পথ দেখিয়েছেন, সেই সকল শিক্ষকের কাছে আমার ঋণ ফুরোবার নয়।

বিগত প্রায় পাঁচ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যে সকল ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছি, তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সঙ্গে আলোচনায় আমার গবেষণা সমৃদ্ধ হয়েছে, নতুন ভাবনাপথ খুলে গেছে। অনুজপ্রতিম আকাশনীল ঘটক প্রয়োজনীয় পিডিএফ জোগাড় ক’রে দিয়েছে। আমার বিভাগীয় সহগবেষক, অগ্রজ গবেষক, একদা-সহপাঠী এবং রাজনৈতিক পরিসরের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা-গল্পের অবসরে মতামত আদানপ্রদান এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার সহধর্মিণী এবং প্রিয়জনেরা সাহিত্যপঠনে নিয়মিত উৎসাহ জুগিয়েছেন। যে আত্মজনেরা হঠাৎ কোনও দারুণ ভাবনায় ভাবিত করেছেন কিংবা সংকটমুহুর্তে পাশ থেকে সরে যাননি, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই মেহেদী হাসান খানকে, যাঁর ‘অব্র’ বাংলায় লেখা সহজ করেছে।

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে বহু প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়েছি। কোভিড পরিস্থিতিতে যখন সারা বিশ্ব বাধ্যত ঘরবন্দী ছিল, সেই সময় ফেসবুকের মলাট গ্রুপ এবং আরও কয়েকটি গ্রুপে বহু মূল্যবান ও দুস্ত্রাপ্য বইয়ের পিডিএফ পেয়েছি। আন্তর্জালের বিভিন্ন ইংরাজি (প্রধানতঃ লিবজেন) ও বাংলা সাইটে (প্রধানতঃ আমারবই এবং গ্রন্থাগার) প্রাপ্ত অগণিত পিডিএফ ছাড়া গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত। বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক ও সাধারণ আলোচনাসভা, চেনা-অচেনা মানুষের সঙ্গে কথোপকথন, বিভিন্ন সাহিত্য-আড্ডা এবং রাজনৈতিক সমাবেশ-মিছিল থেকে প্রাপ্ত চেতনা ছাড়া এই গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লিখতে পারার জন্য আমি ঋণী বসাই টুডু, দোপ্‌দী মেঝেন, কেলু, বাঘারু, চ্যারকেটু, খেতখেতু, চেংটু, হাড্ডি খিজির, মদন, ডিএস, বিনু, তমিজের বাপ, কুলসুম, শারিবা, লুবিনীদের কাছে- তাঁরা আখ্যানের কাল্পনিক চরিত্র হয়েও ঠিক কাল্পনিক তো নয়! তাঁদের মতো অগণিত মানুষের বাস্তবিক দুঃখ-সুখ-যাপন-উদ্‌যাপন বিশ্বের সব ভাষার সাহিত্যের সম্পদ, গবেষণাকর্মের সম্পদ। আমার ঋণ এই চরিত্রগুলির স্রষ্টাদের কাছে, যাঁদের আখ্যানবুননের নীতি ও কৌশল এই অভিসন্দর্ভের শিরদাঁড়া। আমি ঋণী নকশালবাড়ি আন্দোলন ও চলমান গণবিদ্রোহের সমস্ত জীবিত কুশীলব এবং শহীদদের কাছে। তাঁদের বাস্তবের রাজনৈতিক নির্মাণ ছাড়া ১৯৭০-পরবর্তী সময়ের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের সমৃদ্ধি ঘটত না এবং এই অভিসন্দর্ভ লেখা সম্ভব হত না। গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সুধীজনকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও শুভকামনা।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করতে চেয়ে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৩ সালের সময়পর্বকে বেছে নিয়েছি সন্দর্ভের মূল সময়পর্ব হিসেবে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’, দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত (১৯৭৭)’, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮)’ এবং ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)’, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’ এবং ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট (১৯৯২)’, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ এবং ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসগুলিকে সন্দর্ভের মূল অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছি। সন্দর্ভের গতিপথে মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ এবং ‘অগ্নিগর্ভ (১৯৭৭)’, অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’, সমরেশ বসুর ‘মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭)’, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস (১৯৭৫)’, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা নটার সূর্য (২০১৩)’ এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শোকমিছিল (১৯৭৩)’ আলোচনার পরিসরভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বাংলা উপন্যাসের দেড় শতকের দীর্ঘ যাত্রাপথে রচিত অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসও সন্দর্ভের পরিসরে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সাহিত্যের ইতিহাসলেখ (literary historiography)-র আধারে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের অক্ষবদল, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক উপস্থাপনা এবং ভাষার বিবর্তন বিশ্লেষণ করা।

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা খুঁজতে চেয়েছি। সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে মূল প্রশ্ন আবর্তিত হচ্ছে রাজনৈতিক উপন্যাস ও উপন্যাসের রাজনীতি- এই দুই বিষয়ের বিভিন্ন উপাদানকে কেন্দ্র ক’রে। রাজনৈতিক উপন্যাস কী? কোন উপন্যাসকে রাজনৈতিক বলব আর কোনটাকে নয়? দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে সাহিত্যগত রাজনীতির প্রতিফলন কীভাবে খুঁজব? উপন্যাসের রাজনীতি উপন্যাস সংরূপ নির্মাণের প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা ক্রিয়াশীল থেকেছে।

রাজনীতি ও সাহিত্য একে অপরকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বিশেষতঃ বাংলা উপন্যাসে রাজনীতির উপস্থাপনা পাঠকের প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে কীভাবে প্রতিফলিত হয়? প্রকাশনা সংস্থা, বাণিজ্যসফলতা ইত্যাদিও কি পাঠরীতিকে প্রভাবিত করে না? লেখক-প্রকাশক-পাঠক এই স্তম্ভত্রয়ের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক উপন্যাস বহু দশকের বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। জোসেফ ব্লটনার রাজনৈতিক উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে স্পষ্ট করছেন যে, রাজনৈতিক উপন্যাস কোনও রাজনৈতিক ঘটনা বা সংকটমুহূর্তকে সরাসরি উপস্থাপিত করে এবং বিশ্লেষণ করে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবেরা আখ্যানের ভেতরে রাজনৈতিক আবহে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ক্রিয়াশীল রাখে। শুধুমাত্র বামপন্থী নয়, বরং দক্ষিণপন্থী রাজনীতিরও ক্ষেত্র থাকতে পারে আবার শুধুমাত্র শাসিতের অবস্থান থেকে সমাজ-পরিবর্তনের রাজনীতির সঙ্গে শাসকের অবস্থান থেকে সমাজ-কাঠামোর স্থিতিাবস্থা বজায় রাখার ঘটনাও ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংজ্ঞায়নে চলে আসতে পারে। ব্লটনার, ‘directly describes, interprets or analyses a political phenomena.’ বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চয়ই বোঝাতে চাইছেন যে, এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা পুনর্পাঠই হবে আখ্যানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্য আরও অনেক ঘটনা, সামাজিক বা ঐতিহাসিক পাঠ-পুনর্পাঠ থাকতেই পারে উপন্যাসে, কিন্তু প্রাথমিক ভিত্তি অবশ্যই হবে রাজনৈতিক পাঠ। মহাশ্বেতা দেবী বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁদের উপন্যাসে ‘চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক’ বলে নির্দিষ্ট দলীয় রাজনৈতিক পক্ষপাত প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পাঠক আখ্যানগুলিতে রাজনৈতিক পাঠই খুঁজে পান। আখ্যানের সেই রাজনীতিপাঠ মধ্যবিভ-শিক্ষিত-ভদ্রলোকীয় পাঠপ্রস্তুতাবনার বাইরে নিম্নবর্ণ-নির্বিক্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্মিত হয়। বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধরণ রাজনৈতিক উপন্যাসের ইউরোপীয় সংজ্ঞায়নের থেকে আলাদা, কারণ শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে বর্ণ, ধর্ম ও লিঙ্গ ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী। বর্ণ বা ধর্ম শুধুমাত্র সামাজিক উপন্যাসের নির্মাণ করে না বরং তা রাজনৈতিক উপন্যাসও হয়ে ওঠে। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘খোয়াবনামা’ বা ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ সেইজন্যেই রাজনৈতিক

উপন্যাস। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ ও ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে বাঘারু ও কেলুর অবজ্ঞাত-অস্তিত্ব, সংলাপহীনতা ও প্রান্তিকতম অবস্থান ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। কোনও রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতাদখল বা সমাজবিপ্লবের কাহিনি না থাকলেও, অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞান সন্ধান এবং জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ায় অস্থিষ্ট বোধের উচ্চারণ থাকতে পারে। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে... সেই উপন্যাসকেই আমরা যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস বলব, যেখানে এই জনসমাজের গভীর প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে”¹

যে সময়পর্ব সন্দর্ভে মূল আলোচ্য, সেখানে নকশালবাড়ি এবং ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরবর্তী সময়পট যেমন আছে, তেমনই নব্বই দশকের উদারিকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটও রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরেই রয়েছেন উপন্যাসের পাঠকদের সিংহভাগ এবং লেখকেরাও। মুক্ত-বাজারের প্রভাবে সমাজের পুরনো রীতিনীতি-মূল্যবোধ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক আকাজ্জা-আচরণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নেও কি বদল আসে? কোনও নির্দিষ্ট কালস্থানের রাজনৈতিক ঘটনাকে ভিন্ন কালস্থানিক অবস্থান থেকে লেখক যখন আখ্যায়িত করেন, তখন দৃষ্টিকোণের কী কী বদল হয় এবং উপন্যাসের কোন উপাদানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে? সাহিত্যের বাইরের বিভিন্ন ঘটনায় রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্তর কীভাবে প্রভাবিত হয় এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্তরমহল কীভাবে চিরাচরিত উপন্যাসের ধারায় বদল আনছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস এবং আখ্যাননির্মাণের রাজনীতি’। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়- আখ্যানের কাল্পনিকতাকে অক্ষ ক’রে ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের মেলবন্ধন কীভাবে ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাবলী ও তার রাজনৈতিক বাস্তবতার আখ্যানের সংযোগে কীভাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণ হয়?

উপন্যাসের সত্য এবং ইতিহাসের সত্য কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত? উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে ‘শিক্ষিত-ভদ্রলোক-মধ্যশ্রেণি’ পরিচয়বাহক পাঠকশ্রেণির নির্মাণ কীভাবে করছেন খ্যাতনামা উপন্যাসিকরা? উনিশ শতকে কীভাবে এই ‘শিক্ষিত’, ‘মার্জিত’ ভদ্রলোক পাঠকবর্গকে তৈরি করা হয়েছে যারা পরবর্তী শতকব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছে এবং শাসকের মনোমতো বিশেষ উপন্যাসদর্শন প্রজন্মান্তরে বহমান রেখেছে? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘বাবু’ ও ‘ভদ্রলোক’ শব্দদ্বয়ের শ্রেণিগত ও সামাজিক-অবস্থানগত অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সামাজিক নেতৃত্ব ভদ্রলোক বৃত্তের হাতে ন্যস্ত হল। উপন্যাস-পাঠকমণ্ডলীর প্রস্তুতিও জোরদার হল তখন থেকে।² ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণ এবং পাঠকনির্মাণের মানদণ্ডের রাজনীতি- সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলি কি সেই নির্ধারিত মানদণ্ডগুলিকে প্রত্যাহ্বান জানাতে পারল? ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির পাল্টাপ্রস্তাব কীভাবে হাজির করলেন সতীনাথ, মহাশ্বেতা, দেবেশ, আখতারুজ্জামানরা? ১৯২৬ সালে ঢাকাকেন্দ্রিক ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের পরে ১৯৪০-র দশকে বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতর্ক নিয়ে হাজির হল পাকিস্তানবাদী সাহিত্য। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান কয়েক দশক ধরে চলছিল, যা ১৯৪০-র দশকে নতুন অভিমুখ পেল। বাংলা সাহিত্যের রাজনীতি কীভাবে হিন্দু এবং/বনাম মুসলমান প্রতর্ককে ধারণ ক’রে এগিয়েছে? পূর্ববঙ্গের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ধর্মীয় রাজনীতি ও সাহিত্যের রাজনীতির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্রোহ এবং ধর্মীয় রাজনীতির ত্র্যহস্পর্শ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে এবং শহীদুল জহিরের উপন্যাসে কীভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে? ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক বয়ানের সমান্তরালে তেভাগা কৃষকবিদ্রোহের বয়ান উপস্থিত ছিল। ‘খোয়াবনামা’ সেই বয়ানকে নিম্নতলের ইতিহাসের সঙ্গে তুলে আনল। দাঙ্গাবিপন্নতার রাজনীতি, দেশভাগের রাজনীতির সমান্তরালে ঘটে চলা সর্বাত্মক কৃষকবিদ্রোহে বর্গাদারদের পাশাপাশি

ক্ষেতমজুররাও যোগদান করেছিলেন। নিম্নবিভের এবং নিম্নবর্গের রাজনীতি ভদ্রলোক-মধ্যবিভের পাঠপরিসর ও সাহিত্যপরিসরকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল কি? উক্ত সময়ে মধ্যবিভের সংকট ও নির্বিভের সংকটের দ্বন্দ্ব কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যান-পরিসরে? ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানভাষা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসের পুনর্কথন করে শোলোক আর কীর্তনের ভাষায়, শাসকশ্রেণির ইতিহাস-সংস্কৃতি পাঠের পাল্টাপ্রস্তাব হাজির করে এবং ‘অপর’দের প্রতিস্পর্ধী বয়ান হাজির করে। হেইডেন হোয়াইটের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইতিহাস‘নির্মাণ’-এর প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। লেভি স্ট্রাউস মিথোলজির সঙ্গে ইতিহাসের মিথজিয়া খুঁজেছিলেন। উক্ত বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিশ্লেষণে এই তত্ত্বগুলি কীভাবে সহায়ক হতে পারে? অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ নিম্নবর্গীয় বাজিকরদের দীর্ঘ যাত্রাপথে ঘটমান আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার পাশাপাশি ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে সংশ্লেষিত করে। ইতিহাস ও সাহিত্যের ভেদরেখা-সাহচর্যের দ্বন্দ্ব মুখফেরতা আখ্যান ও লোককথা উপন্যাসের নতুন নীতির সন্ধান দেয়। দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে আখ্যানজগৎ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করছেন, সেখানে মিথ ও মুখফেরতা কাহিনি সংশ্লেষিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা ধারণ করছে কীভাবে? পূর্ববর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের বিরুদ্ধবাচন হয়ে উঠতে পারছে কি? নিম্নতল থেকে উঠে আসা ইতিহাসের বাচন ও সাহিত্য কীভাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের বাচনে রূপান্তরিত হচ্ছে? প্রচলিত ইতিহাসকথন আর শাসকের বয়ানকে প্রতিস্পর্ধী জানাতে আখ্যানের গড়নগঠন কীভাবে নবায়ন ঘটচ্ছেন উপন্যাসিকেরা? ভদ্রলোকবৃত্তের দৃষ্টিকোণ ব্যতিরেকেও যে আখ্যানের নির্মাণ হয়, তা খুঁজে দেখার উপাদানগুলি কী কী?

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি নকশালবাড়ি আন্দোলনপর্বের পরবর্তী সময়ে (উনিশশো ষাট-সত্তর দশক) বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বাঁকবদলের উপাদানগুলি নিয়ে। সত্তর দশকের আগের বাংলা সাহিত্য এবং সত্তর দশকের পরের সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ ঘটছে

শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরের প্রভাবে নয়, বরং সাহিত্যের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাপ্রয়োগের সম্যক প্রভাবের ফলেও। রাজনৈতিক হিংসা, শ্রেণিসংগ্রাম, কুশীলবদের রাজনৈতিক অবস্থান, দৃষ্টিকোণ, নায়কনির্মাণের উপাদান এবং প্রধান আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে বিবর্তিত হয়েছে কীভাবে? রাজনীতি ও সাহিত্যের মতো দুই বিষম শব্দের সেতুবন্ধনের মূল সমস্যা হয় যে, সমস্ত কালপর্বের সমস্ত সংরূপের সাহিত্যেই ‘রাজনীতি’র ছোঁয়া কম-বেশি থাকে। সাহিত্যের নিজস্ব রাজনীতি বহু উপাদান সম্বলিত জটিল পথে বিবর্তিত হয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের রচনায় রাজনীতি ও উপন্যাসের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে এবং সাহিত্যগত রাজনীতি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? উপন্যাসের পুনর্সংজ্ঞায়নে সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস এবং বিশেষতঃ উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকেরা কী বিবর্তন ঘটাতে পারছেন, সেটাই বিবেচ্য। সাহিত্যের রাজনীতি এবং লেখকের রাজনীতি এক না। ঔপন্যাসিকের মতাদর্শ কী, ঔপন্যাসিক কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য কিনা কিংবা তাঁর ব্যক্তিজীবনে কোন রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, তা বিচার্য না হয়ে তাঁর রচিত আখ্যানের রাজনীতি ও আখ্যাননির্মাণের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত বলে রেনসিয়ারের মত।³

“The expression ‘politics of literature’ implies that literature does politics simply by being literature.” (Ranciere 2011, 3-4) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’-র নিজস্ব রাজনীতি আছে, যা আখ্যানগর্ভ থেকে উঠে আসে পাঠকের সামনে। পাঠক তার পাঠমুহূর্তে খিজির ও ওসমান নামক দুই বিজিতের প্রতিস্পর্ধাকে আবিষ্কার করতে পারে, মহাজন ও আইয়ুব খানের শাসনের রাজনীতিকে চিনে নিতে পারে। আর, এই আবিষ্কার করা বা চিনে নেওয়ার পদ্ধতিতে পাঠকের সহায় হয় উপন্যাসের ভাষা, নির্দিষ্ট কালস্থানিকতায় কুশীলবদের অবস্থান এবং আখ্যানবিষয়ের উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি। নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসের প্রধান কুশীলব ফ্যাতাডু-

চোক্তাররা কেউই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু আখ্যানে তাদের কর্মকাণ্ড উচ্চবর্গীয় শ্রেণি-অবস্থান ও সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধতা করে। প্রায় দেড়শো বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ও আখ্যানেতিহাস যে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অভিজাতদের লালন করেছে, ফ্যাতাডু-চোক্তাররা তাদের নির্মমভাবে আক্রমণ করে। উপন্যাসের রাজনীতি এই আক্রমণের সার্বিক গভীরতা থেকে স্পষ্ট হয়। দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে নিম্নবর্গের এমন মানুষেরা, যাদের অস্তিত্ব বাস্তবে ও সাহিত্যে বিপন্ন ছিল (অথবা অস্তিত্ব ছিলই না প্রায়)। এদের কেউ অস্তিত্বের সন্ধানে শাসকের উন্নয়ন-প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করে, কেউ অবজ্ঞাত-অস্তিত্বের সমস্ত ‘না’ জড়ো করে শাসক-মতাদর্শের প্রকল্পনাগুলিকে নস্যাৎ করে দেয়। রাজনৈতিক উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতী বয়ান রাখতে পারছে? পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাসের রাজনীতি কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে? ইলিয়াস বাংলাদেশের কালস্থানিকতায় অবস্থান করে দেশভাগ-দাঙ্গার রাজনীতি এবং ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের রাজনীতি আখ্যানবদ্ধ করছেন। কুশীলবদের শ্রেণিবোধ, রাজনৈতিক উত্তরণ এবং আখ্যানের ভাষা কীভাবে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আখ্যানধারণকে প্রত্যাহ্বান জানায়? আধুনিক সময়ের যুক্তিশৃঙ্খলা ও বাস্তবতাবাদের গড়নগঠনকে প্রত্যাখ্যান করে ‘ভূত’ তাৎপর্যপূর্ণভাবে আখ্যানে অবতীর্ণ হয়। হারবার্টের ভূত নামানোর ব্যবসা ও মৃতের সহিত কথোপকথন, হাড়িড খিজির মরে গিয়েও ওসমানের মাথায় গেঁড়ে বসা, মুনসির ভূতের পাকুড়গাছে বাস, ‘কাঙাল মালসাট’-এ ভূতদের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্‌যাপন- রাজনৈতিক উপন্যাসে ভূতেরা কি নিছকই উপস্থিত থাকে নাকি আখ্যানের গতিপথে বিশেষ ভূমিকা পালন করে? ইতিহাস কি ঢুকে পড়ে বর্তমানের সঙ্কল্পে? অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধনে এবং উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে দ্রোহোৎসবে গুরুত্বপূর্ণ তারা? সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস পূর্ববর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রথাগত নির্মাণকে প্রতিস্পর্ধা জানাচ্ছে কীভাবে? পাঠকের কাছে উপন্যাসপাঠের নতুন কোন সম্ভাবনাগুলির উন্মোচন ঘটছে? ‘আনন্দমঠ’, ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘পথের দাবী’ ইত্যাদি উপন্যাস থেকে সত্তর দশক

পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কের বিবর্তন কীভাবে সাধিত হচ্ছে? সেই বিবর্তনপথের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি কী কী?

নকশালবাড়ি রাজনৈতিক পর্বকে ঔপন্যাসিকরা যখন আখ্যানবদ্ধ করা শুরু করলেন, তখন অধিকাংশ ঔপন্যাসিক একটা নির্দিষ্ট সূত্রায়নের অনুবর্তী হলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনকে ও আন্দোলনের কুশীলবের বিচার করা, মধ্যশ্রেণির আদর্শ-নীতিবোধ থেকে দ্রোহের পরিসরকে বিচার করা, সম্ভ্রাস ও হিংসার নির্দিষ্ট চিত্রকল্পের পুনরুৎপাদন, বামপন্থী মতাদর্শের অবক্ষয়ী নঞর্থক উপস্থাপন, দ্রোহী নারী কুশীলবদের মা-বধূ-প্রেমিকা ছাঁচে আখ্যায়িত করা, উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গীয়দের উপস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী বয়ানকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলি উপর্যুক্ত সূত্রায়নকে প্রত্যাহ্বান জানাতে পারছে কি? রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী বয়ানের অন্তর্ঘাতী বয়ান প্রতীয়মান হচ্ছে কি? নিছক স্মৃতিকামুক আখ্যাননীতিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে রাজনৈতিক বাচন প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতিগুলি কী? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ কী কী বদল ঘটাচ্ছে এই উপন্যাসগুলি?

চতুর্থ অধ্যায়ে সত্তর-দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছি। সন্দর্ভের মূল উপন্যাসগুলিকে অক্ষ ক'রে সত্তর দশক পরবর্তী রাজনীতি-কেন্দ্রিক উপন্যাসের বিবর্তন। বাংলা রাজনীতি-কেন্দ্রিক আখ্যানের গড়ন-গঠন বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আখ্যানকাররা কীভাবে উপন্যাসের গড়ন-গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটাচ্ছেন? কী বলা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছে এই দু'টি মূলগত প্রশ্নের থেকেও কি কে বলছে তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে? আর, 'কে বলছে' তাতে দৃষ্টিনিবদ্ধতা (focus) কেন্দ্রীভূত বলেই কি প্রচলিত আখ্যানধর্ম প্রত্যাহ্বায়িত (challenged) হচ্ছে?

এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, ‘ক্ষুধা’ কীভাবে রাজনৈতিক আখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। ‘খোয়াবনামা’, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, ‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘কমুনিস’ ইত্যাদি উপন্যাসে এবং অন্য কিছু আখ্যানে ক্ষুধাবর্ণনার ভাষা এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির বর্ণনা রাজনৈতিক অনুষ্ণে জড়িত। ‘খোয়াবনামা’-র তমিজের বাপের গোত্রাসে খাওয়া, কুলসুমের ক্ষুধা ভুলতে চেয়ে নিজের বমি বারবার গিলে ফেলা কিংবা ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে না-কাটা ধানক্ষেতে শুয়ে উপোসী বালক বেঙ্গু-বৈশাখুর সংলাপের মধ্যে সাহিত্যের ‘নান্দনিক’ পরিসরের প্রত্যাশার দিগন্তকে বিস্তৃত করার বাস্তবানুগ চেষ্টা রয়েছে। শৈবাল মিত্রের গল্পে শহর থেকে গ্রামে রাজনীতি পৌঁছে দিতে যাওয়া মধ্যবিত্তের রাজনীতিবোধ পুনরাকৃতি পায় যখন সে বোঝে, “পাঁচপো আটা, আলু, ভেলিগুড় এবং ভারতীয় বিপ্লব সমান জরুরী”। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসে ভদ্রলোক শহুরে প্রটাগনিস্ট চরঘোষপুর গ্রামে নিরন্ন ফরুর পরিবারের মুখোমুখি হয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে। সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে ‘ক্ষুধা’ উপাদানটি পাঠকের পাঠপ্রক্রিয়া কি নতুন ধরনে বিন্যস্ত করে?

এর পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণ করেছি ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসে কীভাবে আধিপত্যমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করার অন্তর্ঘাতী সাহিত্যধারা উনিশ শতক থেকে বিবর্তিত হয়েছে- ‘কাঙাল মালসাট’ তার উত্তরাধিকার বহন করেছে। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাস যে কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে তার মধ্যে রয়েছে- (১) রাষ্ট্র (২) পুলিশ ও প্রশাসন (৩) বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪ক) ভদ্রলোকীয় পরিশীলিত সংস্কৃতি (৪খ) ভদ্রলোকীয় সাহিত্যভাষা ও সাহিত্যোপাদান (৪গ) ঔপনিবেশিক ও বিশ্বায়নী সংস্কৃতি (৫) সংসদীয় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং (৬) সামাজিক উচ্চবর্গ। বর্তমানের ঘটমান ও অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতে অতীতের ফিরে ফিরে আসা কেন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে? বাংলা সাহিত্যে অডুতরসের আখ্যানের যে ইতিহাস, তাতে নতুন কোন কোন উপাদান সংযোজন করেছে ‘কাঙাল মালসাট’?

এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছি প্রগতিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ এবং মার্ক্সীয় সাহিত্যধারা নিয়ে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল? সরোজ দত্ত বনাম সমর সেনের সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিতর্কের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের কঠোর-কঠিন প্রয়োগ সাহিত্যিকদের ভাবনাপথের স্বাধীনতায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রয়োগ যেমনটা চেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রধান নায়ক (the principal hero) শ্রমজীবী হবে; শ্রমজারিত সেই নিষ্ঠা নায়ক একাধারে আধুনিক প্রকৌশলে দক্ষ হবে এবং “a person who, in his turn, so organizes labour that it becomes easier and more productive, raising it to the level of an art”- প্রগতিবাদী বাঙালি সাহিত্যিকরা হুবহু তেমন ‘নায়ক’ খুঁজে পেল কি? কিছু সাহিত্যিক মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছাপূরণের (wishful thinking) এমন নায়কনির্মাণ করলেন, কিছু প্রগতিবাদী সাহিত্যিক এমন ভাবনাকে পরিহার ক’রে আখ্যাননির্মাণের স্বাধীনতা খুঁজলেন। ষাট-সত্তর দশকের রাজনীতিজারিত সাহিত্য এই ভাবনাপথের দ্বন্দ্বকে মুক্ত করতে পারল কি? ইলিয়াস, নবারুণ, দেবেশ কিংবা মহাশ্বেতা ব্যক্তিগত পরিসরে মার্ক্সবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীভাবে তা অনুশীলন করলেন? তাঁরা কেন মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছাপূরণের সাহিত্যকৌশল পরিহার ক’রে এবং শ্রেণিদ্বন্দের চেতনাকে ধারণ ক’রে আখ্যান নির্মাণ করলেন? আখ্যানের প্রোটাগনিস্টদের ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি প্রগতিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগকে প্রত্যাখ্যান ক’রে শাসকবিরোধী সামূহিক দ্রোহের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে কীভাবে? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রগতি সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ থেকে বিপ্লবী সাহিত্যে উত্তরণের দ্বন্দ্বিক পথ কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে?

এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে বাংলা তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছি। তথ্য-আখ্যান একইসঙ্গে আখ্যানের কল্পনাপ্রবণতাকে প্রশ্ন করে এবং কথকের স্বর ও কুশীলবদের স্বরের

ন্যায্যতা (justification) খোঁজার চেষ্টা করে। পাঠককে পাঠমুহূর্তে সচেতন ক'রে দেয় আখ্যানে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে। লেখক ও পাঠক উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত একটা সাধারণ বাস্তবতা রয়েছে- উপন্যাসের সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেক্ষিত রয়েছে। এই 'সত্য' কি সমাজের সমস্ত শ্রেণি আর সামাজিক স্তরের মানুষের কাছে এক ও অভিন্ন? কোনও এক নির্দিষ্ট কালস্থানের বাস্তবতাকে আখ্যানস্থ ক'রে লেখক সেই সত্যে পৌঁছতে চান পাঠককে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু, শাসকের সত্য ও শাসিতের সত্য এক হতে পারে কি? তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের উপাদানগুলি উপন্যাসে কেন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে? উপন্যাসের প্রথাগত ধারায় কীভাবে বাঁকবদল ঘটাচ্ছে?

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম- “বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা, নিম্নবর্গের প্রতিরোধ এবং আখ্যানের নবায়ন”। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষাগত নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করছি- ভাষা কীভাবে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটায়? আখ্যানের মধ্যে ত্রিাশীল ভাষার বহুস্তর, বহুস্বর (Polyphony), দ্বিবাচনিকতা (Dialogism) একটা রাজনৈতিক পাঠে একইসাথে শ্রেণি, বর্ণ ও প্রান্তিকতার আলাদা পাঠনির্দেশ দেয়। নবাবুর্গের ‘হারবার্ট’ ও ‘কাজল মালসাট’-এ সেই ভাষাপার্থক্য আরও স্পষ্ট কারণ, সেখানে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিকে সচেতন আঘাত করা হচ্ছে। উপন্যাসিক নিজের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে অন্য শ্রেণির মানুষ, তাঁদের ক্ষোভ-হতাশা-যাপন নিয়ে লিখছেন- বাংলা উপন্যাসে এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু, শ্রেণি থেকে বেরোলেও শ্রেণিচেতনা থেকে বেরোতে পেরেছেন কি? যে ভাষায় তিনি লিখছেন/লিখেছেন তাতে তাঁর স্বশ্রেণির চেতনা থেকে বাকি ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়। পাঠক সমাজের কাছে সেই ভাষা, স্বর ও বোধ চেনা, তাতেই অভ্যস্ত পাঠক। কিন্তু, বাঘারুর উচ্চারণ ও ততোধিক না-উচ্চারণ আমাদের অভ্যস্ত পাঠরীতিকে কি বিপর্যস্ত করে? মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ বা ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে শাসক শ্রেণির বয়ান, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কথকের বয়ান (অমূল্য আব্রাহাম, কালী সাঁতরা) ও প্রান্তিকায়িত বিদ্রোহীর বয়ান স্বতন্ত্র; ‘অরণ্যের অধিকার’ কীভাবে এক সামূহিক বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করে?

সাহিত্য নির্মিত হয় সত্য এবং কাল্পনিকের মধ্যে। যে ভাষা শাসকের মতাদর্শকে বহন ক’রে চলে, সাহিত্যভাষা কি তার পক্ষে থাকে নাকি বিরুদ্ধে? কীভাবে সেই প্রতিস্পর্ধার ভাষা নির্মাণ হয়েছে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে? আমাদের দৈনন্দিনের ভাষার শুদ্ধরূপ থাকে সাহিত্যের ভাষায়। ‘সাহিত্যের ভাষা’ হতে হয় এমনই, যাতে তা মান্যতা, শুদ্ধতা মেনে চলে। শাসক যেমনভাবে চায় সাংস্কৃতিক আধিপত্য বজায় রাখতে, তেমনভাবেই ভাষাকে গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি ‘মূল’ ধারার সাহিত্যে সেই প্রথা মেনে চলে। কিন্তু, পিয়েরে ম্যাশেরের মতে, সাহিত্যের ভাষা শাসকের মতাদর্শ দ্বারা নির্মিত ভাষাকে ভাঙ্গচুর করে, তাকে বদলায়। তখন আর সেই সাহিত্যভাষায় শাসকের প্রভাব থাকে না, থাকে বিরুদ্ধ মতাদর্শের, শোষিত শ্রেণির প্রভাব। সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলির ভাষাকাঠামোকে এই আলোতে দেখতে পারি আমরা? এই রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি কীভাবে পাঠককে তার ‘কমফোর্ট জোন’ বা স্বস্তিক্ষেত্র থেকে বের ক’রে আনে ভাষাগত নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এবং চেনা প্রত্যাশার দিগন্ত বিস্তৃত করে চলে?

দ্বিতীয় উপ-শিরোনাম ‘কথক ও কথন’- এই পর্বে আখ্যানকৌশলের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলির মিল ও অমিল আলোচিত হয়েছে। ইউরোপীয় উপন্যাস মডেল মেনে নিয়ে অথবা তাকে প্রত্যাখ্যান ক’রে আখ্যানের নতুন কোনও মডেলের দিশা দেখাতে পারছেন কি সন্দর্ভে আলোচ্য লেখকেরা? পরবর্তী পর্বে ‘আখ্যানের ভাষা, মিথ ও প্রতিরোধের সন্ধান’ শিরোনামে মিথ ও মৌখিক সাহিত্যের দ্বারা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতিরোধের যে বয়ান নির্মিত হচ্ছে, তার অনুসন্ধান করেছি। ভারতীয় নিম্নবর্ণের তাত্ত্বিক-সংজ্ঞায়ন এবং সাহিত্যে নিম্নবর্ণের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি কীভাবে সম্পর্কিত? উচ্চবর্ণের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ম-আইনের ভাষার সঙ্গে নিম্নবর্ণের সামগ্রিক অস্তিত্বের অনতিক্রম্য দূরত্ব থাকে- উক্ত উপন্যাসিকেরা আখ্যানের ভাষায় কীভাবে সেই দূরত্ব উপস্থাপিত করছেন? প্রতিরোধী বয়ানের উপস্থাপনায় ভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে “আখ্যানে ‘শরীরের রাজনীতি’” খুঁজে দেখেছি। শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গগত শোষণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম

দেহ/শরীর। উচ্চবর্গ ও ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চতর স্তর এই দেহ/শরীরকে ব্যবহার করে শোষণসম্পর্ক গতিশীল রাখতে। উপর্যুক্ত রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকরা কীভাবে এই রাজনীতিকে আখ্যানে চিহ্নিত করেন এবং শোষিত মানুষের শরীর/দেহ প্রতিরোধের ভাষা জাহির করতে পারে? পরবর্তী পর্বে ‘হারবার্ট’, ‘কমুনিস’ ও ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে বর্ণনাকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করেছি। প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে ব্যতিক্রমী ভাষাদর্শন বাংলা উপন্যাসের রাজনীতিকে প্রগতিমুখী করেছে। এর পরের পর্বে খুঁজতে চেয়েছি যে, আখ্যানপরিসরে উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গ এবং ভদ্রলোক বনাম অভদ্রলোক সংস্কৃতির পার্থক্য কীভাবে রাজনৈতিক বাচনের অভিমুখ পাচ্ছে। এর পরে ‘সাহিত্যের রাজনীতি ও ভাষা’ পর্বে উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষান্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আখ্যানের গড়নগঠনকে এই ভাষান্তরীয় প্রভেদ কীভাবে প্রভাবিত করেছে? আখ্যানস্থ কুশীলবদের ক্ষেত্রে শহুরে ভদ্রলোকীয় ভাষান্তরের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় ভাষান্তরের দূরত্ব কীভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে? ‘নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ‘ভদ্রলোক’-এর অভিজ্ঞানঃ আখ্যানের ভাষা’ পর্বে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে দীর্ঘকালব্যাপী গড়ে ওঠা নৈতিকতা, মূল্যবোধের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। উপর্যুক্ত উপন্যাসের কুশীলবেরা মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক নৈতিকতা-মূল্যবোধের পরিসরকে প্রত্যাশ্রয় জানিয়ে কীভাবে অস্তিত্বের উদ্ঘাপন করে? শেষ পর্বের শিরোনাম- ‘সেট-তত্ত্ব, পাঠকের রাজনীতি এবং বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি’। পাঠকের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং লেখকের অবস্থানের মধ্যে কোন কোন সেটে মিল থাকতে পারে? লেখকের অবস্থানগত নৈর্য্যভিত্তিকতা আখ্যাননির্মাণের ক্ষেত্রে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পাঠকের স্বস্তিক্ষেত্র তাতে কীভাবে প্রভাবিত হয়? রাজনৈতিক উপন্যাসে লেখকের পক্ষপাতের যথার্থ্যকে কিছুদূর পর্যন্ত মেনে নিয়ে মালিনী ভট্টাচার্য বলছেন নিরাসক্ত বাস্তববোধের কথা যা আখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তোলে।⁴ সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাসে লেখকের পক্ষপাতটাই তাঁর নিরাসক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যাসের সত্যের দ্বন্দ্বিক বিচার থেকেই মহাশ্বেতা এবং ইলিয়াসের আখ্যানের সত্য নির্মিত হয়। মহাশ্বেতা ঐ উভয় সত্যকেই ভাঙ্গেন ও গড়েন; এবং ঐ দু'ই সত্যের দ্বন্দ্বিক ক্রিয়ার জন্যেই 'অরণ্যের অধিকার', 'চোড়ি মুগা ও তার তীর' কিংবা 'ঝাঁসির রাণী'-র নায়করা মহাকাব্যিক মাত্রা অর্জন করে।⁵ ইতিহাসের সাহিত্যায়ন করতে গিয়ে কাদের কখন এবং কাদের আখ্যানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ইলিয়াস, মহাশ্বেতা? বিজিতের বয়ানে ইতিহাসের পুনর্লিখনে/পুনর্পাঠে ভাষার বহুস্তরীয় পাঠকে কীভাবে হাতিয়ার ক'রে তোলেন এঁরা? লেখক নিশ্চয়ই তাঁর মতাদর্শের প্রচার করবেন না অথবা নিজবিশ্বাসের মতাদর্শ আখ্যানের মধ্য দিয়ে পাঠকের ওপরে চাপিয়ে দেবেন না। কিন্তু, নিজের বাস্তবতার অবস্থানকে আরোপিত নিরপেক্ষতায় সাজিয়ে দেওয়ার দায়ও তাঁর নেই। মহাশ্বেতা ও দেবেশের নির্মাণে বহুস্তরীয় সমাজের ভাষার বিভিন্ন নিবন্ধন (register) কীভাবে প্রতিফলিত হয়? শ্রেণি-অবস্থান, লৈঙ্গিক-অবস্থান ও সামাজিক-অবস্থানের ভিন্নতা থেকে ভাষাপ্রয়োগের স্বাভাবিক স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়? বসাই টুডুর বাতাসের গলা মোচড়ানোর ভাষা কিংবা বাঘারুর শরীরী ভাষা কিংবা কেলুর না-ভাষা রাষ্ট্রের কাছে ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ওসমান মানসিক ভারসাম্য হারায়, শিক্ষিত-ভদ্রলোকেরা তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে চিহ্নিত করে। রণজয়ও ঠাঁই পায় মানসিক ভারসাম্যহীনদের সঙ্গে। কিন্তু, তাদের ভাষায় দ্রোহভাষার পরিচয় জাগরুক থাকে? বাজিকরদের ভাষা থিতু নয়, সময় ও স্থানের সঙ্গে তা পাটে যায়। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর শারিবার 'হামরা বাজিকর, হামারাদের আর কোনও জাত নাই' উচ্চারণ অন্তর্ঘাতী বয়ান তৈরি করে। হারবার্ট সরকারের সুইসাইড নোট এবং আত্মঘাতের পরেও অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। 'কাঙাল মালসাট'-এ ফ্যাতাডুদের ভাষা সভ্য-শিক্ষিত সমাজের উচ্চবর্গীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। বটতলা সাহিত্যের ভাষা ও সাহিত্যের যে রাজনীতি ছিল, ফ্যাতাডুদের ক্ষেত্রেও কি সেই রাজনীতিই আরও সংগঠিত, উদ্দেশ্যমুখী ও

পরিশীলিত হয়ে শাসক-নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক স্থিতিবস্থাকে ব্যঙ্গ করে? রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা ও অন্তর্ঘাতের এই সম্ভাবনাগুলো বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

সন্দর্ভে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

¹ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস রাজনৈতিক, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১, ১৭

² সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ৬৫-৬৬

³ Ranciere, Jacques, 'The Politics of Literature'. In *The Politics of Literature*, tr. Julie Rose, Polity, Cambridge, 2011, 3-4

⁴ মালিনী ভট্টাচার্য, সতীনাথ ভাদুড়ীঃ উপন্যাস ও রাজনীতি, নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, ১৯৯৬, দে'জ, কলকাতা, ৪৯

⁵ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীঃ ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেলবন্ধন, এবং মুশায়েরা উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. সুবল সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-দিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, ৪২-৫৬

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক উপন্যাস ও উপন্যাসের রাজনীতিঃ বিভিন্ন উপাদান

অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে মূল প্রশ্ন আবর্তিত হচ্ছে রাজনৈতিক উপন্যাস ও উপন্যাসের রাজনীতি- এই দুই বিষয়ের পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন উপাদানের বিবর্তনকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক উপন্যাস কী? কোন উপন্যাসকে রাজনৈতিক বলব আর কোনটাকে নয়? রাজনীতি ও সাহিত্য একে অপরকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বিশেষতঃ বাংলা উপন্যাসে রাজনীতির উপস্থাপনা পাঠকের প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে কীভাবে প্রতিফলিত হয়? লেখক-প্রকাশক-পাঠক এই স্তম্ভত্রয়ের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক উপন্যাস বহু দশকের বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭৩-২০০৩ সন্দর্ভের উপন্যাস বিশ্লেষণের মূল সময়কাল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও নবারুণ ভট্টাচার্য সন্দর্ভে আলোচিত মূল লেখক-চতুষ্টয় হলেও রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অন্যান্য কালপর্বের লেখকরাও উপস্থিত থাকছেন।

রাজনীতি শব্দের অর্থ রাজ্যশাসনের নীতি; সাম-দান-দণ্ড-ভেদ এই চার নীতির প্রয়োগ। রাজনীতি রাজার দ্বারা প্রণীত নীতি, যাতে একইসঙ্গে প্রজাদের সুশৃঙ্খল করা যায় এবং তাদের মঙ্গল করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যদিও পলিটিক্সের সঙ্গে রাজনীতি শব্দের তফাৎ করছেন এবং পলিটিক্সের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘রাষ্ট্রনীতি’ শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। ‘রাষ্ট্রীয় ব্যাপার’ প্রবন্ধে লিখছেন,

যখন পূর্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাত হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজ্য শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি

নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। (ঠাকুর, ১৩০১ সাল)

‘পলিটিক্স’ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতের প্রেক্ষিতে রাজনীতি বা পলিটিক্সের (শব্দটির ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য অনুমোদিত, তা স্বীকার করেও) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। পলিটিক্স মানে যে শুধু আত্মরক্ষার শিক্ষা পাওয়া নয় বরং ‘চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে’^১ মানুষের সমাজে বাস্তবপ্রয়োগে নিয়ে আসা, এই তাঁর বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শন অনুযায়ী পলিটিক্সকে ‘উন্নত মানবতা’-র প্রায়োগিক রূপ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। রাজনীতি বা রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল-র মতামতও প্রণিধানযোগ্য। অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুযায়ী পলিটিক্স হচ্ছে বাস্তবিক জ্ঞান, রাজনীতি হচ্ছে সামাজিক অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। নাগরিকদের শান্তিবিধান ও স্বস্তিপ্রদানের জন্যে রাজনীতিবিদরা নিয়ম ও সংবিধান তৈরি করেন ও তার পালন করেন^২। অন্যদিকে, অ্যারিস্টটলের মতে, সভ্য নাগরিকবৃন্দেরও সরাসরি ভূমিকা থাকে প্রশাসনিক কাজে। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, ‘পলিটিক্স’ শব্দটার মধ্যে নিন্দার্থ নিহিত নেই, পোলিসে বাস করা নাগরিকবৃন্দের জন্যে সর্বজনমান্য কিছু নিয়ম, রীতি ও আচরণবিধি নির্মাণ করার কেন্দ্রীয় শব্দ ‘পলিটিক্স’। জ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে^৩ ম্যাকিয়াভেলি ও কৌটিল্যের ব্যাখ্যায় ‘রাজনীতি’ শব্দটি অনুধাবন করেছেন। “এঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মোহজালের বাইরে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা [রাজনীতি] দেখতে-বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। যা দেখা গেল, তা মনোহর নয়, মানবিক সততা ও ন্যায়বিচারের সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই” (১৬৬-৭) পলিটিক্স পল্লীর নিয়মশৃঙ্খলা সর্বোপরি মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে, তা মানবিক জীবনের ধর্ম- অ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞায়নের ব্যাখ্যা এভাবেই করেন তিনি। যদিও তৎকালীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্র (Polis- City) এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর দেওয়া ‘আদর্শ রাষ্ট্র’-র রাজনীতি ও নাগরিকদের সংজ্ঞায়ন প্রশ্নের মুখে পড়ে। আধুনিক রাজনীতির সংজ্ঞানির্ধারণে এবং অতিব্যবহারে দুষ্ট ‘রাজনীতি’-র

মৌলিকত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে জুলিয়ান কোরাব কারপোইজৎ-এর বইতে, শোভনলাল দত্তগুপ্ত ‘রাজনীতি ও মৌলিকতা’ প্রবন্ধে অনুবাদ করেছেন,

রাজনীতি হল অনুশাসনের একটি শৈলী এবং সমাজের সবাইকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার কাজ। তার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতায় আসা কিন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্যে ক্ষমতায় আসা নয়; ক্ষমতার প্রয়োজন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর সে কারণে আমরা মুখোমুখি হই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের... ক্ষমতার লড়াইকে বাদ দিয়ে রাজনীতি হয় না। রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য একটি মঙ্গলময় সমাজের বাস্তবায়ন, যার মূল কথা হল নাগরিকদের সম্পদ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে একটি যথার্থ মানে পৌঁছে দেওয়া। (দত্তগুপ্ত ২০১৭, ৩২)

এই সংজ্ঞায়নে নিশ্চিতভাবে আধুনিক একুশ শতকীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বার্তা দিতে চাইছেন কারপোইজৎ। কিন্তু, ‘রাজনীতি কি হওয়া উচিত’- এই ঔচিত্যবোধের নির্দেশেও কয়েকটি বিশেষ শব্দে দৃষ্টি ফেরানো যায় যেমন, ‘সবাই’ (অন্ততঃ শোভনলালের অনুবাদে যেভাবে থেকেছে)। এই ‘সবাই’ শব্দের মধ্যে উচ্চবর্গ থেকে নিম্নবর্গ, বিলিওনেয়ার থেকে ভূমিহীন কৃষক, অধ্যাপক থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সকলেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে! আর, একইসঙ্গে কি বিলিওনেয়ার ও দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষ- এঁদের মঙ্গল সম্ভব? উপরিলিখিত ‘সংগঠিত ব্যবস্থা’ উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের কল্যাণসাধনে ব্রতী হতে পারে? বিশেষতঃ শ্রেণিবৈষম্যমূলক সমাজে, এবং ভারতের মতো ধর্মবৈষম্যমূলক, বর্ণবৈষম্যমূলক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায়? যদি না, ‘ক্ষমতার দ্বন্দ্ব’ ও বহু প্রতিঘাত পেরিয়ে ‘সাম্যবাদী’ কল্যাণমূলক সমাজকাঠামো বাস্তবায়িত হয়?

রাজনীতি সবসময়েই দ্বিবচনিক, একবচনিক নয়। বিশেষতঃ আধুনিক সময়ে রাজনীতি শাসক এবং শাসিত দু’য়েরই আদানপ্রদানের ওপর নির্ভর করে। যদিও, সেই আদান-প্রদানে অসমতা আছে, শাসকের দ্বারা শাসিতের ‘সম্মতি/কনসেন্ট’ আদায় ক’রে নেওয়া ও শাসিতকে

মতাদর্শগত আধিপত্য দ্বারা প্রভাবিত করার শর্ত রয়েছে। শাসক তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দ্বিবিচনিক উপাদানগুলোকে লঙ্ঘন ও বাতিল করার চেষ্টা করে। শাসিতের সঙ্গে তখনই শাসকের বিরোধমুহূর্ত তৈরি হয়। আর, রাজনীতির এই পাঠ যুগব্যাপী চলতে থাকে। এই পাঠের মধ্যেই যে ধারণা সমাজে তৈরি হয়ে যায় তা হচ্ছে, পলিটিক্স বা রাজনীতি অনৈতিক রুচিহীন ও শীলিত মূল্যবোধের বিরোধী। অ্যারিস্টটল এমনকি কৌটিল্যের সংজ্ঞায়নে কিন্তু রাজনীতিকে ‘প্রয়োজনীয়’ ও ‘জীবনের ধর্ম’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহে, প্রাচীন কাল থেকে রাজনীতিবিদ্বত্তের তত্ত্বায়নে ‘রাজনীতি’-র স্থান উচ্চকোটির। তাহলে কি সাধারণ জনসমাজে (প্রধানতঃ শাসিত ও শোষিত জনগণ দ্বারা নির্মিত সমাজস্তর) ওই তত্ত্বায়ন আর প্রকৃত অনুশীলনের বিরাট কোনও ফাঁক রয়ে গেছে? সেই ফাঁক বহু শতকের শাসক-অনুশীলনে আর পূরুট হয়নি, বরং শাসকের সযত্নেচেষ্টায় তা বেড়েছে ক্রমেই? আমাদের দৈনন্দিনবৃত্তে ‘পলিটিক্স’ আর ‘রাজনীতি’-র দ্যোতনা আলাদা; বাচনিক অনুশীলনে রাজনীতি শব্দের থেকেও ‘পলিটিক্স’ শব্দে নেতিবাচকতা অনেক বেশি নিহিত থাকে। ‘পলিটিক্স খুব খারাপ’ অথবা, ‘পলিটিক্স করবেন না’ এই জাতীয় সাবধানবাক্য ভদ্রলোকবৃত্তে অহোরহ ছুঁড়ে দিই আমরা। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস বিচার করতে গেলে, বিশেষতঃ ষাট-সত্তর দশকের পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস বিচার করতে গেলে, এই ব্যবহারিক বাক্যগুলো জানা জরুরি; কারণ, এই বাক্য নির্মাণ করে পাঠকসমাজ ও লেখকসমাজ উভয়েই।

রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ক্ষমতার প্রশ্ন। রাজনীতি অর্থে শুধু ‘সায়েন্স অব পলিটিক্স’ নয় বরং ‘সায়েন্স অব পাওয়ার’ও। সমাজের ক্ষমতাকাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখার অনুশীলন বনাম তাকে বদলাতে চাওয়ার অনুশীলন। আর, এই দ্বন্দ্ব যুগান্তরে ক্রিয়াশীল। রাষ্ট্র কীভাবে শাসনের নীতি-কৌশল ঠিক করবে ও প্রবহমান পরিসরের স্থিতিবস্থা বজায় রাখবে, তাও রাজনীতিরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, শাসিতও তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিশেষতঃ ভারতে কোনও ব্যক্তির প্রদত্ত ভোটের ওপরে নির্ভর করে রাষ্ট্রের শাসনভার কোন মতাদর্শের অনুশীলনকারীদের

হাতে থাকবে এবং কোন নীতি তাঁরা প্রয়োগ করবেন শৃঙ্খলা-অনুশাসন-নাগরিক অধিকার বজায় রাখতে। শুধুমাত্র ‘সক্রিয়’ ভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের বা কোনও মতাদর্শধারী দলের অনুগামী হওয়া নয় বরং তথাকথিত ‘নিরাজনৈতিক’ ব্যক্তিও তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়েই বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেন ও তার দ্বারা প্রভাবিত হন। জোসেফ ব্লটনার রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্যক্তির ভূমিকা ও আচরণ নিয়ে বলছেন যে, উপরতলায় থাকা যে রাজনীতিবিদরা নীতি ও আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োগ করে এবং আইনরক্ষা করে, তারা গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই। কিন্তু যে জনগণ এই পদ্ধতিগুলিতে অংশগ্রহণ করে এবং সরকারকে (তা যেরকম সরকারই হোক) আইন প্রণয়ন করতে ও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে কোনওভাবে প্রভাবিত করে, তারাও কম গুরুত্বপূর্ণ না।⁴ আধুনিক রাজনীতিতে (বিশেষতঃ গণতন্ত্রে) সমস্ত শ্রেণির মানুষের ‘সক্রিয়’ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এবং তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাস্তবিক অনুশীলনে ক্রমেই সর্বসর্বা হয়ে ওঠে রাষ্ট্র। রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনায় এই রাষ্ট্র-র সংজ্ঞা নির্ণয়ও জরুরি, কারণ, সন্দর্ভে আলোচিত লেখকদের রাষ্ট্রের প্রতি যা মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বাচনকে (ডিসকোর্স) প্রতিরোধ করার যে চেতনা, তা তাঁদের উপন্যাসকে প্রভাবিত করে। ফলে, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র এক মানদণ্ডও তৈরি হয়ে যায়। ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’ বইতে ভ্লাদিমির লেনিন এই রাষ্ট্র ও রাজনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁরও আগে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস ‘পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১৮৮৪)’ গ্রন্থে রাষ্ট্রের রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষণ করেছিলেন এই বক্তব্যে,

As the state arose from the need to keep class antagonisms in check, but also arose in the thick of the fight between the classes, it is normally the state of the most powerful, economically ruling class, which by its means becomes also the politically ruling class, and so acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class. (Engels 2000, 93)

লেনিন এঙ্গেলস্-র এই রাষ্ট্রের ধারণাকে সামনে রেখে এবং বুর্জোয়াবিকাশের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপসাধনের তত্ত্বকে (১৯১৮) প্রাধান্য দিয়ে রাজনীতির তত্ত্বকে বিবর্তিত করলেন। শোষিত শ্রেণির দ্বারা শোষক শ্রেণির রাষ্ট্রকে পরাভূত করার রাজনীতি। সর্বহারার মতাদর্শকে জয়ী করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয় তত্ত্বায়ন।

... the theory of Marx and Engels of the inevitability of a violent revolution refers to the bourgeois state. The latter cannot be superseded by the proletarian state (the dictatorship of the proletariat) through the process of “withering away”, but as a general rule, only through a violent revolution... the necessity of systematically imbuing the masses with this and precisely this view of violent revolution lies at the root of the entire theory of Marx and Engels. (Lenin 1999, 16-17)

সন্দর্ভে আলোচিত প্রত্যেক লেখকই মার্ক্সবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে আস্থাশীল এবং ‘রাষ্ট্র’ সম্বন্ধে এঁদের মতামতও এই ধারণার সঙ্গেই মেলে; যদিও, ‘ভায়োলেন্ট রেভলুশন’ শব্দবন্ধে এসে এঁদের মতামতের ভিন্নতা চোখে পড়ে। রাজনীতির আলোচনায় ও তত্ত্বে সাম্প্রতিক কালে বহু বাঁকবদল হয়েছে এবং ‘রাজনীতি’ শব্দটির অর্থও প্রসারিত হয়েছে। মূলতঃ রাষ্ট্র পরিচালনার ও রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন প্রতর্ক বা ডিসকোর্সের বিরোধিতায় উঠে এসেছে রাজনীতি শব্দের বহুদ্যোতনা। উপমহাদেশের ক্ষেত্রে লিঙ্গ রাজনীতি, দলিত রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি, পরিবেশের রাজনীতি, উচ্ছেদের রাজনীতি, উন্নয়নের রাজনীতি ইত্যাদির তত্ত্বায়ন হয়েছে, যা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। আর, এরই সঙ্গে উপমহাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের ও দ্রোহপ্রচেষ্টার তত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতর্ক তৈরি হয়েছে; রাজনৈতিক সাহিত্যের নির্মাণে এবং ‘রাজনীতি’ শব্দের অর্থায়নে তার যথেষ্ট ভূমিকা।

১৯৯০ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র এবং রাজনীতি, দু'য়ের সংজ্ঞাতেই কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। উদারনীতিকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়ন (LPG) নীতিত্রয়ের প্রয়োগ ঘটে বিশ্বের প্রায় সব দেশের অর্থনীতিতে। আর, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে 'উন্নয়নশীল' দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্দোলিত হয়, রাষ্ট্রক্ষমতার লড়াইয়ে থাকা দলগুলোর চেতনা ও নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। নব্বই দশকের শেষে যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রায় ৫ দশকের ঠাণ্ডা যুদ্ধে পুঁজিবাদ জিতে যাচ্ছে, তখন উদারনীতিকরণের অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল প্রায়োগিক রূপ পেতে থাকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে, ভারতের রাজনীতিতেও-

Liberty to establish any kind of economic activity at any time anywhere in the country without anticipating any private or public restrictions, In short liberalizations mean looseness in the rule and regulations. When Government removes the restrictions from the fields of production exchange and distribution through its industrial export-import and taxation policies, it is called the Policy of liberalization. (Sengupta 2001, 3)

চন্দন সেনগুপ্তের দেওয়া উদারনীতিকরণের এই সংজ্ঞায় ভারত ঢুকে পড়ার পরে বিশ্বায়নী সংস্কৃতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে ঢুকে পড়ল। ক্রমশঃ ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে একের পর এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হল, তাইই নয়, এই পরিবর্তনগুলো ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকেও প্রবলভাবে বদলে দিল। বিদেশি পণ্য অবাধে প্রবেশ করতে লাগল ভারতীয় পণ্যক্ষেত্রে, বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকারি বজ্রমুঠো আলাগা হতে শুরু করল, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকারগুলোর বেসরকারিকরণের ফলে আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখে বদল

আসতে শুরু করল এবং ‘বলপূর্বক’ সমসত্ত্ব সংস্কৃতি-অর্থনীতির খাপে সামাজিক কাঠামোকে ঢুকিয়ে নিতে গিয়ে বৈষম্যের নতুন প্রয়োগক্ষেত্র তৈরি হতে লাগল। এরই সঙ্গে দ্রুত পালটে যেতে লাগল জনচেতনা ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বায়ন মানবসভ্যতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব একটা যুগ এবং এমনই এক ‘spatio-temporal processes of change’, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ককে বিশেষভাবে বদলে দিয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় পরিসরে ‘সীমাবদ্ধ’ পূর্বস্থিত উপাদানগুলির এবং জনসমাজের ক্রিয়াকলাপের খোলনলচে নিরন্তর বদলে চলেছে।^৫ বিশ্বায়ন-উদারনীতির ভাল-মন্দ নিয়ে বহু বিতর্কের অবকাশ রয়েছে এবং এখনও আমরা এই ত্রয়ী অভিঘাতের ভাল-মন্দ প্রভাবের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। এই সন্দর্ভে অর্থনীতির ভাল-মন্দ আলোচনা করার অবকাশও নেই। কিন্তু, এই ত্রয়ী-অভিঘাতে খোলনলচে পালটে গেল ‘মধ্যবিত্ত’ সংজ্ঞায়নের। মধ্যবিত্তের চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তি-আচরণ-রুচি এবং সাংস্কৃতিক দিগন্ত খুব দ্রুত বদলে যেতে শুরু করল। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সাহিত্যেও এসে পড়ল; অর্থনীতিগত নীতিবদলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রভাবই ভারতীয় সাহিত্যে পড়লেও মূলতঃ সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাদিগন্ত বদলের সঙ্গে অর্থনৈতিক বদলের মিথস্ক্রিয়ার পরোক্ষ প্রভাব সাহিত্যে পড়ল। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসও দ্রুত অভিযোজিত হতে লাগল এই বদলের সঙ্গে। উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণ ও প্লটনির্মাণে বিশ্বায়নী সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বহু উপন্যাসেই। প্রাক-বিশ্বায়ন সময়ে, ১৯৭৭ সালে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘বিবাহবার্ষিকী’- সেই উপন্যাসেও আঁচ পাওয়া যায় তৎকালীন পণ্যসজ্জা নগরায়ণের এবং ভবিষ্যতে আরও ভোগ্যপণ্যকামী সমাজে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে পারে সেই সমাজ। দীপেন্দ্রনাথ ‘বিবাহবার্ষিকী’ উপন্যাসে ভোগ্যপণ্য-সংস্কৃতির হইহই করে ঢুকে পড়াকে প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৭০ দশকে পার্টি-হোলটাইমার মণিমোহন উদ্বিগ্ন হন যখন শোনেন যে তাঁর সাত বছরের ছেলে বাবুয়া ‘ক্যাডবেরি’ খেতে ভালবাসে। আপাতদৃষ্টিতে ক্যাডবেরি শিশুপ্রিয় খাদ্য, মনোলোভা কিন্তু এর মধ্যেই মণিমোহন আঁচ পান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের। তাঁর

সাদাসিধে যাপন, তাঁর এতদিনের লালিত কমিউনিস্ট মূল্যবোধ হঠাৎ ঝড়ের সামনে পড়ে; অথচ, এই ঝড় অবশ্যম্ভাবী, এড়ানো যাবে না।

বাবুয়া ক্ষেপে উঠে বলল, বাবু কমিনিস্ট। আমি কক্ষণও কমিনিস্ট হব না।

তুমি কী হবে?

টিনটিন। ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সঙ্গে জাহাজে ঘুরব। তোমরা এখানে বসে বসে কাঁচকলা ভাজা খেয়ো। আর জাহাজে কেমন কুটুস মাংস খাবে, ক্যাপ্টেন হ্যাডক মদ খাবে, আমি- প্রায় আত্ননাদ করে উঠে মণিমোহন বলল, ‘কী খাবে?’ মণিমোহন বলল, ‘এসব কী কনক?’ ক্ষুব্ধ স্বরে কনক উত্তর দিল, ‘আনন্দমেলা। কমিকস। তুমি কী দিয়ে ঠেকাবে?’

তুমি কী দিয়ে ঠেকাবে মণিমোহন? ভোগ্যপণ্যসর্বস্ব জীবন। বাচ্চাদেরও সেই ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। আগুন একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৬২)

‘বিবাহবার্ষিকী’-র মতো রাজনৈতিক উপন্যাসে কলকাতা শহরের এক কমিউনিস্ট প্রোটোগনিস্ট মণিমোহনের রাজনীতিকেন্দ্রিক জীবন, বিগত রাজনৈতিক ভুলের স্থালন ও সত্তর দশকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক পুনর্গঠন ঘিরে আবর্তিত হয়। আর, তাঁর স্থানান্ত্রে ঢুকে পড়ে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বাঁকবিন্দুগুলো। ফলে, এই রাজনৈতিক উপন্যাস মণিমোহনের মতাদর্শের অবস্থান থেকে দেখতে পারে সমাজের, পারিপার্শ্বিকের ও স্বজনদের দ্রুত বদলে যাওয়া। নবারণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে আখ্যানের স্থানান্ত্র ‘৯০ দশক। তখন উদারনীতি-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়ন ডানা মেলতে শুরু করেছে। উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট রণজয়ের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তখনও শেষ না হলেও, আরেকটি যুদ্ধফ্রন্ট তাকে খুলতে হয়েছে বিশ্বায়নী আর্থ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। “দোকানের মধ্যে টিভি চলছে। কোকা কোলা, পেপসি। এভারেডি ব্যাটারির চিৎকার- গিভ্ মি রেড।”^৬ কলকাতায় এসে পড়েছে আমেরিকান ক্যান্ডি বিয়ার, রক্ ব্যান্ডের রেযারেযি, নিত্যনতুন মডেলের গাড়ি এবং বাইক। রণজয়ের সন্তান কোবার ভাষায় উঠতি-ধনী বা ‘নিও রিচ্’-রা সংস্কৃতিজগতকে গা-জোয়ারি দখল করে নিয়েছে। রণজয়ের

লুকিয়ে রাখা রাইফেল, এই আখ্যানের মূল যা মোটিফ, সেই রাইফেলের ওপরে ফ্ল্যাট তুলে ফেলেছে প্রমোটাররা। আদর্শকে চাপা দিয়ে রিয়াল-এস্টেট ব্যবসা ফাঁদার কী প্রতীকী উদাহরণ। রণজয় কিন্তু '৮০ এবং '৯০ এর দশকের হঠাৎ বিষম বদলকে পাতাই দেয়না, সে এই দু'দশক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সে বেঁচে আছে সত্তরে, কারণ তখন 'চেয়ারম্যানের চীন' আছে, বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ আছে আর ক্ষইতে থাকলেও টিকে আছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। কিন্তু, সেইসব যখন ভেঙ্গে যায়? যখন '৭০ দশকের শেষ আর '৯০ এর দশকের শুরু অবধি পুঁজিবাদের গোপন আক্রমণে দ্রবীভূত হয়ে যায় কমিউনিস্ট সঙ্ঘ, সমাজতন্ত্র-অভিমুখী অর্থনীতি? তখন? নবাবুর্গ কমিউনিজমের ভাঙনমুহূর্ত ধরে রাখেন 'হারবার্ট (১৯৯৩)'-এও, "১৯৯২ সালের মে দিবস। রাশিয়াতে বরিস ইয়েলৎসিন জব্বর ভূতের জলসা বসিয়েছেন। লাখ লাখ কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিজমের ভূত দেখছে। সলঝেনিৎসিনের ছদ্মবেশে রাসপুটিন ফিরে আসছে। যুগোশ্লাভিয়া ভেঙ্গে পড়ছে।... কমিউনিজম কেলিয়ে পড়েছে" (ভট্টাচার্য ২০০৫, ৬১)। অর্থাৎ, ঔপন্যাসিকেরা সম্পৃক্ত থাকছেন ক্রমবিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এবং উপন্যাসের 'বর্তমান' ধরে রাখছে সেই দশকের সাংস্কৃতিক অভিমুখ, যেখান থেকে আখ্যানেরা তৈরি হচ্ছে, উপন্যাসের 'ব্যক্তি' নির্মিত হচ্ছে। 'রাজনৈতিক উপন্যাস' সংরূপ-বিভাগে এই উপাদানগুলো থাকছে। এখানে মনে রাখা দরকার ভারতীয় তথা বাঙালি মধ্যবিত্তায়নের কথা। সুরজিৎ ভাল্লা যে মধ্যবিত্তায়ন ও আকাজ্জা-চাহিদা বদলের কথা বলছেন, বিশ শতকের শেষ দু'ই দশকের 'রাজনৈতিক উপন্যাস' সংরূপে তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, সংজ্ঞানুযায়ী মধ্যশ্রেণি গরিবও না, ধনীও না। মধ্যশ্রেণি কিছু মূল্যবোধের সমাহার, কিছু আকাজ্জার সূচক এবং 'আইন-শৃঙ্খলা'য় বিশ্বাস রাখা সামাজিক অংশ। অভিজাত জমিমালিক বা শিল্পপতির বিপ্রতীপে মধ্যশ্রেণি সেইসব মানুষদের সমাহার, যাঁরা পুরনোপন্থায় অর্থোপার্জন ক'রে সম্পত্তি বাড়ানোয় বিশ্বাসী।^৭

Thus, it is logical is for the middle class to believe in the opposite of what the traditional elite believes. Its own self-interest demands an

increase in its own welfare, but its gains can come only from a more open economy, from less controls on its own enterprise, from more economic freedom. (Bhalla 2007, 97)

মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরেই রয়েছেন উপন্যাসের পাঠকদের সিংহভাগ এবং লেখকেরাও। মুক্ত-বাজারের প্রভাবে পুরনো রীতিনীতি-মূল্যবোধ বদলের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনৈতিক আকাজ্জা-আচরণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও তো প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ

রাজনৈতিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে কিছু সমস্যা রয়েছে। কারণ, রাজনীতির প্রতিগ্রহণ (রিসেপশন) ব্যক্তি কীভাবে করবে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার যে জটিল বহুমুখী চরিত্র-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়ায় যে অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ হয়, সেই সমস্ত কিছুই রাজনৈতিক সাহিত্যে প্রভাব ফেলে। মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে রাজনৈতিক উপাদানগুলোকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া বা বিচ্ছিন্ন ক’রে নেওয়া অসম্ভব। এডিথ ট্রুজওয়েল লিখছেন, একভাবে দেখতে গেলে রাজনীতির বৃহত্তর সার্বিক সংজ্ঞানুযায়ী, সমস্ত সাহিত্য এবং অবশ্যই পুরো জীবন আদতে রাজনৈতিক। এমনকি রাজনীতিবোধের অভাব বা, রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা/পক্ষপাতহীনতা (political neuutrality) একটি রাজনৈতিক অবস্থান।^৪ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, আমাদের জীবন ও সমস্ত নির্মাণের সঙ্গেই রাজনীতি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। যে লেখকদের লেখা বিশ্লেষণ করতে চাইছি, তাঁদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই, বরং এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি তাঁরা স্বীকার করেই নিচ্ছেন। ‘পলিটিকাল নিউট্রালিটি’-র ভানটুকু অন্ততঃ করতে চান নি তাঁরা। শিল্পের রাজনৈতিক অভিমুখ প্রসঙ্গে জর্জ অরওয়েল তাঁর ‘Why I write?’ প্রবন্ধে লিখছেন, “the opinion that art should have

nothing to do with politics is in itself a political attitude” (Orwell 1980, 101)

এই সংজ্ঞাগুলি পরিষ্কার করছে সাহিত্যে রাজনীতির অন্তর্ভুক্তির কারণগুলি। একইসঙ্গে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ এই সংরূপের (জঁর) স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট ক’রে নেওয়ার বাধা থাকছে। আর, এই ‘অস্পষ্টতার’ জন্যেই কিংবা এই সমস্ত জীবন ও সাহিত্য জুড়ে রাজনীতির উপস্থিতির কারণেই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, তা বিবর্তিত হতে থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সাহিত্যের ভাষা-প্রকরণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে। ব্যক্তির সঙ্গে রাজনীতির আর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিধির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক এই বিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। কোনও ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক উপন্যাস লিখবেন এমন মনোবাসনা নিয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন না। তেমনই, অন্য কোনও বিশেষ সংরূপের উপন্যাস লিখবেন বলে বা সমালোচক কোন অভিধায় তাঁদের ভূষিত করবেন এই ভেবে ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখতে বসেন না। একটি উপন্যাসে বা সাহিত্য-বিভাগে অনেকগুলি উপাদান মিলেমিশে থাকে- রাজনৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ, শ্রেণি ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য/বিভেদ, ব্যক্তিগত বিশ্বাস-মতাদর্শ, বুদ্ধিমেধাগত বিচার ইত্যাদি। এই সবই গভীরভাবে ঔপন্যাসিকের মস্তিষ্কে তথা লেখায় মিশে বিভিন্ন পথে প্রকাশিত হয়। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা সমস্যা ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ জঁর-র ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়- পাঠের মধ্যে বা উপন্যাসটির মধ্যে রাজনৈতিক উপাদানগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা; কোন রাজনৈতিক উপাদান বা কতটা রাজনৈতিক উপাদান উপন্যাসকে ডমিনেন্ট করছে তা চিহ্নিত করা। এডিথ কুর্যওয়েইল এবং উইলিয়াম ফিলিপ্স তাঁদের ‘পার্টিজান রিভিউ’-তে লিখছেন, “রাজনৈতিক চরমতা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় ও আলোচিত হয়। কিন্তু, মধ্যপন্থী উপাদানগুলো রাজনৈতিক উপন্যাস বিচারের পূর্বশর্ত বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুলিয়ে দেয়।” এই মধ্যপন্থী উপাদানে ভরা সাহিত্য, নিরপেক্ষ-ভান করে থাকা উপন্যাসগুলোর মধ্যেও রাজনৈতিক উপাদান থাকে, কিন্তু তাকে এই জঁর-তে অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত কী হবে?

এই সংশয়গুলো থেকেই রাজনৈতিক সাহিত্য- এই সংরূপটি (genre) বিকাশলাভ করেছে। বিগত কয়েক দশকে বহু সমালোচক এই সংরূপকে শৈল্পিক আঙ্গিক এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে এর গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং জোসেফ ব্লটনার “as a means for understanding the important aspects of the complex society in which he lives, as well as a record of how it evolved.” (Blotner 1955, 1) হিসেবে এই সংরূপের ব্যবহার ও বিবর্তনকে বুঝতে চেয়েছেন। সাহিত্যের উপাদানে সংশয়ের ভূমিকা যে রয়েছে, তা স্বীকার করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। জটিল সমাজে রচিত সাহিত্যে রাজনৈতিক উপাদানগুলো কীভাবে থাকতে পারে, তার নিরীক্ষা যেমন তিনি নিজে লেখার মধ্যে দিয়ে করেন, তেমনই অন্য ঔপন্যাসিকদের লেখাতেও সেই অনুসন্ধান করেন; উপন্যাসের অন্যতম নির্মাণবৈশিষ্ট্য যে লেখকের দৃষ্টিদ্বাস্ত বা পূর্বনির্ধারিত মতামত চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং সংশয়ের সঙ্গে উপন্যাসের ভেতরের পথগুলো খুঁজে চলা, ইলিয়াস সেই কথাই বলতে চাইছেন ‘সংশয়ের পক্ষে’ প্রবন্ধে,

ঔপন্যাসিকের প্রধান অবলম্বন হল তাঁর সংশয়। সংশয়ের তাড়াতেই লেখক প্রত্যেকের ভেতরে ঢোকে তাকে তদন্ত করার জন্য, এই সংশয়ের তাড়ায় তাঁকে আখ্যানের চেয়ে বেশি তাড়া করে ভেতরের মনোজগৎ এবং তাঁর সমাজ- কারণ তা-ই তাঁকে সাহায্য করে মানুষের বিশ্লেষণে... উপন্যাস-রচনার জন্য সামন্তবোধমুক্ত নগরচেতনা অপরিহার্য, এই চেতনা না-থাকলে গ্রামের কী অরণ্যের জীবনযাপন নিয়েও উপন্যাস লেখা যায় না... উপন্যাস কি তাহলে শেষ পর্যন্ত মানুষের দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের কুরুক্ষেত্র হয়েই টিকে থাকবে? হ্যাঁ, তা-ই (ইলিয়াস ১৯৯৭, ৫৩-৫৪)

সংশয়ের এই অবস্থান থেকেই ইলিয়াস তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের তথা প্রগতিশীল লেখকদের রচনার সংকটকে বিশ্লেষণ করতে চাইছেন। সরাসরি ‘রাজনৈতিক’ শব্দটি তিনি এই ‘সংশয়ের পক্ষে’ প্রবন্ধে ব্যবহার করছেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বোধটিকে খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না।

মরিস এডমুন্ড স্পিয়ার এই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের ওপর প্রথম আলোকপাত করেন তাঁর ১৯২৪ সালে লেখা ‘The Political Novel: Its Development in England and America’ লেখা বইতে। বেঞ্জামিন ডিসরাইলির^৭ রাজনৈতিক থিমের ওপরে লেখা উপন্যাসের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই সংরূপ হিসেবে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’কে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের সংরূপঘটিত প্রশ্ন ও উত্তরানুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই মরিস রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করেন,

a work of prose fiction which leans rather to ‘ideas’, than to ‘emotions’; which deals rather with the machinery of law making or with a theory about public conduct than with the merits of any given piece of legislation; and where the main purpose of the writer is partly propaganda, public reform or expositions of the lives of personages who maintain government, or of forces which constitute the government. In this exposition the drawing room is frequently used as a medium for presenting the inside life of politics. (Spere 1924, ix)

মরিস স্পিয়ারের এই সংজ্ঞায়নে ‘idea’ বা মতাদর্শের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে, যা রাজনৈতিক অভিমুখের পরিচায়ক। ‘forces which constitutes the Government’ বাক্যের ক্ষেত্রে কি সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোর দিকেই ইঙ্গিত নেই? আর, উপন্যাসিকের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট করছেন মরিস, শাসকশ্রেণির বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাপদ্ধতির ‘exposition’- আর, এই এক্সপোজিশন বা প্রকাশ্যকরণ হয় শাসকের পক্ষে নয়তো শোষিতের পক্ষে হয়। যদিও, এ সংজ্ঞায়নে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য- ‘in this exposition the drawing room is frequently used’- অর্থাৎ, বৈঠকখানার চর্চা যা রাজনীতির আভ্যন্তরীণ চর্চাকে উন্মুক্ত করে।

বৈঠকখানার চর্চা বাঙালি পাঠকের কাছে প্রথমেই যে দৃশ্যের জন্ম দেয়, তা হচ্ছে নির্দিষ্ট বিভ্রাট কিছু মানুষের তত্ত্বচর্চা, যা ‘মধ্যবিত্ত তাত্ত্বিক’ বা ‘বাবু তাত্ত্বিক’দের অনুশীলনবাস্তবতাহীন তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অন্যদিকে, ‘ড্রইং রুম’ অর্থে যদি গ্রামীণ ভারতের জনগণের বাড়ির ‘দাওয়া’ বলে বুঝি, তাহলেও কিন্তু তত্ত্বচর্চার পরিসরটুকুই থাকে। অন্যদিকে, যখনই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র সংজ্ঞা ‘ড্রইং রুম’-এ এসে থমকে যাচ্ছে, এবং সেটাকেই রাজনীতির আভ্যন্তরীণ জীবন বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন বাদ পড়ে যাচ্ছে অন্দরমহল। ভারতীয় সমাজে অন্দরমহলের বা ‘অন্তঃপুর’-এর চর্চা বাদ দিয়ে ‘রাজনীতি’-র প্রকৃত সংজ্ঞায়ন সম্ভব কি? বিশেষতঃ নারীবাদী ও অন্যান্যদের (পুরুষ-নারী বাইনারির বাইরে) রাজনৈতিক সাহিত্য যেখানে একইসঙ্গে পুরুষতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শ্রেণিকাঠামোর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অবস্থান রাখছে? রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নে সমসাময়িক (contemporary)‘ শব্দটির তাৎপর্য রয়েছে। তা যেমন ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বর্গভাগ থেকে পৃথক ক’রে দেয়, তেমনই পরিবর্তনশীল আধুনিকতার পরিসরের রাজনীতিতে দৃষ্টিনিবেশ করে। সেখানে রাজনৈতিক দ্রোহের ব্যর্থতা আছে, শাসকের বজ্রমুষ্টিতে শাসিতের ওষ্ঠাগত প্রাণের কথা আছে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলির চাপিয়ে দেওয়া মতাদর্শ আছে- আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলব নির্মাণের উপাদান এগুলি। সুইয়ার্ট শিনগোল্ড ঠিক এখান থেকেই আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করছেন,

Novels of political estrangement thus constitute a new genre that resonates with the mournful legacy of the twentieth century- that is, with the futility of political struggle. As I have already indicated, novels of political estrangement shift attention from political actors and institutions to the general public- ordinary people whose agency has been appropriated by autocratic regimes, by bureaucratic

institutions and by professionals with the expertise to colonize consciousness. (Scheingold 2010, 2-3)

এর আগে জোসেফ ব্লটনার মূলতঃ ইউরোপীয় ও আমেরিকান উপন্যাস আলোচনা ক’রে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁর ‘দ্য পলিটিক্যাল নভেল’ গ্রন্থে। বিস্তৃত বর্ণনা, সংজ্ঞা, সংরূপ চিহ্নিতকরণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। কাল্পনিক আখ্যানে রাজনীতির ভূমিকা ও বিস্তার কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বিশ্লেষণ ক’রে এগিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনও রাজনৈতিক মতবাদের জীবন ও মতাদর্শ প্রচারের আখ্যান থাকবে উপন্যাসে এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কুশীলবেলাও ভূমিকা রাখবে সেই আখ্যানে। কোনও নাগরিকের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও রাজনৈতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হতে পারে। রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপের প্রত্যেক সমস্যাগুলো অন্তর্নিহিত, তাকে ধারণ করতেই কি ব্লটনার ‘পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার’-র পরিধিকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন? ব্লটনার রাজনৈতিক উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে স্পষ্ট করছেন যে, রাজনৈতিক উপন্যাস কোনও রাজনৈতিক ঘটনা বা সংকটমুহূর্তকে সরাসরি উপস্থাপিত করে এবং বিশ্লেষণ করে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবেলা আখ্যানের ভেতরে রাজনৈতিক আবহে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ক্রিয়াশীল রাখে¹⁰। লক্ষ্যণীয়, ব্লটনার ‘Political phenomena’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন এবং এই শব্দের ব্যাপকতায় যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনা কিংবা আন্দোলন কিংবা পরিবর্তন স্থান ক’রে নিতে পারে। শুধুমাত্র বামপন্থী নয়, বরং দক্ষিণপন্থী রাজনীতিরও ক্ষেত্র থাকতে পারে আবার শুধুমাত্র শাসিতের অবস্থান থেকে সমাজ-পরিবর্তনের রাজনীতির সঙ্গে শাসকের অবস্থান থেকে সমাজ-কাঠামোর স্থিতিবস্থা বজায় রাখার ঘটনাও ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংজ্ঞায়নে চলে আসতে পারে। রক্ষণশীল থেকে প্রগতিশীল- দুই বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক আবহই স্থান পেতে পারে এই শব্দবন্ধের বিস্তারে। সংজ্ঞায়নে আরেকটি শব্দ ব্যবহার করছেন ব্লটনার, ‘directly describes, interprets or analyses a political phenomena.’-এই ডিরেক্টলি বা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি

রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণের কথা যে বলছেন, কারণ, রুটনার নিশ্চয়ই বোঝাতে চাইছেন যে, এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা পুনর্পাঠই হবে আখ্যানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্য আরও অনেক ঘটনা, সামাজিক বা ঐতিহাসিক পাঠ-পুনর্পাঠ থাকতেই পারে উপন্যাসে, কিন্তু প্রাথমিক ভিত্তি অবশ্যই হবে রাজনৈতিক পাঠ। এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক সাহিত্যের চেতনা পর্যালোচনা করা যায়। ‘অগ্নিগর্ভ’-র ভূমিকায় লিখছেন,

আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়... আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত, নিছক দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা (দেবী ১৩৮৭ সাল, আট)

যে প্রত্যক্ষ বা চিহ্নিত রাজনীতির কথা রুটনার ইঙ্গিত করছেন ‘রাজনৈতিক সাহিত্য’ সংরূপে, তা বলছেন না মহাশ্বেতা। দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী, দুই রাজনীতির সমালোচনাই করছেন তাঁর উপন্যাসগুলোতে। বসাই টুডুর শত্রু শুধু শ্রেণিকাঠামো নয় বরং ব্রাহ্মণ্যবাদও, দোপদী মেঝেনকে লড়তে হয় একটা গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে- যে সিস্টেমে পুরুষতন্ত্র-ব্রাহ্মণ্যবাদ-শ্রেণিশোষণ একে অপরের পরিপূরক। মহাশ্বেতা ‘চিহ্নিত রাজনীতি’ না খোঁজার কথা বললেও, তাঁর লেখার ওই সূর্যসমান ক্রোধই রাজনৈতিক ক্রোধ হয়ে ওঠে যাকে নাম দেওয়া যায় শ্রেণিঘৃণা বা নিম্নবর্ণের ঘৃণা উচ্চবর্ণের প্রতি। মহাশ্বেতা নিম্নবর্ণের চোখ দিয়ে যখন সেই ঘৃণা দেখান পাঠককে, তখন তা রুটনার ‘রাজনৈতিক সাহিত্য’ সংরূপের সংজ্ঞায়নকে আরও প্রসারিত করে এবং উপমহাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসকে নির্দিষ্ট করে তোলে।

রুটনার দেওয়া সংজ্ঞায় এই যে রাজনৈতিক উপাদানের উপস্থিতির প্রত্যক্ষতায় জোর, অর্থাৎ অন্যান্য উপাদান যেমন সামাজিক বা ঐতিহাসিক বা কল্পবিজ্ঞানের উপাদান থাকলেও

সেগুলো অপ্রত্যক্ষ বা অপ্রধান হবে। ব্লটনার হয়তো সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস বা অন্য সংরূপের থেকে রাজনৈতিক উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করতেই এই সংজ্ঞায়ন করছেন। আর, ‘analyze’ বা ‘describe’ শব্দের ব্যবহারে উপন্যাসের গভীরতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করতে চাইছেন। শতাধিক উপন্যাসের আলোচনা-সমালোচনা ক’রে এই শব্দগুলো শব্দদ্বারা নির্মিত ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র সংজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করছেন ব্লটনার। ব্লটনার রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপেরও শ্রেণিবিভাগ করছেন- ‘the novel as a political instrument’, ‘the novelist as a political historian’, ‘the novel as a mirror of national character’, ‘the novelist as an analyst of group behavior’ এবং ‘the novelist as an analyst of an individual behavior’ ইত্যাদি। প্রথম ভাগের মধ্যে ব্লটনার সেই সমস্ত রাজনৈতিক উপন্যাসকে রাখছেন যেগুলো সরাসরি নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচার করে। নির্দিষ্ট কোনও মতবাদের সপক্ষে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা সংগঠনকে কেন্দ্রে রেখে সেই মতাদর্শের প্রতর্ক চারিয়ে দেয় আখ্যানে। ব্লটনার যে কটা উপন্যাসকে এই সংরূপ-ভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার মধ্যে জোসেফ কনরাডের দ্য সিক্রেট এজেন্ট (১৯০৭), ডিসরায়েলির ‘কনিংসবাই (১৮৪৪)’ ইত্যাদি রয়েছে যেগুলোয় মতাদর্শগত প্রচারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লটনারের এই বিভাগীয়-সংরূপে রাখা যেতে পারে সতীনাথ ভাদুড়ির ‘জাগরী’, স্বর্ণ মিত্র-র ‘গ্রামে চলো’, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ কিংবা, গুণময় মান্নার ‘শালবনী’, জয়ন্ত জোয়ারদারের ‘এভাবেই এগোয় (অনুষ্টিপ, ১৩৮৫)’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি। এর পরে ব্লটনার যে সংরূপ-বিভাগ করছেন, ‘the novelist as a political historian’, তাতে এমন রাজনৈতিক উপন্যাসকে রাখছেন, যেগুলোর মূল কেন্দ্র ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার। ব্লটনার আর্থার কোয়েসৎলার-এর ‘The Age of Longing (1866)’ কে এর উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করছেন। এই বিভাগীয়-সংরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরে-বাইরে’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

‘শোকমিছিল (১৯৭৩)’ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’ ও ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তৃতীয় সংরূপ-ভাগে ব্লটনার উল্লেখ করছেন ফর্স্টারের ‘A passage to India (1975)’, যেখানে একটা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানে উঠে এসেছে। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৬)’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলোকে এই সংরূপ-ভাগে ফেলতে পারি। চতুর্থ ভাগে আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ভিত্তিতে নির্মিত কোনও গোষ্ঠীর বা দলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কথা বলছেন ব্লটনার এবং উল্লেখ করছেন আপ্টন সিন্কেয়ারের ‘Oil (1926)’ উপন্যাসের কথা। আমরা এই বিশ্লেষণের আওতায় রাখতে পারি শংকর বসু তথা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’, সুপ্রিয় চৌধুরীর ‘দ্রোহজ (২০১৪)’, দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮)’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসগুলোকে। পঞ্চম সংরূপ-ভাগে ব্লটনার যেখানে ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিসরের এবং অনুসন্ধানের কথা বলছেন, সেই ভাগে সতীনাথ ভাদুড়ির ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’, দেবেশ রায়ের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)’, নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট (১৯৯২)’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পায়ের তলার মাটি (১৯৭৮)’ ইত্যাদি উপন্যাসকে রাখা যায়। যদিও, এই সংরূপ-ভাগের প্রধান সমস্যা হৈছে যে, একটি ভাগ আরেকটি ভাগের সঙ্গে মিশে থাকে (ওভারল্যাপিং)। ‘অরণ্যের অধিকার’ একদিকে যেমন নিম্নবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ইতিহাস তেমনই ব্যক্তি বিরসার কিংবদন্তীতে পরিণত হওয়ার আখ্যান। ‘খোয়াবনামা’ যেমন একদিকে ইতিহাসের পুনর্পাঠ করে বিজিতদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, তেমনই ইতিহাসের এক সংকটক্ষণ ও যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে একটি জাতির রাজনৈতিক বিমূঢ়তাকেও তুলে আনে। দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলো প্রবলভাবে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাতের সন্ধান দেওয়ার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা-বৈষম্যের দলিল হয়েও থাকে। তাই, এইভাবে সংরূপ-ভাগের মধ্যে সমস্যা হৈছে। আর, রাজনৈতিক শুধু এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয়, থাকে ১- ভাষার ব্যবহারে। ২- কালস্থানিকতার প্রয়োগে। আর, লেখকের যেমন রাজনৈতিক

মতাদর্শ থাকে, তেমনই পাঠকেরও থাকে নির্দিষ্ট মতাদর্শ। পাঠকের রাজনীতিও কি উপন্যাসকে প্রভাবিত করতে পারে না?

Irwing Howe-র ‘Politics and the Novel (1957)’ আরেক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপ চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে। হাও ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে পাঠকের ওপরেও কিছু ভার ন্যস্ত করছেন। ‘রাজনীতি’ শব্দটির অভিঘাত এবং দ্যোতনার ব্যাপকতাকে মেনে নিয়েই তিনি ‘উপন্যাস’ ও ‘রাজনীতি’ এই দুই ভিন্ন শব্দার্থের মধ্যে সেতু গড়ে নিতে চাইছেন- “the term political novel is used here as a convenient shorthand to suggest the kind of novel in which this relation (between politics and literature) is interesting enough to warrant investigation.” (Howe 1957, 17) এই যে ইনভেস্টিগেশন বা অনুসন্ধানের কথা বলতে চাইছেন হাও, তাতে ভূমিকা কিন্তু পাঠককেই নিতে হবে। আর, উপন্যাস এবং রাজনীতির মধ্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং নিত্যনতুন উপাদানপুষ্ট সম্পর্কের অনুধাবনে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংজ্ঞার দিকে এগোতে এগোতে হাও লেখেন, রাজনৈতিক উপন্যাস অন্তর্বর্তী দ্বন্দের এক অদ্ভুত শিল্প। উপন্যাস হয়ে উঠতে গেলে আখ্যানে মানুষের আচরণ ও অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব থাকবে তো বটেই, তার সঙ্গে বিভিন্ন আলোড়নের প্রবাহও মিশে থাকবে। সেই সব প্রবাহের সঙ্গে আধুনিক মতাদর্শের বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকতে পারে, কিন্তু তা তাৎপর্যপূর্ণ।¹¹ হাও এও বলছেন যে,

a novel in which we take to be dominant political ideas or the political milieu, a novel which permits this assumption without thereby suffering any radical distortion and it follows, with the possibility of some analytical profit. (Howe 1957, 18-19)

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বা রাজনৈতিক সন্ধিমুহূর্ত (Political Milieu) শব্দবন্ধের প্রয়োগে রাজনৈতিক উপন্যাস সংজ্ঞায়নের সংশয় অনেকটাই কাটিয়ে দিতে পারছেন হাও। শুধুমাত্র ‘রাজনীতি’র উপস্থিতিই যে কোনও উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসের মাপকাঠিতে বিচার্য করে তুলতে পারে না, তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন হাও ‘analytical profit’ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে। অর্থাৎ, লেখকের বিশ্লেষণ এবং পাঠকের প্রতিগ্রহণ দুইই জরুরি হয়ে পড়ছে এই শব্দদু’টোর সামনে এসে। অন্যদিকে, যখনই হাও ‘insoluble pellets of modern ideology’ বলছেন, তখনই আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মিথস্ক্রিয়ায় জারিত উপন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত নির্দিষ্ট হচ্ছে। হরিশ ত্রিবেদী তাঁর ১৯৮৪ সালে লেখা সমালোচনা গ্রন্থে হাও-য়ের এই সংজ্ঞায়নকে উপযুক্ত বলে বর্ণনা ক’রে, রাজনৈতিক উপন্যাসের ‘organic emphases’-র ভিত্তির ওপরে জোর দিচ্ছেন¹²- হরিশের মতে, রাজনৈতিক উপন্যাস ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপন্যাসের মতো পূর্বনির্ধারিত শর্ত মেনে নির্মিত হয় না কিংবা ‘এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস’- এরকম রাজনৈতিক ছফ্কার দিয়ে আসেনা বরং শিল্প ও রাজনীতির ওই মিথস্ক্রিয়া সবথেকে জরুরি এই সংরূপের নির্মাণে।

গর্ডন মিলনে তাঁর ‘The American Political Novel (1966)’ বইয়ে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র নির্মাণ ও ক্রমবিবর্তনের আলোচনা করছেন। উনিশ শতকে প্যারোডি ও রাজনৈতিক প্রহসনের মধ্যে দিয়ে এই সংরূপের সূচনার কথা বলছেন। মিলনের মতে, যে উপন্যাসে দু’টি মতাদর্শের দ্বন্দ্ব যেমন সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয় বা যে উপন্যাসে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তার নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ (এবং স্বাধীনতা) আখ্যানপথে যাচাই করা হয়, তা রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কোনও ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চাৎপট ক’রে তুলতে পারেন কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা তাদের কর্মকাণ্ডের আধারে আখ্যানবর্ণন করতে পারেন।¹³ মিলনে উল্লেখযোগ্য ভাবে দু’টো মতাদর্শের সংঘাত বা দ্বন্দের কথা নিয়ে আসছেন ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর সংজ্ঞায়। মিলনের পর্যবেক্ষণে রাজনৈতিক

উপন্যাসের আওতায় উপন্যাস ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব কীভাবে চলে এবং প্রায়শই কোনও একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অপরটির ক্ষয় হয়; রাজনৈতিক উপন্যাসে অধিকাংশ সময়েই উপন্যাসের ‘শিল্প-সংরূপ-আঙ্গিক’ ইত্যাদির সঙ্গে আপস করেন লেখক¹⁴ এবং ‘রাজনীতি’কে প্রাধান্য দেওয়ার গা-জোয়ারি বা আরোপিত চেষ্টাও চলে আসতে পারে। মিলনের বক্তব্য ছিল যে, রাজনৈতিক উপন্যাসে কুশীলবেরা প্রকৃত বাস্তব থেকে উঠে আসবে, রক্ত-মাংসের হয়ে উঠবে এবং জীবনের এক সামগ্রিক ধারণা প্রকাশ করবে, কোনও আরোপিত মতাদর্শ নয়। ‘ফিক্শন’ বা কল্পকাহিনিতে রাজনীতি কীভাবে এবং কতটা উপস্থাপিত হবে, এই নিয়ে তাত্ত্বিক-সমালোচকেরা বহুযুগ বিতর্ক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কখনও তা আঙ্গিক-বিষয়ের বিতর্ক, কখনও বা বাস্তবতা-মতাদর্শপ্রেমের বিতর্ক। জে এফ ডেভিডসনের মতামত অনুযায়ী,

By political fiction is meant novels, stories or plays, or parts there of where political processes or political views are reasonably close to the surface, and where the pearls, if any, do not all have to be dredged from the vastly deeps (Davidson 1961, 856)

অন্যদিকে, স্টিফেন স্পেন্ডারের যুক্তিতে, রাজনৈতিক উপন্যাস হচ্ছে রাজনীতির কাল্পনিকীকরণ এবং আখ্যানের ভেতরের রাজনৈতিক আখ্যানপ্রবাহ শৈল্পিক মানদণ্ড মেনে চলতে বাধ্য। এই যে মিলনে বা স্পেন্ডারের মতামত, বাস্তবের গভীরতায় প্রোথিত কুশীলব ও ঘটনাবলী খুঁড়ে তুলে আনা এবং উপন্যাসের শৈল্পিকতার সঙ্গে রাজনীতির ‘রুঢ়তা’র মেলবন্ধনে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের নির্মাণ- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’ প্রবন্ধে বলছেন রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবদের চরিত্রনির্মাণে লেখকের পর্যবেক্ষণের কথা। লেখকের সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসে উপজীব্য কুশীলবদের শ্রেণির পার্থক্য যদি থেকে যায়, ভাষা, চেতনা ও মূল্যবোধের পার্থক্য যদি থেকে যায়¹⁵, তাহলে কথাসাহিত্যে লেখকের মনমতো, লেখকের স্বপ্লাধীন ‘অবাস্তব’ প্রোটোগনিস্ট নির্মিত হয়। রাজনীতিকে তথা শ্রেণি-রাজনীতিকে

প্রাধান্য দিতে গিয়ে এবং ‘শ্রমজীবী’ শ্রেণিকে আখ্যানে উল্লিখিত শ্রেণিসংগ্রামে বিজয়ী করতে গিয়ে, বহু ঔপন্যাসিকই উপন্যাস-সংরূপ ও উপন্যাস-শিল্পের সঙ্গে আপস করেন, তার পাল্লা খাটো ক’রে দেন। ইলিয়াস কিংবা নবারুণ বা দেবেশ রায় সচেতনভাবেই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ নির্মাণে এই পক্ষপাতিত্বের বিপরীতে নিজেদের উপন্যাসকে গড়ে নিচ্ছেন।

Edwin Muir সমস্ত মানবসমাজকে ‘প্রাকৃতিক (Natural)’ ও ‘রাজনৈতিক (Political)’ এই দুই ভাগে ভাগ করছেন। মুইরের মতে, “when he strives to remove the conditions in society, which frustrates the development of his own personality through political action.” মুইরের মতে, যে সাহিত্য-সংরূপ শোষিতকে তার উন্নততর জীবনের দিশা দেখানোর সংগ্রামের কথা বলবে, এবং তাকে চিত্রিত করবে, তাইই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুইরের এই সংজ্ঞায়নকেই আমি আমার সন্দর্ভের সময়কালে ‘শ্রেণি সংগ্রাম’-এর আলোয় দেখতে পারি, যেখানে শোষিত শ্রেণি তাকে নিয়ত যাঁতাকলে পিষতে থাকা সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা দেখাবে। যেরকম তমিজ তার খোয়াবে প্রতিমুহূর্তে দেখাবে, যেরকম প্রতিস্পর্ধা চ্যারকেটু দেখাবে শাসকের বয়ান নাকচ করার মধ্যে দিয়ে কিংবা বাঘারু বা মাদারির মায়ের নীরব, ফল্গুধারাসম অন্তর্ঘাত যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করবে- সেই সবই কি ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে না? আশা কৌশিক তাঁর ‘Politics, Aesthetics and Culture (1988)’ গ্রন্থে ‘রাজনৈতিক সংরূপ’-এ আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করছেন। আশা কৌশিক মূলতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কের যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সংরূপের নির্মাণ দেখতে চাইছেন। সমগ্র ‘রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড’-এর সঙ্গে জুড়ে এই সংরূপকে বিশ্লেষণ করছেন আশা কৌশিক,

Political fiction here is defined as a corpus of novels, which offer a direct treatment of political process, inclusive of political incidents

and traditions, institutions, practices and formations of change
(Kaushik 1988, 6)

আশা কৌশিক রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠার দায়িত্ব ন্যস্ত করছেন লেখকের ওপরে। লেখক কোন কোন কুশীলবকে বেছে নেবেন যারা একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আবহে ক্রিয়াশীল থাকবে অথবা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মুহূর্তের বিবরণকে আখ্যানের কেন্দ্রে রাখবেন তার ওপরে নির্ভর করে উপন্যাসের ‘রাজনৈতিক’ হয়ে ওঠা। চমন নাহালের মতে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার ওপরে নির্ভরতা নয় বরং এক মতাদর্শের অন্য মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাত ও কোনও একটি মতাদর্শের সঙ্গে অন্যগুলোর বৈপরীত্যের ওপরেই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের ক্রমনির্মাণ নির্ভর করে¹⁶।

তাত্ত্বিক মাইকেল উইল্ডিংস-র ‘Political Fictions (1980)’ অনুযায়ী, ‘রাজনৈতিক’ সাহিত্যের প্রকরণ ও বিষয় উভয়ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব বিপ্লবাত্মক বদল আনা জরুরি। বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় (আঞ্চলিক অর্থে ‘উপ’ নয়, অঞ্চলগত ভাষা) লেখা নিম্নবর্গের প্রোটোগনিস্টের জীবনআখ্যান (picaresque), খোয়াবকথন সাহিত্য (dream fantasy), ইউটোপিয়ান/ডাইস্টোপিয়ান কাহিনি কিংবা নিও-ক্লাসিসিজম ইত্যাদি সংরূপ বাস্তববাদী সাহিত্যের বিকল্প ভাষ্য হয়ে উঠছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আখ্যানধরণে যে দ্রুত ও বৈচিত্রময় বদল ঘটেছে ও ঘটে চলেছে, তার রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে নতুন কোনও সমালোচনা পদ্ধতির প্রয়োজন¹⁷। লেখকের চেতনা এবং আঙ্গিক বা বিষয় কীভাবে তিনি বেছে নেবেন তার ওপরে সাহিত্যের ‘রাজনৈতিক’ হয়ে ওঠার মাত্রা নির্ভর করে। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে আখ্যানধরণে যে দ্রুত পরবর্তন হয়ে চলেছে এবং রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপেও ভাঙচুর হচ্ছে আঙ্গিক-বিষয় উভয় তরফেই, তা বোঝা যায় কয়েকটি উপন্যাসের পর্যালোচনায়। চিনুয়া আচিবের ‘Things fall apart (1958)’ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোজের ‘One hundred years of solitude (1967)’ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ উপন্যাসগুলি

রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপের আখ্যানধরণে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। প্রথমটি আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়া দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পটপরিবর্তনের কথা বলে। উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে ইগবো জাতির আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাত ও ব্রিটিশদের দ্বারা উপনিবেশিত হওয়ার আখ্যান রচনা হয় প্রোটাগনিস্ট ওকোনকো ও তাঁর স্বজনদের কেন্দ্র ক'রে। ভাষা ও সংস্কৃতির ওপরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে একটি জাতিকে কীভাবে উপনিবেশিত ক'রে ফেলা যায় এবং তাঁদের প্রতিরোধকে দমনমূলক মতাদর্শ দিয়ে বিপন্ন ও ইনফিরিওর প্রতিপন্ন করা যায়, চিনুয়া আচিবের উপন্যাস তার স্বাক্ষর রাখে; আর, উপন্যাসটির আঙ্গিক উত্তর-ঔপনিবেশিক আখ্যানকথনের নতুন দিশা দেয় কিছু। আচিবে গল্পকথকের ভূমিকায় এই আখ্যান বিবৃত করেন, গল্পকথনের সেই প্রাচীন সংস্কৃতি, যা ক্রমেই হারিয়ে গেছিল পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক পেষণে। মুখফেরতা সাহিত্য (Oral Literature) যা আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে 'নিম্নবর্গীয়' ও 'ব্রাত্য' হয়ে গেছিল, তাকেই পুনপ্রতিষ্ঠা দেন আচিবে। প্লট ও সম্পর্কিত ঘটনাবলী বারবার আখ্যানে পুনঃকথিত হতে থাকে; 'Literature'-র বিপরীতে 'Orature'-র পদ্ধতি উপন্যাসকে 'রাজনৈতিক' করে তোলে আরও, উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে। ইউজিন ম্যাকার্থি তাঁর আলোচনায়¹⁸ দেখাচ্ছেন যে, মৌখিক সাহিত্যের ছন্দ, প্রকরণ উপন্যাসে প্রয়োগ করছেন আচিবে এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক বিরুদ্ধ-বয়ান তৈরি হচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোজ 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা (১৯৬৭)' উপন্যাসটি লেখেন স্প্যানিশ ভাষায়, যেখানে কলম্বিয়ার মাকোন্দো নামের এক কাল্পনিক জনপদের আখ্যান লেখা হয়, উনিশ শতকের অন্তিম পর্বের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি ঘিরে তা আবর্তিত হয়। হোসে আর্কাদিয়ো বুয়েন্দিয়া ও তাঁর পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের আখ্যান, দেশের গৃহযুদ্ধ, নতুন শাসকের আর্থ-সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং একটা জাতির তথা দেশের বা মহাদেশের উপনিবেশিত হয়ে যাওয়ার নিঃসঙ্গ কথন এই উপন্যাসে লিখেছেন গার্সিয়া মার্কোজ। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোজ কিংবা তাঁরও আগে হুয়ান রুলফো (পেদ্রো পারামো উপন্যাস) ও আলেহো কার্পেস্তিয়ের তাঁদের কথাসাহিত্যে এক নতুন নির্মাণপদ্ধতি আবিষ্কার ও অনুশীলন করেন- জাদুবাস্তব আখ্যানশৈলী।

লাতিন আমেরিকার মিথ্, মৌখিক সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান এই উপন্যাসের রাজনীতিকে ধারণ করে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠা নিয়ে এই সন্দর্ভে বিশদ আলোচনা করছি।

ওপরে আলোচিত এই সমস্ত সংজ্ঞায়নে বোঝা যাচ্ছে যে, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপ নির্দিষ্টতায় জটিলতা রয়েছে ‘উপন্যাস’ শব্দে তো বটেই, বিশেষতঃ ‘রাজনীতি’ শব্দটির ব্যপকতায়। শব্দটির মধ্যে শুধুমাত্র ব্যাষ্টিগত নয় বরং ব্যক্তিগত পরিসরও ঢুকে পড়ে, জটিল মানবচরিত্র ও তার বহুমুখী প্রতিফলন। একটা উপন্যাস রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারে কল্পকাহিনির মধ্যে দিয়ে কোনও রাজনৈতিক ঘটনাকে বিবৃত ক’রে অথবা রাজনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু কুশীলবের নির্মাণে। এই উপন্যাসগুলোতে রাজনীতি মূল পটভূমি নির্মাণ করেছে নয়তো মূল বিষয়কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, যাতে প্রতিফলিত হচ্ছে ‘ব্যক্তি’-র সঙ্গে মানুষের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং তাদের উদ্দেশ্য-আকাঙ্ক্ষা। উনিশ শতক জুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং বহু কাউন্টার-ডিসকোর্স বা বিরুদ্ধ-প্রতর্ক সমাজকে প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তিগত পরিসরও যে রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে সম্পর্কিত (Personal is Political¹⁹) তা আমরা জেনেছি যেখানে ‘রাজনীতি’ শব্দটি প্রসারিত হয়েছে ক্ষমতা-সম্পর্কের ইঙ্গিতে এবং নারীদের অব্যক্ত কথনের গুরুত্বে; ‘মূলধারা’র রাজনীতি থেকে যে বিষয়গুলো সরিয়ে রাখা বা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়গুলোও পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রতর্ককে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে সামনের সারিতে উঠে এসেছে- যেমন দলিত রাজনীতি কিংবা ভাষার রাজনীতি। আর, এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে ’৯০ দশক ও তৎপরবর্তী বিশ্বায়নী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজনীতি, যার প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহিত্যে পড়েছে, সাহিত্যতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে এবং ‘ব্যক্তি’ ও মানুষের সম্পর্ককে নতুন অভিমুখ দিয়েছে। এই সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব বিশ শতকের উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে এবং বহু ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর নির্মাণের ভিত্তি হয়েছে। এই সংরূপের বিশালতার ভেতর লেখকের যথেষ্ট সুযোগ থাকে উপন্যাসের থিম্

নিয়ে নিরীক্ষণের এবং কাল্পনিকতাকে বহুদৃষ্টিকোণ থেকে দেখার। কাল্পনিকতা ও বাস্তবতার জটিল দ্বন্দ্বসংঘাতে সবসময়েই জারিত হতে হয় উপন্যাসকে। পাঠক হিসেবে আমাদের পাঠচেতনায়ও কি সবসময়েই এই কাল্পনিক বনাম বাস্তবতার বিচার চলে না? আর, যদি তা রাজনৈতিক উপন্যাস হয়, তাহলে এই বিচারপ্রক্রিয়া আরওই ঘনীভূত হয়। আর্ভিং হাও লিখছেন,

To the degree that he is really a novelist, a man seized by the passion to represent and to give order to experience, he must drive the politics of or behind his novel into a complex relation with the kinds of experience that resist reduction to formula- and this once done, supreme difficulty though it is, transforms his ideas astonishingly. (Howe 1957, 21-22)

সর্বদা একজন ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো। তাঁর দায়িত্ব তিনি অনুভূতি ও সম্পর্কবলীর যে জটপাকানো আখ্যান উপস্থাপন করতে চাইছেন, তার সঙ্গে তাঁর পূর্বার্জিত মতাদর্শের মেলবন্ধন ঘটানো।²⁰ রাজনৈতিক ঔপন্যাসিককে একইসঙ্গে অনেকগুলো মতাদর্শ ও চেতনাকে কলমের ডগায় রাখতে হয়, কারণ যে সমাজের কথা আখ্যানবদ্ধ করতে চাইছেন, সেখানে এই বহুমতাদর্শ বিদ্যমান। আর, ঔপন্যাসিকের কেরামতির ওপরেই নির্ভর করে, যাতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারপুস্তিকা না হয়ে বহুমতাদর্শের যথাযথ প্রতিফলন উপন্যাসে হতে পারে, কোনও বিশেষ মতাদর্শের প্রতি চোরাটান রেখেও।

রবার্ট বয়েস তাঁর ‘Atrocity and Amnesia: The Political Novel Since 1945 (1985)’ বইতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের উল্লেখের কথা বলছেন, যা তাঁর মতে রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সাহিত্যের কুশীলবরা তাদের চারপাশের সবকিছুর জন্য নিজেকে অবজ্ঞাত বোধ করতে পারে কিংবা বর্তমান পেরিয়ে হয়তো ভবিষ্যতের জন্য বাঁচতে

চাইতে পারে। কিন্তু, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের যাপন এমন অমোঘ অনিবার্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে যাতে দূরাগত ভবিষ্যতের থেকেও তাদের এই বর্তমান পাঠককে বেশি ব্যাপ্ত রাখে।²¹ রাজনৈতিক উপন্যাসে ব্যক্তিগত সংঘাতও সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের মোড়কে প্রকাশ পায়। ব্যক্তির উত্তরণ নির্ভর করে আখ্যানগত সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরণের ওপর। আখ্যানে প্রোটোগনিস্টের নির্মাণ ও বিকাশের ওপরে সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব-আন্দোলনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে, ঔপন্যাসিকের কেরামতি সেই বিকাশকে যথাযথ করা। মাইকেল হান তাঁর ‘The Power of the story: Fiction and Political change (1995)’ বইতে লিখছেন পাঠ্যের ওপর রাজনীতির প্রভাবের কথা। সলমন রুশদি এবং জর্জ অরওয়েলের উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কথাই বলছেন- সাধারণভাবে এটাই সত্যি যে কোনও সাহিত্যে রাজনৈতিক অভিঘাতের (impact) ঐকান্তিক বিচার করতে গেলে কোনও অস্তিত্বশীল ক্ষমতা-সম্পর্কের ওপরে তার কিরকম প্রভাব, সেটার ওপরেই জোর পড়ে। “The extent to which works of narrative fiction may be thus largely appropriated by a dominant political discourse is remarkable.” (Hanne 1995, 5) যেকোনও রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকেই সতর্ক থাকতে হয় যেন উপন্যাস নীরস রাজনৈতিক তত্ত্বের কচকচি না হয়ে যায়। এই বিশেষ সংরূপটি লেখকের সামনেও বহু সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগান্তকারী রাজনৈতিক উপন্যাস ‘জাগরী (১৯৪৫)’-র উল্লেখ করা যায়; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও মানুষের তথা সমাজের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং এক রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক ও চেতনাপ্রবাহরীতির (Stream of Consciousness) শৈল্পিক সার্থকতা- একইসঙ্গে আখ্যানে ধারণ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ি। এই উপন্যাসের প্লট উপন্যাসের প্রচলিত কার্যকারণসূত্র মানা কাহিনির বিন্যাস নয়, এই উপন্যাসের চারজন কুশীলবই (বিলু-বাবা-মা-নীলু) নির্মিত হয়েছে প্রত্যেকের নিজস্ব মনঃকথনে এবং তাঁর প্রতি অন্য কুশীলবদের দৃষ্টিভঙ্গির যৌথ উল্লেখ। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) চলাকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিসর যে রাজনৈতিক অভিমুখগত সংকটের মধ্যে পড়ে, তার প্রধান দ্বন্দের আওতায় আসে এই বিষয়গুলি-

১- ভারত উপনিবেশিত ব্রিটিশদের দ্বারা, সুতরাং ভারতের জনগণের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত। ২- বিশ্বে মানবতাবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইে ব্রিটিশরা, সুতরাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম এ পর্যায়ে স্থগিত রাখা। ৩- জার্মানি-ইতালি-জাপান অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইে ব্রিটেন-সোভিয়েত-ফ্রান্স-আমেরিকা মিত্রশক্তি; এ পর্যায়ে মিত্রশক্তিকে যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত বিশ্বরাজনীতির স্বার্থে। ৪- পূর্বোক্ত কারণে, অক্ষশক্তির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বিশেষতঃ ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে। ৫- জাতীয় কংগ্রেস ‘ভারত ছাড়ো (১৯৪২)’ আন্দোলন ও ব্রিটিশদের সঙ্গে সমস্তরকম অসহযোগিতার ডাক দেয়; অন্যদিকে, সোস্যালিস্ট দলগুলো সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সত্ত্বেও কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয় কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) এবং তাদের গণসংগঠনগুলো আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রাধান্য দিয়ে সোভিয়েত-ব্রিটেন মিত্রশক্তির পক্ষে দাঁড়ানোর আহ্বান রাখে।

‘জাগরী’-র আখ্যানকেন্দ্র এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে, জেলবন্দি চার কুশীলবের গল্পে। উক্ত জটিল সময়ে ভারতের জনগণও যখন এই দ্বন্দ্বগুলোর সামনে বহুধাবিভক্ত, তখন এই উপন্যাস সেই রাজনীতির এক দলিল হয়ে উঠতে পেরেছে; যদিও সতীনাথ ভাদুড়ি নিজে ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। বিমল কর ‘জাগরী’ প্রসঙ্গে ‘সতীনাথ ভাদুড়িঃ যেমন দেখেছি’ প্রবন্ধে লিখছেন যে, সমস্ত পূর্ণিয়া জেলায় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ির সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মতে, জীবনের নিবিড় ছোঁয়া থেকে ‘জাগরী’-র পাণ্ডিত্যগুলি ফুটেছিল, তা কোনও স্বপ্নোদ্যানের পুষ্প না। তাই, ‘জাগরী’-র চরিত্ররা নিষ্প্রাণ না কিংবা রাজনৈতিক রক্তে রাঙানো নিশ্চল পুতুল না; তারা যথার্থ মানুষ।^{২২} ১৯৭৩ সালে লেখা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শোকমিছিল’ ‘জাগরী’-র মতোই একটি পরিবারের বাবা, মা ও তাঁদের দুই

সন্তানের রাজনৈতিক মতাদর্শ ঘিরে আবর্তিত হয়; যদিও ‘শোকমিছিল’-এর প্লট রচিত হয় সত্তর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক উত্তালতাকে কেন্দ্র করে। ওই পরিবারের কেউ অবশ্য দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু সিপিআই (এম) ও সিপিআই (এম-এল) এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য এবং সত্তর দশকের শুরুতে এই দুই কমিউনিস্ট পার্টিই বহু ভাঙন ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব পেরিয়ে এসে পরস্পরের ‘শত্রু’ শিবিরে পরিণত হয়েছে। সতীনাথ রাজনৈতিক উপন্যাসের সংরূপে যে উল্লেখযোগ্য বিবর্তনের সূচনা করছেন, দীপেন্দ্রনাথ প্রায় তিন দশক পরে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

রাজনীতি আকর্ষক ও জীবনসম্পৃক্ত বলেই সব ঔপন্যাসিকই কমবেশি আকর্ষণ বোধ করেন রাজনৈতিক উপন্যাস লেখার। জীবনে ও যাপনে রাজনীতির সঙ্গে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই মোলাকাত হয় বলে ঔপন্যাসিকদের পক্ষে ‘নির্লিপ্ত’ থাকা সম্ভব হয় না আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে গভীরে জড়িত থাকলে, ‘উপন্যাস’ থেকে ‘রিপোর্টাজ’-র প্রতি বেঁকে যায় আখ্যান। কাজেই, আখ্যানের সঙ্গে লেখকের একটা দূরত্বের অবকাশ থেকেই যায়। স্পিয়ার তাঁর বইতে আরও একটা সমস্যার কথা বলেছেন ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের; তৎকালীন সময় ও কুশীলবদের বর্তমান সময় ও প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করার সমস্যা অর্থাৎ, কালগত প্রতিনিধিত্বের সমস্যা। লেখক যদি সাম্প্রতিকতা না রাখেন লেখায় তাহলে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গুরুত্ব থাকে না, কারণ কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের উপাদানে জারিত, আবার, যদি সাম্প্রতিকতার মাত্রা বেশি হয়ে যায় তাহলে চিরন্তনতার সমস্যা হতে পারে অর্থাৎ, ‘কালজয়ী’ তকমা সরে যেতে পারে উপন্যাসটি থেকে। এই দ্বন্দ্বগুলোর সফল নিরসনেই ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক জয় নিশ্চিত হয়। সাহিত্যিক নিরপেক্ষতা কীভাবে এবং কতদূর উপন্যাসের নির্মাণে ভূমিকা নেবে, এই নিয়ে বিগত কয়েক দশকে বিতর্ক কম হয়নি। বিশেষতঃ প্রগতিবাদী সাহিত্যধারায় ’৪০- ’৫০ দশকে এই বিতর্ক জোরদার হয়ে উঠেছিল; গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মার্ক্সবাদী সমালোচক এবং দ্বিধাবিভক্ত লেখকেরা এই বিতর্কের

অংশ ছিলেন। সমাজের বিশেষ কোনও আন্দোলন বা সংকটের মুহূর্তে লেখকেরা যখন নিজেরাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি ও নির্দিষ্ট কোনও মতাদর্শগত পক্ষে অবস্থান করছেন, তখন এই ‘সাহিত্যিক নিরপেক্ষতা’ চরম বিতর্কের বিষয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে মালিনী ভট্টাচার্যের মূল্যায়ণ দেখা যাক,

রাজনৈতিক উপন্যাসে এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা আরোই অর্থহীন। কারণ এখানে তো লেখকের পক্ষপাত প্রথম থেকেই স্বীকৃত, এবং এই পক্ষপাতের যথার্থ্যকে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত মেনে না নিলে উপন্যাসটি পাঠকের চোখে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। কিংবা হয়তো একথা বলা যায় যে উপন্যাসটি যদি আমাদের কাছে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে তার মানেই আমরা পরোক্ষে উপন্যাসে উচ্চারিত রাজনৈতিক মূল্যবোধকে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত মেনে নিচ্ছি। আপাতদৃষ্টিতে যেটা লেখকের পক্ষপাত, সেটা একটা নিরাসক্ত বাস্তববোধ থেকে না এলে বিশ্বাস্য হতে পারে না। সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাসে লেখকের পক্ষপাতটাই তাঁর নিরাসক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। (ভট্টাচার্য ১৯৯৬, ৪৯)

এই রাজনৈতিক পক্ষপাত ও নিরাসক্ত বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব সন্দর্ভে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোতে তো আছেই, বিশ্বসাহিত্যের অন্য রাজনৈতিক উপন্যাসেও রয়েছে। এই পক্ষপাতিত্ব শুধু যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিই হতে হবে তা নয়, তা হতে পারে কোনও নিপীড়িত ও উপনিবেশিত জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্বও। ইউরোপীয় বাস্তববাদের ধারণাকে যখন চ্যালেঞ্জ করছেন মার্কোজ এবং ইউরোপীয় সমালোচকদের দাগিয়ে দেওয়া লাতিন আমেরিকার অনাধুনিকতা ও অবাস্তবের যান্ত্রিক ধারণাকে প্রশ্ন করছেন, তাঁকে নতুন এক সাহিত্যঘরানা নির্মাণ করতে হচ্ছে। উপনিবেশিত মানুষের দখল হয়ে যাওয়া ভাষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির প্রতি পক্ষপাত থেকেই গার্সিয়া মার্কোজ তাঁর ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’ উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে লিখছেন,

Macondo was already a fearful whirlwind of dust and rubble being spun about by the wrath of the biblical hurricane when Aureliano skipped eleven pages so as not to lose time with facts he knew only too well, and he began to decipher the instant that he was living, deciphering it as he lived it, prophesying himself in the act of deciphering the last page of the parchments, as if he were looking into a speaking mirror. Then he skipped again to anticipate the predictions and ascertain the date and circumstances of his death. Before reaching the final line, however, he had already understood that he would never leave that room, for it was foreseen that the city of mirrors (or mirages) would be wiped out by the wind and exiled from the memory of men at the precise moment when Aureliano Babilonia would finish deciphering the parchments, and that everything written on them was unrepeatable since time immemorial and forever more, because races condemned to one hundred years of solitude did not have a second opportunity on earth. (Marquez 1971, 201)

গার্সিয়া মার্কোজ সমস্ত বিজিত, উপনিবেশিত জাতির কথাই কি বলছেন না? মাকোন্দো কাল্পনিক একটি জনপদ, কিন্তু মাকোন্দোকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকা ঘটনাবলী, কুশীলবেরা, রাজনীতির অভিমুখ, সামাজিক বদল এই সবই তো ইতিহাসের পাতা থেকে কিংবা আমাদের বাস্তব থেকে উঠে এসেছে। গার্সিয়া মার্কোজ তাঁর নোবেলপ্রাপ্তি-মঞ্চের ভাষণেও এই নিঃসঙ্গতার, উপনিবেশিত ক'রে রাখার ঔপনিবেশিক অনুশাসনকেই যেন চ্যালেঞ্জ করেন, “জীবনের এক নতুন এবং

পরিচ্ছন্ন ইউটোপিয়া, যেখানে কেউ অন্যদের জীবন-মরণ নির্ধারণ ক’রে দেবে না, যেখানে ভালবাসা বাস্তব হবে এবং সুখসমৃদ্ধিতে যাপন ভরে উঠবে এবং যে জাতিগুলো একশ বছরের নিঃসঙ্গতায় দন্ধে মরতে বাধ্য হচ্ছে, তারা অবশেষে চিরকালের জন্যে এই পৃথিবীতে বাঁচার আরেকটা সুযোগ পাবে।²³” গার্সিয়া মার্কোজের এই পক্ষপাত আদতে সাহিত্যের তথা উপন্যাসের বিবর্তনে প্রগতিশীল দিশা দেখায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিহ্ন’ উপন্যাসে²⁴ যেমন পক্ষপাত স্পষ্ট। আর, সেই পক্ষপাত শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাপন ও আখ্যানের ভেতরে তাঁদের বিকাশ ও পরিণতির প্রতি; এই পক্ষপাত গোপন করার কোনও চেষ্টা করেন না মানিক। এই উপন্যাসের এক নির্ভরযোগ্য আলোচনা মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে²⁵ করেছেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করলেও উহ্য রাখা হয়েছে উপন্যাসের কুশীলব নির্মাণে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। কলকাতা শহরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আখ্যানবুনন, মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন গণেশ নামক এক নির্বিকৃত শ্রমিক আর, মিছিলকে কেন্দ্র করেই মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ ও নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের কাহিনি দ্রুতগতিতে দু’টো দিনের ঘটনার মধ্যে ছুটে চলে। কিন্তু, আখ্যানের কুশীলব উপস্থাপনায় নিরাপদ অবস্থান বনাম শাসকদ্রোহীতা, মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা বনাম নির্বিকৃতের দৃঢ়তা এবং নীতি-মূল্যবোধের সঙ্গে বাস্তব ত্রুটি সমাজের দ্বন্দ্ব বুনে চলছেন মানিক, অবশ্যই তাঁর পক্ষপাত নির্বিকৃতের বিক্ষোভে, ছাত্রদের রাজপথ দখলের মিছিলে। তাই, কালিঝুলিমাথা ছিন্ন পোশাকের ওসমানের পাশে মৃত্যুর সময়েও শহর থেকে গ্রামে আসা নির্বিকৃত গণেশের প্রশ্ন- “এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাবু? এগোবে না?” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৯, ৩৭২) দাশগুপ্ত চোরাকারবারি, যুদ্ধের সময়ে অনৈতিক পথে পুঁজি বাড়িয়ে নেওয়া, অমৃত-অরুণা স্বচ্ছল উচ্চবিত্ত যারা রাজনীতিকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করতে চায়, সীতা-হেমন্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব দোদুল্যমান, অক্ষয় একদিকে অনৈতিক সুযোগসুবিধায় লোভী আবার সারাদিন রাজপথে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ দেখে মদ্যপানজনিত আত্মগ্লানিতে ভোগে, রসুল-ওসমানের বিক্ষুব্ধ হওয়া ছাড়া হারানোর কিছু নেই। আমিনা, অনুরূপা, সীতা, সুধা প্রত্যেকে নিজেদের শ্রেণি-অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে তৎকালীন আর্থ-রাজনৈতিক

সংকটের ভিতে দাড়িয়েই। রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তির চিরিত্র ও উত্তরণের যে সংক্ষিপ্তসার মানিক নির্মাণ করছেন তা তাঁর কাছে উপন্যাসের ‘নতুন টেকনিক’ হতে পারে, কিন্তু তাঁর পক্ষপাতিত্ব গণেশ-ওসমান-রসুল-আমিনাদের প্রতিই। এ পক্ষপাত ঢেকে রাখার নিরাপদ-ছদ্মবেশ মানিক নেন নি, শাসকগোষ্ঠী বা প্রকাশনা সংস্থা রুগ্ন হবে কি না ভেবে রাজনীতিকে ব্যক্তিগত-রোম্যান্সের স্তরে নামিয়ে আনেননি। বরং, আমিনা, খানিকটা গোর্কির ‘মাদার’-র আদলেই বলেছে, “অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে আহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে” (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৫) আর, পাঠক বুঝতে পারেন যে, মিছিলকে কেন্দ্র করে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা আখ্যানে শাসকের গুলি খেয়ে মরে যাওয়া ও মিছিলে যোগ দেওয়া মানুষগুলির প্রতিই পক্ষপাত মানিকের। কিন্তু পক্ষপাত সত্ত্বেও, ‘চিহ্ন’ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠার সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক উপাদানে ঋদ্ধ।

উপন্যাসের কুশীলবেদের বেছে নেওয়া ও নির্মাণ করা, বিভিন্ন মতাদর্শের জটিলতা ও সেই মতাদর্শের প্রতি কুশীলবেদের আচরণ এবং যুগোপযোগী প্লটের নির্মাণের ওপরেই পাঠকের সঙ্গে লেখকের সাঁকো বাঁধার কাজটা সম্পন্ন হয়। ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপে পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগের এই সেতুবন্ধন বিষয়ে স্পিয়ার বলছেন, “he may draw a spark and then fan it into a flame of enthusiasm in the minds and hearts of the reading class” (Speare, 25) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চার অধ্যায় (১৯৩৪)’ কিংবা ‘ঘরে-বাইরে (১৯১৬)’ ইত্যাদি রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবেদের নির্মাণের যে শ্রেণি অবস্থান, তা সতীনাথ ভাদুড়ির ‘টোঁড়াই চরিত মানস (১৯৪৯-৫১)’ কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিহ্ন (১৩৫৩)’ উপন্যাসের কুশীলবেদের শ্রেণিচরিত্র থেকে অনেক ভিন্ন। আবার, ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ উপন্যাসের যে মতাদর্শের জটিলতা ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শোকমিছিল (১৯৭৩)’ বা ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’-তে সেরকম নয়। নবারণ ভট্টাচার্য তাঁর ফ্যাতাডুদের যে শহরে নিম্নবর্ণ ও লুম্পেন অংশের মধ্যে থেকে বেছে নিচ্ছেন এবং তাঁরা যে

ধরণের ‘অ্যাকশন’ সংঘটিত করছে, তার সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবেদের তফাৎ রয়েছে; যদিও তাঁরাও নিম্নবর্ণ এবং প্রান্তিক কিন্তু তাঁদের প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের ভাষা ফ্যাতাডুদের থেকে আলাদা।

কোনও কোনও সমালোচক ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের যথার্থ্যে অবিশ্বাসী। তাঁদের অনেকেরই মতে, রাজনীতির মতো রুঢ়বাস্তব, নীরস বিষয় ‘ফিকশন’ বা কল্পকাহিনির শৈল্পিকতায় খাপ খায় না। স্টেনডালের বক্তব্য অনুযায়ী, সাহিত্যে রাজনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা মানে কনসার্টের মধ্যখানে হঠাৎ পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া। ব্যাপারটা বেশ স্থূল ও অপ্রয়োজনীয় হলেও এহেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়।²⁶ স্টেনডালের এই মতামতে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে মেলানোর বিরোধিতাই রয়েছে। যদিও, স্টেনডালের ‘চার্টারহাউস অব পার্মা’ উপন্যাসে যে চরিত্রচিত্রণ, তা ক্ষমতার রাজনীতিরই উপন্যাসন্যস্ত রূপ। রাজনৈতিক জগতের শৈল্পিক ও কাল্পনিক প্রতিফলন এবং স্টেনডালের গদ্য তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই উপস্থাপিত করে, যেখানে ‘সার্বিক মনুষ্যচিত্র’-র সঙ্গে অঙ্গঙ্গী রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কলাকৈবল্যবাদী শিল্পী ও তাত্ত্বিকদের মতামত, যাঁরা রাজনীতিকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দিতে চাননি; এর সাথেই উল্লেখ্য রোমান্টিক প্রতিগ্রহণ পর্বে বাংলা সাহিত্যের পুরোধাদের অভিরুচি। তাঁরাও সাহিত্য ও বাস্তবতার রাজনীতিকে মেলানোর অন্তরায় হিসেবে খাড়া করেছিলেন নন্দনতত্ত্বকে। একথা অনস্বীকার্য যে, উপন্যাস তত্ত্বের কচকচি নয় এবং শ্রেণি-সংগ্রামের ইস্তেহার নয়। কিন্তু, উপন্যাসের আখ্যানের মধ্যেই ব্যক্তির ও জনসমাজের উদ্বেগ প্রতিফলিত হয়। কোনও রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতাদখল বা সমাজবিপ্লবের কাহিনি না থাকলেও, জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ায় অস্থিষ্ট বোধের উচ্চারণ থাকতে পারে। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “সেই উপন্যাসকেই আমরা যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস বলব, যেখানে এই জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে”²⁷ পার্থপ্রতিম ‘সিভিল সোসাইটি’ বা জনসমাজের (সভ্যসমাজ প্রতিশব্দও হতে পারে) পুনর্নির্মাণ ও গঠনকেই দেশীয় রাজনীতির কাজ

বলে উল্লেখ করেছেন। ফটিকচাঁদ ঘোষ ‘মধ্যবিত্ত ও বাংলা উপন্যাস’-র পর্যালোচনায় জনসমাজকে সাহিত্যের বিষয়ে রূপান্তরিত করা নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন এবং নকশালবাড়িকেন্দ্রিক সাহিত্যের উল্লেখ লিখেছেন, “নকশাল আন্দোলনে তো এই জনসমাজের গুরুত্বই স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু, মধ্যবিত্ত লেখকেরা তাকে, তার শক্তিকে কতখানি অনুধাবন করলেন?”²⁸ তবু, একথা মনে রাখা দরকার যে, জনসমাজের প্রতিক্রিয়া ও জনসমাজের গুরুত্ব আখ্যানকে ‘রাজনৈতিক’ ক’রে তুললেও, আখ্যানের নিজস্ব সত্য রয়েছে, সাহিত্যের নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে এবং উপন্যাসের ‘হয়ে-ওঠা’র নিজস্ব রাজনীতি রয়েছে। রাজনীতির সত্য ও উপন্যাসের সত্যর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে, তাকে কীভাবে উদ্দেশ্য করবেন একজন ঔপন্যাসিক?

রাজনৈতিক উপন্যাসের সাহিত্যগুণ বিচারের মাপকাঠি অন্যান্য সাহিত্য সংস্কৃতির মাপকাঠির মতোই। রাজনীতিকে কাল্পনিকতার সৃজনীশক্তি দিয়ে যত নিপুণভাবে আঁকতে পারবেন লেখক, ততই তা রসোত্তীর্ণ হতে পারবে; নীরস রাজনীতি ও সরস কল্পনার সুসামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে পারবে। আর্ভিং হাও-র মতানুযায়ী, রাজনৈতিক উপন্যাসে “মেধাবী প্রয়োগ, জীবনের গভীরতার সমৃদ্ধ পাঠ এবং আবেগ ও মতাদর্শের সামঞ্জস্য”- এই গুণগুলোই রাজনৈতিক উপন্যাসকে সার্থক ক’রে তোলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বাঁকবদলের মুহূর্তের বিতর্ক- রাজনীতি ও শিল্পের সমন্বয়সাধন। প্রেমচাঁদ, উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ১৯৩৬ সালে ‘অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন’-র উদ্বোধনী সভার সভাপতির অভিভাষণে বলেন,

It [the Association] claims to make literature a message and a song of action and adventure. It is not much concerned with language. When the ideal is broad, language becomes simply by itself. Beauty of thought can afford to be careless about ornamentation. The writer who wants to please the rich accepts the style of the rich; the writer

who writes for the common people writes in the common language.

Our purpose is to produce such an atmosphere in this country wherein unsophisticated literature can be created and developed.

(Coppola 1986, 28)

স্পষ্টতই প্রেমচাঁদ সাহিত্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছেন তাঁর ভাষণে। ১৯৩৬ সালে একদিকে আন্তর্জাতিকতাবাদী ফ্যাসিবাদের উত্থানবিরোধী অবস্থান অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতিতে সামন্ততন্ত্র-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান- এই দুইয়ের যোগে তৈরি হচ্ছে সারা ভারত প্রগতিবাদী লেখক সংঘ, তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সাহিত্যের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা ঘোষণা করে এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যেহেতু এই সংঘের প্রতিষ্ঠা, অতএব এর রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুধাবনযোগ্য। প্রেমচাঁদ সভাপতির অভিভাষণে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাহিত্যের সেতুবন্ধনের যোগসূত্রটা বলছেন। ‘ধনী’দের তুষ্ট করার সাহিত্যশৈলী বনাম ‘আমজনতা’র মনের কথা বলবার সাহিত্যপদ্ধতির এই দ্বন্দ্ব প্রবলভাবেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে ধারণ করে। শুধুমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে নয় বরং উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বাঁকবদল আনছে এই সভার প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক অভিমুখ। আর, বিশ শতকের বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য (এবং উপন্যাসের) দু’টি মূল বাঁকবদলের বিন্দুর মধ্যে একটি ১৯৬০ দশকের নকশালবাড়ি বিদ্রোহ এবং অন্যটি এই প্রগতিবাদী সাহিত্যসভার প্রভাব। প্রেমচাঁদ তাঁর অভিভাষণে ‘সম্মিলিত সাহিত্য’ এই মতাদর্শের ওপরে যেমন জোর দিচ্ছিলেন, তেমনই প্রয়োজন অনুভব করছিলেন নতুন ভাষা ও আঙ্গিকের যা মূলগত রদবদল আনবে সার্বিক সাহিত্যচিন্তায়। বিবর্তন ছাড়া সাহিত্য বাঁচে না, বদলের অভিমুখ ছাড়া সাহিত্য প্রাণ পায় না। তাহলে কি সাহিত্যে বিবর্তন আর প্রগতি এক? প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই তাঁর লেখায় আঙ্গিক ও বিষয়গত কিছু পরিবর্তন আনতে চান তাঁ পূর্বসূরীদের থেকে (সফলতার প্রশ্ন ব্যতিরেকে) তাহলে সেই পরিবর্তনই কি প্রগতি? প্রেমচাঁদ

তাঁর অভিভাষণে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, প্রত্যেক লেখকই মননে-চিন্তায় প্রগতি-অভিলাষী এবং বর্তমান সময়ের কিছু বদলই তাঁর কাম্য, তা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করে প্রগতিবাদী লেখক; এই পরিবর্তন, বিবর্তন ও প্রগতির দ্বন্দ্বকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

By progress we mean that situation which generates [in us] the firmness and capacity to perform duty, which shows us that, due to various internal and external causes, we have reached this condition of death and decline and must strive to remove them. (Coppola 1986, 26)

এই সংজ্ঞায়ন থেকে যদি ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র সংজ্ঞায়নের দিকে যাই, তাহলে পরিষ্কার হতে থাকে সামাজিক বাস্তবতার (socialist Realism) সঙ্গে তার পূর্ববর্তী সংস্কৃতির সংঘাত এবং সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাদী বাস্তবতার (Futuristic Realism) সংঘাত। প্রগতিবাদী লেখক সংঘ লেখকদের একরকম ‘কর্তব্যপালন’-র কথা ঘোষণা করে দিচ্ছেন। এই কর্তব্যপালন মানে চেনাজানা নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে নতুন সংজ্ঞায়ন, রোম্যান্টিক সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশীলন এবং যা কিছু স্থিতিশীল জড়দগব মৃত্যুমুখী তাকে জীবনাভিমুখে বদলে ফেলার সাহিত্যিক প্রয়োগ। যদিও, প্রেমচাঁদের ওই অভিভাষণ এবং প্রগতিবাদী লেখকদের সং-সাহসী উদ্যোগ সত্ত্বেও, সাহিত্যের ‘মানদণ্ড’ নির্ণয় নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রগতিবাদী লেখকেরা আঙ্গিক/প্রকরণ নয়, বরং বিষয়ের সমৃদ্ধির ওপরেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কারণ, তাঁদের মতে আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষা ও সমৃদ্ধি শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণির ও ‘উচ্চবর্গ’-র কাব্যরসোত্তীর্ণতার প্রতিফলন। যদিও, তাঁরা হয়তো ভুলে গেছিলেন যে, আঙ্গিক ও বিষয় পরস্পরের পরিপূরক, কোনও একটিকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ মনে করা যায় না। রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন ভাষা ও আঙ্গিকের নিরীক্ষা যদি না থাকে, তাহলে সময়ের প্রগতিককে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় না। আর, আঙ্গিক বা প্রকরণ শুধুমাত্র ধনীদেব বা উচ্চবর্গের

কাব্যচর্চার ও সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, বরং নিম্নবর্ণের মানুষ, শ্রমজীবীদেরও সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নিজস্ব আঙ্গিক আছে, তার বিবর্তন ও প্রগতি আছে। মধ্যবিত্ত-মধ্যবর্ণের সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক সময়েই তা অধরা থেকে যায়। প্রেমচাঁদ বা বহু প্রগতিবাদী কবি-ঔপন্যাসিক নিম্নবর্ণের শোষিত মানুষের আখ্যানকে সাহিত্যের কেন্দ্রে আনায় জোর দিচ্ছেন, ‘সৌন্দর্য’ শব্দের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমজীবী-অভিযুক্তি করায় জোর দিচ্ছেন। কিন্তু, বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা নিজেদের শ্রেণি-অবস্থানের ও সামাজিক-অবস্থানে দাঁড়িয়েই নিম্নবর্ণের দিকে তাকাচ্ছেন ও তাঁদের কথন-যাপনের সাহিত্যায়নের চেষ্টা করছেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী বা সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম-র সাহিত্যতত্ত্বের যুগে সেইজন্য বহু উপন্যাসেই শ্রমজীবী, নিপীড়িত, দরিদ্রদের কথা আসছে ঠিকই কিন্তু সেই কুশীলবেরা লেখকের মানসসন্তান হয়ে যাচ্ছেন, ঔপন্যাসিকের সমাজতান্ত্রিক অভিলাষের বিজয়াকাঙ্ক্ষার ক্রীড়নক হয়েই থেকে যাচ্ছেন; রক্তমাংসের বাস্তব কুশীলব হয়ে উঠছেন না। সতীনাথ তাঁর নিজস্ব কংগ্রেস-ঘেঁষা রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও এই ফাঁকিকে চিহ্নিত করতে পারছেন। সতীনাথ তাঁর ‘জাগরী’ উপন্যাসে নিশ্চিতভাবেই কমিউনিস্ট নীলুকে অমানবিক ও ‘খারাপ’ বলে চিত্রায়িত করছেন, ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই ‘ভাল’ বলে শাদা ও মুক্তিকামী বলে সামনে আনছেন; কিন্তু, তা সত্ত্বেও ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এ যখন তিনি নিম্নবর্ণের আখ্যান পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছেন, তখন ওই শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের ফাঁকির আড়ালটুকু সরিয়ে রাখছেন সচেতনভাবে। সতীনাথ ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’-র বিভিন্ন কুশীলবকে নির্মাণ প্রসঙ্গে লিখছেন,

একটি particular form- যা গরীব লোকেদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে- সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার। আর উত্তর ভারতের এ যুগের (১৯৪৫-এ যা শেষ হয়েছে) তার পক্ষে অনুপযোগী হত আমার বিবেচনায়। আর সত্যের অপলাপও হত। প্রচারমূলক হওয়ার সম্ভাবনা। আমার চোখ দিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল না। (ভাদুড়ী ১৯৭৩, ৫৪০)

‘টোড়াইচরিতমানস’-এর মতো রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণে মতাদর্শের ছাঁচে ঢালা নিম্নবর্গ বা ‘গরিব লোক’-র কাহিনিতে সত্যের অপলাপ হয় বলেই সতীনাথের বিশ্বাস। তার মানে কি সতীনাথ প্রগতিবাদী নয়? সমাজবাদী বাস্তবতার যান্ত্রিকতায় কুশীলবেদের নির্মাণ না করলেই কি ঔপন্যাসিককে অ-প্রগতিশীল বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়? অন্ততঃ টোড়াই ও তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ১৯৪০ দশকের এক প্রত্যন্ত টোলির আখ্যানে তো জঙ্গমতা প্রবল, সমাজের পরিবর্তনশীলতার কথা সেখানে বারবার উঠে আসছে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র ক’রে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও আখ্যান সবই আন্দোলিত হচ্ছে। এই যে মতাদর্শের ছাঁচে ঢালা চরিত্রনির্মাণের বিরোধিতা, এই একই বক্তব্য ইলিয়াসও বলেন তাঁর ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’ গ্রন্থে। কিন্তু, সমাজবাদী বাস্তববাদ ও প্রগতিবাদের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রেমচাঁদ উল্লেখ করছেন সাহিত্যের সমাজমূল্যের। প্রেমচাঁদ জোর দিচ্ছেন, সাহিত্যের উপযোগী হয়ে ওঠার বিষয়ে, সাহিত্যের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য^{২৭} এবং সেটা পূরণ করতে লেখকের ‘সামাজিক সক্রিয়তা’র ওপরে। ভাষা এবং আঙ্গিকের আলোচনায় এখান থেকেই আবার ফেরা যায়। প্রেমচাঁদ এবং প্রগতিবাদীরা বারবার তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনে বিষয় বা কনটেন্টের ওপরেই গুরুত্ব ন্যস্ত করছেন ও তাকে উদ্দেশ্যমুখী করতে চাইছেন; ফলে, ভাষা ও আঙ্গিক এই দুইই গুরুত্ব হারাচ্ছে তাঁদের আলোচনায়। “With a correct ideology, language will become simpler and better. So long as the content of our writing is on the right lines, we need not worry about the form.” (Premchand 2011, 86) কিন্তু, ভাষাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র মতাদর্শের হাতে ছেড়ে দিলে কি তা সাহিত্য তথা উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে? ভাষা ভিত্তি (base) বা উপরিকাঠামো (superstructure) কোনটাতেই আঁটে না, বহু প্রগতিবাদী বা মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ভাষাকে উপরিকাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ করতে চেয়ে কম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উপন্যাসের যথাযথ ভাষাকাঠামো, কুশীলবেদের কথনভাষা এবং পাঠকের সঙ্গে আখ্যানের সেতুবন্ধের ভাষা নিয়ে ঔপন্যাসিক সচেতন না হলে তা কখনোই সাহিত্য বা বিশেষতঃ রাজনৈতিক সাহিত্য হয়ে

উঠতে পারে না। ঠিক সেইজন্যেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে বগুড়া অঞ্চলের মিথের ভাষা, তাঁদের প্রবাদ-প্রবচন এবং দৈনন্দিন ভাষা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বাঘারুর না-ভাষা কিংবা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবর্গীয় কৃষকের স্বগতকথনের ভাষা বুঝতে হয় আখ্যানকথক দেবেশকে; নবারণ ভট্টাচার্য ভাষাকে শুধুমাত্র উপরিকাঠামো ভেবে নেন না বলেই ফ্যাঁতাডু, কালমন, মোগলাই, ফোয়ারাদের ভাষা-সংস্কৃতি স্বতন্ত্র অধিকারে তাঁর লেখা কথাসাহিত্যে জায়গা ক’রে নেয়। ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’-এর লেখক ভাষাকে মতাদর্শের অধীন ক’রে রাখেন না, বরং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কুশীলবের নামের অনুষ্ণেও সচেতন থাকেন,

এখানকার গ্রামাঞ্চলে ও নামটা [ঢোঁড়াই] খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হল ঢোঢ়াই; উচ্চারণ ঢোড়হাই। বাঙ্গালিরা নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাংলাভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম, এই নামের অনুষ্ণে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্যে। (ভাদুড়ী ১৯৮৭, ঘ)

এই ‘নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু’ পাঠের সঙ্গে পাঠকের যোগসূত্র তৈরি ক’রে দেয়। বাঙালি ভদ্র, শিক্ষিত পাঠকের ভুল উচ্চারণের প্রতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল বলেই সতীনাথ এই ঢোঢ়াই > ঢোঁড়াই বদলের কথা ভাবতে পেরেছেন। একইসঙ্গে যা ভদ্র শিক্ষিত পাঠকের সঙ্গে তাৎক্ষণিকের নিরক্ষর নিম্নবর্গ ঢোঁড়াইয়ের শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য ক’রে দেয় আবার তাঁদের জুড়েও রাখে কেন্দ্রীয় কুশীলবের সঙ্গে। সতীনাথকে এই ভদ্র শিক্ষিত পাঠকের সামনে ঢোঁড়াইকে উপস্থাপন করতে উপন্যাসের প্রতি পাতায় টীকা রাখতে হয় বিভিন্ন শব্দের, সাংস্কৃতিক চিহ্নের। যাতে, রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষার অন্তরাল সরে যায় পাঠকের সামনে থেকে।

আঙ্গিককে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক সাহিত্যে ও উপন্যাসে গুরুত্ব না দিলে, তা শ্রমজীবীদের বা উদ্দিষ্ট পাঠকের সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে কি? ইলিয়াস যখন ‘নামা’-র আঙ্গিক দিয়ে ইতিহাস-মিথ-বর্তমানের প্রায় ২০০ বছরের পটভূমি ধরার চেষ্টা করেন, তখন আঙ্গিকের

গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ‘খোয়াবনামা’ নামা সংরূপের এক উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার এবং এটি উক্ত সংরূপের বিবর্তনধারার সাক্ষ্য বহন করে।³⁰ দেবেশ একইভাবে নথি-উপন্যাস-কথকের বয়ান দিয়ে ‘বৃত্তান্ত’-র আঙ্গিক নির্মাণ ক’রে নেন যেখানে রাজনৈতিক উপন্যাস নিম্নবর্গের ভাষ্য হয়ে উঠতে পারে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশে বিপ্লব রচয়িথাল সঙ্ঘম বা বিরাসম গড়ে ওঠে, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মেলবন্ধনই ছিল সেই গণসংগঠনের উদ্দেশ্য। ১৯৭৩ সালে গদরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয় জননাট্য মণ্ডলীর। নকশালবাড়ি বিদ্রোহের রাজনৈতিক মতাদর্শ ধারণ করেই এর প্রতিষ্ঠা। জননাট্যমণ্ডলী তাঁদের নাটকের আঙ্গিক-বিষয় উভয়ক্ষেত্রেই বিপ্লবাত্মক বদল আনে, গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী, শ্রমিক নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে গিয়ে তাঁদের মিথ্, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই দেশীয়-গ্রামীণ উপাদান নিয়ে নির্মাণ করেন নিজেদের গান ও নাটক। বিরাসমের সাংস্কৃতিক কর্মীরা একাধারে পার্টি ও নিপীড়িত জনগণের মতাদর্শকে ধারণ করেই গান-কবিতা-নাটকের উপাদান সংগ্রহ করে নিপীড়িত জনগণের উদ্দেশ্যে তা পারফর্ম করেন। ফলে, তাঁদের সাহিত্যের মর্মোদ্ধার সহজ হয়ে যায় নিপীড়িত জনগণের পক্ষে। বিপ্লবাত্মক সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ এবং জনযুদ্ধের সাময়িক সেটব্যাকের আঘাত সত্ত্বেও রাজনৈতিক সাহিত্য-শিল্পের ধারক বিরাসম ও জননাট্য টিকে থাকে এবং বিপ্লবী পার্টিকে পুনর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সাহিত্য-শিল্প-পারফর্ম্যান্স থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনের এই ইতিহাস রাজনৈতিক সাহিত্যের এক অভিযুদ্ধের সন্ধান দেয়। প্রগতিবাদীদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সৎ ছিল, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিকের প্রশ্নে তাঁদের বক্তব্যের পুনর্মূল্যায়ণ জরুরি। আঙ্গিক-বিষয় দ্বন্দ্ব ও ভাষার সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসের ঘনিষ্ঠতা পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক সাহিত্য ধারাটির সূচনা সম্ভবতঃ উনিশ শতকে লেখা বিভিন্ন প্রহসন, প্যারোডি এবং নকশার হাত ধরে। প্রহসন ও প্যারোডিগুলোর অধিকাংশই তৎকালীন সমাজের ভাল-মন্দ, শ্রীল-অশ্রীলের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হলেও, রাজনীতির উপস্থিতিও তাতে ছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪) মূলতঃ কুলীন ব্রাহ্মণদের যৌনলালসা ও কুলীন নারীদের শোচনীয় দুর্গতির কথা বলে। এক হিসেবে এই প্রহসনটি ‘সামাজিক’ হলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি যা দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় রাজনীতিকে দমিত করছে, তার বিরুদ্ধাচারণও তো এতে আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬১)’ কলকাতার নাগরিক সমাজের বৃত্তান্ত বলে এক অননুকরণীয় ভঙ্গিতে; যেখানে সমালোচনা, বিদ্রূপ, টীপনী ও কথনবুনন সমস্ত পদ্ধতিই মিশে থাকে। কলকাতার তৎকালীন উচ্চবর্গীয় সমাজ ‘বাবু’ ও ‘ভদ্রলোক’ হওয়ার তাগিদে যে প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলেছে, সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি-অবস্থানের উন্নতিকল্পে দ্বিধাজড়িত সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে, তারই এক দলিল হয়ে থাকে এই নকশা। সেইসঙ্গে কলকাতার নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা, রুচি ও উচ্চবর্গের সঙ্গে সংঘর্ষের সংস্কৃতিও এই নকশায় উপস্থিত। একে কি শুধুমাত্র ‘সামাজিক’ বলে সরিয়ে রাখা যায়? নাকি, এই নকশার ভাষা, আঙ্গিক ও নির্মাণের রাজনীতি অধ্যয়ন করেই ভবিষ্যতের ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ -এর ধরতাই পাওয়া যায়? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা ‘প্রথম’ বাংলা উপন্যাস ‘আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)’ কলকাতার বাবু-সমাজের সাংস্কৃতিক-সামাজিক ভালমন্দের আখ্যান বলে। এক ‘বাবু’ রামবাবু ও তাঁর দুই পুত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাঁদের বৃত্তের মধ্যে থাকা সমাজের ছবি। এই উপন্যাসও মূলতঃ সামাজিক অভিঘাতের কথা বললেও, রাজনীতির বিষয় অনুল্লেখ্য নয়; উপন্যাসে অন্তর্ঘাতী ধারার মতো সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থানও কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষতঃ এই উপন্যাসের বিশ্লেষণে, যে উপন্যাসকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ‘বাংলা সাহিত্যের অশেষ কল্যাণকর গ্রন্থ’ আখ্যা দিয়ে প্রথম উপন্যাস হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন, ‘বাবু’সমাজের রাজনীতির ছবি পাওয়া যায়। আর, ভাষা ও প্লটের রাজনীতি পাওয়া যায়- কলকাতা শহরের এক নির্দিষ্ট শ্রেণির জীবনযাপনের আখ্যান।

বিশ শতকে, বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্ধে, উপন্যাসের রাজনৈতিক থিমে উল্লেখযোগ্য বদল আসে। রাজনীতির সঙ্গে মানুষের জটিল জীবনের সরাসরি সম্পর্ক। স্পিয়ার রাজনৈতিক

ঔপন্যাসিকের লেখায় যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন, রাজনীতির সঙ্গে শিল্পের মেলবন্ধনে শিল্পকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক’রে তুলতে ঔপন্যাসিক নিছক ‘কৌশলী (tactician)’ হবেন না বা শিল্প ও রাজনীতি পারস্পরিক আপস করবে না। রাজনৈতিক সূত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক চিত্রকল্পে চিন্তাভাবনাকে অলঙ্কৃত ক’রে নেবে।³¹ প্রগতি সাহিত্যের প্রথম সম্মেলনে প্রেমচাঁদও কিন্তু এই কথাগুলোই বলতে চাইছেন³², রাজনৈতিক সাহিত্যিকের ‘করণীয়’ কি, সাহিত্যকে মানুষের বিশেষতঃ নিপীড়িত মানুষের করে তুলতে গেলে; প্রেমচাঁদ ও অন্যান্য প্রগতিবাদীরা স্পিয়ারের থেকে একটু এগিয়ে ‘শ্রেণিচেতনা’ শব্দে জোর দিচ্ছেন। কিন্তু, স্পিয়ার ‘পলিটিকাল ফর্মুলি’ শব্দে জোর দিচ্ছেন, রাজনৈতিক জীবনের চিত্রকল্পকে পরিস্ফুট করতে; উপন্যাস বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি কোনওরকম ফর্মুলা বা বাঁধাসূত্র চলে? রাজনৈতিক সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয় উভয়েরই ক্রমবিবর্তন তো এই সূত্রকে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণের প্রতিই নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা মানুষ এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁদের ‘রাজনৈতিক চেতনা’ সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ও অধুনা উন্নত দেশগুলির নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা এবং ভারতবর্ষের নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনার মান কি এক? নিশ্চয় তা নয়। অ্যারিস্টটল বা প্লেটোর রাজনৈতিক চেতনার ধারণা অনুযায়ী, গ্রিক নগর-রাষ্ট্রের সচেতন সমস্ত নাগরিকের সক্রিয় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ থাকবে রাজনীতিতে এবং সেই মতোই রাজনৈতিক আইনপ্রণালী তৈরিও হবে। শাসক ও শাসিত (অবশ্যই, সচেতন শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রেণিও) উভয়েরই অংশগ্রহণে শাসিতের কল্যাণার্থে শাসক শাসনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করবে- এই রাজনৈতিক চেতনার কথা তাঁদের তত্ত্বে উল্লেখ পাচ্ছে। এই যে সকলের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, বিভিন্ন সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রেও এই চেতনার অনুশীলন দেখা যায়- সাম্য, মৈত্রী, মুক্তির দিশায় পরিচালিত ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবেও এই চেতনারই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু, বহু

রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের মতে, ভারতবর্ষের জলহাওয়ায় এই অনুশীলন ছিলনা কখনও। শাসক ও শাসিত উভয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের স্বার্থে- এই উদারনৈতিক ‘গণতান্ত্রিক’ বোধ অনুশীলিত হয়নি; বরং রাজা আর প্রজা কিংবা সমাজের গভীরে গেঁড়ে বসে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে ভারতীয় সমাজকে। রজনী কোঠারির বিশ্লেষণে, উনিশ শতক ও তৎপরবর্তী ব্রিটিশ অনুশাসনে পাশ্চাত্য তত্ত্ব-অনুশীলনের রাজনৈতিক প্রয়োগে ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার এই প্রথাগত ইতিহাসে বদল আসে। তার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী ভারতীয় সমাজে এক ‘রাজনৈতিক কেন্দ্র’ গড়ে ওঠার অভাবের কথা বলছেন কোঠারি, “The Indian system was a loose accommodation between a remarkably stable social order and an unstable political order.” (Kothari 1970, 31) কোঠারির মতে, এই দীর্ঘ সময়ে জনগণের রাজনীতি-বিমুখতা প্রকট ছিল কিংবা রাজ্যশাসনে নাগরিকদের ভূমিকার ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন তাঁরা। আশিস নন্দীও কোঠারির মতামতকেই সমর্থন করছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণে। তাঁর মতে, অষ্টাদশ শতক অবধি ভারতীয় রাজনীতিতে ‘নিরাজনীতি’ বা অ্যাপলিটিক্স বিদ্যমান ছিল। এর কারণও উল্লেখ করছেন আশিস- প্রথমতঃ, ভারতীয় সমাজে রাজনীতিকে দেখা হয় অনৈতিক, শাসকের/রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর প্রায়োগিক নীতি হিসেবে যেখানে স্বার্থসিদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়তঃ- ভারতীয় সমাজ ‘সংস্কৃতি’কে কেন্দ্র করে যতটা আবর্তিত হয়, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ততটা নয়। ঐতিহ্য, সনাতন ইত্যাদি শব্দের বাস্তবপ্রয়োগে রাজনীতি বরাবরই গৌণ; তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সমাজে ‘ধর্ম’ ধারণাটির নাগরিকজীবনে বহুস্তরীয় প্রয়োগ এক স্বতন্ত্র মূল্যবোধ-নৈতিকতার কথা বলে এসেছে। “When the Political sector became threateningly disjunctive, or began to negate some of the major assumptions of the society, the traditional lifestyle still was not dramatically disoriented.” (Nandy, 1973, 118); চতুর্থতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা সমকালীন অন্যান্য

সংস্কৃতিকে নিম্নতর বা ইনফিরিয়র ভেবে এলেও, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয়নি বরং বহিঃশাসকেরা বারবার ভারতীয় রাজনীতিতে মিশ্রপ্রভাব এনে দিয়েছে “and exogenous political ideas never seemed diabolical instruments of subversion”; পঞ্চমতঃ- ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতি মূল ভূমিকা রাখলেও, ‘সংস্কৃতি’ বরাবরই বহুত্বের ধারণা নিয়ে চলেছে এবং কোনও একক কেন্দ্রীভূত শক্তি বহুপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও একে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। রাজনীতির সঙ্গে বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজের কোনও না কোনও জাতি-ভাষার মানুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক এগিয়েছে³³।

আশিসবাবুর বক্তব্যে ভারতীয় সমাজে রাজনীতি ও সংস্কৃতির যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, তা কিয়দংশে সত্যি, কিন্তু এতটা সরলসূত্রায়িত করা বোধহয় যায় না। কারণ, ভারতীয় সমাজের উপাদানগুলির প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে, বহিঃপ্রভাব ও অন্তঃপ্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান বহু শতাব্দী ধরে এবং নিম্নবর্ণের ও অন্তর্ঘাতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বয়ান প্রায় উহ্যই থেকেছে তাঁর প্রবন্ধে। তবুও, রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে একটা ব্যাপারে সহমত হতেই হয়, তা হচ্ছে- রাজনীতির প্রতি নাগরিকদের বিমুখতা ও নৈতিক-বিকর্ষণ। বিশ শতকের শেষার্ধের ভারতীয় রাজনীতিতে এই নৈতিক-বিকর্ষণ এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। ‘রাজনীতি’ শব্দটা সাধারণতঃ ব্যবহার হয় ঋণাত্মক অর্থে, মন্দার্থে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ঐতিহ্য, নিঃস্বার্থ, সু-সংস্কৃতি- সমস্তকিছুরই পরিপন্থী হিসেবে দেখা হয় রাজনীতিকে। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ‘ক্রিয়াপদ’-এর সংক্ষিপ্ত রূপ নামা। ভারতীয় এবং বাঙালি সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী ‘ভাল ছেলে/মেয়ে’ রাজনীতিতে নামে না। অবশ্যই ‘ভাল’ শব্দটি অসংজ্ঞাত এবং আপেক্ষিক, কিন্তু রাজনীতি যে ‘খারাপ/নোংরা’, তা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পেশা প্রচলিত থাকলেও, রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বাঁকা নজরেই দেখা হয়। উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে যখন ভারতীয় নাগরিকদের সামনে যুযুধান আর কোনও বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তি রইল না, যখন ‘ভারতবর্ষ’ ধারণাটির ভৌগোলিক, প্রশাসনিক ও মানসিক

পরিবর্তন ঘটে গেল তখন রাজনীতির মর্মার্থও পাল্টে যেতে থাকল। যদিও বা ব্রিটিশ শাসকদের মতো প্রত্যক্ষ-দৃশ্যমান শত্রুর বিরুদ্ধতা (নিরস্ত্র ও সশস্ত্র দুইই) করা ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বলে গণ্য হত, ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে সেই প্রত্যক্ষ-ঔপনিবেশিক শত্রুও আর রইল না, ফলে এর পরের রাজনীতিকে ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’-এর মতো মহিমময় তকমায় আঁটা গেল না। আর, তারই সঙ্গে ঘটল মোহভঙ্গ; উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকদের (শাসকরাও এখন স্বদেশীয় সহনাগরিক) থেকে যে সহনাগরিকতুল্য শাসনব্যবস্থা, উন্নততম সমাজকাঠামো এবং শ্রেণি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নিরপেক্ষ সুশাসন আশা করেছিলেন নাগরিকেরা তার কিছুই তাঁরা পেলেন না³⁴। বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো প্রদেশে এরই সঙ্গে জুড়ে থাকল দেশভাগ-দাঙ্গা-স্বজনবিচ্ছেদের চিরকালীন ক্ষত। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, “অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান- ‘নাঙ্গাভুখা হিন্দুস্থান, ভুলো মাত, ভুলো মাত’... স্বাধীনতা এক মৃত ভারতবর্ষ প্রসব করেছে।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১৮১)। আর, এই সবকিছু মিলিয়েই ‘রাজনীতি’ শব্দার্থের আরও অবনমন ঘটল এবং যে প্রজন্ম অন্ততঃ ‘স্বাধীনতার রাজনীতি’কে সুনজরে দেখতেন, তাঁদেরও সিংহভাগের বিকর্ষণ ও বিমুখতা দেখা দিল ভারতীয় রাজনীতির প্রতি। এই প্রসঙ্গে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সচেতনতার কথা তুলে আনতেই হয়, বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচন-বিতর্কিত রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক কীভাবে ‘রাজনীতি’কে দেখতেন। তারাক্ষর ঘোষিতভাবেই কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও সেই মতাদর্শের প্রভাব পড়ে। ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ উপন্যাসেও। জমিদার, মহাজন, সুদের কারবারিরা কীভাবে গ্রামের চাষীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, সেটা চৈতালী ঘূর্ণিতে রয়েছে। ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, ‘গণদেবতা’- এই তিন উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের অক্ষবদল। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, পুরনো সমাজের ভেঙে পড়া দেখাচ্ছেন। তারাক্ষর যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে ধারণ করেই লিখছেন, তার প্রমাণ থাকছে ‘সাহিত্যের সত্য’ বইয়ের ‘লেখার কথা’ প্রবন্ধে। বার্ষিক রায়ের ‘তারাক্ষরের রাজনৈতিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে তার উল্লেখ,

উনত্রিশ সাল শেষ হতেই তিরিশ সাল এল। ডাক এল গান্ধীজির। আমি কলম রেখে
ঝাণ্ডা হাতে বের হয়ে পথ থেকে লোহার ফটক ঠেলে জেলে ঢুকলাম। এই জেলেই
আমার মনে একটা অবসাদ বা বিতৃষ্ণা এল রাজনৈতিক দলবাদের উপর... সংকল্প
করলাম রাজনীতি করব না, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই নবজীবনের কথা লিখব (রায়
১৩৮৪, ৫৩)

তারাশঙ্কর তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে এই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশীলন শুরু করলেন।
তারাশঙ্কর যতই বলুন যে, রাজনৈতিক দলবাদের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন, বাস্তবে এই ‘মতাদর্শ
ত্যাগ’ সহজ নয়। তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ্রের শাহাদাতের পরে যে ফ্যাসিবিরোধী লেখক-
শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠার (১৯৪১) উদ্যোগ নেওয়া হয়, তার সামনের সারিতে ছিলেন তারাশঙ্কর।
আর, সেই সংঘের উদ্বোধনী সভার অভিভাষণে তারাশঙ্করের সাহিত্য-মতাদর্শগত অবস্থান কিন্তু
প্রেমচাঁদের অভিভাষণের থেকে থেকে ভিন্ন ছিলনা খুব একটা। তারাশঙ্কর যখন সেই অভিভাষণে
সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের নিষ্পেষণ দুইয়েরই বিরোধিতা করেন, ভারতবর্ষের জনগণের
দাসমনোবৃত্তির সমালোচনা করেন, তখন শুধুমাত্র তৎকালীন কংগ্রেসীয় রাজনীতির পরিসরে
তাঁকে আঁটা যায়না^{৩৫}। আবার, এই তারাশঙ্করই ফের ‘প্রগতিবাদী লেখক সংঘ’-তে
কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণের রাজনীতিকে মেনে নিতে না পেরে সরে আসছেন ১৯৪৪
সাল নাগাদ। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে মেলানোর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তারাশঙ্কর
সেকথা লিখলেন ‘আমার সাহিত্যজীবনঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’ অংশে। পরবর্তীতে
‘নেহরুভিযান সোশ্যালিজম’-এ আকর্ষিত তারাশঙ্কর সমাজতন্ত্র ও ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের
মাঝামাঝি এক মতাদর্শ তৈরি করে নিলেন তাঁর উপন্যাসের কুশীলবেদের ‘মূল্যবোধ’, ‘নৈতিকতা’
ইত্যাদি বোঝাতে। ‘পঞ্চগ্রাম-গণদেবতা’ এবং ‘হাসুলিবাঁকের উপকথা’ তারাশঙ্করের সবচেয়ে
আলোচিত দু’টি রাজনৈতিক উপন্যাস- কিন্তু, এই উপন্যাস দুটিতেও কি ‘রাজনীতি’ তৎকালীন
সমগ্র মূল্যবোধের প্রতিফলন হতে পেরেছে? উপন্যাসগুলির রাজনৈতিক সার্থকতা^{৩৬} বিচার

করেছেন মালিনী ভট্টাচার্য, সঠিক বিশ্লেষণই হয়তো করেছেন। কিন্তু, দেবু ঘোষ-বিশ্বনাথ-অনিরুদ্ধ-বিলুর আখ্যানগত বিবর্তন কি সমগ্র রাজনীতির ‘অনৈতিকতা’ ও ‘মূল্যবোধহীনতা’-র দিকেই পাঠককে চালিত করে না? ‘হাসুলিবাঁকের উপকথা’তে কাহারপাড়া ভেঙে যাবার বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক মডেলে সার্থকভাবে পৌঁছতে পেরেছেন তারাশঙ্কর; কিন্তু, সমস্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে যেমন রাজনীতির দুর্নীতি, তেমনই রাজনীতির ‘সুনীতি’-র কোনও সত্যতা কি উপন্যাসে এসেছে? না, আসেনি। তৎকালীন মার্ক্সিস্ট সমালোচকদের মতো ‘যান্ত্রিক শ্রেণিসংগ্রাম’-এর উপস্থিতি খুঁজতে চাইছি না এই উপন্যাসের মধ্যে, সে বিতর্ক অন্যত্র; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ‘রাজনীতি’ পাঠকের চোখে মহান হতে পারেনি। অথচ, ওই ১৯৪০ দশকেই যুগান্তকারী ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে- আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় খবর বেরোচ্ছে,

গত তিনদিন যাবৎ মাদারিপুর সহর ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলিতে ৪৫টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। চাউলের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাউল ত্রয়ের ক্ষমতা লোকের নাই। গত কয়েকদিন যাবৎ স্থানীয় হাট, বাজার এবং পথে ঘাটে প্রত্যহ ৩/৪টি করিয়া মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে; সহরে যে সব অনশনক্লিষ্ট লোক খাদ্যাশ্বেষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের দুর্দশার অন্ত নাই। জীর্ণ ও কঙ্কালসার নিরন্ন নরনারী খাদ্যের জন্য পথে পথে আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। এ দৃশ্য মর্মভেদী...

(২৮শে অগাস্ট, ১৯৪৩)

১৯৪২ সাল থেকে খাদ্যদ্রব্যের সংকট তৈরি হচ্ছে। একদিকে যুদ্ধরত ব্রিটিশ শাসকের মানবতাবিরোধী নীতি অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার খাদ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন। মঞ্চস্তরের দিনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সদস্যেরা একদিকে সেবাকার্য চালাচ্ছেন অন্যদিকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নতুন রূপ পাচ্ছে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি গণনাট্য সঙ্ঘ (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ‘বেঙ্গল কালাচারাল স্কোয়াড’ মঞ্চস্তরের বাস্তবতাকে শিল্পবাস্তব ক’রে তুলছেন। বিজন ভট্টাচার্য ‘নবান্ন’ নাটক রচনা করছেন,

যা বাংলা নাটকের বাঁকবদলের সন্ধিক্ষণ। রাজনীতির কি এই সময়েই ‘মহিমময়’ হয়ে ওঠার কথা ছিল না? উপন্যাসে ‘রাজনীতি’-র উপস্থাপনায় লেখক ও পাঠক উভয়েরই সমস্ত জড়তা কেটে যাওয়ার কথা ছিল না?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসে এই সামগ্রিক রাজনীতিকে মহিমময় ক’রে তোলার প্রয়াস রয়েছে। অন্ততঃ সাম্যবাদী মতাদর্শে সচেতন মানিক তারাশঙ্করের মতো দ্বিধাজড়িত অবস্থানে ভোগেননি। মানিকের ‘চিহ্ন’ উপন্যাসের পাঠক রাজনীতিকে ‘অনৈতিক’ বা মূল্যবোধহীন হিসেবে খুঁজে পাবেন না। শহরের একটি ছোট কারখানার শ্রমিক ওসমান কিংবা অসংগঠিত শ্রমিক গণেশের কাহিনি পাঠককে রাজনীতিবিমুখ ক’রে দেবে না। বাংলা ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত ‘মাটি-ঘেঁষা মানুষ’ উপন্যাসে মানিক লেখেন, “বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখকের কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পরিণত না হয়, জীবন-বিরোধী না হয়ে ওঠে তাই এই সতর্কতা।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১, ৪৭৬)। গোপাল হালদারের উপন্যাসগুলিতে কিংবা সাবিত্রী রায়ের ‘পাকা ধানের গান’ বা ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রোটাগনিস্টের দ্বন্দ্ব, সমাজের প্রগতি-রক্ষণশীলতা, রাষ্ট্র বনাম মানুষ এবং আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত ব্যক্তির আখ্যান রয়েছে। কিন্তু, রাজনীতিকে অনৈতিক বলে হেয় করার চেষ্টা হয়নি, কমিউনিস্ট রাজনীতির ঠিক-ভুল ভাঙ্গা-গড়ার বাস্তবতাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। পাঠককে রাজনীতিবিমুখ করে তুলতে চেয়ে নিরাজনীতির দিকে ঠেকে দেওয়ার যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন চলছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে, এই উপন্যাসগুলো তার বিরুদ্ধবয়ান। গোপাল হালদার ‘সার্থক’ রাজনৈতিক উপন্যাসিক কিনা, কিংবা সাবিত্রী রায় ‘যথার্থ’ মার্ক্সবাদী চেতনারীতিতে উপন্যাসের আখ্যানরচনা করেছেন কিনা সে বিতর্ক আপাততঃ সরিয়ে রেখেও একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়। ‘রাজনীতি’ সম্পর্কে সমাজে যে ঋণাত্মক ধারণা, সমবেত নির্লিপ্তির দিকে এগোনো এবং মূল্যবোধ-মানবতাহীন ‘নিষ্ঠুর, কুসংস্কৃতি’ হিসেবে রাজনীতিকে দেখানোর যে চেষ্টা,

এই উপন্যাসগুলি সেই প্রচলিত ধারণার বশবর্তী নয়। রাজনীতিকে অপ্রয়োজনীয় ভয়ালকরাল হিসেবে নয় বরং প্রয়োজনীয়, যাপনপদ্ধতির অঙ্গ হিসেবেই পাঠকের কাছে পেশ করছেন তাঁরা।

ক্রমশঃ ক্ষমতা-হস্তান্তরের বয়েস যত বাড়তে থাকল, সহনাগরিক শাসকদের নিপীড়নের মাত্রা যত বাড়তে লাগল, ততই বাড়তে লাগল রাজনীতি-বিমুখতা। ১৯৬০-৭০ দশক ভারতের তথা বাংলার রাজনীতিতে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ- খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র-যুব অসন্তোষ, কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্বব্যাপী ছাত্র-যুব আন্দোলন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উপর্যুপরি দু'টো বিচ্ছেদ, নতুন দ্রোহদিশারী পার্টির জন্ম, নকশালবাড়ি-শ্রীকাকুলাম। ১৯৭০ দশকের পরে ভারতের তথা বাংলার রাজনীতির ও রাজনৈতিক সাহিত্যের দিশাবদল করে দিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। সেইসঙ্গে রাজনীতির প্রতি পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গির বদলে সচেষ্ট হল শাসকশ্রেণি ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিক 'হৌস'। 'রাজনীতি' শব্দার্থের অবনমন আরও বাড়ল। সাহিত্যিক অনুশীলনে রাজনীতি দেখা দিতে লাগল বিপথগামী ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে। মূলতঃ নকশালবাড়ি বিদ্রোহকে 'ভুল' প্রমাণ করতে প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিকরা কমিউনিস্ট চরিত্রকে প্রোটাগনিস্ট ক'রে যে উপন্যাসগুলো রচনা করতে লাগলেন, তার অধিকাংশই বাস্তববাদী এমনকি প্রগতিবাদী উপন্যাসের ছলনায় রচিত রোম্যান্টিক, মিথ্যে মতাদর্শের উপন্যাস। রাজনীতির এই সন্ধিপর্বগুলো আলোচনায় আসা প্রয়োজন কারণ, সাহিত্যের সঙ্গে তা সম্পর্কিত, এই ঘটনাগুলো ও উপাদানগুলো রাজনৈতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঢুকে পড়ছে বিগত কয়েক দশক ধরে। বাংলা সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উপন্যাসের বেশ কিছু ফর্মুলা বা সূত্র গড়ে উঠেছে- জনতোষী, মধ্যবিত্ত-স্বচ্ছল পাঠকশ্রেণির অবস্থানকে তৃপ্তি দিতে।

নকশাল আন্দোলন পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মোড়বদল হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের স্বপ্ন, বাস্তব এবং অভিঘাত সেই '৭০ দশক থেকেই পাতার পর পাতা ভরে বাঙালি তথা বিশ্ব পাঠককে উপহার দিয়েছে বহু সাহিত্য। আর, তারই সাথে শুরু হয়েছে 'অ্যাপলিটিসাইজেশন' বা 'নিরাজনীতিকরণের' পদ্ধতি। নকশাল আন্দোলন মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতা ও কাঁচা প্রেমের মতো,

বামপন্থা মানেই তা ভ্রষ্ট সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখায় এবং আসলে নিরাজনীতিই মানুষকে ‘মানুষ’ করে তোলে! এহেন ধারণাকে সচেতন ভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। আর, প্রাতিষ্ঠানিক ও ‘এলিট’ পত্রিকা যেগুলো নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রের মতাদর্শকে সংস্কৃতি-সাহিত্যের মধ্যে প্রচারে এনেছিল, তারাই প্রতিবছর পুজোসংখ্যার সাহিত্যগুলিতে কিছু খোড়বড়িখাড়া খাঁচা (স্টিরিওটাইপ) এনে ফেলল³⁷। বেশিরভাগ ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এ নকশাল ছেলেটি লেখাপড়ায় মারাত্মক মেধাবী ছিল, ‘ভুল’ রাজনীতির পাল্লায় পড়ে গ্রামে গেল রাজনীতি শিখতে ও শ্রেণিঅবস্থানচ্যুত (declassified) হতে, তার প্রেমিকা উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা স্বচ্ছল ঘরের এবং তাদের যৌনসম্পর্কের (উপন্যাসের মূল প্লটের সঙ্গে সঙ্গতিহীন) বিশদ বর্ণনা, পুলিশের গুলিতে বা অত্যাচারে পঙ্গু হল প্রোট্যাগনিস্ট কিংবা সেই ‘প্রেমিকা’কে প্রতারণা করল ও আদতে লড়াইটি এবং মতাদর্শটি ব্যর্থ হল এবং অরাজনীতি (অ্যাপলিটিক্স) এবং সমাজসেবার ওপরে ভরসা রাখল ব্যর্থ প্রোট্যাগনিস্ট (সাম্প্রতিক দশকে প্রোট্যাগনিস্টের স্বার্থান্বেষী সুযোগবাদী হয়ে যাওয়া)। ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর এই জনতোষী, সর্বাধিক বিক্রিত ছকে সবচেয়ে যেটার অভাব তার নাম রাজনীতি। তারাক্ষর কিংবা সতীনাথ ‘দক্ষিণপন্থী’ রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক হয়েও³⁸ কখনও রাজনীতিহীন রাজনৈতিক উপন্যাস লেখেননি। উপন্যাসের কমিউনিস্ট কুশীলবের মূল উদ্দেশ্য সামগ্রিক রাজনৈতিক অনুসন্ধানের বাইরে শুধুমাত্র ‘ব্যক্তিগত’ সম্পর্কের জটিলতা আর উদ্দেশ্যহীন ‘রোম্যান্টিক’ বিষাদবিলাসে জড়িয়ে যাওয়া-উপন্যাসের অভিমুখ যেন সবসময়েই তার ব্যর্থতার দিকেই পূর্বনিয়ন্ত্রিত। স্পিয়ার বা মরিস বা সতীনাথ কিংবা মহাশ্বেতার মতে ও লেখায়, রাজনৈতিক সময়ের অনুসন্ধান ব্যক্তি-কুশীলবের ও প্লটের যে উত্তরণ, সেটাই অনুপস্থিত এখানে। ফলে, ‘রাজনৈতিক’ হওয়া সত্ত্বেও তা মূলতঃ সামাজিক প্রচলিত ধারণাগুলির পুনঃকথন হয়ে যায় এবং সমগ্র ‘রাজনীতি’ মধ্যবিত্ত, ভদ্র, শিক্ষিত পাঠকের বিবমিষার কারণ হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র পাঠকের শ্রেণি-অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় হেজিমনি দ্বারা প্রাপ্ত পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা তৃপ্ত হয় এতে। সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ থেকে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর ‘কম্পাস’ এই সূত্রায়ন মেনে চলে। ফটিক চাঁদ ঘোষ নকশালবাড়ি রাজনীতিকে সাহিত্যায়িত চাওয়া বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় আখ্যানস্থিত কুশীলবেদের শ্রেণি-অবস্থানের এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন যে, আন্দোলনে যে প্রচুর পরিমাণ প্রান্তিক মানুষ ও নিম্নবর্গের নিপীড়িত জনজাতির মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের রাজনীতি (উৎপাদন-সম্পর্ক ও ভূমি-সম্পর্ক), সংস্কৃতি কিংবা আর্থ-সামাজিক জীবনপরিচিতি এবং বিবর্তনের বিবরণ অব্যক্ত থেকে গেছে কথাসাহিত্যে।³⁹ শহরের তরুণ মধ্যবিত্তরা গ্রামে গিয়ে কৃষি-বিপ্লবের রাজনীতি অনুশীলন করতে চেয়েছিল, উপন্যাসে এই রাজনীতির কথা এলেও সেইসব তরুণ-তরুণীরা অধিকাংশ উপন্যাসেই পটভূমি বিচ্যুত এবং তাদের উপস্থাপনা খণ্ডিত।

নকশালবাড়ি-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে ‘নকশাল’ মানেই যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির ‘মেধাবী’ যুবক- এরকম সহজ সূত্র মানা হতে লাগল এবং একপ্রকার নিয়মে পর্যবসিত হল! এখনও বারবার এলিট-বয়ান প্রমাণ করতে চায় যে, ‘মেধাবী মধ্যবিত্ত’ না হলে নকশাল হয়না। কিন্তু, এই এলিট বয়ানকেই প্রতিস্পর্ধা জানাতে চেয়েছিল ’৬০-’৭০ দশকের বামপন্থী আন্দোলন এবং ছাত্র-যুব বিক্ষোভগুলো। শুধুমাত্র কলকাতা শহরের দু’টি ‘নামী’ উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বহু ‘অখ্যাত’ কলেজ-ইস্কুলের বহু ছাত্রছাত্রীর অবদান ভুলে ‘মেধাবী মধ্যবিত্ত’ বয়ানের চাষ হতে লাগল বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যে। আর, এই অনুশীলনে, যাতে পণ্যসাহিত্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রণী, রাজনীতি শব্দের বিরুদ্ধে ওই ‘মেধাবী মধ্যবিত্ত ভদ্র’ পাঠকসমাজকে জড়ো করা যায় ঠিকই কিন্তু শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে শাসিতের উৎসবের আখ্যানকে অস্বীকার করা হয়। গোপাল কাহার, দোপদী মেঝেন, বসাই টুডু, কেলু কিংবা চ্যারকেটুদের প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়। সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে নিপুণ ‘নিরাজনীতিকরণ’-এর লক্ষ্যে প্রবাহিত শাসক-হেজিমনির বয়ানকেই প্রশ্ন করেন তাঁরা- রাজনীতি শুধুমাত্র ‘ভদ্র’, ‘মেধাবী’ বৃত্তের নয় কিংবা এই ভদ্র মেধাবী মধ্যবিত্ত স্বঘোষিত উপযাচক হয়ে রাজনীতির সাদা-কালো বাইনারি ঠিক ক’রে দেওয়ার অধিকারীও নয়।

কোনও কোনও ঔপন্যাসিক এই সূত্রায়িত পণ্যসাহিত্যের পথ থেকে সরিয়ে রাখলেন নিজেদের। ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর কেন্দ্রে রাখতে চাইলেন রাজনীতিকেই, তুলে আনলেন প্রান্তিক মানুষের কথা এবং তাঁদের প্রশ্নকে আর, ‘৬০-’৭০ দশকের অগ্নিগর্ভ সময়ের রাজনীতিকে রাজনীতির মাধ্যমেই উত্তরণের পথ খুঁজতে চাইলেন। তাঁদেরই একজন নবাবুণ ভট্টাচার্য কীভাবে দেখছেন ‘রাজনীতি’ শব্দার্থকে?

আমার দ্বারা সম্ভব অর্থবহ কাজ লেখা। তাই লেখার মধ্যে দিয়েই আমার যৌবনের প্রজন্মের [সত্তর দশক] তৈরি করা ইতিহাসে সাড়া না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। আজ আমি সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। সেই নদীর স্রোত বা পৃথিবী কোনো কিছুই সেখানে থেমে থাকেনি। কিন্তু এখনও আমি অনুভব করি কোথাও একটা সত্তর থেকে গেছে। নির্বোধে কোমা-য়, পরিক্রমায়, ভয়ে, অভয়ে- মিটমিটে নব্বই-এর শেষে কোকাকোলা সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এক অর্থে সত্তরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সর্বস্পর্শী। (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৭৯)

নবাবুণের চেতনায় ‘রাজনীতি’ শব্দ কোনও অনৈতিক বা মূল্যবোধহীনতাকে প্রশ্ন দেয় না। বরং, বিশ্বায়নী সংস্কৃতির প্রাবল্যেও আঁকড়ে থাকতে চান ‘সত্তর দশক’-এর রাজনৈতিক চেতনা, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন। লেখকের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যদি রাজনীতি ওতপ্রোত থাকে, তাহলে তাঁর উপন্যাসে যে রাজনীতি থাকবে, তা নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক হবে এবং কোনওভাবেই তা পাঠককে তাদের শ্রেণিঅবস্থান সন্নিবিষ্ট করতে স্বত্তিক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হবে না। নবাবুণ তাই ওই সহজসূত্রায়িত রাজনৈতিক উপন্যাসের মডেলকে অভিহিত করছেন ‘ব্রয়লার সাহিত্য’ বলে। অর্থাৎ, উৎপাদন মূল্যের বাইরে যে সাহিত্যের কোনও উপযোগিতা নেই। সত্তর দশকের রাজনীতি, ভুল-ঠিক ব্যাতিরেকে, আঁকড়ে থাকার ফলশ্রুতিতেই ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’-তে রণজয়ের প্রতিস্পর্ধা জারি থাকে বিশ্বায়নী হাওয়ার নব্বই দশকেও সত্তর দশকের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে ভিত্তি ক’রে, ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসের শেষে হারবার্ট নামক ‘মানববোমা’ চুল্লির

ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটায় সত্তর দশকে তোষকের তলায় রেখে দেওয়া ডিনামাইটের ডিটোনেশনে, আর সেই তারিখটাও ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর প্লটকে জাস্টিফাই করে, ২৫শে মে! ঠিক যে ২৫শে মে তারিখে নকশালবাড়িতে পুলিশকর্তৃক গুলিচালনায় ১১ জন শহীদ হওয়ার পরে দাবানলের মতো পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে নকশালবাড়ি বিদ্রোহ। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে রাজনীতি নীতি-অনীতির বাইরে বেরিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত শান্তিকল্যাণের বিরুদ্ধে এক প্রবল অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে ফেলে এবং ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে রাজনীতিকে ‘মূল্যবোধহীন’, ভদ্র-শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের এড়িয়ে থাকার মতাদর্শ হিসেবে ভাবার সুযোগ পান না পাঠক। প্রাতিষ্ঠানিক পণ্যসাহিত্যের বিজ্ঞাপিত পত্রিকাতেই ২০১৪ সালে প্রকাশিত সুপ্রিয় চৌধুরীর ‘দ্রোহজ’ উপন্যাসটি ওই সহজসূত্রায়িত পণ্যসাহিত্যের চেনা অবয়ববাদী খাঁচায় পড়ে যেতে পারত যদি না শেষ পৃষ্ঠায় ‘পুনে’ নামক এক কুশীলবের চিঠি পেত মধ্যবিত্ত, রোম্যান্টিক-উৎসবকামী প্রোটোগনিস্ট সুদীপ্ত (উত্তম পুরুষে লেখা উপন্যাস)- যে চিঠিতে প্রোটোগনিস্টের পলায়নবাদী মানসিকতা, স্বস্তিক্ষেত্রে ঢুকে যাওয়ার মানসিকতা ধাক্কা খায় ওই চিঠির কয়েকটি বাক্যে-

কলকাতায় বসে ভাবতেও পারবি না তোরা। তবে ভালও লাগছে খুব এটা ভেবে যে
প্রতীপদা, তন্ময়, প্রশান্তদাদের হাত থেকে খসে যাওয়া পতাকাটা মাটিতে পড়তে দিইনি
আমরা... আবার নতুন করে খেলা শুরু। তোরা খেলাটা মাঝপথে ছেড়ে দিলেও আমি
ছাড়তে পারলাম না। (চৌধুরী ১৪২১, ১২১)

‘খেলা না ছাড়া’-র আখ্যানটাই রাজনীতির প্রতি নির্লিপ্ত হতে দেয় না পাঠককে, উপন্যাসের ‘স্টিরিওটাইপড’ নকশাল-রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে নিম্নবিত্ত পরিবারের পুনে-র লড়াই-রাজনীতিতে ঠোঁট কামড়ে টিকে থাকার মধ্যে দিয়ে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা-নটার সূর্য’ উপন্যাসও ‘বাণিজ্যসফল’ রাজনৈতিক উপন্যাসের বাঁধাগৎ থেকে সরে এসে প্রোটোগনিস্ট পাঞ্চলীকে নন্দীগ্রাম-লালগড়ের শাসকবিরোধী আন্দোলনের বাস্তবতায় নিয়ে আসে। সত্তর দশকে দ্রোণাচার্য (শহীদ দ্রোণাচার্য ঘোষ) ও নিরুপমের সঙ্গে

পাঞ্চগলীর প্রণয়ের ভিত্তি রাজনৈতিক মতাদর্শ, দ্রোণ ও নিরুপমের শহীদ হওয়াও সেই মতাদর্শগত লড়াইয়ের অঙ্গঙ্গী এবং উপন্যাসের কেন্দ্র কখনোই সরে আসে নি সত্তর দশকের রাজনৈতিক তাৎপর্য থেকে। দ্রোহচেতনা দশকান্তরে বিছন হয়ে ছড়িয়ে যায় বলেই পাঞ্চগলী তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেও ‘মধ্যবিত্ত পলায়নবোধ’কে প্রাধান্য না দিয়ে একবিংশ শতকের দ্রোহাখ্যানে ঢুকে পড়েন; পরের প্রজন্মকে নতুন লড়াই গড়ে তুলতে দেখেন শাসকের বিরুদ্ধে। গতানুগতিক রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় ‘রোম্যান্স’-কে প্রাধান্য দেওয়া নয়, বরং রাজনীতির কেন্দ্রাতিগ আবর্তনকেই প্রাধান্য দেওয়া জরুরি, নইলে ‘রাজনৈতিক’ শব্দটা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তরলীকৃত হয়ে যায়।

১৯৬০-৭০ দশকের রাজনৈতিক অভিঘাত সাহিত্যে সরাসরি এসে পড়ার প্রত্যক্ষ কারণ নকশালবাড়ি বিদ্রোহ, যা ১৯৬৭ সালের ২৫শে মার্চ ১১ জন কৃষকরমণীর শাহাদাতের পরে শুরু হয় এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বহু দল-উপদলে ভাগ হয়ে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে চূড়ান্ত অর্থবহ। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ ও শ্রীকাকুলাম কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহ সমসাময়িক এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নকশালবাড়ি বিদ্রোহের তাত্ত্বিক মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের তত্ত্ব, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বারবার বহুধাবিভক্ত হওয়া ও মতাদর্শগত সংগ্রামে রাষ্ট্রবিরোধিতার ভূমিকা এবং সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালবাড়ির অভিঘাত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালবাড়ির পূর্ববর্তী এবং নকশালবাড়ি পরবর্তী দু’টি ধারা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ তার সাফল্য-ব্যর্থতার দ্বন্দ্ব নিয়েই বাংলা উপন্যাসে তথা সমগ্র সাহিত্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তৈরি করতে পেরেছে। সমর সেন কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর মতো রাজনীতি সচেতন নকশালবাড়ি বিদ্রোহ ও অগ্নিগর্ভ সত্তর দশকের অবদান বারবার স্বীকার করছেন বাংলা সাহিত্যের বাঁক বদলের সন্ধিক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে, “এ দেশের কয়েক দশকের জীবনযাত্রায় সেটাই

(নকশালবাড়ি আন্দোলন) ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মতো ঘটনা।” (দেবী ১৩৮১ সাল, ভূমিকা) রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কমুনিস’ ও ‘জার্নাল সত্তর’-এ যাঁদের কেন্দ্রে রেখে কাহিনিকে আবর্তিত করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ‘রোম্যান্টিক শখ’ থেকে নয় বরং নকশাল রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল পেটের তাগিদে; স্বতঃস্ফূর্ত বহুত্বসবে নিছকই গা ভাসানো নয় বরং মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ‘বেকারের চিঠি’-র কেন্দ্রীয় চরিত্রের মতোই তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, ‘বিপ্লব শব্দটি শুনলেই আপনাদের মতো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসে না।’⁴⁰ রাঘব ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ দু’টির ভূমিকা (লেখকের কথা) লেখেন,

১৯৭০- একটি বছর কিংবা একটি সাল হিসেবে থেকে যাওয়ার আগু-পিছু, দু-দিকেই লঙ্ঘন করায় এর শুরু যে কবে এবং শেষই-বা কোথায়, তা নির্ণয় করা স্পষ্টত অসম্ভব। শহর-গেরিলারা ছিল সত্তরের দশকে। কথা তাদের শেষ হল কোথায়? আজ, এখনও বিস্ফোরণের শব্দ। ঘোর অন্ধকার এই সময়ে তাহাদের কথা মনে পড়ে, কেবলই মনে পড়ে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ২৩)

উপন্যাসের লেখক যখন এই উপলব্ধি ও সময়ের চেতনাত জারিত থাকেন, সে উপন্যাস যে অন্তঃকরণে রাজনৈতিক হবে, তাতে সন্দেহ থাকেনা। তদুপরি, ‘কথা তাদের শেষ হল কোথায়?’ যেন সেই সময়ের গতিকেই আরও এগিয়ে নিয়ে আসে বর্তমান দশকে; আর, রাজনীতির প্রতি মধ্যবিভ-দ্বিধা, শাসকের চারিয়ে দেওয়া সশ্রদ্ধভীতিবিকর্ষণের অনুভূতি কিংবা সংস্কৃতিগত নিরাপদ অনুশীলনের রাজনীতিহীন-রোম্যান্টিকনীতিদুর্নীতিবোধ থাকে না- রাজনীতি নিজেই হয়ে ওঠে একটা কুশীলব, যা নিয়ন্ত্রণ করে আখ্যানের ঘটনাবলী ও অন্যান্য কুশীলবেদের।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর ‘রাজনীতি ও মৌলিকতা’ প্রবন্ধে রাজনীতির প্রতি সমসাময়িক সমাজের বিমুখতার উৎস খুঁজতে চাইছেন। উদ্ভাবনী রাজনীতি ও কেজো রাজনীতির নীতিগত দ্বন্দ্বের তুলনায় লিখছেন,

উদ্ভাবনী বনাম কেজো রাজনীতির দ্বন্দ্বটা এভাবে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষ যাকে বর্জন করে, মানুষ যার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, মানুষ ক্রমেই যার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে, সেটি হল কেজো রাজনীতি। রাজনীতি বলতে মানুষ আজ কেজো রাজনীতিকেই বোঝেন, যার কোনো দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা নেই, নেই মানুষকে উদ্দীপিত করার, মানুষকে ভাবাবার কোনও রসদ... এই সুবাদেই জনমানসে রাজনীতি সমার্থক হয়ে যায় জাল ভোট, বুথ দখল, বিধায়ক কেনাবেচা, তথাকথিত বিদ্বজ্জনদের অনায়াস শিবির বদলের ঘটনার সঙ্গে। (দত্তগুপ্ত ২০০৭, ২৮)

শোভনলাল উদ্ভাবনী রাজনীতির মৌলিকত্বের সঙ্গে কেজো রাজনীতির জনমোহিনী বাকসর্বস্বতা ও আপাত চমকের তাৎক্ষণিক আকর্ষণের নীতিগত বিরোধ নিয়ে মূলতঃ কথা বলছেন। রাজনৈতিক অনুশীলনের ‘অভিনবত্ব’ শব্দে জোর দিয়েও সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন উগ্র দক্ষিণপন্থা যেভাবে এই অভিনবত্বের ছদ্মবেশে মারণ-রাজনীতির সূচনা করে, তাই নিয়ে। এবং, শোভনলাল আস্থা রাখছেন বামপন্থীদের রাজনৈতিক নীতি-কৌশলের মানবিক প্রয়োগ ও অভিনব তত্ত্বপ্রয়োগের ওপরে, যাতে ‘রাজনীতি’ গ্রহণযোগ্য⁴¹ হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মনে রাখা দরকার, শোভনলাল যাকে ‘কেজো রাজনীতি’ বলছেন, তার প্রায়োগিক অনুশীলনই কিন্তু বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ‘৬০-’৭০ দশক পরবর্তী যে বামফ্রন্টের শাসনজমানা শুরু হল ১৯৭৭ সালে, তাতেও কিন্তু এই ‘কেজো রাজনীতি’ তথা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক বিমুখতার ফলাফলই প্রকট হতে শুরু করল। কারণ, শোভনলাল কেজো রাজনীতিকে বিজয়ী করার যে পদ্ধতিগুলোর কথা বলছেন, নির্বাচনী ক্ষমতাকেন্দ্রিক সেই সমস্ত পদ্ধতিই অনুশীলিত হচ্ছিল বামফ্রন্টের দ্বারা। নিরাজনীতি বা অ্যাপলিটিক্সের চর্চাও কিন্তু সেই সময় থেকে আরও গেঁড়ে বসছে সমাজে। তার কারণ মূলতঃ দু’টো। প্রথমতঃ, দক্ষিণপন্থী সরকারকে নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলেও, সমাজকাঠামো যেহেতু বদলে গেল না, সেহেতু শাসকের নিরঙ্কুশ শাসনকাঠামো গড়ে তোলার পদ্ধতিগুলোও বদলাল না; আর, রাজনীতিবিমুখ

শাসিত শাসকের সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়স্থল হেজিমনি অনুশীলন করার এবং শাসনের ‘সম্মতি (Consent)’ আদায় করে নেওয়ার। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকাঠামো পাল্টানোর জন্যে যে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন, বাস্তবিক প্রয়োগে যা রক্তপাত-হিংসা, তার প্রতি শাসিতের মনে ভীতি তৈরি ক’রে দেওয়া এবং সমাজের স্থিতিবস্থা অবিলম্বে রাখার নামে ক্রমশঃ শাসকের ‘হিংসা’কে স্বাভাবিক শাসনপদ্ধতি হিসেবে ন্যায্যতা দেওয়া। এই দু’টি কারণেই একদিকে যেমন ‘রাজনীতি’ শব্দটির প্রতি বা শোভনলাল-কথিত কেজো রাজনীতির প্রতি বিমুখবিতৃষ্ণা তৈরি হল জনসাধারণের চেতনায়, তেমনি অন্যদিকে, নিরাজনীতিকরণের মাধ্যমে শাসক-শাসিত দ্বন্দের রাজনীতির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হতে শুরু করল; বিশ্বায়ন-পরবর্তী দশকগুলোতে উদারনৈতিক অর্থনীতি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির রমরমার যুগে ক্রমশঃই শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ ইত্যাদির সমষ্টিবোধ তথা এই তিনটি সামাজিক উপাদানদ্বারা নিপীড়িত মানুষের সম্ভবদ্বার অনুশীলনগুলো তরলীকৃত-সরলীকরণ ক’রে দেওয়া হল।

রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ‘ভায়োলেন্স’ বা হিংসার প্রসঙ্গও এসে পড়ে এখানে। ‘হিংসা’-র নির্মাণ এবং তার অনুশীলনকে কীভাবে দেখে আমাদের সমাজ, সমাজস্থিত সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক এবং সমাজস্থিত পাঠক? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে ‘হিংসা’ বনাম ‘মানবিকতা’- এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক উপন্যাসগুলো জারিত হয়েছে। ক্রমশঃ পাঠকমননও এই দ্বন্দের চেতনায় প্রভাবিত হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়পর্বে বিশেষতঃ ষাট-সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক-জাতীয়-বঙ্গীয় তিন সমাজক্ষেত্রেই রাজনীতি যখন আর তত্ত্বের চেনাছকে এবং ‘অহিংসা পরমধর্ম’ স্তোকবাক্যে আটকে থাকতে চাইছিল না, তখন এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয় আরও। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দু’টি বড় বিভাজন (১৯৬৪ ও ১৯৬৯) কিন্তু দাঁড়িয়েছিল তিনটি উপাদানের ওপর- পার্টিলাইন, বিপ্লব বনাম শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ এবং তত্ত্ব থেকে অনুশীলনে শ্রেণিসংগ্রাম (শ্রেণিহিংসা)-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ। লেনিনের স্টেট অ্যান্ড রেভল্যুশনে এঙ্গেলসের মতামতকে বিশ্লেষণ ক’রে দু’টি বিপ্লবের নীতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ ব্যবহার

করা হয়েছে- ভায়োলেন্ট রেভলুশন এবং ‘উইদারিং অ্যাওয়ে’। শাসক এই শব্দবন্ধদুটো বারবারই গুলিয়ে দিতে চায়। লেনিন বা মার্ক্স বা এঙ্গেলস অবশ্যই ‘ভায়োলেন্স’-এর মাত্রাকে নির্দিষ্ট ক’রে যাননি। নির্বিক্ত শ্রেণি (এঙ্গেলসের ভাষায় প্রলেতারিয়েত) ঠিক কতটা মাত্রায় সশস্ত্র বা আক্রমণাত্মক হলে শোষক শ্রেণির (এঙ্গেলসের ভাষায় বুর্জোয়া শ্রেণির) রাষ্ট্রকাঠামোকে প্রতিস্পর্ধা জানানো ‘মঞ্জুর’ হবে বা শাস্ত্রসিদ্ধ হবে, তার কোনও ব্যাকরণ বই হয় না। অথচ, ‘হিংসা’ শব্দটি বরাবরই ঘৃণ্য এবং রাজনীতির সঙ্গে অতীব সম্পৃক্ত। শাসক যে যে পদ্ধতিগুলো অবলম্বন ক’রে শাসনকাঠামো অব্যাহত রাখতে চায়; গ্রামশির পরিভাষায় সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গের ওপরে দমনমূলক আধিপত্য কায়েম রাখতে চায়, সেই পদ্ধতিগুলোকে যতটা না হিংসাত্মক রাজনীতির প্রকাশ রূপে দেখা হয় তুলনায় অনেক বেশি ‘হিংসাত্মক’ হিসেবে প্রদর্শিত হয় সাবল্টার্নের প্রতিস্পর্ধার শরীরী ভাষা। এই উপাদান যখন উপন্যাসে আসে, তখন উপন্যাসের কাহিনিও সেই অনুযায়ী অভিযোজিত হয়। ‘হিংসা’ এবং বিদ্রোহ শব্দদুটিকে সমার্থক ক’রে প্রদর্শিত হয়, সত্তর দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির সিংহভাগ আখ্যানে এটাই মানা হয়েছে। এই দশকের রাজনৈতিক উপন্যাসেও এই সূত্রায়নই চলছে। গৌতম ভদ্র তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যে হিংসায়নের প্রকাশ সম্বন্ধে মতামত রাখছেন। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জার্নাল ৭০’-এর হিংসার বিশ্লেষণে বলছেন,

এই চৈতন্যের রূপান্তরটাই আমার ধারণা দ্য ক্রিটিক অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যাজেন্ডা, ক্রিটিক অফ সিপমল প্রোগ্রেস অ্যাজেন্ডা। এবং এই ক্রিটিকের মধ্যে দিয়ে আমি আর পরবশ্য থাকি না, আমি স্ববশ্য হই। আমি অভয়মন্ত্র পাই। ব্যক্তি হিংসাকে অতিক্রম করে, শ্রেণি হিংসাকে অতিক্রম করে, রাষ্ট্রীয় হিংসাকে অতিক্রম করে, আমি অভয়মন্ত্র লাভ করি। (ভদ্র ২০১৭, ১৯০)

গৌতমবাবু সমস্ত হিংসাকে এক বাক্যে এনে ফেলেছেন কয়েকটি অর্ধযতি ব্যবহার ক’রে। এবং ‘স্ববশ্য’-র মতো শব্দ ব্যবহার করছেন। উপন্যাসের আখ্যানে চৈতন্যের রূপান্তর তাঁর চেতনার

কোনও এক বিশেষ উত্তরণ/পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে তাঁর ধারণা। স্ববশ্য হয়ে গৌতমবাবু কি ওই উল্লিখিত তিন হিংসাপ্রস্তাব বন্ধ করতে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন? আর, ওই তিন হিংসা কি একই বাক্যে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে? রাষ্ট্রীয় হিংসার প্রাবল্য ও দুর্দমনীয়তার সঙ্গে ব্যক্তি হিংসাকে তুলনা করা যায় কি? রাষ্ট্রীয় হিংসার মতো ব্যাপক, নিরবচ্ছিন্ন ও সুপরিকল্পিত আধিপত্যের সামনে ব্যক্তি হিংসার মতো ‘পরিকল্পনাহীন’ ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিংসা (অথবা, হত্যা) কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে? আর, ‘শ্রেণি হিংসা’ বলতে গৌতমবাবু কি উচ্চশ্রেণির নিম্নশ্রেণিকে করা নিষ্পেষণের কথা বলতে চাইছেন নাকি ‘শ্রেণি সংগ্রাম’-এর ‘ভায়োলেন্স’কে বোঝাতে চাইছেন? যদি শেষোক্ত অর্থই বোঝাতে চান, তাহলে সংগ্রাম শব্দের সঙ্গে হিংসা শব্দকে মিলিয়ে দেওয়ার চিরাচরিত ফাঁদেই কি তিনি পা দিচ্ছেন না? আর, গৌতমবাবু তাঁর পাঠকীয় ও তাত্ত্বিক শ্রেণি-অবস্থান থেকে ‘অভয় মন্ত্র’ বিস্ময় পেতে পারেন, কিন্তু সেই একই অভয় মন্ত্র কি নিম্নবর্ণের শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ অবস্থানে থাকা মানুষেরা পান? প্রতিমুহূর্তে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও উচ্চবর্ণের সাংস্কৃতিক আধিপত্যমূলক দমন সহ্য ক’রে বেঁচে থাকা অত্যাচারিতদের কাছে এই অভয়মন্ত্র বিলাসিতামাত্র। অতএব, অন্ততঃ এই প্রবন্ধে/কথোপকথনে গৌতমবাবু ‘ভায়োলেন্স’ প্রসঙ্গে শাসকনির্মিত অবস্থান এড়িয়ে যেতে পারেন নি। আর, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা বা নবাবুগের উপন্যাসের ভাষা তো এই ‘শ্রেণিসংগ্রাম’কেই ন্যায্যতা দেয় এবং তাঁদের ভাষার ব্যবহার সমাজের হিংসাকে আখ্যানকে বিবৃত করে ভাষার বহুস্বরীয় প্রয়োগে। মহাশ্বেতা দেবীর দোপ্‌দী মেঝেন যখন খোলা উদ্ধত বুক নিয়ে সশস্ত্র সেনানায়কের মুখের ওপর বলে, ‘কাঁউটার কর, লে কাঁউটার কর’ তখন সেনানায়ক ‘নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়’- এই গল্পে মহাশ্বেতা ভাষা দিয়েই ‘হিংসা’কে বিবৃত করেছেন রাষ্ট্রের হিংসা-অত্যাচারের বিরোধিতা করতে কোনও ‘অভয়মন্ত্র’ দিয়ে দ্রোপদী, বসাইদের শান্ত করতে চাননি। ক্রোধকে ‘প্রশান্ত (প্যাসিফাই)’ করা নয়, বরং প্রজ্জ্বলিত রাখার রাজনীতির কথাই উপন্যাসে-গল্পে রাখছেন মহাশ্বেতা- তাই বসাই টুডুর সমচিহ্নক হয়ে যায় ‘খালি হাতে বাতাসের গলা

মোচড়ানো’-র মতো একটি হিংসাত্মক শরীরী ভঙ্গি! গৌতমবাবু তাঁর এই প্রবন্ধে বরং যাঁর উপন্যাসের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, সেই নবাবুগের বক্তব্য দেখা যাক সমকালীন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে,

রাঘব একজন আদ্যন্ত রাজনৈতিক লেখক এবং হাতেকলমে যে বিপ্লবটা সে করতে গিয়েছিল এবং যে বিপ্লবটা হয়নি শুধু তাই না, বিপ্লবের পুরো গল্পটাই যখন ‘অন্ধগলির গুপ্তকথা’র গহ্বরে ঢুকে গেছে তখনও রাঘব যাদের কথা বলবে বলে কলম তাক করেছিল তাদের কথা বলার জায়গাটা এক সেন্টিমিটারও ছাড়েনি... যে রাজনীতি ক্ষমতায় আসীন বা ধুকুমার প্রতিপক্ষ- তাদের ছক তো চেনা। কিন্তু এর বাইরেও অসংখ্য ছোট-বড় খেলা যেগুলো চলে তারই লড়াই রাঘবরা লড়ছে আগামীকালের কথা ভেবে (ভট্টাচার্য ২০১৫, ১৪৬)

একজন রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক খুঁজে নিচ্ছেন তাঁর সাহিত্যিক সহযোদ্ধাকে, আখ্যানের বুনোটে থাকা রাজনীতি ও হিংসাকে ‘লেখকের মুক্তাঞ্চল’ গড়ার পদ্ধতি হিসেবে দেখছেন।

সাম্প্রতিক কয়েক দশকের অধিকাংশ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে ‘রাজনীতি’-র উপস্থিতি শোভনলাল দত্তগুপ্তের কথামতো ওই ‘কেজো রাজনীতি’ কেন্দ্রিক। আরও স্পষ্ট করে, ১- রাজনীতির উপস্থিতি ব্যক্তির নৈতিকতা-মূল্যবোধ ইত্যাদির উত্তরণ-অবতরণ কেন্দ্রিক এবং ২- ব্যক্তিহিংসা বা ব্যক্তিহত্যা কেন্দ্রিক। যেন, ‘রাজনীতি’ শব্দটির ও তৎসংলগ্ন সমস্ত আখ্যানের পরিসর ওটুকুই। সত্তর দশক পরবর্তী প্রায় সব রাজনৈতিক উপন্যাসে কোনও এক বা একাধিক দ্রোহীযুবক কর্তৃক ‘নিরীহ’ কোনও ব্যক্তির খুন ও খুনের বর্ণনা বহুলব্যবহৃত ঘটনা। এরপর সেই ‘খুনি’ যুবকটির উচ্চারিত সংলাপ বা স্বগতকথনে ঔপন্যাসিকের তথ্য কথকের মনস্তাপ কিংবা জাজমেন্ট- এও বহু ব্যবহৃত কথনকৌশল। মৃণাল সেনের ‘১৯৭১’ ছবিটিতে দেখানো একটি রাষ্ট্রীয় হত্যার দৃশ্য- এক পলায়নরত যুবককে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ-

বারবার পুনরুৎপাদিত হতে থাকে পরবর্তী প্রায় সব ‘রাজনৈতিক’ চলচ্চিত্রে। দেয়াললিখনে ‘বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস’- সেই সময়ের একটা স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি হয়ে যায়, একটা প্রতীক; সত্তর দশক নিয়ে নির্মিত প্রায় সবক’টি চলচ্চিত্রেই এই দেয়াললিখন দেখা যায়। কিন্তু, মূল উদ্ধৃতিটি- ‘বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস’ কোথাওই সঠিকভাবে থাকে না, ‘রাজনীতি’ শব্দটি বাদ চলে যায়। এই উদ্ধৃতি থেকে ‘রাজনৈতিক’ শব্দটি বাদ দিলে যা পড়ে থাকে, তা শুধু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হত্যার কথা বলে। শিল্পে বারম্বার পুনরুৎপাদিত এই প্রতীকগুলো রাজনীতিকে ভুল ভাবে উপস্থাপিত করে চলচ্চিত্রে, জীবনে। ‘বিকৃত’ প্রতীক বা প্রতীকের ‘বিকৃত’ ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই রাজনীতিবিমুখ ক’রে দেয় দর্শক বা পাঠককে। সচেতন ঔপন্যাসিক এই ফাঁদ এড়িয়ে যেতে পারেন। যেমন, ইলিয়াস বা নবারুণ, রাঘব বা মহাশ্বেতা, দীপেন্দ্রনাথ ও দেবেশ। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে রাজনীতির উপস্থাপনার এক উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ‘রোম্যান্টিসিজম’ পরিহার করা। কাদের রোম্যান্টিসিজম? মধ্যবিত্তের বা মধ্য-শ্রেণির। যে কোনও আন্দোলনে বা দ্রোহে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের আড়ালে অ্যাডভেঞ্চারিজম ও রোম্যান্টিসিজম জড়িয়ে থাকে; সেটাই তার একমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়জ্ঞাপক নয়, কিন্তু এই দু’টো থাকে। আর, এরই সঙ্গে থাকে দ্রোহের বা আন্দোলনের ‘নেতৃত্ব’ কন্ট্রোল করার প্রবল ইচ্ছে। বিশ শতকের বিভিন্ন কৃষকবিদ্রোহ ও শ্রমিকবিদ্রোহ-র ইতিহাসে এই উদাহরণ আছে। ‘বিপ্লব’-এর নীতিনৈতিকতা নির্ধারণের এই যে মধ্যবিত্ত-আগ্রহ, অনেকসময়েই তা নিম্নবর্গের দ্রোহাকাঙ্ক্ষা বুঝতে ব্যর্থ হয়, অনেকসময়েই নিম্নবর্গের আন্দোলনকে নিজস্ব শ্রেণিঅবস্থাননিয়ন্ত্রিত পথে চালিত ক’রে ফেলে। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান পূর্ব-পাকিস্তানে দীর্ঘ কয়েক বছরের মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ ওঠা মানুষত্বের পবিত্রতম হিংসাত্মক ক্রোধ, সেকথা স্বীকার করেও ইলিয়াস মেনে নেন যে, মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সেই ক্রোধান্বিত তরলীকৃত করে স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়, “But our middle class leadership waved the white handkerchief of nationalism and thwarted that human being, the

entire movement was usurped by this leadership”⁴² এই রাজনৈতিক চেতনা ইলিয়াস ধারণ করেন উপন্যাসের আখ্যানজুড়ে। ওসমানের মতো এক কুশীলব নির্মিত হয়, যার উত্তরণ দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত থেকে ‘সিজোফ্রেনিক’ বিক্ষোভকারীতে, যে জ্বলন্ত আগুনে আইয়ুব খানকে পোড়াতে চায়, যে বহুযুগের ওপার থেকে আসা অত্যাচারিত মানুষের সশস্ত্র মিছিলে নিজেকে মিশে যেতে দেখে এবং যার চেতনায় জাঁকিয়ে বসে হাড্ডি খিজিরের মতো লুম্পেন প্রলেতারিয়েত। ইলিয়াস মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা স্বপ্নালু বিপ্লবাকাজ্যকেই উলটে দিতে চেয়েছেন, যেখানে মধ্যবিত্তের রাজনীতিবোধে ভাঙচুর হয় এবং ‘রাজনীতি’ আর অনীতির-অমূল্যবোধের-বিমুখতার থাকে না বরং অংশগ্রহণের উৎসব হয়ে ওঠে। তাই ওসমানের ‘পাগলামি’ সম্পর্কে লেখেন-

Osman turned mad and you are questioning this madness. But what I am trying to say is this that if someone wants to come out of his middle class hole, he has to be to that measure estranged from his middle class life and attitude, which will provoke the middle class to call him mad. In fact, he has to be mad. Had I shown any other outcome in this perspective, it would have been wishful thinking. (Elias 2018, 171)⁴³

ঠিক এরকমই এক ‘ম্যাডনেস’ দেখা যায় রণজয়ের, যদিও সেই মস্তিষ্কবিভ্রাটের কারণ ওসমানের থেকে আলাদা। কিন্তু, রণজয়ও নিজের শ্রেণিঅবস্থানচ্যুত হতে চেয়েই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এক বিপ্লবী পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে। এরপর পুলিশের প্রবল মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারে ‘পাগল’ হয়ে যায় মেধাবী ছাত্র ও তাত্ত্বিক রণজয়, তার স্থান হয় পাগলাগারদে। এই অবধি আখ্যানটি সেই চেনা সূত্র ধরে এগোলেও, সূত্রায়ন ভেঙে দেন নবাবরূপ রণজয়ের মানসিক অস্থিরতার সাহায্যেই। নকশাল রণজয় স্মৃতিভ্রংশের তাড়সেও ভুলতে পারে না দু’টো জিনিস-

শ্রেণিশত্রুদের এবং সত্তরের দশকের মতাদর্শগত রাজনৈতিক প্রতিরোধকে। নব্বই দশকের বিশ্বায়নী হাওয়ায় সমস্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের যখন দফারফা হচ্ছে, উদারনীতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অপ্রতিরোধ্য গতিতে দখল ক'রে নিচ্ছে সমস্ত সামাজিক পরিসর, তখন মতাদর্শকেই আঁকড়ে থাকে রণজয়, প্রাণপণে বিশ্বায়নী সংস্কৃতিকে ও সত্তর দশক ভুলিয়ে দেওয়ার শাসকের স্থিতিবস্থার সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ ক'রে চলে। কেন 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে, তার দু'টো উল্লেখযোগ্য কারণ আলোচনা করা যায়- প্রথমতঃ, রণজয়ের অস্তিত্ব এখনও সত্তর দশকের যুদ্ধ-ইতিহাস-বিতর্ক; রণজয়ের কাছে '৭০ ফুরোয় নি। রণজয় বারবার গল্পগুলো, প্রতিরোধের কাহিনিগুলো তুলে আনে তা কোনওভাবেই নস্ট্যালজিয়া বা স্মৃতিকামুকতার রোমাঞ্চের উপাদান নয় বরং রাষ্ট্রশাসনকে প্রতিরোধের হাতিয়ার। দ্বিতীয়তঃ, 'ব্যক্তি রণজয়' শুধু নয়, সত্তর-দশক পরবর্তী দ্রুত-বদলানো সমাজসময় এই উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। নবাবুণ 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের যান্ত্রিক প্রয়োগে রণজয়কে ও নকশালবাড়ি বিপ্লবকে মহিমময় ক'রে তোলেননি বরং অস্থিরতার '৭০ আর স্থিতিবস্থার '৯০ এর দ্বন্দ্বকেই সামনে রেখেছেন। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস-এ রাজনীতির উপস্থিতি মানেই দু'টো বোমাবাজি, চারটে বুলেট, লেখকের মনমতো অবাস্তব কাল্পনিক মতাদর্শ কিংবা রাজনীতির অধঃপতন নয়- 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' কিংবা 'চিলেকোঠার সেপাই' বা 'অপারেশন? বসাই টুডু' সেই কথাই বলতে চায়।

উনিশশো ষাট-সত্তর দশক ও নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদলের অন্যতম মুহূর্ত মনে করার এই যে কারণগুলো, তার সাথেই জুড়ে আছে উপরে আলোচিত আরেকটি শব্দ- নিরাজনীতিকরণ বা অ্যাপলিটিক্স। অ্যাপলিটিকাল শব্দের সংজ্ঞা ইংরাজি অভিধান অনুযায়ী, "not interested in or connected with politics, or not connected to any political party" অর্থাৎ, রাজনীতি বিমুখতা, রাজনীতির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রাখা সত্তা। আরেকটি সংজ্ঞা অন্যযায়ী, "politically neutral; without political

attitudes, content, or bias”⁴⁴ অর্থাৎ, নিরপেক্ষতা- কোনও ব্যক্তির রাজনীতির প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থানই তাঁর নিরাজনীতির সংজ্ঞা। সাহিত্যের পাঠক থেকে লেখক সবার ওপরেই নিরাজনীতির প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু নিরাজনীতিও আসলে একটা রাজনীতিই; যে রাজনীতি আপাত নিরপেক্ষতার আড়ালে, আপাত নিরাপদ অবস্থানের সুখে আসলে শাসকের স্থিতিবস্থাকে প্রশ্ন করতে এবং শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ভুলিয়ে দেয়। নিরাজনীতিও যে আসলে রাজনীতিই, তা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন জর্জ অরওয়েল। তাঁর ‘হোয়াই আই রাইট’ গ্রন্থে প্রত্যেক লেখকের লেখার যে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটি- ‘পলিটিকাল পারপাস’, যেখানে লেখকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন,

Political purpose- Using the word ‘political’ in the widest possible sense. Desire to push the world in a certain direction, to alter other peoples’ idea of the kind of society that they should strive after. Once again, no book is genuinely free from political bias. The opinion that art should have nothing to do with politics is itself a political attitude. (Orwell 1946, orwell.ru)

অরওয়েলের বাক্যের সূত্র ধরেই বলা যায় যে, রাজনীতিকে ঘৃণা করতে শেখানোর রাজনীতি সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চেতনায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারই ফলস্বরূপ একদিকে পণ্যসাহিত্যের কালচার ইন্ডাস্ট্রি নিয়মমাফিক সাহিত্য-উৎপাদন ক’রে চলে আর অন্যদিকে রাষ্ট্রও নিশ্চিন্তে থাকে সংস্কৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত নির্দেশে রয়েছে বলে।

সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উপন্যাস নির্মাণের রীতি ও সাজিকতায় বেশ কিছু বদল আসে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আকাঙ্ক্ষা, জটিলতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদির উপস্থাপনা যুগপৎ পাল্টাতে থাকে। ঔপন্যাসিক ও পাঠক একইসঙ্গে যে সময়ের বদলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করেন,

সেজনেই উপন্যাসের নতুন রীতিনীতির সন্ধান চলতে থাকে, ‘সাহিত্য’ বিশেষতঃ কবিতা ও উপন্যাস পাঠককে তাঁর ‘স্বস্তিক্ষেত্র’ থেকে বের ক’রে আনতে চায়; শুধুমাত্র বাস্তববাদ বা রিয়্যালিজম দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর, উত্তর-ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে শুধুমাত্র ‘বাস্তববাদ’-এর প্রয়োগ পাঠককে নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারে না এবং কিছু লেখকও গতানুগতিকতা থেকে বেরোতে চান। সাহিত্যের নতুন তত্ত্বায়ন যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই চলতে থাকে নতুন ভাষাকাঠামো, রীতিনীতি ও আঙ্গিক-বিষয়ের খোঁজ। বিনির্মাণ, অন্তর্ঘাত, জাদুবাস্তবতা, অন্যবাস্তবতা, মেটাফিকশন ইত্যাদি সাহিত্যপদ্ধতির বহুল প্রয়োগ ঘটতে থাকে। আর, এই পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গেই জড়িয়ে যায় বেশ কিছু সাহিত্য-আন্দোলন। মূলতঃ ’৬০ দশকের শুরু থেকে একাধিক সাহিত্য-আন্দোলন বিশ্বসাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে প্রভাববিস্তার করে। এর মধ্যে কোনও-কোনও আন্দোলন আন্তঃসম্পর্কিত আবার কোনওটা একক ভাষার সাহিত্য থেকে সৃষ্ট। ভাষাগত বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষাও রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণ সমৃদ্ধ করেছে। ‘নিম্নবর্গের সাহিত্য’ একটা রাজনৈতিক ঘোষণা হিসেবে, বিরুদ্ধ-প্রতর্ক হিসেবে যখন থেকে সাহিত্যের এতদিনের প্রথাগত নির্মাণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছে, তখন থেকেই ‘ভাষা’ হয়ে উঠেছে সেই সাহিত্যের হাতিয়ার। সাহিত্যকে, উপন্যাসকে দৈনন্দিন ভাষার কাছাকাছি পৌঁছে দিতে চেয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে অন্যতম প্রধান কুশীলব হাড্ডি খিজিরের জবানে যে ভাষা লেখেন, তা হাড্ডি খিজিরেরই ভাষা, কোনভাবেই তা রুচিবান-শিক্ষিত-ভদ্রলোক শ্রেণির ভাষা নয়। নবাবুর্গ তাঁর ফ্যাতাডুদের যে ভাষায় কথা বলান, সেই ভাষা শীলিত-মার্জিত ড্রইংরুম সাহিত্যে ছিছিকার ফেলে দিলেও, ফ্যাতাডুদের ভাষা সেই মার্জিত-রুচিবান-নিরাপদ পরিসরকেই প্রত্যাখ্যান করে; ভাষার রাজনীতি ক্রমেই চিনে নেওয়া যায় বিশ শতকের এই উপন্যাসগুলোয়। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ‘কথক’ প্রথম নিজের শ্রেণিগত-অবস্থান ও ভাষাপ্রয়োগের সাহিত্যরুচি ভাংচুর ক’রে সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যান দোপ্‌দী-বসাই-বিরসাদের ভাষার কাছে। দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-ও ভাষার এই উলটপালটকেই ধারণ করে; ‘সাহিত্যের ভাষা’ বলে এতদিন যা স্বীকৃত, প্রাতিষ্ঠানিক ছিল, তাকে হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ ক’রে

সাহিত্যের বাইরে থাকা ভাষাকেই কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। নবারুণের ফ্যাতাডু-কালমন-মোগলাই-ফোয়ারাদের যে ভাষায় ‘নিম্নবর্গের অন্তর্ঘাত’ রয়েছে, তা শুধু কিছু খিস্তি-অপরিশীলিত শব্দের সমাহার নয় বরং তা উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আর্থ-সামাজিক হেজিমনির বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ। বিশ শতকের শেষ তিন দশকের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস এই বৈশিষ্ট্যকেও ধারণ করে। ভাষাগত বিপরিচিতিকরণ নতুন নন্দনধারণার সম্ভাবনা খুলে দেয়।

‘দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা’ উপন্যাসে অদ্ভুতরসের মোড়কে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সমালোচনা অভূতপূর্ব আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন মিখাইল বুলগাকভ। আলেক্সান্দার সলজেনিৎসিন সোভিয়েত জমানায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ (সোশ্যালিস্ট রিয়ালজম) ও ভবিষ্যবাদ (ফিউচারিজম)- এই দুই সাহিত্যরীতির বাইরে আখ্যানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সামাজিক ইতিহাসের অদেখা ও শাসকদ্বারা চাপাদেওয়া বাস্তবতা সলজেনিৎসিনের উপন্যাসে উঠে আসে। সুখী-রঙ্গিন কার্পেটের নিচে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়, গ্রামীণ কাঠামো ধ্বংস, সংবাদমাধ্যমের শাসক-নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা, জেলজীবনের চরম দুর্ভোগ ইত্যাদি সলজেনিৎসিনের রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়। ‘The First Circle (1964)’ উপন্যাসটি সোভিয়েতের স্থালিন জমানার আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তির জটিল সম্পর্কের আখ্যান বলে। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কোজের ‘The Autumn of the Patriarch (1975)’ সলজেনিৎসিনের উপন্যাসের মতোই লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক নিপেষণের কথা বলে। গার্সিয়া মার্কোজের উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার প্রয়োগ মিথের সঙ্গে বাস্তবতা, কাল্পনিক আখ্যানের সঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কাহিনি আখ্যানপদ্ধতির নূতনত্বের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করায়। ‘জাদুবাস্তব’ আখ্যানপদ্ধতি রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে, উপনিবেশিত বয়ানের প্রতিস্পর্ধা হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিকের ফাঁদা কাহিনির বিরুদ্ধে। ‘magic realism’ ১৯৩০-র দশক থেকে শিল্পনিরীক্ষার এক মাধ্যম, স্কট সিম্পকিন্সের সংজ্ঞায়নে, জাদুবাস্তবকে উদ্ভটরসের সাহিত্য (fantastic literature) বা মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যের সঙ্গে

মেলানো চলে না। পরাবাস্তববাদ (surrealism) বা আধ্যাত্মবাদী (hermetic) সাহিত্যের সঙ্গেও মেলেনা।⁴⁵ পার্থক্যগুলি আরও স্পষ্ট করছেন।

Magic realism does not use, like superrealism, dream motifs; nor does it distort reality or create imaginary worlds, as do fantastic literature or science fiction; nor does it place importance on a psychological analysis of the characters, since there is no attempt to explain the motivations behind their actions or which prevent them from expressing themselves. (Simpkins 1988, 143)

আলেহো কার্পেস্তিয়ের সাররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের চেতনা ও ইউরোপীয় তত্ত্বায়নকে পান্ডা না দিয়েই জাদুবাস্তবের অন্য সংজ্ঞা তৈরি করলেন, যে জাদুবাস্তবতা লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা থেকেই শুধুমাত্র সাহিত্যস্থ হয়। জাদুবাস্তব আখ্যানে যে শব্দটি নিয়ে তাত্ত্বিকরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকেন, তা হচ্ছে ‘বাস্তব’ (real)। কল্পসাহিত্য বা ফিকশন মানেই কম বা বেশি বাস্তবচ্যুত। হুবহু বাস্তবকে সাহিত্যে রাখলে তা আর আখ্যান থাকে না, তা তত্ত্ব-প্রবন্ধ ইত্যাদি হয়ে যায়। কিন্তু, এই ‘বাস্তব’-এর মাত্রাভেদ থাকে, ফিকশনে নিরেট বাস্তব থাকেনা মানে এই নয় যে, তা অবাস্তব বা মিথ্যেয় ভর্তি। বরং, যে নিরেট বাস্তবতা, তাকে আখ্যানের কল্পনায় মিশিয়ে উপন্যাস-গল্প ক’রে তোলার চেষ্টা করেন লেখক। আর, গার্সিয়া মার্কোজ, হুয়ান রুলফো, বোরহেসরা এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতটাই দিলেন বদলে। উপনিবেশিত, যুদ্ধধ্বস্ত ও প্রথম-বিশ্ব দ্বারা হেজিমোনাইজড (hegemonized) লাতিন আমেরিকার ‘বাস্তব’ যে ইউরোপীয়দের বা অন্য মহাদেশের দেখিয়ে দেওয়া বা দেখাতে চাওয়া বাস্তবের মতো হবে না, সগর্বে জানিয়ে দিলেন তাঁরা। আর, এখানেই তাঁদের উপন্যাস রাজনৈতিক হয়ে ওঠে; সাহিত্যের রাজনীতি, ভাষার রাজনীতি এবং শাসিতের রাজনীতিকে ধারণ ক’রে। বাস্তবের উপস্থাপনা বদলে দেওয়ার সাহিত্য-হাতিয়ার বিষয়ে মার্কোজের বক্তব্য, “disproportion is part of our reality too. Our

reality is in itself out of all proportion.”⁴⁶। তাহলে বাস্তবতা কোনটা? বহির্দেশীয় ঔপনিবেশিক ও দখলদার জাতির কাছে যা বাস্তব, তা উপনিবেশিতর বাস্তব নয়; মার্কোজ যখন একটা আস্ত জনপদের সম্মিলিত স্মৃতিভ্রংশের (amnesia) কথা লেখেন এবং সেই জনপদবাসীরা জীব-জড় সব বস্তুর নাম লিখে রাখে বস্তুগুলোর শরীরে, তখন তা আপাত অবাস্তব ও কৌতুকোদ্দীপককারী মনে হলেও, লাতিন আমেরিকার বাস্তব সেকথাই বলে। ইউরোপীয় দখলদারেরা একে একে সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি সবকিছুই দখল ক’রে নিয়েছিল কয়েক শতক ধরে এবং ভাষাহীন-সংস্কৃতিহীন-ইতিহাসহীন জাতিতে পরিণত করেছিল তাঁদের। লাতিন আমেরিকার মিথ, আখ্যান, বিশ্বাস, লোককথা যখন তাঁদের উপন্যাসে-গল্পে আসে, তখন যুক্তিবাদী, ‘শিক্ষিত’ আধুনিক মনন তা মানতে পারে না, তাকে ‘জাদু’, অবাস্তব বলে দাগিয়ে দেয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে কি জাদুবাস্তব আখ্যানপদ্ধতির তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান নেই? ঔপনিবেশিকদের ইতিহাস-রাজনীতির পাঠকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর আখ্যান এই উপন্যাসেও রয়েছে। যে বাস্তব দেশভাগ ও জাতিবিরোধের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা চাপিয়ে দিয়েছিল শোষিত মানুষের ওপরে, সেই ‘বিকৃত বাস্তব’কেই খোয়াবের ভাষায়, না-হওয়া বাস্তবের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের দ্বন্দের ভাষায় প্রকাশ করছেন। ফ্রাঞ্জ রোহ্ ১৯২০-র দশকে ‘Magischer Realismus’ শব্দটিকে শিল্পক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন শিল্পের বিরুদ্ধ-আন্দোলন হিসেবে, যেখানে বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য/মুগ্ধতাকে পুনরাবিষ্কার করাই ছিল উদ্দেশ্য। রোহ্ সাহিত্যক্ষেত্রে বাস্তববাদ (Realism) এবং জাদুবাস্তববাদ (Magic Realism)-র কিছু পার্থক্যসূত্র নিরূপণ করেছেন-

Realism

History

Mimetic

Fantastic/Supplementation

Magic Realism

Myth/Legend

Familiarization

Defamiliarization

Empiricism/Logic

Mysticism/Magic

Narration

Meta-narration

Closure-ridden/Reductive

Open-ended/Expansive

Naturalism

Romanticism

Rationalization/Cause-Effect

Imagination/Negative Capability⁴⁷

যা দৈনন্দিন, যা বাস্তব, যা প্রত্যক্ষ তাকে অপরিচিত প্রকাশভঙ্গিতে আখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা ‘জাদুবাস্তব’ আখ্যানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোহ যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছেন জাদুবাস্তববাদকে চিহ্নিত করতে, তার প্রায় সবগুলির উপস্থিতিই রয়েছে ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে (যদিও, ‘খোয়াবনামা’-কে শুধুমাত্র জাদুবাস্তবের পাঠ হিসেবে দেখা যায়না)। মজনু শাহ ও ভবানী পাঠকের কিংবদন্তী, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বহু মিথ ব্যবহার করছেন ইলিয়াস; মিথ-কিংবদন্তী-লোককথা প্রায় দু’শতক পরের বিভেদমূলক রাজনীতির সমান্তরাল অস্ত্র হয়ে উঠছে। ১৯৪০ দশকের রাজনীতির ধারাবিবরণী বা নিছক অনুকৃতি হয়ে থাকছেনা এই উপন্যাস, বরং পাঠককে এক কল্পবাস্তবের সন্ধান দিচ্ছে। খোয়াবের বারংবার ফিরে আসা, খোয়াবনিয়ন্ত্রিত আখ্যানমালা এবং কুশীলবেরা তার সাক্ষ্য বহন করছে। ‘খোয়াবনামা’-র পাঠে বিপরিচিতকরণ (defamiliarisation) থাকে, যখন কুলসুম ‘ক্ষিদে’-র পরিচিত প্রকাশকে পাল্টে নেয়, পাঠকের চেনা আখ্যানবৃত্ত থেকে দূরে সরে যায় নতুন দৃশ্যকল্পের আবিষ্কারে। উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই অর্জিত ধানে সংসারের ভরণপোষণ এবং আগামীতে ফের ধানচাষের জন্যে প্রস্তুতি-কুলসুমের খিদে তাড়ানোর এক আশ্চর্য ভঙ্গি জেগে থাকে তার মধ্যেই।

(খিদেকে কাবু করার কায়দা) জানে তো জন্ম থেকেই, তবে নতুন ফন্দিটা শিখেছে বছর দুই আগে আকালের সময়। কী রকম সেটা- জোরালো কোনো গন্ধ পেট ভরে নিতে

পারলেই পেটটা তার বেশ ফুলে ওঠে। থুথু যতবার আসে একটু জমতে দিয়ে গিলে ফেলতে হবে, তাতে পাতলা ডাল খাওয়ার কাজ হয়। কিন্তু বমি করা চলবে না, বমি হলেই পেট খালি (খোয়াবনামা ১৯৯৬, ২৩)

কখনো ফাঁকা হাঁড়ি থেকে বাসি গন্ধ, কখনো তমিজের বাপের মুখের পচা আঁশটে গন্ধে, “কুলসুমের জিভ জুড়ে এখন পচা মাছের বাসনা” (ইলিয়াস ১৯৯৬, ২৩), কখনো বা শ্রেফ গন্ধের ভাবনাতেই খিদে জয় করে নেয় কুলসুম। খিদে-অন্ন-সুঘ্রাণ এই ‘সুখী’ বয়ানকে বিপরিচিতিকরণের মধ্যে দিয়ে বাস্তবে এনে ফেলেন লেখক, পাঠক অস্বস্তিতে পড়ে চেনা সাহিত্যবোঁকের বিপরীতে। সুফীচেতনা ও অতীত-চরিত্রেরা ‘খোয়াবনামা’র পাঠে অঙ্গঙ্গী। খোয়াবনামা বা তাবিরনামা গ্রন্থই তো রহস্যময় আধ্যাত্মবাদের স্বাক্ষ্যবহন করে। চেরাগ আলির অদৃশ্য উপস্থিতি, তমিজের বাপের খোয়াবে মুনসির জেগে থাকা, শোলোককখন বাস্তবতার বাইরে এক কাহিনিবুনোটের দিকে নিয়ে যায়। রোহ-র মতে যে উন্মুক্ত-অন্ত কাহিনি থাকার কথা ‘জাদুবাস্তববাদ’-এ, তাও তো রয়েছে ‘খোয়াবনামা’-তে। তমিজের বাপের সেই কাদায় পা-গেঁথে ছাই রঙের মেঘ তাড়ানো দিয়ে যে আখ্যান-কাহিনির শুরু, তার শেষে থাকে নাতনি সখিনার খিদের কথা। সখিনাও শক্ত মাটিতে পা গেঁথে ‘জোনাকির হেঁশেলে ভাত রান্না’ হতে দেখে-সোভন ধূমা, মজনু শাহ, ভবানী পাঠকদের থেকে যে কাহিনির শুরুয়াত, বহু প্রজন্মান্তরে সখিনাতেও কি তা শেষ হয়? খিদের আখ্যান তো অনন্ত; খোয়াবের উত্তরাধিকার সখিনার চোখে ভর করে। উপন্যাসে থেকে যায় ‘ভূত’, খোয়াবে চালিত করে তমিজের বাপকে। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী মুনসি বয়কতুল্লাহর ভূত আধিপত্য করে ১৯৪০ দশকের মানুষদের বিশ্বাসে-চেতনায়, হারিয়েও যায়। তমিজের বাপের ভূতও তো আধোচেতনায় তমিজ আর কুলসুমের মাথায় ঢুকে যায়। আর, যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক তত্ত্ব-চেতনা ‘খোয়াবনামা’তে থিতু হতে পায় না, বারবারই তাকে তাড়িয়ে ফেরে স্বপ্নের ভেতরে ভেতরে খুলে যাওয়া পথ। নিছক বাস্তবতার দেশভাগ-দাঙ্গা-বিচ্ছেদ-রাষ্ট্রগঠনের কাহিনিতে আটকে না থেকে নিম্নবর্ণের প্রায় দু’শো বছরের ‘নিঃসঙ্গতার

আখ্যান’ হয়ে ওঠে খোয়াবনামা। আকাজ্জিত অথচ না-হওয়া বাস্তবের সম্ভাবনা ঝলসে ওঠে। কার্পেণ্ডিয়ের-মার্কোজ-বোরহেসের জাদুবাস্তবতা যেমন লাতিন আমেরিকার নিজস্ব পাঠ, তেমনই ইলিয়াসও ভারতীয় উপমহাদেশের নিজস্ব পাঠ। এই অন্তর্ভাবনে ইউরোপীয় আধুনিক বাস্তবতাবাদের প্রবল প্রত্যাখ্যান থাকে। ‘জাদুবাস্তব’ ইলিয়াসের উপন্যাসের একটি পাঠভঙ্গি হতে পারে, কিন্তু তা একমাত্র না। আর, এই বিন্দুতেই ‘সাহিত্যের রাজনীতি’ ও ‘রাজনীতির সাহিত্য’ এই দুই সমান্তরাল বয়ান পরস্পরের অভিমুখ খুঁজে নেয়।

মিলান কুন্দেরার আখ্যান সেই সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, যাঁরা এক টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রের ভেতরে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এখানেও সেই ব্যক্তিকে বুঝতে না পারা রাষ্ট্রের কথা, নিয়ম ও মতাদর্শের যান্ত্রিক ছাঁচে ফেলে ‘মানুষ’ নির্মাণের চেষ্টা। ‘The Book of Forgetting and Laughter (1979)’ চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্মৃতিজাগরুক বয়ান রাখে। ‘নাইনটিন এইটিফোর’-এর শাসকপ্রতিষ্ঠানের মতোই এই আখ্যানে শাসকগোষ্ঠী তাদের অপ্রিয় মতামত দমন করে এবং অপছন্দের সবকিছু এমন কি ব্যক্তিকেও সামাজিক বিস্মৃতির গহ্বরে ঠেলে দেয়। সোভিয়েত ভাঙনের আগের দশকে একটি নিষ্পেষিত প্রদেশের রাজনৈতিক ভাষ্য হয়ে ওঠে-

Four years later Clementis was charged with treason and hanged. The propaganda section immediately airbrushed him out of history and, obviously, out of all the photographs as well... It is 1971, and Mirek says that the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. (Kundera 1981, 3)

বিস্মৃতির বিরুদ্ধে এই স্মৃতির সংগ্রাম রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপের এক উল্লেখযোগ্য আখ্যানবিষয়। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে রণজয়ও এই ভুলিয়ে দেওয়ার শাসক-সংস্কৃতির

বিরুদ্ধেই যুদ্ধ জারি রাখে। আর, এখানেই মনে রাখা জরুরি যে, এই স্মৃতির সংগ্রাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্মৃতির অ্যালবাম খুলে বসা নয় কিংবা স্মৃতিরোমন্থনের রোম্যান্টিক তাগিদ নয় বরং এই স্মৃতি ‘সমষ্টিগত’ বা কালেক্টিভ মেমরির অন্তর্গতী বয়ান। কুন্দেরার উপন্যাসে ফোটোগ্রাফ বা ছবি এক বিশিষ্ট মোটিফ হিসেবে বারবার ফিরে আসে। কখনও শাসক ‘ছবি’কে ব্যবহার করে আবার কখনও সেই ছবিত অন্তঃসলিলা বয়ানে বিরুদ্ধ-প্রতর্কের সন্ধান দেন। পাঠককে খুঁজে চলতে হয়, স্মৃতি-রাষ্ট্র-ইতিহাসের জটিল দ্বন্দ্ব। হানা পিশোভা তাঁর ‘The Art of Memory in Exile’ বইতে কুন্দেরার স্মৃতি-হাতিয়ার নিয়ে লিখছেন,

Photography becomes the focus of Kundera’s exploration of the importance of cultural memory, of the necessity of holding on to memories of the history of one’s nation, as well as the rich culture one inherits. This bridge to the past is at risk when a writer is forced into exile, far from the sustenance of his native shore; it is equally jeopardized within a totalitarian regime, where questioning the versions of the past that are promoted by those in power, although dangerous, is crucial. (Pichova 2002, 88)

সমষ্টিগত স্মৃতিপথ বা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক স্মৃতিছবি যতই মুছে ফেলা যায়, ততই দমনমূলক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য জোরদার করতে পারে শাসক। ঔপনিবেশিক, নব্য-ঔপনিবেশিক কিংবা স্বেচ্ছাসিদ্ধ দেশীয় শাসক এই পদ্ধতির পুনঃপ্রয়োগেই দখল ক’রে নিতে চায় শাসিতের মনোভূমি। দখলীকৃত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি যত দ্রুত মুছে দেওয়া যায়, তাদেরকে যত দ্রুত ইতিহাসবোধহীন ক’রে দেওয়া যায় ততই শাসনব্যবস্থা জমকালো হয়ে ওঠে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে রণজয় বিশ্বব্যাপী প্রসারণশীল বিশ্বায়ন-উদারনীতিকরণের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ জারি রাখে। কারণ, ওই বিশ্বায়নী মতাদর্শ ক্রমেই ষাট-সত্তর

দশকের বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহ, উপনিবেশমুক্তি ও জনগণের বহুত্বসব উদ্‌যাপনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ভুলিয়ে দিতে চায়। রণজয়কে পুলিশ অত্যাচার ক’রে ‘পাগল’ করে দিলেও, রণজয় কিছুতেই ভোলে না রুশ বিপ্লবের খুঁটিনাটি ইতিহাস, চিনের বিপ্লবের প্রতিটি কাহিনি নিখুঁত ভাবে বলে দিতে পারে সে। অথচ, মনে রাখতে পারে না সে যে দশকে এখন অবস্থান করছে, সেই দশককে। নাকি, রণজয় ইচ্ছে করেই এই দশককে ভুলে যেতে চায়? ’৭০ দশক পরবর্তী ঐ যে নিরাজনীতিকরণের রাজনীতি, সেও তো দ্রোহস্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতেই চায়, বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রতিস্পর্ধী গল্পগুলোকে ভুলিয়ে দিয়ে শাসকের মনগড়া বিপ্লবহীন সংস্কৃতির স্মৃতি পুরে দিতে চায় শাসিতদের মাথায়। তাই কি রণজয়ের প্রত্যাখ্যান? দ্রোহদশকের স্মৃতি দিয়েই ’৯০ দশকের স্মৃতিবাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান? কুন্দেরা ‘ফোটোগ্রাফ’-কে ব্যবহার করেছেন স্মৃতির ধারক ও হাতিয়ার হিসেবে; নবাবরণ ব্যবহার করেন বিভিন্ন কাহিনি, কিংবদন্তী ও বই। রণজয়ের স্মৃতিতে থেকে যায় ’৭০ দশকের শুরুতে মাটিতে পুঁতে রাখা একটি রাইফেল। সশস্ত্র বিপ্লব ছিল চলছে এবং চলবে- স্মৃতির সেই রাইফেল খুঁজতে অ্যাসাইলাম থেকে পালায় রণজয়। রাইফেল শুধুমাত্র এই আখ্যানের মূল প্রতীক নয়, রাইফেল হয়ে ওঠে স্মৃতিযোদ্ধা রণজয়ের হাতিয়ার; রণজয়ের স্থানান্ত্রে কোথাও নকশালবাড়ি দ্রোহের ব্যর্থতা নেই। সত্তর দশক পরবর্তী নব্য-অর্থনৈতিক সময় সেই লুকিয়ে রাখা রাইফেলের ওপরে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছিল। এ তো স্মৃতির পরাজয়। ফ্ল্যাটবাড়ির তথা রিয়াল এস্টেটের অমোঘ সংস্কৃতি দিয়ে দ্রোহের সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে রাখা। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জার্নাল সত্তর’ এরকমই এক স্মৃতির আখ্যান; ‘আত্মজীবনীমূলক’ আখ্যানে স্মৃতিকথনই থাকে, কিন্তু রাঘবের স্মৃতিকথন গ্যাদগ্যাদে স্মৃতিকামুকতার আখ্যান হয় না বরং তার কেন্দ্রে থাকে সত্তর দশকের রাজনীতি, তার প্রস্তুতিমূহূর্ত এবং রাজনৈতিক ‘কমরেড’দের মিলিত আখ্যান- বিদ্রোহ দমনের পরে শাসক যেসব কথা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল, জেগে থাকে সেই সবই। ‘জার্নাল সত্তর’-এ পুলিশের আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে রাঘব শাসকের সঙ্গে শাসিতের স্মৃতি ও সংস্কৃতির সংঘাতের উল্লেখ করেন। কুন্দেরা বা নবাবরণের মতো নয়, বরং

রাঘবের এই স্মৃতি ও সংস্কৃতির উল্লেখ ‘মধ্যবিভ’-র চেননপরিসর ধরে এগোয়। যে অতীত কথকের শ্রেণি-অবস্থানের উৎস, যে স্মারক ‘ভদ্রলোক’-শিক্ষিতর প্রতীক হয়ে উঠেছে শতকব্যাপী- তাকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করে নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় বাহিনী (ISA)।

উনিশ শতকী, সাহেবি ফার্নিচারের স্মৃতিসমৃদ্ধ বইঠাসা আলমারিটির এই লাঞ্ছনার কথাই প্রথম মনে পড়ল... ভোররাতে আমার খোঁজে এসে সাত-আট জন সাদা পোশাকের পুলিশ কেন যে ওই আলমারিটার ওপর তাদের সমস্ত সন্দেহ, তদন্ত ঘনীভূত করেছিল আমার জানা নেই। ওরা চলে যাওয়ার পর বইয়ের আশ্রয়-কাঠামোটি খুলে পড়েছিল। বই-কাগজপত্র- কোনো কিছুই চিহ্নটুকু রাখেনি... যদি কিছু টুকরো কাগজ, ডায়েরির ছেঁড়া পাতা, বিপ্লবী চটিবই দু-একখানাও থাকত। স্মৃতিনাশ ঘটাতেই যেন সব তথ্য, চিহ্ন, সাক্ষ্য লোপ করা হয়েছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, ১৭৫-৬)

বইয়ের আলমারি ও স্মৃতিনাশের ইঙ্গিত কি কূটাভাস? ওই বইয়ের আলমারির মধ্যবিভ-দোদুল্যমান শ্রেণি-অবস্থানের বিরোধিতা তো নকশাল রাজনীতিই করেছিল। পুলিশ যে এই ‘স্মৃতিনাশ’ ঘটাতে চায়, তা নকশালদের তাত্ত্বিক অবস্থানের প্রতি প্রবল হিংসাত্মক মনোভাব থেকেই। আর, এর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে কথকের নিজস্ব শ্রেণিবোধ, যাকে ভাঙ্গার একেকটা পদক্ষেপ কথক এরপর বিবৃত করতে থাকেন। “আমরা তো কত বস্তিতেই না থেকেছি, কোথাও, কখনও, কারও ঘরে এরকম আলমারি দেখিনি” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫) কারণ এই ‘আলমারি’, বইয়ে ঠাসা এই আলমারির জন্যেই যেমন তাঁর ভদ্রলোক অবস্থান (বস্তির বাকিদের থেকে আলাদা) তৈরি হয়েছে, তেমনই এই আলমারির বইগুলোই তাঁকে শ্রেণিবিচ্যুত হওয়ার সংগ্রামী রাজনীতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এগুলোর সঙ্গেই জুড়ে থাকে রাষ্ট্রকর্তৃক স্মৃতিবিলোপের চেষ্টা। কিন্তু, দ্রোহের স্মৃতি যে রাষ্ট্র চাইলেই বিলুপ্ত হয়ে যায়না, বরং সামান্য থেকে সামান্যতর হলেও তা ছাইচাপা থেকে যায়, ‘জার্নাল সত্তর’-র শব্দ-বাক্যে তা জানান দেওয়া থাকে। জর্জ অরওয়েলের ‘নাইন্টিন এইটিফোর (১৯৪৯)’ উপন্যাসে শাসক ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

করে। শোষিত ব্যক্তির স্মৃতিপথে থাকা বিরুদ্ধতার সব চিহ্ন মুছে দেওয়া, মগজধোলাইয়ের সব উপাদান সমাজে চালু করা- রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ অনুযায়ী অতীতের পুনর্নির্মাণ করার পদ্ধতি শাসনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

And if all others accepted the lie which the Party imposed- if all records told the same tale- then the lie passed into history and became truth. 'Who controls the past,' ran the Party slogan, 'controls the future: who controls the present controls the past.' And yet the past, though of its nature alterable, never had been altered. (Orwell Ebook, 44)

শাসিতর বয়ান, বিজিতর বয়ান যাঁরা আখ্যানবদ্ধ করছেন, অতীতকে ভুলে যেতে না-দেওয়া তাঁদের লিখনপদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট থাকে। 'স্মৃতি'কে জেগে থাকতে বলার, হারিয়ে না যেতে দেওয়ার আরেক আখ্যান কল্লোল লাহিড়ীর 'গোরা নকশাল (২০১৭)' উপন্যাস। কথক তাঁর স্মৃতি হাতড়ে গোরা নামক এক নকশাল ব্যক্তিকে ও তাঁকে ঘিরে থাকা মানুষদের যেমনভাবে দেখেছেন, সেই আখ্যান বলেন। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ আপাতস্তিমিত হবার পরে বামফ্রন্টের শাসনকালেও অব্যহত থাকে শোষণ, প্রায়-অপরিবর্তিত থাকে শোষণকাঠামো। দ্রোহচেষ্ठाও জারি থাকে। এই উপন্যাসে সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ছবি না-পাওয়া গেলেও, কথকের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথনে কিছুটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অনিরপেক্ষ আখ্যান হয়ে ওঠে; তবুও, এই উপন্যাস ব্যক্তিপ্রতিমাসংক্রান্ত শুধুমাত্র নয়। বিপ্লবের উত্তরদায়বদ্ধতা উত্তরপ্রজন্মের হাতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে যেতে থাকে- স্মৃতির ভেতর, আন্দোলিত সময়ে দ্রোহকামী-তবু-মৃত চোখের ভেতর স্বপ্ন প্রবাহিত হতে থাকে।

বাড়ি চলে যাও টুকনু। আর ভুলে যেও না তুমি সুশান্তকে দেখেছিলে। ভুলে যেও না তোমার সুশান্তকে কারা যেন মেরেছিল... আমাকে খুঁচিয়ে মনে করাবে কতদিন আগে

গঙ্গার ঘাটে পড়ে থাকা এক লাশের কথাকে। আমাকেও হাঁটতে হবে স্মৃতির মিছিলে।

বলতে হবে সুশান্ত ভুলে যাইনি তোমাকে। অনেক রাতে দাদা এসে বলবে চারু মজুমদারের এই বইটা পড়েছিস ভাই? আর ঠিক তখনি কোথাও যেন চটকলের খুন হয়ে যাওয়া চৌকিদারের বিধবা বৌ এগিয়ে আসবে। সুশান্তর সেই ভিজে গায়ের ওপর হাত বোলাবে সে। তারপর বলে উঠবে “ঠাণ্ডা লাগছে আমার বাবুয়ার...। ওর ঠাণ্ডা লাগছে।” কেউ এসে সুশান্তর গায়ের ওপর বিছিয়ে দেবে একটা লাল রঙের পতাকা।

(লাহিড়ী ২০১৭, ৫০-১)

এই উপন্যাসেও পণ্যসাহিত্যের রীতিমতো ‘রাজনীতি’কে ক্রমেই নিরাজনীতিতে বদলে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। রাজনীতির প্রতি মধ্যবিত্ত-পাঠকমনকে বিকর্ষিত করার যাবতীয় শিল্পপ্রয়াস করা হয়নি। বরং স্মৃতির ভেতর দিয়ে রাজনীতি এসেছে, কংগ্রেস আমল থেকে বামফ্রন্ট আমল হয়ে শাসক-রাজনীতি এগিয়েছে এবং তার বিরোধভাসে দশকান্তরে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে প্রতিরোধী রাজনীতি। গোরা নকশাল ভুল না ঠিক এই বৃথা কালক্ষয়ের তাত্ত্বিক ঘোরপ্যাঁচে না গিয়েও কল্লোল লাহিড়ী নিরাপদ মধ্যবিত্তের সংশয়ের সঙ্গে চলমান রাজনীতির দ্বন্দ্বকে মেলাতে পেরেছেন; তাঁর স্মৃতিকক্ষের ওই ‘গোরা’ নামক নকশালের প্রতি পক্ষপাত রেখেই।

উপরে আলোচিত প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই আধুনিক রাজনৈতিক কূটাভ্যাসে নিষ্পেষিত মানবসত্তার সংগ্রামের কথা লিখছেন। ব্যক্তি ও রাজনীতির পারস্পরিক প্রভাবমূলক আন্তঃসম্পর্কের প্রকাশ ঘটছে নতুন নতুন আখ্যানপদ্ধতির মাধ্যমে। ভারতীয় এবং বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়গত মস্ত বদল ঘটছে কারণ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়পর্ব শেষ হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুক্তিচেতনার জাগরণ, কোনও রাজনৈতিক কিংবদন্তীকে নিয়ে আখ্যান এবং বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে ‘দেশি’ প্রতিবাদসমূহের দ্বন্দ্বসমূহ নিয়ে আখ্যানের প্রয়োজন শেষ হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই। জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতাপর্বের ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহে গান্ধীবাদী বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ও

নবচেতনার জাগরণ আহ্বান ক’রে উপন্যাস নির্মাণ চলছে। মূলক্ রাজ আনন্দ ‘আন্টাচেবল্ (১৯৩৫)’ কিংবা ‘কুলি (১৯৩৬)’ উপন্যাসে ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণ ও শ্রমজীবী মানুষের কথা বলার চেষ্টা করছেন; তাঁদের ওপরে শোষণ, উচ্চবর্ণ-উচ্চশ্রেণির অমানবিক ব্যবহার ও শোষণের কথা বলছেন। স্বাধীনতাকামী ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিমুক্তি যতক্ষণ না হচ্ছে ব্যক্তির শোষণমুক্তির দিশা যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছে, স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না- এই বক্তব্যকে উপন্যাস-শিল্পের আগুবাঁক্য করতে চাইছেন মূলকরাজ, ’৩০ দশকে। কিন্তু, এই উপন্যাসের কথন এবং ভাবনাপরিসর উচ্চশ্রেণি-উচ্চবর্ণের দৃষ্টিকোণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই রাজনীতি ভারতীয় সমাজকাঠামোকে ‘শুভবোধ’-এ উত্তরণ ঘটাতে চায় মাত্র। সমাজের ওপরতলার ভদ্রলোকবৃন্দের করুণাদৃষ্টিতে দেখা নিম্নবর্ণের আখ্যান; তাদেরই মনমতো চরিত্রদের ক্রিয়া-আচরণ-আকাঙ্ক্ষা। রাজা রাওয়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু মোহনদাস গান্ধী- ‘কণ্ঠপুরা (১৯৩৮)’ উপন্যাসে ’৩০ দশক জুড়ে গান্ধীর সমস্ত আন্দোলনের কাল্পনিক আখ্যান রয়েছে, তৎকালীন দশকের ইতিহাসের উপস্থাপনা। ঔপনিবেশিকদের ইতিহাস ও আখ্যান রচনার ধারা, ভারতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিতে চাইল ‘কণ্ঠপুরা’। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর ‘জাগরী (১৯৪৩)’ উপন্যাসে এই সময়ের রাজনীতিরই প্রকাশ ঘটানেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বহুমাত্রিক রঙ, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সংঘাত- এই উপন্যাসের উপজীব্য। সতীনাথ এই উপন্যাসেই ব্যবহার করলেন ‘চেতনাপ্রবাহরীতি’ পদ্ধতি, আখ্যানের প্রতিটি কুশীলব তাঁদের চিন্তাচেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করছে। কথকের কাজ শুধু সূত্রায়িত করা। যদিও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম প্রয়োগ করছেন, কুশীলবেদের জবানিতে আখ্যান বর্ণিত হচ্ছে এবং গতি পাচ্ছে। সতীনাথ কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট- এই তিন মতাদর্শের প্রেক্ষিতে একটি জেলবন্দি পরিবারের রাজনৈতিক চেতনা ও সক্রিয়তার কথা বলছেন। যদিও, তাঁর পক্ষপাত কংগ্রেস-সোশ্যালিস্ট মতাদর্শের প্রতি; নীলুর কমিউনিস্ট রাজনীতিবোধ ‘জাতীয়তাবোধের শত্রু’ বলে বিবেচিত হয় এবং পরাজিত হয় বিলুর মানবিক

রাজনীতিবোধের কাছে; লেখকের উদ্দেশ্য একেই প্রতিষ্ঠিত করা এবং অবশ্যই পাঠককে প্রভাবিত করা।

‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়ে উপস্থিতি থাকে মোহনদাস গান্ধীর। অদৃশ্য উপস্থিতি, অর্থাৎ, সশরীরে কোথাও তিনি নেই কিন্তু তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলির আচরণে-উৎসবে-রাজনীতিবোধে, ’৪০ দশকের রাজনীতিতে জারিত বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের জনগণের আকাজ্জায় তিনি থাকেন। তাই, গান্ধী কখনও হয়ে ওঠেন ‘গানহী বাওয়া’ কখনও বা অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতাকাঠামো দখলের মতাদর্শগত হাতিয়ার। কখনও এই ‘গানহী বাওয়া’ নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবর্ণের পরিচিতির চিহ্নায়কও হয়ে যায়-

বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মুরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কী করা যায়? এরকম করে তো গানহী বাওয়াকে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার... থানে কুমড়োটোর পুজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে... সেদিন এরকম একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে, বাওয়া সকলের সম্মুখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিল। মালা গলায় দিলেই সে হয়ে যাবে ‘ভকত’। আর কেউ তাকে ঢোঁড়াই তাৎমা বা ঢোঁড়াই দাস বলতে পারবে না। (ভাদুড়ী ১৩৮৮ সাল, ২৮)

ঢোঁড়াইয়ের সামাজিক পরিচিতির উত্তরণ ঘটে গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনে, তাৎমাদের মধ্যেও এক স্বতন্ত্র পরিচিতি, গলায় কর্ণি। গানহী বাওয়ার মন্ত্র পড়া হয়, গানহী বাওয়া দেবতার আসন পায়। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে ‘মোহনদাস গান্ধী’ আইকন, প্রতিমাসম ব্যক্তিত্ব। কিংবদন্তী ও অলৌকিক বিশ্বাস মিশে যায় লৌকিক চরিত্রের সঙ্গে। গানহী বাওয়ার নাম আবিষ্কার করা যায় বেলগাছের পাতায়, গানহী বাওয়ার নামে ঘটির জল বেড়ে যায়। তাৎমা-ধাঙড়দের ‘গানহী বাওয়া’র মূর্তি আবিষ্কারের মতোই ভারতীয় রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন সতীনাথ; আইকন-প্রেম। যা কিছু আদর্শের সঙ্গে, নৈতিকতার সঙ্গে কিছুদূর

মেলে, যার নেতৃত্ব জনতোষী তাকে ‘দেবতা’সম মহিমময় বানিয়ে দেওয়া। ভারতীয় রাজনীতিতে এই আইকন-প্রেম এখনও চলছে আর ঢোঁড়াইদের মতো মোহভঙ্গের ইতিহাসও তাই বর্তমানে বারবার ঘটে। আর, এরই সঙ্গে থাকে রেবণগুণী- ওই কুমড়োয়-গানহী-বাওয়া মেলায় প্রদর্শন ক’রে লোকেদের থেকে পয়সা তোলে সে। আখ্যান যতই এগোয় পাঠক আবিষ্কার করে প্রত্যন্ত জিরানিয়া-তাৎমাটোলির আর্থ-সামাজিকতার সঙ্গে দেশের রাজনীতি জুড়ে যাচ্ছে। লাডলীবাবু ও অন্য বাবুসাহেবরা রেবণগুণীর মতোই গানহী-ভগবান বা মহাৎমাজীর আদর্শ ভাঙিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছে আখের; ব্রিটিশ শোষকের চেহারা পাটে যাচ্ছে দেশি বাবুদের চেহারা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এই চল্লিশ দশকের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতকেই ধরতে চেয়েছেন ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ উপন্যাসে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের স্বার্থের সংঘাত ও কংগ্রেসের ভেতরেই হিন্দু মহাসভা দ্বারা প্রভাবিতদের সঙ্গে ‘বেঙ্গল কংগ্রেস’-এর প্রতিনিধিদের সংঘাত- যার চূড়ান্ত পরিণতি বাংলাভাগ। রাজশাহী টাউনের উচ্চবর্গীয় মুসলমান প্রতিনিধিদের কথোপকথনে উঠে আসে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের এই দ্বন্দ্ব-

ছোটোমিয়াকে জুতমতো ধরা গেছে এমন ভাব করে ডাক্তার।, ‘ফেমিনের সময় বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চাল চাইলো বিহার গভর্নমেন্টের কাছে, হিন্দু ডমিনেটেড কংগ্রেস গভর্নমেন্ট না করে দিলো। এখানকার হিন্দু লিডাররা পুরো সায় দিলো বিহারকে। ওয়ারের নাম করে ব্রিটিশ সব চাল গায়েব করে দিলো। বদনাম হলো মুসলিম লীগের। পাকিস্তান হলে হেলপ করবে গোটা ইন্ডিয়ার মোসলমানেরা।’ (ইলিয়াস ১৯৯৭, ৯৬)

কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জন্মলগ্ন থেকে এবং বিশ শতকের শুরুর দুই দশকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিমদের বহু দাবিদাওয়া আশাআকাঙ্ক্ষায় কর্ণপাত করেনি। চল্লিশের দশকে বাংলা প্রদেশের মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে ‘ভদ্রলোক’ হিন্দুদের বিপন্নতা সামাজিক পরিসরে ও রাজনীতিতে মুসলিম

লিগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক টানাপড়েন বাড়িয়ে দেয়। হিন্দু-অধ্যুষিত কামারপাড়া আর মুসলিম-অধ্যুষিত মাঝিপাড়া একে অপরকে হিংসাত্মক আক্রমণে জড়িয়ে পড়লে ১৯৪৭ সালের সেই ভাঙ্গনমুহূর্তে গোলাবাড়ি হাটে এক সভার আয়োজন হয়- কংগ্রেসের শহুরে বড় নেতা সুরেন সেনগুপ্ত এবং মুসলিম লিগের স্থানীয় নেতা ইসমাইল, আজিজ তাতে উপস্থিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার সেই সভায় জনগণের সামনে গান ক’রে কেরামত আলি। এই কেরামত আলি তেভাগা কৃষক-আন্দোলন দেখে গান বাঁধা কবি, চেরাগ আলির রেখে যাওয়া খোয়াবনামা-র শোলোকভাষা খুঁজে ফেরা কবি। কেরামতের গানে কংগ্রেস বনাম লিগের হিংসা এবং সম্প্রীতির আহ্বান থাকে, খেয়াল রাখা দরকার এই সম্প্রীতির আহ্বান কেরামত আলি পাচ্ছে কমিউনিস্ট অজয় দত্তের থেকে; কংগ্রেস ও লিগের তাবড় নেতারা তখন বিভাজনের অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণে বৃন্দ। কেরামত ‘গান্ধি-জিন্নার মিলন’-এর খোয়াব দেখে বলে, “ইসমাইল সাহেব তেভাগার নেতাকে লিয়া আসিছিলো, অজয়বাবু, কী সোন্দর কথা কয়া গেলো, শুনিছিলেন? গান্ধি-জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই” (ইলিয়াস, ২৪১) আর, কেরামতের গানের কথাও ভরা জনসভায় এই আকাজ্জার পুনরাবৃত্তি করে। কেরামতের গান সুরেন সেনগুপ্তের মতো বাগ্মীতা ভরা নয় কিংবা আজিজের মতো ক্ষমতাশালীর স্বর নয়- তবু, লোকগীতির সুরে তেভাগার গানের আদলে এই গান গায় কেরামত-

মুসলিম লীগে ভারতবর্ষে যাহা দাবি করে/ পাকিস্তান করিবে তারা লেখ্য অধিকারে।।

কংগ্রেসিরা বলে তাহা নাহি দিব ছাড়ি/ এই বলিয়া দুইটি পাড়ি করে মারামারি।।

কাঁচা ফলে কিল মারিয়া নষ্ট করলো বেদানা/ লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেল না...

চিরযুগের দুষ্টি মোরা হিন্দু মোসলমান। স্বাধীন পাবো আশা করি হতেছি বিরান।।

এই দেশ আমার এই দেশ তোমার আর গুণগোল কইরো না। লীগ কংগ্রেসের হিংসা

কেন গেল না।। (ইলিয়াস, ২৪২)

এই গানের ভেতর যে আকাজ্জা⁴⁸, তা সুরেন সেনগুপ্তের নয়, গান্ধির নয়, জিন্নার নয়, আজিজ-ইসমাইলেরও নয়; এই আকাজ্জা কৃষিজীবী নিপীড়িত মানুষের যারা ‘চিরকালের দুষ্কি’। দেশ বিভাজন কিংবা কংগ্রেস-লিগ খেয়োখেয়ি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাদের মুক্তির আকাজ্জা বুঝতে পারেনি কখনও। কেরামত এই গানের বিষয়বস্তু পায় তেভাগা আন্দোলন থেকে আর ভাষা পায় ছেঁড়াখোঁড়া ‘খোয়াবনামা’ থেকে। উপন্যাসের রাজনৈতিক পাঠ ক্রমশঃ যে অভিমুখে চালিত হয়, তাতে তেভাগার স্বপ্ন এবং ‘খোয়াবনামা’ বইটি দুইই হারিয়ে যায়। ‘খোয়াবনামা’ কেরামতের থেকে ছলে-কৌশলে নিয়ে নেয় জোতদার শরাফত মণ্ডলের ছেলে আজিজ। আজিজ কিন্তু কেরামতের মতো শোলোক-অনুসন্ধানী নয়, চেরাগ আলির ভাসিয়ে দেওয়া মজনু-ভবানীর ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের বিয়োগান্তক শোলোক তার অন্বিষ্ট নয়; আজিজ ওই তাবিরনামা নেয় ধর্মীয় গোঁড়ামি বশতঃ, কুসংস্কারের বিধান হিসেবে। ক্রমশঃ ’৪০ দশকের শেষার্ধ্বে উপমহাদেশের রাজনীতিও তো এই ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর ছল-কৌশলের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ‘হিংসা’ পরিণতি পায় বাস্তবে, দুষ্কি হিন্দু-মোসলমানের আকাজ্জা নয়।

‘মধ্যবিত্ত’ সংজ্ঞায়ন ও বাংলা সাহিত্য-

নবাবুণের গল্প বা উপন্যাসে যে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থাকে ’৮০ বা ’৯০ এর দশকে, তারাও কিন্তু ঠিক এই কারণেই বোধহয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। কখনো খুব লীন ভাবে কখনো বা দৃঢ় ভাবে। আর, নবাবুণ যে বারবার লেখকের ‘নৈরাজ্যবাদী স্পর্শক’ ছুঁয়ে থাকার কথা বলেন, তাও কিন্তু এইজন্যেই। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের জন্মলগ্নে যে বিষবৃক্ষের বীজ ছিল, তা মহীরুহ হয়ে ওঠে ’৯০ দশক থেকে। নয়া-উদারনীতি, বাজার-সমাজতন্ত্রের দাপটে ক্রমশঃই যে নিম্নবিত্তের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়ে এবং যে ‘মধ্যবিত্ত’ শ্রেণিটি নিম্নবিত্ত হওয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়তে থাকে বাজার-অর্থনীতির নিয়মে তা স্পষ্ট করতে থাকেন নবাবুণ। ‘পাঁচুগোপাল’, ‘ফোয়ারা’ কিংবা ‘কাল্মন ও মোগলাই’ গল্পের চরিত্ররা সমাজের

মূলস্রোতে টিকে থাকতে বেগ পায়। কারণ, বাজার অর্থনীতি তাদের ভোগক্ষমতা বা ভোগ্যপণ্যক্রয়ের অতিনিমিত্তকে ঠাই দেয়না। তারা প্রান্তিক হতে থাকে। দীপেন্দ্রনাথের মণিমোহন বা বিনয়ভূষণদের মতো অসহায় অবস্থানে একলা দাঁড়িয়ে থাকেন নবাবুগের ‘বিকল্প রণনীতি’ গল্পের মহীতোষ। কারণ, তিনি না ছেড়ে আসতে পারেন তাঁর এতদিনের মূল্যবোধ আর না মেনে নিতে পারেন তাঁর উত্তরপ্রজন্মের পিছিয়ে পড়া। আপোষ করতে পারেন না। নবাবুগের ‘সব শেষ হয়ে যাচ্ছে (২০০৪)’ গল্পে ধরা থাকে অনিবার্য অবক্ষয়। অথবা, এই গল্পগুলোর চরিত্রনির্মাণ ও ভাষার মধ্যেই থেকে যায় তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সংলাপও। প্রান্তিক হতে হতে, প্রত্যাখ্যাত হতে হতেও আচমকা বিস্ফোরিত হওয়ার স্বপ্ন।

মধ্যবিত্ত কে বা কী? তার সংজ্ঞা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই সংজ্ঞা নির্ধারণ সোজা নয়, কারণ, ‘মধ্যবিত্ত’ দোদুল্যমান এবং বিত্ত-অর্থনীতিতে ভাসমান একটি শ্রেণি। তবু, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ২০০৪-০৫ এ ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করছে এইভাবে- “India’s middle class lives barely or not far above India’s poverty line, and below international poverty lines, especially in the rural areas.”⁴⁹ আর, বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ এমনকি ভারতের অর্থমন্ত্রকের প্রাক্তন পরামর্শদাতা অশোক লাহিড়ীও ‘মধ্যবিত্ত’ শ্রেণিকে মাপছেন ভোগ্যপণ্যের মাপকাঠিতে। ক্রয়ক্ষমতা যত বেশি, ততই ভোগ্যপণ্য ক্রয় বেশি করবে সে। তাই, অশোক লাহিড়ীর মতে,

In the 1960s and early 1970s, it was difficult to find a variety of quality refrigerators, toasters and electric irons in the market. The “aspirers” – just above the poverty line – such as small shopkeepers, marginal farmers, and semi-skilled workers, did not have much to aspire for. In such a milieu, the Indian middle class could not

compete with the growth of its counterparts in East Asian countries such as Korea and Taiwan. (Lahiri 2014, 37-44)

অর্থাৎ, বিশ্বায়নী সংস্কৃতি এবং উদারনীতি প্রবর্তনের আগে অবধি ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উন্নয়নের সূচক হিসেবে গণ্য করা সমস্যার ছিল। কিন্তু, উদারনীতি ও খোলা-বাজারের অর্থনীতি মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা ও ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য তৈরি করল যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ‘Development’s secret weapon’ বলছেন অর্থনীতিবিদ ভাল্লার। আর, তার কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন,

given the [middle class’s] belief in meritocracy, as well as ways of getting ahead the old fashioned way, the middle class should help engineer growth by being at the forefront of innovation, and adoption of advances in technology, regardless of whether this technology was foreign owned or domestic. Middle class should be associated with increased openness, increased foreign trade etc.... if anything defines the middle class, it is its higher propensity to save and invest. This higher savings leads to higher investment, and the middle class tries to ensure that the growth is efficient. The virtuous cycle continues, savings increase further, as does investment and GDP growth. (Bhalla 2007, 94-107)

মধ্যবিত্তের এই সঞ্চয়-প্রবণতা, নিরাপদ-নিশ্চিত জীবনের হাতছানি এবং আগামীকালের জন্যে পুঁজিসঞ্চয়ে বর্তমানকে কাটছাঁট করার পাশাপাশি থাকে মূল্যবোধ, সংস্কার ও রক্ষণশীলতার প্রায়োগিক যাপন। বিশ্বায়নী সংস্কৃতি ভারতীয় মধ্যবিত্তের সামনে খুলে দিল নতুন অর্থনৈতিক

দিগন্ত, ক্রমেই আরও স্টেটাসচেতনতার দিকে এগিয়ে দিল কিন্তু রেখে দিল সংশয়, ভয় এবং পণ্যমুখী হয়েও প্রতিমুহূর্তের সামাজিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়ের বোধ। ভাঙ্কার মতো অর্থনীতিবিদরা মূলতঃ মধ্যবিত্তের ‘মেধা’ এবং ক্রয়ক্ষমতাকে পুঁজি করে এবং লগ্নিপুঁজির বিনিয়োগকে আশ্রয় করে ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজকে অর্থনীতির প্রধান আশা হিসেবে দেখছেন। এই অবস্থান থেকে দেখলে, দীপেন্দ্রনাথের দেখা প্রাক-বিশ্বায়ন যুগের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি নবায়নের সময়ে পালটে যাচ্ছে। পাল্টাতে বাধ্য। কিন্তু, দীপেন্দ্রনাথ তার আগাম ইঙ্গিত দিয়ে রাখছেন। একজন সাহিত্যিক এবং মার্ক্সীয়-চিন্তক হিসেবে সূত্রগুলো লিখে যাচ্ছেন। আর, নবায়ন সেই বেড়ে ওঠা সমস্যা ও বদলে যাওয়া মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি নিয়ে লিখছেন। ‘টয়’ গল্পের চরিত্ররা, কিংবা, ‘আংশিক চন্দ্রগ্রহণ’ ইত্যাদি গল্পে আপাতঃসুখী এবং আপাতস্বচ্ছল মধ্যবিত্তের ভিতরের ভাঙ্গন দেখাচ্ছেন। টয় গল্পের মিথিল-মিমিরা কিন্তু ওই মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত এবং স্বচ্ছল-মধ্যবিত্ত অংশেই রয়েছে; জনসংখ্যার যে অংশটাকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনৈতিক ‘প্রগতি’-র স্বপ্ন দেখে সংসদীয় প্রশাসক-রাজনীতিকেরা। তারা বিদেশী ম্যাগাজিন পড়ে, তারা আপডেটেড, তারা তারকোভস্কির চলচ্চিত্র দেখে এবং পারিপার্শ্বিক বৃত্তটাকে অতিস্বচ্ছল আর্থ-সংস্কৃতিতে সাজিয়ে নিতে চায়। “With its aspirations and capacity for delayed gratification, the middle class is more likely to invest in education and other sources of human capital, which are vital to prosperity”⁵⁰ মিথিল-মিমির ছেলে টয় ঠাণ্ডামাথায় অ্যাকোরিয়ামের মাছ খুন করলেও, তারা আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে, ছেলে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্তের নির্লিপ্ত মানসিকতার, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নবনির্মাণ হয় না কি এই গল্পে?

গোটা বিশ্বজুড়েই শ্রেণিবৈষম্যের আধুনিক গোলকায়িত রূপ স্পষ্ট হচ্ছে। খোদ আমেরিকার মতো ‘উন্নত’ ও প্রথম বিশ্বের দেশে ১৯৭৯-২০১২ সালের মধ্যে ১% ধনীর আয় বেড়েছে ১৮০.৯%। কিন্তু, বাকি ৯৯% মানুষের আয়বৃদ্ধি হয়েছে ২.৬%। তথ্যবিস্ফোরণের যুগে আমরা

জানি সহজ সাধারণ কিছু হিসেব- ১০% ভারতীয় ধনীর কাছে গচ্ছিত আছে দেশের ৭৭% সম্পদ এবং বছরজুড়ে আয় হওয়া ৭৩% সম্পদ যায় মাত্র ১% ধনীর ঘরে যেখানে ৬৭ মিলিয়ন ভারতীয়ের ঘরে মাত্র ১%। প্রতি বছর প্রায় ৬৭ মিলিয়ন ভারতীয় শুধুমাত্র চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যয়ের কারণে ‘গরিব’ তকমায় ঢুকে পড়ে^{৫১}। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ভারতরাত্ত্রের আর্থিক বাজেটের থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ রয়েছে মাত্র ১৩০ জন বিলিওনেয়ারের হাতে। ভারতীয় অর্থনীতির এই বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু না থাকলে সন্দর্ভে উল্লিখিত সময়পর্বের (১৯৭৩-২০০৩) রাজনৈতিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা সমস্যার। দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, নবাবুণ ভট্টাচার্য তাঁদের উপন্যাস-গল্পের সময়পর্বে এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এড়িয়ে যাচ্ছেন না, বরং এই বৈষম্যের রাজনীতির সঙ্গে জারিত ক’রে নিচ্ছেন তাঁদের নির্মাণকে। নবাবুণের গল্পে ‘চীন ২০০২’, কিংবা, ‘কড়াই’ ইত্যাদি গল্পে এই চিত্রগুলো স্পষ্ট হচ্ছে।

সারা দিনে ত্রিশ ইউয়ান রোজগার হয়েছে দিং-এর। দিং তার মাস্কাতার আমলের সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছে। অনেকটা পথ... গলায় জড়ানো রয়েছে গিঁট বাঁধা নাইলনের দড়ি। রাস্তায় সে বাজার থেকে সবজি কিনে নেবে। পাশ দিয়ে তাকে টপকে চলে যায় বুইক, ক্রাইসলার, টয়োটা, ডজ, জেনারেল মোটরস্- সাংহাই। বিশ্বের নানা পণ্যের ঝকঝকি দোকানের আলোতে দেখা যায় দিং ফিরছে তার সাইকেলে। তেষটি বছর বয়স। (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৪৬)

এই দিং উন্নত ও বাজার-অর্থনৈতিক চীনে প্রান্তসীমার মানুষ। চীনের শিয়ান স্টেশনে অন্য কুলিদের সাথে রীতিমত মারামারি ক’রে মোট বওয়ার কাজ করে। দিং থাকে জমকালো শিয়ান শহরের প্রান্তে। সস্তার সাইকেল নিয়ে রুজির সন্ধানে বেরোতে হয় তাকে। রীতিমতো যুদ্ধ করেই খাদ্যজোগাড় করতে হয়। দ্রুতগতির উন্নয়ন কিংবা বাজার-সমাজতান্ত্রিক চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিচেতনা কিছুই তাকে ছোঁয় না। দিং-এর শ্রেণি ক্রমেই আরো প্রান্তিক এবং তুচ্ছ হয়ে পড়ে। এই কৃষক দিংকে নিয়ে লেখা গল্পটার মূলউৎস (Rohstoff) পাওয়া যায় নবাবুণের ‘চীন থেকে

ফিরে' লেখায়। সেই লেখায় তিনি বলেন যে, কীভাবে বর্তমান কমিউনিস্ট সরকার কৃষকদের অস্বীকার করছে। আসলে, ১৯৪৯ সালের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তিটাই ভুলে যাচ্ছে সচেতনভাবে। প্রবন্ধটির শেষে লেখেন,

চিনে যে নতুন বড়লোকেরা তৈরি হয়েছে তারা গরিব বা মধ্যবিত্তের তোয়াক্কা করে না। করার কথাও নয়। রাজনীতিতে তারা এখন যতটা ভাগ বসাতে চায়, সেটা বোধহয় এখনো পারছে না। এখনও হয়তো মূল্যবোধের কিছুটা টানাপোড়েন চলছে। কিন্তু আগামীদিনে এদের হাত শক্ত হবে। (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৭১)

মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অনিশ্চিত জীবন ভারতেও সত্যি। পাঁচুগোপাল, 'এক টুকরো নাইলনের দড়ি' গল্পের সেই বাবা, 'আমার কোনো ভয় নেই তো?' গল্পের বীরেন, মিউচুয়াল ম্যান- এরা প্রত্যেকে স্পষ্ট করে দেয় যে, উন্নয়নশীল দেশেও উন্নয়নের স্বার্থে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির সংকট সবচেয়ে বেশি। কারণ, এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণিই বারবার ভাঙতে থাকে, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত অবস্থানের দিকে। তাদের তোয়াক্কা কেউ করে না, তারা প্রান্তিক হয়ে দিন গুজরান করে বা করে না! 'কড়াই' গল্পে মধ্যবিত্তের প্রান্তিকতা এবং নিম্নবিত্তের ক্রমবিলুপ্ততা বিষয়ে খানিকটা যেন প্রফেট হয়ে ওঠেন নবাবুর্গ,

অটো চালাতে চালাতে বুঝি যে, সরতে হবেই। তোমাকে কেউ এসে বলবে না সরো, কিন্তু ঠারেঠোরে ঠিক জানিয়ে দেবে। ফ্লাইওভারে অটো উঠবে না। ফ্লাইওভারে হাঁটাও বারণ। একটু একটু করে অ্যাটাক বাড়বে। বাস চাপবে। টাটা সুমো চাপবে। সরতে তোমাকে হবেই। যে লোকটা কড়াই-কে তিন মাসের দুশো সত্তর টাকা, হকের টাকা, দেয়নি, সে-ও পারবে না দোকান বাঁচাতে। কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচাবে না। (ভট্টাচার্য, ২০১০, ২৮৭)

দীপেন্দ্রনাথ তাঁর ‘তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা’ গল্পে থাকে রক্ত বেচে পয়সা রোজগারের কথা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার যুবক চাকরির দরখাস্ত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে হতে এই পথ বেছে নেয়। সে জানে যে, নিয়মিত রক্ত দিয়ে টাকা রোজগার করায় অনেক বিপদ লুকিয়ে আছে, তবু নিরুপায় তারা। “নিজের রক্ত দিয়ে দুটো পয়সা করব- এতেও কম্পিটিশন। আজকাল ক্যান্ডিডেট বেড়ে গেছে তো? যেন চাকরির দরখাস্ত করে লাইন দিয়েছি। আর, ডাক্তার, নার্সগুলো তো বাণী দেবার জন্য মুখিয়েই আছে।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫, ৩৬৮)। প্রোটোগনিস্ট কানাই জানে যে, শারীরিক অসুস্থতায় ভেঙে পড়লেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হারানো চলে না। দীপেন্দ্রনাথ বা নবাবুগঞ্জের গল্পে এই নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থ-সামাজিক সংকট তৈরি হয়। এই সংকট লেখকের মনোগত সংকট (ক্রাইসিস) চাপিয়ে দেওয়া নয় কিংবা ‘রোম্যান্টিক ক্রাইসিসে’র পরিণতিজ্ঞাপক নয়। ‘বাংলা কথাসাহিত্য’ কি এই লেখাগুলোতেই নিশ্চিত-নিরাপদ জীবনের আখ্যানবর্ণন থেকে বেরিয়ে আসছে না?

ভারতের অর্থনীতিতে ’৮০ এর দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সময়। বিশেষতঃ ’৭০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় শাসকেরা অর্থনীতিতে নিঃশব্দ বদলের বিভিন্ন প্রয়াস করে আসছেন। সত্তরের দশকে প্রধানমন্ত্রীর ‘গরিবি হঠাও’ চক্কানিনাদ স্লোগান কিংবা শিল্পে লাইসেন্সিং, পেটেন্ট আইন, FERA আইন ইত্যাদি একের পর এক সংস্কার ও দেশের ভিতরের শিল্প-অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসগুলো বদলে যেতে থাকল নিঃশব্দে আটের দশকে। ’৭০ দশক-পরবর্তী স্থিতিবস্থার সুযোগে শাসকশ্রেণি বিশেষভাবে প্রস্তুত করতে লাগল মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। উন্নয়নের মডেল হিসেবে বেছে নিল পরিষেবা ক্ষেত্র ও তথাকথিত ‘মেধা ক্ষেত্র’ গুলিকে। আর, এরই সঙ্গে অর্থনৈতিক উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা- চীনের সেজ্ মডেল এসে যাচ্ছে, ‘স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টের’ নীতিগুলির খসড়া প্রস্তুত চলছে। বিশ্বঅর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ভারতের এই বিশেষভাবে নির্মিত শ্রেণি- একাধারে সম্ভার শ্রমিক এবং ভোগ্যপণ্যের ভোক্তা হিসেবে- এই আঁচও করে নিয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা। তাই,

উপনিবেশ-যুগে ব্রিটিশরা যেমন শিক্ষা-পরিষেবা ক্ষেত্রে সমাজের একটি বিশেষ ‘সর অংশ’-কে তুলে এনেছিল ও নিজেদের আর্থ-সামাজিক খাঁচায় সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছিল, তেমনই ভারতীয় সমাজেও উঠে তৈরি ক’রে নেওয়া হতে এই শ্রেণি। “The Enigma of the ‘Indian Model’ of Development” প্রবন্ধে অধ্যাপক অমিত এস রায় বলছেন,

India’s remarkable success in *lower-end activities* of the *high-end knowledge-intensive sectors* has undoubtedly created unprecedented opportunities for a limited segment (creamy layer) of the society, mainly for the English-speaking, college/university-educated urban elite. It might have also created incentives for upward mobility and opportunities for the less fortunate to ascend the social ladder and be absorbed in what has been described as the Great Indian Middle Class. Nonetheless, it can hardly be called a truly inclusive strategy of economic development. (Ray 2016, 39)

আর, এর ফলে চুইয়ে পড়া অর্থনীতির একটি অতিস্বচ্ছল-বিত্ত তৈরি হয়, যাদের বিনিয়োগ, যাদের ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের টাকায় এবং যাদের ‘উন্নয়নের’ অবশেষে (trickle down) উন্নতি হবে দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের। এই বিশেষ শ্রেণিটি সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি দুয়েরই প্রধান সম্পদ হয়ে ওঠে। উন্নয়নের এই মডেল বিষয়ে অমিত এস রায় বলছেন,

It is not only inequitable in the extreme, but also a prescription for political volatility. This is surely not a sustainable development model, especially in a democracy. The political economy of neglecting the bottom quarter billion people, who lack health, nutrition, education and shelter, must be clearly understood... To employ the

billion strong population productively, one cannot rely on a policy of picking winners and supporting a narrow set of sectors, whether capital-intensive import substitutes (as during the pre-1991 regime) or knowledge-based IT, pharmaceuticals, biotech, etc. (as pursued now) (Ray 2016, 31-40)

ভারতীয় অর্থনীতির এই বিশেষ ঝোঁক সম্পর্কে জানা এইজন্যই দরকার যে, এই বিশেষ শ্রেণিই কিন্তু ‘সংস্কৃতি’ জগতের নিয়ন্ত্রক, ভোক্তা এবং উদ্যোক্তা হয়ে উঠছে। এরাই ‘শাইনিং ইন্ডিয়া’-র বিজ্ঞাপিত মুখ, এরাই ‘সুখী-স্বচ্ছল-মধ্যবিত্ত’ এবং পণ্যসাহিত্যের টার্গেট-রিডার। এবং এরাই অনেকক্ষেত্রে লেখকও বটে। আর, এরাই সমস্ত শিল্পের সংজ্ঞানির্ধারক। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিবাহবার্ষিকী’-তে যে ইন্দ্রদার কথা আসে, তিনি সমস্ত আত্মসমালোচনার পরেও কিন্তু এই শ্রেণিরই ধারক। ইন্দ্র বলেন,

আর আমি? যে ওকে [মণিমোহনকে] বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিলাম? টাটা-বিড়লা গোটা দেশের পকেট কাটে। আমি তাদের পকেট কেটে বিজ্ঞাপনের কোম্পানি চালাই। আর মাল খেতে খেতে উপমহাদেশের অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্যে চোখের জল ফেলি।
(বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৮৯)

এই উপন্যাসের মহীন, দূর্বা প্রত্যেকেই ক্রমশঃ সেই আর্থ-সংস্কৃতিরই বাহক হয়ে যাচ্ছে। মণিমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমিয় সেইদিকেই চলেছে। আর, মণিমোহনের সংকটটা তৈরি হচ্ছে সেখানেই। কারণ, সে কিছুতেই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের এই বদল মেনে নিতে পারছে না। তাকে কুড়ে খাচ্ছে আত্মসমালোচনা, পার্টির ভুল। তাকে স্মৃতিতে ফেরাচ্ছে একাত্তরের বাংলাদেশ-মুক্তিযুদ্ধ। তার স্মৃতি-সত্তায় ভিড় করে আসছে একদা-কমরেডরা। তাই তার অস্বস্তিও বাড়ছে; সে পথ হারিয়েও পথ খুঁজছে। দীপেন্দ্রনাথ বিশ্বায়িত অর্থনীতির প্রত্যক্ষবাস্তবতা দেখে যেতে

পারেননি। আখতারুজ্জমান ইলিয়াস তা প্রত্যক্ষ করছেন বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিসরে। আর, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের কোন লেখক, এই বিশ্বায়িত আর্থ-রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হবেনই, ইলিয়াসও সাক্ষাৎকারে সেই প্রভাবের কথা বলছেন,

শুধু লেখালেখি কেন আমার দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুই controlled হচ্ছে বিশ্ব রাজনীতি দিয়ে। আমার এখানে আমি Industry করতে পারবো কি না সেটা তো আমি জানি না, আমার প্রধানমন্ত্রীও জানেন না, সেটা জানে World Bank। সুতরাং আমি তো আষ্টেপৃষ্ঠেই বাঁধা। বিশেষ করে বিশ্বরাজনীতির আজকের এই ব্যাপক ওলটপালট বহু লেখককেই তীব্র সংকটে ফেলে দিয়েছে। (ইলিয়াস ২০১৮, ৬৭)

ইলিয়াস দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেন, নবায়নের মতোই, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙনের বাস্তবতা। কোনও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ না করলে এবং আমলাতান্ত্রিকতার ফাঁসে সামগ্রিক বিকাশকে কষে বেঁধে ফেললে শুধুমাত্র অর্থনীতির মডেল-বেস দিয়ে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় না।

মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায় যেমন বদল হয়েছে, তেমনি মধ্যবিত্তের স্থানাক্ষ বদলে দেওয়ায় বড় ভূমিকা রেখেছে গোলকায়ন সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপজাত মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানি। নবায়ন এর একটা বড় সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিচ্ছেন ‘আনাড়ির নাড়িজ্ঞান’ বইতে।

এরা দেশ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব- কিছুই মানে না। ‘ট্রান্সন্যাশনাল’ কথাটা সঠিকতর হলেও মাল্টিন্যাশনাল নামটাই বেশি চালু। এবং এরাই হল বর্তমান দুনিয়ার হর্তাকর্তাবিধাতা।... সারা দুনিয়ার মানুষ কী খাবে, কী পরবে, কী দেখবে, অসুখ হলে কী করবে, কী ভাববে, কিভাবে মশা তাড়াবে, ঘর সাজাবে- সব কিছু এরা নিয়ন্ত্রণ করে। এরাই বিনাযুদ্ধে আমাদের দেশটা দখল করার জন্যে আসছে। সিঙ্গাপুর, মেক্সিকো, ব্রাজিল, চীন হংকং, মালয়েশিয়া, মিশর, আর্জেন্টিনা, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান-এর পর এবার

কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ভুলে গেলে চলবে না আমি সেই দেশের একজন লেখক। বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ, গ্যাট, ডাংকেল- সবার চোখে এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। এর মধ্যে আমি ও আমার স্থানান্তর। (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৯১)

একজন লেখক হিসেবে, নবায়ন অতিসচেতন তাঁর স্থানান্তর বিষয়ে; তাঁর লেখক-স্থানান্তর। আর, প্রতিমূহুর্তে অধিজাতিক সংস্কৃতি সাহিত্যকেও পণ্য বানাতে তৎপর, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্নকেও অবধি গ্রাস ক'রে নিচ্ছে। একজন লেখক সেই আবহকে অস্বীকার করে লিখতে পারেন কী? বরং, সেই দাপিয়ে বেড়ানো পুঁজি-সংস্কৃতির বিরোধিতাই '৯০ দশকের সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নির্ধারণ করে। নবায়নের 'কোল্ড ফায়ার' গল্পে এই সর্বগ্রাসী সংস্কৃতির নমুনা পাওয়া যায়। মানুষের মৃত্যুপরবর্তী অন্তিমক্রিয়াকে 'সুখকর' করে তোলার প্রচেষ্টা। দাহ, সৎকার এসবে যে 'কমফোর্ট' নেই, স্বচ্ছলতার আত্মপ্রচার নেই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গজিয়ে উঠেছে 'কোল্ড ফায়ার' বিক্রির সংস্থা। সেই সংস্থার দালাল তার খদ্দেরদের বোঝায়,

ইন দ্য পোস্ট-কমিউনিস্ট ওয়ার্ল্ড আপনার লোয়ার স্ট্র্যাটাগুলোর ফারাক একটা লজিক্যালি অ্যাবসার্ড ডাইমেনশন নিয়েছে। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে- কি শিক্ষা, কি চাইল্ডবার্থ, কি ট্রান্সপোর্ট- সবটাই আলাদা।... এই যে আপনার বাঁচা, এই যে এলিভেটেড, ফ্রি, চমৎকার একটা লাইফস্টাইল তার সঙ্গে আপনার ফিউনারেলের কিন্তু কোনো সঙ্গতি নেই। (ভট্টাচার্য ২০১০, ১৮২)

অন্তিমসংস্কারকে 'এক্সকুসিভ' এবং কুলীন করে তুলতে একে পণ্য করে বাজারে নেমে পড়েছে সংস্থাটি। আর, সমাজতন্ত্রের একটি প্রায়োগিক মডেলের ধাক্কা খাওয়া এই গোলকায়নের সংস্কৃতি, পণ্যসংস্কৃতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। তাই, দালালটি সগর্বে বলে, “কমিউনিজমের পতনের জন্যে আপনাকে চুরাশি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর মাত্র ছ বছরের মধ্যে আপনি পেয়ে গেলেন কোল্ড ফায়ারের স্নিগ্ধতা।” (ভট্টাচার্য, গল্প, ৮২) তবে, শুধু মৃত্যুপরবর্তী সংস্কারক্রিয়াই

নয়, মৃত্যুকেও পণ্য ক’রে তোলা হয় ‘কন্থ্যাচুলেশনস’ গল্পের শাস্বত কিংবা, ‘মরণদান’ গল্পে। দীপেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, বহুমাত্রিক ভোগ্যপণ্য-সংস্কৃতি অনেকগুলো যুদ্ধফ্রন্ট খুলে ফেলেছে! দীপেন্দ্রনাথ ‘বিবাহবার্ষিকী’ উপন্যাসে ভোগ্যপণ্য-সংস্কৃতির হইহই করে ঢুকে পড়াকে প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৭০ দশকে পার্টি হোলটাইমার মণিমোহন উদ্ভিগ্ন হন যখন শোনে যে তাঁর সাত বছরের ছেলে বাবুয়া ক্যাডবেরি খেতে ভালবাসে, যে আনন্দবাজার পত্রিকার বুর্জোয়া অবস্থানকে তিনি ঘৃণা করেন সেই পত্রিকারই ‘আনন্দমেলা’ সংস্করণ পড়তে ভালবাসে। আপাতদৃষ্টিতে ক্যাডবেরি শিশুপ্রিয় খাদ্য, মনোলোভা এবং ‘আনন্দমেলা’ সুখপাঠ্য কিন্তু এর মধ্যেই মণিমোহন আঁচ পান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের। আর, মনে রাখা দরকার যে, ’৭০ দশকের মাঝামাঝির সেই ৭ বছরের শিশু ’৯১ এর আর্থ-সামাজিক ভোলবদলের সময়, উদারনৈতিক উদাত্ত আবাহনের যুগে যুবক হয়ে উঠেছে। নবায়নের গল্পে-উপন্যাসে যে মধ্যবিত্তের বদলানোর রূপরেখা থাকে, সেই মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তখন ‘বিবাহবার্ষিকী’র ‘বাবুয়া’রা। আর, দীপেন্দ্রনাথও নিজের স্থানাক্ষ বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ-বদলের উদ্বেগও ধরে রাখতে চান সাহিত্যে। দীপেন্দ্রনাথ ‘শব্দের যুদ্ধফ্রন্টঃ বাংলা গল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা’ প্রবন্ধে উক্ত স্থানাক্ষ এবং লেখক-সত্তার গড়ে ওঠা বিষয়ে লেখেন,

মানুষ ভিয়েতনামের জঙ্গলে বন্দুক হাতে লড়েছে। মানুষ গ্রীসের সামরিক কারাগারে লেনিনি-জন্মশতবার্ষিকী পালন করছে। আশ্চর্য এই সময়। নিজ গ্রহের সীমা অতিক্রম করে মানুষ তার সভ্যতাকে এক অভূতপূর্ব সম্ভাবনার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আর ঐতিহাসিক এক শহরে মশার কামড় খেয়ে বৃষ্টির জলে ভেসে রোদের তাপে শুকিয়ে সেই মানুষটা বাঁচছে। সেই মানুষটা এই আশ্চর্য আর জটিল সময়ের সঙ্গে, এই গ্রহের সঙ্গে, অনন্ত সৌরজগতের সঙ্গে, মানব সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার জন্য লড়াই করছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১০ সাল, ৫২১)

লেখক দীপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস এই কালস্থানিকতার বয়ান রাখতে চাইছে; এটা স্পষ্ট যে, তাঁর পক্ষপাত কিউবার ক্ষেত্রে লড়াকু মানুষটার প্রতি, যাপনযুদ্ধের নিরন্তর সৈনিক মানুষদের প্রতি- কিন্তু ওই ‘আশ্চর্য আর জটিল সময়’-এই মানুষগুলো বেঁচেবর্তে থাকার সংগ্রাম করছে।

প্রতিকূল স্থানাক্ষের উল্লেখ করেও নবারণ লেখেন, “যে অস্থির ও ঘটনাবলুল কালপ্রবাহের মধ্যে গল্পগুলি লেখা হয়েছে তাতে করে দেখার ও বোঝার চোখ ও মন পালটে যেতে বাধ্য। প্রকাশভঙ্গিও। তবে অস্তিত্বকে যা অভিমুখিনতা দেয় সেই মতাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রদবদল বা পিঠটান দেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।” (ভট্টাচার্য ২০১০, ১০) মায়াকোভস্কির কাব্যতাত্ত্বিক অবস্থানও তো এরকমই ছিল^{৫২}- দীপেন্দ্রনাথও সময়ের ওপরে সওয়ার হওয়ার কথাই বলছেন; সময়-স্থানাক্ষের প্রতিকূলতা ধারণ করেই তাকে উপন্যাসে-গল্পে বদলে নেওয়া, “লোকটা জানে সময়ের দায় মেটানোই হল সময়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার একমাত্র শর্ত” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১০ সাল, ৫২১) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও শাহাদুজ্জামানের সঙ্গে ‘লিরিক’ পত্রিকার সাক্ষাৎকারে স্বীকার করছেন পাল্টানো সময়, বিশ্বায়নী আবহে ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের স্থানাক্ষ বদলের বাস্তবতা। তাঁর নিএজ্র উপন্যাসে এর প্রভাব নিয়ে বলছেন, “হ্যাঁ, [better society]-র মডেল হয়তো দেখাতে পারছি না, কিন্তু বুর্জোয়া society যে কিছুতেই acceptable না এটা তো দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, এর চেয়ে better একটা society নিশ্চয়ই আছে।”^{৫৩}

‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’ উপন্যাসে সিপিআই-এর হোল্টাইমার মণিমোহন প্রশ্ন রাখে তার সিপিআই(এম) বন্ধু প্রসন্নের কাছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বারবার ভুল করেছে, তা সংশোধনের চেষ্টা করেছে; কিন্তু, পুনরায় নতুন ভুলের দিকে এগিয়ে গেছে। কখনো বা পুরনো ভুল নতুন রূপে এসে দাঁড়ানোয় তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক যে আশঙ্কা মণিমোহন-প্রসন্নের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ, তা প্রায় চার দশক পর আবার

ফিরে আসছে। শ্রেণিগত অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা ও নির্বাচনের কাছে নতিস্বীকার করে পদক্ষেপ করছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। এমনকি, যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থাশীল নয়, তারাও কখনো না-কখনো দক্ষিণপন্থীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভুলের বীজ কিন্তু বহু আগে পত্তন হয়েছে। ভারতীয় জনগণের নাড়ি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি, কখনো বা জনগণের স্বার্থ আর পার্টির স্বার্থ গুলিয়ে ফেলেছে আবার কখনো কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিস্বার্থ ভুলে গেছে আশু লক্ষ্য অর্জনের আশায়। ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’ থেকে একটি উদাহরণ দেখা যাক, সিপিআই মণিমোহন ও সিপিএম প্রসন্ন-র কথোপকথনে। সিপিএম-র প্রসন্ন মণিমোহনকে অভিযুক্ত করতে থাকে- ‘৭০ দশকের মহাসন্ধিক্ষণে সিপিআই যে ভুলগুলো করেছিল, দেশে জারি হওয়া জরুরি অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছিল, সেই ব্যাপারে। মণিমোহন স্বীকার করেন সিপিআই-এর ভুল,

আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। রাণ্ডিরে ঘুম হয় না। গণতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে কত বড় স্বৈরতন্ত্রকে আমি সমর্থন করে বসেছি। ঠিকই তো, জরুরি অবস্থার হত্যার পাপের পতনের দায় আমি কী করে অস্বীকার করব?... দেশের মানুষের কাছে আমরা নতজানু হয়ে ভুল স্বীকার করেছি।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৯২)

কিন্তু, একইসাথে দূরদর্শীর মতো তিনি প্রশ্ন করেন সিপিআইএমের জোটবাদী রাজনীতিকেও; যা এত দশক পরে জ্বলন্ত সত্যির মতো ফিরে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তো মুছেই গিয়েছিল। তাদের বড় পার্টির দম্ভ আর সংকীর্ণ স্বার্থ সব তছনছ করে দিল। অথচ আজও প্রমোদবাবু [দাশগুপ্ত] যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলছেন। গণতন্ত্রের লড়াই লড়তে গিয়ে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যে ভুল আমরা করেছি- সেই একই ভুল তোরা করছিস জনতা পার্টির ক্ষেত্রে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৯২)

বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থেকেছে ১৯৭৭-২০১১, আর বামফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে সিপিএম-এর মতামত। অথচ, গোড়াতেই থেকে গেছে প্রচুর গলদ, যে ভুলগুলো শুধু সংগঠনগত নয়, বরং রাজনীতিগত। যে ভুলগুলোর ওপরেই সামান্য মেরামত ক’রে ‘সমাজতন্ত্রের অট্টালিকা’ বানাতে চেয়েছিলেন তৎকালীন সিপিএম নেতারা। আর, তার ফলেই ক্ষমতার স্বাদ পেতে পেতে, আদর্শগতভাবে ক্ষইতে ক্ষইতে একসময় জনগণের ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম। দীপেন্দ্রনাথ ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলেন চার দশক আগে। অথচ, সেই মুহূর্তে তিনি সিপিআই পার্টির প্রায়-পরিত্যক্ত হোল্টাইমার এবং সাহিত্যক্ষেত্রে ‘প্রায়-অপঠিত’। দীপেন্দ্রনাথের পার্টি সিপিআই-ও বহু দ্বিধার পরে বামফ্রন্টে যোগ দিয়েছিল ১৯৮২ সালে। রাজনৈতিক সূত্রগুলোকে গভীর বিশ্লেষণে সাহিত্যের শব্দ-সংলাপে ধরে রেখে ভবিষ্যতের এক রূপরেখা দিতে চেয়েছে। প্রবক্তা বা প্রফেট হিসেবে নয়, বরং এই দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষক হিসেবেই। একদা ভারতের ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরবর্তী সময়ে শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতি এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশ্বাস দিয়ে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করত সিপিআই বা সিপিএম। আর, সেই ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭-র বামফ্রন্ট সরকার (সিপিআই তাতে যোগ দেয় ১৯৮২ সালে)। কিন্তু, তারপরে বিশ্বঅর্থনীতিতে এবং রাজনীতিতে বদল আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নীতিও বদলে নিতে শুরু করে তারা। ফলে, শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে ক্রমশই শুধুমাত্র ক্ষমতা বজায় রাখার রাজনৈতিক দলে পর্যবসিত হয় সিপিএম ও তার শরিক দলগুলো। শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর ‘জোট সরকার, ফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি’ প্রবন্ধে এই ক্ষমতায়নের অস্বাভাবিক দমনাধিপত্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন-

ক্ষমতায় আসার সুবাদে এবারে যদি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিয়ত জনজীবনের সর্বস্তরে তার দাপট ও ক্ষমতা প্রদর্শনকেই অগ্রাধিকার দেয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে জনতার সমর্থন নিয়ে সে ক্ষমতায় এসেছিল, সেই জনতার দ্বারাই সে হবে পরিত্যক্ত। পার্টির অস্তিত্বকে জাহির করার চেয়ে এই পর্বে অনেক বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয় একটি

প্রকৃত জনদরদি, উৎকর্ষমণ্ডিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি। ইতিহাসের ট্রাজেডি এটাই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ঘটেছিল ঠিক এর উল্টোটাই, আর সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনকেও তাই রোধ করা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের গণভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার নেপথ্যেও এটি হল অন্যতম প্রধান কারণ।
(দত্তগুপ্ত ২০১৩, ৬৯-৭৯)

সংসদকে ব্যবহার করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে স্বপ্ন, তা কেবল স্বপ্নই থেকে যায়, উপরন্তু ক্ষমতা ও গদি আঁকড়ে থাকার মোহে ‘মধ্যস্বত্বভোগী’ ও শাসকঘনিষ্ঠ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করতে থাকে তারা। ১৯৯০-র দশকের প্রবল বিশ্বায়নী হাওয়া এবং পুঁজির দৌরাণ্যের কাছে নতিস্বীকার করতে করতে একুশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করতে থাকে বামফ্রন্ট। মডেল হিসেবে তুলে আনে তৎকালীন চীনের ‘বাজার সমাজতন্ত্র’ নামক মডেল। আর, তাই শ্রেণিগত শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ছেড়ে দলগত শত্রু-মিত্র নির্ধারণের মনোনিবেশ করে তারা। আর, আশু আধিকারের রাজনীতির উত্তরণহীন সীমাবদ্ধতায় ধাক্কা খায় কমিউনিস্ট রাজনীতির দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে; বহুদশক পরে সেই ধাক্কাই ঝড় হয়ে এসে পড়ে। অথচ, দীপেন্দ্রনাথ ‘৭০-এর দশকেই আঁচ করছেন সেই শূন্যগর্ভ পরিস্থিতি এবং ঝড়।

কলেজ টিচারদের মাইনে ধাপে ধাপে বাড়ছে। কিন্তু তাতে কিছু ফ্রিজ, কিছু রেকর্ড প্লেয়ার আর পুজোর সময় বেশ কিছু রেলের টিকিট বিক্রি ছাড়া দেশের কোন উপকারটা হয়েছে? শিক্ষানীতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি- জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে জাতির বাবুদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির ইন্টারভেনশন আছে?... ভারতের সব কটা কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দল হল পেটিবুর্জোয়া পার্টি। আত্মকেন্দ্রিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সর্ববিধ ক্ষুণ্ণ বিহীন এই শ্রেণী নানা নামে পরিচয়ে আসলে পুঁজিবাদেরই সেবা করছে, অনেকে অবশ্য না জেনেও করছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৮৯)

দীপেন্দ্রনাথ ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ’ আদর্শের উপন্যাসগত প্রয়োগে চরিত্রদের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন তাঁরই মতাদর্শ-বিশ্বাস। ‘বিবাহবার্ষিকী’ উপন্যাসের মণিমোহন আসলে দীপেন্দ্রনাথের কখন হয়ে ওঠে। ‘কলেজ টিচারদের মাইনে বাড়ি’ কোনও ঘূণার ঘটনা নয়, তার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে কিংবা ‘ফ্রিজ বা রেলের টিকিট কেনা’ নিন্দনীয় নয়। দীপেন্দ্রনাথ কলেজ টিচারদের আক্রমণও করতে চাইছেন না, বরং আক্রমণ করতে চাইছেন পেটিবুর্জোয়া মানসিকতাকে, স্থিতিবস্থার জগদল পাথরের ভারকে। কিন্তু, মণিমোহনের ভাষা আসলে লেখকেরই ভাষা হয়ে থেকে যাচ্ছে, পুরনো কমরেডদের যে ভাষায় মণিমোহন সমালোচনা করছেন তা আসলে সিপিআই পার্টির রাজনৈতিক দলিল ও তাত্ত্বিক ভাষা। রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মেলাতে চেয়ে একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে এই সমাজসূত্রগুলো লিখে রাখছেন দীপেন্দ্রনাথ। কারণ, তাঁর প্রবন্ধে যে কথা তিনি বলছেন যে, সমাজে শিল্পীর কাজ সেই লাইটহাউসের মতো, বহুদূর থেকেও যা আলো দেখিয়ে দিতে পারে দিশেহারা সময়ের পাঠককে। ’৭০ দশকে যে জনতা পার্টির কার্যক্রম ছিল জরুরি-অবস্থার বিরোধিতা এবং পরিবারতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের বিরোধিতা- সেই দলের সাথেই নির্বাচনী সমঝোতায় আসে তৎকালীন সিপিআইএম। সিপিআই-র সদস্য হিসেবে এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আতঙ্কিত হন মণিমোহন। ১৯৭৫ সালে পি সুন্দরাইয়া সিপিআইএম-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও পলিটবুরো থেকে পদত্যাগ করেন; সেই পদত্যাগপত্রের প্রথম কারণ ছিল জনসঙ্ঘের সঙ্গে সিপিআইএমের জোটের রাজনীতি। ‘My Resignation’ লেখায় তিনি লেখেন,

My resignation is due to the fact that the CC majority has decided for joint actions with pro-imperialist Jana Sangh with para-military fascist (storm-trooper like RSS) as its core in the name of fighting emergency, which I consider very harmful for our party; both among democratic masses in our country and abroad, we will be getting

isolated from the anti-imperialist and socialist forces. (Sundarayya 1991, revolutionarydemocracy.org)

দীপেন্দ্রনাথ একদিকে টের পান পুঁজিবাদের নতুন রূপে আগমন, অন্যদিকে ভবিষ্যতে জনতা পার্টির মুখোশ ছেড়ে আসল রূপে আত্মপ্রকাশ। একটি কমিউনিস্ট পার্টি এরকম দলের সাথে নীতিগত সমঝোতা করলে, ভবিষ্যতে শুধু সেই পার্টিটিই নয় বরং সারা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রশ্নের মুখে পড়বে। নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসার এই যে ভবিষ্যত বিপদ, সেই সম্পর্কে প্রোটাগনিস্ট মণিমোহন বলেন,

তোরা মনে রাখছিস না, জনতা পার্টি মানে হল একদিকে মাল্টিন্যাশন্যাল অন্যদিকে গোহত্যা নিবারণ আর হরিজন হত্যা। আমি নিশ্চয়ই জানি একদিন লোকে তোদেরও প্রশ্ন করবে- দেশে যখন আধা-উপনিবেশিক অর্থনীতি চালু হচ্ছিল, তখন তোমরা কী করছিলে? বলবে, দেশকে যারা আমেরিকার কাছে বেচে দিতে চায়- তোমরাই না ছিলে তাদের সহযোগী, বন্ধু? (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৯৩)

আর, রাজনীতি-সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না মণিমোহনের বকলমে লেখকের উদ্বেগ; দীপেন্দ্রনাথ বারবার এই ‘মানুষের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির দূরত্ব’ নিয়ে আশঙ্কার কথা বলেন। কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নিছক সমালোচনা নয় বরং সাহিত্য কীভাবে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে সেটাই দেখাচ্ছেন তিনি। এটাই একজন শ্রেণিসচেতন এবং কমিউনিস্ট লেখকের কাজ বলে মনে হচ্ছে তাঁর। আর, সেইজন্যই উপন্যাসটি ঔচিত্য-অনৌচিত্য বোধে ভুগছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রয়োগে দীপেন্দ্রনাথ ‘আদর্শ চরিত্র’ হিসাবে নির্মাণ করছেন মণিমোহন, বিনয়ভূষণদের। শুদ্ধবাদী মানসিকতা ও নৈতিকতার প্রাবল্যে ব্যক্তির অনুসন্ধান চালাতেই ভুলে যাচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ। তুলনায় ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি’-র নিশানাথ কিছু ব্যতিক্রম।

বিশ শতকের শেষার্ধ্বে সমস্ত বামপন্থী লেখক-শিল্পীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রের পতন, ১৯৯২ সালে। যার প্রভাব সচেতন প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিআই-র সক্রিয় সদস্য, পার্টিলাইন অনুযায়ী রুশ সমাজতান্ত্রিক মডেলের সমর্থক, তবু সোভিয়েতের সমালোচনা করছেন। বস্তুতঃ, শুধুমাত্র সোভিয়েত মডেলের সমালোচনা নয়, বরঞ্চ বিশ্বব্যাপী দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সংস্কৃতিতে কমিউনিস্ট তত্ত্বও যে প্রশ্নের মুখে পড়ছে, নীরস তাত্ত্বিক ব্যখ্যা আর ‘বেস্-সুপারস্টারক্চার’-র পুঁথিগত বোঝাপড়ায় তাকে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না, সেই আশঙ্কাও তাঁর, ১৯৬০ সালে, ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি’ উপন্যাসে।

বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধ্বে তাবৎ ধনতান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক পৃথিবীর এক শ্রেণীর যুবজনের পোষাক, প্রসাধন, ভঙ্গি চলাচল মোটামুটি এক করে দিচ্ছে। যাকে এক ধরনের দেশ-কালাতীত বিশ্ব-সংস্কৃতিও বলতে পারো। এমন কি মহান সোভিয়েত ভূমিতেও আজ এই সাধারণ লক্ষণটি সেখানকার কোনও যুব মহলে প্রকাশ পাচ্ছে। মহামতি ত্রুশ্চেভ ভুরুফুরু কুঁচকে একে বলছেন টেডি বয়ের সমস্যা। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২২২)

নিশানাথ নামের সেই নায়ক প্রতিমুহূর্তে সমাজ ও সভ্যতার প্রতি প্রশ্ন করে চলে। আর, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো সদস্য হিসেবে সে প্রশ্ন করতে থাকে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বামপন্থীদের ভূমিকাকেও। সাহিত্যিক বীক্ষা এবং দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে ‘৬০ এর দশকেই পূর্বাভাস পাচ্ছেন আগাম পতনের, দেখছেন কীভাবে ফাটল ধরে আপাত-দৃঢ় হাতির দাঁতেও। আসলে, দীর্ঘ কয়েক দশক পেরিয়ে এসে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রও হয়ে উঠেছিল এক প্রতিষ্ঠান। একদিকে ‘মার্কসবাদ অপরিবর্তনীয়’ এই অন্ধবিশ্বাস, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউএসএ-র মতাদর্শগত প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠা, এই দু’টোই সেই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি মজবুত করেছিল। অশোক সেন তাঁর ‘মার্ক্সবাদে ‘অদৃশ্য বুদ্ধিজীবী’ (২০০২)’ প্রবন্ধে চিহ্নিত করতে চাইছেন সোভিয়েতের ও সোভিয়েত-অন্ধভক্ত দেশগুলির সমস্যা,

নির্বিন্দের একনায়কত্বে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় হুকুমদার অভিভাবকের নিষ্পেষণ! শ্রেণীহীন সমাজের, গণতান্ত্রিক পরিপূর্ণতার ধ্যানধারণা কেন এমন হারিয়ে যায় ‘সচেতন’ মার্ক্সবাদী (Marxist) চিন্তা ও কার্যক্রম থেকে? তবে কি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন মাত্রেই শক্তির জটিলতায় জরিয়ে যাবে?... বৃহত্তর জনস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে ধনতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জের যথাযোগ্য উত্তরাধিকারও হারিয়ে যায়। সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় মার্কিন ধনতন্ত্রকে টেক্কা দেওয়া আর যাই হোক সোভিয়েট দেশে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির অনুকূল ছিল না। (সেন ২০০৫, ১২৭)

মণিমোহন এই কথাগুলোই বলতে চান উপন্যাসের অন্যান্য কুশীলবেদের। আসলে, এটা দীপেন্দ্রনাথেরও অভিযোগ তাঁর সময় ও সমসাময়িকের প্রতি। ‘বিবাহবার্ষিকী’ ঠিক এই অবস্থানবিন্দু থেকেই প্রবন্ধবুনোটে বাঁধা পড়ে যায়। কুশীলবেদের জীবনচর্চা ও উপলব্ধি প্রতিফলন ঘটায় মণিমোহনের ওপরে, কিন্তু সেই কুশীলবেদের উত্তরণ ঘটেনা কোথাও। যে ‘লেখকের সংশয়’-এর কথা ইলিয়াস বলতে চেয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে, সেই সংশয় লেখক দীপেন্দ্রনাথের মধ্যে রয়েছে কিন্তু, যখন তিনি কুশীলব নির্মাণ করছেন, সেই ‘সংশয়’ আর থাকছে না। লেখকের ‘বিশ্বাস’ ও পার্টিলাইন সেই সংশয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তবু, সমালোচনার পরেও মণিমোহন বিশ্বাস রাখেন কমিউনিস্ট পার্টিতেই, ভরসা রাখেন মার্ক্সবাদের ওপরে,

আমরা অনেক ভেবেছি, পার্টিকে বলব ওয়েজ [হোলটাইমারের ওয়েজ] দিতে হবে না... ছাত্রজীবন থেকে শহরে রাজনীতি করলাম। আবার আসল জায়গায় [গ্রামে] যেতে চাই... কমিউনিস্ট পার্টি [সিপিআই] ছেড়ে আমি কোথায় যাব?... মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান, সেই ভরসায়ই তো গাঁয়ে যাচ্ছি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৯০-৯২)

১৯৭৭ সালেই কবি ও প্রাবন্ধিক সমর সেনও একই মতামত পোষণ করেন। ’৭০ দশক জুড়ে সিপিআই ও সিপিআইএম-র বারবার দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে জোট এবং বুদ্ধিজীবীদের দোনোমনা নিয়ে লিখছেন, “ভোটে অবশ্য বিপ্লব সাধিত হয় না! তার জন্য অন্য পন্থা দরকার। বুদ্ধিজীবীদের

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করা উচিত- তবে সেটা এখন পর্যন্ত স্বপ্নবিলাস।⁵⁴” কিন্তু, মতামতের দৃঢ়তা ও সযৌক্তিক গদ্যবিন্যাস প্রবন্ধে মানায়, তা কি উপন্যাসে সমীচীন? উপন্যাস যেখানে কুশীলবেদের পারস্পরিক বিনিময় ও আন্তঃসম্পর্কগত আখ্যান-উত্তরণ দাবি করে, প্রবন্ধে তো তা পাওয়া যায় না। তাহলে দীপেন্দ্রনাথ কি চাইছেন প্রবন্ধের যুক্তিনিষ্ঠ তार्কিক পরিসর ও বয়ান-বিরুদ্ধবয়ানের রাজনীতিকে সরাসরি ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ নামক কাল্পনিক আখ্যানের সংরূপে ঢুকিয়ে নিতে?

‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে রণজয়ও মণিমোহনের মতোই আপাতশূন্য এক প্রস্থিতিতে ছটফট করে, বোঝে প্রচুর ভুল হয়ে গেছে, অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, জনগণের সাথে ‘বিপ্লবী পার্টি’-র দূরত্ব বেড়েছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্যে লুকিয়ে রাখা রাইফেলের ওপরে বাড়ি উঠে গেছে। স্থিতাবস্থা আর সিপিএমের শাসন পুরনো যুদ্ধপরিস্থিতিকে মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছে। তবুও, সে কিছুতেই পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না, “কিন্তু, রাইফেলের ওপরে বাড়ি উঠে যাওয়ার ভুলটা কার? রণজয় ছুটন্ত বাসের জানলার বাইরে ধাক্কা খাওয়া হাওয়াকে বলে, ‘আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তার মানে এনয় ই যে লি লি সান বা ওয়াং মিং-দের মতো আমি পালিয়ে যাব।’⁵⁵” অবশ্য সময়টা পালিয়ে যাওয়ার নয়ও। কারণ, সত্তরের সেই যুদ্ধলগ্ন আপাততঃ থিতিয়েছে, পলি পড়েছে কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর, শাসক তার নিজের স্বার্থেই প্রতিনিয়ত যুদ্ধপরিস্থিতি চাপিয়ে দেয় বৃহত্তর জনগণের ওপর। বিশ্বায়ন-অর্থনীতি আর নতুন শাসকের দমনমূলক আধিপত্য নতুন যুদ্ধফ্রন্ট খুলে দিয়েছে মানুষের সামনে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ প্রকাশকালে সোভিয়েত ভেঙ্গে পড়েছে, টুকরো হয়ে গেছে। ‘পেরেক্সিকা’ কার্যকর হয়েছে। অন্যদিকে, নয়া গণতান্ত্রিক চীন বাজার-অর্থনীতির নীতিতে সমাজতান্ত্রিক কৌশল মিশিয়ে দমবন্ধ অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছে, ক্রমশঃ পুঁজিবাদী পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বোপরি, বিশ্বায়ন দাবড়ে বেড়াচ্ছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। ঠিক যে আশঙ্কা দীপেন্দ্রনাথ করছেন, তা মূর্ত হয়ে উঠছে, মণিমোহনেরা মার্ক্সবাদী পার্টির আদর্শ আর কার্যকারণ মেলাতে পারছে না, রণজয়কে

উন্মাদ বলে দাগিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ছে ভারতে, এবং ভারতরাষ্ট্র উদারনৈতিক অর্থনীতিতে স্বাক্ষর করে সাময়িক স্বস্তি পাচ্ছে। দীপেন্দ্রনাথের ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি (১৯৫৯)’-তে নিশানাথ যে সিঁদুরে মেঘ দেখেছিল,

অতীত মানুষ সহজেই বিস্মৃত হয়। বলাই বাহুল্য, কৌলিন্য আজ শুধু অর্থের... আর সদা অসম্ভব অথচ সহজে তৃপ্ত মধ্যশ্রেণি এই দুটি সহজ কারণে নিজেদের যাবতীয় প্রতিভা ও সামর্থ্য নিয়োগ করে আসলে ধনতন্ত্রেরই নিরুপদ্রব বিকাশের সহায়তা করছে... আসলে এই ভাবেই পৃথিবীটা দ্রুত কাছে আসছে আর এক হয়ে যাচ্ছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২১৮-২২২)

দীপেন্দ্রনাথ দেখছেন মূল্যবোধের ভঙ্গন। পারিবারিক মূল্যবোধ, নিম্নবিত্তের নৈতিকতা ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে বিশ্বায়নের দাপটে, কিংবা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক মডেলের ক্রমশঃ ভেঙে পড়ায়। যে পৃথিবীটা ‘এক হয়ে যাচ্ছে’, তা কোনও মুক্তির দিশা দেখাচ্ছে না বরং আপাত সেতুবন্ধনের আড়ালে বৈষম্যের ও বিযুক্তির পাঠ দিচ্ছে। আর, এই ‘সমাজতন্ত্রের ছাতা’ হঠাৎ সরে যাওয়ায় পুঁজিবাদের নতুন জয়যাত্রার সময়ে পথ খুঁজছেন দীপেন্দ্রনাথ, নবাবরণ। নবাবরণ লিখছেন,

১৯৮৯-র পর থেকে বিশ্বে যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে তাল রেখে, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি তালকানা লেখক ও সেইসঙ্গে ভিত্তি বজ্জারে পরিণত হয়েছি। এই অবস্থানটা সুখকর নয়। মানুষ মৌমাছির থেকে যে কারণে আলাদা বলে মার্কসবাদ আমাদের বুঝিয়েছিল সেখানেই ঘুমের মধ্যে বালিশ চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে মাথাটি এখন গ্যাস বেলুন বা মিমির মাথা হয়ে শূন্যে ভাসমান। এ জাতীয় অসংলগ্ন মাথা আর যাই করতে পারুক, মডেল তৈরি করতে পারে না। (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৮৮)

রাজনীতি-সচেতন লেখকদের চেতনায় কি এক সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে? যেখানে পূর্বপরিকল্পিত পক্ষপাতের মডেল বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আখ্যানরচনাপদ্ধতি অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি বিকর্ষণ তৈরি হচ্ছে পাঠকমনে আর জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগে থাকছে। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, পাশের দেশে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই সময়েই ‘খোয়াবনামা’ লিখছেন; প্রায় ৫ দশক আগে নিম্নবর্ণের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে উপন্যাস-রূপ দিচ্ছেন। নবারুণ, দেবেশরা বুঝছেন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতা কিন্তু, প্রতিরোধে পথও খুঁজছেন। আর, কোবাদ ঘান্দি এই ভেঙ্গে পড়া রূপকথার জলযান বিষয়ে বলছেন,

The socialist countries have collapsed, the national liberation movements have been replaced, in many places, by Islamic resistance, and of the millions who have come onto the streets in the West, one can see only a sprinkling of Communists. There continue to be a few communist resistance movements, but even of these, many have collapsed, while a few continue with enormous difficulties, fighting with their backs to the wall... Why such a devastating reversal? What happened to our hopes and dreams of a better future? Was it to witness a mafia type rule in the first ever socialist country, or the billionaire prince lings of China, not to mention the tin-pot dictators of earlier East-Europe!!? (Ghandy 2015, 8-9)

আশি আর নব্বইয়ের দশক জুড়ে, একবিংশের প্রথম দশক জুড়ে এই শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। মণিমোহন এর বিরুদ্ধেই লড়াইটা অব্যাহত রাখতে চান। বিনয়ভূষণ ‘শ্মশানে দেখা হবে’ বলার পরেও জানেন যে, সব শেষ হয়ে যায়নি। হারবার্টের স্বপ্নে ফিরে আসে বিনু। আর, রণজয়ের স্বপ্ন-বাস্তব-পাগলামি একাকার ক’রে ফিরে আসে স্মৃতিদের প্রতিরোধ। স্মৃতিরা, ইতিহাসেরা

রণজয়ের প্রতিরোধের প্রধানতম অস্ত্র। র, ফ্যাতাডুরা এই সময়েই হেজিমনির বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী উড়ান শুরু ক'রে দেয়। আসলে, ক্রমশঃ 'নিরাজনীতিকরণ' ক'রে দেওয়ার শাসক-চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে যুদ্ধের স্মৃতি, দৃঢ় রাজনৈতিক ইতিহাস। ফ্যাতাডুদের মতো বাস্তব-না-মানা কুশীলবেরা। নবারুণ স্বপ্নবিজ্ঞানে জোর দেন,

গুলিয়ে দেবার জন্যে বলে নিই যে আমি মৌলকণা, রশ্মি, কোয়াসার, নীহারিকা- এসবের সঙ্গে মৃত্যুবিজ্ঞান ও স্বপ্নবিজ্ঞানেও বিশ্বাসী।... মৃত্যুতে বিজ্ঞান শেষ হয়। হোক। আমার ধারণায় মৃত্যুর পরে স্বপ্নের পর স্বপ্নের পর স্বপ্ন... (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৮৮-৯০)

নবারুণ বারবার বলতে চান যে, ইতিহাস মরে না, পাণ্ডুলিপিরা পোড়েনা, খোড়োরবিরা মরে না, বিনুরা থেকে যায়। 'খোয়াবনামা'-র আখ্যান যে বিন্দুতে শুরু হয়, শেষ হয় একই বিন্দুতে শুধু কাদায়-পা গাঁথা তমিজের বাপ থেকে তার নাতনি সখিনাতে বদলে যায়। বিরসা মরেও ভগবান হয়ে যায়, উলগুলান শেষ হয় না। ওসমান যে বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়, তার সামনে অনেকগুলো পথ খুলে যায়, স্বৈরতান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে দ্রোহপথও তার অন্যতম।

পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক উপন্যাস-

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পথেও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমাজবৈশিষ্ট্য উপন্যাসিকদের আখ্যানরচনায় ঢুকে পড়ে। পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের 'রাজনৈতিক উপন্যাস'-র ক্ষেত্রে রাজনীতির যাত্রাপথ অনুসন্ধান প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে এই সন্দর্ভে আমি ১৯৭১ পরবর্তী উপন্যাস বোঝাতে চাইছি। যদিও, এই প্রসঙ্গ বহুবিতর্কিত ও আলোচিত যে, 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে কী বুঝবে? তা ১৯৭১ সালের পরবর্তী সাহিত্য, না কি ১৯৪৭-১৯৭১ সময়পর্বের উপন্যাসও তার মধ্যে থাকবে, নাকি ১৯৪৭ পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গের বাংলা উপন্যাসও তার মধ্যে ধরা হবে- এই বিতর্ক পুরনো। তবে, 'পূর্ব

বাংলার উপন্যাস' শব্দবন্ধ মনসুর মুসা⁵⁶ ব্যবহার করেছেন ১৯৭১ পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে, কারণ ভৌগোলিক ও সাহিত্যিক দুই বিচারেই এই শব্দবন্ধ সমীচীন মনে হয়েছে তাঁর। এই গ্রন্থেই মনসুর মুসা জরুরি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, পূর্ব বাংলার উপন্যাস-র সংজ্ঞায়নে যে প্রশ্নগুলো জরুরি,

নির্মোহ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের উপন্যাসের ঐতিহ্য কি? পাকিস্তান-পূর্ব কালের সকল মুসলমান ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাস কি আমাদের ঐতিহ্য? নাকি পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসীদের রচিত উপন্যাসই আমাদের ঐতিহ্য? অথবা হিন্দু-মুসলমান, পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ নির্বিশেষে বাংলার সকল ঔপন্যাসিকের রচনাই আমাদের ঐতিহ্য? (মুসা ১৩৮১ সাল, ১-২)

শুধুমাত্র বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকের উপন্যাস দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে গেলে মুসলমানিত্ব ও পাকিস্তানিত্ব অভিন্ন হয়ে পড়ে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মেরুকরণ অবশ্যম্ভাবী। বাংলা উপন্যাসের ধারা প্রস্তুতিপর্বের প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে এসে পূর্ণতা পাচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথ, মীর মোশারফ হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক, শরৎচন্দ্র, কাজী আবদুল ওদুদ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের লেখনীতে বিকাশলাভ করছে। কিন্তু, এই উপন্যাস বিকাশের ধারায় যদি 'অ-মুসলমান' বলে বাকি লেখকদের সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে উপন্যাস সংরূপের বিকাশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। যদিও, বিভাগোত্তর (১৯৪৭ পরবর্তী) নবগঠিত পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা সাহিত্যকে 'মুসলমানী' ক'রে তোলার রাজনৈতিক চেষ্টা শুরু হয়েছিল। 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব'-তে স্পষ্টতঃই ঘোষিত হয়েছিল যে, পাকিস্তানপ্রস্তাবের সমর্থনে ও পাকিস্তানের পক্ষে (পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরে) সাহিত্য-অভিযুক্ত নির্মিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর⁵⁷, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রবলভাবে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী কিংবা হিন্দু-সামাজিকতার প্রসঙ্গ রয়েছে বলে তা বর্জনীয়- নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাহিত্য নব্যহিন্দু-জাতীয়তাবাদ বিকাশের আগের

ইসলামীয় রীতিনীতিতে ভিত্তিশীল সাহিত্যের হারিয়ে যাওয়া ধারাকে পুনরায় উজ্জীবিত করবে- এরকম সাহিত্যফতোয়া জারি হয়ে গেছিল। ১৯৪২ সালে যখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ ও প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ সাহিত্যভাবনার অভিমুখ পাল্টে দিচ্ছে, সেই সময়ে ১৯৪২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’^{৫৪} ও ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ’। এই সঙ্ঘগুলোর উদ্দেশ্য প্রচারে ‘রেনেসাঁ’র ওপরে জোর দিতে গিয়ে একদিকে মুসলমান সমাজের জাগরণ-সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলছেন (খেয়াল রাখা জরুরি যে, এই উদ্যোগ উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী জাগরণের বিরুদ্ধ-বয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া চেষ্টা চলছে এবং নবজাগরণের ভিত্তি হিসেবে সরাসরি হিন্দু-উপাদানের বিরোধিতা) অন্যদিকে সাহিত্যে (উপন্যাস ও কবিতায়) আরবি-উর্দু শব্দের পুনরুজ্জীবনে জোর দিচ্ছেন, যা ‘মুসলমান’দের মুখের ভাষা। নব-সাহিত্যগঠনের এই প্রয়াস ও প্রবক্তাদের সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

আবুল হাসানাত এমন অদ্ভুত বানানে তাঁর রচনাটি লেখেন, যা গৃহীত হ’লে মুসলিম বাংলা বানান হয়ে উঠতো ভয়াবহ ও সাহিত্য হতো অপাঠ্য। এ এ রেজাউল করিম ‘পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য’ প্রবন্ধে পাকিস্তানে বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চান, এবং পাকিস্তানি রাজনীতি ও পাকিস্তানি সাহিত্যকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে চান। (আজাদ ২০১৪, ১৮)

‘খোয়াবনামা’-র সাদেক উকিল বা আলেম মাস্টাররা ঠিক যে বিষম্বতা থেকে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন, বঞ্চনার হাহাকার থেকে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করেন, পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও সাহিত্যের ‘স্বঘোষিত’ হর্তাকর্তারাও সেই রাজনীতিকেই ধারণ করেন। গোলাম মোস্তাফার মতো প্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁর ‘নওবাহার’ পত্রিকায় আহ্বান রাখছেন বেহুলা-ভাসান, বেদে-গান, মারফতী ও মুর্শিদীগান বর্জন করার, পুঁথিসাহিত্যকে ব্রাত্য করার কারণ, সে সব ইসলাম অনুসারী নয়! পত্রিকাটি ও পত্রিকা-অনুমোদিত সকল সাহিত্য

কমিউনিজমকে আটকাতে এমন বন্দোবস্তও পাকা হয়ে গেছিল। নবগঠিত পাকিস্তানে ইসমাইল, আব্দুল কাদেররাও তো ‘কমিউনিজম’-কেই আটকাতে চায়। তেভাগা আন্দোলনের বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত হয় ‘বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৪৭)’ কিন্তু সেই বিল পাশ হয়নি কারণ, মুসলিম লিগের মূল শক্তি যতই কৃষকদের সমর্থন নিয়ে বৃদ্ধি পাক, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকাঠামোয় জমিদার-জোতদার-আমলাতন্ত্রই ছিল শক্তিশালী। মুসলিম লিগ সরকার তাদের ‘ভোটব্যাঙ্ক’-র কথা মাথায় রেখেই চাষের জমিতে ভাগচাষির অধিকার ও তেভাগার ‘ফসলভাগের দাবি’-কে স্বীকৃতি দেয়। তমিজের স্বপ্ন পূর্ণতা পাওয়ার দিকে এগোতে থাকে, কেরামতের গান প্রভাবিত হয়। কিন্তু, শেষপর্যন্ত সাদেক উকিল আর ইসমাইলের দ্বন্দ্ব জিতে যায় সাদেক উকিলের মতো প্রভাবশালীরা, মুসলিম লিগের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশও শেষ পর্যন্ত মেনে নেন সেই পরাজয়, বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়,

তেভাগা আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের উনিশটি জেলাতে কৃষকরা ব্যাপকভাবে যে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের ওপর সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লিগ সরকারের পুলিশ যে দারুণ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল সে সম্পর্কে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, কোনও মন্তব্য পর্যন্ত মুসলিম লিগ নেতারা প্রকাশ্যভাবে করেননি... বিলটি [বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল] মুসলমান সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণির সংগঠন মুসলিম লিগের একটি অংশের ‘সদিচ্ছা’র বাহন হয়েই মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় কবরস্থ হল। (উমর ২০১৯, ৯৫-৮)

সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা বিলটিকে কেন পাশ করাতে পারল না, তার একটা বড় কারণ উত্তরবঙ্গের জোতদার-জমিদারদের সহর্ষ বাধাদান। এক্ষেত্রে শুধু ‘মুসলিম’ নয়, বরং হিন্দু জমিদার-জোতদাররাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কারণ, তেভাগা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টিকে রুখতে গেলে উচ্চবর্ণের হিন্দু-মুসলিম ‘ঐক্য’ ছিল জরুরি, নায়েব পূর্ণচন্দ্র নায়েক এবং

শরাফত মণ্ডলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যতই থাক, এই ভাগচাষিদের অধিকারের বিরুদ্ধতায় কোনও দ্বিমত ছিল না। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লিগ নিজেদের স্বার্থে বিভেদের রাজনীতি অনুশীলন করেছে, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ও কৃষকসভার আন্দোলনের বিরুদ্ধে এককাটা থেকেছে। আর, এই ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রভাব যখন সরাসরি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাবিত করে ফেলে, নিঃসন্দেহে সাহিত্যের রাজনীতির প্রসঙ্গ তখন অবশ্য-আলোচ্য। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিতে তমিজসহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের, প্রান্তিক মানুষের থেকে ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্রগঠনের সম্মতি আদায় করা গেলেও, রাষ্ট্রগঠনের পরে সব দায় ঝেড়ে ফেলে আব্দুল কাদের, ইসমাইল।

কিন্তু তমিজটা একেবারে নাছোড়বান্দা, ‘আপনেরা না কছিলেন জমির উপরে বর্গাদারের হক কায়ম করার আইন জারি হবি? ফুলজানের বাপেক আপনার বাপজান জমি থ্যাকা উঠায় ক্যাংকা কর্যা?’

আবদুল কাদের রাগ করলেও হেসে ফেলে, ‘তোরা বাপু এত কথা মনেও থাকে? তোক বাপু এমএলএ করা লাগে।’... সেই খানদানি হাসির চর্চা করতে করতেই জানায়, ‘দুই বছর আগে অ্যাসেম্বলিতে জমিদারি উচ্ছেদের বিল উঠলে বর্গাদারদের সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটা কথা ছিলো। ঐ বিল তো আবার উঠিছে, এই তো কয়দিন আগেই উঠলো। এবার বর্গাদারদের কথা বাদ দিছে।’ (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৯৪-৫)

ইসমাইল, ইয়াকুব বা কাদেররা যতই ভুলে যাক, তমিজ ভোলে না খোয়াবে দেখা তেভগার কথা, ভোলে না শাসকের প্রতিশ্রুতি। তাই ক্ষমতা-কাঠামোর প্রান্তিকতা থেকেই সে শাস্তাহারের গাড়িতে উঠে পড়ে ইসমাইলের কুটুমবাড়িতে থাকা-খাওয়ার লোভ ত্যাগ ক’রে। খোয়াবই তার রাজনীতিকে উসকে দিতে থাকে, ধর্মের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় অন্ধতাকে স্বার্থসিদ্ধিতে লাগানো শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে। ‘খোয়াবনামা’ এখানেই তার রাজনৈতিক উপন্যাসের সার্থকতা অর্জন করে।

একথা স্বীকার্য যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের রাজনীতির মধ্যেই পরবর্তীতে ‘বাংলাদেশ’ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বীজ উগ্ধ ছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদ প্রবলমাত্রায় উপস্থিত ছিল। বাংলা ও মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটে, তাতে হিন্দু-পুনরুত্থান ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। কলকাতাকেন্দ্রিক ও বোম্বেকেন্দ্রিক যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা শক্তিবৃদ্ধি করছিল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে, তাতে ব্যাপক মুসলমান সমাজ তো দূরের কথা, শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-ভদ্র মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণও ছিল সীমিত। অথচ, এর ঠিক ‘বিপ্রতীপ’ পরিসরে শিক্ষিত-ভদ্র-মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ছে রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনের মতো উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ওই শিক্ষিত-ভদ্র-মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের রুচি-মূল্যবোধ-নৈতিকতা ও আকাঙ্ক্ষা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। সেইসঙ্গে রয়েছে ‘ইংরেজি’ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ‘সামনের সারি’তে চলে আসার হেজিমনি-নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশিত সমাজচেতনা। আরবি-ফারসি ভাষার ক্রমসঙ্কোচনে এবং ‘সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)’, ‘ওয়াহাবি বিদ্রোহ (১৮৩১)’ দমনে ব্রিটিশদের হিংসাত্মক দমনমূলক শাসনে ব্যাপক মুসলিম সমাজের সাময়িক বিরূপতা তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি। ১৮৮৫ সালে অ্যালান অস্টাভিয়ান হিউম, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা^{৫৭} তারপরে, সশস্ত্র ও নিরস্ত্র আন্দোলন কিংবা বয়কট ও স্বদেশি কিংবা আবেদন-অনুন্নয় বনাম অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার রাজনীতি- সবেতেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী বয়ান ক্রমেই জোরদার হয়েছে। আর, বিপ্রতীপে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী বয়ানকে নাকচ করতেই উঠে এসেছে মুসলিমদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন, ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠার প্রশ্ন। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘বেঙ্গল ডিভাইডেড (১৯৩২-৪৭)’ বইতে হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির উত্থানের রাজনীতি ও মুসলিম অ-ভদ্রলোকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের অবনতির বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। ‘সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাসের সাহিত্য’

অধ্যায়ে এই সময়পর্ব ও সাহিত্যনির্মাণ নিয়ে আলোচনা করেছি। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বটেই, বাংলাে রাজনীতিতেও মুসলিম রাজনীতির স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ ‘সঙ্কটাপন্ন’ ক’রে তুলল উপনিবেশিত রাজনীতিতে নির্দেশাত্মক অবস্থানে থাকা ভদ্রলোক-বাবুদের। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যসহ একাধিক বিদ্বজন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও তাতে নিম্নবর্গের মানুষদের যোগদান কংগ্রেস ও লিগের রাজনৈতিক অভিমুখকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে লাগল বারবার এবং, ১৯৩৫ সালের ‘গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট’-এ বৃহৎ কৃষকদের ভোটাধিকার (তাঁরা বেশিরভাগই মুসলিম) স্বীকৃত হয়ে যেতে বাংলার রাজনীতিতে ‘বাবু’-দের মৌরসিপাড়া আরও সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ল।

The quest of later generations to create an independent nation state, on the face of it a wholly modern enterprise, was based upon ideologies that equated 'India' with 'Hinduness', and regarded nationalist mobilisation as the awakening and re-invigoration of a long-slumbering Hindu nation. Bhadraklok leaders saw themselves as the standard-bearers of Hindu Bengal's destiny. This was a theme that was to re-emerge powerfully in the Hindu propaganda that accompanied the agitation for the partition of Bengal in 1946-47.

(Chatterji 2002, 14)

১৯৪০-র দশকে বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় স্থান সঙ্কুলান হলো হিন্দু ভদ্রলোকের। ততদিনে যেহেতু হিন্দু বনাম মুসলিম এই বাইনারিকে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে শাসকশ্রেণি এবং নিম্নবর্গ বনাম উচ্চবর্গের বয়ান ‘সামান্য’ পরিসরে হলেও শ্রুতিগোচর হচ্ছে, সেহেতু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের ‘হিন্দুপক্ষীয়’ নেতাদের পক্ষে সহজ হয়ে গেল মুসলমান শাসনের ‘আতঙ্ক’ সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। ১৯৪৬ সালে বিভাগপূর্ব শেষ মন্ত্রিসভায় ১৩ জন মন্ত্রী

মধ্যে ভদ্রলোক-হিন্দু শ্রেণির ‘প্রতিনিধি’ ছিলেন মাত্র দু’জন (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও তারকনাথ মুখার্জী)। ১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মন্ত্রী নিজামুদ্দিন-সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা এবং ১৯৪৬-র ১৬ই অগাস্ট সংঘটিত ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ সম্প্রীতির সমস্ত আবহাওয়াকে বিচ্ছেদের অমোঘ ঘন মেঘে রূপান্তরিত করল। আর, এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য রচনার রাজনীতি বাংলা সাহিত্যে আসন পোক্ত করে নিচ্ছিল।

দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও ভদ্রহিন্দু-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের প্রবল বাধা পেরিয়ে যখন ‘মুসলমান’ পরিচয়কে সামনে রেখে পাকিস্তানবাদী মতাদর্শের ছাতার তলায় লেখকেরা সজ্জবদ্ধ হন, তখন তাঁরা ওই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সাহিত্য-সংস্কৃতির অভিমুখ নির্দেশ করেন। কায়কোবাদের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বলেন, “আজ আপনাদের অনুকরণের কোনো প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন” (১৩) কারণ, হিন্দু-ভদ্রলোক পাঠকসমাজ ও লেখকগোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল যে, মুসলমানরা ভাল বাংলা লিখতে পারে না। সৈয়দ এমদাদ আলী সেইজন্যেই সাহস ক’রে কায়কোবাদের নবসাহিত্য রচনার উৎসাহকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন পাকিস্তানবাদ ও ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে- “কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ সর্বদা আপনারা সম্মুখে রাখিবেন। মনে রাখিবেন আপনারা মুসলমান” (১৪)। রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে আরও স্পষ্টভাবে মেলালে^{৬০} আবুল কালাম শামসুদ্দীন, যিনি পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সংসদের সভাপতি ছিলেন। ‘মোহাম্মদী’, ‘নওবাহার’ ইত্যাদি প্রথম-সারির পত্রিকার ঘোষিত আহ্বানে এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের রাজনীতি স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। আর, এই সাহিত্যকেন্দ্রক রাজনীতির সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে ভাষার প্রশ্ন। পাকিস্তানবাদে যতই ইসলামি ধর্মাদর্শকে মহিমময় ক’রে তোলা হোক, যতই লোককথা-পুঁথি-লোকসংস্কৃতিকে ‘হিন্দু’ তকমা লাগিয়ে ছেঁটে ফেলা হোক, আদৌ কি তা সম্ভব হয়? কারণ, দেশভাগ-পাকিস্তান-ভারত এই রাজনীতির আড়ালে বারবার চাপা দেওয়া হয়েছিল ভাষাগত ঐক্যের প্রশ্ন। ধর্মীয় উন্মাদনার প্রাবল্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও, পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-

পাকিস্তানের ভাষাগত, জাতিগত বিরোধ ক্রমেই ধর্মীয় পরিচিতিতে প্রত্যাখ্যানের দিকে এগোতে থাকল। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই শাসক-শাসিতের ভাষার দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠল, ধর্মগত ‘ঐক্য’-কে সরিয়ে রেখেই। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে পলাশী ব্যারাকের সামনে ‘রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাই’, ‘উর্দু-ভাষার বিরোধীরা কাফের’ সমস্বরের মাঝেও অল্প কিছু স্বর ‘রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা হবে’^{৬১} দাবি তুলে এক নতুন রাজনীতির সূত্রপাত করল। ‘তমদুন মজলিশ’ অগাস্ট মাস থেকেই এই দাবি তুলে আসছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী ‘পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না-করলে শাসককে সমস্যায় পড়তে হবে, এরকম সতর্কবাণীও লিখলেন যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে। আর, এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকেও। (ক) পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য ‘ইসলামি তমদুন’-র বাহন হবে এবং (২) সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ ঠেকাতে হবে ও সাহিত্য-সংস্কৃতি দিয়ে কমিউনিজমকে রুখতে হবে- এই দু’টো নীতিগত অবস্থানের জন্য পাকিস্তানবাদকে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে শাসকশ্রেণি ভুলে গেছিলেন যে, অন্ততঃ যাপনের দৈনন্দিনতায় ধর্মের থেকে ভাষার আধিপত্য বেশি; উর্দুভাষী শাসক বনাম বাংলাভাষী শাসিতের দ্বন্দ্ব ক্রমেই আরও হিংসাত্মক ও জঙ্গি রূপ নিতে শুরু করল। নবগঠিত রাষ্ট্রে শাসকের মতাদর্শ ধারণ করা সাহিত্যিকদের আধিপত্যের ভিড়েও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো সাহিত্যিক ‘সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ’-র তত্ত্বকে প্রশ্নে জর্জর করতে লাগলেন তাঁর উপন্যাসের ভাষা ও কাঠামোয়। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ‘লালসালু’ উপন্যাস শুধুমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসেরই প্রতিচ্ছবি নয়, বরং ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতীও বটে। এই উপন্যাস বারবার পাঠককে সচেতন রাখে এই ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিবোধে, যে, ক্ষমতা-হস্তান্তর, দেশভাগ ও নবরাষ্ট্রগঠনের যুদ্ধনিমিত্তে চাপা পড়েই থেকেছে গ্রামীণ কাঠামো, নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা। দেশের ভেতরে থাকা দেশকে ছুঁতে পারেনি রাজনৈতিক পালাবদল কারণ, ক্ষমতা-কাঠামোর প্রায় কোনও পরিবর্তনই হয়নি। আর, পাকিস্তানবাদী অর্থনীতি-সমাজনীতিও যে শোষণকাঠামোয় কিছুমাত্র পরিবর্তন আনতে পারেনি, তা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক

ঘটনাবলীতেই প্রমাণিত। কিন্তু, পাকিস্তানবাদী সাহিত্যধারার প্রচার-আন্দোলনের যুগের কালস্থানিকতায় ‘লালসালু’-কে বিচার করতে গেলে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা’ প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান যে তিনটি ধারায় বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-অভিমুখ নির্দেশ করতে চান, তাতে স্পষ্টতঃই প্রগতি সাহিত্যের ধারার বিরোধিতা করেন, প্রগতি সাহিত্য ‘ইসলামী নীতিবোধকে লাঞ্ছনা’ ক’রে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এই মর্মে। এই প্রবন্ধে⁶² রবীন্দ্রনাথ ও প্রগতিবাদীদের নব্য-ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকদের তিনটি ‘অবশ্যকর্তব্য’ স্থির ক’রে দেন। তিন নম্বর যুক্তিটি ছিল- “পূর্ব-পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রাম্য জীবনকে আরো বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা” (২২); ‘লালসালু’ এই প্রবন্ধের তিন বছর আগে প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু, তৎকালীন সিংহভাগ উপন্যাস কি এই নির্দেশাত্মক বাক্যকে ধারণ করেই গ্রামীণ সমাজের জীবন ও চরিত্রাবলী যান্ত্রিক আঙ্গিকে উপস্থাপিত করতে শুরু করেছিলেন?

বদরুদ্দীন উমর তাঁর ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ গ্রন্থসিরিজে⁶³ ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক কারণ বিস্তারে বর্ণনা করেছেন। খুব সংক্ষেপে যে ক’টি বিষয় সাজিয়ে নেওয়া যায়,

- ১- তেভাগা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা, নাচোল কৃষক বিদ্রোহ, টঙ্ক বিদ্রোহ।
- ২- সিলেট, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রামসহ আরও বেশ কিছু জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি।
- ৩- ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ। শ্রমিক ও শিক্ষকদের ধর্মঘট এবং ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান।
- ৪- পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করার সময়পর্ব। শিল্প-বাণিজ্য সবক্ষেত্রেই পূর্ব-পাকিস্তানের ‘স্বনির্ভরতা’র বিরুদ্ধে পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণমূলক নীতি প্রণয়ন।

৫- উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা^{৬৪}। মোতাহার হোসেন, আবুল কাসেম সহ একাধিক বিদ্বজ্জন পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করেন ও মিটিং করেন। ‘তমদুন মজলিশ’ বাংলার সপক্ষে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচি শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুর পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে গঠিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (অক্টোবর ’৪৭)’। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দীন ‘বাঙালি জাতিসত্তা’-র প্রতি দমনমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ ক’রে দেন এবং উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা বলবৎ রাখেন। জিন্মাহ ১৯৪৮ সালের অগাস্টে ঢাকায় এই দাবিকেই স্বীকৃতি দেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও শাহাদাতের রাজনীতি এই সন্দর্ভে এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস তথা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রাজনৈতিক উপন্যাসের বিশ্লেষণে এই ইতিহাস ও রাজনীতি অঙ্গঙ্গী। ভাষা-আন্দোলন ও জাতিসত্তার আন্দোলন থেকে যার সূত্রপাত, তারই ধারা প্রবাহিত হতে থাকে পরবর্তী দু’দশকে, ১৯৬৯-র গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনে। আর, ধর্ম বনাম/এবং ভাষার এই রাজনীতি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই এখনও তাৎপর্য বহন করেন। বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাস ভাষা ও ধর্মের রাজনীতিকে কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না; সাম্প্রতিক দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি (NRC) বা সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু ধর্মীয়-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এর বাস্তবতা ফুরোয় নি।

আবুল ফজলের ‘রাঙ্গাপ্রভাত (১৯৫৭)’ উপন্যাস রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাস, দুই সংরূপ-বিভাগেই আলোচ্য হতে পারে। দাঙ্গা-দেশভাগ-বিচ্ছেদের পটভূমিতে কামাল ও মায়া নামী দুই চরিত্রের প্রেম ও তার সাথে জড়িত অ-গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার সমন্বয়। কিন্তু, উপন্যাসের পটভূমি বিশ্লেষণে মনে রাখা জরুরি যে, এই উপন্যাসটি তৎকালীন পাকিস্তানবাদী সাহিত্যধারাকে

অনুসরণ করেনি, বরং ধর্মীয় অনুশাসনের উর্ধ্বে মানবতাবাদী সাম্যের এক স্বপ্নের কথা বলতে চেয়েছে। কিন্তু, আধুনিক উপন্যাসে যে ব্যক্তির বিকাশ ও পটভূমির বিকাশ কাম্য, তা এই উপন্যাসে অমিল, কুশীলবেরা ‘সাদা-কালো’ বাইনারি ও নিজ নিজ আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর; লেখক তাঁর নিজেরই আদর্শ ও স্বপ্ন চারিয়ে দিতে চান কুশীলবেদের মধ্যে, তাঁদের সংলাপে ও পারস্পরিক সম্পর্কে। সত্যেন সেন তাঁর ‘পদচিহ্ন (১৩৬৬)’ উপন্যাসে যেভাবে এক মুসলিম যুবকের অনুসন্ধানে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-অধ্যুষিত (সংখ্যালঘু) সমাজের খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা ঠিক যেন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা উপন্যাসে হিন্দু যুবকের দ্বারা মুসলিম সমাজের অনুসন্ধানের পরিপূরক। বিভাগান্তর কালে মুসলিম যুবক আনিস পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হয়ে থেকে যাওয়া হিন্দু সামাজিকতার ছবি দেখতে পায়- যেখানে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, ঐতিহ্য-পরম্পরা ও মানবতা, প্রেম সবই উপস্থিত।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ওঠা এবং স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যাত্রায় রাজনীতি প্রভাবিত করেছে সাহিত্যকে, সরাসরি তা স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসে। শহীদুল জহির ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসের ভাষা এবং আঙ্গিক সাহিত্যের রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা এই সন্দর্ভে বিচার্য।

ভূত ও রাজনৈতিক সাহিত্য-

Stephen M Hart তাঁর ‘Magical Realism in the Americas’ প্রবন্ধে টনি মরিসনের ‘বিলাভেড’ এবং গার্সিয়া মার্কোজের ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড’-এর তুলনা করেছেন, জাদুবাস্তবতার রাজনৈতিক চর্চা করতে গিয়ে। আর, এখানেই এনেছেন অলৌকিক ও ভূতের প্রসঙ্গ। বিলাভেড উপন্যাসটিও গণবিস্মৃতির বিরুদ্ধে বয়ান হয়ে ওঠে, যেমন হয়ে ওঠে শতবর্ষের

নিঃসঙ্গতা বা খোয়াবনামা। বিলাভেড ও শতবর্ষের নিঃসঙ্গতার যে তুলনাবিন্দুগুলো খুঁজে পেয়েছে স্টিফেন হার্ট, সেগুলো হল,

(i) the portrayal of ghosts in a mundane context, (ii) the use of ghosts to allude to a subalternised supernatural, (iii) the use of the supernatural as a means of drawing attention to the ideological rifts within a given society, that is, highlighting the fact that what exists for one group does not exist for another. This rivenness is, as we have seen, central to the notion of magic realism. The supernatural is presented in Morrison's novel in a gradual sense. (Hart 2007, 90)

‘খোয়াবনামা’-র ক্ষেত্রেও এই তিনটি যুক্তি বিচার্য। উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদেই ব্রিটিশবিরোধী মুনসির ভূত হয়ে যাওয়ার খবর জানিয়ে দেওয়া হয় পাঠককে। ইতিহাসের ধরতাই এই অংশ থেকেই। মুনসির ভূত আখ্যানে জীবন্ত থাকে, লোকবিশ্বাসে জেগে থাকে, যতক্ষণ ওই পাকুড়গাছ থাকে। কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছে বসেই তার শাসন; তমিজের বাপের সঙ্গে কথোপকথন। অবিশ্বাসী যুক্তিবাদী আধুনিকতায় এই কথোপকথন ভিত্তিহীন, কিন্তু কাৎলাহার বিলের আশেপাশের মানুষের জগতে মুনসি, তাঁর মিথ, তমিজের বাপের শোলোক পাওয়া সর্বেরই বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। মুনসিকে খুঁজতে গিয়েই একদিন চোরাবালিতে তলিয়ে যায় তমিজের বাপ, সেও তো ভূত হয়ে যায় তারপরে। আর, তমিজের বাপের ভূত কী অনর্থক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে, যা প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সম্পর্ক সবকিছুর ভিত্তি ধাক্কা দেয়।

পায়ের দুটো ঘা থেকে তার আধপেটা গতরের গন্ধ নিতে কুলসুম হাত বোলায় তমিজের হাঁটুতে আর উরুতে। আর তমিজের বাপ অনেক দূরে কাৎলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয়

তমিজের তবন আর কুলসুমের শাড়ি। গরহাজির মানুষটার গায়ের ওম পেতে আর গায়ের গন্ধ ঝুঁকতে দুজনে ঢুকে পড়ে দুজনের ভেতরে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৫৫)

তমিজের বাপের ‘খোয়াব’ এরপর থেকেই একটু একটু ক’রে গ্রাস করতে থাকে তমিজকে। বাপের ভূত তমিজের চেতনায় বদল ঘটাতে থাকে; আর, এরপরেই তো তেভাগার খোয়াব এবং জোতদারি-জমিদারি অবসানে কৃষকের জমির অধিকারের খোয়াব আরও বাড়তে থাকে তার। কথকও জানেন তমিজের বাপের এই ‘ভূত’ হয়ে ওঠা- “চোরাবালির ভেতর থেকে তমিজের বাপ আজকাল রোজ রোজ আসে, কুলসুমের সঙ্গে এটা ওটা কথাও বলে। তা মানুষটা আগের মতোই আছে, কথাবার্তা তেমনি কম।”, কুলসুমই একমাত্র সেই ভূতকে দেখে ও কথপকথন করে আর তমিজ অনুভব করে মাত্র। ঠিক যেমন তমিজের বাপই একমাত্র কথপকথন পারে বহুযুগের ওপার থেকে আসা মুনসির সঙ্গে। ‘বিলাভেড’ বা ‘হাড্রেড ইয়ার্স অব্ সলিচ্যুড’-র মতোই এই ভূতকে নিয়ে কোনও গা-ছমছমে অশরীরী প্রেতাঙ্গার আখ্যান শোনাতে বসেন না কথক; কিংবা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘অডুতুড়ে সিরিজ’-র উপন্যাসের ভূতদের মতো কোনও গোঁড়া ভাববাদী চেতনা, অজ্ঞেয়বাদ, ভাল-মন্দ বাইনারির নৈতিকতা ঠিক ক’রে দিতে চাননা ইলিয়াস। এই ভূতেরা সেতুসূত্র হয়ে থাকে। মুনসির ভূত তো মাঝিদের দ্রোহে ইন্ধনও জোগায়! তমিজের বাপ স্পষ্ট শোনে মুনসির আদেশ কেরামতের সুরে-

মণ্ডলে করিল কবজা মাঝির কাৎলাহার

কাঙাল মাঝিপাড়ায় ওঠে করুণ হাহাকার।।...

কেরামতে ডাকে মাঝি জলে ফেলো জাল

মাছ ধরো মণ্ডলেরে করো হে নাকাল।। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৮৯-৯০)

তমিজের বাপ শরাফত মণ্ডলের দখলে থাকা কাৎলাহার বিলের বাঘাড় মাছ ধরতে গিয়ে বহু-আকাজ্জিত মুনসির দেখা পায়, ‘গোলাপি কুয়াশায় ঢাকা সাদা দাড়ি, বুকের লোহার শেকলে ঝনঝন আর গলায় না পুরট হওয়া গুলির ফুটো’ নিয়ে মুনসি তাকে শাসন করতে আসে।

স্টিফেন হার্ট যেমন ‘সুপারন্যাচারাল’ বা অলৌকিক খুঁজছেন বারবার জাদুবাস্তবের আখ্যানে, সেই অলৌকিকই তো ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানকাঠামো। তমিজের বাপই কখনও তার কেন্দ্র; তাই শরাফত মণ্ডলের নাতি হুমায়ুন মারা যাওয়ার পরে শরাফতের বড় ছেলে আব্দুল আজিজ তাকে দেখে ভয় পায়⁶⁵ এবং হামিদা অলৌকিক স্বপ্নের ঘোরে, পাওনা-শোলোকের ভয়ঘোরে তমিজের বাপকেই দেখতে পায়। অন্যদের উপন্যাসের কুশীলবেলা একে একে মারা যাওয়ার পরে তারা আখ্যানেই থেকে যায়, অন্য কুশীলবেলা তাদের কোনও অলৌকিক সন্ধান পেয়ে যায়। তমিজ মারা গেছে কি যায়নি, এই সংশয়ের মধ্যেই ফুলজান দেখে, “তাই কি সে [তমিজ] গুলি-খাওয়া মুখে এসে ঢুকে পড়েছে গোলগাল চাঁদের গতরে? তাই কি চাঁদটাকে এমন ভুতুড়ে দেখায়?”⁶⁶ আর, তমিজ ও ফুলজানের মেয়ে সখিনার মধ্যে এক আশ্চর্য অব্যখ্যাত ভাবান্তর দেখে সখিনা, সখিনা ‘জোনাকির হেঁশেলে ভাত রান্না’ হতে দেখে এবং সখিনার মধ্যেই ফুলজান তমিজের বাপ-মুনসি-তমিজ সকলেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। “মানুষে কয়, পাকুড়তলার চোরাবালির ভেতর তমিজে বাপ নাকি মাঝে মাঝে গা মোচড়ায়”⁶⁷ - এই অলৌকিক দৃশ্যাবলীর মাঝেই কথক ফিরে যান সেই ইতিহাস-বর্তমান যুগলবন্দির পরাবাস্তব কথনে এবং আখ্যানের শুরুতে যা ছিল তমিজের বাপের বর্ণনা তা-ই সখিনার বর্ণনা হয়ে ওঠে। বহুযুগ আগের মজনু শাহ মুনসিদের ভূত হয়েও বেঁচে থাকা, তমিজের বাপ তমিজের ভূত হয়ে থেকে যাওয়া এবং পরাবাস্তব বর্ণনাগুলোর পরেও যা একমাত্র উজ্জ্বলতা নিয়ে জেগে থাকে, তার নাম খিদে! তমিজের বাপের খিদে সখিনার খিদেতে বদলে যায়। ঔপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্বে যা হাস্যকর, অবাস্তব, মিথ্যে তারই বিপ্রতীপে শোষিতের উপনিবেশিতের প্রবল-বাস্তব। স্টিফেন হার্ট তাঁর প্রবন্ধে ‘Beloved’-এ অতিলৌকিকের ব্যবহার নিয়ে লিখছেন,

What is important about the supernatural as presented in *Beloved* is that it is a subalternised reality, that is, it is directly expressive of societal oppression... The novel, as we can see, is constructing a web

of associations between the unconscious, the socially repressed, women within a patriarchal society, and, last but not least, the ghost of what Baby Suggs calls “some dead Negro’s grief”. (Hart 2007, 91)

ভূতদের আধিপত্য ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তেও অব্যাহত। অবদমিত নিম্নবর্গের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শাসকের দমনমূলক আধিপত্যের বিরুদ্ধতা এবং সমস্ত আর্থ-সামাজিক শোষণকাঠামোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণজাগরণ- এই ইতিহাস বহু শতাব্দীর এমনকি সহস্রাব্দের। এঁদের অধিকাংশই ইতিহাসের পাতায় ছিলেন না, এঁদের ‘গুরুত্বহীন’ মতামতকে পাতা দেয়নি উচ্চবর্গ (এমনকি সেই উচ্চবর্গ বিজিত হলেও)। ওসমান বা খিজির সেই অস্তিত্বহীনেদের উপস্থিতি টের পায় পূর্ববঙ্গের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে। গণঅভ্যুত্থানের মিছিল দেখে ওসমানের ‘গা ছমছম’ করে, কারণ মধ্যবিত্ত-ভদ্র-শিক্ষিত আধুনিক মননের যুক্তিবাদী দেয়াল ভেঙে পড়তে চলেছে। আর, এই গা ছমছম আসলে শাসকেরও।

মহল্লার জ্যান্ত মানুষদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে ১০০ বছর আগে সায়েবদের হাতে নিহত মিরাতের সেপাই, বেরিলির সেপাই, লক্ষ্মী-এর মানুষ, ঘোড়াঘাটের মানুষ, লালবাগের মানুষ... এই এলাকার সবাই জানে ভিক্টোরিয়া পার্কে পামগাছগুলোর সঙ্গে ফাঁসিতে লটকানো সেই সব মানুষ অমাবস্যায়, পূর্ণিমায়, প্রতিপদে, একাদশীতে- মধ্যরাত্রি হলেই মহল্লা জুড়ে টহল দেয়, শত্রুপক্ষের গুলিগালাজের আওয়াজ শুনে তাদের কণ্ঠনালীতে, জিভে ও টাকরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, মহল্লা মাত করে জীবিত মানুষের সঙ্গে তারা শ্লোগান দেয়, ‘মানি না! মানি না!’... ওসমান দ্যাখে যে কলকাতাবাজারের কবন্ধটাও মিছিলে যোগ দিয়েছে। অমাবস্যার রাতে, পূর্ণিমার রাতে মুণ্ডুহীন এই সেপাই ছুটে বেড়ায় নবদ্বীপ বসাক লেন, নন্দলাল দত্ত লেন, নাসিরুদ্দিন সর্দার লেন ও পাঁচভাইঘাট লেন জুড়ে। (ইলিয়াস ২০১৫, ২৪২)

মিলিটারির গুলি, কার্ফুর মধ্যেই ওসমান এই মিছিল দেখে আর সেই মিছিলের পুরোভাগে রয়েছে খিজির; ‘আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো- দিকে দিকে আগুন জ্বালো’ স্লোগানে তারই সাথে গলা মেলায় ওই ভূত, কবন্ধেরা। আর, তাদেরই কেউ ওসমানসহ ভদ্রমহল্লার বাড়ির লোকজনকে চেতিয়ে দিতে থাকে মধ্যবিত্ত-ভদ্রদের গা-জ্বালানো গালাগালির ভাষায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ‘পুরুষ’দের অপমানের ভাষায়, “বিবিজানের সিনার মইদ্যে খোমাখান ফিট কইরা নিন্দ পাড়েন না ভাইসাবেরা...” (২৪২) ওসমানের এতদিনের যাবতীয় দোদুল্যমানতা তখন ঝুঁকে পড়ছে বিদ্রোহের দিকে, মিলিটারির কার্ফুকে অগ্রাহ্য করে অবাস্তব, ভূত ও ‘অস্তিত্বহীন’-দের ডাকে ওসমান তার চিলেকোঠায় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আশায়। আর, কথক ঠিকই বলেন যে, অত ভূত আর গা ছমছমে পরিবেশেও “ওসমান সামলে নেয়... না, তার ভয় কি?” আর, তখনই ওই গা ছমছমে পরিবেশ শাসকের জন্যে ও বিদ্রোহে যোগ না-দেওয়া মধ্যবিত্ত-নিরাপদ-নিশ্চিন্ত শ্রেণীর জন্যে বাস্তব হয়ে যায়। ওসমানকে, ওসমানদের দিকে বিদ্রোহের বার্তা ছুঁড়ে দেয় কোন খিজির? যে খিজির ওই কার্ফু-ভাঙ্গা মিছিলেই শহীদ হয়ে যাবে। যে খিজিরের নিজেরও ‘গা ছমছম’ করে ‘মহল্লার বহুকালের পুরনো বাসিন্দারা’ তাদের মিছিলে যোগ দেওয়ায়। “কিন্তু তার ভয় করে না; জীন বলো মাহাক্কাল বলো- আজ সবাই মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে” (২৫৮) আর, ওই যে ‘মানুষ’, তাদের মধ্যে আছে ভাড়ার রিকশাওয়ালার দল, গ্যারেজের তোতামিয়া ও অন্য শ্রমিকরা, রুটির কারখানার শ্রমিক, জুতো-কারখানার শ্রমিকেরা এবং স্কু-ড্রাইভার হাতে জুন্মন ও ‘পিচ্চির দল’। ভূতেরাও তাদের সঙ্গেই মিছিলে মেশে, যাদের সঙ্গে তাদের শ্রেণি-বন্ধুত্ব হয়। সেইজন্যেই শওকত, আলাউদ্দিন এরা কেউই ভূতদের দেখতে পায়না, তাদের স্লোগান শুনতে পায়না। কমিউনিস্ট কর্মী আনোয়ারও তার প্রবল যুক্তিবাদী আধুনিক মনন দিয়ে ওসমানের অনুভব-উপলব্ধিকে উড়িয়ে দেয়। ওসমানকে শেষ অবধি চিলেকোঠার ঘরের সব আগল ভেঙে, তার মানসিক সংশয় ও বন্দিদশা ভেঙে উদ্ধার করে আনে খিজিরের ভূতই। কিন্তু, রহমত, আনোয়ার, আলাউদ্দিন, রঞ্জুদের

কাছে ওসমান ‘স্কিজোফ্রেনিয়া’-র রুগী, মানসিক বিকারগ্রস্ত। ইলিয়াস জানেন যে, তাঁর এই রাজনৈতিক উপন্যাসের পাঠক বিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে এবং তাদের আধুনিক-বিজ্ঞানবাদী মনন ভূতের অস্তিত্ব কিছুতেই বিশ্বাস করবে না; আর, ইলিয়াস নিছক ভূতের গল্প মোটেই ফাঁদতে চাননি। তাহলে এই ভূতের প্রসঙ্গ কেন? এই ভূতেরা আসলে শ্রেণিবিচ্যুতির সাঁকো, এই ভূতেরা অতীতের সমস্ত অসফল বিক্ষোভ-বিদ্রোহের বাহক। কিন্তু, ভূতে অবিশ্বাসী আধুনিক পাঠকদের পাঠচেতনায় তাদের প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে যুক্তিনিষ্ঠার উপন্যাস-মডেল ভেঙে পড়তে পারে বলেই ‘মিডিয়াম’ হিসেবে বেছে নিতে হয় ওসমানকে এবং তার মানসিক ভারসাম্যহীনতাকে। ইলিয়াস নিজে ওসমানের এই মানসিক স্থিতি হারানোকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে,

Osman turned mad and you are questioning this madness. But what I am trying to say is this that if someone wants to come out of his middle class hole, he has to be to that measure estranged from his middle class life and attitude, which will provoke the middle class to call him mad. In fact, he has to be mad.⁶⁸

কিন্তু, তারপরেও যে প্রশ্নটা থেকে যায়- রাজনৈতিক উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে কেন ইলিয়াস কুশীলব ওসমানের মানসিক স্থিতি নষ্ট ক’রে দিচ্ছেন? খিজিরও তো ওসমানের মতোই উপলব্ধি করছে ভূত ও অতীতের উপস্থিতি, কিন্তু তার তো মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে না। সে মিলিটারির গুলিতে শহীদ হচ্ছে এবং তার ভূত ওসমানের রাজনৈতিক অভিমুখ শাসকের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এর উত্তর কি লুকিয়ে আছে গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবিত্তের ভূমিকা নিয়ে ইলিয়াসের অসন্তোষের ভেতর? ইলিয়াস কোনওভাবেই উপন্যাসকে আর মধ্যবিত্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা বিকাশের ভরসায় ফেলে রাখছেন না; মধ্যবিত্তের বরাবরের যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দখল করার লোভ, তাকে প্রত্যাখ্যান করে নিম্নবর্গের দ্রোহাকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রাতিগ

করতে চাইছেন। খিজিরের মতোই তাই ভাবতে বাধ্য হচ্ছে ওসমান, আনোয়ারকে প্রভাবিত করেছে চেংটু বা আলিবক্তের মতো গ্রামীণ নির্বিকার এবং ‘পাগল’ ওসমান যে বহুপথের সামনে দাঁড়িয়ে মতাদর্শের সফল উদ্যাপন খুঁজছে, তা রুচিবান-সংস্কৃতিবান-নিরাপত্তাকামী-ভদ্র মধ্যবিত্ত পাঠককে পাঠতৃপ্তি দিয়ে পারছে না। শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের ব্যাখ্যায়,

This is the hallucinatory vision of a person who has been branded ‘scizophrenic.’ What he dares to see or imagine cannot be observed by the million balanced and sane who have already opted for Sheikh Mujib’s call for peace and order. The latter represent the majority whose obligation is to cure the society of this madness. (Dasgupta 2018, 45)

শুভরঞ্জন ফুকোর যুক্তি-প্রতিযুক্তির আলোচনায় আসছেন। যুক্তিহীনতার অমরত্ব বিষয়ে ফুকোর মতামতের বিশ্লেষণ করছেন ওসমানের মানসিক ভারসাম্যহীনতা বিচার করতে গিয়ে। কিন্তু, শুভরঞ্জন যা করছেন না, তা হল সাহিত্যের উদাহরণে এই ‘মানসিক ভারসাম্যহীনতা’-র বিশ্লেষণ। নির্বিকারের দ্রোহচেতনায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত আখ্যানের কেন্দ্রস্থান নির্বিকারকে ছেড়ে দিয়ে সরে আসছে কিংবা নিম্নবর্গের মিছিল-নৈরাজ্য উদ্যাপন মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-ভদ্র স্বরচিত বৃত্ত থেকে আখ্যানকে বের ক’রে নতুন সমাজ ও প্রোটোগনিস্টকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে- এমনটা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কবে হয়েছে? আর, এই ভূতদের উদ্যাপনে জীবন্তদের যোগদানের উৎসবে তো বাস্তবতার, যুক্তিবাদের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আবছা হতে থাকে আরও। ‘Beloved’-র বিশ্লেষণে জেন স্মাইলি যেমন বলছেন,

Even though Morrison rejects realism, using a heightened diction and a lyrical narrative method returning again and again to particular

images and events and adding to them so they are more and more fully described, the reader never doubts the reality of what Morrison reports... the reader is shocked at the sufferings of the black characters and the brutality of the whites, but knows at once that every torture and cruelty is not only plausible but also representative of many other horrors that go unmentioned in the novel and have gone unmentioned in American history. (Smiley 2006, theguardian.com)

এই ‘ব্রুটালিটি’, শাসকের হিংস্র অত্যাচার ‘চিলেকোঠার সেপাই’ আখ্যানেও প্রত্যক্ষ করা যায়- পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সংস্কৃতির ওপরে নির্মম শোষণ করে পাকিস্তানী শাসক। ১৯৬৯ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে সরিয়ে দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার। কিন্তু, অব্যাহত থাকে সামরিক শাসন এবং অব্যাহত থাকে আর্থ-সামাজিক শোষণ। আর, ক্রমশ জনরোষও বাড়তে থাকে। ’৬৮-’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। তবে, এই পর্যায়েও বৃহত্তর নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা-শোষণমুক্তি ও সমাজকাঠামো বদলের স্বপ্নকে উঠতি শাসকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার ক’রে নিল। ‘বাংলাদেশ’ গঠনে অতীতে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের একটা ‘প্রায়শ্চিত্ত’ ঘটলেও, পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর জনগণকে কোনও স্থায়ী মুক্তির দিশা দিতে পারল না। ইলিয়াস বা রুদ্দ মহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো লেখকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির ও ধনিক গোষ্ঠীর সে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বারবার তাঁদের সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন। আর, ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তেও সেইজন্যেই কি খিজিরের ভূতের সঙ্গে মানসিক ভারসাম্যহীন ওসমান দৌড়তে দৌড়তে এসে থামে অনেকগুলো পথের সন্ধিস্থলে? মুক্তসমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন ইলিয়াস; আর, এই ইঙ্গিত গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনৈতিক দিশারও প্রতীক,

তাহলে সে রাস্তা ধরলো কোনদিকের?- এখন থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়।
ওসমান কোথায় যেতে পারে? নর্থব্রুক হল রোড ধরে শ্যামবাজার গেলে সামনে
বুড়িগঙ্গা... ট্যাকসি-স্ট্যান্ডের ভেতর দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু বাঁয়ে রেখে শাঁখারি পল্লি
ক্রস ধরে চলে যেতে পারে ইসলামপুর... আবার ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে জনসন রোড
হয়ে নবাবপুর ধরে দৌড়ালে পৌঁছে যাবে গুলিস্তান... ভিক্টোরিয়া প্রকরের উত্তরে পুরনো
পানির ট্যাঙ্কের সামনে দিয়ে কলতাবাজার হয়ে ওসমান ছুটে পারে দোলাই খালের
দিকে। (ইলিয়াস ২০১৫, ৩০৮-৩১০)

ইতিহাস-অতীতের সঙ্গে ভূতদের ফিরে আসা, থেকে যাওয়া ও বর্তমানের জীবন্তদের প্রভাবিত
করার উদাহরণ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে কম হলেও, অমিল নয়। ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’
আখ্যানেও তো এই উদ্‌যাপন চলে, অতিলৌকিকের উদ্‌যাপন। দণ্ডবায়স, বেগম জনসন^{৬৯} এঁরা
মৃত, বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু, অতীত আধিপত্য করে বর্তমানের ওপর। এবং এঁরা
ফিরে আসেন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েই, নিম্নবর্গের দ্রোহচেতনাকে উস্কে দেন আরও এবং
দ্রোহধর্মী অন্যান্য কুশীলবের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেন। এই বেগম জনসন ও দণ্ডবায়সের
নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাঁদের কথিত ইতিহাস শাসকের বলা/লেখা ইতিহাসকে প্রত্যাহ্বান
জানাতে থাকে।

সাহিত্যে ভূতের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ‘অডুতুড়ে
সিরিজ’ তথা শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা উপন্যাসগুলোতে ভূতদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। বাংলা
উপন্যাসের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুপঠিত এই উপন্যাসগুলোতে ভূত ও অলৌকিক আসলে রহস্য,
কৌতুক ও নৈতিকতার আদলে ‘চরিত্র’ গঠনকারী এবং শিশুমনের ওপর প্রভাব-বিস্তারী। যদিও,
এই উপন্যাসগুলোকে ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, কিন্তু লেখকের
আধ্যাত্মিক-রাজনৈতিক মতাদর্শ সচেতনভাবেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তথা শিশু-কিশোর মননকে
নিয়ন্ত্রণ করে। এই উপন্যাসের ভূতেরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও ‘বাবু’ বা রাজার অধস্তন ও

পরম অনুগত এবং সেই বাবু বা রাজার উত্তরপুরুষদের রক্ষা করে বিভিন্ন অলৌকিক উপায়ে। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া গুপ্তধন বা মূল্যবান সম্পদ বহুযুগ পরে ওই উত্তরপুরুষকে পাইয়ে দেওয়াই ভূতের মূল উদ্দেশ্য। সমস্ত দুর্যোগের পরেও নিয়তিরই জয় হবে। আর, কোনও কোনও উপন্যাসে ‘ভূত’ সরাসরি না থাকলেও, অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনাবলী অবশ্যই থাকে, যা নির্দিষ্ট আখ্যানকাঠামোকেই বজায় রাখে। কী এই আখ্যানকাঠামো? কাহিনির প্লট তৈরি হবে কোনও বিশেষ নামের (পটাশপুর, নবীগঞ্জ বা হেতমগড়) জনপদে; জনপদ এই জন্যেই যে, সেখানে শহুরে আধুনিকতা প্রায় পৌঁছায়নি, আবার গ্রামীণ পরম্পরার মধ্যে বদল আসতে শুরু করেছে। সেইসব জনপদে সামন্ততান্ত্রিক বিশ্বাস ও রক্ষণশীলতা এখনও প্রবল আবার জনপদটির বাইরের দুনিয়ার কিছু খবরাখবরও ছড়িয়ে পড়ে। লেখক জনপদের বাইরের পৃথিবীর সেটুকুই আখ্যানের ‘ভাল’-দের দিয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়ে নেন, যতটুকুতে রক্ষণশীলতা-ধর্মবিশ্বাস-পরম্পরা-অনুশাসন অটুট থাকে। আর, এই ভাল বা ‘সাদা’দের বিপ্রতীপে ‘খারাপ’ কুশীলবেরা, যারা পূর্বোক্ত চারটি বিষয় মানে না। উপন্যাসের কাঠামোয় কুশীলব নির্মাণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সচেতন শীর্ষেন্দু। মূল দ্বন্দ্ব শুভ বনাম অশুভ, বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাসের। আর, দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয় রাজপুরুষ বা ব্রাহ্মণ-উচ্চবর্ণের বংশের সঙ্গে অধস্তন কর্মচারী বা নিম্নবর্ণ-নিম্নবর্ণের কোনও ব্যক্তির/দলের। ভাল-মন্দের চিরায়ত মোড়কে সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো (Hierarchy) বজায় রাখা, সামাজিক স্তরবিভাগগুলোকে সযত্নে লালন করা। কোনও ‘উচ্চ বংশ’ বা কুলীন বংশের সন্তান যদি বিপথেও যায়, তবে ঠিক সময়ে তার ‘আভিজাত্য’ ঝলসে ওঠে, ডাকাতির দলে বড় হয়েও রাজবংশের সব সদগুণ (চেহারা, চরিত্র ও বিচারবুদ্ধি) তার মধ্যে থাকবেই⁷⁰। অতিলৌকিক ঘটনাপরম্পরা বা ভূত সেই অভিজাত, প্রতিষ্ঠিত ও কুলীন সন্তানকে ঠিকই তার প্রাপ্য সুযোগ ও মর্যাদা পাইয়ে দেবে। বিপদে পড়েও শেষে নিয়তির ভূমিকায় রক্ষা পাবে তারা, ঝলসে উঠবে পুরুষকার। ‘ভাল’রা মেধাবী এবং অনায়াসে তাকলাগানো ফলাফল তাদের (কেউ সামান্য হোঁচট খেলেও কোনও ভূত তাকে প্রাণপণ সাহায্য করে) এবং ‘খারাপ’রা সদ্বুদ্ধিহীন,

শেষবেধে বসা; তারা খেলাধুলায় ভাল কিন্তু উচ্ছলে যাওয়া⁷¹। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট প্রতীকমূলক গোপাল-রাখাল দ্বন্দের আধুনিক প্রতিরূপ এই চরিত্রগুলো; এবং মিল এই যে, এগুলোও মূলত শিশু-কিশোর পাঠ্য আর, নৈতিকতা-অনুশাসন-মূল্যবোধ এরও পরতে পরতে মিশে আছে। শীর্ষেন্দু সচেতনভাবেই এই বাইনারির মধ্যে নিয়ে আসেন অজ্ঞেয়বাদী দর্শন⁷² এবং বস্তুবাদ অপেক্ষা ভাববাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। সেইজন্যেই বালক বুরুনের মুখ দিয়ে বলাতে হয়, “আমি শুধু সায়েন্সের কথা ভাবছিলাম, মনে হল সায়েন্স এখনো অনেক কথা জানে না” (মুখোপাধ্যায় ১২) এবং এই ভাববাদ, ধর্মবিশ্বাস প্রতিটি ‘অদ্ভুতুড়ে’ আখ্যানেই থাকে। বুরুনকে বশীকরণ থেকে জাগানোর জন্যে করালীস্যার বলেন রাম কবিরাজের শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্র বলেন, “বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো”, যা এই উপন্যাসে মোটিফ-বাক্য। কিন্তু, অঙ্কের কথা বারবার এলেও, অঙ্ক বা বিজ্ঞান কিছু সমাধান করতে পারেনা, যা পারে বিশ্বাস-সংস্কার; আর, ‘বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো’ বাক্যে ‘অঙ্ক’ শব্দটা থাকলেও, তা ব্যবহার হয় বশীকরণ কাটানোর মন্ত্র হিসেবে! ‘দুধ সায়েন্সের দ্বীপ’ উপন্যাসে অধস্তন সচ্চরিত্র ‘ভাল’ লোক বলে, “বিজ্ঞান কি আর ভাল জিনিস? বিজ্ঞান অ্যাটম বোমা বানায়, ভগবানের নামে নিন্দেমন্দ করে, ঐটোকাটা মানে না” (৯-১০); উল্লেখ্য দ্বিতীয় বাক্যের তিনটি অংশ- অ্যাটম বোমা বানানোর সঙ্গে ঐটোকাটা না-মানার তুলনা এবং এই বাক্য উচ্চারণ করছে ‘ভালমানুষ’ একজন! অ্যালোপ্যাথির থেকে আয়ুর্বেদ বড়ো, বিজ্ঞানের থেকে অজ্ঞেয়বাদ- আয়ুর্বেদের জোরেই রহস্য সমাধান করে ‘সৎ, আদর্শবাদী, তেজী’ রাম কবিরাজ যিনি সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্গ এবং আভিজাত্যে-স্টেটাসে কুলীন। আর, এই কৌলীন্যই রক্ষা করে রাজা বীরচন্দ্রকেও। রাজবাড়ি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও এবং পুরনো আমলের ঠাঁটবাট অন্তর্হিত হলেও, আভিজাত্য এবং সামন্ততান্ত্রিক পরম্পরা থেকে যায়; ক্ষমতা-কাঠামো আর ভূতাদের আচরণও সের’মই থাকে। তাই, “মোহন রায়ের বাঁশি বংশ পরম্পরায় বাজে” (৯৩) এবং ‘ভাল’ লোক ব্রাহ্মণ পুরোহিত মাধব ঘোষাল তলোয়ার চালনা প্রসঙ্গে বীরচন্দ্রকে বলে, “তোমার রক্তেই শিক্ষাটা আছে। চিন্তা কোরো না।”⁷³ আর, এই একই কথা

‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’-র রাজা কন্দর্পনারায়ণের ক্ষেত্রেও মনে করিয়ে দেন লেখক। ‘নবীগঞ্জের দৈত্য’-তেও অলৌকিক কর্মকাণ্ড বজায় থাকে। অধস্তন কর্মচারী শঙ্কর সেনাপতির উত্তরপুরুষ কিঙ্কর সেনাপতি রাজা পূর্ণচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে, উপন্যাসের অন্যান্য কুশীলবেরাও। অথচ, এই রাজারা একসময়ে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল। ‘ছায়াময়’ উপন্যাসের আখ্যানধাঁচও একই- রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষকে সম্পত্তি ও গুপ্তধন (মোহর) পাইয়ে দিতে রাজার সভাকবি চন্দ্রকুমার ‘ভূত’ হয়ে ফিরে আসে; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ‘মোহ’ কাটিয়ে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ ফেরে মোহর উদ্ধার করতে, সেটাও ওই ভূতেরই চেষ্টায়। অন্যদিকে, জীবিতরাও প্রাণপণে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপকে সাহায্য ক’রে সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য বজায় রাখতে চায়; তাই, নকুড় কর্মকারের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ হরিপদ কর্মকার বংশপরম্পরা মনে করে। আর, ব্রাহ্মণ্যবাদী কাঠামো মেনেই লক্ষ্মণ পাইক, গগন সাঁপুই, কালু দাসেরা খারাপ এবং পটল গাঙ্গুলি, নটবর ঘোষেরা ভাল। রাজার বহু বদ্গুণ এবং খুনের নজির থাকলেও⁷⁴, ‘রাজা’ বলেই তাঁর সব অপরাধ মাফ হয়ে যায় এবং তাঁর গুপ্তধন উত্তরাধিকারের হাতে তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত। মুক্তমনের সঙ্গে রক্ষণশীলতা, আধুনিকতার সঙ্গে সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব রক্ষণশীলতা ও রাজতন্ত্রই জিতে যায়, ‘রায়বাবু’, যিনি শহুরে আধুনিকতা কিছু উপভোগ করেন পুরনো মূল্যবোধকে ফেলে, তিনিও হয়ে যান ‘খারাপ’ চরিত্র। ‘দুধ সায়েরের দ্বীপ’-এর রসময় চক্রবর্তী বা উর্ধতন অফিসার গগনবাবু রাজবাড়ির মর্যাদা রক্ষা করেন এবং অধস্তন সেপাই ‘মানসিক সমস্যায়ুক্ত’ ক্ষেত্রীকেই হতে হয় মূল অপরাধী। এই উপন্যাসগুলোতে ভাল লোকেরা যেমন উচ্চকুলীন বংশ বা রাজারাজড়া হয়, তেমনই ‘খলনায়ক’ বা এলেবেলে চরিত্রদের পদবী হয় নিম্নবর্গের। গড়াই, হালদার, দুলে, কোঙার দাস- চোরদের পদবী⁷⁵; ভাল লোকেদের পদবী ঘোষাল, কবিরাজ বা সান্যাল এবং তাদের নাম সংস্কৃতায়িত- তেজেন্দ্রনারায়ণ, অয়ঙ্কান্ত, কমলাক্ষ; খারাপ লোকেদের পদবী সামাজিক স্তর অনুযায়ী কখনো উঁচুর দিকে থাকে না, তারা হয় বৈশ্য বা শূদ্র (কায়স্থ)। ‘পাগলা সাহেবের কবর’, ‘সাধুবাবার লাঠি’ সব উপন্যাসেই এই ধাঁচা

(Stereotype) ব্যবহার করেন শীর্ষেন্দু। জ্যোতিষচর্চা যারা করে এবং বয়স্ক-কুলীন লোকেরা সবসময়েই প্রাজ্ঞ হয় এই উপন্যাসগুলোয় আর, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিমূহূর্তে তাদের মুখ দিয়ে আগুবােক্যের মতো বেরোয়। আর, শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো একই রাখা নয়, বিভিন্ন প্রথাগত সংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধও অটুট এই উপন্যাসগুলোতে। তাই, ভূতের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেওয়া যায়, “মেয়েদের সামনে গুহ্যকথা বললে বড় ভজখট লেগে যায়। ওদের পেটে কোনো কথা থাকে না কী না” (৫০) কিংবা নারী-চরিত্ররা আখ্যানে থাকে মূলতঃ সাংসারিক অশান্তির জন্যে এবং ‘শুভ’ কাজে অবিশ্বাসসূচক বাধাদানের জন্যে। ‘অদ্ভুতুড়ে’ ধারাবাহিকের সব উপন্যাসেই এই অবয়ববাদী বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায়, ভূত ও অলৌকিকের মঙ্গলসূচক আনুগত্য অনুধাবন করা যায় এবং কুলীন উচ্চবর্গের হুকুমবরদার নিম্নবর্গের ভূমিকা অব্যাহত থাকে। কিন্তু কেন? ‘ভূত’ ও অলৌকিককে ব্যবহার ক’রে কিশোরবয়সের কল্পনাকে উস্কে দেওয়া নিঃসন্দেহে প্রয়োজন কিন্তু সেই কল্পনার মূল ভিত রক্ষণশীলতা, সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয় অনুশাসন। কিশোরমননে ঠেসে দেওয়া নৈতিকতা-মূল্যবোধ-রুচিবোধের সামন্ততান্ত্রিক পাঠ; উনিশ শতকে শুরু হওয়া ভদ্র-শিক্ষিত-রুচিবান-মধ্যবিত্ত গড়ে তোলার যে সাহিত্য-প্রয়াস, এই উপন্যাসগুলো তো তারই বিস্তারিত আধুনিক রূপ। আর, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসগুলোর রাজনৈতিক পাঠ প্রয়োজন; কারণ অরাজনীতির চর্চা, শুদ্ধবাদী রক্ষণশীলতার চর্চায় এবং বিজ্ঞান-যুক্তিবাদের ওপরে আধ্যাত্মবাদ-অজ্ঞেয়বাদের চর্চায় শিশু-কিশোরমনে চারিয়ে দেওয়া যায় শাসকের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। শীর্ষেন্দু ‘ভূত/অলৌকিক’-এর ভান বজায় রেখে এবং কল্পশিহরণ (fantasy)-র আবহ তৈরি ক’রে ঠিক এই কাজটাই সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। আর, শাসকও এতে তৃপ্ত হয় কারণ, স্থিতিবস্থা বজায় থাকে, নীতি-মূল্যবোধের আড়ালে মতাদর্শগত রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের নিখুঁত অনুশীলন চলে। ‘অরাজনৈতিক’ হয়েও একদিকে যেমন নিরাজনীতি-মতাদর্শের বড়ি গেলানো যায় তেমনি অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির প্রতি বিশ্বাস নির্মাণ করা যায়। জনপ্রিয় উপন্যাস-আঙ্গিকের ভেতরে প্রতিস্পর্ধা নয়, স্বস্তিক্ষেত্রের যাবতীয় উপাদান মজুত থাকে। রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও তাই সাহিত্যের রাজনীতি বোঝা

যায় এই উপন্যাসগুলো থেকে। মতাদর্শগত রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্র সাহিত্যের ভেতর দিয়েও তো ক্রিয়াশীল থাকে, বিশেষতঃ ‘শিশু-কিশোর সাহিত্য’ নামক বিশেষ বর্গে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাসঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য’ গ্রন্থে শিশুসাহিত্যের অন্তর-অন্দরে লুকিয়ে রাখা মতাদর্শের ছোবল সম্পর্কে বিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রান্ট ও মেকলের শিক্ষানীতিতে ‘রুচির পুনর্গঠন’, ‘মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ’ গুরুত্ব পেয়েছিল খুব বেশি এবং পরবর্তীতে বাঙালি তথা ভারতীয় লেখকদের সাহিত্যে (শিশুপাঠেও) এই দু’টি বিষয়ের সঙ্গে যোগ হয় ‘মূল্যবোধ নির্মাণ’ ও ‘নৈতিকতার অনুশীলন’-এর মতো বিষয়। ‘বর্ণপরিচয়’ ও অন্যান্য শিশুসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শাসকের মতাদর্শ কীভাবে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে শিশুদের মানসিক গঠনপ্রক্রিয়ায়। সন্দর্ভে যে রুচিবান-ভদ্রলোক-মার্জিত-শিক্ষিত শ্রেণির সাহিত্যবোধের কথা আলোচনা করছি, এই বোধের আরোপিত নির্মাণ শুরু হচ্ছে এখান থেকেই। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বের বাংলা উপন্যাসের বিশ্লেষণে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

‘প্রভুভক্তি’ বাঙালি শিশু-পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের এক অতীব প্রিয় প্রসঙ্গ। ‘প্রভুভক্তি’ ছাড়া কমবেশি প্রায় সব নীতিগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকে যে-যে প্রসঙ্গ ফিরে-ফিরে আসে সেগুলি হলঃ ‘রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ’, ‘গুরুজনদের সেবা’, ‘অধ্যয়ন ও শ্রম’, ‘পরোপকার’ ও ‘বিভিন্ন জাতির গুণাগুণ বিচার’। পরস্পরসম্পৃক্ত ওই প্রসঙ্গসমূহ ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকের জীবনজিজ্ঞাসায় প্রকৃতি ও পরিধির সংকীর্ণতার এক সূচক। এদের মাধ্যমে মনু-কথিত সম্পর্কের সেই পাঁচ প্রকার – বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম ও নৈমিত্তিকধর্ম- যেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নবকলেবরে ফিরে এসেই তৈরি করে সামাজিক শৃঙ্খলার বিধিবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ছবি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫, ১৫৫)

এই বিশ্লেষণ থেকে ‘ঔপনিবেশিক’ ও ‘আশ্রমধর্ম’ শব্দদুটিকে বাদ দিলে, এই সমালোচনা উপরিউক্ত ‘অদ্ভুতুড়ে সিরিজ’-এর উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উপনিবেশিত সময়ের শিশুপাঠ্যগুলোতে ‘নিয়তি’ ও ‘পুরুষকার’-এর প্রতি যে বোঁক⁷⁶ শিবাজী দেখতে পাচ্ছেন, সেই

ঝাঁক শীর্ষেন্দুর শিশু-কিশোর উপন্যাসেও রয়েছে। প্রায় দেড় শতক পরে, নয়া-উদারনীতি ও বিশ্বায়নী হাওয়ায় জারিত হয়ে শীর্ষেন্দু নিশ্চয়ই উপনিবেশিত সময়ের উপন্যাসকাঠামোর হুবহু অনুকরণ করবেন না কিংবা ‘ভূত-অলৌকিক’কে প্রতিষ্ঠা দিতে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি নস্যাৎ করবেন না। কিন্তু, তিনি ওই নীতি-মূল্যবোধ-নিয়তির সঙ্গেই মিশিয়ে দেবেন অণ্ডেয়বাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতি প্রশ্নহীন সমর্পণ। “নিয়তি কেন বাধ্যতে” ও মধুরেণ সমাপয়েৎ- এই দুইয়ের মধ্যে থাকা আখ্যানে অতি-আধুনিক সময়েও শিশুমনকে গড়েপিটে নেওয়ার সাহিত্য-রাজনীতি অব্যাহত থাকবে। ছোটদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করার এই উপন্যাস-উপাদান কিন্তু শীর্ষেন্দুর ‘বড়দের’ উপন্যাসেও মজুত থাকে। নৈতিকতা-মূল্যবোধ সেখানে রক্ষণশীলতার সঙ্গে ওতপ্রোত। পাঠকমননকে ‘ভাল’ প্রোটাগনিস্টের দিকে টেনে নিতে নিতে ভদ্রলোক-নীতিপরায়ণ-রুচিবান ‘আদর্শ’ চরিত্রায়ণ আখ্যানকে জয় ক’রে নেয়। লেখকের রাজনীতি, ধর্মবোধ ও ছক-ভাঙ্গার অনুশীলন নিজিতে মাপা, সেই একই ফর্মুলা বা সাহিত্যসূত্রে কেন্দ্রীভূত। ইলিয়াস বা মহাশ্বেতা যে ‘লেখকের সংশয়’-এর পক্ষে থাকেন, সেই সংশয় এই জনপ্রিয়, প্রভাববিস্তারকারী উপন্যাসে নেই। থাকতে পারে না। কারণ, উপন্যাসগুলোয় পুজোসংখ্যার পাঠকপ্রিয়তার দায়িত্ব রয়েছে ও প্রাতিষ্ঠানিক মতাদর্শকে জয়ী করার দায় রয়েছে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থের অবতরণিকা অংশে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন প্রসঙ্গ আলোচনায় বলছেন,

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভদ্রলোকদের স্বপ্নরচনা ও স্বপ্নভঙ্গের এই ইতিবৃত্ত। সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে আকাজ্জা ও আশঙ্কার সে বৃত্তান্ত। গন্তব্যের যে-প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রার শুরু, তার অনেকটাই ছিল অলীক। ভদ্রলোক কর্তৃক ও ভদ্রলোকদের উদ্দেশে লিখিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছে সেই নিষ্ফলতার বিবরণ। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫, ৬২)

ভদ্রলোকের দ্বারা ও ভদ্রলোকের জন্যে সাহিত্য-রচনার দায় তো মিটে যায়নি। বরং, যা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের উপনিবেশিত পরিসরে, তার ধারা অব্যাহত থেকেছে ও পুষ্ট হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, সাহিত্যগত বিবর্তন এবং বহু দশকের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ‘ভদ্রলোক’ সংজ্ঞায়নে কিছু অদলবদলের সঙ্গে মানিয়ে তাদের দ্বারা ও তাদের জন্যে সৃষ্ট সাহিত্যও অভিযোজিত হয়েছে। উপাদানে বদল এসেছে, উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়ে যুগোপযোগী বদল এসেছে কিন্তু মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-ভদ্রলোককে কেন্দ্র ক’রে সাহিত্যনির্মাণ পদ্ধতিতে মূলগত বদল আসেনি। খেয়াল ক’রে দেখা যাক, পণ্যসাহিত্যের বাড়বাড়ন্তের যুগে এই পুরনো মডেলকে কেমন ঝকঝকে ক’রে নেওয়া গেছে; সহজ সূত্রায়নে ‘ক্লোন’ বা ছবছ-প্রতিকৃতি সাহিত্য প্রকাশিত হয়েই চলেছে ‘মূলধারার সাহিত্য’ বকলমে।

পুজোসংখ্যার উপন্যাসকে কেমন ক’রে বিভিন্ন বয়সী পাঠকের সহজপাচ্য ক’রে তোলা যায়, তার কিছু সহজ সূত্রায়ন রয়েছে।⁷⁷ পুজোসংখ্যায় রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাসেরও এমনই কিছু বাঁধা ছক থাকে। ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ, আকাঙ্ক্ষা এবং নৈতিকতা থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আখ্যানরূপ দেওয়া হতে থাকে। এই সূত্রায়নে ফেলে সেই ভদ্রলোক-রুচিবান-শিক্ষিত শ্রেণির জন্যেই একই ধাঁচার সাহিত্য ‘উৎপাদন’ হয়ে চলেছে। কিন্তু, পাঠক? পাঠকের কেন ভাল লাগে এই ধাঁচার ‘স্বস্তিজনক (ফিল গুড)’ সাহিত্য? কারণ, পাঠকের দৈনন্দিন অসহনীয় অস্বস্তি (discomfort), প্রতিদিন বেড়ে চলা দমবন্ধ বাস্তব থেকে ‘পলায়নপথ (এস্কেপ রুট)’ তৈরি ক’রে দেয় এগুলো। উপন্যাসের বাস্তব যদি মধ্যবিত্ত পাঠকের সামাজিক-অবস্থান ও শ্রেণিঅবস্থানের হয়, সেই বাস্তব যদি পাঠকের শ্রেণিচেতনার ধোঁয়াশাবোধকে মহত্ব দান করে, যদি স্থিতিবস্থার নিরাপদ পদ্ধতিগুলো এতে পুনরাবৃত্ত হয়, তাহলেই তার বাজারমূল্য প্রচুর। পাঠক, মূলতঃ মধ্যবিত্ত বা স্বচ্ছল-মধ্যবিত্ত পাঠক, দৌদুল্যমান অবস্থান থেকে উত্তরণের যন্ত্রণা ভোগ না ক’রে সেই অবস্থানের বিষাদরোমাঞ্চে সুখে জলকেলি করে- স্বস্তিক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় সাহিত্যে শিল্পে। এও এক রাজনীতি, সাহিত্যক্ষেত্রের রাজনীতি, যা শাসক-অনুষঙ্গে মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচারিত। পাঠকেরও প্রত্যাশার দিগন্তে নতুন কিছু সংযোজন হয় না এক্ষেত্রে। প্রত্যাশার দিগন্ত (horizon of expectations) অর্থাৎ যা পাঠককে তার পূর্ব-পাঠাভিজ্ঞতা

থেকে বের ক'রে নতুন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করায়। ইয়াউস যে পাঠ-অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যের ইতিহাসবোধের কথা বলেন, তা এরকম,

The relationship of literature and reader has aesthetic as well as historical implications. The aesthetic is seen in the fact that the first reception of a work by the reader includes a test of its aesthetic value in comparison with works which he has already read... the repression of past works occurs simultaneously with the continual mediation of past and present art and of traditional evaluation and current literary attempts. (Jauss 1970, 8-9)

ইয়াউস তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যপাঠ ও তত্ত্বপাঠের অভিজ্ঞতায় দেখছেন যে, কীভাবে সাহিত্যের ইতিহাসের ধারণা বিবর্তিত হচ্ছে। ইয়াউস এই সমস্ত তত্ত্ব-ধারণার কেন্দ্রে রাখলেন পাঠকবর্গকে। পাঠকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় নয় বরং সপ্রতিভ সক্রিয় এবং যে কোনও সাহিত্যপাঠের (literary text) কালব্যাপিতা ও ইতিহাসগত অস্তিত্ব নির্ভর করে পাঠকবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত নির্মিত হয় সংরূপগত প্রথা, শৈলী ও আঙ্গিকের প্রথা ইত্যাদি দ্বারা এবং কোনও পাঠ্যের পাঠঅভিজ্ঞতা সেই প্রথাসমূহকে ভাঙতে ভাঙতে এগোয়। ইয়াউস উদাহরণ দিচ্ছেন সেরভান্তেসের ‘দোন কিহোতে (১৬১২)’ উপন্যাসের, যেখানে নাইটহুডের, শিভ্যাল্রির বহুচর্চিত আখ্যান ও মিথ্‌ উসকে দিয়ে সেরভান্তেস তাকে ঠাট্টা করেন। ফলে, প্রথাগত পাঠঅভিজ্ঞতা ধাক্কা খায়। তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পাঠকের প্রত্যাশা- পাঠটি যে সংরূপের অন্তর্ভুক্ত সেই সংরূপের নির্দিষ্ট রীতিনীতি, পাঠ্যটির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-ইতিহাসগত পারিপার্শ্বিকের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক এবং কল্পনা ও বাস্তবের সংঘাত, ভাষার কাব্যিকতা ও ভাষার কার্যকারিতার দ্বন্দ্ব এই মূল বিষয়গুলোর ওপরে। ঠিক এই যুক্তি থেকেই প্রত্যাশার দিগন্তের প্রশ্নটি বিচার করা যায় দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলোর প্রসঙ্গে। বৃত্তান্ত, উপন্যাসের চিরাচরিত

সংরূপে আখ্যান বাঁধতে শুরু করেন দেবেশ। কিন্তু, সেই আখ্যানে উপন্যাসের প্রচলিত উপাদানগুলোর অনুষ্ণে ঢুকে পড়ে সরকারি নথি⁷⁸, বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের খবরের-টুকরো এবং বাস্তবের বিভিন্ন চরিত্র। ফলে, উপন্যাস সংরূপের রীতিনীতিকে ভাঙুর করে নতুন আখ্যানপদ্ধতির দিশা দেয়। কল্পনা আর বাস্তব সেখানে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং, একে অপরের পরিপূরক। ফলে, পাঠক-প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে পাঠকের প্রত্যাশা তথা পূর্ব-পাঠঅভিজ্ঞতায় বদল আসে। সাহিত্যের ভাষার কাব্যিকতা বনাম ভাষার কার্যকারিতা ও দৈনন্দিনসম্পৃক্ততার যে দ্বন্দ্বের কথা প্রত্যাশার দিগন্ত বদলের অন্যতম বিচার্য বিষয়, নবাবুণ ভট্টাচার্য তাঁর ‘কাঙাল মালসাট’ ও ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে কি সেই সেই চেষ্টাই করেন না নবাবুণ? ভাষা সেখানে আর শুদ্ধতার পরোয়া করেনা, ‘সাহিত্যভাষা’র প্রথা ভাঙতে চায়। সন্দর্ভের পরের অধ্যায়ে ‘ভাষা ও সাহিত্য’ শিরোনামে এই প্রসঙ্গের আলোচনা থাকবে। রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখক কখনও নিজের আখ্যানশৈলীও ভাঙতে পারেন, তাঁর উপন্যাসের আধিপত্যকামী আখ্যানশৈলীর বাইরে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন। যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘চিহ্ন’ উপন্যাসে করেছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় লিখছেন, “বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এ ধরনের কাহিনি, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি” (বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনাসমগ্র ৫, ৩৬৯) মানিক এর আগে ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘দিবারাত্রির কাব্য’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ লিখে ফেলেছেন এবং লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তা সত্ত্বেও ‘উপন্যাস’ সংরূপ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা অব্যাহত রাখছেন। উপন্যাসের আখ্যান ‘দ্রুতগতির’ বা ‘অল্প সময়ের কাহিনি’ হতে পারে কি না, সেই নিরীক্ষার সাহস দেখাচ্ছেন রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে, কোনও বাণিজ্যসফলতা বা প্রকাশক-হাউজের নির্দেশাত্মক বাক্যকে গুরুত্ব না দিয়েই। আর, এই ক্রমাগতঃ পরীক্ষানিরীক্ষাই পাঠককে সজাগ রাখে, সাহিত্যের ইতিহাসবোধে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষায় ও রাজনীতিতেও পূর্বপাঠিত অভিজ্ঞতায় ধাক্কা লাগে, যখন একজন শহুরে

শ্রমিক ‘বাবু’ সম্বোধনকে সামাজিক উত্তরণের অভিমুখ নয় বরং অপমান হিসেবে দেখে, যখন যে বিরক্ত হয় ওই সম্বোধনে-

বাবু। খচ করে একটু আঁচড় লাগে ওসমানের বুকে। কালি-ঝুলি মাখা এই হাফশাট পরনে, রঙচটা সুতোওঠা নীল প্যান্ট, পায়ে জুতো নেই, দাড়ি কামায়নি সাতদিন। তবু তাকে বাবু বলে ছেলেটা। ঘৃণ্য বাবু বলে গাল দেয়। ট্রামের কাজ ছেড়ে দেবার চলতি আপশোশটা আর একবার নাড়া খায় ওসমানের। এ আপশোশ তেজি হয়েছে ওসমানের গত ধর্মঘটের সাফল্যের পর। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও কেউ কোনোদিন তাকে বাবু বলে অপমান করেনি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৯, ৩৭২)

ওসমান, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান কুশীলব ‘বাবু’ শব্দকেই প্রত্যাখ্যান করছে, যে বাবুদের জীবন ও যাপনকে কেন্দ্র করে ভদ্রজনেদের উপন্যাস রচনার রীতি, যে বাবুদের ভাষা-শীলতা-রুচিবোধকে কেন্দ্র করে বাংলা উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। ‘বাবু’ শব্দের ব্যাখ্যা জড়িয়ে আছে ‘ভদ্রলোক’ পরিচিতির সঙ্গেই, যে শব্দার্থকে প্রায় দেড় শতক ধরে সযত্নে লালন করা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থানে, এমনকি সাহিত্যেও। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘বেঙ্গল ডিভাইডেডঃ হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন ১৯৩২-১৯৪৭’ গ্রন্থে এই শব্দার্থ ও আর্থ-ইতিহাসে তার বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্দর্ভ রচনা করছেন; তাঁর ভাষায়,

The title 'Babu' - a badge of bhadralok status - carried with it connotations of Hindu, frequently upper caste exclusiveness, of landed wealth, of being master (as opposed to servant), and latterly of possessing the goods of education, culture and Anglicisation. The vernacular term 'bhadralok' is useful not only because it expresses this sense of exclusiveness and the social relations that produced it, but also because it carries with it overtones of the colonial origins of

this class and its overwhelmingly Hindu composition. (Chatterji 2002,

6)

এই সামাজিক-বর্গকে কেন্দ্র ক’রে উনিশ শতকীয় নবজাগরণ থেকে আজও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ, সেই কেন্দ্রকেই প্রত্যাখ্যানের এই রীতি মানিকের আখ্যানশৈলী বদলের নিরীক্ষার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাঠকের প্রতিক্রিয়ায় যদি এরপরে ওই প্রত্যাখ্যানের আঁচ লাগে, যদি পাঠকচেতনা অ-ভদ্রবাবু, কালি-ঝুলিমাখা ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চড়া শ্রমিকের দিকে ঝোঁকে এবং উপন্যাস পাঠের পূর্বঅভিজ্ঞতাকে প্রশ্ন করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ পাঠকবর্গের পাঠপ্রত্যাশাও বিবর্তিত হবে।

সাহিত্য দ্বিবাচনিক- পাঠের সঙ্গে পাঠকের এই দ্বিবাচনিকতা চলতে থাকে এবং এই দ্বিবাচনিকতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকবর্গের মধ্যে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। পাঠক-প্রতিগ্রহণ তত্ত্বে পাঠক ও লেখকের এক সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন ইয়াউস, ‘প্রত্যাশার দিগন্ত’ শব্দবন্ধে, যাতে পাঠের বোধগম্যতা সহজ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। পাঠ-প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব আসলে পাঠকের রাজনীতির আঁচ দেয়। উপরিউক্ত সূত্রায়িত উপন্যাসধারা কোনও নতুন পাঠপ্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর দিতে পারে না। ইয়াউস যে ‘presupposed audience’-র কথা উল্লেখ করছেন, সেই পূর্বনির্ধারিত পাঠকবর্গের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত প্রত্যাশার দিগন্তে গুমরে মরে এই উপন্যাসগুলো। ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপেও শুধুমাত্র বিনোদনের ও জনতোষের উদাহরণ হিসেবে থেকে যায়। “such a work demands no horizontal change, but fulfills previous established norms and expectations, satisfies the prevalent norms of taste, and confirms familiar sentiment”⁷⁹ উৎপাদনের পৌনপৌনিকতায় পাঠকের সঙ্গে পাঠের নান্দনিক দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় ক্রমশঃ। নান্দনিকতা একটি অপরিমাপযোগ্য বিষয় বলেই এই নান্দনিক দূরত্ব বাড়া সত্ত্বেও ‘সাহিত্য’কে পণ্য ক’রে তুলতে এবং পাঠ-বাজারজাত (Reading Market) করতে অসুবিধে হয় না প্রকাশকগোষ্ঠীর। উপরের যে দু’টি উপন্যাসসূত্র নিয়ে

আলোচনা করলাম, সেই দু'টি উপন্যাসসূত্র ব্যবহার করেই লেখা উপন্যাস প্রকাশিত হয় বাংলার সবথেকে বাণিজ্যসফল প্রকাশনা সংস্থা থেকে। সুমন গুপ্ত সাম্প্রতিক উপন্যাসচর্চার পরিসর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওই একঘেঁয়ে উপন্যাসসূত্র এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছেন। ভারতীয় ইংরাজিতে লেখা বাণিজ্যিক উপন্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য বলছেন,

It is primarily in a non-academic register that the burgeoning Indian commercial fiction is registered: in claims made by publishers and other professionals and authors in the mass media (particularly newspapers and magazines). Such claims come with an alternative-to-academic authority; also a matter of expertise, but hands-on expertise in production processes and reading markets rather than in studied critical understanding. Publishing professionals are apt to be cited as experts... While the former attend to the nuances of postcoloniality and (literary) history, the latter gesture towards globalisation and the transcendence of the present. When the former pronounce on the quality of literary fiction, the latter agree and offer disclaimers about the literariness of commercial fiction and point to their market penetration. (Gupta 2012, 46-7)

সুমন গুপ্ত ভারতীয় ইংরাজি উপন্যাসের পাঠবাজার ও পণ্যসাহিত্যের আলোচনা করলেও, এই বৈশিষ্ট্যাবলী সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিচারে পাঠকের সঙ্গে লেখকেরই শুধু নয়, পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকেরও এক আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ হয়ে যায়। বাণিজ্যসফল প্রকাশনাসংস্থা তার বাণিজ্যের তাগিদেই, উদ্দেশ্য-পাঠকবর্গের (target reader) কথা মাথায় রেখেই লেখককে উৎসাহিত করে পরবর্তী সাহিত্য উৎপাদনে। উপন্যাস ও

রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যসফল প্রকাশক বহুক্ষেত্রেই প্রভাবিত করেন লেখককে। নবাবুগের ভাষায় যা ‘হৌস’, সেই হৌস বা পাবলিশিং হাউজ বাণিজ্যসফল উপন্যাস-সূত্রের পুনরাবৃত্তি করতে চায়, যাতে ওই উপন্যাস-সূত্রে তৃপ্ত পাঠক উপন্যাসটি খরিদ ক’রে এবং প্রকাশনা সংস্থার অর্থাগম হয়। নিরাজনীতি, ষাট-সত্তর দশকের রাজনীতিহীন রোম্যান্স-আখ্যান কিংবা সাম্প্রতিক রাজনীতি-সমাজনীতির জনতোষী সরলীকরণ বহু সময় প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যসফলতার উপাদান হিসেবে ব্যবহার হতে লাগল। সেই বাণিজ্যসফলতার নিরিখে ইলিয়াসের উপন্যাসকে কাটাছেঁড়া করলেন প্রকাশকরা, “It would be incorrect to regard him as a writer’s writer. His books have crossed the limits of elite readership and are read by the common people. But that does not mean that he is or ever will be as popular as, say, Humayun Ahmed”⁸⁰ ইলিয়াসের জনপ্রিয়তার তুলনা প্রকাশকেরা করছেন হুমায়ুন আহমেদের সঙ্গে, যিনি চূড়ান্ত বাণিজ্যসফল ও প্রকাশক-পাঠক সেতুবন্ধনের ‘দামী’ মুখ প্রকাশক-পাঠক-লেখক ত্রয়ীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আবহের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য, যেখান থেকে নিরাজনীতিকরণ ও নিরাপদ-সাহিত্যের ধারণার অবতারণা করেছি। প্রকাশকের নিরাপদ অবস্থান, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে না চটাতে চাওয়ার মনোভাব উপন্যাসকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসকে। কারণ, লিখিত সাহিত্যের আধুনিক যুগে এসে সাহিত্যের ‘প্রকাশ (কাগজের পাতায় বা আন্তর্জালে)’ সাহিত্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র উপায়। বিশেষতঃ, পাঠক-প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব (Reader Response Theory) বা প্রকাশক-পাঠক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতায় উপন্যাস-কবিতা-গল্প বা অন্য সংরূপের প্রকাশিত (Publication) জরুরি। কিন্তু, প্রকাশনা সংস্থাও প্রভাবিত হতে পারে শাসক-মতাদর্শ দ্বারা। সেইজন্যেই কোনও লেখা ‘অশ্লীল’ বিচার ক’রে ছাপায় না কোনও প্রকাশনা সংস্থা কিংবা ‘রাজনৈতিক বিতর্কমূলক লেখা কাম্য নয়’ বলে নিরাপদ-অবস্থানের ঘোষণা দিয়ে রাখে কোনও পত্রিকা। ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ প্রকাশকালেই এরকম ঘটনা ঘটেছিল, বাংলাদেশে

‘সংবাদ’ নামক এক নামী পত্রিকা হঠাৎই বন্ধ ক’রে দেয় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ। কারণ, তৎকালীন শাসকের আপত্তি। শাহাদুজ্জামানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানাচ্ছেন,

কারণ ’৭৬ এ তো Govt. highly pro-pakistani। সুতং পাকিস্তানী নিয়ে কোন ঠাট্টা করা যাবে না। আমার উপন্যাসে তো পাকিস্তান নিয়ে ঠাট্টা ছিল। একটা character আছে না? Basic democrat, রহমতউল্লা যে ডাঁট মারত মাঝে মাঝে জিন্নাহ টুপি পড়ে ওরা ছাপালো Basic democrat, পাকিস্তান, জিন্নাহ শগুলো বাদ দিয়ে। ওদের ধারণা এতে খনকার Govt. ক্ষেপে যাবে। আমি ভীষণভাবে Protest করাম। কিন্তু কিছু change করতে চাইলো না, এর পর আর এক কিস্তি ছাপিয়ে বন্ধ করে দিলো... তারপরে ধরো আবার বই হিসেবে প্রকাশেও নানা অসুবিধা। এতবড় বই কেউ প্রকাশ করতে চায় না। (ইলিয়াস ২০১৮, ৫৫)^{৪১}

ইলিয়াস যে সমস্যার কথা বলছেন, তা নবাবুণ ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বহু লেখকের ক্ষেত্রেই সত্যি। কারণ, এঁরা কেউই সমকালীন রাজনীতিকে সরিয়ে রাখতে চাননি বরং সাহিত্যের অন্তরে নিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্যের বাহিরমহলে নিরাপদ দূরত্বে রাজনৈতিক মতামতকে সরিয়ে রাখার যে সাহিত্য-রাজনীতি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এঁরা। ফলে, এঁদের ক্ষেত্রে সাহিত্যপাঠের অন্যতম স্তম্ভ তথা প্রকাশনা বিপদে পড়েছে। নবাবুণের লেখায় তাই সরাসরি দেশের অন্যতম বাণিজ্যসফল প্রকাশনা সংস্থাকে আক্রমণ থাকে। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসের শুরুতেই প্রাতিষ্ঠানিকতার ধরতাইটুকু রাখেন নবাবুণ,

তবে আমাদের মনের এই ফ্যাকড়াকে কেউ যেন আনন্দবাজার পত্রিকার মতো সুমহান প্রতিষ্ঠানের পেছনে কাটি করার অপচেষ্টা বলে না ভাবেন। দুইহাতে সংবাদ ও সাহিত্যের মদিরা যে প্রতিষ্ঠান নিয়তই বাজিয়ে চলেছে তার পোঙ্গায় লাগতে যাওয়া মোটেই ফলপ্রসূ হতে পারে না, উল্টে হুলো হয়ে যেতে পারে... তবে একথা বলা অন্যায় হবে না যে,

আনন্দবাজার না থাকলে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙালি লেখক মালদার হয়ে উঠেছেন
তাদেরও এতটা ফুলেফেঁপে ওঠা সাধ্যে কুলোতো না। হাতে হারিকেন হয়ে যেত।

(ভট্টাচার্য ২০১০, ২৩২-৪)

‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতেই থাকেন
নবাবু। আর, আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মতো বাণিজ্যসফল সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, যারা প্রায় সাত
দশকের পণ্যসফল চেষ্টায় নিজস্ব সাহিত্যবৃত্ত তৈরি করতে পেরেছে, যারা ‘বাংলা সাহিত্য’-র
মূলধারার একটা সংজ্ঞায়ন করতে পেরেছে, তারা যে নবাবুগের এই উপন্যাস, ভাষা ও
প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সাহিত্য-রাজনীতির বিরুদ্ধ পক্ষের তা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যের বাণিজ্যসফল
প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা বেশ কয়েকবার উল্লিখিত হয় এই উপন্যাসে।

আমি reality-র ভেতরটা দেখতে চাই। আমি আমার কোনো idea এর উপর চাপিয়ে
দিতে চাইনা। সেটা হবে wishful thinking, আর, wishful thinking is a thing I
am the last person to go with. এতকাল আমাদের কম্যুনিষ্ট writer-রা এই
wishful thinking-ই করে এসেছে। তারা শ্রমিককে মহৎমানুষ হিসেবে দেখিয়েছে।
তার মানে সে আসল শ্রমিককে disown করলো। মনগড়া একজন শ্রমিক তৈরি
করলো... বাস্তবতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনা দেখানোর জন্য প্রথম এবং শেষ যেট
দরকার সেটা হলো বাস্তবে যথার্থ কোনো সমাজতান্ত্রিক পার্টির সক্রিয় কার্যকলাপ এবং
মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্র চেতনার চর্চা। সেটা না থাকলে আমি জোর করে কি ভাবে তা
দেখাবো। (ইলিয়াস ২০১৮, ৩১-২)

রাজনৈতিক উপন্যাসের পাশ্চাত্য সংজ্ঞা থেকে সরে এসে দীপেন্দ্রনাথ, মহাশ্বেতা, নবাবু, ইলিয়াস ও দেবেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক উপন্যাসের কি কোনও নতুন সংজ্ঞায়ন হচ্ছে? এঁরা

প্রত্যেকেই অন্তর্ঘাতের (Subversion) বয়ান রেখে দিচ্ছেন তাঁদের আখ্যানে। রাষ্ট্রের দমনমূলক আধিপত্যের মতাদর্শ-বিরোধী অন্তর্ঘাত ও প্রত্যাখ্যান এঁদের লেখায়। ভাষা আর কাঠামো, বিষয় এবং আঙ্গিক- কোনটা প্রয়োজনীয় এবং কোনটা অপ্রয়োজনীয় এই বিতর্ক অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, যখন রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’-এ রক্তস্নাত বেলেঘাটা সিআইটি রোড নিজেই একটা কুশীলব হয়ে উঠছে এবং বিষণ্ণ রক্তের দাগের রাজনীতি বুঝতে পারছেন পাঠক। বাঘার বা কেলু তো রাষ্ট্রকেই প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে, তাদের উন্নয়ন ও প্রগতির সমূহ আড়ম্বরকে প্রত্যাখ্যান করছে। হারবার্টের বিস্ফোরণ জানতে রাষ্ট্রের ঢের বাকি থেকে যাচ্ছে, যেখানে ডিটোনেটর নকশালপত্নী বিনুর দু’দশক আগে রেখে যাওয়া ডিনামাইট। এই বিনু ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা (১৯৬৫)’ চলচ্চিত্রে নতুন বাড়িতে পৌঁছতে চেয়েছিল। ইলিয়াসের হাড্ডি খিজিরের ক্রিয়া মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি ওসমানকে বিপ্লবমুখর ও রাষ্ট্রবিরোধী ক’রে তুলছে। যে ওসমানকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ক’রে তুলছেন ইলিয়াস, তার ভাঙ্গন ও উত্তরণের চূড়াবিন্দু স্পর্শ করতে চাইছেন, সে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চিহ্ন’ উপন্যাসের অন্যতম মূল কুশীলবের উত্তরাধিকার? ইলিয়াস একথা কোথাও উল্লেখ করেননি। মানিকের ওসমান আখ্যানে শ্রমিকের রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষে থাকে শেষ অবধি, সে নিজেও শ্রমিক। পাঠকের দেখায় এঁরা মিলে যান। ‘গোরা’ উপন্যাসের তমিজ, যার উল্লেখ দু’টো বাক্যে সেরে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই তমিজই কি ‘খোয়াবনামা’-র তমিজের পূর্বসূত্র নয়? চরঘোষপুরের অত্যাচারিত নিরন্ন ফরর পরিবার আর কাংলাহার বিলের পাশে বসতি বাঁধা নিরন্ন তমিজের বাপের পরিবারে আর্থ-সামাজিক ভিন্নতা কোথায়? নকশালবাড়ি-পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নিরাজনীতিকরণের বাণিজ্যসফল উদ্যাপন- ‘নকশাল’ মানেই যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির ‘মেধাবী’ যুবক, অভিজাত-বয়ান প্রমাণ করতে চায় যে, ‘মেধাবী মধ্যবিত্ত’ না হলে নকশাল হয়না, রাজনীতি তুচ্ছ কিন্তু পলায়নবোধের স্মৃতিকামুকতা (nostalgia) আদতপ্রস্তুত- উদ্যাপন চলতেই থাকে। কিন্তু, এই অভিজাত বয়ানকেই প্রতিস্পর্ধা জানায় সোনামতি সিং, বাবুলাল বিশ্বকর্মার

মতো বাস্তব মানুষরা। বাংলার বহু ‘অনভিজাত’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বহু মানুষের অবদান নকশালবাড়ি বিদ্রোহে। ‘রোমান্টিক মেধাবী মধ্যবিত্ত’ বয়ানের পুনরাবৃত্তি বছরের পর বছর রাজনৈতিক উপন্যাস পুনরুৎপাদিত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাতে শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে শাসিতের উৎসবের আখ্যানকে অস্বীকার করা হয়। কথাসাহিত্যে তাই গোপাল কাহার, দোপ্দী মেধেনদের প্রশ্নগুলো জরুরি, শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ-ধর্মের রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী বয়ানের স্পর্শক সম্পৃক্ত থাকা প্রয়োজন। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, বা ‘খোয়াবনামা’ বা ‘কাঙাল মালসাট’-র যাত্রাপথের সন্ধান ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ সংরূপ-বিভাগের উপমহাদেশীয় প্রতর্ক তৈরি ক’রে নেয়। ‘খোয়াবনামা’-র সখিনা, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র বেঙ্গু-বৈশাখু বা ‘গোরা’-র ওই নিরন্ন বালক ‘তমিজ’ কিংবা ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’-র শারিবা- এদের কারোরই খিদের আখ্যান ফুরোয় না। আর, সেই জন্যেই উপন্যাসের রাজনীতিও প্রবহমান থাকে, শাসক-মতাদর্শের নিরাজনৈতিকরণের সমস্ত আয়োজন ছিঁড়েখুঁড়ে। আর, এই সমস্ত প্রতিস্পর্ধী বয়ানে কি ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র সংজ্ঞাও পাল্টাচ্ছে না? পাশ্চাত্য ধারণা থেকে তো বটেই এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস থেকেও এগুলি স্বতন্ত্র। মানিক বা তারাশঙ্কর কিংবা সতীনাথের ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞায়ন থেকেও পৃথক ক’রে নিচ্ছেন এঁরা নিজেদের। পৃথক সাহিত্যবর্গ হিসাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের অবস্থানে জটিলতা রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নের আলোচনায় চলে আসে জনসমাজের প্রতিক্রিয়াকে উপস্থাপনার প্রশ্ন। পাঠক এবং লেখক দু’জনেই ওই জনসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রচলিতভাবে যে সব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি, তার অধিকাংশ কনজাংচারাল, কোন রাজনৈতিক ঘটনা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত, কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গত কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে। অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে অভিজ্ঞান সন্ধান,

জনসমাজের নির্মাণ ভাঙনের চেতনায় এমনকি ধর্মীয় জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক অন্বেষণেও

উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১, ১১)

উল্লিখিত মন্তব্যের যথার্থ্যে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮)’, ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)’ কিংবা ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ বা বৃহৎ কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন এই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রে না থাকলেও, জনসমাজের নির্মাণ-ভাঙনের চেতনা, ধর্মীয় জিজ্ঞাসার অন্বেষণ এবং বিশেষভাবে অস্তিত্বের বহুমাত্রিক অন্বেষণ এই উপন্যাসগুলির আখ্যানের মূল বিষয়। এই উপন্যাসগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার আখ্যান নেই, কিন্তু যাঁদের কেন্দ্র ক’রে আখ্যান আবর্তিত হয়, তাঁদের বয়ান ও যাপন রাষ্ট্রের স্বরের প্রতিস্পর্শী হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানকল্পে শ্রেণির সঙ্গে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ওতঃপ্রোত। বিশেষতঃ ধর্ম ও বর্ণ-জাতি ব্যতিরেকে শ্রেণির দ্বন্দ্বকে আখ্যানসফল ক’রে তোলা যায় না। সন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ইতিহাস ও ভাষাগত বিবর্তনের অনুসন্ধান এই বোধবিন্দু থেকেই শুরু হয়।

¹ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, সাধনা পত্রিকা, চৈত্র ১৩০১, <https://www.tagoreweb.in/Essays/samayik-sar-sangraha-244/rashtriyo-byapar-6046>, দেখা হয়েছে ৩০/০৩/২০২০

² Aristotle, *Politics*, Trans. By Benjamin Jowett, Batoche Books, Kitchener, 1999, 80-82

³ জ্যোতি ভট্টাচার্য, *জীবন, ধর্ম ও রাজনীতি*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ- ১৬৩-১৭৭

⁴ Joseph Blotner, *The political novel*, Doubleday, United States, 1955, Reprint E-book, Project Gutenberg, 2022, p.2

⁵ Anthony Giddens, “The Globalizing of Modernity”, *The Global Transformations Reader* Ed. By David Held and Anthony McGrew, Polity, Cambridge, 2002, pp. 60-66

⁶ নবারণ ভট্টাচার্য, যুদ্ধ পরিস্থিতি, *উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ- ১২০-২২

⁷ Surjit S Bhalla, *Second Among Equals: The Middle Class Kingdoms of India and China*, Oxus Research & Investments, New Delhi, 2007, pp. 96-97

⁸ Edith Kurzwel and William Philips, ‘Introduction’, *Writers & politics: a Partisan review reader*, Ed. By Kruzweil and Philips, Routledge & Kegan Paul, Boston, 1983, p. 7

⁹ বেঞ্জামিন ডিসরাইলি (১৮০৪-১৮৮১) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং রাজনৈতিক থিমের ওপরে তিনটি উপন্যাস লেখেন; *Coningsby or The New Generation*

(১৮৪৪), *Sybil or The Two Nations* (১৮৪৫) এবং *Tancred or The New Crusade* (১৮৪৭)

¹⁰ Joseph Blotner, *The political novel*, pp. 1-3

¹¹ Irving Howe, *Politics and the Novel*, Horizon Press, New York, 1957, pp. 17-18

¹² Harish Trivedi, *The American Political Novel*, New Delhi: Allied Publishers, 1984, p.6.

¹³ Gordon Milne, *The American Political Novel*, University of Oklahoma Press, Norman, 1966, p. 5

¹⁴ Ibid. p.6

¹⁵ ইলিয়াস আখতারুজ্জামান, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ- ৩০-৩৫

¹⁶ Chaman Nahal, "The Indian Political Novel": Kushwant Singh, Raj Anand and Nayantara Sahgal in *New Literatures in English* Delhi: Allied Publishers, 1985, p.138.

¹⁷ Michael Wilding, *Political Fictions*, London: Routledge and Kegan Paul, 1980, pp.18-21.

¹⁸ Eugene B McCarthy, 'Rhythm and Narrative Method in Achebe's "Things Fall Apart"', *NOVEL: A Forum on Fiction* Vol. 18, No. 3 (Spring, 1985), pp. 243-256 (14 pages), Duke University Press, 1985

¹⁹ Hanisch Carol, 'The personal is political', 1969, <http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>, accessed on 25/05/2020

²⁰ Irving Howe, *Politics and the Novel*, Horizon Press, New York, 1957, p. 22

²¹ Robert Boyers, *Atrocity and Amnesia: Political Novel since 1945*, Oxford University Press, New York, 1987, p. 18

²² বিমল কর, 'সতীনাথ ভাদুড়িঃ যেমন ভেবেছি', দেশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫

²³ Gabriel Garcia Marquez, 'La soledad de America Latina', Nobel Lecture, 8th December, 1982,
<https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/>
accessed on 31/3, 2020

²⁴ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *রচনাসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ- ৩৬৫-৪৪০

²⁵ মালিনী ভট্টাচার্য, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্নঃ বাংলা কথাশিল্পে একটি নতুন ধারা', *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ- ৬০-৬৫

²⁶ Stendhal, *The Charterhouse of Parma (1839)*, Ed. By Edmund Gosse, William Heinemann, London, 1901, Chapter xxiii, p. 433

²⁷ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ- ১৭

²⁸ ফটিক চাঁদ ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ১৬

²⁹ Munshi Premchand, 'The Nature and Purpose of Literature', *Social Scientist*, Vol. 39, No. 11/12 (November–December 2011), pp. 82-86

³⁰ Ipshta Chanda, *The Journey of the Namah: A Case Study*, CAS, Comparative Literature, Jadavpur University, March 2011

³¹ Morris Edmund Speare, *The political Novel: Its development in England and America*, Oxford University Press, New York, 1924, pp.25-28

³² Carlo Coppola, 'Premchand's address to the first meeting of the All-India Progressive Writers Association: Some Speculations', *Journal of South Asian Literature*, Vol. 21, No. 2, pp- 26

³³ Ashish Nandy, 'The Making and Unmaking of Political Cultures in India', *Daedalus*, Vol. 102, No. 1, Post-Traditional Societies (Winter, 1973), MIT Press, pp. 115-137

³⁴ প্রবুদ্ধ ঘোষ, 'আপোষ কিংবা দ্রোহঃ স্বস্তিক্ষেত্র না থাকাই ভাল', <https://aparjan.com/2019/08/31/august2019-prghes/>, accessed on 28/05/2020

³⁵ মালিনী ভট্টাচার্য, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ- ৬৭

³⁶ তদেব, পৃ- ৭৬-৮২

³⁷ প্রবুদ্ধ ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশন এবং নবাবুণ ভট্টাচার্যঃ তুলনামূলক পাঠ', *নবাবুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, অর্ক চট্টোপাধ্যায় ও অদ্বয় চৌধুরী সম্পা. বৈভাষিক প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২১, ৩৩৯-৪০

³⁸ সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসে সক্রিয় যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সূত্র- ফণিশ্বরনাথ রেণু, 'ভাদুড়ীজী', *সতীনাথ স্মরণে*, সম্পা. সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৩৩-৩৬

³⁹ ফটিক চাঁদ ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, ৪২-৩

⁴⁰ মনিভূষণ ভট্টাচার্য, বেকারের চিঠি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ ১১৭-১২২

⁴¹ শোভনলাল দত্তগুপ্ত, 'রাজনীতি ও মৌলিকতা', চর্চা, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ- ২৯-৩১

⁴² Elias's letter to Sadhan Chattopadhyay, dated 10th July, 1989, *Elegy and Dream*, Subhoranjan Dasgupta, University Press Limited, Dhaka, 2018, pp. 115-16

⁴³ Subhoranjan Dasgupta, 'Revolt is the only reply', *Elegy and Dream*, p. 47

⁴⁴ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apolitical> accessed on 3rd June 2020.

⁴⁵ Scott simpkins, 'Magical Strategies: The Supplement of Realism, Twentieth Century Literature', Summer, 1988, Vol. 34, No. 2 (Summer, 1988), Duke University Press, pp. 140-154

⁴⁶ Ibid. pp-143-4

⁴⁷ Ibid. pp- 141, (main reference) Franz Roh, German Art in the 20th Century, New York Graphic Society, 1968

⁴⁸ কংগ্রেস-লিগকে জাতীয় বুর্জোয়া পার্টি ঘোষণা ক'রেও স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে 'কংগ্রেস-লিগ এক হও, হাতে হাত বেঁধে লও' আহ্বান রেখেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ জোশী। গান্ধী-জিন্নাহর মিলন ঘটাতে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা। বদরুদ্দীন উমর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ- ৯৬-৯৯।

⁴⁹ Aspects of Indian Economy, No.58, Sept, 2014, <https://www.rupe-india.org/58/problem.html> accessed on 2/1/2020

⁵⁰ তদেব

⁵¹ India: extreme inequality in numbers, Oxfam International, <https://www.oxfam.org/en/india-extreme-inequality-numbers>, accessed on 10/606/2020

⁵² “Weak artists mark time and wait for the event to retreat into the past so that they can reflect it; strong ones run ahead to get hold of time and pull it” <https://thecharnelhouse.org/2015/09/12/a-tribute-to-vladimir-mayakovsky/>

⁵³ শাহাদুজ্জামানের নেওয়া আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, ‘বাঘের বাচ্চা’ ইলিয়াস সংখ্যা, বইমেলা ২০১৮, পৃ- ৬৬-৭

⁵⁴ সমর সেন, ‘জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’, *বাবুবুড়ান্ত*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ ৮৭-৯

⁵⁵ নবারণ ভট্টাচার্য, যুদ্ধ পরিস্থিতি, *উপন্যাস সমগ্র*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ১৬০

⁵⁶ মনসুর মুসা, ভূমিকা, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ, ঢাকা, ১৩৮১

⁵⁷ সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধ, ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা’, *মাহে-নও পত্রিকা*, ভাদ্র, ১৩৫৮।

⁵⁸ এই সোসাইটির মূল নীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল- সাহিত্যিক, সাহিত্যমোদী, মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানি ভাবধারা সম্প্রসারণ এবং সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ-বিরোধী সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি। হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি* আগামী প্রকাশন, ঢাকা ২০১৪, পৃ- ১১-১২

⁵⁹ David Taylor, 'The Indian National Congress: A Hundred-Year Perspective', The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 2, Cambridge University Press, pp. 289-306

⁶⁰ “বস্তুতঃ পাকিস্তান শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে... মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদুন, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা”- সভাপতির অভিভাষণ, পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, আজাদ, পৃ- ১৫

⁶¹ রতনলাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ- ৩৫-৬

⁶² হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, পৃ-২২

⁶³ প্রথম প্রকাশ ১৩৮২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

⁶⁴ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমেদ ১৯৪৭ সালের ৩রা জুলাই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার সুপারিশ করেন। ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ প্রবন্ধে এই সুপারিশের বিরোধিতা করেন এবং ধর্মের সঙ্গে ভাষাকে অবিচ্ছেদ্য ক’রে (ইসলাম=আরবি/উর্দু) তোলার বিরোধিতা ক’রে বাংলাকেই প্রধান রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান।

⁶⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ১০৯-১১১

⁶⁶ তদেব, পৃ- ৩৩৩

⁶⁷ তদেব, পৃ- ৩৩৫

⁶⁸ Elias’ interview in Lyric magazine, Shubharanjan Dasgupta, *Elegy and Dreams*, pp- 47

⁶⁹ বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) আঠারো শতকের কলকাতার বাস্তব চরিত্র।

⁷⁰ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

-
- ⁷¹ উদাহরণ- ‘গোঁসাই বাগানের ভূত’, ‘পাগলা সাহেবের কবর’ ও ‘মোহন রায়ের বাঁশি’।
- ⁷² অজ্ঞেয়বাদী শব্দের অর্থ যা জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ব্যতীত, যাকে জ্ঞান দিয়ে জানাবোঝা সম্ভবপর নয়।
- ⁷³ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *নবীগঞ্জের দৈত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ৫৪
- ⁷⁴ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *ছায়াময়*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮
- ⁷⁵ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *মোহন রায়ের বাঁশি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ৮৮
- ⁷⁶ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাসঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ১৭৪-৮
- ⁷⁷ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ‘আপোষ কিংবা দ্রোহঃ স্বস্তিক্ষেত্র না থাকাই ভাল’, *অপরজন পত্রিকা*, অগাস্ট ২০১৯, <https://aparjan.wpcomstaging.com/2019/08/31/august2019-prghes/>, accessed on 8th July, 2020
- ⁷⁸ দেবেশ রায় ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে এই আখ্যানপদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।
- ⁷⁹ Hans Robert Jauss, *Literary History as a Challenge to Literary Theory*, pp. 7-37
- ⁸⁰ Publishers’ Comments, Subhoranjan Dasgupta, ‘An icon not too high’, *Elegy and Dream*, pp. 107-108
- ⁸¹ শাহাদুজ্জামানের নেওয়া ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, ‘লিরিক’ পত্রিকা (১৯৯২) থেকে পুনর্মুদ্রিত ‘বাঘের বাচ্চা’ পত্রিকায়, বইমেলা ২০১৮, ‘গরবাচভও এখন Masturbate করে’ শিরোনামে

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস এবং আখ্যাননির্মাণের রাজনীতি

এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়- ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের মেলবন্ধন কীভাবে ঘটে আখ্যানের কাল্পনিকতায়। ইতিহাসের ঘটনাবলী ও তার বাস্তবতার সঙ্গে আখ্যানের সংযোগে রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। বাঙলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে উপন্যাস নির্মাণের যে রাজনীতি চলেছে, তার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল পাঠক নির্মাণের রাজনীতিও। উনিশ শতকে ‘শিক্ষিত’, ‘মার্জিত’ ভদ্রলোক পাঠকবর্গকে নির্মাণ করা হয়েছে। এঁরা পরবর্তী শতকে সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির মাপকাঠি নির্ণয় করেছেন এবং সাহিত্যের উচ্চ-নিচ থেকে সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষিত কুশীলবদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণের সঙ্গে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত পাঠকশ্রেণিও তৈরি করে নিচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও বৃহত্তর মুসলমান সমাজের অভিমান এবং বঞ্চনাবোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে বহুদশক ধরে। হিন্দু ও মুসলমান পরিচিতির স্বাতন্ত্র্য ও বিভেদকে ধারণ ক’রে বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসে হিন্দু এবং/বনাম মুসলমান প্রতর্ক কীভাবে এগিয়েছে? বাঙলা ভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, মধ্যবিত্তের সংকট এবং তেভাগা কৃষকবিদ্রোহ বাংলার রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ‘খোয়াবনামা’ ও অন্যান্য বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে এগুলি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? প্রশ্ন ওঠে ইতিহাস ও সাহিত্যের ভেদরেখা নিয়ে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসনির্মাণে ‘ইতিহাস’ কীভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ছে? সমকালীন রাজনীতির আত্তীকরণ কীভাবে হচ্ছে? তাত্ত্বিকরা আখ্যান ও ইতিহাসের সেতুবন্ধনকে যেভাবে তত্ত্বায়িত করছেন, তা কীভাবে এই অনুসন্ধানে আলোকপাত করছে? এই অধ্যায়েই মিথ ও মুখফেরতা কাহিনির প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পূর্ববর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের বিরুদ্ধবয়ান হয়ে উঠতে তাদের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেছি। সন্দর্ভে আলোচিত মূল রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোতে মিথ ও মুখফেরতা গল্পের

সঙ্গে অলৌকিক আখ্যান প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের বয়ানে। প্রচলিত ইতিহাসকথন আর শাসকের বয়ানকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে আখ্যাননির্মাণ কীভাবে করছেন ঔপন্যাসিকেরা? ভদ্রলোকবৃত্তের বাইরে যে আখ্যানের নির্মাণ হয়, তা খুঁজে দেখার উপাদানগুলি কী কী?

‘খোয়াবনামা’- ইতিহাসের পুনর্কথন ও ‘আনন্দমঠ’-এর পাল্টাপ্রস্তাব

‘খোয়াবনামা’-র ভাষার বিস্তৃতিতে মিথ, লোকাচার, মুখফেরতা কাহিনি শাসকের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করার চিরায়ত হাতিয়ার হতে পারে না। বরং, মুনসির শোলোক আর চেরাগ আলির গানে ফিরে ফিরে আসে আঠারো শতকের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-র একপেশে বয়ানকে প্রত্যাখ্যান করে। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ানে ‘ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ থেকে বাদ চলে যায় ‘ফকির’দের কথা; বরং সেখানে সন্ন্যাসীরাই হয়ে ওঠে নায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪ সালে ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসের ভূমিকায় খুব স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেন ‘সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ’-এর কথা।

‘আনন্দমঠ’ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব... ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব। (চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ সাল, ভূমিকা)

বঙ্কিমচন্দ্র বারবারই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করছেন এই বিদ্রোহকে। ১২৯৩ সালে তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র একটি ইতিহাস-কথা লেখার চেষ্টা করেছেন, যার সার সেই ‘সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ’। বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ তাঁর জীবিতাবস্থায় পঞ্চম সংস্করণ অবধি বদলেছে, কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেছে ‘হিন্দু’ প্রজাদের উৎপীড়িত হওয়া এবং ‘হিন্দু’ প্রজাদের ক্ষেপে উঠে

বিদ্রোহ করার বিবরণ। মহেন্দ্র সিংহের কাছে তা ব্যাখ্যা করে ভবানন্দ, “আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?” (চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫, ২৫) ঠিক এই বয়ানই ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের সতীশ মুক্তারের বা নায়েব পূর্ণচন্দ্রের। জবরদস্তি হিন্দুয়ানির এই বীজ রোপণ করা হচ্ছে বঙ্কিমের সময় থেকেই। ‘মেক হিন্দুজ্ গ্রেট এগেইন’ বা ‘সনাতন ধর্ম’-র জয়ের পথ নিষ্ফল্টক করার ইচ্ছে বঙ্কিম চারিয়ে দিচ্ছেন উত্তরপ্রজন্মে। অথচ, ‘আনন্দমঠ’-এর প্রথম সংস্করণে শুধুমাত্র জাতীয়তাবোধের জাগরণের চেষ্টাই নয়, বরং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের আশ্বাস জানানো হয়, তাই বিদ্রোহী সত্যানন্দের জেলে যাওয়া আগুন অনিবার্ণ থাকে। তনিকা সরকারের মতে, নিজে রাজকর্মচারী হওয়া, বিক্ষুব্ধ ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের দমনমূলক আচরণ ইত্যাদির জন্যেই বঙ্কিমকে বিদেশিদের সমালোচনার পরিসর কাটছাঁট করতে হয়েছিল এবং উপন্যাসটিকে দ্বন্দ্ববোধক অবস্থানে পরিবর্তন করতে হয়েছিল^১। বঙ্কিম যতই বলুন যে, তিনি ‘ইতিহাস’ লিখছেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, রেনেসাঁস-দীক্ষিত ও নবজাগরণের পাশ্চাত্য প্রভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রুচিবান শিক্ষিত হিন্দু পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কোন বাচন (ডিসকোর্স)। নীরস ইতিহাসের থেকেও যে সরস সাহিত্যের ঘটনাপ্রবাহ পাঠকমনে ও ভবিষ্যৎপ্রজন্মে থেকে যায়, একথা বঙ্কিমের অজ্ঞাত ছিল না। গল্পকথা ‘সত্য’-র চেয়েও দ্রুত ও গভীরভাবে পাঠকমনকে প্রভাবিত করতে পারে, একথা শিক্ষিত ভদ্রলোক বঙ্কিম জানতেন। তাই, হান্টারের ইতিহাস-বিশ্লেষণকে তিনি সাহিত্যরূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। সঙ্গে রইল তাঁর শৈশবে শোনা কিছু কাহিনি। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’-তে লিখছেন যে, বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের কাছে তাঁরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গল্প শুনেছিলেন, তাঁর গল্প করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। পূর্ণচন্দ্রের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের ওই গল্পটি মনে ছিল কারণ, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ওই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় শুনিয়েছিলেন।^২ আর, এর সঙ্গে যুক্ত হয় হান্টারের ইতিহাসলেখ। তিনি শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চান

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহকে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ‘ফকির’দের খানিক উহাই রাখেন! ‘The Annals of Rural Bengal’-এ লিখছেন, “A set of lawless Banditti, wrote the council in 1773, known under the name of Sannyasis or Faquirs, have long infested these countries,” (Hunter 1872, 70-72) হান্টার ‘সন্ন্যাসী বা ফকির’ উল্লেখ করছেন, সন্ন্যাসী শব্দটাই প্রথমে রাখছেন। তাঁদের কাছে ‘Dacoits’ বা ‘Bandits’ হিসেবে উল্লিখিত সন্ন্যাসী ও ফকিররা একই গোত্রের ছিলেন। বঙ্কিমের সচেতন প্রয়াসে যাঁদের আমরা ‘আলাদা’ করে চিনতে পারি। কিন্তু, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ফকির ও সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। মাদারি সুফি তরিকার ফকির ও দশনামী পুরী-গিরি সন্ন্যাসীরা সমসত্ত্ব নন; যদিও তাঁদের দ্রোহের লক্ষ্য পরস্পরবিরোধিতা নয় বরং সাধারণ লক্ষ্য সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিদেশি-শাসনের বিরোধিতা করা। রতনলাল চক্রবর্তী তাঁর ‘ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০)’ প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন এই বিষয়সত্ত্বেও কথা। মাদারিয়া সুফী সাধকদের আগমন হয়েছিল উত্তর ভারতে, ১৫শ শতকের প্রথম দিকে এবং বাংলায় তাঁরা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সুফী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। বাংলায় তাঁদের নেতৃত্ব দেন শ্ শ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা। এই ‘বুরহানা’ বা ‘বারনা’ উপাধি গ্রহণ করা সুফীরা মজনু শাহ বুরহানার নেতৃত্বে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু করেন। অন্যদিকে, এই বিদ্রোহের ‘সন্ন্যাসী’রা ‘গিরি’ বা ‘পুরী’ সম্প্রদায়ের, যাঁদের উৎস বৈদান্তিক একদণ্ডী সন্ন্যাসী-ধারা,

খ্রিস্টীয় আট শতকের বেদান্ত দর্শনের দিকপাল শঙ্করাচার্য হিন্দু একদণ্ডী সন্ন্যাসবাদকে দশটি পৃথক শাখায় বিভক্ত করেন যা ‘দশনামী সন্ন্যাসবাদ’ নামে পরিচিত। এই দশটি শাখার মধ্যে ‘গিরি’ বা ‘পুরী’ নামে দুটি শাখা ছিল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। সুফী ফকিরদের মতো সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাখা অনুযায়ী তাদের নামের পেছনে ‘গিরি’ বা ‘পুরী’ উপাধি গ্রহণ করতেন। (চক্রবর্তী ২০১৬, ৪৯)

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের মনে ‘আপন মনের মাধুরী’-র রঙ-রস মিশিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কিম। আবারও তাঁকে কাহিনির রহস্য ফুঁজতে হয়েছিল হান্টারের ইতিহাসবই থেকে। হান্টারের ‘A statistical account of Bengal’ গ্রন্থে ভবানী পাঠক সম্পর্কে জানা যায়,

In 1787 Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaites (gang robbers), named Bhawani Pathak... we catch a glimpse from the Lieutenant’s report of a female dakait, by name Debi Chaudhrani, also in league with Pathak. Her title Debi chaudhrani would imply that she was a Zamindar- probably a petty one, else she need not lived in boats for fear of capture. (Hunter 1875, 158-159)

ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীকে বাঙালি পাঠকের চোখে অমরত্ব দান করে গেছিলেন বঙ্কিম। একদিকে যেমন ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ রচনাধারায় কিংবদন্তী-মিথ-ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, তেমনই অন্যদিকে, ভবিষ্যতের শিক্ষিত, ভদ্রলোক, হিন্দু পাঠকের কাছে কিছু ‘রোল মডেল’ তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইতিহাস ও মিথ কীভাবে পুনর্জাগরিত হচ্ছে সাহিত্যের মধ্যে, সে আলোচনায় আসব আমরা পরে। কিন্তু, ভবানন্দ-জীবানন্দ বা ভবানী পাঠককে বঙ্কিম ‘দুর্বলের ত্রাতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেও বঙ্কিমের ইতিহাস-আনুগত্য প্রশ্নের মুখে পড়ে³। বঙ্কিম নিজেও চাননি এই উপন্যাসগুলিকে ‘ঐতিহাসিক’ আখ্যা দিতে। যদুনাথ সরকার বাংলা উপন্যাসের গড়ে ওঠার যুগে বিদেশি ঐতিহাসিক উপন্যাসগ্রন্থ ও বঙ্কিমের উপন্যাসভাবনার তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন-

তাঁহার এই উপন্যাস কয়টিতে ইতিহাস হইতে জানা পুঞ্জানুপুঞ্জ এবং নিখুঁত সব সত্য নাই কেন? তাহার এক কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সেই সেই যুগের ফোটোগ্রাফ দিতে আদৌ চান

নাই; তিনি এগুলিকে গদ্য-কাব্য আকারে সৃষ্টি করিবেন, লোকশিক্ষার যন্ত্র করিবেন বলিয়া কলম ধরিয়াছিলেন... দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের দেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মসলার অভাবে উপন্যাস লেখক- অনেক স্থলে পেশাদার ঐতিহাসিকও- কল্পনার সাহায্যে ফাঁক পুরাইতে বাধ্য হন... কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর; তাহারা বা তাহাদের দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই। (যদুনাথ সরকার, ভূমিকা, আনন্দমঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৫)

যদুনাথবাবু বঙ্কিমের ইতিহাসনিষ্ঠ না থেকে সাহিত্যের অতিরঞ্জিত রসে চরিত্র সৃষ্টি ও প্রায় ১০০ বছর আগের ইতিহাসের পুনর্নিমাণকে স্বাগতই জানিয়েছেন। লীটনের ‘লাস্ট দেজ অব পম্পি’ বা স্কটের ‘ওল্ড মর্টালিটি’-র তুলনায় কম রহস্য সংগ্রহ করেও বঙ্কিম যে উৎকৃষ্টতায় তাঁদের ছাপিয়ে গিয়েছেন, সেকথা বারবার উল্লেখ করেন। হেডেন হোয়াইট ইতিহাস ও উপন্যাসের কল্পনা-বাস্তবতার দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেমন- ঘটনাসমূহ কি মূল্যবোধ-রহিত বা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ হতে পারে? একজন ইতিহাসবিদ কি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ‘সাজাতে (এমপ্লট)’ পারে এবং অর্থবহ ক’রে তুলতে পারে? এবং, তথ্যভিত্তিক পুনর্নিমাণ এবং কল্পনাভিত্তিক পুনর্সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য কী? আমরা যেমন সাহিত্যের ‘বাস্তবতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলি, হোয়াইট তেমনি ‘The Historical Text as Literary Artifact (1978)’ প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলছেন ইতিহাসের মধ্যে থাকা ‘(কাল্পনিকতা) ফিকশন’ নিয়ে,

Of course, it is a fiction of the historian that the various states of affairs which he constitutes as the beginning, the middle, and the end of a course of development are all "actual" or "real" and that he has merely recorded "what happened" in the transition from the inaugural to the terminal phase. But both the beginning state of affairs and the ending one are inevitably poetic constructions, and as

such, dependent upon the modality of the figurative language used to give them the aspect of coherence. This implies that all narrative is not simply a recording of "what happened" in the transition from one state of affairs to another, but a progressive *redescription* of sets of events in such a way as to dismantle a structure encoded in one verbal mode in the beginning so as to justify a recoding of it in another mode at the end. (White 1978, 81-100)

যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কুশীলবেদের মতাদর্শগত অভিপ্রায় নিয়ে ঐতিহাসিকোচিত সংশয় প্রকাশ করেছেন। আনন্দমঠের অনৈতিহাসিক উপাদান বেশ কিছু আছে, বঙ্কিম নিজেও তা নিয়ে অসচেতন ছিলেন না বোধহয়। উপন্যাসের কুশীলবেদের বাস্তবোৎস ও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান হওয়া ইতিহাসবিদের সততা নিশ্চয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনিও তাঁর লেখা ভূমিকায় বারবার ‘বিদ্রোহী সন্ন্যাসী’ বা ‘বিদ্রোহী সন্তানগণ’-এর কথাই শুধু বলেন, অথচ ‘বিদ্রোহী ফকিরগণ’-র কথা উহ্য রাখেন। এরপরে অবশ্য তিনি ফকিরদের নামোল্লেখ করেন।

যে সব সন্ন্যাসী ফকিরেরা সত্য ইতিহাসের লোক এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে, তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমের লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল “সন্ন্যাসী”রা ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা-সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুণ্ঠ করিতে পারে না... সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল একেবারে লুণ্ঠা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত, মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। (সরকার ১৩৪৫, ভূমিকা)

যদুনাথবাবু ফকিরদের নামোল্লেখ করলেন বটে, তবে, ‘সন্ন্যাসী ফকির’ একসঙ্গে। তিনি সন্ন্যাসীদের/সন্তানদল সম্পর্কে পশ্চিমী, গিরিপুরী ইত্যাদি ইতিহাস উল্লেখ করলেও, ফকিরদের সম্পর্কে একটি বাক্যও আলাদা ক’রে খরচ করলেন না। আর, তাঁর মতো স্বনামধন্য ঐতিহাসিক যখন আরেক স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের ভূমিকা লেখেন কিংবা তার প্রশংসা করেন, সাধারণ পাঠকসমাজে তখন সেই উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই বাড়ে। কিন্তু, আড়ালে থেকে যায় ফকিরদের ইতিহাস। এত গুরুত্বপূর্ণ এক উপন্যাস, যা বাংলা সাহিত্যের ও সমাজ-সংস্কৃতির নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, আগামী শতকে রাজনীতির ডিসকোর্স ঠিক করে দেবে, সেখানে ইতিহাসের অর্ধেক উচ্চারণ অবাক করে বইকি। অধ্যাপক জ্ঞান প্রকাশ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিকতার বিপ্রতীপে তাঁরা জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের দিকে ফিরলেন, যদিও তাঁরা ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের পদ্ধতি ও নীতিক্রমই অনুসরণ করেছিলেন⁴। ইতিহাস ও সাহিত্যের যে যুগবিভাগ ব্রিটিশরা শিখিয়েছিল, তা শিরোধার্য করেই তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ‘হিন্দু’ পুনরুজ্জীবনের নীতি নিয়েছিলেন; আর, এই যুক্তিতে যদুনাথ সরকারের ভূমিকা আলাদা কিছু নয়। ফকিরদের বাদ রাখার রাজনীতিটিও কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। ‘আনন্দমঠ’-এর প্রায় ১১৪ বছর পরে লেখা ‘খোয়াবনামা’-তে ফকির-সন্ন্যাসীদের ইতিহাস আর মিথ্ ফিরে আসছে কী ক’রে সে আলোচনা চলতে চলতেই মাদারি ফকিরদের ইতিহাসে চোখ ফেরানো যাক,

ফকিরগণ ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের মাদারিয়া শ্রেণির এবং এই শ্রেণির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরিয়া হতে আগত সুফি সাধক বদিউদ্দিন শাহ-ই-মাদার, যিনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকে ভারতে এসেছিলেন এবং বহুদিন উত্তর ভারতে তাঁর সুফি মতবাদ প্রচারের পর ১৪৩৬ সালে অযোধ্যার কানপুর জেলার মাখনপুরে মৃত্যুবরণ করেন। শাহ মাদারের সুফী মতবাদ বাংলায় প্রসার লাভ করেছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে এই

সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাহ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানা (চক্রবর্তী ২০১৬, ৪৮)

রতনলাল চক্রবর্তী লিখছেন, মজনু শাহ্ বুরহানা আঠারো শতকের শেষে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মাদারিয়া সুফী সম্প্রদায়ের অনেক আচরণ হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের মতো ছিল। তাঁরা রোজা, নমাজসহ ইসলামের বহু বিধান মানতেন না।^৫ এই ইতিহাস এবং এই ফকিরদের সম্পর্কে মুখে মুখে ফেরা বিভিন্ন মিথ্ ও কিংবদন্তী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা যদুনাথ সরকারের গোচরে না আসলেও, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিশ্চয় তা জানতেন। আখতারুজ্জামানের দু'টি উপন্যাসেই তাই উড়ে আসে মজনু শাহ্ ও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফুলকি। ইলিয়াস তাঁর আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে মজনু শাহ্, মুনসি বরকতুল্লাহ ও ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত 'প্রামাণ্য' ইতিহাস নিশ্চয়ই রাখেন, কিন্তু তার থেকেও বেশি তিনি জোর দেন মৌখিকতায়, মিথ্-বিস্তারে। 'খোয়াবনামা'-র কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে এই মৌখিকতা, মিথ্। উপন্যাসের স্থান ও সময় আখ্যানের মূল কুশীলবদের ইতিহাসবোধে জারিত করে যে বিস্তার ঘটায়, তাতে এই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গেই জড়িয়ে যায় মহাস্থানগড়ের নাম। রজতকান্ত রায় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করছেন, “ফকিররা এমন সাহসী হয়ে উঠল যে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে মজনু শাহ আর মাকওয়ানপুর ফিরে না গিয়ে মহাস্থানগড়েই কেপ্লা বানিয়ে বর্ষা কাটালেন। তখন আর তাঁর দলে শুধু গৈয়ো বাংলা আমজনতা নয়, অনেকগুলি সশস্ত্র রাজপুত্রও যোগ দিয়েছে” (রায় ১৯৬০, ২৮৫) রজত রায় মজনু শাহ-র মৃত্যুর পরে গোসাঁই ও ফকিরদের যুদ্ধ থিতুয়ে আসার উল্লেখ করছেন। উপন্যাসের ইতিহাসবোধ, ভাষা ও ডিসকোর্স যেহেতু একসূত্রে বাঁধা, তাই 'খোয়াবনামা'-র আখ্যানকেন্দ্র তথা মজনু শাহ মুনসি বরকতুল্লাহদের অন্যতম যুদ্ধভূমি মহাস্থানগড়ের ইতিহাস ও তাকে ঘিরে থাকা উল্লেখ প্রয়োজন। ইলিয়াস 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের দ্বিতীয় বাক্য তথা উপন্যাসের সম্ভবতঃ দীর্ঘতম বাক্যে

তমিজের বাপের থেকে আখ্যানকে প্রসারিত করে নেন মজনু শাহের বেগুমার ফকিরের আখ্যানে। পাঠক আখ্যানের ভাষায় পিছোতে পিছোতে ইতিহাসের হৃদিশ পায়,

...এসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেগুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেব্লায় যাবার জন্যে করতোয়ার দিকে ছোট্ট সময় মুনসি বরকতুল্লাহ শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৯)

এই মহাস্থান কেব্লা বা মহাস্থানগড় রাজশাহীর বগুড়ায় অবস্থিত, অধুনাজীর্ণ করতোয়া নদীর ক্ষীণস্রোত এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। মহাস্থানগড়ের পত্তন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, পরবর্তীতে পুণ্ড্রনগরী নামে এর উত্থান ও বিকাশ। উনিশ শতক থেকে বহুবার এই স্থানকে কেন্দ্র করে খননকার্য চালানোর সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তের অবশেষের খোঁজ পাওয়া যায়। মহাস্থানগড়ে সুফি আন্দোলনের বহু চিহ্নও পাওয়া যায়। উচ্চবর্গের প্রতিনিধি ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভূমিকায় নিম্নবর্গের মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন সুফি সন্তরা।

মহাস্থানের ইতিহাসে উঠে আসে বলখী সাহেবের নাম। পশ্চিমের সুদূর বলখ প্রদেশ থেকে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন দ্বাদশ শতকে এবং জনৈক রাজা নরসিংহ রায়কে পরাজিত করেন; রাজা নরসিংহের প্রচুর সৈন্যসামন্ত থাকলেও, ফকির বলখী সাহেবের কাছে পরাজিত হন। ‘মহাস্থান গড়ের ইতিহাস’ থেকে জানা যায় যে, এখানেও কিংবদন্তীর উল্লেখ প্রচুর-

আল্লামার কুদরতে ও ফকিরের কেরামতিতে যারা বিশ্বাস করেন না, তাহারা বলিয়া থাকেন যে মৎস্যকৃতি নৌকাতে বলখী সাহেব সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলেন সেজন্য তাহাকে মাহীসোওয়ার নামে অভিহিত করা হয় (আফজল ১৯৭৯, ২৩)

হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী-র জীবন ও ইসলাম ধর্মপ্রচার নিয়ে যে মিথ্, আফজল মোহাম্মদ তাঁর ‘মহাস্থান গড়ের ইতিহাস’ বইতে তার যথেষ্ট উল্লেখ করছেন, তবে, এই

অধিকাংশ মিথেরই ‘ঐতিহাসিক সন ও স্থান’ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। গৌতম রায় তাঁর ‘আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বাঙালি মুসলমান’ বইতে এই মহাস্থানগড়ের লোকশ্রুতির কথা লিখেছেন, যার অধিকাংশই মোহাম্মদ আফজলের লেখার সঙ্গে মেলে যদিও ভিন্নতাও আছে-

শাহ সুলতান সম্বন্ধে মহাস্থান ঘুরে এই লোকশ্রুতি সংগ্রহ করতে পেরেছি যে, হিন্দু রাজা বলরাম ও পরশুরাম ছিলেন মারাত্মক রকমের মুসলমানবিদ্বেষী। শাহ সুলতান মাহি আসোয়ার এই দুই মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দু রাজা বলরাম এবং পরশুরামকে হত্যা করেন... ইবন বতুতা যখন শ্রীহট্টে এসেছিলেন তখন সেখানে শাহ জালালাউদ্দীন কুনিয়াঈ-র দেখা পেয়েছিলেন। এটা সম্ভবত ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। শাহ জালালাউদ্দীন শ্রীহট্টে গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সেখানকার সাধারণ মানুষকে রাজার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। (রায় ২০২১, ৭৮)

মাহী সওয়ার সুফীসাধকের কথা আচমকাই কেরামতের শোলোকে চলে আসে; যে কেরামত আলি বরাবর খুঁজে বেরিয়েছে খোয়াবনামার ভাষা, চেরাগ আলির শোলোকের উৎস এবং তমিজের বাপের মতে যে, ‘ফাতরা কিসিমের কবিরাল’, তারই গলায় মুনসির প্রতিধ্বনি। মাহী সওয়ারের আখ্যান কিন্তু এর আগে আসেনি চেরাগ আলির শোলোকে, মুনসিকে নিয়ে দেখা ভুতুড়েখোয়াবে; কিন্তু, কোনও এক আশ্চর্য পরম্পরা এবং চিরাচরিত বিদ্রোহ-ঐতিহ্যে তাঁর কথা ধ্বনিত হয়,

মহাস্থানে শায়িত শাহ সুলতান হুজুর

মাহি সওয়ার নামে তিনি দুনিয়ায় মশহুর

তানারে বেইজ্জত করে নাসারা কোম্পানি

লাজে দুক্ষে শুকাইল করতোয়ার পানি (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৮৯)

এই শোলোকভঙ্গি কেরামত খুঁজে পায় তখনই, যখন মাঝিরা শরাফত মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, এবং হকের মাছ কাৎলাহার বিল থেকে তুলতে এসেছে। তমিজের বাপের মাথায় শরাফত খড়ম মারলে, স্বতঃস্ফূর্ত দ্রোহে সম্মিলিত হয় মাঝিপাড়ার তাবৎ শোষিত মাঝি। কোম্পানির সেনারা মাছি সওয়ারকে অপমান করলে করতোয়া নদীতে যে আলোড়ন ওঠে, তমিজের বাপের অপমানে কি সেই আলোড়ন কাৎলাহার বিলেও ওঠে না? তমিজের বাপই কি তবে সেই পরম্পরার উত্তরাধিকার হয়ে শোলোক-মিথ—দ্রোহের ধারা টিকিয়ে রাখে? এইসব প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতেই কেরামতের ঠোঁটে মুনসির গলা শোনা যায় মাঝিদের প্রতিস্পর্ধায় উৎসাহ দিতে! গৌতম রায় ও মোহাম্মদ আফজল উল্লেখ করছেন শীলাদেবীর কিংবদন্তীও। জনশ্রুতিতে পুনঃপুনঃকথিত এই মিথ অনুযায়ী পরশুরামের বোন শীলাদেবী ও তাঁর নামাঙ্কিত ঘাটের কাহিনি। তবে, আফজল মোহাম্মদের লেখা থেকে দু'টি ধারণা স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়- হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণা এবং বুরহানা ফকিরদের কথা।

মাজারে যেমন মুসলমানেরা জিয়ারত করিতে আসেন তেমনি দশহরা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, পৌষ-নারায়ণী প্রভৃতি তিথিতে বহুসংখ্যক হিন্দু যাত্রীরা শীলাদেবীর ঘাটে স্নান করিয়া পুণ্য অর্জন মানসে আগমন করেন। তাহাদের অনেকেই পীর সাহেবের দরহায় শীরণী দিয়া থাকেন... বগুড়ার ইতিহাসে শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন মহাস্থানকে হিন্দু তীর্থস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন... ভারতের আর কোনও তীর্থস্থান একাধারে হিন্দু ও মুসলমানের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত তাহা জানা নাই। (আফজল ১৯৭৯, ৩৬-৭)

করতোয়ার তীরবর্তী মহাস্থানগড় বা অতীতের পুণ্ড্রবর্ধনে বহু শাসক শান করেছে, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম শাসকেরা নিজেদের শাসনসময়ে রাজত্ব করেছে। ভারতে সুফী-মতাদর্শের প্রসার ঘটার পর, ক্রমে তা যখন পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, পুণ্ড্রবর্ধন ছিল তার অন্যতম কেন্দ্র। সুফী সাধক মীর বোরহান উদ্দিনের উল্লেখও প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে। তাঁর সাধনা সম্পর্কেও বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। বহুকাল আগের ধুলোয় ঢাকা ইতিহাসের সম্পূর্ণ হদিশ পাওয়া

অসম্ভব স্বীকার ক'রে নিয়েও মহম্মদ আফজল মীর বোরহান উদ্দিন নামক সাধকের অস্তিত্বের বাস্তবতা উল্লেখ করছেন, যিনি মহাস্থানগড়ের কাছেই বাস করতেন। প্রমাণ হিসেবে রয়েছে গড়ের দক্ষিণের কবরস্থানে তাঁর সমাধি।^৬

হযরত সোলতান বলখী সাহেব, সোনাতন সাহেব, মীর সাহেব, বোরহানা ফকিরেরা এবং সর্বশেষে সৈয়দ আলী দরবেশ আল্লাহর জন্য আপন প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আজীবন তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া এখানেই সমাধিস্থ হইয়াছে। (আফজল ১৯৭৯, ৪০)

এই সুফী বোরহানা বা বুরহানা সম্প্রদায়ের ফকিরেরাই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান দ্রোহশক্তি ছিলেন। মোহাম্মদ আফজল মহাস্থানগড়ের ইতিহাসসন্ধানে দৈবশক্তির আধিক্য ও ‘অলৌকিক’ কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখলেও, ইলিয়াস সেই পথে হাঁটেননি। স্থানীয় সমস্ত কিংবদন্তী ও লোকমুখে ছড়ানো আখ্যানের সঙ্গে ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন এক বাস্তব ইতিহাসের ওপরে ভরসা রেখেই। তাই, ‘হাজার হাজার বেগুমার ফকির’ ও মজনু শাহের মৃত্যুদৃশ্যের পরেই মুনসি কীভাবে কিংবদন্তী হয়ে যান, মিথের লৌকিকতা অর্জন করেন জনমনের বিশ্বাসে, সেই চিত্রকল্প ইলিয়াস সাহিত্যের ভাষায় তৈরি করেন। মিথের জন্ম কীভাবে হয়-

তা সে কি আজকের কথা? সেই কোন আমলে এক বিকেলবেলা বেলা ডোবার আগে আগে মজনু শাহের হাজার হাজার বেগুমার ফকিরদের সঙ্গে করতোয়ার দিকে ছোট্ট সময় গোরাদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে সে পড়ে গিয়েছিল সাদা ঘোড়া থেকে। সারা অঙ্গে তীর বেঁধা সেই ঘোড়া উড়ে গেলো কোথায় কে জানে, আর এখানে এই কাদায় পড়ে থাকতে থাকতে মুনসির লাশ জ্বলে উঠলো লাল আগুন, নীল আগুন, কালো আগুনের শিখায়। তিন দিন তার জ্বলন্ত শরীর ছোঁয়ার সাহস কারো হলো না, কাফন দাফন সবই বাকি রইলো দেখে মুনসি কী আর করে, গুলিতে ফাঁক-করা-গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসলো পাকুড়গাছের মাথায়। (ইলিয়াস, ১২)

মুনসির এই যে ‘আগুনের জীব’ হয়ে যাওয়া, মৃত্যুর পরেও অমরতা পেয়ে যাওয়া এবং লৌকিক আখ্যানে আখ্যানে অতিলৌকিক বিশ্বাসে ‘ভূত’ হয়ে যাওয়া- উপন্যাসের আখ্যানক্রমের ধরতাই হয়ে থেকে যায়। বারবার ফিরে আসে মুনসি এবং অন্য বেশুমার ফকিরদের কাহিনি, তমিজের বাপের খোয়াবে জেগে থাকে এবং ফকির-সন্ন্যাসীদের অতীত নিয়ন্ত্রণ করে আখ্যানের কালস্থানিকতাকে। বঙ্কিম ও জাতীয়তাবাদী সমালোচকেরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আখ্যান থেকে ফকিরদের বাদ দেওয়ার যে সাহিত্যপদ্ধতির অবতারণা করেছিলেন, ইলিয়াসের ইতিহাস খুঁড়ে তোলা মিথ—আখ্যানের যুগলবন্দিতে সেই পদ্ধতির বিপ্রতীপ অবস্থান দৃঢ় হয়। মোহাম্মদ আফজল বা গৌতম রায়ের তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তি কিংবদন্তী-মিথ হলেও, একটা সূত্র পাওয়া যায়, সুফী মতাদর্শের বিস্তারের আলোচনায়। নিম্নবর্ণের মানুষ হিন্দু বা মুসলিম শাসকের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে এই মতাদর্শের দিকে ঝুঁকছেন এবং সুফীর মধ্যে দিয়েই এক সমন্বয়সেতু তৈরি হচ্ছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘The Eighteenth Century in India’ প্রবন্ধেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, আঠারো শতকে সুফীবাদ ভারতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন করেছিল। বেদান্ত দর্শন ও সুফীবাদের মধ্যে সাদৃশ্য হেতু হিন্দু-ইসলামিক সাধকরা একে অভিন্ন বলে বিবেচনা করতেন।⁷ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রাথমিক কারণ ছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তীর্থস্থান ভ্রমণে বাধাদান এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। ফকির মজনু শাহ্ রানী ভবানীকে ব্রিটিশদ্রোহে সহযোগীরাপে পেতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, যে, বাংলায় তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি করেন ও ‘দরগায় দরগায় আল্লার নামে দোয়া’ দেন; কিন্তু, ইংরেজরা এই দরগাভ্রমণে বাধা দিচ্ছে ও দেড়শত ফকিরকে হত্যা করেছে। “আপনি দেশের মালিকান। আমরা ফকির, সদাই আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি”⁸ সদ্য ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টররা এঁদের ‘ডাকাত’ তকমা দিয়ে হেনস্থা করতে শুরু করেন। কিন্তু, এর পরে মূল যে কারণটি দ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং শক্তিবৃদ্ধি করে, তা হচ্ছে, গ্রামীণ শোষিত জনগণের খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক অনটন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘দেবী চৌধুরানী’ ও ‘আনন্দমঠ’-এ সেই ইঙ্গিতই

দিচ্ছেন। নিঃস্ব কৃষক ও কর্মহীন সৈন্যদল এবং ছোট কৃষকেরা যুক্ত হন ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ধনী-অত্যাচারী জমিদার, নায়েব-গোমস্তার গুদাম, কোম্পানির কুঠি এবং ইংরেজ সেনার রসদের ভাণ্ডার। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পরে উচ্চবর্গ-উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে মজনু শাহ ও ভবানী সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে।^৯ রতনলাল চক্রবর্তী লিখছেন যে, মস্বন্তর ও মস্বন্তর-পরবর্তী সময়ে জনজীবনে যে অসীম দুর্দশা খেয়াল করা যায়, তার ফলশ্রুতিতে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তৎকালীন বঙ্গের দিনাজপুর, রঙপুর, বগুড়ার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন তীব্রতর রূপ নেয়। ফকিররা বগুড়ার মহাস্থানগড়ে সমবেত হয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেন।^{১০} আর, এঁদের বিরোধিতা এসেছিল উচ্চবর্গ-উচ্চশ্রেণির থেকেই। নাটোরের রানী এবং তাঁর মতো হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে, অধিকাংশ জমিদার ও দেশি বেনিয়া ব্রিটিশদের সঙ্গে একজোটে সন্ন্যাসী-ফকিরদের দমনে উৎসাহী হন। নিম্নবর্গের এই সশস্ত্র প্রতিরোধের সময়কাল প্রায় চার দশক বিস্তৃত হলেও, ১৭৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকেই এর তীব্রতা হ্রাস পেতে শুরু করে।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে বাংলার একটি শ্রেণী ফকির-সন্ন্যাসীদের বিরোধিতা করেছেন, যারা ছিলেন মূলত যুগান্তর যুগের উঠতি পুঁজিপতি, প্রকৃতপক্ষে তখন বাংলায় কান্তাবাবু, দেবী সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, রামকান্ত রায়, দুলাল রায় ও জয় নারায়ণ ঘোষালের মতো বেনিয়া ও মুৎসুদ্দির অভাব ছিল না এবং ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন উঠতি পুঁজিপতি বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে। (চক্রবর্তী ২০১৬, ৫৭)

আনন্দ ভট্টাচার্য তাঁর ‘Reconsidering the Sannyasi Rebellion’ প্রবন্ধে এই শত্রুতার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যদিও, তাঁর লেখাতেও ‘সন্ন্যাসী’রাই মূল, ফকিরদের উল্লেখ প্রায় নেই এবং সন্ন্যাসীদের লুঠপাট-ডাকাতির বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আরও

একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য দিচ্ছেন আনন্দবাবু, যে, সন্ন্যাসীরা ছিল সুদের কারবারি¹¹; কোম্পানির সঙ্গে সুদের হার নিয়ে বিবাদের জেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত।

The causes of conflict between the Sannyasis and the peasants' of Bengal included the peasants' failure to pay the forced contribution and money lending at extortionate rates. Along with the increasing revenue demands of the East India Company, the recurring crop failures during 1769-70 placed the peasantry under great economic hardship, and the sannyasis demands for contribution in the name of charity during their religious pilgrimage further worsened their condition... The collector of Bagura reported in 1773 that more than 3000 armed sannyasis arrived at chowgong in Bagura, having plundered several villages on their way (Bhattacharya 2012, 94)

আনন্দ ভট্টাচার্য তাঁর নিবন্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই বলতে চাননি¹² বরং কৃষক ও কোম্পানির সঙ্গে ত্রিমুখী স্বার্থের সংঘাতকেই দ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু ধরেছেন। ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুরে প্রায় ৩০০০ সশস্ত্র সন্ন্যাসী-দলের উল্লেখ করলেও, আশ্চর্যজনকভাবে অনুচ্চারিত থাকেন ফকিররা। ১৭৬৭ সালে সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের প্রথম আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায় বিহারের সারণে।

ইলিয়াস ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রতিগ্রহণ খুঁজছেন লোকায়ত মিথ ও কিংবদন্তীর পারস্পরিকতায়। ইতিহাসের দস্তাবেজ, ইংরেজ কালেক্টরদের চিঠি-নথিতে লেখা 'ইতিহাস'-র থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মহাস্থানগড়ের আশেপাশের গ্রামজীবনে বেঁচে থাকা মুখফেরতা কথনের ওপরে। রজতকান্ত রায়ের গ্রন্থে যদিও ফকির ও গৌঁসাই (সন্ন্যাসী)দের নিয়ে রচিত 'মজনুর কবিতা' ও 'পৌষ-নারায়ণী স্নান'-র মতো লেখায় ফকির-গৌঁসাইদের সম্পর্কে 'বাঙালী

গ্রামবাসীদের 'ত্রাসের' ভাব উল্লেখ করেছেন¹³। কোম্পানির ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী শহীদ মুন্সির মিথ চারিয়ে যায় তেভাগা আন্দোলনে, বারেবারে তা অবদমিত কৃষকসত্তাকে সচেতন ক'রে তোলে। লেখকের কথন নয়, তমিজের বাপের নিজস্ব কথনসূত্রে আসে, খোয়াবে আসে। হিন্দু নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোঁড়া হিন্দু সতীশ মুক্তাররা প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায়ে যেভাবে ধর্মকে দেখছেন, যেভাবে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের উস্কানি দিয়ে বলে, "নো মোর উইথ দি বারবেরিয়ান মহামেডানস... দে বিলং টু এ ডিফারেন্ট কালচারাল লেভেল। উই ক্যান নট লিভ টুগেদার" (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৪) সেই ভাষার বিরোধিতা করে কেপ্ট পাল, বৈকুণ্ঠ গিরিরা। তাদের কাছে ধর্মীয় সহাবস্থান, দুর্গাপূজো না-করে ফকির-সন্ন্যাসীর পূজো করা এবং পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসীর থানে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত উৎসব অনেক বেশি অর্থময়। 'বাবু' হিন্দুদের ইংরাজি, ধর্মীয় অধিকার বুঝে নেওয়ার সংলাপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে তথাকথিত 'সুপারস্টিশাস্ পিপল'-এর মিথ ও সমন্বয়বর্তা। প্রায় দু'শো বছর আগের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মিথ, মুন্সি ও ভবানী সন্ন্যাসীর প্রতিরোধ তারাই বয়ে নিয়ে চলে সংস্কৃতিতে, ভাষায়। মিথ এবং মুখফেরতা সাহিত্য বা ওরাল ট্র্যাডিশন যে প্রতিরোধেরই ভাষ্য তা স্পষ্ট করেন ইলিয়াসের সমসাময়িক আরেক লেখক, মহাশ্বেতা দেবী। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস বারবার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-র চেনাছক ভেঙে ও লিখিত ইতিহাসের মানদণ্ডকে প্রশ্ন ক'রে বিরসা মুণ্ডা থেকে বিরসা ভগবানে উত্তরণ ঘটায়। এর মুখবন্ধে মহাশ্বেতা লেখেন,

Oral tradition-এর মার নেই। বিরসা legend হয়ে ওঠে, কেননা জীবিতকালেই সে Oral tradition-এ জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। আজকের তথ্য + তথ্যপ্রযুক্তি রোগজর্জর বিশ্বেও Oral tradition দ্বারা জনচেতনাকে আক্রমণ ও সংক্রমণ করা দরকার। এটা গণপ্রতিরোধের একটা পরীক্ষিত সফল আয়ুধ। (দেবী ১৪১৮ সাল, ১৪)

আর, এই গণপ্রতিরোধই উলগুলান নিভতে দেয় না, 'উলগুলানের মরণ নাই' আগুবা ক্য হয়ে সমন্বরে কালান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ভবানী আর মজনুর যুগলবন্দির কথা যেমন কালান্তরে

প্রসারিত হতে থাকে, যতই লিখিত ইতিহাস বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক তাতে বাধানের চেষ্টা করুন না কেন।

‘বাবু’দের ‘বারবেরিয়ান মহামেডান’-দের সঙ্গে সহাবস্থানের এই যে অনীহা, তার সূত্রপাতও কি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-র মধ্যেই নেই? মুসলমানের প্রতিষ্ঠান বলপূর্বক ভেঙে তাতে হিন্দু প্রতিষ্ঠানের পুনর্প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা? ‘অথর্’ বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা তাঁর উপন্যাসের ভাষায় চরিত্রদের মুখে মুখে বসে যায়- ‘ভাই, এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?’ (চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ সাল, ৯৭)। সত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত-অপ্রকৃত রূপ বোঝাবার পরে, সত্ত্বগুণ মতে দয়াদাক্ষিণ্য ভক্তির উপাসনা ও রজোগুণ মতে শক্তির উপাসনায় ‘দেবদেবীগণের নিধন’- এই দু’য়ের পার্থক্য বোঝায় মহেন্দ্রকে। স্পষ্ট হয় সন্তানদলের লক্ষ্য, এমনকি যে লক্ষ্য এতক্ষণ আলোচনা করা ইতিহাসের দশনামী গিরি সন্ন্যাসীদলের লক্ষ্যের থেকে বহু আলাদা। সত্যানন্দ দ্বিধাহীন চিন্তে ঘোষণা করে, “আমরা রাজ্য চাহি না- কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্রোহী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।” (চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫, ৬৭) বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁর এই আখ্যান রচনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দেন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, যেখানে ইংরেজদের শাসনকে সদর্থক ভাবেই দেখতে চান। সদ্যপরাজিত নবাব-আমল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি-আমলের মধ্যবর্তী ‘অরাজকতা’-র অবসানকল্পে ইংরেজশাসনকেই আহ্বান করেছেন। “সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।” (চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮২, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন) উপন্যাসের শেষে বিদ্রোহী সন্তানদল আত্মসমর্পণ করে ইংরেজশাসনের আপাতনিশ্চয়তায়। ‘বিধর্মী’ মুসলমানদের বিরুদ্ধে একপ্রকার ‘সফল’ বিদ্রোহের পরে তাদের এই সমর্পণ উপন্যাসের রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। ইংরেজদের পরাধীন হতে চেয়ে এবং পাশ্চাত্য শাসন-সংস্কৃতির কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছিল তৎকালীন বাংলার কোন শ্রেণি? যে কান্তবাবু, দেবী সিংহ, জয়নারায়ণ ঘোষালেরা নিঃস্ব

কৃষক-বেকার সৈন্যদল-ফকির সন্ন্যাসীদের জোটের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে কোম্পানির সাহায্য নিয়েছিল, তাদেরই আকাজ্জার ভাষা ফুটে বেরোচ্ছে আনন্দমঠের প্রোটাগনিস্ট-গোষ্ঠীর সংলাপে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রাজনীতির ভাষা তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এসে পূর্ণতা পায়। যুদ্ধে প্রধান শত্রু ও গৌণ শত্রু বেছে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে (ইতিহাসেরও সন্ধিক্ষণ বটে) দশ সহস্র সন্তানের যুদ্ধোৎসাহের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিচ্ছেন এইভাবে,

কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, “মার, মার, নেড়ে মার।” কেহ বলিল, “জয় জয়, মহারাজকি জয়!” কেহ গাহিল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে!” কেহ গাহিল, “বন্দে মাতরম!” কেহ বলে, “ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙালি হইয়া রণক্ষেত্রে শরীরপাত করিব”... দশ সহস্র নারীকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্রাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর, মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম “বন্দে মাতরম”! (চট্টোপাধ্যায় ১৩৪৫ সাল, ৯৭)

এই ভাষা, বাংলা উপন্যাসের নির্মাণকালের তথা প্রথম বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের এই ভাষা নিঃসন্দেহে আবেগপ্রবণ, কল্পনায় জর্জরিত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতিবর্ণনায় উদ্ভাসিত। কিন্তু, তার থেকেও বড় হয়ে দেখা দেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আকাজ্জায় জারিত ভাষার নির্মাণ। না, এই বর্ণনায় কোথাও ফকিররা নেই। ‘নেড়ে’-দের প্রধান শত্রু করে তোলার সচেতন লেখনপ্রয়াসে ফকিররা স্থান পেতে পারেন না, শত্রু-হননকারী বিষুণের মন্তোচ্ছারণে ফকিরদের প্রার্থনা মিলতে পারে না, ‘মসজিদ গড়িয়া মন্দির গড়িয়া তুলিব’ বাসনায় ফকির-সন্ন্যাসী যুগলবন্দীর ইতিহাস চুরমার হয়ে যায়। আর, সেই চুরমার হয়ে যাওয়া ইতিহাসবোধের ভেতরে ঢুকে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখকের স্বীয় ভাবনার আধিপত্য; তাঁর লেখায় কুশীলবেরা সেই কথাই

উচ্চারণ করে, যা তিনি উচ্চারণ করাতে চান। আর, ‘সর্বজনমনোরম বন্দে মাতরম’-র বিস্তারে কাদের কথা বলতে চান বঙ্কিমচন্দ্র? এই সর্বজন-এর মধ্যে কোথাও কি তৎকালীন ভারতবর্ষের বা আজকের অ-হিন্দু জনগণ উপস্থিত আছে? না, নেই। ‘বন্দে মাতরম’ এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়েই এক প্রতর্ক বা ডিসকোর্সে পরিণত হয়, যাকে পরবর্তীতে বিপ্লবীরা পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্র হিসেবে উচ্চারণ করতে থাকেন। কিন্তু, ‘আনন্দমঠ’-র এই ‘বন্দে মাতরম’-এর মধ্যে নিহিত থাকে এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধের জেদ।

এই প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা প্রধান সন্তান সত্যানন্দের গলাতেও। দশ হাজার সন্তানের সামনে এসে যখন তিনি ভাষণ দেন, তখন স্পষ্টতর হয় এই বিদ্রোহীদের আরাধ্য উপাসক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার পরিসর, যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায়কেই জাগিয়ে তুলতে পারে-

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দন,
লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি
দিন, ধর্মের মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর। (চট্টোপাধ্যায়, ৯৭)

আর, এর পরেই সত্যানন্দ সন্তানদলের সম্মুখে হাজির করেন তাদের আশু শত্রুর নাম- ‘বিধর্মী দুরাত্মা’ টমাস নামক ইংরেজ সেনাপতি। সন্ন্যাসীদের অস্ত্রের অভিমুখ ও ‘রজোগুণ’ জাগরিত বাহুবল ইংরেজদের প্রতি ধাবিত হলেও, সত্যানন্দ এক মোক্ষম সন্ধিক্ষণে মূল শত্রু চিহ্নিত করেন। ভবানন্দ বলেন, ইংরেজরা নয়, সন্তানদের মূল শত্রু বিধর্মী মুসলমানেরা- আর, এর ফলে, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কালস্থানিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় ‘আনন্দমঠ’,

ভবানন্দ বলিলেন, “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে।
কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস- তোমার প্রাণদান দিলাম,
আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।”... ভবানন্দ রঙ্গ
দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, “ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল, একবার উহাদিগকে

আক্রমণ করি।” তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল (চট্টোপাধ্যায়, ১০২)

হিন্দু সন্তানদের তথা সন্ন্যাসীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালানো ও লুণ্ঠ করার¹⁴ বর্ণনায় যে আবেগপ্রবণ ভাষার ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাতে ইতিহাস বা লোকায়ত মিথের উল্লেখ না-থাকুক, মুসলমান-দমনকারী হিন্দু-জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের রাজনীতি সুস্পষ্ট। শব্দের রাজনীতি ও ভাষার রাজনীতি উনিশ শতকের শেষপর্বে যে সাহিত্যভাষার জন্ম দিচ্ছে, ‘ভদ্রলোক’ হিন্দুবাবুদের বাসনা চরিতার্থ করছে- বাংলা উপন্যাসকে তা সংজ্ঞায়িত করছে। সন্তানরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাহিত্যের ভাষা থেকে ভারতবর্ষের আজকের রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরেজদের সম্পর্কে ভদ্রলোক পাঠকবর্গের মনে কোনরূপ বিরূপতা নয় বরং তাদের সুশাসন সম্পর্কে অবহিত করাই যে মূল উদ্দেশ্য, তা ‘আনন্দমঠ’-এর দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনের মধ্যেই উল্লিখিত। ১৮৮২ সালের ‘দ্য লিবারাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত বুক-রিভিউ বঙ্কিমচন্দ্র টীকা হিসেবে তুলে ধরেন ‘দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন’ অংশে-

The immediate object is thus briefly described in the preface- To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter- “...The English are profound masters of physical knowledge and the apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with thw problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord...” This passage embodies the most recent and the most enlightened views of

the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for Good. (চট্টোপাধ্যায়, ৮ই এপ্রিল ১৮৮২ দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন)

উপন্যাসের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে আসেন সেই অলৌকিক চিকিৎসক, যিনি রণক্লান্ত-আহত জীবানন্দকে সুস্থ করে তোলেন। সত্যানন্দের ‘হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন’-র অতৃপ্তিকে সন্তুষ্টি দেন এবং সনাতনধর্মের সারকথা বোঝান। বঙ্কিমচন্দ্রের মতাদর্শ ও ভাষার রাজনীতিতে এই চিকিৎসক অচিরেই ‘মহাপুরুষ’ বলে সম্বোধিত হন লেখক দ্বারা। তিনিই অভিমুখহীন সন্তানদলকে দিশা জোগান, সত্যানন্দকে হাত ধরে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি মার্গের দিকে নিয়ে যান। বিষ্ণুমন্দিরে পরম আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে উপলব্ধি করান যে, “সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।” (চট্টোপাধ্যায়, ১৩২) বঙ্কিমচন্দ্রের এই রাজনীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘খোয়াবের রাতদিন’ প্রবন্ধে লিখছেন, “আনন্দমঠ তো শুধু ‘কাল্পনিক’ উপন্যাস ছিল না, ভবানন্দ-জীবানন্দ-ধীরানন্দ-জ্ঞানানন্দ-সত্যানন্দের আনন্দ-রোমাঞ্চ ছিল না, তাতে পেশ হয়েছিল ভবিষ্যের উপযোগী রীতিমত এক কৃত্যসূচী, কর্ম-প্রস্থানের নতুন ঘোষণাপত্র।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২ ১৫৪) ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ এই ভাষা ও রাজনীতিকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েই প্রথম বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে। মিথের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধান ও কল্পনার মিথস্ক্রিয়ায় ‘উপন্যাস’ নির্মাণ করছেন বঙ্কিম ও ইলিয়াস দু’জনেই। কিন্তু, ইলিয়াসের মিথ-ব্যবহার, লোকায়ত কিংবদন্তীর প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত আখ্যান ঔপনিবেশিক ইতিহাস-মহাফেজের দলিল-দস্তাবেজকে যেমন আক্রমণ করে, তেমনি প্রায় ১১৪ বছর আগে লেখা দারুণ প্রভাবশালী এক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকেও আক্রমণ করে। ইলিয়াসের মিথ ও লোকায়ত কিংবদন্তী ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই, এই আখ্যানের রাজনীতির ভাষায়। বাবুহিন্দু সতীশ মুক্তার বা নায়েব পূর্ণচন্দ্র ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রাক্কালে হাতিয়ার করেন

‘আনন্দমঠ’কেই। উল্লেখ্য, যে ‘আনন্দমঠ’ বারবার সাহিত্যপাঠের ইতিহাস-উপন্যাস সীমানায় গোলযোগ ঘটয়েছে। আর, ইলিয়াস তাঁর রাজনীতি দিয়ে খুঁজে দেখতে নিম্নবর্গের ইতিহাসবোধকে। নিম্নবর্গের হিন্দু যুধিষ্ঠির কামার, বৈকুণ্ঠ গিরি, কেষ্ট পালেরা উত্তরাধিকারে মুখে-কানে বয়ে নিয়ে চলে ‘ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’-এর মিথ্। তাঁরা শুধুমাত্র ‘সন্তানদল’ নন, তাঁরা সত্যানন্দের চালা নন বা ‘মার মার, নেড়েদের মার’ ডিসকোর্সের বাহক নন। তাঁরা ‘ফকির-সন্ন্যাসী’ দলের নেতা ভবানী পাঠক ও মজনু শাহের উত্তরাধিকারী।

নায়েববাবু নিচু গলায় উপদেশ দেয় কামারদের, ‘এখন আমাদের এক হওয়ার দরকার। জমিদারবাবু এখন থেকে সন্ন্যাসীর স্থানে দুর্গাপূজা করবেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব হিন্দু সেখানে মিলিত হবে। মুসলিমদের দেখো না, ওদের ঈদ ফিদ কী সব হলে সব পালে পালে জুটে যায় এক ময়দানে। সেখানে কি তোমাদের ঢুকতে দেয়?’

কেষ্ট পাল প্রতিবাদ করে, ‘কিন্তু পোড়াদহ মেলাত এটিকার মোসলমান সগলি আসে। গোলাবাড়ি থ্যাকা পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসীর থান পর্যন্ত ঘোড়দৌড় হয়, তার সওয়ারি তো ব্যামাক মোসলমান।’

‘কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো ছিল মুসলমানের শত্রু, সে খবর রাখো?’

‘না বাবু’

‘তুমি বেশি জানো?’ সতীশ মুক্তার কেষ্ট পালকে ধমক দেয়, ‘সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো, তা জানো? আনন্দমঠ পড়েছো?’

‘না বাবু’। বলে কেষ্ট পাল তার আনন্দমঠ না পড়া এবং সতীশ মুক্তারের কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে একই সঙ্গে, ‘হামাগোরে ভবানী সন্ন্যাসীর সেনাপতি আছিলো এক পাঠান।’ বলতে বলতে কেষ্ট পালের আত্মবিশ্বাস এতটাই বাড়ে যে গল্পের মধ্যে সে ইতিহাস ঢুকিয়ে দেয়, ‘ফকির মজনু শাহ আছিলো ফকির রাজা, আর সন্ন্যাসী দলের রাজা আছিলো ভবানী সন্ন্যাসী’। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৪-৩৫)

মাঝিপাড়ার হিন্দুদের মুসলমান-বিরোধী কর্মে উৎসাহ দিতে সতীশ মুক্তার ও নায়েববাবুর ভূমিকা সত্যানন্দ-ভবানন্দের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তবে, পার্থক্য এটাই যে, ভবানন্দ-সত্যানন্দদের অন্ততঃ লড়াইটুকু করাতে পেরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর, এই নায়েববাবু-সতীশ মুক্তাররা দশরথ কামার কেপ্ট পালেদের দিয়ে আগুন লাগিয়ে নিজেরা সুরক্ষিত থাকতে চায়, নিজেদের স্বার্থের বিভক্ত-বাংলা পেতে চায়। ‘আনন্দমঠ’-র প্রতিগ্রহণ (reception) ইতিহাস পেরিয়ে বর্তমানে চলে আসে, উপন্যাসের ‘কাল্পনিক’ গণ্ডি টপকে (বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যাকে ইতিহাস বলতে দ্বিধাগ্রস্ত) ঢুকে পড়ে ‘প্রামাণ্য’ বয়ানে। আর, এই বয়ান-প্রতর্ক কাদের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসে? সমাজের উচ্চবর্গ-উচ্চবিত্তদের মুখ দিয়ে, যাদের যথেষ্ট আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা রয়েছে নিম্নবর্গকে তথা বাকি সমাজকে প্রভাবিত করতে। আর, অনিল সান্যালের দাদার মতো শিক্ষিত-হিন্দু-ভদ্রলোক-বাবুরা তাদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি অবস্থান দিয়ে প্রভাবিত করে ভদ্রলোক হিন্দুদের। তাদের ভাষা, তাদের রাজনৈতিক চেতনা এবং ধর্মীয় আভিজাত্য একে অপরের পরিপূরক। দিল্লি রেডিওতে ইংরেজি স্ক্রিপ্ট লেখা, ‘মহাপণ্ডিত’ এমন বাঙালিকেই তো দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর স্বপ্নের ‘নেশন’ তথা সন্তানরাজ্যের চালিকাশক্তি হিসেবে এদেরকেই আশা করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার ‘নবজাগরিত হিন্দু’ ইলিয়াসের আখ্যানের ভাষায় এসে প্রতিষ্ঠা পেল-

দাদা লিখেছে, “তোমরা হিন্দু বাঙালি কি আত্মঘাতী হইতে চাও? নিম্নবর্ণের ধর্মাস্তরিত অমার্জিত কুলাঙ্গারদিগের সহিত এক রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া বাস করিবার কুমতি বর্জন কর... তোমরা কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে অর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়া চাষাদের সঙ্গে থাকতে চাও?” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-বাঙালি সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ। চিঠিতে বঙ্কিমি-ভাষার ব্যবহার ও চেতনাতে সন্তানদলের উগ্রহিন্দুত্ব মানসিকতা- যা নিয়ন্ত্রণ করেছে দেশভাগ ও ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্বের রাজনীতিকে। এই দাদার আরোপিত প্রতর্কেই ‘হেজিমনাইজড’ হয় অনিল সান্যাল।

অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ভাষণ দিয়ে এসেও তাই ‘বংশের গৌরব’ দাদার পরামর্শ অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না।

আর, খেয়াল করে দেখা যাক ভাষার ব্যবহার, যা ইতিহাস ও লোকায়তের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। অনিল সান্যালের ইংরেজি-শিক্ষিত দাদা ‘নিম্নবর্ণ’, ‘অমার্জিত’ ও ‘কুলাঙ্গার’- এই তিনটে শব্দই অবলীলায় ব্যবহার করে মুসলমানদের সম্পর্কে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সম্পর্কে। অনিল সান্যাল, সতীশ মুক্তাররা উনিশ শতকের বাংলায় নির্মিত ‘শিক্ষিত’, ‘মার্জিত’ শীলিত পাঠকবর্ণের উত্তরাধিকার বহন করছে। এরাই বিংশ শতকে সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির মাপকাঠি ঠিক ক’রে দিতে চেয়েছে এবং শাসকের মনোমতো বিশিষ্ট ভদ্রলোক উচ্চবর্ণকে প্রজন্মান্তরে বহমান রেখেছে।¹⁵ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসপাঠের বিপ্রতীপে ‘খোয়াবনামা’র এই যে স্পর্ধিত প্রতিপাঠ, তার আরেক উৎস রয়ে যায় ইলিয়াসের উপন্যাস-চেতনার মধ্যেও। ইতিহাসের গর্ভ থেকে তুলে আনা সাহিত্যের বিচারে এই চেতনাও উল্লেখের দাবি রাখে। পূর্বসূরীদের উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইলিয়াস স্বীকার করেন বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য কিন্তু একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিবিধ অবস্থান ও ব্যর্থতার কারণও খোঁজেন,

‘সাম্য’ অথবা বঙ্গদর্শন-এর কোনো কোনো সম্পাদকীয়তে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে গভীর মনোযোগ ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয় তাতে তাঁকে আধুনিক বুর্জোয়া মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসে তাঁর এই পরিচয় অনুপস্থিত। উপন্যাসে তিনি প্রধানত কাহিনিকার। রাষ্ট্রীয় সংঘাত দেখাতে চলে যান কমপক্ষে একশো বছর পেছনে এবং সেই সময়কার সমাজবাস্তবতাও সেখানে নেই বললেই চলে। (ইলিয়াস ১৯৯৭, ৪১)

স্পষ্টতই ইলিয়াস নির্দেশ করছেন ১৮৮২ সালে প্রকাশিত ‘আনন্দমঠ’-র সমাজবাস্তবতার দিকে, লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে যে আধুনিক বুর্জোয়া মানুষ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, উপন্যাসে সেই ইঙ্গিত দিতে ব্যর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-এ যে রাষ্ট্রীয় সংঘাতের কথা

আসছে এবং যে সাহিত্যবিন্দুতে ‘আনন্দমঠ’-র মতো উপন্যাস ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠছে, তার জরুরি সমালোচনাই ইলিয়াসের লেখায় ‘উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা’ প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিবর্তনের থেকে মুখ ফিরিয়ে রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরেন বলেই তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশ বাধা পেয়েছে¹⁶ বলে ইলিয়াসের অভিমত। নিজের মতামত চরিত্রদের ওপর চাপিয়ে ‘ভাল-মন্দ’-র সুস্পষ্ট বাইনারি তৈরি করেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো সেই রক্ষণশীলতার ফর্মুলা মেনেই এগোয়। কিন্তু, ‘একটি সম্প্রদায়ের অসহায় মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া দেখে তিনি নির্লজ্জের মতো হাসেন’- এই অভিযোগের পরেও ইলিয়াস বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটা শব্দ এড়িয়ে যান, তা হচ্ছে- মতাদর্শ। প্রত্যেক লেখক বা শিল্পীই কোনও না কোনও মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হন- স্থিতিবস্থা ও রক্ষণশীলতার পক্ষে অথবা আন্দোলন ও প্রগতিশীলতার পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র ও ইলিয়াস এই দুই বিপরীত ও সংঘর্ষকামী মতাদর্শের ধারক বলেই সাহিত্য দিয়ে ইতিহাসের কখন আবিষ্কারে তাঁদের এই ভিন্নতা। আর, বঙ্কিমচন্দ্র যে মতাদর্শ থেকে নারী চরিত্র লিখেছেন ও তাঁর পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ইলিয়াস ঠিক তার মুখোমুখি নির্মাণ করেন কুলসুম বা ফুলজানের মতো চরিত্র কিংবা জুম্মনের মায়ের মতো চরিত্র। প্রফুল্ল/দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে বা রোহিণী সম্পর্কে ইলিয়াসের যে উপলব্ধি¹⁷, সেই ক্রোধী চেতনাই তাঁকে কুলসুম, জুম্মনের মায়ের নির্মাণে প্রেরণা জোগায়। এই আলোচনাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্বের ও বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে যে উপন্যাসগুলো প্রভাববিস্তারী ছিল, সেই উপন্যাসগুলো ও উপন্যাসনির্মাণের উপাদানগুলোর প্রতিগ্রহণ হচ্ছে ‘পাঠক’ ইলিয়াসের চেতনায়। ইলিয়াস যখন ‘লেখক’ হিসাবে তাঁর সত্তাকে বদলে নিচ্ছেন তখন সেই পাঠকের প্রতিগ্রহণের চেতনাও তাঁর লেখায় ছাপ ফেলছে। হান্স রবার্ট ইয়াউস পাঠকের প্রতিগ্রহণ তত্ত্ব (reception theory)-র অবতারণা করেছিলেন ১৯৬০ দশকের শেষে।

The reconstruction of the horizon of expectations, on the basis of which a work in the past was created and received, enables us to find the questions to which the text originally answered and thereby to discover how the reader of that day viewed and understood the work. This approach corrects the usually unrecognized values of a classical concept of art or of an interpretation that seeks to modernize... it brings out the hermeneutic difference between past and present ways of understanding a work, points up the history of its reception- providing both approaches... the method of the history of reception is essential for the understanding of literary works which lie in the distant past. (Jauss 1970, 18-19)

অতীত ও বর্তমানের বোঝাপড়ার ওপরে নির্ভর করেই ভবিষ্যতের সাহিত্যের উপাদান নির্মিত হচ্ছে। পাঠকের প্রতিগ্রহণের ঝোঁকে ইলিয়াস যদি একজন পাঠক হিসেবে ‘আনন্দমঠ’ তথা বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী উপন্যাস নির্মাণের ফাঁকফোকরগুলো সম্বন্ধে অবহিত না হন, যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত শব্দাবলী ও নির্দেশাত্মক বাক্যাবলীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যকভাবে ঋদ্ধ না হন, তাহলে ‘খোয়াবনামা’-র মতো পাল্টা-প্রস্তাবনা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের (ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) প্রতিগ্রহণ বঙ্কিমচন্দ্রেও হচ্ছে, ইলিয়াসেও হচ্ছে, এই সময়ের পাঠকমননেও হচ্ছে; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিগ্রহণ ইলিয়াসে হচ্ছে, বর্তমান সময়ের পাঠকসমাজেও হচ্ছে; আবার, ইলিয়াসের প্রতিগ্রহণ হচ্ছে এই সময়ের পাঠকদের মধ্যে- প্রতিগ্রহণের পরস্পরাটুকু অনুধাবন করা প্রয়োজন ইতিহাস ও সাহিত্যের মিলিত প্রতিগ্রহণের পথগুলো খুঁজে।

খোয়াবনামাঃ সুফী ও বেদান্ত দর্শন এবং নিম্নবর্গের প্রতিস্পর্শী স্বর

কেষ্ট পাল, যুধিষ্ঠির কামার ‘আনন্দমঠ’ নয়, প্রতিগ্রহণ করে ‘ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’কে। তাঁদের কাছে ‘আনন্দমঠ’-র গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব রয়েছে প্রজন্মান্তরে বয়ে আসা লোকমুখফেরতা আখ্যানের। বাবুদের ঠাট্টার পাত্র হয়েও, অন্ধবিশ্বাসের খোঁটা শুনেও অটল থাকে তারা মিথে, কিংবদন্তীতে,

‘এই দুইজন যুদ্ধ করিছে কোম্পানির গোরা সেপাইয়ের সাথে। আর পাকুড়গাছের মুনসি শুনিছি আছিলো মজনুর সাথে। আবার বৈকুণ্ঠ কয়, না, ঐ মুনসি হলো ভবানী সন্ন্যাসীর সেনাপতি। মরার পরে মুনসি ঠাঁই লেয় পাকুড়গাছে। কয় বছর পর পর আষাঢ় মাসের অমাবস্যার রাতে বিলের মধ্যে যে ক্যাংরা ভাঙ্গা ওঠে সেটাত বলি দেওয়ার পাঁঠাও পাঁঠায়া দেয় ঐ মুনসি। বিলের গজার মাছ সেদিন পাঁঠার আকার পায়।’ (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৫)

তাঁদের কথনে চলে আসে বহুস্তরীয় মিথ্। বোঝা যায় যে, লোকমুখে প্রায় দু’শতক ধরে আখ্যান বদলে বদলে গেছে। ব্রিটিশদের ও বাবুদের লিখে রাখা ইতিহাসের বিরুদ্ধবয়ানে উঠে আসে কেষ্ট পাল, দশরথদের বয়ান। অথর্ ইলিয়াস নিম্নবর্গের মানুষদের ইতিহাসবোধ সংলাপে আনার আগে লেখেন, “ইংরেজি খবরের কাগজ হাতে বাবুর ঠাট্টা না বুঝে কিংবা গায়ে না মেখে কেষ্ট পাল বলে...” (ইলিয়াস, ২৩৫)। মুনসি ও মজনু শাহের সঙ্গে ভবানী পাঠক, পোড়াদহের মেলা ব্রিটিশরাজত্বের শেষ পর্যায়ে এবং ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি কেন এত গুরুত্ব পাচ্ছে ইলিয়াসের লেখায়? কোন অতীত থেকে এই সেতু বাঁধা হচ্ছে, তা খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে বাংলায় ইসলামিক ঐতিহ্যের বিস্তারের দিকে।

দ্বাদশ শতকের শেষে বখতিয়ার খিলজির লক্ষণ সেনকে হারিয়ে নদীয়া দখলের মধ্যে দিয়ে বাংলায় ইসলামিক রাজত্বের সূচনা। বঙ্গদেশে সুফী মতাদর্শের আগমন প্রায় একই সময়ে। উত্তর ভারত থেকে বঙ্গদেশে আসা সুফী মতবাদের সঙ্গে দেশীয় ধর্মীয় ভাবধারাগুলির মিশ্রণ ঘটে

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর লেখায় এই যোগসূত্রের উল্লেখ করছেন। তাঁর মতে, বাংলার মুসলমান কবিদের রচনায় বাংলার ভক্তধর্ম ও যোগধর্মের প্রভাব পড়ছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর সমান্তরাল প্রেমকাব্যের চর্চা চলছে প্রেমপন্থী সুফীদের হাত ধরে।¹⁸ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ও অবশিষ্ট বৌদ্ধ ধর্মের যৌগিক-কায়-সাধন তত্ত্বের সঙ্গে ভারতের তথা বাংলার সুফীবাদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সুফীমতের ইসলাম বাংলার মূল সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছিল এবং বাংলার চিরাচরিত যোগমার্গ ও আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে সুফি ইসলামের সহজ ‘আপস’ হয়েছিল।¹⁹ বাংলাদেশে সুফী মতের প্রভাববিস্তার ও ইসলামিক শাসনকালে লোকাযত দর্শন, নাথপন্থা, সহজিয়া যোগসাধনার একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠার বিষয়ে সাহিত্য ও মিথ-কিংবদন্তীর ওপরেই ভরসা রাখতে হয়। আর, এই ইতিহাসের সন্ধানে বোঝা যায় যে, উচ্চবর্গের শাসক ও উচ্চবিত্তের শ্রেণিক্ষমতার সমান্তরালে বা আড়ালে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে এক সমন্বয়সেতু গড়ে উঠেছিল। সহজ ধর্মাচরণ, জীবনযাপনের সরলতা এবং লোকাযত ধর্মান্তর্গতের জটিলতাহীন ব্যাখ্যায় বিশ্বাস- এই তিনের মিশ্রণে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে সুফী ও বাউলদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গীয় সমাজে। এনামুল হক তাঁর ‘বঙ্গে সুফী প্রভাব’ গ্রন্থে বঙ্গদেশে প্রধানতঃ সাতটি তরিকার প্রভাব উল্লেখ করছেন- সুহরবরদীয়র সম্প্রদায়, চিশতীয়হ সম্প্রদায়, কলন্দরীয়হ সম্প্রদায় এবং মাদারীয়হ সম্প্রদায়, অদহমীয়হ সম্প্রদায়, নকস্বন্দীয়হ সম্প্রদায় এবং ক্বাদরীয়হ সম্প্রদায়। বখতিয়ার খলজি বঙ্গদেশ আক্রমণের আগেই সুহরবরদীয়র সুফীদের আগমন ঘটে বঙ্গদেশে। জলালুদ্দীন তবরীযী এই তরিকার সুফি সাধক, যিনি খলজির আগেই বরেন্দ্রভূমে আসেন এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও ধর্মপ্রচার চালাতে থাকেন²⁰। মখদুম জঁহানিয়া জঁহা গশত্ বুখারী চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে জনপ্রিয়তা লাভ করেন বরেন্দ্রভূমিতে।

রিচার্ড এম. ঙ্টন তাঁর ‘The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760’ গ্রন্থে বঙ্গে সুফী প্রভাবের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি ক্ষেত্রের কথা বলেছেন, যথা,

রাজনৈতিক ক্ষেত্র, কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্র এবং ধর্মীয় ক্ষেত্র যেখানে লোকায়ত ও বৌদ্ধিক ধর্মভাবনার সঙ্গে সুফী ধর্মমতের মেলবন্ধন ঘটছে। ‘The Question of Sufis and Frontier Warfare’-এ ঙ্টন বলছেন মধ্য এশিয়া থেকে আসা পরিয়ায়ী তুর্কিভাষীদের কথা যাঁরা সামরিক দাস হিসেবে, অভিযাত্রী হিসেবে বা শরণার্থী হিসেবে পালিয়ে এসেছিলেন। বাগদাদ, কাউরো, সমরখন্দেই শুধু না, বাংলার কিছু প্রান্তেও। তাঁদের দলে বিভিন্ন বীরগাথার নায়করা এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পবিত্র মানুষদের মেলবন্ধন থাকত। এই সাধকরাই অজ্ঞেয় দৈবী জগতের সঙ্গে যোগস্থাপন করিয়ে দিতেন। কাঠামোগত অনুশাসন মেনে মুরিদকে (শিষ্য) ইসলামীয় রহস্যভূত জ্ঞান প্রদানের ধারা বহমান রাখতেন মুর্শিদ। এই দৈবীশক্তিসম্পন্ন অগ্রপুরুষরা বাংলায় তুর্কিসংস্কৃতির হোতা ছিলেন।²¹ ঙ্টনের লেখায় স্পষ্টতঃ যে বিষয় উঠে আসছে যে, বাংলায় সেন বংশের রাজত্বকালের শেষ দিকে তুর্কি আক্রমণের সময়, উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণের সমুদ্রাঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া অবধি বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল তারা। মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতা-কাঠামো নির্ধারিত কৃষি-অর্থনীতিকে অধিকার করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন এসেছিল ত্রয়োদশ শতক থেকে। এই পরিবর্তনের ইতিহাস, প্রধানতঃ মিথ-কিংবদন্তীর সমাহারে ঢাকা ইতিহাস বাদ দিলে ‘খোয়াবনামা’-র ইতিহাস-সন্ধান কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসবোধে হিন্দুপুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষা ধরতে পারা যাবে না। ঙ্গিস্তা চন্দ তাঁর ‘The Journey of Namah’ বইতে ভক্তিপন্থা ও বেদান্তের সঙ্গে সুফির ঐক্য প্রসঙ্গে লিখছেন,

To add to this was Vaishnava sadhana of two varieties: the nirgun and the sagun. Muwahid or believers in a single god, Muslims found similarities between the nirgun sadhana of the wandering singers, the bauls; the social equality envisaged in Islam found perhaps some form of echo in the simple, non-hierarchical austere sadhana of the Sahaja

path. The local existing religions and the beliefs and practices of Islam at the very basic level became so closely intertwined that the future division of the land along religious lines seemed almost surreal. (Chanda 2011, 29)

এনামূল হক বঙ্গদেশে মূলতঃ সাতটি ভিন্ন তরিকা বা সম্প্রদায়ের সুফি প্রভাবের উল্লেখ করলেও, আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই মাদারীয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব ও বিস্তারের মধ্যে। রতনলাল চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে বদিউদ্দীন শাহ-ই-মাদার -এর উল্লেখ করেছেন। এনামূল হক তাঁর গ্রন্থে শাহ্ আল্লাহ নামে এক সুফী ফকিরের উল্লেখ করেছেন, যিনি সম্ভবতঃ শাহ-ই-মাদারের শিষ্য ছিলেন এবং গৌড় অঞ্চলে বাস করতেন। ‘শূন্যপুরাণ’-এর প্রক্ষিপ্ত অংশে ষোড়শ শতকে লেখা ত্রিপদী কবিতায় মাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ‘ধিকর’-এর উল্লেখ পাওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।²² রতনলাল চক্রবর্তীর প্রবন্ধে সপ্তদশ শতকের শাহ্ সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানার উল্লেখ মেলে, যিনি ১৬৫৮ সালে বাংলার মুঘল শাসক শা-সুজার থেকে জমির সনদ পেয়েছিলেন।²³

‘খোয়াবনামা’-র ভাষাকাঠামো ও ইতিহাসবোধে মিশে থাকে শোলোক ও কীর্তনের সুর। তমিজের বাপ খোয়াবে শুনতে পায় চেরাগ আলির স্বর আর চেরাগ আলি খোয়াবে পেত ফকিরি শোলোক, মজনু শাহের যুদ্ধাবয়ব। ভবানী পাঠকের নামবন্দনা শোনা যায় বৈকুণ্ঠ গিরি, কেষ্ট পালেদের মুখে, বৈকুণ্ঠ কীর্তনের সুরে ভবানী পাঠক আর পাঠান সেনাপতির বীরত্ব ও ট্রাজেডি শোনায়। এক ভাষা প্রভাবিত করে আপনার ভাষাকে, এক প্রকরণে মিশে যায় অন্য প্রকরণ। আর, এরও মূল সুপ্ত রয়েছে যায় বাংলার সংস্কৃতিতে সুফী প্রভাবের ভেতর। এনামূল হকের বিশ্লেষণে,

চীশতীয়হ্ ও সুহরবরদীয়হ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণের মধ্যে অবিকল কীর্তনের অনুরূপ প্রেম-প্রকাশের ধারা প্রচলিত ছিল- তাহার নাম সমা বা ‘গানের বৈঠক’। কোন বিশেষ

বিশেষ দিবসে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ একস্থানে একত্র হইতেন, এবং গান-বাজনার সাহায্যে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া ভগবৎ-প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন বা নাচিতে থাকিতেন। বঙ্গীয় সুহ্রবরদীয়হ্ ও চীশতীয়হ্ সম্প্রদায়ের ‘সমা’-এর প্রভাবে কীর্তনের সৃষ্টি বলিয়াই আমাদের ধারণা। কেননা কীর্তনও ‘সমা’-র উদ্দেশ্য এক ভাবাবেশ উভয়েরই বৈশিষ্ট্য, গান-বাজনা উভয়ের মধ্যেই আছে, নর্তন, কুর্দন, চীৎকার ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি উভয়ের মধ্যেই সাধারণ; কীর্তনের ন্যায় ‘সমা’-ও ঘরে-বাহিরে সম্পাদিত হয়। (হক ২০১৫, ১১৪)

কীর্তনের মধ্যে সংস্কৃত-প্রভাব এবং আর্থমানসিকতা রয়েছে। বৈকুণ্ঠ গিরির কীর্তনের ভাষা তার প্রমাণ, ভাষা-সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করব। চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রচলিত কীর্তন বঙ্গদেশে এক নতুন ভাবোন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল, তা স্বতন্ত্রও বটে। আর, চৈতন্যদেবই ষোড়শ শতকের বাংলায় এবং পূর্ব ভারতে সেই মর্মবাদী ও আধ্যাত্মিক সাধক, যিনি একাধিক ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত-বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ বেশ কিছুটা ঘোচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সুফী দর্শনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষণীয়। ভারতে তথা বঙ্গদেশে সুফী দর্শন ও সংস্কৃতি প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন প্রভাবিত করেছে তৎকালীন দেশীয় দর্শনগুলোকে, তেমনই অভিযোজিতও হয়েছে তাদের দ্বারা। বৈদান্তিক দর্শন যা শঙ্করাচার্য-নিম্বাকের দর্শনপথ ধরে নতুনভাবে ভারতীয় সমাজে পুনর্গৃহীত হয়, তার সঙ্গে সুফীমতের মিল ও অমিল নিয়ে রমা চৌধুরী ‘বেদান্ত ও সুফী দর্শন (১৯৪৪)’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ‘সুফী মরমিয়াবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ’ অধ্যায়ে লিখছেন- অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতো রুমী বা অন্য সুফীরাও মনে করেন যে, পার্থিব বস্তুজাত উপলব্ধি করা যায় কিন্তু একেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি হয় না। কারণ কালাতীত, দেশাতীত, অসীম ঈশ্বরকে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান (যে জ্ঞান আপেক্ষিক এবং তুলনা ও প্রভেদমূলক) দ্বারা পাওয়া অসম্ভব- রামানুজ তথা অন্যান্য বৈদান্তিকদের মতেও ব্রহ্মজ্ঞানে বিচারবুদ্ধি প্রারম্ভিকভাবে প্রয়োজন কিন্তু শুধুমাত্র সেটার দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব না।^{২৪} যদিও, এই মিলগুলো ভারতে তথা বাংলায়

বৈদান্তিক দর্শন ও সুফী দর্শনের মিলনের পথ সুগম করলেও, পার্থক্যও কিছু ছিল। ‘সমা’ ও ‘কীর্তন’ প্রসঙ্গে এনামুল হকের বক্তব্যে এই দু’য়ের মধ্যে প্রভূত মিল থাকলেও, রমা চৌধুরীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী শঙ্করাচার্যের বেদান্তদর্শন ও সুফীগণের আবেগপ্রবণ ভাবোন্মদনার মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

শঙ্করের মতবাদে ভাবাবেগের লেশমাত্র নাই। ভক্তি, প্রেম, বিরহজনিত ক্লেশ, মিলনজনিত উচ্ছ্বাস, আবেশ, উন্মাদনা, বিহ্বলতা প্রভৃতি সুফী একতত্ত্ববাদের মূল কথা; কিন্তু শঙ্করের মতবাদে ইহাদের স্থান, পারমার্থিক স্তরে তো দূরের কথা, ব্যবহারিক স্তরে পর্যন্ত নাই।

(চৌধুরী ১৯৪৪, ১৫২)

মিল ও অমিল নিয়েই সুফী দর্শনের সঙ্গে বেদান্ত ও লোকায়তের যে পারস্পরিক সম্পর্ক; একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা অন্যদিকে ইসলামের বিভিন্ন গোঁড়ামির বিরোধিতা-বাংলায় সুফী মতাদর্শের সঙ্গেই বাউল ও কীর্তন জুড়ে থাকে। রমা চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে সুফী সাধনার সাতটি সোপানের উল্লেখ করছেন, যার মধ্যে অন্যতম অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সাত হাজার যবনিকার আবরণ রয়েছে এবং ওই সাতটি সোপানের দ্বারা সেই যবনিকা সরে যায়। এই সাতটি সোপানের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে রমা চৌধুরী বলছেন যে,

অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান (১) (মারিফৎ) ইন্দ্রিয়জ অথবা বিচার-বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞান (ইলম) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, হৃদয়-প্রসূত। ইহা ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁরই দ্বারা আলোকিত ও উদ্বুদ্ধ হৃদয়জ ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিশেষ। (চৌধুরী ১২৩)

তমিজের বাপ যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ক’রে পাকুড়গাছে মুনসির অধিষ্ঠান, তাঁর খোয়াবে মুনসির ‘আদেশ’ পায়, আধোগুম-আধোজাগরণে মুনসির বার্তা মাথার ভেতরে নিয়ে বাস্তব বিচারবুদ্ধি ও

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তা কি এই সুফী সোপানের ইঙ্গিত দেয়? ইসলামিক বিশ্বাস অনুযায়ী নবী মহম্মদ দৈবযোগে স্বপ্নের মধ্যেই আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছিলেন। খোয়াব আর ‘অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক’ ছিল অপার্থিবের সঙ্গে পার্থিবের সেতুবন্ধন। আর, তমিজের বাপের কাছে মুনসি ‘আল্লাহ’-র থেকে কোনও অংশে কম নয়; মুনসির প্রতি ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সমর্পণ, প্রেম-সবই আছে তমিজের বাপের। ঈঙ্গিতা চন্দ তাঁর ‘The Journey of the Namah: A Case Study’-তে এই অতীন্দ্রিয় স্বপ্নবোধ ও সুফীধারণার যোগের প্রসঙ্গে আল বুখারির ধারণা উল্লেখ করছেন। সুফী ভাষ্যকাররা মুকাশফাৎ বা উন্মোচনের কথা বলেন- অর্থাৎ কশফ (পর্দা) দ্বারা প্রকৃতবাস্তব ও মানবাত্মার মধ্যে আড়াল থাকে। আত্মিক অবস্থার তিনটি স্তর তথা প্রকৃত উন্মোচন, কাল্পনিক উন্মোচন এবং অসত্যের ওপরে নির্ভর করে এই উন্মোচনসম্ভাবনা।²⁵ ইলিয়াস সুফিদের ইতিহাস ও তাঁদের নিয়ে প্রচলিত আখ্যানের বিবর্তনকে ধরে রাখতে চান তাঁর দেখা ইতিহাসের আয়নায়। ফকির চেরাগ আলি, তমিজের বাপের দাদাশ্বশুর কুলসুমের ঠাকুর্দা, তাঁর নাম কিন্তু ইতিহাসেও থাকে। দ্রোহী ফকির মজনু শাহের শিষ্য ছিলেন, মজনু শাহের শাহদাতের পরেও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অংশে যিনি ব্রহ্ম রেখেছিলেন ব্রিটিশ-জমিদার শ্রেণিজোটকে।²⁶

মজনু শাহের উত্তরাধিকারীগণে ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবাহান শাহ, মাদার বক্স, জরি শাহ, করিম শাহ প্রমুখ যারা অনেকেই ছিলেন মজনু শাহের আত্মীয়। ফকীর-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পুরোধা মজনু শাহ লোকান্তরিত হবার পরও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ পুরো আঠারো শতক পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তবে ক্রমশ এই আন্দোলনের গতি হয়ে পড়ে স্তিমিত। (চক্রবর্তী ২০১৬, ৫৬)

চেরাগ আলির কথা মনে রাখে, তাকে সবথেকে বেশি খোঁজে নাতনি কুলসুম। ফকির চেরাগ আলির ঝোলায় থাকা ‘খোয়াবনামা’ নামক ‘ছেঁড়াখোঁড়া, চৌকো চৌকো দাগ আর হাবিজাবি লেখায় ভরা’ বইটাই এই উপন্যাসের অক্ষ। আর, কুলসুম সেই ফকিরের স্বপ্নব্যাখ্যা এবং মাধুকরী জীবনের দাওয়াত-পাওয়া দেখতে দেখতে বড় হয়। চেরাগ আলিই কি সেই সুফী নয়?

যে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছে, যে খোয়াবে অলৌকিক আর লৌকিকের সেতু বাঁধে এবং গোটা উপন্যাসেই অজ্ঞেয় থেকে যায়, অদৃশ্য থেকে যায়- যার শোলোক শোনে তমিজের বাপ, কুলসুম-দৈববাণীর মতোই।

দাদার জেবন কাটলো খুব মন দিয়ে মানুষের কথা শুনে আর মানুষের সাথে কথা কয়ে আর দোতারা বাজিয়ে গান করে। কিসের কথা কওয়া আর কিসের গান করা? ভিক্ষা করা ছাড়া এসব কী... কিন্তু তার দাদা চেরাগ আলি ফকির কি কাউকে পরোয়া করার মানুষ। তার কথা সরাসরি বাড়ির গিন্নির সাথে, হাফিজ দারোগার মাকে লক্ষ করে সে বলে, ‘মা। হামার সাথে হামার লাতনি আছে গ। হামারা মাদারি ফকির, মানষের বাড়িত একলা জেয়াফত কবুল করা হামাগোরে মানা আছে মা। একলা খাই তো হামাগোরে দোয়া কবুল হয় না।’ (ইলিয়াস ১৯৯৭, ২৬)

চেরাগ আলিকে ইলিয়াস পাঠকের সঙ্গে পরিচিত করান উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কুলসুমের ভাবনায়। তৃতীয় অধ্যায়ে মাদারিয়া তরিকার ফকির চেরাগ আলির পরিচিতি ও বিস্তৃত বিবরণ, তাও বেশিরভাগই কুলসুমের স্বগতকথনে কিংবা তমিজের বাপের খোয়াবের কথনে। কুলসুমের স্মৃতিতে চেরাগ আলির যেটুকু কখন পাঠকের কাছে এসে পৌঁছায়, তাতে স্পষ্ট হয় ফকির-সন্ন্যাসীদের ইতিহাস এবং চেরাগ আলির উত্তরাধিকার^{২৭}। মাদারিপাড়া, গিরিরডাঙ্গা বা মাঝিপাড়ায় একদা-কালো-অধুনা-রংচটা আলখাল্লা পরে চেরাগ আলি তার কাছে ছুটে আসা বালা-মুসিবতের মধ্যে পড়া মানুষদের খোয়াবের তাবির জানাত। সুফী ফকিরদের মতোই অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের সঙ্গে অব্যাক্ষাত যোগাযোগ-স্থাপনের মধ্যে দিয়ে চেরাগ আলি সুফী ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে যান (যদিও, ইতিহাসের চেরাগ আলি শাহ্ এবং কুলসুমের দাদু চেরাগ আলির মধ্যে কালগত হিসেবের ফারাক বিস্তর)। আর, এর আরও একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যখন চেরাগ আলির সঙ্গে গোঁড়া ইসলামীয় ধর্মবিশ্বাসীদের সংঘাত বাঁধে, সুফী তরিকার সঙ্গে

গোঁড়া ইসলামের যে সংঘাত বহু শতকের পুরনো। সংঘাতের ইতিহাসও এক যোগসূত্র হয়ে ওঠে চেরাগ আলির বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে উপন্যাসের কালস্থানিকতার।

এরপর এক নাগাড়ে মেলা দিন তার কাটে দরগাতলায় দরগাশরিফে। সেখানে নতুন খাদেম জুটেছিলো তখন কয়েকজন, তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং দরগাকে পরিণত করেছে মসজিদে। তারা মিলাদ পর্যন্ত করতে দেবে না। মাদারি তরিকার ফকির চেরাগ আলি, এসব শরিয়তি বিধিনিষেধের মধ্যে তার আর থাকে কী... তা নামাজ বন্দেগি করে পাকা বারান্দায় ঠাঁই পাওয়া গেলে চেরাগ আলি কি তাই করলে ভাল করত না... চেরাগ আলি অবশ্য বড়ো গলা করে বলতো, ‘শালা ভিন্ন তরিকার মানুষ রে, শালা হামাগোরে দরগা দখল করিছে। হামার পাও ধরিলেও হামি এটি থাকিছি না। হামরা আজকার ফকির লয়, মাদারি ফকির হামরা, বেড়াকুড়া না খালে দাদা পরদাদারা শাপমন্যি দিবি।’ (ইলিয়াস ৩২)

এই যে বেড়াকুড়া খাওয়া এবং প্রবল দীনতার মধ্যে দিনযাপন, নিজের অধিকারে জাগতিক কিছুই না রাখা, সুফী সাধনার অন্যতম সোপান এটি। রমা চৌধুরী লিখছেন যে, বৈরাগ্য অর্থে সংসার ত্যাগ নয় বরং বাসনা পরিত্যাগ করা এবং ঈশ্বরানুরাগী হওয়া মানে মানুষের প্রতি বিরাগ না বরং পার্থিব সুখে বিরাগ। সুফিসাধনার অন্যতম এই স্তমভে বিশ্বাস করেই সুফিরা স্বেচ্ছাদারিদ্র্য বরণ করতেন; ভোগের সকল ইচ্ছেকে সমূলে উৎপাটনের জন্য।²⁸ রমা চৌধুরী লিখছেন যে,

কোনো কোনো সুফী সম্প্রদায় “নিন্দামার্গ” (মালামাৎ) নামক মার্গবিশেষও অনুসরণ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা দেশাচার ও সামাজিক নিয়মাদি ভঙ্গ করিয়া স্বেচ্ছায় লোকনিন্দা, রাজদণ্ড, পরিহাস, ঘৃণা প্রভৃতি সাদরে বরণ করিতেন। (চৌধুরী ১২১)

চেরাগ আলির সঙ্গে স্থানীয় মসজিদের তালেবরদের বিরোধ এই ইঙ্গিতকেই মান্যতা দেয়। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ফকির ও সুফীদের সঙ্গে বাউল ও অনুরূপ লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মিল খুঁজে পাচ্ছেন মূলধারা এবং গোঁড়ামির সঙ্গে বিরোধের মধ্যে।

বাউল ও অন্যান্য অনুরূপ উপদলের মতো, ঐচ্ছামিক মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফকির সম্প্রদায়ও মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুফি চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শরিয়তকে খোলাখুলি ‘চ্যালেঞ্জ’ করেন এঁদের গানে ও দৈনিক জীবনযাপন ধারায়। হিন্দু ও মুসলমান- উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মৌলবাদী হর্তা-কর্তার (ও রাজনৈতিক নেতা) এঁদের একঘরে করে রেখেছে, জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে ও নানারকম অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ৩৫৯-৬১)

ইতিহাস থেকে বর্তমান উচ্চবর্গের এই অত্যাচার বহমান। চেরাগ আলি ফকির কিংবা তমিজের বাপের লাঞ্ছনা এই ইঙ্গিতই তো বহন করে। ইলিয়াস যে সময়ে চেরাগ আলিকে নির্মাণ করছেন, সুফী মতাদর্শের পুনঃকথন বিবৃত করছেন, সেই সময় ইতিহাসের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আসছে। একই কারণে বৈকুণ্ঠ গিরির ওই কীর্তনের উত্তরাধিকার থাকে না, সে নিজেও বিপন্ন হয়। প্রান্তিক সমাজের মিথ, শোলোক, কিংবদন্তী লৌকিকতায়, অতিলৌকিক বিশ্বাসে উচ্চবর্গের ক্ষমতাকাঠামোর সমান্তরালে নিজস্ব বিবর্তনপথ খুঁজে নিয়েছে। ইতিহাসের এই প্রান্তিকতাকে ইলিয়াস ‘নামা’-র আখ্যানে বাঁধছেন। ইলিয়াসের সুফী ধর্মের আশ্রয় ও বিবর্তন অব্যাহত থাকে উপন্যাস জুড়ে। তমিজের বাপ বাঘার মাঝি, শোভন ধুমার বংশধর- যাঁরা একাধারে ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীর চরিত্র। তমিজের বাপের মধ্যেই আবার নিজের উত্তরাধিকার খুঁজে পায় চেরাগ আলি; সবাই হতশ্রদ্ধা করত যে বোকা-সরল মানুষটিকে, তার মধ্যেই অতীন্দ্రిয়ের খোঁজ পায় চেরাগ আলি, এমনকি তার সযত্নরক্ষিত তাবিরনামাটিও চেরাগ আলি গচ্ছিত রাখে তমিজের বাপের কাছেই, তারপর হারিয়ে যায়।

ঘুমন্ত মানুষ কথা বলে মুনসির সাথে, নাহলে জিনপরীর সাথে, মাসুম বাচ্চাদের আলাপ হয় ফেরেশতাদের সাথে। আগুনের জীবদের সাথে তমিজের বাপের কি যোগাযোগ হয় না? দাদা বলতো, ‘মানুষটাকে আবার ঠেকলে কী হয়, জাহের মাঝির বেটা হলে কী হয়, অর মদ্যে বাতেনি এলেম থাকবার পারে রে! মানুষটার মদ্যে আগুন জ্বলে।’... তমিজের বাপ তো যি সি মানুষ লয় বাপু- ঘুমের মধ্যে সে কার ডাকে বাইরে চলে যায়, কতদূর যায়, কোথায় যায়, কেউ জানে না! (ইলিয়াস, ১৭-২১)

তমিজের বাপ দীক্ষিত সুফী সাধক বা ফকির না হলেও, চেরাগ আলি তাকেই খুঁজে নেয়। আর, তমিজের বাপের সম্বন্ধে বিভিন্ন মিথ ও ‘অলৌকিক’ কাহিনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে মাঝিপাড়ার মানুষের মধ্যে। খোয়াবনামা গচ্ছিত রাখা তো বটেই এমনকি সোভন ধূমা বা বাঘাড় মাঝির অবিশ্বাস্য দক্ষতার উত্তরাধিকারও যেন তার উপরেই বর্তায়। মাঝিপাড়ার ‘যৌথখামার’ তথা কাৎলাহার বিলের (শরাফত বিলের একচেটিয়া মালিকানা নেওয়ার আগে) অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ জেলের শিরোপা তারই জোটে। সেখানেও তো মুখফেরতা ইতিহাসেরই বিবর্তন ঘটে। সেই জন্যেই কি ইলিয়াস ‘খোয়াবনামা’ শুরু করেন তমিজের বাপের কাদায় পা গেঁথে ছাই রঙের মেঘ তাড়বার বর্ণনা দিয়ে? ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং ভুলে যাওয়া দ্রোহের ফেরেশতাদের একঝলক দেখার আশায় বা তাদের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে আখ্যানের পাঠকের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার আশায়?

তাকে যদি একনজর দেখা যায়- এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়... গজার মাছের চেহারা নেওয়ার জন্যে মুনসি ভেড়ার পালকে হুকুম করে কীভাবে তাই দেখতে তমিজের বাপের ঘুমে-নেতানো-দুটো-হাত একটু আগে নড়ছিলো আকাশের মেঘ তাড়াতে, তাই এখন চট করে চেপে বসে তার নিজেরই মাথার ওপর। (ইলিয়াস, ৯-১৪)

ইসলামিক দর্শন ও হিন্দু দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় উঠে আসে আরও একটি প্রসঙ্গ- বৈষ্ণব মরমিয়াবাদ ও সুফী মরমিয়াবাদের তুলনা। গানের মধ্যে দিয়ে অন্তরাত্মার উদ্ভাস অর্থাৎ ‘ফনাহ্’ এবং আশিক-মাশুকার চিরাকাজিত মিলন তথা ‘সমা’ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ভাব-সম্মিলনের ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অধ্যাপক এনামুল হক তাঁর ‘বঙ্গে সুফী প্রভাব’ গ্রন্থে এই পরস্পরকে প্রভাবিত করার ইতিহাসে দিকেই ইঙ্গিত করছেন। জগৎ পরমেশ্বরের প্রকাশক্ষেত্র এবং তিনি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বহুরূপে তিনি প্রকাশ পান- এই বিশ্বাসের মূলে সুফিদের প্রভাব বলেই তাঁর অভিমত। তাই ‘তব্ব্বীদ’ প্রসঙ্গ আনছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ‘কৃষ্ণতত্ত্বের’ সঙ্গে সুফীদের ‘তব্ব্বীদ-ই-শহদী’ এবং ‘তব্ব্বীদ-ব্জুদী’র পরমেশ্বরে একান্ত সমর্পণের সাদৃশ্য তুলনা করছেন।²⁹ এনামুল হক এরপরে বৈষ্ণবদের রাধা-তত্ত্ব ও সুফীদের ইশক-তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং এই দুইয়ের সাদৃশ্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। চৈতন্যদেব যে সুফীদের ‘ইশক’-কেই রাধাতত্ত্ব ও প্রেমধর্মে রূপান্তরিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন³⁰- সেকথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সুফি ধারার গায়কের গানে উপনিষদের তত্ত্বের মিল খুঁজে পেয়ে তাকে আত্মীকরণ করেছিলেন।³¹ তাঁর ‘তপোবন’ প্রবন্ধে সুফিভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভারতের অন্তরাত্মার সন্ধানে।³² এই বিষয় প্রভূত বিতর্কের এবং ভিন্ন আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু, সুফী-অনুশীলন এবং বৈদান্তিক-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-লোকায়তের অনুশীলন ইসলামিক শাসনের বাংলায় যে মেলবন্ধনের বিকাশ ঘটিয়েছিল, তা বোঝা যায়। আর, সেই ইতিহাসের পুনর্কথনেই কি বৈকুণ্ঠ গিরির কৃষ্ণনামের কীর্তনে চেরাগ আলির শোলোক ঢুকে পড়ে? কুলসুম তার দাদা চেরাগ আলির পাওনা-শোলোকের কিছু ‘টুকরোটাকরা’ খুঁজে পায় গোলাবাড়ি হাটের বৈকুণ্ঠ গিরির গলায়। আর, সেই বৈকুণ্ঠ গিরি, যে নিজেকে ভবানী সন্ন্যাসীর গিরি-পুরী সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী বলে, মাঝিপাড়ায় চেরাগ আলি ও কুলসুমের থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। এখানেও কি সেই মেলবন্ধনের ইতিহাসের দিকেই ইলিয়াসের ইঙ্গিত নেই?

গোলাবাড়ি হাটের বৈকুণ্ঠ, সে-ই কেবল কয়েকটা গানের পুরোটাই জানে, আর আর শোলোকের কোনোটা আদেক, কোনোটা সিকিভাগ। তারই উস্কানিতে কালাম মাঝি তাদের দাদা নাতনিকে নিজের বাঁশঝাড়ে ছাপরা করে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল... ‘তুমি ফকিরের সব গানই জানো, না? ইগলান মারফতি গান তুমি বোঝো।’- শমশের পরামর্গিকের এই সংশয়ে বৈকুণ্ঠের কিছুমাত্র বিকার নাই। পাঁচটা গান না গেয়ে সে এখান থেকে উঠবে না। (ইলিয়াস, ৩১-৪০)

অথচ, এইসমস্ত ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ইতিহাসের আরেক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে ‘খোয়াবনামা’র কালস্থান। মসজিদের ইমাম তখন শরিয়তী আইন ও সামাজিক লোকাচারের অজুহাতে কুলসুমকে দরগায় থাকতে দেয় না, মাঝিসমাজের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র মাঝিদের সম্মিলিত স্বরের থেকে বদলে যায় কালাম মাঝির আধিপত্যে কিংবা শরাফত মণ্ডলের একচেটিয়া শাসনে এবং বৈকুণ্ঠ গিরি বা কুলসুম যতই কীর্তন ও শোলোকের ঘোরে থাকুক না কেন তাদেরও চেতনায় ছাপ পড়ে হিন্দু-মুসলমান ভিন্নতার। ১৯৪৬-৪৭ সালের দিকে যত এগোনো যায়, এই ভিন্নতা আরও প্রকট হতে থাকে। বৈকুণ্ঠ গিরি, তমিজের বাপ, কুলসুমেরা ‘হিন্দুরা এক জাত, মোসলমান আরেক জাত’ একথা জানলেও সেই জানাবোঝা কখনও হিংসাত্মক হয়ে ওঠেনি। আর, সেটা বোঝাতেই ইলিয়াসকে ইতিহাসের না-লেখা আখ্যান, মাদারি ফকির আর দশনামী সন্ন্যাসীদের ‘প্রায়-এক’ মতাদর্শের আশ্রয় এবং দুই সম্প্রদায়ের ‘কমন’ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কখন টেনে আনতে হয়। ‘খোয়াবনামা’-র রাজনীতির সঙ্গে ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকা এই বিন্দুতেই। আর, সেই রাজনীতিই তাঁর আখ্যানকথন এবং ভাষাকে বিযুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রাজনীতি থেকে। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা দায়বদ্ধতা দেখাননি ইতিহাসের এই চাপা পড়া অধ্যায়গুলোকে খুঁজে দেখার। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’-এর পুনরুত্থানে এতই সন্ধানী ও ব্যস্ত ছিলেন যে হয়তো ভেবে দেখেননি ইসলামিক ঐতিহ্য তথা সুফী প্রভাবকে বাদ দিয়ে (অথবা, শত্রু

বানিয়ে) জাতীয়তাবাদের বাচন তৈরি করলে, তা ‘হিন্দুত্ব’-র গর্বকেই শুধুমাত্র জাগিয়ে তোলে এবং বিপজ্জনক দিকে মোড় নেয়। অথচ ইতিহাসের দিকে এবং দুই ধর্মেরই লৌকিক পরিসরের দিকে তাকালে নিশ্চয়ই তাঁরা খুঁজে পেতেন অ্যামালগামেশন বা সংমিশ্রণের উপাদানগুলো। এনামুল হক যেরকম তাঁর ‘বঙ্গে সুফী দর্শন’ বইতে অনুসন্ধান করছেন। তাঁর মতে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত অমুসলমানি বস্তু তথা ‘শেরেক’ ও ‘বেদায়াৎ’ সংস্কার করার চেষ্টা করেনি বঙ্গীয় মুসলমানেরা। ফলে, এই অমুসলমানি বস্তুগুলি তাঁদের ধর্মচেতনায় একাত্মীভূত হয়ে যায়। প্রতিবেশী হিন্দুদের আচার-রীতিনীতিকে নব-দীক্ষিত মুসলমানরা আপন ক’রে নিয়েছিল এবং ‘পাকা মুসলমান’দের উত্তরপ্রজন্মও বহুক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলিম চিন্তাধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল।³³

এনামুল হক বাংলায় ‘লৌকিক ইসলাম’ উদ্ভবের মূলতঃ তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, যথাক্রমে- ধর্মান্তর গ্রহণ, হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং সুগু-মানসিকতার জাগরণ। শরিয়তী গোঁড়া মুসলিম কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদী গোঁড়া হিন্দুদের আধিপত্যের যুগে দাঁড়িয়ে এই ইতিহাস খানিক অলৌকিকই লাগে। কিন্তু, এই সংমিশ্রণের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ইলিয়াস খুঁজতে চাইছিলেন তাঁর উপন্যাসের কুশীলবদের মধ্যে; ইতিহাসের যুগান্তকারী সন্ধিক্ষেত্রে এই ইতিহাসকে পরাজিত ক’রে জিতে যায় দেশভাগ ও দাঙ্গার ইতিহাস; যেখানে হিন্দু এবং মুসলমান দুই যুযুধান সম্প্রদায়, সংমিশ্রণের প্রায়-সব চিহ্ন মুছে ফেলেছে। বাংলার সংস্কৃতিতে ‘পীর’ এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যদ্রষ্টা এবং ব্যক্তির ওপরে ফলিত আশীর্বাদ-অভিশাপের নিয়ন্ত্রা- তাঁরা “জীবিত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিতে কিংবা আশীর্বাদ করিয়া মৃত ব্যক্তিকে জীবনদান করিতে পারেন। এহেন লৌকিক বিশ্বাসের ফলে ‘পীর-মুরীদী’ বা ‘গুরু-শিষ্য’ প্রথার দূরারোগ্য ব্যাধি কালক্রমে শাস্ত্রীয় ইসলামে প্রবেশলাভ করিয়া ইহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে।” (হক ২০১৫, ১৪৫) ‘খোয়াবনামা’-য় চেরাগ আলি তো একপ্রকার পীরের সম্মানই পান। খোয়াব, মানত, নিয়ত, খতনা, জেয়াফত সবেতেই ফকির-খাওয়ানোর যে রীতি, তাতে নিমন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী চেরাগ

আলির। দরবেশ চেরাগ আলির গ্রহণযোগ্যতা সবখানে। তমিজের বাপের সঙ্গে ফকির আলির পীর-মুরীদী সম্পর্কই কি তৈরি হয়ে যায় না? আর, সেইজন্যেই যোগ্য ‘শিষ্য’কে খোয়াবনামা কিতাবের উত্তরাধিকার সঁপে যেতে দ্বিধাবোধ করে না চেরাগ আলি। এমনকি তমিজের বাপ মুনসিকেও তো গুরুর মতোই মান্য করে। তার আধো ঘুম আধো জাগরণে মুনসির নির্দেশই তো আসে বারবার। মুনসির অভিশাপের ভয়ে ত্রস্ত সে, মুনসিকে খুশি রাখতে সচেষ্ট সে। আর, মুনসিও কখনও গজার মাছের বেশ ধরে, কখনও বা অন্য কোনও বেশ। গাছভরা বক মুনসির হুকুমের গোলাম বলেই বিশ্বাস তমিজের বাপের।

মেঘগুলো কাটলেই না ভেড়াগুলোর পিছে পিছে এসে হাজির হবে মুনসি। তার হাতে মাছের নকশা কাটা লোহার পান্টি... পাটের আঁশের মতো চুলে ঢাকা এই মাথায় ভালো করে নজর পড়লেই মুনসির হাত থেকে তার আর রেহাই নাই গো, রেহাই নাই!

(ইলিয়াস, ১৪)

এই যে মুনসির আদেশের কাঙাল হয়ে থাকা, এই যে মুনসিকে একটিবার দেখতে পাওয়ার অদম্য বাসনা এবং এই যে চেতনাপ্রবাহের মধ্যে মুনসির সঙ্গে অলীক কথোপকথন-খোয়াবনামার আখ্যানে তা প্রবাহিত হতে থাকে। তমিজের বাপকে নির্মাণ ক’রে চলে। ইলিয়াসও এই ‘পীর-মুরীদ’ সম্পর্কের দোলাচল এগিয়ে নিয়ে যান যতক্ষণ অবধি না পাকুড় গাছ উধাও হয়, মুনসির বসত হারিয়ে যায়।

এনামুল হক তাঁর ‘বঙ্গে সুফী’ গ্রন্থের ‘বঙ্গে লৌকিক ইসলামের উদ্ভব’ অংশে নির্দেশ করতে চাইছেন হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতির সংমিশ্রণের দিকে। ইসলামিক শাসনকালে পূর্ব-অস্তিত্বশীল হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ইসলামিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীতে মূলতঃ ধর্মাস্তরণের ফলে ইসলাম ধর্মের ক্রমপ্রসারের কারণে হিন্দু সংস্কৃতির আচার-আচরণের বহু ভিত্তিই অবশেষ (রেসিডুয়াল) হিসেবে থেকে গেছিল। তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বঙ্গের

ইসলামিক সংস্কৃতি। একটি ধর্ম আরেকটিকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি বরং ধর্মের থেকেও বড় হয়ে দৈনন্দিন যাপনে থেকে যাওয়া আচার-সংস্কার-রীতি একে অপরকে প্রভাবিত করেছে³⁴। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান কিংবা বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে এর কাউন্টার-ডিসকোর্সে আসা ইসলামিক জাতীয়তাবাদ এই প্রভাবের সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করেছে। তবু, আখতারুজ্জামানের মতো লেখক এই ‘ভুলিয়ে দেওয়া’র শাসকনির্মিত বয়ান-মতাদর্শের বিরুদ্ধেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের ক্রিয়াশীল রাখছেন। আর, এই যে ‘লৌকিক ইসলাম’-র জন্ম হচ্ছে বাংলার জল-হাওয়ায় মিশে, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দীর্ঘ কয়েক শতকের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই পড়ছে। রিচার্ড ঈটন ১৯৩০ সালে পাবনা ও বগুড়া জেলায় মুসলিম জনবসতি এবং চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মুসলিম জনবসতির (এইলিন ম্যাকফারলেনের সমীক্ষার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করছেন) বিশ্লেষণে গ্রামবাংলার মুসলমানদের জাতিগত উৎসের উল্লেখ করেন। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারই নিম্নবর্গ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সংস্কৃতিতেও সেই ছাপ স্পষ্ট। মাহিষ্য, বাগদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রভূত মিল তাঁদের মুসলমান প্রতিবেশীদের।³⁵ ঈটন আরও উল্লেখ করছেন যে,

urban Bengali Muslims were serologically closer to the distant Pathans of India's Northwest Frontier than they were to rural Bengali Muslims, lending substance to the urban Muslims' claims of their own descent from foreign immigrants to Bengal. (Eaton 1993, 77-78)

‘খোয়াবনামা’ বগুড়া-রাজশাহী অঞ্চলের যে গ্রামগুলোর কথা বলে এবং যে নিম্নবর্গের আখ্যান তুলে ধরে, তাতে প্রয়োজনীয় মনে হয় ইতিহাস-সংস্কৃতির এই অংশটির উল্লেখ। মাঝিপাড়া, কামারপাড়া, চাষীপাড়া এবং গিরিরডাঙ্গা, নিজগিরিরডাঙ্গা ও কাংলাহার বিলের চতুর্দিকে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলোর ইতিহাসে ঈটন কথিত এই প্রভাব স্পষ্ট। ফকির-সন্ন্যাসী

বিদ্রোহের ইতিহাস থেকে দেশভাগ-দাঙ্গার ইতিহাস এই মানুষগুলোকে নিয়েই নির্মিত হয়েছে; অথচ নিম্নবর্ণের এই ইতিহাস ও আখ্যান ‘খোয়াবনামা’-র আগে ধরা থাকেনি কোনও সাহিত্যেই। অষ্টাদশ শতকে জোসেফ ও জুলেখার ইরানীয় প্রেমাখ্যানের যে বঙ্গ সংস্করণ, তাতে রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ণবীয় প্রেমাখ্যানের আদল স্পষ্ট। ইটনের পর্যবেক্ষণে আরও ধরা পড়ে যে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই স্বাভাবিক ও ভেদভাব পেরিয়ে ‘স্বাভাবিক’ সাধারণ সাংস্কৃতিক-রীতিগত পরিসরে অংশ নিতেন। কোনও একজন পবিত্র মানুষ বা পবিত্র নদী বা অলৌকিক থানের আশ্রয় খুঁজতেন নিপীড়িত জীবনের মুক্তিকল্পে। মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে Dusan Zbavitel-এর উক্তি বিশ্লেষণ ক’রে ঈটন লিখছেন,

What Dusan Zbavitel has written of the ballads of pre-modern Mymensingh—that they were —neither products of Hindu or Muslim culture, but of a single Bengali folk culture—may be justly said of pre-modern Bengali folk religion generally. (Eaton, 163-167)

ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসের ইতিহাসচেতনায় এই উপাদানগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করান পাঠককে। গুরুত্ব দেন লোকায়ত সংস্কৃতিকে। ‘খোয়াবনামা’ লেখার পর্যায়ে সংগ্রহ করেন বগুড়া অঞ্চলের ছড়া, লোককথা এবং স্থানীয় ভাষান্তর। ওই অঞ্চলের কিংবদন্তীর খোঁজ করেন, ফলে আখ্যানের ইতিহাসবোধে নিছক সম্প্রদায়গত ভেদের বাইরে তৈরি হয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অন্য উপাত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে কিংবা অন্য ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায় ইলিয়াসের অভিজ্ঞান।

উদারনৈতিকতার পক্ষে ও ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে সুফী এবং বাউল দ্বন্দ্বমিলনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘযাত্রা করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই প্রান্তিক হয়ে গেছে। উনিশ শতকের ‘আধুনিক’ শিক্ষা মূলধারার রুচি-ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে বিভেদ বাড়িয়ে দিয়েছে সুফী, বাউল ও

লোকায়তের। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করছেন লোকধর্মের সঙ্গে দ্রোহী রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তনমূলক সম্পর্ক,

বাউল, ফকির, কর্তাভজা, সাহেবধনী- এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাংলার গ্রামীণ কৃষিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষদের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজও জনপ্রিয়, এদেরই রাজনৈতিক প্রতিরূপ যেন দেখতে পাই নকশালবাদী গোষ্ঠীগুলিতে... অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, এই লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি তৈরি হয়েছিল বাংলার নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও গরিব মুসলমান খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে, যাঁরা সমাজের প্রান্তিক অংশে বাস করতেন। আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এঁরা এই সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি বর্জন করে, তার আওতা থেকে বার হন, নিজেদের স্বতন্ত্র তল্লাট তৈরি করেছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ৩৫৪-৫)

সুমন্তবাবু স্বাভাবিক কখনবোঁকে, জনৈক বন্দির সঙ্গে জেলখানায় কাটানো সময়ের অভিজ্ঞতায় এই আশ্চর্য ধরতাই বা চিন্তা-সম্ভাবনার পথ খুলে দিচ্ছেন। নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান তথা কমিউনিস্ট দ্রোহ বারবারই তো সংস্কারের গোড়ায় আঘাত করার কথা বলে। ১৯৭০ দশকে ‘বিরাসম’ তৈরি হয়েছিল লোককথা ও লোকসংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েই। সেই ‘বিরাসম’^{৩৬}-র সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাহিত্য কর্মীরা নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন। রাষ্ট্রের নৃশংস দমনপীড়নের পরেও এই ‘বিরাসম’, লোকায়তের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনই তাঁদের জনযুদ্ধ (Peoples’ War) নির্মাণের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে বাউল-সুফী চর্চা হয়তো ছিলনা, কিন্তু, তাঁদের নিজস্ব লোকায়ত সমৃদ্ধি, গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে আত্মীকরণ ছিল। সুমন্তবাবু বলছেন, “এদের গানে একটা স্বপ্নরাজ্যের আকৃতি আছে। একটা চিরকালীন Rural Utopia-র কল্পনা ভেসে বেড়ায়” আর, এই স্বপ্নরাজ্যের ইতিকথা তো আখতারুজ্জামানের ‘খোয়াবানমা’-র হুমতুল্লার খোয়াবে, তমিজের খোয়াব আর, কেরামতের গানে! সুমন্তবাবু ভবা পাগলার গানের

‘মধুর বৃন্দাবন’-র সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের দ্রোহীদের শোষণমুক্ত সমাজভূমি খুঁজে পেয়েছেন-মিলসূত্র ‘কৃষিজীবী সমাজের আবহমান Millenarian dream বা আগামী এক স্বর্ণযুগের প্রত্যাশা’³⁷। এই প্রবন্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারবিন্দু বাউল দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের দৈহিক শ্রম ও শ্রমের শোষণমুক্তির বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার মিল।

এ দেহকেন্দ্রিক চিন্তার অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম নকশাল রাজনীতির আলোচনাতে যখন নেতা ও কর্মীরা জোর দিতেন মেহনতি ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের কায়িক শ্রমের অভিজ্ঞতার উপর। যুক্তিটা ছিল এইরকম- যেহেতু এই দরিদ্রতম কৃষক শ্রেণিই নিজেদের দৈহিক শ্রম দিয়ে উৎপাদন করছেন (ধনী ও মধ্যকৃষকেরা সচরাচর নিজেরা জমিতে প্রত্যক্ষভাবে চাষ-আবাদ করেন না; ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন ও ছোটো কৃষক বা বর্গাদার দিয়ে করান)- সেইজন্য এই শ্রেণিই বিপ্লবের কর্ণধার হওয়ার উপযুক্ত।

(বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ৩৫৬-৮)

সুধীর চক্রবর্তী তাঁর লোকায়ত গবেষণায় ‘বাংলা দেহতত্ত্বের গান’ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজের শোষিততম, প্রান্তিকতম মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের নিরন্তর অনিশ্চয়তার সন্ধান করছেন, কায়িক শ্রম তথা ‘দেহ’-র উপযোগিতা গানগুলোর রূপকার্থে খুঁজে পাচ্ছেন।³⁸ সুমন্তবাবু ঠিক এখানেই তুলনাবিন্দুতে পৌঁছছেন। যদিও, মূলতঃ সমাজতত্ত্বের রাজনীতি নিয়েই সুমন্তবাবু কথা বলছেন। কিন্তু, এই দেহতত্ত্ব, বাউল-সুফী ও নিম্নবর্গের প্রতিস্পর্ধী রাজনীতির চিহ্নত্রয়কে সাহিত্যের ভেতর সন্ধানের চেষ্টা করা যায়। ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যান কি এই চিহ্নত্রয়কে কেন্দ্র করেই এগোয় না? তমিজের কায়িক শ্রম আর কেরামতের গান সেই স্বপ্নরাজ্যের কথা বলে। নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ববাদ আর গোঁড়া মোল্লাতন্ত্র কোনওটাই মেনে নিতে পারে না তমিজের আকাঙ্ক্ষা ও কেরামতের গান। চেরাগ আলির আচরণে, শোলোকে যে অতীন্দ্রিয়বাদের সন্ধান থাকে, তা বারবার অতীন্দ্রিয়ের তালা খুলে ইতিহাসে পৌঁছে দিতে চায়। কিন্তু, সেই ইতিহাসে পৌঁছানোর পথই বা একমাত্র ‘শিক্ষিত-আধুনিক’ ইতিহাসের পথ কেন হবে? ফকিরের যুদ্ধে গিয়ে না-ফেরার

শোলোক, ‘ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইল সকল ঠাই’-র মতো প্রতীকার্থে উচ্চারিত শব্দসমূহ নিম্নবর্ণের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানের পথ দেখায়। সুমন্তের মতে, চৈতন্য যে বর্ণাশ্রমবিরোধী সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন, চৈতন্যের মৃত্যুর পরে তা বৈষ্ণব রাজনীতি ও উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী ‘গোস্বামী’, ‘মোহান্ত’দের প্রাতিষ্ঠানিক মৌরসিপাট্রায় পরিণত হয়; “ধর্মান্দোলনের মূল ভিত্তি নিম্নবর্ণের মানুষ ক্রমে প্রাপ্তস্থিত ও বিতাড়িত হলেন, ‘আউল-বাউল’ নামে” (বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬১)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘খোয়াবনামা’-তে এই প্রান্তিকবিন্দুর উল্লেখ রাখেন বিস্তারিতভাবে, প্রবল ধর্মান্ধতা আর পরধর্মদ্বেষ হিন্দু-ইসলাম দুই ধর্মকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আলেমবাদী মোল্লাতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়। যুধিষ্ঠির পাল, দশরথ কামার, বুধা মাঝিদের গ্রাস করে নেয় ‘ধর্মসংকট’-র দোহাই দিয়ে। চেরাগ আলির শোলোকগুলো আর পাওয়া যায় না কোথাও, তমিজের বাপ চোরাবালিতে ডুবে যায় এবং মুনসির বসতি ‘মোটফ’ পাকুড়গাছ উপাঙ হয়ে যায়। তমিজের বাপই ছিল রহস্যময় জগতের সঙ্গে শেষ ‘যোগসূত্র’। কেরামত আলি আজীবন চেরাগ আলির সঙ্গে তথা পাওনা-শোলোকের উৎসের সঙ্গে যে ‘মুরীদ-মুরশিদ’ সম্পর্ক বাঁধতে চেয়েছিল, তা ব্যর্থ হয় নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে। আর, ‘খোয়াবনামা’ তখন একটি ছেঁড়াখোঁড়া বই ছাড়া আর কিছু নয়। আর, সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্মাদনায় কেউ মনেও রাখেনা সেসব।^{৩৯}

যে কোনও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা একসময় নিজেই যখন প্রতষ্ঠান হয়ে ওঠে, তখন তাকে গ্রাস করে প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলো। সুমন্তবাবু সাম্প্রতিক সংসদীয়-ক্ষমতামূলক বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন আউল-বাউল, ফকিরদের নিপীড়িত অবস্থানের সামাজিকতাকে। চৈতন্যের ব্রাহ্মণ্যবাদী শিষ্য ও সহযোগীরা যেমন আন্দোলনের মূল ভিত্তি ও নিপীড়িত নিম্নবর্ণকে ভুলে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন, তেমনই সিপিআই(এম) কৃষক বিদ্রোহ দমন ক’রে ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে শোষণমূলক ক্ষমতাসম্পর্ক অটুট রেখেছিল, বিপ্লবের মূল ভিত্তি নির্বিন্দু-শ্রমজীবী-কৃষিজীবীদের

ভুলে গিয়ে⁴⁰। ইতিহাসের পথ ধরে রাজনৈতিক বাস্তবতায় পৌঁছতে চাইছেন সুমন্ত। এই বাস্তবতা থেকেই সাহিত্যে আসা যাক আবার। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় তাঁ ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে সুমন্তবাবু কথিত নকশালবাদী রাজনীতির ওই ‘স্বপ্নরাজ্য’-র কথাই বলেছেন। পাঞ্চগলী, দ্রোণাচার্য, নিরুপমরা ওই স্বপ্নরাজ্যের খোঁজে, কৃষিজীবী-শ্রমজীবীদের শোষণমুক্তির দ্রোহের শরিক হয়। এই উপন্যাসে ইতিহাসের বাস্তবতায় কাল্পনিক কুশীলবেরা নয়, কেন্দ্রে থাকেন ইতিহাসের কুশীলবেরা- চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী, দ্রোণাচার্য ঘোষ এবং ‘ফিকশন’-র কল্পনা ও বাস্তবতার যোগসূত্র গড়ে দিতে থাকেন সুকান্তি, নিরুপম, পাঞ্চগলী (বাস্তব নামের থেকে ভিন্ন নামে⁴¹)। কৃষিবিপ্লব, ছাত্রছাত্রী-যুবকযুবতীদের গ্রামে যাওয়া, সুমন্ত যেভাবে মেহনতি মানুষের কায়িক শ্রমের অভিজ্ঞতা ও বঞ্চিত শ্রমজীবীদের শোষণমুক্তির স্বপ্নের কথা বলছেন, এই আখ্যানেও তা উপস্থিত। আর, ইতিহাসের পথ ধরেই একবিংশ শতকের প্রথম দশকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে কৃষকবিক্ষোভের ইঙ্গিত সামান্য রাখেন সুমন্ত, সংসদীয় বামপন্থী দলের ক্ষমতামদগর্ভী বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেন। অশোক মুখোপাধ্যায়ও তাঁর কাহিনিকে এই নতুন দশকে নিয়ে আসেন। ইতিহাসের ধারা তো মুছে ফেলা যায় না, রাষ্ট্রের বহু দমনপীড়ন ও আভ্যন্তরীণ বাকবিতণ্ডার পরেও শোষক বনাম শোষিতের লড়াই থেমে থাকে না। কারণ, শোষণকাঠামো অপরিবর্তিত। ইলিয়াস যেভাবে দু’শতক পেরিয়ে ইতিহাসের আখ্যানে বাস্তবের কালস্থানিকতার যোগসূত্র স্থাপন করেন, অশোক মুখোপাধ্যায়ও সেই যোগসূত্র খুঁজে পান চার দশকের ব্যবধানে। জ্যোতিষ্ক, অভিজ্ঞান, প্রকৃতি- নতুনরা এসে যায়, দ্রোহস্বপ্ন শেষ হয় না। উপন্যাসের শেষ অংশে উল্লেখ থাকে সিধো সরেনের দেহ বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, পুলিশ-সিআরপিএফ মিলিত সন্ত্রাস ও লালগড়ের কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের দ্রোহের। যে স্বপ্নরাজ্যের ইঙ্গিত সুমন্ত খুঁজে পেয়েছিলেন কয়েক শতক আগে থেকে প্রবহমান বাউল ও ফকিরি গানে, নিপীড়িত জনগণের লোকায়ত সংস্কৃতির সাথে ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূলনীতিতে, তারই ধারাবাহিকতা অটুট থাকে নতুন প্রজন্মের চেতনায়-

পাঞ্চগলী এই ছেলেমেয়েদের অনেক কিছুই বুঝতে পারে। নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।
নতুন যুগের সুর, তাল, ভাষা তো পালটে যাবেই... প্রত্যেক মানুষই স্বপ্ন দেখে। যারা
বলে স্বপ্ন দেখে না, আসলে তারা আগের রাতের স্বপ্ন মনে রাখতে পারে না... একটু দম
নিলেন সুকান্তি। আর কী জান, আমাদের স্বপ্ন বুলেট প্রুফ। (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ৪৫২-
৮)

ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের এই মিলমিশের সূত্রগুলো স্মৃতিতে রেখে ‘খোয়াবনামা’-র শোলোক ও
খোয়াবে-পাওয়া গানগুলো দেখা যাক। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর ‘বাংলা দেহতত্ত্বের গান’ গ্রন্থে বাউল
ও সুফী গানের নিগূঢ় তত্ত্ব ও দেহবাদী সাধনার গবেষণা করেছেন। ইলিয়াস অতীন্দ্রিয়বাদের
নির্দেশ করেন না। ইলিয়াস দেহতত্ত্ববাদের ইঙ্গিতও হয়তো দেন না। কিন্তু, যে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী
ইতিহাসকে তিনি রাজনৈতিক উপন্যাস ক’রে গড়ে নিচ্ছেন, সেখানে কি এই নিগূঢ় তত্ত্বের ইঙ্গিত
একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব? আর, যদি সেই তত্ত্বের ভিত্তি হয় আবহমান গ্রামীণ কৃষিজীবী
শোষিত মানুষজন, তাহলে ‘খোয়াবনামা’-র শিরদাঁড়া জুড়ে তাঁদের মুখে মুখে ফেরা গান চেরাগ
আলির শোলোক হয়ে যায় কখন-

চান্দ জাগে বাঁশঝাড়ে

একটা একটা ডিম পাড়ে

ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইলো সকল ঠাঁই

উঁকি দিয়া চায়া দেখি ফকির ঘরত নাই (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৫৮)

দেহতত্ত্ববাদী গান বাউল ও ফকির সাধনার দীর্ঘদিনের অনুশীলন। তাঁরা ব্রাত্য, মূলধারার সমাজ
থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁরা গোঁড়া ধর্মবাদের শিকার। কিন্তু, তাঁদের অনুশীলন তো থেমে যায় না।
দ্রোহের দাবানল না হলেও প্রতিবাদের-নাকচস্বরের ফুলকি হয়েই তা থেকে যায়। মজনু শাহের
লড়াই আর ভবানী পাঠকের বীরত্বগানে তাই কি ‘দেহ’ এত প্রাধান্য পায়? “আন্ধার পাগড়িতে
বাঁধো নিজ নিজ শির/ সিনা টান রাখো আর আঁখির ভিতর/ সুরমা করিয়া মাখো সুরুজের কর”
(১৭৪)- মজনু শাহের এবং বৈকুণ্ঠ গিরির ক্রমঅপস্মরণ কীর্তন-সংস্কৃতি, সন্ন্যাসী-ফকির

বিদ্রোহের মুখফেরতা ইতিহাসে প্রাধান্য পায় দেহ, প্রাধান্য পায় কৃষ্ণ-গোপিনীদের জলকেলির
আধারে ভবানী পাঠকের অবয়ব- ‘কৃষ্ণ কোলে যেন শত রাই’ আর ভবানী পাঠকের দেহ মানাস
নদীর জল থেকে তুলে আনার মধ্যে ভেদ থাকে না কোনও। কেরামত আলি শোলোক খুঁজে
বেড়ায়। চেরাগ আলির শোলোক, খোয়াবনামার রহস্য জানতে চায় কেরামত। কিন্তু, চেরাগ আলি
ফকিরের সবই যে পাওনা-শোলোক, মুখফেরতা সাহিত্য। কোথাও তা লেখা নেই। আধুনিক
কবি কেরামত আলি কবিতা ও গানের বই ছাপায়, হাটে বিক্রি করে। তার আধুনিকতায়
মজনু শাহ-ভবানী পাঠকের বিদ্রোহ, কৃষকদের সহর্ষ যোগদান এসবের তেমন প্রভাব নেই;
অলীক কিংবদন্তী, অতিরঞ্জিত লোকাযত মিথ্। সে শুধু চেয়েছিল চেরাগ আলির ফেলে যাওয়া
খোয়াবনামা নামক স্বপ্নব্যাক্যানের পুঁথির নাগাল পেতে, সেই ভাষা-সুর-আখ্যানধর্ম আয়ত্ত্ব করতে।
কেরামত তেভাগার লড়াই থেকে গান বাঁধার অনুপ্রেরণা পায়, তেভাগা কৃষকবিদ্রোহে কৃষকদের
বীরত্বগাথা চারণকবির মতোই ছড়িয়ে দেয় হাটভরা লোকের মধ্যে, জিন্নাহ-গান্ধীর মিলনের গান
গায় মুসলিম লিগের সভায়, সামন্ততন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের অবসানের স্বপ্নে কৃষকদের শোষণমুক্তির
গান গায়- সহজ সরল মেঠো ভাষায় ও গাজী গানের সুরে। মাঝিপাড়ার শ্রমজীবী মানুষ জোতদার
শরাফত মণ্ডলের বিরুদ্ধে কাৎলাহার বিলের মাছ দখল করতে গেলে, তমিজের বাপ মুনসির
শোলোকের ভাঙাখোয়া সুর-ভাষা শোনে কেরামতের গলায়। এখানেও সেই স্বপ্নরাজ্যের আকাজ্জা
মিশে যায় বহুশতক আগের সুফীসাধকদের সুরে। কিন্তু, কেরামতের গানে দেহতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ
নয়, সরাসরি মুক্তির কথা। তাই জন্যেই কি তমিজের বাপ তাকে ‘আউরা’ মনে করে, মুনসির
মতো ‘পবিত্র’ ব্যক্তির শোলোক কীভাবে কেরামতের মতো আধুনিক কবিরালের গলায় স্থান পায়
তা ভেবে আশ্চর্য হয়? ইলিয়াস কেরামতকে ইতিহাসের এই বিবর্তন ও উত্তরণের দিশাতেই
সম্পূর্ণতা দিতে পারতেন। তাতে ‘রাজনৈতিক মতাদর্শ’, প্রতিস্পর্ধী স্বরের গুরুত্ব হয়তো স্পষ্ট
হতো আরও। কিন্তু, ইলিয়াস তো বারবারই চাইছেন ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবয়ব। ইতিহাসের
অলিগলির ভেতর ব্যক্তিমানুষের অনুসন্ধান। তাই, চেরাগ আলির নাতনি কুলসুমের সংস্পর্শে

এসে কেরামতের গান কি ফের সেই ফকিরিসাধনার নিগূঢ়তার দিকেই যায়? আবারও কি সেই দেহতত্ত্বের অপসূয়মাণ ছায়া এসে যায় তার মাথার ভেতর? এই হঠাৎ-পাওয়া খোয়াবসুরে ‘পাওনা শোলোক’ কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঝলসে ওঠে তার চেতনায়। আগুনের অবয়বে কুলসুমের মুখ, পারিপার্শ্বিক জ্বলে উঠতে দেখে কেরামত,

কুলসুমের রাগের তাপ লাগে কেরামতের মুখে, তার ঝাঁঝ লাগে তার চোখে। তার কাতর মাথা ব্যথায় নুয়ে আসে। বই নিয়ে মাচায় উঠে কুলসুম তার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকলে তগু চখে আগুন জ্বলে ওঠে। ঐ আগুনের শিখা লাগে কেরামতের শরীরে এবং দেখতে দেখতে সব তাপ জমা হয় তার মাথায়... আজকের স্বপ্নের নতুন উপসর্গ প্রচণ্ড মাথাব্যথা। ভেতরের মগজ তার আগুনের তাপে গলে গলে পড়ছে। ভয়ে, ব্যথায়, কষ্টে, উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তার গোটা মাথাই কাঁপে প্রবল বেগে... তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এই দুটি লাইনঃ

এ জেবনে রূপ যদি দেখিয়াছি কোথা

খোয়াবে আগুন মুখ নাহিক অন্যথা (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২০৬)

কেরামত আক্রান্ত হয় স্বপ্নে। আধোঘোর আধোচেতনায় কেরামত বোঝে সে স্বপ্ন দেখছে কিন্তু স্বপ্নের ‘অসুখ’ থেকে বেরোতে পারে না। সর্বগ্রাসী স্বপ্নে তেভাগা নয়, মুনসি নয়, ফকির-সন্ন্যাসী নয়, লিগ-কংগ্রেসের মিলন নয়, শুধু জেগে থাকে কুলসুমের দহনতগু মুখ আর কেরামতের ততোধিক তগু শরীর ও চেতনা। আর, এই স্বপ্নাহত হওয়া ঘটে তমিজের বাপের ঘরে, ‘খাবনামা, পালনামা ও তাবির’ নামের বহু দশক-শতকের জীর্ণ বইটি ছুঁয়ে দেখার পর থেকেই। বইটি ছোঁয়ার মুহূর্তেই কেরামতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, “খোয়াবে আগুন জ্বলে দুনিয়া আসমানে। আল্লা সেই রূপ রাখিয়াছে এইখানে...” সে শোলোক কেরামতের মনমতো হয় না, অথচ কুলসুম এই শোলোকেই পায় তার ঠাকুর্দা চেরাগ আলির স্বর, ‘তমিজেরর বাপের সঙ্গে কেরামত আলিও কি চেরাগ আলির সাগরেদ হয়ে গেল?’ ভাবনায় আকুল হয় কুলসুম। সেই

মুহূর্তেই তো ওই ‘আগুন’ জ্বলে কেরামতের চেতনায়। কুলসুম, কেরামত, তমিজের বাপ- এরাও তো নিম্নবর্গের, সমাজের সবচেয়ে তলায় থাকা অনিশ্চিত জীবন আর শোষিত যাপনের দৈনন্দিনে বাঁচা মানুষ। ইলিয়াস কি ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেই দেহতত্ত্ববাদী গানেরই নতুন কালস্থানিকতায় বেঁচে ওঠার?

সময় ও সমাজের সঙ্গে উপন্যাসের ‘ব্যক্তি’-র দ্বন্দ্বিকতার সম্পর্ক এবং ইতিহাসের উপাদান

গিওর্গে লুকাচ্ উপন্যাস বিষয়ে জোর দেন সমগ্রতার ওপরে। ব্যক্তিভাষার সঙ্গে সমাজভাষার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক উপন্যাসের কুশীলবেদের নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আর, উপন্যাসের পরিসরে যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিপরিসরে থাকা মানুষদের কথা উঠে আসে, তাতে পাঠকের মনে ছাপ পড়ে একটা নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের। ‘The Historical Novel’ প্রবন্ধে লুকাচ লিখছেন যে, উপন্যাসের প্রধানতম বিষয় সমাজ। মানুষের সামাজিক পরিসরের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহের নিরন্তর আদানপ্রদান যা সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির দ্বারা মানুষের সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক তৈরি হওয়া ইত্যাদিই মূল বিষয়।⁴²

The world of the novel is not only a point of departure, but a thoroughly concrete, complex and intricate world inclusive of all the details of human behavior and conduct in society. It is clear, however, that if this world is to evoke a totality, if a restricted circle of people and a restricted group of “objects” are to be portrayed in such a way that the reader has the immediate impression of an entire society in movement, then some form of artistic concentration

is again necessary and any straightforward copying of reality must be resolutely abandoned. (Lukacs 2000, 237-38)

উপন্যাসের নির্মিত হওয়ার এই লুকাচকথিত সূত্রে ব্যক্তির সঙ্গে সময়ের, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে; আর, সেই দ্বন্দ্বিকতার সম্পর্কে উপন্যাসের রাজনীতি স্পষ্টতর হয়।

ইতিহাসের পাতা উড়তে উড়তে ক্রমশ এক সন্ধিক্ষণের দিকে এগোয়। ‘খোয়াবনামা’র সময়ের মূল ভরকেন্দ্র ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি। ফকির-সন্ন্যাসীরা তখন নেহাতই কিংবদন্তী কিংবা অলৌকিক বিশ্বাসের কুশীলব। বৈকুণ্ঠ গিরির ভবানী পাঠক কিংবা তমিজের বাপের মুনসি ও তার শোলোক বাস্তবের বিভেদ, দাঙ্গা এবং অবিশ্বাসের আবহে ছটফট করছে। যে পাকুড়গাছে বাসা বাঁধা মুনসির সঙ্গে ‘পীর-মুরীদ’ সম্পর্ক ছিল তমিজের বাপের, সেই পাকুড়গাছ সমেত মুনসিও উধাও হয়ে যায়; হুঁটভাটার চোরাবালিতে ডুবে মারা যায় তমিজের বাপ। আর, তাদের সঙ্গেই উধাও হয়ে যায় ইতিহাসের যাবতীয় সেতুবন্ধন। খোয়াবে, অতীন্দ্রিয়ে অলৌকিকের সঙ্গে যোগাযোগের সব পথও কি বন্ধ হয়ে যায় না? ইলিয়াস তাঁর আখ্যানে প্রথম বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-র প্রতিপাঠ রেখেই থামেন না, বরং তাকে জুড়ে নেন ১৯৪০ দশকে। আর, এখানেও ইতিহাসের ছায়ায় আখ্যান এগোতে থাকে পরিণতির দিকে। এই ইতিহাসের পরিণতি প্রত্যেকের জানা, যেহেতু তা ‘ঘটে গেছে’ এবং তা ‘ইতিহাস’। কিন্তু, সাহিত্যের ওপরে এখানেই কিছু দায় বর্তায়। ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়ণ শুধু ইতিহাসবিদেরাই করতে পারেন কিন্তু ইতিহাসের ভেতরে থেকে যাওয়া চরিত্ররা? ইতিহাসের উপরিতলে থেকে যাঁরা তৎকালীন-বর্তমানের তথা অধুনা-ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন, ইতিহাসের পাঠ কীভাবে ভবিষ্যৎ নেবে তা ঠিক করে দেন এবং আখ্যানে কোন কুশীলবেরা আখ্যানজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করবেন তা নির্ণয় করেন, তাঁরা সেই ইতিহাসের উপরিতলের নিচে চাপা পড়ে থাকা কুশীলবেদের ‘ব্রাত্য’ করেই রাখেন। প্রামাণ্য ইতিহাসে যেমন সোভন ধূমা বা বরকতুল্লাহ নেই কিংবা চেরাগ আলি শাহের সম্বন্ধে দু-একটি ছেঁড়া পাতা বরাদ্দ, তেমনই তমিজ, তমিজের বাপ, কুলসুম, বৈকুণ্ঠ গিরি, দশরথ কামার,

হুমতুল্লাহরাও নেই। আর, যদিও বা আখ্যানকারের দাক্ষিণ্যে সামান্য জায়গা করে নিতেও পারেন, তবুও আখ্যানের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, থেকে যান পাদটীকায়। এঁদের যাপন, চাহিদা এবং ভূমিকা প্রামাণ্য ‘মূলধারার’ ইতিহাসের উপরিতলে উঠে আসতে পারে না। ঠিক এই সংকট-বিন্দুতেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সতীনাথ ভাদুড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়ের মতো লেখকদের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিমানুষের ইতিহাস এবং সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে- যেখানে এই ‘ব্রাত্য’ মানুষদের সম্পর্ক, আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ এবং ভূমিকা দিয়ে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানোর উদ্যোগ থাকে। উপন্যাস মানে যদি ইতিহাসে জারিত ব্যক্তিমানুষকে অশেষণের আখ্যান হয়, তাহলে এই প্রান্তপরিসরে থাকা মানুষগুলোর অনুসন্ধানই এঁদের লেখা উপন্যাসের ভরকেন্দ্র। দেবেশ রায় তাঁর ‘উপন্যাসচিন্তা’ প্রবন্ধে এই সময় ও ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের জারিত রসায়ন প্রসঙ্গে লিখছেন,

সময়ের দায় ঔপন্যাসিককে মানতে হয়। সময়ের পাককেও ঔপন্যাসিক এড়াতে চান। কারণ তিনি পৌঁছতে চান ব্যক্তিমানুষের কাছে। সেই ব্যক্তিমানুষ সময়ে অস্থিত, হয়তো-বা সময়ের পাকচক্রে বাঁধা। তার কাছে পৌঁছতে ঔপন্যাসিককে হাজার পথ খুঁড়তে হয়। (রায় ২০০৬, ৯০)

১৯৪০ দশকে উপমহাদেশের ইতিহাস যতগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং প্রাদেশিক। আন্তর্জাতিক স্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ও ভারত তথা বঙ্গ প্রদেশে তজ্জনিত প্রভাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-রাজনৈতিক সংকটে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিলুপ্তি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন। জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনৈতিক পক্ষ বিভাজন, মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে কংগ্রেসের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাত এবং হিন্দু মহাসভার সুযোগসন্ধানী ভূমিকা, অর্থনৈতিক সংকট ও নগরায়ণ নীতি, খাদ্যসংকট, দেশভাগ, দেশভাগের অব্যবহিত আগে ও পরে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর। প্রাদেশিক স্তরে (মূলতঃ অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া খাদ্যসংকট, '৪৩-র মন্বন্তর, মন্বন্তর ও নগরায়ণ অর্থনীতির ফলে গ্রামবাংলা থেকে লক্ষাধিক মানুষের শহরে চলে আসা, মুসলিম লিগের একচ্ছত্র আধিপত্যে বেঙ্গল কংগ্রেসের ক্ষমতা-হ্রাস, বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু, বাংলা ভাগ হওয়া এবং উদ্বাস্তু কয়েক লক্ষ মানুষ। এই প্রত্যেকটি ঘটনা যেমন একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনই এগুলোর প্রত্যেকটাই সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যক্ষ আর্থ-সামাজিক অভিঘাতে তো বটেই, মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও প্রভাব ফেলেছে। লেখক ও পাঠক উভয় তরফের মনস্তত্ত্বেই এই ঘটনাগুলো গাঢ় উদ্বেগ জাগিয়েছে এবং এখনও জাগায়। লেখক ইলিয়াসের উপন্যাসের কুশীলবেরাও তাই এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত। ইলিয়াস তাঁর চিঠিতে, প্রবন্ধে এই ইতিহাস ও ইতিহাসের নিম্নতলে থেকে যাওয়া মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও ভূমিকার কথা বলেছেন। ১৯৪৫-৪৬-৪৭ সালের ইতিহাস অলৌকিকবাস্তবতার মোড়কে আখ্যানে বুনন করতে তাঁকে ফিরতে হচ্ছে 'অপর' ইতিহাসের কাছে, প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে পাঠ্য ইতিহাসের বহু বয়ান,

Partition can never be the the desired solution to the economic problem of one community. The outcome of partition has not proved to be beneficial for either/or, especially for the overwhelming majority on both sides. But in order to grasp and recreate that time, the writer has to delve deep into the problem... Hence, the novelist is a prisoner in one sense; he has to write with a lot of care even on those themes which he himself dislikes. (Dasgupta 2018, 117)

ইলিয়াস বিষ্ণু বসুকে লেখা ওই চিঠিতেই উল্লেখ করেন যে, কেন দেশভাগ-দাঙ্গা বিষয়ক বিভিন্ন সাময়িক পত্র, বই এমনকি মুসলিম লিগের লিফলেট জোগাড় করেও তিনি ক্ষান্ত হন না। তিনি

চলে যান উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে, সংগ্রহ করেন তাঁদের মিথ্, লোককথা ও ছড়া- সেই নিম্নবিত্ত মানুষদের কথন শুনেই প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের বয়ান। খুঁজতে থাকেন ১৯৪৫-৪৭ সালের উত্তর^{৪৩}। ইলিয়াস যে শুধু ওই দশকের তথ্য ও প্রামাণ্য নথি খুঁজেই থেমে যান না তার কারণ, ওইটুকু ঐতিহাসিকের কর্তব্য। তথ্য থেকে ইতিহাসের সত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা। কিন্তু, সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতা আরেকটু বেশি। শুধুমাত্র ‘সত্য’-র পরিবেশনা নয় বরং তথাকথিত তথ্য ও প্রামাণ্য মহাফেজখানার হাজারো নথিতে উল্লেখ না-থাকা মিথ্, মুখফেরতা কথন ও না-শোনা আকাজ্ঞাগুলোকে সাহিত্যের রূপ দেওয়া। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব ‘ব্যক্তি’-র নির্মাণ সমাজ ও সময়ের সমস্ত উপাদানকে ধারণ করেই। ইলিয়াস নিজেও তাঁর ‘উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা’ প্রবন্ধে স্বীকার করেন এই ‘ব্যক্তি’র ভূমিকা, যুথবদ্ধ মানুষের আকাজ্ঞার কথা এবং কালস্থানিকতার প্রেক্ষিতে উপন্যাসে ‘ব্যক্তি’ থেকে ‘মানুষ’-এ বিকাশলাভের কথা।

মানুষকেও ব্যক্তি-খোলসের মধ্যে থেকে বার করে এনে তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলা দরকার। ব্যক্তি এখন মানুষ হয়ে উঠবে। যে-শ্রমজীবীর রক্ত ও যাদের বিনিময়ে বুর্জোয়াব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আজ অসম্ভব ও বিক্ষুব্ধ। তাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ থেকে ঔপন্যাসিক নতুন করে লেখার ইচ্ছা পাবেন। (ইলিয়াস ১৯৯৭, ৪৯)

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের মতো ঔপন্যাসিকদের তথা পূর্বসূরীদের উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপন্যাসের নির্মাণের মূলে ফিরতে চাইছেন ইলিয়াস। সেইজন্যেই উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে সমাজের বিবর্তন ও ইতিহাসের সঙ্গে আঁঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ‘ব্যক্তি’ বা ‘মানুষ’কে কেন্দ্র করে উপন্যাস হয়ে ওঠার কথা আলোচনা করছেন। পূর্বসূরীদের উপন্যাসের সীমাবদ্ধতার কথাও আলোচনা করছেন। আর, এই প্রসঙ্গেই তাঁর মতামত,

যাঁরা নতুন সমাজবাদী চেতনাকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণের কাজ করেছেন তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেননি। এর কারণ হল, উপন্যাসের পুরনো প্রকরণটি তাঁদের সমাজবাদী চেতনাপ্রকাশের জন্যে মোটেই উপযুক্ত নয়। (ইলিয়াস, ৪৯)

ঠিক এই কারণেই কি ইলিয়াস তাঁর প্রগতিশীল উপন্যাস নির্মাণের ও সমাজবাদী চেতনার ধারক হিসাবে নতুন প্রকরণ বেছে নেন? ‘খোয়াবনামা’-র প্রকরণে কোনও উপন্যাস আগে লেখা হয় নি। প্রায় দেড়শো বছর আগের ইতিহাসের সঙ্গে সংকটময় বর্তমানকে জুড়ে নেওয়া, তাও আবার সেই ‘বর্তমান’-র প্রায় ৫০ বছর পরে। গিওর্গে লুকাচ নাট্য ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে চেয়ে উপন্যাসের সংরূপ প্রসঙ্গেও তো একই কথা বলেন,

This complication of the relation between individual and class, however, is again not a product of the development of literature; on the contrary, the entire development of literary forms, and here in particular the novel, is nothing more than a reflection of social development itself. Marx has given a very precise picture of this changed relationship between individual and class under capitalism. (Lukacs 2000, 238)

ইলিয়াসকে সেইজন্যেই ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানকে মিলিয়ে নিতে হয়। লেখ্য সাহিত্য আর মুখফেরতা সাহিত্য-র মধ্যে সেতু গড়ে নিতে হয়। এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ‘জঁ’ তথা ‘নামা’-সাহিত্যকে উপন্যাসের প্রকরণের অক্ষ করে তুলতে হয়। আর, বিজিতদের কেন্দ্রে রেখে ‘ব্যক্তি’ থেকে ‘মানুষ’-র আখ্যানের দিকে এগোতে হয়। সময়ের প্রবল পরিবর্তনকে ধারণ করার ও পুরনো বিষয়-প্রকরণকে পুনরাবৃত্ত না ক’রে নির্মাণ করার যে নীতির কথা ইলিয়াস বলছেন তাঁর প্রবন্ধে, তারই সফল প্রয়োগ ‘খোয়াবনামা’ আর ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর রূপায়ণে।

বাংলা উপন্যাস নির্মাণের রাজনীতি, ভদ্রলোকদের নিয়ন্ত্রণ এবং অন্তর্ঘাতের সূত্র

‘পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য’ বা ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ এই অধ্যায় শুরু হচ্ছে ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যাঁরা মনে করেন যে, সাহিত্যের ধর্মবিচার হয় না কিংবা সাহিত্যের জাতি-দেশ ভাগ হয়না, তাঁরা হয়তো ভুল ভাবেন। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষতঃ উপমহাদেশে বহু ভাষাভাষী মানুষের বোধবিবর্তনের সঙ্গে জাতি-দেশ-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ প্রত্যেকটা বিষয়ই জড়িয়ে। ১৭৯৩ সালে প্রথম বাংলা ছাপাখানা (হুগলি জেলার পঞ্চগনন কর্মকার) প্রতিষ্ঠার পরে ও ঊনবিংশ শতকে তথাকথিত আধুনিক, ইংরেজি শিক্ষা প্রসারণের ফলে বাংলা সাহিত্য নির্মাণের ‘রাজনীতি’ স্বাতন্ত্র্য পায়। সাহিত্যের এই রাজনীতি তথাকথিত ‘আধুনিক-পূর্ব’ সময়ের থেকে আলাদা, এই স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। উপনিবেশিত বাঙালির ‘আত্ম’ নির্মাণের রাজনীতির সঙ্গেই সাহিত্যের (অবশ্যই উপন্যাসের) আত্ম-অপর নির্মাণের রাজনীতি জড়িয়ে থাকে। হিন্দু-জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থানের যে সংস্কৃতি ও রাজনীতি, তা গাঢ় প্রভাব ফেলে উপন্যাসে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত এমনকি মীর মোশারফ হোসেনের মতো ঔপন্যাসিকের ওপরেও। জয়া চ্যাটার্জি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)’ কাব্যের রাজনীতি এবং পরবর্তী সমাজনীতিতে তার বিস্তারিত অভিঘাত নিয়ে। ভদ্রলোক-বাবুদের লেখক-পাঠক বৃত্তে বাংলা উপন্যাসের জগৎ নির্মাণ হচ্ছে; সেখানে কালেভদ্রে নিম্নবর্ণ হিন্দু, দলিত বা মুসলমান লেখক নিজস্ব ওজস্বীতায় ঢুকে পড়লেও, তাঁরা ‘সংখ্যালঘু’দের দলে। এই নির্মাণের ভাল-মন্দ বিচার নিয়ে দেড় শতাব্দী ধরে তর্ক চলছে, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বায়নে সমালোচনা আজও অব্যাহত, কিন্তু প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন এই নির্মাণের রাজনীতি। এই তর্ককেই পরিসংখ্যানের বিচারে দেখা যায় যে, ঊনিশ শতকের বহুকথিত বিতর্কিত নবজাগরণের ছোঁয়ায় উপন্যাসের (রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক-ভ্রমণমূলক) যে পরিসর তাতে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কতিপয় কুলীন কায়স্থ বা বৈদ্যদের একচেটিয়া দাপট। কতিপয় ‘বিরুদ্ধ-হেজিমনিক’ লেখক ছাড়া

প্রায় প্রত্যেকেই ভদ্র-শিক্ষিত-রুচিবান অবস্থান থেকেই রাজনীতি ও সমাজকে আখ্যানবদ্ধ করছেন। জয়া চ্যাটার্জির মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত সম্পত্তি সম্পর্কের ফলাফল হচ্ছে বাঙালি ভদ্রলোক। এরা বিশেষ এক উপস্বত্বজীবী অংশ, যারা জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনার মধ্যস্বত্ব ভোগ ক'রে (intermediary tenurial rights) বেড়ে উঠেছে। আর, 'বাবু' হচ্ছে সেই ভদ্রলোকদের একটা তকমা (badge), যার সামাজিক অর্থবিস্তারে অধিকাংশ উচ্চবর্ণ হিন্দু অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের জমির মালিকানা আছে, যারা সামাজিক বিন্যাসে প্রভু অবস্থানের এবং যাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইংরেজকরণের (anglicisation) পুঁজি রয়েছে।⁴⁴

The vernacular term 'bhadralok' is useful not only because it expresses this sense of exclusiveness and the social relations that produced it, but also because it carries with it overtones of the colonial origins of this class and its overwhelmingly Hindu composition. (Chatterji 2002, 5-6)

অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের ফলে ভদ্রলোক ও বাবুদের উদ্ভব হলেও, ক্রমশঃই উপনিবেশিত বাংলার সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোয় ও সাংস্কৃতিক উপরমহলে এঁদেরই দখলদারি জোরদার হয়। জয়া যদিও বলছেন যে, এই ভদ্রলোক-বাবুরা সরাসরি সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত বিভেদমূলক ভাগের চিহ্নায়ক নয়, কিন্তু, কলকাতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি-সাহিত্য পরিসরে এঁদেরই সাহিত্যানুশীলনে ও পাঠাভ্যাসে আত্ম-অপরের দুর্লভ্য প্রাচীর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে এসে এই ভদ্রলোক-বাবুরা যখন উদারনৈতিক বিশ্বায়নী আবহে সারজল পাচ্ছেন, যখন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ভারত ও বাংলায় জমে উঠছে, তখন এই সামাজিক পরিচয়গুলো নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। এর সঙ্গেই স্থানগত ভূমিকার উল্লেখও করতে হয়। কলকাতা শহরকে ব্রিটিশরা নিজেদের পরিকল্পনামতো যেভাবে সাজিয়ে তুলেছিল অর্থ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-শ্রেণিবিভাগ দিয়ে, তা আর কোনও উপনিবেশিত শহরের ক্ষেত্রেই বোধহয় করেনি।

কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে উনিশ শতক পর্যন্ত তেমন ‘সমস্যা’ না হলেও, বিশ শতকের শুরু থেকে স্থানগত অসামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কলকাতা ও ঢাকার বিরোধ শুরু হয়। ঢাকা বা রাজশাহী শহর কলকাতার তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন এবং দেশীয় উপাদানে ভরপুর; কিন্তু, ঔপনিবেশিক মডেলে এই দুই শহরের গুরুত্ব ‘দুয়োরানী’র মতো। অরুণ সেনের মতে, বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কলকাতা বনাম ঢাকার দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হতে শুরু করে⁴⁵। আর, এর জন্যেও মূল দায় বর্তায় হিন্দু-জাতীয়তাবাদ প্রধান বাংলা সাহিত্যের প্রবণতার ওপরেই। প্রবর্তী ঘটনাপ্রবাহে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা থেকে ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য’ আলাদা হয়ে যায় কোনও এক অভিমানে। ‘বাঙালি মুসলমান’-র আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আর, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য থেকে ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’ আলাদা ক’রে নেওয়ার দৃঢ়তা আসে প্রতিস্পর্ধী এক দ্রোহসফলতা থেকে। আমাদের খুঁজে দেখা প্রয়োজন ওই অভিমানের ইতিহাস আর দ্রোহের ইতিহাস, এই দু’য়ের সঙ্গেই মিশে আছে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বাস্তবতা।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার ইতিহাস উনিশ শতকের শুরু থেকে নির্মিত হচ্ছিল মিশনারীদের হাতে, ইংরেজি শিক্ষিত স্বচ্ছলবিভূদের হাতে এবং আরবি-উর্দুর বিপরীত স্রোতে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান’ গ্রন্থে উনিশ শতকের কলকাতার অভিজাত সংস্কৃতি-সাহিত্য ও অনভিজাত সংস্কৃতি-সাহিত্যের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চা (Cultural Studies)-এ ‘হাই কালচার’ বনাম ‘লো কালচার’-র দ্বন্দ্বের ইতিহাসজ্ঞান থেকেই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উচ্চ-নিচ ভেদাভেদকে প্রশ্ন করার শুরু। এই প্রশ্ন যে ১৯৬০ দশকের আগে ছিলনা তা নয়, কিন্তু বিদ্যায়তনিক প্রতর্কে (Academic discourse) সূত্রাকারে তত্ত্বায়িত করা হয় সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চাকে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতির ‘নিম্নাবস্থান’ থেকে ‘উচ্চাবস্থান’কে প্রশ্ন করেছেন। বাংলার সমাজে ‘উচ্চ’ বনাম ‘ইতর’-র দ্বন্দ্ব বহু শতকের পুরনো। সেইজন্যেই ব্রাহ্মণ্যবাদী, সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃতিমোড়লেরা কৃতিবাস ওঝা

কর্তৃক ‘রামায়ণ’ ও কাশীরাম দাস কর্তৃক ‘মহাভারত’-র অনুবাদ মেনে নিতে পারেননি ভাষার অশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে। আঠারো-উনিশ শতক থেকে সংস্কৃতঘেষা বাংলা গদ্যই হয়ে উঠল আদর্শ গদ্যরীতি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইংরেজ ও ইউরোপীয়রা যেরকম আদর্শে উপনিবেশিত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাইই হয়ে উঠল আদর্শ (Standard)। ‘লোকসংস্কৃতি’ বা মাস্ কাল্চারের যে সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘসময়ব্যাপী বিস্তার ছিল, ক্রমশঃ তাকে সচেতন অবহেলায় ও ক্ষমতাকাঠামোর নির্দেশাত্মক কর্মকাণ্ডে পিছনে ঠেলে দিয়ে নির্মাণ করা হয় এক নতুন উচ্চবর্গীয়-শহুরে-আধুনিক সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি ও নিম্নবর্গের মুখফেরতা সাহিত্য-গান হারিয়ে গেলনা ঠিকই, কিন্তু তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভদ্রসমাজের দেওয়া ‘অশ্লীল’ তকমা লাগল, গড়ে উঠল এক অনভিপ্রেত দেওয়াল।। নিম্নবর্গের ‘জনপ্রিয়’ ও উচ্চবর্গের ‘প্রিয়’ সংস্কৃতির এই যে দেওয়াল, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের প্রবহমানতা থেকে তা বিশ্লেষণ করেছেন,

নিম্নবর্গের লোককবির সে-যুগের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের আচার-আচরণ সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন। আর অভিজাত শিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা লোকসংস্কৃতিকে একটা অস্বস্তিজনক ব্রণ বলে ভেবেছিলেন, যেটা তাঁরা তাঁদের নব্য পরিশীলিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার অঙ্গরাগে রঞ্জিত সাংস্কৃতিক মুখাবয়বে ঘষেমেজে মসৃণ, বা ঐ মুখ থেকে একেবারে নির্মূল করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দুই সংস্কৃতির মধ্যে এই টানাপোড়েন এক ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আকর্ষণ-বিকর্ষণ আজও শেষ হয়নি বাঙালি ভাবজগতে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ৩২-৫)

উনিশ শতকের অবিসংবাদিত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবোধও ইতিহাসের এই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের বিন্দুতে আপতিত। বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই সওয়াল ক’রে এসেছেন শীলিত-নৈতিক সাহিত্য নির্মাণের সপক্ষে। বাংলা সাহিত্যের আবহমান উপাদান, যাকে ‘লোকসংস্কৃতি’ বলে বিচ্ছিন্ন ক’রে দেওয়া হল ‘মূলধারা’ থেকে, যাকে আলাদা করে দেওয়া হল ভদ্রবৃত্ত থেকে, তাকে আর মেনে নিলেন না ‘নবজাগরণ’-র পথিকৃৎেরা। বঙ্কিমচন্দ্র তাই ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্তকে ‘বাঙালির কবি’ স্বীকার করেও, ‘অশ্লীল’ অভিধা দিলেন; বাঙালির মুখের ভাষায় লেখা কাব্যগুণের উপাদান স্বীকার করেও, শিক্ষিত, মার্জিত পাঠকবৃত্তের উদ্দেশে “আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি”⁴⁶ বললেন। এই ‘তাহা’ অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার যে সব অংশ অমার্জিত, অপরিশীলিত মনে করেছিলেন এবং পাঠকেরা যে সব অংশ অশ্লীল ভাবে পাবে বলে ধারণা করে নিয়েছিলেন। প্রচলিত আরবি-ফারসি, দেশজ ও তদ্ভব শব্দ ত্যাগ ক’রে তৎসম ও অর্ধ তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে লেখা সাহিত্য ক্রমেই ‘মানজ্ঞাপক’ হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্য আরও সংকীর্ণ রূপে কলকাতাইয়া ভাষার সাহিত্য হয়ে উঠল, বিশেষতঃ উপন্যাসের ক্ষেত্রে কলকাতার বাবুসমাজ, শিক্ষিত-ভদ্রসমাজের ভাষা ও বোধই হয়ে উঠল প্রধান। আর, শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতেও এঁরাই রইলেন, আখ্যানকাঠামো থেকে ‘লোকসংস্কৃতি’র প্রভাব পুরোপুরেই মুছে ফেলার উদ্যোগ কয়েক দশক ধরে চলতে লাগল। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ সালে যখন ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ লিখলেন, তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল নব্যধনী বাবুসমাজ⁴⁷ ও পাশ্চাত্য আদবকায়দা অনুশীলন করা ভদ্র-স্বচ্ছলবিত্ত ও গোঁড়া হিন্দুয়ানির চর্চাকারীরা। কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ মিত্ররাই ইউরোপ-অনুকৃত যুক্তিবাদ আর নবজাগরণের রঙচঙে মোড়ক ছিঁড়ে ‘নগর-কলকাতার ব্যাভিচারী লাম্পট্যকে’ আখ্যানে তুলে এনেছিলেন।⁴⁸ ‘নকশা’ সংরূপে কালীপ্রসন্ন কলকাতার বাবুদের⁴⁹ শ্রেণিচরিত্র, সামাজিক অবস্থান ও ভণ্ডামি (hypocrisy) দেখানোর পাশাপাশি কলকাতার নিম্নবর্গীয় জনপ্রিয় সংস্কৃতিকেও তুলে আনলেন। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-কে তাই শুধুমাত্র বাবুদের প্রতি বিদ্বেষ বা সমালোচনা বলেই থেমে যাওয়া যায় না, শহুরে নিম্নবর্গের উদ্যাপনের আর্থ-সংস্কৃতিও অনুধাবন করতে হয়। জেলেপাড়ার সং, চরকের মেলায় তাদের পারফরম্যান্স, নিম্নবিত্তের অ-বাঙালিদের সাংস্কৃতিক উদ্যাপন এবং খেমটা নাচের মতো বহু ঘটনা প্রাণ পেয়েছে হুতোমের নকশায়। অথচ, এই ঘটনাগুলো তৎকালীন বাংলা সাহিত্য থেকে উবে যাচ্ছিল।

এদিকে দুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠোনে নেচে ব্যাড়াচ্ছে... প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে- কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে- তার পেচোনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগতে “ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা” ভজন গাইতে গাইতে চলেচে... (সিংহ ২০১২, ৪৫-৬০)

‘কলিকাতার চড়ক পার্বণ’ ও ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’ নকশাদু’টিতে হুতোম লোকসংস্কৃতি ও মুখফেরতা সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন। বাবুদের আয়োজিত বারোইয়ারি পূজাকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠানসূচী তাতে হাফ-আখড়াই, খ্যামটা, সঙের গান, কেত্তন, দকের দল ধোপাপাড়ার দল কাঁচা খেউড়ের গান সবই ঢুকে পড়তে লাগল- আর, এতে শুধু বাবুরা নয়, শহরের নিম্নবর্গের মানুষের পারফরম্যান্স ও দর্শক-শ্রোতারূপে ভূমিকা দুইই উজ্জ্বল। হুতোমের আগে বাংলা সাহিত্যে এঁদের স্থান দেননি কোনও ঔপন্যাসিক। এমনকি, হুতোমের নকশার পরেও খুব বেশি কেউ এঁদের কেন্দ্রে রাখার সাহস দেখাননি। ১৯৯৫ সালে নবারণ ভট্টাচার্য ‘ফ্যাঁতাডু’ নামক ‘বিশেষ মানুষ’ নির্মাণ করে বাংলা আখ্যানে শহুরে নিম্নবর্গের উদ্‌যাপনকে ফের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তবে, তার রস ও রূপ হুতোমের থেকে বহুলাংশে ভিন্ন কারণ, প্রায় দেড়শো বছরের ব্যবধানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, সাংস্কৃতিক আবহ আমূল বদলে গেছে। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’কে বহু গবেষক ও আলোচক বাবুসমাজ ও বিদ্ববৃন্দের প্রতি আক্রমণ হিসেবে দেখেছেন বটে, কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের সহর্ষ উদ্‌যাপনের পাঠ এড়িয়ে যাওয়া হয়। বাখতিন যে ‘কার্নিভ্যালেস্ক’ খুঁজে পাচ্ছেন উচ্চবর্গের সামাজিক রীতি-নীতি-মূল্যবোধের প্রতি নিম্নবর্গের ছুঁড়ে দেওয়া বিদ্রূপ ও সমান্তরাল উদ্‌যাপনের স্বরে, হুতোম তাঁর নকশায় ঠিক সেই অবয়বই তৈরি করছেন। কিন্তু, একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-র কোনও সাহিত্য-

উত্তরাধিকার তৈরি হয়নি। নকশা নামক সংরূপের ধারাবাহিকতাও আর থাকেনি। এর একটা বড় কারণ কি এটাই যে, হতোম যে ‘ইতর’ সমাজের উচ্ছ্বাস-পারফরম্যান্সে ‘ভদ্র’ সমাজের মেকি আবরণ খসিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে ভদ্র-শিক্ষিত-স্বচ্ছল সমাজের সাহিত্য-প্রতিরূপ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল? হতোম প্যাঁচার নকশাকে বাবুরা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। অরুণ নাগ ‘সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থের ভূমিকায় এরকম বেশ কিছু প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এর পাল্টা উপন্যাস লিখলেন, ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ (১৮৬৩)’ এবং চুনিলাল মিত্র লিখলেন ‘কলকাতার নুকোচুরি (১৮৬৯)’⁵⁰। এই দুই লেখকই কলকাতার উচ্চবর্গের বাবু, শিক্ষিত-বিদ্ব মহলের আদরণীয়। চুনিলাল মিত্র তথা প্যারীচাঁদ মিত্রের ছেলেকে ‘কলকাতার নুকোচুরি’-তে হতোমের পাল্টা জবাব দিতে হতোমের ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনতে হয়, “তিনি সর্ব গুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম্ম নাই যে তিনি করেননি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে মহাভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলতো না।”⁵¹ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’-তে কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিগত কেছা প্রকাশ করেন ও কিছু প্রকাশ না-করার প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেন, তাঁদের এই চাপান-উতোর⁵² আর যাই হোক, কলকাতার বাবুসমাজের মার্জিত-শীলিত সাহিত্যবোধকে অস্বস্তিতে ফেলে। হতোমকেও তাই প্রথম নকশার দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের সময় গৌরচন্দ্রিকায় লিখতে হয়,

হতোমের নকশার অনুকরণ করে বটলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান, ও অনেকে হতোমের উতোর বলে, “আপনার মুখ আপুনি দেখেন ও দ্যাখান,” হনুমান লঙ্কা দণ্ড করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপুনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক... ফলে “আপনার মুখ আপুনি দেখ” গ্রন্থকার হতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হতোমের নকশার উত্তর দিতে উদ্যত হল ও বই ছাপিয়ে ঐ

বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। (সিংহ, ২০১২, গৌরচন্দ্রিকা)

‘ভদ্রলোক’ সমাজের অস্বস্তির চাপানউতোর হুতোমের এই গৌরচন্দ্রিকা থেকে বোঝা যায়। আর, ‘উপন্যাস’ সংরূপ থেকে ভিন্ন হলেও নকশা নামক সংরূপ যে প্রকৃতিই সমাজদর্পণ এবং উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সামাজিক অবস্থান-আচরণের নিরপেক্ষ বিবরণ তা বোঝা যায়। হুতোমের এই নকশা তৎকালীন ‘কেছা’, ‘বটতলা সাহিত্য’ ও ‘সম্বাদপত্রের কুৎসা’ থেকে যে বহুলাংশে ভিন্ন, তার উল্লেখ অরুণ নাগ করেছেন তাঁর সটীক গ্রন্থের ভূমিকায়,

সেই যুগের অন্যান্য বাজারচলতি রচনার থেকে হুতোমের নকশার পার্থক্য, হুতোম অর্থনৈতিক অপরাধকে রেয়াৎ করেননি, সত্যের খাতিরে বলা উচিত, মুখ্য বিষয়ও করেননি কখনও। দ্বিতীয়ত, নকশায় ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও স্ফীলতার মাত্রা অতিক্রম করেননি এবং একটি মাত্র উদাহরণ বাদে অন্যত্র মুখরোচক যৌন কেছাকে প্রাধান্যও দেননি। (নাগ ২০১২, ১৪)

কালীপ্রসন্ন নিজেও বাবুবুভেই দিনযাপন করতেন। একথা অনস্বীকার্য যে, কালীপ্রসন্ন বাবুসমাজের অন্যান্য অনেক মাতব্বরের থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিলেন, তাঁর সাহিত্যরসবোধও যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু, বাবুসমাজের শিক্ষিত-মার্জিত-রুচিশীল গঠনের ফাঁপা আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করেও, কালীপ্রসন্ন নিজের ‘ভদ্রলোক’ অবস্থানের সচেতনতা এড়িয়ে যেতে পারেননি। কালীপ্রসন্নের জীবনীকাররা এ বিষয়ে বহু গবেষণা করেছেন^{৫৩}, এই সন্দর্ভে সে আলোচনা বাতুলতা। কিন্তু, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ গ্রন্থেই সেই ভদ্রলোকীয়, সাহিত্যসম্মত অবস্থানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। হুতোম নিজেও একপ্রকার ‘ডিস্‌ক্রেমার’ দিয়ে রাখেন দ্বিতীয় সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকায়, “আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই” (ভূমিকা, ১৮৬২)। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ কলকাতার শিক্ষিত মহলে যে তোলপাড় তুলেছিল, তার একটা কারণ যেমন ছিল ভদ্রবাবু

সমাজের প্রতি কটাক্ষ ও তাদের নীতি-অনীতির রাখঢাকহীন প্রকাশ, তেমনই আরেকটা কারণ ছিল এর ভাষা। তিথি ভট্টাচার্য এই ভাষাকে ‘বেওয়ারিশ বাংলা’ বলছেন, অর্থাৎ অভিভাবকহীন বাংলা ভাষা।⁵⁴ উনিশ শতকের এই সময়েই বাংলা গদ্যভাষা ‘উপন্যাস’-র পথে যাত্রা করছে, সংবাদপত্রের গদ্যের সঙ্গে প্রভেদ গড়ে তুলছে এবং শিক্ষিত-আধুনিক-ব্রিটিশশাসনানুকৃত পাঠকসমাজ গড়ে তোলার সুবন্দোবস্ত চলছে। একদিকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের তৎসম পরিশীলিত ভাষাপ্রকল্প এবং অন্যদিকে অপরিশীলিত দেশজ প্রবচনপূর্ণ হুতোমি ও আলালী ভাষার টানাপড়েনের মুখোমুখি হচ্ছে পাঠকসমাজ।⁵⁵ সদ্যনির্মীয়মাণ পাঠকমহলের ওপর নক্শার ‘ইতর’ভাষা ও চরিত্রদের ‘অঙ্গীল’প্রকাশের প্রভাব প্রবল অস্বস্তিজনক ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো ঔপন্যাসিক নক্শাকে সাধুবাদ দিতে পারেননি। অথচ, কালীপ্রসন্ন ওরফে হুতোম বিদ্ববৃত্তে ‘খারাপ’ হতে চাননি, তিনি শুধু একটু সমাজের দ্বিচারিতাকে (hypocrisy) খোঁটা দিয়েছেন। কালীপ্রসন্নের উদ্দেশ্য সাহিত্য দিয়ে সমাজের খোলনলচে বদলে দিতে চাননি, বরং যাতে ‘শ্যাম রাখি না কূল’-র মতো ‘রক্ষণশীল হই না কি আধুনিক’ এই সমসাময়িক দ্বন্দ্বের সংস্কার চেয়েছিলেন। হুতোমের নক্শা ‘বৈপ্লবিক’ নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে তো ভদ্রলোক-সমাজের হাহুতাশও প্রকট, জাত্যাভিমান ও আভিজাত্য-দেখনদারি প্রতুল। ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’ অংশে বাবুদের বারোইয়ারি পুজোর মেলায় পরিবেশিত যে বাউল গানের উল্লেখ রেখেছেন, তা এরকম- “পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুড়ি সোণার বেণের কড়ি/ খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা” (৮৮) অর্থাৎ, ‘পুঁটে, তেলি, শুড়ি’দের মতো তথাকথিত ‘নিচুজাত’ সমাজে উচ্চস্থান ও ক্ষমতা পেতে চাইছে এবং খেমটা-নাচা মেয়েরা দামি অর্থসম্পত্তি করেছে প্রচুর কিন্তু ‘ভদ্রলোক’ মন্দভাগ্য অথবা সৎ তাই গোলপাতার ছাউনিতে তথা কুঁড়েঘরে বাস করছে। রামলীলার যাত্রা ও পারফরম্যান্স, হাফ-আখড়াই বা খেউড় ও ঢপের মতো পারফরম্যান্স যে ভদ্রলোকেদের দেখা ও উৎসাহ দেওয়া মানায় না, হুতোম পাঠককে তা অবগত করছেন বারবার।⁵⁶ শিক্ষিত-আধুনিক-ভদ্রবাবুদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে ‘রামলীলা’-র

রস থেকে বহুতর উন্নত, তা মনে করিয়ে দিতেই লেখেন, “কল্কেতায় অন্য কোন ম্যালা নাই বলেই অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্মা বাবু, মাড়ওয়ারি খোঁটা, বেশ্যা ও বেণেই অধিক” (১৫৭)। ছতোম যতই বাববার ঘোষণা দিন যে, ‘বর্তমান সমাজের ইন্সাইট’ জানা দরকার পাঠকের, তবুও, নক্শার মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের ওই উচ্চ-নিচ দ্বন্দ্বও প্রবহমান। তবু, নক্শাকে যেহেতু ভদ্রসাহিত্যিক ও ভদ্রপাঠকেরা তৎকালীন সময়ে পুরো হজম করতে পারেননি, কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তাঁদের ‘অশ্লীল’ লেগেছিল বলে ‘নেড়ামুড়া বাদ দিয়া’ প্রকাশ করেছিলেন, সেহেতু প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৫)’-কেই তাঁরা প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস মনে করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদকে ‘বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র’ সম্বোধন ক’রে ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান’ প্রবন্ধে তাঁকে বাংলা গদ্য/উপন্যাসের ভাষার ও বাংলা উপন্যাসের বিষয়ের প্রধান সংস্কারকের স্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিচ্ছেন।

যে ভাষা সকল বাঙালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এজন্য তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাঙারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাঙার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন... প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। (মিত্র ২০১৮, ৭-১০)

প্যারীচাঁদ তাঁর সর্বাধিক আলোচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসে যে শ্রেণির জীবনযাপন ও আখ্যান খুঁজতে চাইলেন, তারা কলকাতার বাবু। কিন্তু, খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, আখ্যানের এই বাবুরা, মূলতঃ বাবু মতিলাল ও তার পরিবার উপন্যাসটি যে সময়ে (১৮৫৫-৬) রচিত হচ্ছে, সেই সময়ের নয় বরং তার প্রায় তিন দশক আগের, ইংরাজি শিক্ষা, আধুনিক আদবকায়দা ও নবজাগরণের উচ্চবর্ণীয় প্রভাব যেসময় বিস্তারী নয়। তিথি ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে, নবমধ্যবিত্ত পরিসরে বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা দু’টোরই প্রবরণতা ছিল- ব্যঙ্গধর্মী, রসাত্মক সাহিত্য

আলালীভাষা অনুসরণ করত।⁵⁷ এই আখ্যানে মতিলালের চরিত্র নির্মাণ হচ্ছে আধুনিকতায় ‘অর্ধশিক্ষিত’ ও রক্ষণশীলতার নীতিবোধহীন-মূল্যবোধহীন বিকাশের দ্বন্দ্ব। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় বাবুরাম বাবু আদরের পুত্র মতিলালকে ইংরাজিশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান,

দেখ, মতিলালের বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হইয়াছে- ছেলেটিকে দেখে চক্ষু জুড়ায়, সম্প্রতি ইংরাজী পড়াইতে বাঞ্ছা করি- অল্প-স্বল্প মাহিনাতে একজন মাষ্টার দিতে পার?... আর আমার ছেলে মোটামোটি শিখিলেই বস্ আছে, বড় পড়াশুনা করিলে স্বধর্ম্মে থাকিবে না। ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয় তাহাই করিয়া দিও- (মিত্র ২০১৮, ২৯-৩০)

ক্রমশঃ আখ্যানের গতিপথে এই মতিলালের ‘উচ্ছল্লে’ যাওয়ার যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, পুরনো ভাঙ্গনশীল সমাজের নীতিবোধ তার যেমন নেই, তেমনই বাবুয়ানির বদলে যাওয়া ব্রিটিশনির্ধারিত সংজ্ঞাতেও সে আঁটে না। তারই ছোটভাই রামলাল মতিলালের সমস্ত আদর্শহীনতা ও ব্যর্থতার বিপরীত প্রতিক্রিয়া। এই উপন্যাসের আরেক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির স্পষ্ট তফাৎ- লেখকের নৈতিকতা প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই উপন্যাস কি তবে ‘বর্ণপরিচয়’ ও অন্যান্য প্রাইমারের মতো নীতিশিক্ষার এক আখ্যায়িত কাল্পনিক রূপ? আর, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মতিলালের উত্তরণ আক্ষরিক অর্থেই ‘অন্ধকার থেকে আলোয়’, ‘মন্দ থেকে ভাল’, ‘অসৎ থেকে সৎ’ অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এর বাইরে কিছু ঘটনা, কিছু প্রতিষ্ঠান ও কিছু ব্যক্তির বিবরণ ও অনুকৃতি, ‘নকশা’-তে হতোম এই বিষয়গুলোই আরও স্পষ্টতার সাথে করেছেন ও অযাচিতভাবে পাঠকের ওপরে কোনও নৈতিক-মূল্যবোধনির্ভর দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দিতে চাননি। সত্রাজিৎ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্যারীচাঁদ ভাষাব্যবহারে শ্লেষ-শ্লেভ প্রয়োগের মাঝে মাঝে হঠাৎ ভদ্রতাসচেতন ভাষার সঙ্গে আপস করেছিলেন, কিন্তু, কালীপ্রসন্ন ‘টোঁক না গিলে গালাগালটা দিয়েছিলেন’।⁵⁸ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নিশ্চিতভাবেই বাংলা গদ্যকে সার্থক সাহিত্যরূপ দিচ্ছে এবং বাংলা উপন্যাস গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, ‘হতোম প্যাঁচার নকশা’য় নিম্নবর্ণের যে উদ্‌যাপন

আছে, প্যারীচাঁদের লেখায় তা অনুপস্থিত। উচ্চবর্গীয় অভিজাত জাত্যাভিমান থেকে দেখেও হতোম খেউড়, সং, টপ্পা, ঢপ, হাফ-আখড়াই, রামলীলা, যাত্রা ইত্যাদির ‘সং’ বর্ণনা দিচ্ছেন। এতে নকশা যেমন স্পষ্ট হচ্ছে, তেমনই ‘ভদ্র-শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত’ পাঠকের পাঠে পৌঁছে যাচ্ছে এই পারফরম্যান্স ও জীবিকাগুলো। মনে রাখা দরকার যে, মুখফেরতা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যানুসন্ধানে এই পারফরম্যান্স, গান তদুপরি আখ্যানগুলোর ভূমিকা রয়েছে। কেণ্টা মুচি, গোপাল উড়ে, ভোলা ময়রার মতো অনভিজাত ও তথাকথিত ‘নিম্নবর্গজাত’ শিল্পীদের গান-কবিতা-আঙ্গিক তৎকালীন কলকাতার সাহিত্যবৈশিষ্ট্য। এঁদের গানে পাঁচালীর আঙ্গিক ভেঙে সামাজিক ও লোকায়ত রঙ্গ-রসিকতা ঢুকে যাচ্ছে (কখনও তা আদিসাত্বক), কখনও উচ্চবর্গীয় সমাজের কেচ্ছা/কুৎসা কবিতা-সুরে প্রকাশিত হচ্ছে, আর, পৌরাণিক কাহিনি ও দেব-দেবীদের লৌকিক স্তরে নিয়ে এসে তাঁদের আবেগ-অনুরাগ-বিরহ-মিলন কবিতায় গানে যাত্রায় নতুন রূপ পাচ্ছে। এসবের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কালস্থানিক গালিগালাজ, খেউড় এবং রঙ্গরসিকতা। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের চোখরাঙ্গানি সত্ত্বেও ‘অসংস্কৃত’ চর্চার উদ্যাপন চলছে, অন্ততঃ ‘বাবুসমাজ’ তাদের আধুনিকতা-শিক্ষা-রুচি-শ্লীলতা দিয়ে ও ‘হিন্দু-জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ’ দিয়ে যতদিন অবধি না এই সমস্ত অসংস্কৃত শিল্প-সাহিত্যচর্চাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। কলকাতার বাবুসমাজ আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতা এবং গ্রাম্যতা ও শহুরেপনার দ্বন্দ্ব ‘জনতোষী’ সংস্কৃতিকে গুলিয়ে ফেলেছেন বারবার, দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছেন। তাই, বাবুরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় ‘বাঁদজি নাচ’-র পাশাপাশি খেমটা নাচেরও আয়োজন করছেন, হাফ-আখড়াই ও কবিগানের সভা আয়োজন করছেন জনসাধারণ যেখানে দর্শক। কবিগানের শেষপর্বে কাব্যরস অক্ষুণ্ণ রেখে জুড়ে যাচ্ছে খেউড়, দাশু রায় তাঁর পাঁচালীতে সং-এর অবতারণা⁵⁹ করছেন, মোহনচাঁদ বসু আখড়াই গানের ধ্রুপদী আঙ্গিকে প্রশ্নোত্তর চাপান-উতোর এনে হাফ-আখড়াই নির্মাণ করছেন এবং কীর্তনীয়া মেয়েরা কীর্তনের আঙ্গিকের বিবর্তনে ঢপ সঙ্গীতের পারফরম্যান্স করছেন। এই সংস্কৃতি, যা পরবর্তীতে ‘অভদ্রোচিত’ ও ‘ছোটলোকীয়’ বলে খারিজ হয়ে যাচ্ছে মূলধারা থেকে, তা

নিশ্চিতভাবেই তৎকালীন সাহিত্যের উপাদান হয়ে থাকছে। এমনকি, নবাবুণের ফ্যাতাডুরা, যারা শাসকের সংজ্ঞায়িত ‘আধুনিকতা’কে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা কি এই উপাদানগুলোকেই নতুন ভাবে গ্রহণ করছে না? অসংস্কৃত উদ্যাপনই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নবাবুণের উপন্যাসে ও ষাট-সত্তর দশকের বেশ কিছু ‘সামাজিক উপন্যাস’-এ। মধ্যবিত্ত পাঠক-সমাজ সযত্নে নির্মাণ করা হচ্ছে ওই সময় থেকেই। আর, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র আলোচনায় ইতিহাসের এই সংকটবিন্দুগুলো স্পর্শ করার এই জন্যেই প্রয়োজন যে, প্রায় দেড় শতক ধরে পাঠকশ্রেণির সযত্ননির্মাণে রাজনীতি রয়েছে এবং তা উপন্যাসের রাজনীতি ও পাঠের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসের ভূমিকায় লিখছেন,

It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, custom & c. and partly of the state of the mofussil. (Thakoor 1856, preface)

কলকাতা শহর ও তার সাহিত্য-সংস্কৃতি তখনও নির্মীয়মান, ‘বাবু’রা অধিকাংশই মফস্বলের রুচি-শিক্ষা-মূল্যবোধ বোড়ে ফেলতে পারেনি। প্যারীচাঁদ তাদের কথা লিখছেন, বাস্তবোচিত বর্ণনায়। একদিকে নীতিশিক্ষা, আদর্শ সন্তানপালনের রূপরেখা অন্যদিকে তৎকালীন জায়মান হিন্দু-সমাজের ভদ্র রীতিনীতি, শীলিত আচরণের প্রস্তাব। হুতোমের মতো ‘আক্রমণাত্মক’ নয়, বরং সংস্কারপন্থী ও আধুনিকতার সদ্যগৃহীত মডেলে অভিযোজিত হওয়ার সূত্রাবলী। টেকচাঁদের উপন্যাসকে ‘প্রতিষ্ঠা’ দিতে বঙ্কিমচন্দ্রদের তাই দ্বিধা থাকছে না, যদিও গদ্যরীতির পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতা নিয়ে কিছুটা দ্বিধা থাকছে। হুতোমের নকশার ভাষা, টেকচাঁদের উপন্যাসের ভাষায়

সাহিত্যের রাজনীতি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা পরের ভাষা ও রাজনৈতিক সাহিত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এই পর্যায়ে আরেকটি বিতর্ক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রয়েছে। ১৮৫২ সালে জনৈকা খ্রিস্টান মিশনারি হানা ক্যাথেরিন ম্যুন্স কতৃক রচিত ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’-কে কোনও কোনও সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাসচেষ্টা বলে থাকেন। হানা ক্যাথেরিন নামক ওই মিশনারির আত্মবয়ানে লেখা ‘বিবরণ’, কলকাতা শহরের নিকটস্থ কোনও এক পল্লীগ্রামে তিনি যান সমাজকে সম্যক বোঝবার জন্যে ও খ্রিস্টধর্মের মহত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে। আখ্যানটিও এই উদ্দেশ্যেই লেখা, যেজন্য আখ্যানের শেষে ফুলমণি পাঠকদের নিশ্চিত করেন এই বলে,

ফুলমণি আপন বন্ধুর কথা শুনিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, পরমেশ্বরের নাম ধন্য হউক, কারণ তিনিই মনুষ্যদের মনকে পরিবর্তন করেন... করুণা শেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল কিন্তু সে ধর্ম্মেতে কখন প্রফুল্লিতা হইতে পারিল না; কেননা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু অনেকবার মনে পড়িত, তাহাকে সে কখন ২ ভাবিত, ঈশ্বর আমাকে গ্রাহ্য করিবে না... তোমরা যে সকল লোকের ইতিহাস পড়িয়াছ, তাহারা তমাদেরই দেশের লোক; তোমাদের ন্যায় তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল, এবং তোমাদের আচার ব্যবহার ও রীতি মত তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল... এই হেতু আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, ফুলমণি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী ছিল, তেমনি তোমরাও তাহার অনুকারী হও। (ম্যুন্স ১৮৫২, ২০৩-৫)

এই ‘বিবরণ’-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশই থাকে না। অন্যান্য মহাদেশের উপনিবেশিত দেশে ঠিক যে কায়দায় মিশনারিরা খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ক’রে শাসনের দমনমূলক আধিপত্য দিয়ে সংস্কৃতি-সাহিত্য-ভাষা-জীবন সবকিছুকে দখল করতে চেয়েছে, এই উপন্যাসের

উদ্দেশ্যও সেরকমই। তবে, ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’-কে উপন্যাস বলার বেশ কিছু বাধা আছে; এই আখ্যানে পল্লীসমাজের আংশিক চিত্র আছে এবং গ্রাম্যসমাজের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক দুর্দশার বিবরণ আছে। মূল কুশীলবেদের ‘উত্তরণ’ ঘটে হিন্দু থেকে খ্রিস্টানে, এর বাইরে তাদের আর কিছু করণীয় নেই। আর, আখ্যানের পরিণতি ও কুশীলবেদের পরিণতি পূর্বনির্ধারিত, হানা ক্যাথেরিন জানেন যে, করুণ ও ফুলমণিকে সমাজের বিপন্নতা থেকে উদ্ধার করিয়ে খ্রিস্টের শরণাপন্ন করিয়ে দিলেই বিবরণের সাফল্য! ‘হিন্দু সমাজ’ তথা ‘ভারতীয় সমাজ’ অশিক্ষা ও দুরাচারজনিত অন্ধকারে নিমজ্জিত, একমাত্র খ্রিস্টের শরণেই সব অন্ধকার দূর হবে এবং সমাজের উন্নতিসাধন হবে- এই সার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই লেখিকা উপন্যাসোপম বিবরণ লিখেছেন। এই আখ্যানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক, ঔপন্যাসিক হয়তো ‘নারী’ বলেই সমাজে নারীদের দুর্দশা ও অশিক্ষার রোগের বর্ণনা ও উপশম চেয়েছেন। যদিও, করুণা ও ফুলমণি, দুই গ্রাম্য মহিলা যিশুর শরণে সমস্ত রোগের উপশম পেয়েছে এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছে।

‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’-র শেষাংশ তথা পরিশিষ্টে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নজরে আসে। হানা এক বিশেষ নামতালিকা সংযোজন করেছেন, ‘নামাবলি’ নামে। তিনি নারী ও পুরুষদের যে সমস্ত নাম শুনেছেন বা দেখেছেন বা কোথাও পড়েছেন, সম্ভবতঃ সেগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গসমাজে সন্তানের নামকরণ বিষয়ে কয়েকটি সূত্র খুঁজে পেয়েছেন হানা ক্যাথেরিন; আর, একইসঙ্গে, দেবদেবীদের নামে সন্তানের নামকরণ যে খ্রিস্টীয় মতে ঘৃণার্হ অপরাধ⁶⁰, সেকথা স্মরণ করাতে ভোলেননি। এরপরে নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে আভিধানিক ছাঁচে নামকরণের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। বালকদের নাম, বালিকাদের নাম ও মিত্রাক্ষরান্ত নাম- এই তিনভাগে ভাগ ক’রে সাজিয়েছেন নামগুলি। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ‘বালিকাদের নাম’ বলে স্বতন্ত্র বর্গীকরণ করেছেন এবং ‘বালকদের নাম’-র সমমর্যাদা জ্ঞাপন করেছেন, ১৮৫২ সালে এর তাৎপর্য যথেষ্ট। কিন্তু, অপরদিকে, এই নামগুলির প্রত্যেকটাই সংস্কৃতায়িত নাম, শুদ্ধ বাংলায় তৎসম বা অর্ধ-তৎসম শব্দের রকমফেরে নামগুলি দেওয়া। প্রধানতঃ অভিজাত

উচ্চবর্গের নামই সেই যুগে এরকম হত। দ্বিতীয়তঃ, এই ‘নামাবলি’তেও বর্ণীয়-বর্ণীয় রাজনীতির পাশাপাশি ধর্মীয় রাজনীতিও কি নেই? প্রত্যেকটা নামই সংস্কৃতায়িত ‘হিন্দু’ সন্তানের নাম। অথচ, আখ্যানটি যে সময়ে লেখা, তখনও আরবি-ফারসি পুরোপুরি ‘ব্রাত্য’ হয়ে যায়নি, রাজভাষার মর্যাদা থেকে ফারসিকে জোর ক’রে সরিয়ে দেওয়া হয়নি; সিপাহী বিদ্রোহের তখনও ৫ বছর দেরি আছে। অথচ, হানা ক্যাথেরিন একটাও ‘ফারসি’ বা ‘আরবি’ নাম খুঁজে পেলেন না? বাংলার গ্রামীণ সমাজে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়ে ঘুরছেন তিনি, অথচ, একজনও ‘ইসলাম-বিশ্বাসী’ পরিবারের সান্নিধ্যে আসেন নি? তাঁদের লোকাচার, সংস্কার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এমনকি ‘সন্তানের নামকরণ’ তাঁর নজর পুরোপুরি এড়িয়ে গেল? নাকি, যেহেতু ‘হিন্দু’ সামাজিকতা ও সংস্কারের ধর্মান্তরসাধনই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য, সেইজন্যেই ইসলামিক-সমাজের প্রসঙ্গ সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন?

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরও যে বিষয়টির কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন তা হচ্ছে, ‘বটতলা সাহিত্য’। প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র- এই প্রখ্যাত লেখকবৃন্দের বাইরেও যে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যবর্গের অস্তিত্ব ছিল ও ‘সমান্তরাল’ এবং ‘জনপ্রিয়’ সাহিত্য রচনা হতো, তার প্রমাণ ওই বটতলা সাহিত্যে। বটতলা সাহিত্যের উদ্ভব উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে।

‘বটতলা’ সাহিত্য এই নাগরিক লোকসাহিত্যেরই typical নমুনা। ছাপাখানার প্রবর্তন ও তার ব্যাপক বিস্তারের সুযোগ নিয়ে বটতলা সাহিত্যিকেরা লিখতে শুরু করেন... সস্তা কাগজ, সস্তা ছাপাখানা এবং সহজবোধ্য বাংলা ভাষা (বৈয়াকরণিক মাপকাঠিতে অনেক সময়-ই অশুদ্ধ বলে বিবেচিত)- এই তিনটির সমকেন্দ্রাভিমুখিতা বটতলার সামাজিক সাহিত্যের সাফল্যের মূলে। বটতলার সাহিত্যিকেরা অধিকাংশই এসেছিলেন তাঁদের পাঠকদের সামাজিক পরিবেশ থেকে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ২২৮-৩০)

শিশিরকুমার দাস ‘A History of Indian Literature (1856-1910)’ গ্রন্থে সাহিত্যে আধুনিকতার অভিমুখে যাত্রার যে কারণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছেন, তার অন্যতম হচ্ছে, ছাপাখানার আবিষ্কার।⁶¹ ১৭৯৩ সালে হুগলি জেলায় পঞ্চগনন কর্মকার বাংলা হরফ তৈরি করেন। বটতলার সাহিত্যের স্ফূরণের মূল কারণ কলকাতার ছাপাখানা। বিশ্বনাথ দেব, বাবুরাম, লল্লু লাল- এঁদের ছাপাখানা কলকাতার সাহিত্যমহলে বহু বই ছাপিয়েছিল। ১৮২৫-২৬ সালে কলুটোলা, শাঁখারিটোলা, মির্জাপুর, বৌবাজার, আড়পুলিতে যে ছাপাখানাগুলো ছিল⁶², তাতে বটতলা থেকে ধর্মীয় বই বা সংবাদ-পত্রিকা সবই ছাপা হত। উত্তর কলকাতায় বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাকে কেন্দ্র⁶³ করে বটতলা সাহিত্যের সূচনা। সুকুমার সেনের মতো বিদ্বজ্জন বটতলা সাহিত্যকে আদরসালো ও অশ্লীল বলে খারিজ করে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যখন ‘নবজাগরণ’ পূর্ণতা ও পরিপক্বতা পেয়েছে, তখন ‘শিক্ষিত-রুচিবান-ভদ্র’ লেখক ও পাঠক দু’য়ের কাছেই বটতলা সাহিত্য অশ্লীলতার দ্যোতক, নিম্নরুচির সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কারণ, যে অভীষ্টে বাংলা গদ্য ও উপন্যাস নির্মাণের ছক কষা হয়েছে সমাজের উচ্চবর্গ ও শাসকমহল থেকে, তার সঙ্গে খাপ খায়নি বটতলার লেখাপত্র। এমনকি, তাকে ‘সাহিত্য’ বলতেও পরবর্তী লেখক-প্রাবন্ধিকদের বেধেছে। কিন্তু, তাঁরা এড়িয়ে গেছেন যে বিষয়টি তা হচ্ছে, বটতলার সাহিত্যে ‘কলিকাতা’ শহরকে বহুদৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। মূলতঃ কলিকাতায় সদ্যথিতু, জীবিকা-উপার্জনে আসা মধ্যবিত্তরা এই সাহিত্যপরিধিতে ছিলেন। দৈনন্দিন বাচনভঙ্গি, আড্ডা-পরচর্চায় উঠে আসা সংবাদ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত উত্তেজক খবর ইত্যাদি তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কখনও উচ্চবর্গের রাখঢাক করা কেচ্ছা ও সামাজিক কেচ্ছা, কখনও নৈতিকতা-মূল্যবোধের শিক্ষা এই আখ্যানগুলোর কেন্দ্র ছিল। অদ্রীশ বিশ্বাস ‘বটতলার বই’-এর ভূমিকায় উল্লেখ করছেন ‘বটতলা সাহিত্যের বাজার’-এর কথা। বইগুলো প্রবল জনপ্রিয় ছিল বলেই বিক্রি হত প্রচুর পরিমাণে, এছাড়া ‘নিষিদ্ধকথা’ ও ‘কেচ্ছা-কুৎসা’-র আকর্ষণ সময়-নিরপেক্ষভাবে থাকেই। সাহিত্য যে স্বতন্ত্র এক বাজার তৈরি করতে পারে, অদ্রীশবাবু তাঁর লেখায় সেকথা পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরছেন। বটতলার সাহিত্য-র কোনও লেখাই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়,

এমনকি, উপন্যাসের কাঠামোও তাতে নেই। কখনও প্রহসন, কখনও কাব্য, কখনও সংবাদ-পরিবেশনের ঢঙে গদ্য-বটতলার রচনা এভাবেই পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ও সাহিত্যের স্বতন্ত্র ‘বাজার’⁶⁴ গড়ে তুলেছে, যার অর্থনৈতিক মূল্য নেহাৎ কম নয়। আর, এই বটতলা সাহিত্যকে ‘নন-প্রোডাক্টিভ লিটরেচার’ বলা যায়, কারণ, কোনও বড় পুঁজিপতি বা অর্থকারী বাণিজ্যসফল সংস্থার সাহায্য ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা প্রকাশিত হচ্ছে। আর, এরই সঙ্গে ‘জনপ্রিয়তা’⁶⁵ ও ‘জনতোষী’ শব্দগুলির চিহ্নক-চিহ্নিত অর্থবোধ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এই বটতলার বইয়ের বিষয়সূচী জেমস্ লং থেকে সুকুমার সেন থেকে শ্রীপাশ্ব থেকে অদ্রীশ বিশ্বাস অনেকেই করেছেন, আর, তাতে এটা পরিষ্কার হয় যে, বটতলার বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্য শুধুমাত্র যৌনতা ও আদিরস/আদিমরিপুতে (যেমনটা অভিযোগ) আটকে ছিল না। শিক্ষাবিষয়ক, ধর্মবিষয়ক, পঞ্জিকা, শিশুপাঠ্য, জ্যোতিষ, কারিগরিবিদ্যা সমস্তই ছিল বটতলার বিষয়সূচীতে।

বটতলা সাহিত্যের অধিকাংশই প্রহসনধর্মী; কিন্তু, প্রহসন মাত্রেই যে সংলাপধর্মী নাট্যরূপ আমাদের মনে আসে, বটতলার সব বই সেই আঙ্গিক অনুসরণ করেনি। বরং, প্রহসনের মধ্যে গদ্য, স্বগতকথন, সংবাদপত্রের সংবাদ, প্রচলিত খেউড়-হাফ আখড়াই-চপ-কীর্তন এই সবই স্থান ক’রে নিয়েছে। বটতলার বইয়ের বিষয়ে রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ও দ্বিধাও রয়েছে প্রবল পরিমাণে; ‘পাশ করা মাগ’-এর মতো বইও প্রকাশিত হয়েছিল, নারীশিক্ষাকে নিচুনজরে দেখা, নারী শিক্ষা পেলে ভারতীয় সনাতনত্ব ভুলে যায় ও ‘বর পেটায়’ এমন অপ্রগতিশীল ধারণার গুণগান করা পুস্তিকা আবার ভবানীচরণের পণপ্রথা বিরোধী উপন্যাসও বটতলারই অবদান। ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ বিভাগীয়-সংরূপের যে আলোচনা সন্দর্ভে করছি, তার বিচারে বটতলার কোনও বই ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-র আওতায় পড়ে না। কারণ, এগুলি মূলতঃ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা ও উপন্যাস সংরূপ তখনও অভিযোজিত হয়নি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। সুরাপানের বিরোধিতা, পুরুষের বেশ্যাসক্তি, সোনাগাজির (বটতলা ও সোনাগাজি অঙ্গঙ্গী ছিল,

এই উল্লেখ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন এঁরা প্রত্যেকেই করেছেন) বিভিন্ন ‘কেচ্ছা’, শহুরে মধ্যবিত্তের (মূলতঃ স্বচ্ছল) আর্থ-সামাজিক সংকট- এগুলোই ছিল মূলতঃ বটতলার বইয়ের বিষয়সূচী। জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ‘বটতলার বইগুলো’ প্রবন্ধে লিখছেন,

বটতলা নারীঘটিত সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে আধুনিক plot সমন্বিত কাহিনি বিন্যাস করলেও মূল লক্ষ্য ছিল তার যৌনসমস্যা। যৌনসম্পর্কের অস্বাভাবিক আলোচনার ক্ষেত্রে উপাদেয়- বইয়ের hot sale-এর ক্ষেত্রে সিঙর সাকসেস মেড ইজি। বাংলার সামাজিক সমস্যা যে বটতলার লক্ষ্য ছিল না তার প্রমাণ বটতলায় বহুবিবাহ সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ যুগে সমাজে বহুবিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল... আমরা বারবার বলছি বটতলা সমস্যাকে ভাঙিয়ে পয়সা পিটতে এসেছে- সমাজ সংস্কার তার উদ্দেশ্য ছিল না। (চট্টোপাধ্যায় ১৩৭৫, ৯৫-৯৬)

বটতলার বইয়ের লেখকেরা অবশ্য কখনও সমাজ-সংস্কারক হওয়ার দাবিও তোলেননি। বরং, ‘নিষিদ্ধ’ ও ‘গোপন মুখরোচক’ জীবনের প্রতি পাঠকের আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তবু, পণপ্রথা এবং নারীদের অসহায়তা নিয়ে সাহিত্য রচনার সাহস বটতলাই দেখিয়েছিল। এক্ষেত্রে, একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে, বটতলার বইয়ে নারীদের বিশেষতঃ ‘পতিতা’ নারীদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার যে বর্ণনা, তা রচিত হয়েছে উনিশ শতকের মূল্যবোধ থেকে; ওই মূল্যবোধ কোনওভাবেই প্রগতিশীল নয় বা বৈপ্লবিক নয়। আধুনিকতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার, গ্রাম্য সংস্কারের সঙ্গে শহুরে হুজুগের এবং বিলেতি নৈতিকতা-মূল্যবোধের সঙ্গে দেশি রীতিনীতি-মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় জারিত। তাই, ‘পাসকরা মাগ’^{৬৬}, ‘কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী’ বা ‘হুড়কো বউয়ের বিষম জ্বালা’-র মতো পশ্চাৎপদ সাহিত্যের সঙ্গে সমান্তরালে ‘কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে’ বা ‘কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে’ ইত্যাদি সামাজিক-সমস্যামূলক বইও প্রকাশিত হয়েছে। ‘কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে’ পণপ্রথার কু-দিকগুলো তুলে ধরেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক

সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহজনিত অত্যাচারে জর্জরিত ‘কন্যাদায়গ্রস্ত’ পরিবারের দুর্দশার কথাও লেখা হচ্ছে। আবার, সমসাময়িক মামলা-খুন-রহস্য নিয়ে ‘মোহান্তের এই কি দশা!!’ বা ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা নিয়ে বইও লেখা হচ্ছে। জীবানন্দের মতে, সংবাদপত্রহীন কলকাতার সমসাময়িক ঘটনাগুলোর বিবরণ পাওয়ার একমাত্র উপায় এই বটতলা সাহিত্য⁶⁷; প্রগতিশীল মনন ও আধুনিক রুচিতে তা যতই কুরুচিপূর্ণ হোক বা তৎকালীন ‘ভিক্টোরিয়ান মর্যালিটি’-তে তা যতই অঙ্গীল প্রতিপন্ন হোক, উনিশ শতকের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত রচিত বিখ্যাত প্রহসন ও নাটক কিংবা প্যারীচাঁদের উপন্যাস হতোমের নকশার ধরতাই কিন্তু এই বটতলার সাহিত্যই।

নবারণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতাডু-ধারাবাহিক ও ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’-র উৎসসূত্রও কি রয়েছে এই বটতলা সাহিত্যের ভাষা-আঙ্গিকে, উনিশ শতকের টেকচাঁদ-হতোমের রচনায়? তিন ফ্যাতাডু, যারা ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক (২০০৪)’ ধারাবাহিক গল্প সংকলনের প্রধান চরিত্র, ডিএস, মদন ও পুরন্দর, তারা পছন্দ করে এমন এক লেখকের বই, যিনি বাংলা সাহিত্য-বাজারের ‘জনতোষী’ সাহিত্যরীতির রুচি-শিক্ষা-নীতিবোধ-মার্জিতবোধের বিপরীতে লিখে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক! নবনী ধরের উপন্যাসগুলোর নাম, ‘সায়ী ঢাকা কায়া’, ‘মোগলাই হারেম’, ‘সতী ও ভীমরতি’⁶⁸। মদনের ভাষায় ‘সব সুপার হিট’ উপন্যাসগুলোর বিক্রিও প্রচুর, কমপক্ষে কুড়ি-বাইশটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পুরন্দর ভাট এই নবনী ধর সম্পর্কে জানায়,

বাঙালি মাত্রেই জানে। যারা বাঙালি নয় তারাও জানে। পাঁচশো বেয়াল্লিশটা নভেল, গল্প সাড়ে তিন হাজার, ভাগ্যিস কবিতাটা লেখেনি, লিখলে রবি ঠাকুরকেও ফুটিয়ে দিত... এরপরেই ছড়ো- গুরু করল ‘ধরাধরি’ সিরিজ... যার প্রথমটা হল ‘ধরা ও অধরা’। এরপরে ‘ধরা দাও’, ‘ধরেছ কি ধরেছি’ ও ‘ধরলে পরে’। মোটামুটি ভালোই। একটা নিয়ে তো পর্নোগ্রাফির কেস চলছে। (ভট্টাচার্য ২০০৪, ৯০-২)

নবনী ধর মদ্যাসক্ত, নবনী ধর যৌন'কেচ্ছা' নিয়ে উপন্যাস ও গল্প লেখে তবু, নবনী ধর সবথেকে জনপ্রিয়। ফ্যাতাডুরা নবনী ধরকে মদের যোগান অব্যাহত রেখে বাংলা সাহিত্যের উপকার করতে চায়, কারণ তাদের ধারণা নবনী ধরের পরে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! উনিশ শতকের তথাকথিত 'ইতর' সাহিত্য, অনুচ্চবর্ণের সাহিত্যের সঙ্গে নবনী ধরের মিল রয়ে যায় দু'টি বিষয়ে- সুরাসক্তি এবং যৌনতাউদ্‌যাপনের বই। বটতলার বইয়ের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল সমাজের সুরাসক্তি। টেকচাঁদ ঠাকুর 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' বইতে সমাজের সুরাসক্তির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বাবুদের মদ্যাসক্তির বহু উদাহরণ ও মদ ছাড়ানোর বিভিন্ন পন্থা বিস্তারে আলোচনা করেছেন। মল্লিনাথ ও মেঘমালা নবনীকে যেভাবে মদ ছাড়াতে চায়, তার সঙ্গে এর মিল আছে প্রচুর। উচ্চবর্ণীয় সমাজ একদিকে যেমন মদ্যপানের ঘরবিরোধিতা করেছে, তেমনি নিজেরা মদ্যপানকে নিজবৃত্তে একপ্রকার সংস্কৃতি করে তুলেছে। এই দ্বিচারিতার উল্লেখ টেকচাঁদ করছেন, "শুন্তে পাওয়া যায় অনেক বাবু লেখাপড়া শিখিয়া রাহে পরিবারের নিকটে না থাকিয়া কেবল মদ খাইয়া এখানে ওখানে হো ২ করিয়া বেড়ান- আবার জাঁকটুও করা আছে, আমার দেশের সকল কুরীতি শোধন করিয়াছি।" বটতলার অন্যান্য বইগুলির নাম থেকেও এই বিষয়ের সম্যক ধারণা মেলে। ফ্যাতাডু ও চোক্তাররা যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা উনিশ শতকের 'ভদ্র' সাহিত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফ্যাতাডুরা যে বই পড়ে যে সাহিত্য-উপন্যাস পছন্দ করে, উনিশ শতকের বিদ্ববৃত্ত তাকে দমিয়ে দিয়েছিল, 'ভিক্টোরিয়ান মর্যালিটি'র দোহাই পেড়ে। বইমেলায় আগুন লাগার পরে পোড়া বইমেলা থেকে মদন ও ডিএস যে বইগুলো চুরি করে, তার মধ্যে ছিল 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত', 'জ্যোতির্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা', 'রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ', 'বগলামুখীর ধ্যান' ইত্যাদি; আর, যে বইগুলো তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তাতে ছিল 'আধুনিক বাংলা কবিতা', যা শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-বাহালি পাঠকের আলমারি ভরে থাকে। উল্লেখ্য, বটতলার বইয়ের জনপ্রিয় বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল- জ্যোতিষচর্চা ও তন্ত্র। 'বৃহৎ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত' বইয়ে পাশ্চাত্যের কেতাবী জ্যোতিষচর্চাকে অস্বীকার করে, দেশীয় বিশ্বাস-

সংস্কারকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসে নবাবুণ বারবার প্রসঙ্গ তোলেন উনিশ শতক ও বিশ শতকের কলকাতার, বিভিন্ন ছড়া ও কবিতা উদ্ধৃত করেন। আর, সেই কবিতা ও সাহিত্যের অংশগুলো কোনওটাই সুপরিচিত ‘মেইনস্ট্রিম’ নয়; উনিশ শতক নিয়ে এয়াবৎ তাবৎ গবেষণার আওতায় আসেনি অধিকাংশই। নবাবুণ ইতিহাসের উল্লেখ বারবার করছেন, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই। সেইজন্যে বেগম জনসন, উনিশ শতকের অখ্যাত দাঁড়কাক, আত্মারাম সরকার ও অনামী সাহিত্যিকরা ভিড় করে এই আখ্যানে। ফিরে আসে পুরনো কলকাতার বহু সূত্রউৎস, এমনকি বোমা বানাবার কথা ও বাঙালির সাহসিকতার বিভিন্ন ইতিবৃত্ত। যে কলকাতাকে ভদ্রাবুরা শিক্ষা-নৈতিকতা-শ্রীলতার মতাদর্শ দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল এবং সহস্রাব্দের শেষ দশকে সেই ‘বানানো’ আরওই ভয়াটে-ক্ষয়াটে চেহারা নিয়েছে, সে কলকাতার বাইরে আরেকটা কলকাতা ছিল এবং আছে। নবাবুণ নিজের মতাদর্শের সাহিত্যিক প্রয়োগে পাঠককে সেই অতীত আর ইতিহাসের ভূত সম্পর্কে সচেতন রাখতে চান। নবাবুণের ‘কাঙাল মালসাট’ ভদ্রতা-সাধিত্যবোধ-শ্রীলতা-দ্বিচারিতা এই সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে বারবার। প্রতিষ্ঠানের ‘বাতিল’ ক’রে দেওয়া ঘটনা, সাহিত্য ও কুশীলবেরা অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা নিয়ে জেগে থাকে; নবাবুণ পাঠকের সঙ্গে তাদের সেতু বেঁধে দেন। উনিশ শতক থেকে অধুনা কলকাতার উচ্চবর্গের সযত্নে-বানানো সাহিত্য সম্পর্কে কথক বলে, “সবই প্রায় আলাগা ঠাসা বসন তুবড়ি যা থেকে থেকে ভাঁস ভাঁস করে এবং অচিরেই নিঃশেষিত তামাশায় পর্যবসিত হয়। কলির কলকাতায় হালফিল সাহিত্য ও বাজি বানানো মোটের ওপর একই চেহারা নিয়েছে।” (ভট্টাচার্য, ২৬৫) শহুরে নিম্নবর্গদের উদ্যাপনের যে আখ্যান নবাবুণ লিখছেন তাতে প্রতিমুহূর্তে ভদ্রবৃত্তের সঙ্গে সংঘাত চলে ফ্যাতাডুদের। তারা কিছুতেই উনিশ শতকীয় নবজাগরণ-পরবর্তী সভ্যতা-শ্রীলতায় খাপ খায় না। নবাবুণের সচেতন লেখক-মতাদর্শ খাপ খাওয়াতেও চায় না মনে হয়, কারণ উনিশ শতক থেকে ক্রমশ ভদ্র-ইতর ডিসকোর্স বা প্রতর্কে ‘ইতর’ আখ্যা দিয়ে মূলধারা থেকে বের ক’রে দিয়ে বাবুরা যে ‘ভদ্র’ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, তার বিবর্তিত রূপ আজও চলছে। আর, নবাবুণ সেই বাবুদের ও বাবুদের বিবর্তনকে দেখেন এইভাবে,

মহামতি সাহেবরা বাঙ্গালিকে মানুষ করিবার একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যাহাকে বলা যায়- ‘বেবুন থেকে বাবু’। হল না। কিছু বেবুন থেকে গেল, কিছু মধ্যপথে বেবুনবাবু ও বাবুবেবুন এবং অবশ্যস্তারী কিছু বাবু। (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৭৯)

নবাবু যে ইতিহাসকে যেভাবে দেখতে ও দেখাতে চান, তা আমাদের প্রচলিত ইতিহাসধারার থেকে আলাদা। নবাবু যে ইতিহাসের বিস্মৃতি আমাদের স্মৃতিতে ফের জাগিয়ে দি তে চান, তাতে আমাদের পরিশীলিত সাংস্কৃতিক বোধ নড়ে যায়। বটতলার সাহিত্যিকেরা, হতোম- এঁরা বাবুদের নাম নিয়ে খিল্লি করতেন, সং-রা উচ্চবর্ণের নাম ধরে ধরে মজার গান বাঁধতেন, রূপচাঁদ পক্ষী ও তাঁর গানের দল এমনকি ঠাকুর পরিবারের গোপন ‘কেচ্ছা’ প্রকাশ্যে গাইতেন। নবাবু কি সেই সাংস্কৃতিক-ইতিহাস মনে রেখেই সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি-র মতো রাজনৈতিক দলগুলোর নাম নিয়েই তাদের ‘কেচ্ছা’ আখ্যানবদ্ধ করেন? কারণ, উনিশ শতকের উচ্চবর্ণীয় বাবুরা এখন রাজনীতিতে প্রবেশপথ পেয়ে গেছে, উপনিবেশিত-পোশাক ছেড়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোয় এরাই বসেছে; এরাই এখন আর্থ-রাজনীতি ও সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রা। তাই, হতোমের আক্রমণের লক্ষ্য, টেকচাঁদের ‘বাবুরাম বাবু’-রা বদলে গেছে এদেরই আদলে। বটতলার বইতে অদ্রীশ বিশ্বাস যে কাউন্টার-ডিসকোর্স বা বিরুদ্ধ-প্রতর্ক আবিষ্কার করছেন,

উচ্চভাষাকে অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে সে নিজের ভাষার একটা কাউন্টার-ডিসকোর্স বা জগত গড়ে তোলে, যে জগতকে অন্যেরা মানে না। অশিষ্ট, কাঁচা, উচ্চরুচির নয় বলে নস্যাত্ন করে। সেই নস্যাত্নের নস্যাত্ন, যা বটতলার লেখালিখিতে বহুভাবে রয়েছে... বটতলাকে সামাজিক অধঃপতনের টেক্সট হিসাবে উচ্চবর্ণের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার, কিন্তু বটতলাই হল সেই সত্য-দর্পণ যেখানে সমাজের মুখোশ-পরা মিথ্যা ছবিটা নয়, মুখোশহীন আসল রূপটা ধরা পড়েছে। (বিশ্বাস ২০০০, ৩৩-৩৫)

এই বিরুদ্ধ-প্রতর্ক ‘কাঙাল মালসাট’-এর ভাষার ক্ষেত্রে প্রবল সত্যি। ‘ফ্যাডার বোম্বাচার’-এর মধ্যেও এই নস্যাত্ন করারই বহু উদাহরণ এবং তা প্রকাশ্য রাখাটাইন। এমনকি, ‘হারবার্ট’-এর

বন্ধুবৃত্ত, ভূত-নামানো, হারবার্টের পাঠাভ্যাস এবং যাপনভাষার ক্ষেত্রেও বিরুদ্ধ-মূল্যবোধ নির্মাণ করার চেষ্টা। ‘রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা’ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও, এই অধ্যায়ে এটুকু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, নবাবুণ বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকীয় অনুচ্চবর্গ-ইতর ভাষা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে পুনর্মযাদা দেওয়ার চেষ্টা করছেন; তবে, অবশ্যই এই ‘অপর’ ইতিহাসের পুনর্জাগরণ বটতলা-হুতোম-টেকচাঁদদের অন্ধ অনুকরণ নয় বরং তা বিশ্বায়ন-পরবর্তী ভাষা-সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি ও ভদ্রলোক

বটতলা সাহিত্যের ভাষা-আঙ্গিক-সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান ক’রে গদ্যের যে ভাষা ও পাশ্চাত্য অনুকৃত সংরূপ উঠে এসেছিল, তার দিকে তাকানো যাক। বাংলা গদ্য ও উপন্যাস গড়ে তুলতে এবং পাঁচালি-লোককথা-লোকগান ইত্যাদিকে না-মেনে নতুন সাহিত্য সংরূপ গড়ে তুলতে ইংরেজদের ও উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদের যুগপৎ প্রচেষ্টা জারি ছিল। উনিশ শতকের শুরুতে মিশনারিদের অনুবাদ, শিক্ষাপ্রসার ও তারপরে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্যের বিকাশে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছিল। অরুণ সেন ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে লিখছেন যে, “বাঙালির আত্মপরিচয় বলতে শিক্ষিত, শহুরে হিন্দুর আত্মপরিচয়। মুসলমান সম্পর্কে ও গ্রামের নিম্নবর্ণ হিন্দু সম্পর্কে অপরিসীম অজ্ঞতা ও উপেক্ষাই তাদের।”⁶⁹ এই ‘আত্মপরিচয়’ কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। এই আত্মপরিচয় তৈরি করতে বহু পরিশ্রম ও ব্যয় করতে হয়েছে উচ্চবর্গকে, ইংরেজদের। ধীরে ধীরে উৎখাত করতে হয়েছে ফারসি-আরবি ভাষা ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব। উইলিয়ম কেরি ১৮০১ সালে ‘কথোপকথন’ লেখেন, যা আধুনিক বাংলা গদ্যবিকাশের আদি ধাপ বলে স্বীকার করেছেন সকলে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে পরপর প্রকাশিত হতে থাকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘বদ্রিশ সিংহাসন (১৮০২)’, ‘হিতোপদেশ (১৮০৮)’, কেরির ‘ইতিহাসমালা (১৮১২)’। কেরি এবং মিশনারি প্রেসের

ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের রাজনীতির সূত্রপাতও সেখানেই; উপন্যাসের ইতিহাসলেখ-র যে বিবর্তন অনুসন্ধান করছি, তার উৎসও ওই সময়েই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়- এঁরা প্রত্যেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং সাহিত্যে ‘সাধু’ ভাষা ও আগ্নিকের পৃষ্ঠপোষক। কেরি তাঁর ‘কথোপকথন’ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য স্বীকার করেছেন যে, ব্যবহারিক বাংলাকে গদ্যের আকারে সাজাচ্ছেন⁷⁰। আরবি-ফারসির সঙ্গে স্থানীয় ভাষা এবং ‘অপ’ইংরাজির মিশ্রণ কথ্য ও লেখ্য দুই ভাষাকেই প্রভাবিত করছে, এটা মেনে নিয়ে কেরি ও অন্যান্য মিশনারিরা নিযুক্ত করছেন ‘টোল’-এর সংস্কৃতজ্ঞদের; স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথোপকথনের ‘ভাষা’ লিপিবদ্ধ ও মার্জিত করছেন তাঁরা, যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাক্যকাঠামোয় অনড়বিশ্বাসী। কিন্তু, কেন মিশনারীদের ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের প্রয়োজন হচ্ছে এমন ভাষা ও সাহিত্যের? কারণ, শাসিতের ওপরে দমনমূলক আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি সংস্কৃতিকে করায়ত্ত্ব করা এবং তাকে নিজেদের মাপ-ছাঁচমতো সাজিয়ে নেওয়া। একটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয় শাসকেরা দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা বা আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক ‘বিজয়রথ’ চালাবার সময়ে সর্বাত্মক আদি বাসিন্দাদের ও ভূমিপুত্রদের ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে দিয়েছিলেন। আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের সমৃদ্ধ মুখফেরতা সাহিত্য বা ওরাল-ট্র্যাডিশন নস্যাৎ ক’রে নিজেদের সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতাসমূহকে প্রত্যাখ্যান ক’রে ও সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে ‘লাতিন’ আমেরিকা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। বহুভাষাভাষী ভারতের সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডারকে ধ্বংস না ক’রে, কিছু নির্দিষ্ট ভাষাকে শাসন-সংস্কৃতিতে ব্যবহার ক’রে নিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা। উইলিয়াম জোন্স, নাথান হ্যালহেড, হোরেস উইলসনরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ‘পুনরুদ্ধার’ ক’রে সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা ও সাহিত্যচর্চার সপক্ষে সরকারি নীতি গ্রহণ করলেন। “Taking their lead from the developments in the European scientific and linguistic paradigm noted

earlier, the structure of Sanskrit through its grammatical laws, became the point of departure for Jones and his contemporaries” (Bhattacharya 2005, 196-7) সংস্কৃত ভাষাচর্চার থেকেও তার প্রতি শ্রদ্ধার আবহ তৈরিতেই আগ্রহ বেশি ছিল জোন্সের।⁷¹ জোন্সের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল রবার্ট ক্লাইভের। তাই, ১৭৮৪ সালে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’-র প্রতিষ্ঠা এবং জোন্সের একের পর এক অনুবাদ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের। শাসনক্ষমতাকে জোরদার করতে ধর্মীয় আইনের অনুবাদ করা হয়। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র পুনরুদ্ধারেই জোর দিয়েছিলেন এঁরা। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে মুসলিম শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-শত্রুতার জন্যেই কি এদেশীয় ফারসি সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে জোর দেননি তাঁরা? সেইজন্যেই কি বাংলা গদ্যনির্মাণ প্রকল্পে সংস্কৃতায়িত ভাষা-আঙ্গিক-সংস্কৃতির ওপরে এত জোর পড়েছিল? গড়ে তোলা সাহিত্যভাষা থেকে ব্রাত্য হয়েছিল ফারসি, আরবি ও দেশজ শব্দভাণ্ডার? ‘হিন্দু’ সংস্কৃতি ও নীতিবোধ সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লেগেছিল ব্রিটিশ শাসক ও মিশনারিরা? সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়সহ অনেকেই জোন্স, হোরেসদের কর্মকাণ্ডে ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক⁷² ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন এই নির্মাণের রাজনীতিতে, এবং, তা সঠিক। এঁরাই বাংলার প্রচলিত লোকসংস্কৃতিকে এবং সাহিত্যকে ‘অধঃপতিত’ ও নীতিবোধহীন হিসেবে আখ্যায়িত করে দিয়েছিলেন। কেরি তাঁর ‘ইতিহাসমালা (১৮১২)’ গ্রন্থে লিখছেন,

যে সময়ে রাজা সভাস্থ হইয়া থাকেন, সেই সময় এক বানর প্রত্যহ রাজাকে পাঁচ মাণিক্য দেয়। রাজা বানরকে পাঁচ চাবুক খুব কসিয়া মারেন। এই প্রকার কথক দিন যায়। এক দিবস পাত্রাদি সকলে কহিতে লাগিল- মহারাজ, ‘এই বানর প্রত্যহ পাঁচ মাণিক্য আপনাকে দেয়; আপনি তাহাকে প্রত্যহ মারেন- ইহার কারণ কী?’ তাহাতে রাজা বলিলেন, ‘তোমরা বুঝ নাই। ছোট লোককে মুখ দিলে সে মাথার উপর চড়ে- ইহা তোমারদিগকে প্রত্যক্ষত দেখাই।’ তাহার পরদিন সে বানর রাজাকে পাঁচ মাণিক্য দিল-

রাজা সে দিবস মারিলেন না। তাহাতে বানর যে স্থানে বসিত, সে স্থানে সেদিন না বসিয়া
রাজার কিছু নিকটস্থ হইয়া বসিল। (কেরি, ইতিহাসমালা, ১৮১২)⁷³

এই বইতে নীতিমালার গল্প, হিত উপদেশ, বিভিন্ন লোককাহিনি ইত্যাদি রয়েছে। বাঙালি জাতির
রুচিবোধ, মূল্যবোধ এতে নাকি উন্নত হওয়ার কথা। তাই, ‘ছোটলোককে মুখ দেওয়া’
ভদ্রলোকেদের উচিত নয়- এমনটাই কেরির ধারণা। ভদ্রলোকেদের সর্বদা তোয়াজ করে, ভেট
দিয়ে তাদের পায়ের নিচে থেকে গলবস্ত্র হয়ে থাকবে সমাজের ‘নিম্নবর্গ’- এমন রীতিই সমাজে
প্রতিষ্ঠিত হোক চাইছেন কেরি। শুধু কেরি নয়, ওই সময়ে বাংলার সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার লক্ষ্য
এটাই, আর, সাহিত্যকেও নির্মাণ করা হচ্ছে এই লক্ষ্যেই। ‘কথোপকথন’-এর তৃতীয় সংস্করণের
ভূমিকায় কেরি লিখছেন,

The great want of books to assist in acquiring this language, which is
current through an extent of country nearly equal to Great Britain,
and which, when properly cultivated, will be inferior to none, in
elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work
(Carey 1818, Preface, 5)

কেরি বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন, এমন ধারণা বিদ্যায়তনিক মহলে গড়ে
উঠেছে ও লালিত হয়েছে। ‘কথোপকথন’-এর ভাষারীতি ও বাক্যের অস্বয় অনেকক্ষেত্রে ইংরাজি
বাক্যনীতির অনুকরণ করেছে। তৎসত্ত্বেও তাঁকে বাংলা গদ্যভাষার ভগীরথ জ্ঞান করা হয়।⁷⁴ বহু
গবেষক কেরিসহ এই পর্বটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের মতামত এর ঠিক
বিপরীত, কারণ তাঁর মতে প্রৌঢ় বয়েসেও ‘নিখাদ বাংলা বাগ্ভঙ্গি আর বাকস্পন্দ’ কেরির
আয়ত্তে আসেনি। তাঁকে বাংলা ভাষার ‘বড় লেখক’ বলতেও যুক্তিসঙ্গত আপত্তি তুলেছেন তিনি।⁷⁵
শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যে উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যের ছলিয়া বদলানোর চেষ্টা

করছিল, তাতে যুক্ত হল মেকলের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত উপদেশ। শিশুশিক্ষার বইগুলোতে, ‘প্রাইমার’-এ অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল বাইনারি- গোপাল-রাখাল, সু-কু, উচিত-অনুচিত, শিক্ষা-অশিক্ষা। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস’ বইতে অনুসন্ধান করেছেন শাসনব্যবস্থা ও দমনমূলক আধিপত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে এই প্রাইমার ও শিশুপাঠ্যগুলির সম্পর্ক। ১৮৫৫ সাল থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন ‘বাংলা উপন্যাস’ লেখার চেষ্টা করছেন। তাঁর ‘সত্যচন্দ্রোদয় (১৮৫৫)’ ও ‘গোপালকামিনী (১৮৫৬)’ দু’টিকে শিশুপাঠ্য প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে দাবি করেছেন বহু গবেষক। যদিও, এই দু’টির কোনওটিই মৌলিক নয়, অনুবাদ-উপন্যাস। ‘গোপালকামিনী’-তে ‘চণ্ডীমঙ্গল’-র প্রভাব বড়ই প্রকট, কুশীলবদের শুধুমাত্র ‘কলকাতা’ নামক নগরীতে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, হরিনাথ মজুমদার, যিনি ‘গ্রামবার্তা’-র প্রকাশক ছিলেন, তিনি ‘বিজয় বসন্ত (১৮৫৯)’ নামক এক উপন্যাস লিখলেন। এই আখ্যানটি ‘উপন্যাস’ নাকি উপন্যাস নয়, এই বিতর্ক সরিয়ে রেখেও বলা যায় যে, তৎকালীন সময়ে যে কয়েকটি হাতেগোনা উপন্যাস-চেষ্টায় গ্রামবাংলার লোককথা, আঙ্গিক-ভাষা ব্যবহার হয়েছিল, ‘বিজয় বসন্ত’ তার অন্যতম। মূলতঃ শিশুপাঠ্য হলেও, শহরকেন্দ্রিক নবজাগরণের বিলিতিছাঁচের আধুনিকতা নয় বরং চিরায়ত আখ্যান, লোককাহিনির কথনভঙ্গি ও কাহিনির মধ্যে দিয়ে নীতিশিক্ষার চেষ্টা রয়েছে এই ‘উপন্যাস’-এ। উল্লেখ্য, এই হরিনাথ মজুমদার পরবর্তীতে ‘কাঙাল হরিনাথ’ নামে পরিচিত হন, ‘গ্রামবার্তা’ প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে ও প্রত্যক্ষদ্রোহে ইংরেজ শাসক ও দেশি জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ গড়ে উঠতে লাগল যত, তত পৃথক হয়ে যেতে লাগল নিম্নবর্গ ও মুসলমান। অলিখিতভাবে ‘বাঙালি = হিন্দু’ কিংবা ‘আমরা বাঙালি, ওরা মুসলিম’ এই প্রতর্ককে তৈরি ক’রে নেওয়া হল। এই সমীকরণ ও বিচ্ছিন্নতার যুগপৎ প্রতিষ্ঠা উনিশ শতক থেকে আজও বহমান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ বাংলার ইতিহাসের এই দু’টো গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের সাহিত্যিক-উপস্থাপনা রাখে। নায়েব, সতীশ মুক্তার, অনিল সেনদের মতো ‘বাবু’রা ‘বাঙালি=হিন্দু’ এই সমীকরণের জোরে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের ধর্মোন্মাদ ক’রে তুলতে চায় এবং দেশভাগের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, শরাফত, আজিজ, ইসমাইল, সাদেক হোসেনরা হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছিন্নতার ইতিহাসকে জ্বলন্ত বাস্তবে রূপ দিতে চায়; বঙ্গভূমিতে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা ও উচ্চপদ হিন্দুপ্রধান হয়ে ওঠায় সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ যে অবশ্যসম্ভাবী, তা এদের বয়ানে স্পষ্টতর হয়। কিন্তু, ‘খোয়াবনামা’-র সাহিত্যগুণে ইতিহাসের ‘অন্য/অপর’ বয়ানও জেগে থাকে- তমিজ, বৈকুণ্ঠ, দশরথ, কেরামতের ‘আত্মপরিচয়’ মূলধারার ওই প্রতর্কগুলোকে প্রতিরোধ করে। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’-এর এই উন্মোচনে ভবানী-মজনু চেরাগ আলিরা উপন্যাসে আধিপত্য করতে থাকে দু’শো বছরের কালস্থানিকতা জুড়ে।

উপর্যুক্ত সমীকরণ ও বিচ্ছেদের পারস্পরিক বয়ানের সঙ্গেই বঙ্গজীবনের অঙ্গঙ্গী প্রতর্ক হয়ে উঠল ‘নবজাগরণ’! নবজাগরণের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রভাব পরস্পরের পরিপূরক। ফারসি-আরবিতে ক্রমেই ব্রাত্য ক’রে দিয়ে ‘আর্টিফিশিয়াল’ সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটছে; ‘গদ্য রচনাকে উৎসাহিত করতে উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানগুলো’ পুরস্কার দিয়ে গদ্য লেখাচ্ছে। উপন্যাসের সূচনাপর্ব প্রস্তুত হচ্ছে। ১৮৬০ দশকে ‘হিন্দুমেলা’র প্রতিষ্ঠা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার ও ওয়াহাবি-আন্দোলনের অমূলক কিছু সিদ্ধান্ত দুই ধর্মের বিভেদের পথ আরও খুলে দিল। হিন্দু-বানুদের প্রতিষ্ঠার পত সুগম হলো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ‘নবজাগরিত’ বাঙালি বিদেশি সংরূপের অনুকরণে ‘উপন্যাস’-এর স্বাদ পেল। অরুণ সেন মন্তব্য করছেন, “ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির প্রশয় নেই জেনেও তিনিই [বঙ্কিমচন্দ্র] প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখলেন” (১৪-৫) কিন্তু, অরুণবাবুর এই মন্তব্যে কিছু ফাঁক থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন যে, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি যেটুকু ইংরেজি ও পাশ্চাত্য আদবকায়দা শিখেছে, তার জন্যে লোকায়ত সংস্কৃতি যথেষ্ট নয়। তাই, শিক্ষিত-হিন্দু বাঙালি শ্রেণিকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইলেন। বঙ্কিমের নিজের উপন্যাসের পাঠক হিসেবে এই শ্রেণিকে তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। ‘আনন্দমঠ’-র আলোচনায় এই পাঠক-নির্মাণের রাজনীতি আলোচনা করেছি। উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে লোকায়ত পরিসর, আবহমান গ্রামীণ

সংস্কৃতি-সাহিত্য ছেড়ে এসে নতুন সংরূপকে আত্মস্থ করার প্রবণতা বাড়ে এবং ভাষা-আঙ্গিকের বদল, গদ্যের বিকাশও এর সঙ্গেই জড়িয়ে। অম্লান দত্ত তাঁর ‘উনিশশতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা’ প্রবন্ধে এই বিষয়ে লিখছেন,

দেবদেবীর স্মৃতি ও মাহাত্ম্য কীর্তনের একটা আবরণ অন্তত রক্ষা করতে এতদিন অভ্যস্ত ছিল বাংলা সাহিত্য, তা নইলে কাব্যে মঙ্গল কোথায়, স্থায়িত্ব কোথায়? এবার সেই আবরণ পরিত্যক্ত হলও, মানুষ ও সমাজকে আপন মর্যাদায় সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে সরাসরি গ্রহণ করা হলো, বাংলা উপন্যাসের জন্ম হলো... ব্যক্তির মূল্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিকের চিত্রাঙ্কনে ও অনুভূতিতে একটা বিশেষ মূল্যলাভ করল... সাহিত্যে নবজাগরণের আর একটি সার কথা এই যে, বাংলা সাহিত্য এবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হলো। (দত্ত, ১৩৮৭, ৭২-৪)

অম্লান দত্ত উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশের কথা বলেছেন এবং পুরনো বিষয় ঝেড়ে ফেলে নতুন সভ্যতায়াপনের বিষয়কে আত্মীকরণ করার কথা। দেবেশ রায় এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসভাবনাও প্রায় একই। কিন্তু, অম্লান দত্তও কি উহ্য রাখছেন ‘ব্যক্তি’-র নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটির কথা? সাহিত্যে তথা উপন্যাসে শুধু ওই পূর্বোক্ত ‘আবরণ’টুকুই পরিত্যক্ত হল না, ব্যক্তি বলতে স্পষ্ট হল শহুরে-উচ্চবর্গীয় ‘ব্যক্তি’র রূপ। টেকচাঁদেব উপন্যাসপ্রস্তাব, হুতোমের নকশার বহু চরিত্র কিংবা বটতলার বইয়ের কুশীলবেরা- ব্যক্তি বলতে প্রাধান্য পেল ইংরেজ-নির্মিত, ব্রিটিশসংস্কৃতি-শিক্ষিত ও উচ্চবর্গীয় (মূলতঃ হিন্দু)। বঙ্কিমচন্দ্র এই নির্মাণের ভিত্তে সার-জল দিয়ে তাকে সযত্নে মহীরুহ করে তুললেন এবং এই উপন্যাসধারার জন্যে প্রয়োজনীয় পাঠকমহল গড়েপিটে নিলেন। এইসঙ্গে, একথাও মনে হয় যে, টেকচাঁদ কিংবা হুতোম বা বটতলা সাহিত্যের লেখকেরা সদ্যজায়মান নব্যধনী ও নির্মীয়মাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাপনকে সাহিত্যের অন্দরে এনে ফেললেও, হিন্দু-জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থান নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান নি। সচেতনভাবে তো নয়ই এমনি, অসাবধানেও ‘মুসলিম অন্ধকার যুগ পেরিয়ে এখন হিন্দু পুনরুত্থানের যুগ’- এই

বিভেদমূলক প্রতর্ককে জাগিয়ে তোলেন নি। তাঁরা বাবু-ভদ্রলোক-রুচিবান শ্রেণির পাতে সাহিত্যস্বাদ তুলে দিচ্ছিলেন, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তরা ক্রমেই সদ্যজাগরিত ‘বাংলা নভেল’ সংরূপের বিভিন্ন বিভাগীয় সংরূপে এনে দিলেন হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী পরিচিতি; বিষবৃক্ষের বীজ কি সেখানেই উগ্ঠ হল?

‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির জন্যে বাংলা সাহিত্যের অক্ষবদল হচ্ছে। ওই ভদ্রলোক শ্রেণির অর্থনৈতিক বদলের সঙ্গে সংস্কৃতি বদলের সম্পর্ক- অম্লান দত্ত তাঁর প্রবন্ধে সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। উনিশ শতকের ‘বাবু’ সম্প্রদায় নির্মাণের অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ, ব্যবসা এবং স্বাধীন উপার্জনের পথ ছেড়ে ব্রিটিশ অধীনস্থ উচ্চপদের চাকুরিতে আসীন হওয়া। উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণীয়া একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফায়দা তুলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে উদ্ভূত অর্থে কলকাতায় ভোগবিলাসে জীবন কাটাচ্ছিল ও ব্রিটিশ শাসকদের থেকে বিভিন্ন খেতাব-উপাধি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তাদের উত্তরসুরীরা এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাকরির নিরাপত্তাকেই বেছে নিয়েছিল এবং সেইভাবেই নিজেদের শিক্ষা-রুচি-সাহিত্যসংস্কৃতিবোধকে তৈরি ক’রে নিচ্ছিল। আইন-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-আমলা এইসব ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রস্তুত করার প্রতিযোগিতা চলছিল। অম্লান দত্ত ১৮৮৩-৮৪ সালের যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করছেন, তাতে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পাঁচ দশক পরেও বাংলাদেশের কলেজগুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যার পঁচানব্বই শতাংশ হিন্দু এবং তাদের মধ্যে পঁচাশি শতাংশ উচ্চবর্ণ হিন্দু। এই জন্যই অম্লান দত্তের বিশ্লেষণে, তৎকালীন সরকারি চাকুরিতে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর সংখ্যালঘুতা আশ্চর্য কোনও ঘটনা না।⁷⁶

নবজাগরণ সত্ত্বেও বাংলার দুরবস্থা ঘোচেনি, আর্থিক সংকট থেকেই গেছে। বাংলার কৃষক দারিদ্র্য ও অত্যাচারে পীড়িত, শিক্ষিত যুবকদের ভিতর বেকারী ব্যাপক, বাংলার অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নের গতি লাভ করেনি। (দত্ত, ১৩৮৭, ৭১-৪)

অম্লান দত্ত নবজাগরণের খুঁতগুলো স্বীকার করেও জোর দিচ্ছেন যুক্তিচিন্তা, বিজ্ঞানভাবনা, মানবতাবাদ ও ইংরেজি শিক্ষার সুফলের ওপর। কিন্তু, এখানেও প্রশ্ন থেকেই যায়। এই প্রত্যেক ক’টা ‘গুণাবলী’ কি ব্রিটিশদ্বারা আনীত ‘রেনেসাঁস’ আসার পরেই বাঙালিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে? ‘ইংরেজি শিক্ষা’ নিঃসন্দেহে ইংরেজ শাসকদের অবদান, কিন্তু, সভ্য-আধুনিক হওয়ার শর্ত ইংরেজি জানা- এই প্রতর্ক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে ঔপনিবেশিক রাজনীতি আছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও লোকাযত চর্চা, সুফী-বাউল সংস্কৃতির মরমিয়াবাদ অস্বীকার না করলে ‘ইউরোপীয় মানবতাবাদ’ প্রতিষ্ঠা পেত কি? ‘বাবু’রা ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সাহিত্যের সবচেয়ে আলোকিত অংশ ছিল এবং সেই বাবুয়ানি উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতক একুশ শতকেও সমান উজ্জ্বল। বিনয় ঘোষ ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’ গ্রন্থে পরিসংখ্যান⁷⁷ দিয়ে বিচার করেছেন ‘হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি’-র উদ্ভব। কলকাতা শহর কেন্দ্রিক সমস্ত সরকারি অফিসে ও বেসরকারি ব্যবসার নিম্নস্তরে (clerical writer) এই হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির দাপট। অম্লান দত্ত ও বিনয় ঘোষের যুক্তি এখানে মিলে যায় যে, “বাঙালি মুসলমানেরা এ সুযোগ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক কারণে গ্রহণ করেন নি... বাঙালি হিন্দুর আধিপত্য সরকারি চাকরির নিম্নস্তরেই বেশি প্রায় শতকরা ৯০ জন” (ঘোষ ১৯৬৮, ১৫৯-৬০)। মেকলে তাঁর ‘মিনিটস্’-এ যে ‘higher class of natives’ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেই ‘নেটিভ’ শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, বিত্ত ও বিদ্যার মধ্যে সেতুবন্ধনে কলকাতার বিদ্বসমাজ ও প্রতিষ্ঠিত দেশি বিত্তবান সমাজ তৈরি হচ্ছে। ওই অল্প-ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি পুরুষানুক্রমে বিদ্যা ও বৃত্তের কাছে পৌঁছতে পারছে এবং এদের সকলের মেলবন্ধনে ‘বাবু’সমাজের বিবর্তন ঘটছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই, এঁদের দ্বারা লেখা ও এঁদের নিয়ে লেখা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উপনিবেশিত হয়েও ক্ষমতামালা গোষ্ঠী নির্মাণ করছেন এঁরাই এবং সেই গোষ্ঠীই উপনিবেশিত বাঙালি সমাজের ‘দ্বিতীয় প্রভু (প্রথম ইংরেজ)’ হয়ে উঠছে শিক্ষা-রাজনীতি-সাহিত্য সবক্ষেত্রেই। বাবুয়ানির শ্লাঘা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে ফিরে এসেছে বারবার, আখ্যানের কেন্দ্র দখল করে থেকেছে,

তাদেরই জীবনযাপন-আবেগানুভূতি উপন্যাসের আখ্যানের মূল বিষয় হয়ে থেকেছে; রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখক ও পাঠক হিসেবে সিংহভাগ দখল করে রেখেছে এরাই। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)’-তে বসাই সেইজন্যেই ঘৃণা ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলে, ‘বাবু একটো জাত’! কারণ, উনিশ শতকের ‘নবজাগরিত’ এই শ্রেণির উচ্চবর্গীয় প্রতিনিধিরাই বরাবর ঠিক ক’রে দিয়েছে রাজনীতি-সংস্কৃতি; নিম্নবর্গের বিক্ষোভ, কৃষকদের দ্রোহে কিংবা সংসদীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এরাই স্বঘোষিত তাত্ত্বিক-নেতা-প্রচারক। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিচারে এই শ্রেণির উৎস ও বিকাশ জানা এই জন্যেই প্রয়োজন। কারণ, বিশ ও একুশ শতকের সচেতন রাজনৈতিক সাহিত্যেও ইতিহাসের এই সূত্রগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে নবজাগরণকে বিশ্লেষণ করার সময় অম্লানবাবু ও বিনয়বাবু এক উল্লেখযোগ্য ধরতাই দেন যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে, মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় আধুনিক হতে এগিয়ে আসার ফলে উনিশ শতকের শেষলগ্ন থেকে চাকরির প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়ল^{৭৮}। এর ফল হল এই যে, সরকারি চাকরি ও নিশ্চয়তার জীবন-বেতন ভদ্র-শিক্ষিত-হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল, সেই নিশ্চয়তা নড়বড়ে হয়ে গেল। ‘প্রাতিষ্ঠানিক’ ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার^{৭৯} যে অভ্যেস নির্মিত হয়েছিল, বিপন্ন হয়ে পড়ল তা। রাজনৈতিক উপন্যাসেও এই বিপন্নতার ছাপ পড়ল। প্রাদেশিক সরকারি চাকরিতে (জজ, কালেক্টর, আয়কর, পুলিশ, পূর্ত, সার্ভে) বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য^{৮০} ছিল। বিনয়বাবু যে কথা উল্লেখ করেন, “উনিশ শতকে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের এই পারস্পরিক সামাজিক দূরত্ব অনেকদিক থেকে বাংলাই জীবনে পরবর্তীকালে দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে” (ঘোষ, ১৮৩)। সামাজিক বিভেদ ও দূরত্বের যে বিষময় ফলের ইঙ্গিত দিচ্ছেন বিনয় ঘোষ, ‘খোয়াবনামা’-র মতো রাজনৈতিক উপন্যাস সেই বিষময়তা তুলে ধরে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না-হওয়ার, নিজেদের ‘জাতির’ কেউ ডাক্তার না-হওয়ার হতাশা শরাফত মণ্ডলের মতো জোতদারের গলায়। আবার, তারই বড়ছেলে আজিজ কলকাতায় সরকারি চাকরি

করতে পেরে সেই বিদ্যা-বিত্ত বৃত্তের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় শরাফত আনন্দিত হয়। হিন্দু ডাক্তার শিশির সেন শরাফত মণ্ডলের বাড়িতে রুগি দেখতে এলে, প্রশান্ত কম্পাউন্ডার বারবার ‘বিধর্ম’-এর দিকে ইঙ্গিত করে, ফলে, শিক্ষিত-হিন্দুর সঙ্গে কাদেরের অনতিক্রম্য ব্যবধান বাড়ে। প্রশান্ত কম্পাউন্ডারের জাতবিচার ও ধর্মীয় ছুৎমার্গে তো বটেই, কাদেরের ক্ষোভ বাড়ে ইংরাজি শিক্ষা থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজ মুখ ঘুরিয়ে আছে বলেও; পূর্বোক্ত প্রাবন্ধিকদের যুক্তি মেনেই ইলিয়াসও লেখেন,

আব্দুল কাদেরের তখন রাগ হয় বাপের ওপর, ভাইয়ের ওপর এবং খানিকটা নিজের ওপরেও বটে... ডাক্তার হতে না পারার দুঃখে আবদুল কাতর হয়ে পড়ে। নিজেদের মধ্যে ডাক্তার থাকলে এই মালাউন কম্পাউন্ডারের কাছে আজ তাকে এরকম হেনস্থা হতে হয়?... চাষের জমি বাড়াবার ফন্দি ছাড়া বুড়ার [শরাফতের] আর কোনো বুদ্ধি খোলে না।
(ইলিয়াস ১৯৯৮, ৭৮)

শিশির-ডাক্তারের হিন্দু কম্পাউন্ডার প্রশান্ত ব্রাহ্মণ, সে ছোঁয়াছুঁয়ির অজুহাতে শরাফত-কাদেব বাড়িতে জলস্পর্শ করে না। কাদেরের সঙ্গে দেশবিভাগের তর্কে পেশাগত স্লামা থেকেই উত্তর দেয়, “আলাদা হলে তোমার ভাইয়ের চিকিৎসা করবে কে?” (৭৮) এর উত্তর লুকিয়ে আছে উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক অবস্থানের যে চিত্র বিনয় ঘোষ, অল্লান দত্তরা ইঙ্গিত করেছেন, সেখানে। এবং, উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরু থেকে যাবতীয় গোঁড়ামি ও অভিমান ঝেড়ে ফেলে মুসলমান সমাজের একটি অংশ যখন ‘আধুনিক’ ইংরাজি শিক্ষা ও তত্ত্বের দিকে এগিয়ে এসে হিন্দু উচ্চবর্গকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে শুরু করে তখন থেকে অনতিক্রম্য বিভেদ আরও বাড়তে থাকে। কারণ, স্বাধীনতা মানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থান- এই প্রতর্ককেই প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে বসেন তাঁরা। আর, প্রশান্ত-শিশিরের উচ্চবর্গীয় অবজ্ঞায় আহতপ কাদেব একমুহূর্তের জন্যে যে খোয়াব দেখতে শুরু করে, তাতেও ‘সহাবস্থান’ নয় বরং আধিপত্যমূলক স্থানে উঠে আসারই বাসনা- “বাবরকে ডাক্তার করতে পারলে এই শিশির

সেনেরই পসার নষ্ট হবে... এই বেটা মালাউন কম্পাউন্ডার তার ফার্মেসিতে চাকরির জন্যে এই কাদেরের সুপারিশ চাইবে” (৭৮); ‘পসার মারা’ অর্থাৎ অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের ছাপিয়ে যাওয়া- ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে সাদেক উকিল, মাস্টাররা এই যুক্তি তুলে ধরেন আখ্যান যত এগোয়, আখ্যানের সময় যত দেশভাগের কাছাকাছি পৌঁছায়। বর্ণহিন্দুরা, প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নিম্নবর্গের উত্থানে ও আশরাফ শ্রেণির অগ্রণী ভূমিকায়। ইলিয়াস বিষ্ণু বসুকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র এই ভূমিকা উল্লেখ করছেন।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আনন্দবাজারের নাম করে খোয়াবনামা বইতে দুবার বেশ ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে। আনন্দবাজারের যেটা সমস্যা তা হলো বাঙালি জাতির যে প্রধান দুটি সম্প্রদায়- তাদের যাতে মিলন না হয় তার জন্য কাজ করে যাওয়া। (ইলিয়াস ২০১৮, ৭৭)

ইলিয়াস ‘খোয়াবনামা’য় মুকুন্দ সাহার দোকানে ‘বাসি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় হুমড়ি খেয়ে পড়া লোকজন’-র কথা লিখেছেন, ‘আনন্দবাজার’-র মুসলমানাতঙ্ক বয়ানে জেগে উঠছে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা^{৪১}। “সতীশ মুক্তারের গলাটা ঘ্যারঘ্যারে হলেও ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ জোরে জোরে পড়ে মন্তব্য করার দায়িত্বটা পালন করতে হয় তাকেই।” (ইলিয়াস, ২১৩) উল্লেখ্য, এই সতীশ মুক্তারই ‘আনন্দমঠ’-র মুসলিমবিদ্বেষী প্রতর্কে কেপ্ট পাল, যুধিষ্ঠির কামারকে প্রভাবিত করে। ইলিয়াস ‘আনন্দবাজার’কে অভিযুক্ত করছেন কারণ, ‘ভদ্র’ঘরের হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার ও ধর্ষণের বর্ণনা দৈনিক পত্রিকাটি যেভাবে অতিরঞ্জিত করেছে সেই সময়, তাতে হিন্দুদের ধর্মীয়-আত্মবোধ এবং প্রতিহিংসার ‘ন্যায্যতা’ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সংকটনির্মাণের রাজনীতি বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়েই। জয়া চ্যাটার্জি মুসলমান-অধিকারবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে ‘ভদ্র’হিন্দুদের আতঙ্কিত হয়ে পড়ার ব্যাপারে দীর্ঘ, গভীর বিশ্লেষণ রাখছেন। জয়া দেশভাগের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণে যে ভ্রান্তি চিহ্নিত করছেন, তা হচ্ছে, বহু ঐতিহাসিক মুসলমান

সম্প্রদায়কে এককভাবে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন এবং ‘উচ্চশ্রেণির’ আত্মপরিচয়সচেতন নেতাদের শাসন’লোভ’কেই দায়ী করেছেন তাঁরা। এই প্রচলিত বয়ানের উলটোপথে হেঁটে আবিষ্কার করেছেন তৎকালীন হিন্দু-উচ্চবর্গের ভূমিকা। মুসলমান সম্প্রদায়কে খুব সহজেই ‘দাঙ্গাপ্রবণ’ বলে দাগিয়ে দিলেন পূর্বজ ঐতিহাসিকেরা ও সিরাজদৌল্লাসহ অন্যান্য ইসলামিক শাসকদের ‘যবন’ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত ক’রে চরিত্রহীন-মদ্যপ-অযোগ্য প্রমাণ করে দিলেন। যদিও, জয়া তথ্যপ্রমাণাদি দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৩৭ সালে ‘অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম’ বইতে পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজদৌল্লা বিষয়ে যাবতীয় উগ্র-হিন্দুত্ববাদী প্রতর্ককে অস্বীকার করেন^{৪২}। ১৯৪০ সালে টাউনহলে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের নিয়ে সিরাজদৌল্লার প্রকৃত ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক’রে বিদেশি ও হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিকদের বিরোধিতায় সাড়াজাগানো এক সভার আয়োজন করেন সুভাষচন্দ্র; কিন্তু, হিন্দু-বনাম মুসলিম প্রতর্ক জাগিয়ে রাখতেই সুভাষকে ঐ সভা আয়োজন করতে দেওয়া হয়না। হিন্দু-ভদ্রলোকেদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উল্লেখে এরপরে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলেন জয়া,

But this type of political action was becoming more and more rare, and the ideology that inspired it was increasingly contested. In 1932, B.C. Chatterjee, in his *Betrayal of Britain and Bengal* had described Plassey as the moment when Bengal was liberated from Muslim tyranny, which ushered in a new age of 'the outflowering [sic] of the Bengali Hindu genius and culture'... Perhaps the most striking feature in Sarkar's hyperbole is its unabashed depiction of the 'Muslim period' as a Dark Age of unrelieved tyranny, borrowing themes from different European views of India. (Chatterji 2002, 183-4)

জয়া এখানেও উল্লেখ করেন সাহিত্যিক প্রতিগ্রহণের। যদুনাথ সরকার ‘পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)’-র আখ্যানকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন তাঁর ইতিহাসলেখতে এবং সেই আখ্যানই হয়ে উঠছে নব্য-ইতিহাস। অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমেশচন্দ্র দত্তদের ইতিহাসে-সাহিত্যে মুসলমান শাসনকে ‘অন্ধকার যুগ’ প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ হচ্ছে আর, এই ইতিহাসই হয়ে উঠছে বিশ শতকব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। বাংলার নবজাগরিত সংস্কৃতিকে হিন্দুদের পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম ক’রে দেখার প্রয়াস প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে, জয়া চ্যাটার্জি বাঙালির আত্মনির্মাণের রাজনীতি থেকে ‘মুসলমান’-দের বাদ দেওয়ার এই প্রয়াসের সমালোচনা করছেন^{৪৩}। ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ জয়া তাঁর গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে রাখেননি, কিন্তু ইতিহাসের সূত্রগুলো ইলিয়াস ভোলেননি। সেইজন্যই ইলিয়াসের ওই ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ সম্পর্কিত মতামত এবং উপন্যাসের বর্ণহিন্দু-উচ্চবর্ণের দেশভাগের আকাজ্জার উৎসবাস্তব বোঝা যায় জয়ার বক্তব্যের সঙ্গে মেলালে,

Bhadralok leaders saw themselves as the standard-bearers of Hindu Bengal's destiny. This was a theme that was to re-emerge powerfully in the Hindu propaganda that accompanied the agitation for the partition of Bengal in 1946-47. (Chatterji 2002, 14-5)

ওই আলোচনায় আরও কিছু বিস্তারের প্রয়োজন, সন্দর্ভের খাতিরেই। কিন্তু, এযাবৎ ‘ভদ্রলোক-বাবু’ থেকে ‘শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোক’ হয়ে ‘হিন্দু-ভদ্রলোক’ লেখক-পাঠক নির্মাণভিত্তির যে আলোচনা হল, নবাবরুণ ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবীরা ওই পরিচিতিগুলোর উচ্চাবস্থানের বিরুদ্ধ-মতাদর্শ রাখছেন তাঁদের উপন্যাসে। নবাবরুণ ফ্যাটাডু নামক যে বিশেষ কুশীলবেদের নির্মাণ করেছেন উপন্যাসে, তারা তো বাবুবিকাশের ওই ধারাকেই ঠাট্টা করে প্রতিনিয়ত, ভদ্রলোকীয় সাংস্কৃতিক স্থিতিবস্থাকেই স্পর্ধা জানায়। ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য আধুনিকতায় জারিত হয়ে শ্লীল-অশ্লীল মূল্যবোধের যে পরাকাষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে তৈরি করা হয়েছে, নবাবরুণের আঘাত তার প্রতি। আবু সৈয়দ আইয়ুব বা বুদুদেব বসুর মতো লেখক-সমালোচকও যে শ্লীল-অশ্লীল

দ্বন্দ্বের নির্ণায়ক... ফ্যাঁতাডু পুরন্দর ভাট রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কবিতা লেখে, তা প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষিত-রুচিবান-উচ্চবর্গ উদ্যোক্তারা, যারা সংস্কৃতির স্বঘোষিত (entitled) ধারক-বাহক। উনিশ শতকে ‘নবজাগরিত’ সংস্কৃতি যে উপরমহলকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল, সেই মহলের বিশ্বায়িত-উদারনৈতিক-বিবর্তিত রূপ এই উদ্যোক্তারা। যারা ‘বিগ ফান্ড মবিলাইজ’ করতে চায়, যারা ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী (অ্যাকোয়া)’ করতে চায় যেখানে উচ্চবর্গের লোক ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার নেই এবং সংস্কৃতিসহ রবীন্দ্রনাথকেও কুক্ষিগত ক’রে রাখতে চায়। ফ্যাঁতাডুদের ভাষা তাদের কাছে ‘অঙ্গলীল’, কারণ ‘রাবীন্দ্রিক’ নয়; রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে ভাষায় ও আঙ্গিকে কবিতা লেখার প্রচলন, তাকে প্রত্যাখ্যান ক’রে পুরন্দর শ্রদ্ধা জানায়, “সকলে জাঙ্গিয়া পরা, একা তুমি পরে আলখাল্লা” বলে। রবীন্দ্রনাথকে ‘প্রতিষ্ঠান’ বানিয়ে তুলে সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার ফায়দা তোলা হর্তাকর্তারা নিজেদের মাপমতো না হলেই কোনোকিছুকে ‘অতি বিকৃত মনের পরিচয়’ বলে ছাপ্পা দিয়ে দেয়; উনিশ শতকীয় ‘অপরায়ন’-এর নব্যরূপ। ‘কবি সম্মেলনে ফ্যাঁতাডু’-তে বাঙালি-সংস্কৃতির দ্যোতক কবি-সম্মেলন বিশ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও একুশ শতকের শুরুতে কেমন রূপ পেয়েছে, তার বর্ণনা থাকে কবি-সম্মেলনের উদ্যোক্তা মালতীলতার কথোপকথনে,

জীবনানন্দ না কে যেন- পোয়েট- ওফ্, সো মেনি পোয়েটস্, তার মুখ দিতে হবে।
একজ্যাঙ্কলি স্যার, হরিবল। দেখলে লোকে বলবে হয় ময়রা নয় বাজারে শাক-ফাক
বিক্খিরি করে। তখন আমি বললাম, নো, বাংলা-র ইমেজ হল সফট, সেইসঙ্গে
পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গলটাও দেখতে হবে-... না, না কী করে তুমি ভাবলে যে তোমার
হাউসকে আমি চটাব! কে নেই, বলো? হ্যাঁ, আছে। আছে। (ভট্টাচার্য ২০০৬, ৮২)

ওই অভিজাত কবি-সম্মেলন প্রতীক মাত্র। ফ্যাঁতাডুরা আক্রমণ করে সেই প্রতিষ্ঠানকে। উনিশ শতকীয় ভদ্রলোকীয় রুচিবোধে রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলাল চক্রবর্তীদের যেভাবে প্রতিষ্ঠান বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাতে সেকালে ব্রাত্য থেকে গেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতা অঙ্গলীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। সম্মেলনে কারা কবিতা পড়বে আর কারা ব্রাত্য থাকবেন, তারও

নির্ণায়ক ওই স্বঘোষিত হর্তাকর্তা বুদ্ধিজীবীরা। সমাজের উপরতলার একুশ-শতকীয় বাবুরা বিশ্বায়নী জমানার অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে নব্যধনী এবং উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রবহমানতার সূত্রেই সাংস্কৃতিক পরিসরের ‘প্রথম সারি’! বিশ্বায়নী আর্থ-সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বদল আনে, তার অন্যতম হচ্ছে, ইনভেস্টর/স্পনসর। উনিশ শতকে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় বা নব্যধনী ও ‘বনেদি’ বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে রূপান্তর ঘটছে। বিভিন্ন কবিগোষ্ঠী ও ‘হাউজ’ তৈরি হচ্ছে, যারা প্রকাশনা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। লেখককে পাঠকমহলে ‘জনপ্রিয়’ বা বহুলপঠিত করার ব্যাপারে এই সম্মেলন-হাউজ-ঘনিষ্ঠতার যোগ নিবিড়। আর, এই বিষয়ও খেয়াল রাখা দরকার যে, বিনয় ঘোষ উনিশ ও বিশ শতকের কবিদের সামাজিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করছেন ‘সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা’ প্রবন্ধাংশে⁸⁴। বিনয়বাবু এই প্রবন্ধ লিখছেন ১৯৫৫ সাল নাগাদ, সাহিত্যিকের সামাজিক অবস্থান নিয়ে খুব একটা আশাবাদী উনি ছিলেন না। কিন্তু, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন ইউরোপীয় সমাজ ও বাঙালি সমাজের প্রেক্ষিতে। সাহিত্যিকের ব্যক্তিমর্যাদার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা পৃথকভাবে দেখছেন, এমনকি পৃষ্ঠপোষকতার যুগ পেরিয়ে প্রকাশনার যুগেও সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদা বাড়েনি বলেই বিনয় ঘোষের অভিমত। কিন্তু, বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় সাহিত্যিকের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন রাখছেন, “সেই মর্যাদার স্বরূপ কী? সত্যিই কি সেটা খাঁটি সাহিত্যিক পেশা ও প্রতিভার মর্যাদা, না সাহিত্যিক ব্যবসায়ে সাফল্যের মর্যাদা?”⁸⁵ সাহিত্যিক ব্যবসায়ে ‘সাফল্য’ বিনয়বাবুর প্রবন্ধ লেখার সময় থেকে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেড়েছে। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রকাশক-লেখক-পাঠক এই ত্রিভুজের যথার্থে সাহিত্য ও ব্যবসার মেলবন্ধন ঘটায়। ২০১৮ সালে ‘বুকসেলার্স গিল্ড’ বা বইবিক্রয়কারীদের সমবায় সংস্থার হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল ১৩ দিনে। ২০১৯ সালের কলকাতা বইমেলায় ১২ দিনে মোট বই বিক্রির পরিমাণ হয় ২১.৫ কোটি টাকা⁸⁶। বাংলাদেশের একুশে বইমেলায় ২০১৮ সালে মোট বই বিক্রির পরিমাণ ৭০ কোটি ৫০ লাখ টাকা⁸⁷।

বিনয়বাবুর আমলে যতজন বাংলা সাহিত্যিক লেখাকে ‘পেশা’ হিসেবে নিয়েছিলেন, তার সংখ্যা বেড়েছে। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা ‘হাউজ’গুলোর বিনিয়োগ বেড়েছে^{৪৪}। ভারতের অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারের ফলে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগও হচ্ছে প্রকাশনার ক্ষেত্রে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের ‘বিখ্যাত’ ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসে অর্থসমাগমের আশা প্রায় রাখতেনই না। লেখাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাও অর্থনৈতিক দুরবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করতেন। প্রথম ঘোষিত বামপন্থী ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষযাত্রার যে বর্ণনা পাওয়া যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়, তাতে সামাজিক মর্যাদা দূরে থাক, ব্যক্তিমর্যাদারও বড়ই অভাব ছিল বলে মনে হয়^{৪৫}। জীবনানন্দের সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তিমর্যাদাও সুখপ্রদ ছিল না। সমসাময়িক কবি-ঔপন্যাসিকদের কাছে তো বটেই, এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাছেও ‘মর্যাদা’ আশা করেও পাননি^{৪৬}। তাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সম্মান পেয়েছেন সম-মতাদর্শের লেখক-সমালোচকের কাছে, জীবনানন্দ জীবদ্দশায় সেটুকুও পাননি। ‘মাল্যবান’ ও ‘কারুবাসনা’ উপন্যাস দু’টি জীবনানন্দকে খ্যাতি এনে দিতে পারত, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বহু পরে এই দু’টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা গোপাল হালদারের মতো ঔপন্যাসিকের ‘সামাজিক মর্যাদা’ কিংবা ‘আর্থ-সামাজিক মর্যাদা’ সুখপ্রদ ছিল না। তুলনায় ইদানীং ঔপন্যাসিকদের আয় যথেষ্ট, বিশেষত যদি তাঁরা কোনও প্রতিষ্ঠিত হাউজের নিয়মিত লেখক হন। একজন ঔপন্যাসিক/সাহিত্যিক যে-যে ভাবে তাঁর বই থেকে আয় করতে পারেন, তার মধ্যে রয়েছে গ্রন্থস্বত্ব (Royalty), অগ্রিম মূল্য, অনুবাদস্বত্ব, প্রতিনিধিত্ব-আয় ইত্যাদি। ভারতে ইংরাজি-সাহিত্যের অনেক প্রকাশনা সংস্থা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও, বাংলা প্রকাশনা-শিল্পে হাতেগোনা কিছু প্রকাশনা সংস্থাই লেখকের এই প্রাপ্য স্বীকার করে। উনিশশো ষাট-সত্তর দশক থেকে এখনও অবধি খুব কম কবি-ঔপন্যাসিকই সাহিত্যকে ‘পেশা’ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, নবারণ ভট্টাচার্য ইত্যাদি কয়েকজন। ‘খ্যাতিমান’ বা ‘মূলধারা’র বাংলা ঔপন্যাসিক ও কবিরা অনেকেই একটি নির্দিষ্ট সংবাদপত্রে ও প্রকাশনা দপ্তরে

বেতন পেতেন এবং সেই সংস্থার সঙ্গে সাহিত্যনির্মাণে চুক্তিবদ্ধ⁹¹। সাংস্কৃতিক শিল্প বা কালচার ইন্ডাস্ট্রির ‘মজুর’ হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক চুক্তিতে বাঁধা পড়েন। স্থানীয় সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের শাসককথিত বয়ানই এঁদের রচনায় থাকে। ঠিক যেমন মধ্যবিভ-শ্রেণির মূল্যবোধ-আকাঙ্ক্ষা-দোলাচল সংজ্ঞায়িত ও নির্মাণ করার দায়িত্বও নেন এই ঔপন্যাসিক সাহিত্যিকেরাই। অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সাহিত্য। জনতোষী সাহিত্য, বিনিয়োগ-উত্তোলকারী সাহিত্য ইত্যাদি মাপকাঠি তখন ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু, এরই সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মতাদর্শ-কেন্দ্রিক সাহিত্যবৃত্ত তৈরি ক’রে নিয়েছে। শাসকের মতাদর্শের সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছে, যা বহুক্ষেত্রেই তাদের ব্যবসায়িক ‘সফলতা’ এনে দিয়েছে। কোনও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ‘সাহিত্যবৃত্ত’ নির্মাণ করে নেওয়ার ইতিহাস অবশ্য নতুন নয়। বাদল বসু তাঁর স্মৃতিচারণায় ১৯৫০-৬০ দশকের বিখ্যাত দুই সাহিত্যবৃত্ত ‘হাউস অব লর্ডস’ ও ‘হাউস অব কমন্স’-এর উল্লেখ করেছেন, যা দু’টি প্রকাশনা সংস্থার লেখকবৃন্দের দৈনন্দিন আড্ডাস্থল ছিল⁹²। কোনও ঔপন্যাসিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় শুধুমাত্র সাহিত্যরচনা ও প্রকাশনা সংস্থার দৈনিক সংবাদপত্রে চাকরি ক’রে যে যথেষ্ট স্বচ্ছল যাপন করতে পারেন এবং সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করতে পারেন, বাদল বসুর বইটি থেকে সেই উদাহরণও পাওয়া যায়⁹³। খেয়াল রাখা দরকার যে, লেখার গুণমান নিয়ে এক্ষেত্রে আলোচনা করছি না, লেখকের সামাজিক মর্যাদা ও বিভাবস্থার বদল হচ্ছে কিনা, সেটুকুই বিচার্য। সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতিতে বহু কবির পৃষ্ঠপোষক হয়েছে শাসক-শ্রেণির প্রতিনিধি রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন অ্যাকাডেমি, সাহিত্য সংসদের চূড়ায় বসে থেকেছে ও আছে তারা। ‘সামাজিক মর্যাদা’-র একটা শর্ত যদি হয়, শাসকের আনুকূল্য লাভ, তবে তা সম্ভব হয়েছে কিছু কবির ক্ষেত্রে। একুশ শতকে প্রকাশনা ব্যবস্থায় সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ ইত্যাদি আসার ফলে লেখকের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থানেও কি রদবদল ঘটেনি? আন্তর্জালে, ব্লগে সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে অর্থাগমের নতুন উপায় খুলে গেছে- প্রকাশনার জন্যে ‘বৈদ্যুতিন বই’ এসেছে, সামাজিক মাধ্যম (Social media)

এসেছে, যেখানে গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রকাশিত হয়। জনতোষী লেখায় লেখক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন অনেক সময়। আর, ‘সামাজিক মর্যাদা’ সংজ্ঞায়নও বিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ, বিনয় ঘোষ যে সময় লেখকের সামাজিক অবস্থান বিচার করছেন, তার থেকে এই বিশ্বায়িত আন্তর্জাল-কেন্দ্রিক সময় অনেকটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু, উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকা মধ্যবিত্তের জীবনচর্চা, তাদেরই সংকটযাপন ঘিরে আখ্যানরচনা এবং সেই মধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছলবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়নি। নিম্নবর্ণের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েই গেছে, বাস্তবতা থেকে দূরত্ব বেড়েছে এবং ‘নিরাজনীতিকরণ’-এর জনতোষী মতাদর্শ সাহিত্যের প্রাণ হয়ে উঠেছে। অনাবাসী ভারতীয় কবি সাহিত্যিকেরা সম্মেলনের ‘আভরণ’ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, এতে স্পনসর বাড়ে, সম্মেলনের ‘সামাজিক মর্যাদা’ বাড়ে এবং শাসনের স্থিতিবস্থা বিপন্ন হয় না। নবাবরণ সাম্প্রতিক সাহিত্যসমাজের অবস্থানকেই কি আক্রমণ করতে চান?

বিশিষ্ট এন আর আই কবিরা ডায়াস আলো করে বসে আছে। এন আর আই-দের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে কারণ তারা বং কবিদের মতো ধুতি-পাঞ্জাবি পরেনি, হয় সুট নয় স্যাভো শার্ট ও বারমুডা। জেট-ল্যাগ ও লং ডিস্টেন্স ফ্লাইটে কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি, গরু, হরিণ, শুয়োর, ভেড়া, কচি বাঁদর ও খরগোশ ইত্যাদি খাওয়ার ফলে নানারকম হাস্যোদ্ভেদককারী শব্দ হচ্ছে... (ভট্টাচার্য ২০০৬, ৮৬)

চর্যাপদের কবিদের নাম শুনে ফ্যাতাডুরা বলে, “যে রেটে পাদাপাদি চলছে, এই হল টাইম। মারো ডাইভ” (৮৭)। বহু টাকা ব্যায়ে আয়োজিত সেই এলিট কবি-সম্মেলন পণ্ড ক’রে দেয় ফ্যাতাডুরা, সভামধ্যে আরশোলা ছেড়ে দিয়ে। ‘ভদ্রলোক’-রা বিপন্ন হয়, তাদের সাংস্কৃতিক উচ্চাবস্থান হকচকিয়ে যায়- আর, সেটাই ফ্যাতাডুদের উদ্দেশ্য- এক বিরুদ্ধ-সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া। সংস্কৃতি বলে যাকে তৈরি করা হয়েছে, তার সঙ্গে বৃহত্তর জনগণের কোনও সম্পর্কই নেই। ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাস থেকে ফ্যাতাডুদের সঙ্গে জোট বেঁধে চোক্তারদের জেগে ওঠা শুরু বাংলা সাহিত্যে। এই জেগে ওঠারও ইতিহাস আছে, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে। উত্তর-

ঔপনিবেশিক সময়ে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী পরিবর্তিত আদলে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলেছে সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়। অন্য অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি।

উনিশ শতকের হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির সাহিত্য-রাজনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মসৃণ সম্পর্ককে সাহিত্যে নিয়ে আসা। যদিও, এই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে লেখা উপন্যাসগুলো 'সামাজিক উপন্যাস' বর্গের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু, নির্মাণের রাজনীতি তো অস্বীকার করা যায় না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যিনি উনিশ শতকীয় ইয়ং-বেঙ্গল আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন, প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তিনি 'বাল্যবিবাহ', 'সতীর ধর্ম', 'বৈধব্যব্রত' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখেন।⁹⁴ 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলি রক্ষণশীল পশ্চাদপদশীল তো বটেই, উপরন্তু স্থূলভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির পার্থক্য নিরূপণ করে। স্ত্রীপুরুষের একত্র সমাবেশ, পানভোজনে 'স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কিছু অকোমল কিছু দিব্যভাববর্জিত এবং পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে' এই তাঁর মত! বাল্যবিবাহকে সমর্থন, নারীর গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া, প্রকারান্তরে নারীমুক্তির বিরোধিতা প্রবন্ধগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। ভূদেবের মতো সমাজের অগ্রগণ্য, নবজাগরণের আলোকবর্তিকাবাহক ও ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার কাছ-ঘেঁষে-থাকা প্রাবন্ধিকের এই মতামত থেকে অনুমেয় যে, ঔপন্যাসিকরা জনতোষী আখ্যানে এই নীতিবাক্য-মূল্যবোধকেই প্রাধান্য দেবেন। ভূদেব 'জাতিভেদ প্রথা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতেও জাতিভেদ প্রথাকে সর্বান্তকরণে সমর্থনই জানিয়েছেন, এই জাতিভেদ প্রথার গুণেই বিজিত 'হিন্দু জাতি' পুনরায় গৌরব অর্জন করতে পারবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। উনিশ শতকের অন্ত্যপর্বে 'মেক হিন্দুজ গ্রেট এগেইন' বা হিন্দুদের হতগৌরব পুনরুদ্ধারের যে প্রতর্ক, তাতে ভূদেবের এই প্রবন্ধ জুড়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই। তার ওপরে, 'ভাল হিন্দু, ভাল মুসলমান' ধারণাও এসময়ে শিক্ষিত সমাজে বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ভূদেব 'দেশীয়' সংস্কার-আচারের সঙ্গে এই ধারণাকে জয়যুক্ত করেও একটি

বাক্যে লিখছেন, “আর কোন কোন ইংরাজ হাকিমরাও যেন হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়।”⁹⁵ বস্তুত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ‘মুসলমান’ শব্দের ব্যবহারও শুরু হচ্ছে উনিশ শতকের নবজাগরণ-নীতির সমান্তরালে। ভূদেব যে ইঙ্গিত দিতে চাইছেন ইংরেজ কর্তৃক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের, তার পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে ১৯০৫ সাল থেকে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে ‘মুসলমান’ শব্দপ্রয়োগের সময়কাল মাপছেন,

আট থেকে সতেরো শতকের, তথাকথিত মধ্যযুগের, রাজকীয় বিভিন্ন লেখ-পুঁথিতে ‘মুসলমান’ শব্দটিরই তেমন চল নেই- ‘তাজিকা’, ‘পারসিকা’, ‘তুরস্ক’, ‘যবন’ ইত্যাকার বিকল্প-পদের এত বোলবোলা যে জমাট-বাঁধা একক কোনো পারিভাষিক আখ্যা তখনও প্রাপ্ত হয়নি ইসলাম-সমর্থকরা। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, ১৫৮)

সম্ভবতঃ নবজাগরণের সময়পর্ব থেকেই যখন ব্রিটিশ-আধুনিকতার পরিমাপে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ‘প্রাচীন’, ‘মধ্য’ ও ‘আধুনিক’- এই তিনভাগে ভাগতে শেখানো হচ্ছে, তখন থেকেই ভারতবর্ষে ইসলামিক শাসনপর্বকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। আধুনিকতার এই বাচন বা প্রতর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ‘মুসলমান দ্বারা হিন্দুদের অত্যাচার’ ও ‘হিন্দু বনাম মুসলমান’ এই হিন্দামূলক বিরোধভাসে। ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জাতীয়তাবাদ। হিন্দু সমাজের লোকাচার-কুসংস্কার-হিংসাশ্রয়ীতা আড়াল ক’রে বর্ণপ্রথা-জাতিভেদ-পুরুষতান্ত্রিকতা-পরধর্মদ্বেষ্ট হয়ে উঠছে প্রধান বিবেচ্য। আক্রমণলক্ষ্যের বর্শামুখ ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যত না ধাবিত হচ্ছে, তার থেকে বেশি ধাবিত হচ্ছে ইসলাম-বিরোধিতায়, অন্তত প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকদের লেখায়। এই সময়েই শিক্ষিত-হিন্দু-ভদ্রলোক শ্রেণির প্রবন্ধরচনার জনপ্রিয় বিষয় ছিল ধর্মনীতি⁹⁶। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়- হিন্দু ধর্মের পূর্বগৌরব ও অধুনা দুরবস্থার মধ্যে তুলনায় ওই জাতীয়তাবাদ পুনরুত্থানেই জোর দিচ্ছেন বারংবার। প্রমথনাথ বিশীর পর্যবেক্ষণে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের

‘পুষ্পাঞ্জলী (১৮৭৬)’-তে যেরকম দেবরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে, তারই পুনঃপ্রকাশ ঘটছে ‘আনন্দমঠ (১৮৮২)’-এর মাতৃমূর্তি দর্শনে।^{৭৭} “তবে প্রভেদের মধ্যে পুষ্পাঞ্জলীতে হিন্দু ধর্মের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে হিন্দু জাতীয়তার উপরে।” (বিশী ১৩৬৭ সাল, ভূমিকা)। এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু ইংরেজি-আধুনিকতায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় যুক্তিতর্ক-প্রজ্ঞাবাদের বিষয়ে অবহিত এবং ব্রিটিশশাসনের সুফল সম্পর্কে পাঠকসমাজকে সচেতন রেখেছেন বিভিন্ন সময়ে। ‘দুস্ত্রাপ্য বাংলা সাহিত্য’ বইয়ের ভূমিকায় অর্ণব সাহা ইঙ্গিত করছেন উনিশ শতকের সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী নবজাগরণের,

অন্ত্য উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী বিকশিত হতে শুরু করলে ‘আধুনিকতার’ এই দেশীয় নিজস্বতার পরিসরের খোঁজ শুরু হয়, ঘটতে থাকে ‘আধুনিক জ্ঞানচর্চার জাতীয়করণ’, যেখানে ডিসকোর্সের চরিত্র দাঁড়াতে ‘আধুনিক, অথচ জাতীয়’। অন্ত্য উনিশ শতকের এ হল ‘জাতীয়তাবাদী আধিপত্যমূলক বাচন’ যা হিন্দুত্ব, জাতি, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সব মিলিয়ে এক নিজস্ব ‘বিশ্ববীক্ষা’র জন্ম দিয়েছিল (সাহা ২০০০, ১০-১১)

কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দেবগণের অভিনব ভারত-দর্শন (১৩২০)’ গ্রন্থে হিন্দুদের সমকালীন দুরবস্থার বর্ণনা, যদিও এই গ্রন্থ রম্যরচনার ঢঙে লিখিত, উপন্যাস-আঙ্গিকে নয়। আখ্যানের শুরুতে নারায়ণসহ গণেশ ও নারদ ছদ্মবেশে বাংলার পল্লীসমাজ পরিদর্শনে যায় এবং জমিদার-কর্তৃক অপমানিত হয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়! আখ্যানে সৎ-ভদ্র-উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দুরবস্থার কাহিনিই মুখ্য। এর শেষাংশে দেবতা নারায়ণ ছদ্মবেশে শহরের কসাইখানা দেখতে আসছেন, যে কসাইখানায় গোবধ হয়!

গোবধ আর মাতৃবধ আকই কথা... গোজাতির অভাবে ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে কর্ষিত হয় না এবং ভারতসন্তানগণও উদর-পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ-পান করিতে পায় না; কাজেই দুর্ভিক্ষ এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য সর্বত্র বিরাজমান। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০, ৩৬১)

‘আনন্দমঠ’ ততদিনে প্রকাশিত, প্রথম বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রতর্ক তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু, সরাসরি গোবধের ‘পাপ’ উল্লেখ করা কিংবা হিন্দুত্বের সঙ্গে গোরুকে এক ক’রে দিতে পারেননি। উনিশ শতকের শেষে লেখা এই গ্রন্থের সামাজিক ছবি আজ দেশের রাজনৈতিক প্রতর্ক হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত আধুনিক সমাজের অগ্রগণ্য অংশ হিসেবে কেদারেশ্বর কুলীনদের বহুবিবাহের নিন্দা করছেন, নারীদের দুর্গতিতে আহত হচ্ছেন এবং অশিক্ষার সমালোচনা করছেন, কিন্তু বঙ্কাল সেন দ্বারা সৃষ্ট কৌলীন্য-প্রথার বিরোধিতা করছেন না^{৯৪}।

ছদ্মবেশী দেবতারা মর্ত্যের শেষ যে-স্থানে যাচ্ছেন, তা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, হিন্দু জাতীয়তাবাদ পুনরুত্থানের অন্যতম প্রতীকভূমি। কেদারেশ্বরের এই সাহিত্য-রাজনীতি ভূদেব বা বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই। যদিও, ‘ধর্মতত্ত্ব-প্রচার’ অংশে বহু সদুপদেশের মধ্যে ভারতের চিরাচরিত ‘বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’ প্রতর্ককেও স্বীকার করে নেওয়া আছে, যেখানে ‘আপন-আপন ধর্ম’ পালনের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা আছে, ভারতের ‘সনাতন হিন্দু ধর্ম’-এর কথা স্বীকার করেও। এই ‘অভিনব-ভারত-দর্শন’-এর সঙ্গে তুলনীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস’। হিন্দুগৌরব পুনরুজ্জীবনের প্রবল জাতীয়তাবাদী বাসনা তো এই আখ্যানে আছেই, উপরন্তু রয়েছে ‘অপরায়ন’-এর রাজনীতি! স্বপ্নলব্ধ আখ্যানে ভূদেব এক নতুন আঙ্গিকের অবতারণা করছেন, রুশ পর্যটক, ইংলণ্ডীয় পর্যটক, আমেরিকান মিশনারিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের ‘স্বরূপ’ দেখাতে চাইছেন; যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি যে লেখকেরই স্বর, তা বোঝা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে। ‘প্রকৃত ভারতবর্ষীয়’দের থেকে বিচ্ছিন্ন ‘ইতর’ ক’রে দেগে দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের, ব্রাহ্মণত্বের সদৃশ্যে ‘প্রকৃত ভারতবর্ষীয়’রা তাদের ‘সভ্য’ করতে চায় এমন ইতিহাসের অবতারণা করা হয়েছে,

ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে যে সকল অসভ্য বনজাতীয় লোক থাকে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, ত্যাগী এবং নম্র স্বভাব করিয়া তুলিতেছে... সেই প্রদেশে প্রকৃত ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অপর কতকগুলি বন্য জাতীয়

লোক বাস করে, তাহাদিগের নাম মিকি, আবর, গারো, নাগা, মিস্মি প্রভৃতি। আমি ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখি, ঐ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া আছেন, এবং নিরন্তর অকৃত্রিম ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রীতিভাজন হইতেছেন। (মুখোপাধ্যায় ১৩০২, ৫৮-৯)

আখ্যান শুরু হয় তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে মারাঠা রাজসভার বর্ণনায়। সমাজচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চিত্রও বিস্তারে গদ্যায়িত করেছেন ভূদেব। বাংলা ভাষার ‘উপন্যাসের গদ্য’ ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভূদেব সেই গদ্যের অন্যতম প্রাঞ্জল সাহিত্যিক। ভারতের বাণিজ্য-উৎসব-সংস্কৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন ভূদেব^{৭৭}। কিন্তু, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অপরায়ন। প্রকৃত ভারতবর্ষীয় হওয়ার ‘যোগ্যতা’ মাপে কী কী গুণাবলী দরকার, তা ঠিক ক’রে দিচ্ছেন ভূদেব। সামাজিক উপন্যাসের স্বপ্ন-আখ্যানের আঙ্গিকে ভূদেব যে সূত্র দিয়ে যাচ্ছেন, বিশ শতকের শেষে সেই সূত্রায়নের বিপরীতে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়কাঠামো নির্মাণ হচ্ছে। দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, নবারুণ ভট্টাচার্যেরা এই ‘অপরায়ন’কে সাহিত্যিক হাতিয়ার করে তুলছেন রাজনৈতিক উপন্যাসে। আর, বাঘারু, কেলু বা চ্যারকেটুরা ভূদেবকথিত ওই ‘অসভ্য’দের মধ্যে পড়ে, যারা কিছুতেই ‘ব্রাহ্মণ্যবাদী’ ‘প্রকৃত ভারতবর্ষীয়’ হয়ে উঠতে পারেনি শিক্ষিত-ভদ্রলোক-হিন্দুদের চোখে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ বা ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-র মতো রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হয়েছে ভূদেবকথিত ওই ‘অসভ্য’, ‘বন্যজাতীয়’ চরিত্রদের নিয়েই। দীর্ঘদিন এঁদের ‘অ-প্রকৃত ভারতবর্ষীয়’ বলে ঠেলে রাখা হয়েছে কেন্দ্রের বাইরে, বাংলা উপন্যাসের ‘ওরা’ করে দেওয়া হয়েছে এঁদের। ইতিহাসের সেই নির্মাণপ্রক্রিয়া না জানলে পরবর্তী বিনির্মাণ-রাজনীতিও বোঝা যায়না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, ‘অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৮)’ নামে, যা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবুবিলাস (১৮৫৫)’-র পরে দ্বিতীয় সফল উপন্যাসচেষ্টা। এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্রও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ লেখেন এরই আদলে, এমন অভিমতও

রয়েছে। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশের বিজ্ঞাপনে ভূদেব স্পষ্টতই জানান যে, “গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয় ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য... উভয় উপন্যাসেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক...”¹⁰⁰ উল্লেখ্য, প্রকৃত ইতিহাস, প্রকৃত ভারতবর্ষীয় শব্দগুলো; ভূদেব ‘প্রকৃত’ শব্দে জোর দিচ্ছেন। কোনটা প্রকৃত আর কোনটা অপ্রকৃত, পাঠককে তা বিশ্বাস করানোর কর্তৃত্ব (Authority) নিয়ে রাখছেন ভূদেব ও তাঁর সম-সামাজিকবর্গের লেখকেরা। আত্ম-অপরের আদলে বাঙালির ‘আত্ম’নির্মাণের বৌদ্ধিক দায়িত্ব এঁদেরই হাতে। ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’-এর কাহিনি আওরঙ্গজেব আর শিবাজীর দ্বন্দ্ব নিয়ে, তার সমান্তরালে শিবাজীর সঙ্গে আওরঙ্গজেব-দুহিতা রোশেনারার অনুরাগ। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস শুরুর লগ্ন থেকেই ইউরোপী নভেল-আঙ্গিক অনুসরণ করেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’-এর কিয়দংশ ‘রোমান্স অফ হিস্টরি’ নামক ‘পুস্তক হইতে সংগৃহীত’ তা স্বীকার করেন।¹⁰¹ কিন্তু, উপন্যাসগুলির মূল বিষয়ে এসেছে মুসলমান রাজার সঙ্গে মারাঠা বা রাজপুত রাজার দ্বন্দ্ব। ‘মুসলমান বনাম হিন্দু’ প্রতর্ক এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে দিয়েই কালে কালে রাজনৈতিক প্রতর্কের অবয়ব পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই মডেলই অনুসরণ করে। ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’-এ আখ্যানের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে নারী অপহরণকে প্রতিষ্ঠা দেন লেখক, হিন্দুরাজা-র স্বার্থেই কি?

সত্য বটে, যখন শিবজী আরঞ্জের কন্যাকে উপত্যকার মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। (মুখোপাধ্যায় ১৩৬৭ সাল, ২৮০)

ভূদেব ১৮৫৭ সালে, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আগেই উপন্যাসে ‘মুসলমান’ শব্দ ব্যবহার করছেন উপন্যাসে, “মুসলমান জাতীয়েরা স্বভাবতই অজ্ঞ” এই বাক্যের ব্যবহারে কিংবা মোগল সৈন্যের

মুখ দিয়ে হিন্দু মারাঠা সেনানীকে “তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস” (২৯১) বলিয়ে নিতে পারলে জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রাক্কালে ‘আত্ম’ পরিচয়জ্ঞাপনে সুবিধে হয়। প্রকৃত ইতিহাসের নাম ক’রে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের ধর্মান্তরণ ও গোমাংস খাওয়াবার অপরাধের উল্লেখও করছেন লেখক, তাও আবার শিবাজীর বয়ানে।¹⁰² প্রায় দেড় শতক পরে ভারতের রাজনীতির প্রতর্ক আবর্তিত হবে এই সাহিত্যিক বাচনের সূত্রতেই। এই আখ্যানে শিবাজী জয়সিংহের সামনে যে আবেদন রাখে, নিঃসন্দেহে তা জাতীয়তাবাদী হিন্দু-পুনরুত্থানের বাচনকে প্রতিষ্ঠা দেয়। আওরঙ্গজেবের রাজপুত সেনাপতি জয়সিংহের সঙ্গে শিবাজীর কাল্পনিক বচনে ভবিষ্যৎ বাংলা উপন্যাসের হিন্দুপ্রাধান্যও কি প্রতিষ্ঠিত হয় না? এই উপন্যাসে জয়সিংহকে শিবাজী বলছেন,

ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজাদিগের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না... আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোনো বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন!... তিনি আমার কোনো অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন, তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে... (মুখোপাধ্যায়, ১৩৬৭, ৩০২-৩০৪)

রোসেনারা ‘হিন্দুবীর’ শিবাজীর জাতি ও দেশরক্ষার সঙ্কল্পে মুগ্ধ হয়ে শুধু অঙ্গুরীয় বিনিময় করে তাঁর সঙ্গে, কিন্তু কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হন না। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) উপন্যাসেও ইতিহাসের সমান্তরালে জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষার রোমাঞ্চ; আর, আয়েষার পরিণতি এবং রোসেনারার পরিণতির মধ্যে মিলও যথেষ্ট। প্রমথনাথ বিশীর মতে, সমালোচকরা স্কটের উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মিল খুঁজতে তৎপর হলেও, ভূদেবচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্কিমের উপন্যাসের সাদৃশ্য অধিক।¹⁰³ সর্বোপরি ইসলামিক শাসক মাদ্রেই হিন্দুর শত্রু এবং হিন্দুত্ব পুনঃস্থাপন প্রয়োজন- এই বাচন দু’টো উপন্যাসেই রয়েছে। হিন্দুত্ব পুনঃস্থাপনের যে জিগির ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতের জাগরণশীল (emergent) রাজনীতি

ছিল, তা আপাততঃ আধিপত্যমূলক (dominant) হয়ে উঠেছে। এই রাজনীতির অন্তর্ভুক্তি
উনিশ শতকের জনপ্রিয় সাহিত্য-বয়ানের অনুসরণ করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আধিপত্যমূলক স্থানে অবস্থান করছেন হিন্দু-বাবু-শিক্ষিত
ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকেরা। তাঁরা একদিকে যেমন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে লিখছেন,
তেমনই পুরনো সমাজের অবশেষ (residual) উপাদানগুলো থাকছে তাঁদের লেখায়। পাশ্চাত্য
তত্ত্বে শিক্ষিত নবজাগরণের ছাঁচ তাঁদের সাহিত্যের ভাষা-আঙ্গিকে থাকছে আবার জাগরণশীল
(emergent) বৈশিষ্ট্য হিসেবে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও থাকছে। উনিশ শতকে মানবতাবাদ ও
যুক্তিবাদের উপাত্ত (premise) প্রসারিত হচ্ছে, তার অনুশীলন চলছে সামাজিক স্তরে- সমাজ-
সংস্কারমূলক কাজের প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যে পড়ছে; বিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক
উপন্যাসের বিষয়বস্তুকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। বাঙালির ‘আত্ম’পরিচয় হিন্দু-
আধিপত্যবাদে মোড় নেওয়ার সময় ‘মুসলমান লেখক-সমাজ’ কী ভূমিকা নিচ্ছে? সুমন্ত
বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান লেখক নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ রাখছেন। মীর
মোশারফ হোসেনের ‘রত্নাবলী (১৮৬৯)’ ও ‘গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু (১৮৭৩)’-কে ঢালাও
প্রশংসা করছে ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ ও ‘বঙ্গদর্শন’-এর মতো প্রথম সারির পত্রিকা, কারণ এই
লেখাগুলোতে অ-শুদ্ধ অ-সংস্কৃত উপাদান প্রায় ছিল না¹⁰⁴। অথচ, মির্জা মহম্মদ ইউসুফ আলী-র
‘দুগ্ধ-সরোবর (১৮৯১)’ গ্রন্থটি যুক্তিবাদী উদারতার সাহিত্যিক প্রকাশেও বৃহত্তর বাঙালি
পাঠকসমাজের প্রীতিভাজন হতে পারেনি অ-সংস্কৃত ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির আধিক্যের জন্যে।
অর্থাৎ, ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র-প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নদের বহু চেষ্টায় যে ‘পাঠকসমাজ নির্মাণ’-এর প্রচেষ্টা
চলছে, তাতে পাঠকের ‘রুচি’ তৈরি করে দিতে সমসাময়িক পত্রিকাগুলোও যথেষ্ট ভূমিকা
রাখছে। আর, এই পাঠকসমাজই বিবর্তিত হচ্ছে বিশ ও একুশ শতকে; তাঁদের পাঠ-প্রত্যাশা পূর্ণ
করেই সাহিত্যের মূলধারা ও বিরুদ্ধ-ধারা তৈরি হচ্ছে। রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ‘পাঠ্য
(text)’-এর বিচার হচ্ছে এই ইতিহাসের ধারাতে। পাঠক-ঔপন্যাসিক পারস্পরিক খুঁটির এই

সময়কাল শুধু যে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে, তাই নয়, ইংরেজি উপন্যাস ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিনয় ঘোষের ‘জনসভায় সাহিত্য’ গ্রন্থে উপন্যাসের যুগ বিষয়ে লিখেছেন,

নতুন যুগের এই নতুন মাধ্যম ও আঙ্গিকের জন্য যেন পাঠকেরাও উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তাঁরা কাব্যের মূল্য না বুঝলেও, উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানব-চরিত্রের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ, সমাজ-জীবনের যে বৃহত্তর পরিচয় তারা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন, একমাত্র উপন্যাসেই তা সম্ভব হল... যুগের তাগিদেই উপন্যাসের চাহিদা বাড়ল। (ঘোষ ১৩৬২, ১১৪)

কিন্তু, একটা ব্যাপারে দ্বিমত থেকে যায় যে, বিনয় ঘোষ বলেছেন ইউরোপীয় সমাজে ‘কাব্যের বাজার মন্দা’ হওয়ার সঙ্গে উপন্যাসের বাজার বৃদ্ধির ব্যাস্তানুপাতী সম্পর্ক। বাংলা সাহিত্যের বাজারে কাব্য ও উপন্যাসের এরকম ব্যাস্তানুপাতী সম্পর্ক ছিল না। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-র সমসময়ে মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)’ প্রকাশিত হচ্ছে। ওদিকে ইউরোপে তখনই বোদলেয়ারের ‘ফ্লোর দ্য মাল (১৮৫৭)’ ও ‘প্যারিস স্প্লীন (১৮৬৯)’ প্রকাশিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী উপন্যাসের সূচনার যুগে নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)’¹⁰⁵ কাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনীর উপাখ্যান’ প্রকাশিত হচ্ছে, যা হিন্দু-জাতীয়তাবাদ পুনরুত্থানের মতাদর্শবাহী। এরপরে বাংলা উপন্যাসের বিকাশের সময়েই বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বাংলা কাব্যধারার উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলছে ও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তৎকালীন ইউরোপীয় কাব্যে নতুনত্ব ও বাঁকবদলের ইঙ্গিত আসছে, যখন আধুনিক বুর্জোয়াসমাজের ঢেকে রাখা খারাপ বিষয়গুলো কবিতায় উপস্থাপিত হচ্ছে। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রোমান্সধর্মী- এই তিন সংরূপ-বিভাগের উপন্যাস রচনা হতে লাগল।

‘রহু চণ্ডালের হাড়’, ‘অরণ্যের অধিকার’ এবং অপরাধের রাজনীতি

উনিশ শতকের নবজাগরণ নিয়ে যত বিতর্ক ও প্রতর্ক তৈরি হয়েছে, সে তুলনায় স্বল্পালোচিত থেকে গেছে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ বা ১৮২০ সালের কোল-মুণ্ডা বিদ্রোহ। ভদ্রলোকীয় ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক পরিসরে যদিও বা আলোচনায় এসেছে, কিন্তু সাহিত্য পরিসরে তো তার ঠাঁই হয়নি। ভদ্রলোকীয়-শিক্ষিত-রুচিবান ‘আত্ম’কে পেরিয়ে ‘অপর’ কেন্দ্রে আসতে পারেনি। বাঙালির আত্মপরিচয় কলকাতা-কেন্দ্রিক, ইংরাজি শিক্ষা-কেন্দ্রিক, হিন্দু ভদ্রলোক-কেন্দ্রিক ও ‘অপর’-বিরোধী হয়ে বিকশিত হয়েছে, যা অনিবার্যভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থানের দিকে এগিয়ে যায়। সাঁওতালদের, আদিবাসীদের ওই পুনরুত্থানের বাইরের জগৎ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে বরাবর। অথচ, সাঁওতাল বিদ্রোহ-র মতো প্রবল রাজনৈতিক দ্রোহ ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ-শাসনভিতে প্রথম সংগঠিত আঘাত, দেশি জমিদার-জোতদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শুরু হয়ে সংগঠিত বিদ্রোহে রূপ পেয়েছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে যে সময় ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)’ প্রকাশ পাচ্ছে, নির্বিক্তের দ্রোহকে তত্ত্বায়িত করা হচ্ছে, সেই সময়েই ভারতের মাটিতে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হচ্ছে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভারতবর্ষের প্রথম বিদ্রোহমূলক গণপদযাত্রা¹⁰⁶ অনুষ্ঠিত হয় প্রায় চল্লিশ হাজার সাঁওতাল কলকাতায় ব্রিটিশ সদর দপ্তর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁদের যাত্রাপথে স্থানীয় জমিদার ও মহাজনেদের বাধায় গণমিছিল ক্রমে দ্রোহের রূপ নেয়। প্যারিস শহরে বিদ্রোহীরা শাসনক্ষমতা দখল করছে আড়াই মাসের জন্যে, ১৮৭১ সালে, তার প্রায় ১৬ বছর আগে সাঁওতাল পরগণার বিস্তৃত অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ২ বছরব্যাপী দখলে রাখছে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা সিধো, কানহো, চাঁদ, ভৈরবের নেতৃত্বে। সাঁওতাল-রাজ সূচনার উল্লেখ ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে লিখছেন,

হল আরম্ভ হল। চারদিকে শালগাছের ডাল পাঠাও, দারোগা নেই, হাকিম নেই, সরকার নেই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে। জনতা চিৎকার করে উঠলঃ “হল! হল!

দারোগা নেই, পেয়াদা নেই, অত্যাচারী মহাজন নেই। সাঁওতালদের রাজা সিদু-কানু। জয় সিদু-কানুর জয়।” (বাক্সে ১৯৬০, ৬২)

পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও আধুনিক সমরাস্ত্রকে উপেক্ষা করেই নিজস্ব সমরকৌশল দিয়ে ব্রিটিশবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন তাঁরা। আসলে, শাসকের বিরুদ্ধে, শোষণকাঠামোর বিরুদ্ধে, শ্রেণি-বর্ণ-জাতিগত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি রয়েছে তত্ত্ব-সময়-স্থান ব্যতিরেকে।

‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’ উপন্যাসটি স্বতন্ত্র এই জন্যেই যে, সাহিত্যে ‘অপর’-এর চোখ দিয়ে আরেক ‘অপর’কে দেখার চেষ্টা এখানে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)’ নিঃসন্দেহে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের এক বাঁকবদলের মুহূর্ত, যেখানে সাঁওতাল জীবনের দ্রোহক্ষণ রাজনৈতিক আন্তরিকতা দিয়ে বর্ণনা করছেন মহাশ্বেতা। কিন্তু, উপন্যাসের কথক অমূল্য আব্রাহাম নিজের শ্রেণিব্যবস্থানকে স্বীকার ক’রে নেয়। সে যে বিরসাইটদের দ্রোহের উদ্দিষ্ট দিকু সমাজের একজন, তা মেনে নেয় নির্দিধায়, বলে, “আমি না পারি বলোয়া চালাতে, না পারি তীর ছুঁতে, আমি পারি শুধু লিখতে”। ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৮০)’-তে বসাই টুডু প্রশ্নে জর্জরিত করে ভদ্র-শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক শ্রেণি অবস্থানকে। ‘আত্ম’-র দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘অপর’-এর বয়ান বিচারের প্রথাগত আখ্যানবর্ণন ছেড়ে আসেন মহাশ্বেতা। সাহিত্যে এ এক দুর্লভ প্রাপ্তি অবশ্যই। কিন্তু, অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এ আখ্যানের কেন্দ্রে যে ‘অপর’ মানুষেরা, ঘরহীন-স্থায়িত্বহীন যাযাবর¹⁰⁷ বাজিকর¹⁰⁸ সম্প্রদায়, তারা শুধু এতদিন সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে-সমাজে যারা ‘আত্ম’ ছিল তাদেরই প্রতিস্পর্ধা জানায় না, বরং অন্য ‘অপর’দের সমাজ-সংস্কৃতিতেও মেশে এবং বোঝবার চেষ্টা করে। বাজিকররা তাদের শতকব্যাপী যাত্রাপথে, বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পথ পেরিয়ে আসতে আসতে পরিচিত হয় সাঁওতাল পরগণার মূলবাসী মানুষের সঙ্গে। বাজিকররাও মূলধারায় ব্রাত্য, সাঁওতালরাও। বাজিকরদের জমি-ঘর কিছুই স্থিতি নেই এবং সাঁওতালদের জমি-ঘরের স্থিতিও বারবার বিপন্ন হয় দিকু আর ইংরেজদের দ্বারা। শোষিত বাজিকরদের চোখে নিম্নবর্ণ মূলবাসী সাঁওতালরা কীরকম?

এই মানুষগুলো চকচকে কালো, উজ্জ্বল দাঁত তাদের, অফুরন্ত তাদের আনন্দ। পীতেম তাদের দেখেছিল বিস্ময়ের সঙ্গে। এরা বাদিয়া বাজিকরের মতো নয়, আবার এরা সাধারণ গৃহস্থের মতোও নয়। এরা পণ্ডিতও নয়, মূর্খও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, খেটে খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ভেঙে, জঙ্গল পরিষ্কার করে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠায় তারা ফসলের জমি তৈরি করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা পরিশ্রম করে, তার পরেও গান গায় এবং নাচে, জীবনকে উপভোগ করে। (সেন ২০১০, ১৫)

বাজিকরদের সর্দার পীতেম তাঁদের আবিষ্কার করে রাজমহল, সাহেবগঞ্জের হাটে। পরতাপ, জিল্লু আর ডুমকা সোরেনের বন্ধুত্ব হয় বাঘ শিকার করতে গিয়ে; পীতেমের প্রজন্ম আর জিল্লুর প্রজন্ম লক্ষ্মণ সোরেন আর ডুমকা সোরেনের ঘনিষ্ঠ হয়। দুই ‘অপর’-এর বন্ধুত্বকে অভিজিৎ সেন এক নির্দিষ্ট সময়খণ্ডে আখ্যানবদ্ধ করেন। আবার কখনও ইতিহাসের সময়কে ছাপিয়ে যায় উপন্যাসের সময়, বিশেষতঃ যে ইতিহাস বিস্মৃতির, যে ইতিহাস ভুলিয়ে রাখার বন্দোবস্ত মজবুত করা হয়েছিল। উপন্যাসের আখ্যান ঠিক ওখানেই ইতিহাসের তথ্য-বয়ান থেকে ভিন্নতা পায়। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ শুধুমাত্র বাজিকরদের ভ্রমণবৃত্তান্ত আর সামাজিক উপন্যাস হয়েই থেকে যেতে পারত যদি না এর অন্তর্বয়ানে থাকা রাজনীতিই আখ্যানের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠত। অভিজিৎ ‘দেবাংশী’ বা ‘বর্গক্ষেত্র’-র মতো গল্প-উপন্যাসকেও রাজনৈতিক করে তুলেছেন, শ্রেণি-সংগ্রামের রাজনীতির সাহিত্যিক উপস্থাপনায়। ‘দেবাংশী’-র সমালোচনায় প্রসূন ঘোষের মতে, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে লোকবিশ্বাসে আরোপিত সত্তাটির দ্বন্দ্ব তথা ব্যক্তিক ট্রাজেডি বা লোকাচার-লোকবিশ্বাসে স্থিত একটি গোষ্ঠীর কৌম জীবনের কাহিনি শুধু ‘দেবাংশী’-র মূল বিষয় না, তার সঙ্গে ‘শ্রেণিসংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় মাত্রাটি’ যুক্ত হয়েছে।¹⁰⁹ অভিজিৎ সেন নিজেও জানান যে, যে সময়ে তিনি ‘দেবাংশী’ ও সেই পর্যায়ের আখ্যানগুলি লিখেছেন, তখন শ্রেণিসংগ্রামের দায় নিজের ভেতর উপলব্ধি করতেন এবং তাকে জাগরুক রাখার চেষ্টা করতেন। তাই শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়বস্তুকে আখ্যানবস্তু ক’রে তুলেছিলেন।¹¹⁰ বাজিকরদের পূর্বপুরুষ রহুর মৃত্যু এবং সেই রহুর

হাড় খুঁজে চলার মিথের মধ্যে রাজনীতি আছে। ক্ষমতাবান কর্তৃক ক্ষমতাহীনকে দখল করার রাজনীতি এবং ভূখণ্ড দখল করে মানুষকে উপনিবেশিত বানানোর শতকব্যাপী রাজনীতি। বাজিকররা একাত্ম বোধ করেছিল সাঁওতালদের সঙ্গে- কারণ দু'জনেরই শত্রু ছিল এক; বাজিকররা সাঁওতালদের মতো 'সংগ্রামী' বা 'শহীদ' মর্যাদা পায়নি, কারণ যুদ্ধের ফলাফল আঁচ ক'রে পালিয়ে এসেছিল তারা। এই আখ্যানে বাজিকরদের চোখে সাঁওতাল বিদ্রোহের শত্রু চিহ্নিত হয়ে যায়, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে- W. W. Hunter-এর রিপোর্টেও- ব্রিটিশদের বিশ্বস্ত জমিদার ও মহাজনরা ইংরেজ সৈন্যদের অভিযানের পথ সুগম করেছিলেন এবং তাদের থাকা-খাওয়ার রসদ যুগিয়েছিলেন। ইংরেজ নীলচাষীরাও একইভাবে সৈন্য ও প্রভূত অর্থের বন্দোবস্ত করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রশিক্ষিত হস্তীবাহিনীসমেত সেনা পাঠিয়েছিলেন ব্রিটিশদের জন্য।¹¹¹ “a special commissioner was appointed by the English rulers to suppress the Santal rebellion” (Dasgupta 2013, 72)

বাজিকরদের কোথাও থিতু না হতে পারার মধ্যেও আর্থ-রাজনৈতিক বন্দোবস্তই ক্রিয়াশীল থাকে; ক্ষমতাবানেরা চিরকাল তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, নারীদের লুণ্ঠ করে এবং অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার সবটুকু কেড়ে নেয়। এই আখ্যানের বাজিকররা বংশ পরম্পরায় প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাসযানে চড়ে গোরখপুরে ঘাঘরা নদীর তীর থেকে রাজশাহী হয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ ছুঁয়ে ভূমি-সংস্কারের সময়কালের সাক্ষী থাকে। আখ্যানের রাজনীতি গড়ে ওঠে ভাষায়, ইতিহাসবোধে, কেন্দ্র-প্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং কুশীলবেদের ক্রিয়াকলাপে। আর, বাজিকরদের নিজস্ব রাজনীতি থাকে আপস থেকে দ্রোহে, ক্ষমতাকাঠামোয় আত্মসমর্পণ থেকে বিরুদ্ধসম্পর্কীয় এবং আর্থ-সামাজিকতার 'মূলধারা'র সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্ব জারিত হয়ে। বাজিকরদের যুথবদ্ধ জীবন ও চারণ-অর্থনীতি সাঁওতালদের কৃষি-অর্থনীতির সাক্ষাৎ পায়- পরস্পরকে বুঝতে শিখে তাঁরা দেখেন যে, তাঁদের বহু পার্থক্য সত্ত্বেও মিল রয়েছে শোষিত শ্রেণি-অবস্থানে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখছেন,

ব্যক্তিসর্বস্বতা দিয়ে চিহ্নিত সমাজও যে-শিল্প সৃষ্টি করে তা দিনদিন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আসছে রুগ্ণ ও রোগা এক ব্যক্তির কাতরানিতে। এই রুগ্ণ লোকটির ভেতরটা ফাঁকা ও ফাঁপা। অভিজিৎ সেন এই ফাঁকা ও ফাঁপা লোকের গল্প ফাঁদতে বসেননি। তিনি যে-শক্তির ইঙ্গিত দেন, তা কোনো ব্যক্তির নয়, কেবল একটি গোষ্ঠীর নয়, বরং তা হল মানুষের শক্তি... বাজিকরদের দীর্ঘ পদযাত্রা তাদের ঘর দিলেও দিতে পারে, কিন্তু সেই ঘরে মর্যাদা নেই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবানদের কবজার ভেতরে নিষ্পিষ্ট হওয়াই এদের পরিণতি। (ইলিয়াস ১৯৯৭, ১৩৯-৪০)

লক্ষ্মণ সোরেনও বাজিকরদের জাত-ধর্ম জানতে চায়, “তুমি মানুষটাকে আমার বড়ো ভাল লেগেছে। তোমাদের কি জাত সরদার?” (৩৩) কিন্তু, সেই প্রশ্ন লালমিয়া বা জমিদার মোহনবাবুর মতো অপমানজনক নয়, বাজিকরদের অচ্ছুৎ করে দেওয়ার জন্যে নয়। রোড-রোলার চালানো শ্রমিক হানিফ বাজিকরদের ধর্মহীনতা-জাতহীনতার কথাই উৎফুল্ল হয়, উনিশশো ষাটের দশকে। আর, তার একশো বছর আগে এই উৎফুল্লতা পাওয়া যায় লক্ষ্মণ-ডুমকার কথা। “আমরা বাজিকর জাত। হিন্দু-মুসলমান সমাজ আমাদের ডোম-চণ্ডালের জাত হিসেবে ধরে” (৩৩) শুনে পারগাণা আর সর্দারের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়- ধর্ম-জাত-বর্ণ-শ্রেণির শোষণ আর শোষণমুক্তির ছটফটানিই তাদের বন্ধুত্ব বাড়ায়। আর, শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়, অর্থনৈতিক সম্পর্কও এই ভিত তৈরি ক’রে দেয়- জমি আর স্থিতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয় বাজিকরদের মধ্যে; ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এর আখ্যান এই অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাই বহু রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত পেরোয় শতক-দশক ধরে। আর, উপন্যাসটিও কখনোই সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে সন্ধানপথ থেকে সরে যায় না।

উনিশ শতক থেকে একুশ শতকের বিস্তীর্ণ সময়ে সাঁওতাল মূলবাসীরা ক’টা বাংলা উপন্যাসে স্থান নিতে পারেছে? আর, বাজিকরদের তো আরোই স্থান সঙ্কুলান। কারণ, বাজিকররা ‘বানজারা’ নয়¹¹², তাদের যাত্রাপথে রোমাঞ্চকর ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনানোরও অবকাশ নেই। তাদের

চলার গতি আছে, থিতু হওয়ার বাসনা আছে, কিন্তু স্থিতি পাওয়ার সামাজিক পুঁজি কিছু নেই। লেখক অভিজিৎ সেন সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে বাজিকরদের জড়িয়ে পরার রাজনীতিকে বাজিকরদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলান, উনিশ বা বিশ শতকের ভদ্র-শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত চেতনাবোধ থেকে বিচার করতে বসেন না। নিম্নবর্গের বাজিকররা জীবদ্দশার প্রথম ও শেষ আমন্ত্রণ পায় আরেক নিম্নবর্গ সাঁওতালদের থেকে। বাজিকররা এড়িয়ে যেতে চাইলেও সাঁওতালদের ওপরে জোতদারের অর্থনৈতিক শোষণ, ঠকিয়ে নেওয়া দাদন ও জমি তাদের প্রতিবাদী করে তোলে। রাজনৈতিকভাবে ‘অসচেতন (unconscious)’ বাজিকরদের এখানেই সম্ভবত রূপান্তরের শুরু, প্রতিরোধের শুরু, যা পরে প্রবাহিত হবে প্রজন্মান্তরে। তাদের সুগু জমির আকাজ্জাই কি এই বোধ-জাগরণের ভিত্তি নয়? স্থানীয় দারোগা বা জোতদার তাদের শোষণ করত, ‘তোলা আদায়’ করত, কিন্তু পতিত সাউয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মুহূর্তটি এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। দিকু পতিত সাউ, গোরাচাঁদ সেনেদের জুলুম ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ায় ‘বহিরাগত’ বাজিকর যুবক জিল্লু¹¹³। শোষিত শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিবন্ধুত্ব স্থাপনের উদাহরণ নয়? যে শ্রেণিবন্ধুত্ব এবং শোষণমুক্তির সংগ্রাম পরিপূরক¹¹⁴। কার্ল মার্ক্স শ্রেণিসচেতনতার প্রসঙ্গে আসছেন নির্বিক্রমের এই শ্রেণিবন্ধুত্বের ধারণাকে বিস্তৃত করে। নির্বিক্রমের নিয়ত সচেতন বিরুদ্ধতাই তাঁদের শ্রেণিসচেতন ক’রে তোলে। শ্রেণিসচেতন বন্ধুত্বের এই বাস্তবতা ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহেও যথেষ্ট উপস্থিত ছিল, পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের তোয়াক্কা না করেই। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কো তাঁর গ্রন্থে কে কে দত্তর ‘সান্তাল ইনসারেকশন অফ ১৮৫৫-৫৬’ থেকে উল্লেখ করছেন,

সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা বাঙ্গালী ও পশ্চিমী মহাজনদের উচ্ছেদ করে এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল দখল করে নিজস্ব স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করবেন। কুমার (কুম্ভকার), তেলী, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতী), চামার (চর্মকার), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোককে আক্রমণ করা হবে না বলে স্থির করা হল।

কারণ, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তারা সাঁওতালদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। (বাক্সে ১৯৬০, ৫৭)

উদ্ধৃতিতে উক্ত প্রত্যেকটি পেশার মানুষই নিম্নবর্ণের ও ক্ষমতাকাঠামোর ‘অপর’ এবং বিদ্রোহের লগ্নে সাঁওতালদের ভুল হয়নি বন্ধু ও শত্রু চিনে নিতে। “লোহার কাজে ছিল তাদের [বাজিকরদের] স্বাভাবিক দক্ষতা। সেই দক্ষতা এখন প্রয়োজনে লাগে। অস্থায়ী শিবির যেখানেই হয়, প্রথমেই কামারের হাপর বসে সেখানে”¹¹⁵- স্থায়িত্বহীন শোষিত বাজিকরদের সঙ্গে সাঁওতাল-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া সাঁওতালদের বন্ধুত্বভিত। জোতদার-মহাজন পতিত সাউ ধান ওজনের কারচুপিতে ধরা পড়ে গেলে লক্ষ্মণ সোরেনকে বলে, “আরে যা যা, শালা জংলি সাঁওতাল... নিজের ভালো চাস তো আমার কাজে বাধা দিতে আসিস না” (৪৪-৫) এই তাক্ষিল্যের স্বর ও সুর ‘অপরায়ন’-এর ঘনিষ্ঠ অংশ; যে অপরায়নের বলি হতে হয় লক্ষ্মণ সোরেনকে। ব্রিটিশ আইনের মারপ্যাঁচ না জানায় অজান্তেই তার জমি-বাড়ি ত্রোক হয়ে যায়। (৫৯)। বহেরা গ্রাম ও সংলগ্ন অঞ্চলে লক্ষ্মণ সোরেনই ছিল অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে প্রথম সচেতন ব্যক্তি,

এই পারগানা কিছুটা যেন অন্য ধাঁচের মানুষ। অনেক কিছুই বুঝতো এবং যা বুঝত না তাও তলিয়ে দেখতে চাইত। লক্ষ্মণ সোরেনই গ্রামের প্রথম ব্যক্তি যে ওজন ও পয়সার হিসেব বুঝতে শেখে। সুতরাং প্রতিপক্ষের কাছে সে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। (সেন ২০১০, ৫৯-৬০)

লক্ষ্মণ সোরেনের মধ্যে কি তিলকৌ মাঝির ছায়া দেখতে চেয়েছেন অভিজিৎ? তিলকৌ মাঝি স্বাধীনতা বিদ্রোহের নেতা, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে (১৭৭৭-৮৪) যিনি প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন ও শহীদ হয়েছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে বাংলার প্রথম শহীদ মহারাজা নন্দকুমার বা ক্ষুদিরাম বসু নয়, প্রথম শহীদ (১৭৮৪) তিলকৌ মাঝি। লক্ষ্মণ ও তিলকৌ

দু'জনেই রাজমহল অঞ্চলের অধিবাসী এবং ব্রিটিশদের ও ব্রিটিশদের অধস্তন দিকু জোতদার-মহাজনদের দ্বারা শোষিত¹¹⁶। লক্ষ্মণের প্রথম পয়সার হিসেব বুঝতে শেখা, প্রথম পাথরের ওজন ছেড়ে সরকারি বাটখারার পরিমাপ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মধ্যে কি তিলকৌ মাঝির ছায়াই নেই? বাজিকররা যেমন লক্ষ্মণ সোরেনের পাশে দাঁড়িয়ে দিকু ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তিলকৌ মুর্মুর সহযোদ্ধা হন রাজমহলের পাহাড়িয়া সর্দাররা। তিলকৌ মাঝিই প্রথম 'দামিন-ই-কোহ'¹¹⁷-তে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ১৭৮৪ সালে দামিন-ই-কোহ-এর ব্রিটিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্লিভল্যান্ডকে হত্যা করেন¹¹⁸। পাহাড়িয়াদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরোধ এবং সাঁওতালদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরোধ বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে লিখছেন,

১৭৭২ সালে ক্যাপ্টেন ব্রুক নামে এক ইংরেজ একদল সিপাহী নিয়ে এই পাহাড়িয়াদের দমন করতে গেছিলেন, কিন্তু পাহাড়িয়ারা অধিকাংশ সিপাহীকেই জঙ্গলের আড়াল থেকে তীর দিয়ে হত্যা করে, ফলে ক্যাপ্টেন সাহেবকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল... তিনি [ক্লিভল্যান্ড] তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ক্লিভল্যান্ড সাহেবের কৌশলের ফাঁদে পাহাড়িয়ারা সহজেই ধরা পড়ল... এতদিন তারা [সাঁওতালরা] স্বাধীনভাবে চাষবাস আর অরণ্যসম্পদের ওপরে নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে, এমন কি মোগলযুগেও তাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি, কিন্তু কোম্পানীর লোকজন আজ তাদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাদের শোষণের শিকারে পরিণত করতে চাইছে, তাদের কাছে খাজনা দাবি করছে। জমির উপর খাজনা বা অন্য কোন কর দেওয়াকে তারা অন্যায় বলে মনে করে। (বাক্সে ১৯৬০, ৮-১০)

অষ্টাদশ শতকের সাতের দশক থেকে তিলকৌ মাঝির বিদ্রোহও সেই জমিকে কেন্দ্র করে, খাজনা আদায় ও দৈহিক শোষণের বিরুদ্ধে। ক্লিভল্যান্ডকে হত্যা করা ও কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অপরাধে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয় তাঁকে। ফাঁসির আগে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করা হয়, যার বর্ণনা পাওয়া যায় ধীরেন্দ্রনাথের লেখায়,

তিলকা ধরা পড়লেন। তাঁকে ভাগলপুরে এনে নিদারুণভাবে চাবুক মারা হল এবং ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে সমস্ত শহরে টেনে হিঁচড়ে ঘোরানো হল। এতেও তাঁর মৃত্যু হল না দেখে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হল... তিলকা মাঝির পরিবারের লোকেরা ও তাঁর অনেক সহযোদ্ধা এরপরে ব্রিটিশদের অত্যাচারে রাজমহল ভাগলপুর থেকে পালিয়ে গেলেন অন্যান্য স্থানে। (বাক্সে ১৯৬০, ১২-৩)

লক্ষণ সোরেনের ওপরে অত্যাচারের সঙ্গেও তো এই অত্যাচারের মিল পাওয়া যায়। বাজিকর যুবক বালি লক্ষণ সোরেনকে হাটের মাঝখানে প্রকাশ্যে শিকল দিয়ে পশুর মতো বেঁধে রাখা অবস্থায় আবিষ্কার করে।

বালি দেখেছিল শৃঙ্খলিত লক্ষণকে আমগাছির হাটে... একপাশে ক্লান্ত অবসন্ন এবং শৃঙ্খলিত লক্ষণ আধশোয়া। পাথরের মতো মানুষটার শরীর যেন ভেঙে পড়েছে। শিকলের ঘষায় পায়ে লাল দগদগে ঘা। মাছিও তাড়াতে পারছে না লক্ষণ... সিপাইরা মাঝেমাঝেই ভিড় দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল... তারপর দারোগা এবং সিপাই ঘোড়ায় ওঠে, অন্যরা লক্ষণের কোমরের শিকল ধরে টেনে নিয়ে যায় শহরের পথে (সেন ২০১০, ৫৭-৮)

প্রকাশ্যে অত্যাচারের ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে বাজিকররা খবর পায় যে, “থানার মধ্যে লক্ষণ সোরেনকে মেরে ফেলা হয়েছে।” আর, এরই সঙ্গে খবর আসে “সবার উপরে সমস্ত দামিন-ই-কো, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি জায়গার সাঁওতালদের সংঘবদ্ধতার খবর” (৬৩)। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরুর দিনগুলোতে অস্থিরতা বাড়ে বাজিকরদের মধ্যে এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে। আর, ইতিহাসের তথ্যাদির বাইরেও উপন্যাসের আখ্যানে কুশীলবেদের যাপনে ঘিরে থাকে মিথ্। আখ্যান যেকোনও ইতিহাস বয়ানের ঠিক-ভুল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায় এখানেই। আর, তাই সালমার উচ্চারিত “হাজার হাজার নাগনাগিনী উড়ে আসছে। তাদের নিশ্বাসে বিষ। সেই বিষ-নিশ্বাসে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।” (৬৩) বাজিকর-কন্যা সালমার

এই উচ্চারণ রাজমহল-ভাগলপুর অঞ্চলের মানুষের মনে বিশ্বাস প্রোথিত হয়। এই উচ্চারণ থেকে মিথ্ হয়ে বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার যে আখ্যান, এতে তো ইউরোপীয় ‘নভেল মডেল’ নেই। আধুনিকতার যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিও নেই। অথচ, খেয়াল করলে দেখা যাবে, সালমার কাছে হতো দিয়ে পড়ে থাকে দয়ারাম ভকতের মতো বিভবান চিরযুবা হওয়ার জড়িবুটির আশায়, সালমার ‘অলৌকিক’ উচ্চারণের খবর হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় এবং পেমার ‘অভিশাপ’ লাগে আনন্দরামের ওপর। পাশ্চাত্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ‘নভেল’-র কাঠামো দিয়ে উপনিবেশের ‘অপর’-এর মধ্যেও ‘অপর’ হয়ে থাকা মানুষদের আখ্যান ব্যাখ্যা কীভাবে হবে? দেবেশ রায় তাঁর ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ প্রবন্ধে লিখছেন,

ঘোষণার বিষয়টি যত মিথ্যেই হোক, ঘোষণার ভাষা তো সত্য। সে-ভাষায় এই মিথ্যেঘোষণাকেও তো সত্যের মতোই শোনাতে। বাক্ আর অর্থের মধ্যে এক ঔপনিবেশিক শক্তির ঢুকে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন থেকেই আমাদের নিজেদের কাহিনিকার হওয়ার পরিচয় হারাতে শুরু করি। আমরা ধরে নিলাম- ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার নামই উপন্যাস। ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ‘অর্থ’ গলে গেল। (রায় ২০০৬, ১৬)

দেবেশ রায় এই প্রবন্ধাংশে বাংলা ভাষায় রচিত ‘প্রথম’ উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)’-র প্রসঙ্গে এই কথা বলছেন। ইউরোপদর্শিত পথে উপন্যাসের নির্মাণে নিজেদের দেশীয় কাহিনি, স্ব-উপাদানগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল ঔপন্যাসিকেরা। কিন্তু, অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবী কিংবা দেবেশ রায় নিজেও এই দেশীয় উপাদানগুলোকে হারাতে চান না; বরং আখ্যানের স্বাভাবিক গতিপথ ওই উপাদানগুলোর বিবর্তনপথ ধরেই অগ্রসর হয়। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ কিংবা ‘দেবাংশী’-র মতো আখ্যানে দেশীয় উপাদান, মিথ, মুখফেরতা আখ্যান নিম্নবর্গের মানুষদের ঘিরে আবর্তিত হয়, তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। কিন্তু, এই লেখকেরা কেউই শুধুমাত্র ‘কল্পনা’ দিয়েই আখ্যান নির্মাণ করতে চাননা। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্ক্যেজের উপন্যাস ও গল্পেও বাস্তবের

কুহক এবং কুহকের বাস্তবতা মিশে থাকে। দনুর মতো, সামলার মতো, ইয়াসিন বা পীতেমের মতো হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াও তার স্বজন ও গোষ্ঠীর সবাইকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যায়। মিথ্-কাঠামো ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’ উপন্যাসের শিরদাঁড়া।

The non-rational elements of myth also serve to expand the narrow dimensions of objective everyday reality and lend universal significance to the experience of characters. (McMurray 1969, 179)

এই মিথ্কেন্দ্রিকতা তথাকথিত আধুনিকতার বাঁধন থেকে আখ্যানকে মুক্ত রাখে, যুক্তিবাদের পরিসরে ধরা পড়তে চায়না। অথচ, পাঠক আবিষ্কার ক’রে নিতে পারে যে, কল্পনার আবরণ সরাতে সরাতে বাস্তবের নিটোল অবয়ব ঠিকই উন্মোচিত হবে। সালমার ওই “সেই বিষ নিশ্বাসে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে” বাক্য মিথ্ হয়ে লোকান্তরে লোকমুখে ছড়িয়ে গেলেও, আখ্যানের গতিতে পাঠক আবিষ্কার ক’রে নিতে পারেন যে, ওই ‘ছারখার’ হয়ে যাওয়া বাজিকর আর সাঁওতালদের জীবনে কতখানি বাস্তব। বস্তুতঃ ইংরেজশাসন আরও জাঁকিয়ে বসবে এরপরেই আর, নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের জীবন ছারখার হয়ে যাবে। ম্যাকমারে লিখছেন যে, ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’ উপন্যাসে মিথ্ অনেকসময়ে অতিকথন এবং রঙচড়ানো রূপ নেয় “perhaps the result of generations of hyperactive imaginations”¹¹⁹ ‘একশ বছরের নিঃসঙ্গতা’ সম্বন্ধে ম্যাকমারের এই মন্তব্য ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এর ক্ষেত্রেও তো প্রযোজ্য। উপন্যাস শুরু হয় শারিবা তার বৃদ্ধা ঠাকুমা লুবিনির কাছে বাজিকর সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত শোনে, কয়েক শতকব্যাপী পরিযানের ইতিহাস-কল্পনা মেশানো আখ্যান।

লুবিনি ধূসর চোখে পাতালু নদীর বাঁকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত জ্যোৎস্না রাতে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে শারিবাকে অলীক সব দৃশ্য দেখাত... নমনকুড়িতে পীতেম বলত, হাঁই দেখ লুবিনি, হাঁই দেখ রহু... রাজমহলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অশরীরী দনু বলত, হাঁই দেখ পীতেম, হাঁই দেখ রহু। (সেন ১৯৮৫, ২৬৩)

গার্সিয়া মার্কোজের উপন্যাসের ওই ‘অতিসক্রিয় কল্পনা (hyperactive imagination)’ অব্যাহত থাকে এই উপন্যাসেও। মিথ্ তো শেষ হয় না। বরং তা প্রজন্মান্তরে বহমান থাকে, ইতিহাসের শিরায় ধমনীতে বইতে থাকে। আধুনিক যুক্তিবাদী মনন একে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু মিথের বহমানতা রোধ করতে পারে না। বারংবার রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে ও সামাজিক দ্বন্দ্বমুখরতায় বাজিকররা ‘দেশ’ পায়না, তবু, তারা এক দেশের সন্ধান ক’রে চলে। ‘দেশ’-র ধারণাও কি তাদের কাছে অলীক, কুহকী বাস্তব নয়? এক আশ্চর্য “লুবিনি বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক্ আর কি ক’মো। সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজের বিসরণ হই গিছে, তোক্ আর কি শিখামো”¹²⁰ উপন্যাস বাজিকরদের যাত্রাপথের সাক্ষী থাকে, বাজিকররা ইতিহাসের সাক্ষী থাকে। অসংখ্য কাহিনি, লোকায়ত সংস্পর্শ আর মুখফেরতা মিথ্ ঘুরে বেড়ায় বাজিকরদের মধ্যে এবং বাইরের দুনিয়ায় বাজিকরদের নিয়ে। “নানির বলা অসংখ্য কথা সে একসময় আবিষ্ট হয়ে শুনত ও বিশ্বাস করত। অথচ এখন তো শারিবা লুবিনির অসংখ্য গল্পকথার মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে।” (২৬৪) ম্যাকমারে গার্সিয়া মার্কোজের উপন্যাসে মিথ্ ও বাস্তবতায় খুঁজে পাচ্ছেন,

Some of the characters achieve mythical stature due to colorful personality traits or extreme old age... frequently lend a humorous tone, at times satirical and occasionally macabre. Fernanda, the reserved, decorous girl from the interior, has illusions of grandeur (she grew up being constantly reminded that some day she would become la reina) stemming from her aristocratic family background, even though her father has to mortgage their home to purchase her trousseau. To her children she paints an idealized portrait of their

grandfather, don Fernando, creating in their minds the image of a legendary being. (McMurray 1969, 177-8)

আর, রহুর মিথ ও তো এভাবেই তৈরি ক’রে নেয় বাজিকরেরা, প্রজন্মান্তরে। দনুর অশরীরী উপস্থিতি বাজিকরদের চলার ভরসা যোজায়, বারবার পালাতে পালাতেও স্থায়িত্ব খুঁজে পাওয়ার ভরসা দেয়। সালমা হয়ে ওঠে বয়সের গাছপাথরহীন, সময়ব্যাপী বিস্তৃত ‘colorful personality’, যে তার জড়িবুটি-মন্ত্র ইত্যাদির জন্যে ‘mythical stature’ লাভ করে। তারই বলা “হাজার হাজার নাগনাগিনী ছুটে আসছে, তাদের নিশ্বাসে বিষ” ভীষণবাক্য হয়ে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয় জুড়ে। লুবিনীও সেই বর্ণময় চরিত্র হয়ে ওঠে কিংবা একদা-দলপতি পীতম বা ইয়াসিনের মতোই। সাঁওতাল বিদ্রোহের বাস্তবতাতেও তার সবিস্তার উপস্থিতি এবং জমিদার-জোতদার-ব্রিটিশদের প্রবল ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে লক্ষণ সোরেনের বন্ধুত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না কিছুতেই। অভিজিৎ সেন ‘মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা’ প্রবন্ধে লিখছেন,

আমি ‘দেবাংশী’র সারবান লোহার এবং দৈত্যারি মণ্ডলের আশ্চর্য সংলাপ পাশে বসে শুনতে চেয়েছি যেখানে বেলালি সতী (বেহুলা), মহাদেব, মনসা মামলামোকদ্দমা জমিসম্পত্তি ইত্যাদির যাবতীয় নিষ্পত্তিতে হরদম হস্তক্ষেপ করে। মিথ এবং লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। (সেন ২০১৩, ১৫০)

অভিজিৎ সেন এই প্রবন্ধেই উল্লেখ করছেন লোকায়ত ও মিথে ফিরে যাওয়ার উপন্যাসপদ্ধতির কথা। আর, আরেক বিতর্কের ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, “তারাশঙ্কর মিথ ব্যবহার করেছেন আখ্যান হিসেবে। আখ্যান হিসেবে মিথের ব্যবহার খুবই সরল এবং একমাত্রিক।¹²¹” অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ভূত বা অলৌকিকের সঙ্গে লোককথার ভূত ও মিথের তফাৎ রয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোরদের জন্যে লেখা ‘অডুতুড়ে সিরিজ’-এর ভূত বা তারাশঙ্করের উপন্যাসে হঠাৎ-দেখা ভূতের সঙ্গে লোককথা ও মিথের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। ‘ভৌতিক গল্প (Horror Story)’ নয়,

ভূত বা মিথ বিশ্বাসের মধ্যে, মুখফেরতা গল্পে গল্পে প্রজন্মান্তরে কোনও এক সংস্কৃতির বাহক। ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো বুজে যায় সেই মিথপ্রবাহে। ‘খোয়াবনামা’-র মুনসির ভূতসহ আস্ত পাকুড়গাছ লোপাট হয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক বিপন্নতার দোসর। ভবানী পাঠকের লোককথা নিম্নবর্গের প্রতিরোধের হাতিয়ার। মহাশ্বেতা দেবীর ‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসে প্রাগৈতিকহাসিক মিথের সচেতন ব্যবহার রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা দেয়। আধুনিক ভারতে আদিবাসী জগতের এক রাজনৈতিক বার্তা হয়ে ওঠে মিথ।¹²² তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণেরা মিথ নিয়ে যে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, তার থেকে এই মিথ-ব্যবহারগুলি গুণগতভাবে আলাদা, যা উপন্যাসের রাজনীতিকে অনন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকের সামনে হাজির করে।

ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে নিছক কল্পনা ও নির্দিষ্ট মতাদর্শের সামঞ্জস্য রাখলে, তা ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ হয়ে উঠতে গেলে মিথ ও মুখফেরতা আখ্যানের প্রতিরোধ-ক্ষমতা প্রয়োজন। কুশীলবেদের নির্মাণে বাস্তবের আর্থ-রাজনৈতিক উপাদানসমূহের ভিত্তি প্রয়োজন। তাই, মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তে ক্ষেতমজুরদের শোষণের সরকারি নথি থাকে। নবাবরূপ সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলোর নাম উল্লেখ করেন। ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে বীরসা মুণ্ডার মিথ্জন্মের পাশাপাশি সরকারি ভাষ্যের উল্লেখ থাকে। আর, অভিজিৎ সেন বাজিরকরদের যে পেশা ও পেশাবদলের উল্লেখ করেন, তা মিলে যায় সামাজিক গবেষণাপত্রের সঙ্গে। মিলিন্দ বকিল যাযাবর সম্প্রদায়ের সামাজিক স্বীকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বাজিরকরদের যে বৃত্তিগুলোর উল্লেখ করছেন, “As nomadic people carved their livelihoods through a variety of activities, they could be suitably classified in four categories: (a) pastorals and hunter-gatherers (b) goods and service nomads (c) entertainers and (d) religious performers”¹²³ বাজিরকরদের বৃত্তিও মিলে যায় এই প্রত্যেকটার সঙ্গেই। এমনকি, যে বাজিরকরদের জাত নেই

বলে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকেদের কাছেই অচুৎ ছিল, তারা ধর্মীয় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ক্ষমতা হস্তান্তরোত্তর কালে। আর, বাজিকরদের জাত-ধর্মহীনতার বয়ান মিলে যায় বাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে, যাঁরা সুদূর পূর্ব রাজস্থানের যাযাবর সম্প্রদায়। “The Bawarias have an intricate system of rituals that distinguish them from other local communities. They worship Kali, Shed Devi and Thakarji (Singh 1992) and pray to the goddess (devi) from Nagarkot”¹²⁴ বাজিকরদের ছিল লোকায়ত উপাস্য; ধরতিমাঈ, ওলামাঈ, বিগামাঈ আর তেলসিঁদুরে মাখানো রহুর হাড়। এই বিগামাঈ আর ওলামাঈ-র হৃদয় হিন্দু বা মুসলমান কোনও ধর্মীয় ক্ষমতাবানই পায়নি। লেখক অভিজিৎ বাজিকরদের জীবন প্রত্যক্ষ করেন কর্মসূত্রে এবং এই প্রসঙ্গে লেখেন,

বাজিকরদের নিজস্ব কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিল না। তাদের বৃদ্ধদের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম, পথচলতি অবস্থায় গৃহস্থ মানুষের সমাজের কোনো কোনো লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের দেব-দেবী তারা কখনো কখনো আশ্রয় করে। ‘বিগামাই’, ‘ওলামাই’- এরকম দু-একটি মাতৃশক্তির খুবই অস্বচ্ছ ধারণার কথা তারা আমাকে বলেছিল... দুই প্রবল ধর্মবিশ্বাসী সমাজের মধ্যে সততই নিষ্পিষ্ট বাজিকরেরা কেমন যেন অপ্রস্তুত তাদের অস্তিত্ব নিয়ে, এমনই তাদের মনে হয়েছিল আমার। (সেন ২০১৫)

অভিজিৎ এই ধর্মবিশ্বাসের রাজনীতির উল্লেখ করেন এবং ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে থাকা শ্রেণি-সংগ্রামের রাজনীতি। ‘দেবাংশী’ গল্পেও বর্ণা-বিষয়ক অর্থনৈতিক আখ্যানের পাশাপাশি নিম্নবর্গের ধর্মবোধের জটিলতা, ন্যায়নীতির বোধও স্বাভাবিকতায় ঢুকে পড়ে। ‘দেবাংশী’ আখ্যান সম্পর্কে “ধর্মাশ্রয়ী শ্রেণীসংগ্রামের এক এক বিশেষ রূপও দেখানো হয়েছে”¹²⁵ বলে মন্তব্য করেছেন অভিজিৎ সেন। ভূমি সম্পর্কের সঙ্গে ধর্মীয় শোষণ একটা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে কীভাবে টিকিয়ে রাখে এবং বাজিকর বা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি দেবাংশী কীভাবে সেই শ্রেণি-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জারি রাখে, সেই আখ্যানই উপন্যাস-গল্পগুলোকে রাজনৈতিক ক’রে তোলে।

ক্ষমতা হস্তান্তরোর কালে বাজিকররা নতুন ক'রে সমস্যায় পড়ে তাদের 'পরিচিতি' নিয়ে; এই পরিচিতির রাজনীতি যা তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে শতকব্যাপী, তা নতুন দ্বন্দের সামনে পড়ে। ভারত সরকারের 'সামাজিক সুরক্ষা' বিভাগের প্রকাশিত লোকুর কমিটি রিপোর্ট (১৯৬৫)¹²⁶ থেকে জানা যায়, বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায়কে 'তফশিলি বর্ণ' ও 'তফশিলি জাতি'-র অন্তর্ভুক্ত করার রাজনৈতিক পদ্ধতি আছে। এই রিপোর্টে কারণ দর্শানো হয় যে, কেন কোনও 'জাতি (Tribe)'-কে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অভিজিৎ 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ জাতপাতের রাজনীতির বিশদ বিবরণ রাখেন। এই জাতপাতের রাজনীতি গ্রামীণ সমাজে বরাবরই কেন্দ্রস্থান অধিকার করে রেখেছে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে দশরথ কামার, বৈকুণ্ঠ বৈরাগীর থেকে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও অনিল সান্যালেরা 'জাতবিচারে' বড়। তাই অনিল বা পূর্ণচন্দ্রদের বয়ান নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এও ৫০ সংখ্যক অধ্যায়ে নমঃশূদ্রদের সামাজিক অবস্থান এবং নিম্নবর্ণীয় গ্রামীণ সমাজে জাতভেদের কাহিনি।

ভায়রোর বাইশ দিগর কোলমা ও কাপড়া নমোশূদ্রদের নিয়ে। কোলমা অর্থাৎ যারা লেখাপড়ার কাজ করে এবং কাপড়া, যারা তাঁত বোনার কাজ করে, এই বাইশ দিগরের অন্তর্ভুক্ত। হালুয়া এবং জালুয়া এই বাইশ দিগরের বাইরে, যদিও তারাই সংখ্যায় অধিক... দিগরভুক্ত মানুষেরা কখনো বাইরে বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম করে না, দিগরবহির্ভূত নমোশূদ্রদের সঙ্গে একত্রে পানাহার পর্যন্ত করে না। কিন্তু এইসব হালুয়া ও জালুয়া নমোশূদ্রদেরও দিগরের অনুশাসন, দিগরপতির আদেশ ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। এখানে ভায়রো রাজার মতো সম্মান পায়... বাইশ দিগরের নমোশূদ্রদের বাড়িতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পূজো করে না। (সেন ২০০০, ২২১)

ভারতবর্ষের সংবিধান যতই প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলুক, বাস্তবচিত্রে এই সামাজিক অনুশাসন ও তৎসংলগ্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় প্রতি প্রদেশেই ছিল এবং আছে।

সামাজিক জাতবিচারের এই রাজনীতির বলি হওয়ার খবর প্রতিদিন ভারতবর্ষের সংবাদ-শিরোনাম হয়; এই আখ্যানেও ওমর-মালতীর¹²⁷ বিয়ে রাজনৈতিক বিরোধের রূপ পায়। বাজিকরদের ধর্মহীনতা ও সামাজিক স্থিতিহীনতা ওই বিরোধের প্রধান কারণ। আর, বাজিকরদের বিশেষ তফশিলি জাতিতে অন্তর্ভুক্তিও হয় না। কারণ, বাজিকরদের দু'টো ধর্মীয় সম্প্রদায় ভাগ হয়ে যায়- একদল কলমা পড়ে মুসলিম ধর্ম নেয় আর রূপাসহ অন্যরা বেদের জীবিকা গ্রহণ করে হিন্দুরীতির শরণাপন্ন হয়ে। আর, লোকুরের কমিটির রিপোর্টে তফশিলি বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভুক্তিতে প্রত্যাখ্যানের কারণ লেখা থাকে হয় হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্তি নয়তো মুসলমান ধর্মে অন্তর্ভুক্তি¹²⁸, নয়তো অস্পৃশ্যতার দ্বারা ব্রাত্য নয় বা ওই নির্দিষ্ট রাজ্যে আর তাঁদের খোঁজ মেলেনি অথবা অবজ্ঞাযোগ্য জনসংখ্যা। লোকুরের রিপোর্টে চণ্ডালদের তফশিলি জাতি (scheduled tribe) থেকে বিতাড়নের কারণ হিসেবে থাকে, “A derogatory term, not a caste”¹²⁹। অর্থাৎ, বাজিকরদের আত্মপরিচিতি ফের প্রশ্নের মুখে পড়ে। এর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে অস্তিত্বসংকট, কারণ কোনও এক বিশেষ ধর্মীয় পরিচিতি বা জাতি-বর্ণগত পরিচিতির ওপরেই নির্ভর করে অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান, সামাজিক স্বীকৃতির সম্মান। আর, লোকুর কমিটির রিপোর্ট (১৯৬৫) কেন উপন্যাসের আখ্যানে রাজনৈতিক নির্যাস এনে দেয় তা বোঝা যায়,

সাতষড়ির নির্বাচনের ডামাডোল তখন শুরু হয়ে গেছে... বিধানসভার আসনটিতপশীল জাতি ও উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত... সরকারি হিসেবে যেহেতু এককভাবে তপশীল জাতি ও উপজাতির স্থান এ থানায় প্রথম, রাজনৈতিক নেতারা তাদের তুষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বেশি ভাবেন। (সেন ২৪৮)

বাজিকররা ঠিক এসময়েই আত্মপরিচিতির লোভে হাজিসাহেবের কাছে কলমা পড়ে মুসলমান হতে চায় অথবা কেউ কেউ হিন্দু আচার-আচরণের অনুশীলনে হিন্দু হতে চায়। কিন্তু, আখ্যানের বিবরণ থেকে পরিষ্কার হয় যে, বাজিকরেরা অন্ততঃ সরকারি খাতায় বিশেষ জাতি হিসেবে স্থান

পায়নি এবং সামাজিক স্বীকৃতিতে তারা তখনো ‘অপরাধী জাতি’ হিসেবেই রয়ে গেছিল। যদিও, বাজিকরদের আর্থ-সামাজিক অভিযোজন ও প্রত্যাখ্যান দুইই ক্রিয়াশীল থাকে এই ধর্মগ্রহণের মধ্যে; এখানেও পরিচিতির রাজনীতি এবং অপর থেকে আত্ম হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা¹³⁰। তবে, বাজিকরদের প্রতিমুহূর্তে উচ্চবর্গ ও সামাজিক ক্ষমতাবানদের দ্বারা লাঞ্ছনা শুধুমাত্র তাদেরই নয়, বরং সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যাযাবর অথবা অস্থায়ী ‘আত্মপরিচয়হীন’ সম্প্রদায়ের আখ্যান হয়ে থাকে। কারণ, এ আখ্যান শুধুমাত্র পাঁচবিবি বা বাদা-কিসমৎ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, তা বোঝা যায়,

As we mentioned earlier, due to the ban on their traditional profession of hunting, the Bawarias want to settle down, but cannot because of the relations of conflict with the sedentary and dominant local populations. As many as 69 percent of Bawarias said that they move on to other sites because of conflict with surrounding villagers or zamindars , all of whom belong to higher castes. (Dutt 2004, 269)

রাজস্থানের বাওয়ারি সম্প্রদায়ও বাজিকরদের মতোই বারবার তাড়া খায়, ঘর হারায়, জমি পায়না এবং অস্তিত্বহীনতায় ভোগে। রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, নমনকুড়ি, পাঁচবিবি, মোহরের হাটখোলা-কোথাওই তারা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে টক্করে পেরে ওঠে না। স্থানীয়রা তাদের মেনে নিতে পারে না আর উচ্চবর্গ তাদের শ্রমের প্রয়োজন ফুরোলে ভিটেমাটিছাড়া করে। মহিম চৌধুরী, দিগিন মণ্ডল, লালমিয়া, আজুরা শেখ, জানকীরাম, ভায়রো- বাওয়ারি সম্প্রদায়ের মতোই পালিয়ে বেড়ানো। জমিদার মহিম চৌধুরীর তালুকে জোতদার দিগিন মণ্ডলের সঙ্গে সঘাতের পরে,

তারপরেই আড়ালের চিরকালের ভয়াত মারখাওয়া বেদিয়া সারা দুনিয়াব্যাপী অন্ধকার দেখে। পালায় সে, ক্রমাগত পালায়। পিছনে পড়ে থাকে দুই পুরুষের অর্জিত অধিকার,

প্রিয়জন, আকাজ্জা, অতৃপ্ত ঘর-গেরস্থালির পরিকল্পনা... দুই কুঠিবাড়ির দুই হাতি বাজিকরের ঘর ভাঙে। ভাদুই ফসলের জমিগুলিকে দাপিয়ে কাদা করে। ঘরে আগুন লাগে। বাজিকর রমণীরা বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়... তারপর এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাড়িয়ে অনেকদূর পার করে দেয় মহিমবাবু, লালমিয়া ও দিগিন মণ্ডলের লোকেরা। (সেন ২০০০, ১৮৯-৯০)

বাজিকরদের সামাজিক অস্তিত্বহীনতার ও ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্বের এই রাজনীতিই একাধারে ‘বহু চণ্ডালের হাড়’-কে রাজনৈতিক ক’রে তোলে এবং ভারতীয় সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

বাজিকরদের ইতিহাস গোষ্ঠীবদ্ধতার ইতিহাস; বিচ্ছিন্ন হয়েও ফের সঙ্ঘবদ্ধতার ইতিহাস। “যাযাবর কি দল ছাড়া বাঁচতে পারে?” (৬২) তাই পেমা আনন্দরামকে হত্যার পরে ফিরে আসে ছাউনিতে। পলবী সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েও ফিরে আসে বাজিকরের ছাউনিতেই, বহু বছর পরে। আর, অভিজিৎ সেই সঙ্ঘবদ্ধতার সচেতন আখ্যানালাপ করেন। ইলিয়াস ঠিকই বলেন যে, এ কোনো ফাঁপা ও ফাঁকা ব্যক্তিমানুষের আখ্যান নয়। আর, এই জুড়ে-জুড়ে-থাকার রাজনীতিকে বজায় রেখেই উপন্যাসের ভাষা ও আঙ্গিক নির্মাণ ক’রে নেন অভিজিৎ। আর, আখ্যানের বিস্তৃতি হয় শতকব্যাপী, দল থেকে বিযুক্ত হয় অনেকে। কিন্তু, দনুর বহু অধস্তন-প্রজন্ম শারিবাও বলে, “আমরা বাজিকর”! তার গর্বের এই উচ্চারণে পরিচিতির রাজনীতি রয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রে থাকা ‘আত্ম’-র বিরুদ্ধে ‘অপর’-এর আত্মপরিচিতি। এই পরিচিতির রাজনীতিকে বিচার করতে গেলে, ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন যাযাবর সম্প্রদায়ের ওপর ও মূলবাসী সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বর্বর আইনের দিকে তাকাতে হয়।

After the mutiny of 1857, the British administration took a number of preventive steps to retain law and order. The enactment of the Criminal Tribes Act (CTA) of 1871 was one of them. However, the act

was based on a fallacious understanding of Indian society, particularly the caste system. One of the influential members of the Law and Order Commission, T V Stephens equated caste with profession and believed that certain communities were profession- ally criminal and crime was their caste, occupation as well as religion. (Bokil 2002, 150)

‘অপর’কে দাগিয়ে দেওয়ার ও মূলধারা-বিচ্যুত করার রাজনীতি। সেই জন্যেই দারোগা জানকীরাম বা দয়ারাম ভকত ও উচ্চবর্গের অন্যান্যরা আইন-পুলিশের ভয় দেখিয়ে বাজিকরদের বিপদে ফেলতে, তাদের জিনিসপত্র লুণ্ঠ করে¹³¹। এই শোষণের ধারা বদলায় না। বাজিকররা যেখানেই বাস করতে যায়, থিতু হতে চায় সেখানেই স্থানীয় ক্ষমতাবানেরা তাদের জাত-ধর্মের প্রশ্ন তুলে পরিচিতির প্রশ্ন তুলে ‘অপরাধী সম্প্রদায়’ হিসেবেই দাগিয়ে দেয়। সরকারি আইন মতে, ১৯২৩ সালে এই ‘ক্রিমিনাল ট্রাইবস্ অ্যাক্ট’ সংশোধিত হয়েছিল একবার; স্বাধীনতার পরে ১৯৫২ সালে সংবিধানের অধিকার অনুযায়ী কানুনটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কানুনটি প্রতিস্থাপিত হয় ‘হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার অ্যাক্ট’ দ্বারা; কিন্তু, মিলিন্দ বকিল তাৎপর্যপূর্ণভাবেই লিখছেন যে, এই আইনটি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে হেনস্থা করার জন্যে বানানো না হলেও, বাস্তব পরিসরে পুলিশ-প্রশাসন এখনও ঔপনিবেশিক মানসিকতা নিয়ে চলে। তারা একজন ব্যক্তি অপরাধীর বদলে গোটা সম্প্রদায়কে ‘অপরাধী’ বলে দাগিয়ে দিয়ে অত্যাচার করে কিংবা আইনটির সুযোগ নিয়ে স্বৈচ্ছাচারী অপব্যবহার করে।¹³² অপরাধী বলে একটা সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পরে, প্রজন্মান্তরে সেই ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয় তাঁদের। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও প্রশাসনের প্রতি যে ইঙ্গিত বকিল করছেন, তার উদাহরণ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ আখ্যানেও থাকে। পীতমদের চার প্রজন্ম পরে শারিবাকেও নিজেকে না-অপরাধী বলে প্রমাণ করতে হয়। ক্ষমতা হস্তান্তোরন্তর সময়ে “থানা অফিসার বলে, বাদিয়া মুসলমান, বাজিকর আর পাখমারা নলুয়া এই তিনজন বহুত হারামি।” (২৩৫) উচ্চবর্গের সঙ্গে বা ক্ষমতাবানের সঙ্গে ঝগড়াটের পরে প্রশাসন নির্দিধায়

বাজিকরদেরই দোষী সাব্যস্ত করে ও জেলে নিয়ে যায়- কারণ, তারা ‘অপরাধী’ বাজিকর। “ছেষটি সালেও ভায়রোর কাছে এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভিখ-মাঙ্গা বাজিকর সোজা চোখে তাকিয়ে বিচার চায়!” (২৪৯) বাজিকরদের সামাজিক স্বীকৃতি এতটাই অস্বীকৃত যে স্থানীয় নিয়মকানুন বা সাংবিধানিক আইন কোনটাই তাদের জন্যে প্রযোজ্য বলে উচ্চবর্গ স্বীকার করে না। নিম্নবর্গের নিম্নবর্গতম অংশে বাজিকরদের অবস্থান, তাদের সামাজিক পরিচিতি এবং আখ্যানের রাজনীতিও একে কেন্দ্র করেই। বাজিকরদের সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থা শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকের বিস্ময় উদ্ভ্রেক করে, কারণ, তা পাঠকের দৈনন্দিনবৃত্তের বাইরে। বাজিকরদের সামাজিক অবস্থান উনিশ থেকে একুশ শতক অবধি কখনোই ‘নবজাগরিত’ বাঙালির পাঠকচিতে আসেনি এবং ক্রমাধুনিকতার বিকাশে অবজ্ঞাত থেকে গেছে। যাযাবর, বাজিকর-বেদিয়ার সম-সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যবহার বদলায়নি। বাহার ডাট রাজস্থানের পূর্ব রাজস্থানের বাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের ওপর গবেষণাকালে প্রশাসনিক রক্ষকদের (অতিরিক্ত এসপি তারিক আলম) সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে, আশেপাশের গ্রামে বা অঞ্চলে কোনও অপরাধ হলেই বাওয়ারিয়াদের সন্দেহ করা হয়। তাঁর ‘তত্ত্ব’ অনুযায়ী বাওয়ারিয়ারা নিজেদের বসবাসকৃত অঞ্চলের বাইরে অপরাধ ক’রে ফিরে আসে। তাই কোনও অঞ্চলে অপরাধ ঘটলেই বাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের বসতিতে গিয়ে তল্লাশি-খোঁজখবর করা হয়। এমনকি উচ্চস্তরীয় আইনরক্ষকরা স্বীকার ক’রে নেয় যে বাওয়ারিয়াদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় ‘extremely harsh methods’ প্রয়োগ করা হয়।¹³³ ডাট ১৯৯০-২০০৩ সাল পর্যন্ত বাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের যাযাবর যাপন ও সামাজিক ক্ষেত্র থেকে বিযুক্তির খতিয়ান দিচ্ছেন; একটা সংগঠিত ব্যবস্থার হিংসার শিকার বাওয়ারিয়ারা, সংগঠিত শ্রেণিব্যবস্থা, বর্ণব্যবস্থা তাঁদের বারবার প্রান্তিকতার প্রান্তিকসীমায় ঠেলে দিয়েছে। শোষণের সামাজিক ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক পরিসরে বাজিকর বা বাওয়ারিয়াদের প্রভেদ থাকে না।

আধুনিকতার যে অনুশীলন উনিশ শতকের প্রথম থেকে বাঙালি সমাজে শুরু হয়েছে, তার নিরিখে বাজিকরদের গোষ্ঠীযাপন ‘প্রাগাধুনিক’ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইউরোপীয় তত্ত্বচর্চার আদলে যা ‘আধুনিক’ ছাঁচে পড়ে না, তাকেই লোকায়ত (folk)¹³⁴ বলে অন্য-আলোচনার আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই লোকায়তের আলোচনায় আধুনিকতার (Modernity) সঙ্গে চিরাচরিতের (Tradition) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হয়, বাইনারি তৈরি ক’রে দেওয়া হয়। অথচ, ভারতীয় তথা বাংলার সমাজব্যবস্থায় ‘আধুনিকতা’-র চেতনা চিরাচরিতের সঙ্গে অল্পমধুর দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের পথেই এগিয়েছে। আর, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এ বাজিকরদের মতো সংখ্যালঘু অথচ নির্দিষ্ট পেশাহীন জনগোষ্ঠীকে কোন আধুনিক পাশ্চাত্য তত্ত্ব দিয়ে বিচার করা যায়? বাজিকরদের গোষ্ঠীজীবন, ভূমি-সম্পর্কের অনিশ্চয়তা এবং বারবার ভেঙ্গে-জুড়ে যাওয়ার গতিময় যাপন প্রবহমান থাকে ‘আধুনিকতার’ সঙ্গে সংঘাতে, প্রাতিষ্ঠানিক সমাজবিধি ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বিক পরিচয়ে। তারা না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক, না-স্থায়ী কৃষিজীবী, না-মধ্যবিত্ত, না-উচ্চবর্গ। আর, এই প্রতিটা নঞর্থক বাঁধন খুলতে খুলতে ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ এগোতে থাকে। এও এক সামাজিক ও রাজনৈতিক আবিষ্কার! এই যাত্রাপথে ‘লোককথার বাস্তবতা’ বারবার সংযুক্ত হয়ে যায় উপন্যাসে। অভিজিৎ সেন ‘মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা’ প্রবন্ধে এই সংযুক্তির কথাই বলছেন,

রূপকথার গল্প নয়, লোককথাও নয়, কিন্তু লোককথার বাস্তবতা (যদি এমন কিছু বলা যায়) শক্তিশালী মাধ্যম দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যে এক নয়া আধুনিকতা এনেছে। সেই আধুনিকতায় যুক্ত হয়ে আছে অপরিচিত এক রহস্যের সৌন্দর্য। ইউরোপীয় বুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্ব চর্চার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের ক্লাস্তিকর কসরতের অনুসরণের বদলে আমাদের সাহিত্যিক মুক্তি বোধহয় ওই পথেই সম্ভব হতে পারে। (সেন ২০১৩, ১৪৪-৫)

ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো বুজিয়ে নিতে ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় নেন, হেডেন হোয়াইট এই প্রশ্ন ও বিতর্কের উত্থাপন করেছিলেন। ঠিক তেমনই ঔপন্যাসিকও আখ্যান রচনায়

ইতিহাসের ‘প্রকৃত’ তথ্যপ্রমাণাদির সঙ্গে বহু না-বলা কথার নিস্তকতা জুড়ে নেন। হোয়াইট তাঁর ‘দ্য প্র্যাকটিক্যাল পাস্ট’ গ্রন্থে ইতিহাস-অনুসন্ধানী সাহিত্যের প্রসঙ্গ আনেন। আর, এখানেই উল্লেখ করেন ‘ঐতিহাসিক অতীত’ ও ‘বাস্তবিক অতীত’-এর। বাস্তবিক অতীত জনগণের ইতিহাস-প্রকরণ হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বাস্তব-অনুশীলনের জন্যে ইতিহাস নির্মিত হয়। জনগণ সেই ইতিহাসকে নির্মাণ ও ব্যবহার করে। শাসকের অনুশাসন যেমন তা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই শাসিতের নিজস্ব নির্মাণও থাকে। আর, কোনও উপন্যাসে মিথ ও লোককথা জুড়ে যায় আখ্যানে। তাতে ইতিহাসবিদের দ্রু-কুণ্ঠন হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের নতুন ভাবনাপথ খুলে যায়। গার্সিয়া মার্কেজ, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও অভিজিৎ সেন ইউরোপীয় নভেলায়নের অনুকরণ না ক’রে মিথ-লোককথা-ইতিহাস-রাজনীতির সামঞ্জস্যে স্বতন্ত্র আখ্যানভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

উচ্চবর্গ-শাসক আধিপত্যমূলক-মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে শাসিতদের চেতনায় বিভেদের বোধ জাগরুক রাখে; এক শাসিতকে অপর শাসিতের বিরুদ্ধে, এক নিম্নবর্গকে অপর নিম্নবর্গের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চায় যাতে শাসনকাঠামো স্থিতিশীল থাকে।

সাঁওতালদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে লোকজন সংগ্রহ চলছে। সে কাজ বারোজ সাহেব নিজে তত্ত্বাবধান করছে... দারোগা বলে, এমনি যদি না যেতে চাও, বেঁধে নিয়ে যাব, তাও না যেতে চাও, আগুন দিয়ে সমস্ত ছাউনি পুড়িয়ে দেব... ধন্দু, বালি, পরতাপ, পিয়ারবক্স এবং জিল্লু এই পাঁচজন মনোনীত হয়। বারোজ তাদের নিজে পছন্দ করে। বাজিকরদের সেরা পাঁচ যুবক যুদ্ধে যায়। (সেন ১৯৮৫, ৬৯)

ইংরেজরা জোর ক’রে পাঁচ বাজিকর যুবককে নিজেদের পক্ষে যুদ্ধে ধরে নিয়ে গেলেও, সেই যুবকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সচেতন বিশ্বাসঘাতকতা ক’রে যোগ দেয় সাঁওতালদের পক্ষে, জিল্লু-পরতাপরা বন্ধু ডুমকা সোরেনের বিদ্রোহের ভাগীদার হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাজিকরদের যুদ্ধে যোগ দেবার তথ্যাদি কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস বইতেই নেই; এমনকি,

শাসকের ইতিহাসচেতনার বিপ্রতীপে নতুন-ইতিহাসচেতনায় যাঁরা লিখছেন, সুপ্রকাশ রায়, সুশোভন সরকার বা সুমিত সরকার- তাঁরাও কেউ বাজিকরদের সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার কথা বলছেন না। তাহলে বাজিকরদের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে যোগ দেওয়া কি ইতিহাস-অসম্মত নির্জলা মিথ্যে? সাহিত্যের কল্পনা ও আখ্যান ইতিহাসের নীরস তথ্যাবলীর থেকেও পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় এই কারণেই বোধহয়। অভিজিৎ সেন বাজিকরদের শতকব্যাপী কালবিস্তৃতি উল্লেখ করছেন এবং এই কালবিস্তৃতিতে বহু রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাতের সাক্ষী তারা; সাঁওতাল বিদ্রোহও সেরকমই এক রাজনৈতিক ঘটনা।¹³⁵ আর, উপন্যাসটির রাজনৈতিক অভিমুখ তথা বাজিকরদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্টতর হয় যখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তারা নিপীড়িত-শোষিত মানুষদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং শোষক-নিপীড়ক-সামন্ত শ্রেণির সঙ্গে সচেতন বিশ্বাসঘাতকতা করে। চার বাজিকর যুবক যেসময় ডুমকা সোরেন, চাঁদ রাই, শ্যাম পারগাণার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছিল, ঠিক সেই সময়েই দারোগা-ইংরেজের অত্যাচারে বাজিকররা বিপন্ন হয়। সমকালস্থানে ধর্মিতা সালমার অভিষাপের সঙ্গে বন্দি চেতন মাঝির দুর্যোগকাজ্জ্বার মিল থাকে। পীরপৈঁতি পাহাড় থেকে দলে দলে সাঁওতাল সৈন্য মেজর বারোজের সৈন্যদলকে আক্রমণ করলে চেতন মাঝি শীর্ণ-জীর্ণ ধুলোমাখা বন্দি চেহারা নিয়ে আকাশের মেঘকে বলে, “নাম, নাম, আকাশ ভেঙে নাম।” (৭২) এই ঘটনার পরেই বাজিকর যুবকেরা ব্রিটিশদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ঘোড়া ও বন্দি চেতন মাঝিকে নিয়ে পালায়। তারপরেই দারোগা জানকীরাম বাজিকর ছাউনি তছনছ ক’রে পীতমকে বন্দি ক’রে অত্যাচার শুরু করলে সালমার প্রতিরোধ শুরু হয়, “সর্দারের গায়ে হাত দেবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার। এক থাবা ধুলো নিয়ে সালমা তাতে থুথু ছিটায় এবং বিড়বিড় করে। টানা-হেঁচড়াতে তার উড়নি খসে পড়েছে... ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাকে” (৮০) সালমার এই প্রতিরোধ ‘লোকজ সংস্কারকেন্দ্রিক’, বাজিকরদের তুকতাক-কালোজাদুর মিথ্যেকেন্দ্রিক; কিন্তু, সিপাইদের মনে ভয় সৃষ্টি করে সালমার এই অর্ধ-উন্মাদিনী তান্ত্রিকপ্রায় ব্যবহার। আর, জানকীরাম আরও

আধুনিক-মনস্ক¹³⁶ বলে সে এইসব তুকতাক-জাদুতে অবিশ্বাসী নির্ভয়; অথচ, তাকেও সালমা প্রতিহত করে। পীতেমকে রক্ষা করতে, বিপন্ন বাজিকরদের ছাউনি-পরিবার রক্ষা করতে সালমা নিজের শরীরকে অস্ত্র করে তোলে- “যখন সে দেখে দারোগা তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করার প্রয়াস পাচ্ছে, সে আর বাধা দিল না... সে এই ভেবে স্বস্তি পায় যে আপাতত এই ত্রুদ্র দানবীয় মানুষটাকে পীতেমের উপরে আঘাত করা থেকে নিরস্ত করতে পেরেছে।” (৮১) শরীরও রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, ইতিহাসে এ প্রমাণ তো অনেক, সাহিত্যেও। মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী (১৯৭৭)’ গল্পের দোপ্দ্দী মেঝেন, ‘ধৌলি’ গল্পের ধৌলি তাঁদের শরীরী প্রতিরোধকেই নতুন প্রতর্ক ক’রে তোলেন। দোপ্দ্দী মেঝেন সেনানায়কের সামনে যখন রক্তাক্ত নিরাবরণ শরীরে নির্ভয়ে এগিয়ে যান, “সেনানায়ক ওই নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান”। গীতা হরিহরণ বাস্তবে ও সাহিত্যে (‘দ্রৌপদী’) রাষ্ট্রের দ্বারা অত্যাচারিত নারীদের শারীরিক প্রতিরোধ প্রসঙ্গে ‘হোয়েন বডি স্পিকস’ প্রবন্ধে লেখেন,

What happens when a woman’s naked body speaks? Draupadi does not suddenly turn into a leader. But she becomes a source of power insofar as she turns her wounded body into a weapon. In that brief lightning flash, her ravaged woman’s body, the “unarmed target,” terrorizes her plunderers. It threatens Senanayak’s manhood, the source of his power. When a woman’s naked body speaks, its language can turn the victimized body into a speaking, fighting one. Her body is no longer only for the powerful male to inscribe upon; her body turns her into an inscriber. Surely we have heard this language before, in homes or on the streets? It should be familiar,

but something, its challenge to acceptable language, perhaps, makes it bold, even shocking. (Hariharan 2017, 18)

শরীরের রাজনীতিতে পুরুষতন্ত্রের আরোপিত ‘ব্রীড়া’, লজ্জা এবং অঙ্গচেতনা প্রত্যাখ্যান করে দোপ্‌দী মেবোন বা সালমা। দোপ্‌দী কিংবা মণিপুরের নারীরা¹³⁷ দোপ্‌দী মেবোন নকশালবাড়ি বিদ্রোহের দ্রোহী ছিল বলেই রাষ্ট্র তাকে খুঁজে বেড়ায় ও সেনানায়ক তার অধস্তন সেনাক্রমীদের দোপ্‌দীকে “বানিয়ে নিয়ে আসা”র নির্দেশ দেয়। ইতিহাসের দ্রোহের ধারাতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের লিঙ্গচেতনায় বদল আসে; সামাজিক আরোপিত লিঙ্গধারণাকে প্রত্যাখ্যানের নতুন পন্থা অবলম্বন করেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্রোহী নারীরা। পুলিশ ও রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের নির্যাতনের শারীরিক ক্ষত তাঁদের কাছে আর ‘লজ্জা’ বা ‘গোপন’ বিষয় নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের প্রকাশ্য চিহ্ন। মল্লারিকা সিংহারায় নারীমুক্তির এই রাজনৈতিক বিবর্তন বিষয়ে লিখছেন,

Sexually violated women in Singur and Nandigram have inverted the narrative of law-preserving violence by exposing the marks of violence on private parts of their own bodies. They are scripting a non-heroic idea of female militancy, which is uncontainable within a heroic narrative of suffering and sacrifice. The instrumentality of sexual violence, governed by gendered relations of power, is resisted by these women as they deploy those very marks of violence to shame their attackers. One fact-finding team reported, that in order to expose the rule of violence, peasant women of Singur gave evidence of sexual torture by the police before a panel that

comprised Medha Patkar and others at a public hearing organised on 27 October 2006. (Sinha Roy 2012, 128-9)

রাজনৈতিক উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের উপস্থাপনা ও সাহিত্যে তার প্রকাশভাষার ক্রমবিবর্তন বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে।

উপন্যাসে ইতিহাসের সংযুক্তি ঘটে, মধ্যবিত্তের কল্পনাখ্যান থেকে মুক্তি পেয়ে উপন্যাস ইতিহাসের খুঁটিনাটি উল্লেখও ভোলে না। ভদ্রলোকীয়-স্বচ্ছলবিত্তের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সাঁওতালদের ওপরে দিকুদের অর্থনৈতিক শোষণের বাটখারাটুকুও তাই জুড়ে যায় ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসের কাহিনিতে। ‘সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস’ বইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে রাজমহল অঞ্চলে মহাজন-জোতদারদের শোষণের উল্লেখ করেন ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণাদি সহ। কালীকিঙ্কর দত্তের ‘The Santhal Insurrection’ থেকে অনূদিত বর্ণনায় উল্লেখ করেন,

ফসল কাটার সময় আসলেই মহাজনেরা গরুর গাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে বাৎসরিক আদায়ের জন্যে বের হত। তারা আসবার পথে একটা পাথর সংগ্রহ করত এবং তার ওজন নির্ভুল দেখাবার জন্যে সিঁদুর মাখিয়ে রাখত। এ ছাড়া মহাজনরা দুরকম বাটখারা রাখত- (১) কেনারাম বা বড় বৌ যেটি সাধারণ ওজনের থেকে সামান্য বড়... (২) বেচারাম বা ছোট বৌ যেটি সঠিক মানের ওজন থেকে কম... তারা সুদও অত্যন্ত বেশি হারে আদায় করত। (বাস্কে ১৯৬০, ৩৬-৭)

তৎকালীন ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকাতেও ওজনচুরি ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ তথা সুদ অনাদায়ে সাঁওতাল খাতকের ওপরে অত্যাচার ও পারিবারিক ধ্বংসসাধনের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল।¹³⁸ দাঁড়িপাল্লায় ওজনে সরলমতি সাঁওতালদের ঠকানো আর ঋণের শর্তে জমি-বাড়ি ‘ক্রোক’ করার এই বৃত্তান্ত তো ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসেও থাকে। জিল্লু মজাহন পতিত সাউয়ের ওজনের

কারচুপি ধরে ফেলার পরে লক্ষ্মণ সোরেন ক্ষমতাবান পতিত সাউয়ের চোখে চোখ রেখে উত্তর দেয়,

গতবার তোমাকে বলেছিলাম সরকারি বাটখারা নিয়ে এসে ধান ওজন করবে, অথচ এবারও তুমি এই পাথরগুলো নিয়ে এসেছ... এ পাথর তোমার লক্ষ্মী, আমরা জানি, কিন্তু এ পাথর সাঁওতালের দুশমন। আমার ঘরে পাঁচসেরি সরকারি বাটখারা আছে। এবার তোমাকে সেই বাটখারা দিয়ে ধান মেপে নিতে হবে। (সেন ১৯৮৫, ৪৪-৫)

বাজিকরদের সঙ্গে সাঁওতালদের শ্রেণিবন্ধনের সূচনা ওখানেই, অর্থনৈতিক শোষণের সজ্জাবদ্ধ বিরোধিতায়। আর, ১৮৫৫ সাল থেকে বাস্তবের সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের প্রতিস্পর্ধী প্রতিরোধের শুরুও অর্থনৈতিক শোষণের ভিত নড়িয়ে দেওয়া শ্রেণিসংগ্রামে। ব্রিটিশদের সঙ্গে দিকু জমিদার-মহাজনদের আঁতাত যে কল্পকাহিনি নয়, বরং ব্রিটিশ প্রবর্তিত জমি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণবন্ধুত্ব, তার উল্লেখ সুনীতি কুমার ঘোষও করেন। “১৭৯৯ ও ১৮১২তে আইন করে তারা বাকি খাজনার দায়ে কোর্টে না গিয়েই কৃষকদের গরু-ছাগল, ফসল, ঘটিবাটি প্রভৃতি সব ক্রোক করার, এমনকি কৃষকদের পর্যন্ত ধরে আটকে রাখার ক্ষমতা জমিদারদের দিয়েছিল।”¹³⁹ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ একদম এক কাহিনি বলে। সুনীতি ঘোষের মতে, ব্রিটিশদের জমিনীতি জমিদারশ্রেণিকে মহাজনবৃত্তিকে জমিকেন্দ্রিক কৃষকশোষণের মূল ক্ষমতাবান ক’রে তুলেছিল; আর, এই উপন্যাসের সাঁওতালরা এই শোষণেরই শিকার হয়। বাজিকররাও জমি না পাওয়ার, থিতু না হতে পারার যে সঙ্কটে ভোগে, তারও প্রত্যক্ষ কারণ ব্রিটিশ-প্রবর্তিত জমি-অর্থনীতি। ব্রিটিশদের সঙ্গে দিকুদের বন্ধুত্ব আর সাঁওতালদের সঙ্গে বাজিকরদের বন্ধুত্ব ইতিহাসের সারবস্তুকে উপন্যাসের আখ্যানে বদলে নেয়। ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের এই সংযুক্তিতে নিম্নবর্গের দ্রোহসূচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওই শোষণকাঠামোর বাইরে থাকা পাঠকের। আর, উপন্যাসের এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ কি দ্রোহবৃত্তান্তের চেনা পরিসরকেও চ্যালেঞ্জ জানান? সাধারণতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসে নিম্নবর্গের-নির্বিক্তের দ্রোহের উপস্থাপনায় মূল

অনুঘটকের ভূমিকায় দেখা যায় কোনও মধ্যবিত্ত বিপ্লবী নায়ককে এবং দ্রোহের পরিচালক শক্তি হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের প্রয়োগকৃত ও অনুশীলিত তত্ত্ব। কিন্তু, এই উপন্যাসে কোনও রোম্যান্টিক নায়ক নয়, মধ্যবিত্ত ‘মেসিহা’ নয়; বরং, এক নির্বিকৃত-শোষিত বাজিকর যুবক অপর এক নির্বিকৃত-নিপীড়িতের সঙ্গে দ্রোহের ভিত্তি তৈরি করে, অনুঘটক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক উপন্যাসের কেন্দ্র-সংলাপে এ উল্লেখ উপন্যাসের নবায়ন ঘটায়।

উপন্যাসের পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে প্রতিরোধী নায়ক হয়ে ওঠে ডুমকা সোরেন, শ্যাম পারগাণারা। অনুপুঞ্জ ইতিহাসরচনার দায় নেই উপন্যাসিকের, সেই জন্যেই কি অভিজিৎ ‘নায়ক’ হিসাবে নির্মাণ করেন ডুমকা বা শ্যামকে? সিধো ও কানহোর উল্লেখ থাকে, বিদ্রোহের মূল সূত্রধর হিসেবে, কিন্তু বাজিকরদের লড়াই-শ্রেণিবন্ধুত্বের নায়ক ডুমকা। আর, ‘রছ চণ্ডালের হাড়’ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে এই জন্যেই যে, সিধো-কানহো-চাঁদ-ভৈরবদের মতো ইতিহাসচর্চিত দ্রোহী সাঁওতাল নায়কের কাহিনি নয়, বরং শ্রেণি-সংগ্রামের উপলক্ষ্যই এখানে মূল। আর, ‘বিদ্রোহ থেকেই নেতার জন্ম হয়’- এই দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনকেই প্রতীয়মান ক’রে তোলেন অভিজিৎ। যদিও, বিদ্রোহের গতি, বাঁকবদল ও স্তব্ধতার ঔপন্যাসিক আখ্যানের সঙ্গে ইতিহাসের সামঞ্জস্য থাকে।

কিন্তু, অভিজিৎ সেন এও জানাতে ভোলেন না যে, সাঁওতালদের আর বাজিকরদের অর্থনৈতিক ভিত্তি এক নয়, “সাঁওতালরা যে শোষণে নিপীড়িত, সে ধরণের শোষণেরে সঙ্গে বাজিকরেরা অভ্যস্ত নয়।” শ্রেণিচেতনার পার্থক্যের কথাই কি বলছেন? যেহেতু জমি-সম্পর্কের অর্থনৈতিক চেতনা বাজিকরদের নেই? ব্রিটিশ-দিকুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বাজিকরদের সরে আসার একটা কারণ শ্রেণিচেতনতার অসম্পূর্ণ বিকাশ; বস্তুতঃ যেহেতু চারণ-অর্থনীতি এবং অস্থায়িত্ব তাদের মূল আর্থ-সামাজিক ভিত্তি, সেইজন্যেই কি তারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করলেও বিদ্রোহের পরিণতি পর্যন্ত শ্রেণিবন্ধুত্ব অটুট রাখতে পারে না? আর, এই কারণের ভিত্তিতেই ‘তাৎক্ষণিক লাভালাভকেই বেশি মূল্য দিতে’ তারা বিদ্রোহ থেকে সরে আসার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে? আর, দ্বিতীয় কারণ- সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে বাংলার রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ইংরেজদের সাহায্যার্থে হাত-সৈন্য-রসদ-অর্থ পাঠালেও, সেই ক্ষমতা বাজিকরদের ছিল না¹⁴⁰। ওই পাঁচ বাজিকর যুবকের শারীরিক বল ছাড়া আর কোনও সাহায্যেই তারা অক্ষম ছিল; ফলে, যুদ্ধে সাঁওতাল ও বাজিকরদের সাধারণ শত্রু অভিন্ন হলেও যুদ্ধ চালানোর ‘সংগ্রামী বন্ধুত্ব’-র মানসিকতায় পিছিয়ে পড়েছিল তারা। কিন্তু, তাদের কিছুকালের অংশগ্রহণেও তারা বিদ্রোহী সাঁওতালদের সঙ্গে জোট বেঁধে ব্রিটিশ+দিকু+জোতদার-জমিদার জোটের বিরুদ্ধে লড়েছিল; আরও স্পষ্ট করে বললে বাংলার উচ্চবর্গীয় শোষকদের মহাজোটের বিরুদ্ধে ছিল সাঁওতালদের বিদ্রোহ, যাতে সঙ্গ দিয়েছিল বাজিকরেরা। ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে মুণ্ডাবিদ্রোহের সমর্থক, বিরসার একদা সহপাঠী অমূল্যর সঙ্গেও কি এই সামাজিক অবস্থানগত ও শ্রেণিগত পার্থক্যই থেকে যায়? “তুমি আজ ভাল আছ। যখন মিশন হতে বেরোবে? যখন ডাক্তার হবে? তখন কি ভাল থাকবে? আমার সঙ্গে কথা বলতে লাজ লাগবে-”¹⁴¹ অমূল্য বিরসার চোখে ‘অপর’, অমূল্য আব্রাহামের ‘ভাল’ থাকা নিয়ে দ্বিধাস্থিত বিরসা কারণ, অমূল্যর সমশ্রেণিঅবস্থানের লোকেরা মুণ্ডাদের ঘৃণা করে। কিন্তু, বাজিকরেরা যেমন ‘যুদ্ধের পরিণতি বুঝতে পেরে’ সাঁওতাল যোদ্ধাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়, তেমনটা করেনি অমূল্য বা জেকব। অমূল্যও নিশ্চিতভাবেই বোঝেন মুণ্ডাদের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি- পরাজয় এবং ফাঁসি-জেল।

‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে বীরসার নেতৃত্বে বিদ্রোহের নিঃসঙ্গ সঙ্গী হয় অমূল্য আব্রাহাম। বীরসার কাহিনি নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের মূলকেন্দ্র; ধীরে ধীরে বীরসা চরিত্র হয়ে ওঠে, রক্তমাংসের দ্রোহী থেকে উলগুলানের মিথে বিবর্তন রাজনৈতিক আখ্যান। কিন্তু, অমূল্য আব্রাহামের উত্তরণও তো ঘটে। ‘অরণ্যের অধিকার’ নিয়ে যাবতীয় বিদ্যায়তনিক পরিসরে অমূল্য আব্রাহামকে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। অথচ, বীরসার শোষিত শ্রেণিবোধ থেকে সংগ্রামী চেতনায় ব্রিটিশ আর দিকু বিরোধিতা যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, অমূল্য আব্রাহামের শ্রেণিবোধ তার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ‘অরণ্যের অধিকার’-এর রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠার ভিত্তি অবশ্যই এই শ্রেণিবোধ, যা

অমূল্য আব্রাহামের মতোই লেখক মহাশ্বেতাও ধারণ করে। সেই জন্যেই ‘মূলস্রোত’-র বিরোধিতার স্বর জেগে থাকে। আর, যুক্ত হয়ে যায় শতক-দশকব্যাপী মূলবাসী অভ্যুত্থান। ইতিহাসের উপন্যাসীকরণ হওয়ার মূলবস্তু (rohstoff) সংগৃহীত হয়-

“আদিবাসী” সমাজের উপর প্রচণ্ড মূলস্রোতীয় অত্যাচারের কারণেই বিরসার বিদ্রোহ। অবশ্য আমি এবং আমার মতো মানুষ যাঁরা বিশ্বাস করেন, ওঁরাই মূলস্রোত, ভারতে আগে থেকেই ছিল, আমরা পরে এসেছি, আমরা একসঙ্গে আছি। যেসব কারণে বিরসার বিদ্রোহ হয়, মোটামুটি সেসব কারণেই ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের খেরোয়ার বিদ্রোহ, এগুলি ঘটে... ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কারণেই জমিদার-জোতদার-মহাজন-নায়েব-গোমস্তা-পুলিশ-থানা-আদালত ইত্যাদি আদিবাসী জনজীবনে ঢুকে পড়ে। (দেবী ১৪১৮, ভূমিকা ১২)

মহাশ্বেতা দেবী যেমন ‘মূলস্রোত’ ধারণাটির পাল্টাপ্রস্তাব রাখতে চান, অমূল্য আব্রাহামও¹⁴² তো সেরকমই চায়। তাই, আদিবাসী সমাজের শোষণবিরোধিতার সংগ্রামে একাত্মবোধ করে। অমূল্য ‘বাবু’ বা ‘সাহেব’ পরিচিতি প্রত্যাখ্যান করে। জেলবন্দী মুণ্ডাদের ন্যূনতম অধিকারের দিকে খেয়াল রাখে এবং কলকাতার দেশি ও বিদেশি খবরের কাগজগুলোতে এবং মুণ্ডাদের বিনা-পয়সার আইনজীবী জেকবকে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের সমস্ত তথ্যাবলি পাঠায়¹⁴³। অমূল্য নিজেকে মধ্যবিত্ত প্রিভিলেজড বলে চিহ্নিত করে, পরিচায়িত করে। কিন্তু, তার মধ্যবিত্তশ্রেণিসুলভ মানসিকতা দিয়ে নিম্নবর্ণের দ্রোহকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না। নিজস্ব অবস্থানের সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করেই সে বীরসার উলঙলানে একাত্মবোধ করেও নিজেকে বিযুক্ত রাখে; নীরব কথকের ভূমিকা পালন করে চলে। বীরসার সঙ্গে অমূল্যের বন্ধুত্বের শর্তই ছিল সামাজিক অবস্থান প্রত্যাখ্যানের, “একটা বাবু ছেলে হাত ধরেছিল। তার নাম অমূল্য... যদি দিকু হোস্ নাই, তবে কথা বলব। নয়তো বলব না।”¹⁴⁴ চিহ্নিত অমূল্য আব্রাহাম ইতিহাসসম্মত ‘চরিত্র’ নয়, উপন্যাসের কুশীলব- আখ্যান কথনের ভার তারই ওপর। আর, তার প্রত্যক্ষদর্শী

বয়ানেই উপন্যাসের রাজনীতি স্পষ্ট হয় আরও- উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ। অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে। অমূল্য আব্রাহাম ব্রিটিশ শিক্ষা-আদবকায়দা রপ্ত করা বাঙালি ডাক্তার; মুণ্ডাসমাজ ও ব্রিটিশশাসকদের মধ্যে আত্ম-অপর রাজনীতির দোদুল্যমান সেতু হিসেবে থাকে, বিরসার চোখে সে যে ‘অপর’, এই চেতনাই তাকে মুণ্ডাবিদ্রোহের নীরব সক্রিয় সমর্থক ক’রে তোলে। অমূল্য নিরপেক্ষ থাকার ভান করে না, শাসক ও দ্রোহীদের থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার নিরাপদ অবস্থান নেয় না। তার পক্ষপাত এমনকি ব্রিটিশ অফিসারদেরও চক্ষুশূল হয়। অমূল্য আব্রাহাম যতই মিশনারি স্কুলে পরে ডাক্তার হোক, আসলে, শাসকের চোখে সেও যে অপর- এই বোধ থেকে অমূল্য সরে আসেন না কখনো। “আমি শুধু এইটুকুই পারি, বাকি জীবনটা বুঝতে চেষ্টা করতে... আমি লিখছি।”¹⁴⁵ অমূল্য আব্রাহাম ব্রিটিশদের চাকরি ছেড়ে মুন্ডাদের দ্রোহকথা লেখেন, ‘বীরসার মরণ নাই। উলগুলানের শেষ নাই।’- এই বাক্যে বিশ্বাস করেন। শ্রেণিবিচ্ছ্যতির চেতনায় এই যে নতুন শ্রেণিবোধে উত্তরণ, অপর-এর স্বরে অপরের আখ্যানরচনার সাহিত্যপদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটায়।

‘অপর’-এর চোখ দিয়ে ‘অপর’-এর আখ্যান বলার এই ঔপন্যাসিক নীতি (কৌশল নয়, নীতি) কি ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৬৩)’-তেও থাকে না? কালী সাঁতরা পার্টিতে একঘরে, সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোয় ব্রাত্য। অথচ, কালী সাঁতরাই বারবার বসাইকে আইডেন্টিফাই করতে যায়। “প্রশাসন কালী সাঁতরাকে বলে, “যাও, টুডুকে শনাক্ত কর।” তারপর গোপন ফাইলে লেখে, “সন্দেহজনক চরিত্র। বসাইকে শনাক্ত করতে গেছিল।”¹⁴⁶ কালীর চোখ দিয়েই পাঠক বসাইয়ের স্বাতন্ত্র্য চিনতে পারে। অমূল্য আব্রাহাম যেমন তার ‘বাবুত্ব’ আর উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের সামান্য গর্বও না-রেখে বীরসাদের উলগুলানের শরিক হয়, কালী সাঁতরাও তেমনই বসাইয়ের প্রতি পক্ষপাতী। আর, আখ্যানের কথক এই অবস্থান থেকে ইতিহাসকে যখন দেখে, তখন তা শাসকের ইতিহাস থেকে আলাদা হয় বৈকি! নিম্নবর্গের বসাই টুডু, যে সামাজিক অবস্থানে এবং সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে ‘অপর’-অবজ্ঞা পেয়ে এসেছে উচ্চবর্গের নেতাদের

‘আত্ম’-র কাছে, তার সাথে কালী সাঁতারার নীতিগত সংযোগ তৈরি হয়। বীরসা যে কথা অমূল্য আব্রাহামকে বলতে চেয়েছে, বসাই হয়তো সেই কথাটিরই ক্রমান্বয় ঘটায়, “বাবু কমরেট আছ, কিন্তুক সাচাই, বেইমানী হারামি জানে না। কালীবাবু, তুমু ভি সান্তাল হল পাৱতু। তুমুও লেংটা রয়ে গেলা, আমুও”। বসাইকে রাষ্ট্র-পুলিশ-সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি সকলেই শত্রু বানিয়ে খুন করতে চায়, কিন্তু কালীবাবু সেই সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক আচরণের সঙ্গে ‘আত্ম’স্থ হতে পারেন না, বরং বসাইয়ের অপরসত্তা তাঁর নিজস্ব অপরসত্তার চেতনা জাগরুক রাখে।

কালী সাধারণ পার্টিকর্মী, তার শরীর ক্ষয় কিছু নয়। তার ত্যাগ, ত্যাগ নয়। তার সর্বস্ব দান কিছু নয়! কালী এক্সপেন্ডেবল্। তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে... সে পার্টির জন্যে জান দিচ্ছে, কিন্তু পার্টি তাকে সর্বদা বুঝিয়ে দিচ্ছে সে এক্সপেন্ডেবল্... কালী সাঁতারার মতো হাজার হাজার কর্মী ম্যাটার করে না কিছু। সব কমুনিস পার্টিই কালী সাঁতারাদের ইগনোর করতে পারে। (দেবী ১৪১৮, ৩৯)

কালী সাঁতারার পার্টির ভেতরে প্রান্তিক হয়ে যাওয়া ক্রমশঃ আরও বাড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী বলে পরিবার তাকে একঘরে করে এবং দেওকী মিসিরের মতো এসআই দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে তার অস্তিত্বকে পিষে দিতে চায়। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতালদের লড়াই এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে বিরসা মুণ্ডাদের লড়াই আরও বিস্তৃত হয় ১৯৬০-৭০ দশকে এসে। মূলবাসী মানুষকে দেশী ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে সামাজিক অবস্থানের বৈষম্য ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। অভিজিৎ সেন ও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে দ্রোহী-কৃষক মূলবাসী মানুষেরা তাঁদের লড়াইয়ের সঙ্গী হিসেবে অপরদের খুঁজে পাচ্ছেন- কখনো তা গোষ্ঠী (বাজিকর) আবার কখনও তাঁরা ব্যক্তি (অমূল্য ও কালী সাঁতরা)। কালী সাঁতারার স্বগতকথনে, চিন্তাসূত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠকের সঙ্গে বসাই টুডুর পরিচিতি ঘটে। বসাইয়ের সঙ্গে কালী

সাঁতরার কথোপকথনে উঠে আসে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্র। বসাইয়ের পাঁচবার মৃত্যুর পরেও কালী সাঁতরা বসাই ও তার দ্রোহাদর্শের প্রতি প্রবল আদর্শেই বসাইয়ের পালিয়ে যাওয়ার খবরে নিশ্চিত হয়। আর, বসাই একমাত্র কালীর চেতনাপ্রবাহসূত্রেই সংযোগস্থাপন করতে পারে, “ষষ্ঠ, সপ্তম-অষ্টম, মরণ বলতে কিছু নাই হে কমরেট”¹⁴⁷ বসাই টুডু, দোপ্‌দী মেঝেনদের পরিচিতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সংসদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সামন্তর ভূমিকা আলাদা কিছু নয়, কালী সাঁতরা সেই ফাঁকটুকু ভরাট করতে পারছে। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, ‘অরণ্যের অধিকার’ বা ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-র মতো উপন্যাসে অপরের চোখ দিয়ে অপরকে পাঠকসম্মুখে হাজির করার সাহিত্যপদ্ধতি কি অন্তর্ঘাতী বাচনকৌশল নয়? হোসে ম্যানুয়েল গোয়া মিথ ও অন্তর্ঘাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বাচনের অন্তর্ঘাত, অবয়বের অন্তর্ঘাত এবং ট্রান্সডেন্টাল অন্তর্ঘাতের উল্লেখ করছেন।¹⁴⁸ নিম্নতল থেকে উঠে আসা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বয়ানগুলোই প্রতিস্পর্ধী বয়ানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে ইতিহাসবিদ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের তত্ত্ব স্মরণ করা প্রয়োজন। নিম্নতলের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রক্ষেপে বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজের শ্রমের প্রশ্নকে মূলে রেখে বিভিন্ন নিপীড়িত সত্তাকে আলোচনার পরিসরে আনতে চেয়েছেন¹⁴⁹। তাঁর সিদ্ধান্ত,

the history of the 'oppressed' or 'history from below' is not merely the addition of some 'radical' topics to the historians' stock in trade. It may mean a break from the paradigms of pre-independence vintage. Its practice demands that we pay more attention to new problems of method... History of the poor should not be just poor history... It means that this kind of history is harder to write (Bhattacharya 1983, 15)

সব্যসাচী ইতিহাসলেখ-র নবতত্ত্ব তথা শোষণের ইতিহাসলেখ-র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মতামত উল্লেখ করেও এই প্রবন্ধে জোর দিচ্ছেন ভারতের শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণি এবং নিপীড়িত শ্রেণির ইতিহাস অনুসন্ধানে। অভিজিৎ সেন কিংবা মহাশ্বেতা দেবী উপরিউক্ত উপন্যাসগুলোতে নিম্নবর্ণের ও নির্বিত্তের ইতিহাস অনুসন্ধানই করছেন, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। সব্যসাচী যে কাজকে বলছেন পরিশ্রমসাধ্য (harder to write), এই উপন্যাসিকেরা সেই কাজটাই করছেন, ফলে নিশ্চিতভাবেই বাংলা উপন্যাসের ধারায় বিবর্তন ঘটছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিণতির ইতিহাস কোনও ইতিহাস বইতে পাওয়া যাবে। যদিও, উত্তর-ঔপনিবেশিক বিদ্যাচর্চা ও নিম্নবর্ণ বিদ্যাচর্চার পরিসরে ইতিহাস বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিক ইতিহাসপাঠ বা ক্ষমতাবানের লেখা ইতিহাসপাঠ থেকে ভিন্ন। কিন্তু, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে ইতিহাসের সালতামামির বাইরেও ঢুকে যায় মিথ, অভিশাপ এবং মুখফেরতা আখ্যান। ইতিহাসের শিরদাঁড়ায় আখ্যানের রক্তমাংস লেগে উপন্যাসের শরীর নির্মাণ হয়, যার হৃৎপিণ্ড রাজনৈতিক। বীরত্বের আত্মবলিদানের কাহিনির পাশাপাশি থাকে পরাজয়ের বিবরণীও। ডুমকা মাঝিকে অভিশাপ দেয় তার মা পীথা মুর্মু,

উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে সে বলে, তোদের সর্বনাশ হবে। তোরা কোনো নিয়মকানুন মানছিস না। সাঁওতালদের রীতি-নীতি এমন নয়... পীথা ভাবতে পারেনি ডুমকা তার নির্দেশ অমান্য করবে। কিন্তু ডুমকা তার পিতৃহত্যাদের ক্ষমা করতে পারে না। যুদ্ধে এ ধরনের দয়ার কোনো দামও নেই। আর পীথা ভাবছিল সে মানুষটা থাকলে এমন কখনোই হতে পারত না... যারা স্বজন হারিয়েছিল তারা প্রতিশোধের আনন্দে চিৎকার করছিল। পীথা উচ্চস্বরে অভিশাপ দিচ্ছিল ডুমকা ও তার সহকারীদের। (সেন ১৯৮৫, ৮৪)

উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠে এই প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকে পড়ে উপন্যাসের শরীরে। উপন্যাসটি সেইজন্যেই শুধুমাত্র ‘ঐতিহাসিক’ থাকে না, কিংবা শুধুমাত্র ‘সামাজিক’ বর্গে আঁটে না। যদিও, এই দু’টি বৈশিষ্ট্যই থাকে এতে।¹⁵⁰ প্রামাণ্য ইতিহাসের বিপরীতে কিছু বলে না, কিন্তু, ইতিহাসও সময়ের যে ফাঁকগুলিকে ছুঁতে পারে না, সেই ফাঁকগুলোকে ভরাট ক’রে তোলে ‘খোয়াবনামা’, ‘অরণ্যের অধিকার’ বা ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ এবং তা হয় ইতিহাসের গতিপথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। পিয়ালাপুরের যুদ্ধে মেজর বারোজের বিশাল অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে সিধো-কানহোর বাহিনী¹⁵¹। পীরপৈঁতি পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে ঝটিকা আক্রমণে ব্রিটিশ ও দিকুদের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ক’রে দেয়, ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য এটা। কিন্তু, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এ এই পিয়ালাপুর অধ্যায়েই চেতন মাঝির সঙ্গে পুনর্সাক্ষাৎ হয় বাজিকর যুবকদের এবং এখানেই ব্রিটিশদের তাঁবু থেকে পালিয়ে গিয়ে সাঁওতাল যোদ্ধাদলে যোগ দেয় জিল্লু, পরতাপ, পিয়ারবক্স ও বালি এবং তারা ছিনিয়ে নিয়ে যায় পাঁচটি ঘোড়া ও বন্দী চেতন মাঝিকে। তৎকালীন পত্রপত্রিকা (সংবাদ প্রভাকর, ক্যালকাটা রিভিউ) ও ইতিহাসবিদদের বয়ানের সঙ্গে মিলে যায় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির কথা এবং শ্যাম পারগাণার নিহতসংবাদ,

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে, ঝড়ে পাহাড়ের গাছ-পালা দুলতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব বুঝলেন যে, বৃষ্টি সন্নিবর্ত... ইংরাজ সৈন্যদের ভাগ্য ভাল যে সাঁওতালরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। কারণ, শ্যাম পরগণাইতের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মৃতদেহ নিয়ে ফিরে গেল তাদের শিবিরে। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে মেজর বারোজ নীরবে, নিঃশব্দে ভাগলপুরে ফিরে এলেন। (বাক্সে ১৯৬০, ৭৮)

সংগ্রামপুরের যুদ্ধে সিধো-কানহো সহ বাকিদের পরাজয় এবং উপনিবেশ-বিরোধী সাঁওতাল অভ্যুত্থানের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐতিহাসিক এই ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসে মিশে যায় সামাজিক উপাদান- ডুমকা সোরেনের মৃত্যু এবং পীথা মুর্মুসহ চারজন নারীকে ডাইনি অপবাদে

কুপিয়ে খুন করা¹⁵²। বাজিকরদের সঙ্গে সাঁওতালদের বাঁধন ছিল হয় এই পর্বে এসে। আর, ‘অপর’-র চোখ দিয়ে ‘অপর’-এর আখ্যানবুনন, যেখানে ইতিহাস ও কাল্পনিক মিলিয়ে উপন্যাসের নবায়ন ঘটে, তা শেষ হয় বাজিকরদের যুদ্ধ ছেড়ে নিশ্চয়তার খোঁজে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনিতে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি মুসলমান সাহিত্যবর্গের দ্বন্দ্ব

হিন্দু জাতীয়তাবাদী উত্থানের রাজনীতিতে জারিত হয়ে ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক উপন্যাসের ত্রিবেণীসঙ্গমে বাংলা সাহিত্য নতুন দিশা পেয়েছিল উনিশ শতকে। হিন্দু এবং/বনাম মুসলমান এই বয়ান শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং ঔপন্যাসিক পরিসরেও দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করেছিল। এই আলোচনার পরে আসা যাক বাংলার প্রথম জনপ্রিয় মুসলমান ঔপন্যাসিক মীর মোশারফ হোসেনের প্রসঙ্গে। ‘জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)’ নাটক লেখার পরে মীর মোশারফ সাহিত্যিক মহলে পরিচিতি পেলেও, তাঁর জনপ্রিয়তা ও সমালোচক-স্বীকৃতি প্রথম মেলে ‘মহরম পর্ব (১৮৮৫)’ প্রকাশের পরে। এরপরে ‘উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭)’ ও ‘এজিদ-বধ পর্ব (১৮৯১)’ সহ তিনটি পর্ব মিলিয়ে ‘বিষাদ সিন্ধু’ উপন্যাসের প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব মোখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ঔপন্যাসিকের প্রতিষ্ঠার যুগে ‘বিষাদ সিন্ধু’-র প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ততদিনে গড়ে উঠতে শুরু করেছে মুসলমান সমাজের নিজস্ব সংগঠন- নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে কলকাতায় ‘মহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩)’, ‘ঢাকা মুসলমান সুহৃদি-সম্মিলনী (১৮৮৩)’, ‘নূর-অল-ইমান সমাজ (১৮৮৪)’ ইত্যাদি। ‘হিন্দুমেলা (১৮৬৭)’ ও ‘গো রক্ষিণী সভা (১৮৮২)’ প্রতিষ্ঠার প্রত্যুত্তরে বিপরীত-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ক্রমশঃ দুই সম্প্রদায়ের যুযুধান পরিসর বাড়াতে থাকে, সাহিত্যক্ষেত্রেও যার ছাপ অনতিক্রম্য। সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রক্ষণশীলতার যে উদাহরণ ‘খোয়াবনামা’-র অনিল সান্যাল, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর বয়ানে পাই, তার বাস্তব ভিত্তিও তো তৈরি হয়েই গেছিল।

বস্তুতঃ ১৯২৬ সালে ‘গো-রক্ষিণী সভা’-র সভাপতিত্ব করেন কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়¹⁵³। মীর মোশারফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে ইসলামিক ধারাকে সাহিত্য-বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান-হোসেন এবং ইয়াজিদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে আখ্যানের কাঠামোয় নিয়ে আসেন; ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সংস্কৃতশ্রয়ী বাংলার প্রাধান্য। তাই জন্যেই বোধহয় মীর মুশারফ হোসেনকে স্বীকৃতি দিতে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাও দ্বিধাবোধ করেনি। ‘ক্যালকাটা রিভিউ’ পত্রিকার ১৮৭০ সংখ্যায় ‘রত্নাবতী’-র সমালোচনায় লেখা হয়, ‘মুসলমান ছদ্মনামের আড়ালে গ্রন্থকর্তার প্রকৃত পরিচয় লুকানো হয়েছে’¹⁵⁴। কারণ, একজন ‘মুসলমান লেখক’-এর পক্ষে সুললিত বাংলা গদ্যে উপন্যাস লেখা অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল পত্রিকাটি। ‘বিষাদ সিন্ধু’ ১৮৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করলে, তা দু’টো কারণে যুগান্তকারী; ১- শিক্ষিত-হিন্দু প্রাধান্যের লেখক-পাঠক পরিসরে ‘বিষাদ সিন্ধু’ স্বগুণে স্বতন্ত্র স্থান নিতে পেরেছিল এবং ২- আখ্যান ও ভাষাগত সহজতার জন্যেই অ-শহুরে, ‘অনাধুনিক’ পাঠকবর্গের সমাদর শতকব্যাপী পেয়ে চলেছে উপন্যাসটি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর উল্লেখে, বাংলা গদ্যের বড় দুর্বলতা ছিল ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এবং মীর মোশারফ সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পেরেছিলেন। ধ্বনির মোহময়তা এবং বাক্যের গঠনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির ফলেই তাঁর গদ্যে ওজস্বিতা আসে।¹⁵⁵ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘সাহিত্যসাধক চরিতমালা’-তে ‘বিষাদসিন্ধু’-র উল্লেখে কয়েকটি সমালোচনার উল্লেখ করছেন, যেগুলি ‘গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা’, ‘ভারতী’ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘সীতার বনবাস’ বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হয়েছিল, ‘বিষাদসিন্ধু’ তেমনি আজও জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়।”¹⁵⁶ ‘বিষাদ সিন্ধু’-র কাহিনিতে ইতিহাস মিথ ও বাস্তবতার সহাবস্থান। সুদূর কারবালা প্রান্তরের রাজনৈতিক ট্রাজেডি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইয়াজিদের নির্মাণ এই উপন্যাসের সবচেয়ে সফলনির্মাণ। ‘মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)’-র রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রের নির্মাণে দেশীয়

মহাকাব্যিক উৎসের সঙ্গে ইউরোপীয় মহাকাব্য ঘরানার যে অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন মধুসূদন। ইয়াজিদের নির্মাণেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন মীর মোশারফ। একদিকে হাসান হত্যার মর্মান্তিক বীভৎসতা, অন্যদিকে ইয়াজিদের জয়নাবের প্রতি প্রেম; একদিকে মানবিক নিষ্ঠুরতা, অন্যদিকে দৈব হস্তক্ষেপ; একদিকে জাএদার মতো খলচরিত্র যা উপন্যাসকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে মহাকাব্যিক উপাদানে সাজিয়ে জনপ্রিয় ক’রে তোলার জন্যে সামাজিক দোষ-গুণ সম্বলিত কুশীলব। মহরম পর্বের করুণ কাহিনির থেকে ইয়াজিদ-বধ পর্ব ও উদ্ধারপর্বের রণবর্ণনা লেখকের কাছে বেশি গুরুত্ব পেলেও, পাঠকের কাছে এখনও এই মহরম পর্বের গ্রহণযোগ্যতাই বেশি। যে কারণে মূল বাল্মীকি রামায়ণের থেকেও কৃন্তিবাসী রামায়ণের বঙ্গজ রাম, মহাভারতের ব্যর্থ নায়ক কর্ণ কিংবা মেঘনাদবধ কাব্যের ট্রাজিক নায়ক মেঘনাদ বাঙালি পাঠকের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য¹⁵⁷। বিভিন্ন আন্তঃপাঠগত (Inter textual) অনুশ্রেণীও এই করুণকাহিনিগুলির উল্লেখ হয় বারবার। সুদূর কারবালার রাজনৈতিক আখ্যান বঙ্গজ সংস্করণে রোমান্টিক ট্রাজিক কাহিনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু, মীর মোশারফ হোসেনের চিরকালীন প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয়ে যায়। ১৮৮২ সালে জোনাব আলী ‘শহীদে কারবালা’ কাব্য রচনা করেছিলেন, ইতিহাসের অনুসরণ ক’রে, কিন্তু তা ‘বিষাদ সিন্ধু’-র উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। মীর মোশারফ হোসেনের অন্যান্য উপন্যাস মূলতঃ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হলেও, অনস্বীকার্য যে, বাংলার মুসলমান সমাজের বাহিরমহল থেকে অন্দরমহলের বর্ণনা এর আগে কোনও বাঙালি ঔপন্যাসিক করেননি। মীর মোশারফ তাঁর উপন্যাস রচনার আঙ্গিক টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা ও বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে গ্রহণ করলেও¹⁵⁸, বিষয়বৈচিত্রে তা পূর্বজদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’তে কি ‘বিষাদ সিন্ধু’র কিছু চিত্রকল্প ও আদল পুনর্নির্মিত হয় না? আব্দুল আজিজের ছেলের মৃত্যুতে কি বিষাদ সিন্ধুর ইতিহাস ফিরে আসে? হোসেইনের শিশুপুত্রের মৃত্যু ও তার মায়ের বিলাপ কি আব্দুল আজিজের বালকপুত্র হুমায়ূনের

মৃত্যু এবং হামিদার বিলাপের সমার্থক হয়ে যায়? হুমায়ূনের মৃত্যুমুহূর্তে লোবানের গন্ধ আর দৃষ্টিবিভ্রমে হামিদা দেখে, “তার সামনে সাদা ধবধবে কাপড়পরা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একটা মানুষ। লোকটার গলায় ঝোলানো লম্বা লোহার শেকল” (১০২)- লোহার শেকল ওই কাল্পনিক মূর্তিটি কি ফকির-সন্ন্যাসী দ্রোহের মুনসির সঙ্গে মিলে যায় না? আর, এই হামিদাই তার খোয়াবের ঘোরে আসা কাল্পনিক অবয়বকে তমিজের বাপের সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে, নগণ্য নির্বিত্ত তমিজের বাপের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে খোয়াব-বিশ্লেষক হিসেবে। পীর-মুরীদের মিথ্ স্থানীয় সমাজে বিশ্বাসভিত গড়ে। আর, এরই আরও বিস্তার ঘটে যখন হামিদার ভাই কলকাতায় হিন্দুদের হাতে খুন হয় '৪৬ সালের দাঙ্গায় এবং সেই বিষাদকাহিনি হামিদা ও আব্দুল আজিজকে শোকগ্রস্ত ক'রে তোলে। হামিদার স্বপ্নে বীভৎস মৃত্যুদু'টি ফিরে আসতে থাকে। লিগ-কংগ্রেসের পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী বিবাদের সময় কেরামত আলির গানে ইসলামিক পরম্পরার সঙ্গে জড়িত নামেরা ভিড় করে। কোরআন-শরীফ, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিকে বর্তমানের উল্লেখপ্রসঙ্গে তুলনায় আনে কেরামত- “শিঙা হাতে ইসরাফিলে যখন দিবে ফুঁক/ থাকবে না দালান কোঠা থাকবে না তালুক।। নমরুদে রাখিত হিংসা ইব্রাহিমের পর/ বেহেস্ত করিল তোয়ের নমরুদ বব্বর” (২৪২) কেরামতের এই গানের কেন্দ্রীয় আবেদন- ‘লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না’, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও কিংবদন্তীর উল্লেখে দুই চিত্রকল্প মিলে যায়। সভায় আসা সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়- ঘোড়া। ‘ফকির ঘোড়ায় চড়ি বাহিরিলো না থাকে উদ্দিশ’ মোটিফ আকারে ফিরে আসে আখ্যানে। বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের আগে ঘোড়ার চল ছিল না খুব একটা। ভারতীয় উপমহাদেশে ঘোড়ার ব্যবহার বহু প্রাচীন হলেও বাংলার সংস্কৃতিতে ঘোড়া বিরল ছিল। তুর্কিরা ঘোড়াকে লোকসমাজে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলে। “ফকিরদের হাতে বন্দুক, সঙ্গে দুটো ভারবাহী উট আর প্রধান প্রধান সহচরদের জন্য কয়েকটা টাটু ঘোড়া। শাহ্ মজনুর ঘোড়াটা তেজীয়ান।” (রায় ১৯৬০, ২৮৩) এরপরে, পীরেরা ঘোড়ায় চড়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরতেন এবং জনসমাজে প্রচারকাজ করতেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার

এই সংস্কৃতিতে তাঁদের ঘোড়ায়-চড়া রূপ গেঁথে গেছিল জনমানসে। “পিরেদের প্রিয় অবলম্বন ছিল ঘোড়া, পিরেরা নানা অত্যাচার থেকে মানুষকে অতীতে বাঁচিয়েছেন, সেকারণেই পিরের মাজারে ঘোড়া উৎসর্গ করে পিরকে সন্তুষ্ট করার একটা প্রথা চলে আসছে এই লোকায়ত জনগণের মধ্যে”¹⁵⁹ মুনসি বয়কতুল্লাহ্ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার সময় ব্রিটিশ সর্দার টেলরের গুলিতে মারা যান। মাদারিয়া ফকির ও দশনামী গিরি সন্ন্যাসী উভয় সম্প্রদায়ই ঘোড়া ব্যবহার করতেন। ঘোড়া সাহিত্যের ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হয়ে থাকে। শুধু পীর-সুফী ইসলামিক সংস্কৃতিতেই নয়, লোকায়ত সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দেবদেবীর থানে ও মেলায় ঘোড়ার মূর্তি, ঘোড়ার মোটিফ-আঁকা টেরাকোটা দেখা যায়। বাঁকুড়া-বীরভূমের সংস্কৃতিতে পোড়ামাটির ঘোড়া ও লোকনৃত্য ঘোড়ানাচ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বীরভূমে আদৃত ধর্মঠাকুরের¹⁶⁰ বাহন সাদা ঘোড়া আর, ‘খোয়াবনামা’র দ্রোহী ফকিরও সাদা ঘোড়ার সওয়ারি। মুখফেরতা কাহিনি ও পৌরাণিকীকে রাজনৈতিক পাঠ থাকে এবং তা প্রতর্কমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতে পারে। মুখফেরতা, মতাদর্শ ও প্রতর্কের (discourse) মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি; প্রতর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখফেরতা কাহিনি আর মতাদর্শ একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকে অনেকক্ষেত্রে। মতাদর্শগত অনুশীলনে যে প্রতর্কপরিধি তৈরি হয়, তাতে মুখফেরতা ও পৌরাণিকীর নির্মাণ হয়। সেইসব পৌরাণিকী ও মুখফেরতা আখ্যান নিজস্ব আখ্যানছন্দে মতাদর্শকে প্রবাহিত করতে থাকে সময়ান্তরে। নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রভাবে যে ক্ষমতাসম্পর্ক নির্মিত হয়, তাকে প্রতিস্পর্ধাও জানায় মুখফেরতা আখ্যানের ভাষা ও অবয়ব¹⁶¹। ডারেন কেলসির বিশ্লেষণকে দেখা যায় ‘খোয়াবনামা’-র বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে। মিথ্ এমনই এক আখ্যানপদ্ধতি, যাতে মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আকাঙ্ক্ষা, যাপনভঙ্গি সমস্ত কিছুর যৌথ উদ্‌যাপন সমস্বরে জেগে থাকে। আর, রাজনৈতিক মিথ হচ্ছে, “work on a common narrative which grants significance to the political conditions and experiences of a social group” (Bottici and Kühner, 2012: 98) রাজনৈতিক মুখফেরতা আখ্যান অন্যান্য ইতিহাসাখ্যানের থেকে আলাদা হয়ে যায়

যখন অতীতকে আত্ম-অপর দ্বন্দ্ব জারিত করা হয়। আত্ম-অপরের বয়ানের উন্মোচনে রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি মিথ্কে প্রজন্মান্তরে চারিয়ে দেয়। শোষক ও শোষিত দুই পক্ষই যে মিথ্কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তা আলোচিত উপন্যাসগুলিতে বিশ্লেষণ করেছি। রাজনৈতিক মিথ কোনও সমাজের বিবর্তন এবং কোনও সম্প্রদায় বা জাতির রাজনৈতিক-সামাজিক পরিচিতিও ধারণ করে। ধর্মঠাকুরের মিথ্, সাদা ঘোড়ার চিত্রকল্প কিংবা দনুর মিথ্ কোনও এক কৌমসমাজের স্মৃতিজাগানিয়া। ব্যক্তিসর্বস্বতার যুগে শিল্পে ক্রমশঃ বৃহত্তর-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রোটোগনিস্টের গৌরবগাথার যুগে এই কৌমসমাজের প্রতীকগুলি অন্যপাঠের সন্ধান দেয়, প্রতিরোধের নীরব ভাষ্যও। আর, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘টেরাড্যাঙ্কিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’, ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে মিথ্ ‘সম্মিলিত স্মৃতিপ্রবাহ (collective memory)’ থেকে নিঃসৃত আখ্যানে জাতি ও সম্প্রদায়ের পরিচিতিকে দৃঢ় করে এবং অতীতের অবর্ণিত অধ্যায়গুলোর খোয়া-যাওয়া-সূত্রগুলোর হৃদিশ দেয়।

‘বাঙালি মুসলমান সাহিত্য’ বর্গ নির্মাণের পেছনে দু’টো বিষয় নিশ্চিতভাবে কাজ করেছিল- বৃহত্তর মুসলমান সমাজের অভিমান এবং হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজের অবজ্ঞার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত জেদ। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ইংরাজি ‘শিক্ষিত’ মুসলমান লেখক ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল অনেকটাই। সেই সময়ে উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি সাহিত্য থেকে ইতিহাসবোধ, সমস্ত কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করছে। সৈয়দ আহমেদ খান শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য নাম। ১৮৫৯ সালে ‘ভারতীয় বিদ্রোহের কারণসমূহ’ নামক উর্দু বইতে তিনি অভিজাত মুসলিমদের বিরুদ্ধে আনা ব্রিটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নাকচ করেন। ভারতের প্রায় ৫০০ বছরের ইসলামিক শাসনকে উচ্ছেদ ক’রে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ বনাম মুসলমান জাতীয় প্রতর্ককে প্রশমনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থরচনা এবং ‘Translation Society’-র প্রতিষ্ঠা করেন।¹⁶² সাহিত্যক্ষেত্রে ততদিনে কিছু বৃহৎ পরিবর্তন হয়েছে, যা শিশিরকুমার দাশ তাঁর গ্রন্থে

আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে ভারতীয় সাহিত্যের আধুনিকতার দিকে যাত্রার পাঁচটি মূল কারণের মধ্যে অন্যতম ফারসি থেকে ইংরাজিতে রাজভাষার পরিবর্তন।¹⁶³ আনিসুজ্জামান সৈয়দ আহমেদকে মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন রায় বলে একটি তুলনা করার চেষ্টা করেছেন।¹⁶⁴ আশ্চর্য যে, যিনি ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ মূলতুবি রেখে সমগ্র মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও ১৮৮৭ সালে ধর্মভিত্তিক পরিচয়কেই স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে¹⁶⁵। উচ্চবর্গ থেকে চুইয়ে আসা 'আমরা-ওরা' নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তকেও প্রভাবিত করছে। দেবরত মুখোপাধ্যায় 'বিভাজনের পটভূমি' প্রবন্ধে মন্তব্য করছেন যে,

সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যেও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির প্রতিফলন রীতিমতো চোখে পড়ে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আলতাফ হুসেইন হালি রচিত মহাকাব্য 'মুসাদ্দস-মাদি-ও-জাজর-ই-ইসলাম' গ্রন্থটির কথা। সৈয়দ আহমেদ খানের অনুপ্রেরণায় রচিত (১৮৭৯) এই মহাকাব্যটিকে বলা যায় মুসলমানদের অতীত গৌরব ও তৎকালীন অবক্ষয় নিয়ে একটি শোকগাথা। (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ৫)

অতীত গৌরব ও মুসলমান ঐতিহ্যকে সাহিত্যে ফিরিয়ে আনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেশভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যেরও প্রধান রাজনীতি হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ভারতবর্ষ 'দার-উল-ইসলাম' নাকি 'দার-উল-ইরব' এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, তার প্রতিফলন সাহিত্যেও হয়েছে। হিন্দুজাগরণের জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি মুসলমান সমাজের এই দ্বন্দ্বও তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ, 'দার-উল-ইসলাম'-কে উনিশ শতকের শেষ থেকে রাজনীতিতে-সাহিত্যে-ধর্মবোধে আত্মীকরণ করেই মুসলমান সমাজের আধুনিকতার বিষয়টি অনুশীলনে প্রাধান্য পেতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘু হলেও সেখানে উচ্চস্তরীয় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমান সংখ্যক পদ অর্জন করেছিলেন; কিন্তু, বঙ্গপ্রদেশের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু

হয়েও পদাধিকারের অনুপাত হিন্দুদের তুলনায় ছিল নগণ্য। আনিসুজ্জামান ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উত্থানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন¹⁶⁶। আব্দুল লতিফ বা সৈয়দ আহমেদ ‘দার-উল-ইসলাম’কে সাহিত্যে রূপান্তরিত ক’রে শিক্ষাপ্রসারের ও মুসলমান-মানস সংস্কারের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা জারি রইল দেশভাগের পরেও এমনকি বাংলাদেশ নির্মাণের পরেও! গোলাম মোস্তাফার মতো লেখক, ‘নওবাহার’ পত্রিকার মতো প্রথম সারির পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের এযাবৎ ‘হিন্দু উপাদান’গুলিকে চিহ্নিত ক’রে তাদের প্রভাবমুক্ত হওয়ার চেষ্টায় ধর্ম-রাজনীতিকে সাহিত্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। ‘রাজনৈতিক সাহিত্য ও সাহিত্যের রাজনীতি’ শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মোহাম্মদ দানেশ চারটি কাব্য রচনা করেছিলেন। দু’টি কাব্য ফার্সি ও হিন্দী অনুবাদ থেকে বাংলায় তর্জমা করেন। সৈয়দ আহমেদের সংস্কারপন্থী ধারার প্রভাব যে বাংলার সাহিত্যে পড়েছিল, তারই নিদর্শন জোনাব আলীর ‘শহীদে কারবালা (১৮৮২)’-র মধ্যেও রয়েছে। যদিও, আনিসুজ্জামানের মতে, সৈয়দ আহমেদের মতাদর্শের সঙ্গে এই কাব্যের রাজনীতিগত তফাৎ রয়েছে¹⁶⁷। সুফী মতবাদের প্রভাব কিন্তু তখনও মুসলমান সাহিত্যকারদের রচনায় প্রবলভাবে বিদ্যমান, তৎকালীন আধুনিকতাপন্থী সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বড়ই কম। আনিসুজ্জামানের পর্যবেক্ষণে,

আমাদের সমাজের রক্তদ্বারকক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবেশপথ ছিল না বললে মিথ্যে হয় না। ধর্মজীবন-সংস্কারের যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, তাও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল... এই সাহিত্যিকর্ম সমসাময়িক অমুসলমান লেখকদের মহৎ সৃষ্টির তুলনায় হীনপ্রভ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহের প্রভাব বাঙালি মুসলমান লেখকদের উপরে তেমনভাবে পড়ে নি। পূর্ববর্তী সংস্কার-আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে তাঁরা অচেতন ছিলেন না, তবু তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁদের রচনায় আমরা দেখি না। (আনিসুজ্জামান ২০১২, ১৮৪)

মীর মোশারফ, বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের অন্যতম পুরোধা একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ রেখেছিলেন যে, “হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ রাজনৈতিক নয়, প্রধানত অর্থনৈতিক এবং অংশত সামাজিক”¹⁶⁸ এবং ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আর্থ-রাজনীতিতে সামাজিক স্তরে শোষিত শ্রেণির বিভেদের দিকে। কিন্তু, আনিসুজ্জামান মীর মোশারফের (খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পুরোধা তিনি) একটি স্ববিরোধের উল্লেখ করেছেন¹⁶⁹, এই সন্দর্ভের স্বার্থে এই উল্লেখ এই কারণেই প্রয়োজন যে, এই ঘটনাগুলি প্রত্যেকটাই বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের রাজনীতির অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে পরের শতকে। ‘বিষাদ সিন্ধু’ শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের নয় বরং হিন্দু সমাজেরও পাঠতালিকায় ঠাঁই ক’রে নিয়েছে। কিন্তু, মীর মোশারফ বা মোজাম্মেল হক বা ইকবালের মতো একদা প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা আধ্যাত্মবাদকে ধারণ করেছেন পরবর্তীকালে। আর, উপমহাদেশে আধ্যাত্মবাদ এবং ‘ধর্ম’কেন্দ্রিকতা ‘আত্ম-অপর’ বাইনারি মেনেই বরাবর এক বিপজ্জনক পথে মোড় ঘুরেছে। বাংলা উপন্যাসের রাজনীতির এক নিদর্শন পাওয়া যায় মোজাম্মেল হকের ‘দরাফ খান গাজী (১৯১৯)’ উপন্যাসে। বহু দশক পরে ‘আনন্দমঠ’-র দেশিক নেশনের জনতোষী নির্মাণকে ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের অন্তর্মহলে টেনে এনেছেন ইলিয়াস¹⁷⁰, ফলে তার পাঠপদ্ধতি ‘আনন্দমঠ’-এর নির্মাণ-বন্দোবস্তের কিছু পাল্টাপ্রস্তাব হাজির করে। মোজাম্মেল হক ১৯১৯ সালে তাঁর উপন্যাসের উদ্দেশ্য লিখছেন, “ভিন্নজাতীয় লেখকের তুলিকায় আমাদের বাদশাহ্-নবাব, আমীর-ওমরাহ, সাধু-দরবেশ এবং সাধারণ মুসলমান-চরিত্র অকারণে মসীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।”¹⁷¹ আর, ‘দরাফ খান গাজী’ উপন্যাসে বস্তুতঃ সচেতনভাবেই মোজাম্মেল হক বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কিছু পাল্টাপ্রস্তাব রাখেন। যে যে ‘হিন্দু-সামাজিক’ উপাদানগুলি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নির্মাণ হয়েছিল, সেগুলোকেই উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। ফলে, হিন্দু রাজার মুসলিম ধর্মান্তরণ বা প্রেমের জন্যে হিন্দু নারীর মুসলমান সেনাপতির পাণিগ্রহণ এই উপন্যাসটির মূল বিষয় হয়ে উঠল। আনিসুজ্জামানের দীর্ঘ গবেষণা থেকে দু’টো

সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, বাঙালি মুসলমান সাহিত্যকবর্গ কারবালার ট্রাজেডি এবং গোঁড়া ইসলাম বনাম সুফী মতাদর্শের দ্বন্দ্ব নিয়ে অধিকাংশ সাহিত্য রচনা করেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। আর, ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’-এর থেকেও ধর্মীয় উপন্যাস/কাব্য এবং হিন্দু-লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক উপন্যাস/কাব্য রচনায় তাঁরা বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী যে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন, তাতেও লেখকের রাজনীতির সচেতন বৈশিষ্ট্যগুলিই ধরা পড়ে। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে যে ‘হিন্দু-সামাজিক’ উপাদানগুলিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন ‘বাংলা উপন্যাস’ সংরূপের উষালগ্নে, তারই বিরোধিতা প্রধান হয়ে উঠছে সিরাজীর উপন্যাসে। এখানে হিন্দু রাজারা অত্যাচারী-শঠ, মুসলমান রাজপুরুষ বীর এবং হিন্দু নারী ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান বীরের পাণিগ্রহণ করছে। কিন্তু, উপন্যাসগুলোর তুলনামূলক বিচারে দু’টি বিষয় অপরিবর্তিত মনে হয়, ১- হিন্দু বনাম মুসলমান দ্বন্দ্ব গুণগতভাবে একই থাকল আর, ২- বিশ শতকের প্রথমার্ধের এই উপন্যাসগুলোতে নারীদের অবস্থান একই রয়ে গেল, তারা শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্রীড়নক ও তাদের সব মতামতই হিন্দু অথবা মুসলমান ‘বীরপুরুষের’ মতামতের অধীন। সমাজের অন্যান্য অংশের (শোষিত ও নিম্নবর্গের) কোন প্রতিনিধিত্ব এই উপন্যাসগুলোতে নেই। ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, রূপমুক্তা নারী’-র মতো বহুলপ্রচলিত প্রবাদবাক্যই প্রতিষ্ঠিত রইল, শুধুমাত্র উপন্যাসের কুশীলবেদের রাজনৈতিক আচরণ দুই যুযুধান ‘ধর্ম’ বাইনারির এদিক-ওদিক বদলে নিল। এই উপন্যাসীয় অবস্থান পরিবর্তনের সূত্রপাত সম্ভবতঃ ইমদাদুল হকের উপন্যাসে। সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সমসাময়িক রাজনীতির উল্লেখ করলেন ইমদাদুল। “পীর-মুরীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখাদেখিই শেখা”¹⁷²- এই উচ্চারণ ধর্মগোঁড়ামির বিপ্রতীপে আধুনিকমনা অবস্থানকেই ব্যক্ত করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে ১৯০৫ সালে ‘হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তৎপ্রতিকারের উপায়’ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান প্রাবন্ধিককে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয়¹⁷³। বস্তুতঃ

নারীশিক্ষা ও অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ পূর্বের বহু রক্ষণশীলতা ছেড়ে নতুন সামাজিক দ্বন্দ্বগুলোকে আত্মস্থ করছে। এক্ষেত্রে তৎকালীন রাজনীতি চেতনায় বাঙালি মুসলমানের অবস্থান বিষয়ে আবুল মনসুরের মন্তব্য প্রাধান্যযোগ্য,

আবুল মনসুর একটি মারাত্মক উক্তি করছেন, “মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আমার চিনা-জানা মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তখনও দানা বাঁধে নাই।” অবশ্য পরবর্তী সময়ে আবুল মনসুর অন্যান্য অনেকের মতোই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং বৃহৎ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার অন্যতম হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন (চৌধুরী ১৯৯৯, ৩১৭)

যে সময়ের অভিজ্ঞতা আবুল মনসুর লিখছেন, সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রবন্ধ বহু ‘এলিট’ হিন্দু পত্রিকার পাশাপাশি মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাতেও ছাপা হচ্ছে। কিন্তু, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তথাকথিত ‘হিন্দু’ উপন্যাসিকেরা যখন উপন্যাসিক হিসেবে বাংলায় তথা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তখন তথাকথিত ‘মুসলমান’ উপন্যাসিকেরা সংস্কার-রক্ষণশীলতা-অভিমান কাটিয়ে উঠে বাংলা সাহিত্যচর্চায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন। কিন্তু, হিন্দু-জাতীয়তাবাদী উত্থানে যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছেন উচ্চবর্ণ হিন্দু সাহিত্যিকেরা, মুসলমান সাহিত্যিকেরা সেই ভূমিকা নিতে পারছেন না মুসলমান জাতীয়তাবাদের স্ফূরণে। বরং, মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের দাবি জোরালো হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিসর থেকে- জিন্নাহ ও ইকবাল (উর্দু সাহিত্যিক, বাঙালি নয়) এবং অন্যান্য মুসলিম লিগ রাজনীতিকেরা রাজনীতি দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর ঢাকা শহরে এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ‘বঙ্গভঙ্গ বার্ষিকী’ উদ্‌যাপন করেন।¹⁷⁴ পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী আবুল মনসুরের স্মৃতিকথায় বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার বয়ানের উল্লেখ রয়েছে¹⁷⁵। বস্তুতঃ এই বয়ানেরই বিবর্তিত রূপ বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মুখোমুখি সংঘাতে জড়ানো। ‘বন্দে

মাতরম’ ১৯০৭ সাল পর্যন্তও শুধুমাত্র ‘হিন্দু’বয়ান ছিল না, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়ের গবেষণায় ১৯০৫ সালের বিভিন্ন জনসভায় হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস ছিল ‘বন্দে মাতরম’, কলকাতা শহরের (সেই সময় ভারতবর্ষের রাজধানী) বহু জনসভায়, বঙ্গভঙ্গবিরোধী মিছিলে “বিপুল সংখ্যক মুসলমান অংশগ্রহণই কেবল করেনি, তারাও ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।” (চৌধুরী ১৯৯৯, ৩১৭-১৮) মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ-স্কুলের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে দ্বিধাবোধ ছিল না। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠার ইতিহাসগত বিস্তৃতি এই দ্বিধাহীনতার মধ্যে যেমন রয়েছে, তেমনই পরবর্তী সময়ে বন্দে মাতরম হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজেদের শ্লোগানে পর্যবসিত হয়ে ওঠার মধ্যেও রয়েছে। অন্যদিকে ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস ‘বন্দেমাতরমের’ বিপ্রতীপে ‘নারায়ে তকবির আল্লাহ্ আকবর’ শ্লোগানের রাজনীতিকে ধারণ করতে সক্ষম হল। দুই ধর্মীয় যুযুধান সম্প্রদায়ের চরমতম বিভেদের রাজনীতির ইতিহাসকে সাহিত্যিক উপাদানে নির্মাণ করলেন ইলিয়াস। সাহিত্য থেকে রাজনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে ‘আনন্দমঠ’ সফল কিন্তু কোনও বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের উপন্যাস এইভাবে রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি বরং রাজনীতি আর ধর্মই সাহিত্যিক উপাদানে পরিণত হয়েছিল। ‘আনন্দমঠ’ কিংবা ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের বিকল্পবয়ান হিসেবে কোনও সাহিত্য-উদাহরণ অন্ততঃ বাংলায় ছিল না। আর, ‘দার-উল-ইসলাম’ বা ‘নারায়ে তকবীর আল্লাহ্ আকবর’-র মতো রাজনৈতিক শব্দাবলী সাহিত্য থেকে নয়, ধর্মীয় ভাবাদর্শ থেকে এসেছিল।

দাঙ্গা, দেশভাগ এবং ‘খোয়াবনামা’-র ইতিহাসপাঠ

ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি, গায়ে হাত বুলিয়ে
কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে
নিচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই, জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা

আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে ‘হাঁউ’ করে ওঠে; একদিন ওদের ভালুক
নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান
আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই
জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে; নইলে ওরা বিরোধ করবেই। (ঠাকুর ১৩৬৮ সাল,
১০২)

শিক্ষিত মুসলমান সমাজ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে যতই অগ্রসর হোন,
তারা কোনওদিনই ‘ভদ্রলোক’ আখ্যা পাননি এবং শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়েই
থেকেছেন। ‘আশরাফ’ শ্রেণি তথা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান পরিবার ও ‘প্রথম প্রজন্ম’
মুসলমান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জয়া চ্যাটার্জির পর্যবেক্ষণ, “It was this Muslim
intelligentsia, ashraf in its aspirations but usually lowly in its origins,
lifestyle and culture which came to the fore in Bengali politics in the
1930s.”¹⁷⁶ পাটের দামবৃদ্ধি এবং কৃষিজ ফসল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী
পরিবারের সন্তানদের শিক্ষালাভের দিকে এগোতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু, শহর (মূলতঃ
কলকাতা) এবং মফস্বলের (পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ) বিস্তার ফাঁক ছিলই। উচ্চবর্ণ হিন্দু
ঔপন্যাসিকেরা (খেয়াল রাখা দরকার যে, নিম্নবর্ণের হিন্দু লেখক সেই যুগে বিরলতম)
উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে ‘অ-ভদ্রলোক’ কাউকে ঠাঁই দিতে পারেননি। জাতীয়
মুক্তি আন্দোলন যেন শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের আন্দোলন, সেই আন্দোলনে ক্বচিৎ
কদাচিৎ কোনও মুসলমান ‘প্রজা’ বা নিম্নবর্ণ হিন্দু এসে পড়লেও, তাদের বিশেষ করণীয় কিছু
নেই। উচ্চবর্ণ লেখকদের সাহিত্যে প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থানে বরাবরই হিন্দু ভদ্রলোকদের
প্রাধান্য; যে প্রাধান্য শুরু হয়েছিল ‘নবজাগরণ’-এর মহালগ্ন থেকে। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘বেঙ্গল

ডিভাইডেড’ গ্রন্থে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস বিষয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন। এই উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাজদ্রোহের অজুহাতে। উপন্যাসটিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে। কিন্তু, স্বাধীনতা আন্দোলন যে আলোকিত উচ্চবর্ণের একান্ত নিজস্ব মুক্তিপথ, বারবার তার বিবরণ দেওয়া রয়েছে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের রাজনীতির কথা বললেও, “Saratchandra fails to challenge the inherent elitism of Bhadrakalok nationalism. Indeed, he reinforces the notion that the bhadrakalok are the elect, chosen by virtue of their intellect and culture for the task of national liberation”¹⁷⁷ জয়া চ্যাটার্জির এই মতামত প্রণিধানযোগ্য। সব্যসাচী ‘আদর্শ’ নায়ক, অপূর্ব আদর্শ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংশয়বাদী কিন্তু তারা কেউই সামাজিক স্তরবিভেদ ও বর্ণবিভেদের প্রভাবমুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক উপন্যাস ‘গোরা (১৯০৭)’-তে মুসলমান সমাজ ও নিম্নবর্ণের উল্লেখ ও প্রতিনিধিত্ব কতটুকু? কাহিনি আবর্তিত হয়েছে উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারকে ঘিরে, কাহিনির প্রোটাগনিস্ট ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতির উন্মোচনে আত্ম-আবিষ্কার করতে চেয়েছে। তারই সঙ্গে জুড়ে থেকে সমাজ-সংস্কার ও ব্রাহ্ম বনাম হিন্দু সংঘাত। কিন্তু, সংখ্যাগুরু নিম্নবর্ণের সঙ্গে গোরার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংস্পর্শ-বিন্দু কোথায়? একটি অনু-অধ্যায়ের দু’টি বাক্যে চর-ঘোষপুরে নিরস্ত ফরর পরিবারের সঙ্গে কথোপকথন ও বালক তমিজের প্রতি সহানুভূতি ব্যতিরেকে তাঁদের স্বর কি কোথাও প্রতীয়মান হয়? একথা অনস্বীকার্য যে, ‘গোরা’-র আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু উচ্চবর্ণের সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন- কে কত বড় ‘সঠিক’ হিন্দু তা দিয়ে ভারতবর্ষের বিচার হয় না। গোরা নিজের শ্রেণিগত ও সামাজিক বর্ণীয় অবস্থানকে চিনতে চিনতে ও প্রত্যাখ্যান করতে করতে দেশকে চিনতে শেখে। গ্রামীণ সমাজে গোরা ‘বহিরাগত’, সেই অবস্থান থেকে গোরা

গ্রামীণ সমাজ ও দেশের সংজ্ঞা বুঝতে শিখেছিল। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে বরং মুসলমান সমাজের সংকটের কথা কিছুটা উঠে এসেছে। আর, একথাও উল্লেখ্য যে, প্রগতিবাদী সাহিত্যের সিংহভাগ আখ্যানেও মুসলমান সমাজ ‘অপর’ হয়ে রয়ে গেছিল। ‘গোরা’ বা ‘পথের দাবী’ রচনাপর্বে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের উত্থান হয়েছে। রাজনীতি ও সামাজিক পরিসরে তাঁরা নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস ও সশস্ত্র দুই পন্থায় সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়া বাঙালি কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান সমাজ সম্পর্কে জড়তা ও অবজ্ঞাভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তাই, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে জলঘোলা হচ্ছে, বিরোধিতা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াসমাজের বৃহত্তর অংশ আসছে নিম্নবর্গ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে, যাঁরা অনেকেই ‘প্রথম প্রজন্ম’ শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৫-২৬ সালে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের যে বৃত্তি দেওয়া হয়, তার মোট ১০০ জনের মধ্যে ৬৮ জন মুসলমান এবং ৩২ জন হিন্দু^{১৭৮}। একইসঙ্গে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় ঢাকা বোর্ড ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন, তাঁরা ‘ইংরাজিতে কাঁচা থাকেন’। অর্থাৎ, বৃত্তিলাভ করা বা অনগ্রসর থেকে শিক্ষিত শ্রেণিভুক্ত হওয়া বিবেচ্য নয়, ‘ইংরেজিতে কাঁচা’ হওয়াই সামাজিক অবস্থানের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে তৎকালীন বিখ্যাত সাহিত্যপত্রিকার দৃষ্টিতে। ‘খোয়াবনামা’-র সাদেক উকিল, আলেম মাস্টার বা আব্দুল আজিজের অভিমানজনিত ক্ষোভ এই প্রত্যেকটি বয়ানের ফলাফল। হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতি বিপন্ন হয়ে পড়ার পেছনে যে সবচেয়ে বড় কারণটি ছিল, তা ১৯৩৫ সালে প্রণীত আইন (Govt. of India Act)। এই আইনের বলে বাংলার রাজনীতির ভরকেন্দ্র শুধুমাত্র কলকাতা ও সংলগ্ন বৃত্তে আটকে থাকল না। নবজাগরণের পীঠস্থান, সাহিত্যের কেন্দ্র এবং ঔপনিবেশিক ভদ্রলোক-রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র সবটাই বিকেন্দ্রীভূত হল। জয়া চ্যাটার্জি লিখছেন,

The Act enlarged the electorate which now came to reflect the overwhelmingly rural character of Bengal more closely than before. In the Legislature, only twelve of the seventy-eight 'General' or Hindu seats were allocated to urban areas, the remaining sixty-six seats were reserved for rural constituencies. In the distribution of 'Muhammedan' seats, the rural weightage was even greater; here as many as 111 of the 117 Muslim constituencies were rural. Bengal politics, which had hitherto centred upon the metropolis of Calcutta and had revolved around primarily urban issues were now about to be pushed into the countryside. (Chatterji 2000, 68)

যে কংগ্রেস অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয়তাবাদী অনুশীলন করছিল, তারাও এবার অন্ততঃ বাংলার ক্ষেত্রে বাধ্য হল অনভিজাত ও নিম্নবর্গদের দিকে তাকাতে, কারণ, বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যায় মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। কিন্তু, শুধু কংগ্রেসই নয়, 'আশরাফ' শ্রেণির মুসলমানেরা (ইস্পাহানী বা সোহরাওয়ার্দি) কেউই নিম্নবর্গ মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে গায়েগতরে খেটে রাজনীতি করতে রাজি ছিল না¹⁷⁹। 'আশরাফ' শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে বৃহত্তর বঙ্গীয় মুসলমান মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের যে প্রচেষ্টা, তা এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত। 'খোয়াবনামা'র আব্দুল কাদের শিশির ডাক্তার ও তার গোঁড়াহিন্দু কম্পাউন্ডারের ওপরে অভিমানক্ষুব্ধ হয়েছিল কারণ, গ্রামে তার নিজের ধর্মে ভাল ডাক্তার নেই। জয়া চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের যে সালতামামি পেশ করেছেন, ইলিয়াস সেই ইতিহাসের বয়ানকেই পেশ করেন উপন্যাসের ভাষায়, কাদের 'খোয়াব'জুড়ে নিজেদের ধর্মের, নিজেদের বংশের সম্ভ্রান্ত ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে; সেই খোয়াবই কি তাকে ঠেলে দেয়নি পাকিস্তানবাদী রাজনীতির দিকে ও তৎপরবর্তী বিদ্বৈষমূলক অবস্থানের

দিকে? অন্যদিকে, সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকার মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকার বয়ানে ফল্গুধারার মতো বইতে থাকে মুসলমান-বিদ্বেষ ও হিন্দু ভদ্ৰলোক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার তাগিদ। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই, ভারতীয় তথা বাংলার রাজনীতির যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা ভাগের প্রস্তাব প্রসঙ্গে একবারও কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভাকে দায়ী করা হয় নি। আর, ‘দেশ’ পত্রিকা যে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্থানকে কী নজরে দেখত, তার প্রমাণ মেলে ১৩ই জুলাই ১৯৪৬ সংখ্যার ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ বিভাগে, ‘মূলে কারা দায়ী’ শিরোনামে লেখা হয়,

মুসলীম লীগের মূলনীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাও জড়িত রহিয়াছে; ইহা ছাড়া মুসলমান সমাজের শিক্ষা এবং পদাভিমানী ব্যক্তিদের অনেকের কাছে লীগের এই সাম্প্রদায়িকতার দিকটাই একমাত্র আকর্ষণ; বস্তুত লীগের এই সাম্প্রদায়িক নীতিই তাহাদিগকে পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠায় নানাদিক হইতে তুষ্ট এবং পুষ্ট রাখিতেছে। (দেশ, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৩)

সুচতুরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় হিন্দুকেন্দ্রিক রাজনীতি, কংগ্রেসের দোটানা ও হিন্দু মহাসভার ভূমিকা। সেরপুরের অনিল সান্যাল ভরা জনসভায় অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ভাষণ দিলেও তার ইংরেজি-স্ক্রিপ্ট লেখা দাদার চিঠিতে ‘দেশ’ পত্রিকার এই বয়ানই লেখা থাকে¹⁸⁰। অনিল সান্যালের দাদার ‘সুশিক্ষিত’ বয়ান মিলে যায় সতীশ মুক্তার, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মুকুন্দ সাহার বয়ানে। মুসলিম লীগের নেতা মানেই যে সাম্প্রদায়িক নয়, শিক্ষিত মুসলমান মানেই যে ‘পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার’ জন্যে হিংসাকে সমর্থন দেবে তা নয়। বরং ‘দেশ’ পত্রিকা, হিন্দু মহাসভা এবং উচ্চবর্গ-শিক্ষিত হিন্দুর একপেশে বয়ানকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েই ইসমাইল তার নির্বাচনী ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হিংসার বিরোধিতা করে, “কামারপাড়ায় তোমরা আগুন ধরাতে যাও কোন আক্কেলে?... ঐ বুড়ো দশরথের ঠ্যাং পুড়িয়ে আর দুটো গোরু মেরে কি তোমার আত্মীয়কে ফিরিয়ে আনতে পারবে?” (ইলিয়াস ২২৯-৩০) নাজিমুদ্দিন আর সোহরাওয়ার্দি দুই অতিশঙ্করে অতিশিক্ষিত উচ্চবিত্ত ‘আশরাফ’-র সঙ্গে ইসমাইলের মতো গ্রামীণ বিধায়কের পার্থক্য ছিল। যে

পার্থক্য ইতিহাসের তথ্য-তত্ত্বাদির মধ্যে ধরা পড়ে না, সাহিত্যের কাল্পনিকতা ও ইতিহাসের 'নিখোঁজ সূত্র'-র মধ্যে রয়ে যায়। ইসমাইল আর অজয় দত্ত, মিনতির দ্বিবাচনও তাই ধারণ করতে পারে 'খোয়াবনামা' উপন্যাস। ইতিহাসের কোনও এক বিন্দুতে মিলে গেছিল তেভাগার দাবি ও মুসলিম লিগের 'জমিদারস্বার্থ অপসারণ'-এর দাবি। কমিউনিস্ট সশস্ত্র গণপ্রতিরোধকে স্বীকৃতি দিয়ে 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৪৭)' খসড়া প্রস্তাব^{১৮১} করাতে বাধ্য হয়েছিল মুসলিম লিগ; যদিও উচ্চবর্গ হিন্দু ও মুসলিম বিধায়কেরা কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি উচ্ছেদ ও ফসলের ন্যায্যবন্টনের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু, ইসমাইল আর অজয়-মিনতি একযোগে "বাংলা ভাগ হলে হিন্দু মুসলমান- সমস্ত বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে আমরা যে কোনো দলের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত" (ইলিয়াস ২৩০-৩১) বদরুদ্দীন উমর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক' গ্রন্থে মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের দ্বারা 'জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি'কে সমর্থন জানিয়ে 'মিল্লাত' পত্রিকায় লেখালেখির উল্লেখ করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে মুসলিম লিগের সম্মিলনীতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের প্রস্তাবে নেতৃবৃন্দ সম্মত হয়। কিন্তু, পাকিস্তান হাসিলের পরে লিগের নেতারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি।^{১৮২} ৫ই জুলাই ১৯৪৬ সালে 'মিল্লাত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'বাংলার মৃতপ্রায় পল্লীকে পুনরায় নবজীবনে উজ্জীবিত'^{১৮৩} করার বিষয়ে তেভাগা-সমর্থনকারী লেখা প্রকাশিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভাজন নয়, বরং শ্রেণিস্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার অবস্থানই তারা নেয়। কিন্তু, এই সম্প্রীতির, মিলেমিশে থাকার বয়ানগুলো কতটা প্রচার/প্রকাশ করেছিল বর্ণহিন্দুদের সাহিত্যপত্রিকা?

'দেশ' পত্রিকার ১৭ই আশ্বিন ১৩৫৪ সালের সম্পাদকীয়তে দেশভাগের জন্যে সর্বতোভাবে দায়ী করা হয় মুসলিম লিগকেই। মুসলিম লিগের আকাঙ্খাই যে দেশভাগের একমাত্র কারণ, তা উল্লেখ করে লেখা হয়,

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ভারতের মুসলমানগণের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, মুসলিম লীগের এই দাবির ফলে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাখানো প্রচারকার্যের প্ররোচনায় ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে... তাঁহার (লতিফর রহমান) বক্তব্য এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্রভাবে ভারতের মুসলমান সমাজের ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে। পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ সাম্প্রদায়িক স্বৈচ্ছাচারের উত্তেজনায় পড়িয়া যে বিষ বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সমাজ মনে মনে নিজদিগকে অসহায় বোধ করিতছেন। (দেশ পত্রিকা ১৩৫৪)

বলা বাহুল্য হিন্দু ভদ্রলোকের প্রিয় বয়ানই পুনরুজ্জীৱিত করেছে পত্রিকাটি। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি যেমন সত্যি, তেমনই বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় একাংশের ভূমিকাও কিছু কম নয়। ১৯৪৬ সালে বাংলা আইনসভায় মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর থেকেই ভদ্রলোক-হিন্দুদের ‘আতঙ্ক’ বাড়িয়ে তোলে উচ্চবর্গ হিন্দুনেতারা ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। মোট ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৪টি আসনেই জেতে মুসলিম লিগ, কৃষক প্রজা পার্টির ফলাফলও আশানুরূপ ছিল না। হিন্দু মহাসভার নেতা ও বাংলা ভাগের প্রস্তাবকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জামানত বাজেয়াপ্ত হয় মাত্র ৩৪৬টি ভোট পেয়ে^{১৮৪}। অন্যদিকে, বাংলার নির্বাচনে হিন্দু বনাম মুসলমান প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে এবং প্রায় সমস্ত হিন্দু ভোট পড়েছে কংগ্রেসের দিকে। জয়া চ্যাটার্জীর মতে, কংগ্রেসে হয়ে উঠেছে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বমূলক দল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’-কে কেন্দ্র ক’রে যে অস্থিরতা তৈরি হয় অবিভক্ত বাংলায়,^{১৮৫} তারপরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা, বর্ধমানের মহারাজা ও বাংলা কংগ্রেসের একাংশ অখণ্ড বাংলার দাবিকে নাকচ করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। জয়া চ্যাটার্জি তাঁর ‘বেঙ্গল ডিভাইডেড’ গবেষণা-গ্রন্থে এর বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ‘দেশ’ পত্রিকার বয়ানে এই দিকটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে

গিয়ে উড়িষ্যার জনৈক লিগ নেতা লতিফর রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত ক’রে দেশভাগের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় মুসলিম লিগের ওপরেই। কিন্তু, ইতিহাসের বয়ানে দেখা যায় যে, মুসলিম লিগ অখণ্ড বাংলার দাবি তুলেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলিম লিগের ‘আশরাফ’ শ্রেণির দুই গোষ্ঠী তথা সোহরাওয়ার্দি আর নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকলেও, বাংলা ভাগের বিরোধিতায় তাঁদের মতৈক্য ছিল^{১৮৬}। যদিও, ইম্পাহানী, আদমজিদের মতো অভিজাত মুসলমান শিল্পপতিরা পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে যুক্তবঙ্গ চেয়েছিলেন; বিপরীতে বাংলার তৎকালীন প্রিমিয়ার সোহরাওয়ার্দি গোষ্ঠীর দাবি ছিল স্বতন্ত্র অখণ্ড বাংলা। কিন্তু, এই বয়ানগুলোকে সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক পরিসরে ধামাচাপা দিয়ে যে বয়ানকে গল্প-গুজব-অর্ধসত্যে ফুলিয়েফাঁপিয়ে তোলা হয়, তাতে- প্রকারান্তরে হিন্দু ভদ্রসমাজ যে বিপন্ন হয়েছে মুসলিম লিগের বিষ-বিদ্বেষের ফলে, শাসকের সেই তত্ত্বকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। আরও উল্লেখ্য, এই সম্পাদকীয় অংশেই লতিফর রহমানকে উদ্ধৃত ক’রে লেখা হয় যে, “আমরা দ্বৈজাত্যবাদ ভুলিয়া ভারতরাত্ত্রের আনুগত্য স্বীকার করি” এবং একই পত্রিকার ওরা আশ্বিন সংখ্যায় মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ‘দুঃশাসন’ বিষয়ে কিছু অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ‘দেশ’ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকা, শিক্ষিত বাঙালি জনমানসে এর প্রভাব কয়েক দশকব্যাপী। তাদেরও মূল উদ্বেগ কিন্তু ওই শিক্ষিত ভদ্রলোক হিন্দুদের আশা-আশঙ্কা ঘিরেই বহমান। ভারতের তৎকালীন দুরবস্থার পেছনে কংগ্রেস ও তাদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজিপতিদের ভূমিকা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে লিগ ও ‘অবোধ’ ভোটারদের প্রতিই সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেওয়ার এই রাজনীতি পরবর্তীতে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যেও অঙ্গঙ্গী হয়ে থেকেছে। দেশভাগ ও দাঙ্গার বাংলা সাহিত্যে মূল যে বিষয়টি উপজীব্য হয়েছে, তা হল, আতঙ্কিত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ, পথে ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের লাঞ্ছনা এবং দেশত্যাগজনিত স্মৃতিরোমন্থন। ভদ্রসমাজের বিপন্নতা, সামাজিক নিশ্চয়তা হীনভিন্ন হওয়ার কাহিনি, যখন মধ্যবিত্ত-ভদ্র জীবনে ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে- অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু এটাই। রাজনৈতিক উল্লেখ যতটুকু আছে, তা দেশভাগের কারণ দর্শানোয়

এবং অবশ্যই তা মুসলিম লিগকে সর্বতোভাবে দায়ী ক’রে। রাজনৈতিক দর্শনের থেকেও সেইসব উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে স্মৃতিবিষাদ আর সামাজিক অস্তিত্ব-সংকট। আবার, দেশভাগজনিত বেদনা উপন্যাসগুলিতে যতটা এসেছে, দাঙ্গার বীভৎসতা সেভাবে উল্লেখ পায়নি। সাদাত হাসান মান্টো ওই একই সময়ে পাঞ্জাবপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত দাঙ্গা ও গণহত্যার যে আখ্যান ছোটগল্পে উল্লেখ করেছেন, সেই বীভৎস দাঙ্গা পূর্ব সীমান্তেও সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা উপন্যাসে তৎকালীন রক্তপাত, গণহত্যার উদাহরণ খুবই কম। দেশভাগের ওপরে লেখা তিনটি জনপ্রিয় উপন্যাস ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, ‘কেয়াপাতার নৌকো’ ও ‘পূর্ব পশ্চিম’ আলোচনা করা যেতে পারে। আরেকটি বয়ানও প্রায় প্রতি সাহিত্যেই আসে, “কোথেকে এক অবিশ্বাসের মেঘ এসে হাজির”¹⁸⁷ কিংবা, “এক বছরে আগেও একসঙ্গে হোলি খেলেছি। কিন্তু হঠাৎ-ই কেমন যেন হয়ে গেল”¹⁸⁸। কিন্তু, এই অবিশ্বাসের মেঘ একদিনেই তো পুঞ্জীভূত হয়নি। ‘হঠাৎ’ করেই কোনও সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়নি। এমত সরলীকরণে বিশ্বাস রাখলে ইতিহাসকে অস্বীকার করতে হয়। অবিশ্বাস। হতশ্রদ্ধা আর ‘খারাপ’ দীর্ঘ কয়েক দশক লালিত হয়েছে বাংলার সমাজে। স্থানভিত্তিকভাবে কম বা বেশি। “কাদের তো পড়ে ‘দৈনিক আজাদ’, সতীশ মুক্তার সবসময়ে বলে ‘অজাত’।” (ইলিয়াস, ২১৪) উচ্চবর্গ থেকে নিম্নবর্গের দিকে ক্রমেই সেই মেঘ বয়ে এসে ঘন হয়ে উঠেছে। চাপা অবিশ্বাস, অভিমান আর ক্রোধগুলো সময়-স্থান বুঝে দাঁতনখ বার করেছে। সাহিত্যে সম্প্রীতির নিদর্শনগুলো থাকলেও, বিভেদ আর বিচ্ছেদের উপাদানগুলোও ছিল। ইতিহাসে আর সমাজপরিসরেও ছিল।

‘খোয়াবনামা’-তে ইতিহাসের বিস্তৃতি ধরা থাকে খোয়াবের ভাষায়, অতীতের ভাষায়। লেখকের কখন নয়, তমিজের বাপের নিজস্ব কখনসূত্রে আসে, “চেরাগ আলির রুহে ভর করে মুনসিই জানিয়ে গেছে, গজারগুলোকে কেউ উৎপাত করলে এই দুনিয়ার ভাত তার চিরকালের জন্য উঠে যাবে। গজার মাছের ওপর জুলুম করা অত সোজা নয়” (ইলিয়াস, ৫৭) এই গজার কারা? এরা কি আসলে অত্যাচারিত কৃষক শ্রেণির রূপক? যুগের পর যুগ যারা উৎপাদন

ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে থেকেছে, সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে, তাদের ওপরেই শোষণ হয়েছে সবচেয়ে বেশি; অথচ, শোষণকারীরা নিপাত যাবে এও তো চিরকালীন বিদ্রোহবিশ্বাস। কংগ্রেস বা লিগের উচ্চবর্ণ নেতারা, ভদ্রলোক বা আশরাফরা যাদের শ্রমকে শোষণ ক’রে নিজেদের খমতার পথ মসৃণ করেছে, তারাই কি ওই গজার মাছ? আখ্যানের আরেক বিস্তৃতি ধর্মভিত্তিক ভাষাপার্থক্যে- শ্রেণি নয়, ধর্মীয় তফাৎ ভাষার দ্বন্দ্বিকতাকে প্রকাশ করেছে। হিন্দু নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোঁড়া হিন্দু সতীশ মুক্তাররা প্রাক-স্বাধীনতা পর্যায়ে যেভাবে ধর্মকে দেখছেন, যেভাবে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের উস্কানি দিয়ে বলে, “নো মোর উইথ দি বারবেরিয়ান মহামেডানস... দে বিলং টু এ ডিফারেন্ট কালচারাল লেভেল। উই ক্যান নট লিভ টুগেদার” (ইলিয়াস ২৩৪), সেই ভাষার বিরোধিতা করে কেইট পাল, বৈকুণ্ঠ গিরিরা। তাদের কাছে ধর্মীয় সহাবস্থান, দুর্গাপূজো না-করে ফকির-সন্ন্যাসীর পূজো করা এবং পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসীর থানে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত উৎসব অনেক বেশি অর্থময়। ‘বাবু’ হিন্দুদের ইংরাজি, ধর্মীয় অধিকার বুঝে নেওয়ার সংলাপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে তথাকথিত ‘সুপারস্টিশাস্ পিপল্’-এর মিথ ও সমন্বয়বাবর্ত। প্রায় দু’শো বছর আগের সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মিথ, মুন্সি ও ভবানী সন্ন্যাসীর প্রতিরোধ তারাই বয়ে নিয়ে চলে সংস্কৃতিতে, ভাষায়, আচরণে, মেলায়। আবার, ধর্মীয় চেতনার আধিপত্যে ভাষা একই শ্রেণির মানুষদের মধ্যে বিরোধ ঘটাতেও পারে। যতই মিলেমিশে থাকুক নিজগিরিরডাঙ্গা, গিরিডাঙ্গা, কাংলাহার বিলের আশেপাশের মানুষজন, তবু, তাঁদের মধ্যেও কি বিভেদ হয় না? প্রবলভাবে হয়। ‘নেড়ে’দের ঘর জ্বালাতে যায় দশরথ কামার। বৈকুণ্ঠ আহত হয়। মাঝিপাড়ার নিম্নবিত্ত, ‘সাধারণ মানুষ’ হঠাৎ কোনও এক অদ্ভুত আঁধারের চেতনায় হিংসায় জ্বলে ওঠে। “কামারপাড়ায় আগুন লাগিয়ে আসার পর আফসার মাঝির বালমুসিবত আসতে থাকলো একটার পর একটা” (ইলিয়াস ২৩৮) আফসার মাঝি তাই কামারপাড়ায় যুধিষ্ঠির কামারের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইতে যায়।

যে ইতিহাসকে রাজনৈতিক উপন্যাস ক’রে তোলেন ইলিয়াস, তা সংকটের ইতিহাস, বিযুক্তির ইতিহাস। বৈকুণ্ঠ গিরি বুধা মাঝি, কালাম মাঝিকে তার ভাষায় বলে দেয় “বেজাতের মানুষ” (ইলিয়াস ২৯০), হরমতুল্লা চাষী বলে এবং জাতবিভাগে মাঝিদের চেয়ে ‘উঁচু’ বলে তমিজের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না, তার ভাষায় প্রকাশ পায় মাঝিদের প্রতি অবজ্ঞা, ‘মাঝির বেটার সাথে তুমি কুটুস্থিতা করলে হামার ইজ্জত থাকে কুটি?’ (ইলিয়াস, ২৫৮) আবার, ১৯৪৬-র দাঙ্গার সময় সম্পর্ক ও ভাষা বদলায়। সেই ভাষায় মিথ্ ও লোকায়তকে ভুলিয়ে দিয়ে বড়ো করে দেখানো হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী উপন্যাসের বয়ান; বাবুহিন্দু সতীশ মুক্তার বলে, “হিন্দু সন্ন্যাসীরা তো মুসলমানের শত্রু! আনন্দমঠ পড়েছো?” (২৩৪)। মুসলিম লিগের গোঁড়া মুসলিমদের বয়ানে আসে পাক-ইসলাম পুনর্প্রতিষ্ঠার দাবি। বারবার কাদের, কালাম মাঝির আদেশ আসে কেরামতের প্রতি যাতে উগ্র-ইসলামের মহিমা প্রচার হয়। উচ্চশিক্ষিত সাদেক উকিলের ভাষা আরো তীক্ষ্ণ, “এখন আমাদের ফাইট হলো এগেনস্ট দি হিন্দুস” (ইলিয়াস, ২২১)। ধর্মভিত্তিক হত্যা প্রতিষ্ঠা পায় গফুর কলুদের ভাষায়, “কলকাতাতে মুসলমান মরিচ্ছে কুত্তাবিলায়ের লাকান। আর এটি দশরথ কর্মকারের মরিচ্ছে দুইটা গরু...” (খোয়াবনামা, ২১৮) আবদুল আজিজের সম্বন্ধী কলকাতায় দাঙ্গায় খুন হলে, কাৎলাহার বিলের আশেপাশে হিন্দুনিধনের পরিকল্পনা করে উগ্র মুসলমান মৌলবাদীরা। কেরামত আলির প্রগতিচেতনা এক ধূসর সংশয়ে ভোগে বিহার থেকে উদ্ধাস্ত হয়ে আসা মুসলিম নারীদের শোচনীয় পরিণতি দেখে।¹⁸⁹ আর, কামারপাড়াও হিন্দু মৌলবাদীদের উস্কানিতে ‘নিজেদের’ বাঁচাতে কলুপাড়ায় গণহত্যা করতে যায়। এই যে হিংসার কালব্যাপী প্রসার, হিংসার ‘আমরা-ওরা’, অপর সম্প্রদায়ের আক্রমণ ‘হিংসা’ এবং নিজসম্প্রদায়ের হিংসা ‘আত্মরক্ষা’, এই বোধ দাঙ্গামুহূর্তে অন্য সমস্ত বোধকে গুঁড়িয়ে দেয়। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর ‘কমিউনিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্সঃ রিকলিং পার্টিশন’ প্রবন্ধে লিখছেন,

a distinction is commonly drawn between 'our martyrdom' and 'their violence'; or 'their attacks' and 'our revenge'... No other path to justice': this is a violence forced upon the victims, a violence carried out in order to prevent further, and greater, violence (Pandey 1997, 2037)

দেশভাগ আর দাঙ্গার আতঙ্কদিনে যখন ন্যায়নীতির দুনিয়ায় ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে, যখন যুক্তিবোধ ভেসে যাচ্ছে আবেগ ও গুজবের প্রাবল্যে, তখন শাসকশ্রেণির নির্মিত বয়ানেই চালিত হয় আমাদের আদর্শ, মূল্যবোধ। আশিস নন্দী যে 'collapse of the moral Universe'¹⁹⁰ উল্লেখ করছেন, তখন দাঙ্গা-প্রতিরোধকারীদের ভাষার থেকেও ধর্মীয় উস্কানির এই ভাষা অনেক সহজে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে, তাদেরকেও হত্যালীলায় অংশগ্রহণ করিয়ে নিচ্ছে। আবুল মনসুর তাঁর গ্রন্থে এই মনুষ্যত্ব বোধ হারানোর কথাই বলছেন। নোয়াখালি, কলকাতা, বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতায় হিংসা হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।¹⁹¹ 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রাবন্ধিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের দাবি উল্লেখ করে লেখেন যে, কলকাতা শহরে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে (Direct Action)'-এ সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৪ হাজার মানুষের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছিল তা ভুল- প্রায় ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল¹⁹²। ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় পূর্ব পাকিস্তানে 'জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাধা' শীর্ষক অনুচ্ছেদ। ১৯৩২ সালে যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ¹⁹³ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তার প্রভাব আজও প্রবহমান। সম্প্রদায়গতভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোকে বিকেন্দ্রীভূত করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের মতাদর্শগত ক্ষমতা-পরিসরকে অক্ষুণ্ণ রাখা। হিন্দু-ভদ্রলোকেদের অসন্তোষ কীভাবে আতঙ্কে রূপান্তরিত হয়ে দেশভাগের পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল, জয়া তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ আরও একভাবে হিন্দু ভদ্রলোকেদের বিপন্ন করেছিল, তা হল অনগ্রসর শ্রেণির জন্যে নির্বাচনী আসন সংরক্ষণ করা।

নিম্নবর্গের তথা অনগ্রসর শ্রেণির জন্যে পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্রের আয়োজনে হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিকরা খুশি হননি; কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “মজুমদারের [রমেশচন্দ্র] মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক ঝাঁকসম্পন্ন জাতীয়তাবাদীর কাছে দলিতদের সীমিত পরিমাণ সুবিধা প্রাপ্তিও বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল”¹⁹⁴ মহাত্মা গান্ধীরও মনে হয়েছিল যে, এই সংরক্ষণ হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে; বামপন্থী ঐতিহাসিক-সমালোচকরাও অনগ্রসর শ্রেণির জন্যে সংরক্ষণকে শুধুমাত্র ব্রিটিশদের কৌশল হিসেবেই দেখেছিলেন। ব্রিটিশদের স্বার্থ অবশ্যই ছিল, অনগ্রসর শ্রেণির প্রকৃত উন্নয়ন বা ভারতীয় সমাজের বর্ণবাদ দূর করার সদুদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তা সত্ত্বেও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বর্ণবাদে নিষ্পেষিত দলিতদের, নিম্নবর্গের ভারতীয় রাজনীতিতে নিজস্ব আত্মপরিচিতির প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ভদ্রলোকের অসন্তোষকে বিদ্রোহে পরিণত করতে হিন্দু মহাসভা একটুও ভুল করেনি আর, বড় করে তুলেছিল পলাশী-পূর্ব শাসনব্যবস্থায় শাসিত হিন্দুদের কথা,

B. C. Chatterjee of the Hindu Sabha denounced the Award as a 'betrayal', arguing that 'the outflowing [*sic*] of the Bengalee Hindu genius, and the upbuilding of Bengal's new civilisation and culture has been the outstanding phenomenon of British India', and that British rule had enabled Bengali Hindu civilisation to flourish. Placing the Muslims on the *gaddi* would return Bengal to the dark age before Plassey (Chatterji 2002, 26)

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-র উদাহরণ বারবার এই জন্যেই দিতে হয়, ‘বাংলার রেনেসাঁ’ পরবর্তী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের দিতে হয় এই জন্যেই কারণ, হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণিকে সাহিত্য ও রাজনীতির বয়ানে বিশ্বাস করানো হয়েছে ইসলামিক শাসন মানেই ‘অন্ধকার যুগ’। আর, এই বিশ্বাস সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলে দেশভাগ ও দাঙ্গার দায় মুসলমান

সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দিতে সুবিধে হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উচ্চস্তর থেকে এই বিশ্বাস নিম্নস্তরের দিকে বইতে থাকে। আর, ‘দাঙ্গা’ এবং ‘হিংসা’ এই দু’টি শব্দের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্যোতনা কীভাবে যে কোনও সম্প্রদায়কে ‘নীতিবোধ’, পারস্পরিক সম্প্রীতি ওলোটপালট ক’রে দিতে পারে, সেই আলোচনাকে এগোলে দেখা যাবে ‘খোয়াবনামা’-র পরবর্তী অধ্যায়গুলো। নোয়াখালির দাঙ্গার যে ইতিহাস ও মুখফেরতা বয়ান, অবিকল মিলে যায় কাৎলাহার বিলের আশেপাশের গ্রামগুলির দাঙ্গার সাহিত্যবাচনে। নোয়াখালির জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলমান এবং প্রায় ৯৫% কৃষিজীবী।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অধিকাংশই জমিদার বা খাজনা আদায়কারী এবং মহাজন। তবে তাদের সংখ্যাও ছিল কম। আবার ছোটখাট ব্যবসা, স্থানীয় বাজার এবং দোকানপাট ছিল হিন্দুদের দখলে। এরা ছিলেন ‘নবশাখ’ সম্প্রদায়ের লোক (সাহা)। পরবর্তীকালে এরা ক্রমশ মহাজনী বৃত্তিও শুরু করেন এবং জমিতে নতুন মধ্যস্বভোগীর ভূমিকা নেন। এছাড়া জেলার মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল অস্পৃশ্য এবং নিম্নবর্ণের লোক। (রায় ২০১৩, ২২৩-৪)

গৌতম রায়ের প্রবন্ধের এই তথ্যের সঙ্গে নিজগিরিরডাঙ্গা, মাঝিপাড়া, গিরিরডাঙ্গা, কামারপাড়া গ্রামের সাযজ্য প্রচুর। জনসংখ্যাগত সামাজিক ও আর্থিক বিভাজনের চিত্র প্রায় একই। মুকুন্দ সাহা সেই গ্রামের এক বড় ব্যবসায়ী, যে মুসলমানবিদ্বেষী। “মুকুন্দ সাহার দোকানে কয়েক দিনের বাসি ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ ছমড়ি খেয়ে পড়ে লোকজন। কলকাতার মুসলমানরা হিন্দুদের মেরে সাফ করে ফেললো। সুরাবর্দি নিজে পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছে হিন্দু মারতে।” (ইলিয়াস, ২১৩) দেশভাগের প্রাক্কালে পরিণতি আঁচ ক’রে মুকুন্দ সাহা কর্মচারী বৈকুণ্ঠ বৈরাগীকে দোকান ও গুদামের দায়িত্ব দিয়ে নিজে পালিয়ে যায়; সেই গুদামেই হিংস্র সাম্প্রদায়িক কালাম মাঝির হাতে খুন হয় বৈকুণ্ঠ^{১৯৫}। উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদার ও মহাজনরাও প্রবলভাবে ‘খোয়াবনামা’য় আছেন। উক্ত প্রবন্ধে চল্লিশের দশকে নোয়াখালি সহ পূর্ববঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উল্লেখ ক’রে

গৌতম রায় বিভিন্ন তথ্যাদিতে দেখিয়েছেন যে, মুসলমান কৃষকদের শোষণ ক’রে অর্থ-প্রতিপত্তি বাড়ানো জমিদার ও নায়েবদের বাড়িতে আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয় ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে টানা দুই সপ্তাহ^{১৯৬}। গোলাম সারওয়ার হোসেনের মতো একদা কংগ্রেসঘনিষ্ঠ শোষিত মুসলমান প্রজাকে দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। শোষিত নিম্নবর্গ, যাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্কই ছিল না, তাঁদেরও প্রভাবিত করিয়ে নেওয়া যায় দাঙ্গার ভাষায়, হিংসার বয়ানে। ‘খোয়াবনামা’-র ধর্মকেন্দ্রিক সংগঠিত আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল কালাম মাঝি; মহাজন-জোতদার শরাফত মণ্ডলের থেকে মাঝিদের সমানাধিকারের দাবি দেখিয়ে কাৎলাহার বিলের মালিকানা নিয়ে সেই হয়ে ওঠে পরবর্তী শোষক। বাস্তবে গোলাম সারওয়ারের বদলও অনেকটা মিলে যায় এর সঙ্গে। “আগুনে ঘি ঢালার মতো এসে পৌঁছায় কলকাতার দাঙ্গার খবর”^{১৯৭} ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে আব্দুল আজিজের সম্বন্ধী আহসান আলির খুনের খবর এসে পৌঁছেলে একইভাবে আগুনে ঘৃতাছতি হয়। সাম্প্রদায়িকতার কোনও পরিসরেই আহসান আলির ভূমিকা ছিল না, কিন্তু তাকে তালতলায় খুন হতে হয় হিন্দুদের হাতে। আবার, আব্দুল আজিজকে হত্যোদ্যত হিংস্র হিন্দুদের থেকে রক্ষা করে এক সামান্য হিন্দু দোকানদারই। কিন্তু, সেই সুরক্ষাবয়ান চাপা পড়ে যায় প্রতিহিংসাবয়ানের সামনে। ইলিয়াস কেন কোনও কুশীলবকে ‘চরিত্র’ ক’রে তুলতে গিয়ে ভাল-মন্দ্র অবাস্তব বাইনারি ব্যবহার করেনি, তা বোঝা যায় শরাফত মণ্ডলের কথনে, “কিন্তু বাপু আজিজের জানটাও তো বাঁচলো হিন্দু দোকানদারের হাতেই। এটাও তো দেখবা... ‘আর ঐ হিন্দু দোকানদার’?, শরাফত মরিয়া হয়ে তর্ক করে, ‘আজিজের সাথে ঐ মানুষটার কি চেনাজানা আছিলো?’” (ইলিয়াস, ২১৮) কিন্তু, তারই ছোটছেলে মুসলিম লিগের অতিসক্রিয় কর্মী আব্দুল কাদেরের প্রতিশোধস্পৃহাকে দমাতে পারেনি শরাফতের নরমস্বর; কাদেরের হিংসাবয়ানে দু’টি উল্লেখযোগ্য বাক্য ছিল, “আজ হিন্দুর হাতে মার খাচ্ছে সব জাতের মোসলমান... হিন্দু মেয়েরা পর্যন্ত বাড়ির ছাদ থেকে লাঠিসোটা এগিয়ে দিচ্ছিলো।” (তদেব)

কলকাতা বন্দর এলাকায় তখন নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের বহু মানুষ বিভিন্ন কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে জাহাজীরা (বন্দর শ্রমিকরা নয়) ব্যাপক হারে দাঙ্গার কবলে পড়েন। হিন্দুদের মধ্যে মারা যায় মুটে, ফেরিওয়ালা, রাস্তার রিকশাচালক ইত্যাদি। এরা নিজেদের গ্রাম দেশে ফিরে গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিলে সেইসব জায়গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নোয়াখালি ও সমসাময়িক বিহারের ঘটনা দুটিকেই কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। (রায় ২০১৩, ২৩০)

বিহারের দাঙ্গা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে আসা এক-স্তন-কাটা নারীটির অবয়ব কেরামত আলির সম্প্রীতিবিশ্বাস টলিয়ে দেয়। গফুর কলু কলকাতায় মৃত মুসলমানের ‘শোকে’ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে দশরথ কামারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে ন্যায্যতা দিতে ব্যঙ্গোক্তি ছোঁড়ে “তা গোরু তো হিন্দুর দেবতা, গোয়ালেত যায়া দেবতাক ছাড়া দিবার পারলো না কিসক, লিজের জানের ভয়ই বেশি হয় গোলা?”^{১৯৮} মাঝিদের সঙ্গে কলুদের সামাজিক সংঘাত সেই মুহূর্তে উবে যায়, কারণ, দু’জনেই মুসলমান; ধর্মের হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশ তাদের এক ক’রে দেয়।

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের ৩৩ ও ৩৪ নম্বর অধ্যায়ে দাঙ্গার প্রাক-মুহূর্তের ছবি। দাঙ্গার মুহূর্তে নৈতিকবিশ্ব যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে, তা বোঝা যায়। ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ হুমড়ি খেয়ে পড়ে খবর শুনে কেঁট পাল, দশরথ কামাররা ক্রোধান্বিত হয় সতীশ মুক্তার, পূর্ণচন্দ্র নায়েকের কথায়। নোয়াখালিতে যেভাবে গোলাম সারওয়ার হোসেনের নেতৃত্বে হিন্দু জমিদারের বাড়ি লুণ্ঠ করতে ও খুন করতে যাওয়া হয়েছিল, তেমনটাই হয় গোলাবাড়িতে কাছারি বাড়ি লুণ্ঠ করার বর্ণনায়। ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নারায়ণপুর গ্রামে জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে আক্রমণ করে গোলাম সারওয়ারের দুই সহকারী কাশেম ও আকবর। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ির সকলকে হত্যা করা হয়। ১১ই অক্টোবর করপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর জমিদারবাড়ি আক্রমণ করা হয়, নেতৃত্বে সেই গোলাম সারওয়ার। হিন্দু মহাসভার নোয়াখালি অঞ্চলের নেতা রাজেন্দ্রলালের বাড়ির সকলকে হত্যা করা হয় ও কাছারিবাড়িতে আগুন লাগিয়ে

দেওয়া হয়। গৌতম রায় ‘গোলাম সারওয়ার ও নোয়াখালির দাঙ্গা’ শীর্ষক প্রবন্ধে দাঙ্গার যে খতিয়ান রেখেছেন, ‘খোয়াবনামা’-ও সেখানে মিলে যায়।

‘নারায়ে তকবির’ ‘আব্বাহ আকবর’ শ্লোগানে গোলাবাড়ি থেকে ওদিকে লাঠিভাঙ্গা এবং এ দিকে গিরিরডাঙ্গা পর্যন্ত কেঁপে উঠলে শীতরাত্রির হিম কেটে লাফিয়ে ওঠে চারপাশের গ্রামগুলো... ওদিকে কাছারি থেকে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ হতে থাকলে কালাম মাঝির ভাইপো আফসার দলবল নিয়ে পিছু হটে। কিন্তু অনুসারীদের সামলানো তখন তার সাধ্যের বাইরে, সামলাবার ইচ্ছাও তার ছিলো কিনা সন্দেহ। লোকজন উল্টোদিকে দৌড় দেয় বটে, তবে রাস্তা থেকে কয়েক গজ ভেতরে মুচিপাড়ার সবেধন নীলমণি আটটা বুপড়ি তছনছ করী দেয় (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২১৯)

গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে দাঙ্গাবাজেরা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’, ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’, ‘কলকাতার দাঙ্গার বদলা চাই’ শ্লোগানে প্রায় ৩০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে হিন্দুদের ঘরবাড়িতে লুণ্ঠপাট ও অগ্নিসংযোগ করে; প্রায় ৩০০ জন মানুষ নিহত হয়^{১৯৯}। জমিদারবাড়ি ও কাছারিবাড়িতে আক্রমণ থেকে ধর্মীয় গণহত্যার আগুন নিম্নবর্ণের মানুষদেরও নিঃস্ব ক’রে দেয়। মুনসি বয়কতুল্লাহ, মজনু শাহ ও ভবানী পাঠকেরাও কাছারিবাড়ি, জমিদার বাড়ি লুণ্ঠ করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু, তার মূলে ছিল অর্থনৈতিক দাবি, শ্রেণি-অসন্তোষ। অথচ, ১৯৪৬-৪৭ সালে এসে তা বদলে গেল ধর্মীয় বিদ্বেষে। নির্দিষ্ট স্থানে/গ্রামে/শহরে সংখ্যালঘুদের গণহত্যা ক’রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মমতের বিজয়োল্লাস একদিকে যেমন সম্প্রীতির নৈতিকবিশ্বকে তছনছ ক’রে দেয় তেমনই অন্যদিকে দুই ধর্মের মধ্যে বাড়তে থাকা কয়েক দশকের ফাটলকে নগ্নভাবে প্রকাশ্যবাস্তবে এনে ফেলে। কামারপাড়া আফসার মাঝিকে খুনের সময়ে ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগানে ছুটে এলে কলুপাড়া আর মাঝিপাড়া ‘নারায়ে তকবির’ বলে পাল্টা খুন করতে ছোটে। কিন্তু, এ সবই তো ইতিহাসের অল্পবিস্তর, সচেতন

পাঠকদের জানা। তাহলে ইলিয়াস এই দাঙ্গা-গণহত্যা-বিভেদের ইতিহাসকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করছেন কী ক’রে? ‘রাজনৈতিক উপন্যাস’ নির্মিত হচ্ছে কী ক’রে?

দু’জন কুশীলবের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। উপন্যাসে উল্লিখিত সুরাবর্দি, শ্যামাপ্রসাদ, মজনু শাহ, ভবানী পাঠক যেমন ইতিহাসের সত্য; তেমনই উপন্যাসের সত্য বৈকুণ্ঠ বৈরাগী আর কেরামত আলি। হেইডেন হোয়াইট ইতিহাসের ফাঁকফোকর পূরণে কাহিনির আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেছেন। মহাকাব্যের যুগ থেকেই সেই পদ্ধতিতে ‘ইতিহাস’ কালস্থানব্যাপী পাঠকের সামনে হাজির করা হচ্ছে। কিন্তু, ইলিয়াস তো ইতিহাস লিখছেন না, তিনি নির্মাণ করছেন উপন্যাস। সেইজন্যেই বৈকুণ্ঠ বৈরাগীকে দাঙ্গা-সাম্প্রদায়িকতার বিষমুহূর্তে স্মরণ করতে হয় চেরাগ আলি ফকির আর মুনসির কথা। আব্দুল আজিজের সম্বন্ধী হিন্দুদের হাতে খুন হলে তার খোয়াবে আসে সন্ন্যাসীর খাঁড়া, “ঐ খুনীদের ঘাড়ের ওপর ভবানী সন্ন্যাসীর খাঁড়া যদি না নেমে আসে তো সেটা সন্ন্যাসীর হাতে রেখে কী লাভ।” (ইলিয়াস, ২১৪) দশরথ কামারের খড়ের চালায় আগুন লাগিয়ে আসার পর থেকেই আফসার মাঝির ‘বালামুসিবত’ চলতে থাকে, তার পারিবারিক দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়। কিন্তু, এ তো সংস্কার, বিশ্বাস- সেইজন্যেই ইতিহাসের ‘মিসিং লিঙ্ক’ হিসেবে থেকে যায় কারণ, এই বালামুসিবত থেকে উদ্ধার পেতে ক্ষমা চাইতে গিয়েই কামারপাড়ার হিন্দুদের হাতে খুন হয় আফসার। খুনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। অথবা, নতুন বৃত্তরচনার পূর্বাভাস থাকে ওই ধর্মীয় উদ্গীরণকে কেন্দ্র ক’রে।

‘স্বদেশী’, ‘বয়কট’, দাঙ্গার আখ্যান এবং দাঙ্গাবিরোধিতার স্বর

কিন্তু, এই দাঙ্গা কি ‘হঠাৎ’ প্রত্যক্ষ করেছে বাঙালি? তা তো নয়। উনিশ শতক থেকে বিশ শতক জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বহুবার সংঘটিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। কখনও জমিগত বিবাদে, কখনও পূর্বঘটিত দাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে, কখনও গোরক্ষাকে কেন্দ্র ক’রে, কখনও

কোনও ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য দাঙ্গা হয়েছে।²⁰⁰ তাতে রক্তপাত হয়েছে, বিদ্বেষ বেড়েছে। যে প্রদেশে যারা সংখ্যাগুরু, তারা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্মমতকে জনমতে রূপান্তরিত করেছে; আর, এতে মদত জুগিয়েছে শাসকশ্রেণি। ১৯০৭ সালে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজশাহী ইত্যাদি জেলাতেও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। একদিকে যেমন আবদুল হালিম গজনভি, আবদুল রসুলের মতো ‘স্বদেশি’র প্রবক্তা, উদ্যোগপতি ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রবক্তারা ছিলেন, তেমনি নবাব সলিমুল্লাহ ও তার অনুগামীরাও ছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলমান পৃথকীকরণে মদত দিয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ ‘বিলাতি বর্জন রহস্য’ ও ‘লাল ইস্তেহার’ ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রচারপুস্তিকা দ্বারা পুনরায় মুসলমান ‘গোঁড়ামি’কে জাগিয়ে তুলতে চাইলেন ধর্মীয় উন্মাদনায়।²⁰¹ ‘স্বদেশি’ ও ‘বয়কট’ দু’টি আন্দোলন যুগপৎ চলছিল তখন। কিন্তু, বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের চোরাস্রোতও ছিল। বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর এমন যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল যে মুসলমানদের তারা দূরে সরিয়ে রাখেন। তবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা।”²⁰² রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস ‘ঘরে বাইরে (১৯১৬)’ স্বদেশি-বয়কট আন্দোলনের যুগের রাজনীতির কথা বলে। ধর্মীয় উস্কানি ও দাঙ্গার ফলে গ্রামীণ জনজীবন যে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তার উদাহরণ যেমন সন্দীপের বয়কটকেন্দ্রিক আন্দোলনের উগ্রতা, তেমনি উল্লেখ থাকে,

ঢাকা থেকে মৌলবি-প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতো ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও করি। এবারে বুঝলুম ঠেকানো শক্ত হবে। আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। (ঠাকুর ১৩৬৮ সাল, ১৩৫)

‘নিখিলেশের আত্মকথা’ শীর্ষক এই অংশেই জমিদার নিখিলেশের বয়ানে উল্লেখ থাকে ভদ্র-শিক্ষিত-হিন্দু মুরগিবাদের বিপ্লবতার। ‘গো-হত্যা’ যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভেদের এক জোরালো সামাজিক প্রতীক, তা ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির ক্রোধে বোঝা যায়। একই সঙ্গে, অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপানচন্দ্রা রবীন্দ্রনাথের যে ঐক্যপন্থী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সন্দীপের বয়ানে তারই উল্লেখ থাকে। পশুহত্যার ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় রাজনীতির বিরোধ রবীন্দ্রনাথ বহু দশক ধরেই করেছেন, ‘বিসর্জন’ নাটকের বিষয়বস্তুই বলির বিরোধিতা। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের এই বিরোধিতার ধারা বজায় থাকে এবং তা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকাজ্জ্বল্য সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়²⁰³। “এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্র যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি।” (ঠাকুর, ১৩৫) এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ‘ইংরেজি-পড়া, এখনকার বুলি আওড়ানো’ ব্যক্তিটির বিদ্রোহী মতামতের বিরুদ্ধে শ্লেষও থাকে! রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয় ভদ্র-শিক্ষিত-হিন্দুদের ‘আতঙ্কিত’ ক’রে তোলার রাজনীতি সম্পর্কে অবগত এবং দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ শিক্ষিত ও নিম্নবর্গীয় মুসলমান সমাজের অভিমান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। স্বদেশি আন্দোলন যে উচ্চবর্গের হিন্দু জমিদারদের চাপিয়ে দেওয়া মতামত নয়, বরং তা প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমান, দরিদ্র প্রজার আত্মিকরণের রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের স্বরে সেকথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই, সানকিভাঙ্গার চক্রবর্তী বা জমিদার হরিশ কুণ্ডু স্বদেশির পক্ষে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত-ভদ্র হিন্দুদের জনতোষী হলেও, নিখিলেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিরূপভাজন হয়েছে। ‘সন্দীপের আত্মকথা’ অধ্যায়ে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্দীপের মনোভাব অধুনা ভারতবর্ষের হিন্দুত্ববাদী শাসকের সাথে মিলে যায়। আত্মপরিচিতির দাবি করা, হিন্দু উচ্চবর্গের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না-পারা মুসলমানদের ওপরে বয়কটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে না সন্দীপ; নবাব ও মৌলবীদের সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে তাদের এই কর্মকাণ্ড ‘দাঙ্গা’ ও ধর্মীয় বিরোধের প্রাবল্যকেই বাড়িয়ে তোলে। দরিদ্র প্রজাদের বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন না করার অর্থনৈতিক

কারণও ছিল; হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় ‘স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ’ গ্রন্থে লিখছেন,

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। স্বল্প মূল্যের বিলাতি দ্রব্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল বেশি। ১৯০৬ সালের পর বিলাতি পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প হিন্দু নেতারা যতই উৎসাহ নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন, ততই মুসলিম জনগণ ওই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করতে থাকে (মুখোপাধ্যায় ১৯৬১, ২৩৭)

হিন্দু মহাজনদের হাতে সস্তায় পাট ও চাষের ফসল তুলে দেওয়ার বিষাদ, ঈশ্বরবৃত্তি কর দেওয়ার দুঃখ অন্যদিকে হাট থেকে সস্তায় দ্রব্য কেনার ওপরে স্বদেশির স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞার বেদনা। “একটা চাষী তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জার্মান শাল-কটা কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।”²⁰⁴ স্বদেশির লক্ষ্য যতই মহান হোক, দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে সেই আদর্শের সত্যটুকু উপলব্ধি করাতে ব্যর্থ হয়েছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দ। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে দরিদ্র হিন্দু প্রজা কাপড়-বিক্রেতা পঞ্চুর সমস্ত কাপড় পুড়িয়ে দেওয়া হয় ‘বিলিতি’ হওয়ার অপরাধে এবং তার একশ টাকা জরিমানা করে জমিদার হরিশ কুণ্ডু (স্বদেশির সমর্থক)। সন্দীপের উগ্রবুদ্ধিতে হাটের কাপড়-বিক্রেতা মিরজানের নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া হয়, বিলিতির সঙ্গে ‘রফা’ না-করার সংকল্পে সন্দীপ বলে, “মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব... চাষীর খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করার শখ আমার নেই, কিন্তু এ হল যুদ্ধ।”²⁰⁵ প্রজাদের অসন্তোষ ও উচ্চবর্গের জবরদস্তিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপান্তরিত করতে ইংরেজ শাসক, নবাব ও স্বার্থাশ্রয়ী হিন্দুদের বেগ পেতে হয়নি। ‘ঘরে বাইরে’ এই দাঙ্গার উল্লেখ ক’রে চন্দ্রনাথবাবু বলছেন,

নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না... অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহুদূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভেতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল। (ঠাকুর ১৬৫-৭)

এই দাঙ্গার ফলেই নিখিলেশের মাথা ফেটে জীবন বিপন্ন হয় এবং অমূল্য গুলিতে মারা যায়। স্বদেশি ও বয়কট ক্রমশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকে ধর্মীয় মেরুকরণের বিষবাস্পকে ঘনীভূত ক’রে তোলে আরও। আর, এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার ক্রমশঃ এক দর্শন হয়ে উঠতে থাকে, ১৯১৭ সালে যখন তিনি ‘ন্যাশনালিজম’ গ্রন্থটি লেখেন এবং জাপানে, আমেরিকায় ও ইউরোপের দেশগুলোতে বক্তৃতা করতে যান, তখন এই ‘স্বদেশ’ ও ‘জাতীয়তাবাদ’ দর্শন তাতে প্রতিফলিত হয়। নিখিলেশ কুশীলব থেকে চরিত্র হয়ে ওঠার পথে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশদর্শনের বুলি উচ্চারণ করতে থাকে। প্রতি আচরণে ও সক্রিয়তায় সন্দীপের জাতীয়তাবোধের বিরোধিতা করতে করতে রবীন্দ্রনাথের স্বরই হয়ে উঠতে থাকে নিখিলেশের স্বর ও বয়ান। ‘বন্দে মাতরম’ ততদিনে রাজনৈতিক স্লোগানরূপে পূর্ণতা পেয়েছে এবং এই শব্দদ্বয় ঘিরে রাজনৈতিক আলোড়ন প্রবল হয়ে উঠেছে- তা উপন্যাসে বারবার ধরা পড়ে। ‘বন্দে মাতরম’ যে কিছু স্বার্থান্বেষী সংকীর্ণতাবাদীর হাতে পড়ে তাদের যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারের ব্যক্তিগত সাফল্যমন্ত্র হয়ে উঠেছে, নিখিলেশের বকলমে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষোভ গোপন রাখেন না। দাঙ্গার প্রাক্কালে সন্দীপ ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রটিকেও দেশপ্রেম থেকে মানুষীপ্রেমে নামিয়ে আনে, “তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরম্ নয়- বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং” কিংবা দাঙ্গামুহূর্তে গ্রাম ছেড়ে পালাবার সময়ে সে বলে, “মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়রূপিণীং হংপিণ্ডমালিনীং”!²⁰⁶ স্বদেশি-বয়কট ঘিরে আবর্তিত

রাজনীতিতে সন্দীপের চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টো- (i) নিখিলেশের পুণ্যপবিত্র সাদা চরিত্রের বিপরীতে সন্দীপের পাপমলিন কালো চরিত্রের বৈপরীত্য তৈরি এবং (ii) সন্দীপের মধ্যে দিয়ে দেশীয় উচ্চবর্গীয় নেতাদের আখের গোছানোর মানসিকতাকে পাঠকমানসে প্রতিভাত করা²⁰⁷। সেই ধ্বংসাত্মক কাজে স্বদেশের দোহাই দিয়ে বিমলাকে, অমূল্যকে এবং দেশের মানুষকে ব্যবহার করে নেয় সন্দীপ। 'ঘরে বাইরে' কেন রাজনৈতিক উপন্যাস, তার স্পষ্টতা থাকে দুই বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত যখন আখ্যানের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শও সন্দীপ-নিখিলেশের দ্বন্দ্ব ও তাদের স্বগত কথনে (আত্মকথা শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে) বোঝা যায়। “সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ”- নিখিলেশের এই উপলব্ধিতে পাঠকও এই বিরোধের মধ্যে দিয়ে লেখকের 'স্বদেশ' আর 'সত্য' বিষয়ক দর্শনের প্রতি বুঁকে পড়েন।

অমূল্য চরিত্রটির নির্মাণ ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথও বোধহয় বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের 'ভুলিয়ে ভালিয়ে' রাজনীতিতে নিয়ে যাওয়া হয়; পাকা মাথার রাজনীতিকেরা তাদের ব্যবহার করে নেওয়ার পরে, সরল-বীর-সৎ অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলি অকালে প্রাণ হারায়²⁰⁸। অর্থাৎ, রাজনীতি কোনও ভদ্রলোকের কাজ নয়, বিশেষতঃ শিক্ষিত-ভদ্রলোক বাড়ির মেধাবী সন্তান (শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিবারণ ঘোষালের ছেলে অমূল্য) 'বিপথে' চালিত হয়ে রাজনীতিতে গেলে তার পরিণাম ট্রাজিক- রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতর্ক এক শতক পরেও আমাদের চেতনায় বাসা বেঁধে আছে। তনিকা সরকারের বিশ্লেষণে,

It is by splitting the figure of the extremist patriot between Sandip and Amulya that an element of heroic commitment is retained. Idealism- crude, unthinking, but vivid and real- is displaced onto the figure of Amulya, the revolutionary terrorist who is manipulated by

the older leader, but who, nonetheless reserves a surplus of genuine patriotism. (Sarkar 2005, 33-4)

নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়নে কিংবা সাম্প্রতিক রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনও আন্দোলনে এই প্রতর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা বিচার করি এবং অধিকাংশ ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসের মতাদর্শ সাজিয়ে নেন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আরেকটি বিষয় থাকে, তা হচ্ছে কলকাতা-কেন্দ্রিকতা। মাস্টার মশায় চন্দ্রনাথবাবু, যাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে নিষ্কলুষ, আদর্শবাদী, সৎ হিসেবে²⁰⁹ (বিবেকের ভূমিকায় এরূপ কোনও চরিত্র নির্মাণ রবীন্দ্রনাথের নাটকেও প্রচুর), তিনি নিখিলেশকে পরামর্শ দেন,

বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও- মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন। আমিও ঐ কথাই ভাবছিলাম। (ঠাকুর, ১৩৮)

কলকাতা যেন এক আদর্শ স্থান, আর্থ-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তো বটেই, এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকেও। বিমলার মনোচাঞ্চল্যে অধীর হয়ে মাস্টার মশায় থেকে মেজোরানী থেকে নিখিলেশ প্রত্যেকেই বিমলাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। নিখিলেশ নিজেও তার নিজের জমিদারির দাঙ্গাপ্রবণতা থেকে পালাতে চায় কলকাতায়। তাহলে কি কলকাতার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থান পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ রাজনৈতিক অবস্থানের থেকে অন্যরকম ছিল? পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রজাকে প্রভাবিত ক'রে বঙ্গভঙ্গ সফল করতে চাওয়া উচ্চবর্গ মুসলমান আর কলকাতার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের তফাৎ ছিল; বারংবার কলকাতায় যেতে চাওয়া আসলে কি নিখিলেশের রাজনৈতিক-সামাজিক স্বস্তিক্ষেত্রের দিকে সরে যাওয়াকেই ইঙ্গিত করে না? গ্রাম্য 'ক্ষুদ্র' রাজনীতি আর ধর্মীয় বিরোধের সন্ধিক্ষেত্রে কলকাতার 'আধুনিক', মুক্তমনা পরিবেশকেই বিমলার রাজনৈতিক জ্ঞান উপলব্ধির যথার্থ স্থান মনে করেছিল

নিখিলেশ। নিখিলেশ তার গরীব প্রজাদের জন্যে সহানুভূতিশীল, তাদের সুখ-দুঃখের ভার নিয়ে সে ‘ভাল’ জমিদার এবং দেশীয় উদ্যোগপতির ভূমিকায় বেশ কিছু পুঁজি ব্যবহারও সে করেছে দেশের দেশের কল্যাণের জন্যে। কিন্তু, নিখিলেশ শেষাবধি উচ্চবর্গ শিক্ষিত হিন্দু জমিদার; সন্দীপের রাজনীতি যেমন ব্যক্তিস্বার্থের মুনাফায়, নিখিলেশের তা নয়, কিন্তু নিখিলেশের উচ্চ-মানবতাবাদ কি আদৌ কোনও নিম্নবর্গীয় প্রজার বয়ান হয়ে উঠতে পেরেছে? রবীন্দ্রনাথ ‘ঘরে বাইরে’-কে দাম্পত্যের বিপর্যয় হিসেবেও দেখাতে চেয়েছেন- দেশের রাজনীতির ভ্রান্তাদর্শ ‘ঘর’কেও কেমন ভেঙ্গেচুরে দেয়। বিমলার আত্মকথা যতই উপন্যাসের আখ্যানে ফিরে ফিরে আসুক, বিমলার ‘স্বাধীনতা’ কিংবা ইচ্ছে-অনিচ্ছে সবটুকুই নিখিলেশ বা সন্দীপের বয়ানমতো চলে। যদিও তনিকা সরকার বিমলার চরিত্রকে সন্দীপ-কথিত ‘মক্ষীরানী’র দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখেছেন,

It is Bimala who initiates the action that animates the plot, even though it is easy to depict her as a ‘made’ creature, the product of conflicted male designing. She follows these designs up to a point, and then, in an abrupt move of rejection, she opens up a different trajectory for all the male protagonists: Nikhil, Amulya, Sandip. (Sarkar 2005, 37-38)

নিখিলেশের উপলব্ধিতে বিমলার সাজের আড়ম্বর নিখিলেশের থেকে কাজ আদায় করার জন্যে সাজ, এমনকি, “বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে।”²¹⁰ উপন্যাসের আখ্যানপথে এই ছায়াকে বদলানোই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, তা সফলও হয়। সন্দীপের রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্তঃসারশূন্যতা বিমলার কাছে প্রতীয়মান হয়। সন্দীপের ছায়া সরে গিয়ে নিখিলেশের ছায়া গাঢ় হয়ে পড়ে বিমলার ওপরে, দেশ-দেশের রাজনীতিকে নিখিলেশ

যেভাবে তার জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিকতায় উপলব্ধি করেছে ও সক্রিয়তায় প্রকাশ করেছে, বিমলা সেটাই উপলব্ধি করে বহু ঠেকে ও ঠকে। বিমলা তার আত্মকথার স্বগতকথনে যে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যায়, খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, তা আসলে লেখকেরই চেতনার প্রতিফলন। কিন্তু, বিমলার নিজস্ব রাজনৈতিক বোধের বিকাশ ঘটল না। তনিকা সরকারের মতও এখানে মেলে, যে, “Her autonomy therefore had no adequate image from which it could be reflected back to her as a coherent fullness”²¹¹ রবীন্দ্রনাথ নিজেও নারী-স্বাধীনতা বিষয়ক দ্বন্দ্বে ভুগেছেন, কিন্তু, অনস্বীকার্য যে ১৯১৬ সালে বিমলা চরিত্র নির্মাণে সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন তিনি। সন্দীপ ও নিখিলেশের দুই বিরুদ্ধ দর্শনকে প্রকাশ করেও বিমলার স্বাতন্ত্র্য ছিল, কিন্তু ওই একই কারণে বিমলার স্বতন্ত্র বিকাশ সংশয়ের পথে এগোতে এগোতে শেষপর্যন্ত চিরায়তকেই মেনে নিয়েছে। বিমলাকে একদিকে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বে অন্যদিকে নিখিলেশ-সন্দীপের সঙ্গে সংযুক্তি ও বিযুক্তির দ্বন্দ্বে জারিত হয়ে নিজস্ব রাজনীতির নির্মাণ ক’রে নিতে হয়েছে। বিমলার ‘ঘরের বাইরে আসা’র চেতনা নিশ্চয় তার নিজের মধ্যে ছিল, কিন্তু বিমলাকে ‘ঘরের বাইরে নিয়ে আসা’ কি উদার-শিক্ষিত-ভদ্র-উচ্চবিত্ত নিখিলেশের সামাজিক নিরীক্ষামূলক অবস্থান নয়?

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের মুহূর্তে ‘বন্দেমাতরম’ সাহিত্যিক উপাদান থেকে রাজনৈতিক উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘সর্ববিষয়ে স্বদেশি’ নামক প্রবন্ধ, যা তৎকালীন অগ্রণী সাহিত্যপত্রিকা ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হয়েছিল।

“বন্দেমাতরমের” মধ্যে দুইটা বিভিন্ন Idea বা ভাব পাওয়া যাইতেছে- উভয়টার জন্যই আমরা ঐ ঘৃণিত সাহেবদের নিকট ঋণী। প্রথম idea ভারতবর্ষ একটি দেশ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রদেশমাত্র। দ্বিতীয় idea এই দেশ আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর ন্যায় পূজনীয় এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের পরমধর্ম... এবং এ ideaটা এখনও পর্যন্ত আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে নাই...

জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য, স্বদেশপ্রীতিই মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র। (মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯, ২৮৩)

নিখিলেশ বারংবার আইডিয়ার কথা বলে। দেশ কী, দেশের মানুষ কী, ভারতবর্ষ কী- ‘গোরা (১৯১০)’ উপন্যাসেও এই সন্ধানই উপন্যাসের উপজীব্য। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যে, বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশবোধের সংকীর্ণতাকে নাকচ করে দিচ্ছেন তিনি; ভারতবর্ষ মানে যে বহুত্বের বোধ, ভিন্-সংস্কৃতির আত্মীকরণ ও অন্যের সঙ্গে আত্মীকরণের ফলে ‘দেশ’ ধারণার বাস্তবায়ন, প্রভাতকুমার পরিচ্ছদের প্রেক্ষিতে তা ব্যক্ত করেছেন। স্পষ্টতই বয়কট (বিশেষতঃ বিজাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ বয়কট) রাজনীতিকে সমালোচনা ক’রে স্বদেশি ভাবধারা, শিল্পবিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশও তো এই স্বদেশি শিল্পোদ্যমকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রচুর ক্ষতিস্বীকার করেছিল। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে বয়কটওয়ালাদের বিরোধ গুরুই হয় বিলাতি পোশাক পোড়ানোকে কেন্দ্র ক’রে এবং সন্দীপ ও হরিশ কুণ্ডের বিরুদ্ধে দরিদ্র ক্রেতা-বিক্রেতা প্রজাদের অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার কার্তিক ১৩১৩ সংখ্যায় পরিচ্ছদ বিষয়ে প্রভাতকুমারের মতামতের সমালোচনা করেন সম্পাদক।²¹² প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ চৌধুরী “বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশি চিজ- সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক”²¹³ একথা বলেও স্বীকার করছেন স্বদেশির গুরুত্ব এবং স্বদেশি আর বয়কটকে একে অপরের পরিপূরক রাজনৈতিক দ্রোহপদ্ধতি বলে যুক্তিনির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে, শিক্ষিত মুসলমান সমাজ ও মৌলবি মাত্রেই যে ‘বয়কট’ বা ‘স্বদেশি’-র বিরোধী, ইতিহাস সেই একপেশে সাক্ষ্য দেয় না। মৌলবি মহম্মদ হেদায়েতউল্লা ‘স্বদেশি আন্দোলন’ প্রবন্ধে তিনটি মূল কথায় জোর দিয়েছিলেন- ভারতের উন্নয়নকার্যে ইংরেজরা সাহায্য করলেও, তাদের ভেদনীতি হিন্দু-মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করেছে, স্বদেশি বস্ত্র, স্বদেশি শিল্প ও স্বদেশি উন্নয়নে জোর দেওয়া

এবং “ভারতবর্ষের নষ্ট মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাঙালি অগ্রগামী হইয়াছে- তাই আজ সমস্ত ভারত বাঙালির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে”²¹⁴ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টতই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকার ঐতিহ্যের কথা বারবার এসেছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত হওয়ার আহ্বান। এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য তৎকালীন অগ্রণী পত্রিকা ‘নবনূর’-এ প্রকাশিত খয়েরখাহ্ মুনশীর ‘রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধ, যেখানে খয়েরখাহ্ উদাত্ত আহ্বান রেখেছেন স্বধর্মীয়দের দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষিত হিন্দুর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের দূরত্বের যে বহুলপ্রচার চলত (বঙ্গভঙ্গের সময় এই ধারণাকে কাজে লাগাতে উৎসাহী হয় ইংরেজরা ও আশরাফ শ্রেণির স্বার্থান্বেষী অংশ) খয়েরখাহ্ সেই প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইংরাজবিরোধী রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সক্রিয়তার সপক্ষে যুক্তি দেন। মূলতঃ ‘নবনূর’ পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় “শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে অশিক্ষিত মুসলমান মিলিত হইলে অশিক্ষিত মুসলমানেরই ক্ষতি হইবে.... Survival of the fittest নীতি অবলম্বিত হইলেই মুসলমানের দ্রুত পতন আরম্ভ হইবে।”²¹⁵ এই বয়ানে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিরোধিতা করেছেন এই প্রাবন্ধিক। ইংরেজবিরোধী রাজনীতি দেশগঠনের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, ধর্মীয় বিভেদকে প্রাধান্য না দিয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়া প্রয়োজন- “এখন আর বাকবিতণ্ডার সময় নাই। প্রকৃত কার্যের সময় আসিয়াছে... রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতে হবে”। খেয়াল করে দেখার বিষয় যে, রাজনীতিতে যোগ দেওয়া মানেই যে হীনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া বা কর্মে জলাঞ্জলি দেওয়া, এই ক্লিশে ধারণাকে একশ বছর আগেই নাকচ ক’রে দিয়েছিলেন খয়েরখাহ্; অর্থাৎ, রাজনীতিতে যোগ দেওয়া মানে ‘বিপথে’ যাওয়া এবং রাজনীতি মানেই হীন/খারাপ/নিম্নমানের কাজ এমনটা কখনোই নয়। কিন্তু, ‘ঘরে বাইরে’-র অমূল্য, বিমলা এরা তো সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে ‘বিপথে’ গেছে এমনটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আখ্যানে। সত্তর-দশক পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসের

‘অরাজনৈতিক’ প্রবণতা বেড়েছে, রাজনীতির প্রতি বিরূপ ধারণা পাঠকমনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া গেছে শুধুমাত্র ‘হিংসা’ শব্দকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। নবারুণ, মহাশ্বেতা, ইলিয়াসেরা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে উপন্যাস রচনা করেছেন। এই বিশ্লেষণে ১৩১২ সালে লেখা প্রবন্ধে রাজনীতিতে যোগদানের আহ্বান সেইজন্যেই বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ, বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি-বিমুখতাকে প্রশ্ন দেওয়ার প্রবণতাও যেমন ছিল, তার বিরোধিতাও ছিল- সেই ধারাবাহিকতাকেই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল সাহিত্যে আমরা বহন করে চলেছি।

কিন্তু, এই দাঙ্গা আর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিপন্নতার রাজনীতিই সবটুকু নয়। শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ১৯১৯ সালে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লির জামা মসজিদে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বহু স্থানে মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় গো-কোরবানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন^{২১৬}। ‘গো-কোরবানি’-কে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান বিভেদের রাজনীতি তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলিতেও স্থান ক’রে নিয়েছিল। প্রগতিবাদী সাহিত্যিকেরা এবং ভদ্রলোক-শিক্ষিত সাহিত্যবয়ান যতই উপন্যাস-কবিতার পরিসরে সম্প্রীতির বয়ান রাখতে চান না কেন, হিন্দু-মুসলমান অল্পমধুর সম্পর্ক বরাবরই উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে ছিল। বিশ শতকে বাঙলায় তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু বনাম মুসলিম তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু, এই সংঘর্ষ-দাঙ্গার সমান্তরালে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী বয়ানও ছিল। ভদ্রলোকীয় সাহিত্যে আরোপিত ‘সম্প্রীতি-বয়ান’-এ উপেক্ষিত হয়ে থেকেছে নিম্নবর্গ-নির্বিন্তের সংগ্রামী বয়ান। তাঁরা উচ্চবর্গ-উচ্চবর্ণের ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু শাসকের মতাদর্শগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তুলেছেন। ১৯৪০ দশক ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বঙ্গপ্রদেশে শুধু যে দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-উদ্বাস্তু রাজনীতির শোকাবহ তৈরি করেছিল তা নয়, বরং গণসংগ্রামের উজ্জ্বল আভাসও দিয়েছিল। বঙ্গপ্রদেশের তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে গেছিল অন্ধপ্রদেশের তেলঙ্গনার কৃষকবিদ্রোহ। ব্রিটিশ উপনিবেশের শেষপর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষকদের

গণসংগ্রাম ও জমির অধিকারের প্রশ্ন তীব্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের ক্ষমতালোভী ধ্বংসাত্মক রাজনীতির সমান্তরালে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতিও ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সমাজ ও তাদের সাহিত্যবৃত্তের বাইরে থাকা মানুষের গণআন্দোলন ১৯৪৭-র ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ১৯৫১ সাল অবধি জারি ছিল। কিন্তু, বহুসম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তেভাগা অবাস্তবায়িত স্বপ্নই থেকে যায়। তেভাগার ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক উপন্যাস ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তেভাগার অর্থ তিন ভাগ; তিন ভাগ হবে উৎপাদিত ফসল আর তার দুই ভাগ যাবে উৎপাদনকারী কৃষকের কাছে, এক ভাগ নিতে পারবে জমিদার^{২১৭}। আর, উৎপাদক কৃষকেরা আধিয়ার বা বর্গাদার- যে কৃষকেরা নিজের লাঙ্গল-গরু দিয়ে অপরের জমিতে চাষ ক’রে উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ জমির মূল মালিককে (কখনও জমিদারকে) দিতে বাধ্য থাকেন এবং অবশিষ্টাংশ (বেশিরভাগ সময়েই যা যৎসামান্য পরিমাণ) নিজে নেন, তাঁরা বর্গাদার; যেহেতু তাঁরা মোট ফসলের ন্যূনতম অর্ধেক (আধি) জমির মালিককে দিতে বাধ্য থাকেন, ফলে তাঁরা আধিয়ার বলেও পরিচিত। বহু কৃষকের নিজস্ব হাল-গরু থাকে না, ফলে তিনি বাধ্য হন মহাজন বা জোতদারের থেকে বা জমির মালিকের থেকেই হাল-গরু ধার নিতে, ফসল ভাগের সময়ে জোতদার/মালিক সেই হাল-গরুর দামস্বরূপ কৃষকের ভাগের বৃহদংশ ফসল নিয়ে নেন। পূর্ববঙ্গের তথা ভারতের অধিকাংশ কৃষকের অবস্থা এমনই, ফলে অতিসামান্য ফসল তাঁদের ভাগে জোটে, সেই ফসল বিক্রি ক’রে ঋণের বোঝা মেটে না এবং ক্ষুণ্ণিবৃত্তির ব্যবস্থাও হয় না। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র চ্যারকেটু-খেতখেতুরা এরকম আধিয়ার বা ভাগচাষী। ‘খোয়াবনামা’র হুরমতুল্লা ভাগচাষী এবং তমিজ ক্ষেতমজুর। দশরথ কামারের ঘরে আগুন লেগে দু’টো গরু মারা গেলে শরাফত মণ্ডলের দুঃখ হয় তারই জমির ভাগচাষী দশরথের জন্যে নয় বরং ওই গরুদু’টোর জন্যে, যারা চাষের কাজে লাগত। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’তে শুকরাপাড়ার মদেশিয় চাষীরা লালপতাকা নিয়ে আন্দোলন ক’রে বাহেবাবুর থেকে ও অন্য জোতদারের থেকে জমির দখল নিয়েও শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না; কারণ, জমি দখল

করলেও চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি তথা- গরু, লাঙ্গল, বীজ, সার কিছুই তাঁদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না। ফলে, পুনরায় তাঁদের জমি বন্ধক দিতে হয় মহাজনদের কাছে, চাষের দ্রব্যাদি ধার পাওয়ার আশায়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-র বসাই বারবার ক্ষেতমজুরদের অধিকারের প্রশ্ন তোলে। ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি (মিনিমাম ওয়েজ) না-দেওয়ার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করে বসাই টুডুরা। রাজনৈতিক উপন্যাস মধ্যবিত্ত পাঠকের আকাজ্জব্বত্তের বাইরের রাজনীতি-সংস্কৃতিকেও উদ্‌যাপিত করেছে। আর, তেভাগা আন্দোলন বাংলার অনেক রাজনৈতিক উপন্যাসেই স্থান ক’রে নিয়েছে। সাবিত্রী রায়ের ‘পাকা ধানের গান’, গোপাল হালদারের তিনপর্বের ‘একদিন’ উপন্যাস তেভাগা আন্দোলন ও চল্লিশ দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতিকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করে।

বঙ্গভঙ্গ যুগে সাম্প্রদায়িক শক্তির উপস্থিতি ও তার বিরোধিতা, সাহিত্যে দুইই উপস্থিত ছিল। আর, সেই জন্যেই কি, বঙ্গভঙ্গের সময় রচিত স্বদেশিয়ানার, সম্প্রীতির গানের সঙ্গে ‘খেয়াবনামা’র কেরামত আলির গানের কথার এত মিল? রজনীকান্ত সেনের গানে থাকে,

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু মুসলমান!

ঐ দেখ বরছে মায়ের দু-নয়ান

আজ, এক ক’রে সে সন্ধ্যা-নমাজ,

মিশিয়ে দে আজ বেদ-কোরাণ!

জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে

... আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী, দুই গোলারই একই ধান

একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে

একই ভাতে একই রক্ত বয়ে যায় (চৌধুরী ১৯৯৯, ৬৩৫)

‘সংকীর্তন- গড় খেমটা’ সুরের এই গান যে সম্প্রীতির কথা বলে, সম্মিলিত লড়াইয়ের কথা বলে, কেরামত আলির গানেও কি সেই প্রতিচ্ছবি নেই?

বিসমিল্লা বলিয়া শুরু করে কেরামত/ ভারতবর্ষে কায়েম হবে ইনসাফি হুকুমত।।

প্রথম বলি নিরঞ্জন সংসারের সার/ দ্বিতীয় বলি যম রাজা করিবে সংসার।।

শিঙা হাতে ইসরাফিলে দিবে যখন ফুক/ থাকবে না দালান কোঠা থাকবে না
তালুক।।

দরবেশ সাধুর মন্ত্র নিতে কেহ ভুইলো না/ লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না।।

... চিরযুগের দুষ্টি মোরা হিন্দু মোসলমান/ স্বাধীন পাবো আশা করি হতেছি
বিরান।।

এই দেশ আমার এই দেশ তোমার গুণগোল আর কইরো না/ লীগ কংগ্রেসের হিংসা
কেন গেলো না।। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৪২)

রজনীকান্ত সেনের চার দশক পরে কেরামত আলি এই গান প্রকাশ্য সভায় গাইছে; ‘গাজীর গান’-এর সুর তাতে। গোলাবাড়ি হাটে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মিলিত সভা, সুরেন সেনগুপ্ত আর ইসমাইল হোসেন দাঙ্গার সংকটাপন্ন সময়ে এই সভায় সম্প্রীতির আহ্বান রাখে, গান গেয়ে মাঝিদের, চাষীদের মন জয় করে কেরামত। এই চার দশকে গানের ভাষা আর বিষয়ে বদল এসেছে অনেকটাই। রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক রাজনৈতিক গানের সঙ্গে কেরামতের গানের পার্থক্য ক’রে দেয় পাওনা শোলোক আর তেভাগা আন্দোলন। কেরামতের গানের ভাষা ও বিষয় দু’য়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় কৃষকদের অধিকার-সংগ্রাম এবং লিগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বের মধ্যেও অনির্বাক্ষ্য নিম্নবিত্তের শ্রেণিসংগ্রামের আশ্রয়। কাদের, সাদিক উকিলদের কথায় শুধুমাত্র পাকিস্তানের দাবিতে গান বাঁধলে সে গান তার মনমতো হয় না। কিন্তু, তেভাগার চাষিদের দাবি অন্তর্ভুক্ত হলে সেই গান নতুনভাবে জেগে ওঠে। স্বদেশি ও বয়কটের সময় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় রচিত গানগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যথা আর অখণ্ড বঙ্গের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়ে থেকেছে। নিম্নশ্রেণির ও নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতিকে দেখার ভাষা অনুপস্থিত। কিন্তু, ইলিয়াসের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি যে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের ‘স্যাঁতস্যাঁতে

দুঃখবেদনা’ লালন করে ‘জীবনযাপনে কোনও অস্বস্তি বোধ করবে না ও কোনও প্রেরণা পাবে না’ মধ্যবিত্ত পাঠক²¹⁸। তাই, কেরামতের গান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সঙ্গে অভিন্ন ক’রে দেখে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদকে, চাষীর ‘মেন্নতের দাম’ পাওয়াকে এবং বঙ্গপ্রদেশের ‘চিরকালের দুষ্কি’ হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে। কেরামতের গানের ভাষায় শোলোক, গাথা, গণসঙ্গীতের ভাষা কীভাবে আত্মীভূত হয়েছে, তা ‘ভাষা’ শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। তেভাগার ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায় গণসঙ্গীতের বয়ান- কেরামত আলি প্রত্যক্ষ করেছিল তেভাগা; পুলিশ আর জমিদারের লেঠেল কৃষকের মার খেয়ে পালাচ্ছে, বর্গাদারেরা দুই-তৃতীয়াংশ ফসল নিজেদের গোলায় তুলছে এবং স্বাধীনতার খোয়াবের সঙ্গে জমিদারি উচ্ছেদের খোয়াব মিশে নতুন খোয়াব জেগে উঠছে- বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে তেভাগার এই গুণগত পার্থক্য কেরামতের গানকে স্বতন্ত্র ক’রে তোলে। ইলিয়াসের ভাষায় “গণসঙ্গীত মানুষকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে না বা সুখে বিভোর করে তোলে না বরং জেগে উঠে মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসাহ দেয়”²¹⁹ কেরামতের গানের ভাষার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায় তমিজের খোয়াব। গণসঙ্গীতের ইতিহাস বহু দশকের পুরনো। কমিউনিস্ট পার্টির আগেও প্রগতিশীল গায়কেরা গণসঙ্গীতকে জনজাগরণের হাতিয়ার ক’রে তুলেছিলেন। গণসঙ্গীত অর্থাৎ যা দেশজ সুরে নির্যাতিত মানুষের আকাজ্ঞাকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করবে²²⁰; কমিউনিস্ট-মতাদর্শের আন্দোলনের পর্বে মেহনতী মানুষের আকাজ্ঞাকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করে এবং বিভিন্ন জেলার-প্রদেশের লোকসঙ্গীতের সুরকে গানে ব্যবহার করে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথায়, “গণসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকসঙ্গীতের ধারাটি গণসঙ্গীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসঙ্গীত মাত্রই লোকসঙ্গীত নয়। গণসঙ্গীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। লোকসঙ্গীত সুরে ভঙ্গিতে ও বাক্য বিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ।” (বাগচি ২০১৩, ৩৬৫) ইলিয়াস গণসঙ্গীতের এই চেতনাকে ধারণ করতেন বলেই কেরামতের নির্মাণে একদিকে সুফী ঐতিহ্যের অবশিষ্ট শোলোক অন্যদিকে কৃষকসংগ্রাম থেকে জেগে ওঠা গান মিশে যায়। রমেশ শীলের রচিত ও গীত ‘হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ’

গানটিতে গাজীর গানের সুর এবং গানের কথায় যেন কেলামত আলির আবেদন-আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ। তেভাগার গণসঙ্গীতের ইতিহাস সমৃদ্ধ; বহু নামী অনামী গায়ক কৃষকবিদ্রোহের সঙ্গতিতে ও জমিদার-ব্রিটিশ যোগসাজশের বিরোধিতায় গান রচনা করেছেন। ‘দেশ’ তখন আর শুধু শিক্ষিত-হিন্দু-মধ্যবিত্তের নয়, তাদের সাহিত্যিক-শিল্পজ আকাঙ্ক্ষার দেশে নিনবর্গ-নিম্নবিত্তের ঠাই পাওয়া নয় বরং কৃষক-শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষার উদ্‌যাপনের সঙ্গে স্বাধীনতার খোঁয়াব মিলে যাওয়ার আখ্যান। নিবারণ পণ্ডিত গাজীর গানের সুরে গান বাঁধেন টংক বিদ্রোহের নেতা মণি সিংহকে নিয়ে, সেই গান কৃষকদের সভায় ও অন্যান্য জনসভায় গাওয়া হতে থাকে; ১৭৭৩ সালে রাজবংশী কবি রতিরাম দাস জাগ গানের মধ্যে দিয়ে রংপুর জেলার কৃষকবিদ্রোহের কথা প্রচার করেছিলেন।

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া

হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরনে নাই বাস

চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।²²¹

‘খোয়াবনামা’র আখ্যাননির্মাণে বহু শতাব্দী ধরে শ্লোক, সুফীসুর আর কীর্তন যেমন গড়িয়ে আসে, তেমনি এই শ্রেণিসংগ্রামের বয়ানও থাকে। মজনু শাহ্ ভবানী পাঠক মুন্সিদের ব্রিটিশ-জমিদার বিরোধী জোটবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলে ন মাধব দত্ত, মণি সিংহ, সমিরুদ্দীন, মাঝি সরেন, যশোদারানীরা। ইলা মিত্র, মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল ও কালী সরকাররা কৃষক-মধ্যবিত্ত সেতুবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই বাস্তবতাকে ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে কাংলাহার বিলের আশেপাশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাঞ্চল্যের সঙ্গে মেলালেন। অবিভক্ত ভারতের দিনাজপুর জেলা তেভাগা বিদ্রোহের অন্যতম পীঠস্থান, বহু দ্রোহীকৃষক শহীদ হন জমিদার-পুলিশের আক্রমণে; পাল্টা প্রতিরোধও গড়ে তোলেন তাঁরা। কেলামত আলি এই বিদ্রোহকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে এবং তমিজ ঠাকুরগাঁও, শান্তাহার, নওগাঁর জোতদার-

পেটানো কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার খোয়াব নিয়ে বাঁচত, শান্তাহারের ট্রেন থেকে নেমে
ঠাকুরগাঁয়ের ট্রেনে ওঠে; তার তখন জাগরণেও নিজের জমি-বাড়ি-সমৃদ্ধি-নিশ্চিন্তির খোয়াব,

এই গাড়ি ঠাকুরগাঁয়ে না গেলে হয় নাটোর যাবে। নাটোর নেমে সুবিধা করতে না পারলে
সে উঠবে নবাবগঞ্জের গাড়িতে। নাচোল যাবে। ওখানে তেভাগা কায়েম হয় তো বর্গা সে
একটা ঠিকই জোগাড় করে নেবে। ফসলের হিস্যা যা জুটবে, তাতে প্রথমেই খালাস করে
নেবে ভিটা আর ঘর। এ ভিটায় তরকারির চাষ হবে ভালো। ফুলজান খাটবে ওই
জমিতে, কুলসুম পারবে না। কুলসুম তার বেটিকে শোলোক শোনাবে আর তার শোলোক
শুনতে শুনতে বেগুন ক্ষেতে নিড়ানি নিড়ানি খেলবে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৩২৬)

নিজের জমিতে আউশের ফলনে ভবিষ্যতের সুখ পাওয়ার খোয়াবে তমিজ ইসমাইলের বাড়ির
পরিচারকের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। ইসমাইল আর কাদের তেভাগা হবে, জমিদারি উচ্ছেদ হবে
কথা দিয়েও সব ভুলে ক্ষমতার সুখভোগে ব্যস্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। দেশভাগের আগে ইসমাইল
জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে চাষীদের আশ্বস্ত করেছিল ও প্রচার করেছিল, কারণ সেটাই তখন
মুসলিম লিগের ভোট পাওয়ার রাজনীতি ছিল।^{২২২} কেরামতকে দিয়ে লিগের ভরা জনসভায় গান
গাওয়ানোয় কাদেরের আপত্তি ছিল, কারণ, কেরামত, “পাকিস্তানের গান তো লেখে নাই” (১৫৬-
৭) অথচ ইসমাইল কৃষক-সংখ্যাগুরু নির্বাচনী কেন্দ্রে জনগণের নাড়ি পড়তে পারে এবং নিজের
দলের তৎকালীন রাজনৈতিক কৌশলের সফলপ্রয়োগ করে। কেরামত সেখানেই গায়,

আর দেহের দুশমন ভেদবমি গাছের দুশমন লতা।

চাষার দুশমন জমিদার জোতদার অতি লেখ্য কথা।। বলি জমিদারি

ব অ লি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই।

জমিদার পাবে এক ভাগ ফসল চাষায় দুই ভাগ পাই।। তাই তেভাগার ডাক

তা ই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষার জয়।

চাষা মিছা জগৎ মিছা সব্রজনে কয়। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৫৮)

দিনাজপুরের শহীদ ‘বর্মণী মায়ে’র লড়াইকে সম্মান দিয়ে আর জোতদার-মহাজনদের আক্রমণের বর্ষামুখে বিঁধে কেরামতের গান কৃষকদের-মাঝিদের সভায় বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। আর, ইসমাইল সেই গানের সূত্র ধরেই “কবি কেরামত আলি তার গানের মধ্যে দিয়ে মুসলিম লীগের কথাই বলে গেলো... রক্তপাতের পথে না গিয়ে মুসলমান কৃষক যদি পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল হয়...” (১৫৯-৬০) বক্তব্য রেখে তেভাগার দাবিকে পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। বাস্তবে রচিত তেভাগার গানের সঙ্গে কেরামতের গানের সুর ও কথা মিলে যায়, ইলিয়াস ‘৪৬-’৪৭-র যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা যথার্থ। কিন্তু, ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো উপন্যাসের আখ্যান পূরণ করতে পারে; ইসমাইলই বিজয়ী হয়, তারাই ইতিহাসের নিয়ন্ত্রা সাজে, কিন্তু অন্য ইতিহাসও উঁকি মারে আখ্যানের বাস্তবতায়। উপন্যাসের কল্পনাখ্যানে কেরামতের গানে ফকিরি শোলোক শুনতে পায় বৈকুণ্ঠ- প্রায় দু’শো বছর আগে ভূস্বামী-ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রজাদের চাপা-পড়া ইতিহাস জ্বলে ওঠে; ইলিয়াস এক অন্তর্ঘাতের বয়ান এভাবেই রেখে দেন তাঁর আখ্যানে। বাস্তবে এরকম কোনও স্বরই শোনা যায়না, তা অবাস্তব কিন্তু মুখফেরতা আখ্যান আর মিথের প্রতিরোধী অন্তর্ঘাতে

মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে অভয় দেয় বৈকুণ্ঠ, ‘কেরামত আলি, ফকির আসিছে। হামি দিশা পাচ্ছি, তোমার পাঁজরার মুড়াত খাড়া হয়। তুমি তার গান ধরো। মনে পড়িচ্ছে না? আরে, ‘গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়’- শুরু করো তো, ঠাকুরের নাম লিয়া গানটা ধরো। মনে ভুল্যা গেলে ফকির তো আছেই’ (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৫৭)

বৈকুণ্ঠ ভবানী পাঠককেই সেরা বলে মনে করে, হিন্দুয়ানির সংস্কার মেনে চলে এবং মুসলমানের ঘরে জল খায় না। কিন্তু, দেশের বিপন্ন মুহূর্তে, তেভাগার তুঙ্গমুহূর্তে ও প্রাক-দাঙ্গার আবহে কেরামতের শিয়রে ফকিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। বৈকুণ্ঠই নায়েব আর সতীশ মুক্তারের বলা ‘আনন্দমঠ’-র কাহিনির বিরোধিতা করেছিল ভবানী সন্ন্যাসীর মুখফেরতা কাহিনির প্রতিরোধ দিয়ে। যুধিষ্ঠির কর্মকার তেভাগা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে বৈকুণ্ঠ তাকে আশ্বাস দেয়, “ফকিরে

গান করিছে, একোটা গান হামরা কতবার কর্যা শুনিছি। উগলান গান এটিকার মানুষ জানে কোনদিন থ্যাকা।” (১৬০) আর, এই গানের পরেই আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে তমিজ; খোয়াব যে আসলে বাস্তবতারই অন্যপাঠ তা বোঝা যায় যখন তার প্রতিরোধের খোয়াবের বাস্তবভিত্তি সে বলে,

কেরামতের গান আবার তমিজের মাথাতেও কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে। খিয়ার এলাকায় তেভাগার কাণ্ড তো সে নিজেও দেখে এসেছে... ‘খিয়ারেতে হামি লিজে দেখেছি। জোতদার শালা আধিয়ারের ধাবাড় খায়া গোয়ার কাপড় তুল্যা কুটি পালাবি দিশা পায় নাই’। তমিজের কথায় সবাই হাসে। জোতদারের ন্যাংটো হওয়াটা এদের অতিরিক্ত হাসির কারণ হতে পারে, আবার সভায় শোনা ভালো ভালো কথার চাপ থেকে খালাশ পেয়েও সবাই হাসতে পারে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৬০)

উপন্যাসের ২৩ নম্বর অধ্যায়ে এসে তমিজের এই উপলব্ধির সঙ্গে ৬ নম্বর অধ্যায়ের উপলব্ধির আকাশ-পাতাল তফাৎ। আধিয়ারদের দাপাদাপিকে সে বাড়াবাড়ি বলে মনে করত। জমিকে আর চাষীর ফসল কেড়ে নেওয়াকে সে জোতদারের স্বাভাবিক অধিকার বলেই মনে করত। ‘চাষাদের বউ-ঝিরা পর্যন্ত ঝাঁটা খুন্তি বাঁটি নাকড়ি নিয়ে তাড়া করে’- এই উপলব্ধিতে ঋণাত্মক অনুভব ছিল। তমিজের বিপ্লবমুখী বদলের সঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের ব্যক্তিগত অঙ্গঙ্গী জড়িয়ে- ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানভূমি ইতিহাসের অসফল এক বিদ্রোহের এক নেতার খাঁপুরের যুদ্ধ নিয়ে লেখা জং-গানের সঙ্গে মিলে যায়, তমিজের বর্ণনা অবিকল-

দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার

কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার

... গ্রামের মহিলা যত ক্ষেপিয়া উঠিল

ঝাঁটা বারণ হস্তে মোটর ঘেরিল

নারীগণ সৈন্যে কয় শোনরে গোলাম
সবারে ছাড়িয়া দাও করিয়া সেলাম
... তীর ধনুক শাবল লাঠি হাসুয়া কুঠার
মরিছে সবাই দ্যাখ যা ছিল যাহার
কেহ ছোড়ে ঢিল এক অন্ধ ছোড়ে বালি
মার মার মার খালি মার মার বুলি।।²²³

কিন্তু, তেভাগা আন্দোলনের এই প্রবল আধিপত্যের যুগে জোতদার-জমিদারদের পাশাপাশি শঙ্কিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিও। ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থানের রাজনীতি একমুখী সরলতায় চলে না বরং সামাজিক আদান-প্রদানে একে অন্যের সঙ্গে মিশে থাকে। ইলিয়াস এই বাস্তব অথচ অনুচ্চারিত সত্যকে নিখুঁত অবয়বে উপন্যাসে তুলে আনতে পারেন। আব্দুল কাদের, আজিজ এরা উপমহাদেশের ধর্মীয় রাজনীতিতে নিজেদের সামাজিক অবস্থান হিন্দুদের চেয়ে নিচে মনে করে; কিন্তু, এরাই তেভাগার ক্রান্তিলগ্নে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল আধিয়ার-বর্গাদারকে শত্রু বলে মনে করে। আব্দুল আজিজের চেতনাপ্রবাহে,

কিন্তু চাষাদের বাড়াবাড়ি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে, টাউন হয়ে করতোয়া পেরিয়ে ঐ দাপাদাপি এই পূর্ব এলাকায় আসতে আর কতক্ষণ?... জমি তো আর হেঁটে হেঁটে জোতদারের বাড়ি এসে হাজির হয় না... এক এক ছটাক জমি করতে মানুষের শরীরের এক এক পোয়া রক্ত নুন হয়ে বেরিয়ে যায়, সে খবর রাখো? জাহেল চাষার গোঁ আব্দুল আজিজ দেখে থিয়ার এলাকায়। সেই গোঁ এখানকার চাষার শরীরে চাগিয়ে উঠতে কতক্ষণ? (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৪২)

অন্যদিকে, কৃষক যুধিষ্ঠির কর্মকার, কেপ্ট পালদের মনে তেভাগার প্রতি সমর্থন জাগতে পারে না মুসলমান-আধিপত্যের ভয়ে; শ্রেণিবোধ নয় বরং ধর্মবোধ প্রবলভাবে জেগে থাকে। তমিজ আর হুমতুল্লার মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় সামাজিক-পরিচিতির স্তরভেদে। দু'জনেই শোষিত আধিয়ার,

নিম্নবর্ণে অবস্থানকারী এবং ধর্মীয় পরিচয়েও এক তবুও মাঝিদের সঙ্গে কৃষকদের সামাজিক-পরিচিতির দুর্লভ্য ব্যবধান থেকে যায়। মাঝির ছেলের সঙ্গে চাষীর মেয়ের বিয়ে গ্রামীণ সমাজে নিন্দনীয়, হুঁসুটুল্লার অর্থনৈতিক সংকটও জড়িয়ে যায়, “মাঝির ঘরে মেয়েকে দিচ্ছে বলে শরাফত এবারেই তার বর্গা কেড়ে নেবে। আর মাঝির বেটাকে জমি লিখে দিচ্ছে শুনলে নিজগিরিরডাঙ্গার চাষাপাড়ার লোকদের দিয়ে তার বাড়িঘর সব উচ্ছেদ করিয়ে ছাড়বে” (ইলিয়াস, ২৭৫) ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে ‘লেখকের মনোবাঞ্ছা’ পূর্ণ করার দিকে না গিয়ে উপমহাদেশের রাজনীতির সূক্ষ্ম-স্থূল উপাদানগুলোর চরিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন। এই প্রত্যেক কুশীলবই তেভাগা সম্পর্কে অবগত, শরাফত মণ্ডলের জমিতে বর্গা খেটে দুই-তৃতীয়াংশের বদলে অর্ধেকেরও বহু কম ফসল পেয়ে ও শোষিত হয়ে ক্রোধে-ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুধিষ্ঠির; কিন্তু, কেরামত তাকে বলে “খিয়ারের কথা আলাদা। ওদিকে চাষারা একজোট হয়। কোমর বান্দে। তাদের সাথে শিক্ষিত মানুষ আছে। আর তোমাগোরে এদিকে মাঝিরা যায় মাছ চুরি করবার” (ইলিয়াস, ১৯৬)। কিন্তু, মধ্যবিত্ত-ভদ্রশ্রেণির ভূমিকা কেমন ছিল তেভাগা আন্দোলনে? আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর বেরোয় চাষীদের ‘উৎপাতের’। বাংলার ভদ্রলোকশ্রেণির মুখপাত্র আনন্দবাজার পত্রিকা ও অমৃতবাজার পত্রিকার খবরে- “মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিপদাপন্ন” এবং কৃষকেরা “আইনভঙ্গকারী ও আনুগত্যহীন”²²⁴। ১৯৪৬-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকাতেও এই ‘মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষাকারী’ তথা তেভাগাবিরোধী পত্রিকাগুলির বয়ান প্রকাশিত হয়, “তেভাগার দাবি মধ্যবিত্তকে ধ্বংস করার চক্রান্ত; “কৃষকের অবস্থা বরং ভাল, মধ্যবিত্তের অবস্থাই আজ শোচনীয়”- জনশত্রুর দল আজ এইসব বুলি আওড়াইতে শুরু করিয়াছে”²²⁵ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী মতাদর্শের মধ্যবিত্তরা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমর্থন করলেও, বৃহৎসংখ্যক মধ্যবিত্তের উদাসীনতা ছিল প্রবল। তেভাগা-চাওয়া কৃষকদের ব্রিটিশ-জোতদার-মহাজন বিরোধী সশস্ত্র গণসংগ্রামকে ‘অপর’ হিসেবেই দেখেছিল তারা। ম্যাথু আর্নল্ড যেমন শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতিকে ‘নৈরাজ্য’ বলে মনে করতেন, নিম্নবর্ণের গণআন্দোলনের

ব্যক্তিকেও তাইই মনে করে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তরা। যে ভদ্র-মধ্যবিত্ত দেশত্যাগী হচ্ছে, পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে ‘ইন্ডিয়া’তে যাচ্ছে, সেও স্ত্রীকে বলে, “ইয়ে টিয়ে সব বাকসে, ব্যাগে ভাগ করে রেখেছো তো? গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, ওদিকে চাষারা খুব উৎপাত করছে।” (৩২৫)

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিও সেইসময় বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা এবং দেশীয় ক্ষমতাবানদের অত্যাচারে অথচ বৃহত্তর কৃষক-শ্রমিক জোটের সঙ্গে কোনওভাবেই একাত্মবোধ করে না তারা। একইভাবে দ্বন্দ্ব থেকে যায় গ্রাম আর শহরের, ’৪৩-র মন্বন্তরে গাঁ-উজাড় হয়ে শহরে এসে খাদ্য-বস্ত্র পায়নি গ্রামীণ নিম্নবর্গ। মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গেও মুসলমান নিম্নবর্গের পার্থক্য থাকে, অথচ মুসলমান উচ্চবর্গ শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে নিম্নবর্গকে প্রভাবিত করে একই ধর্মাবলম্বিতার কথা বলে। ‘স্পিরিট অফ ইসলাম’ পড়া মীর মোহাম্মদ সাদেক আলি পেশায় উকিল, ইংরাজি ছাড়া কথা বলে না এবং তেভাগাকে সমর্থন করে না। মুসলিম লিগের ‘দার-উল-ইসলাম’ই তার মূল উদ্দেশ্য ও ‘আশরাফ’-দের দ্বারা প্রভাবিত হয় সে।

কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মজ্জিত ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়ে নিজের উপমজ্জিত এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে-করা ও না-করা ইংরেজ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেমসয়েবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌবন সঙ্গম প্রভৃতি কারণে খাঁটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। বাঁকা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজের মিশেলে মুসলমান কৃষকের ওপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলতে বলতে তার গলা ভারাক্রান্ত হয় (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৫৫)

খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ আলির এই সভার পরেই দেখা যায় নিম্নবর্গ মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চবর্গের দূরত্ব; তাদের জ্ঞোগান আর ভাষণ নিম্নবর্গের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারে না। ‘নারায়ে তকবির’ ও ‘লড়কে লেঙ্গে’-র পরে যথাক্রমে ‘আল্লাহ্ আকবর’ ও ‘পাকিস্তান’ ধুয়ো তুলতে হয় আব্দুল কাদের আর ইসমাইলকে, ভরা সভা থেকে প্রত্যুত্তর আসে না। সাদেক উকিল বা সৈয়দ

আহমদ আলি মুসলিম লিগের উচ্চবর্গীয় নেতা হলেও সেই প্রগতিশীল অংশের মধ্যে পড়েন না, যাঁরা জমিদারি উচ্ছেদ ও তেভাগাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বঙ্গীয় কৃষক সভার প্রচারপত্রে ‘ভাগচাষী ও মধ্যবিত্ত’ অনুশিরোনামে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নবিত্তের বিপ্লবে যোগ দেওয়ার আহ্বান স্পষ্ট ছিল। ভদ্রলোক শ্রেণি সমস্ত সংকটের কেন্দ্রে সবসময় ভদ্র-মধ্যবিত্তকেই দেখে এবং সামাজিক বন্দোবস্তের পরিবর্তনের জন্যে নিম্নবর্গদ্বারা সংঘটিত সামান্য উদ্যোগকেও তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বের বিপন্নতার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের দেশত্যাগী ভদ্রহিন্দু গৃহকর্তার সঙ্গে, সতীশ মুক্তারের সঙ্গে সাদেক উকিল বা আলিম মাস্টারের কোনওই পার্থক্য নেই এই ব্যাপারে- এঁরা প্রত্যেকেই আধিয়ারদের দ্বারা সংঘটিত দ্রোহে নিজেদের শ্রেণি ও বিত্তনিশ্চয়তার বিপন্নতা বোধ করেছিলেন। প্রচারপুস্তিকায় তেভাগা নিয়ে মধ্যবিত্তের সংশয় ও আশঙ্কার নিরসন করা হয়²²⁶; আর্থ-সামাজিক সঙ্কটে আধিয়ার থেকে কেরানি-চাকুরিজীবী সকলেই যে শোষিত যুক্তি-তথ্য দিয়ে তা প্রকশ ক’রে লেখা হয়,

বাংলার গৌরবময় মধ্যবিত্ত-সন্তানের দল, আসুন, আধিয়ারের ন্যায্য দাবী, কৃষকের ন্যায্য দাবী, মজুরের ন্যায্য দাবী, মধ্যবিত্তের ন্যায্য দাবীর জন্য যুক্ত সংগ্রামে নির্ভয়ে আগাইয়া আসুন... আসুন আমরা সকলে মিলিয়া শেষবারের মত মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের বুকে চরম আঘাত করি, তাহারই ধ্বংসস্তূপের উপর মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্তের নূতন বাঙলা গড়িয়া তুলি। (পশ্চিমবঙ্গ ১৪০৪, ২৫)

‘মিল্লাত’ পত্রিকায় তেভাগার সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল²²⁷ যেখানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমিদার-জোতদারদের খেসারত দেওয়ার বিরোধিতা করা হয়। মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের মুখপত্র ‘মিল্লাত’ আধিয়ারদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল অথচ ‘আনন্দবাজার’ আর ‘অমৃতবাজার’-এ তেভাগাকে শুধু মধ্যবিত্তবিরোধী নৈরাজ্য বলেই দেখানোর প্রয়াস ছিল²²⁸। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে কৃষকের বিরোধ কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার নেতৃত্বে

তেভাগার গণআন্দোলনে ব্রিটিশ-বিরোধিতা নতুন উদ্যম তৈরি করেছিল। বদরুদ্দীন উমর এই প্রসঙ্গে লিখছেন,

সামন্ত-মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-লিগকে পুরোপুরিভাবে জাতীয় বুর্জোয়া পার্টি আখ্যায় ভূষিত করে তারা (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) সেই পর্যায়ে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এই উদ্দেশ্যে জোশী ধ্বনি তুলেছিলেন, ‘কংগ্রেস-লিগ এক হও, হাতে হাত বেঁধে লও’। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিযুক্ত ছিলেন গান্ধী-জিন্নাহর মিলন ঘটাতে। (উমর ২০১৯, ৯৮)

কেরামতের গানের সূত্র লুকিয়ে থাকে পূরণচাঁদ জোশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে। কেরামত কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সভা কোনোটারই সদস্য নয়। কমিউনিস্ট অজয় দত্ত আর তার বোনের কথা শুনে আর কংগ্রেস নেতা সুরেন সেনগুপ্তের ভাষণে মুগ্ধ হয়ে কেরামত বেঁধে ফেলে ‘লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না’ গান। পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকেরা তেভাগা বিদ্রোহের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে কংগ্রেসের সং কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন আপসনীতির সমালোচনা করেছেন। “১৯৪৫ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে... কংগ্রেস লীগ ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয় সরকারের স্লোগান তীব্রতর হয়। কিন্তু, এই লাইনেও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর করার কথা বিশেষ ছিল না” (চট্টোপাধ্যায় ২০১৩, ৭৪-৭) অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪০-র দশক জুড়ে সংশয় ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে; আর, তার প্রভাব সরাসরি এসে পড়েছে নিপীড়িতের ওপরে, শোষিত শ্রেণীর আকাজ্খা-ফলাফলভোগের ওপরে। একদিকে যেমন তারা তেভাগা আন্দোলনের বারুদস্তূপ জড়ো করছে, তেমনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুহূর্তে শ্রেণিসংগ্রামের থেকেও প্রাধান্য দিচ্ছে কংগ্রেস-লিগের মিলনে। আধিয়ার আর ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে ‘দেশের খামার’ গড়ে তুলছে, পুলিশ-জোতদারদের প্রতিরোধ করছে, তেমনই কংগ্রেসের সঙ্গে আপসের পথে আসছে। ‘খোয়াবনামা’র এক কুশীলব, যে তেভাগার স্বপ্ন আর রাজনৈতিক আশাভঙ্গ- দু’য়েরই প্রত্যক্ষদর্শী, সেই আলিম মাস্টার বলে,

অ্যাদিন পরে ওরা কয় গান্ধি জিন্মাক একত্তর হবার। দুইজনে আলাদা থ্যাকা যে জুলুমটা চালাচ্ছে, একত্তর হলে দ্যাশের মানুষ একটাকও বাঁচবার দিবি না। তেভাগার মানুষ হয়্যা অজয় দত্ত হিন্দু মুসলমান মিল করাবার আর মানুষ পায় না? মাথা পাতে গান্ধি আর জিন্মার কাছে? (ইলিয়াস ২৪১)

অজয় দত্ত বা আলিম মাস্টার কেউই ইতিহাসস্বীকৃত চরিত্র নয়, কল্পনানির্মিত। কিন্তু, ঔপন্যাসিক তাঁদের সংলাপেই ইতিহাসের ওই সন্ধিক্ষণকে ‘উপন্যাসের বাস্তবে’ প্রতিষ্ঠিত করেন। গান্ধি আর জিন্মাহ্ কোনও সমাধান দিতে পারতনা তমিজ, হুমতুল্লা, যুধিষ্ঠির, দশরথদের; দিতে পারেও নি সমাধান। বরং লিগ-কংগ্রেসের মিলনের আকাঙ্ক্ষায় নিম্নবর্গের দ্বারা ‘সমাজের নিচুতলা থেকে আন্দোলনের চাপ’-কে পাতা দেয়নি অজয় দত্তরা^{২২৯}। কিন্তু, ইতিহাসের পাতার বাইরেও যা থাকে উপন্যাসের রসদ, যা একান্তই উপন্যাসের কল্পাখ্যানের নিজস্ব পথ, সেখানেই লেখক ইলিয়াস উল্লেখ করেন চেরাগ আলির ‘তাবিরনামা’ বইটির। ওই গান গাওয়ার আগের দিনই কেরামতের হাতে চেরাগ আলির বই তুলে দিয়েছিল কুলসুম। আর, কেরামতের থেকে সেই ছেঁড়াখোঁড়া বই ছিনিয়ে নেয় আব্দুল আজিজ; ইতিহাসের গতিপথে লিগ-কংগ্রেসের মিলনও আর হয়নি বরং দেশভাগ হয়ে গেছে এবং তমিজের বাপের সেই পাকুড় গাছ যাতে মুনসির বসতি ছিল, তা নিরস্তিত্ব হয়ে যায়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস সাহিত্যে-শিল্পে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন। ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩৫ সালে সোভিয়েট রাইটার্স কংগ্রেসে ভাষণ দেন সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের পক্ষে। ভারতের প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে এই তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তেভাগা ও তৎপরবর্তী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মতে,

কোন আন্দোলনকে সামনে রেখে লিখলে সে লেখা হয় সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম। সে লেখা কি আমরা লিখেছি? আমরা কেন ক্ষেতমজুরদের হিরো করে নাটক করলাম না?

তেভাগার লড়াই করে যাঁরা প্রাণ দিল তাঁদের আদর্শ ও স্বপ্ন আমরা কীভাবে ফুটিয়ে তুলব সে নিয়ে ভেবেছি? কেন এ কাজ হয়নি? কারণ বরাবর সংস্কৃতি আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব মধ্যবিভূর হাতে।²³⁰

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অভিযোগ যথার্থ; ইলিয়াস যেভাবে মধ্যবিভূর স্বস্তিক্ষেত্র থেকে সাহিত্যকে বের ক'রে আনতে চেয়েছেন, হেমাঙ্গও তাই চেয়েছিলেন। তেভাগার শহীদ ও সংগ্রামীদের আদর্শ ও স্বপ্নের শিল্পরূপ শিল্পে থাকাও খুব জরুরি বিশেষতঃ রাজনৈতিক শিল্পের ক্ষেত্রে। কিন্তু, হেমাঙ্গর সঙ্গে ইলিয়াসের চেতনাসূত্রের একটা তফাৎ থেকে যায় ক্ষেতমজুরদের ও নিপীড়িত শ্রেণিকে 'হিরো' ক'রে তোলা নিয়ে। সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের বিশ্বাসানুযায়ী সেরকমটা করাই উপন্যাসিকের কর্তব্য, বহু প্রগতিবাদী সাহিত্যিক সেই চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু, ইলিয়াস 'Wishful thinking'-র বিরোধিতা করছেন বারবার। কারণ, লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চরিত্রনির্মাণ কোনও সাহিত্যকে মহৎ করে তোলে না। ইলিয়াসের তমিজ, কেরামত, তমিজের বাপ বা বৈকুণ্ঠ বৈরাগী কেউই 'হিরো' নয় বরং 'হেরো'। তাঁরা বিজিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে। হাড্ডি খিজির, ওসমানেরা হয় মৃত নয়তো 'উন্মাদ'- ইতিহাসে এঁরা কেউই বিজয়ী নন, এঁদের আকাঙ্ক্ষারও অপমৃত্যু ঘটেছিল। আর, এঁরা প্রত্যেকেই দোষ-গুণ নিয়ে সমাজের বাস্তবতায় মিশে থাকা কুশীলব। যদি এঁদের শুধু 'হিরো' ক'রে তুলতে চেয়ে লেখক নিজের বিপ্লবমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহলে তা এঁদের রক্তমাংসের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হয়। প্রগতিবাদীদের বৃহদংশ সেই নির্মাণকৌশল অবলম্বন করলেও, ইলিয়াস তা করেননি। এঁরা প্রত্যেকে নিজেদের দোষ আর বিজিত তকমা নিয়েই অন্তর্ঘাতমূলক বয়ান নির্মাণ করেন উপন্যাসে। যুধিষ্ঠির কর্মকার নিম্নবর্গের নিপীড়িত কৃষক হয়েও তেভাগা নিয়ে সংশয়ী থাকে কারণ ধর্মের প্রশ্ন তখন শ্রেণিরাজনীতিকে ছাপিয়ে গেছে। তেভাগার দাবিতে শিহরিত হয়েও তার মনে হয়, “এখন মনে হচ্ছে তেভাগা হবে মোসলমানদের জন্যে। পাকিস্তান হলে তবে তার খালি লোকসান। জাতও যাবে, তেভাগায় ফসলও তার জুটবে না।” (১৬১) কেরামত তেভাগার বীরগাথাকে গণসঙ্গীতে

কেরামত আলির শেষ যে গান ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানে পাই, সেখানেও এই একই বক্তব্য।
দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরে সাধারণ মানুষের দুর্দশা যে কিছুমাত্র কমে নি, তা বোঝা যায়।

শোনো শোনো শোনো রে ভাই হিন্দু মুসলমান/ মোহাজেরের দুক্কু কিছু করিব বয়ান
বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত মোহাজের/ পাকিস্তানেতে তারা হইয়াছে হাজের
... কাফের হস্তে মায়েবোনে হারালো ইর্জত/ সব্বোশ্রান্ত হইয়া হেথায় করিল হিজরত
হেথা হইতে চলিয়া যায় হিন্দু ভাইগণে/ মাতৃভূমি ত্যাগে বড়ো দাগা পায় গো মনে
(ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৯১)

আর, এই গানের সূত্র ধরেই আসে পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির হুকুমদার কালাম মাঝির আধিপত্য। ‘পাকিস্তান’-র রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ না মানলে এবং ‘এদেশের মালসম্পত্তি সামান যদি ঐপারে পাঠানো হয়’ তাহলে কালাম মাঝিরা রুষ্ট হয়। দেশত্যাগী হিন্দুদের কটাক্ষ ক’রে বৈকুণ্ঠকেও ‘মালাউনের বাচ্চা’, ‘আজই তোকে ঘরছাড়া করমু’ বলে শাসায় সে। নীরেনের পিসেমশাই-পিসিমার বাড়ি দখল ক’রে নেয় আব্দুল আজিজ এবং এলাকার পূর্ব-পাকিস্তানত্যাগী হিন্দুদের বাড়িতে জবরদখল ক’রে ‘রিক্যুজিশন ক্যাম্প’ বানানো হয় বা প্রভাবশালীদের দিয়ে দেওয়া হয়। বাবরের ‘নতুন’ বাড়িতে বেড়াতে এসে বাবরের ‘প্রিয় স্যার’ নীরেন আবিষ্কার করে এটাই ছিল কার্তিক ভাদুড়ির বাড়ি এবং পিসিমার কনকচাঁপা গাছ, পঞ্চজবা ফুলগাছ না-থাকাটাও আবিষ্কার করে। নীরেনের স্মৃতিপথে যখন নাস্তিকতা ও ধর্মের আশ্চর্য দৌল্যমানতা, অদূরে তখন জনৈক ধর্মোন্মাদ গুরু আলির নেতৃত্বে হিন্দুপাড়ায় আক্রমণ, হত্যা ও বাড়ি জবরদখল চলছে।²³² গুরু আলির মতো উগ্র ধর্মাস্কের বিরোধিতা করেও ক্রমশ-রাজনৈতিক-বনে-যাওয়া আব্দুল কাদেরের সমর্থন থাকে হিন্দুপাড়ার হিন্দু বাড়িগুলিকে পুনর্বাসন শিবির বানানোয়²³³। সম্পন্ন ব্যবসায়ী মুকুন্দ সাহা বাড়ি-জমি জোতদার শরাফত মণ্ডলের কাছে বেচে দিয়ে কলকাতা চলে গেলে ক্ষুব্ধ হয় কালাম মাঝি; কালাম মাঝি দেশভাগের ফায়দা উঠিয়ে নতুন বিভবান। “হিন্দু ভাইগণ যদি এই দেশকে আপন মনে না করে, এদেশের মালসম্পত্তি সামান যদি ঐপারে পাঠায়

পরিণত করেও পাকিস্তানের পক্ষে জ্লোগান দেয়; তমিজও তো বিশ্বাস করে পাকিস্তান রাষ্ট্রেই তার সব দুঃখের অবসান হবে। অথচ, মনোবাহুগত চিন্তাসূত্রে কিন্তু তা হওয়ার কথা নয়; সামাজিক বাস্তবতাবাদে নির্বিক্রম শ্রেণিসংগ্রাম সাফল্যার্জন করবে, এমনটাই দস্তুর। ইলিয়াস কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে এবং প্রগতিশীল লেখকশিবিরের সমর্থক হয়েও এই মনোবাহুগত চিন্তাসূত্রের প্রয়োগ ঘটাননি। মহাশ্বেতা দেবী যেমন লিখেছিলেন, ‘আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক’, ইলিয়াসের উপন্যাসেও তাই। ব্যক্তি-রাজনীতি-সমাজ অঙ্গাঙ্গী থেকে এক ঘটনাবল্ল সময়ের সন্ধান করে তাঁর উপন্যাসে।

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে দেশভাগের পরও ধর্মীয় বিভেদ মেটে না। নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িকে ‘শরণার্থী শিবির’ বানিয়ে দিয়ে দখল ক’রে নেওয়া শুরু হয়, খুন হয় বৈকুণ্ঠ বৈরাগী। ভারতবর্ষে বিপন্ন হয় সংখ্যালঘু মুসলমানেরা, পূর্ব পাকিস্তানে বিপন্ন হয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা; আর, সে বিপন্নতার ধারা এখনও প্রবহমান এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। অথচ, গান্ধী দেশভাগের সময়েই জিন্না ও নেহরুকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্যের কথা²³¹। গণসঙ্গীতশিল্পী রমেশ শীলের রচিত গানে ‘গাজীর গান’-র সুরে দুই রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগই ব্যক্ত হয়-

দেখুন হিন্দুস্তানে মুসলিমগণে আছে হতাশায়/ নিশ্চয়তা কিছু নাই কবে কি ঘটায়

তেমনি পাকিস্তানে হিন্দুগণ দুশ্চিন্তায় মনমরা/ কখনি কি দশা ঘটে নাই কুলকিনারা

... সাত পুরুষের ভিটা ছাড়ি দেশান্তরী হিন্দু-মুসলিম হয়

সেই দৃশ্য দেখিলে ভাই প্রাণে সহ্য নয়

দারুণ শীতে কাপড় নাই দেখ ভাই শিশু কোলে নিয়া

প্রাণের আশায় যায় দেশের মমতা ছাড়িয়া (গণসঙ্গীত সংগ্রহ ১৯৯০, ১৯-২১)

তবে পাকিস্তানের বুকতে ছুরি মারা হয়।” (২৯১) পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুদের, বিশেষতঃ নিম্নবর্গ হিন্দুদের ওপর ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জবরদস্তি এবং তাদের বাড়ি-অর্থ কেড়ে নেওয়ার উৎসাহ কালাম মাঝি ও তার সমমনস্কদের মধ্যে বেড়ে চলে পাকিস্তান সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে। ধর্ম এমনই এক সংবেদনশীল সামাজিক উপাদান, ধর্মকে প্রভাবশালীরা হাতিয়ার হিসেবে এমনভাবে ব্যবহার করে এবং ধর্মের সঙ্গে ‘ইমান’, ‘ইজ্জত’ এমনভাবে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে জড়িয়ে যায় যে, সাম্প্রদায়িক চেতনা নির্মিত হয়ে যায়। ধর্মীয় রাজনীতি দখল ক’রে নেয় অন্য সব রাজনৈতিক অধিকার এমনকি মানবিক দাবিটুকুও। কালাম মাঝি বৈকুণ্ঠ ও অন্যান্য হিন্দুদের শায়েস্তা করতে লক্ষ্মীপুজোর শোলার সরা এবং আমপাতার ওপরে আক্রমণ নামিয়ে আনে, “দেখি শালা তোর লক্ষ্মী হামার কি বাল ছেঁড়ে” (২৯২)। ‘জাতের গোয়া মারা’-র মতো মন্তব্যই নব্যশাসকদের কাছে ক্ষমতাপ্রদর্শনের বয়ান। তেভাগার চেতনা, দেশভাগের বেদনা পেরিয়ে এসে এই ঘটনাক্রম পাকিস্তানের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে। তারই ধারাবাহিকতা বহন করে উনসত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থান। আর, প্রতিরোধের বা বিদ্রোহের ভাষার থেকেও ধর্মীয় উস্কানির এই ভাষা অনেক সহজে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে, তাদেরকেও হত্যালীলায় অংশগ্রহণ করিয়ে নিচ্ছে। এই সত্যকে আড়ালে রাখতে চাওয়া হয়। ‘ভাল’ আর ‘শুভ’ আখ্যান দিয়ে ঢেকে রাখতে চাওয়া হয় এই আখ্যানগুলো। কিন্তু, ইলিয়াস ও তাঁর সমমনস্ক ঔপন্যাসিকদের রচনায়, যেখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন প্রোটোগনিস্ট আর একমুখী আখ্যানকল্প গড়ে তোলার দায় নেই, সেখানে এই অন্য আখ্যানগুলো সচকিত, জাগরুক। আর, এই রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যা তো এখনও প্রবহমান।

তেভাগা আন্দোলন নিয়ে রচিত কয়েকটি উপন্যাস

তেভাগা কৃষকবিদ্রোহকে কেন্দ্রে রেখে রচিত অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সাবিত্রী রায়ের ‘পাকা ধানের গান’²³⁴ ও মহীতোষ বিশ্বাসের ‘পায়ে পায়ে পথ (১৯৬১)’ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

‘পায়ে পায়ে পথ’²³⁵ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট সত্যপ্রসাদ ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের ছোট ছেলে, যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরই গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেয়। চাষীদের ‘আত্ম-জাগরণ’-র সঙ্কল্পে ও নিজের দেশকে চেনার এই উপলব্ধিতে গোয়ার আত্মদর্শনের সঙ্গে সত্যপ্রসাদের দর্শন মিলে যায়। মহীতোষ বিশ্বাস গ্রামীণ সমাজের জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ অবস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহের স্মৃতি উসকে ওঠে। পুলিন রায়, বদন মণ্ডলের মতো জোতদার, ভারতীয় গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ক্ষমতাকাঠামোর ওপরতলার বাসিন্দে। ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের ওপরে সামন্ততান্ত্রিক জুলুমের পদ্ধতিগুলি মহীতোষ তাঁর উপন্যাসে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জমির মালিক নিজে নিয়ে নিলেও, কৃষকের ভাগ থেকে বাকি অর্ধেকাংশও কেড়ে নেওয়ার বিভিন্ন ফিকির ছিল- খাজনা দেওয়ার পরেও খোলেন- ঝাড়ানি, পার্শ্বণী, গদি-সেলামী, ছেলে-পড়ানি, কয়ালী, ঈশ্বরবৃত্তি ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হত বর্গাচাষীদের²³⁶। খাজনা অনাদায়ে কৃষকদের ওপরে শোষণের ছবি উপন্যাসে লিখেছেন মহীতোষ; সত্যপ্রসাদের বাবা বৈকুণ্ঠ মুখার্জী ও নায়েব লেঠেলবাহিনীকে দিয়ে যে উপায়ে কৃষকদের ওপরে অত্যাচার করাত, সেই একই পদ্ধতির উল্লেখ উনিশ শতকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়²³⁷। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সামঞ্জস্য বজায় থাকে। আর, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সহানুভূতি-রূপান্তরিত-দ্রোহকাজ্জ্বার যে ধারা, তাও অব্যাহত থাকে। গ্রামের মোড়ল কৈলাসের সঙ্গে সত্যপ্রসাদের কথোপকথনে লেখক কি বর্গাদার কৈলাসের জবানে রোম্যান্টিক অ্যাডভেঞ্চারিজমকে প্রশ্ন করেন, “ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এইসব মুখ্য-সুখ্য গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষাদের ক্ষ্যাপায়ে দিয়ে আপনি ওদেরও ক্ষতি করবেন, আপনার নিজিরও ক্ষতি হবে”

(বিশ্বাস, ৫০) শরাফত আর আজিজের ওপরে বাবলাডাল দিয়ে মারার যে খোয়াব তমিজ দেখেছিল, আধিয়ার জলধরও তা ভাবে নায়েবের বিরুদ্ধে, “ইচ্ছে যা করতিছিল না সেদিন- যে উঠে গিয়ে কাঁৎ ক’রে এক নাথি নাগাই সুন্মুন্দির পাছায়” (বিশ্বাস ১৯৬১, ৪০) কিন্তু, এই উপন্যাসেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আখ্যানপদ্ধতি ও ‘উইশফুল থিঙ্কিং’-র ঝোঁকের প্রাবল্য। সত্যপ্রসাদ মাত্রাতিরিক্ত সৎ ও আদর্শবাদী। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘সব্যসাচী’ উপন্যাসের সব্যসাচীর মতো পবিত্র, সৎ, আদর্শবাদী, জনদরদী এবং জনতা-জাগানিয়া। কৃষকদের দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যতটা, সত্যপ্রসাদের ভূমিকা তার থেকেও বেশি। সৌরভীর চরিত্রাঙ্কনেও সংস্কার ও সামাজিক ব্যবধান ডিঙাতে পারেননি লেখক। আখ্যানে প্রবন্ধের ঢঙে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক²³⁸। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বে জারিত উপন্যাসে শোষিত মেহনতীদের যে উজ্জ্বল বিপ্লবমুখী ভূমিকা থাকার কথা, এই উপন্যাসেও তা রয়েছে। কবিগানের আসরে তেভাগাপন্থী কবিগানে গ্রামের সমগ্র কৃষকমহল উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে ও হিন্দু-মুসলমান ব্যতিরেকে তেভাগার দাবি মেনে নেয়- এই সরলীকরণ ‘খোয়াবনামা’য় নেই। নিতাই সরকারের কবিগান আর কেরামত আলির গান তেভাগার জন্যে রচিত গানের বাস্তবেতিহাসের সঙ্গে মেলে। কিন্তু, কেরামতের কবিগানের পরেও ‘খোয়াবনামা’র পাঠক সভায় উপস্থিত শোষিত-নিম্নবর্ণের স্বরপার্থক্য ও বহুস্বর বুঝতে পারেন, ‘পায়ে পায়ে পথ’ উপন্যাসে তা অনুপস্থিত²³⁹। নারী ও পুরুষ কৃষকদের শ্রেণি-অচেতনতা থেকে শ্রেণিস্বার্থের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে ধর্ম-লিঙ্গ-বর্ণের কোনও বাধা আসেনি কিংবা তেভাগা বাদে তৎকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখও নামমাত্র। অর্থাৎ, ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যে প্রয়োগ চেয়েছিলেন, সেই মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রের একমুখী প্রয়োগ ঘটছে। শোষিত গ্রামীণ মানুষের উত্তরণ ঘটছে একাত্ম-সংগঠিত শ্রেণিবোধে এবং শ্রেণিশত্রু যারা, তাদের অবস্থান সমস্ত আখ্যানজুড়ে একইরকম খল-শোষক রয়ে গেছে। চারিত্রিক সাদা এবং কালো এই দুই অবস্থানের দ্বন্দ্ব সমস্ত আখ্যানজুড়ে প্রায় একইরকম। আদর্শ প্রগতিসাহিত্য হয়ে উঠতে গেলে

প্রগতিসাহিত্যের যে যে শর্ত মানা দরকার, ঔপন্যাসিক তা মেনেছেন। ফুলির নেতৃত্বে গ্রামের নারীরা একজোট হয়ে দারোগাসহ বাকি পুলিশদের নৌকা আটকে পুলিশকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে- এই ঘটনা শ্রেণি-মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলে। আর, পুলিশ, জোতদারদের ভয় না পেয়ে রুখে দাঁড়ানোর অভূতপূর্ব সাহসিকতাকে কথক বলেন, “যে নতুন প্লাবনের ধাক্কা এলো, তাতে ওসব পিছুটানের কথা আর কারো মনে রইল না।” (১২৪) প্রগতির অন্যতম লক্ষণ সামাজিক পিছুটানকে অস্বীকার ক’রে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু, উপন্যাসের নির্মাণে বেশ কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে, এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে রাজনীতি, আরও স্পষ্টতঃ শ্রেণি-রাজনীতি। উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট কিংবা অ্যান্টাগনিস্ট্রা কেউই নিরাজনীতির চর্চা করেনি কিংবা উপন্যাসের মূল প্লট শহুরে মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক অ্যাডভেঞ্চারকে প্রশ্রয় দেয়নি। এমনকি, নিখিল ও সত্যপ্রসাদের মধ্যে বিরোধের কারণও ব্যক্তিগত নয় রাজনৈতিক, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির সঙ্গে স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বন্দ্ব। শ্রেণিবোধ জাগরণের যে আখ্যান উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়, উপন্যাসের শেষপর্বেও তা অক্ষুণ্ণ থাকে। আন্দোলনের সমাপ্তিকে সাময়িক সমাপ্তি মেনে নতুন প্রজন্মকে দ্রোহমুখী করার সঙ্কল্প নেয় কৈলাস, যার নিজের উত্তরণ ঘটেছিল ছোট-কৃষক থেকে সংগ্রামী কৃষকের চেতনায়।

কৈলাস নাটিকে বুকের কাছে টেনে নেয়। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, ‘তোমাদের সবাইরে লড়তি হবে রে ভাই! এ লড়াইয়ের কি শেষ আছে? বাঁচতি গেলে লড়তি হবেই। আমরা লড়িছিলাম। লড়ি কিছু করতি পারলাম না। আবার তোরা লড়বি। একদিন না একদিন লড়াইতে জিত হবেই।’ (বিশ্বাস ১৯৬১, ১৯৭-৮)

শ্রেণিসংগ্রামের মতাদর্শকে ধারণ করার পাশাপাশি উপমহাদেশের সবচেয়ে সংকটময় ধর্মীয় রাজনীতির শাসক-শাসিত অবস্থানও থাকে। খালেদ মিঞা, ইব্রাহিম খাঁয়ের সঙ্গে জাতি-ধর্মগত ভেদ থাকা সত্ত্বেও তেভাগা বিরোধিতায় বদন মণ্ডল, পুলিন রায়, ভজন দাসের সঙ্গে জোট বাঁধে। হিন্দু-মুসলমান ধর্মগত বিভেদ ভুলে শাসক-সম্প্রদায় একজোট হতে পারে, কারণ তাদের

শ্রেণিবোধের একাত্মতা। “হিন্দু মোছলমান আমাদের যার যা জাত হোক না কেন, এক জায়গায় তো আমরা এক। আপনাদেরও জোত-জমি নিয়ে কারবার, আমাদেরও তাই। আপনাদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থের মধ্য কোনো ফারাক নেই।” (বিশ্বাস ১৯৬১, ৮৩) তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এই জোটই হয়েছিল উচ্চবর্ণের মধ্যে^{২৪০}; শোষক শ্রেণির জোটে পুলিশ-জোতদারের সম্মিলিত বাহিনী প্রত্যক্ষ দমন চালিয়েছিল কৃষকদের ওপরে আর মুসলিম লিগ আইনি পথে দমনের ব্যবস্থা করেছিল উচ্চবর্ণ হিন্দু জোতদারদের মদতে। মুসলিম লিগের জোতদার-প্রতিনিধি আর কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার জন্যেই মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভায় প্রণীত ‘বঙ্গীয় বরগাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল’ খসড়া আকারেই থেকে গেছিল, আইনে বাস্তবায়িত হয়নি^{২৪১}। উপন্যাসের কথকের বয়ানও সেই ইঙ্গিতই দেয়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে শাসিতের শ্রেণিবোধকে ছাপিয়ে উঠেছিল ধর্মীয় রাজনৈতিক অবস্থান ও দাঙ্গামুহূর্তের দুর্বলতা। কিন্তু, ‘পায়ে পায়ে পথ’ উপন্যাসে বর্গাদার ও খেতমজুরদের জোট দাঙ্গাপ্রবণতা রুখে দেয় কৃষকসভার নেতাদের সহায়তায়। “সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন ভোরেই কাদের সায়েব এবং হক সায়েব চলে গেলেন নুরহাট অঞ্চলে... নুটু মিত্র, নিখিল রায়, রসিক বিশ্বাস এবং সত্যপ্রসাদও বিলভাসানের গ্রামাএ গ্রামে ঘুরে প্রচারকার্যে নেমে পড়লেন” (১৩৯) অজয় দত্ত, মিনতির মতো কমিউনিস্ট কর্মীরা এমনকি ইসমাইল ও সুরেন সেনগুপ্তের মতো লিগ ও কংগ্রেসের নেতারা যে দাঙ্গা রোধ করতে পারেননি, তা সম্ভব হয় কাদের সায়েব, সত্যপ্রসাদের দ্বারা। তেভাগা-সমর্থক ও তেভাগা-বিরোধীদের কৌশলগত লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে এই দাঙ্গামুহূর্তের উল্লেখ থাকে উপন্যাসে, যা রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণকে ন্যায্যতা দেয়। ইতিহাসের তথ্যাদি ও ব্যক্তিবয়ানের প্রত্যক্ষাভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য থাকে ফুলি সিঙ্গির চরিত্রনির্মাণ ও মহিলাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে। “কোনোদিন কোনো গেরামে যদি কোনো বিপদ হয়, সকলে মিলে তিনবার জুয়োড় দেবা... এইভাবে সে খবর ছড়ায় দেবা গেরামে গেরামে।” (৯১) বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের^{২৪২} সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জোতদার-পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষের কাহিনি বিবৃত হয় উপন্যাসে।

কৃষকসভার গোপন মিটিং, সংগঠন গড়ার গেরিলা-কৌশল, নেতা-নেত্রীদের আত্মগোপন এবং তেভাগা বাস্তবায়নের নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাসধূত কাহিনি সযত্নে নির্মাণ করেছেন মহীতোষ বাবু। আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন শ্রেণিবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, তখন দেখা যায় যে, বর্গাদারদের আন্দোলনে ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা যোগ দিয়েছেন। দিনাজপুরের সমিরুদ্দীন ও শিবরাম নামে দুই ক্ষেতমজুর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হন; ইতিহাসাখ্যানের উপস্থাপনে ‘পায়ে পায়ে পথ’-এও ক্ষেতমজুরদের যোগদানের উল্লেখ থাকে। তেভাগা আন্দোলনে জমিমালিক ও বর্গাদারদের দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায় আরেকটি ক্ষেত্রে, যেখানে বিধবা মহিলারা জমির মালিক এবং ভূমিহীন চাষীকে দিয়ে বর্গা করান। তেভাগার মাপে ফসল ভাগে বিধবা মালিকদের অর্থনৈতিক সঙ্কট বাড়বে, এমনটাই ছিল অভিমত। কৃষকনেতা জিতেন ঘোষ ‘গরাদের আড়াল থেকে (১৯৭০)’-তে এই সংকট সমাধানের উপায় লিখছেন, “কৃষকেরা মাথায় বয়ে ঐ তিনজন বিধবার প্রাপ্য ধান তাঁদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলেন... কেবল ঐ বিধবা পরিবার তিনটিই নয়, তাঁদের কয়েক ঘর আত্মীয়-স্বজনও কৃষক সভার সমর্থক হয়ে তার দাবির স্বীকৃতি দিলেন।”²⁴³ কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কমিটি নয়, বরং স্থানীয় ইউনিয়নগুলোকেই এই মানবিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। ‘পায়ে পায়ে পথ’ উপন্যাসেও অনুরূপ সংকট ও সমাধান আসে বিলভাসান গ্রামের কৃষকদের সভায়। বিধবা জমিমালিকরা শ্রেণিবিশ্লেষণের তাত্ত্বিকতায় জোতদার আখ্যা পেলেও, স্থানীয় কৃষকসভা কর্মীরা তাঁদের ‘প্রাপ্য’ অর্ধেক ধান দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন²⁴⁴। কিন্তু, উপন্যাস নির্মাণের কিছু দুর্বলতাও থেকে যায়। এই দুর্বলতার মূল ভিত্তি সম্ভবতঃ ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ’-র নীতিপ্রয়োগ। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সমাজতান্ত্রিক ‘বাস্তববাদ’-এর বিচার’ প্রবন্ধে লিখছেন যে, সাম্যবাদের পরম আদর্শে অটল বিশ্বাসের জন্যই একপ্রকার সদর্থক নায়ক (পজিটিভ হিরো) সাহিত্যে উদ্ভূত হল, যাদের হৃদয়ে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব/দ্বিধা নেই বা হতাশা নেই, শুধু একমাত্রিক রঙে আঁকা চরিত্র।²⁴⁵ সোভিয়েতের লেখক সিনিয়াভস্কির ‘The Trial

Begins'-র আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ প্রসঙ্গে সিনিয়াভস্কির মতামত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

সিনিয়াভস্কির ভাষায়ঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নিয়মানুসারে সদর্থক নায়ক সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি psychological চরিত্র রূপেও সদর্থক নায়ক ও তার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুর-চড়ানো রচনামূল্য ও অলংকারপূর্ণ ভাষার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জীবনের বাস্তববাদী বর্ণনা- এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সংগতি স্থাপন করতে গিয়ে একটা বিরক্তিকর সাহিত্যিক খিচুড়ি বেরিয়ে আসে।
(বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮, ১৫২-৮)

প্রগতিবাদী সাহিত্যিকেরা অধিকাংশই সোভিয়েতের সাহিত্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে চেয়েছেন, তাই আদর্শবাদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমন এক সদর্থক প্রোটোগনিস্ট ও আন্দোলনমুখী বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন, যা লেখকের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছে। ইলিয়াস এই চিন্তাসূত্রকে অস্বীকার করতেই, 'সংশয়ের পক্ষে' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং 'wishful thinking'-র বিরোধিতা করেছিলেন।

উপন্যাসের কথক যেন তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক কে, তা আগে থেকেই জানেন। সেই শহুরে পাঠককে যত্ন নিয়ে উনি কৃষিজ শব্দ, গ্রামীণ শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত করান। “ধান গাছের গোড়ার দীর্ঘ খড়গুলো পড়ে রয়েছে। ওগুলোকে বলে ‘নাড়া’। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়” (৮৬) কিংবা, “বিলভাসানের চাষী-বৌয়েরা পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহে কুলুই-চণ্ডীর ব্রত করে। চলতি কথায় বলে- কুলো জাগানো” (৮৮) উপন্যাসের এক বিশেষ সংকটময় মুহূর্তে যখন কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কমিটির ‘দালাল হলাল করো’ নীতিপ্রয়োগের নির্দেশ আসে, তখন শত্রুখতমের পক্ষে ও বিপক্ষে দাঁড়ায় নিখিল রায় ও সত্যপ্রসাদ মুখার্জী। দু’জনেই বিলভাসান অঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের সংগঠক। সত্যপ্রসাদ বিলভাসান অঞ্চলের সন্তান (কলকাতায় লেখাপড়া ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডে যোগদান) কিন্তু নিখিল রায় কলকাতা থেকে এসেও

বিলভাসানের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। দালাল খতম ঠিক না ভুল পদক্ষেপ, তাই নিয়ে তর্কও হয় এই দু'জনের মধ্যে²⁴⁶; কিন্তু, খেয়াল করার বিষয় যে কৃষকদের মঙ্গলের জন্যে নেওয়া সিদ্ধান্তে ও তর্কবিতর্কে বিলভাসানের কৃষকদের ভূমিকা নেই। দু'জন ভদ্র-মধ্যশ্রেণির নেতা বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছেন। নিখিল রায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে উপেক্ষা ক'রে দালাল-খতমের সিদ্ধান্ত কৃষকদের ওপরে চাপিয়ে দেন। সৌরভী, কৃষক আন্দোলনের মহিলা নেত্রী, প্রশ্ন করায় তাকে বলেন, “সব কাজের ভালো-মন্দের ভার তোমরা নাই-বা নিতে গেলে! এটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও” (১৭২) সত্যপ্রসাদকে প্রোটাগনিস্ট হিসেবে দেখাতেই লেখক সত্যপ্রসাদের চিন্তাসূত্রে ব্যক্ত করেছেন যে, বহিরাগত নেতাদের ওপরে নয় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করবে চাষীদের নেতৃত্ব-সংগঠনের নিজস্বতার ওপর। কিন্তু, এরই সঙ্গে “তাঁর ভূমিকা গৌণ হয়ে এলেও তাঁকে লক্ষ রাখতে হবে যাতে চাষীদের এই আন্দোলন কোনো ভুলপথে পরিচালিত হয়ে বাধাগ্রস্ত না হয়।” (১৭৪) সত্যপ্রসাদের এই উপলব্ধিও থাকে। নির্বিত্তের মেহনতীদের বিপ্লবের ঠেকা (এজেন্সি) নেওয়ার অভ্যাস মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের চিরদিনের। ঔপন্যাসিক এই ঝোঁক ও নেতৃত্বের স্বরকে সঠিকভাবেই আবিষ্কার করেছেন আখ্যানে। উপন্যাসের শেষাংশে মধ্যবিত্ত-ভদ্র নেতারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। ফুলি, কৃষ-আন্দোলনের অন্যতম নারীনেতৃত্ব শেষাবধি দ্রোহপথ থেকে সরে আসে না। বরং, যক্ষ্মা নিয়েও অসুস্থ শরীরে সত্যপ্রসাদের ফিরে আসার এবং বিপ্লব পুনর্নিমাণে বিশ্বাস রাখেন। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম থেকে কৃষকসভার প্রচারপত্রে মধ্যবিত্ত-কৃষক সহযোদ্ধাচেতনা জাগিয়ে তুলতে চাইলেও, মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের দ্বিধা ও সঠিক সিদ্ধান্তের বলিষ্ঠতার অভাবে আন্দোলনে যবনিকাপাত হয়-

ভুল আমাদেরই হয়েছিল ফুলিদিদি। চাষীদের কোনো দোষ নেই। আমরাই পারিনি সঠিক নেতৃত্ব দিতে। যখন যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল, তা নেওয়া হয়নি। কোথাও কোথাও

আবার ভুল পথ নেওয়া হয়েছে। তার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটল... আবার আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়ব। সে লড়াইয়ে আমরা জিতবই। (বিশ্বাস ১৯৬১, ১৯৪-৫)

নিখিল ও সত্যপ্রসাদের আত্মসমালোচনার মতো বদরুদ্দীন উমর এরকমই এক কারণের দিকে ইঙ্গিত করেন²⁴⁷। বিলভাসানের কাহিনি পূর্ব পাকিস্তানে তেভাগা আন্দোলনের কথা বলে উপন্যাসে আর বদরুদ্দীন উমর সামগ্রিক আন্দোলন বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের তেভাগা আন্দোলনের অসফলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখছেন, “কৃষকেরা যেখানে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত সেখানে মধ্যশ্রেণি থেকে আগত নেতা ও কর্মীরা কৃষকদের সংগ্রামের পথ থেকে সুকৌশলে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন।” (৯৮) মধ্যশ্রেণির নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষায় ও বিপ্লবের ঠেকা (এজেন্সি) নিয়ে রাখার অনুশীলনে মেহনতী মানুষের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বারবার। তমিজ-কেরামতদের ধর্মীয়রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মিথ্যে আশা দিয়ে কিংবা চ্যারকেটু-খেতখেতুদের সাময়িক স্বস্তি দিয়ে মধ্যশ্রেণির নেতৃত্ব মতাদর্শগত নতিস্বীকার ক’রে নেয় শাসকের কাছে। ক্ষমতাকাঠামো আর স্থিতিাবস্থা বলবৎ থাকে। জলধর, ফুলি, কৈলাস, যতীনরা ব্যর্থ হয়।

সাবিত্রী রায়ের ‘ত্রিস্রোতা’, ‘স্বরলিপি’ ও ‘পাকা ধানের গান’ ১৯৪০ দশকের রাজনীতি বিশেষতঃ তেভাগা-কেন্দ্রিক কমিউনিস্ট রাজনীতিকে ঘিরে আবর্তিত উপন্যাস। কৃষকবিদ্রোহ এবং তাকে ঘিরে থাকা গ্রামীণ জীবন ও আন্দোলনে যোগদানকারী বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন মূল উপজীব্য। কিন্তু, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের যে প্রাধান্য, তাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি সাবিত্রী রায়ও। নিঃসন্দেহে তাঁর উপন্যাসে দ্রোহী নারীচরিত্ররা উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন রাজনীতিতে আধিপত্যকারী গান্ধীবাদী রাজনীতি ও মুসলিম লিগের রাজনীতির সমালোচনা উপন্যাসে রয়েছে। কিন্তু, প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সূত্রায়িত প্রয়োগ ও দ্বিতীয়তঃ নিম্নবর্গ-প্রান্তিক এবং মুসলমান সমাজের স্বরের থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের স্বর ও আকাঙ্ক্ষা। সাবিত্রী রায়ের ‘ত্রিস্রোতা (১৯৫০)’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে সোমা মারিকের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য,

Roy however mostly ignores complexities and the different language registers among Muslims. The confrontations between nation and gender therefore end up being limited to an assumption about the political nation being divided between the Gandhians, the national revolutionaries/Forward Bloc, and the Communists. Partition is seen almost solely from the perspective of Hindu, bhadralok/mahila. It appears as though Muslim desire for partition was based just on the will to do Muslim's wish for the land of the Hindu landlords. (Marik 2019, 98)

উপন্যাসের অন্যতম দ্বন্দ্ব গান্ধীবাদী নগেন্দ্রসুন্দর ও তারাসুন্দরীর সন্তান সুকল্যাণের সশস্ত্র বিপ্লবী মতবাদে যোগদান। গ্রামীণ কৃষক সমাজের যাপন, ব্রতকথা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের সঙ্গে সামঞ্জস্যে শহরের প্রতিচ্ছবি। চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ, কৃষিজীবী থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়া, আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও নাগরিক সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মধ্যবিত্তের আখ্যান। চল্লিশের দশক জুড়ে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক বিক্ষোভের বাস্তবধর্মী ইতিহাসানুগত আখ্যান উপন্যাসে। কেন্দ্রীয় চরিত্র পদ্মা বাঙালি-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তার সংস্কৃতি, তার আত্মমর্যাদা, তার সংগ্রাম এবং উপন্যাসের নারীচরিত্রদের স্বনির্ভরতার বর্ণনা নিঃসন্দেহে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নতুন। সময় ও ইতিহাসধৃত কালপর্বে ব্যক্তিমানুষ পদ্মাকে এবং বিস্তীর্ণ সামাজিক পরিসর অনুসন্ধানের জটিলতা প্রতীয়মান। যথার্থ প্রগতিবাদী সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপন্যাসটি রচনা করেছেন সাবিত্রী। তিনপর্বে সমাপ্ত মহা-উপন্যাস ‘পাকা ধানের গান (১৯৫৬-৬০)’। শিক্ষিত-মধ্যবিত্তরাই এই উপন্যাসের অনেকাংশ জুড়ে; তারা যোগ দেয় আধিয়ারদের বিদ্রোহে এবং সংগঠক হয়ে ওঠে। উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট পার্থ সংগ্রামী

নেতা, উপন্যাসের পরিসর তেভাগা থেকে হাজং বিদ্রোহ পর্যন্ত বিস্তৃত। হাজং বিদ্রোহের এক বর্ণনায় সাবিত্রী লিখছেন,

সন্ধ্যা হতে না হতেই হাজার হাজার হাজং সারি বেঁধে টিলার ঢালু বেয়ে নিচে নেমে আসে। নেমে আসে হাজার হাজার ডালু, কোচ, গারো বানাই – প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক, লাঠিসড়কি-, বর্শা। দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর মতো অন্ধকারে শালবনের ভেতরে দিয়ে ছুটে আসে মশালের পর মশাল। মাদলের গুরু গুরু আওয়াজ আর মশালের গণনাতে সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে যায় মিলিটারী সশস্ত্র বাহিনী। (রায়, পাকা ধানের গান)

‘পাকা ধানের গান’ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে বিষয়, কুশীলবনির্মাণ, অবয়ব এবং ভাষাগত সামঞ্জস্যে। সাবিত্রী রায় প্রগতিবাদী লেখক শিবিরের। তাঁর উপন্যাসে শ্রেণিবোধ প্রখর। পার্থ মেধাবী, শিক্ষিত যুবক। সে রাশিয়ার বিপ্লবের গল্প শোনায়, কৃষক-শ্রমিকের বীরত্বের ও সংগ্রামের গল্প শোনায় আবার দেশীয় সমাজে জাত-ধর্মের বিভেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন কুশীলবের সমাহার সত্ত্বেও উপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের যাপন ও রাজনীতিবোধের দ্বন্দ্বিকতায়। কৃষক সমাজের একাত্মতা বোঝা যায় কৃষক-জমিদার দ্বন্দ্বপ্রস্তুতির প্রাক্কালে- নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা একজোট হয়ে বিরুদ্ধতার প্রস্তুতি নেয়- “পথকর না দিলে ফৌজদারী সোপর্দ করবে? ফৌজদারী, দেওয়ানী, নায়েবানী, বাবুয়ানী দেখি কত করতে পারে। রাস্তা সমান না করলে এক আধলাও কর দেব না আমরা”²⁴⁸ (রায় ১৩৪৬, ১৯-২০) কৃষক সংগ্রামের পরিধি যত বাড়তে থাকে, আখ্যানে গ্রামীণ সংস্কৃতির লোকায়ত উপাদানও আসতে থাকে। মহীতোষ বিশ্বাস তাঁর উপন্যাসে দেশীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন বর্ণনা করেছেন, সাবিত্রী রায়ও তেমনই আন্দোলন আর পুলিশি সন্ত্রাসের আবহেও ব্রতকথা, পদাবলী, বিয়ের গান, ভাড়ালি কোটা, মনসাতলার মাঠে কালী নাচ ইত্যাদিকে জড়িয়ে নিয়েছেন আখ্যানের সঙ্গে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, জুয়োড় দেওয়া বা উলু দেওয়া, শাঁখ বাজানোর মতো ধর্মীয় সংস্কার ও রীতিকেই কৃষকেরা আন্দোলনের কাজে ব্যবহার

করেছিলেন জমিদার-পুলিশের সম্বাসের বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। সাবিত্রী রায়, ইলিয়াস ও মহীতোষ বিশ্বাস শাসিতের মতাদর্শকে কেন্দ্রে রেখেও এই উপাদানগুলির নিখুঁত বর্ণনায় সচেষ্ট। কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতিতে সচেতন শিক্ষিতর যে সেতুবন্ধনের দায়িত্ব, পার্থ তা পালন করে কৃষকদের রাশিয়ার বিপ্লবের কাহিনি শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে। “এখানে দেখছো লীগের মন্ত্রীত্ব। লীগের মন্ত্রী কি? না, বড় বড় জোতদার, জমিদারের মন্ত্রীত্ব। সেখানে তেমনি কৃষক, শ্রমিকদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নির্বাচিত হয়।” (১৪৯) কৃষকেরা উদ্বুদ্ধ হয় সোভিয়েতের কাহিনিতে এবং আন্তর্জাতিকতার বোধও তাঁদের চেতনায় জেগে ওঠে। শ্রেণিবোধ যে ধর্মবোধ, জাতিবোধ এবং দেশাত্মবোধের ওপরে এক ভিন্ন চেতনা, তা পার্থ-আলির কথোপকথনে ধরা পড়ে। “একদিনের মধ্যে একসঙ্গে সব ক্ষেতের ধান কাট হবে। আমরা আমাদের নিজেদের ধর্ম-গোলায় তুলতে চাই।” হাজং চাষীদের এই আহ্বান ‘পায়ে পায়ে পথ’ উপন্যাসেও অবিকল।

এর সঙ্গেই মূল কাহিনিতে জুড়ে থাকে সামাজিক সংস্কার ও জাত-বর্ণের প্রসঙ্গ- আলির সঙ্গে মেঘীর সম্পর্ক ঘিরে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বীভৎস রূপ বেরিয়ে আসে। জগাই বাঁড়ুজ্যে বলে, “মিঙ্গার সঙ্গে পিরীত করে যে মাগী, তার আবার মান ইজ্জতের কিছু বাকি আছে?” (১৫৩-৪) আর, এই শাসনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে পার্থ প্রতিবাদ করে ‘চাষার ছেলে’ আত্মপরিচয়ের গর্ববোধ থেকে। কিন্তু, উপন্যাসটি আগাগোড়া রাজনীতিতে নিবদ্ধ থেকেও বহুস্বরীয় কথনাখ্যান রাখতে পারেনি। প্রোটোগনিস্ট পার্থও ‘পায়ে পায়ে পথ’-র সত্যপ্রসাদের মতোই আদর্শবান, সৎ। পার্থর যারা সহযোদ্ধা, তারাও বয়স-ধর্ম-অবস্থান ব্যতিরেকে প্রত্যেকেই আদর্শবাদী ও সৎ। লেখকের মনোবাহুগত চিন্তাসূত্রের প্রয়োগে তাদের সবার স্বর ও চেতনার স্তরের মাত্রা এক। কুশীলবেদের চরিত্রের বিভিন্ন রঙ নয়, বরং সাদা-কালোর বাইনারিই প্রযোজ্য। ‘কমিউনিস্ট চেতনা’য় উত্তরণের পথে বাস্তবে বিভিন্ন ব্যক্তিক ও ব্যাপ্তিক ঘাত-প্রতিঘাত পেরোতে হয় বাস্তবে; উপন্যাসে এই উত্তরণ একবগুণা। এই উপন্যাসগুলিতে লেখক “a

truthful, historical concrete representation of reality in its revolutionary development.”²⁴⁹ এই নীতি অনুসারী লিখনভঙ্গি অনুসরণ করছেন যেখানে পাঠকদের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সঙ্গে পরিচয় করানো ও উদ্বুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য। দুর্ভিক্ষ, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে শহুরে আর্থ-সামাজিকতায় বাধ্যতঃ রূপান্তর, এগুলি এই উপন্যাসেও ফিরে আসে। উপন্যাসের শেষপর্বে, পার্থর মৃত্যুর পরে ভদ্রার চরিত্রচিত্রণ উল্লেখযোগ্য কারণ, সে বিদ্রোহের পথ থেকে সরে আসে না। পার্থসহ অন্যান্য দ্রোহীদের অসমাপ্ত দ্রোহকে পূর্ণতা দেওয়ার লক্ষ্যেই সে ‘মায়েরা, বোনেরা, বধূরা’ এই আহ্বান রেখে বলে, ‘তোমাদের দোলনা দোলানো হাতে বর্ষা তুলে নাও’। এই কালপর্বের দুই দশক বাদে নকশাল আন্দোলনের কালপর্বে রচিত ‘কালবেলা’ উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসের রাজনৈতিক অবস্থান অনেক বেশি প্রগতিশীল। প্রথমতঃ, মাধবীলতা-অনিমেষের মতো ভদ্রারা ‘ব্যর্থতার বোধ’কে মাথায় নিয়ে সরে আসেনি আর, দ্বিতীয়তঃ, ‘পুরুষ বিপ্লবে যাবে আর নারী ঘরে তার দায়িত্ব সামলাবে, পুরুষ-বিপ্লবী সঙ্গীকে মানসিক শক্তি জোগাবে’- এই বস্তাপচা ধারণাকে অস্বীকার করেছে। ভদ্রা কৃষক আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা হয়ে ওঠে কোনও পুরুষবিপ্লবীর ‘সঙ্গী’ পরিচয়ে নয় বরং নিজস্ব সাংগঠনিক দক্ষতায় ও অনুশীলনে। সেলিনা হোসেনের ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯)’ উপন্যাসটি একাধারে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক, কারণ ইলা মিত্র, রমেন মিত্র, হরেক সহ বহু বাস্তবমানুষের সরাসরি উল্লেখ রয়েছে এই উপন্যাসে। আর, রাজনৈতিক, কারণ, আজিজ-আজমলদের বয়ানে এই উপন্যাসের আখ্যান বিবৃত হয়, এরা কাল্পনিক কুশীলব এবং উপন্যাসটি ইলা মিত্রের রাজনৈতিক জীবন ও পারিপার্শ্বিক নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসে ইলা মিত্রের ভূমিকা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট রমেন মিত্রের স্ত্রী হিসেবে নয়, বরং এক দক্ষ সংগঠক, বিপ্লবী ও সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেত্রী হিসেবে। ভাগচাষী তন্নারায়ণের মৃত্যুর পরে শাসকশ্রেণির চেষ্টায় যে দাঙ্গা শুরু হয় তেভাগা-প্রভাবিত অঞ্চলে, তার বিরুদ্ধে ইলা-রমেন ও অন্যান্য ক্ষেতমজুর-ভাগচাষীর ভূমিকা সেলিনা লিখেছেন।

দাঙ্গাকে প্রতিহত করতে জোটবদ্ধ হন তাঁরা। “এই উৎসবের কোনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তি নেই। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল- সবাই এসেছে। এই উৎসবের হৃদয় ফসল, শরীর অধিকারের প্রতিষ্ঠা।” (হোসেন ১৯৮৯, ১৫৯) ‘পায়ে পায়ে পথ’-র মতো এই উপন্যাসেও শ্রেণিভিত্তিক জোটবদ্ধতার কথা থাকে। ইলা মিত্র সামাজিক বাস্তবতায় যথার্থ নেত্রীর ভূমিকা পালন করেন। আর, আখ্যানের বাস্তবতায় কুশীলব থেকে ‘চরিত্র’ হয়ে ওঠে। বাস্তবতা থেকে আখ্যান- এই চলাচল থাকে।

রাজনৈতিক উপন্যাস ‘স্বরলিপি (১৯৫২)’তে তেভাগা-অনুবর্তী সময়ের কথন থাকলেও, ভদ্র-শিক্ষিত বৃত্তে আবর্তন ও তা থেকে বেরনোর চেষ্টার দ্বন্দ্বিকতায় জারিত। উপন্যাসের শুরুতেই ‘তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ’-এই স্লোগানের সচকিত উচ্চারণ থাকে এবং মধ্যবিত্ত নেতাদের সংস্কারবাদী পথকে ত্যাজ্য ক’রে শ্রমিক নেতার, “তোমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেকি টেকি নয়” (২) সঘোষ বক্তব্য শুরু হয়। বাংলা উপন্যাসের প্রথম দু’টি বাক্য- “সূর্যের রশ্মিতে লাল পতাকাগুলি প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। পতাকার নীচে ‘ডায়াসে’ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এক শ্রমিক নেতা”²⁵⁰- এই শুরুয়াৎ বিরল এবং ছকভাঙ্গা। ‘ব্যক্তিগতও রাজনৈতিক’ এবং কুশীলবের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতিকে উপেক্ষা ক’রে সামাজিক-রাজনৈতিক বৃহত্তর পরিসরের আখ্যান লেখা যায় না, তা সাবিত্রী রায়ের ‘স্বরলিপি’তে জাজ্জ্বল্যমান। আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ও নেতৃত্বদান এই উপন্যাসেও রয়েছে এবং আন্দোলনে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র পুরুষানুবর্তী কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকছে না। ‘স্বরলিপি’ উপন্যাস নিয়ে সোমা মারিকের মতামত,

Roy is able to bring together a profound sympathy for the struggles of the downtrodden, alongside a critique of nationalism as an ideology of new states in the making, with their own violence, along with a rare sensitivity to the complex situations of women. Women of the middle class with all the attendant social markers, the

uncertainties of the 1940s and 1950s emerge with clarity and a sensitivity no male leftist writer of that time had achieved. (Marik 2019, 102)

উপন্যাসের আখ্যানকল্পে দেশভাগের বেদনার সঙ্গে জুড়ে যায় কলকাতা শহরে চলে আসার পরে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রাম। পৃথ্বী আর শীতা বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় চলে আসে; আর, শুরু হয় কলোনিবাসীর সংগ্রাম। জমির মালিক মধু মুখার্জীর গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুকলোনির বাসিন্দাদের লড়াই। কৃষকদের জমির ফসলের অধিকারের সংগ্রাম থেকে কলকাতা শহরে বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের জমিরক্ষার সংগ্রাম- আর, এরই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কলোনির নারীদের সংগ্রামের কাহিনি। অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর বইয়ে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন,

যে-সব জমিতে জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল, সেইসব জমির মালিকেরা পুলিশ ও গুণ্ডার সাহায্যে আক্রমণ করলে হাতা-খুস্তি-বাঁটা-বাঁটি নিয়ে মেয়েরা প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয়েছে... ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে সাবিত্রী রায় বর্ণনা করেছেন যেই কলোনি আক্রমণ করেছে ভাড়াটে গুণ্ডারা, অমনি বিপদের সংকেত হিসেবে শাঁখ বেজে উঠেছে ঘরে ঘরে।
(সিকদার ২০০৫, ৬৬)

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস দেশভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক আখ্যানবর্ণন করে। আর, ‘স্বরলিপি’ দশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক আখ্যানবর্ণনে সরে আসে। পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ দেশভাগ আর ক্ষমতা-হস্তান্তর কোথাওই নির্বিত্ত আর মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে পারেনি। নিম্নবর্ণের যন্ত্রণার পরিসর অবিকল থেকেছে নবগঠিত সরকারের শাসনে। ফল্গু-পৃথ্বী-শীতা নাগরিক উদ্বাস্তু জীবনের স্বাদ পায়। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বিশাল সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনে এই আর্থ-সামাজিক রূপান্তর প্রভাববিস্তার করে। বহু উপন্যাস

লেখা হয়েছে এই প্রেক্ষিতে, তার অধিকাংশই ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের স্থানান্তরজনিত দুর্দশার আখ্যান। রাজনৈতিক অক্ষগুলিকে পাঠকের সামনে স্পষ্টতঃ তুলে ধরা এবং শোষিত বনাম শোষকের শ্রেণিঅবস্থানকে চিহ্নিত করা সাহিত্যের অবয়বে- সাবিত্রী রায় পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই সাহস দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীর বহু রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকই যে সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন, শ্রেণিবোধকে গুলিয়ে দিতে মধ্যবিত্তের ‘রোম্যান্টিসিজম’কেই রাজনৈতিক অবস্থান ক’রে তুলেছিলেন। রঞ্জিত মিত্র ‘ব-দ্বীপঃ যুগসন্ধির মহাকাব্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, দাঙ্গাতাড়িত দেশে ‘গান্ধীটুপির গোপন বেসাতির ন্যাক্কারজনক’ রাজনীতি কিংবা সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য রাজনীতির অনুশীলন ক’রে চলা রাজনীতিকদের চিনিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে কমে আসছে- কিন্তু সাবিত্রী রায়ের আপসহীন বলিষ্ঠতা তা চিনিয়ে দিতে সক্ষম। পাঠকের বোধ ও চেতনায় শান দিয়ে যায় তাঁর আখ্যানে পরিস্ফুট চেনা জগতের ছবি।²⁵¹ ‘স্বরলিপি’ শুধু শব্দে নিম্নবিত্তের দুর্দশার কথাই বলে না বরং পাল্টা প্রতিরোধের আখ্যানও বলে। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে ‘স্বরলিপি’-র গুরুত্ব আরও একটি রয়েছে, তা হল, তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকৌশলের সমালোচনা। ‘স্বরলিপি’-র প্রধান কুশীলবেরা যেভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নীতির সমালোচনা করেছে, নেতৃত্বের ভুল সম্বন্ধে সচেতন ক’রে দিতে চেয়েছে, তা মনঃপূত হয়নি পার্টিনেতৃত্বের। সাবিত্রী রায় রাজনৈতিক সক্রিয়তার বাইরে থেকে মনগড়া গল্প নির্মাণ করছেন না কিংবা রাজনীতির সমালোচনায় নিরাজনীতিকে (depoliticization) জয়ী করতে চাইছেন না প্রাতিষ্ঠানিক মহলের আদৃত ঔপন্যাসিকদের মতো। তিনি নিজে ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সদস্য, সক্রিয় কর্মী। ‘স্বরলিপি’-র রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতার আরেকটি মানদণ্ড হল যে, এই উপন্যাস প্রকাশের পরেই কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সাবিত্রীকে বহিষ্কার করা হয় কারণ, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গ’ ক’রে তিনি উপন্যাসে পার্টি কর্মসূচীর সমালোচনা করেছিলেন। প্রায় দু’দশক পরে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এই সমালোচনার ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টি বহুধাবিভক্ত- মতাদর্শগত অবস্থানের

ভিন্নতায় ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে দু'টি বিভাজন আর, পারস্পরিক রক্তপাতের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। তাঁর উপন্যাসে সত্তর দশকের রাজনীতির সমালোচনা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বারবার ভুল করেছে, তা সংশোধনের চেষ্টা করেছে; কিন্তু, পুনরায় নতুন ভুলের দিকে এগিয়ে গেছে। কখনো বা পুরনো ভুল নতুন রূপে এসে দাঁড়ানোয় তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক যে আশঙ্কা 'বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)' উপন্যাসে মণিমোহন-প্রসন্নের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে করেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ, তা একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ফিরে আসছে। শ্রেণিগত অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা ও নির্বাচনী স্বার্থের কাছে নতিস্বীকার ক'রে পদক্ষেপ করছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। এমনকি, যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থাশীল নয়, তারাও কখনো না-কখনো দক্ষিণপন্থীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভুলের বীজ কিন্তু বহু আগে পত্তন হয়েছে। ভারতীয় জনগণের নাড়ি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি, কখনো বা জনগণের স্বার্থ আর পার্টির স্বার্থ গুলিয়ে ফেলেছে আবার কখনো কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিস্বার্থ ভুলে গেছে আশু লক্ষ্য অর্জনের আশায়। 'বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)' থেকে একটি উদাহরণ দেখা যাক, সিপিআই মণিমোহন ও সিপিএম প্রসন্ন-র কথোপকথনে। সিপিএম-র প্রসন্ন মণিমোহনকে অভিযুক্ত করতে থাকে, '৭০ এর দশকের মহাসন্ধিক্ষণে সিপিআই যে ভুলগুলো করেছিল, দেশে জারি হওয়া জরুরি অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছিল সেই ব্যাপারে। মণিমোহন স্বীকার করেন সিপিআই-এর ভুল।²⁵² কিন্তু, জনসঙ্ঘের সঙ্গে সিপিএমের জোটবাদী রাজনীতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন। দীপেন্দ্রনাথ সাবিত্রী রায়ের মতো পার্টি থেকে বহিস্কৃত হননি, কিন্তু, ক্ষমতাসীন পার্টির ইচ্ছাকৃত অবহেলায় অপঠিত ও বিস্মৃত হয়েছেন। দীপেন্দ্রনাথই সম্ভবতঃ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ঘরানার শেষ বাঙলা ঔপন্যাসিক যিনি রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমাজবিশ্লেষণ ও শ্রেণিচেতনার হৃদিশ দিতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে ভারতের বিশেষতঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অনুশীলনের সমালোচনা করেছেন- কখনও যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়, কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে ভুল জোটের দায়, কখনও জনতা পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে 'গণতন্ত্রের

লড়াই’ লড়ার ভুল।²⁵³ একজন প্রগতিশীল লেখক হিসেবে এই সমাজসূত্রগুলো জানা বড়ো প্রয়োজন। একজন সাহিত্যিক শুধু নিছক সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য করছেন না, তাঁর দায়িত্ব অতীষ্ট পাঠককে সচেতন রাখা, অবগত রাখা, আগাম ঝড়বিষয়ে সচেতন করা। আর, সেই দায়িত্বই নিখুঁতভাবে পালন করছেন দীপেন্দ্রনাথ। রাজনৈতিক সাহিত্য-নির্মাণে তাঁর পদ্ধতি বাজারগ্রাহ্য নয়, জনতোষী-সাহিত্যসুলভ নয়। তবু, সাবিত্রী রায়, দীপেন্দ্রনাথরা বহুদূর থেকেও আলো দেখিয়ে দিতে পারেন দিশেহারা সময়ের পাঠককে। ষাট-সত্তর দশকের যুগান্তকারী পর্বে জারিত তাঁর উপন্যাস। আর, রাজনৈতিক উপন্যাসের বলিষ্ঠ অনুশীলনে সরাসরি রাজনৈতিক দলগুলির অনুশীলন-তত্ত্বের উল্লেখও থাকে। ’৭০ দশকে যে জনতা পার্টির কার্যক্রম ছিল জরুরি-অবস্থার বিরোধিতা এবং পরিবারতান্ত্রিক কংগ্রেস দলের বিরোধিতা- সেই দলের সাথেই নির্বাচনী সমঝোতায় আসে তৎকালীন সিপিআইএম। অপর এক কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সদস্য হিসেবে এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আতঙ্কিত হন মণিমোহন। একদিকে টের পান পুঁজিবাদের রূপবদল, অন্যদিকে ভবিষ্যতে জনতা পার্টির মুখোশ ছেড়ে আসল রূপে আত্মপ্রকাশ। অথচ, একটি কমিউনিস্ট পার্টি এরকম দলের সাথে ভোট-সমঝোতা করলে, ভবিষ্যতে সারা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রশ্নের মুখে পড়বে- তাঁর এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসার এই যে ভবিষ্যত বিপদ, সেই সম্পর্কে মণিমোহন বন্ধুদের সচেতন ক’রে দেন এবং দক্ষিণপন্থী নীতি সম্পর্কে দূরদর্শী মতামত দেন।²⁵⁴ আর, দীপেন্দ্রনাথ বোধহয় বারবার এই রাজনৈতিক আত্মসমালোচনার দিকেই নির্দেশ করতে চান। সাবিত্রী রায়, মহীতোষ বিশ্বাসরা কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নিছক সমালোচনা করছেন না। পার্টিভিত্তির সমালোচনা করছেন না। শ্রেণিসচেতন কমিউনিস্ট হিসেবে সাহিত্য কীভাবে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে সেটাই দেখাচ্ছেন তাঁরা। বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থেকেছে, অথচ গোড়াতেই থেকে গেছে এমন কিছু গলদ যা শুধুমাত্র সংগঠনগত নয়, বরং রাজনীতিগত ও মতাদর্শগত। আর, শ্রেণিরাজনীতির অনুশীলন ক্রমেই প্রশ্নের মুখে পড়ে। দীপেন্দ্রনাথ যে পার্টির

সদস্য ছিলেন, সেই সিপিআইও ক্রমেই জনভিত্তি হারাতে থাকে। দীপেন্দ্রনাথ সত্তরের দশকে এদের মতাদর্শগত দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানে ভবিষ্যতের তত্ত্বানুশীলনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক সূত্রগুলোকে গভীর বিশ্লেষণে সাহিত্যের শব্দ-সংলাপে ধরে রেখে ভবিষ্যতের রূপরেখা দেখতে চেয়েছেন। প্রবক্তা বা ‘প্রফেট’ হিসেবে নয়, বরং একজন দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষক হিসেবেই। পরবর্তী অধ্যায়ে দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ ও নবাবুগের রাজনৈতিক উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ইলিয়াস যেভাবে চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সময়কে উপন্যাসের কালস্থানিকতায় আনতে চাইছেন, তা কীরকম? তা কি লেখকের মতাদর্শ-অনুশাসিত যান্ত্রিক রূপায়ণ কিংবা আরোপিত কিছু প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ? না। ইলিয়াস সেই দশকের ইতিহাসের মধ্যে থেকে খুঁজে নিচ্ছেন কিছু মানুষকে- তমিজের বাপ, তমিজ, বৈকুণ্ঠ, কুলসুম, হুমতুল্লা এমনকি শরাফত মণ্ডল, কালাম মাঝি, আব্দুল আজিজ, ইসমাইল, নায়েবদের মতো মানুষকেও। এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াতেই এগোচ্ছে কাহিনি। আর, ইলিয়াসের লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের বিশ্লেষণে ভেতরের মনোজগৎ ও সমাজের প্রতি তাড়না। ইলিয়াস তাঁর ‘সংশয়ের পক্ষে’ প্রবন্ধে এই বৈশিষ্ট্যকে ‘লেখকের সংশয়’ নামে অভিহিত করছেন। ইলিয়াসের লক্ষ্য শুধুমাত্র যান্ত্রিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিম্নবর্গের মহিমময় রূপ দেখানো নয়। ইলিয়াস ‘Wishful thinking’-র বিরোধী বরাবর, আখ্যানের কোনও কুশীলবকে লেখকের মনগড়া হার-জিত বা আদর্শবাদে বেঁধে ফেলতে চান না; সেইজন্যেই তমিজ দোষ-গুণের আওনে পুড়ে উঠে আসে, হাড্ডি খিজিরের মধ্যে একসঙ্গে থাকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, অসহায়তা এবং শাসক-বিরুদ্ধতা। ইলিয়াস তাঁর নির্মিত কুশীলবদের ‘মানুষ’-র পরিপূর্ণতায় দেখতে চান, খণ্ড জীবনীকার হতে চান না। তাই, শাহদুজ্জামানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন,

লেখায় মানুষের সম্পূর্ণটুকু দেখতে চাই, সবকিছু। Total truth এর মুখোমুখি হতে চাই। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যকার সম্ভাব্য সবকিছু আসা উচিত- any damn thing. একজন কমিউনিস্ট যিনি হয়তো খুব নিবেদিত প্রাণ, মানুষের জন্যে অনেক করেনও আবার তারই গভীর ভেতরে ভেতরে অনেক হারামিপনাও থাকতে পারে। সেখানে তার পুরোটাই আসা উচিত। কাউকে তো justify করার দরকার নেই। যে যেমন সেই perspective-এ তাকে দেখতে হবে। মানুষকে আমি যেমন দেখতে চাই সেটাই তো বড় কথা নয়, মানুষ যেমন আছে সেটা বড়। (ইলিয়াস ২০১৮, ৫০)

ওসমানের মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা কিংবা আনোয়ারের মধ্যবিত্ততা থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীতে রূপান্তরিত না হতে পারার দ্বন্দ্ব লেখক ইলিয়াসের এই চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। তমিজকে বাস্তবতাহীন দ্রোহসফলতা ও ঋণটিহীন আদর্শ ব্যক্তিত্বে পৌঁছে দিতে পারেননি ইলিয়াস, চানওনি পৌঁছে দিতে। ‘আনন্দমঠ’-এর একপেশে যবনবিরোধিতা বা নব্য-হিন্দু জাগরণের চিত্রকল্পের বিরুদ্ধতায় সম্পৃতির অবাস্তব ও জনতোষী কাহিনি রচনা করতে চাননি ইলিয়াস। তাই, প্রবল সংকটের যুগসন্ধিতে যে বিভেদ সমাজের সর্বস্তরে তৈরি হয়েছিল এবং উচ্চবর্গের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছেদাভিলাষের যে মতাদর্শগত প্রচারাভিযান ছিল, তাতে আক্রান্ত হন ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-র কেন্দ্রে থাকা নিম্নবর্গও। ইলিয়াস সেই প্রভাব ও প্রভাবিতদের অস্বীকার করেননি; ‘খোয়াবনামা’-র যে আখ্যানে ভবানী-মজনু কিংবা বৈকুণ্ঠ-চেরাগের কাহিনি ও মুখফেরতা কাহিনি স্থান পায়, যে আখ্যানে তমিজ-কেরামত আলিরা তেভাগা ও চাষীর অধিকারের খোয়াবে মশগুল হয়, সেই আখ্যানে দশরথ কামার, বুধা মাঝি, কালামরাও ঢুকে আসে। প্রবল ভাঙ্গাভাঙ্গি আর বিভেদের-বিচ্ছেদের আখ্যানের মধ্যে পাঠক খুঁজে পান সেই আখ্যানও, যেখানে নিম্নবর্গের অবাস্তবায়িত আকাজ্খা ছিল জুড়ে জুড়ে থাকার এবং সমাজবদলের। ইলিয়াসের উদ্দেশ্য বোধহয় সেটাই- ‘অপর’দের, বিজিতদের, সমাজের তলায় থাকাদের আকাজ্খা আর খোয়াব যা কোনওদিন পূর্ণতা পায়নি, তাকে কেন্দ্রে এনে এতদিনের কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠদের চ্যালেঞ্জ

জানানো। এই সচেতন প্রয়াসের ফলে উপন্যাসের পাঠ ও পাঠকের প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাশাও কি নতুন অভিমুখ পায় না? কারণ, প্রতিটা উপন্যাস বা সাহিত্য আসলে পাঠকের ওপরে প্রভাব বিস্তারের জন্যেই। সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু মুখফেরতা সাহিত্য (Oral Literature) বা লিখিত সাহিত্য (Literature), তা পাঠককে প্রভাবিত করার জন্যেই। লেখকভেদে তার পদ্ধতি পালটায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাহিত্য পদ্ধতি অভিযোজিত হয় কিন্তু উদ্দেশ্য পাঠকের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করা। হান্স রবার্ট ইয়াউস তাঁর প্রবন্ধে পাঠকের এই প্রতিক্রিয়া ও পাঠের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছেন। সেরভান্তেসের ‘দোন কিহোতে’ ও দিদেরোর ‘জ্যাক লে ফেতালিস্তে’-র পাঠপ্রতিক্রিয়ায় বলছেন,

The ideal cases of the objective capability of such literary frames of reference are works which, using artistic standards of the reader, have been formed by conventions of genre, style and form. These purposely evoke responses so that they can frustrate them. This can serve not only a critical purpose but can even have a poetic effect... the bizarre reality and moral casuistry of the inserted stories in which the truth of life continually denies the lies of poetic fiction. (Jauss 1970, 13)

পাঠের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস এবং লেখকদের ইতিহাস যেরকম বিবর্তিত হয়েছে তেমনই কয়েক সহস্রাব্দ ধরে, শ্রোতা ও পাঠকের ইতিহাসও কিন্তু বিবর্তিত হয়েছে। অথচ, পাঠকের ‘নির্দিষ্ট’ অবয়ব হয় না, অর্থাৎ, কোনও একজন পাঠক হিসেবে আলাদা ক’রে চিহ্নিত করা যায় না। ফলে, ‘পাঠকবর্গ’ বা পাঠকের সমগ্রতার বিচারে আসতে হয়। ‘লেখক’ যেমন ব্যক্তি বা একক কিন্তু ‘পাঠক’ ব্যক্তি বা একক নয় বরং বহু। ফলে, প্রত্যেক লেখক এই ‘বহু’ পাঠকের উদ্দেশ্যেই সাহিত্য রচনা করেন। পাঠকের ইতিহাস বিচার করাও জরুরি, যেহেতু সাহিত্য

পাঠক/শ্রোতা ছাড়া অচল, যেহেতু পাঠক/শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিগ্রহণ (Reception) ছাড়া সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে না। ইলিয়াস, মহাশ্বেতা, নবাবুণের মত লেখকেরা কি পাঠকের প্রতিগ্রহণের প্রত্যাশা ও প্রত্যাশার ইতিহাসও পাল্টাতে চান না?

এই অধ্যায়ের শেষপর্বে ইতিহাস, সময় ও কল্পনার পারস্পরিক যোগসূত্রের আলোচনা করা যায়- এই তিনটিকে লেখক কীভাবে তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে ধরে রাখবেন? হেডেন হোয়াইট ইতিহাসকে দেখছেন অন্যভাবে। ইতিহাসলেখ (হিস্ট্রিওগ্রাফি) আর সাহিত্য (ফিকশন)-র মধ্যে সীমা কী? তাঁর মতে, ইতিহাস এক আখ্যানগদ্য, যা সাহিত্যের প্রথা মেনেই লেখা এবং তা ঐতিহাসিকের কল্পনার ফসল। ‘The Practiical Past’ গ্রন্থে ইতিহাস আর সাহিত্যের মার্বোর সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন,

What it was that had passed by or what it had done in that place will remain a mystery, the solution to which may be inferred or intuited, but the nature of which must remain conjectural- indeed, must remain a possibility only and therefore a “fiction.” By fiction I mean a construction or conjecture about “what possibly happened” or might happen at some time and some place, in the present, in the past, or indeed even in the future. (White 2014, X)

হোয়াইটের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘অতীতে যা ঘটেছে’ সেটা বিশেষ কোনও অর্থ বহন করে, যখন ঐতিহাসিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে চান। সমস্ত ইতিহাস রচনাপদ্ধতি কবিতা বা উপন্যাসের ঢঙয়ে ‘শৈল্পিক’ হয়ে ওঠে না, সমস্ত ইতিহাস কখনই বিশেষভাবে নির্মিত হয়। ইতিহাস আর অতীতকে এখান থেকেই আলাদা করা প্রয়োজন। অতীতকে প্রবলভাবে নিজেদের মতো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদেরা অনেক সময়েই ইতিহাসকে নিজেদের মতো নির্মাণ ক’রে নেন। কল্পনার সাহায্যে, তথ্যপ্রমাণাদি যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অতীত নিয়ে লিখিত রচনার সাহায্যে তাঁরা

ইতিহাসের নির্মাণ করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পরবর্তী যে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার নাম ভেবেছিলেন ‘করতোয়া মাহাত্ম্য’²⁵⁵। একাদশ শতাব্দীর কৈবর্ত বিদ্রোহ (বাংলায় পালবংশের সম্রাট দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্তদের বিদ্রোহ) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)-কে কেন্দ্রীয় পটভূমিতে রেখে লিখতে চাওয়া উপন্যাস, যেমন দেশভাগ-স্বাধীনতা আর ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে পটভূমিতে রেখে ‘খোয়াবনামা’র নির্মাণ করেছিলেন। আর, তাঁর ‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘খোয়াবনামা’ ও অলিখিত উপন্যাস ‘করতোয়ার মাহাত্ম্য’ এই সবগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য করতোয়া নদী ও তাকে ঘিরে থাকা প্রাচীন জনপদে প্রবাহিত মিথ্রাশি। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে তাই বৈরাগীর ভিটে আর করতোয়াতে ঘোড়ার হেঁসারবের মিথ্র ফিরে ফিরে আসে; ‘খোয়াবনামা’তে করতোয়ার তীরেই মুন্সি বয়কতুল্লাহ্ মারা যান ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে এবং করতোয়ার পশ্চিম তীরে বারেন্দ্রভূমিতেই ‘ভীমের জাদাল’ ও ‘কৈবর্ত স্তম্ভ’ রয়েছে ভীম-দিব্যোকের সংগ্রামের স্মৃতি-মিথের মিশেলে। রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্তনেতা ভীমের প্রতিস্পর্ধা ও প্রতিরোধের মুখফেরতা কাহিনি, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর আখ্যানে যে উপন্যাসের আখ্যানকাঠামো সাজাতে চেয়েছিলেন ইলিয়াস, চৌধুরী মুফাদ আহমদ তাঁর সঙ্গে ইলিয়াসের কথোপকথনের স্মৃতিতে এর উল্লেখ করেছেন,

ইলিয়াস ভাই উপন্যাসে মিথের ব্যবহার নিয়ে তাঁর চমকপ্রদ ধারণা সম্পর্কে বলেছিলেন। বলেছিলেন কীভাবে একজন ঔপন্যাসিকের কাছে ইতিহাস আর মিথের সীমানাটা অনেক সময়ই ঝাপসা হয়ে যায়। ইলিয়াস ভাইয়ের কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, তাঁর উপন্যাসে কৈবর্ত বিদ্রোহের চরিত্রকে হয়তো চেনা যাবে মুক্তিযুদ্ধের কোনো রণাঙ্গনে কিংবা কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি হয়তো চালান করে দেবেন রামপালভীমের- যুদ্ধে... ইলিয়াসের ‘করতোয়া মাহাত্ম্য’স্থানকালের সীমানা অদলবদল করে দিয়ে করতোয়া - পারের মানুষের জীবন আর সংগ্রাম, তাদের ইতিহাসবিশ্বাস-, লড়াই করে জয়ী হওয়া

কিংবা হেরে যাওয়াকে এক বিশাল ক্যানভাসে তুলে ধরার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। (আহমদ ২০২০, প্রথম আলো)

ইলিয়াসও তাঁর আখ্যানরচনায় জনশ্রুতি আর মুখফেরতা কাহিনি দিয়ে বারবার প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছেন ‘ইতিহাস’কে। হেডেন হোয়াইট ইতিহাসের প্রচলিত নির্মাণ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, ইলিয়াস উপন্যাসের নির্মাণে ইতিহাসের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। ইলিয়াসের ‘করতোয়ার মাহাত্ম্য’ লেখা হয়নি, হতে পারত। কিন্তু, নিশ্চিতভাবেই তাতে নিম্নবর্গের মুখফেরতা আখ্যান আর শাসিতের দ্রোহের প্রবাহিত জনশ্রুতি কেন্দ্রে অবস্থান করত।

হোয়াইট ‘মেটা হিস্টরি’ বা অধি-ইতিহাসের কথা বলছেন। অধি-ইতিহাস অর্থাৎ, ইতিহাস রচনার অন্তঃস্থলে ফল্গুধারার মতো কাব্য (বা, আখ্যান) লেখা হয়ে চলে, তা নন্দনতত্ত্ব ও মূল্যবোধের ওপরে নির্ভর করে নির্দিষ্ট ভাষাবন্ধনী ব্যবহার করে লেখা হয়। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক আখ্যানে একজন ঐতিহাসিক ইতিহাসের ক্ষেত্র, ইতিহাসের অব্যবহৃত তথ্যাদি, অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদি এবং পাঠকবর্গের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেন²⁵⁶। একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাসের কোনও ঘটনা লেখেন তখন তাঁরা পূর্বনির্ধারিত ধারণা ও তাঁদের ইতিহাস-সচেতনতার বিশ্বাস থেকে তাঁদের জ্ঞানকে কিছু বিশেষ ‘মোড’-এ বদলে নেন। উনিশ শতকীয় ইউরোপের ঐতিহাসিক কল্পনার বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, “there can be no ‘proper history’ which is not at the same time ‘philosophy of history’” (White 1973, xi) এমন কোনও নিখুঁত প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই, যার ওপরে ভিত্তি করে একজন ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব ইতিহাসলেখ-র ‘মোড’কে বাকিদের তুলনায় বেশি বাস্তবসম্মত বলতে পারেন²⁵⁷। তাঁর মতে, ঐতিহাসিকেরা ‘ইতিহাসাশ্রয়ী কল্পনা (হিস্টরিকাল ইমাজিনেশন)’ পদ্ধতি অবলম্বন করেন ইতিহাসের বর্ণনা করতে গিয়ে। অর্থাৎ, একজন ইতিহাসবিদ একজন সাহিত্য-রচয়িতার আখ্যানপদ্ধতির ওপরে নির্ভর করেন। রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই সূত্রকে মিলিয়ে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ইতিহাস ও সময়কে

মেলানোর প্রশ্নকে লেখক কীভাবে তাঁর উপন্যাসে ধরে রাখবেন? সময় ও পরিসরের মেলবন্ধনেই সাহিত্য সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তার স্বতন্ত্র বজায় রেখেই। বাখতিন তাঁর ‘Forms of time and Chronotope in the Novel’ প্রবন্ধে বলছেন, “Time, as it were, thickens, takes on flesh, and becomes artistically visible; likewise, space becomes charged and responsive to the movements of time, plot, and history.” (Bakhtin 1981, 84-5)²⁵⁸ ক্রনোটোপ বা কালস্থানিকতা অর্থে, যখন সময় ও পরিসর অবিচ্ছেদ্য। পাঠ্যের ভেতরের উপস্থাপিত জগৎ ও বাইরের অ-কাল্পনিক জগতের মধ্যে সীমারেখার নির্ধারক। উনিশ শতকীয় সময় ও পরিসরে বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো প্রথম পর্বের উপন্যাসিকেরা ‘বাংলার ইতিহাস’, যা এতদিন প্রায় অলিখিত ও পাঠকসমাজের কাছে অদৃশ্য ছিল, তাকে নব্যগারতি রুচিবান-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-ভদ্রলোকের সামনে উপস্থাপনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের এক আত্মাভিমानी বাসনাও কি কাজ করেনি তাঁদের চেতনায়? ফলে, যে সময়ে তাঁরা লিখলেন এবং যে সময়কে নিয়ে লিখলেন তাতে মিশে গেল পুনর্জাগরণের ও নির্মাণের মিলিত দায়িত্ববোধ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একইভাবে এক ভিন্ন সময় ও পরিসরে দাঁড়িয়ে অপর তথা বহু পুরনো ইতিহাস-অশ্লীভূত এক সময় ও পরিসরকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু, উদ্দেশ্য বোধহয় রমেশচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো হতগৌরব পুনরুদ্ধার নয় বরং পুনর্মূল্যায়ণ এবং এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের সংকটের দ্বন্দ্বিক বিচার। নবাবুণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ কিংবা ‘হারবার্ট’-এও সময়ের সঙ্গে পরিসরের এই মিলিত যাত্রা। মহাশ্বেতা দেবীর একাধিক রাজনৈতিক উপন্যাস, ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঁও-র জীবন ও মৃত্যু’ ইত্যাদি উপন্যাসেও এই ক্রনোটোপ বিচার্য। অভিজিৎ সেনের ‘রক্ত চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসকে সময় ও পরিসরের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে না জড়িয়ে পাঠ করা অসম্ভব। পাঠবিচারের সময় এই সময়ের অতীত-বর্তমানের দ্বন্দ্বকে লেখক ও পাঠক উভয়েই কীভাবে বিবেচনা করেন, তার সঙ্গে উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনও জড়িত। উপন্যাসের সঙ্গে তৎকালীন ও

সমসাময়িক বাস্তবতার ‘dialogic’ সম্পর্ক রয়েছে। বাখতিন তাঁর ‘Epic and Novel’ গ্রন্থে এই দ্বিরালাপকে খুঁজতে চাইছেন উপন্যাসের নির্মাণে,

The present... demands continuation, it moves into the future, and the more actively and consciously it moves into the future the more tangible and indispensable its inconclusiveness becomes. Therefore, when the present becomes the centre of human orientation in time and in the world, time and world lose their completeness as a whole as well as in each of their parts. (Bakhtin 1981, 19)

উপন্যাসের আখ্যানে এবং উপন্যাসের ভেতরে প্রবাহিত ক্রমপর্যায়িত বহু-আখ্যানে সময় ও পরিসরকে নিজের মতো ক’রে নির্মাণ করে নেন লেখক। ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’ উপন্যাসে কখনসূত্র একমুখী থাকে কিন্তু সময়ের বিপর্যয় ঘটতে থাকে অন্যতম প্রধান কুশীলব ওসমানের চেতনাসূত্রে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে দু’দশক আগে শহীদ বিনু স্বপ্নের মাধ্যমে হারবার্টের কাছে ফিরে আসে। আর, এই ফিরে আসা বা সময়ের বিপর্যয় না ঘটলে হারবার্টের উত্তরণ ঘটত না। বিনুর স্মৃতি, বিনুর ‘ভূত’ যদি স্বপ্নাদেশ না দিত, তাহলে সত্তর দশকের সঙ্গে ‘আশ্চর্য ডিটেনশন’ সম্ভব হত না ১৯৯২ সালের ২৫শে মে-র। আর, ওই দিনটি অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, যেদিন হারবার্ট সরকার আত্মহত্যা করে (পরে ‘মৃত মানববোমা’), সেই দিনটাই ছিল ১৯৬৭ সালে কৃষক অভ্যুত্থানের দিন। আখ্যানের পর্বভাগেও এই সময়ের বিপর্যয় ত্রিাশীল থাকে, তাই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় অন্তিমের ইঙ্গিতবাহী, কিন্তু মধ্যভাগের অধ্যায়গুলিতে হারবার্ট ও তার পারিপার্শ্বিকের বিস্তার। সময় ও স্থানের অদ্ভুত সংযোগে হারবার্ট ভালবেসে ফেলে দোকানে সাজানো নীলপরিকে, তার স্মৃতিপাঠে ‘ফল্ অব বার্লিন’-এর নগ্ন যুবতীর দ্রুত দৌড়। হারবার্টকে মাপতে পারেনি রাষ্ট্র, হৃদিশ পায়নি তার তোষকের নিচে রেখে যাওয়া বিনুদের ডিনামাইটের। কোনও যুক্তিকৌশল, কোনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের, সময়ের সঙ্গে স্থানের

এবং ভূতের সঙ্গে জীবিতের অব্যাখ্যাত যোগসাজশে তৈরি হওয়া বিস্ফোরণ সম্ভাবনার আঁচ পায়না। আর, হারবার্টের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের পরিণতিও জুড়ে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা থাকবে।

¹ “Ananandamath in many ways a reflection of what the author’s attitude was towards his own past in relation to the west enigmatic and complex.”-

তনিকা সরকার, সূত্র- আনন্দ ভট্টাচার্য, ‘বঙ্কিমচন্দ্র, ‘আনন্দমঠ’ ও ‘বন্দে মাতরম্’’, দেশ পত্রিকা, ১৭ জুন ২০১৯

² পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’, পৃ- ৫১-৫২, সূত্র- ‘আনন্দমঠ’, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৫ সাল, ভূমিকা

³ রজতকান্ত রায় বলছেন যে, বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা ইতিহাসাশ্রিত এবং ‘উপন্যাস হলেও বঙ্কিমের বর্ণনার প্রত্যেক কথার দলিল-প্রমাণ আছে।’ গ্রামের নাম বা চরিত্রের নাম কাল্পনিক হলেও, বাংলার তৎকালীন অরাজকতা হান্টারপ্রদত্ত তথ্যাদির অনুরূপ, বিশেষতঃ পূর্ণিয়ার বিবরণ। রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ- ২৭০-৪

⁴ Gyan Prakash, ‘Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography’, *Comparative Studies in Society and History* , Apr., 1990, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1990), pp. 383-408

⁵ রতন লাল চক্রবর্তী, ‘ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০)’, *বাংলাদেশঃ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ (১৭৬৩-১৯৫০)*, সম্পা. মুনতাসীর মামুন, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ- ৪৭-৪৮

⁶ মোহাম্মদ খান আফজল, *মহাস্থান গড়ের ইতিহাস*, প্রকাশক- মকবুলার রহমান খন্দকার, বগুড়া, ১৯৭৯, পৃ- ৩৯-৪০

⁷ Suniti Kumar Chatterjee, ‘The Eighteenth Century in India’, *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume*, Ed. By Muhammad Emanul Haque, Dacca, 1966, p. 126

⁸ রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা, ১৯৬০, ২৮৩-৪

⁹ Asit Nath Chandra, *The Sannyasi Rebellion*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1977, p- 43

¹⁰ রতনলাল চক্রবর্তী, ‘ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০)’, পৃ- ৫৫

¹¹ Bhattacharya, Ananda, ‘Reconsidering the Sannyasi Rebellion’, *Social Scientist* Vol. 40 No. 3/4 March-April 2012, p- 93

¹² Ibid. p- 97-8

¹³ রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, পৃ- ২৮৫-৭

¹⁴ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, পৃষ্ঠা- ১০৮, ১১১

¹⁵ শিক্ষার গুমোর এহেন ভদ্রলোক হিন্দু উচ্চবর্গের অন্যতম পরিচয়জ্ঞাপক। ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামো এদের সামাজিক ক্ষমতা প্রদান করেছিল। Tithi Bhattacharya, *The Sentinels of Culture Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85)*, Oxford University Press, Oxford, 2005, 39, pp. 73-74

¹⁶ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ- ৪১-৪২

¹⁷ মহিলাদের ভাগ করেন তিনি মোটা দুই দাগে। ১ নম্বর ভালো এবং মহা ভালো, ২ নম্বর খারাপ এবং ভীষণ খারাপ... যারা নিজেদের মনোজগৎ ও আবেগের আস্থানে সাড়া দেয় তারা হয় খারাপ মেয়েছেলে (ইলিয়াস ১৯৯৭, ৪১)

¹⁸ Shashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1969, pp. 164-67

¹⁹ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৫২ সাল, পৃ- ২৪-২৫

-
- ²⁰ মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী-প্রভাব*, র‌্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ- ৬৯-৭০।
- ²¹ Richard Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760*, University Of California, 1993, p. 71
- ²² মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী-প্রভাব*, পৃ- ৬৫-৭০
- ²³ রতনলাল চক্রবর্তী, ‘ফকীর-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’, পৃ- ৪৮
- ²⁴ রমা চৌধুরী, *বেদান্ত ও সুফী দর্শন*, প্রাচ্য বাণীমন্দির, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ- ১৪৬-৪৯
- ²⁵ Ipshta Chanda, *The Journey of the Namah: A Case Study*, CAS, Comparative Literature, Jadavpur University, March 2011, pp. 43-44
- ²⁶ ইতিহাসের চেরাগ আলি এবং ‘খোয়াবনামা’-র চেরাগ আলি একই ব্যক্তি নন নিশ্চিতভাবেই। কালপর্ব ও অন্ধের হিসেব মেলে না। কিন্তু, ইলিয়াস এই নামটিকেই গ্রহণ করছেন পাওনা-শোলোকের প্রতিগ্রাহক হিসেবে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের তাৎপর্য ও সুফীর বহমানতা স্পষ্ট করার জন্য। ইতিহাস-আখ্যান-মিথ এক যোগসূত্র নির্মাণের জন্য।
- ²⁷ চেরাগ আলির কথায় যে মিথ্ আসে, তা হচ্ছে, ‘গোরা নাসারাদের’ বিরুদ্ধে মাদারি ফকিরদের ঘোড়ায় চড়ে লড়াইয়ের ইতিহাস এবং গোরাদের কাছে পরাজয়ের পরে ফকিরদের গোরস্থান থেকে কোনও মাদারি ফকিরের দেওয়া অভিশাপের ভূমিকম্পে শান্ত যমুনা খাল পাড়-ভাঙ্গানিয়া নদীতে পরিণত হয় (২৮)। ঘোড়া, ফকির, ভূমিকম্প এবং নদীর এই মুখফেরতা মিথ্ ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তেও রয়েছে আনোয়ার ও গাজীর সংলাপে।
- ²⁸ রমা চৌধুরী, *বেদান্ত ও সুফী দর্শন*, পৃ- ১২১
- ²⁹ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী-প্রভাব*, পৃ- ১১৭
- ³⁰ তদেব, পৃ- ১১৭-১২০
- ³¹ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভারতীয় দর্শন মহাসভায় সভাপতির ভাষণ’, ১৯২৫
- ³² রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তপোবন’, প্রবাসী পত্রিকা, পৌষ ১৩১৬

³³ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী-প্রভাব*, ১৪২-৪৩

³⁴ Islamic institutions proved sufficiently flexible to accommodate the non-Brahmanized religious culture of premodern Bengal. On the other, the religious traditions already present in eastern Bengal made accommodations with the amalgam of rites, rituals, and beliefs that were associated with the village mosques and shrines then proliferating in their midst. Richard Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760*, pp- 157.

³⁵ Ibid. pp. 77-78

³⁶ ‘বিরথাল রচয়িথাল সঙ্ঘম’ নামক সাংস্কৃতিক গণ-সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় নকশালবাড়ি আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শে। অভ্যুদয় রচয়িথাল সঙ্ঘম বা তেলুগু প্রগতিশীল সাহিত্যসভার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তিত রূপ বিরাসম। শ্রী শ্রী, চেরাবাড়া রাজু, গদর সহ কবি-সাহিত্যিকরা এর প্রতিষ্ঠাতা।

³⁷ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘স্বপ্নরাজ্যের সন্ধানেঃ প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য ধর্ম ও রাজনীতি’, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৩৫৪-৩৬২।

³⁸ সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ- ১৪-১৫

³⁹ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ‘খোয়াবনামাঃ সুফি ও বেদান্ত দর্শন এবং নিম্নবর্গের প্রতিস্পর্শী স্বর’, *ঐতিহ্য- দ্য হেরিটেজ*, সম্পা. নন্দিতা ভট্টাচার্য গোস্বামী, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২, ২০২২, পৃ- ১১৫-১৬

⁴⁰ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, পৃ- ৩৬০-২

⁴¹ সুকান্তিদা নির্মিত সুনীতিকুমার ঘোষের আদলে এবং পাঞ্চগলী নির্মিত কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে।

⁴² Georg Lukac, 'The Historical Novel', McKeon, Michael Ed. *The Theory of the Novel: A Historical Approach*, The John Hopkins University Press, Baltimore & London, 2000, 237

⁴³ Letter Written to Bishnu Basu about Elias' novel *Khowabnama*, 30th October 1994, Subhoranjan Dasgupta, *Elegy and Dream*, University Press Limited, Dhaka, 2018, p. 118

⁴⁴ Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge University Press, New York, 2000, pp. 5-6

⁴⁵ অরুণ সেন, *দুই বাঙালি এক বাঙালি*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৬, পৃ- ২২-৩, "কিন্তু শুধু দোষারোপ করলেই চলে না [মুসলমান সাহিত্যিকদের], মুসলমান সাহিত্যসেবীরা সেখানে শনাক্ত করেছিলেন "হিন্দুয়ানি'র ছোঁয়াচ", ভাষার ব্যাপারে একধরনের আধিপত্য"

⁴⁶ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, পৃ- ৮৬

⁴⁷ 'মনিয়া বুলবুলি আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমীদান, আড়িমুড়ি কানন ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ'- বাবুদের সংজ্ঞায়নে সেকেলে কলকাতার প্রসিদ্ধ ছড়া।

⁴⁸ সত্রাজিৎ গোস্বামী, নবাবগণি ভাষা অথবা ফ্যাতাডুভাষ্যঃ একটি নড়বড়ে প্রতিবেদন, অক্ষরেখা পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ১০২-১১৪

⁴⁹ বাবুদের প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের গস্ত ও দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ, *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, সম্পা. অরুণ নাগ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ১৭

⁵⁰ বঙ্কিমচন্দ্রও চুনিলালের মতোই মনে করতেন যে, প্যারীচাঁদের শৈলীর সার্থক অনুকরণ করেছেন হুতোম, "For Kali Prosunno Singh, or 'Hutam', was one of the most successful writers in the style first introduced by Tekchand." *প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী*, সম্পাদনা অলোক রায়, সোপান, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ১৪-৫

-
- ⁵¹ অরুণ নাগ, *সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা*, ভূমিকা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ- ১৭
- ⁵² তদেব, *টীকা অংশ*, পৃ- ১৮০
- ⁵³ মন্থনাথ ঘোষ, *মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ*, মুদ্রক ও প্রকাশক প্রিয়নাথ দাস, কলকাতা, ১৯১৪
- ⁵⁴ Tithi Bhattacharya, *The Sentinels of Culture Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85)*, Oxford University Press, Oxford, 2005 208-10
- ⁵⁵ তদেব, ২০৮
- ⁵⁶ *সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা*, ২০১২, পৃ- ৮৯-র টীকা ও ‘রামলীলা’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
- ⁵⁷ তিথি ভট্টাচার্য, *দ্য সেন্টিনেলস অব কালচার*, পৃ- ২১৭
- ⁵⁸ সত্রাজিৎ গোস্বামী, নবাবগণি ভাষা অথবা ফ্যাতাডুভাষ্যঃ একটি নড়বড়ে প্রতিবেদন, পৃ- ১০২-১১৪
- ⁵⁹ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, পৃ- ১০৭।
- ⁶⁰ হানা ক্যাথেরিন ম্যুলেস, ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’, প্রথম প্রকাশ ব্রিটিশ মিশনারি কর্তৃক, ১৮৫২, PDF, নামকরণের বিষয় অংশটি দ্রষ্টব্য। নামকরণে ৬টি সূত্র খুঁজে পেয়েছেন তিনি।
- ⁶¹ Sisir Kumar Das, *A History of Indian Literature 1800-1910 Western Impact: Indian Response*, Sahitya Akademi, 2012, pp. 32-39
- ⁶² বিনয় ঘোষ, ‘জনসভার সাহিত্য’, *বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২ সাল, পৃ- ১৫২-১৫৮
- ⁶³ *বটতলার বই*, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ১৩-৪
- ⁶⁴ ‘বাজার’-এর উত্থানে বটতলার ভূমিকা, অদ্রীশ বিশ্বাস, *বটতলার বই ১ম খণ্ড*, পৃ- ১৭-২০
- ⁶⁵ “কেউ একটা বই লিখলে তাকে নস্যাৎ করে অন্য কেউ আর একটা বই লিখলেন। তাকে নস্যাৎ করে আরেকজন। জবাব দিলেন প্রথমজন। এভাবেই একটা সোস্যাল স্পেস তৈরি

হয়েছিল, যা মেইনস্ট্রিমের সাহিত্যে গণতান্ত্রিকভাবে ছিল না। জনপ্রিয় সাহিত্য চায় জনবিতর্ক, জনরোল, জনতরঙ্গ।”- অদ্রীশ বিশ্বাস, তদেব, পৃ- ২৪

⁶⁶ প্রচ্ছদের ক্যাচলাইন- ‘স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল/ পতি হয় পায়ের তল’, প্রচ্ছদে আঁকা উলঙ্গিনী নারীর ছবি।

⁶⁷ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘বটতলার বইগুলো’, সমকালীন পত্রিকা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭৫, কলকাতা, ৮৯-১০১

⁶⁸ নবারণ ভট্টাচার্য, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ৫৬-৭

⁶⁹ অরুণ সেন, *দুই বাঙালি, এক বাঙালি*, ১৩-৪

⁷⁰ “A Khansaman, or a Sirkar, talking to an European, generally intermixes his language with words derived from the Arabic or Persian, and some few corrupted English and Portuguese words: examples of this, in several varieties, occupy the first thirteen pages of the following work. From the thirteenth to the nineteenth page are instances of the grave stile.”- W. W. Carey, *Dialogues intended to facilitate the acquiring of Bengalee Language*, 3rd Edition, The Mission Press, Calcutta, 1818, Preface

⁷¹ Tithi Bhattacharya, *The Sentinels of Culture*, p. 197

⁷² সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, পৃ- ৭৭-৯

⁷³ সূত্র- ফাদার দ্যতিয়েন সম্পাদিত *কেরির ইতিহাসমালা*, গাঙ্চিল, কলকাতা, ২০১১

⁷⁴ শক্তিব্রত ঘোষ, *উইলিয়াম কেরীঃ সাহিত্য ও সাধনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ- ২৮৮-

৩০৩

⁷⁵ প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, *টীকা টিপ্পনী*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ৯৭-৯৮

⁷⁶ অম্লান দত্ত, ‘উনিশ শতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা’, ‘জিঙাসা’ সংকলন, সম্পা- শিবনারায়ণ রায়, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ- ৭১-৭২

⁷⁷ বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮, বুকক্লাব, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০০০, পৃ- ১৫১-৮।

⁷⁸ অম্লান দত্ত, ‘উনিশ শতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা’, পৃ- ৭৭

⁷⁹ বিনয় ঘোষ যে তালিকা দিচ্ছেন ১৮৯৩-৯৯ অবধি বাংলা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এঁরা প্রত্যেকেই হয় কুলীন ব্রাহ্মণ, নয়তো উচ্চকুলীন বৈদ্য ও উচ্চকুলীন কায়স্থ। একমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগ জেলা বোর্ডে রয়েছেন মৌলবী সিরাজ-উল-ইসলাম। সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃ- ১৭৯।

⁸⁰ তদেব, পৃ- ১৬০-২। ১৮৭১ সালের পরিসংখ্যান উল্লেখ করছেন বিনয় ঘোষ।

⁸¹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ২১৩

⁸² জয়া চ্যাটার্জি, ‘The construction of bhadralok communal identity’, *Bengal Divided*, পৃ- ১৮২-৩

⁸³ তদেব, পৃ- ১৮৭-৮

⁸⁴ কলকাতা শহরে দেখা যায় বাড়িওয়ালারা আজও অনেকে সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনলে বাড়ি ভাড়া দিতে চান না... অনেক বাড়িওয়ালাকে দেখেছি সাহিত্যিক ও উকিলের নাম শুনে জবাব দিতেঃ ‘ভাড়া দেব না।’ এটা কি সাহিত্যিকের সামাজিক মর্যাদার পরিচয়? যেকোনো সামাজিক সভায় বাড়িওয়ালা গাড়িওয়ালারা যে মর্যাদা পান, সাহিত্যিকেরা তার কিছুই পাননা- বিনয় ঘোষ, *জনসভায় সাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২ সাল, পৃ- ১২৭-৮

⁸⁵ তদেব, পৃ- ১৩৫

⁸⁶ ‘At Rs, 21.2 crore, book fair sales jump by 15% this year’, Times of India, February 12, 2019

⁸⁷ মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, ‘লেখক সম্মানী নিয়ে কিছু কথা’, বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকা, ১৮ই নভেম্বর, ২০১৮।

⁸⁸ The company [Penguin Random House] has sought a nod from the Foreign Investment Promotion Board to acquire 45 per cent stake owned by its Indian partner. It plans to invest Rs 55 crore for this stake buy. This move comes after Pearson Inc-owned Penguin completed its merger with Germany-based Bertelsmann’s Random House in July this year [2013], emerging as the biggest book publisher in the world.- Ambwani Meenakshi Verma, The Hindu Business Line, September 18, 2013

⁸⁹ ‘নেয়ারের খাট, মেহগিনি পালঙ্ক ও একটি দুটি সন্ধ্যা’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৮, পুনর্মুদ্রণ ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকা, সম্পা. আফিফ ফুয়াদ, সপ্তদশ বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯, কলকাতা

⁹⁰ শাহাদুজ্জামান, *একজন কমলালেবু*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭

⁹¹ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সহ অনেকেই আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন এবং তাদের পুজোসংখ্যার নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই ধারা এখনও চলছে।

⁹² এম সি সরকার ও মিত্র ও ঘোষ নামে দু’টি নামী প্রকাশনা সংস্থার উল্লেখ করছেন। অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থার সাহিত্যবৃত্তেরও উল্লেখ রয়েছে। বাদল বসু, *‘পিওন থেকে প্রকাশক’*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, PDF

⁹³ বাদল বসু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরও বেশ কয়েকজন সাহিত্যিকের উল্লেখ করছেন, যাঁরা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

- ⁹⁴ বাংলা ১২৮২ সনের ৮ই মাঘ, ২১শে ফাল্গুন এবং ১২৯৩ সনের ১৫ই জৈষ্ঠও তারিখে প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। সূত্র- শিপ্রা লাহিড়ী, *ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা-সাহিত্য*, কবি ও কবিতা প্রকাশন, কলকাতা, অগাস্ট ১৯৬৩, পৃ- ১৪৭-৪৮
- ⁹⁵ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ*, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, চুচুড়া, ১৩২৭ সাল, পৃ- ৬৬-৬৭
- ⁹⁶ ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ' গ্রন্থ শুরু হয় মনুর উদ্ধৃতি দিয়ে এবং 'স্বজাতীয় পরম পবিত্র শাস্ত্রের মহত্ত্ব উপলক্ষিত' স্বার্থে প্রবন্ধগুলি লিখিত, তা ভূমিকায় উল্লেখ করেন।
- ⁹⁷ প্রমথনাথ বিশী, 'ভূমিকা- ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সংস্কারবাদী ও সংস্কারক', *ভূদেব-রচনাসম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পা. মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ সাল, ভূমিকা, পৃ- ২৬
- ⁹⁸ 'কুলীন ব্রাহ্মণ ও অভাগিনী কুলীন-কুমারী' অংশ দ্রষ্টব্য, *দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য*, সম্পা. অর্ণব সাহা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ- ৩২১-৩
- ⁹⁹ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, হুগলি, ১৩০২ সাল, সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ- ৩২-৪০
- ¹⁰⁰ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *অঙ্গুরীয় বিনিময়*, প্রথম প্রকাশের বিজ্ঞাপন, ১৮৫৭, *ভূদেব রচনাসম্ভার*, সম্পা. প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃ- ২৫৮
- ¹⁰¹ তদেব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভূদেবের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হজসন্ প্রাট সাহেব দ্বারা অনুমোদিত ছিল।
- ¹⁰² তদেব, পৃ- ২৯২-৯৩
- ¹⁰³ প্রমথনাথ বিশী, 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঃ সংস্কারবাদী ও সংস্কারক', *ভূদেব-রচনাসম্ভার*, ভূমিকা, পৃ- ২৪
- ¹⁰⁴ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সম্ভান*, পৃ- ৮২

¹⁰⁵ জয়া চ্যাটার্জির মতে, এই ‘পলাশীর যুদ্ধ’ ট্রাজিক-কাব্যে মুসলমান শাসকদের ধ্বংসকারী, হত্যাকারী ও ধর্ষক হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সিরাজদৌল্লাকে লম্পট, মদ্যপ ও যুদ্ধভীত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর, এই বর্ণনাগুলোই মুসলমানবিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদ নির্মাণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ‘The construction of bhadralok communal identity’, *Bengal Divided*, pp- 180-1

¹⁰⁶ ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ- ৫৬-৮

¹⁰⁷ ভারতে সমস্ত যাযাবর সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬০ মিলিয়ন এবং প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এঁদের উপস্থিতি। Krätli, S. and Dyer, C. ‘Mobile Pastoralism and Education: Strategic options International Institute for Environment Development’, *Education for Nomads Working Papers 1*, UK: IIED, October 2009

¹⁰⁸ অনিতা শর্মা তাঁর গবেষণাপত্রে যাযাবর গোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও ভাগগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (পৃ- ১১) ভারতীয় যাযাবরদের তালিকা অনুযায়ী বাজিকর সম্প্রদায় মূলতঃ ওড়িশা রাজ্যকে কেন্দ্র করে থাকেন এবং তাঁরা তফশিলি জাতি (SC) তালিকার অন্তর্ভুক্ত। Anita Sharma, ‘South Asian Nomads- A Literature Review’, January 2011, p. 75

¹⁰⁹ প্রসূন ঘোষ, ‘অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পঃ একটি বিশ্লেষণ’, জনপদ প্রয়াস অভিজিৎ সেন সংখ্যা, সম্পা. বিকাশ শীল, বইমেলা, ২০০৬, পৃ- ১২৩

¹¹⁰ অভিজিৎ সেন, ‘গল্প বিষয়ে ভাবনা চিন্তা’, উত্তরাধিকার পত্রিকা, বাংলা গল্প সংখ্যা, ১৯৯৬, পৃ- ২৫

¹¹¹ Atis Dasgupta, 'Some Aspects of the Santal Rebellion of 1855-56', *Social Scientist*, Vol. 41, No. 9/10 (September-October 2013), pp. 69-74

¹¹² সালমার আক্ষেপ- বাজিকর কখনো জাত যাযাবর নয়। জাত যাযাবর হল বানজারা। বাজিকরের ঘর-গেরস্থালির সঙ্গে সম্পর্ক করার একটা প্রবণতা সবসময়েই থাকে। অভিজিৎ সেন, *রহ চণ্ডালের হাড়*, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৩৫

¹¹³ অভিজিৎ সেন, *রহ চণ্ডালের হাড়*, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৪৪

¹¹⁴ Economic conditions had first transformed the mass of the people of the country into workers. The combination of capital has created for this mass a common situation, common interests. This mass is thus already a class as against capital, but not yet for itself. In the struggle, of which we have noted only a few phases, this mass becomes united, and constitutes itself as a class for itself. The interests it defends become class interests.- Marx Karl, *The Poverty of Philosophy, Chapter Two: The Metaphysics of Political Economy*, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-philosophy/ch02.htm>

¹¹⁵ অভিজিৎ সেন, *রহ চণ্ডালের হাড়*, পৃ- ৮১

¹¹⁶ English rulers had their rights on the poor tribe's cultivated land and wild trees. Tribal people, children, women, old men were greatly tortured by the British. Sardar inhabited their lands on the hill and they too fought with the English Government to protect their lands. The mountains were inhabited by the landlords and they used to keep the British people happy in return for money. Tilka Majhi, Ambedkaritoday.com

¹¹⁷ রাজমহল-ভাগলপুর অঞ্চলে ক্লিভল্যান্ড পাহাড়িয়া ও মূলবাসী সাঁওতালদের জন্যে উপনিবেশ গড়ে তোলেন। পাহাড়ে ঘেরা, জঙ্গলপূর্ণ এই অঞ্চলের নামই দামিন-ই-কোহ, বর্তমানের সাঁওতাল পরগণা, ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ- ৮-১২

¹¹⁸ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিলকৌ মাঝি ও তাঁর সাঁওতাল মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা, তদেব, পৃ- ১০-১২

¹¹⁹ McMurray R George, 'Reality and Myth in Garcí a Márquez' "Cien años de soledad", The Bulletin of the Rocky Mountain Modern Language Association , Dec., 1969, Vol. 23, No. 4 (Dec., 1969), pp. 175-181

¹²⁰ রত্ন চণ্ডালের হাড়, প্রথম অধ্যায়। প্রজন্মান্তরে এই গল্পগুলো বাজিকরদের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। লুবিনি শারিবাকে আখ্যান বলে আর, এই শারিবার উত্তরণ দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়।

¹²¹ অভিজিৎ সেন, 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', *মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি*, ভাষাবন্ধন, ২০১৩, পৃ- ১৪৫

¹²² Nivedita Majumdar, *The World in a grain of sand: Postcolonial literature and Radical universalism*, Verso, London New York, 2021, pp. 145-150

¹²³ Milind Bokil, 'De-Notified and Nomadic Tribes: A perspective', Economic and Political Weekly, 2002. Jstor

¹²⁴ Bahar Dutt, 'Livelihood Strategies of a Nomadic Hunting Community of Eastern Rajasthan', Nomadic Peoples, 2004, New Series, Vol. 8, No. 2, Special Issue: Whither South Asian Pastoralism? (2004), pp. 260-273, Jstor

¹²⁵ অভিজিৎ সেন, 'কি লিখি, কেন লিখি', কোরক শারদীয়া, সম্পা. তাপস ভৌমিক, ১৩৯৭, পৃ- ৬১

¹²⁶ বি এন লোকুর ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসচিব ছিলেন। তাঁর অধীনে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যে অস্তিত্ববান তফশিলি বর্ণ ও জাতির তালিকা নবীকরণ করা হয়। ruralindiaonline.org

¹²⁷ অভিজিৎ সেন, *রহ চণ্ডালের হাড়*, পৃ- ২০৭-২২২, বাজিকরদের তরুণ ওমরের সঙ্গে নমঃশূদ্রপাড়ার মালতী পালিয়ে বিয়ে করে। ফলে, নমঃশূদ্র দিগরদের প্রধান ভায়রোর রোষে বাজিকরদের ঘরবাড়ি তছনছ হয় এবং পরে ওমর খুন হয়, সম্মানরক্ষার্থে খুন (Honor Killing)। ভায়রোর সমাজ ছিল ‘জলচল’ তথা অন্ত্যজ হিন্দু।

¹²⁸ ‘The Report of the Advisory committee on the Revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes’, Govt. of India, Department of Social Security, 1965, pp- 42-61

¹²⁹ Ibid. p. 43

¹³⁰ রূপা এবং ইয়াসিন যথাক্রমে হিন্দু অনুশীলন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে তাদের কথোপকথনে বোঝা যাত যে, প্রথাগত ধর্মান্তরণের তাদের আত্মসমর্পণের পাশাপাশি বহুযুগের অস্বীকৃত পরিচিতির বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার দায়ও থাকে। শারিবার বাজিকর আত্মপরিচয়ের গর্বেও এই অস্বীকৃতির অভিমান থাকে।

¹³¹ অভিজিৎ সেন, *রহ চণ্ডালের হাড়*, অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫

¹³² Milind Bokil, ‘De-Notified and Nomadic Tribes: A perspective’, p. 150

¹³³ Bahar Dutt, *Livelihood Strategies of a Nomadic Hunting Community*, p. 269

¹³⁴ In the subculture the connection between actual belief in the superstition and its persistence in folk literature is closer. In the true "primitive" culture (though one without acculturation from neighbor or

colonial is nowadays hard to find) folk literature is probably a more integral part of the isolated ethnic pattern; it reflects reality and integral wish rather than cultural lag in a way which it cannot in our "alienated" modern societies- Francis Lee Utley, 'An Operational Definition', The Journal of American Folklore, Vol. 74, No. 293 (Jul. - Sep., 1961), pp. 193-206

¹³⁵ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ইতিহাস, 'মিথ ও বাস্তবতার সংলাপঃ কয়েকটি আখ্যানের তুলনামূলক পাঠ', এবং প্রান্তিক, সম্পা. সৌরভ বর্মণ, বর্ষ ৯ সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর ২০২২, কলকাতা, ২৪৭-২৫৭

¹³⁶ কিন্তু দারোগা এত সহজে ভয় পেল না। সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা তার এবং যথার্থই ক্ষিপ্ত সে। পৃ- ৮০

¹³⁷ ২০০৪ সালে মণিপুরে মনোরমা থাংজামকে ধর্ষণ ও খুন করে ভ্রতীয় সেনাবাহিনীর আসাম রাইফেলস্ বিভাগ। AFSPA আইনের বিরুদ্ধে এবং ওই ধর্ষণের বিরুদ্ধে 'Indian Army Rape Us' লেখা ব্যানার নিয়ে নিরাবরণ হয়ে বিক্ষোভ করেন মণিপুরের কয়েকজন নারী।

¹³⁸ 'ক্যালকাটা রিভিউ', ১৮৫৬, ২৪০-৪১। সূত্র- ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ- ৩৭

¹³⁹ সুনীতি কুমার ঘোষ, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ২০০১, পৃ- ১২৮

¹⁴⁰ স্বপন বসু, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)', বাংলাদেশঃ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ (১৭৬৩-১৯৫০), মুনতাসীর মামুন সম্পা. কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ- ২৭০-১।

¹⁴¹ মহাশ্বেতা দেবী, অরণ্যের অধিকার, পৃ- ৬৩

¹⁴² "মেডিক্যাল স্কুলের ছেলে। তরুণ বাঙ্গালী ডাক্তার অমূল্যবাবু" অরণ্যের অধিকার, পৃ- ৯২

¹⁴³ অ্যান্ডারসনের মনে হয় বিরসার বিদ্রোহের খবরগুলো কলকাতায় ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, ‘দি বেঙ্গলী’ ও ‘দি হিন্দু পেট্রিঅট’ কাগজে ওই পাঠায়। (পৃ- ২১), জেকবকে সাহায্য করার কথা পৃ- ২৩-৪

¹⁴⁴ তদেব, পৃ- ৬৬

¹⁴⁵ মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ সাল, পৃ- ২১৫-৬

¹⁴⁶ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ- ১৩

¹⁴⁷ তদেব, পৃ- ১৬১

¹⁴⁸ José Manuel Losada Goya, ‘The Subversive Triad: A Theoretical Approach’, *Myth and Subversion in the Contemporary Novel*, Edited by José Manuel Losada Goya and Marta Guirao Ochoa, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2012, pp. 4-12

¹⁴⁹ “In addition, there are in the colonial societies sub-class loyalties arising out of primordial communal/tribal/caste ties, as well as supra-class loyalties arising out of the process of anti-imperialist struggle. Perhaps the outcome is a class of "low classness", and the boundaries are fuzzy.” Sabyasachi Bhattacharya, 'History from Below', *Social Scientist*, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1983), pp. 3-20

¹⁵⁰ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ‘ইতিহাস, মিথ ও বাস্তবতার সংলাপ’, এবং প্রান্তিক, পৃ- ২৫৫-৫৬

¹⁵¹ অভিজিৎ সেন, *রহু চণ্ডালের হাড়*, পৃ- ৭০-২ এবং ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, পৃ- ৭৬-৮০

¹⁵² অভিজিৎ সেন, তদেব, পৃ- ৮৪-৫

¹⁵³ প্রবাসী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৩৩

- ¹⁵⁴ আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ- ৫১
- ¹⁵⁵ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মধ্যবিত্ত*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ- ১৬৬-১৬৮
- ¹⁵⁶ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যসাধক চরিতমালাঃ মীর মোশারফ হোসেন*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫০ সাল, পৃ- ৪৮
- ¹⁵⁷ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’-র অপু কর্ণের কথা মনে করে, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্ণকে নিয়ে কাব্যনাট্য লেখেন। মহাভারতের পাণ্ডব নায়কদের থেকেও এঁরাই বাঙালির বেশি আপন।
- ¹⁵⁸ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, প্রাগুক্ত
- ¹⁵⁹ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, ‘ঘোড়া, ইসলাম এবং সুফি-পির সংস্কৃতি’, *অশ্বনামাঃ সংস্কৃতির ঘোড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৬০
- ¹⁶⁰ ধর্মঠাকুর প্রধানতঃ নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের (ডোম, বাগদী প্রভৃতি) উপাস্য। শস্য উৎপাদন ও প্রজননকে কেন্দ্র করে ধর্মঠাকুরের মিথ আবর্তিত হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্য তাঁরই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে রচিত, তাঁরই পূজা করে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে পান। কাঠের ও মাটির ঘোড়া তাঁর পূজার অন্যতম সামগ্রী। বীরভূমের বহু গ্রামে ধর্মঠাকুরের পুজোয় সিংহাসনে রাখা হয় মাটির ঘোড়া।
- ¹⁶¹ Kelsey, Darren, ‘The Myth of the City Trickster: Storytelling’, Bankers and Ideology in the Mail Online, Journal Of Political Ideologies, Vol. 19 Issue. 3, 2014, pp. 307-330.
- ¹⁶² আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, চারুলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ- ৮১
- ¹⁶³ Sisir Kumar Das, *A History of indian Literature 1800-1910: Western Impact: Indian Response*, Sahitya Akademi, 2012, pp. 25-28

-
- ¹⁶⁴ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ৮১-৮৩
- ¹⁶⁵ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, 'বিভাজনের পটভূমি', *বিভাজনের পশ্চাৎপটঃ বঙ্গভঙ্গ*, রিডার্স লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৫-৬
- ¹⁶⁶ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলার সাহিত্য*, পৃ- ৮০-৯৫
- ¹⁶⁷ তদেব, পৃ- ১৪৮-৪৯
- ¹⁶⁸ তদেব, পৃ- ২০০-০১
- ¹⁶⁹ ১৮৬৩ সালে তিনি বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের মৌলিক বিরোধকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অথচ বিশ শতকের শুরুতে তিনিই দুই সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের ওপরে জোর দিয়ে ধর্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকলেন। পৃ- ২০১
- ¹⁷⁰ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, ১৫৫-১৫৬
- ¹⁷¹ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ- ২২৫
- ¹⁷² তদেব, পৃ- ৩২২
- ¹⁷³ নবনূর পত্রিকা, 'নবনূরের পুরস্কার-রচনা', ১৩১২
- ¹⁷⁴ *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, সম্পা. কমল চৌধুরী, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ- ৩১৯-২০
- ¹⁷⁵ *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ- ৩১৫-৭
- ¹⁷⁶ Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-* 47, p. 72
- ¹⁷⁷ Ibid. pp. 164-6
- ¹⁷⁸ প্রবাসী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৩৩

-
- ¹⁷⁹ জয়া চ্যাটার্জির মতে, এই উচ্চবর্ণীয় অবস্থানের কারণেই মুসলিম লিগ কৃষক-প্রজা পার্টিকে নিজেদের ক্ষমতালাভের স্বার্থের আওতায় আনতে চেয়েছিল, যাতে নিম্নবর্ণীয় মুসলমান কৃষকদের ভোট পাওয়া যায় পৃ-৮২
- ¹⁸⁰ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, ২৩৪
- ¹⁸¹ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃ- ৯৪-৭
- ¹⁸² আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ- ১৯৩-৯৪
- ¹⁸³ তদেব, পৃ- ১০৩-৫
- ¹⁸⁴ দীপঙ্কর রক্ষিত, *স্বাধীন বঙ্গের স্বপ্ন*, বিভাজনের পশ্চাৎপটঃ বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭, সম্পা. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২০৫
- ¹⁸⁵ আবুল মনসুর আহমদ কলকাতার দাঙ্গার বিবরণ দিতে গিয়ে নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দির উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করেছেন। নাজিমউদ্দিন সরাসরি বলেছিলেন যে, “আমাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে না, হিন্দুদের বিরুদ্ধে” এবং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি ইচ্ছাকৃত ছুটি ঘোষণা করেন ১৬ই অগাস্ট। তাঁদের কার্যক্রম কলকাতাবাসী হিন্দুদের আতঙ্কিত করেছিল। আর, ভয়াবহ দাঙ্গার পূর্বপ্রস্তুতি হিন্দু ও মুসলিম দুই পক্ষই সেরে ফেলেছিল উড়ো গুজব এবং মনগড়া যুক্তিকে কেন্দ্র করে। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ- ১৯৭-৯৮
- ¹⁸⁶ দীপঙ্কর রক্ষিত, *‘স্বাধীন বঙ্গের স্বপ্ন’*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২১৩-৫
- ¹⁸⁷ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, *জীবন রহস্য*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২
- ¹⁸⁸ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগঃ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, ১৪

¹⁸⁹ কেরামত আলি কুলসুমের মধ্যেও সেই ধর্ষিতা উদ্বাস্ত রমণীর অবয়ব দেখে। কালাম মাঝি কর্তৃক কুলসুমের ধর্ষণের সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে কেরামতের দা'য়ের কোপে কুলসুম ছিন্ন হলে কেরামত দৃষ্টিবিভ্রমে সেই রমণীকে দেখে।

¹⁹⁰ Ajaz Ashraf, The Ashis Nandy interview: 'People didn't have the moral sanction to kill even during the Partition', 10th August, 2017, <https://scroll.in/article/846679/>, accessed on 6th February, 2020

¹⁹¹ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১৯৬-৯৯

¹⁹² শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'বাংলার কথা', দেশ পত্রিকা, সম্পা. শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন, কলকাতা, ৩রা আশ্বিন ১৩৫৪, ৩০৯

¹⁹³ লন্ডনে ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বৈরীমূলক সম্প্রদায় ও দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতাকাঠামো ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। বঙ্গীয় প্রদেশিক আইনসভাকে ২৫০টি আসনে ভাগ ক'রে ১১৭টি আসন মুসলমান প্রার্থীদের দেওয়া হয় এবং সাধারণ আসন (হিন্দুরা যার দাবিদার হতে পারে) রাখা হয় ৭০টি, যার মধ্যে ১০টি আসন শোষিত শ্রেণির জন্যে সংরক্ষিত থাকে। সূত্র- জয়া চ্যাটার্জি, *বেঙ্গল ডিভাইডেড*, পৃ- ২০

¹⁹⁴ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, 'আম্বেদকর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ', ইতিহাসের আড্ডা, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২০, <https://www.itihasadadda.in/ambedkar/>, accessed on 10th december, 2020

¹⁹⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ২৯৭-৩০১

¹⁹⁶ গৌতম রায়, 'গোলাম সারওয়ার ও নোয়াখালির দাঙ্গা', *বিভাজনের পশ্চাৎপটঃ বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭*, পৃ- ২২৫-২৩০

¹⁹⁷ তদেব, পৃ- ২৩০

¹⁹⁸ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ২১৮

-
- ¹⁹⁹ গৌতম রায়, 'নোয়াখালির দাঙ্গা ও গোলাম সারওয়ার হোসেন', পৃ- ২৩৭
- ²⁰⁰ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ- ২২-২৮
- ²⁰¹ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন সমাজ, সম্পা- কমল চৌধুরী, পৃ- ৩১৮-৩২২
- ²⁰² তদেব, পৃ- ৩২০
- ²⁰³ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে বাইরে*, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ- ১৩৪-৫
- ²⁰⁴ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে বাইরে*, সন্দীপের আত্মকথা, পৃ-৯৭
- ²⁰⁵ তদেব, পৃ- ৯৭
- ²⁰⁶ তনিকা সরকার 'Tagore's The home and the world' প্রবন্ধে বিমলার চরিত্রে 'sexual metaphor'-র যথার্থ ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন, 'দেশমাতৃকা'র চিত্রকল্প ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের চিরাচরিত রূপক ভাঙতে চেয়েছেন। বিমলাও তাই ঘরের বাঁধন আর মাতৃস্নেহের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে।
- ²⁰⁷ 'সন্দীপের আত্মকথা' অধ্যায়, পৃ- ৯৫-১০৫
- ²⁰⁸ সন্দীপের নির্ধুর মনোবৃত্তি প্রতীয়মান হয়। এমনকি বিমলারও আত্মোপলব্ধি হয় যে, "আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁতেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।"
- ²⁰⁹ রবীন্দ্রনাথ নিজে যে মানবধর্ম ও সত্যে বিশ্বাসী, সেটাই বসে যায় মাস্টার মশায়ের চরিত্রে। "আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে" একথাই উপলব্ধি করেন ও করতে চান তিনি।
- ²¹⁰ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে বাইরে*, নিখিলেশের আত্মকথা, পৃ- ৯২-৩

²¹¹ Tanika Sarkar, “Many Faces of Love: Country, Woman, and God”, *R. Tagore’s The Home and the World, A Critical Companion*. Ed. Pradip Kumar Datta, Anthem Press, London, 2005, p- 39

²¹² প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘সর্ববিষয়ে স্বদেশি’, *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ- ২৮৭-৮

²¹³ প্রমথ চৌধুরী, ‘বয়কট এবং স্বদেশীয়তা’, *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ- ৩০৪-৬

²¹⁴ মৌলবি মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, ‘স্বদেশি আন্দোলন’, *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, পৃ- ৩৪২-৪

²¹⁵ ‘রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান’, নবনূর পত্রিকা, আষাঢ় ১৩১২

²¹⁶ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, পৃ- ৩৩

²¹⁷ তেভাগার প্রকৃতপ্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৪৬ সালের জুনে বঙ্গীয় প্রাদেশি কৃষকসভার মৌভোগ সম্মেলনে, যেখানে প্রধান প্রস্তাব ছিল ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ’। প্রস্তাবটির শেষে বক্তব্য ছিল- ‘এই সম্মেলন কৃষকদের নিকট এই রণসঙ্কেত দিতেছে, বাংলার প্রতিটি গ্রামে সমিতির মধ্যে সব কৃষক জোট বাঁধিয়া জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও’। তেভাগা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিপূরণের আন্দোলন ছিল না বরং সামন্ততন্ত্র-জমিদারপ্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ছিল। ১৯৪৬-র সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়।

²¹⁸ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, পৃ- ২৫-৩৬

²¹⁹ প্রদীপ ঘোষ, ‘সঙ্গীতের গণধারায় গণসঙ্গীত’, ঐকতান পত্রিকা, সম্পা- সমরেশ বসাক, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩২, পৃ- ৪৩

²²⁰ “অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে দূর করার জন্যে, তাদের সুস্থ জীবনে নিয়ে আসার জন্য পথ দেখায় যে গান, তাই গণসংগীত”- সুব্রত রুদ্র, ‘ভূমিকা’, *গণসংগীত সংগ্রহ*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯০, ভূমিকা

²²¹ মূল জাগ গানটি সংগ্রহ করেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র ও পঞ্চগনন সরকারের সম্পাদনায় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-র রংপুর বিভাগে ১৩১৫ সালে ছাপা হয়। সূত্র- পরিতোষ দত্ত, 'জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগার বৈশিষ্ট্য', *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা তেভাগা সংখ্যা*, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪, পৃ- ৭২

²²² মুসলিম লিগ সরকার ১৯৪৭ সালের ২১শে জানুয়ারি 'বঙ্গীয় বরগাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল'-র খসড়া প্রকাশ করে। বিলটিতে চাষের জমিতে ভাগচাষীর দখলিস্বত্ব ও উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু, সোহরাওয়ার্দি মন্ত্রীসভা এই বিলকে আইনে পরিণত করতে পারেনি মুসলমান ও হিন্দু জোতদারদের সম্মিলিত বিরোধিতায় কারণ, তাঁরাই ছিলেন সরকারের মূল ক্ষমতাভিক্তি। সূত্র- বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, পৃ- ৯৪-৬

²²³ কালী সরকারের লেখা জং-গান, দিনাজপুরে জেলে ১৯৫০ সালে রচিত, 'রণে বাজিল রে রণ যায় রণডংকা সাজিল রে' শিরোনামে প্রকাশিত, সূত্র- *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা 'তেভাগা সংখ্যা'*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ- ১০৪-৫

²²⁴ আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ ও অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭

²²⁵ তেভাগার লড়াই, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'-র প্রচারপুস্তিকায় প্রকাশিত, *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা তেভাগা সংখ্যা*, পৃ- ১৫-২৫

²²⁶ তেভাগার লড়াই, *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা তেভাগা সংখ্যা*, পৃ- ২১-২৫

²²⁷ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, পৃ- ১০৩-১০৬

²²⁸ এই প্রয়াস এখনও থাকে সংবাদপত্রগুলিতে এবং টেলিভিশন-মাধ্যমে পরিবেশিত সংবাদে। ধর্মঘট শ্রমিক-কৃষকের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের অন্যতম চিরাচরিত হাতিয়ার; কিন্তু, সংবাদপত্রগুলি ধর্মঘটকে মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের অসুবিধা সৃষ্টিকারী ও উন্নয়ন-বিরোধী বলে

উল্লেখ করে। নিম্নবর্ণের যে কোনও শোষণবিরোধী উদ্যাপন তাদের কাছে নৈরাজ্য ও হিংসার প্রকাশ বলেই গণ্য হয়।

²²⁹ বদরুদ্দীন উমর এবং কুণাল চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বিশ্লেষণে এই মতামতই রেখেছেন। কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় শ্রেণি-অবস্থানের সংশয় মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনর্দখলের সুযোগ দিয়েছিল।

²³⁰ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ‘গণসংস্কৃতি আন্দোলনঃ অতীত ও বর্তমান’, মূল সাক্ষাৎকার ১৬/৫/১৯৮১, প্রথম প্রকাশ পরিচয় পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৮৮, এবং জলাক, সঙ্গীত সমাজ ইতিহাস, সম্পা. স্বপন দাস অধিকারী, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ- ৩৮৪-৯১

²³¹ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ‘বাংলার কথা’, দেশ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৫৪

²³² আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, খোয়াবনামা, ৪৫ নম্বর অধ্যায়, পৃ- ২৬২-৬৬

²³³ তদেব, পৃ- ২৬৩-৬৪

²³⁴ সাবিদ্রী রায়, পাকা ধানের গান, মিত্রালয়, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৬।

²³⁵ মহীতোষ বিশ্বাস, পায়ে পায়ে পথ, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৬১।

²³⁶ এইগুলিকে একত্রে ‘বাজে আদায়’ বলা হত। ‘খোয়াবনামা’য় তমিজ, হরমতুল্লা, যুধিষ্ঠির মণ্ডলরা কিংবা ‘পায়ে পায়ে পথ’-র জলধর, রণপতি, পঞ্চগননরা এই ‘বাজে আদায়’র শিকার।

²³⁷ বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক, পৃ- ২৮-৯

²³⁸ মহীতোষ বিশ্বাস, পায়ে পায়ে পথ, পৃ- ৬৯

²³⁹ তদেব, পৃ- ১১৪-১৬

²⁴⁰ বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন মশিউর রহমান নামক এক জোতদারের কথা। উপন্যাসে বর্ণিত ইব্রাহিম খাঁয়ের সঙ্গে এর প্রভূত মিল। রংপুর জেলার ডিমলা থানা এলাকায় মশিউরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় অন্য জোতদারেরা। গুলি চালিয়ে কৃষক হত্যা করেন পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে, যা উপন্যাসের ঘটনার অনুরূপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক, পৃ- ৭৫-৬

²⁴¹ বরগাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল ধামাচাপা পড়ে গেলে ‘স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি বিল’ আনা হয়, যেখানে অর্থনৈতিকভাবে সবল জোতদার ও ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছিল এমনকি তেভাগার প্রস্তাবসহ আধিয়ার ও ক্ষেতমজুরদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নও সম্পূর্ণ নাকচ করা হয়েছিল, তাকে বিধানসভায় সমর্থন জানায় কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু। নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা আধিয়ার-ক্ষেতমজুরদের সমস্ত আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছিল। সূত্র- কুণাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৯৩-৪

²⁴² কৃষকেরা জোতদার-পুলিশের দ্বারা সরকারি ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধপ্রস্তাবে ‘১৪৫ ধারা’ জারি ক’রে সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে তেভাগার দাবি তথা কৃষকদের ক্ষমতায়নের দাবিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে।

²⁴³ জিতেন ঘোষ, ‘গরাদের আড়াল থেকে’, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, ৪১-২। সূত্র- *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*

²⁴⁴ মহীতোষ বিশ্বাস, *পায়ে পায়ে পথ*, পৃ- ১২৮-৯

²⁴⁵ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সমাজতান্ত্রিক ‘বাস্তববাদ’-এর বিচার’, *নির্বাচিত এফগ ১*, অশ্রুকুমার সিকদার সম্পাদিত, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ১৫২-৮

²⁴⁶ মহীতোষ বিশ্বাস, *পায়ে পায়ে পথ*, পৃ- ১৭০-৭২

²⁴⁷ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, পৃ- ৯৬-৯।

²⁴⁸ সাবিত্রী রায়, *পাকা ধানের গান*, মিত্রালয়, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৬

²⁴⁹ ১৯৩৪ সালে ‘অল ইউনিয়ন-রাইটার্স কংগ্রেস’-এ লেখক-শিল্পীদের ওপরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদমুখী নির্মাণের যে সূত্রায়িত নীতি বেঁধে দেওয়া হয়, তার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এটি এবং লেখকের দায়িত্ব, ‘remaking the world of ideas of the working people and in educating them in the spirit of Socialism’-এ অবদান রাখা। সূত্র- Gleb Zekulin, ‘Review of Istoriya Russkoi Sovetskoi Literatury (A History of Russian Soviet

Literature) by A. I. Metchenko, L. M. Polyak, L. I', Soviet Studies, Taylor & Francis, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1960), pp. 432-442

²⁵⁰ সাবিত্রী রায়, *স্বর্ণলিপি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ- ১।

²⁵¹ রঞ্জিত মিত্র, 'ব-দ্বীপঃ যুগসন্ধির মহাকাব্য', প্রথমত, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৬

²⁵² দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিবাহবার্ষিকী', *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ ২৯২

²⁵³ তদেব, পৃ- ২৯৩-৯৪

²⁵⁴ তদেব, পৃ- ২৯৩

²⁵⁵ চৌধুরী মুফাদ আহমদ, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের না লেখা উপন্যাস', প্রথম আলো, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

²⁵⁶ Hayden White, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1973, p. 5

²⁵⁷ Ibid. p. xii

²⁵⁸ Bakhtin M. M, *The Dialogic Imagination: Four Essays*, Ed. By Michael Holquist, University of Texas press, Austin, 1981, 84-85

তৃতীয় অধ্যায়

সত্তর দশকের পরে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসের নীতিবদল এবং অভিমুখ

উনিশশো ষাট-সত্তর দশক ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য বাঁকবদলের মুহূর্ত। বিশ্ব রাজনীতিতেও অবশ্য এই দশকদ্বয় উল্লেখযোগ্য। সত্তর দশকের আগের বাংলা সাহিত্য আর সত্তর দশকের পরের সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ অনেকটাই। আর, এই তফাৎ শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরের প্রভাব নয়, বরং সাহিত্যের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাপ্রয়োগের সম্যক প্রভাবেও ঘটেছে। রাজনীতি ও সাহিত্যের মতো দুই বিষম শব্দের সেতুবন্ধন ক'রে সমালোচনায় মূল সমস্যা হয় যে, সমস্ত কালপর্বের সমস্ত সংরূপের সাহিত্যেই 'রাজনীতি'র ছোঁয়া কম-বেশি থাকেই এবং সাহিত্যের নিজস্ব রাজনীতি বহু উপাদান সম্বলিত জটিল পথে বিবর্তিত হয়। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবন কিংবা সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরের রাজনৈতিক সক্রিয়তা না, উপন্যাসের রাজনীতিতে সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস এবং বিশেষতঃ উপরিউক্ত ঔপন্যাসিকেরা কী বিবর্তন ঘটাতে পারছেন, সেটাই বিবেচ্য। বাংলাদেশের (তার আগের পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক উপন্যাসের বিকাশ ও বিবর্তন কোন পথে হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক উপন্যাসের উপাদানগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্যগুলি কী কী? আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)' আখ্যানের নিজস্ব রাজনীতি থেকে মহাজন ও আইয়ুব খানের শাসনের রাজনীতি এবং খিজির ও ওসমানদের প্রতিস্পর্ধার রাজনীতির বিরোধমূলক প্রতর্ককে কীভাবে চেনা যায়? উপন্যাসের ভাষা, কালস্থানিকতায় কুশীলবেদের অবস্থান এবং আখ্যানবিষয়ের উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে এই আবিষ্কারে সহায়তা করে? বাঙলা উপন্যাসে নায়কনির্মাণের ছকগুলিকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে উপন্যাসের চরিত্ররা কীভাবে সময়ের রাজনীতির অন্বেষণে নির্মিত হচ্ছে? রাজনৈতিক উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতী বয়ান রাখতে পারছে? সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস

পূর্ববর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রথাগত নির্মাণকে প্রতিস্পর্ধা জানাচ্ছে কীভাবে? পাঠকের কাছে উপন্যাসপাঠের নতুন কোন সম্ভাবনাগুলির উন্মোচন ঘটছে?

পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ- উপন্যাসের রাজনীতি

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সামাজিক চিত্রে যে দুই দ্বন্দ্ব প্রকট হয় তা হচ্ছে- ১- নব্যগঠিত রাষ্ট্র নিয়ে শাসকশ্রেণির মোহাবরণ তৈরির চেষ্টা এবং ২- নব্যগঠিত রাষ্ট্রে শাসিত শ্রেণির প্রত্যাশাপূরণের ব্যর্থতা ও মোহভঙ্গ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি শুধুমাত্র ভাষার সংকট নয়, বরং ক্ষমতা-হস্তান্তর পরবর্তী চার বছরে আর্থ-রাজনৈতিক সংকটও। নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিবাদের জ্বালামুখ ভাষার সংকটে শাসকবিরোধী প্রতিরোধে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী ইলা মিত্রকে কেন্দ্র করে লেখা ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক উপন্যাস ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’-তে সদ্যগঠিত পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে নিম্নবর্গ-নির্বিত্তের ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ‘খোয়াবনামা’-র তমিজ যে খোয়াব বাস্তবায়িত করতে খিয়ার এলাকার তেভাগার সংগ্রামে যোগ দিতে গেছিল, সেখান থেকেই যেন এই উপন্যাসের কুশীলবেরা কথা বলে; তমিজদের হতাশা-আকাজ্জার স্বর উপন্যাসের লেখিকা সেলিনা হোসেনের কথনবয়ানে শোনা যায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের সভায়, ‘স্বাধীনতা’-র পরেও,

যত দিন যাচ্ছে, আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন ছিল, সাধারণ মানুষের মনে, সে স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। মানুষ বুঝে গেছে, ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে মাত্র, উলুখড়রা উলুখড়ই। কৃষকরা এখন অধিকার আদায়ের দাবিতে রুখে উঠছে। (হোসেন ২০১২, ১৪৫)

অথচ, নব্যগঠিত রাষ্ট্রে নিম্নবর্গের শোষিত অবস্থানে যে বিন্দুমাত্র বদল হবে না, তা পরিষ্কার ছিল সহরাওয়ার্দির ভাষণে। মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের দ্বারা আধিয়ারদের তেভাগার দাবিকে

স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, ‘বঙ্গীয় বরগাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল’-এর প্রহসন হয়েছিল; কিন্তু, তেভাগার সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করতেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ‘চাষাদের অশান্তি’ বন্ধ করতে সোহরাওয়ার্দি সরকার সচেষ্ট হয়। কৃষকদের ‘অসহিষ্ণুতা’ দমনের জন্যে ‘বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য’ হয় সোহরাওয়ার্দির পুলিশ। “আমরা এখন স্বাধীনতার পূর্বাঙ্কে দাঁড়িয়ে। আমাদের উচিত ধীরে ধীরে সাংবিধানিক পথে এগোনো। কারণ, তাহলেই আমরা তার ফলভোগ করতে পারব”¹ এবং সোহরাওয়ার্দি কথিত এই ‘আমরা’-র মধ্যে ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের তমিজ, হুমতুল্লারা নেই; রয়েছে শরাফত, কালাম, তহসেন, ইসমাইলরা। এর ফলে একদিকে যেমন ধর্মীয় জিগিরে দেশভাগের ফায়দা তুলতে পারছে শাসকশ্রেণি, তেমনি কৃষক-শ্রমিক-নিম্নবর্গের সমর্থনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে পারছে। স্বাতন্ত্র্যের খোঁজ এবং হিন্দু শিক্ষিত-ভদ্রলোকের অসহিষ্ণু অবজ্ঞা পেরিয়ে পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যের উত্থানের যুগে ধর্ম এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আগের অধ্যায়ে এই নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। ‘মোহাম্মদ’ বা ‘সওগাত’-র মতো প্রথম সারির পত্রিকা ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সাযুজ্য খুঁজে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে ইসলামপন্থী ক’রে তুলতে চেষ্টা করছিল। সেই সঙ্গে নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা ও শোষণমুক্তির ইচ্ছেকে দ্রবীভূত করতে সফল হচ্ছিল। যদিও, ‘বুলবুল’ পত্রিকা ১৯৩৭ সালেই শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত ও আশরাফ মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের পরিণতিও সেই দিকেই ইঙ্গিত করে,

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম সংহতির বাণী উচ্চারণ করিয়া যাঁহারা আজ হাতের নিশান সঘন আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের পুরোবর্তীরা সকলেই জমিদার মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের ফলে, মুসলিমদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে আতঙ্কিত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলিম জমিদার, মহাজন ও ধনিকেরা তাঁহাদের শ্রেণীগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা, খাতক ও শ্রমিকদের

প্রবল আন্দোলন যাহাতে জাগিয়া উঠিতে না পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন।

(চৌধুরী ২০১৭, ৩৪০)^২

ঠিক এই আর্থ-রাজনৈতিক পরিণতি ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে। আশরাফ শ্রেণি ও ধনিক-জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিরা কৃষক-নিম্নবর্গের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধর্মের নামে সজ্জবদ্ধ ক’রে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের অভিমুখে পরিচালিত ক’রে নেয়। উপন্যাসের পরিসরে সেইজন্যই আব্দুল কাদের, আজিজের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের নিম্নস্তরীয়া কর্মীরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যোগ দেয়, তা পূর্ণ হয় না। কালাম মাঝির নেতৃত্বে মাঝিপাড়ার শোষিত মানুষ কাংলাহার বিল দখল ক’রে মাছ ধরা শুরু করলেও অচিরেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়; কাংলাহার বিলের স্বত্ব নায়েব-শরাফতের হাত ঘুরে কালামের একচেটিয়া অধিকারে চলে যায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দির বিধানসভায় প্রদত্ত ভাষণে ‘চাষীদের অসহিষ্ণুতা’র অনেক উদাহরণের মধ্যে ‘কোথাও কোথাও বিনা অনুমতিতে মাছ ধরা, চৌকিদারী ট্যাক্স না দেওয়া’-র উল্লেখ ছিল^৩। ইলিয়াস কি ইতিহাসের সেই সূত্রকেই উপন্যাসের আখ্যানে গতিশীল রাখেন মাঝিপাড়ার দ্রোহ ও কালামের ভূমিকায়? সোহরাওয়ার্দি পুলিশ পাঠিয়ে বলপ্রয়োগ ক’রে কৃষকদ্রোহ দমন করেন; আখ্যানে কালামের ছেলে তহসেন পুলিশ আধিকারিক এবং কাংলাহার বিল দখল করা মাঝিদের সে গ্রেপ্তার করতে আসে। ইসমাইল, যে ছিল মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের স্থানীয় নেতৃত্ব, যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুহূর্তেও অসাম্প্রদায়িক ছিল, সেও নিম্নবর্গের মানুষদের এবং তমিজকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়। ‘বুলবুল’ পত্রিকার অনুধাবনের যথার্থ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোর চূড়ায় শরাফত-কালাম-তহসেনরা আসীন হলে। দুই বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে। তথাকথিত ‘স্বাধীন’ দেশের সরকার উচ্চবর্গের-উচ্চবিত্তের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক না হয়ে কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করবে, এমন আশা অসমীচীন ছিল না। কিন্তু, ‘খোয়াবনামা’-তে যে পরিণতি ও আশাভঙ্গ হয়েছিল, সেই সমাজ-বাস্তবতা ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’-তেও হয়। পূর্ব

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি-কৌশলের দ্বন্দ্বের কথাও উল্লেখ করেছেন সেলিনা। সশস্ত্র সংগ্রামের ধারাবাহিকতা নিয়ে নাচোলে সংগ্রামরত ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও অন্যান্য কৃষকযোদ্ধাদের সঙ্গে উচ্চতর নেতৃত্বের মতানৈক্য ঘটে। কৃষক সভা সিদ্ধান্ত নেয় জনযুদ্ধে বিরতি দিয়ে তেভাগা আন্দোলন স্থগিত রাখার। ‘খোয়াবনামা’তে মুসলিম লিগের একদা প্রগতিশীল নেতা ইসমাইলও ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে তেভাগার দাবিকে নস্যাৎ করে ও তমিজের প্রশ্নকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু, নাচোলের স্থানীয় কৃষকনেতা শেখ আজাহার বলে “এখনই সময়। বিশেষ করে গোটা নাচোলের ষাট ভাগেরও বেশি সাঁওতাল কৃষক। প্রথম তেভাগার বীজ ওদের মধ্যেই রোপিত হয়েছে।” (২১৫) আর, রমেন মিত্র সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই কৃষকমুক্তির নীতিকে আঁকড়ে থাকতে চান এবং হঠকারিতার তত্ত্বকে নাকচ ক’রে বলেন, “আন্দোলন আমরা সবাই প্রাণের মমতায় গড়ে তুলেছি। আমরা একে নষ্ট করতে চাই না... আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় অধিকার আদায়ের সাফল্য।” (২১৬) ইলা মিত্রও অন্যান্য কৃষকনেতার সঙ্গে মিলিত সিদ্ধান্তে আসেন, “আমাদের প্রথম কর্মসূচি হবে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নাচোলের সর্বত্র একসঙ্গে আমন ধান কেটে আমাদের দখলে নিয়ে আসা” (২১৭) তেভাগা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের শাসকশ্রেণিকে বিপন্ন করেছিল। একদিকে পূর্ব পাকিস্তানে গেঁড়ে বসে থাকা সামন্ততন্ত্র জোতদারি-জমিদারি শোষণ ও অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া উপনিবেশে পরিণত হওয়া আর্থ-রাজনীতির স্থানীয় নিয়ন্ত্রকেরা আশঙ্কিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির তেভাগা সংগ্রাম জারি থাকায়। আন্দোলন ভঙ্গ করতে বিভাজনোত্তর পর্বের মতোই হিন্দু-মুসলমান ধর্মসম্পর্ক দিয়ে শ্রেণিভিত্তিকে দুর্বল ক’রে দেওয়ার চেষ্টা ছিল; আর, মুসলিম লিগের কর্তৃত্বকে দিয়ে কৃষকসভার নেতৃত্বকে আপসের রাস্তায় রাজি করানো ও তেভাগা স্থগিত রাখার প্রচেষ্টা। রাজশাহী-নাচোল-নওগাঁ জুড়ে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামকে যে কোনও উপায়ে দমন করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিরঙ্কুশ করাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের লক্ষ্য। সেইজন্যেই তমিজ ঠাকুরগাঁ-নওগাঁ-নাচোল ছুটে বেড়াতে চায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও কৃষকদের বিদ্রোহ জারি ছিল নাচোল, কাকদ্বীপে-

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব অনেক তদুপরি, বাংলা ততদিনে বিভক্ত। কিন্তু দুই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কৃষকদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবতা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা ষাট-সত্তরের দশকে বহন ক'রে চলে 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর আনোয়ার, পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে রচিত 'বিবাহবার্ষিকী'র মণিমোহন বা 'শোকমিছিল'-এর বিনয়ভূষণেরা। কৃষকের নিরন্তর শোষণের ইতিহাসে তমিজের সঙ্গে জুড়ে যায় 'বৃত্তান্ত'-র চ্যারকেট-খেতখেতু, 'অগ্নিগর্ভ'-র বসাই-দোপ্‌দীরা। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যান ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে এগোতে থাকে। অসংখ্য দ্রোহের সম্ভাবনা ও ব্যর্থতার ইতিহাসে আখ্যানের কাল্পনিকতা জুড়ে জুড়ে 'বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস' নির্মিত হতে থাকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু (১৯৪৮)' উপন্যাসে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসেও 'নব্য শিক্ষিত মুসলমান'-দের কথা রয়েছে, যারা পাকিস্তানের দাবিকে অন্তঃকরণে বিশ্বাস করত ও অন্যকে বিশ্বাস করাত। সিরাজুল চৌধুরী যথার্থ বলেছেন,

বাংলায় যেটা অবশ্য ছিল, সেটা হলো একটি সামাজিক বিপ্লব, যেটি ঘটলে দেশ অমন রক্তাক্ত ও সর্বনাশরূপে বিভক্ত হতো না, এবং পুঁজিবাদও প্রতিহত হতো। মধ্যবিত্ত সেটা চায়নি, বরঞ্চ নানাবিধ বিপ্লবের ধ্বনি তুলে এই বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে; মধ্যবিত্ত রচিত ও পঠিত সাহিত্যের কাজটাও ছিল এই বিপ্লবকে ঠেকানো, একে সাহায্য করা নয়।
(চৌধুরী ২০১৭, ২৮)

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে যে বিভাজনোত্তর পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য ও রাজনীতি দু'ইই আলোড়িত হল। সাহিত্য ও ভাষার রাজনীতিতে ধর্ম মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার ফলেই পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যে ব্রাত্য হয়েছে 'হিন্দু' সাহিত্যিকেরা। দীর্ঘ বিতর্ক চলেছে 'নতুন' সাহিত্যের ভাষা ও অবয়ব নিয়ে। প্রায় দেড় দশক আগেই এই বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু-

ভদ্রলোক দমিত বাংলা সাহিত্যের পালা সাহিত্যপ্রস্কাব এসেছিল। ঊনবিংশ শতকে হওয়া বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃতায়ন ও হিন্দু-আধিপত্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিসরেও ক্ষোভ কম ছিল না। সিরাজুল চৌধুরীর মতে, বাঙালি মুসলমানদের অভিমান ও হীনম্মন্যতা তাঁদের অবাস্তব মনোবৃত্তি তথা বাংলা বনাম উর্দু এই প্রতর্কে ঠেলে দিয়েছিল⁴। বাংলা ১৩৪৩ সালে নাজিমুদ্দিনকে হারিয়ে ফজলুল হক পটুয়াখালি কেন্দ্রে জয়লাভ করার পরে ‘বুলবুল’ সাহিত্যপত্রিকা তাঁকে সম্বর্ধনা দেয়। “তিনি সর্বতোভাবে বাঙালী, বাঙলা তাঁহার মাতৃভাষা, বাঙলার বাঙালীর চিত্তে তাঁহার সহজ গতি। তাই আজ আমরা বাঙলা সাহিত্যের সেবকরূপে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।” (চৌধুরী ১৪১৭, ৩৪৬)- ফজলুল হকের ‘বাঙালীত্ব’-তে আশ্রিত ‘বুলবুল’ পত্রিকা পরবর্তীতেও কৃষকদের ও নিম্নবর্গের শোষিত হওয়ার বিপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। সাহিত্যের রাজনৈতিক যোগ এর ফলে সুপ্রমাণিত হয়; তদুপরি, যে সময় হিন্দু-ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্রিকাগুলি কাজ ক’রে চলেছে, সাহিত্যের রাজনীতির সেই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে ‘বুলবুল’ পত্রিকার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি! বাঙালি হিন্দুর প্রবল জাত্যাভিমানের সংকীর্ণতার জন্যেই বাঙালি মুসলমান সমাজ সঙ্কোচাভিमानে দূরে সরে থেকেছে, সিরাজুলের এই বিশ্লেষণ সত্য। আর, সাহিত্যেও তার প্রতিফলন উত্তরোত্তর বেড়েছে। ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকার ১৩৫১ সালের কার্তিক সংখ্যায় বঙ্গভঙ্গ ও ‘বন্দেমাতরম’-র সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলিকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের নিদর্শন হিসেবে দেখা হয়েছে। ‘সংগাত’ পত্রিকা ১৩৫৩ সালে, অর্থাৎ দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বেই হিন্দু-ভদ্রলোকের বিগত কয়েক দশকব্যাপী কর্তৃত্ব ও দেশভাগের সিদ্ধান্তে সায দেওয়াকে চাঁচাছোলা আক্রমণ ক’রে লেখে,

বাঙলার অখণ্ডত্বের মধ্যে বাঙালী মুসলমানকে আজ যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে হটাইবার উপায় নাই, তখন অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র প্রদেশ হইতে কাটিয়া আলাদা করা হোক। কেননা, পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং সেখানে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাঁহাদেরই আধিপত্য হইবে। বাংলার অখণ্ড সত্তা রক্ষার

জন্য বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মাথাব্যথা হওয়া-না-হওয়ার মূল রহস্য যদি এটাই হয়, তা হইলে ভৌগোলিক, সামরিক প্রভৃতি নানাবিষয়ক যুক্তি দিয়া আজ যে তাঁরা অখণ্ড ভারতের প্রতি দরদ দেখাইতেছেন, সেগুলোর অসারত্ব সহজেই লোকচক্ষে ধরা পড়িবে।

(সংগাত, পৌষ ১৩৫৩)^৫

১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতীয় এবং বঙ্গীয় মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার ধাপ। এই ধাপে আত্মমর্যাদা, আত্মবিকাশের পদ্ধতি ছিল অঙ্গঙ্গী। কিন্তু, ইতিহাস-বর্তমানের জটিল প্রগতিপথ ঘুরে ক্রমেই তা স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে পর্যবসিত হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য ও বর্ণহিন্দু লেখকদ্বারা রচিত সংস্কৃতায়িত ভাষার হিন্দু-মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের রাষ্ট্রগঠনের জেদ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ‘শিখা’ পত্রিকা ছিল বাঙালি মুসলমানের প্রগতিশীল অংশের বার্তাবাহক। ১৩৩৩ সালের সংখ্যায় একগুচ্ছ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়, যার সবকটিই ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিতে তৎকালীন মুসলমান সমাজের দুরবস্থা ও তা থেকে মুক্তির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে। পরবর্তীতেও প্রগতিশীল পত্রিকাগুলি, যারা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় জোর দিত, তারাও হিন্দুসমাজের থেকে পৃথক স্বাবলম্বী অবস্থানেই গুরুত্ব আরোপ করত। আগের অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছিলাম যে, সাহিত্য-রাজনীতি-ইতিহাস রাজনৈতিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ত্রিস্তম্ভ; ওই আলোচনায় ‘খোয়াবনামা’কে ‘আনন্দমঠ’-র পাল্টাপ্রস্তাব হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ছিল। এমন এক উপন্যাস যা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতর্ক বা ডিসকোর্সকে আজও মান্যতা দিয়ে চলেছে। বঙ্গীয় মুসলমানদের সঙ্গে বঙ্গীয় হিন্দুদের বিরোধের অন্যতম বিন্দু ‘আনন্দমঠ’ এবং উপন্যাসটিকে ব্যবহার করা ভদ্রলোক-হিন্দু সমাজ। সৈয়দ সামসুল ইসলাম ১৩৪০ সালে ‘আনন্দমঠ’কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উল্লেখ করছেন, “আজ যে হিন্দু মহাসভা মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে ও মুসলমানকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হবে বলিয়া শাসাইতেছেন, সঙ্কীর্ণমনা বঙ্কিমবাবুই তাহার দীক্ষাগুরু”^৬

যদিও, সৈয়দ সামসুলের ভাষা প্রবল আক্রমণাত্মক ও ধর্মীয়-দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বঙ্কিমের ভবানন্দ-সত্যানন্দের ‘যবনবিরোধী’ সঙ্কল্প ও সন্তানগণের ‘কবে মসজিদ ভাঙিয়া রাখামাধবের মন্দির গড়িব?’ আকাঙ্ক্ষার বীজ উপমহাদেশে (বিশেষতঃ ভারতে) হিন্দুত্ববাদের বীজমন্ত্র হয়ে রয়ে গিয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বনাম জাতীয়তাবাদী প্রতর্ক রাজনৈতিক সাহিত্যের নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু, ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্টের পরে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র অন্ততঃ বাঙালি মুসলমানের মুক্তির দিশা হতে পারেনি। বরং, যে লড়াই ছিল হিন্দু জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং হিন্দু-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রাজনীতি থেকে ইসলামিক সাহিত্যবোধের পৃথকীকরণের, সেই দুই দ্বন্দ্ব আবছা হতে শুরু করল ও অবশেষ হিসেবে থেকে গেল। আধিপত্যকারী দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল বাঙালি জাতীয়তাবোধ বনাম পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ; আর, ভাষাকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। আবুল মনসুর আহমদ লিখছেন যে, “বাংলায় জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে।” (আহমদ ২০১১, ২১) আবুল মনসুর পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতিকে পাক-বাংলার সংস্কৃতি বলে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার ক’রে নিচ্ছেন যে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই দুই বাংলার সংস্কৃতি পৃথক^৭। আবুল মনসুর ১৯৬৬ সালে ‘পাক-বাংলার কালচার’ লিখেছিলেন, পরে তার নাম পরিবর্তন ক’রে ‘বাংলাদেশের কালচার’ রাখেন। এই বইতেই আবুল মনসুর বলছেন যে, “পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই; না প্রাণে, না রূপে, না তার আংগিকে। যদিও, ইসলামি রেনেসাঁর কাজ যোগ্যতর হাতেই আছে।” (৫৭) জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষার খোঁজ জারি রয়েছে তাঁর লেখায়; এবং তা পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া ভাষা-সাহিত্য প্রকল্পনার বিরুদ্ধপ্রস্তাব। সালমা শোভন তাঁর প্রবন্ধে যথার্থই অনুধাবন করেছেন, “The support and vote for the Muslim League in 1946, therefore, was never seen by the Muslim Bengali as a vote against the culture and language of Bengal. This became very clear early on following

the partition of India.”^৪ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবোধ ও ভাষার সঙ্গে ধর্মীয় পরিচিতির এই দ্বন্দ্ব দেশভাগের পর থেকে শুরু হয়ে ১৯৫২তে এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ১৯৪৭-র অগাস্ট থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উর্দু বনাম বাঙলা প্রতর্ক এবং পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান কীভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিণত হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা মুনজুরুল হক তাঁর প্রবন্ধে করেছেন^৫। তমদুন মজলিশ ও ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ, ফজলুর রহমানসহ পাকিস্তানের শাসকদের বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা, ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু গণহত্যা এবং ১৯৫১ সালে পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন ও সংস্কৃতি সম্মেলন- এই প্রতিটি পর্যায়েই বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতা ভাষা-আন্দোলন এবং বাঙালিদের প্রকল্পনা দৃঢ় করেছিল। শ্রমিক-কৃষকদের একের পর এক আন্দোলন ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রীয়-সংস্কৃতি-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে যায়। ধর্মীয় ঐক্য এবং পাকিস্তানপন্থার যে পাঠ পড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মগজ ও চেতনার দখল নিতে চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা, তার বিরুদ্ধে আর্থ-রাজনৈতিক ও ভাষা-সাংস্কৃতিক মহলের প্রতিরোধ জারি ছিল। পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছর ধরেই যে এই দ্বন্দ্ব চরমভাবে অস্তিত্বশীল ছিল, শুধু তা নয়; পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ গঠন এবং আধুনিক বাংলাদেশেও এই দ্বন্দ্ব রয়েছে। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েই ধর্ম বনাম ভাষা বনাম জাতীয়তাবোধ বনাম শ্রেণিবোধ বনাম আত্মপরিচিতি- এই দ্বন্দ্বমূলক প্রতর্ক ক্রিয়াশীল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার পরেও ভাষা-সংস্কৃতি বনাম ধর্মের দ্বন্দ্ব যে কিছুমাত্র কমেনি, সালমার বিশ্লেষণেই তা পরিষ্কার। বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের অভিঘাতে বিশ্বের ইসলামিক সমাজের কাছে ‘বাংলাদেশ’ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ-ভাষা-অস্তিত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে ধর্মভিত্তিক-রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভাঙার জন্যে বাংলাদেশের বাঙালিদের ইসলাম-বিরোধী মনে করত ক্ষমতামালা ইসলামিক-রাষ্ট্রগুলি। “but this rejection of Bangladesh by most of the Muslim world was a blow to the Muslim Bengali psyche

from which it has yet to recover.” (Salma 2013, 307-8) মুসলিম লিগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে যে দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের শেষ থেকে ক্রিয়াশীল ছিল, তার বিবর্তন বিশ শতকের সত্তর দশকে এই রূপ পেল। ‘খোয়াবনামা’-র সাদেক উকিল, ইসমাইল, আব্দুল কাদেররা মনেপ্রাণে ‘পাকিস্তান’ চাইত, কিন্তু নিজেদের ভাষা-সাহিত্য ও জাতীয়তাবোধকে বিসর্জন দিয়ে নয়। অথচ, ১৯৭১-র পরে আজও অবধি ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতির সংঘাত মিটল না। ওয়ালীউল্লাহ, আখতারুজ্জামান, শহীদুল জাহির, আহমেদ ছফাদের রাজনৈতিক উপন্যাস বাঙ্গালিত্বের রাজনীতি বনাম ধর্মীয় রাজনীতির এই দ্বন্দ্বকে ধারণ করেই নির্মিত হল। আর, ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ দু’টি প্রধান দ্বন্দ্বকে রাজনৈতিক আখ্যানে রূপান্তরিত করে- (১) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের অসন্তোষ এবং (২) সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে নির্বিত্ত ও নিম্নবর্ণের অভ্যুত্থান- আলতাফ ও আনোয়ারের বাদানুবাদ-

-আমাদের ভাষা, আমাদের কালচার থেকে শুরু করে অর্থনীতি সব আজ পাঞ্জাবিদের এক্সপ্লয়টেশনের শিকার। এসব বাদ দিয়ে তোমরা জোতদার মারো আর ঘরবাড়ি জ্বালাও।

-আমার কথা হলো এই যে, মানুষের এই আপসার্জ কি খালি বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘাটাবার জন্য? বাঙালি ভদ্রলোকের চাকরির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে?

-পৃথিবীর যেখানে যতো দুঃখী ও শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ আছে, সবাইকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের কে দিলো? পশ্চিম পাকিস্তানের যেটুকু আমরা জানি, তা হলো আমাদের শোষণ করার অদম্য স্পৃহা।

-ভাষা, কালচার, চাকরি-বাকরিতে সমান অধিকার, আর্মিতে জেনারেলের পদ পাওয়া- এসব ভদ্রলোকের প্রব্লেম। এই ইস্যুতে ভোটের রাইট পাওয়ার জন্যে মানুষের এতো বড়ো আপসার্জ হতে পারে? (ইলিয়াস ২০১৫, ৩৩)

আলতাফ ও আনোয়ারের বাদানুবাদের মধ্যে ইফতিখার, সিকানদার, ফরিদ, ওসমানদের মতামত ও আকাজ্জা ঢুকে যায়। ‘কমন পিপল’-র আকাজ্জার মধ্যে নির্বিক্ত ও নিম্নবর্গের আকাজ্জাও যে বিশেষত্ব দাবি করে, আনোয়ার তা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। স্বাধীনতার দাবি আশু কর্তব্য বুঝেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বদলের দাবি উঠে আসে¹⁰। জাতীয়তাবাদ এবং শ্রেণিসংগ্রামের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক প্রকট হয়। এবং, মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোকের নেতৃত্ব সত্ত্বেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবির মধ্যে নির্বিক্তের দাবি যে স্বতন্ত্র, সেই রাজনীতি স্পষ্ট হয় বহুস্বরের মিলমিশে। ইলিয়াস তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন কীভাবে মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত শ্রেণির নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদের ‘সাদা রুমাল উড়িয়ে’ নিম্নবিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত গণপভুত্বাধারের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল।¹¹ ইলিয়াসের এই উপন্যাস বস্তুতঃ ‘৬৯-র সময় তথা গণঅভ্যুত্থানের সময়কে বহুমুখের থেকে বুঝতে চান, নির্বিকার আখ্যানকথকের বয়ানে সাজাতে চান।

দেশভাগোত্তর পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণের থেকেও বোধহয় বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মপরিচিতির সন্ধান জারি রাখা। একদিকে সাহিত্যের ইসলামীকরণ অন্যদিকে গ্রাম্যগাথা, অমার্জিত পুঁথি লোকসংস্কৃতিকে সাহিত্যক্ষেত্রে আনা এবং “রিক্ত সর্বহারাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া। এদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা”¹²। এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যভাবনাকে চালিত করেছিল। দেশভাগের পরে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যে রূপান্তরিত হল এবং ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে উপন্যাসিকেরা গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে উপন্যাসের আখ্যানে প্রাধান্য দিতে চাইলেন। রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট হিসেবে স্বীকৃত হল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল কোনও কুশীলব। আবুল মনসুর আহমদের ‘জীবনক্ষুধা (১৯৫৫)’ পাকিস্তান আন্দোলনের সময়পর্বকে ধারণ করে এবং ব্যক্তিমানুষ হালিমের জীবনকাহিনির মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর ও পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ধরতে চায়। শিক্ষিত আধুনিক যুবক হালিম চিহ্নিত করতে পারে অসাম্প্রদায়িক কৃষিঅধ্যুষিত যাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে

বাঙালি মুসলমান সমাজ স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে কীভাবে সাম্প্রদায়িক ধর্মরাষ্ট্রবাদী হয়ে উঠল। কাহিনির প্লট ও নৈতিকতা-মূল্যবোধের অধিকস্ততায় আখ্যানের ত্রুটি থাকলেও, আবুল মনসুর প্রধান কুশীলব হালিমের বদল দেখাতে পেরেছেন। ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণই যদি উপন্যাসের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যক্তিমানুষের বদল তার উল্লেখযোগ্য উপাদান। হালিম নিজের শ্রেণি-অবস্থান ও সামাজিক-অবস্থানের জন্যেই বাস্তবোচিত দোদুল্যমানতায় ভোগে; কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের রাজনীতির মধ্যে এবং আধুনিক শিক্ষা মুৎসুদ্দী অবস্থান ও সামন্ততান্ত্রিক বোধের মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব হালিমকে পরিণতি দিতে চান আখ্যানকথক। সত্যেন সেন এই পর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসিক, এর মূল কারণ তাঁর ‘পদচিহ্ন (১৩৬৫)’ ও ‘সেয়ানা (১৩৭৫)’ নামক দু’টি উপন্যাস। ‘পদচিহ্ন’ উপন্যাসে বিভাগোত্তর পর্বে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু জনজীবনের আর্থ-রাজনীতি আখ্যানে এসেছে। গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, বিশ্বাসের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। ‘সেয়ানা’ উপন্যাসের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে। দেশের আর্থিক সংকট, শাসক শ্রেণির দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষের নিপীড়ন ও অ-ভদ্রলোক চরিত্রের বর্ণনা উপন্যাসটির উপজীব্য। পকেটমার ঝড়ুর কোনও ‘নায়কোচিত’ গুণ বা নৈতিক উচ্চাবস্থান নেই। বিভিন্ন পেশাবদলে দালালি, পকেটমারি, ছিঁচকে কাজ সবই সে করেছে। আবার একইসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনায় তার উদারতা, বন্ধুবাৎসল্য ও ক্ষমাশীলতা প্রকাশ পায়। সাদা-কালো বাইনারির বাইরে এক অভদ্রলোক ‘অশিক্ষিত’ অমধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানের মানুষকে আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাবল্যতার কেন্দ্রে স্থাপন করা উল্লেখের দাবি রাখে। ঝড়ুর জীবনযাপনের ওঠাপড়ায় ১৯৪০ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধান যেমন চলে, তেমনই একই পটভূমিতে রচিত আবু রুশদের ‘নোঙর (১৯৬৭)’ গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটোগনিস্ট কামাল দেশভাগোত্তর পরিস্থিতিতে পরিবারের সকলকে কলকাতায় রেখে ঢাকায় চলে এসেছে। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর ওসমানও দেশভাগের পরে ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে ঢাকার আর্ম্যানিটোলায় চাচার সাথে থাকতে শুরু করেছিল, ওসমানের নিজের পরিবার ইন্ডিয়াতেই থেকে গেছিল। ওসমানের আব্বা পাকিস্তানে কোনও বাড়িঘর জমি না-ক’রে ইন্ডিয়ার গ্রামের বাড়িতে

থেকে গেছিল বলে ওসমানের অভিমান ছিল¹³। ‘নোঙর’ উপন্যাসের কামালের ক্ষেত্রে একদিকে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ অন্যদিকে নতুন দেশের উন্নতির আহ্বান, একদিকে তার মূল্যবোধ অন্যদিকে জাতীয় জীবনের বৃহৎ পটভূমিতে তার নিঃসঙ্গতা ও স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান রয়েছে। এক বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমিতে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অন্বেষণের জন্যেই ‘নোঙর’ রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি দু’টি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আখ্যাননির্মাণ করছিল। প্রথমতঃ গ্রামীণ সংস্কৃতি-আর্থ-রাজনীতির সঙ্গে শহুরে মধ্যবিত্তের আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়তঃ, শাসকের সামন্ততান্ত্রিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক শাসননীতির সঙ্গে শাসিতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। পাকিস্তানপন্থী অনুশাসনের সঙ্গে ভাষা-সংস্কৃতির জবরদস্তি পূর্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল, ষাটের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণ-অভ্যুত্থানের কারণগুলি প্রকট হতে শুরু করল। ইন্দু সাহার ‘কিষাণ বউ (১৯৬৮)’¹⁴ উপন্যাসের আখ্যান এই দ্বন্দ্বদ্বয়কে ধারণ করে। এক জমিদার পুত্র কলকাতা শহরে গিয়ে মাস্ট্রীয় তত্ত্বসাধনা ক’রে গ্রামে ফিরে আসে কৃষকশ্রেণির সঙ্গে একাত্মবোধ ক’রে। কৃষকদের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বে-অনুশীলনে জাগিয়ে তুলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ উচ্ছেদের জন্যে চেষ্টা করে নবেন্দু রায়। জমিদার শিবেন্দু রায়ের আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে শিবেন্দুর হাতছাড়া হয় জমিদারি কিন্তু, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকেই যায়; এর সঙ্গে যুক্ত হয় তৎকালীন পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী শাসকদের শোষণ। নবেন্দুর ঐকান্তিক চেষ্টায় কৃষক নরনারী সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক দু’য়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইন্দু সাহা সমাজবাস্তববাদী উপন্যাস রচনা করেছেন। কৃষকদের দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে উচ্চ-শ্রেণিঅবস্থান থেকে নবেন্দু মেসিহার মতো কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায়। সমাজবাস্তবতার তাত্ত্বিক প্রভাবে ইন্দু সাহার উপন্যাসের চরিত্ররা রক্তমাংসের চরিত্র না হয়ে শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব দ্বারা চালিত পুতুল হয়ে যায়। প্রগতিবাদী ও সমাজবাস্তববাদী সব বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে এবং সেই দোষে দুই উপন্যাসটি। যদিও, পূর্বোল্লিখিত দ্বন্দ্ব দু’টির প্রতিফলন এই রাজনৈতিক উপন্যাসে সফলভাবে ঘটে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস আনোয়ার পাশার

‘রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)’; এটি একটি তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস, যেখানে ইতিহাস ও রাজনীতি ওতঃপ্রোত। উপন্যাসটির প্লট ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে রাজকার ও পাকিস্তানী সেনাদের মিলিত নৃশংসতায় ধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তান। উপন্যাসের অনেক চরিত্র বাস্তবে ছিল, এবং মূল আখ্যানকথক অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন কল্পনানির্মিত চরিত্র; সুদীপ্তর বয়ানে বাস্তবের চরিত্ররা আখ্যানের কুশীলব হয়ে ওঠে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাহানারা ইমামের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ বা হুমায়ুন আহমেদের ‘জ্যোৎস্না ও জননী’ কিংবা ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ লেখা হয়েছে পরে। আনোয়ার পাশার এই উপন্যাসটি খানসেনা+রাজাকারদের অত্যাচারের অন্যতম দলিল, একাত্তর সালের ২৫শে মার্চের বাস্তববাদী ‘আখ্যান’ এবং আনোয়ার পাশার শেষ লেখা। এই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’ উপন্যাস (১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ওপরে রচিত) সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের মানদণ্ডে কী কী বিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা বোঝার জন্যে।

পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যের অনুশীলনের সময় কিংবা তার আগেও যখন সংস্কৃতায়িত হিন্দু-মধ্যবিভূতের সাহিত্যকে নাকচ ক’রে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য গড়ে উঠছে, তখন সাহিত্যগত ক্ষেত্রে একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন নাজমা জেসমিন চৌধুরী; মুসলমানদের কোনও উল্লেখযোগ্য ‘পুরাণ (mythology)’ না থাকার কারণে ‘হিন্দু’সাহিত্যের মতো বিষয়বিস্তৃতি তাতে ছিল না।^{১৫} নিম্নবর্ণের এমনকি মধ্যবিভূ-নিম্নবিভূ হিন্দুদের কাছে ব্রতকথা, পার্বণ, পাঁচালি, পৌরাণিক কাহিনি ইত্যাদি যেরকম গ্রহণযোগ্য এবং বারেবারে ‘অবশিষ্টাংশ (residual)’ হিসেবে সাহিত্যে পুনরাবৃত্তি থেকে গেছে, পাকিস্তানপন্থী সাহিত্যে তা হয়নি। যদিও, লোকশ্রুতি, আউলিয়া, পীর-মুরীদ এবং সুফীধারার প্রভাব বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রাম্যজীবনে প্রকট ছিল এবং সেটাই একমাত্র হারানো সূত্র বা মিসিং লিঙ্ক হিসেবে সাহিত্যে ফিরে ফিরে এসেছে। আখতারুজ্জামানের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ বা ‘খোয়াবনামা’ কোনও খণ্ডিত প্রকল্পনা নয়, বরং পটভূমি-চরিত্র-আখ্যানবৈশিষ্ট্যে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক

অবয়বের সামগ্রিকতার চিহ্নায়ক। নাজমা জেসমিন যে অভিযোগটি করেছেন বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে, ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ সেই অভিযোগের যথাযোগ্য জবাব। সাহিত্যের রাজনীতির সঙ্গে বাস্তবের রাজনীতির সাঁকোটি এই উপন্যাসে দুলতে থাকে। আর, ‘খোয়াবনামা’-র রাজনৈতিক কালস্থানিকতায় মাদারিয়া ফকির, সুফি তরিকা, শোলোক এই সব কিছুই প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে বলেই পাকুড়গাছ বেমানুম লোপাট হয়ে যায়। যে পাকুড়গাছে মুনসির বাস বলে মুখফেরতা আখ্যান বিশ্বাসযোগ্যতায় ঠাঁই নিয়েছিল, তমিজের বাপ বা বৈকুণ্ঠ কেউই তা খুঁজে পায়না দেশভাগের প্রাক্-মুহূর্তে। শরাফত মণ্ডলের ইঁটখোলা তৈরি হয়, আব্দুল কাদের আধুনিক চেতনায় পাকুড়গাছ ঠাট্টার বিষয় হয়ে ওঠে। এমনকি, সমাজের ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নবপর্যায়ের সূচনাকে ইঙ্গিত করেই শরাফত বলে, “বিলের উত্তর দিকে পাকুড়গাছ কেউ কোনোদিন দেখিছে?... লায়েববাবুর সাথে ঘুরা ঘুরা দেখিছি। লিজে একলা একলাও দেখিছি। ওটি পাকুড়গাছ আছিলো কোনোদিন?” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২২৯) আর্থ-সামাজিক সংকট তখন তীব্র, সাম্প্রদায়িক বিভেদ আটকানো অসম্ভব হয়ে উঠছে, তখন মিথ আর মুখফেরতা আখ্যানেরাও সংকটে পড়ে। দেশভাগোত্তর রাজনীতির ট্রাজেডিতেই পাকুড় গাছ আর পাওয়া যায় না, তমিজের বাপ ও উধাও-হওয়া পাকুড়গাছের কাছে চোরাবালিতে ডুবে যায় ও বৈকুণ্ঠ খুন হয়ে যায়। চেরাগ আলি, মজনু শাহ্ কিংবা ভবানী সন্ন্যাসীদের জেগে থাকার সব সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসেও মিথ্ আর মুখফেরতা আখ্যান ফিরে ফিরে আসে। চিলেকোঠার সেপাইয়ের কালস্থানিকতা ‘খোয়াবনামা’র মতো বিস্তৃত নয়; ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ও একটি গ্রামের জনজীবনের গভীর প্রতিক্রিয়া ও সক্রিয়তার আখ্যান। কিন্তু, মুখফেরতা কাহিনি, লোকশ্রুতি, পরম্পরা-আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, শাসক-শাসিতের আকাজ্ঞাগত দ্বন্দ্ব এবং নিম্নবর্গের চেতনার স্ফূরণ এই উপন্যাসেরও শিরদাঁড়া। এই উপন্যাসেও উল্লেখ্য থাকে বৈরাগীর ভিটার। ততদিনে প্রায় আড়াই দশক পার হয়ে গেছে¹⁶। বৈরাগীর ভিটের মিথ্ ততদিনে আরও আবছা এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের স্মৃতি আরও ফিকে

হয়ে গেছে। আনোয়ারের শহুরে আধুনিকতা ও ভদ্রলোকীয় যুক্তিবাদী চেতনায় বৈরাগীর ভিটে অবাস্তব আর ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অন্ততঃ তার পাঠ্যসূচীতে ছিল না কখনও। তার শহুরে তচ্ছিল্যসূচক ভাষা, ‘বৈরাগীটা’ বা ‘ও, বৈরাগী তাহলে সত্যি সত্যি ছিলো? আমি ভেবেছি স্রেফ গল্প!’ (ইলিয়াস ২০১৫, ১৩৩) শুধরে দেয় গ্রামের জালাল মাস্টার। ফকিরদের বিদ্রোহ নিয়ে আনোয়ারের প্রতিটি ঠাট্টার জবাবে জালাল মাস্টার তাকে পৌনে দু’শো বছর আগের ইতিহাসের পাঠ দিতে উৎসাহী হয়! এখানেও আবার ফিরে আসে ইতিহাস ও কাল্পনিকতার দ্বন্দ্ব এবং মনগড়া গল্পের সঙ্গে মুখফেরতা মিথের সম্পর্ক। ‘খোয়াবনামা’-র সঙ্গে ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র আরও এক আখ্যানসঙ্গতি আবিষ্কার করা যায় এই অধ্যায়ে এসে। বৈকুণ্ঠ বা চেরাগ আলির পাওনা শোলোকের মতো এই উপন্যাসে জালাল মাস্টার সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহীদের মিথেমেশা-ইতিহাস মুখফেরতা আখ্যানে প্রজন্মান্তরে চারিয়ে দিতে চায়। সৌমেন সেন তাঁর ‘Orality and beyond’ গ্রন্থে মৌখিকতা কীভাবে ইতিহাসলেখর পরিসরে ঢুকে পড়ে সেই বিষয়ে লিখছেন,

To examine the process of history, a school of contemporary historians believes in the strength of oral narratives and takes them not as ‘simple utter-reflective memory’ but rather as ‘deliberately structured by their tellers for immediate purposes and audiences. And in producing their work, oral historians constantly negotiate between the past and the present’... emphasis on ‘memory’ and its authenticity is the core factor in the approaches of this school of thought... they want to see ‘historical events’ through oral accounts as alternative discourses to what is available in reported, recorded and transcribed written history. (Sen 2010, 41-42)

আনোয়ারের পঠিত ও জ্ঞাননির্মিত ইতিহাসবোধের সঙ্গে জালাল মাস্টার ও তার গ্রামের মানুষদের ইতিহাসবোধে অনপনয়ে দূরত্ব থেকে যায়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে উচ্চবর্গের বাবুদের সঙ্গেও বৈকুণ্ঠ আব তমিজের বাপ বা যুধিষ্ঠির পালেদের এমনই দূরত্ব থাকে। লিখিত ইতিহাসাখ্যানের উল্লেখ (‘আনন্দমঠে’র উল্লেখ) শিক্ষিত-ভদ্রলোকেরা নাকচ ক’রে দিয়েছিল ভবানী সন্ন্যাসীর বীরগাথা। ভবানী সন্ন্যাসীর নামে অনুষ্ঠিত পোড়াদহের মেলা হিন্দুত্ববাদী প্রতর্কে হয়ে গেছিল মা ভবানীর মেলা। আর, ‘চিলেকোঠার’ সেপাই’-তেও আনোয়ার বারবার অবিশ্বাস-ঠাট্টা-যুক্তিবোধ-ইতিহাসের দেয়ালের ভেতর ঠোঁকর খেতে থাকে। জালাল মাস্টারের বয়ানে মুখফেরতা কাহিনি প্রতিরোধের সনাতন ঐতিহ্য বহন করে, কিন্তু সেখানে কিছু ‘ধূসর অঞ্চল’ তথা ‘অসংজ্ঞায়িত ঘটনাক্রম’ থাকে, ইতিহাস বা মুখফেরতা কোনওটিতেই তাকে পূরণ করা যায় না¹⁷। “বটগাছের নিচে মজনু শাহ্ কি মুসা শাহ্- জালাল মাস্টার ঠিক বলতে পারে না- এই ২জনের ১জনের প্রধান সাগরেদ সুলতান শাহ্ ১টি মজুব খোলে। সুলতান শাহ্ চিরকুমার, তার মৃত্যুর পর তাই ভাইপোর ছেলে কুদ্দুস শাহ্ করলো পাঠশালা।” (ইলিয়াস ১৩৫) ইতিহাস ও মুখফেরতা আখ্যানের মিসিং লিঙ্ক বা নিরুদ্দেশ সূত্র হয়ে থেকে যায় ওই কুদ্দুস শাহ্, যে জালাল মাস্টারের প্রপিতামহ। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের আড়াই দশক পরে ফের একই আখ্যানের উল্লেখ ইলিয়াস বোধহয় দেশভাগ থেকে দেশভাগোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে ধরে রাখতে চান। এবং মূল ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রায় দু’শো বছর পরে ওইসব ঘটনা ইতিহাস-মিথ-মুখফেরতা ইত্যাদির মেলানোমেশানো দ্বিরালাপে শাসিতের প্রতিরোধের ধারাবাহিকতার উল্লেখ রাখতে চান। জালাল মাস্টার ভবানী সন্ন্যাসী, মজনু শাহ্দের ব্রিটিশবিরোধিতার কাহিনির সঙ্গে জুড়ে নেন নেহরু-গান্ধী-হক-কায়েদে আজমের নাম, স্বাধীনতার লড়াই। “Oral history is a particular form of narrative that intentionally shapes what the teller knows about the past events in order to create meaning for them” (Singer 1997, 7-8) জালাল মাস্টারের উদ্দেশ্য তার পূর্বপুরুষ কুদ্দুস

শাহের কথা শহুরে-শিক্ষিত আনোয়ারকে জানানো, মজনু ও ভবানীর মিলিত সংগ্রামের কথা বলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উসকে দেওয়া। কিন্তু, লেখক ইলিয়াসেরও কিছু উদ্দেশ্য থাকে বৈকি! জালালউদ্দিন অভিমানের সুরে বলে, “খানদানীরা কেউ অগ্রসর হয় ফকির-সন্ন্যাসীদের সহায়তা করলো না। তারা সব নীরব হয় থাকলো।” (১৩৪)- ওই খানদানীরাই উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে উচ্চবিভূ-মধ্যবিভূ উচ্চবর্গ শিক্ষিত অংশে রূপান্তরিত হল, যারা দেশের অগণিত নির্বিভূ-নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করায় সহায়তা করলো না। এমনকি কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক আনোয়ারের সঙ্গেও ফকির-সন্ন্যাসীদের দূরত্ব বেড়ে গেল প্রচুর এবং আলিবক্স-চেংটু-জালালদের শ্রেণিআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের সংগ্রামে আনোয়ার-আলতাফ-আলাউদ্দিনরা হয় বিরুদ্ধপন্থী নয়তো নীরব হয়ে থাকল। জালাল মাস্টারের ফিরিয়ে আনা মুখফেরতা আখ্যান আর সন্ন্যাসী-পীরের কাহিনিতিহাসে ইলিয়াস তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করেন। মৌখিক ইতিহাসের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা আখ্যানকে রাজনৈতিক ও বিকল্পপ্রস্তাব ক’রে তোলে। ‘মানুষের ইতিহাস’-র ক্ষমতাকে আখ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দেন ইলিয়াস।

‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘কমুনিস’ ও ‘অপারেশন? বসাই টুডু’- শ্রেণিবোধ ও রাজনৈতিক উত্তরণ

এই উপন্যাস দু’টিকে চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাস হিসেবে অনেক সমালোচক দেখলেও, আমার কাছে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবেই এদের উজ্জ্বল অবস্থান। চেতনাপ্রবাহরীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের মনের অন্তর্জগতের বিভিন্ন জটিল টানাপোড়েন এই ধরনের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রধান কুশীলবদের মনের বহু বিচিত্র, অসম্ভব ও অসংলগ্ন চিন্তা এই উপন্যাসের ভাষা ও আখ্যানকাঠামো জুড়ে থাকে। আখ্যানকথকের রীতি হিসেবে স্বগতকথন, সর্বজ্ঞ কথন ও অন্তর্ভাষণ ব্যবহার করেন লেখক। কাল-স্থানের না-একরৈখিক (non-linear) যাত্রাপথে আখ্যান এগিয়ে চলে। ১৯১৮ সালে মে সিনক্লেয়ার প্রথমবার এই চেতনাপ্রবাহের উল্লেখ করেন ডরোথি

রিচার্ডসনের ‘পয়েন্টেড রুফস্ (১৯১৫)’-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে। ওসমানের চেতনাপ্রবাহ বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে যখন আইয়ুব খানের মৃত্যুদৃশ্যের (যে মৃত্যু তার হ্যালুসিনেশনে ঘটেছে) বর্ণনা করে, সর্বজ্ঞ আখ্যানকথকের কথনে যখন সময়-স্থান ওলোটপালট হয়ে যাওয়া মিছিলদৃশ্যের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়, তখন উইলিয়ম জেমসের “It is nothing jointed; it flows. A 'river' or a 'stream' is the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it hereafter, let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life.”¹⁸ সংজ্ঞায়ন স্পষ্ট হয়। ওসমানের স্বগতকথন তার দৃষ্টিবিভ্রম ও চিন্তাবিভ্রাট ঘটায় আগে থেকেই অনুধাবন করেছেন কথক। ওসমান তার চিলেকোঠার ঘরে রঞ্জুর বোনকে যেভাবে নিয়তকল্পনায় নিয়ে আসে কিংবা তার স্বগতকথনে দেশভাগ-পরবর্তী স্মৃতিকথায় কালস্থান গুলিয়ে যায়।

রানু কি বিছানায় ওর পাশে বসবে?? সেই সময় ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওকে পাশে শুইয়ে দেওয়া যায় না?- দূর। এই মেয়েটার ভাবনা তার ঘুমটা নষ্ট করে দিলো। ছাদে একটু পায়চারি করে আসবে নাকি? গা থেকে লেপ সরিয়ে ওসমান একবার ওঠার উদ্যোগ নিলো। না, ঠাণ্ডা লাগছে। এর মধ্যে ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু মতিঝিল কি নবাবপুরের আগুনের আঁচে বারবার ঘুম ভেঙে যায়। পাতলা ঘুম কি তন্দ্রায় আগুনের শিখার পাশে দ্যাখা যায় হাজার হাজার মানুষের লালচে শক্ত মুখ। (ইলিয়াস ২০১৫, ১৫৮)

ওসমানের চিন্তাসূত্রের বিপর্যয় আখ্যানকথক পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। খিজিরের চিন্তাস্রোতের দিকে তাকালেও চেতনাপ্রবাহের রীতি বোঝা যায়। রিকশার মহাজন আর আইয়ুব খানের প্রতি ক্রোধে সে যে ভাবনাগুলো ভাবে, তার সহশ্রমিক রিকশাওয়ালাদের নিয়ে শোষণের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে চেয়ে তার যে অলীক কথোপকথন, কিংবা সে মারা যাওয়ার পরেও ওসমানের চেতনাপ্রবাহে ঘাঁটি গেড়ে ওসমানকে চেতিয়ে তোলার জন্যে তার কথোপকথন-

চেতনাপ্রবাহ রীতির সূত্র মনে করিয়ে দেয়। “abound not only in critical situations, but with what may be called instantaneous descriptions and reflections (proper to be brought home to the breast of the youthful reader;) as also with affecting conversations; many of them written in the dialogue or dramatic way.”¹⁹ রিচার্ডসন তাঁর উপন্যাসের ভূমিকায়, উপন্যাসটি যে চিঠিপত্রের প্রকরণে লেখা হয়েছিল, সেই চিঠিগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন ওই কথাগুলি। ‘চিলেকোঠায় সেপাই’-তে খিজির যে পরিস্থিতিতে ঢাকার রাজপথে মিলিটারির গুলিতে মারা যায়, সেই বর্ণনা চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রতি ইঙ্গিত করে। “চোখের সামনে উল্টোদিকের সাদা দেওয়ালে লেখা লাল শ্লোগান ল্যাম্পোস্টের হলুদ আলোতে একটু একটু দোলে। ঐ দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথে টিয়াপাখি দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে ১বুড়ো, সেই লোকটি ১টি ছায়া হয়ে ১বার ওপরে ওঠে, ১বার নামে...” (২৬০-১) গুলিখাওয়া খিজির মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দৃষ্টিবিভ্রম ও অসংলগ্ন চিন্তাস্রোতে যে ঘটনাগুলি ঘটতে দেখে, তাতে সময় আর স্থান গুলিয়ে যায়। নিজের দেহকে রিকশার ভাঙা চেসিসের সঙ্গে তুলনা করে, ঢাকার রাজপথ অলি-গলিতে মহাজনের নিষেধ অমান্য ক’রে রিকশার প্যাডেল ঘুরিয়ে চষে বেড়ায় খিজির। মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তের ওই দীর্ঘ চেতনাপ্রবাহে তার মুক্তির সন্ধান, নিজের মা ও জুম্মনের মায়ের প্রতি যত্ন-ভালবাসা সব প্রকাশ পায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন্যাসে বাবা-মা ও দুই ভাই চারটি আলাদা জেলকুঠুরিতে বসে বিনিদ্র রাতে যে কথাগুলি ভাবে, তাতে কালগত সামঞ্জস্য থাকে না। ফাঁসির আগের রাতে বিলুর জবানীতে স্মৃতিচারণ কিংবা তার মায়ের স্মৃতিচারণ, অথবা নীলুর স্মৃতিচারণে বিলুর কথা, “একেবারে নীলকণ্ঠ। সাহসের অভাব তাহার নাই, ভয় পাইয়া কোনো উচিত কাজ ছাড়িয়া দিতে আজ পর্যন্ত তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু তাহার রক্ত যেন গরমই হয় না।” (৫৭)- এই প্রত্যেক চরিত্রের কথনের অসংলগ্নতা ও কালগত অসামঞ্জস্য থেকে পাঠক সামগ্রিকভাবে একটি আখ্যানসূত্রের হদিশ পেয়ে যান। ১৯৪২-র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসটিতে চারটি চরিত্র যে পৃথক রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, সেই রাজনীতির হদিশও পাঠক পেয়ে যায় এই

চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগে। এই ধরনের উপন্যাসের উদ্দেশ্যই তাই, চরিত্রদের চিন্তার অনুরণনে আখ্যানপ্রেক্ষিত (plot) ও আখ্যানউদ্দেশ্যের হৃদিশ দেওয়া। কিন্তু, চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও, ‘চিলেকোঠার সেপাই’ ও ‘জাগরী’ রাজনৈতিক উপন্যাস।

‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে ইলিয়াসের চিন্তাসূত্রকে আখ্যানকথক যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাকে কি শুধুমাত্র ‘চেতনাপ্রবাহ রীতি’-তে বেঁধে দেওয়া যায়? কারণ, চেতনাপ্রবাহরীতির অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য যদি হয় অসংলগ্নতা ও মনের অন্তর্জগতের জটিল টানাপড়েন, তা’লে খিজিরের চিন্তাসূত্রের মধ্যে এই দু’টিই উপস্থিত থাকলেও, সেই জটিলতা ও অসংলগ্নতার মধ্যেও একটা বিশেষত্ব থাকে- তার শ্রম। খিজিরের শ্রমের বাহন রিকশা তার ওই চিন্তাসূত্রে ফিরে ফিরে আসে। খিজিরের মৃত্যুর আগে রিকশার ভাঙা চেসিসের সঙ্গে নিজের শরীরের তুলনায় কিংবা রিকশা নিয়ে শহরের রাজপথ-গলি চষে ফেলার বর্ণনায় শ্রমের অনুবাদ। খিজির যখন জুম্মনের মায়ের পোয়াতি হওয়ার খবর শোনে, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার চেতনাপ্রবাহে যে বর্ণনা চলতে থাকে, তাকে শুধুই চেতনাপ্রবাহরীতিতে বাঁধা যায় না। সেখানে অন্য বাস্তবতার নজির, সেখানে শ্রমের উদ্‌যাপন!

মাথার ভেতরকার একটা জাম যেন কেটে যাচ্ছে, রিকশার প্যাডেলে দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, সামনের মাল বোঝাই ট্রাক তার রিকশাকে সাইড দেওয়ার জন্যে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু সামনের রাস্তা বড়ো ফাঁকা, এই মস্ত রাস্তায় কি তার রিকশা ছাড়া কোনো গাড়ি নাই? এই খাঁ খাঁ রাস্তায় রিকশা চালাবার সুযোগ পেয়ে সে একটু বিচলিত হয়। নতুন অর্পিত দায়িত্বভারে তার হাড়িসর্বস্ব বুক চওড়া হতে থাকে-” (ইলিয়াস ২০১৫, ১৭৮)

নতুন প্রাণের আগমনে তার ওপরে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হতে চলেছে, সেটাকেও খিজির অনুবাদ ক’রে নেয় শ্রমের ভাষায়। মৃত্যু থেকে শুরু ক’রে নতুন প্রাণের উল্লাস- সবটাকেই সূত্র হিসেবে

থেকে যায় তার রিকশা, তার শ্রম। সাহিত্যের রাজনীতি এবং সেই রাজনীতির ভাষা তাতে নির্দিষ্ট অভিমুখ পায়। সাহিত্যের রাজনীতি নিয়ে Ranciere লিখেছেন,

The expression ‘politics of literature’ thereby implies that literature intervenes as literature in this carving up of space and time, the visible and the invisible, speech and noise. It intervenes in the relationship between practices and forms of visibility and modes of saying that carves up one or more common worlds. (Ranciere 2011, 4)

‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর রাজনীতি আলোচনায় এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। বহুস্তরীয় এই উপন্যাসে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের দ্বন্দ্ব এবং মৃত-জীবিতের দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটাই সমগুরুত্বে উজ্জ্বল। রাজনীতি শুধু বহিরঙ্গের প্রভাব নয়, বরং উপন্যাসের অঙ্গাঙ্গী; এর একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে উপন্যাসে উচ্চারিত বহুমাত্রিক শ্লোগানে। একই আখ্যানের মধ্যে উল্লিখিত শাসিতের আন্দোলনে উচ্চারিত হচ্ছে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের শ্লোগান- জাতীয়তাবাদী শ্লোগান এবং শ্রেণি সংগ্রামের শ্লোগান। ‘পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা’, ‘জাগো জাগো বাঙালী জাগো’ শ্লোগানের অনুরণন আখ্যানের ব্যপ্ত রয়েছে; তেমনই, ‘মিল মালিকের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’, ‘কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না’ শ্লোগানের নির্যাস আখ্যানে মিশে থাকে। ওসমানের মতো নিরাপত্তালোভী, নিশ্চয়তাকামী মধ্যবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য একটু একটু ক’রে ভেঙে চুরমার হয়ে হাড়ি খিজিরের অনিশ্চিত, দ্রোহকামী জীবন প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে ওসমানেরই চেতনায় ও আচরণে। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উত্তরণের প্রস্তুতিপর্বের আখ্যান। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ক্রোধে ফেটে পড়ার ও আগামীর দ্রোহের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি, যদিও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত/নির্বিত্তের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার²⁰ ভিন্নতাকে অনুধাবন করা যায় এই উপন্যাসের ভাষায়, চরিত্রচিত্রণে এবং বিষয়বস্তুতে। ‘খোয়াবনামা’-র খোয়াবের অনুরণন

‘চিলেকোঠার সেপাই’-তেও চলে, কারণ মনে রাখা জরুরি যে, ‘চি.সে’ লেখা হয়েছিল ‘খোয়াবনামা’র দশ বছর আগে কিন্তু, ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানকাল ‘চি.সে’-র থেকে প্রায় দু’দশক আগে। এই উপন্যাসেও খোয়াব ফিরে ফিরে আসে কুশীলবদের চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে। খিজির তার খোয়াবে মহাজনকে আক্রমণ, মিলিটারিকে আক্রমণ করে। ওসমানের খোয়াবে আইয়ুব খান পুড়ে যায়। জুম্মনের মা, উপমহাদেশে পুরুষতন্ত্র ও উচ্চশ্রেণির দ্বারা নিয়মিত শোষিত এক নারী, তারও খোয়াব ঝলসে ওঠে। মহাজনের বাড়িতে নিজের শ্রম দিয়ে এসে, খিজিরের অকর্মণ্যতার প্রতি অভিমানে দগ্ধ হতে হতে তার খোয়াব আসে, “আমাদের মহাজনের বাড়িতে যদি আগুন লাগায়! আর পাবলিক কি খালি আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত দেবে? মহাজনকে চুল ধরে বাইরে টেনে আনবে না? তারপর ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে নিয়ে মারধোর করে যদি?... পাবলিক এসে মহাজনের চোখ দুটো উপড়ে নিচ্ছে...” (১৬৪) জাগরণে দেখা এই খোয়াবে বীভৎসতা আছে, কিন্তু এই খোয়াবে জুম্মনের মায়ের সুখ। মহাজনের অশ্লীল নজর, ধর্ষকাম এবং শ্রমশোষণের বিরুদ্ধে তার অসহায় অক্ষম ক্রোধ জাগরণে-দেখা-খোয়াবে ঝলকে ওঠে। তার ক্ষণেকের খোঁয়ারি ভেঙে যায় তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বাস্তবোপলব্ধিতে। “এই বুইড়াই তো মাথার উপরে একখান ছাদ দিয়া রাখছে।- মহাজনের বস্তিতে ভাড়া হয়তো একটু বেশি, কিন্তু এরকম নিশ্চিন্ত কাজের সুযোগ সে পাবে কোথায়?” (১৬৫) জুম্মনের মায়ের এই খোয়াবের গড়া-ভাঙ্গার সঙ্গে তমিজের খোয়াবের আশ্চর্য মিল! শরাফত মণ্ডলের জমিতে বর্গা দিতে দিতেই সে বাবলা ডাল দিয়ে শরাফতের গলায় মারার খোয়াব দেখে ফেলে। প্রথমে তেভাগার দাবিসম্পর্কে অসচেতন থাকলেও এবং কাঁটাওয়ালা বাবলাডাল দ্রোহী চাষীদের দিকে ছুঁড়ে মারলেও, পরে “কোন শালা কী মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বাবলাডাল একটার পর একটা গিয়ে লাগে জোতদারের গায়ে” (৬৪)। তারপর খোয়াবের মধ্যেই শ্রেণিসচেতন তমিজ আব্দুল আজিজের মুখে বাবলাডাল মারার চেষ্টা করে, তার চিন্তাভাষা তেভাগাবিরোধী থেকে তেভাগাকামী হয়ে ওঠে, শরাফতের প্রতি সমর্পণ বদলে যায় শরাফত-আজিজ-কাদেরদের বিরুদ্ধে শ্রেণিঘৃণায়, “জোতদার শালা ঝাড়েবংশে হারামজাদা, শালার একেকটা মাকুচোষা” (৬৪) শরাফতের কাছে

হাল-গোরু-জমি সব সূত্রে বাঁধা থেকেও তমিজের ক্ষণস্থায়ী খোয়াব আখ্যানের রাজনীতিকে গতিশীল রাখে। ক্ষণস্থায়ী খোয়াবে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়ে খোয়াবের ভেতরেই সক্রিয় অংশগ্রহণের এই আখ্যানকৌশলে জুম্মনের মা ও তমিজের তফাৎ নেই! আর, তমিজের ওই খোয়াবের বাস্তবভিত্তি ছিল খিয়ার এলাকায় তার দেখা ও শোনা তেভাগা আন্দোলনের উড়োগল্প। তেমনই, জুম্মনের মায়ের ক্ষণস্থায়ী খোয়াবের ভিত্তি পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থান, মহাজন-জোতদারের বিরুদ্ধে শোষিতের তীব্রতর জেগে ওঠার উড়োখবর। প্রায় একই সময়ে একই উপমহাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও শোষিতের খোয়াবের উদ্‌যাপন চলে। ‘কমুনিস’ উপন্যাসের লেখক সেই খোয়াবের সন্ধান পান এবং আখ্যানকথক আশ্চর্য আখ্যানকথনে সেই খোয়াব পাঠককে জানান, “বেলিয়াহাট্টা, পুতলিকলের বেলিয়াহাট্টা, যে খোয়াবের পুতুল বানায়! মানুষের স্বপ্নের মাটি দিয়ে গড়া পুতুল।” (১৬০) এই খোয়াব কোনও একজনের নয়, সম্মিলিত খোয়াব। বেলঘাটার শ্রমিকবসতি অঞ্চলের মানুষের সম্মিলিত খোয়াব এবং খোয়াবকে বাস্তবে পেড়ে ফেলতে চাওয়ার রাজনীতি নিয়েই রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস। আর, রাষ্ট্রের দমনপীড়নে সেই খোয়াব যে হারিয়ে যায় না, কিংবা অপরিসীম দারিদ্র্যেও খোয়াব দেখার অধিকার যে কেড়ে নেওয়া যায়না, সেই কথাও আখ্যানকথক জানিয়ে দেন, “ভুখের পেটে পা দিয়ে মজবুত মানুষ এখনও গান গায়। দিললাগি করে” (১৬১) এই ‘দিললাগি’ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে জুম্মনের মা, খিজিররাও করে। নবারণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ রণজয় এই খোয়াবেই বাঁচে। তার সামাজিক অবস্থান যদিও খিজির, তমিজ, সোনা, সুকুদের থেকে ওপরে, কিন্তু স্বশ্রেণিচ্যুত হওয়ার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সশস্ত্র গণআন্দোলনে যোগ দেয় সে। রণজয়ের খোয়াবে ‘ভুখ’ শব্দটা আসে না; তার ভদ্র-মধ্যবিত্ত অবস্থানের জন্যে কিংবা রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার জন্যেই হয়তো আসে না। কিন্তু, জোতদারকে মারার খোয়াব বা মহাজনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার খোয়াবের সঙ্গে রণজয়ের খোয়াব এক হয়ে যায়- খেয়াল রাখা দরকার খিজির, জুম্মনের মা, ওসমান, সোনা, নিবারণদার খোয়াবের সঙ্গে একই সময়ে (ভিন্ন

রাষ্ট্রে) রণজয়ও একই খোয়াবের অংশীদার। নারাণদা, গোরা এবং রণজয় একই দ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। আর, ভুলে গেলে চলে না যে, হারবার্টের জীবনে স্বপ্নের প্রভাব কীভাবে হারবার্টের যাপন ও অনুশীলনকেই পাল্টে দিয়েছিল। বিনুর মৃত্যুর পরে বিনুকে স্বপ্নে দেখে হারবার্ট, “স্বপ্নে বিনু এসেছিল... ওঃ সে কত কাগরে বাবা। কাচের এমুড়ো ওমুড়ো ঠুকরোচ্ছে আর ডানা ঝটকাচ্ছে। তার মধ্যে আবার গান হচ্ছে। বিনু ঠায় হাসছে। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তারপর কানে এল ফাঁকায় কতা বলার মতো। পষ্ট শুনলাম” (ভট্টাচার্য, ১৯৯৩, ৩৭) বিনুকে স্বপ্নে দেখার মধ্যে দিয়ে হারবার্ট একটা অমোঘ সূত্র পেয়ে গিয়েছিল যে, “এবার তার সময়। সব লগুভগু করে দিতে হবে। নকরাছকরা করে ফাংরাফাঁই করে বিশ্বসংসারে একটা তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে হবে” (৩৭) হারবার্টের পরবর্তী কর্মকাণ্ড যাবতীয় যুক্তিবাদ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবোধকে সত্যিই ‘ফাংরাফাঁই’ ক’রে দেয়। হারবার্টের এই খোয়াবের ভিত্তি ছিল বিনুর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিনুর মতাদর্শের সান্নিধ্যে আসা এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজকাঠামোর প্রতি ফল্গুধারায় বহমান ক্ষোভ। আর, এই সবই পরিণতি পায় শ্মশানে চুল্লির ভেতরে বিস্ফোরণে। বিনুর খোয়াব থেকে হারবার্টের খোয়াব ছুঁয়ে এসে একটা স্থিতিবস্থার সময়কে ওলোটপালট ক’রে দেয় ওই বিস্ফোরণ। উপরোক্ত উপন্যাসগুলির কুশীলবদের দেখা উপরোক্ত ওই খোয়াবগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে যে, এরা প্রত্যেকেই আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক এবং দ্রোহী; আর, এরা প্রত্যেকেই ইতিহাসের ঘটনাক্রমে এবং আখ্যানের বাস্তবতায় বিজিত।

‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে ইলিয়াস উপমহাদেশের শ্রেণিঐক্য নিয়ে প্রায় এক সন্দর্ভ লিখেছেন। সমাজবাস্তবতাবাদী উপন্যাসে কিংবা প্রগতিবাদী উপন্যাসিকদের রচনায় নির্বিক্রমের শ্রেণিঐক্য পূর্বনির্ধারিত। অনেক সময়েই ওই শ্রেণিঐক্য মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক পথের বাস্তবতারহিত অনুকরণ, আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব বাদ রেখে আখ্যানের নির্বিক্রম নিম্নবর্গেরা সমমনস্ক হয়ে যান। কিন্তু, শ্রেণির ভিতরেও যে দ্বন্দ্ব থাকে, অ-সরল বন্ধুতা-শত্রুতা থাকে, তা এই উপন্যাসগুলিতে থাকে না। কিন্তু, ইলিয়াস তাঁর লেখায় ‘লেখকের মনোবাহুগত চিন্তাসূত্র’কে প্রাধান্য দিয়ে শ্রেণিবোধ

চাপিয়ে দেন না না, বরং আখ্যানস্থিত কুশীলবেদের শ্রেণিবোধ আখ্যানের গতিপথে রূপান্তরিত হতে থাকে, উত্তরণ বা অবতরণ ঘটে। খিজির আর বজলুর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তা বোঝা যায়। এমনকি, খিজিরের বাস্তবতার বদল যেভাবে হয়, তাতেও বোঝা যায়। বজলু খিজিরের মতোই লুম্পেন প্রলেতারিয়েত; খিজিরের মতো সে রিকশা চালায় না, কিন্তু সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে বা ছিঁকেচুরি করে। বজলু মহাজন রহমতউল্লাহর পক্ষে সওয়াল করে, মহাজনের পক্ষ নিয়ে খিজিরকে মারতে আসে এবং খিজিরকে বলে, “কাউলকা তুই এই ঘর ছাইড়া দিবি। মহাজনের হুকুম” (১৬০) মহাজনের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করে বজলু। শ্রমিক মানেই যে তার মধ্যে সংগ্রামী চেতনা থাকবে, এমন নয়। মেহনতি মানেই যে সে শোষণের উপাদানগুলি চিনে নিতে পারবে, তা নয়। ইলিয়াস বা দেবেশ এই সত্য জানেন। খিজিরের মতোই রিকশাচালক এবং খিজিরের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিকতার সঙ্গে প্রভূত মিল তার। মার্ক্সের মতে, শ্রমিকেরা প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে নিজেদের শোষিত অবস্থান ও শ্রেণিক্ষোভের একাত্মতা থেকে সচেতন হন (class in itself) এবং এখান থেকেই ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে স্বশ্রেণিবোধ নির্মিত হয় (class for itself), গড়ে ওঠে নির্বিকৃত শ্রেণি। আর, এই ‘ইন ইটসেলফ’ থেকে ‘ফর ইটসেলফ’-র বদলাভিমুখে শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তাঁরা। “proletarian consciousness is simultaneously the discovery by the laborers of their extreme alienation and of their need to overcome such alienation through a form of action aimed at destroying the capitalist mode of production.”²¹ খিজিরের মধ্যে এই শ্রেণিচেতনা যেভাবে নির্মিত হয়, বজলুর মধ্যে তা হয় না। খিজিরের সঙ্গে তার শ্রেণিসংখ্য তৈরি হয় না বলেই আখ্যানে খিজির ও বজলু একই মহাজন এবং একই সমাজব্যবস্থা দ্বারা শোষিত হয়েও পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। বজলুর মধ্যে ‘দ্রাস্ত সচেতনতা’ তৈরি হয়, এঙ্গেলস যেমন লিখছেন, “The real motives impelling him remain unknown to him, otherwise it would not be an ideological process at all. Hence he imagines false or apparent motives.”²²

অর্থাৎ, কোনও নির্বিকৃত/শোষিত তাঁর শ্রেণিঅবস্থান বুঝতে পারেন না এবং সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞানতার কারণে মালিকের শোষণ-নিপীড়ন সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যান। উপন্যাসের ২৫ নম্বর অধ্যায়ে বজলুর সঙ্গে খিজিরের মারামারি তার উদাহরণ। ঠিক যে মুহূর্তে সমস্ত অসহায়তা ঝেড়ে ফেলে খিজির মহাজনের চোখে চোখ রেখে অধিকারের কথা তোলে, তখনই বজলু মহাজনের পক্ষ নিয়ে খিজিরকে আক্রমণ করে। “বাঁ হাতে প্লায়ার ও স্কু-ডাইভার এবং ডান হাতটি মুষ্টিবদ্ধ করে বজলুর দিকে এগিয়ে আসে খিজির... বজলুর নিম্নাঙ্গ বাদ দিয়ে প্লায়ার দিয়ে সে আঘাত করে বসে বজলুর কপালে! আর বজলু করলো কি, খুব জোরে একটা ঘুষি লাগালো খিজিরের বুকো। তার লক্ষ্য ছিলো খিজিরের মুখ” (১৭০) খিজির একাই মার খায় বজলু ও তার সঙ্গীদের কাছে, কিন্তু তার পাল্টা মারের সাহসে “মার হালার মহাজনের দালালরে মার”, “গাড়ি দিবো না কইলেই হইলো” বলে রিকশাওয়ালারা গ্যারেজের দখল নিতে আসে। যে মিটিং আলাউদ্দিন-আলতাফদের ডাকা, যে মিটিং মিছিলের নেতৃত্ব মধ্যবিত্তদের হাতে থাকার কথা, খিজিরের শ্রেণিচেতনার উন্মেষে ও সেই চেতনার ক্ষুদ্র সক্রিয়তায় খিজিরই হয়ে ওঠে সেই মিছিলের নেতৃস্থানীয়, “মেঝেতে রাখা একটি রিকশার সিটে ধপ করে বসে সে ঢালাও হুকুম ছাড়ে, ‘গাড়ি লইয়া বারাইয়া পড়ো, মিটিঙের টাইম যায় গিয়া!’ সত্যি সত্যি রিকশাগুলো বেরিয়ে যেতে থাকে।” (১৭১) আর, খিজিরের আচমকা নেতৃত্বে নির্বিক্তের চেতে ওঠায় রহমতউল্লা ও আলাউদ্দিন দু’জনেই ক্ষুব্ধ হয়, তাদের হাত থেকে পরিস্থিতির রাশ চলে যাওয়ায়। কিন্তু, আখ্যানের বিরোধাভাস চলতে থাকে নির্বিক্তের শ্রেণিচেতনতা ও অসচেতনতার মধ্যে। জেমসন তাঁর ‘পলিটিকাল আনকনশাস (১৯৮১)’ গ্রন্থে লিখছেন,

the prior moment of class consciousness is that of the oppressed classes (whose structural identity-whether a peasantry, slaves, serfs, or a genuine proletariat--evidently derives from the mode of production). On such a view, those who must work and produce

surplus value for others will necessarily grasp their own solidarity- initially, in the unarticulated form of rage, helplessness, victimization, oppression by a common enemy-before the dominant or ruling class has any particular incentive for doing so... ideological commitment is not first and foremost a matter of moral choice but of the taking of sides in a struggle between embattled groups. (Jameson 1983, 280-1)

বজলু তার স্বশ্রেণির পক্ষ নিতে পারে না। অন্যদিকে, রহমতউল্লা ও আলাউদ্দিন দু'ই বিরুদ্ধপক্ষের কাছে তারা দু'জনেই 'ভাড়াটে গুপ্তা' রূপে চিহ্নিত হয়। কিন্তু, খিজির এবং বজলুর মধ্যে দেওয়ালসম মহাজন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে খিজির ও বজলু উভয়েই "কখনো আফসোস করে, আবার কখনো তাকে গালাগালি করে। কিছুক্ষণ পরে কারফ্যু নামক সরকারী আদেশটির সঙ্গে নানাভাবে শারীরিক সঙ্গম করার স্পৃহা জানায়।" (২৩৬) বজলুর সম্বোধনে খিজির 'দোস্ত' হয়ে ওঠে। মহাজনের অমঙ্গল কামনায় এবং রাষ্ট্রের মিলিটারি বাহিনীর পতন কামনায় শ্রেণিসংযোগ স্থাপিত হয় দু'জনের মধ্যে। আর, খিজির এরপরে উপন্যাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোগটি ঘটিয়ে ফেলে- ওসমানের শ্রেণিঅবস্থানকে ঘেঁটে দেয়। ওসমানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের যোগসূত্র হয়ে ওঠে খিজির। ওসমান যখন যৌনতা ও মৃত্যুর জটিল স্বপ্ন দেখছিল, তখন তার ঘুম ভাঙিয়ে ঘরে ঢুকে পাকিস্তানবিরোধী মিছিলের বিবরণ দিতে থাকে ওসমান।²³ ওসমানের 'ফলস্ কনশাসনেস্' চিহ্নিত ক'রে দেয়। 'অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)'-র বসাই টুডু ভ্রান্ত মতাদর্শ তথা ফলস্ কনশাসনেসের প্রভাবমুক্ত হতে পারে বলেই সামন্তকে চিনতে পারে। সামন্তর শ্রেণি অবস্থান, কালী সাঁতারার শ্রেণি অবস্থান এবং তাদের শুভানুধ্যায়ী সেজে 'বাবু'দের ক্ষমতায়ন করতে চাওয়া সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণি-অভিমুখ সম্পর্কে সচেতন হয় সে। যে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষকসভার হয়ে লড়াই করেছে, আন্দোলন করেছে সেই কৃষকসভা যে তাদের মতো আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের জমির অধিকারের প্রশ্নে উদাসীন থেকেছে,

বসাইয়ের তা উপলব্ধি হয়। এবং, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে আস্থা রেখে জান লড়িয়ে দেওয়ার পরেও সামন্ত ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের কমিউনিস্ট নেতার চোখে সে সাঁওতাল, অস্পৃশ্য, ‘অ-শিক্ষিত’ ‘অ-ভদ্রলোক’ বলে অমর্যাদা পেয়েছে- এই সচেতনতা তার হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রেণির সঙ্গে জাতি ও বর্ণের সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বসাইয়ের এই উপলব্ধি হয় এবং বসাইয়ের আখ্যানের মধ্যে দিয়ে আখ্যানপাঠকও সচেতন হন। একই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও এবং দ্রোহে ভূমিকা রেখেও ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার জাতি-বর্ণগত বৈষম্য অনুশীলিত হতে দেখে বসাই। আর, সেই উপলব্ধি থেকেই কৃষকসভা এবং উক্ত সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বসাই নিজেদের জনজাতির দ্রোহের পথ প্রস্তুত ক’রে নেয়। শ্রেণিসচেতনতার সঙ্গে বর্ণ-জাতির সচেতনতায় ‘ক্লাস-কাস্ট ইন ইটসেলফ’ থেকে ‘ক্লাস-কাস্ট ফর ইটসেলফ’ যাত্রাপথে স্বশ্রেণি ও স্বজাতিবোধ নির্মিত হয় বসাই ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে। বসাইও চিনতে পারে নিজের শ্রেণি ও জনজাতির জন্যে রাষ্ট্রের সবরকম শোষণমূলক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

বেলেঘাটার রঙকল, হাড্ডিকল, সিক্লিকল এবং আরও অসংখ্য ছোটখাট কারখানার অসংগঠিত শ্রমিকদের শ্রেণিবোধ অবয়ব পেতে থাকে ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে। এঁদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ, ঝগড়ার পরেও শ্রেণিঐক্যের চেতনাও থাকে; খিজির কোনও নারাণদাকে পায়নি। কিন্তু, সুকু, গোরা, সুবলারা নারাণদাকে পেয়েছিল। আখ্যানের এই নারাণদা কোনও অতিমানব নয়, বিপ্লবীসুলভ আরোপিত গুণাবলী বহন করে না। ছোট কলগুলির অসংগঠিত শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনার ধরতাইটুকু দিত কমিউনিস্ট শ্রমিক নারাণদা,

গেলাস ফ্যাক্টরির কাঁচা নর্দমার ধারে, নর্দমার ওপরকার ব্যাকারির মাচানে আমি, সুবলা, বিজয়ের হাতের কবজি টেনে বাতচিতের আগল খুলে দিত কোম্পানির খিলাপে... স্টারটেকসের মজদুর ছাঁটাই হলে গেলাস ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা যদি নিদ যায় তো ইউনিটি কি আশমান থেকে আসবে?” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১৪১)

সোনা সুকু মিনু নিবারণের মতো বিক্ষুব্ধ যুবকযুবতী বা শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা ঔপন্যাসিকের মনগড়া আকাঙ্ক্ষাপথ ধরে আসে না। তারও নির্দিষ্ট অনুশীলন থাকে। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠার অনুশীলন থাকে। ইলিয়াসের মতোই রাঘবও নির্বিকারত্ব প্রয়োগ করেন আখ্যানকৌশলে। ইলিয়াস বা রাঘব সেই সময়টুকুকে শুধু পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে চান, যে সময় খিজির, ওসমান, আনোয়ার বা সোনাকে রাজনৈতিক ক’রে তুলেছিল। যে সোনা প্রায় ‘অশিক্ষিত’, যে সোনা অ-ভদ্রলোক ও যে সোনা রাজনৈতিক পোস্টার লিখতে জানত না, তার উত্তরণ ঘটে কমিউনিস্ট দ্রোহপর্বের কালস্থানিকতায়- “মামুলি কাজের কথার পোস্টার সোনা খুব কমই লিখেছে। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে ও মানুষের মন ধরে হ্যাঁচকা টান দিতে চাইত। কথাগুলো বিঁধিয়ে দিতে চাইত। পোস্টার তো নয়, কবিতা।” (৭৯) আর, এই উত্তরণের সূত্রগুলোই কোনও আখ্যানকে রাজনৈতিক আখ্যান ক’রে তোলে। পাঠকের শ্রেণিবোধেও কি অস্থিরতা তৈরি করতে চায়?

শ্রেণিবোধের আরও এক উদাহরণ রহমতউল্লা ও আলাউদ্দিনের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। রহমতউল্লা মহাজন, ‘খোয়াবনামা’র শরাফত মণ্ডলের মতোই লোভী, সর্বগ্রাসী মানসিকতার লোক সে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণিতে তার অবস্থান। আলাউদ্দিন তার ভাগ্নে কিন্তু সে আইয়ুব খানের বিরোধী; ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে আব্দুল কাদের বা আজিজ যেমন মুসলিম লিগের সমর্থনে শাসকবিরোধিতা করে কিন্তু শোষণকাঠামো অপরিবর্তিত রাখতে চায়, আলাউদ্দিনও তেমনই আইয়ুব খান ও খানসেনাদের বিরোধিতা করেও শহুরে শোষণকাঠামোর বিরোধিতা করে না। রিকশা-শ্রমিকদের নিয়ে সে মিছিলে লোক জড়ো করে বা সভা ভরায় যাতে বিরোধী-রাজনীতিতে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, আলাউদ্দিন মিয়া সেই সুবিধাভোগী শ্রেণির, যারা ক্ষমতালান্ধের জন্যে নির্বিকার আন্দলনকে ব্যবহার করে নেয়। “এরা আন্দোলনের কি বোঝে? রাজনীতির কি বোঝে?... এদের ছাড়া আন্দলন হয় না, কিন্তু এদের হাতে আন্দোলন চলে গেলে মুশকিল” (১৭২) ইলিয়াস এই সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বারবার তাঁর আখ্যানে

উন্মোচন ক’রে দেন। আর, এদের কাছে নির্বিত্তের শ্রেণিঐক্য নয়, বরং মধ্যবিত্তের ক্ষমতায়নের স্বার্থে নির্বিত্তের আনুগত্য আদায় ক’রে নেওয়া মূল্যবান²⁴। মুজিবর রহমানের ছয় দফা দাবি আদায়ের দাবি সমর্থন ক’রে ভাষণ দেয় আলাউদ্দিন, বাঙালির স্বার্থরক্ষার দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব সে। কিন্তু, সে আতঙ্কিত হয় রিকশাশ্রমিক ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবে। শ্রেণিসচেতনতা নয়, বরং বাঙালি মধ্যবিত্তের দৌল্যমানতা তার মধ্যে প্রকট। সে রাষ্ট্রবিরোধী কথা বললেও, আসলে তার নির্যাস বাঙালি জাতিসত্তা, কোনওভাবেই নির্বিত্ত-নিম্নবর্গের শ্রেণিসত্তার স্ফূরণ নয় তা বোঝা যায় তার কথায়, “আরে পাগলা, মাহাজন তো থাকবোই... তরা ভি মাহাজন হইবার পারস একদিন! তহন তগো গাড়ি না কইয়া বাইর করতে দিবি?” (১৭২) রিকশাশ্রমিকদের রিকশা নিয়ে মিছিলে যোগ দেওয়ার দাবি বা মাহাজনের গ্যারেজ ভাংচুর ক’রে রিকশার অধিকার নিজেদের হাতে নেওয়ার দাবিতে আলাউদ্দিন, আলতাফেরা আতঙ্কিত হয়; কারণ তাতে মধ্যবিত্ত শান্তি-স্বস্তি বিব্রত হয়। আলতাফকে তার ভাষণে ছাত্র-শ্রমিকদের সর্বাত্মক বিদ্রোহকে ‘হঠকারিতা’ ও ‘বাঙালির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টির চেষ্টা বলে উল্লেখ করতে হয়। আলতাফ- আলাউদ্দিন বা মধ্যবিত্ত সাবধানী সুবিধাবাদী নেতাদের প্রতিরূপ কি ইলিয়াস শেখ মুজিবরের মধ্যেও দেখেছিলেন? কারণ, আলাউদ্দিন-আলতাফের উক্ত ‘সতর্কতা’ দিয়ে শ্রমিকবিদ্রোহের সর্বাত্মক দ্রোহকে আটকানো মুশকিল ছিল। “কিয়ের মাহাজন? গাড়ি চালাই আমরা” (১৭২)- শ্রমিকদের এই প্রবল শ্রেণিসচেতনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দ্রোহ ও ‘মাহাজনের গদিতে- আগুন জ্বালো একসাথে’ স্লোগানের মর্মবস্তুকে ধারণ করা আলতাফদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইলিয়াস শেখ মুজিব সম্পর্কেও একই কথা বলছেন, “সেদিন তাঁর চোখে আমি দেখেছিলাম ভয়, nothing but fear। ভাবছেন বোধহয় এই লোকগুলোকে তিনি কোথায় নিয়ে যাবেন?... মানুষ তো তখন শুধু পাকিস্তান থেকেই মুক্ত হতে চায়নি আরও অনেক কিছু চেয়েছিল” (ইলিয়াস বাঘের বাচ্চা, ৬৪-৫) আলাউদ্দিন-আলতাফদের চোখেও ওই ভয় ছিল। মাহাজন ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে তাঁরা আলাদা বর্গভুক্ত করেছিলেন, খিজির ও রিকশা-ইউনিয়নের

অধিকাংশ শ্রমিক তা করেনি। অথচ, এই মধ্যবিভদের হাতেই ছিল নেতৃত্ব, তাই তাঁদের হুকুম দিতে হয়, “রিকশাচালক ইউনিয়নের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনারা মহাজনদের রিকশা ফেরত দিয়া মিছিলে আসেন। (১৭৩)” নিম্নবর্ণ ও নির্বিত্তের এই জেগে ওঠা তথা শ্রেণিঘৃণা চেংটু, আলিবক্সদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। খয়রার গাজী আর হোসেন আলি ফকিরের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষ জেগে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দুই প্রতিনিধি তারা- অত্যাচারিত কৃষকদের জনরোষ আছড়ে পড়ে,

পচার বাপের হত্যকারীদের খতম করে যমুনা পার হয়ে ধারাবর্যা। হোসেন আলিকে ধরে নিয়ে সোজা ডাকাত-মারা চর। বাথানের সব গোরু খুলে দাও, খতম করো হোসেন আলি ফকিরকে- মনে পড়ে? একবার নিজের কিশানকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছিলি, মনে আছে?- এইবার বুঝবি মানুষের হাতে মরতে কেমন লাগে। ধারাবর্যা থেকে ফিরে এসে ধরে খয়রার গাজীকে। (ইলিয়াস ২০১৫, ১৯৮-৯৯)

আনোয়ারের মতো ভদ্রলোক-মধ্যবিভ-শিক্ষিত দ্রোহীর হাতে গণজাগরণের রাশ আর থাকে না। নির্বিত্ত ও নিম্নবর্ণের অভ্যুত্থানের নেতা সে হতে পারে না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আনোয়ারের এই হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং হতে না-পারার গ্লানিকেও শ্রেণিবোধ দিয়েই প্রকাশ করেন। আনোয়ারের শ্রেণিচেতনা আলাউদ্দিন-আলতাফদের থেকে আলাদা, কিন্তু তাদের শ্রেণি-অবস্থান একই। তাই জন্যেই চেংটু-আলিবক্সদের সশস্ত্র শ্রেণিক্ষোভের সিদ্ধান্তে তার নেতৃ-মানসিকতা আহত হয়, “এতো সিরিয়াস ১টা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাকে ১বার কেউ জিগ্যেসও করলো না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তার কোনো ভূমিকাই নাই।” (১৯৮) কিন্তু, আনোয়ার বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, আলতাফদের মতো শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। সে নির্বিত্তের ক্ষমতায়নের বাস্তব অনুশীলন দেখে বিমূঢ় হয়ে যায়, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগে; আবার, নির্বিত্তের ক্ষমতায়নের তত্ত্বে বিশ্বাসী বলেই “আনোয়ার বড়ো কাচুমাচু হয়। ছি, ছি। সে কি নেতৃত্বের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে? চেংটু তাকে ভাবলো কি?” (১৯৯) ভেবে গ্লানিবোধ করে।

‘কমুনিস’ উপন্যাসের এ.বি কি এই আনোয়ারের প্রতিরূপ? উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আর উনসত্তরের নকশাল আন্দোলন- আনোয়ার এবং এ.বি দুই বাংলার দুই দ্রোহের মধ্যবিন্দু নেতা। “অশোক নামের কাঁচা আবেগটা পোড় খেয়ে, ওপরতলার নেতাদের সাথে ওঠা-বসা করে, নীচের তলার দাদা হয় এখন অদ্ভুত হাফ নেতা এ.বি। পোড়াআঙুর। তেড়া হাসি। বেদম রিস্ক। ওর ওপর কথা চলে না। কেমন একটা মিলিটারি মেজাজ। নেতৃত্বের মোহ? নাকি নেশা?” (১০৫)

কিন্তু, আনোয়ারের সঙ্গে এ.বির কর্মক্ষেত্রের অমিল যেমন থাকে, মিলও থাকে কিছু। আনোয়ার শ্রেণিসংগ্রামের চেতনায় জেগে ওঠা বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের নাড়ির গতি বুঝতে পারে না; কিন্তু, এ.বি শ্রেণিসংগ্রামে জারিত শ্রেণিহিংসার তত্ত্বকে আরোপ করে দিতে চায় তার কমরেডদের ওপরে। দুই ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আনোয়ার ও এ.বি তাদের মধ্যবিন্দু রোম্যান্টিকতা থেকে নিম্নবর্গ নির্বিকার আকাজ্জার ওপরে নিজেদের পূর্বনির্ধারিত তাত্ত্বিক মতামত চাপিয়ে দিতে চায়। কিন্তু, আলাউদ্দিনদের সঙ্গে আনোয়ারের গুণগত পার্থক্য রয়েছে, মতাদর্শগত তফাৎ রয়েছে। আবার, আলাউদ্দিন-আলতাফেরা মহাজনের সঙ্গে বা মহাজনী ব্যবস্থার সঙ্গে আইয়ুব খানের গুণগত তফাৎ ক’রে ফেলে তত্ত্ব দিয়ে, কিন্তু, খিজির তার নির্বিকার জীবনযাপন দিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে মহাজনের সম্পর্ক আবিষ্কার করে। তার কাছে মহাজন আর রাষ্ট্রব্যবস্থার তফাৎ থাকে না, “আইয়ুব খান মোনেম খান খতম হইলে আমাগো মহাজন হালার রোয়াবি থাকবো? তহন মহল্লা ছাইড়া হালায় কৈ পলাইবো দিশা পাইবো না” (২১৮) মোনেম খানের পতন হলে, খিজির জানে, জুম্মনের মায়ের পেটের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে; কারণ, রাষ্ট্রের প্রতিরূপ মহাজন রহমতউল্লাহ ততদিনে খিজির ও জুম্মনের মায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তথা ওই ক্রুটিতে নষ্ট ক’রে দিতে উদ্যত। অন্যদিকে, ইলিয়াস বা রাঘব বা নবাবুলের উপন্যাসে মধ্যবিন্দু-মধ্যশ্রেণির সঙ্গে নির্বিকার-নিম্নবর্গের যে সংঘাত চলে, ওসমান সেই সংঘাত থেকে ছিটকে বেরনো এক চরিত্র। ক্রমশঃ সে তার মধ্যবিন্দু-মধ্যশ্রেণির অবয়ব হারিয়ে ফেলে। সাপের নির্মোহের মতোই ফেলে দেয় আর, তারই সূত্রপাত হয় ২১নম্বর অধ্যায়ে যখন মিছিল ছেড়ে তার শ্রেণিবন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোঁরায় খেতে ঢোকে সে। ‘মোরগ-পোলাও, মুরগির রানের’ লোভনীয় স্বাদগন্ধ নয়, তাকে চুম্বকের মতো

আকর্ষণ করে ওই মিছিল। উল্লেখ্য, ওই মিছিলেই ইতিহাসের শোষিত-অবদমিত নির্বিভেরা দ্রোহীরা ওসমানের দৃষ্টিবিভ্রমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ওসমান তার শ্রেণিবন্ধুদের সঙ্গে রেস্তোঁরায় খেতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওই শ্রেণিবন্ধুত্ব থেকে, রেস্তোঁরায় বসা মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের ভিড়ে নিজের মুখ খুঁজে পায় না; “এতো মানুষের প্রতিকৃতির মধ্যে ওসমান নিজেরটা খোঁজে। কিন্তু ঠিক ঠাहर করতে না পেরে তার গলা শুকিয়ে আসে, তার মুখ কোথায়?” (১৪০) ইলিয়াস সচেতনভাবে তাঁর উপন্যাসের শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকের শ্রেণিবোধ ও সামাজিক অবস্থানের স্থিতির ভিত্তিতে নাড়া দিতে চান। এই উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট যতটা খিজির, ততটাই ওসমান এবং আনোয়ার। ইলিয়াস ওসমানের মানসিক বিপর্যয় দৃষ্টিবিভ্রম, ওসমানের চেতনার বদল এবং ওসমানের শাস্ত থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার যাপনে গণঅভ্যুত্থানের চেতনা পুরে দেন। ওসমান আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ওসমান পূর্ব পাকিস্তানের চাকুরিজীবী-মধ্যবিত্ত চেতনার প্রতিনিধি। খিজিরকে কি সেইজন্যেই মিলিটারির দিকে ছুটে যেতে হয় বা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অতি-সক্রিয় হয়ে উঠতে হয় কিংবা আত্মবলিদান দিতে হয়? যাতে ওসমানের চেতনায় পাকাপাকিভাবে ঢুকে যেতে পারে সে? উপদ্রুত সময়ে ওসমান ঘর থেকে সমস্ত বাধা ছিন্ন ক’রে বেরিয়ে আসে ঢাকার রাজপথে, পথ খোঁজে। তার অতীতকে পেছনে ফেলে রেখে আসে। আর, এই সমস্ত ত্যাগের মুহূর্তে সে কাকে টপকায় শেষ বাধা হিসেবে? ঘুমন্ত আনোয়ারকে টপকে ‘জোড়াপায়ের লাথিতে তালা ভেঙে দরজা খুলে’ ওসমান রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আনোয়ারকে না টপকালে সে খিজিরের সম্পূর্ণ বশ হতে পারত কি? আনোয়ারই ছিল তার শেষ ‘বাধা’, যাকে পেরিয়ে সে নির্বিভের দ্রোহের চরমপন্থী প্রতিনিধি খিজিরের অনুগামী হয়ে উঠল। উপন্যাসের শুরুতে ওসমান বলেছিল “মানুষ এবার অ্যাকশনে নেমেছে, রি-অ্যাক্ট করছে বরং গভমেন্ট, রাদার কাওয়ার্ডলি!” (২৪) কারণ তখন ওসমানের চেতনা ও ভাষা-সংলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছিল আনোয়ার, আনোয়ারের ‘পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস’ তার ভাল লাগে^{২৫}। ওসমানের চেতনার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয় সেই নিয়ন্ত্রণ কাটিয়ে খিজিরের চেতনার নিয়ন্ত্রণধীন হওয়ার পরে।

দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যে সে দেখে যে, খিজির ইলেকট্রিক তার থেকে ‘বিদ্যুৎ নিংড়ে নিচ্ছে নিজের হাড়িসার শরীরে’ এবং আরও ‘স্পিড বাড়িয়ে’ ওসমানের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।²⁶ ওসমান সেই দৃশ্য অনুসরণ করতে চায় একটাই কারণে, যাতে ‘খিজিরের পাশে চলতে তখন আর তাকে কোনো বেগ পেতে’ না হয়। উপন্যাসের উত্তরণ এবং বিশেষভাবে একটি রাজনৈতিক উপন্যাসে উত্তরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এই বাক্যেই। ওসমান, ১৯৬৯ সালের সেই গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলিতে এইটুকুই চেয়েছিল, সে যাতে খিজিরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে। আনোয়ার নয়, আলতাফ নয়, রহমতউল্লাহ নয় এমনকি তার মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পরিসরের বন্ধুরাও নয়, ওসমানের মুক্তি খিজিরের দ্রোহের শরিক হওয়ায়। ওসমান শেষে মারা গেল কিনা, বা ঢাকার রাস্তায় অনেকগুলি পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে ‘মুক্তি’সন্ধান পেল কি না তা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, “no one can identify him any more as a member of the submissive and compromising middle class because his metamorphosis is complete” (Dasgupta2018, 48) এই শেষপর্বে এসে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আনোয়ারের ঘুম। ওসমান যখন তার চিলেকোঠার বন্ধতার সব আগল ভেঙে বেরিয়ে আসছে, তখন ‘আনোয়ার তারিয়ে তারিয়ে ঘুম পাড়ে’ এবং স্বপ্ন দেখে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের আধো ঘুম আধো জাগরণ এবং স্বপ্নের ভেতরে আরও হাজারটা স্বপ্নের পথ খুলে যাওয়া সংযোগ ঘটিয়ে নেয় এই উপন্যাসের সঙ্গেও। ঘুমের ভেতরে অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে আনোয়ার কোনও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে না কিংবা তার এতদিনের লড়াই-মতাদর্শ তার স্বপ্নে ছায়া ফেলে না। আনোয়ার স্বপ্ন দেখে “অন্ধকারে পড়ে অন্ধকারের ছায়া এবং ছায়া-অন্ধকার ঘনিয়ে আসে বৈরাগীর ভিটায়। চেংটুকে খুঁজতে গিয়ে সেখানে দ্যাখা মেলে জালাল মাস্টারের। জালালউদ্দিন বৈরাগীর ভিটার নতুন মহিমা কীর্তন করে” (৩০৭) যে সময় ওসমান আলোর স্বাদ পেতে খিজিরের ভূতের পিছনে পিছনে দৌড়ে ঘরের আগল ভেঙে রাজপথে নামছে, সে সময় আনোয়ার ওই ছায়া-অন্ধকার বৈরাগীর ভিটের রহস্যময় অতীত-বাস্তবের সেতুতে দৌল্যমান²⁷। আলো-অন্ধকারের এই দ্বৈরথ প্রতীকী।

ইলিয়াস ‘ঘুমের স্বাদ’-এর কথা লেখেন, গদ্যসাহিত্যে যা দুর্লভ কারণ, তাতে কাব্যময়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসেও এরকম ঘুমের স্বাদ পায় তমিজের বাপ কিংবা কুলসুম। বৈকুণ্ঠ তার মৃত্যুর সময় ঘন অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে স্বপ্নের স্বাদ পেয়েছিল, তমিজ শান্তাহার যাওয়ার ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ে তেভাগায় যোগ দেওয়ার সুখী খোয়াবের স্বাদ পায়। ওসমানের ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন বা জন্মনের মায়ের স্বপ্নের ভেতরে দ্রোহের থেকে আনোয়ারের স্বপ্ন অনেক নিষ্ক্রিয়।

খিজিরের শ্রেণিবোধ আবিষ্কার করা আখ্যানপাঠকের কাছে এক অনন্য পাঠমুহূর্ত এনে দেয়। খিজির মহাজনের রিকশা চালায়, খিজির মহাজনের মালিকানাধীন বস্তিতে নামমাত্র ভাড়া থাকে, খিজির মহাজনের ভাগ্নে আলাউদ্দিনের রাজনৈতিক খিদমত খাটে। কিন্তু, খিজিরের আত্মমর্যাদা জাগরুক থাকে তার শ্রমের মধ্যে। খিজির উচ্ছেদের ভয়ে থাকে, খিজির নিজের পরিবারের ওপর অধিকারবোধ থাকা না-থাকায় মহাজনের কর্তৃত্ব নিয়ে উদ্ভিগ্ন থাকে, খিজিরকে নিজের জন্মপরিচয় নিয়ে ঠাট্টার পাত্র হতে হয়, তবু তার সুষ্ঠু শ্রেণিচেতনা শোষণের উপাদানগুলির বিরোধিতা করে। “মাগনা খাই না, খাইটা খাই। মাগনা থাকি না, ভাড়া দিয়া থাকি” (ইলিয়াস ২০১৫, ১৬০) কিংবা মহাজনের দালালদের সে শ্রমগর্ব থেকে বলে, “ভাড়া দেই মহাজনের হাতে, কথা কইলে তার লগেই কমু” (১৬১)। আইয়ুব খানের শাসনবিরোধী মিছিল কখন তার অস্তিত্বরক্ষার মিছিল হয়ে ওঠে। ওসমানের মতো আলাউদ্দিনের মতো মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা তার নেই। খিজির বন্দুক থেকে ছিটকে বেরনো বুলেটের মতো শুধু লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে যেতে জানে, তার পিছুটানগুলো ওই বুলেটের মতোই জ্বলে মুছে যায়। খিজিরের এই শ্রেণিচেতনা আরোপিত নয়, খিজির ঔপন্যাসিকের বা আখ্যানকথকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রে নির্মিত অবয়ব নয়- খিজির সাদা-কালো বাইনারির বাইরে অতিধূসর বাস্তবক্ষেত্রের প্রতিনিধি। ইলিয়াস বারবার সমগ্রতার কথা বলছেন, তাঁর আখ্যানচিত্রে সমগ্রতার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বর্ণনাত্মক আখ্যানের নাম উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু তা রাজনৈতিক উপন্যাসের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। রাজনৈতিক উপন্যাসে আখ্যানস্থিত

প্রত্যেক কুশীলবের নিজস্ব রাজনৈতিক সারবত্তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর, সেই রাজনীতির প্রকাশ কীভাবে হবে? কুশীলবেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাদের যাপন, তাদের বয়ান এবং সচেতন বা অবচেতন শ্রেণিবোধ সেই রাজনীতিকে প্রকাশ করবে। ইলিয়াস সেই সমগ্রতার বিচারে কুশীলব নির্মাণ করেন। তাঁর কথায়, “আমাদের অধিকাংশ কম্যুনিষ্টের কাছে যেমন কৃষক একজন শ্রেফ গরীব মানুষ, আর কিছুই না, nothing but a poor man। কিন্তু ঐ কৃষককে পুরোটা জানা হবে না যদি না তার পারিবারিক সংস্কৃতি, সংস্কার এমনকি তার যৌন জীবনের ধরনও সব না জানি।”²⁸ খিজির বা তমিজ বা ওসমান সেই সমগ্রতার সেই ‘পুরোটা জানা’র সাক্ষ্য বহন করে। ইলিয়াস তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, খিজির এক সমগ্রতা যার মধ্যে বহু চরিত্র এসে মিলেছে এবং ওসমান ও আনোয়ার একই মধ্যবিত্ত ব্যক্তির দুই ভিন্ন সত্তা²⁹। উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণে ইলিয়াসের এই অনন্যতা পাঠকের কাছে বাস্তবের সমগ্রতাকে একইসাথে জটিল ও সরল ক’রে তোলে। এবং তার পূর্ববর্তী পাঠাভিজ্ঞতার প্রত্যাশায় বদল হয়। খিজিরের পূর্ণতা তার মৃত্যুতে এবং খিজিরের পূর্ণতা মৃত্যুর পরেও ওসমানের দৃষ্টিবিভ্রমে ভূত হয়ে সঁধিয়ে যাওয়ায়। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে জীবিতের মাথার ভেতর মৃতের সঁধিয়ে যাওয়া এতটা প্রবল নয়। কিন্তু, সেখানেও সোনার শাহাদাত গোরার চেতনায় গভীর অভিঘাত বয়ে আনে। “এখনও যে গোরার ঘাড়ের কাছে সোনার উষ্ণ নিঃশ্বাসঃ গোরাদা! তুমি না কমুনিস! আর এমন একটা কথা মনে হলেই গোরার সারাটা শরীর অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১০৯)- রাষ্ট্রের হাতে সোনার মৃত্যু গোরা ও তার কমিউনিস্ট কমরেডদের আলোচনায়, বাস্তবে, দৃশ্যকল্পনায় ফিরে ফিরে আসে। গোরার প্রতিটি অ্যাকশন, গোরার তাত্ত্বিক বিতর্ক সোনার চিন্তার আদলে বদলে যেতে থাকে। ওসমানের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় মধ্যবিত্ত-ভদ্র অবস্থান গোরার ছিল না, কিন্তু সংশয় ছিল। নিজে শহীদ হয়ে সোনা গোরার চেতনায় সংশয়ের বীজ বুনে দিয়েছিল। আর, খিজির ওসমানকে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্তি দিয়েছিল, উত্তরণের পথ দিয়েছিল। ইলিয়াস কোনও শ্রমিক বা কৃষককে ‘পুরোটা জানা’র কথা বলেছেন, তাঁর উপন্যাসে সেই সূত্র থাকে।

খিজির রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক আবিষ্কার করে কোনও তত্ত্বায়ন থেকে নয়; রাষ্ট্র প্রতিমূহূর্তে ব্যক্তিগত পরিসরে থাকা বসছে, খিজির তা আবিষ্কার করে যখন মহাজন জুম্মনের মায়ের গর্ভপাতের জন্যে চাপ দেয়। জুম্মনের মায়ের গর্ভপাত কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখা গেলে, তার মধ্যেই মহাজনের সুনিশ্চিত পতন হবে এবং খিজির সেই শিশুকে শোষণমুক্ত ভবিষ্যৎ দিতে পারবে- খিজিরের ব্যক্তিচেতনা ক্রমেই আরও বেশি করে রাষ্ট্রবিরোধী চেতনায় জারিত হয়। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ও শ্রমিকের যাপন তথা ‘পুরোটা জানা’র ব্যাপারে উৎসাহী বলেই বেলেঘাটার পুতলিকলের এক শ্রমিকের বিশ্লেষণ জানতে পারেন। হারান মিস্ত্রি তার ২৭-২৮ বছরের শ্রম-অভিজ্ঞতায় মালিক-কারখানা-শ্রমিকের উৎপাদন সম্পর্ক বুঝতে পারে, এর জন্যে তাকে কোনও তত্ত্ব-বইয়ের সাহায্য নিতে হয় না। “সেই ঘোঁটা ভেঙে কারখানায় ঢোকা।” (১৩৭) এঁদের জীবন যেমন একখাতে বয় না, প্রত্যেকটা দোষ-গুণ-সংশয় সমেত এঁরা যেমন বস্তবসম্মত ‘মানুষ’ হয়ে ওঠেন, খিজিরও তেমনই। খিজির, আনোয়ার এবং ওসমান এরা প্রত্যেকেই সংশয়দীর্ণ হয় কোনও না-কোনও পর্যায়ে। খিজির, যে লুপ্তপ্রায় প্রলেতারিয়েত থেকে নৈরাজ্যবাদী অবস্থান হয়ে চরমপন্থী দ্রোহী হয়ে ওঠে, সেও তো একাধিক ‘দোষে’ দুষ্ট। খিজির স্ত্রীলভাষা, শব্দের শালীন প্রয়োগ জানে না। সমাজবাস্তবাদী উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট যেমন রাজনৈতিকভাবে সঠিক (politically correct) শব্দচয়ন করে ও আচরণ করে, খিজির তা করে না। তার মতো অমার্জিত ভাষা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রকাশ্যে ব্যবহার করে না, ক্ষোভ-হতাশা-বিষাদ-আনন্দ সবেতেই খিজিরের আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয় ‘অশালীন’ ভাষা তথা খিস্তিতে। সমাজবাস্তববাদী উপন্যাসে প্রোটোগনিস্ট নারীর প্রতি (বা, বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি) অসম্মানসূচক ব্যবহার করে না; কিন্তু, খিজিরের সঙ্গে জুম্মনের মায়ের সম্পর্কে এমন অসম্মানসূচক ব্যবহার সাবলীল। ইলিয়াস খিজিরকে আরোপিত মতাদর্শের ‘মডেল’ করতে চাননি, বরং তাকে পুরোটা বুঝতে চেয়েই তার দৈনন্দিন আচরণ (ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যবহার ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ) আখ্যানবদ্ধ করেছেন। খিজিরের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মাপা পরিসরে আঁটে না। খিজির চুরি করে, মালিক

রহমতউল্লাহ গ্যারেজ থেকে স্কু-ড্রাইভার বা চোরাবাজার থেকে বল-বেয়ারিং ‘হাতিয়ে’ সেগুলি বিক্রি করে খুচরো রোজগার করত।³⁰ রিকশায় ওঠা এক তরুণ রাজকর্মচারী, যার স্ত্রী মোমেন খানের বাহিনীর দ্বারা সদ্য-অপহৃতা খিজিরের সামনেই, তার থেকেও ভাড়া চাইতে কুণ্ঠা নেই খিজিরের।³¹

খিজিরের শ্রেণিবোধ যেভাবে অবয়ব পায়, তার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ‘কমুনিস’ উপন্যাসের সোনা, গোরাদের শ্রেণিচেতনার। শহরের শ্রমিক তারা, খিজিরের মতোই নিম্নবর্গীয় অবস্থান তাদের। রঙকল, হাড্ডিকল, কাঁচকলের শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা বহু ওঠানামার মধ্যে দিয়ে এগোয়। বেলেঘাটার যে বস্তি অঞ্চলে যে শ্রমিক-পরিবারে তাদের যাপন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সেখান থেকেই শ্রেণিবোধ আসে, “সুকু বলতঃ শত্রুর বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ফুসফুস যদি একবারও বেশি নড়ে তাহলে আমি কমুনিস না। তাহলে বুঝবে আমার ইমান নেই।” (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১) এরা কেউ ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত নয়, ‘শিক্ষিত’ তাত্ত্বিক নয়; ‘কমিউনিস্ট’ নয়, বরং তারা ‘কমুনিস’ উচ্চারণ করে। শ্রেণিচেতনা কোনও নীরস তত্ত্বায়ন থেকে নয় বরং যাপন ও অনুশীলন থেকে আসে। (১০৯) ‘কমুনিস’ উপন্যাসের সঙ্গে ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র আখ্যানগত পার্থক্য থাকে এর প্লট বা আখ্যানবস্তুতে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় অনেক বেশি পরিব্যপ্ত, দ্বিতীয়টি পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক দলিল কিন্তু প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলের (বেলেঘাটা) আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র। কিন্তু দু’টি আখ্যানের সময়গত মিল (‘চি.সে’ ’৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ‘কমুনিস’ ’৭০ সালের কয়েকটি দিনের আখ্যান) রয়েছে। খিজির যেমন ট্রিগার-টেপা বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে কেবলই মহাজন আর মিলিটারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, নিবারণ-সুকু-সোনারা তেমনই ‘অ্যাকশন’ করতে চায়। আর, এই ‘অ্যাকশন’ শ্রেণিচেতনা থেকেই আসে, তত্ত্ব-সাবধানতা-জ্ঞানচর্চার পরিসরকে অগ্রাহ্য ক’রে,

সাতাশ বছরের ছিবড়ে পাকস্থলীতে হাত রেখে নিবারণ তখন কাঠ-কাঠ। শ্রেণিশত্রু ছিঁড়ে ফেলার জন্য দু-পাটি দাঁতই যথেষ্ট। রাতভরের এত তত্ত্ব, ইতিহাস- নিবারণের কাছে গজলা। ফুটোপয়সা দাম নেই। মাজাভাঙা বউটার কথা মনে হয়েছে ওর। নিজের শরীরের রক্ত, আকাজ্জা দিয়ে যে শিশুটার জন্ম দিয়েছিল, তার কথা মনে হয়েছে আর আগুনের মতো রাগ কণ্ঠনালী দিয়ে হু-হু করে ছুটেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১৫৬-৭)

গোরার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চেতনা এই শ্রেণিঘণাকে পুরোপুরি বুঝতে পারে না। গোরা দেখে নিবারণ, সুকু, সোনারা তেতে উঠেছে। রাঘবের উপন্যাসে ‘ভুখ’ শব্দটা বারবার ফিরে আসে। শ্রম, ভুখ ও শ্রেণিঘণা এই তিনটি শব্দ ওতঃপ্রোত জড়িয়ে থাকে। খিজিরের ভাষার সঙ্গেও ভারি মিল তাদের ভাষার ও চিন্তাসূত্রের। হাড্ডি খিজির ভারতীয় উপমহাদেশে নিবারণ-সুকুদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে থেকে ক্ষিধে আর শোষণের অবয়ব চিনে নিতে পেরেছিল। কলকাতা শহরের শ্রমিক নিবারণ, সোনা, নারায়ণদার ভাষা আর চেতনার আশ্চর্য মিল টের পাওয়া যায়। খিজিরের ভাষাস্রোতে উপচে ওঠে শ্রেণিঘণা ও ক্রোধ, “হাতিয়ার সব চলে আসবে মানুষের হাতে... দু-চারটে হাতিয়ার নিতে খিজিরের আজ কোনো ঝামেলা হবে না। চুতমারানি মিলিটারিকে আজ ভাসিয়ে দেবে পেছাবের ফেনার মতো” (২৫৯) এদের মতোই খিজিরের এই ভাঙাচোরা শ্রেণিবোধ, মহাজন আর রাষ্ট্রের প্রতি অপরিসীম ক্ষোভ আর রাষ্ট্রকে ‘ড্যামেজ’ করতে চেয়ে ছুটে যাওয়া বারবার- নবাবুণ ভট্টাচার্যের ফ্যাতাডুদের যাত্রাপথে মিলে যায় কোথাও। পার্থক্য একটা থাকেই- খিজিরের জেগে ওঠা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ক্রান্তিলগ্নে কিন্তু ফ্যাতাডুদের সক্রিয় হয়ে ওঠা নব্বই দশকের বিশ্বায়ন-বেসরকারিকরণ-উদারিকরণের সময়ে যখন আপাতভাবে ক্রান্তিলগ্ন বলে কিছু অবশিষ্ট নেই ও স্থিতিবস্থার রমরমা চলছে। আরেকটা পার্থক্য থাকে এই যে, ফ্যাতাডুদের আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামো; পরে চোক্তারদের সঙ্গে মিলে তারা রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে চায়। কিন্তু, খিজিরের লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষ শোষণক মহাজন ও অপ্রত্যক্ষ শোষণক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ দ্রোহে অংশগ্রহণ।

ফ্যাতাডুরা সচেতনভাবে ও দলবদ্ধভাবে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের চিহ্নায়কগুলিকে আক্রমণ করে এবং ঔপনিবেশিক হ্যাংওভারের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারগুলিকে খিল্লি করে। খিজির এত সচেতন নয়, খিজির দলবদ্ধ নয় এবং খিজিরের প্রত্যাখ্যান এত পরিকল্পিত নয়। তা সত্ত্বেও, খিজিরের যাপন, খিজিরের চিন্তাসূত্র এবং খিজিরের বিরুদ্ধবয়ানের সঙ্গে ফ্যাতাডুদের প্রভূত মিল। কাঙাল মালসাটের আখ্যানকথক ও চিলেকোঠার সেপাইয়ের আখ্যানকথক দু'জনেই ভাষা দিয়ে, চরিত্রনির্মাণ দিয়ে ও আখ্যানবস্তু সাহিত্যের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। খিজির, বজলুর মতো ফ্যাতাডু ও চোক্তাররা শহুরে নিম্নবর্গ। শাসক-নির্ধারিত সাংস্কৃতিক মানদণ্ডকে ও রাজনৈতিক ভব্যতা-শালীনতাকে স্ব-অবস্থান থেকে অবজ্ঞা ও ঠাটা করে তারা।

‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’- রাজাকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার রাজনীতি

শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮)’ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ঢাকার রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপিত হয়। উপন্যাসটি মাত্র ৫২ পাতার, অবয়বের দিক থেকে বড় গল্পের সমান। কিন্তু, আখ্যানের অন্তর্বস্তু উপন্যাসের, চরিত্রনির্মাণ ও সাহিত্যপদ্ধতি উপন্যাসের। উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ মোটিফ হিসেবে ফিরে আসে গল্পে এবং মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয় অচিরাচরিত নির্মাণে। ইলিয়াস ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর আখ্যান যে সময়পর্বে শেষ করেছেন, তাকেই আরও বাড়িয়ে নেন শহীদুল। ইলিয়াসের উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসেও মুক্তিযুদ্ধের চেনা আবেগ বর্জিত; শুধুমাত্র বি-জাতীয় শত্রু তথা পাকিস্তানী সেনা এবং নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণি মূল অ্যান্টাগনিস্ট নয়। “রাজনীতিতে চিরশত্রু বা চিরবন্ধু বলে কিছু নেই”- এই বাক্যটিই উপন্যাসের রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুর শিরদাঁড়া। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনও তথাকথিত কোনও ‘নায়কোচিত’ সৎ সাদা পবিত্র ব্যক্তি নন, আখ্যানের কেন্দ্রে বদরুদ্দিন মওলানা। “বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস।” (জহির ২০১৩, ২৯৮) বদু মওলানা ছিল রাজাকারদের সঙ্গী কিন্তু

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তার পুনর্বাসন হয়। একজন নিপীড়ক খুনীকে সমাজব্যবস্থা কীভাবে নিরাপদ আশ্রয় দেয় এবং রাষ্ট্রের অনুমোদনে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামো টিকে থাকে- বদু মওলানার মধ্যে দিয়ে পাঠক তা বোঝেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বদু মওলানাদের সংখ্যা কম নয়। রুদ্র মহম্মদ শহিদুল্লাহর ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’ কাব্যনাটিকাটিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ‘অপ্রিয় সত্য’ পরিস্থিতি উন্মোচন করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে একদা রাজাকার ও খানসেনা-অনুগামীরা ফের ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষে জুড়ে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবীদের আকাজ্জা পদদলিত হয়। ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’ যে সাতটি পর্বে বিভক্ত, তাদের নামগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ- গণ আদালত পর্ব, বীরঙ্গনা পর্ব, অস্ত্র সমর্পণ পর্ব, ক্যাম্প পর্ব, ক্ষমা পর্ব ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের একটি গ্রাম ও সার্বিক রাজনীতিতে যে বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠছিল, রুদ্র তাকেই উপস্থাপন করেন নতুন এক দ্বন্দ্ব। অপরিবর্তিত সমাজকাঠামোয় নব্যশাসক হয়ে ওঠা প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন রাজাকারদের জুটির সঙ্গে সংঘাত বাঁধে প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা সাধারণ মানুষের ও সমাজকাঠামো পাল্টাতে চাওয়া বিপ্লবীদের। বদু মওলানার মতোই রাজাকার আক্কেল মোড়ল রাষ্ট্রের নির্দেশিত ‘সাধারণ ক্ষমা’ পেয়ে যায় এবং “সকলের দোয়া চাই, নির্বাচনে দাঁড়াবো এবার” (শহিদুল্লাহ ১৯৯২, ১১১) সংলাপে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। মুক্তিযোদ্ধা গৌরব “মেহনতী মানুষের মুক্তি ছাড়া অন্য পথ নেই-” (১০৬) মতাদর্শে বিশ্বাস রেখে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেলে স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশের হাতে বন্দী হয়। এই দ্বন্দ্ব যেমন এই কাব্যনাটিকার মূল উপজীব্য, তেমনই আরও দু’টি উপজীব্য- (১) সাধারণ মানুষের দুরবস্থা স্বাধীন রাষ্ট্রেও অপরিবর্তিত থাকে এবং নয়া-শাসকদের সঙ্গে পাকিস্তানী খানসেনার পার্থক্য থাকেনা এবং (২) রূপবানের সংকট- “খানেনদের বাচ্চা পেটে নিয়ে ঘুরি, কত আকথা কুকথা কয় লোকে মুখের উপর” (১০৯) বাংলাদেশে খানসেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের সংকট এখনও মেটেনি। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নির্মাণের ঘাত-প্রতিঘাত একমাত্রিক সরলরৈখিক পথে এগোয়নি। ইলিয়াস যে প্রশ্ন ‘৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে তুলেছিলেন, রুদ্র মহম্মদ বা শহীদুল সেই প্রশ্নগুলিকেই ‘৭১ ও

তৎপরবর্তী সময়ে বাড়িয়ে নিয়েছেন। খানসেনার বিরোধী মানেই যে কেউ সৎ হবে বা নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়াবে, তা নয়। রাখাল, ধোনাই, মোংলাইরা আঞ্চলিক ক্ষমতাস্তরের দখলদারি করে। বাংলাদেশে তারাই হয়ে ওঠে জমির নতুন মালিক, রেশনের ডিলার, দেশছাড়াদের ভিটের মালিক এবং হাটের আদায়কর্তা। অন্যদিকে গুরুছোটো, দীপংকর, পাচুবিবির জমি হারিয়ে, ভিটে হারিয়ে এবং অন্ন-বস্ত্রের সবটুকু সংস্থান হারিয়ে স্বাধীনতার মূল্য চোকায়³²। “ভাত ভুলে দৈনিক আটার রুটি, এই স্বাধীনতা!/ কোনো দরকার ছিল এই স্বাধীনতা আমাদের?” (১০১) এবং “ক্যাম্পে এসে হত্তে দিয়ে পড়ে আছে গ্রামের মানুষ,/ খোরাকির চাল নেই, কোনোমতে খুটি চালা দিয়ে/ মাথা গুঁজে আছে তারা পোড়া ভিতে, বিরান সংসারে” (৯৩) এবং “যে ভূত তাড়াতে গিয়ে প্রাণ দিলো লক্ষ লক্ষ লোক/ সে ভূত চেপেছে আজ সংগোপনে তোমাদের ঘাড়ে” (১০৪)- শীলভদ্র, গৌরব, গুরুছোটোদের এই সংলাপগুলি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ওঠার পরের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া জাতীয়তাবাদী নির্মাণের গর্ত উপগর্ত দিয় বেরিয়ে আসা নিম্নবর্গের বাস্তব দিনযাপনের ছবি। ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের ‘স্মৃতিলিপি ১৯৭২’-এও ধরা থাকে, “চারদিকে কেবল হতাশার ছায়া। স্বাধীনতার পর যে উদ্দীপনায় চতুর্দিকে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হওয়ার কথা, তার কিছুই দেখছিলাম। এমন নিরানন্দ পরিবেশ” (ওসমান ২০১৯, ৩১) গৌরব কোনও রাষ্ট্রনেতার কাছে নয়, ‘সমতামন্ত্রের কাছে সমর্পিত এ-অস্ত্র আমার’ বলে তার লড়াই জারি রাখে এবং রূপবানের অধিকারের প্রশ্নকে সেইই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারে। গৌরবের চরিত্রনির্মাণ ও মতাদর্শজারিত ক্রিয়ায় সিরাজ সিকদারের প্রতিফলন স্পষ্ট। কাব্যনাটিকার গৌরবের যে পরিণতি হয়, একই পরিণতি সিরাজ সিকদারের হয়েছিল এবং দু’জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের না অভিযোগেও বিস্তর সাদৃশ্য। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খানসেনা ও রাজাকারদের দ্বারা লুণ্ঠ, হিংসা, ধর্ষণ ও গণহত্যার বাস্তবতা এবং স্বাধীনতার পরে রাজাকারদের ক্ষমা ক’রে দেওয়ার বাস্তবতা- রুদ্দ ও শহীদুল দু’জনের লেখাতেই রয়েছে। “আল্লাহতালার নামে জেহাদ করেছি। তার ধর্ম/ তার শরিয়ত বাঁচাতে রাখতে কোতল

করেছি/ বিধর্মী, বিরুদ্ধাচারী। বেশরম জেনানা যেসব/ তারাই পেয়েছে শাস্তি, সবই আল্লার ইচ্ছা” (৮২) আক্কেল মিঞার সঙ্গে বদু মওলানার এবং বাস্তবের কাদের মোল্লা, আত্তার, সাকা চৌধুরী, একেএম ইউসুফদের মতাদর্শ ও ক্রিয়ায় প্রভূত মিল³³। ধর্মের নামে খুন ধর্ষণকে ন্যায্যতা দিয়েছে এরা। বদু মওলানা মহল্লার যতজনের খুনের জন্যে দায়ী, তাতে মিশে থাকে তার ধর্মাত্মমিশ্রিত ব্যক্তিগত ক্রোধ। কিশোর আলাউদ্দিনকে সে খুন ক’রে “খাড়ায়া খাড়ায়া মোতস। খাড়ায়া মোতে কুত্তা” (৩০২) এই যুক্তি সাজিয়ে। স্ত্রী লতিফাকে সে তালাক দেয় কাকের মুখ থেকে পড়া কাটা পুরুষাঙ্গ প্রত্যক্ষ করার ‘অপরাধে’ এবং মোমেনা “একমাত্র মুসলমানের মেয়ে যে গান গাইত”-এই অপরাধে বদু মওলানা ও রাজাকার-মিলিটারির হিংসার শিকার হয়। পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীকে মহল্লায় এনে পাকিস্তানবিরোধী মানুষদের বাড়ি চিনিয়ে দেয় বদু, রাজাকারদের নেতৃত্ব দিয়ে আজিজ পাঠানের বাড়ি লুণ্ঠ করায়³⁴। এরা অনেকেই নতুন বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতাকাঠামোয় আসীন হয়। যে বদু মওলানা প্রাণভয়ে মহল্লা ছেড়ে পালিয়েছিল একাত্তরের ডিসেম্বরে, সেই মওলানা তিয়ান্তর সালে মহল্লায় ফেরে। বদুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অত্যাচারে মৃতদের স্মৃতি সরাতে হয় তাকে, মহল্লার সম্মিলিত জাগরুক স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিতে হয় এবং তিয়ান্তর-সন পরবর্তী সময়ের সাথে অভিযোজিত হতে হয়। লক্ষ্মীবাজার মহল্লাই একাত্তরের পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তী বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থাপিত হয়। এই মহল্লাই জহিরের উপন্যাসের বহির্বাস্তব এবং এই মহল্লার বাসিন্দেরাই ওই কুখ্যাত ন’মাসের দেশের সমস্ত মানুষের প্রতিভূ³⁵। শাসকের ও রাষ্ট্রের স্মৃতি বনাম নির্যাতিতের স্মৃতির এক দ্বন্দ্ব বাস্তব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সংঘাতকে স্পষ্ট করে। আর, উপন্যাসের শেষ দু’টি বাক্যে শাসকের রাজনৈতিক স্মৃতি ও শাসকদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসই যে আধিপত্য ক’রে চলে, সেকথা স্পষ্ট হয় আব্দুল মজিদরা লক্ষ্মীবাজার ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায়-

এবং ধরে নেওয়া যায় যে, তাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকলে লক্ষ্মীবাজারে তাদের নাম অবলুপ্ত হয়েছে। মহল্লার লোকেরা প্রথমে তাদের এই আচরণে প্রথমে হয়তো

বিস্মিত হয়; তবে একসময় তারা বুঝতে পারে, কেন আবদুল মজিদ মহল্লা ছেড়ে চলে যায়, অথবা এমনও হতে পারে যে, আবদুল মজিদের এই সংকটের বিষয়টি মহল্লায় এবং দেশে হয়তো কেউ-ই আর বুঝতে পারে নাই। (জহির ২০১৩, ৩৩৭)

এই যে স্মৃতিনাশের সম্ভাবনা তৈরি হয়, তা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা। বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কাঠামো ও ক্ষমতাবানের রাজনৈতিক আধিপত্যের থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে পারেনি; আবদুল মজিদদের লক্ষ্মীবাজার মহল্লা ছেড়ে চলে যাওয়া এবং মহল্লার লোকদের দোদুল্যমান স্মৃতির সংকট বাংলাদেশের নির্মাণে অঙ্গঙ্গী হয়ে থাকে। শওকত ওসমানের স্মৃতিলিপিতে নবগঠিত বাংলাদেশের এই অস্বস্তিগুলো ধরা পড়ে,

‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্যেও। বীভৎসতা, কোমলতা, শত্রুতা, বন্ধুতা সবই ভাষায় অবয়ব পায়। উপন্যাসের আখ্যানভঙ্গি নিরন্তর কথনের- সর্বজ্ঞ কথক একটানা কথনের মধ্যে দিয়ে কাল, স্থান ও কুশীলবেদের হাজির করেন। একটানা কথন মূলতঃ স্মৃতিপথ থেকে উঠে আসে। সম্মিলিত স্মৃতিপট (কালেক্টিভ মেমরি) ধরে আখ্যান এগোয়, যেখানে ‘মহল্লার লোকদের মনে পড়ে’- এই সম্মিলিত স্মৃতিপাঠে প্রতিনায়ক বদু ও অন্যান্য কুশীলবেদের ক্রিয়া উল্লিখিত হয়। আখ্যানটির রাজনীতিও এখানেই যে, সম্মিলিত স্মৃতিপাঠে জেগে থাকা একাত্তরের ভয়াবহতার স্মৃতি ও কতিপয় নিপীড়কের অত্যাচারের স্মৃতি কীভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই ভুলিয়ে দেওয়ার শাসক-প্রচেষ্টার ফাঁকফোকর দিয়েও জেগে থাকে আবদুল মজিদ, মায়ারাণীদের স্মৃতি। শাসক মতাদর্শ ‘মহল্লার স্মৃতি’কে নিজেদের প্রয়োজনমত সাজিয়েগুছিয়ে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবু, “বদু মওলানা জানে আবদুল মজিদরা একাত্তরের নয় মাসের মথা ভোলে নাই।” (৩৩৬)। স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্বের মাঝে যে বাস্তবতা ও রাজনীতি আখ্যানে ঝলসে ওঠে, তাতে মিলে যায়, “the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting” (Kundera 1996, 4) মিলান কুন্দেরার রাজনৈতিক উপন্যাসের এই সারবাক্য।

স্মৃতি শুধুমাত্র শব্দ দিয়ে পুনর্নির্মিত হয় না, চিত্রকল্প দিয়েও হয়। একান্তর সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর অবধি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে রচিত সব উপন্যাসেই রাজাকার আর খানসেনাদের প্রবল হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে। এই উপন্যাসেও সেই হিংসা বিভিন্ন চিত্রকল্পে ফিরে ফিরে আসে। ‘ভায়োলেন্স’ বা হিংসা আখ্যানে প্রকাশ করার মাধ্যম শব্দ এবং চিত্রকল্প- শহীদুল এক্ষেত্রে চিত্রকল্প দিয়ে হিংসা ও আতঙ্কের বাতাবরণ নির্মাণে মনোযোগী।

[১]- রাজাকাররা যখন মোমেনাকে তুলে নিয়ে যায় বদু মওলানার প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এবং মোমেনার মা লাঞ্ছিত হয়ে বদুর পায়ে পড়ে থাকে- এই বর্ণনা থেকে আব্দুল মজিদ যখন তার বোন মোমেনার মৃতদেহ আবিষ্কার করে, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত বর্ণনার বীভৎসতা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা- “তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান উরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল” (৩৩৫) এবং [২]- ‘বিধর্মী’ হিন্দুদের প্রতি বদু ও রাজাকারদের আক্রোশ প্রকাশিত হয় তুলসী গাছের ওপর বীভৎস হিংসার চিত্রকল্পে। তুলসী গাছকে হিন্দুধর্মের পবিত্র প্রতীক ঘোষণা ক’রে মহল্লার সমস্ত তুলসী গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয় বদু ও অন্য রাজাকাররা- জবা গাছের প্রতিও তাদের একই হিংস্র প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। মোমেনার প্রতি তৎপরবর্তী হিংসার সূচনাও এই অংশ থেকেই³⁶। [৩]- কাক এই উপন্যাসে অতিসক্রিয়। কাকের মাংস খাওয়া এবং সেই মাংস ছিটকে এসে মহল্লার বিভিন্ন লোককে মানুষের নৃশংস মৃত্যুর কথা জানান দেওয়ার বর্ণনার ভাষা ও চিত্রকল্প শীতল, নিষ্পৃহ ও বীভৎস। “মাংসটুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মুসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল” (৩০১), “অন্য একটি টুকরো, সেটা ছিল পায়ের বুড়ো আঙুলের... আঙুলটির নখ খুব বড় এবং শক্ত ছিল এবং নখের ওপর ঘন মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক।” (৩০১) এবং কাকের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া ‘কাটা পুরুষাঙ্গ’ নিয়ে নিষ্পৃহতায় মোড়া অন্তর্ব্যানের বীভৎস তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি। শহীদুল চিত্রকল্পের বুননে সেই প্রতিচ্ছবিকে আখ্যানে

উপস্থাপিত করেন। আর, উপন্যাসের পৌনঃপৌনিক বাক্য হিসেবে ‘মহল্লার লোকেরা জানে’ বলে যে বাক্যবদ্ধ থাকে, সেই প্রসঙ্গে মহীবুল আজিজ গ্রীক নিয়তিবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন, অর্থাৎ তিনি সকলের জানা সংবাদটুকু উপস্থাপন করছেন- এর ফলে গল্প থেকে গল্পে লাফ দেওয়ার আখ্যানপদ্ধতি আসে³⁷। স্থান, সময় ও মানুষের ওপরে তাঁর অতিসংবেদন ইন্দ্রিয়ের প্রহরায় লেখক-কথকের উপস্থিতি ও অদৃশ্যমানতা একইসঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে বলে তাঁর মত। এই উপন্যাসে আলাদা ক’রে কোনও সংলাপ নেই, কোনও উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে সংলাপ নেই। সর্বজ্ঞ কথকের কখনভঙ্গিতে কুশীলবদের ভাবনা ও কখন সাজানো থাকে। বদু মওলানার সঙ্গে আবদুল মজিদের বয়ানের পার্থক্য সেখানেই বোঝা যায়। রাজাকার ও প্রতিরোধী জনগণের চেতনার পার্থক্য স্পষ্ট হয়। সর্বজ্ঞ কথক ভেবে নেন বিভিন্ন সামাজিক স্তরের বয়ানের স্বাতন্ত্র্য এবং এক উপদ্রুত পরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাতী বয়ানের স্বর কীরকম হতে পারে। একাত্তর সালের মার্চ থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের আখ্যান তাই একঘেয়ে হয়ে যায় না, কিংবা সংলাপহীন বলে আখ্যানের খেই হারিয়ে যায় না। কথকের নিরন্তর কথনের মধ্যেই কুশীলবদের প্রতিবাদের স্বর জেগে থাকে। বদু মওলানা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পরে পালিয়ে গেলে মহল্লার জনগণের সম্মিলিত ক্রোধের সংলাপও বীভৎসতার আরেক রূপ- রাজাকার-বদু-খানসেনাদের বীভৎসার সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসায় ও শোষণকাঠামোর বিরুদ্ধে তাদের এই সম্মিলিত ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত। বদু মওলানা মিলিটারি সঙ্গে নিয়ে যে হিংস্রতায় ‘মহল্লার হিন্দুদের বাসার তালা ভেঙে লুণ্ঠ করে’ ও আজিজ পাঠানের বাড়ি ভস্মীভূত করে এবং ‘বাড়ির গেটে নৌকো দিয়ে তৈরি তোরণে একজন মিলিটারি ‘শালা’ বলে গাল দিয়ে একঝাঁক গুলি করে’ (৩১০) তার প্রতিহিংসা শোষিত মানুষের প্রতিক্রিয়ায় ঝলসে ওঠে একাত্তরের ডিসেম্বরে। মুক্তিযোদ্ধা আজিজ পাঠান মহল্লায় ফিরলে হর্ষোদ্যাপনে “মহল্লার লোকেরা বদু মওলানার বাড়ির দরজা ভেঙে সব জিনিসপত্র এনে আজিজ পাঠানের উঠোনে স্তুপ করে রাখে” (৩১১) বদু মওলানা মুক্তিযুদ্ধের দু’বছর পর মহল্লায় ফিরে জনগণের সম্মিলিত স্মৃতিতে জাগরুক

তার ঋণাত্মক ইমেজ মুছতে চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়ে মহল্লার মহিলাদের। এরা প্রত্যেকে মওলানার দ্বারা কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নিপীড়িত ছিল। নিরন্তর কথনের ধারায় বদু মওলানার উদ্দেশ্য বনাম এই মহিলাদের স্মৃতির প্রতিরোধ চলতে থাকে; বদু মওলানার মোলায়েম ব্যবহার বনাম এই মহিলাদের খরশান জিভ ও শরীরী ভাষা বহুস্বরের সূত্র দেয়। আব্দুল মজিদের মা বদুকে অভিশাপ দিতে দিতে চিৎকার করেছিল, ‘থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে’। ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’-এর সোনাভান, পাচুবিবি, রূপবানেদের বিলাপ এবং অসহায়তা ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’য় মজিদের মা, আলাউদ্দিনের মা, খাজা আহমেদ আলীর স্ত্রী ও জয়নাব বেগমদের বিলাপ ও প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মিলে যায়। পার্থক্য থাকে এই যে, বকুলি-পাচুবিবিদের হাহাকার স্বাধীনতার ব্যর্থ হওয়া নিয়ে, “পথেঘাটে জন্তুর নাহান মরবার স্বাধীনতা?/ এই জঠরে পাথর বেঁধে রাখবার স্বাধীনতা” (১০১), রূপবান গর্ভবস্থায় স্বাধীন দেশের পুলিশের লাথি খায় পেটে, কারণ বিপ্লবী গৌরবের সপক্ষে সে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু, শহীদুল জহিরের উপন্যাসে মহিলাদের স্মৃতিজাত প্রতিরোধ তীব্রতর- বিনীত বদু মওলানাকে দেখে জয়নাব বেগমের ‘খবরদার, খবরদার’ বলে চেষ্টা করে ওঠার সঙ্গেই কথক জুড়ে নেন- “উত্তোলিত হাতে তসবির মালা ঝোলানো জয়নাব বেগমকে দেখে মনে হয়েছিল যেন সে তার প্রাপ্তবয়স্ক আয়তনের পুনঃপ্রবেশ রোধ করতে চাচ্ছিল” (৩২০) এবং বদু মওলানার মুখে বাসনকোসন ছুঁড়ে মেরে তাকে তাড়া ক’রে গলিছাড়া করে ‘খড়ির চুলোর ফুকনি হাতে মৃত আলাউদ্দিনের রণচণ্ডীবেশী মা’ (৩২১)। কথক এই প্রত্যেকটি প্রতিরোধের বিবরণই বলেন ‘মহল্লার লোকেরা দেখেছে’ কিংবা ‘মহল্লার লোকেরা জানতে পারে’ এই বয়ানগুলিকে সামনে রেখে। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও আশি সালের মধ্যে লক্ষীবাজার মহল্লায় বদুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিংবা পরবর্তী বছরগুলিতে ফের তার মাতব্বর হয়ে বসা ঠেকানো যায় নি। আর, সেটা যে যায়নি, তা বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে ত্রিাশীল আজও। সাহিত্যিক শওকত ওসমানও এই সংকটের আশঙ্কা করেছিলেন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেই, “আজ দুই শিবির

[আলবদর আলশামস্ ও মুক্তিবাহিনী] তাই অস্বাভাবিক এবং ক্ষমা এখানে সম্ভব নয়... বাংলাদেশ সরকার যদি প্রতিপক্ষ এই জাতীয় জন্তদের প্রতি ক্ষমা দেখায় বা ক্ষমাশীল হয়, তাহলে গুপ্তহত্যায় বহু মানুষের প্রাণ যাবে” (ওসমান ২০০৯, ১৭৪) ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’-র গৌরব দীপংকর কিংবা ‘জীবন ও রাজনৈতিক’ উপন্যাসের প্রতিরোধী মহিলারা, আব্দুল মজিদরাও ওই ক্ষমাশীলতার মধ্যে দিয়ে রাজাকারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আটকাতে চেয়েছিল। গৌরবকে ‘সশস্ত্র বিপ্লবী’ তকমায় জেলে ভরে বাংলাদেশ সরকার এবং আব্দুল মজিদকে মহান্না ছেড়ে চলে যেতে হয়।

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের সময় তথা দেশভাগের সময় ধর্মের রাজনীতি ভাষা-সংস্কৃতি-স্বাভাবিকবোধ সমস্ত কিছুকে গ্রাস করেছিল। বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ‘ইসলামীকরণ’-র জন্যে প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা এবং সাহিত্যের চেয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন অনেকে^{৩৮}। গোলাম মোস্তাফার মতো অগ্রণী সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক পাকিস্তানী আদর্শ রক্ষার দায়ে নজরুল ইসলামের লেখা থেকে ‘অবাঞ্ছিত’ হিন্দু ভাবধারা বর্জনের পক্ষে সওয়াল করলেন^{৩৯}। এমনকি প্রাবন্ধিকেরা অনেকে ‘ইসলামী আদর্শ’-র ধূয়ো তুলে নারী-ভূমিকা বর্জিত নাটক রচনার প্রস্তাব দিলেন। অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হবীবুল্লাহ বাহারের মতো ব্যক্তির এই বর্জনপন্থা ও ধর্মভিত্তিক সাহিত্যচর্চায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। অর্থাৎ, ধর্মীয় মতাদর্শ এবং সম্প্রদায়গত পরিচয়ের তত্ত্ব আধিপত্যমূলক হয়ে ওঠায় বাঙালি নাকি পূর্ব পাকিস্তানী এই আত্ম-পরিচয়ের দ্বন্দ্ব খুবই প্রভাবিত ছিল। ‘সকলেই মুসলমান’- এই সার্বিক একবর্ণনা পরিচিতির মোড়কে সবকিছু মুড়ে ফেলতে চাইলেও, তার অন্তর্ভুক্তগত বিরোধগুলিও জেগে ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অব্যবহিত পর থেকেই ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবোধের ওপরে নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরোধ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুসুলভ আর্থ-রাজনৈতিক শোষণ এবং নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিকদের ক্রমাগত আন্দোলন ভাষা ও স্বাভাবিকবোধের দৃঢ়তার পালে হাওয়া দিয়েছিল। ভাষা, ভৌগোলিক

অবস্থান, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিস্তার ব্যবধানেও ‘ধর্মের জিগিরের জোরে দুই অঞ্চলে [পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান] রাখীবন্ধন হয়’ এবং কালক্রমে শোষণ ও বঞ্চনার জেরে দূরত্ব অনপনয়ে হয়ে ওঠে⁴⁰। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এবং ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ উপন্যাস দু’টির আখ্যানে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের (১৯৪৭) থেকে সরে এসে জাতিগত ও ভাষাগত ঐক্যের কালগত বদলের অভিমুখ আঁচ করা যায়। ধর্মগত ঐক্য এবং ‘শত্রু ভারতকে প্রতিহত করাই পাকিস্তানীদের কর্তব্য’ এই বয়ানে শাসক আর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আকাজ্জকে এঁটে রাখতে পারছিল না। উপরোক্ত দু’টি উপন্যাসেই ধর্মীয় পরিচিতির থেকে কুশীলবেদের স্বাভাবিকতা ও অ-পাকিস্তানী রাজনীতি বড় হয়ে উঠেছে। খিজির লুস্পেন প্রোলেতারিয়েত থেকে দ্রোহাভিমুখী শ্রমিক হয়ে ওঠে, ওসমান দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত থেকে রাষ্ট্রবিরোধী মানসিক ভারসাম্যহীন, চেংটু-করমালিরা কৃষক-অভ্যুত্থানের সময়োপযোগী সংজ্ঞা খুঁজতে চায়। জুম্মনের মা তার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী পরিসর থেকেই প্রতিরোধের চোরাগোপ্তা পথ খুঁজে নেয়। আব্দুল মজিদ, খাজা আহমেদ, মোমেনা, আলাউদ্দিনের মায়েরা তাদের যাপন দিয়েই রাজাকার-খানসেনার বিরোধী হয়ে ওঠে এবং বদু মওলানার ‘সহি ইসলামী’ ক্ষমতা-পরিসরকে প্রত্যাখ্যান করে। এঁদের কারোর কাছেই ধর্মীয় আধিপত্য মুক্তির আকাজ্জার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে নি। বদু মওলানার ধর্মীয় আচরণ এবং ধর্মীয় আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চাওয়া রাষ্ট্রের নেকনজরে থাকার ক্রিয়াকলাপ তাকে আখ্যানের প্রতিনায়ক বানিয়ে দেয়। খানসেনারা আজানরত ব্যক্তিকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না, আজিজ পাঠানের ঘরদোর ধ্বংস-লুণ্ঠ করতে সময় নেয় না। ১৯৮৫ ও ১৯৮৮ সালে লেখা এই দু’টি উপন্যাস যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের পটভূমিকে আখ্যায়িত করে- বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক যাপনচিত্রের হদিশও দেয়। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সাহিত্যে আধিপত্যমূলক স্থান অধিকার ক’রে আছে স্বাভাবিকভাবেই। আর, এই পটভূমিতে রচিত যে কোনও গল্প উপন্যাসে পাকিস্তানবিরোধী জাতীয়তাবাদী আবেগ সাহিত্যের অন্যান্য উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, উপরোক্ত দু’টি উপন্যাস ও কাব্যনাটকে কথকের কখনভঙ্গী নির্মোহ আখ্যানপথে

টেনে নিয়ে যায় পাঠককে। একপেশে জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং দ্বন্দ্বহীন উত্তরণের আখ্যান নয়, এগুলি উক্ত সময়পর্বের মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক বহুমুখীনতাকে প্রকাশ করে।

এনকাউন্টার, পুলিশি সন্ত্রাস ও হিংসাঃ রাজনৈতিক আখ্যানে রূপান্তর

“পুলিশের সহিত সংঘর্ষে সোনা নামের যুবক নিহত... যুবকের নিকট রেডবুক...।’ আর রিভলভার। আর আপত্তিকর কাগজপত্র। আসলে যেন সব আগ থাকতেই কম্পোজ করা থাকে। শুধু যুবকের নামটা পাল্টায়।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ৭৩) রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ উপন্যাসে সোনাকে ভূয়ো সংঘর্ষে খুন করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী। রাঘব তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সামগ্রিক ছবি আঁকেন এই বর্ণনার টেম্পলেটে। সত্তরের দশকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রসঙ্গ মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’, নবারণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’, সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ ইত্যাদি উপন্যাসে রয়েছে। মহাশ্বেতার ‘দ্রৌপদী’ গল্পে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নিপীড়ন ও ধর্ষণের উল্লেখ এবং দোপদী মেঝেনের নগ্ন প্রতিস্পর্শী বয়ান প্রতিরোধের আইকন হয়ে উঠেছে। দ্রৌপদীর নগ্ন দেহ দেখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন অর্জন সিং হতচকিত হয়ে যান এবং “এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়” (দেবী ১৩৮৭ সাল, ১৮০) বসাই টুডু সহ সাঁওতাল ক্ষেত্রমজুররা বারবার পুলিশ-জোতদারের মিলিত সন্ত্রাসের বলি হতে হতে এনকাউন্টার থিওরি তৈরি করে নিতে পারে। ভারতীয় গণতন্ত্র ভূয়ো সংঘর্ষের নিত্যনৈমিত্তিক অনুশীলনে বসাইদের সামনে এই তত্ত্বই হাজির করেছে।

কোয়ান্টাম থিওরি দ্বারা যেমন পদার্থ বিদ্যার সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে, “সম্মুখ সংঘর্ষ” বা এনকাউন্টার, বা বসাইদের ভাষায় “কাঁউটার” তেমনি এক কোয়ান্টাম থিওরি। মৃত ব্যক্তির হাড়-গোড় ভাঙা, ভ্যানের চাকায় বাঁধা হতে পারে- পেছনে হাত-পা বাঁধা ও গাছে

বাঁধা থাকতে পারে- পায়ুদেশে শিক ঢোকানো, সমস্ত পাঁজরা চুরচুর হতে পারে- কমন গুণ হচ্ছে, সব শরীরে অজস্র গুলি থাকবে,- সব মৃত্যুই ব্যাখ্যা করা হবে এইভাবে, “সম্মুখ সংঘর্ষের ফলে”। বসাই টুডুও সম্মুখ সংঘর্ষে মারা পড়ে। বালক-বালিকা শিশুর মৃতদেহও “সম্মুখ সংঘর্ষ” থিওরির দ্বারা এক্সপ্লেইন্ড হয়। (দেবী ১৩৮৭ সাল, ১১৮)

সত্তর দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হিংস্রতায় কিছু নজির সৃষ্টি করে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা নটার সূর্য (২০১৩)’ উপন্যাস নকশাল বনাম রাষ্ট্র প্রতর্কের আখ্যান হাজির করে এবং লক-আপে পুলিশি অত্যাচারের কিছু বীভৎস দৃশ্য প্রকাশ করে। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান কুশীলব পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর থেকে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর হয়ে ওঠা কনকেন্দু। যাঁর মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও বিবর্তন উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য। রাষ্ট্রীয় হুকুম তামিল করতে করতে মানবিক মনোবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ দানবিক অভিব্যক্তিতে বদলে যায়। কনকেন্দু ‘দেশব্রতী’, ‘লিবারেশন’ ও রাজনৈতিক সাহিত্য খুঁটিয়ে পড়ত (তার পেশার অংশও বটে) এবং বামপন্থী তরুণতরুণীদের প্রতি সংবেদনশীল ছিল। “বড়বাবু তাকে অনেকবার পীড়ন-প্রক্রিয়ায় সঙ্গী করতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন কচুয়া-খোলাই, বিদ্যুতের শক দেবার পদ্ধতি। কিছুটা দেখবার পরই কনকেন্দুর গা গুলিয়ে উঠেছে” (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ২০৬) অথচ এই কনকেন্দু, যে বিপ্লবীদের, পুলিশদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুমান করার চেষ্টা করত মুখ-চোখ দেখে, সে ক্রমেই হয়ে ওঠে নিপীড়ক পুলিশ অফিসার। রাজনৈতিক উপন্যাসে পুলিশের চরিত্রচিত্রণ ও মানসিকতার রূপান্তরের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসের মতো এত গভীরতার সঙ্গে আগে কোনও উপন্যাসিক করেননি। দ্রোহীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাই শুধু নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতিনিধির স্বর এবং ক্রমশঃ মানবিক থেকে দানবিক রূপান্তর রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানকে ঘন করে আরও। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দমনযন্ত্র শুধুমাত্র বিদ্রোহ-সম্ভাবনাকেই দমন করে না কিংবা শাসিতের ওপরে নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয় না, বরং ক্ষমতাকাঠামো সচল রাখার প্রতিনিধিদেরও দুমড়েমুচরে নেয়। “আগের সেই পড়াশুনো আর নেই। জ্ঞানের দীপ্তি স্তিমিত,

ক্ষুরধার মেধা চর্চাহীনতায় বিকল। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারের যে ছেলেটি মাত্র বছর পাঁচেক আগে পুলিশে যোগ দিয়েছিল, সে আজ কতদূরে সরে গেছে। বড়বাবুর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে গিয়েই তার অবনমনের শুরু” (৩৪৯) কনকেন্দু চিহ্নিত করে সমাজব্যবস্থাকে। ঔপন্যাসিক সেই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধেই নিজস্ব স্বর সৃষ্টি করেন, যে ব্যবস্থা নির্যাতক-শাসক উৎপাদন ক’রে চলে নিরন্তর। “People know what they do; they frequently know why they do what they do; but what they don’t know is what what they do does”- ফুকো ‘ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশমেন্ট’-এ একথা বলেছিলেন। কনকেন্দুও এইভাবেই ক্রমশঃ এক প্রতিক্রিয়াহীন নিষ্ঠুর যন্ত্রমাত্রের পরিণত হয়, রাষ্ট্রের হুকুম তামিল ক’রে খুন ও নির্যাতন করাই যার একমাত্র পরিচয়। আর, রাষ্ট্রযন্ত্রের দানবিক পদ্ধতিকে সচল রাখার এই চিরন্তন পদ্ধতি। কনকেন্দুর মতো অফিসারেরা হুকুম তামিল করতে করতে রাষ্ট্রের দমনযন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়ে যান ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান নিরন্তর। উপন্যাস সেই ভাষাকে ধারণ করে- বড়বাবু ও কনকেন্দুর কথপকথনে এবং কনকেন্দুর স্বগতকথনে। কিন্তু, এখানেও উল্লেখ্য সেই ‘ভদ্রলোক’ ও ‘শিক্ষিত’ পরিচয়। ঔপন্যাসিকের বয়ানে ও কনকেন্দুর স্বগতকথনে ‘ভদ্রলোকের অধঃপতন’-ই প্রাধান্য পায়। পরিবার, পড়াশোনা, ভদ্র-মধ্যবিত্ত শব্দগুলি রাষ্ট্র বনাম বিপ্লবী প্রতর্কমূলক বিরোধিতার মাঝে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে- এমনটাই বোঝা যায় এই প্লট থেকে। আর, এক্ষেত্রে, প্রোটাগনিস্ট বনাম অ্যান্টাগনিস্ট দ্বন্দ্ব, যা প্লটকে গতিমুখ দেয় ও পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা প্রথাগত সংজ্ঞায়নকে পুনর্সজ্জিত করে। অ্যান্টাগনিস্টের সঙ্গে প্রোটাগনিস্টের দ্বন্দ্বের মাঝে এসে পড়ে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত শব্দগুলি; কনকেন্দু-বড়বাবু এবং নিরুপম-পাঞ্চগলী-দ্রোণাচার্য যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাগ ক’রে নেয়, তা ওই শব্দবন্ধ! কনকেন্দু, বসাক, বড়বাবুরা নিশ্চিতভাবেই আখ্যানের অ্যান্টাগনিস্ট, কারণ,

The antagonist is the force that prevents the protagonist from reaching goal. The absence of antagonist in the novel indicates no

suspense, no excitement, no opportunity to perceive the protagonists personality as he or she responds to obstacles. The antagonist must be as strong as the protagonist. It is important that battling forces will be equal in weight. (Catron 1989, 64)

প্রটাগনিস্টের বিরোধিতা এবং উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়াই অ্যান্টাগনিস্টের বৈশিষ্ট্য। তা আখ্যানের প্লট নির্মাণ করে। এই উপন্যাসগুলিতে প্রটাগনিস্ট ও অ্যান্টাগনিস্টের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি অবস্থান প্রায় একই। কিন্তু, পার্থক্য থেকে যায় শাসক বনাম শোষিতের চলমান দ্বন্দ্ব তঁরা কে কোন পক্ষ নিচ্ছেন, সেই অবস্থানে। এই দ্বন্দ্বের উৎসভূমি আখ্যানের গতিপথ থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই রাজনৈতিক উপন্যাসের অ্যান্টাগনিস্টরা রাষ্ট্রের মতাদর্শে ও অস্ত্রে ক্ষমতাবান এবং প্রটাগনিস্টদের তুলনায় অসম শক্তিশালী। প্রটাগনিস্ট একটা আখ্যানের মূল কুশীলব যে একটা নির্দিষ্ট ইচ্ছে বাস্তবায়নের দিকে বা কোনও ‘আইডিয়া’কে জেতানোর লক্ষ্যে গতিশীল থাকে কাহিনির সঙ্গে। এই প্রটাগনিস্টের মাধ্যমেই লেখক আখ্যানের মোদা বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করিয়ে দেন। এর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পায়; অন্যান্য কুশীলবেরা যোগ্য সঙ্গত করে চলে। কাহিনির মূল অক্ষকে কেন্দ্র ক’রে প্রটাগনিস্ট আবর্তিত হয় এবং বাকি কুশীলবেরা তাকে কেন্দ্র ক’রে আবর্তিত হতে থাকে; কেউ তার বিরোধিতা করে আর কেউ সহায়তা করে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে রণজয় প্রটাগনিস্ট হয়ে ওঠে এবং কৌশিক, মেখলা ও ডক্টর দামেরা তাকে কেন্দ্র ক’রে আবর্তিত হয়; বসাক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হয়ে ওঠে অ্যান্টাগনিস্ট। ডোনাল্ড মাসের সংজ্ঞানুযায়ী, “A protagonist is the subject of the story. He can be a hero, certainly, but not always. Protagonists are ordinary people; they may face extraordinary circumstances in the course of the story.” (Maass 2009, 9) রণজয়ের সঙ্গে এঁটে যায় এই বৈশিষ্ট্য, রণজয়ই আখ্যানের কেন্দ্রীয় কুশীলব। রাষ্ট্রই মূল অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে ভূমিকা নেয়। আর, সেই ভূমিকায় সঙ্গী হয় দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের

প্রতিনিধিরা। কৌশিক রণজয়ের সমর্থক একজন বুদ্ধিজীবী, যার সাংস্কৃতিক পুঁজি (cultural capital) রয়েছে এবং সামাজিক অবস্থান উচ্চবর্গের। পার্থ কিংবা কোবার কলেজের অধ্যাপক দু'জনেরই ওই সাংস্কৃতিক পুঁজি রয়েছে, কিন্তু তারা প্রোটাগনিস্ট রণজয়ের স্বার্থবিরোধী। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'-র আখ্যানেও এই প্রোটাগনিস্ট-অ্যান্টাগনিস্ট দ্বন্দ্ব একই শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে থেকেই চিহ্নিত হয়। সুজাতা এই উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট, যে শহীদ ব্রতীর আদর্শকে খুঁজে চলে। নন্দিনী, সমুর মা ইত্যাদি কুশীলবেরা তার সেই অনুসন্ধানের সহায়ক হয়ে ওঠে, বস্তুতঃ ব্রতী ও সুজাতার কার্যকারণ যখন মিলে যেতে থাকে তখন এই কুশীলবেরা ব্রতী-সুজাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। প্রধান দুই অ্যান্টাগনিস্টের একজন দিবানাথ চ্যাটার্জী যে একাধারে সুজাতার স্বামী এবং ব্রতীর বাবা। শ্রেণিগত ও সামাজিক অবস্থানে এদের তফাৎ নেই, কিন্তু মতাদর্শ ও মতাদর্শগত অনুশীলনের বাস্তবতায় মূল তফাৎ রয়েছে। শাসক ও শোষিতের চলমান দ্বন্দ্ব ব্রতী শোষিতের পক্ষে থেকে দ্রোহ করতে চায় এবং সুজাতাও পরে সেই মতাদর্শের অনুশীলন করতে চায়; দিবানাথ এবং তার মেয়ে-বড়োছেলে-বন্ধু-জামাই রাষ্ট্রের দমনমূলক মতাদর্শ ও শাসনের অনুসারী হয়ে ওঠে আখ্যানের গতিপথে। দীপেন্দ্রনাথের 'শোকমিছিল' এই প্রোটাগনিস্ট-অ্যান্টাগনিস্ট দ্বন্দ্বকে ও দ্বন্দ্বের গুণগত বৈশিষ্ট্যকে আরও অস্পষ্ট ক'রে দেয়। কারণ, এই রাজনৈতিক উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয় একই পরিবারের চার সদস্যকে কেন্দ্র ক'রে। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের ভূমিকা এই আখ্যানে নগণ্য, এমনকি উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মতো পুলিশ বা দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের কোনও ক্ষমতাবান এই উপন্যাসে অ্যান্টাগনিস্ট নয়। দুই ভিন্ন ধারার বামপন্থায় বিশ্বাসী দুই ভাই এবং তাদের বাবা-মায়ের রাজনৈতিক অবস্থানগত দ্বন্দ্ব আখ্যানের বিরোধভাস নির্ধারণ করে। উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মতো এই উপন্যাসে শাসিতের পক্ষে নাকি শাসকের পক্ষে এই যুক্তিতে প্রোটাগনিস্ট ও অ্যান্টাগনিস্ট নির্ধারণ করা যায় না। মূলতঃ বাবা বিনয়ভূষণের স্মৃতিবীক্ষণে দুই ছেলে অজয়-বিজয়ের কর্মকাণ্ড এবং তাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উঠে আসে। কিন্তু যে ট্রাজিক পরিণতিতে এর

সমাপ্তি, তাতে আত্মদ্বন্দ্ব জারিত বিনয়ভূষণের সঙ্গে সমগুরুত্বে সত্তর দশকের ওই ত্রাণিকালও প্রোটাগনিস্ট হয়ে ওঠে। আর, সময়ই আখ্যানের প্লটকে গতিশীল রাখে। বিনয়ভূষণের স্মৃতিস্থবিরতার বিরোধভাসে ওই অস্থির সময় ঘটনা প্রবাহকে সামনের দিকে টানে।

রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে পুরুষ-মহিলা বন্দী নির্বিশেষে জুড়ে যায় যৌন নির্যাতন। নকশালবাড়ি বিদ্রোহের সময় দ্রোহীদের থানায় নিয়ে গিয়ে উলঙ্গ ক’রে যৌন অত্যাচার চালানো অনেকগুলি উপন্যাসেই বিবৃত হয়েছে। বাস্তবেও এই ঘটনাগুলির সাক্ষ্য মেলে। “উলঙ্গ ছেলেদু’টির দিকে ফিরে বললেন, কী রে, সাত ইঞ্চি না আট ইঞ্চি?... কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করতেই সে সঙ্গীটির হাতে স্কেল ধরিয়ে দিল। নে মাপ এইবার... মাপ... আরে এ তো ছোট হয়ে গেছে... লম্বা কর লম্বা কর” (ঐ ২১০) দীর্ঘ এক বর্ণনায় থানার লক-আপে নকশাল দুই তরুণকে উলঙ্গ ক’রে অত্যাচারের উল্লেখ করেছেন লেখক। আর, বড়বাবু কীভাবে তাঁর অধস্তন পুলিশদের ব্যবহার ক’রে নিচ্ছেন তাঁর অত্যাচারের আইনি ন্যায্যতায়। একদিকে যেমন কনকেন্দুর মত আপাত সং পুলিশের বিবর্তন ঘটছে “কদিন আগেও এমন কাণ্ডে বিবমিষা আসত কনকেন্দুর। কিন্তু আজ, অবাক কাণ্ড, তার গোপন অঙ্গটিও শক্ত হয়ে উঠছে” (ঐ) তেমনি বিদ্রোহ দমনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হচ্ছে। আর, এই দৃশ্যে যে প্রচণ্ড হিংসা রয়েছে, তা বাস্তব থেকেই গৃহীত। বড়বাবুর চরিত্রটি তৎকালীন পুলিশ-বড়কর্তা রুণু গুহনিয়োগীর আদলে নির্মিত। আর, ইতিহাস ও কল্পনার মাঝে যে ফাঁক পুরট করে উপন্যাস, বাস্তবতা ও কল্পনার নিরন্তর সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে, সেখানে বিজয়ীর (এক্ষেত্রে, রাষ্ট্র) লিখিত বয়ানকে প্রতিস্পর্ধা জানানো থাকে কখনও। রুণু গুহনিয়োগীর লেখা ‘সাদা আমি না কালো আমি (১৯৯৭)’ বইটির পাঁচটা ‘রুণু সাদা না, রুণু কালো (১৯৯৮)’ বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে কানু সরকার, বাদল ঘোষ, মলয়া ঘোষ, গোপালী দাসেদের জবানবন্দি⁴¹ থেকে উপন্যাসের বড়বাবুর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় রুণুর। উপন্যাসে বড়বাবু কনকেন্দু ও অন্যান্য কনস্টেবলদের সঙ্গে নিয়ে যেভাবে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করেন, অবিকল সেই ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায় কানু সরকারের বয়ানে।

কানুর অভিযোগ ছিল যে, বিটি রোডে গঙ্গার ধারে তাঁর সঙ্গীকে হত্যা করে রুণু⁴²। উপন্যাসের কাল্পনিকতায় এই হত্যামুহূর্তে অংশগ্রহণ করেই কনকেন্দু নৃশংস নির্যাতক হয়ে ওঠার যাবতীয় জড়তা ঝেড়ে ফেলে এবং “বারাসাতের কদিন পরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বেলেঘাটায়। বেলেঘাটার পর দমদমে। পরের দুবার আর বমি পেল না কনকেন্দুর” (২১৩)। নিরুপমের ধরা পড়া থেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গুলি করে হাসপাতালে ফেলে আসার গোটা বিবরণই কানু সরকারের জবানবন্দির সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর বিবৃতি অনুযায়ী, তাঁর বন্ধু অশোককে তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার ক’রে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাঝরাতে তাঁকে পুলিশ জিপের ভেতরে নির্যাতন করে মৃতপ্রায় ক’রে ফেলে রাখে রুণু। আর, “এরপরই শূনি গুলির শব্দ, জলের শব্দ আর অশোকের ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলে চিৎকার। ওই অবস্থাতেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওরা গুলি করে অশোককে জলে ফেলে দিল।” (এপিডিআর, ২৭) উপন্যাসে নিরুপমের সহযোদ্ধা লাল্টুকে একই উপায়ে খুন করে বড়বাবু ও কনকেন্দু। উপন্যাসে নিরুপম চ্যাটার্জীকে বড়বাবু জিপের ভেতরে গুলি করে, তারপর মৃত ভেবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে ফেলে দিয়ে পালায়। বরবাবুর দাঁড়ানো, হুমকি দেওয়া, অধস্তনের সঙ্গে কথপকথন এবং সাজানো এনকাউন্টারের প্রতিটি মুহূর্ত অবিকল উঠে আসে তথ্য-সংকলনের পাতা থেকে। এই অতি-সাদৃশ্য থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, রুণু ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী-বিবরণ ঔপন্যাসিক বাস্তব ঘটনা (বিশেষতঃ ঐ উল্লিখিত পুস্তিকা) থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা (১৯৮৩)’ উপন্যাসেও প্রায় একই ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যার উল্লেখ থাকে। সিরিল এবং অনিমেষকে পুলিশ গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই গুলি ক’রে খুন করে এবং নিরুপমকে যে ভঙ্গিতে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে ফেলে এসেছিল ‘মৃত’ ভেবে, তেমনই অনিমেষকেও উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে ফেলে রেখে আসে⁴³।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বাস্তবতা থেকে উপন্যাসে আসার আরেক উদাহরণ ‘কাটাতারে প্রজাপতি’ উপন্যাস। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের জীবনীমূলক উপন্যাস লিখেছেন সেলিনা

হোসেন, যা একাধারে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রে তেভাগার সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। নাচোলের ইলা মিত্র ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষ সংগঠক ও নেত্রী। দীর্ঘ সময়ের সশস্ত্র কৃষক প্রতিরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও সাঁওতাল আধিয়ার ক্ষেতমজুরদের বিদ্রোহ দমন করতে উঠেপড়ে লাগে। ইলা মিত্রকে গ্রেপ্তারের পরে রাষ্ট্রীয় আক্রোশ প্রবল মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন-নিপীড়নে রূপান্তরিত হয়,

ওরা চিৎকার করছে অশ্লীল ভাষায়, ধরা হয়েছে ডাইনি মাগিকে, ওকে এখন ন্যাংটো করে চামড়া তুলে ফেলে সারা শরীরে লবণ মাখিয়ে দাও... যারা আক্রোশে উন্মত্ত, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। বুটের লাথি, ঘুষি, বেত্রাঘাত এবং চাবুক কোনোটাই বাদ যায় না। তারপর ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় একটি কক্ষে। (হোসেন ১৯৮৯, ২৪৪)

ইলা মিত্রকে ‘পাকিস্তানের শত্রু’ ঘোষণা ক’রে তাঁর ওপরে অত্যাচার চালানোর পরে তাঁর সহযোগী হরেককে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন ক’রে খুন করা হয়। “হরেকের মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত পড়ে। ওকে পেটাচ্ছে তিন চারজনে একসঙ্গে... ওরা ওকে চিৎ করে ফেলে, তারপর সমানে বুটের লাথি চালায় বুকের ওপর” (২৪৭) ইলা মিত্রের জবানবন্দিতে⁴⁴ হরেকের ওপরে নির্যাতন ও মৃত্যুর বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য এই বর্ণনার; ঔপন্যাসিকের কল্পনার ভিত্তি ওই বাস্তব ঘটনাগুলি। আর, ইলা মিত্রের ওপরে যে প্রবল যৌন-নির্যাতন চালায়, আদালতে ১৯৫০ সালে ইলা মিত্রের জবানবন্দীতে তার উল্লেখ,

যেহেতু আমার বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে। আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না... দু’টো লাঠির মধ্যে আমার পা দু’টি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলছিলেন

যে, আমাকে ‘পাকিস্তানী ইনজেকশন’ দেওয়া হচ্ছে... সেলের মধ্যে আবার এস.আই সেপাইদেরকে চারটে গরম সিদ্ধ ডিম আনার হুমকি দিয়ে দিলো এবং বললো, ‘এবার সে বলবে’। তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো... ৯.১.১৯৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো উপরোক্ত এস.আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো... আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না, তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। (রফিক ২০১৫, ১৬-৭)

‘কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯)’ উপন্যাসে ইলার এই জবানবন্দির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বর্ণিত হয়েছে।^{৪৫} সেলিনা উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্র আজিজের বয়ানে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কারাগারে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, বিশেষতঃ মহিলা দ্রোহীদের ওপরে যৌন নির্যাতন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। ‘সেদিনের কথা’ নামক আত্মজীবনীতে ১৯৪০ দশকের অপর এক কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের বয়ানেও উঠে আসে কারাগারের জীবন। যদিও, মণিকুন্তলারা জেলে ইলা মিত্র, জয়া মিত্র, মলয়া ঘোষ, অর্চনা গুহ-র মতো অত্যাচারিতা হননি, কিন্তু, অনশন চলাকালীন কিংবা জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের সময় কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন।^{৪৬} কিন্তু, ইলা মিত্র সাক্ষাৎকারে, ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ উপন্যাসে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকৌশলের দ্বিধাভরা সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। মণিকুন্তলা সেন ‘সেদিনের কথা’-তে তার উল্লেখ করেন, “ঐ কাগজে লেখা হয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে জাতীয় বুর্জোয়াদল, শ্রমিক এবং ধনী চাষী আর গরীব চাষী সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে... কী কাণ্ড! আমরা তো তখন শ্রেণীসংগ্রাম করছিলাম। সঙ্গী ছিল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও ক্ষেতমজুর। বাকি সবাই শত্রুপক্ষ” (সেন ১৩৫৯, ২১২-৩) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আচমকা নীতি ও কৌশল বদলালে, মণিকুন্তলা

সেনের মনে হয়েছিল যে, আগের নীতিকৌশলগুলি কি অর্থহীন ছিল? সেইসময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক বি.টি রণদিভের নীতিগত সিদ্ধান্তের সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরে নীতিকৌশলগত অবস্থানের বিরোধ চলছে।⁴⁷ উপন্যাসে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের সঙ্গে বৃন্দাবনের বিরোধ হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ জারি রাখা নিয়ে; রমেন ও ইলা আধিয়ার-ক্ষেতমজুর নিয়ে অগ্রসরমান জনযুদ্ধকে থামাতে চান না⁴⁸। আর, পূর্ব পাকিস্তানে যখন তেভাগা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নাকি স্থগিত রাখা হবে, সেই দ্বন্দ্ব চলছে, তখন ভারতেও সেই দ্বন্দ্ব চলছিল। মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জেলের ভেতরে বসে পার্টির খবর ও সংগ্রামের খবর যেভাবে তাঁরা পেতেন এবং তাতে তাঁদের যা প্রতিক্রিয়া হত, সেকথা লিখছেন তিনি। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির নয়া সিদ্ধান্ত জেনে তাঁরা বিস্মিত (এবং হতাশও) হয়েছিলেন। “এ আজাদী বুটা হ্যায় বলে জেলেই বা এলাম কেন?” (২১৩) মণিকুন্তলা সেনের স্বীকারোক্তি ‘সেদিনের কথা’-তে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী (১৯৭৭)’ গল্পে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনাগুলির থেকে আলাদা নয়। কিন্তু, ‘দ্রৌপদী’ কাল্পনিক আখ্যান। ‘আটটা নটার সূর্য’ বা ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’-র মতো সরাসরি প্রত্যক্ষ জবানবন্দি অনুসারে লেখা নয়। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বীভৎসতার সঙ্গে সেখানে থাকে প্রতিরোধের স্বর, গল্পের সার্থকতাও সেই প্রতিরোধ-প্রতিস্পর্ধার স্বরে। বাঁকরাঝাড় থানার চেরাখানের বাসিন্দা নকশাল দোপ্দ্দী মেঝেনকে জীবিত বা মৃত ধরতে বহু অর্থ-লোকবল ব্যয় করে ভারতীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। “জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশো টাকা... মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড ইন মেনি...” (দেবী ১৯৭৭, ১৬৩) সেনাবাহিনীর ছড়িয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তির এই ছিল বয়ান। ক্যাপ্টেন অর্জন সিং-র নেতৃত্বে সেনাবাহিনী দোপ্দ্দী মেঝেনকে গ্রেপ্তার করে। “আটটা সাতাশতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং “ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। দু দি নীডফুল।” বলে তিনি অন্তর্ধান করেন।” (১৭৮) এরপরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা দ্রৌপদীকে গণধর্ষণ

ক'রে সারারাত ধরে। একদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অন্যদিকে দ্রোপদীকে এতদিন না-ধরতে পারার আক্রোশ- দ্রোপদীর শরীরকেই সেনাবাহিনী বেছে নেয় প্রতিহিংসার লক্ষ্য হিসেবে। মলয়া ঘোষ, অর্চনা গুহদের ওপরে রুণু ও তার পুলিশবাহিনীর আক্রোশ কিংবা ইলা মিত্রের ওপরে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ-সেনার আক্রোশ এর থেকে আলাদা নয়। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ তথা দমনমূলক রাষ্ট্রীয় কলাকৌশল (Repressive State Apparatus) নির্যাতনের মাধ্যমে একপ্রকার আতঙ্ক তৈরি ক'রে দেয়; রাষ্ট্রবিরোধী ও শাসকশ্রেণির মতাদর্শ-বিরোধী যে কোনও কাজ প্রবল শারীরিক-মানসিক হিংসাত্মক উপায়ে দমন করা হবে এটাই থাকে উদ্দেশ্য। যাতে, অন্য দ্রোহীরা এই হিংসাত্মক আচরণকে 'চরম উদাহরণ' হিসেবে দেখে। রুণু নিজেও সাক্ষাৎকারে বলেছে যে, "টর্চারার ইমেজ আমাকে চাকরিজীবনে অনেক সাহায্য করেছে" (এপিডিআর, রুণু সাদা না কালো)। আর, নারী দ্রোহীদের ওপরে যৌন নির্যাতন করাও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিশেষ কৌশল। এর পেছনে মূল দু'টি কারণ- রাষ্ট্রীয় তথা শাসকের (মূলত সামন্ততান্ত্রিক) মতাদর্শে নারীরা দুর্বল এবং নারীদের 'ইজ্জত' বা 'সম্মান' মহার্ঘ্য তথা তাদের একমাত্র পরিচিতি। ফলে, মহিলা দ্রোহীকে শারীরিক নির্যাতন করা মানে দ্রোহীর মতাদর্শকে দমনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইজ্জত/সম্মান/পরিচিতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। ভয়/আতঙ্কের উদাহরণ দর্শানো। আর, 'দ্রোপদী' গল্পে দোপদী মেঝেনের প্রতিস্পর্ধা এই সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা তথা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে পাল্টা-আঘাত হেনে দ্রোহীকে প্রতিষ্ঠা দেয়। নারীর সম্মান/ইজ্জত শুধুমাত্র তার গোপনাঙ্গে থাকে না, তার শরীরের 'পবিত্রতায়' থাকে না, বরং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে নিহিত থাকে। দ্রোপদী তার দ্রোহের প্রতি গর্ব এক মুহূর্তের জন্যেও অস্বীকার করে না। বরং, যে শরীরকে নির্যাতন ক'রে রাষ্ট্রীয় বাহিনী নিজেদের মতাদর্শকে গেঁথে দিতে চেয়েছিল, সেই শরীরকে ব্যবহার করেই দ্রোপদী রাষ্ট্রকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে বসে "চারিদিকে চেয়ে দ্রোপদী রক্তমাখা খুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শাটটি বেছে নেয় এবং সেখানে খুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে

পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্” (১৮০) মহাশ্বেতা এই গল্পে বহুস্বরের যথার্থ প্রয়োগ করেন, যেখানে সেনানায়কের ভাষা দোপ্‌দী মেঝেনের ভাষার মুখোমুখি, সেনানায়কের কর্তৃত্বমূলক ভাষার পাল্টাপ্রতিরোধ দোপ্‌দীর ভাষা থেকেই আসে। সেনানায়কের মার্জিত, শিক্ষিত ‘বানিয়ে নিয়ে এস, দু’ দি নীডফুল’-র বিরুদ্ধে দোপ্‌দীর অমার্জিত, অশিক্ষিত ‘লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাব কেমন করে?... লেঃ কাঁউটার কর’ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দোপ্‌দীর ‘মরদ তু?’ প্রশ্ন শুধু ক্যাপ্টেন অর্জন সিংকে নয় বরং রুণু গুহনিয়োগী, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতনকারী পুলিশ প্রত্যেকের প্রতি। আর, ঠিক এই বিন্দুতে এসেই আখ্যানের তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়। ইলা মিত্র, অর্চনা গুহনিয়োগী বা সোনি সরিদের দ্রোহের যে স্বরটুকু বাস্তব জবানবন্দিতে ছিল না, তা আখ্যানের কাল্পনিকতায় দোপ্‌দীর অনায়াস প্রত্যাখ্যানের স্বর হয়ে ওঠে। আর, ‘এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়’ (১৮০) যে ভয় রুণু গুহনিয়োগী, জগদলপুর থানার ও.সিরা (সোনি সোরি নামক আদিবাসী মহিলার যোনিতে পাথর ঢুকিয়ে অত্যাচার করেছিলেন) পায়নি, সেই ভয় লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা চারিয়ে দিতে পারেন অর্জন সিংয়ের মধ্যে। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসেও শরীর হয়ে ওঠে প্রতিরোধের স্বর, যখন ব্রজ গুহকে গ্রেপ্তার করতে এসে পুলিশ অফিসার কনকেন্দু এক ‘আদিবাসী নারী’র অনাবৃত শরীরের মুখোমুখি হয়।

কালো গ্রানাইট পাথরের ভাস্কর্য যেন। উদ্ধত স্তনযুগ, ক্ষীণ কটিদেশ, মসৃণ নিম্ননাভি।
প্রত্যন্তে ঘন অন্ধকার। টর্চ নামল না আর। সব অন্ধকার আলোকিত করতে সবাই পারে
না। আজন্মের সংস্কার হাত টেনে ধরে। দিগম্বরী আবার বললো, কিসকো চাহিয়ে জী?
মুঝ কো? কয়েক পা এগিয়ে এল নারীমূর্তি। তার ডানহাতে ঝুলছে শায়ার প্রান্ত। আঙ্গুলে
জড়ান সেই অন্তর্বাসের রশি। অপ্রত্যাশিত উলঙ্গ প্রকাশ বাকরোধ করে। অনাকাঙ্ক্ষিত
নিরাবরণতাকে কয়েক মুহূর্তের বেশি সহ্য করা যায়না। ছিটকে বেরিয়ে এল কনকেন্দু।
(মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ৩৪৮)

যদিও, এই বর্ণনার ভাষা একজন পুরুষ ঔপন্যাসিকের, তা বোঝা যায় নারীশরীরের বর্ণনায় কালিদাসীয় বিশেষণ ও উপমা ব্যবহারে। কিন্তু, দোপ্‌দী মেঝেনের ধর্ষিত শরীর আর বাসন্তী হাঁসদার উলঙ্গ শরীর রাষ্ট্রের আত্মসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সচেতন ভাষ্য তৈরি করে। সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের মতো পুলিশ অফিসার কনকেন্দুও ভয় পায়। বাসন্তী হাঁসদা বিপ্লবী সুকান্তি ওরফে ব্রজ গুহকে ও নিজেকে বাঁচানোর কৌশল হিসেবে শরীরকে প্রতিরোধী বয়ান ক’রে তুলেছিল। কারণ, রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, তা সে অর্জন সিং হোক বা কনকেন্দু বা বড়বাবু, ‘নারী শরীর’ তাদের কাছে ‘অবজেক্ট’; তাই দোপ্‌দী, বাসন্তীরা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের দ্বারা নির্মিত ‘অবজেক্টিফিকেশন’কেই পাল্টা অস্ত্র ক’রে তোলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

জয়া মিত্র-র ‘হন্যমান’ উপন্যাস নয়, জয়ার জেলে কাটানো কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা। কিন্তু, নকশাল হওয়ার শাস্তিস্বরূপ তাঁকেও বহু অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। জেলে এক ডাকাতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, যে ডাকাত আগে ছিল ভূমিহীন বর্গাদার। কিন্তু, তিনপুরুষের ভাগচাষের জমি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয় জমির মালিক। সংকটের চরম বিন্দুতে জমির মালিককে খুন করার পরে, মামলার টাকা জোগাতে ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ে সে। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি নয়, বরং আরও বড় দস্যু বলে সামাজিক পরিচিতি জোটে তার। ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং কৃষিব্যবস্থার সংকট প্রতীয়মান হয় জয়ার এই অভিজ্ঞতায়; নকশালবাড়ি বিদ্রোহের মতাদর্শের কেন্দ্রীয় নিবন্ধতা ছিল এই ভূমিহীন বর্গাদার ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অধিকারের লড়াইতেই। রাষ্ট্রীয় নির্যাতন নকশাল বন্দীদের ওপরে সবচেয়ে বেশি হলেও, অন্য বন্দীদেরও দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, জয়া সেই অভিজ্ঞতার কথাই লিখেছেন। রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের কথা তাঁর স্মৃতিতে আসে, স্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করার সময়ে,

গাড়ির পাশটায় থুথু ফেলেছিলাম- তাতে তখনও রক্তের ছোপ ছিল... বুটের ঠকঠক গত দশদিনে এত শুনেছি, যে ওটা বাইরে বাজছে না আমার মাথার মধ্যে তাও ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না। অন্ধকারে একটা অসম্ভব স্বর- দিল তো চাপিয়ে। এখন রাস্তায় মরে গেলে সামলাও ঠালা... ধীরে ধীরে বুঝতে পারি এটা একটা ত্রিপল-ঢাকা মিলিটারি লরি... অনেকে বড়োবড়ো করে শুধিয়েছেন, ছেলেরাই মারে! মেয়েদেরও! আর প্রতিবারই থানার সেইসব গর্জমান হিস্ট্রিক্যাল মহাপ্রভুদের জায়গায় আমি মোটাসোটা রাগী মহিলাকে কল্লনা করতে চেষ্টা করি... থানায় অবশ্য বলেছিল, গুলি করে মেরে কাঁসাইয়ে ভাসিয়ে দাও, ওদের তীর্থ মেদিনীপুরে গিয়ে ঠেকবে (মিত্র ১৩৬৯, ৯-১০)

‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে পাঞ্চগলী মিত্রকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় আবারও মিল পাওয়া যায় বাস্তব ঘটনার, যা প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগীর জবানবন্দি। ১৯৭৪ সালের ৩০মে মলয়া ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয়। ‘রুঁনু সাদা না কালো’ বইতে মলয়া বলছেন,

আমায় ধরার দলটা যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সেই অরুণ মুখার্জি রুঁনুর কাছে সবিস্তারে জানায়, আমি কি বলে তাদের গাল দিয়েছি। শোনা মাত্র রুঁনু নির্দেশ দেয়, টেবিলে তোলা। রুঁনুর পাশের ঘরে দুটো টেবিল জড়ো করা। আমায় সেখানে উপুড় করে শোয়ানো হয়। আমার মাথার দিকে তিনজন, পায়ের দিকে তিনজন। রুঁনু রুলের বাড়ি দিয়ে মারা শুরু করে। তারপর শুরু হয় মার। কোমরের নিচে শরীরের হেন অংশ নেই, যেখানে তাদের ডাঙা পড়েনি। এই অত্যাচার চলে প্রায় দু ঘণ্টা... রুঁনু তার চুরুটের ছাঁকাও দেয় শরীরের বেশ কিছু জায়গায়। (ঘোষ ১৯৯৭, ২৮)

উপন্যাসের আখ্যানে পাঞ্চগলীর ওপরে বড়বাবু ও তার পুলিশদলের করা যৌন নির্যাতনের বিবরণ সম্ভবতঃ এই উপাদান থেকেই সংগ্রহ করেছেন অশোক মুখোপাধ্যায়। পাঞ্চগলীকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তারাও বড়বাবুর কাছে একইভাবে নালিশ পেশ করে পাঞ্চগলীর নামে এবং মলয়ার বর্ণনা অনুযায়ী লালবাজারে রুঁনুর বিশেষ কক্ষে অত্যাচার থেকে শুরু করে নিম্নাঙ্গে ক্ষত হয়ে

যাওয়া সর্বোপরি, পুলিশি অত্যাচারের প্রতি বিচারব্যবস্থার নিষ্পৃহ পক্ষপাতিত্ব সবটুকুই পাঞ্চগলী ও মলয়া দু'জনেরই অভিজ্ঞতা। “বড়বাবু আবার বললেন, কীরে মাগি! চুপ কেন? বলবি? নাকি আবার দলাই মলাই করে দেব? ঘরের সবাই চিৎকার করে হেসে উঠল... লোকটির মুখে মদের গন্ধ। কী রে শালি? বলেই তার গালে চুরুটের ছাঁকা দিলেন।” (৩৭৯) ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক পরিসর এই উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট বলেই রাষ্ট্র বনাম বিপ্লবী এই প্রত্যেক রাষ্ট্রের দ্বারা নির্যাতিতর বাস্তব জবানবন্দিগুলোকে কাল্পনিক মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। আর, আখ্যানকাঠামোয় কল্পনার পাতলা আবরণ সরিয়ে পাঠকের বুঝতে হয় না নিপীড়নের বাস্তবতা। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ নিয়ে সিংহভাগ উপন্যাসে সংঘর্ষ ও নিপীড়নের কাহিনিগুলিতে কাল্পনিকতার ভিত্তি অনেক বেশি। তার বর্ণনাতেও অতি-হিংসা, অতি-কল্পনা, অতি-রং ব্যবহার করা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু, এই উপন্যাসে লেখকের প্রচেষ্টা ওই বাস্তব তথ্য-সংকলন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাল্পনিক স্থান ও নামের মোড়কে তাকে পুরে দেওয়া। সেইজন্যেই পুলিশি সন্ত্রাসের বিবরণগুলিকে কষ্টকল্পিত ও অবাস্তব মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনীতিকে মূলে না রাখার যে প্রবণতা দেখা যায় কিংবা প্রকারান্তরে হিংসার দায়ভার সম্পূর্ণতঃ নকশাল তরুণ-তরুণীদের ওপরে ন্যস্ত করার যে ঝোঁক দেখা যায়, এই উপন্যাসটি সেইসব প্রবণতার বিরোধী-উপন্যাসও হয়ে ওঠে লালবাজারের ডিডি-ডিসি, বড়বাবু, কনকেন্দু প্রভৃতি কুশীলবেদের আচরণে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক হিংসা ও মতাদর্শ অনুশীলিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ উপন্যাসে রণজয়ের ওপরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অংশটুকু দেখা যেতে পারে। লক-আপে প্রবল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে মানসিক ভারসাম্য হারায় রণজয়। আর, উপন্যাসটিতে রাষ্ট্রীয় হিংসা চরিতার্থ করায় মুখ্য ভূমিকা নেয় বসাক নামক এক অফিসার। বসাক-রণজয়, রণজয়-রাষ্ট্র এমনকি বসাক-রাষ্ট্র এর’ম কিছু সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। রণজয় ও পুলিশ অফিসার বসাক কাল্পনিক চরিত্র (যদিও বসাক ছিল

কলকাতা পুলিশের বাস্তবিক ডিডি-ডিসি দেবী রায়ের ডানহাত)। কিন্তু, আখ্যানের কিছু সত্য-দাবি (truth claim) থাকে, সেই সত্য-দাবি ১৯৭০ দশকে নকশালদের ওপরে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিভিন্ন বয়ানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে আখ্যানে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বর্ণনায় নির্যাতিতার সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যেমন ছবছ সাদৃশ্য থাকে, এক্ষেত্রে তা নয়। কিন্তু, রাজনৈতিক উপন্যাস ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বর্ণনায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছবি স্পষ্ট হয়। রণজয়কে গ্রেপ্তারের পরে ইএফআর ও পুলিশ তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে, জ্বলন্ত কয়লা ও সিগারেট দিয়ে শরীরে ছেঁকা দেয়। পুলিশ হেফাজতে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হয় এবং চোখে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়⁴⁹। এরপরে রণজয়কে পুলিশ হেফাজতে অত্যাচারের বর্ণনা রণজয়ের জবানবন্দিতে দেওয়া হয়। পাঠক এখানে প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে, রণজয়ের এই জবানবন্দি লেখক জানলেন কী ক’রে? সেজন্যেই লেখক পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি নামক একটি বাস্তব-সংগঠনে জবানবন্দিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন; এই উল্লেখ তাৎপর্যের,

জিজ্ঞাসাবাদের ধার দিয়েও গেল না। উলঙ্গ করে পেটাতে লাগল। তখন মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলছি। এমন সময়ে আরেকজন ইন্সপেক্টর কিংবা এসআই অশ্রাব্য গালাগাল করতে করতে আমার মুখে পেছাপ করতে এল... আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ওরা দফায় দফায় আমাকে পিটিয়ে চলল। (ভট্টাচার্য ২০১০, ১৪৪)

এখানে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনপদ্ধতির ‘ভাল পুলিশ, খারাপ পুলিশ (Good Cop, Bad Cop)’ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে রণজয়। পুলিশি অত্যাচারের এও এক চিরন্তন পদ্ধতি, ক্রিস্টোফার নোলানের ‘দ্য ডার্ক নাইট (২০০৮)’ ছবিতে জোকার চরিত্রটির ওপরে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের সময়⁵⁰। রণজয়ের এই উল্লেখপর্বটি কিন্তু এপিডিআরের পুস্তিকায় প্রকাশিত জবানবন্দির অংশ নয়, “রণজয় মনে করে খুব বেশি কিছু আর বলতে পারেনি, কারণ তখন অসুস্থতার ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে” (১৪৪); বরং রণজয়ের চেতনাপ্রবাহে ও স্মৃতিপথে

জাগরুক। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে ‘ভাল পুলিশ’-র তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাবাদকে পাঁচটা প্রতিরোধের পদ্ধতিগুলি রণজয়ের স্মৃতি থেকে উল্লিখিত, কারণ, এই অংশটুকু এপিডিআরের জানার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ, হেফাজতে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল রাষ্ট্রীয় বয়ানে নিশ্চয় এভাবে থাকবে না। ঔপন্যাসিক কি এক্ষেত্রে আখ্যানের কল্পনাভিত্তিকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন সচেতনভাবে? যাতে ‘বিরোধমূলক প্রতর্ক (oppositional discourse)’-র সার্থকতা বজায় থাকে আখ্যাননির্মাণে? রণজয় ক্রমশঃ দৃষ্টবিভ্রম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে হতে অভিজ্ঞতা বলেছিল, “বাবা, ওরা না, ওরা আমায় ভীষণ মেরেছে... বাবা, তুমি যখন জেলে আসতে, ওরা কথা বলতে দিত না।” (১৪৯) এর সঙ্গেই রণজয়ের ছেলে কোবার (অনির্বাণ) স্মৃতিতে অমলিন থাকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির বইতে পড়া দ্রোহীদের ওপরে করা প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের তথ্য। ফলে, আখ্যানকৌশলে নবাবরূপ বাস্তব ও আখ্যানের মিশেল ঘটান এইভাবে। কোবার পড়া বই, যা তার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল, তাতে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিবরণ,

১৯৭২, ২০ ফেব্রুয়ারি। একজন নিহত, ৯ জন আহত... দমদম সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ১৪ মে। ১৫ জন নিহত ও ৭৩ জন আহত- ‘জেলের রক্তপিপাসুরা জেলারের প্ররোচনায় পরিস্থিতিটাকে তাদের একটা উৎসবে পরিণত করল।... এটা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য নয়, হত্যার জন্য। একে একে তরুণেরা লুটিয়ে পড়তে শুরু করল। তাদের রক্তে মাটি ভিজে উঠল। কিন্তু তাদের জ্ঞানহীন শরীরের উপরেই পেটান চলতে লাগল। কেউ কেউ সাথে সাথেই মারা গেল। অন্যেরা মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।... হাওড়া জেল, সিউড়ি জেল, আলিপুর স্পেশাল জেল, আসানসোল স্পেশাল জেল...’ (ভট্টাচার্য ১৪১৬, ১৪৮)

এই নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর লম্বা তালিকা কোবার স্মৃতি আর বাস্তব-পুস্তিকার তথ্যভারে পাঠকের কাছে ক্রমশঃ বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব হতে থাকে। কিন্তু, যেহেতু এটা উপন্যাস, যেহেতু এটা আখ্যান, কোনও তথ্যসংকলন বা স্মৃতিভারাতুর সত্যকথন নয়, তাই রণজয়ের স্মৃতিভ্রম আর ‘ভুল-বকা’ ঢুকে পড়তে থাকে। এর ফলে, একদিকে যেমন কারাগারে পুলিশি নির্যাতনের ফলে

রণজয়ের মানসিক স্থিতি নষ্ট হয়েছে, তা বোঝানো যায়; তেমনই, আখ্যানের নিজস্ব সত্যও উপস্থাপিত করা যায়। রণজয় র্যালফ ফক্সের ‘কমিউনিজম’ এবং ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ডের বইয়ের উল্লেখ করে যেগুলি বাস্তবে রয়েছে কিন্তু এর সঙ্গেই তার দৃষ্টবিভ্রম ঘটতে থাকে পুলিশি অত্যাচারের, যা সেই মুহূর্তে বাস্তব নয়। রণজয়ের এই দৃষ্টবিভ্রম অন্তর্বর্তী পাঠক (implied reader)কে সচেতন রাখে রাষ্ট্রীয় হিংসা সম্পর্কে, কোবার পঠিত পুস্তিকার তথ্য-বিবরণ সেই সচেতনতাকে বাড়িয়ে দেয়। সত্তর দশক কেন্দ্রিক বিশেষতঃ নকশালবাড়ি কেন্দ্রিক সমস্ত উপন্যাসের আখ্যানে এই সচেতনতা থাকে। জয়ন্ত জোয়ারদারের ‘এভাবেই এগোয় (১৯৭৮)’ উপন্যাসে রাজু পুলিশ অত্যাচারের ফলে মেরুদণ্ডের অসুখে চিরকালের জন্যে রুগ্ন হয়ে যায়। আর, রাজুর কারাসম্মতিতে বলসে ওঠে,

হঠাৎ দেখি লাইট অফ হয়ে যায় আর মশাল হাতে ঝড়ের বেগে সিআরপি-রা ঢোকে। বেধড়ক লাঠিগুলি চালাতে শুরু করে। বীরভূমের কমরেডটির মাথায় লাঠি পড়ে- ফট করে একটা আওয়াজ হয়। তার মাথাটা ধরতে গিয়ে দু’ফাঁক হয়ে যাওয়া খুলির মধ্যে হাত ঢুকে যায় গৌতমদার। তখন নাকি গৌতমদা ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই সিআরপি-টার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে সেটাকে খতম করে... এক ঝাঁক সিআরপি ঝাঁপিয়ে পড়ে, গৌতমদাকে ধরে বেদম পিটিয়ে মাটিতে ফেলে গলায় লাঠি চেপে ধরে তার ওপরে দু’দিক থেকে দু’জন... ‘চুপ কর, রাজু, চুপ কর’। চীৎকার করে ওঠে মিনু (জোয়ারদার ১৯৭৯, ১৩০)

উপন্যাসের বাস্তবতায় ঘটে যাওয়া এই কাহিনি শুনছিল যে মিনু, সে ঘটনার বীভৎসতায় চিৎকার ক’রে ওঠে, সঙ্কস্ত হয়। আখ্যানের পাঠকও সঙ্কস্ত হয় এই বর্ণনায়। উপরোক্ত অন্যান্য উদাহরণের সঙ্গে এই উদাহরণকে মিলিয়ে দেখলে যে সাযুজ্য পায় বাস্তবের পাঠক, তাতে সে শিউরে ওঠে। সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের পাঠক এই বীভৎসতার পাঠে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ‘হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪)’ উপন্যাসে ব্রতীর লাশ যে বীভৎসতার সাক্ষ্য দেয়, তাতে রাষ্ট্রীয়

হিংসা বর্ণিত হয় আখ্যানকথকের মাধ্যমে, “ওর বুক, পেটে আর গলায় তিনটে গুলির দাগ ছিল। নীল গর্ত। শরীরে খুব কাছ থেকে ছোঁড়া গুলি। নীলচে চামড়া। কর্ডাইটের ঝলসানিতে পোড়া বাদামী রক্ত... শাণিত ও ভারী অস্ত্রের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘা-মেরে খেঁতলানো, পিষ্ট ব্রতীর মুখ” (৬৭) নকশালবাড়ি বিদ্রোহের ওপরে লেখা উপন্যাসগুলি এই বীভৎস আখ্যানপাঠের পথ খুলে দিল পাঠকের সামনে। শাসকের মতাদর্শ-মানা ঔপন্যাসিকেরা কিংবা শাসকের মতাদর্শের বিরুদ্ধে থাকা ঔপন্যাসিকেরা কেউই এই বীভৎসতাকে অস্বীকার করতে পারলেন না তাঁদের আখ্যানরচনায়। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই এই হিংসার উপস্থাপনা ভিন্ন, এই হিংসার উপস্থাপনার মাত্রাতেও পার্থক্য আছে, কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্যতম বিবরণাত্মক উপাদান হয়ে উঠল এই বীভৎসতা। যদিও, এর দু’টি পৃথক উদ্দেশ্য ছিল- (১) রাষ্ট্রীয় হিংসার বীভৎসতার বর্ণনা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে (যারা এইসব উপন্যাসের পাঠক) দ্রোহবিমুখ ক’রে দেওয়া কারণ, ‘রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান সর্বদ্রোহদলনকারী’ এই বয়ানই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং (২) আখ্যানের কাল্পনিকতার পরিসরেও ওই দশকের বাস্তবতার যথাযোগ্য উপস্থাপনা করা যাতে পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকেরা ওই দশকের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থাকে। এই বীভৎসতা একমাত্র তুলনীয় মহাকাব্যের (এবং এপিকের) বীভৎস রসের বর্ণনার সঙ্গে। মহাকাব্যে এরকম গলা কাটা, অসংখ্য তীরবিদ্ধ শরীর, ঘুমন্ত অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্রের ব্যবহারের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু, মহাকাব্য হোক বা উপন্যাস, তা তো ‘কল্পনাশ্রয়ী’। কাব্যের সত্য আর ইতিহাসের সত্য কি অবিকল অভেদ হতে পারে? আখ্যানকথকের কথিত বীভৎসতার পরেও কি পাঠকের মনে সংশয় থাকেনা যে, ‘আদৌ কি এরকম ঘটেছিল? আদৌ কি এতটা বীভৎসতা সত্যি?’ যেখানে রাষ্ট্র তার নির্মিত নিয়তবয়ানে ওই দশকের ইতিহাসকেই ভুলিয়ে দিতে চায়, সেখানে আখ্যানপাঠকের এই সংশয় তো স্বাভাবিক।

উপন্যাসের সত্য-দাবি বা ট্রুথ ক্লেইম থাকতে পারে না, কারণ তা কল্পাখ্যান- এই দাবিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতেই উপন্যাসের মধ্যে বারবার সত্তর দশকের পুলিশি নির্যাতন নিয়ে

বেরনো বিভিন্ন পত্রিকা-বইয়ের উল্লেখ করেন লেখক নবারণ ভট্টাচার্য। সেই বইগুলি থেকে বিভিন্ন অংশ অনিবার্ণের (রণজয়ের ছেলে) বয়ানে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেন লেখক। “কোবা তার বহু জায়গা মুখস্থ বলে যেতে পারে” (১৪৭) তাতে পাঠক অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারেন যে, উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রণজয়ের ওপরে যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, তা অতিরঞ্জন নয় বা অতিবাস্তব নয়। রণজয়ের ওপরে পুলিশি হেফাজতে হওয়া অত্যাচার, যা তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট ক’রে দিয়েছিল, তা পড়ে পাঠকের মনে হতেই পারে অতিবাস্তব; কিন্তু, লেখক সেইজন্যেই “পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকাতে রণজয়ের অভিজ্ঞতার সামান্য এক অংশের কিছুটা বিবরণ রয়েছে” (১৪৪) এই উচ্চারণটুকু রাখে যাতে আখ্যানের ‘মিথ্যে/কল্পনা’-র মধ্যে সত্যের আদল থেকে যায়। মানসিক ভারসাম্যহীন রণজয়ের জবানবন্দিকে পাঠক যাতে অস্বীকার না করেন, সে ব্যাপারে ঔপন্যাসিক সচেতন। রাজনৈতিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই কাল্পনিক সত্যকে (fictional truth) পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তুলতে চান। আর, আখ্যানের নিরপেক্ষতার দাবিপূরণ করতেও তাই বাস্তবের সংগঠন এপিডিআরের পুস্তিকার বারংবার উল্লেখ করতে হয় এবং বাস্তবে নথিবদ্ধ শহীদ তরুণ-তরুণীদের নামোল্লেখ করতে হয়। “শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীর রায়চৌধুরী, মদন দাস, পার্থসারথী ঘোষ ও প্রতীপ ঘোষের মুণ্ডু-খ্যাংলানো মৃতদেহের বিবরণ দিতে পারে কোবা” (১৪৭) এই পদ্ধতিতেই রণজয় নামক এক কাল্পনিক কুশীলবকে সত্তর দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিস্থাপন করেন লেখক। এই পদ্ধতিতেই নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসের কল্পনাভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ ক’রে আখ্যানরচনা করেন তিনি। তিমিরবরণ সিংহ সহ ৯ জনকে বহরমপুর জেলে ১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করে জেল কর্তৃপক্ষ। এই বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না কোনও আখ্যানের কল্পভিত্তি। এইরকম প্রচুর উদাহরণ বাস্তবের ‘পুস্তিকা’ থেকে পায় কাল্পনিক চরিত্র কোবা। এক্ষেত্রে, ‘পুস্তিকা’টি কিন্তু পাঠকের কাছেও বাস্তব, যদিও কোবা এবং রণজয় পাঠকের কাছে

কল্পনার উপাদান। শংকর বসুর (রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম) ‘কমুনিস (১৯৭৫)’ ও ‘জার্নাল সত্তর (২০০০)’ প্রকাশিত হয় পঁচিশ বছরের ব্যবধানে। ‘কমুনিস’-র প্রটাগনিস্টের নাম গোরা; ‘জার্নাল সত্তর’ লেখকের আত্মজীবনীমূলক। কিন্তু, গোরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশ-হেফাজতে যে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়, ‘জার্নাল সত্তর’-এর ‘আমি’-র সঙ্গে তা মিলে যায়। শংকর/রাঘব তথ্য দিয়ে সত্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেননি, কিন্তু, আত্মজীবনীমূলক আখ্যানে ‘কমুনিস’ উপন্যাসের আখ্যানকে ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করেছেন। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে উল্লিখিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকায় উল্লিখিত গণহত্যা ও জেলের-ভেতরে-হত্যার সালতামামি রয়েছে। হুগলি জেলে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে দ্রোণাচার্য ঘোষকে আরও কয়েকজন সহবন্দী নকশালের সঙ্গে পিটিয়ে-থোঁলে খুন করে কারা-কর্তৃপক্ষ। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসের আখ্যানে এই হত্যাকাণ্ডটি রয়েছে। দ্রোণাচার্য ঘোষ জেল পালাতে গিয়ে মারা গেছেন, জেলের ভেতরে কারারক্ষীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয় এবং মানবাধিকার কর্মীদের আহত কিছু তথ্য-সম্ভাবনা- এই বাস্তব রসদটুকু নিয়েই আখ্যানে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা করতে হয়েছে অশোক মুখোপাধ্যায়কে।

ওঠবার মুহূর্তে পেটে লাথি কষাল কেউ। উপুড় হয়ে পড়ে গেল দ্রোণ। শুরু হয়ে গেল লাঠিবৃষ্টি... কিন্তু, আজ এরকম যন্ত্রণা কেন হচ্ছে তার? নাঃ লাঠি নয়, কোনো ভোঁতা ধাতব অস্ত্র দিয়ে মারা হচ্ছে তাকে... দ্রোণের উন্মুক্ত পেটের ওপর লাফাতে শুরু করে দিল দু-টি প্রহরী। বুক ফেটে গেল যেন। আর্তনাদ বের হতেই গলায় পা রেখে দাঁড়িয়ে গেল লোহার নাল লাগান বুট। দমের কষ্ট ভীষণ। বাতাস না পেয়ে দ্রোণের শরীর আন্দোলিত। (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ২৮৮)

দ্রোণাচার্য ঘোষ এই উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, দ্রোণাচার্য কলকাতা শহরের নয়, দু’টি অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর) কোনওটিতেই তিনি পড়েননি, নিম্নবিত্ত পরিবার এবং তাঁর সক্রিয়তার ভৌগোলিক এলাকা শহরকেন্দ্রিক নয়।

দ্রোণাচার্যকে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলে ঔপন্যাসিক নকশালবাড়ি-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসের চলতি মডেলকে এড়াতে পেরেছেন এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানবিস্তৃতিও সম্ভব হয়েছে। সত্তর দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক চারু মজুমদার সিপিআই(এম-এল) পার্টির সহযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন জেল ভেঙে বেরিয়ে আসার। আইন-আদালতের পথে না গিয়ে, রাষ্ট্রীয় আইনকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্রনির্মিত কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার এই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে দ্রোণাচার্য, তিমিরবরণ সহ অসংখ্য দ্রোহী শহীদ হয়েছেন। কিন্তু, জেল ভাঙার আহ্বান কমিউনিস্ট পার্টি এর আগেও রেখেছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্ত আইনি সুবিধাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে একদিকে যেমন অনশন, তেমনই অন্যদিকে জেল-ভাঙার ডাক; মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীমূলক ‘সেদিনের কথা’-তে তারই উল্লেখ,

নতুন আসা একজনের কাছে হঠাৎ খবর পেলাম জেল ভাঙার অভিযানে বাইরে থেকে বিশাল মিছিল আসবে। ব্যাপারটা ছিল ‘বাস্তিল দুর্গ’ ভাঙার মিনি-অনুকরণ। মিছিল এলো একদিন রাত্রে। আমরা তখন তালাবন্ধ... গোটাকতক বোমা ফাটল। তারপর পুলিশের লাঠি চললো। রাস্তার উপর কয়েকজনকে পড়ে থাকতে দেখেছি, আর বুকের মধ্যে শুধু কাঁপুনী ধরেছে। (সেন ১৩৫৯, ২১০)

১৯৪৯-৫০ সালে রণদিভে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক থাকার সময়ে আইনবিরুদ্ধ পথে সংগ্রামকে অগ্রসর করার ও শহরভিত্তিক অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও, মণিকুন্তলা এ ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা জ্ঞানিয়েছেন কিন্তু, ইলা মিত্ররা ওই পথেরই সমর্থক ছিলেন। আখ্যানের সত্য-দাবির প্রতিষ্ঠার্থে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রচেষ্টা জারি রাখেন। যেকোনও ঔপন্যাসিকই এই চেষ্টাটুকু করেন, যাতে আখ্যানকে বিশ্বাস করানো যায় পাঠককে। আর, ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে তথ্য-আখ্যান-ইতিহাস মিশেই ‘আখ্যান বনাম সত্য’ প্রত্যর্কে নতুন সংযোজন করে। আখ্যানের অন্যতম অ্যান্টাগনিস্ট পুলিশ-অফিসার কনকেন্দুর ‘ডায়েরি’ আখ্যানের সত্য-দাবিকে

পাঠকের সামনে হাজির করিয়ে পাঠকের ‘বিশ্বাস’ অর্জন করতে চায়। “জানেন তো আমার ডায়েরিতে সব লিখে রেখেছি... বড়বাবুর সমস্ত অত্যাচারের বিবরণ... হত্যার তালিকা... সাল, তারিখ, সময় দিয়ে লেখা আছে সব... আগামীতে কোনো মানুষের হাতে তুলে দেব ডায়েরিটা।” (৪১৩) কিন্তু, কনকেন্দুকে লুকিয়ে রাখতে হয় সেই ডায়েরি; বড়বাবু অর্থাৎ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যেকোনও অধস্তনকে খুন করতে পারে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ অটুট রাখার তাগিদে। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ সম্পর্কে বয়ান পাল্টা-বয়ান অজস্র। শাসকের প্রচারিত ইতিহাস ও সেই ইতিহাসকে শিরোধার্য ক’রে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসে বড়বাবু-কনকেন্দুদের ভূমিকা নায়কের তথা সমাজরক্ষকের। অথচ, ইতিহাসও ‘নির্মিত’ হয়, ইতিহাসলেখক কাল্পনিকতার ‘হারানো-সূত্র (মিসিং লিঙ্ক)’ জুড়ে জুড়ে ইতিহাসের নির্মাণ করেন। আখ্যানের কাল্পনিকতা সেই নির্মাণে সাহায্য করে। কনকেন্দু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়েও যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের নির্যাতনের সালতামামি দিনলিপিবদ্ধ করে, তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়। আর, ওই ডায়েরিটি শাসকের বয়ানে নির্মিত আখ্যানকে প্রত্যাক্ষান করে। কিন্তু, আখ্যানের রসনিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন তবু থেকেই যায় এত সত্য-দাবি ও বাস্তবতার সঙ্গে সাদৃশ্যের পরে। শঙ্কুকের মতে, রসের উৎপত্তি ঘটে অনুমান থেকে। শঙ্কুকের মতে, সুদক্ষ নট-নটী যখন অভিনয়দ্বারা নাট্যস্থ কোনও অবিদ্যমান কুশীলবকে প্রকাশ করে, তখন দর্শকের মধ্যে সেই অবিদ্যমান কুশীলবের (নাটকের চরিত্র) অনুমান হয়; ফলে রসের উদ্ভব ঘটে দর্শকের হৃদয়ে। তাঁর মতে, চিত্রার্পিত অশ্বকে দর্শক অশ্বজ্ঞান করে, অনুমানও তাই। কোনও ঘোড়ার ছবি দেখে সম্যক, মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্য- এই চারটির কোনওটিই হয় না; তাই, ছবিতে আঁকা ঘোড়া দেখে ঘোড়ার অনুমান হয় বলে, তা আনন্দদায়ক। আখ্যানেও কি একই তত্ত্ব প্রযোজ্য? কিন্তু, বড়বাবু অথবা বসাকের চরিত্রচিত্রণে রুন্নু গুহনিয়োগী ও দেবী রায়ের সাদৃশ্য থাকে। বাস্তবের পুস্তিকায় লেখা ঘটনা থেকেই ছেকে তোলা হয় এদের। পাঠক অনুমান করতে পারেন এই বাস্তব চরিত্রদের। পাঠকের পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানা কোনও বাস্তবিক দ্রোহীর কাহিনির সঙ্গে নিরুপম, অনিমেঘ, রণজয়েরা মিলে যায়। নাটকের ক্ষেত্রে নট-নটীর অভিনয় যেমন অনুমানকে প্রকট করে তোলে, তেমনই

আখ্যানের ক্ষেত্রে ভাষা-স্বর-সংলাপ ও কুশীলবেদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই অনুমানকে প্রকট করে। ‘দ্রৌপদী’ গল্পের ভাষা-বহুস্বর-সংলাপ থেকে দ্রৌপদী মেঝেনকে অনুমান ক’রে নিতে পারে পাঠক। রসোত্ত্বের এই তত্ত্ব আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনায় মিলে যায়। কিন্তু, যেখানে সম্যক ও সাদৃশ্যের উপস্থিতি থাকে? সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে এই সম্যক ও সাদৃশ্যের উপস্থিতি কি বেশি?

রণজয়ের ওপরে হওয়া নির্যাতনের সঙ্গে ‘কমুনিস’-র গোরার ওপরে হওয়া নির্যাতনের দু’টি বিষয়ে মিল আছে। এক- প্রতিহিংসা ও যৌন-বীভৎসতার উন্মত্ততায় পুলিশের ভূমিকা এবং দুই- ‘ভাল পুলিশ, খারাপ পুলিশ’ ভূমিকায়। গোরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বেলেঘাটা থেকে, যে বেলেঘাটাকে শহরের ‘মুক্তাঞ্চল’ হিসেবে গড়ে নিয়েছিল গোরা ও তার সহযোদ্ধারা। বেলেঘাটার বস্তি অঞ্চল ও শ্রমিক অঞ্চলে পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলেছিল নারাণ, মণ্টু, সুকু, শান্তা, নিবারণ, গোরা। ‘ভাষা’ এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে, ভিন্নশ্রেণি, ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের স্বরপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা হয়ে উঠেছে সত্তর দশকের রাজনীতি-হিংসা-শ্রেণিসংগ্রামে গড়ে ওঠা ‘জীবন্ত’; আর, সেই ভাষা দিয়েই থানায় গোরার ওপরে হওয়া নির্যাতনের বর্ণনা এরকম,

সব ওলোটপালোট হয়ে গেল খিস্তি আর মারের তোড়ে। কস্বল চাপা দিয়ে পেটাল খানিক। তারপর কচুয়া। পায়ের চেটো ফুলকো লুচির মতো, গোদের মতো ফুলে গেল একরাতিরে। রাত্তিরটা কাটল লকআপের পেছাপের ঝাঁজ আর মশার হলে আর অসাড় জ্বরো-ঘুমে। তারপর জেরা। ইন্টারোগেশন। শকুনের ঠোঁটের মতো অফিসারের নাক। চাঁচাছোলা মুখ... ‘তোর মাকে ছেড়ে দিয়েছি, বেশি বাড়াবাড়ি করলে...’ কোমরের ওপর কাপড়টা সবসুদ্ধ তুলে অফিসারটা (এসবি) অণ্ডকোষ সমেত যৌনাঙ্গ গোরার মুখের কাছে এনে উরুতে চাপড় মারতে লাগল, খা... শালা... মূত খা (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১৬৪-৬৬)

নির্যাতক অফিসারের এই ভূমিকা লালবাজারে প্রত্যক্ষ করেছিল অনিমেঘও। “পুলিশকে মারার তাল হচ্ছিল। বিপ্লব করছেন। পেছাপ করে দিই বিপ্লবের মুখে। হাঁ কর হাঁ কর বলছি।” (২৮০) কমিউনিস্ট বন্দির ওপরে যৌন নির্যাতনের সময় তার মুখে ‘পেছাপ ক’রে দেওয়া’-র এই বর্ণনা অনেকগুলি উপন্যাসেই থাকে। আর, এর মাঝেই চলে ‘ভাল পুলিশের’ জেরা, “ভদ্র-ভদ্র কথা, দরজির ফিতে-মাপা হাসি, পেনের নিবের সোনার জলের খস খস শব্দ”- এই পর্বে গোরাকে চারমিনার সিগারেট দিতে চান তদন্তকারী অফিসার, গোরার কলেজ-মতাদর্শ সব কিছুই জানে সে। সর্বজ্ঞ রাষ্ট্রের যথার্থ সর্বজ্ঞ প্রতিনিধি সেই অফিসার। আর, ‘আপনি’ সম্বোধনে গোরাকে জিজ্ঞেস করে, “কার কথায় প্রথম ইন্সপার্ড হলেন... মানে হ্যাঁ সত্যিই দেশের অবস্থা তো শোচনীয়, একটা পরিবর্তন...” (এ) সেই অফিসারই এরপর ‘তুই’ সম্বোধনে গোরাকে প্রাণের হুমকি দিয়ে তাকে প্রস্রাব গিলতে বাধ্য করে। সত্তর দশকের বিশেষতঃ নকশাল দ্রোহীদের ক্রিয়া-সময় নিয়ে লেখা উপন্যাসে এই জেরা, এই নির্যাতন অঙ্গঙ্গী হয়ে যায়। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ উপন্যাসে রণজয়কে কখনও প্রবল শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা হয়, আবার কখনও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হয়ে যায় পুলিশ অফিসারেরা। গোরার সব খবর আগেভাগে রেখেই গোরাকে জেরা করেছিল পুলিশ। রণজয়কে সর্বজ্ঞ অফিসার বলে, “আপনার ব্র্যান্ড তো চারমিনার। দেখেছেন তো, আপনি আমাকে চেনেন না, অথচ, আপনার সব খবর আমরা রাখি” (১৪৪) সেই মুহূর্তে রণজয়কে ‘আপনি’ সম্বোধন করে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা ক’রে সংগঠনের অন্দের গপন খবর বের ক’রে নিতে চায়। “আপনাদের ইন্টারন্যাশন্যাল কন্ট্রাস্টগুলো আমরা জানার চেষ্টা করছি... আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে মারিঘেল্লার থিওরি আপনি জানেন?” দু-ধরনের প্রশ্ন অর্থাৎ, সাগঠনিক-তাত্ত্বিক খবর জানার জন্যে এবং ব্যক্তিগত স্তরের প্রশ্নে দ্রোহীর মনের হৃদিশ পাওয়ার জন্যে- রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘জার্নাল সত্তর (২০০০)’-এও একই পদ্ধতির উল্লেখ করেন। অনেকগুলি উপন্যাসেই যখন আখ্যানের মিল পাওয়া যায়, তখন বোঝা যায় বাস্তবতার সত্য। ‘মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭)’ উপন্যাসে একজন গলা-পুলিশ রুহিতনকে সিগারেট দিতে চায়। অথচ, তার আগেই

কড়া-পুলিশরা রুহিতনের গুহ্যদ্বারে একটা মোটা রুল অনেকখানি ঢুকিয়ে চাড়া দিয়েছিল।⁵¹ আর, যন্ত্রণাবিদ্ধ রুহিতনকে ঐ জিজ্ঞাসাবাদ-কক্ষেই গলা-পুলিশ বলে, “কী হবে আর এত চেপে রেখে! যা জানো তা বলেই দাও।” (৮) কিন্তু, রণজয়, গোরা, নিরুপমদের সঙ্গে রুহিতনের একটা পার্থক্য থাকে, রুহিতনকে গলা-পুলিশ ‘আপনি’ নয়, ‘তুমি’ সম্বোধন করে; রুহিতনের নিম্নবর্গীয় সামাজিক-অবস্থানের জন্যেই এই সম্বোধন রাষ্ট্রের তরফে। ‘হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪)’ উপন্যাসেও এই ভাল পুলিশ খারাপ পুলিশ দ্বন্দ্ব চলতে থাকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে,

যে জেরা করে সে থাকে অন্ধকারে। সে সিগারেটখোর হোক বা না হোক, হাতে সিগারেট জ্বলে। কখনো কখনো, ‘ও, আপনি চ্যাটার্জির বন্ধু?’ এ হেন সামাজিক ভদ্র প্রশ্ন মিহিগলায় করে শিক্ষিত ভদ্রবংশের জেরাকারী জ্বলন্ত সিগারেটটা হাজার ওয়াটে উদ্ভাসিত মুখের ওপর চেপে ধরতেও পারে। সিগারেটের ছাঁকায় শুধু ‘সারফেস্ কিউটেনাস ইনজুরি’ হয়... ভেতরে, তরুণ হৃদয়ে প্রত্যেকটা ছাঁকা চিরকাল ক্ষত হয়ে থাকে, থেকে যায়। (দেবী ৬৯-৭০)

কমিউনিস্ট দ্রোহী নন্দিনীর চিন্তাস্রোতে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের এই বিবরণ আখ্যানে আসে। পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে নন্দিনীর চোখ নষ্ট হয়ে যায়⁵²। রাষ্ট্রীয় দমননীতির অঙ্গ হিসেবেই ব্রতীর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে রাষ্ট্রমুখী ক’রে দেওয়া হয় এবং ব্রতী-সমু-পার্শ্ব-বিজিতকে প্রকাশ্যে খুন করে রাষ্ট্রের মদতপ্রাপ্ত গুপ্তারা। ‘জার্নাল সত্তরে’ রাঘব লেখেন থানায় পুলিশের নির্যাতনে “শরীর তখন রাস্তার কুকুর; কিল, চড়া, লাথি, রক্ত-মাংস-হাড়ের একটা কাঠামো থেকে নিংড়ে বের করছে যন্ত্রণাজ্ঞ, অস্ফুট এমন সব ধ্বনি...” (২৩৪) অথচ, সেই বিপ্লবীকেই লালবাজারে একুশ দিনের ‘পুলিশ কাস্টডি’তে তাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহে, ‘ভদ্র’ ব্যবহারে ‘গলা পুলিশ’ জেরা করে। “নিঃসঙ্গ লাগছে খুব?... রাজনীতির বাইরে আর কোন জিনিসটা আপনার মন টানে? এইরকম অজস্র প্রশ্ন খুবই ভদ্রভাবে, আলোচনার ঢঙে ঘণ্টার পর ঘণ্টা করে যেত।” (২৪০) ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে নিরুপমের সঙ্গেও প্রায় একই আলোচনা চালায়

কনকেন্দু নামক অফিসার⁵³। “লিবারেশন পড়িস?... সিপিএমের সঙ্গে তোদের কোন জায়গায় তফাৎ?... শোন, তোদের এই নতুন রাস্তায় খুব মারকাট হবে রে...” (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ১৪৮-৯) রণজয়, গোরা বা নিরুপম- সবাইকেই ‘গলা পুলিশ’ বোঝাতে চায় রাষ্ট্রদ্রোহীতা ভুল বরং সামাজিক নিশ্চয়তা ও শান্তির পথই নেওয়া উচিত। রাঘব যেমন লেখেন, ‘অপরিণত মস্তিষ্ক আর শিশুসুলভ সারল্যের কারণেই’ তিনি ভেবেছিলেন (এবং ‘কমুনিস’ উপন্যাসের গোরাও ভেবেছিল) যে, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সহজেই বিভ্রান্ত করা যাবে অপ্রয়োজনীয় কথায়, বাস্তবে তা হয় না। কারণ, ‘পুলিশের বুদ্ধিজীবী শাখার ওই লোকগুলো’ রণজয়, গোরা, বিনু, নিরুপমের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেই জেরা করতে আসে। ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে বিনুকে চুল্লীতে ঢোকানোর পরে তার বাবা কৃষ্ণলাল যখন সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, তখন “জনৈক বুদ্ধিজীবী পুলিশ অফিসার অধস্তন একটিকে বলেন- ‘ঐ দেখুন, নকশালের বাবা, ছেলে পুড়ছে বলে মন্তর পড়ছে’... বিনু পুড়ছিল তখন” (ভট্টাচার্য ২০০৭, ৩৪) মন্তব্যটিতে ‘নকশালের বাবা’ সুকান্তর ‘ওরা আকাশে জাগাত ঝড়’ আবৃত্তি শুনে ‘বুদ্ধিজীবী অফিসারের’ গ্লোমের পাশাপাশি ‘গলা পুলিশ’-র মুখোশটাও ধরা পড়ে। নিরুপমকে বড়বাবু জেরা করে না। দোপ্দ্দী মেঝেনকে গণধর্ষণ করে ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের অধস্তনেরা, অর্জন নিজে নয়। কিংবা, রণজয়কে বসাক জেরা করেছিল কিনা, তা রণজয় চিনতে পারে না। গোরা দেখেছিল স্পেশ্যাল ব্রাণ্ডের ‘পাড়ার মাঝবয়সি কেরানির মতো ভোলেভালা চেহারার একটা মানুষ’ জেরা করতে করতে ভোল বদলে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করেছিল। কিন্তু, অর্জন সিংই নির্দেশ দিয়েছিল ‘ওকে বানিয়ে নিয়ে এসো’। অনিমেষকে গুলি করার সময়ে যে অফিসার বলেছিল, ‘এই শালা নকশালদের ঝাড়েবংশে শেষ করা দরকার’ (২৭৫), তা আসলে রাষ্ট্রের অমোঘ নির্দেশ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যৌথ পরিকল্পনা ও নির্দেশই পুলিশ-সিআরপি-মিলিটারি অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। বড়বাবু ও ওপরমহলের নির্দেশেই কনকেন্দু নিরুপমের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিল এবং পরে হস্তারক অফিসারে বদলে গিয়েছিল। ‘হাজার

চুরাশির মা (১৯৭৪)’ উপন্যাসে পুলিশ অফিসার সরোজ পাল একদিকে ‘ব্যাপক তদন্ত তল্লাসী ও শাস্তিবিধানের ভার লইয়াছেন’ অন্যদিকে তিনিই ব্রতীর ঘর তল্লাসী করতে এসে সুজাতাকে বলেন, ‘মিসেস চ্যাটার্জি, আমি জানি, আমারও মা আছেন।’ এবং ব্রতী সম্পর্কে বলেন ‘মিসগাইডেড ইয়ুথ।’⁵⁴ ব্রতীর উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী বাবা-দাদার সূত্রেই সরোজ পাল ব্রতীর আত্মীয়দের সাথে ‘মোলায়েম’ ব্যবহার করে কিন্তু, ব্রতী ও তার সহযোদ্ধাদের প্রতি তার হিংস্রতা বড়বাবু, রফু বা বসাকের চেয়ে কম নয়। সরোজ পাল, প্রশাসনিক বড়কর্তা যে মুখোশের আড়াল থেকে বলেন, ‘ইয়েস ও [ব্রতী] ক্যানসারাস গ্রোথ অন দ্য বডি অফ ডেমোক্রাসি’, তা আসলে সিদ্ধার্থ রায়, ইন্দিরা গান্ধী ও রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তিগুলির সম্মিলিত বক্তব্যের নির্যাস। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে পুলিশ-গেজেটে প্রকাশিত রিপোর্টগুলিতে এর উল্লেখ করেছেন। একদিকে পুলিশকর্তাদের দ্বারা প্রচারিত সহকর্মীদের প্রতি সতর্কতাবাণী, অন্যদিকে নকশাল দ্রোহীদের হিংসাশ্রয়ী সমাজবিরোধীদের সাথে তুলনা ক’রে যেকোনও মূল্যে খতম করার জন্যে উৎসাহপ্রদান- এই দুইই ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য⁵⁵। পুলিশকে অস্ত্র ব্যবহারের ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ও ভুয়ো সংঘর্ষে পারদর্শী পুলিশ আধিকারিকদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এক গেজেটে সমস্ত থানায় বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, “we are facing an unusual situation and unusual bold steps are required. Meanwhile, let everyone realize that we are from the armed police”⁵⁶ নকশালবাড়ি বিদ্রোহকে কেন্দ্রে রেখে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে রাষ্ট্রের এই মুখ ও মুখোশগুলি আখ্যানের মধ্যে দিয়ে প্রকট হল।

হেফাজতে ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যার পদ্ধতিকে দ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পস্থা সুপ্রাচীন, কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’-তেও বিভিন্ন তরিকায় নির্যাতনের নিদান দেওয়া আছে। নারীদের ক্ষেত্রেও সেই নিদান বলবৎ হবে, যদিও কম অভিঘাতে⁵⁷। স্থান-কাল ব্যতিরেকে বিভিন্ন শাসক তা এগুলি করেছে। ইউরোপে কিংবা আমেরিকায় রাষ্ট্রের নির্দেশে সেনাবাহিনী বা গুপ্তচরসংস্থা

শারীরিক-মানসিক নির্যাতনকে পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছে⁵⁸। অ-পুরুষ দ্রোহীদের ওপরে যৌন নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক শাসক আর স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক শাসকের মধ্যে ফারাক নেই⁵⁹। পুলিশি হেফাজতে ও কারাগারে নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে পুলিশ-মিলিটারি তাদের কর্তৃত্ব ও উচ্চমন্যতা (Superiority) প্রতিষ্ঠা করতে চায় দুর্বল/শাসিতের (‘দুর্বল’ কারণ, সে তখন শাসকের করায়ত্ত) বিরুদ্ধে। জাতীয় নির্যাতনবিরোধী প্রচারসংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রতিক নির্যাতনের খতিয়ান, হেফাজতে অভিযুক্তদের (বিশেষতঃ রাজনৈতিক অভিযুক্ত) ওপরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অত্যাচারের নথিভুক্ত ঘটনা। ২০১৯ সালে ১২৪টি মৃত্যু ঘটে পুলিশ লকআপে এবং জেল ও লকআপ মিলিয়ে মোট ১৬১০জনের মৃত্যু ঘটে, যার অধিকাংশের কারণ নির্যাতন। ২০১৯ সালে ১৩ জন দলিত ও আদিবাসীর মৃত্যু ঘটে পুলিশ হেফাজতে। এছাড়াও, ফেক এনকাউন্টার বা ভুয়ো-সংঘর্ষে হত্যা করা এবং মৃতের লাশ গায়েব ক’রে দেওয়ার পদ্ধতিও রাষ্ট্র বরাবর ব্যবহার করে। বিভিন্ন উপায়ে মানবাধিকারের ন্যূনতম শর্তগুলি লঙ্ঘন ক’রে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে ‘থার্ড ডিগ্রি’ নির্যাতন কিংবা অভিযুক্ত/সন্দেহভাজনকে মনুষ্যেতর হিসেবে দেখাতে চাওয়ার চেষ্টা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সময় থেকে ষাট-সত্তর দশক বা এখনও হয়ে চলেছে⁶⁰। সত্তর দশকের অন্যতম নির্যাতক এবং হেফাজতে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক রুণু গুহনিয়োগী নিজেও বলেছিলেন, “টর্চারার ইমেজ পুলিশজীবনে অনেক সাহায্য করেছে... কোনও হার্ডকোর অপরাধী কখনোই নিজে থেকে মুখ খোলে না। এদের নিশ্চয় ভয় দেখাতে হয়। জয় পেলেই সে গোপন খবর বলবে... একটু আধটু মারধর তো করতেই হবে”⁶¹। রুণু এই সাক্ষাৎকারে এবং অন্যান্য সাক্ষাৎকারে নিপীড়ক ধারণা নিয়ে গর্ববোধ করেছিলেন যে, তাঁর সামনে নকশাল দ্রোহীরা ভয়ে সব সত্যি বলে দিত। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সন্দেহভাজন অপরাধীদের বিরুদ্ধে এমন অত্যাচার করা হত। সত্তর দশক পরবর্তী উপন্যাসগুলি হেফাজতে নির্যাতনের বীভৎসাকে বর্ণনায় নিয়ে এল। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে পুলিশ লকআপে

রণজয়ের অভিজ্ঞতা সেই ইঙ্গিতই দেয়⁶²। রণজয়ের ওপরে হওয়া মানসিক নির্যাতন ও যৌননির্যাতনের বর্ণনায় কার্পণ্য দেখাননি নবাবু। ‘চোখের ওপরে মগজ শুকিয়ে ফুটিফাটা করে দেওয়া চড়া আলো’র সামনে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ও যৌনহেনস্থার পরবর্তী পর্বে রণজয় মানসিক ভারসাম্য হারায়। ‘থার্ড ডিগ্রি’ এক বিশেষ ধাঁচার নির্যাতনপদ্ধতি, যাতে যে কোনও আটক ব্যক্তির ওপরে যথেষ্ট চাপ দেওয়া যায় স্বীকারোক্তি আদায়ে⁶³। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে থানার লকআপে দ্রোণের থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ে তার ওপরে অত্যাচারের বর্ণনা স্মর্যব্য। মণি মুখোপাধ্যায়ের ‘গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার’ গল্পে গোপাল কাহার গণতন্ত্র কী তা জানত না! কিন্তু, গণতন্ত্র বিপন্ন বলে এবং গোপালকে ‘ডেন্জারাস ফর ডেমোক্রাসি’ তকমা দিয়ে যারা গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চায়, সেইসব আইনরক্ষকদের নির্যাতনে ও গালাগালিতে গোপাল গণতন্ত্রের পাঠ পায়⁶⁴। এই গল্পে পুলিশ বনাম মানুষ প্রত্যেক শ্রেণিবোধ মিশে থাকে নির্যাতনের ধরণে, পুলিশের সংলাপে এবং গোপাল কাহারের সরল অজ্ঞতায়। পুলিশের প্রতিটি সংলাপ ক্ষমতাকাঠামোয় তাদের উচ্চস্তরীয় অবস্থানকে চিহ্নিত করে, যে অবস্থানের জন্যে নিরক্ষর ভাগচাষী গোপালকে নির্দিষ্ট শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতে পারে তারা। গোপাল ‘কাহার’ অর্থাৎ নিম্নবর্ণ হিন্দু। তাই তার ওপরে সহজেই পুলিশি অপভাষা প্রয়োগ করতে পারে এবং তাকে লকআপে নির্যাতন করতে পারে। লক্ষ্যণীয় নির্যাতনের প্রতিটি মুহূর্তের বিস্তৃত ও প্রলম্বিত বর্ণনা, যাতে ‘গণতন্ত্র’ শব্দের প্রকৃতার্থ পাঠকও গুলিয়ে ফেলে। জয়া মিত্রের ‘তিমির বিদার’ গল্পে মেদিনীপুর জেলে বন্দী-নির্যাতনের বিবরণ এবং গণহত্যার বীভৎসতার বিবরণ। কোনও তৃতীয় পক্ষের ‘নিরপেক্ষ’ বয়ানে নয়, এই পুলিশি-হিংসা এবং জেলের ভেতরে বন্দীহত্যার বর্ণনা দিচ্ছেন ওই জেলে বন্দী আরেকজন⁶⁵। গল্পকার জয়া মিত্র বাস্তবে মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে নকশালদ্রোহীদের হত্যা করার নৃশংসতা সত্যিই ঘটত। নবাবু ভট্টাচার্য ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতির পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যবলী

সরাসরি উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন^{৬৬}। জয়া তাঁর অভিজ্ঞতাকে আখ্যানবস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন।

শাসকের প্রতিনিধিদের (উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের পুলিশকর্মী) মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা বহাল থাকে, ফলে, মহিলা দ্রোহীদের (এবং দ্রোহের সমর্থক ও সহায়তাকারীদের) প্রতি তাদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়। উপন্যাসের আখ্যানে বিবৃত বিভিন্ন বিবরণের সঙ্গে বাস্তবের যোগ স্পষ্ট হয় আত্রেয়ী সেনের গ্রন্থে,

According to several women political prisoners, a significant expression of de facto jurisdiction within the prison system lay in wardens, constables, and police officials who repeatedly reminded the inmates that '*ekhane amader rajotto*, this place is our kingdom'. The women guerrillas were warned that once they fell into the hands of the prison officials, their class, caste, gender, and political status would not afford them any privilege. '*Ekhane tomader kono bonduk nei*, you don't have your guns here,' a prison guard told a political prisoner, suggesting that a gun was a mere metaphor for multiple status-related freedoms. Women political prisoners were brutally beaten, sexually assaulted, and insulted by both male and female prison guards under the guise of 'interrogation', primarily to procure undisclosed information about the underground guerrilla movement. (Sen 2018 925-6)

দোপ্‌দী মেঝেনকে 'বানিয়ে নিয়ে আসা' কিংবা পাঞ্চালীর ওপরে বড়বাবুর অত্যাচার নিছক কল্পনাখ্যান নয়। মল্লারিকা সিন্‌হা রায় পুলিশ হেফাজতে মহিলা দ্রোহীদের ওপরে হওয়া রাষ্ট্রীয়

নির্যাতনের উদাহরণ পেশ করেছেন।⁶⁷ সেখানেও রাজনৈতিক বন্দীদের সাক্ষাৎকারে ‘টর্চার চেম্বার’-র কথা এসেছে, নির্যাতিতা নারীদের আতঙ্কিত স্মৃতিভারের বর্ণনা তিনি নারীদের ওপরে বৃহত্তর সামাজিক নির্যাতনের অংশ হিসেবেই দেখেছেন, “The necessity to read through such descriptions emerges from feminist engagements with violence in terms of its wider implications in women’s lives.” (Roy 2018, The Wire) একদিকে মহিলা দ্রোহীদের হিংসাপ্রবণ কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি অন্যদিকে দীর্ঘযুগব্যাপী গড়ে তোলা স্নেহশীলা, কোমল নারীর সামাজিক প্রতিচ্ছবি নারীরাও দ্রোহী হতে পারে, সেই ধারণাকে খর্ব করে। দোপ্‌দী মেঝেন, বাসন্তী হাঁসদা, পাঞ্চলী কিংবা ‘কমুনিস’-র মিনু, শান্তার মতো কুশীলব বাংলা উপন্যাসে কজন এসেছে? নারীদের ওপরে পুলিশি নির্যাতনের যে একটি উদাহরণ আছে রাজনৈতিক উপন্যাসে, তার বেশিরভাগে নারীর ভূমিকা ‘পরোক্ষ’, হয় তিনি পুরুষ বিপ্লবীর মা-স্ত্রী-প্রেমিকা নয়তো পুরুষ বিপ্লবীর সাহায্যকারী।

শুধুমাত্র মহিলা দ্রোহীদের ওপরেই নয়, বরং লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে নির্যাতন করা হয়েছে দ্রোহীদের। সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় ও জেলে নির্যাতিত হয়েছেন দ্রোহীরা, নকশাল হওয়ার অপরাধে। এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আলোচ্য যে, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে মহিলা দ্রোহীর কথা কতটুকু বর্ণিত হয়েছে? আর, মহিলা দ্রোহীরা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হয়ে উঠতে পেরেছেন কি? ‘হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪)’ উপন্যাসে সুজাতা প্রোটাগনিস্ট, উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে তাঁর উপস্থিতি এবং আখ্যানের গতি-অভিমুখকে তিনি এগিয়ে গেছেন মৃত দ্রোহী-সন্তান ব্রতীর কর্মকাণ্ডের সূত্রপথ খুঁজতে খুঁজতে। ব্রতীর শহীদ হওয়ার পরে তাঁর লড়াই শুরু হয়েছে নিজের পরিবারের আভিজাত্য, উন্নাসিকতা ও শ্রেণি-অবস্থানের বিরুদ্ধে। ব্রতীর মৃত্যুর পরে তাঁর চেতনাজগতে এসেছে সমুর মা, নন্দিনীদের উপস্থিতি। বস্তুতঃ, উপন্যাসটি একজন নকশালদ্রোহীর মৃত্যুর পরে তার মায়ের চোখ দিয়ে তাকে আবিষ্কারের আখ্যান বলে। “সুজাতা কে? তিনি তো শুধু মা। যাদের হাজার হাজার হৃদয়ে এই প্রশ্ন আজও

কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, তারা কে? তারা শুধু মা!” (৫০) এই আখ্যান সুজাতার আত্মসচেতনতা ও আত্মাবিস্কারও বটে- একজন মা, একজন স্ত্রী, একজন অরাজনৈতিক চাকুরীজীবী থেকে ক্রমে ক্রমে রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা। আর, একইসঙ্গে তাঁর প্রত্যাখ্যানের বয়ানও; স্বামী দিবানাথ, মেয়ে, জামাই টোনি, বেয়াই-বেয়ান সকলকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান খুঁজে পাওয়ার কাহিনি। অরুণা কৃষ্ণমূর্তির বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য-

the mother herself undergoes a transformation in the course of the narrative, from a passive, middle-class housewife to a figure of resistance in the household. Sujata's rejection of her husband's patriarchal authority allows Devi to inscribe gender empowerment within Brati's revolutionary legacy. (Krishnamurthy 2017, 145)

সুজাতার অভিমুখ এক অরাজনৈতিক ও শোষিত মায়ের অবস্থান থেকে বিপ্লবী ছেলের শহীদ হওয়াকে অপ্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্যে উদ্‌যাপনে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসরণকারীরা সময়ের পলি জমতে জমতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু, মহাশ্বেতা সুজাতার শরীর ও মননের ব্যবহারে সেই ভুলে যাওয়া সময়কেই জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন^{৬৪}। ব্রতীর জন্মদিনে পরিবারের সকলেই যখন ব্রতীকে ভুলে গিয়ে আনন্দানুষ্ঠানে মগ্ন, তখনই সুজাতার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে যায়, আশ্চর্য সমাপতন হয় ব্রতীর জন্ম ও মৃত্যুদিনে এবং সুজাতা ব্রতীকে জন্ম দেওয়ার সময়কার প্রসববেদনা অনুভব করেন অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে যাওয়ার আগের মুহূর্তে। কৃষ্ণমূর্তির বিশ্লেষণ দু'টি সম্ভাবনার কথা বলে- ১) সুজাতার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে যাওয়া তাঁর নিজের শুদ্ধিকরণের মুহূর্ত, যেখানে তিনি নিজেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া সমাজের দায় থেকে মুক্ত করছেন; এবং ২) ব্রতীর সশস্ত্র বিপ্লবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সুজাতা পচাগলা সমাজ-পরিবারের উচ্ছ্বাসের উদ্‌যাপনের মুহূর্তটিকে

বানচাল ক’রে দেন। “প্রত্যেকটা সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে গেল। এ কান্নায় রক্তের গন্ধ, প্রতিবাদ, সুখী শোক। তারপর সব অন্ধকার। সুজাতার শরীরটা আছড়ে পড়ল। দিব্যনাথ চোঁচিয়ে উঠলেন, তবে অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে।” (১২০) উপন্যাসের অন্তিমাংশে সুজাতার সঙ্গে তার পরিবারের ও সমাজের উচ্চবর্গের অনপনেয় দূরত্ব আরও বেড়ে যায়, সুজাতার স্বগতকথন (monologue) ব্রতীর মতাদর্শকে ন্যায্যতা দিতে দিতে ব্রতী ও ব্রতীদের সময়কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায় বিপরীত মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যানের জমিতে^{৬৭}। আর, এক্ষেত্রে অবশ্যউল্লেখ্য আরেকটি উপন্যাস, নবাবুণ ভট্টাচার্যের (বাস্তবে তিনি মহাশ্বেতার সন্তান) ‘হারবার্ট (১৯৯২)’। ওই উপন্যাসেও তারিখের আশ্চর্য সমাপতন- হারবার্টের আত্মহত্যার দিন ২৫শে মে ১৯৯২। আর, এই ২৫শে মে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহের সূত্রপাত। হারবার্ট নিজে প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট নকশাল ছিল না, কিন্তু, পার্টির প্রয়োজনে কয়েকবার গোপনে বই-ইস্তাহার দেওয়া-নেওয়ার কাজ করেছিল; বিনুর মতাদর্শগত অবস্থানের প্রতি তার সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। (প্রবীর ঘোষকে সে বিনুর নাম নিয়েই চমকায়)। আর, সেই হারবার্টও নিজের অজান্তেই ‘ডেড হিউম্যান বম্ব’ হয়ে যায়, সুজাতার পরিণতিও কি এক নয়? সুজাতা কাউকে আহত করেনি, তার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফাটার শব্দ হারবার্টের তোষকে লুকানো ডিনামাইট ফাটার শব্দের থেকে অনেক মৃদু; কিন্তু, অভিঘাত কিছু কম নয়। সুজাতার আত্মবিষ্কারের পথে সুজাতা দিব্যনাথ ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে অভিযুক্ত করেন সমাজের বুদ্ধিজীবীদেরও। “পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের জীবন বিপন্ন, এটা নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়? যদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হত, তাহলে কি মিছিল শহর কলকাতার সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তা নিয়ে কলম ধরতেন না?” (দেবী ১৯৭৪, ৫০) নকশালবাড়ির দ্রোহের অনিবার্যতাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ও লেখক-শিল্পীদের ‘হিরণ্ময়’ নীরবতার বিরুদ্ধে সুজাতার চেতনাপ্রবাহ, ওই দ্রোহসময় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কথা ‘হারবার্ট’ উপন্যাসেও আছে। আর, ‘হাজার চুরাশির মা’-র মতো এই উপন্যাসেও সময়ের পলি, বনেদিয়ানার উন্মাসিক বিস্মৃতির উল্লেখ থাকে বিনুর মৃত্যুর পরে, “এই

ঘটনার পরে পচা, বন্ধ, অকিঞ্চিৎকর যে কালপর্ব চলেছে তা এতই ক্লান্তিকর যে এর তুলনা অন্তত ইতিহাসে মেলা ভার। এবং হারবার্ট কলকাতা শহরের যে খণ্ডের বাসিন্দা সেখানে যুগযুগান্তরেও কিছু পাল্টায় কিনা সন্দেহ” (ভট্টাচার্য, ৩৪-৫) দিব্যনাথ, টোনিদের মতো ধন্বনা, জ্যেষ্ঠিমা-জ্যেষ্ঠী সকলেই ষাট-সত্তরের কালপর্ব বিস্মৃত হয়। ব্রতী, বিনুরা চেষ্টা করেছিল ওই কালপর্বকে ‘মুক্তির দশকে’ বদলে দিতে, কিন্তু, তাদের অসফলতা বা প্রচেষ্টা দিব্যনাথ ধন্বনাদের মতো জগদলকে নাড়াতে পারেনি। আর, বিস্মৃতিই জীবনের প্রবহমানতাকে মসৃণ ক’রে তোলে- এই আগুবাণ্য ধারণ করেই জ্যেষ্ঠিমা, সুজাতার মেয়ে এরা সবাই জীবনের ‘স্বাভাবিকতা’য় ফেরে। নাজিম হিকমেত কবেই লিখেছিলেন, ‘বিংশ শতাব্দীতে শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর’⁷⁰ হারবার্ট সকলের ঠিক তেমন বিস্মৃতির অতলে দাঁড়িয়েই পুনর্জাগরণের বিন্দু হিসেবে খুঁজে পায় বিনুকে। বিনুর ‘স্বপ্নাদেশ’ আসলে মৃত্যুমুহুর্তে বিনুর হারবার্টকে বলে যাওয়া লাল ডায়েরির কথা। ওই ‘পচা, বন্ধ, অকিঞ্চিৎকর কালপর্ব’তে ঢেউ তুলতে হারবার্টের ‘ভূত নামানো’র ব্যবসা শুরু হয়েছিল। হারবার্ট সরকারের রাজনৈতিক বোধ ছিল- সে ছোটবেলায় ‘ফল অফ বার্লিন’ দেখেছিল, বিনুর ছোটবেলায় বিনু তাকে কমিউনিস্ট পার্টির ছড়া শিখিয়েছিল এবং বড়বেলায় বিনু তাকে মাও-সেতুং-এর বই পড়িয়েছিল। লেখক নবারুণ বিনুকে শুধুমাত্র সত্তর দশকের সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখতে চাননি, নবারুণ চেয়েছিলেন ষাট-সত্তর পরবর্তী ঘটনাবিহীন স্থিতিবস্থায় বিনু আরও আগের কোনও ইতিহাসবোধ থেকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করুক। ‘সুবর্ণরেখা (১৯৬৫)’ ছবির শেষদৃশ্যে যে বিনু ‘নতুন বাড়ি’ খুঁজতে চায়, সেই বিনুকেই সচেতনভাবে ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে প্রতিস্থাপিত করেন নবারুণ। ব্রতী, বিনু, নিরুপম, দোপ্‌দীদের ইতিহাস রাষ্ট্র যতই স্থিতিবস্থার আবহে ভুলিয়ে দিক, সুজাতা, পাঞ্চগলী কিংবা হারবার্টরা তাদের পুনর্জাগরিত করেন।

এবং আজকেও এই চেষ্টাটা ফুরিয়ে যায়নি। আজকে আমার যে মাওবাদী বন্ধুরা জঙ্গলে

বা জেলে রয়েছেন তারা ঐ নতুন বাড়িটার জন্যই ভাবছেন... আর কিছু না। এবং

প্রত্যেক যুগে, সমস্ত সময়ে বিনুদের এটা অধিকারবিনুরা এটা করবেই !, সেটা ঠিক হোক কি ভুল হোক! (ভট্টাচার্য ২০১৪)⁷¹

সুজাতাকে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে, দ্রোহী সময়ের সঙ্গে সেতুবন্ধন করিয়ে দিয়েছিল মৃত ব্রতী। হারবার্টের সঙ্গে ঐ একই কমিউনিস্ট পার্টির সেতুবন্ধন করিয়েছিল বিনু⁷²। উপন্যাসের পাঠপদ্ধতিতে পাঠক এমন এক মুহূর্ত আবিষ্কার করেন, যা উপন্যাসের গতিপথকে দিশা দেয় এবং পুনর্সংজ্ঞায়িত করে। নির্লিপ্ত সমাজ-বুদ্ধিজীবী-পরিজনদের প্রতি শ্লেষাত্মক স্বগতকথন সেই মুহূর্ত, ব্রতীদের ওপরে হওয়া চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় হিংসার উন্মোচন-বিন্দু। আর, ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে সেই উন্মোচন-বিন্দু আসে বিনুর স্বপ্নাদেশে হারবার্ট যখন বিনুর ডায়েরি খুঁজে পায়। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে ‘মহিলা দ্রোহী’-র উপস্থিতিতে আত্মাবিস্কারের মুহূর্ত পাঞ্চগলী (‘আটটা নটার সূর্য’) খুঁজে পেয়েছিল দ্রোণাচার্য জেলবন্দি হওয়ার পরে এবং দ্রোণাচার্য শহীদ হওয়ার পরে। সুজাতা বা হারবার্টকে যেমন রাষ্ট্রনির্মিত স্থিতিবস্থাকে ভাঙতে হয়েছিল সচেতন চেতনাপ্রবাহের দ্বারা, পাঞ্চগলীকে তেমনই পার্টির ‘ভুল-ঠিক’ এবং পার্টির সহযোদ্ধাদের বিশ্লেষণ করতে হয়। এই উপন্যাসও স্থিতিবস্থার আখ্যান বলে, কিন্তু, সেই স্থিতিবস্থাকে পেরিয়ে পাঞ্চগলী-সুকান্তিরা নন্দীগ্রাম-লালগড় আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে যান। ‘কালবেলা’ উপন্যাসের মূল রাজনৈতিক কুশীলব অনিমেয় এই রাষ্ট্রনির্মিত স্থিতিবস্থা প্রত্যক্ষ ক’রে জেল থেকে বেরনোর পরে। কিন্তু, স্থিতিবস্থা ও নির্লিপ্ত নিরপেক্ষতাকে ভেঙে সুজাতা, হারবার্ট, পাঞ্চগলী, সুকান্তিদের স্বর যে রাজনৈতিক অভিমুখ পায়, অনিমেয় তা পায় না। কোনও পুনর্জাগরণের বিন্দুতে উপনীত হতে পারে না সে। রাজনৈতিক উপন্যাসে শাসকনির্মিত স্থিতিবস্থা, শাসিতের সম্মতি আদায় ক’রে নিয়ে সমস্ত দ্রোহভাবনা ভুলিয়ে রেখে পাঠকচেতনায় নয়া-উপনিবেশ বানিয়ে নেওয়ার উল্লেখ ‘অগ্নিগর্ভ (১৯৩৭)’ উপন্যাসেও আছে। সুজাতা, হারবার্ট যে নির্লিপ্ত স্থিতিবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিল এবং লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চুপ স্বেচ্ছানীরবতা দেখেছিল, তা দেখেছিলেন হাইনৎস লাইপম্যানও- ১৯৩৭ সালে নাজিশাসিত জার্মানিতে,

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু এগারো মাস বন্দীশিবিরে কাটিয়ে জার্মানীর বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তির পর আটদিন মাত্র জীবিত ছিলেন তিনি। তারপর আত্মহত্যা করলেন। তাঁর শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম। তিনি ভাবতে পারেন নি, বাইরের পৃথিবী এত উদাসীন! হিটলারের জার্মানী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে; আর বাইরের পৃথিবী সে-হাতে হাত মেলাচ্ছে। হত্যাকারীর হাতে হাত মেলাচ্ছে শাসকমণ্ডলী। (লাইপম্যান ১৯৪৬, ১৭১)⁷³

উপন্যাসটিতে নাজি-জমানার দমনপীড়ন ও শাসনের মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীদের দ্রোহনিষ্ঠতার বিবরণ রয়েছে। সুজাতার আক্ষেপ, সত্তর দশকে প্রকাশিত নথি-তথ্যাদিতে বুদ্ধিজীবীবর্গের উদাসীনতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি নীরব সমর্পণের বাস্তবতা বোঝা যায়; তেমনই এই উপন্যাসেও লাইপম্যান তৎকালীন জার্মানির বুদ্ধিজীবীমহল, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান আখ্যায়িত করেছেন। লাইপম্যানের উল্লিখিত ওই ‘শ্রদ্ধেয় বন্ধু’-র মতো উপলব্ধি ‘আটটা-নটার সূর্য’-র সুকান্তি, ‘হাজার চুরাশির মা’-এর সুজাতাদের।

‘সত্তর দশকের আগের রাজনৈতিক উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের এই বর্ণনা অনুপস্থিত ছিল। তার কারণ সম্ভবতঃ দু’টি- ১) সাহিত্যের নান্দনিকতায় বাধা সৃষ্টি করে এহেন বর্ণনা; রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের প্রবল ‘হিংসা (ভায়োলেন্স)’ পাঠের নান্দনিক মুহূর্ততে আঘাত করে এবং ২) ষাট-সত্তর দশকে দ্রোহী তরুণ-তরুণীদের ওপরে পুলিশি নির্যাতনের মাত্রা এবং ‘ভূয়ো সংঘর্ষ’ সাজিয়ে হত্যার ঘটনা পূর্ববর্তী দশকগুলিতে পুলিশি নির্যাতনকে ছাপিয়ে গেছিল; উপনিবেশিত দেশের থেকেও তথাকথিত ‘স্বাধীন’ ও গণতান্ত্রিক দেশে দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের (রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস) নির্যাতন বহু সাহিত্যিককে ঘোষিতভাবে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। তাঁদের কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের বর্ণনা আবরণহীন হয়ে উঠেছিল। নবারুণ, মহাশ্বেতা, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়রা বাস্তব তথ্যসংকলন, প্রত্যক্ষ্য জবানবন্দিকে সরাসরি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ক’রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

রাজনৈতিক মতাদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক উপন্যাসটি পড়ে পাঠকের চেতনায় রাষ্ট্রের প্রতি বিবমিষা ও ক্রোধ তৈরি হয়। নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসের যে ক'টিতে রাজনৈতিক হত্যার বর্ণনা বা উল্লেখ আছে, তার বেশিরভাগেই নকশালদের দায়ী করা হয়েছে। ১- নকশালরা ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাসী ছিল ২- নকশালরা রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে নয়, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকেই খুন করত। ২- নকশালরা 'নিরীহ' পুলিশকে খুন করত। ৩- 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এই ছিল তাদের একমাত্র বিশ্বাসবাক্য। পরবর্তীতে, এমনকি, এখনও অবধি নকশালবাড়ি নিয়ে যতগুলি চলচ্চিত্র হয়েছে, তার বেশিরভাগেই 'নকশাল রাজনীতি' নিয়ে এমন বক্তব্য পেশ হয়েছে। সিপিআই (এমএল) পার্টির 'অ্যাকশন স্কোয়াড' রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় শ্রেণিশত্রুদের সঙ্গে শ্রেণিশত্রুদের স্বার্থরক্ষাকারী পুলিশদের খতম করেছিল, একথা সত্যি। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে স্বদেশী আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীরা যেমন পুলিশবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ করতেন, নকশাল বিপ্লবীরা তেমন হত্যার নীল-নকশা ছকা শীর্ষ পুলিশদের ওপরে আক্রমণ করতে পারেনি। কিন্তু গরীব মেহনতি মানুষের ওপরে সরাসরি দমনপীড়ন চালায় 'খুদে সিপাই'রা এবং তারাই উৎপীড়নকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।⁷⁴ “জনসাধারণের প্রতিবাদকে ভাষা দিতে গেলে এই অত্যাচারীদের- তারা যত সামান্যই হোক- গায়ে আঘাত লাগবেই” (১৩) বলে সশস্ত্র প্রতিরোধকে ন্যায্যতা দিচ্ছেন সুমন্ত। কিন্তু, অধিকাংশ সাহিত্যিকের মধ্যে এই রাজনৈতিক বোধের অভাব ছিল সচেতন অজ্ঞানতাবশতঃ। সিতাংশুশেখর চক্রবর্তীর 'সত্তরের চালচিত্র' উপন্যাসে টাইগারের নেতৃত্বে হত্যা, লুণ্ঠ, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ ও রাজনীতিহীন 'অ্যাকশন' প্রধান হয়ে ওঠে⁷⁵। রাজনীতির থেকে অরাজনৈতিক ঘৃণার বক্তব্যই পেশ করা হয়, বাস্তবতার তথা সংবাদপত্রের যে নিদর্শনগুলি রাখা হয়, তাতেও উপরোক্ত একপেশে বয়ানগুলিকেই মান্যতা দেয়। কিন্তু, উপন্যাসে বা চলচ্চিত্রে এই বক্তব্য পেশ হলে এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে আখ্যান নির্মাণ হলে, তার নির্দিষ্ট রাজনীতি থাকে। উপরোক্ত সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে বিপরীত নির্মাণকৌশলে রাষ্ট্রের হিংসা

ও নির্যাতনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিহিংসার দিকে সচেতন আঙুল তোলা হয়েছে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ষাট-সত্তর দশকের দ্রোহের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ কী ছিল, তা আলোচনা করেছেন এক প্রবন্ধে⁷⁶। সশস্ত্র কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের সুযোগ নিয়ে পুলিশ-সেনা ও রাষ্ট্র যৌথভাবে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল যাতে হিংসা ও নির্যাতনকে প্রশাসনিক সম্মতি দেওয়া হয়।

Besides draconian laws, the unchained police force was adequately encouraged to liquidate Naxalites through "encounters". The sole motive was to kill the enemy by any means. The legal procedures were given a go by. On getting the green signal from the top, a section of the police force happily turned Calcutta and its suburbs into their hunting ground. (Mukhopadhyay 2006, 3230)

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের হিংসামূলক আচরণের বাস্তববাদী উপস্থাপনা রাজনৈতিক আখ্যানে প্রয়োজনীয়। উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের রাজনৈতিক উপন্যাসে বহুস্তরীয় রাজনৈতিক হিংসার বিবরণ রয়েছে। তাঁরা ‘বন্দুকের নল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস’ এই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বাক্যকে নকশালদের মতাদর্শগত বিশ্বাসবাক্য (এবং, একমাত্র বিশ্বাসবাক্য নয়) বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে, পাঠকের পাঠচেতনায় শাসক ও শাসকনিয়ন্ত্রিত শিল্পক্ষেত্র দ্বারা নির্মিত ‘নকশালরা বিপথগামী ও হিংসাত্মক’ এই প্রতর্কের বিরোধী-প্রতর্ক আলোচনাস্তরে উঠে আসে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘কমুনিস’ ও আত্মকথনমূলক ‘জার্নাল সত্তর’-এর ভাষা ও আখ্যানকৌশলে এই পদ্ধতি আরও জোরদার; প্রতিমুহূর্তে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, ভদ্রলোকীয় চেতনা ও শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অবমানবতার সংঘাত চলে। এই সংঘাত তো ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসেও। “ব্রতীর শরীরে তেইশটা আঘাত ছিল, বিজিতের শরীরে ষোলটা। লালটুর নাড়ির পাক খুলে লালটুকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে কোন পৈশাচিকতা নেই”

(৫০) সুজাতার চেতনাপ্রবাহ চলতে থাকে। এই অংশেই সুজাতা দায়ী করে বুদ্ধিজীবীদের নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ অবস্থানকে। লেখক-বুদ্ধিজীবীরা পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রাম নিয়ে কথা বলছে, পশ্চিম পাকিস্তানের পৈশাচিকতা নিয়ে কথা বলছে অথচ কলকাতার রক্তস্রাব তরুণ-তরুণীরা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে- সুজাতার এই শ্লেষমিশ্রিত আক্ষেপ ‘নিরপেক্ষ অবস্থান’-র প্রতি প্রশ্ন তুলতে থাকে। ‘জেল থেকে মাকে’ সংকলনে জনৈক শহীদের মার চিঠি প্রকাশিত হয়, সুজাতার আক্ষেপ অভিযোগ শ্লেষের প্রতিটি বিন্দু তাতে মিলে যায়। শিক্ষকসমাজের প্রতি, বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক-শিল্পীদের প্রতি এবং প্রশাসকদের প্রতি নিরপেক্ষ নীরবতার বিরুদ্ধে শাণিত প্রশ্ন ছুঁড়ে তিনি লেখেন, “আমাদের প্রত্যেকের হাতেই আজ রক্তের দাগ।”⁷⁷ এই প্রশ্নগুলি অন্ততঃ অসঙ্গত নয়, বস্তুতঃ পরের দশকগুলিতেও এই প্রশ্নগুলিকে কার্যত এড়িয়ে গেছে অধিকাংশ প্রথিতযশা সাহিত্যিক। দিব্যেন্দু পালিতের ‘সহযোদ্ধা’ উপন্যাসে স্বয়ং একজন বুদ্ধিজীবী কুশীলব উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট; এই বুদ্ধিজীবী লেখক আদিত্য তার শ্রেণি-অবস্থানগত দ্বন্দ্ব ভোগে, রাষ্ট্রের চাপ ও প্রত্যক্ষ সত্যদর্শনের দোলাচলে ভোগে। আদিত্যর পারিবারিক দায়িত্ববোধ, নাগরিক কর্তব্যপালন ও ব্যক্তিগত জটিলতা তাকে বিদীর্ণ করে। একইসঙ্গে, নিরপেক্ষতার বয়ানও উদ্ভাসিত হতে থাকে; পুলিশি সন্ত্রাসের উল্লেখ করেও বিপ্লবীদের হঠকারী বিপথগামী বলে বর্ণনা করা হয়। আদিত্যর দুর্বলতা তাকে সৎ, অরাজনৈতিক, অসহায়, ভদ্রলোক প্রোটাগনিস্ট ক’রে তোলে। যে কোনও সামাজিক আলোড়নের সময় বুদ্ধিজীবীরা, সমাজের ওপরতলার নিশ্চয়তাসম্পন্ন উচ্চবর্ণের লোকেরা ‘শান্তি’ এবং ‘নিরপেক্ষতা’-র পক্ষে সওয়াল করে। সাধারণত রাষ্ট্রের মতাদর্শকেই প্রামাণ্য ধরে নিয়ে তাঁরা চর্চা করেন; সুজাতা যে অভিযোগ তাঁর চেতনাপ্রবাহে ব্যক্ত করছেন, তার ভিত্তিও রাষ্ট্রের বয়ান। কাশীপুর-বরানগর গণহত্যায় নকশাল নিধনযজ্ঞের পরে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা শান্তির প্রসঙ্গ তুললে, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলে, “আগে দেখতে হবে যারা মারা গেছে তারা শান্তিপ্রিয় ছিল কিনা।”⁷⁸ এর উদাহরণ পাওয়া যায় ‘সত্তরের চালচিত্র’ উপন্যাসে টাইগার নামক কুশীলবের ক্রিয়া বর্ণনায়। স্থানীয় বেকার, হতাশ, মধ্য-নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সমাজ-

বিরোধীদের নিয়ে যে ‘নকশাল দল’ তৈরি করে সে, যাদের “হত্যা প্রতিহতায় এলাকাটা যেন বিষবাস্পে কালো হয়ে উঠল। অবিশ্বাস আর দ্রুততার জীবাণু বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল” (চক্রবর্তী ৫০)। সিদ্ধার্থশঙ্করের কথাকে মান্যতা দিতেই হয়তো এরা রাতে তার চুরি করে, গৃহস্থের বাড়িতে হানা দেয়। গবেষক অরুণকুমার দাস আখ্যানের তারচুরির সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখেছেন চৌঠা জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ‘গণশক্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত নকশালদের তারচুরির খবরের সঙ্গে^{৭৯}। এতে নকশালদের সম্ভ্রাস ও সমাজবিরোধী অরাজনৈতিক অপকর্মের ‘প্রমাণ’ হাজির করা যায় বটে, কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, এতে রাষ্ট্রীয় বয়ানই সিদ্ধ হয়। ‘গণশক্তি’ সিপিআই(এম) পার্টির মুখপত্র, নকশালদের সমাজবিরোধী সম্ভ্রাসবাদী প্রমাণ করতেই তারা খবর করবে এটা স্বাভাবিক। নকশালদের ‘খতম’ অভিযানকে বড় ক’রে দেখিয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আত্মরক্ষার বয়ানকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যের বিক্রি ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছেন। কিন্তু, তাতে আখ্যানে উল্লিখিত বাস্তবের রাজনীতির বিবরণে মিথ্যে থেকে গেছে অনেকটাই। উপরোক্ত যে তিনটি পয়েন্টের কথা বললাম, অর্থাৎ যে তিনটি পয়েন্টের ভিত্তিতে নকশালদের ‘খুনে’ ও ‘রক্তলোলুপ’ বলে দেখানোর চেষ্টা করে রাষ্ট্রীয় বয়ান ও অধিকাংশ ঔপন্যাসিক, সেই তিনটি পয়েন্ট দিয়ে নকশালবাড়ির কৃষিবিপ্লবের রাজনীতি বোঝা যায় না। আখ্যানকাররা যে ‘খতম’ ও ‘বন্দুকবাজি’কে প্রধান ক’রে তুলতে চান, ১৯৭০ সালে পার্টির ইস্তেহারে সেই বন্দুকবাজির প্রবণতার বিরুদ্ধেই লেখা হয়েছিল- “কিন্তু এর [বন্দুক/পিস্তল] ওপরে কখনো গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটা জনগণের বদলে অস্ত্রের ওপরে এক বিপজ্জনক আস্থা রাখতে উৎসাহ যোগাতে পারে”^{৮০} ওই ইস্তেহারে গেরিলা আক্রমণে শ্রেণিশত্রু খতমের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে সেটাকে যুদ্ধের রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম করেই দেখা হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রেণিশত্রু খতমের কাজ নয় বরং তার পরে স্থানীয় জনগণের মধ্যে যুদ্ধনীতি ও রাজনৈতিক শিক্ষার আলোচনা করার নির্দেশও দেওয়া আছে। অথচ, নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা অধিকাংশ সাহিত্যে ওই ‘রাজনৈতিক’ শিক্ষা

ও শ্রেণিচেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেণিসংগ্রামের বোধটিকে বাদ দেওয়া হয়। নিছক ব্যক্তিহত্যা বিশ্বাসী, রক্তলোলুপ ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বলে নকশালবাড়ি রাজনীতির দ্রোহীদের উপস্থাপনা করা হয়। সিপিআই (এমএল) রাজ্যকমিটি থেকে প্রকাশিত ‘পুলিশের প্রতি’ বার্তায় পুলিশকে রাষ্ট্রযন্ত্রের দাস না হওয়ার জন্যে এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে আবেদন রাখা হয়। অনেক পুলিশ মেহনতি শ্রেণি থেকে পেটের দায়ে পুলিশের চাকরি করতে এসেছেন এবং অত্যাচারী প্রশাসনিকরা তাঁদের ঢাল বানিয়ে দ্রোহী শ্রমিক-কৃষকদের হত্যা করছে, এমন বার্তাও দেওয়া হয় ওই প্রচারপত্রে।^{৪১} বিমল মিত্রের ‘রাগভৈরব (১৯৭১)’ উপন্যাসে অরাজনৈতিক আদর্শবাদী ভৈরব চক্রবর্তীকে খুন করা হয় কারণ স্থানীয় থানার ও.সির হত্যাকারীদের নাম পুলিশের কাছে বলে দিয়েছিলেন তিনি। অথচ, তাঁর মেয়ে প্রভা নকশাল যুবকদের সমর্থন করে এবং পিতার হত্যাকারী জেনেও তাদের ক্ষমা ক’রে দেয়। একদিকে নিরীহ অরাজনৈতিক মধ্যবিত্তদের খুন করা এবং অন্যদিকে সেই ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের কাছেই নিরাপত্তা পাওয়া- এইটাই যেন নকশালবাড়ি রাজনীতির একমাত্র পরিচয়জ্ঞাপক। নির্মল ঘোষের বিশ্লেষণে, “বিমল মিত্রের মতে, নকশালবাদীদের এই হত্যা ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ হোল ক্ষমা ও প্রেম” (ঘোষ ২০১৬, ২২৪) সমরেশ বসুর ‘সিদ্ধান্ত (১৯৭৮)’ গল্পের প্রটাগনিস্ট কুণাল তার প্রেমিকার বাবা তথা সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিককে হত্যা করে এবং ‘শ্রেণিশত্রু’ বলে দেগে দিয়ে নিজের বাবাকে হত্যা করার পরিকল্পনায় অংশ নেয়। সৎ আদর্শবাদী পূর্বপ্রজন্মকে খুন করাতেই যেন নকশালবাড়ির রাজনীতি- এমনটাই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা এই গল্পে। আর, রাজনীতিহীন আবর্তে নকশালদের বর্ণনা করার পৌনঃপৌনিক আখ্যান বাঙলা সাহিত্যে নিরাজনৈতিকরণ আমদানির ভিত্তি হয়ে ওঠে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের হিংস্র বয়ান এবং কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে শুরু হওয়া ‘উড বি ফট টু দি ফিনিশ্’-র হিংসাত্মক লাইন ন্যায্যতা পেয়ে যায় তাতে। কোনও শাসকের আদেশকে ন্যায্যতা দেওয়া নিশ্চয়ই সাহিত্যের কাজ হতে পারেনা, কিন্তু সেটাই যখন দশকের পর দশক ধরে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে, তখন সাহিত্যের রাজনীতি প্রকাশ্য হয় আরও।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে হিংসা ও বীভৎসতা

উপন্যাস পাঠকের কাছে যখন পৌঁছচ্ছে তখন পাঠক তাকে ‘উপন্যাস’ হিসেবে অর্থাৎ কল্পনাভিত্তিক আখ্যান হিসেবেই পড়ছেন। রাজনৈতিক উপন্যাসিকেরা ওই ‘ভায়োলেন্স’ বা হিংসাকে কল্পনাখ্যানে স্থান দিয়ে পাঠককে বিশ্বাস করাতে চাইছেন তার বাস্তবতাকে। কিন্তু, কেন? সত্তর দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে হিংসার শিল্পসত্তা বা হিংসার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উপন্যাসিকরা ও পাঠকবর্গ এত সচেতন কেন? তার কারণ কি এটাই যে, উপন্যাস কল্পনাভিত্তিক আখ্যান মেনে নিয়েও, সত্তর দশকের বীভৎসতার অ্যাকাউন্ট রাখতে চাইছেন তাঁরা? মহাকাব্যেও কিন্তু হিংসা বা ভায়োলেন্সের বীভৎসতা প্রকট। বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎকে বধের পরে বানরসেনা ও দেবকুলের উল্লাস লক্ষ্যণীয়⁸²। প্রতিটি মহাকাব্যে প্রতিটি হত্যার মুহূর্তে বীভৎস রসের প্রয়োগ এবং হত্যার পরে হস্তারক দলের উল্লাসের বর্ণনা সাবলীল ভাবেই এসেছে। ‘মহাভারতে’ দ্রোণাচার্য বধের মুহূর্ত, ঘটোৎকচ বধের মুহূর্ত কিংবা অভিমন্যু বধের যাবতীয় আয়োজনে যে বীভৎসা, তা মহাকাব্যের সাহিত্যগুণে অঙ্গঙ্গী। ‘দ্রোণপর্বে’ পঞ্চাশতীতিবর্ষ বয়সের দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার বীভৎসতা স্মরণীয়- ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রত্যাগী দ্রোণের গলা কেটে সারা গায়ে রক্ত মেখে উল্লাস করছে এবং দ্রোণের ছিন্ন মাথা কৌরবসেনার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।⁸³ অভিমন্যুকে ছয় মহারথী ঘিরে ধরে একের পর এক তার অস্ত্রসমূহ নষ্ট করে দিচ্ছে এবং উপর্যুপরি আঘাত করছে এবং অভিমন্যু ‘রুধিরসংপ্লুত’ হয়ে শেষ যুদ্ধ লড়ছে- এই দৃশ্যের বীভৎসতার মধ্যে অসংখ্য মৃত্যু ও যুদ্ধদৃশ্য ঢুকে পড়ছে যা মহাকাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।⁸⁴ সৌপ্তিকপর্বে অশ্বখামার তপস্যায় খুশি হয়ে ভগবান রুদ্র অশ্বখামাকে দিব্য-খড়া উপহার দেন এবং নিজে তার শরীরে প্রবেশ করেন। ফলস্বরূপ অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, শিখণ্ডীকে এবং দ্রৌপদীর পাঁচজন ঘুমন্ত সন্তানকে বধ করে। হিংসা ও রক্তপাতের চরম নিদর্শন বর্ণিত হয় এই হত্যাকাণ্ডে যেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নকে খালি হাতে পিটিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নৃশংসভাবে বধ করে এবং পাণ্ডবপুত্রদের

কাউকে হাত বা পেট বা উরু কেটে বা কাউকে মাথা কেটে হত্যা করে।⁸⁵ ‘মহাভারত’ একটি কাল্পনিক রাজনৈতিক আখ্যান, যা একই রাজবংশের দু’টি শাখার ক্ষমতাদখলের রাজনীতিকে আখ্যানবদ্ধ করেছে। নির্দিষ্ট কালস্থানে যুদ্ধ-হিংসা-রক্তপাত সবকিছুই ছিল, মহাকাব্য রচয়িতা সেগুলোকে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করছেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বা আগামী সময়ের পাঠক সাহিত্যক্ষেত্রের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে অতীতের বাস্তবতার হদিশ পায়। উত্তর-সত্য জমানায় শাসক-মতাদর্শ যখন পূর্বকৃত শাসন-শোষণের পদ্ধতি অস্বীকার করছে, তখন এই পদ্ধতিই কি বেছে নিচ্ছেন রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখকেরা? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে উনিশ শতক থেকে সত্তর দশকের আগে অবধি এই বীভৎসা, হিংসা ও রক্তপাত প্রচ্ছন্ন। সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আখ্যানে যুদ্ধ-রক্তপাত-দ্রোহ-দমন সবই ছিল, কিন্তু তা অনেক পরিশীলিত, মাপা এবং কোমল বর্ণনার। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে দাঙ্গা-মুহূর্ত আছে, কিন্তু সরাসরি রক্তপাতের উল্লেখ নেই। মাস্টারমশাইয়ের কাছে নিখিলেশ খবর পায় যে, দাঙ্গা লেগেছে; সন্দীপের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের পথ তৈরি হয়ে আগুন লেগে যায় কিন্তু তার বীভৎসা বর্ণনা নেই। এমনকি মধুসূদন দত্ত যখন ‘রামায়ণ’-র বিনির্মাণ ঘটিয়ে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ লিখছেন, তাতে বীভৎস রসের প্রয়োগ সীমিত থাকছে। বীর রস, রৌদ্র রস, করুণ রসের প্রাধান্যের মধ্যে শৃঙ্গার বা বাৎসল্য বা অদ্ভুত রস কিছু কিছু বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু, কোনও হত্যাদৃশ্যই বীভৎসতাকে প্রশ্ন দেয় না; মূল ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু রক্তপাত এবং হত্যাপরবর্তী উচ্চকিত উল্লাস এখানে অনুপস্থিত। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসেও ‘অ্যাকশন’ দৃশ্যবর্ণনা এবং রক্তপাত-হিংসা প্রায় নেই। সব্যসাচী সশস্ত্র বিপ্লবের হোতা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহিংস পথে আন্দোলনে বিশ্বাসী, কিন্তু সহিংসতার বর্ণনা উপন্যাসে অনুপস্থিত। ভারতীর নিষ্ঠা ও সেবা, সুমিত্রার কাঠিন্য এবং অপূর্ব-ভারতীর প্রেম রাজনৈতিক আখ্যানকে দ্রবীভূত ক’রে রেখেছে। “সব্যসাচী, সুমিত্রা, ব্রজেন, তলোয়ারকর প্রভৃতি চরিত্র ও বৈপ্লবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ একদিন আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু অপূর্ব, ভারতী, শশী, নবতারা প্রভৃতি নর-

নারী তাহাদের অন্তর-রহস্যের চিরন্তনতায় প্রেমের অক্ষয় জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া পাঠকের মনে স্মরণীয়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭, ২৭৪) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে বীভৎসতার সার্বিক রূপকল্প রয়েছে দুর্ভিক্ষের চিত্রে। মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে বাংলার মানুষ, তারা রোগের শিকার হচ্ছে এবং বাধ্যতঃ লুণ্ঠরাজ দস্যুবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে- এমন এক সার্বিক বীভৎস আবহ উপন্যাসের শুরুতেই রচনা করেন বঙ্কিম। “অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মতো” দস্যুদল কল্যাণীকে অপহরণ করতে এলে আতঙ্কের পাশাপাশি পাঠকের মনে করুণার সঞ্চার হয়।^{৪৬} তৃতীয় পরিচ্ছেদে এমনই বীভৎস রসের সঞ্চার হয় যখন দস্যুরা নিজেদের দলপতিকে মেরে নরমাংস খাওয়ার বাসনায় উল্লাস করতে থাকে। মহেন্দ্র ও ভবানন্দ ব্রিটিশ অধ্যক্ষ ও দেশি সিপাইয়ের ‘মাথা ভাঙিয়া’ দিলে ও ‘মস্তকচ্ছেদন করিলে’ রক্তপাত ও বীভৎসার ঝলক পাওয়া যায়। “নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুদের হিন্দুয়ানি থাকে?” (২৫) এবং ইংরেজ ও মুসলমানের শৌর্য-বীর্য-মানবিকতার তুলমূল্য বিচারের রাজনীতিতে আখ্যানের সুর বাঁধা হয় বলেই শাসকের বীভৎসতা ও দ্রোহী সন্তানদের সহিংসতার নমুনা আর খুব বেশি থাকে না। যবনের ও ইংরেজদের মাথা কাটার ইচ্ছেপ্রকাশ ও মাথা কাটার উল্লেখ ছাড়া রক্তপাতের বর্ণনা নেই। হিন্দু সন্তানদল বনাম যবনসৈন্য বনাম ইংরেজসৈন্য এই ত্রিমুখী যুদ্ধের বর্ণনার সময়গুলিতে হিংসা ও রক্তপাতের উল্লেখ রয়েছে;^{৪৭} যা মহাকাব্যের অনুসারী; কিন্তু মহাকাব্যের বিশদ বর্ণনা অনুপস্থিত। ওই বিস্তারিত ও ব্যাপক আকারের যুদ্ধ-রক্তপাত-হিংসা অনুপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের দায়বদ্ধতা ছিল জ্ঞান-ভক্তি, ধর্ম-কর্ম, বিসর্জন-প্রতিষ্ঠাকে মেলানোর, তবুও আখ্যানের বাস্তবতায় হিংসা-অমানবিকতার বর্ণনায় পরবর্তী জমানার রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকদের থেকে বেশি নিষ্ঠ ছিলেন তিনি।

নকশাল আন্দোলনকে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে সাহিত্য-পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে হিংসা (ভায়োলেন্স) ছিল একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। সত্তর-পরবর্তী অনেক

রাজনৈতিক উপন্যাসের আখ্যানকাঠামোর নিরিখে বৃহত্তর মধ্যবিভ শ্রেণির (যার একটা বড় অংশ বাংলা সাহিত্যের পাঠক) সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির নৈতিক ও আকাজ্জাগত দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। এই দূরত্ব তৈরি করতে উপন্যাসে এমনভাবে প্লট ও কুশীলবদের সাজানো হয়েছে, যাতে রাজনীতি ও হিংসা সমর্থক হয়ে যায় এবং দ্রোহের সঙ্গে বৌদ্ধিকচর্চার দূরত্ব রচনা করা যায়^{৪৪}। নকশাল দ্রোহীরা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা-ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা বিদ্যাসাগর সহ নবজাগরণের মনীষীদের মূর্তি ভেঙ্গেছিল এবং ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা’-র রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করতে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষর-নিম্নবর্ণের সঙ্গে জোট বেঁধে জোতদার-পুলিশ খতমের রাজনীতিতে মেতেছিল। এগুলোকেই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী দশকগুলিতে পাঠকের সামনে হাজির করা হল। আখ্যানে খতমের বর্ণনা সুখপাঠ্য নিশ্চয়ই না, কিন্তু এই বয়ানগুলি থেকে মুছে দেওয়া হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কার্য-কারণে তার রাজনৈতিক অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠা না করে তাৎক্ষণিক নির্মমতা, ব্যক্তিঘৃণা, ভয়ঙ্করতার অতিশায়িত বর্ণনা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হল।^{৪৫} নির্মল ঘোষ একে বলছেন ‘বিপজ্জনক রক্ষণশীল রাজনীতি’, যেখানে সাহিত্যিকরা নির্বিকৃত-নিম্নবর্ণের বাস্তবতাকে গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চশ্রেণির প্রতি মানবিক করুণা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। (ঘোষ ২০১৬, ১২৫) রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের বয়ান যদি অর্ধসত্য হয়, তা’লে তা পাঠককে ভ্রান্তসত্যের নির্দেশ দেয়। আর, এই বয়ানই পুনরুৎপাদিত হয়ে চলে। ‘নকশালরা মূর্তি ভাঙে’- এই বয়ান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রায় প্রত্যেকের উপন্যাসেই আছে এবং রাষ্ট্রও এই বয়ানকে শিক্ষিত-মধ্যবিভ পাঠকমননে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে শিল্পে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে। মধ্যবিভের সঙ্গে দ্রোহীদের দূরত্ব রচার প্রয়াস খেয়াল করা যায় ‘সত্তরের চালচিত্র’ উপন্যাসেও। শিক্ষিত, সদ্বংশজাত, মধ্যবিভ অশনি নকশাল হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিভাঙ্গা নিয়ে প্রশ্ন করে অসদ্বংশজাত, লুম্পেন, স্বল্পশিক্ষিত টাইগার ও ঝাটে-পল্টু-গজেনদের। ‘গৌরবোজ্জ্বল অতীত’, নবজাগরণ ও আবেগ অশনি ও টাইগারের মধ্যে এসে পড়ে, ফলে গান্ধীমূর্তি ভাঙার ‘প্রতিটি আঘাত যেন অশনির বুকে এসে লাগে’^{৪৬}। মূর্তি-ভাঙার রাজনীতি এই

পুরো অংশতেই অনুপস্থিত, বরং শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকের দ্বারা গৃহীত একপেশে ধারণারই চর্চিতচর্চণ। সুদর্শন সেনশর্মার ‘দক্ষ দিনের কিছু স্মৃতি’⁹¹ গল্পে নিত্যযাত্রীদের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর মূর্তির ‘মাথা নামিয়ে দেওয়া’-র আলোচনায় সেই রাজনীতিহীন ভদ্রলোকি আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রচলিত বিতর্কহীন বিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে সময়, স্থান ও কুশীলবেদের উপস্থাপনায় “মূর্তি ভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দুই মূর্তির লড়াই, দুই রাজনীতির লড়াই, দুই লাইনের লড়াই, দুই শ্রেণীর লড়াই”⁹², এই রাজনীতিকে ছেঁটে দেওয়া হয়। ‘বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস’ বাক্যবন্ধ থেকে সচেতনভাবে ‘রাজনৈতিক’ শব্দটি বাদ দেওয়ার মতোই। মল্লারিকা সিন্হা রায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের ‘ভদ্রলোক’ উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলির সমালোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

Their cultural critique, especially the one directed towards dismantling the aura of Bengal Renaissance, contained a particular mode of existentialising their ideology. Decapitation of statues, burning or smearing of portraits in black, setting fire on buildings marked movement of iconoclasm. The intensity of disavowing a particular cultural heritage was reflected in their ferocity against these symbols and earned the Naxalites wrath of the urban middle-class. (Simha Roy 2016, 9)

সরোজ দত্তের মতো তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট এই ‘ব্যক্তিপূজাবিরোধিতা’কে ন্যায্যতা দিতে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণার কথা বলেন। এই পরিসর থেকেই যে প্রতর্ক উঠে আসে, তা হচ্ছে, উনিশ শতকের নবজাগৃতি আদৌ কতটা সমাজের সমস্ত স্তরের জন্যে উদ্দিষ্ট ছিল এবং কৃষকবিদ্রোহ সাঁওতালবিদ্রোহের প্রতি নবজাগৃতিকারদের দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ প্রগতিশীল ছিল কি না। মল্লারিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিদ্যাসাগর-রামমোহনের মতো ব্যক্তির যাঁরা

নারীমুক্তির আন্দোলন করেছেন, নারীর প্রতি রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে চেয়েছেন, তাঁদের মূর্তির প্রতি নকশালদের ক্ষোভ কেন? তাহলে কি নকশাল আন্দোলনের ‘পৌরুষপ্রধান’ বয়ানই এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় এবং নারীসমস্যার প্রতি কমিউনিস্টদের উদাসীনতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিরোধী মনোভাবের মিশেল এতে ধরা পড়ে?⁹³ মল্লারিকার অভিযোগ অমূলক নয়, কিন্তু, তিনি সম্ভবতঃ ‘মূর্তি ভাঙা’ প্রসঙ্গে শশাঙ্কের (সরোজ দত্ত) লেখাটি খুঁটিয়ে পড়েননি! “জনতার মধ্য থেকে দাবি উঠেছিল পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির সংযোগস্থলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দন্ডের প্রতীক আউটরামের খোলা তরোয়াল হাতে অশ্বারূঢ় মূর্তি সরিয়ে সেখানে মহাবিদ্রোহের নায়িকা শহীদ ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের খোলা তরোয়াল হাতে অশ্বারূঢ় মূর্তি স্থাপন করা হোক।”⁹⁴ শুধুমাত্র পুরুষকেন্দ্রিক বয়ান থাকলে লক্ষ্মীবাইয়ের মূর্তি স্থাপনার কথা বলতেন না। গান্ধীমূর্তি ভেঙে লক্ষ্মীবাইয়ের মূর্তি স্থাপন করতে উদ্দেশ্য দু’টি- সিপাহী বিদ্রোহকে ‘জাতীয় বিদ্রোহ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপের বদলে বিদ্রোহী নারীর সংগ্রামকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা। নকশাল দ্রোহীরা বিদ্যাসাগরের ‘মূর্তি’ নয়, বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ‘ফেটিশ’ ভাঙতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় ও সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের অবদান তাঁরা অস্বীকার করেননি, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁর ব্রিটিশসহায়ক ভূমিকার সমালোচনা করেছিলেন। গান্ধী মূর্তি ভাঙতে চেয়ে মঙ্গল পাণ্ডের মূর্তি বসাতে চেয়েছেন, যে মঙ্গল পাণ্ডে ধর্মীয় বিদ্বেষকে উপেক্ষা করা এক ব্রিটিশবিরোধী শহীদ। ‘আইকন’ উঠে আসুক নিম্নবর্গ থেকে, সভ্যতার ধারক-বাহক যে মেহনতি মানুষ, তাঁদের মধ্যে থেকে, এটাই তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল,

নারায়ণ সান্যালের বিবরণীতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার এক অজানা কথা উঠে আসে। “কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর-মশায়ের মর্মরমূর্তির যেদিন মুণ্ডচ্ছেদ হয় তার মাসখানেকের মধ্যে সিপিআই (এম. এল) দলের এক নেতৃত্বস্থানীয় ছাত্রনেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! ঘটনাচক্রে সে আমার নিকট আত্মীয়। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট। কটর নকশাল। আমার পেচকপ্রতিম বিরস মুখখানা দেখে সে সাস্তুনা দিয়ে বলেছিল, ‘বিশ্বাস কর ছোটকাকু! মূর্তিটা যে ভেঙ্গেছে তাকে আমি চিনি। গত বছর হায়ার সেকেন্ডারিতে সে বাংলায় লেটার পেয়েছে। ওর সেই বাংলা প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধ এসেছিল তোমার প্রিয় দেশবরেণ্য নেতা। ও লিখেছিল বিদ্যাসাগরের উপর।’

আমি জানতে চেয়েছিলুম, ‘তাহলে ও বিদ্যাসাগরের মূর্তিটা ভাঙল কেন?’ ...বিদ্যাসাগরের মূর্তি তো সে ভাঙেনি। ভেঙেছে একটা ফেটিশ! ষড়যন্ত্রী মশাইরা যে ফেটিশের গলায় প্রতিবছর ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর একটা করে গাঁথা ফুলের মালা দুলিয়ে দিয়ে বলেন, আগামীবার ভোটটা আমায় দেবেন কাইন্ডলি! দুঃখ কোরো না কাকু। সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি আবার বসাব”। (অর্ণব ২০১৭, লালসংবাদ)^{৯৫}

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদানকে নকশালরা অস্বীকার করেননি, মণীষীপূজা আর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তথাকথিত ‘বাংলার নবজাগরণ’ যে উচ্চশ্রেণি উচ্চবিত্ত অংশের উত্তরণের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তা বলতে চেয়েছিলেন। বিনয় ঘোষ ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে ও বদরুদ্দীন উমর ‘বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থে আরও যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। শাসকশ্রেণি গান্ধী-বিদ্যাসাগরদের মূর্তি পূজো করে ‘প্রকৃত ইতিহাস’ ও শ্রেণিশিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখছে বলেই ‘বিপ্লবী’ জনগণ সেইসব মূর্তি ভেঙে কৃষিবিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূর্তি স্থাপন করবে- এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। আর, শশাঙ্ক স্পষ্টতই ঔপনিবেশিক শাসনে ‘সহায়তাকারীদের’ মূর্তি ভাঙাকে ‘দুই রাজনীতির লড়াই ও দুই শ্রেণির লড়াই’ হিসেবে দেখেছেন^{৯৬}। তাঁর বক্তব্যে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য ছিল ও শাসকশ্রেণির দ্বারা লিখিত ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধা ছিল। নকশালবাড়ি বিদ্রোহে নারীবাদের বহু প্রশ্ন উহ্য থেকে গেছে বলে মল্লারিকা যে অভিযোগ করেছেন, তা অনেকক্ষেত্রেই সত্যি, কিন্তু, ‘মূর্তি ভাঙা’ প্রসঙ্গে তা সত্যি নয়; “শুধু মূর্তি ভাঙার জন্যে নয়, এ কাজ তাদের নেতিবাচক কাজ

নয়, মূর্তি ভাঙছে তারা বাঁসীর রাণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, গান্ধীঘাট ভাঙছে তারা মঙ্গলঘাট তৈরীর জন্য” (শশাঙ্ক ১৯৭০, দেশব্রতী)- রাষ্ট্রীয়-মতাদর্শ-বিরোধী এই আকাজ্জ্বল্য অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিকতা নেই। ঔপনিবেশিক শিক্ষা, শ্রেণিচেতনা ও জ্ঞানকাণ্ডকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েই ১৯৮০ দশকের শুরুতে নিম্নবর্ণীয় বিদ্যাচর্চার (Subaltern Studies)-র প্রারম্ভিক প্রস্তুতি ও ব্যাপ্তি ঘটে ভারতে। সরোজ দত্ত ১৯৭০ সালে ‘মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রজনীপাম দত্তের মতো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের যে শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরুদ্ধতা করছেন এবং নিপীড়িত জনগণের আকাজ্জ্বল্য ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কথা বলছেন, রণজিৎ গুহ ১৯৮১ সালে তাঁর প্রবন্ধে সেই যুক্তিগুলিরই অবতারণা করছেন পরিশীলিত বিদ্যায়তনিক পদ্ধতিতে। গুহ যেখানে বলছেন, “Elite mobilization tended to be relatively more legalistic and constitutionalist in orientation, Subaltern mobilization relatively more violent. The former was, on the whole more cautious and controlled, and latter more spontaneous.” (Guha 1982, 4-5) শুধুমাত্র উপনিবেশিত সমাজেই নয়, কৃষকবিদ্রোহ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জনতার (শ্রমজীবী ও পেটি বুর্জোয়া) এই ‘অমার্জিত’, ‘হিংস্র’ বিক্ষোভ নকশালবাড়ি বিদ্রোহেও দেখা গেছে; সরোজ দত্ত তাঁর প্রবন্ধে জনগণের ওই স্বতঃস্ফূর্ততার কথাই বলছেন। সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহ ও শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতির সঙ্গে ‘উচ্চবর্ণের (এলিট)’ ইতিহাসবোধ ও তত্ত্বকে প্রতিস্পর্ধা জানানো অঙ্গঙ্গী, এটা দু’জনের প্রবন্ধেই উপস্থিত^{৭৭}। দীপেন্দ্রনাথের ‘শোকমিছিল’ উপন্যাসিকায় বিনয়ভূষণ তাঁর ছোট ছেলে নকশালপন্থী অজয়কে অভিযুক্ত করেন বই পোড়ানোর অভিযোগে। উপন্যাসিকায় অজয় সোভিয়েত সংশোধনবাদী ও আমেরিকার বুর্জোয়া সাহিত্য পোড়ানোর পক্ষে যুক্তি দেয়। ‘দেশব্রতী’ পত্রিকার একটি সংখ্যায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, মধ্য কলকাতার কলিঙ্গ ইন্সটিটিউট স্কুলে বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীরা পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে “মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ও মার্কিন বই দিয়ে সজ্জিত লাইব্রেরি আক্রমণ করে সমস্ত রকম আমেরিকান বই পুড়িয়ে দেন এবং

দেওয়াল থেকে গান্ধি ও কেনেডির ছবি টেনে নামিয়ে লাথি মেরে ভেঙে ফেলেন।”^{৯৮}

নিশ্চিতভাবেই এই কর্মকাণ্ড ছিল উগ্র, হঠকারী, বৌদ্ধিক চর্চার পরিপন্থী। কারণ, মূলতঃ কলকাতা শহরে এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চললেও, শহরের বৃহৎ জনগণের কাছে এর কারণ রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আর, কৃষিবিপ্লবের সহায়ক হিসেবে শহর-মফস্বলের নিম্নবর্গের যে অভ্যুত্থানের কথা সরোজ দত্ত বলেছেন, সেই শহুরে নিম্নবর্গের সঙ্গেও এই ‘এলিট-বিরোধী’, ‘ভদ্রলোকীয়-জ্ঞানচর্চা-বিরোধী’ আন্দোলনের যোগ ছিল ক্ষীণ। ফলে, আখ্যানকারদের অধিকাংশের কাছে রাজনীতি বাদ দিয়ে হিংসাটুকুকে আখ্যানস্থ করায় সুবিধে হল। আর, উপরোক্ত আন্দোলন-কৌশলগুলিতে শহুরে-শিক্ষিত-ভদ্রলোকেদের সঙ্গে যতটা দূরত্ব বেড়েছিল^{৯৯}, মেহনতি মানুষের সঙ্গে ততটা রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়নি। কিন্তু উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-জ্ঞানের বিরোধিতা, মণীষীপূজার বিরোধিতা ও ধনতান্ত্রিক মতাদর্শের সাহিত্যপ্রভাব আটকাতে চাওয়া ছিল তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ শাসকেরা কাঁচামালের প্রয়োজনে গ্রাম-ভারতবর্ষকে নগর-ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক’রে দিয়েছিল, যে নগর-ভারতবর্ষ ছিল মধ্যশ্রেণি অধ্যুষিত। নকশালবাড়ি আন্দোলন সেই বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিল, ফলে শহুরে-মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকরা গ্রাম-ভারতের যাপন ও দ্বন্দ্বগুলিকে সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।^{১০০} উক্ত বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভাঙার জন্য কমিউনিস্টদের আন্তরিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল। সেই সময় কমিউনিস্টরা বহু পাঠচক্র (Study Circle) খুলেছিল, যেখানে রাজনৈতিক শিক্ষা তথা শ্রেণিচেতনার সামঞ্জস্যে শিক্ষাদান ও আলোচনার পরিসর বিস্তৃত হয়েছিল। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে বেলিয়াহাটার শান্তা বলে, “আমাদের একটা স্টাডি সার্কেল খোলা দরকার” (১৫৮) তারা ‘শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতি’-র পাশাপাশি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চেতনাজারিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে কিছু উদ্যোগও নেয়। ‘হাজার চুরাশির মা’-তে ব্রতী-নন্দিনীরা অনুপত্রিকা প্রকাশ করত। ষাট-সত্তরের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ ক’রে ‘অনুষ্টূপ (১৯৬৬)’, ‘অনীক (১৯৬৬)’ ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে, যাদের সম্পাদকরা ঘোষিতভাবেই

কমিউনিস্ট মতাদর্শপ্রেমী ছিলেন। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র রণজয়ের পাঠসূচির পরিধি শুধুমাত্র ‘চীনপন্থী’ সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। রণজয় তার ছাত্র কৌশিকের চেতনায় জ্ঞানের ক্ষুধা চারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল! সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় উঠে আসছে রাজনৈতিক পাঠের সাক্ষ্য,

300 undertrial CPI (ML) cadres by the Special Branch of the Calcutta police in 1970 revealed that one in every 7.5 persons studied Marx seriously, and one in every six persons was well acquainted with Mao Tse Tung’s works, suggesting the size of the solid core among the masses of youths who flocked to the movement (Banerjee 1980, 277)

এই পরিসংখ্যান থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় যে, নকশাল দ্রোহীরা শিক্ষাবিমুখ ছিলেন না, তবে, নিশ্চিতভাবেই শিক্ষালাভের অভিমুখ ছিল শ্রেণিচেতনার দিকে। কিন্তু, পরবর্তী চলচ্চিত্র, সাহিত্যে যেভাবে তাঁদের শুধু ভাঙনের দূত বলা হয়েছে, তাঁদের ধ্বংসাত্মক কৌশলকেই একমাত্র রাজনীতি বলে উপস্থাপিত হয়েছে, তা সত্যি নয়। কিন্তু, ইতিহাসে বিজয়ীর বয়ানই প্রাধান্য পায়, পুনরুৎপাদিত হয়। বিজিতের ইতিহাস মুখফেরতা কাহিনি আর উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই টিকে থাকে। ‘কালবেলা’ উপন্যাসের অন্তিমপর্বে দীপকের ঠাকুরমার বয়ানে, “নকশাল মানে জানি যারা পুলিশের গলা কাটে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে। আমাদের খোকা ওসব করছে?” (২৯২) অনিমেষের অনুতাপের চিন্তাস্রোতেও প্রায় এই কথাগুলিই এবং ‘হঠকারী’ পদক্ষেপের কথা উচ্চারণ করান ঔপন্যাসিক¹⁰¹। তাই, এগুলোর বিরুদ্ধপ্রস্তাবে ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসকে ‘প্রামাণিক দলিলভিত্তিক উপন্যাস (ডকুমেন্টারি নভেল)’ হয়ে উঠতে হয়। পাঠকের চেনা ইতিহাস ও চেনা আখ্যানের প্রত্যাশার দিগন্ত বিস্তৃত হতে থাকে। বিজিত দ্রোহীদের অন্য-ইতিহাস পাঠকের চেতনাকে প্রভাবিত করে। দ্রোণাচার্য ঘোষ (বাস্তবচরিত্র) ও পাঞ্চালী (কল্পনানির্মিত) আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে কৃষিবিপ্লবের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে

চায়, যে শিক্ষা তাঁদের যাপন ও দ্রোহকাজ্জ্বার সঙ্গে সম্পর্কিত। শিশুদের জন্যে স্কুল ও পাঠ্যক্রম তৈরি করেন তাঁরা। আর, বর্ণপরিচয়ের নতুন প্রকরণ, যা নিশ্চিতভাবেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধচেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

ক- কিসাণ মাঠে বুনছে ধান/ খ- খেতখামার চাষীর প্রাণ/ গ- গরীব মা বোন খাটে

দেশে/ ঘ- ঘরে জমিদার খাচ্ছে বসে

একেবারে নতুন রকমের বর্ণপরিচয়। পাঞ্চগলী বিস্মিত হয়। মজাও লাগে।

বিদ্যাসাগর মশাই এই দৃশ্য দেখে কী বলতেন? রূপা জানায়, দ্রোণ তাদের

শিখিয়েছে এইসব বর্ণপরিচয় আর ছড়া। পাঞ্চগলীর মনে পড়ে, দক্ষিণদেশে

বেরিয়েছিল এই নতুন বর্ণপরিচয়।

রূপা হাঁক পাড়ে, ‘ট’...

শিশুরা বলে, টাকার কুমীর সব মহাজন (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ১২৩-৪)

এতে বিদ্যাসাগরকে অপমান করা নেই, বরং তাঁর ভাষাশিক্ষার আঙ্গিক ও বিষয়কে পরিমার্জিত করার উদ্দেশ্য আছে। নকশালদের পরিচয় মাত্রেই যেসব আখ্যানকার ও ঐতিহাসিক ‘বিদ্যাসাগরের গলা কাটা’ বলে পরিচিতি ঘটান, তাঁরা এই উদাহরণ মনে রাখতে পারেন। আর, উল্লিখিত ‘দক্ষিণদেশ’ পত্রিকা ছিল কানাই চ্যাটার্জী ও অমূল্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত মাওবাদী কমিউনিস্ট কেন্দ্রের মুখপত্র, যদিও ১৯৬৯ সাল থেকে পত্রিকার নামেই ‘দক্ষিণদেশ দল’ বলেই তাঁদের পরিচিতি। দ্রোণাচার্য ঘোষ ছিলেন ষাটের দশকের কবি; প্রথমে দক্ষিণদেশ ও পরে সিপিআই (এম-এল) পার্টির হুগলি জেলা কমিটির অন্যতম নেতা। উপন্যাসটির অন্যতন প্রধান কেন্দ্রীয় কুশীলব দ্রোণ। উপন্যাসে বর্ণিত উপরিউক্ত অংশ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, ‘নকশালরা শিক্ষাবিরোধী’- এই বহুলপ্রচলিত প্রতর্ককে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে শ্রেণিচেতনার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা যে কমিউনিস্টরা করেছিলেন, তার উদাহরণ রয়েছে। ‘বিদ্যাসাগর মশাই এই দৃশ্য দেখে কী বলতেন?’- এই ভাবনা পাঞ্চগলীর মতোই লেখকেরও এবং

লেখক ‘পাঞ্চগলীর ভাবনা’র মধ্যে দিয়ে পাঠকের ভাবনাও হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরকে অসম্মান তো নয়ই, বরং ‘বর্ণপরিচয়’-র উদ্দেশ্যকেই সমসাময়িক ক’রে তোলা হয়েছিল নতুন ভাষা ও শব্দস্থাপনার দ্বারা। ভাষার রাজনীতি ও ভাষা প্রয়োগকারীর রাজনীতিবোধ পরিস্ফুট হয় এতে। উপন্যাস যে বাস্তব জগৎ তৈরি করে নেয় আখ্যানে-ভাষায়-কুশীলবের সামঞ্জস্যে, তাতে শাসক-নির্ধারিত প্রতর্কগুলিকে প্রতিস্পর্ধা জানায় এই আখ্যান। অক্ষর-পরিচয়ের অধিকার ও শিক্ষার অধিকার শুধু যে মধ্যবিত্তের অভ্যাস-করায়ত্ত্ব হয়ে থাকবে না, সেটাই ছিল দ্রোণ, রূপা বাউড়ির প্রত্যাশা। আর, একইসঙ্গে লেখক যে সময়কে আখ্যানবদ্ধ করছেন কেন্দ্রীয়ভাবে সেই ষাট-সত্তর দশকের সঙ্গে লেখক যে কালস্থানিকতায় দাঁড়িয়ে উপন্যাসটি রচনা করছেন, দু’টি মিলে যায় কিছু বর্ণনায়। ১৯৬৯-৭০ সালে নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় ‘বুনো’ সম্প্রদায়ের ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকদের নিয়ে কমিউনিস্ট গেরিলাবাহিনী গঠনের কাজ চলার পাশাপাশি হরিণঘাটায় তাঁদের জন্যে একটি নৈশবিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছিল।¹⁰²

আখ্যানে নারীর অবস্থানঃ বাঁধাছক ও ছকভাঙা

শিশুপাঠ্য ছড়াকে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জন্যে গড়া পাঠশালায় সময়ের মোড়কে সাজিয়ে নিয়েছিলেন দ্রোণ ও রূপা বাউড়ি। পাঞ্চগলীর মনে প্রশ্ন জাগে ‘খোকা’রাই শুধু দ্রোহে কেন অংশগ্রহণ করবে? পাঞ্চগলী যে এটা ভেবেছিল, তা ঔপন্যাসিক কীভাবে জানলেন? এই প্রশ্নের একটা উত্তর হতে পারে যে, ঔপন্যাসিকের কল্পনার সূত্র পরবর্তী দশকগুলিতে জাগরিত নারীবাদী চেতনা, যেহেতু উপন্যাসটি উপন্যাসে উক্ত সময়পর্বের প্রায় চার দশক পরে লেখা। আর, আরও একটি উত্তরের সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ববর্তী কৃষকবিদ্রোহ তথা তেভাগার সময়েও যে এই প্রশ্নগুলি উঠেছিল, তার সূত্র বিশ্লেষণে। এই প্রশ্ন শুধু বর্তমান দশকের নয়, এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রয়েছে। সমাজব্যবস্থায় গেঁড়ে বসে থাকা পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধিরা তো বটেই, বিপ্লবী দলগুলোও প্রভাবিত হতো। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধিদের প্রভাবিত

হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় আত্রেয়ী সেনের গবেষণায়, “some women Naxals in Calcutta were severely and spectacularly beaten, at times on their breasts with cricket bats to create ‘a male chest’ since politically active men were accepted more comfortably within Bengali patriarchal societies”¹⁰³ সাম্প্রতিক সময়ে কৃষক আন্দোলন চলাকালীন, দিল্লির সিঙ্গু সীমান্তে কৃষক-নারীরা আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন বলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বলেন, “মহিলাদের আন্দোলনে রাখা হয়েছে কেন?”। অনিমেষের স্ত্রী মাধবীলতাকে অত্যাচার করার সময় মাধবীলতার স্ত্রী-ত্ব ও মাতৃত্বের বৈধতা নিয়ে যে মন্তব্যগুলি পুলিশ অফিসার করে, তা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ।

...আপনার মিত্র হবার কোনও নোটিফিকেশন নেই। কবে আপনাদের বিয়ে হল সেখবর কারোজানা নেই। অথচ আপনার শরীর বলছে আপনি মা হতে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা যদি বৈধ না হয় তাহলে-... দেখুন কি চমৎকার দায়িত্বজ্ঞান! আপনি কোথায় আছেন, সে খবর আপনার স্বামী রাখেন না, অবশ্য আপনার স্বামী যদি হন! (মজুমদার ২০০৪, ২৮১-২)

অনিমেষের আবেগপ্রবণ দুর্বলতার বিন্দু ‘মাধবীলতা’- এটা প্রমাণ করতেই লালবাজারের পুলিশ অফিসারেরা মাধবীলতাকে নির্যাতন ক’রে অনিমেষের মুখ খোলাতে চায়। প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বমূলক মনোভাব থেকেই গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃত্ব দিয়ে মাধবীলতার তাত্ক্ষণিক সংকটকে ব্যাখ্যা করে তারা। “দেখুন এই ভদ্রলোক আপনাকে ভালবাসেন না। আপনার শরীরে সন্তান এনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন” (২৮৪) ব্যক্তিগত ভালবাসাকে ‘ব্যবহার’ ক’রে রাজনৈতিক মতাদর্শকে ব্ল্যাকমেল করার এই নির্যাতনপদ্ধতি রাষ্ট্রীয় হিংসার স্বরূপ উন্মোচন করে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসেও মেখলাকে পুরুষতান্ত্রিকতার সম্মুখীন হতে হয় অন্যান্যদের প্রশ্নবাণে ও আচরণে। ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসেও ‘মা’ হিসেবে সুজাতাকে আত্মীয়-পরিজনদের কটুক্তি শুনতে হয় যেহেতু ব্রতী কমিউনিস্ট এবং শহীদ হয়ে গেছিল। “জানেন, নিশ্চয় সুজাতা ইজ অ্যা থরোলি আনফীলিং ওয়াইফ। শী স্পয়েল্ট হার সন। নইলে এ রকম

ফ্যামিলির ছেলে কখনো...” (১০৬) অর্থাৎ, বড় পুঁজিপতি ও অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে কমিউনিস্ট হয়ে ‘বিপথে’ যাওয়ার নিয়ম ভাঙার সব দায় সুজাতার; এক্ষেত্রেও সুজাতাকে আক্রমণ করে তারাই, যারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মতাদর্শের অনুগামী। সবসময় যে পুলিশি নির্যাতন কক্ষেই পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অনুশীলন হয় তা নয়, বরং আর্থ-সামাজিক আবহ ও রাজনৈতিক আবহ পরস্পরের পরিপূরক বলেই আখ্যানে তার প্রতিফলন হয়। ‘কালবেলা’-তে মাধবীলতাকে বারবার অনিমেষের সঙ্গে সম্পর্কের প্রমাণ দিয়ে যেতে হয় পুলিশি জেরার বাইরেও। অনিমেষের সহবন্দি ও মানসিক ভারসাম্যহীন বিপ্লবী দীপকের মা ও ঠাকুমা তাঁদের রক্ষণশীল বিশ্বাস থেকেই “শুধু জানতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সম্পর্কটা কী?... তোমাদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?” (২৯৬) ইত্যাদি প্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকেন মাধবীলতাকে। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে পুলিশি গোয়ার মা-কে তুলে নিয়ে যায় গোয়ার খবর জানতে এবং মিনু খবর নিয়ে জানে, “গোরাদাকে না-পেলে ছাড়বে না বলেছে।”¹⁰⁴ রাজনৈতিক উপন্যাসে, বিশেষতঃ নকশালবাড়ি ও ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর ভূমিকা তিনভাবে এসেছে- ১) প্রত্যক্ষ মহিলা কমরেড, যাঁরা সরাসরি আন্দোলনের প্রথম সারিতে রয়েছেন, যাঁরা প্রত্যক্ষ যোদ্ধা ও ২) যাঁরা পরোক্ষভাবে আন্দোলনে সহায়তা করেছেন ও ৩) যাঁরা মাতৃভূমিকা ও স্ত্রী-ভূমিকা পালন করেছেন তথা, পুরুষ-বিপ্লবীর আশ্রয়স্থল হিসেবে থেকেছেন। প্রথম দুই অংশের প্রতিনিধিত্ব বাংলা উপন্যাসে হাতেগোনা। কারণ, অধিকাংশ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস পুরুষ-লেখকের লেখা এবং বিপ্লবকে পৌরুষের সমার্থক হিসেবে দেখার দীর্ঘকালীন ঢগটি কি তাঁদের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে? রাষ্ট্র কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নির্যাতনের কৌশল হিসেবে আবেগপ্রবণ দুর্বলতার বিন্দু (point of emotional weakness) খুঁজে নেয়। পুরুষ-বিপ্লবীর ভালবাসার মানুষকে তথা প্রিয়তম মানুষকে ধরে এনে নির্যাতন করলেই বিপ্লবীটির আবেগপ্রবণ দুর্বলতায় আঘাত করে তাকে তালুবন্দি করা যাবে- এই বিশ্বাস সামরিক নির্যাতনপদ্ধতির বহুব্যবহৃত কৌশল। মাধবীলতাকে অত্যাচার বা গোয়ার মাকে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া বা রণজয়ের

বাবাকে ও মেখলাকে মানসিকভাবে সন্তুষ্ট রাখা এই কৌশলের প্রয়োগ। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে সোনার সত্তরোর্থ পিসিমার পুলিশের প্রতি ‘খিস্তি’ পুলিশি নির্যাতনের উপরোক্ত কৌশলের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া ক্ষোভ- “খেকিকুত্তার দল এয়েছে রে... যমের চক্ষু নেই রে... এগুলোর মরণ হয়না কেন রে...” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ৮১) সোনাকে ধরতে চেয়ে প্রায়ই পুলিশ ও খোচড় বেলেঘাটার বস্তিতে সোনাদের বাড়িতে হানা দিয়ে তার মা ও পিসিমাকে মানসিক অত্যাচার করত, বাড়ি তছনছ করত। রাজনৈতিক উপন্যাসে উপরোক্ত তিন প্রকারের ভূমিকার মধ্যে প্রথম প্রকারের উদাহরণ ‘দ্রৌপদী (১৯৭৭)’ গল্পের দোপদী মেঝেন, ‘আটটা নটার সূর্য (২০১৩)’ পাঞ্চালী, জয়া মিত্রের ‘হন্যমান (১৩৬৯)’ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস (১৯৭৫)’-র শান্তা, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪)’-র নন্দিনী- এরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ ‘কমুনিস’ উপন্যাসের মিনু। দ্রোহী যুবক সোনার মৃত্যুর পরে মিনু নকশালদের সঙ্গে যোগ দেয় মিনু; প্রতিশোধের জন্যে এবং রাজনৈতিক বোধে সম্পৃক্ততার জন্যে। মিনুর চেতনার বদল ‘কমুনিস’ উপন্যাসকে শুধুমাত্র পুরুষকেন্দ্রিক বয়ানে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয় না। বেলেঘাটার তেইশ নম্বর বস্তির নিম্নবিত্ত পরিবারের (শহুরে নিম্নবর্গ) সোনাকে দেখে শহুরে নিম্নবিত্ত পরিবারের মিনু বিপ্লবী হওয়ার কথা ভাবলেও, “মিনুর বুকে একটা ‘কিন্তু’ খচ খচ করে।” এবং গোরার মনেও সংশয় থাকে, “মিনুর একরত্তি নাক, মুখের অসহায় কোমলভাব এসব দেখে গোরা ভাবলঃ ও এখনও বড্ড কাঁচা। ওর সঙ্গে কি কমরেড নির্মলার তুলনা চলে?” (১১৩-৪) এই সংশয় আসে এক পুরুষ বিপ্লবীর চিন্তাস্রোতে ও নির্মিত ধারণায়, মিনুর ‘কোমলতা’ ও মানসিকতা অ-বিপ্লবী বলে মনে হয় তার। কিন্তু, মিনুর উত্তরণ তথা উপরিলিখিত তৃতীয় প্রকার থেকে ক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম প্রকারে উত্তরণ ঘটে সোনার মৃত্যুর পরে। আখ্যানের প্রোটাগনিস্ট গোরার চেতনাতেও বদল আসে। মিনুর আবেগ বেশি (ইঙ্গিত সম্ভবতঃ মিনুর নারীসত্তার কোমলতার প্রতি) এই অভিযোগ তুলতেই মিনুর বলিষ্ঠ জবাব, “তোমরা শহিদ কমরেডের মৃতদেহ সামনে রেখে ভাবতে বসেছ

কোনদিকে যাবে। তোমরা মানুষ!” (১১৮) ‘দ্রৌপদী’ গল্পে দোপদী মেঝেন যেমন আখ্যানের প্রোটোগনিস্ট তথা ‘নটোরিয়াস বিপ্লবী’ তথা রাষ্ট্রের ত্রাস হয়ে উঠেছিল, আর কোনও বাংলা রাজনৈতিক কথাসাহিত্যেই তেমনটা হয়ে ওঠেনি। ‘আটটা নটার সূর্য’তে পাঞ্চালীর ভূমিকা ব্যতিক্রমী। শিক্ষিতা-মধ্যবিত্ত সেবিকা থেকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হয়ে ওঠার যাত্রাপথে ‘নারী’ লিঙ্গতকমার জন্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাধার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে পুরুষতান্ত্রিক বাধাও পেরোতে হয় তাকে।¹⁰⁵ পাঞ্চালী বিভিন্ন অ্যাকশনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সাংগঠনিক প্রস্তুতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাসন্তী হাঁসদা একাধারে পার্টির প্রথম সারির নেতা ব্রজ গুহর ‘কভার’ এবং জঙ্গী নেত্রী। মল্লারিকা সিন্হা রায় নারী-বিপ্লবীদের অবস্থান ও স্বীকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে লিখছেন,

For metropolitan male Naxalites, the imagined tribal woman was capable of conscious political decisions precisely because she was a construction of their imagination. If the ideal tribal woman warrior was capable of strategising guerrilla warfare and martyrdom, the idealised model of middle-class female militancy revolved around the virtues of the male guerrilla's perfect companion, a courier of arms and ammunitions who would refrain from using those weapons herself. (Sinha Roy 2012, 128)

‘কমুনিস’ উপন্যাসের শান্তার ভূমিকা পর্যালোচনায় মল্লারিকার উক্ত বাক্য বিশ্লেষণ করা যায়। শান্তা একাধারে জঙ্গি যোদ্ধা এবং নেপুর স্ত্রী। তাকে ক্রমাগত সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয় এই দুই ভূমিকার মধ্যে। নেপু বোমার আঘাতে জখম হলে শান্তা নেপুর চিকিৎসা-সেবা করে, তাকে খাইয়ে দেয় এবং যাবতীয় দেখভাল করে ‘মা’-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে¹⁰⁶। শান্তার হাতে রান্নার হলুদ ছোপ, ‘শাড়ি পরা মেয়েটা আঁচলের খুঁট দিয়ে নেপুর মুখ মুছিয়ে দিল’ ইত্যাদি বর্ণনা

‘কমরেড’ শান্তার পাশাপাশি ‘জননী/স্ত্রী’ শান্তার চিত্রকল্প তৈরি ক’রে দেয়। ‘নেপুর ব্যথার সবটুকু বুকে নিয়ে মেয়েটার চোখে বেদনা’ প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ভূমিকা রাখা ছাড়াও, শান্তা রাজনৈতিক বিপর্যয় আঁচ করতে পারে; শান্তা পার্টির নীতি-কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক শিক্ষাদানকেন্দ্র চালু করে। মিনু যখন সহযোদ্ধাদের খিঁধে নিয়ে বিচলিত হয়, কথকের বয়ানে “মিনু এখন জননীর মতো” (১১৯) ‘কালবেলা’ উপন্যাসে অনিমেষের পরিচর্যায় ও যত্নে মাধবীলতার ওই স্নেহ-মাতৃ-আত্মত্যাগ ইত্যাদি প্রথাগত/একঘেয়ে ‘নারীসুলভ’ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ক’রে তোলেন ঔপন্যাসিক। পুরুষ-কথকের চেতনাস্রোতে এই ‘জননী/স্ত্রী’ চিত্রকল্প বারবার আসে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক গল্প-উপন্যাসে ‘মা’-র ভূমিকায় পারুল ও কনকের সংলাপ উল্লেখ্য। ১৯৭০ দশকের শুরুতে একজন মা তাঁর সন্তানদের পার্টি-হোলটাইমার বাবাকে প্রশ্ন করেন, “তোমাদের অভাব কী? তোমার পার্টি আছে, অজুর যুববাহিনী আছে, বিজুর চেয়ারম্যান আছে। আমার? আমার কী আছে?” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ৪৪১) কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনকালে সেই মা উদ্ভিন্ন হয় ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ, তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক যুদ্ধে। মূল্যবোধ ও মানবিক বৃত্তির শোকমিছিলে হার না-মানা মায়ের দ্বিধাহীন উচ্চারণ।

হ্যাঁ, ক্রোধ, তবে তা তোমার বিরুদ্ধে, তোমাদের বিরুদ্ধে। এই তো সেদিনই বলছিল- ৫০ বছরে কেমন রাজনীতি করলে তোমরা যাতে আজ ছেলে তার বাপকে দাদাকে মনে করে পুলিশের লোক আর দলত্যাগী ছেলেকে তার বাপ-দাদার পার্টি ভাবে সমাজবিরোধী, সি.আই.এ-র এজেন্ট?... আমি অজয়ের মা, আমি বিজয়ের মা, আমি তোমাদের অভিযুক্ত করছি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ৪২৯)

এই মা তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে আগলে রাখেন দুই সন্তানকে, আঁকড়ে থাকতে চান কমিউনিস্ট রাজনীতির মূল্যবোধকে। অথচ, তিনিই ভাঙ্গনের অসহায় সাক্ষী, নীরব দর্শক। মতাদর্শের (ideology) সদর্থক ও নঞর্থক ধারণা এই বিশ্লেষণে জরুরি। অজয়ের জেলে জন্মগ্রহণ, তার

ও বিজয়ের রাজনৈতিক পাঠ কিংবা মতাদর্শগত বিনিময় মতাদর্শের চৈতন্য জাগরণের দিক।¹⁰⁷

পারুল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় ঋজু এক ‘মা’, যিনি নিজেও পার্টিকর্মী ছিলেন এবং এক পার্টিকর্মীর ‘দায়িত্ব’ হিসেবেই কমিউনিস্ট আদর্শে মানুষ করেছেন ছেলেদের। বিনয়ভূষণ পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী (হোল্টাইমার), ‘৬৪-র বিভাজনের পরে সিপিআইএম দলের কর্মী। তিনি বহু সময় বাড়ির বাইরে বাইরে কাটান বা শাসকের চোখরাঙ্গানিতে লুকিয়ে কাটান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তখন পারুল দৃঢ়তা ও মমতার যুগলবন্ধনে বাঁচিয়ে রেখেছেন সাংসারিক চলমানতা। পারুল রাজনৈতিক আখ্যানের সেই ‘মডেল’ ভদ্রমহিলা, পুরুষ কমিউনিস্ট যার ভরসায় বিপ্লব করতে যায়। একই মতাদর্শের অনুশীলন করলেও ভদ্রমহিলা বিপ্লবী প্রত্যক্ষ সংগ্রামী হতে পারে না- সাংসারিক মঙ্গলে ‘জননী/স্ত্রী’ হয়ে তাকে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রগতিবাদী ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও যে এই পুরুষকেন্দ্রিক চেতনা আধিপত্য বজায় রেখেছে, তা উপন্যাসের ইতিহাসলেখ থেকে বোঝা যায়। প্রোটাগনিস্ট বিনয়ভূষণও এই প্রশ্নেই আলোড়িত হন এবং বারবার আত্মসমালোচনা করেন “এ সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিয়ের পর থেকে পারুল এতই ব্যস্ত ছিল যে নিজের বলে কিছু চাইবার অবসর সে কখন পেল-” (৪৪২) অর্থাৎ এই বয়ানেই নারীর আত্মত্যাগেই মহানতা আরোপ করার চেষ্টা। অজয়ের জন্মের বেশ কয়েকবছর পর অবধি বিনয়ভূষণ জেলে ছিলেন, সেই ‘অপরিচিত’ বাবার সাথে শিশুর যোগাযোগের একমাত্র সাঁকো মা পারুল¹⁰⁸। অথবা, ছোট ছেলে বিজয়ের মুখে আদরের ‘কমরেড বাবা’, ‘কমরেড মা’ সম্বোধনের সংস্কৃতি গড়ে তোলেন (বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এইরকম সম্বোধন বাস্তবসম্মত নয়, লেখকের আদর্শগত মনোবাঞ্ছার প্রতিফলন হয়তো) সেই মা, পারুল। সাংসারিক অভিঘাতে নিয়ত যুঝে চলা, অজয়-বিজয়ের স্কুল-ছেলেবেলা সামলানো সেই মা কখনো রুদ্রমূর্তি; মাঝরাতে বাড়িতে শাসকপুলিশের হানা থেকে সযত্নে রক্ষা করেন লালঝাণ্ডা এবং ইস্তেহার। পারুল গৃহকর্ত্রী হয়ে এবং বিনয়ভূষণ-অজয়-বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর মতাদর্শগত দায়িত্ব পালন করেন। পারুল কিংবা কনক একজন সমাজবাস্তববাদী পুরুষ ঔপন্যাসিকের মনোবাঞ্ছাগত

চিন্তাসূত্রে (Wishful thinking) নির্মিত চরিত্র হয়ে থেকে যান, যাঁদের স্বর আখ্যানের প্রোটাগনিস্ট ও ঔপন্যাসিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পারুল এক অমোঘ যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয় যখন বড় ছেলে অজয় সিপিআইএম যুববাহিনীর অ্যাকশন কমিটির সক্রিয় সদস্য, ছোট ছেলে বিজয় সিপিআইএমএল-এর সক্রিয় কর্মী এবং বিনয়ভূষণ সিপিআইএমের হোলটাইমার হয়ে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। পারুল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের প্রতীক হয়ে ওঠেন যিনি প্রত্যেকটি ভাঙনের নীরব দর্শক, কমিউনিস্টদের পারস্পরিক দোষারোপ-সন্দেহের সাক্ষী এবং অনুতাপের নামান্তর। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অখণ্ড সত্তা হয়েই যেন পারুল বলেন, ‘পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। পার্টি ভাঙ্গার পাপ’। পারুল রাজনীতির মধ্যে মনুষ্যত্ব খোঁজে এবং মতাদর্শকে মানবুমুক্তির পথ হিসেবে দেখে। আর, নঞর্থক মতাদর্শের অনুশীলনের সময় সেই প্রত্যাশা চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং তা হত্যা-প্রতিহত্যার নামান্তর হয়ে ওঠে। নকশাল বিজয় তার বাবা-দাদাকে সংশোধনবাদী বলে অভিযুক্ত করছে এবং বিজয়ের বাবা ও দাদা তাকে ‘সিপিএম পার্টির শত্রু’ বলে দাগিয়ে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে, অথচ পারুল তাঁর মাতৃসত্তা দিয়ে ‘অবিভক্ত’ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে চাইছেন। বিজয়ের যুক্তির মধ্যে ও সিপিএমের ভোটসর্বস্ব রাজনীতিকে নাকচ করার মধ্যে দিয়েই যেন নিজের এতদিনের না-বলা কথাগুলোর যুক্তি শানাচ্ছেন। নিছক তত্ত্ব নয়, পারুল তাঁর বিজয়ের মধ্যে দিয়েই নিজের বিদ্রোহের পথ খুঁজছেন। সুজাতা যেমন ব্রতীর দ্রোহপথ অনুসন্ধানে মুক্তির আদর্শের সন্ধান পান একটু একটু করে।

পারুল তথা ‘আদর্শ’ মা সবচেয়ে বেশি আহত হচ্ছেন যখন পার্টিনিষ্ঠ বড়ছেলে বাবাকে অভিযোগ করছে, “মা ক্রমেই পার্টিবিরোধী কথাবার্তা বলা শুরু করেছে। একে তো বিজু। তার ওপর মা। তুমি-আমি বিপদে পড়ব।” (৪৪১) দ্রোহী ছোটছেলে বলছে, “কমরেড মা, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি নিজেই চলে যাব।” (৪৩৮) এক অসম্ভব ভাঙ্গনমুহূর্ত আখ্যানের। সাংসারিক প্রতিটা কৌণিক বিন্দুতে ঢুকে পড়েছে পার্টি, আর শুধু ঢুকেই পড়েনি বরং ভেঙ্গে

দিচ্ছে সম্পর্কগুলো। বাবা-দাদা-ভাই-মা চারটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে উঠছে। সতীনাথ ভাদুড়ির ‘জাগরী’ উপন্যাসের সত্তর দশকীয় বিস্তৃতি এই উপন্যাসে। ১৯৪২ থেকে ১৯৭০- এই তিনদশকে মানুষ-পার্টি-পরিবার-রাজনীতি বিষয়টি বদলেছে এবং মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েন আরও বেড়েছে। বিনয়ভূষণ, পারুল, অজয় ও বিজয় একাধারে সামাজিক সত্তা হিসেবে বাঁচে এবং এই সত্তার মধ্যেই তারা পারিবারিক সাবজেক্ট ও রাজনৈতিক সাবজেক্ট।¹⁰⁹ পার্টি এবং পরিবার এই দুইই তাঁদের অস্তিত্বের নির্ধারক। পারুল বিচ্ছিন্ন ক’রে নেন নিজেকে পার্টির মানবতাহীন নীতি থেকে। তাঁর ব্যথা শেষ হয় মৃত্যুসংবাদে। দাদা অজয় যুববাহিনীর সঙ্গে যায় ‘পার্টিশত্রু’ ভাই বিজয়কে খতম করতে। বড় ছেলে মারা যায় ছোট ছেলের ছোঁড়া বোমার আঘাতে আর, বড় ছেলের যুবদলের সাথীরা ছুরি গেঁথে দেয় ছোটছেলের পেটে। অসহায় সাক্ষী বিনয়ভূষণ, সেই মৃত্যুদৃশ্যের। অজয় সিপিএম কর্মী বলে, তার সাথে শ্মশানে যায় হোল্টাইমার বিনয়ভূষণ। কিন্তু, সিপিএমবিরোধী নকশাল বিজয়ের সাথে শ্মশানে যায় তার ‘কমরেড মা’, পারুল জানেন এজন্যে তাঁর পার্টি তাঁকে বিতাড়িত (expel) করবে, তবু যান। বিজয়ের সাথে তার ‘মা’ যান, ছেলের মৃতদেহে রাখেন লেনিনের মুখাঙ্কিত মেডেলিয়ান। দীপেন্দ্রনাথ মাতৃসত্তাকে প্রাধান্য দিতেই পারুল চরিত্রনির্মাণ করেছেন, যদিও তা রাজনৈতিক উপন্যাসে কোনও বাঁকবদল ঘটায়নি- পার্টি ও পরিবারের দ্বন্দ্ব ভদ্রলোক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষ পার্টির দিকে গেলে ভদ্রমহিলা মধ্যবিত্ত নারী পরিবার সামলে রাখার দায় নেবে এই চিরাচরিত সূত্রায়ণই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু, পারুলই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আখ্যানকথক (narrator) এবং পারুলই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অস্থিরতার স্থির বিবেক “না, আমি কাউকে ক্ষমা করব না। তোমাকে না, ইদ্রিসকে না, নিজেকেও না।” (৪৪২)। এইটিই ক্রমশঃ আখ্যানের প্রধান প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়। উন্মাদিনী ননীদি রাজনৈতিক বদলের ও মতাদর্শগত অবক্ষয়ের অভিমুখ দেখিয়ে দেয় যখন পার্টির যুবদলের অ্যাকশন স্কোয়াডের নেতার শ্রেণিঅবস্থান ও লুম্পেন কার্যকলাপ মনে করিয়ে দেয়। “অজু-বিজু পুলিশের গুলিতে শহীদ হল” (৪৩৪) এই উপলব্ধি একইসঙ্গে সত্তর দশকের রাজনৈতিক হিংসার প্রতীক, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের প্রতীক এবং মতাদর্শের নঞর্থকতার

প্রতীক। সত্তর-দশক পরবর্তী মূলধারার রাজনৈতিক উপন্যাস এই হত্যা-প্রতিহত্যাকে মূল বিষয় ক’রে তোলে এবং নিরাজনীতিকরণের (depoliticization) মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ‘শোকমিছিল’ তা করে না, বরং প্রতিকূল সময়েও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণে পথ খুঁজতে চায়। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, উপন্যাসের শেষে আইদিওলজি কি রিচুয়াল বা প্রথায় পরিণত হচ্ছে? তাই শহীদ অজু-বিজুর জন্যে মতাদর্শের সাজিয়ে রাখা মেডালিয়ন আর লাল পতাকা ঠিক রাখা থাকে? নাকি দীপেন্দ্রনাথ অনেক ভাঙন আর নঞর্থকতার পরেও কমিউনিস্ট মতাদর্শের সদর্থক ভাবের প্রতি আস্থা রাখছেন? তাই, “শ্মশানে দেখা হবে”-র মতো প্রতীকী উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিনয়-পারুল সময়ের আলো-আঁধারির প্রতি নির্দেশ করেন, যাতে ভবিষ্যতে আলোর সন্ধানে যাওয়া যায়?

‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’ উপন্যাসে পারুলের প্রতিরূপ কনক শিক্ষিত ভদ্রমহিলা; তিনি ইন্সকুলে চাকরি করেন, তাঁর স্বামী মণিমোহন সিপিআই-এর হোল্টাইমার এবং বছর চোদ্দোর মিতু আর বছর ছয়েকের বাবুয়া- আখ্যান আবর্তিত হয় মণিমোহনকে অক্ষ ক’রে। মণিমোহনের সঙ্গে সংলাপের সূত্র ধরে কনককে আবিষ্কার করান আখ্যানের কথক। কমিউনিস্ট নারী, চাকুরীজীবী, হোল্টাইমারের স্ত্রী এবং দুই বাড়ন্ত সন্তানের মা- এই প্রত্যেকটি পরিচয়ে সুষম ভারসাম্য রেখে চলতে হয় কনককে প্রতিনিয়ত। কিন্তু, সে ভারসাম্য ধাক্কা খায় কখনো। এই উপন্যাসের সংকটবিন্দু মণিমোহনের ও তৎকালীন সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক সংকট। মতাদর্শ-বিচ্যুতি, দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সংস্কৃতি-রুচির যোজন দূরত্ব এবং ব্যক্তিগত-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ঘনীভবন- এই বিষয়গুলিই আখ্যানকে রাজনৈতিক ক’রে তোলে। মণিমোহনের কাছে যা কিছু মনে হয় বুর্জোয়া সংস্কৃতি, যা কিছু কমিউনিস্ট সংস্কৃতির পরিপন্থী, তা-ই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি, নিজের সন্তানদেরও সেই ছাঁচে ঢেলে বড় করতে চান। কিন্তু, কমিউনিস্ট আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তি ও আবহ না থাকলে কি কমিউনিস্ট সংস্কৃতির অনুশীলন ‘শুদ্ধ’ হতে পারে? মণিমোহনের মতাদর্শের সঙ্গে তাল মেলানো এবং পণ্যমুখী সমাজে

বেড়ে ওঠা সন্তানদের চাহিদার দোলাচলে কনক সত্তর দশকের শেষার্ধ্বে পথ খোঁজে। কঠিন-কঠোর আদর্শের যান্ত্রিক প্রয়োগ এবং আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত চাওয়া-পাওয়ায় ঠোকাঠুকি লাগে; কনকের ব্যক্তিগত চাহিদার থেকেও বড় হয়ে ওঠে মণিমোহনের সমস্ত ব্যর্থতার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠা। বাবুয়ার ক্যাডবেরি খাওয়া, বাবুয়ার ‘ক্যাপ্টেন হ্যাডকের’ মতো মদ খেতে চাওয়া কিংবা কমিউনিস্ট না-হতে-চাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশে মণিমোহন আতঙ্কিত হয়ে মতাদর্শের যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটাতে চাইলে কনকের মাতৃসত্তা বলে ওঠে, “দোহাই তোমার, দারিদ্র নিয়ে ওদের অহঙ্কার করতে শিখিও না... আমি চাই ওরা যোগ্যভাবে বাঁচতে শিখুক, হেরে না যাক।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২৬৩) কিন্তু কনক মণিমোহনের মতাদর্শনিষ্ঠার প্রতি গর্ববোধও করে এবং আত্মত্যাগকেই মেনে নেয়।¹¹⁰ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে লিঙ্গ সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বহুবার। পার্টিতে ও গণসংগঠনে বারবার পুরুষ এবং মহিলা বিভাজন হয়েছে। সাংগঠনিক পরিসরে মধ্যবিত্ত কিংবা নির্বিত্ত পুরুষ ও নারী একই সংগঠন করেন। কিন্তু, মহিলা সংগঠককে মিটিং শেষে ঘরে ফিরে একজন নিষ্ঠা স্ত্রীর দায়িত্ব বা একজন দায়িত্বশীলা মা-এর কর্তব্যপালন করতে হয়। সেখানে সমান দায়িত্বভাগ হয়না পুরুষ ও মহিলার। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে পুরুষতান্ত্রিক চেতনা প্রভাববিস্তার করেছে এবং আধা-সামন্তান্ত্রিক চিরাচরিত মূল্যবোধ রক্ষার্থে নারীর ওপরে জননী/স্ত্রী-র অতিরিক্ত গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে- এমন উদাহরণও বিরল নয়। পারুল কনকরা তবু স্বতন্ত্র এই জনোই যে তাঁরা সীমাবদ্ধ পরিসরে থেকেও প্রতিমুহূর্তের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সরব এবং শাসকসংস্কৃতির চাপিয়ে দেওয়া অবক্ষয়ের সাথে যুদ্ধে চলে। মণিমোহন-বিনয়ভূষণ এবং পারুল-কনক একইসঙ্গে বহির্জগত এবং অন্তর্জগতের প্রবল টানাপড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও আগলে থাকেন সংস্কৃতি এবং আগলে রাখেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশাটুকু। কনক ও মণিমোহনের কথোপকথনের পরিসরে পার্টি-পরিবার, ব্যক্তি-সমাজ ও সংস্কৃতি-রাজনীতির দ্বন্দ্বগুলি প্রধান হয়ে ওঠে। মণিমোহন কনককে বৃহত্তর আদর্শ-সমাজতন্ত্র-দেশ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে বললে প্রত্যুত্তরে কনক বলে,

“তোমার দেশ আছে, পৃথিবী আছে, মানবসভ্যতা আছে। রাগ করো না গো। এই ছেলেমেয়ে দুটো আর তুমি ছাড়া আমার যে কিছু নেই।” (২৬৩) অজয়-বিজয়ের মায়ের সঙ্গে মিতু-বাবুয়ার মায়ের তফাৎ থাকেনা এই পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ যেমন কাবুলিওয়ালা আর মিনির বাবার মধ্যে সমস্ত পিতৃহৃদয়ের কেন্দ্রাতিগ অভিমুখ দেখেছিলেন। তেমনি, পারুল-কনকদের মধ্যেও সব মাতৃহৃদয় প্রকাশ পায়। বিনয়ভূষণের মতো মণিমোহনের আক্ষেপ কনকের আত্মত্যাগ নিয়ে।¹¹¹ আর, কনকের অস্বচ্ছল পরিবেশে ‘বাধ্যতঃ’ অভিযোজিত হওয়ার জন্যে মণিমোহনের আত্মবিলাপের মধ্যেই তার আত্মমোক্ষণ সম্পূর্ণ হয়। এও উল্লেখ্য যে, রাজনীতি ও মতাদর্শকে ঘিরে এই আত্মমোক্ষণ পূর্ণতা পায়। দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণে রাজনৈতিক অনুশীলনের খারাপ দিকগুলি বর্ণনা করেও আখ্যান ও চরিত্রদের রাজনৈতিক অভিমুখ থেকে বিমুখ করেন নি দীপেন্দ্রনাথ। ‘নিজের পায়ে নিজের পথে’ সংকলন থেকে জানা যায় যে, ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, “আমাদের সমাজে নারীর স্থান আর কতটুকু? সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী তো এঁরাই। আমি এঁদের মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।” (ঘটক ২০১০, ৭৯)। ঋত্বিক বিভিন্ন লোকগীতি, মিথ্ এবং প্রতীকের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রে এঁদের ব্যক্ত করেন। ঋত্বিক ‘মাদার আর্কেটাইপ’-এর রূপায়ণ ঘটান চলচ্চিত্রে। দীপেন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও গল্পে এই ‘মাদার আর্কেটাইপ’ এসেছে। ‘তৃতীয় ভুবন (১৯৫৮)’ উপন্যাসে একটি সংসারকেন্দ্রিক নারীজগৎ বিশ্লেষণ করতে চান দীপেন্দ্রনাথ। অস্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের জয়তী সংসারের তাগিদে একইসঙ্গে চাকরি ও পড়ার দ্বিবিধ পথ বেছে নেয়। একদিকে তার সাংসারিক জগৎ যেখানে মা-বাবা-বোন এবং তার সংসার। অন্যদিকে তার চাকুরিক্ষেত্র ইস্কুলের জগৎ যেখানে অন্যান্য সহশিক্ষয়িত্রীদের সাথে এবং ছাত্রীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। আর, সর্বোপরি, তার কলেজ ও রাজনীতির জগৎ যেখান থেকে সে সমাজের মুক্তির স্বপ্ন দেখে এবং তার চেনা পরিসরকে পাল্টাতে চায়। ব্যক্তিগত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ ও বাস্তবতার ধারণা লাভ করে সে। জয়তী সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিস্পর্ধা জানায় এবং রাজনৈতিক চেতনা থেকেই ব্যক্তিজীবনের অনুশীলন করে।

কনক-পারুলের মতো আত্মত্যাগকেই ‘আদর্শ’ বলে মনে করে না সে, বরং প্রতিবাদী সত্তা হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে জয়ন্তী মায়ের চিরন্তন রূপ উপলব্ধি করতে পারে, যে মা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজেকে গড়ে নেয়। ক্ষমতা হস্তান্তরোত্তর ভারতে এক আটপৌরে বাঙালি মা-কে তাঁর মেয়ে আবিষ্কার করে,

এই হলেন মা। দুর্বল। কোনও ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত নেই। সকলের মতে সায় দিয়ে, পক্ষ নিয়ে, সব কিছু সহ্য করে তিনি সংসারে শান্তি চান।... মা আজ পর্যন্ত থিয়েটার দেখেননি। যাদুঘর দেখেননি।... দু-দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে, বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদের দেশে পৃথিবীর উপনিবেশ গড়ার পরিকল্পনায় মশগুল। মা জানেন না পৃথিবী কোথায় এগিয়েছে, কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। মা রবীন্দ্রনাথ পড়েননি, যামিনী রায়ের ছবি দেখেননি, কর্ণার্জুন ও পথের পাঁচালির তফাৎ খেয়াল করেননি- অথচ তিনি এই উনিশশো সাতান্ন সালে বেঁচে আছেন। দু-দুবার সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।... কী আশ্চর্য বিরোধ, কী আশ্চর্য দ্বন্দ্ব। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ৯৮-৯৯)

প্রতিমুহূর্তে সমষ্টিসমাজ বা সমষ্টিপ্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে নির্মিত হয় দীপেন্দ্রনাথের আখ্যানবিশ্ব। এই আখ্যানগুলি অরাজনৈতিক হয়ে যায় না। দীপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক গল্পেও ‘জননী’-ভূমিকা এসেছে বহুবার। ‘উৎসর্গ (১৯৬২)’ গল্পে এক মা ভয় পান তাঁর আসন্নসন্তানের কথা ভেবে। প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে থাকে ভয়, তেজস্ক্রিয়তার। হিরোশিমা-নাগাসাকির পরে এক আণবিক সময়- ৫০-র দশক। ধনতান্ত্রিক ক্ষমতামূলী দেশগুলো পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষা করছে, তাদের বাধা দেওয়ার অজুহাতে সমাজতান্ত্রিক দেশও পাল্টা পরীক্ষা করছে। প্রকৃতিতে মিশেছে ভয়ানক বিষ। অনিমেঘ-ইন্দিরা ভদ্রবৃত্তের আধুনিকমনস্ক এবং তারা নিয়মিত দেশী-বিদেশী জার্নাল পড়ে। তারা চারপাশের আলোচনায় সক্রিয় মতামত বিনিময়ে দুনিয়াদারির খবরাখবর জানে। তাই ইন্দিরা ভয় পায় রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট পড়ে, হলডেনের দেওয়া তথ্যে- প্রজন্মান্তরে তেজস্ক্রিয়তা প্রবাহিত হয়ে বিকলাঙ্গ অসুস্থ শিশু জন্মাচ্ছে পৃথিবীতে। তার সন্তানও যদি

অস্বাভাবিক হয়, যদি তেজস্ক্রিয় বিষের প্রভাব তারই রক্তে রক্তে বংশধারায় প্রবাহিত হয়? মাতৃত্বের ব্যক্তি-অনুভূতির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতা ঢুকে পড়ে।¹¹² অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং অশান্তিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের প্রধান উপপাদ্য। অনিমেষের সঙ্গে গর্ভবতী ইন্দিরার সংলাপ,

সব সময় মনে হয় যে-ষড়যন্ত্র চলছে, তা আমার গর্ভকে গ্রাস করবে। সে আমার কত বড় পরাজয় ভাবতে পারো? জন্মের দায় কী কঠিন! বাতাস, মাটি, জল, খাদ্য, শরীর-বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু অপ্রিহার্য, তাতে আমার ভয়। আমি একা এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমি যে মা হতে চলেছি। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫, ৪০১)

আর, ক্রমশঃ সেই মা এক বিপন্ন সভ্যতার প্রতীক হয়ে ওঠেন। সেই বিপন্নতার প্রতীককে কথক রাজনৈতিক সচেতনতায় বদলে যেতে দেখে, “বৃহত্তম প্রতিনিধি দল আমেরিকার এক জননী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি মানুষের পক্ষে, আমার দেশবাসীর পক্ষে, পৃথিবীর পক্ষে ধিক্কার দিই আমার সরকারকে। আমি জননী, ধিক্কার দিই।” (তদেব) পরিচিত বৃত্তে থেকেও, চিরাচরিত ধাঁচা (stereotype) ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে মা-এর অন্য এক প্রতিরোধী রূপ। নবারণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে মাতৃসত্তা নিয়ে উপস্থিত থাকেন জ্যাঠাইমা। বিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু বাবু-সংস্কৃতির রক্ষণশীল পরিবারের বড় বৌ। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল বাবুয়ানির ফলাফলে যাঁর সারাজীবন প্রায় ব্যর্থ। তাঁর ছোটছেলে ধর্মলালকে মানুষ করার ব্যর্থতা কুড়ে কুড়ে খায় তাঁকে। তাঁর সমস্ত স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্য বর্ষিত হয় অনাথ হারবার্টের ওপরে। হারবার্টকে সমর্থনের মধ্যে দিয়েই তিনি অনৈতিক ছোট ছেলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। হারবার্টের যাপনকে প্রশ্নয় দিয়ে তিনি বাবুয়ানির ধাঁচার বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন আওয়াজ তোলেন। এবং, হারবার্টের সাথে নিজের স্মৃতি ভাগ করে নিয়েই তিনি বর্তমান থেকে মুক্তি খোঁজেন। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’ উপন্যাসের মেখলা শুধুমাত্র রণজয়ের আশ্রয়স্থল নয়। রণজয়কে কেন্দ্র করেই শুধুমাত্র তার জীবন আবর্তিত হয় না; কনক বা পারুলের যেমন হয় মণিমোহন বা বিনয়ভূষণকে কেন্দ্র ক’রে। মানসিক

বিপর্যয়ের পরে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি রণজয়ের আশ্রয়স্থল শুধুমাত্র মেখলা নয়, বরং কৌশিক এবং ডাক্তার দামও। মণিমোহন বাবুয়া-মিতুকে কমিউনিস্ট মূল্যবোধে বড় ক'রে তোলার যে স্বপ্ন লালন করতেন প্রতিকূল বাস্তবে, রণজয়ও তেমনই স্বপ্ন লালন করে কোবার জন্যে। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' উপন্যাসে রণজয় ও মেখলার জীবনযাপন ও চেতনা স্বতন্ত্র; রণজয়ের মতাদর্শ ও উইশফুল থিঙ্কিং মেখলাকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

নারীরা বিপ্লবী পুরুষের যত্ন ও সেবা করলেই 'মহান' হয়ে ওঠে, মাতৃত্ব ও সেবাময়ী ভাষার সত্তায় তারা মহান- পুরুষতান্ত্রিক দমনমূলক আধিপত্যের বিপরীতে এই ভাবনাও আসলে নারীদের সত্তা ও অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ রাখে। 'কালবেলা' উপন্যাসে অনিমেষের অনুতাপ হয় মাধবীলতার গর্ভে সন্তান এনে দেওয়ার জন্যে। "সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই, অতীতটাকে নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে এভাবে থাকতে মেয়েরাই পারে" (২৮৫) অনিমেষের বকলমে লেখকের এই ভাবনার মধ্যেও চিরন্তন পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব- আত্মত্যাগ ও কষ্টস্বীকারই নারীদের একমাত্র অস্তিত্বের পরিচায়ক। অনিমেষের সহবন্দি দীপকের মা-র কষ্টস্বীকারও এই ভাবনা থেকেই বিবৃত হয়। সত্তর-দশক পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক উপন্যাস (কমিউনিস্ট প্রোটোগনিস্ট বা অন্যতম প্রধান কুশীলব যে আখ্যানে আছে) রচনায় যে ধাঁচকে জনতোষী ক'রে তোলা হয়, তাতে কমিউনিস্ট প্রোটোগনিস্ট পলায়নবাদী, দায়িত্ববিমুখ ও হতাশাগ্রস্ত এক চরিত্র। উপন্যাসের অন্তিমপর্বে অনিমেষের চিন্তাসূত্রে এই প্রসঙ্গ এবং রাজনীতি-বিমুখতা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

নকশালবাড়ি আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাসের কিছু বিশেষ নজরটান

সত্তর দশক পরবর্তী উপন্যাসে পাঠক আখ্যানপাঠে সচেতন হন বিশেষ কিছু নির্যাতনপদ্ধতি ও পুলিশিভাষার সঙ্গে। কচুয়া ধোলাই- ছেলেটির পায়ের গোড়ালি দুটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। (২০৫) 'যুদ্ধ

পরিস্থিতি'-র বসাক কখনো নকশাল বলত না, বলত 'লুড়কুৎ'। চোদ্দ থেকে ষোল- 'লুংকু'। ষোল থেকে আঠার- 'গাঁজ'। আঠারো অতিক্রম করার পর ক্রমানুযায়ী- 'ডগা', 'ভাইডু', 'কোণ্ডা' ইত্যাদি। দেবী রায়ের ডানহাত বসাক নিত্যনতুন নির্যাতনপদ্ধতি প্রয়োগ করত, যা যে কোনও দেশের যে কোনও শাসকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। আঙ্গুলে পিন ফোটানো, পিছনে রুল ঢোকানো, গাঁটে গাঁটে লাঠির বাড়ি- এগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত জেরাপদ্ধতি।¹¹³ দ্রোণকে মিলিটারি ও পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরে থানায় শারীরিক নির্যাতন করার সময় নির্যাতনের পদ্ধতি বিস্তৃত বিবরণ দেন কথক। দ্রোণকে যে ভঙ্গিতে টেবিলে গুইয়ে যে পদ্ধতিতে নির্যাতন করা হয়, তার পদ্ধতি বাস্তব কিন্তু সাহিত্যের শালীনতায় খুব বেশি ব্যবহৃত নয়।¹¹⁴ 'খোঁচড় (১৯৭১)' গল্পে পুলিশি ব্যবস্থার ও ভূয়ো সংঘর্ষে হত্যার যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে পুলিশ-খোঁচড়ের নিজস্ব ভাষা ও সাংকেতিক ভাষার হৃদিশ থাকে। অপরাধ জগতের ভাষা পুলিশের মুখে এঁটে যায়। নবাবরুণের গল্পে খোঁচড় পুলিশেরা নিজস্ব স্বর নিয়েই উপস্থিত। 'খোঁচড়' গল্পে পুলিশের খোঁচড় ও অফিসারের এনকাউন্টার করতে যাওয়া, লাশ গায়েব ক'রে দেওয়ার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও রয়েছে। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র বসাকের প্রতিক্রিয়া এরা, তাই ভাষাতেও মিল- "শালা! লুড়কুৎগুলোকে মেরে মেরে হাত পচে গেল" (৩৯)। নবাবরুণ যে এদের নিজস্ব ভাষা নিয়ে সচেতন, সেই ইঙ্গিতও গল্পে থাকে; এক অধ্যাপক থানায় থানায় ঘুরে চোরডাকাতের কথা, রাজনৈতিক অপরাধীদের কথা ও পুলিশের কথা সংগ্রহ করে- "আই.বি.রে কয় খোঁচড়, পিস্তলের কয় চেম্বার... এইসব লোয়ার ক্লাস কথা আর কি..." (৩২)। বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্য বিশেষতঃ রাজনৈতিক সাহিত্য এই 'লোয়ার ক্লাস কথা' নিয়ে সচেতন ছিল না। সত্তর-দশক পরবর্তী উপন্যাস-গল্প এগুলি সাহিত্যের বাস্তবতায় নিয়ে এল। 'আটটা নটার সূর্য (২০১৩)' উপন্যাসে নিরুপম কিংবা পাঞ্চগলীর ধরা পড়ায় খোঁচড়ের সক্রিয় ভূমিকার উল্লেখ থাকে। বস্তুতঃ ষাটের দশকের শেষ থেকে এই খোঁচড়-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয় রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের স্বার্থে। এদের ভাষা, কর্মবিস্তার, আচরণ ও উচ্চ-অধস্তন সম্পর্ক নবাবরুণ ও অশোককুমার বিস্তারিত উল্লেখ

করেছেন তাঁদের গদ্যে। নিরুপমের গ্রেগোরির পরে থানায় তার ওপর অত্যাচারে পুলিশের ভাষা-আচরণ,¹¹⁵ পাঞ্চালীর ওপরে অত্যাচারের ভাষা ও দ্রণাচার্যকে অত্যাচারের পদ্ধতি বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যকে ভদ্রবৃত্তের পাঠাভ্যাস থেকে বের ক'রে আনে। নবাবুণ ভট্টাচার্যের গল্পে-উপন্যাসে মিলিটারি অত্যাচার-পদ্ধতি, যুদ্ধবিজ্ঞান ইত্যাদির রেফারেন্স বহুব্যবহার এসেছে। 'ম্যালোরি (১৯৯৯)' গল্পে জ্যান্ত কাঁকড়াকে ডিপ-ফ্রিজে ঢুকিয়ে মেরে ফেলার হিমশীতল মস্তিষ্কের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি অফিসারকর্তৃক রেড আর্মির দু'জন সেনাকে অতিশীতল ঘরে বন্ধ ক'রে মারার নিষ্ঠুরতার তুলনা দেন।¹¹⁶ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা, হিমশীতল অপরাধমস্তিষ্ক ইত্যাদি যে 'স্বাভাবিক', তা 'টয়' গল্পের মনস্তত্ত্ববিদও বলে।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে লেখা উপন্যাসে আরও কিছু কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' উপন্যাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রামে যায় শ্রেণিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে। উপন্যাসে আসে 'টেক নেম' বা ছদ্মনামের প্রসঙ্গ, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর থেকে আত্মপরিচয় গোপন করতে 'টেক নেম' ব্যবহার করতেন কমিউনিস্টরা- অনিরুদ্ধ বাগচীর নাম হয় রঘু। রঘু 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো' এবং 'ভোটের বদলে বিপ্লবী পার্টি গঠন ও সশস্ত্র বিপ্লব'-এর নীতিতে বিশ্বাস রেখে ক্ষেতমজুরদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন ছেড়ে গ্রামে যায়। জোতদার+পুলিশ বনাম কমিউনিস্ট পার্টি+ক্ষেতমজুর মূল দ্বন্দ্বের পাশাপাশি অন্য দু'টি ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা- ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শ্রেণিশত্রু হত্যার কৌশল বেছে নেয় এবং মধ্যশ্রেণির শহুরে রাজনীতি আখ্যানে ধীরে ধীরে ক্ষেতমজুরকেন্দ্রিক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। 'শ্রেণিশত্রু খতম' কৌশলটি বাইরে থেকে চাপিয়ে দিতে হয় না, বরং শোষিত ক্ষেতমজুরদের গুণগত উত্তরণের মধ্যে দিয়েই তা কার্যকরী হয়। শহুরে মধ্যশ্রেণিভুক্ত রঘুর মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মসমালোচনা এবং নৈরাশ্য থেকে মুক্তি ক্রমশঃ আখ্যানের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। নির্মল ঘোষের মতে, স্বর্ণ মিত্র রাজনৈতিক তত্ত্বের ছকে আখ্যানকে বেঁধে ফেলেছেন বলে তা বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব হয়ে ওঠেনি, বরং লেখকের

মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছের প্রতিফলন হয়ে গেছে।¹¹⁷ কৃষকের ভাষা ও চেতনার সঙ্গে রঘুর একাত্ম হয়ে যাওয়া লেখকের মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছে থেকে চাপিয়ে দেওয়া- শহুরে বুদ্ধিজীবী+ছাত্রদের তত্ত্ব সর্বস্বতার জন্যই উপন্যাসটি পাঠকের মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত অবশ্য মনে করেন যে, এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে আখ্যানের সত্য উপস্থাপিত হয়েছে।¹¹⁸ আখ্যানগত গুণাবলী, যুক্তিপূর্ণম্পরা এবং মতাদর্শমিশ্রিত কুশীলবনির্মাণে উপন্যাসটিকে নকশালবাড়ির রাজনৈতিক দশকের যথার্থ প্রতিফলন মনে করেছেন। আর, আখ্যানের ভাষায় বিস্তৃত কাব্যিক উপাদানসমূহ “links up with the tormented reality as its counterpoint.” (Dasgupta 2018, 271) ‘এভাবেই এগোয়’ উপন্যাসে আসে ‘টেক-নেম’-র প্রসঙ্গ। ‘পুরনো পরিচয় মুছে ফেলতে হবে’ বলে গৌতম নতুন নাম নেয় অশোক। গোপন রাজনৈতিক সংগঠনে এই এক উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’তে রণজয়ের সঙ্গে যে পুরনো কমরেডের পুনর্সাক্ষাৎ হয়, তাকে ‘মিলন’ টেক-নেমে চেনা যায়। সাংগঠনিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে টেক-নেম প্রসঙ্গ ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসেও আসে। “এখন কোনো নামের শেষে পদবী নেই... নাম শুনে পুলিশ তো নয়ই, তুমিও চট করে বুঝে উঠতে পারবে না আসল লোকটি কে” (৩২০)- এই টেক-নেম বা ছদ্মনাম কোনও কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক গোপনীয়তার অনিবার্য বিষয়। দোপ্দি মেঝেন ‘অগ্নিগর্ভ’ আখ্যানে বসাই টুডুর সহযোদ্ধা। বসাই টুডু যদিও সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার পরে সিপিআই (এম-এল) পার্টিতে যোগ দেয়নি বলে জানায়, কিন্তু দোপ্দি মেঝেনের যুদ্ধনীতি ও কৌশল সিপিআই (এম-এল) পার্টির অনুসারী। দোপ্দি মেঝেনকে ধরতে সশস্ত্র সেনাবাহিনী মজুত হয়, তারা চিরুনিভল্লাশি চালায়। সেই মুহূর্তে দোপ্দি মেঝেনের ছদ্মনাম জানা যায়- উপী মেঝেন।¹¹⁹ দুর্লভা মাঝির নতুন নাম মাতং মাঝি। সংগঠন থেকেই তাদের এই নাম ধার্য হয়েছে। দোপ্দি মেঝেন নিজের আসল নামে সাড়া দেয় না।

নকশালবাড়ি আন্দোলনকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে শহরের ও শহরতলির বিশেষ কিছু অঞ্চল গুরুত্ব পেল। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কলোনি, বস্তি এবং নিম্নবিত্ত জনবসতির ছবি আখ্যানের

কৌশলগত স্তরে বিশেষ স্বীকৃতি পেল। সময়ের দলিলীকরণে এই আঞ্চলিক উল্লেখ জরুরি। উদ্বাস্তু কলোনিগুলির আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের গণসংগঠনগুলির অতিসক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একদিকে নিজেদের অস্তিত্ব ও দখলীকৃত জমি আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা, অন্যদিকে দ্রুত বিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিকতায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার লড়াই কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অভিমুখ পেয়েছিল।¹²⁰ উদ্বাস্তু শরণার্থীদের নিয়ে তৎকালীন শাসকশ্রেণির অস্বস্তি যত বেড়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের সমর্থনও তত বেড়েছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে দু'টি বিচ্ছেদের পরে ত্রিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটিতেই তাঁদের প্রচুর সদস্য সমর্থক ছিল। তাঁরা শহরের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ছিলেন। “The refugees thus not only became the surrogate proletariat in these movements but also gave it the revolutionary edge that was needed to take these movements forward” (Banerjee 2018, 47) ‘কালবেলা’ উপন্যাসে ১৯৬৭ সালের রাজনৈতিক পটভূমি বর্ণনায় লেখা হয়- “কলকাতা শহরের আশেপাশে ছোট ছোট দল তৈরি হয়ে গেল। একদিকে দমদম, সিঁথি, বরানগর, বেলঘড়িয়ায়, অন্যদিকে বেলঘাটা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ এলাকায় কাজকর্ম জোরদার হতে লাগল।” (মজুমদার ২০০৪) প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলি কলকাতার উত্তর অংশের উদ্বাস্তু-সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকাতেও উদ্বাস্তু কলোনি প্রচুর। ‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসে বেলঘাটার নিম্নমধ্যবিত্ত বস্তি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি। প্রশাসনিক মদতে ব্রতী, সমু, বিজিত, পার্থ, লাণ্টুদের ওখানেই হত্যা করে শাসক দলের গুপ্তারা। সুজাতা তাঁর সন্তান ব্রতীর মৃত্যুর পরে ব্রতীকে আবিষ্কার করেন ওই বেলঘাটার বস্তি অঞ্চলে এসে। উচ্চবিত্ত-অভিজাত-ভদ্রলোক পরিবেশে নয়, ব্রতীর রাজনৈতিক অনুশীলনের উল্লেখযোগ্য পর্ব এমন পরিবেশেই প্রাণ পায়। উপন্যাসের ‘দুপুর’ অধ্যায় শুরু হয় উদ্বাস্তু কলোনির ইতিহাস ও আর্থ-সামাজিক বিকাশের ছবি দিয়ে।¹²¹ কলোনিকে আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা ‘অন্য কলকাতা’কে আবিষ্কার করে এবং সেই কলকাতার

প্রান্তিকায়িত মানুষদের খুঁজে পায়। সমুদ্র মা উদ্বাস্ত, তাঁর ভাষায় পূর্ববঙ্গের বরিশালের ভাষার ছাপ। সুজাতার আর্থ-সামাজিক বন্দোবস্ত ভেঙে কলোনি-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এই চেষ্টার মূলে ব্রতীর রাজনীতি। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ বেলেঘাটার কলোনি এবং তৎসংলগ্ন ছোট ছোট কলের পটভূমিতে সত্তর দশকের রাজনীতিকে ধরে রাখে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শরণার্থী পরিবারের গোরার সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সহযোদ্ধা হয়ে ওঠে সোনা-সুকু-মিনুরা। অসীম রায়ের ‘শ্রেণিশত্রু’ গল্পে শহরতলির কলোনি অঞ্চলের ছবি- নকশালবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা উঠে আসে। হেডমাস্টার চিন্তিত হন, “কদিন এই তাজা রক্ত ঝরবে কলোনিতে?” যুযুধান পক্ষ রমেন ও নন দু’জনেই কলোনির যুবক। নন শ্বেত সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হবার পরে কলোনি জুড়ে বৃষ্টি নামে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে আসে। এই দৃশ্যপটের সঙ্গে তুলনীয় মণিভূষণ ভট্টাচার্যের ‘গান্ধীনগরে রাত্রি’ কবিতাটি। সেখানেও কলোনির ছেলে গোকুল পুলিশের দ্বারা ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত হওয়ার পরে কলোনিতে আগুন জ্বলে না- রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি পংক্তিতে কবিতাটি শেষ হয়- সত্য-সুন্দরের সঙ্গে বীভৎস হত্যার দ্বন্দ্বিক দৃশ্যপটে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্রোতের সঙ্গে (১৩৫৮)’ উপন্যাসে স্বরাজপ্রসাদ ও আনন্দপ্রসাদ পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা যুবক- স্বরাজপ্রসাদ বামপন্থী রাজনীতি শুরু করেও রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস হারায় “চুলায় যাউক পলিটিক্স- এই সমস্ত আবর্জনার মধ্যে আমি আর নাই” (গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭২, ৩১)। কিন্তু আনন্দপ্রসাদ নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সর্বাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী। মূলতঃ মধ্যবিত্ত পরিসরে ঘুরপাক খাওয়া প্রতর্কণগুলি এই উপন্যাসের উপজীব্য হলেও উদ্বাস্ত জীবনের সংকট, কুশীলবদের ভাষায় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের বয়ান উল্লেখযোগ্য। সুজাতার সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান, সুজাতার বিপ্লবী পার্টিতে সক্রিয় ভূমিকার সঙ্গে তার পারিবারিক যাপনের দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিতে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ অস্বীকার ক’রে রাজনীতির পথ বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “আমি মার্ক্সিস্ট” বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।¹²² তার ব্যক্তিগত জীবনের আপস

ও আপসহীনতার দ্বন্দের সঙ্গে ১৯৬৪-র পার্টি বিভাজন মেলাতে পারার মতো চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার যাত্রাপথ ষাটের দশকের শেষভাগের আখ্যানকে গতিশীল করে। ‘শোকমিছিল’-এর মতো এই উপন্যাসেও দুই ভাই স্বরাজপ্রসাদ ও আনন্দপ্রসাদ নিজেদের মতাদর্শ নিয়ে পরস্পরবিরোধী তর্কে জড়ায়। আনন্দপ্রসাদ সংসদীয় বামপন্থী স্বরাজপ্রসাদকে প্রশ্ন করে- “লেনিনের মিসইন্টারপ্রেট কইর্যা প্রোলেটারিয়ান রেভল্যুশনের দফা তোমরা শ্যাম কইর্যা আনছ।” (গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৭৮, ১৮০) ব্যক্তি স্বরাজ না, তার পূর্বতন দল সিপিআই (এম)-র প্রতি রাজনৈতিক প্রশ্ন করে আনন্দ। উদ্বাস্তু শরণার্থীদের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যে সক্রিয় ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ‘শোকমিছিল’-এ। দেশভাগের পরে শরণার্থীরা রেললাইনের পাশে জলা আর জঙ্গল পরিষ্কার ক’রে বসতি গড়ে, জমি-মালিক নস্করদের বিরুদ্ধে লড়াই ক’রে জমি নিজেদের দখলে রাখে এবং অনেকের শাহাদাতের পরেও বাকিরা জীবন বিপন্ন ক’রে কংগ্রেস-পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে লাল পতাকা ওড়ায়।¹²³ পঞ্চাশের দশকে বিনয়ভূষণের বক্তব্যে উদ্বাস্তুদের সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে কলোনি ও কলোনি-সংলগ্ন ছোট কারখানাগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত তৈরি করেছিলেন বিনয়ভূষণ, নীহার, যশোদারা। পলা ব্যানার্জী ও সুচরিতা সেনগুপ্ত শরণার্থীদের অধিকাররক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত জমি ও রাজনীতির প্রশ্নগুলির বিশ্লেষণ যেভাবে করছেন¹²⁴, বিনয়ভূষণের ভাষে তার নির্যাস পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের প্রশ্ন, দেশের জল-জমিতে অধিকার এবং কলোনির আর্থ-সামাজিক বিকাশের প্রশ্নগুলি থেকে ষাট-সত্তরের দশকে কলকাতা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম কীভাবে পুষ্ট হয়েছে তা বিনয়ভূষণের চেতনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে পাঠক জানতে পারে। বিজয়ের নেতৃত্বে নকশালপন্থী কমিউনিস্ট ও অজয়ের নেতৃত্বে সিপিআই (এম) পার্টির যুব-গণসংগঠনের মধ্যে এই কলোনির রাজনৈতিক অধিকার দখলের লড়াই শুরু হয় সত্তরের দশকের শুরুতে। বিনয়ভূষণ অবিভক্ত সিপিআই থেকে সিপিআই (এম) পার্টিতে এসেছেন, কিন্তু অবিভক্ত সিপিআই-এর

রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শগত সংগ্রামের স্মৃতি বহন ক'রে চলেন। তাঁর চেতনায় কলোনির গড়ে ওঠা, সংগ্রাম, লাল পতাকার সম্মানরক্ষার শ্রেণিদ্বন্দ্ব যেভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে তা অন্যরকম।

‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে রাজনৈতিক সমস্যার আরও কিছু উল্লেখ থাকে, যে সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে প্রবহমান। এই সমস্যাগুলি রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিতকরণ জরুরি, কারণ লেখক ও পাঠক একুশ শতকের কালস্থানিকতায় তা পাঠ করছে। পাঞ্চগলীর সঙ্গে যৌন কু-ব্যবহার ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে প্রৌঢ় ঘনশ্যাম, সে পার্টির সমর্থক। আর, নিরুপম-পাঞ্চগলী তারই বাড়িতে শেল্টার পেয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় ক'রে। পাঞ্চগলী নিরুপমের সেরে ওঠার অপেক্ষায়, পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চুপ ক'রে মেনে নেয় ঘনশ্যামের যৌনইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল ব্যবহার ও সম্মতিহীন স্পর্শ।¹²⁵ আর, উদাহরণ হিসেবে চীনের মেয়েদের কথা, ভিয়েতনামের মেয়েদের কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার কথা মনে করে। বিপ্লবের স্বার্থে ও বিপ্লবী পুরুষের স্বার্থে চুপচাপ সব কিছু মেনে নেওয়ার এই ‘ঐতিহ্য’ বিপ্লবের প্রত্যেক কতদিন স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত থাকবে?— এই প্রশ্ন সত্তর দশকের পাঞ্চগলীর স্বরে তুলে আনেন একুশ শতকের প্রথম দশকের এক ঔপন্যাসিক। ঘনশ্যাম ধারাবাহিক দোষী (serial offender) ছিল বলে রুবি, জয়া ও অন্যান্য মহিলার প্রতি অশালীন আচরণ করে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন শুধু নয়, পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নের সমস্যা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকের মধ্যেও যে থাকে তা অশোক মুখোপাধ্যায় চিহ্নিত করছেন এই নারীদের স্বরে। এবং একইসঙ্গে পার্টি অভ্যন্তরে তা শাস্তির ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু, এখানেই পাঞ্চগলীর প্রতিবাদী নারীবাদী স্বর আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় কারণ, (১) পাঞ্চগলী এই সমস্যাতে ব্যক্তি ঘনশ্যামের সমস্যা নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে; (২) ঘনশ্যামের মৃত্যুদণ্ড রদ ক'রে রাজনৈতিক শাস্তি দেয়।¹²⁶ দ্রোণের মৃত্যুর পরে পাঞ্চগলী নিরুপমের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে সবচেয়ে বেশি বাধা আসে তার পার্টির নেতৃস্থানীয় (লিন পিয়াও পত্নী) ভোলানাথের তরফ থেকে। দ্রোণের

শাহাদাতের গৌরবে উজ্জ্বল থেকে পাঞ্চগলীকে আজীবন দ্রোণের স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে হবে- এর'ম এক অলিখিত শর্ত পাঞ্চগলীর ওপরে আরোপ করতে চায় ভোলানাথ। পাঞ্চগলী নিরুপমের সঙ্গে প্রেম করলে দ্রোণের বিপ্লবী ঐতিহ্যের অবমাননা হয়, এরকম কুযুক্তি দিয়ে পাঞ্চগলীর চেতনা ও শরীরের ওপরে নিজস্ব কর্তৃত্ব ফলাতে চায় ভোলানাথ। এই ঘটনা বাস্তবরহিত নয়, রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব থেকে বিপ্লবী দলের সদস্যরাও মুক্ত হতে পারেন না বহুক্ষেত্রে; মল্লারিকা সিংহা রায় তাঁর প্রবন্ধেও এইরকম ঘটনার উল্লেখ করেন,

Rupa, a 'martyr's widow', said that she was severely criticised by her comrades when she decided to enter into a second romantic relationship. This was considered a moral degradation, because her second relationship was an emotional transgression closely linked to her sexual agency. Martyrdom was extended to the living bodies of widows through the transformation of sexual purity and asceticism into revolutionary virtues. (Sinha Roy 2012, 130)

‘কমুনিস’ উপন্যাসে গোরা ভাবে, “নাহয় পাঞ্চগলীর মতো সোনাকেও ওরা হত্যা করেছে। তাতেই কি মিনু নির্মলা হয়ে উঠতে পারে? মেয়েটা এখনও পোড় খাওয়া খাঁ-খাঁ জীবন দেখেনি। ভুখা দেখেনি।” (১১৪) মিনু নির্মলার মতো অকুতোভয়, সাহসী হয়ে উঠতে পারবে কিনা, মিনুর জীবনযুদ্ধ কতটা রক্ষা বাস্তবের অভিঘাত সয়েছে, গোরা তা ভেবে দেবার কে? কিন্তু, গোরাও প্রাথমিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাব এড়াতে পারেনি। যদিও, মিনুকে এই কর্তৃত্বের অধীন করতে চাননি লেখক। তাই জন্যেই গোরার চিন্তাস্রোতে দ্বন্দ্বিকতার ছাপ পড়ে, গোরা মিনুকে বুঝে উঠতে পারে না। “ও বোধহয় সোনার জন্যই নিজেকে উচ্ছুগু করে বসে আছে। ভালোবাসার কাছে উৎসর্গ।” (১৩১) এই ধারণা ভেঙে যায় মিনুর ক্রমবিবর্তনে। মিনু যখন উত্তেজনা ‘টানটান শক্ত’ হয়ে যায়, মিনু যখন পরিণত চেতনায় অভিজ্ঞ সহযোগীদের বলতে

পারে, “হ্যাঁ গোরা দা তোমরা যদি এমনি পাগলের মতো কথা বল। তাহলে... এদেশ আমার, এখানে খুনির জন্যে একইধি জায়গা নেই... তোমরাই যদি খেয়োখেয়ি কর...” (১১৭) মিনুর এই কথাগুলো তাত্ত্বিক নয় কিংবা ‘অ্যাকশনের’ কথা নয়; কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, মিনু এই কথাগুলি বলছে তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপন শেল্টারে বসে এবং কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের (set back) সময়ে এই কথাগুলি অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। আখ্যানের কথনে গোরার চেতনাস্রোতের আধিক্য, গোরার কথনে লেখক কাহিনি বিবৃত করেছেন। গোরার চিন্তাচেতনার দ্বন্দ্বিকতাতেই মিনুর চেতনার বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হতে পারত পাঠক, যদি না রাঘব আখ্যানের স্বরান্তর ঘটাতেন, যদি না রাঘব আখ্যানকথনের মধ্যে কিছু অন্তর্ঘাতী সম্ভাবনা রেখে দিতেন। সেইজন্যেই মিনুকে একজন শহীদের ‘ভালবাসার জন্যে উচ্ছুগুণ্ড’ বলেও প্রোটাগনিস্ট গোরার সংশয় থেকে যায়। গোরা এবং নারায়ণদার পুরুষ-বিপ্লবী কর্তৃত্ব ‘মিনু হয়তো সত্যিই নির্মলা নয় কিন্তু ধরে ধরে শিথিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে চোখা অন্তর হয়ে উঠত’ (১৪৩) এই সম্ভাবনায় নারী-বিপ্লবীর প্রতি পুরুষের ‘দায়বদ্ধতার’ এজেন্সি নিয়ে ভাবিত থাকে। কিন্তু, মিনু শুধুমাত্র শহীদ সোনার প্রেমিকা হিসেবে কিংবা কয়েকজন পুরুষ-বিপ্লবীর সাহায্যকারী হিসেবে নেপথ্য ভূমিকা পালন করতে চায়না; তার স্বর প্রায়ই জেগে উঠে মূল কথনস্বরে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে দেয়। আখ্যানের শেষদিকে এসে মিনু সেইজন্যেই কি ‘নিখোঁজ’ হয়ে যায়? কারণ, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে, পুরুষ-বিপ্লবীদের নির্দেশ ও মনগড়া নির্মাণ দিয়ে তাকে আর আটকে রাখা যায় নি? “মিনুর কোনো খোঁজ নেই” (১৭০) কারণ, গোরা বা নারায়ণদাই শুধু নয়, রাঘব নিজেও মিনুর উত্তরণ-পরবর্তী খোঁজ জানেন না। জয়ন্ত জোয়ারদারের ‘এভাবেই এগোয় (১৯৭৮)’ উপন্যাসে আরেক মিনুর রাজনৈতিক অবস্থানের আখ্যান। উপন্যাসটিতে মিনুর বাস্তবতা, মিনুর উত্তরণ অনেকাংশে প্রাধান্য পেয়েছে। অশোক, মিনু, জহর- এই তিন কুশীলবের রাজনৈতিক চরিত্র হয়ে ওঠা নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি। কিন্তু, মিনুর ‘চরিত্র’ হয়ে ওঠার নেপথ্যে অশোক ও দীপু দুই পুরুষের ভূমিকা ক্রিয়াশীল থাকে। দীপু তাকে ব্যঙ্গ করে, “তোমার পলিটিক্সের কী

খবর? দেশ স্বাধীন হতে আর ক'দিন?” (১২৬) অন্যদিকে অশোক তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দূত হয়ে আসে, অশোকের স্বপ্নের শরিক হতে চেয়ে মিনুর উত্তরণ ঘটতে থাকে দ্রোহী হওয়ার ভাবনায়-ক্রিয়ায়¹²⁷। কিন্তু, মিনুর নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ উপন্যাসে কোথায়? মিনুর বিবর্তন নিশ্চিতভাবেই তার রাজনৈতিক বিবর্তন, কিন্তু, হয় দীপু নয়তো জহর নয়তো অশোক, মিনুর চেতনা-ভাবনা গ্রাস ক'রে এই তিনজনেরই স্বর দ্বারা প্রভাবিত হয় সে। দ্রোহচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে মিনুর “আবার সেই রুটিন। রুটি বেল, তরকারি কোটো, বাসন মাজ, ঘর ঝাঁট দাও। ওঃ, মুক্তি নেই” (১৩৪) মিনু পুরুষকথক ও আখ্যানের পুরুষ-কুশীলবেদের স্বপ্নের শরিক, এমনকি আখ্যানের শেষে সে যে জহরদার চিঠিতে ও অশোকের পুরনো কবিতায়-লেখায় নিজের দায়িত্ব খুঁজে পায়, তাও তো অন্যদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকেই লালন ক'রে চলা। কিন্তু, মিনুর নিজস্বতা এখানে কোথায়?

কল্পনা ও বাস্তবের দোলাচল

সাহিত্যে রসনিষ্পত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ কয়েক শতকব্যাপী। রসতাত্ত্বিকদের মতে, রস হচ্ছে লোকোত্তর-চমৎকার প্রাণ। সাহিত্যপাঠের (কাব্য ও নাটকের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকেরা তা বলেছেন) মুহূর্তে পাঠক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির চিন্তা করেন না এবং পাঠক আখ্যানের ঘটনাকে একাধারে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মেলাতে চান ও মেলাতে পারেন না। দ্বিতীয় অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই বাস্তবের তথা পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারা ও মেলাতে না পারার মধ্যেই লোকোত্তর, বাস্তবোত্তর জগৎ থাকে। আখ্যানের কাল্পনিকতায় বাস্তব জগৎ, প্রাত্যহিক জীবন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পর্ক থাকে না বলেই পাঠক তার সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। এখান থেকেই সাহিত্যপাঠে আনন্দের উদ্ভব, রসের অনুভব। বিশ্বনাথ কবিরাজ ‘সাহিত্যদর্পণ’-এ যে ‘সাধারণীকরণ’-এর কথা বলেছেন, তার দ্বারাই যে বস্তু বাস্তব জগতে

অনিত্য, তা সাহিত্যে (বিশ্বনাথ কাব্যের কথা বলেছেন) নিত্য ও শাস্ত্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায় এখানেই যে, আখ্যানের ভাষা-স্বর-উপাদান যদি কাল্পনিকতার বিমূর্ততাকে অস্বীকার করতে চায়? এখানে কি পাঠকের শ্রেণি অবস্থান ও সামাজিক অবস্থানও এই ‘কাল্পনিকতার দূরত্ব’ নির্মাণ করে? উপন্যাসের-গল্পের প্রোটোগনিস্ট-অ্যান্টাগনিস্টের শ্রেণি অবস্থান এবং আকাজ্জার সঙ্গে পাঠকের শ্রেণি অবস্থান যত দূরবর্তী হয়, কাল্পনিকতাও তত বাড়ে; আবার এই দূরত্ব কমে এলে পাঠকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিকের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হয়। আর, বিশেষতঃ উত্তর-সত্যের যুগে যখন শাসক মতাদর্শ নতুনতুন বয়ানে পূর্বকৃত ঘটনাবলী ও তথ্য বিকৃত করছে শাসনের স্বার্থে, তখন উপন্যাসের আখ্যানবুনন কতটা লোকোত্তরের দূরত্ব বজায় রাখবে? যদিও, স্বীকার ক’রে নেওয়া উচিত যে, কাব্যের রসতত্ত্বের সঙ্গে উপন্যাসকে সম্পূর্ণ মেলানো যায় না কারণ, উপন্যাসের ধর্ম ও কবিতার ধর্ম আলাদা। কিন্তু, কাল্পনিকতা যেহেতু সাহিত্যের প্রাথমিক উপাদান ও শর্ত, ফলে তা কবিতা ও উপন্যাস দুই সংরূপেই উপস্থিত। সনৎ বসু উপন্যাস ও কবিতার মূল তফাৎ করছেন ‘time-factor’ দ্বারা। “কবিতায় এই time-factor non-existent আর উপন্যাসে এইটেই হল প্রধান কথা” (বসু ২৮৯)। তাঁর মতে, উপন্যাসে এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সৃষ্টি হয়, যা বাস্তব জগতের ছোট সংস্করণ। পাঠক সেই জগতের নিছক দ্রষ্টা নয়তো পাঠক ওই জগতের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অনুসরণে নিজেকে কোনও চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আনন্দলাভ করেন। “উপন্যাসের সার্থকতা বাস্তবের সঙ্গে তার যথার্থ সংযোগ” (বসু ২৯০) কবিতার ক্ষেত্রে ‘অনুভব’ সবথেকে গাঢ় উপলব্ধি, এই অনুভবের উপলব্ধির ওপরেই পাঠকের সেই কবিতাকে ভাল-লাগা বা ভাল-না-লাগা নির্ভর করে। সময়ের নির্দিষ্ট কোনও ভূমিকা সেখানে থাকে না। কিন্তু, উপন্যাসে সেই ভূমিকা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, কারণ উপন্যাসের আখ্যান ও কুশীলবেদের নির্দিষ্ট সময়-পরিসর থাকে। সেই সময়-পরিসর এক দিন হতে পারে আবার এক হাজার বছরও হতে পারে, কিন্তু, তা থাকেই। ফলে, কবিতা ও উপন্যাসের ধর্ম আলাদা হয়ে যায়। সনৎ বসু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

বলেছেন যে, “তাই উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে আর কবিতা তার অনেক আগে, ভাষা সৃষ্টির গুথম যুগেই” (২৯০)। কিন্তু, কল্পনা কবিতা ও উপন্যাস দুই ক্ষেত্রেই থাকে। পাঠক কবিতার ক্ষেত্রে কল্পনা ও অনুভবের মাঝে বাস্তবকে আনতে চান না। কিন্তু, উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনার সামঞ্জস্যবিধানের টানাপড়েন চলতে থাকে। সাহিত্য (উপন্যাস) বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সেতুবন্ধন করে। লোকাযত সুখ-দুঃখ, আকাজ্জা-হতাশা, পাওয়া না-পাওয়ার বাস্তব ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে কাব্য লোকোত্তরে ইঙ্গিত করে, কিন্তু, উপন্যাস সেই লোকাযততেই থাকতে চায়। তার একটা কারণ কি এই যে, কাব্যে যে প্রতীকের ব্যবহার হয়, উপন্যাসে তা হয় না? কাব্যে যে অতি-পরিমিত সূক্ষ্মতায় প্রকাশ চলে, উপন্যাসে তার বিস্তৃতি অনেক বেশি? কাব্যে কুশীলব-ভিড় নেই, উপন্যাসে আছে। কাব্যে ঘটনা-বহুলতা ও সময়-ইতিহাসের দ্বন্দ্ব জারিত এক বা একাধিক মূল চরিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সুযোগ নেই, কিন্তু উপন্যাসে তা অবশ্যঘটনীয়। এই পার্থক্যগুলির জন্যেই কি কল্পনা ও বাস্তবের সেতুতে টানাপড়েন চলতে থাকে? সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তাঁর ‘সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা’ প্রবন্ধে লিখছেন,

বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সাহিত্যিককে তার পরিচয় দিতে হয় বলেই, সাহিত্যিক কেবলমাত্র অবাস্তবকে বর্জন করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়। কারণ, যত সমস্যার সৃষ্টি হয়, তত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করা লোকোত্তর সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। সুতরাং কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ অবশ্যসম্ভাবী। (গোস্বামী ৩৬৯)

সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য সঠিক হলেও, প্রশ্ন থেকে যায় একটিই বিষয়ে, তা হচ্ছে, কল্পনার উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথবাবু বাস্তবজীবনের সমস্যা, সামাজিক পরিসরের ঘাত-প্রতিঘাতের উল্লেখ ও বর্ণনা সাহিত্যে থাকে তা স্বীকার ক’রে কল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে বলছেন, ‘কল্পনার সাহায্যে সে

সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়।’ কিন্তু, সাহিত্যিকের কাজ কি সমস্যার ‘সমাধান’ খুঁজে দেওয়া? কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘সাহিত্য সমাজ-বিশেষের হৃদগত প্রতীতির অভিব্যক্তি’- এই সংজ্ঞায়নের বিরোধিতা করেছেন সুরেন্দ্রনাথ,¹²⁸ এবং এই বিরোধিতা যথার্থ। কারণ, ‘হৃদগত’ তো আসলে চেতনারই প্রকাশ এবং সাহিত্যিকের কল্পনা নিরালস্য নয়। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক বিধির সঙ্গে সাহিত্যিকের কল্পনাপ্রয়োগের তুলনা ক’রে তিনি একটি নিদান দিয়েছেন, “সাহিত্যিককেও তেমনি কাল্পনিক সমাধানকে যেখানে সম্ভব ইতিহাসের নজিরের সঙ্গে বা আগম্যমান বিশিষ্ট সামাজিক পরিবর্তন এসে উপস্থিত হলে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে” (৩৭০) এই নিদান কি সাহিত্যক্ষেত্রে থাকতে পারে? কল্পনার সাহায্যে বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজতে গেলে ইলিয়াসের ভাষায় ‘উইশফুল থিঙ্কিং’-কেই প্রাধান্য দিতে হবে। তাতে ‘অথর্’ বা লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রের সম্পূর্ণ প্রয়োগ ঘটবে ও আখ্যানের প্লট-কুশীলব সবই লেখকের মনোবাঞ্ছানুসারী হবে। আর, সাহিত্যের উদ্দেশ্য বা সাহিত্যে কাল্পনিকতার উদ্দেশ্য সমাধান খোঁজা হতে পারে না বা ইতিহাসের নজিরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পাঠককে নির্দেশ দেওয়া হতে পারে না। ‘খোয়াবনামা’-তে ইতিহাসের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ‘নজির’ বারেবারে আখ্যানে এসেছে, কিন্তু ইলিয়াস কোনও সমাধানসূত্র দিতে চাননি, তিনি আখ্যানের কুশীলবদের বাস্তবজীবনের সংকটগুলিকে নিজের মনোবাঞ্ছাগত সমাধানসূত্র দিয়ে রোবটন্যায় ক’রে দিতে চাননি। দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তগুলি সময় ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষকে অশ্বেষণের দিকে পাঠককে এগিয়ে দেয়। কিন্তু, কল্পনার সাহায্যে সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের কিংবা নিম্নবর্গীয় শোষিত কুশীলবদের সংকটের কোনও সমাধান যে তাঁর কাছে নেই, তা উপন্যাসের কথকের বয়ানে স্বীকারও করেন। এক্ষেত্রে, স্বীকার্য যে, বাঘারু বা কেলুর সংকটের গভীরতা বৃহত্তর মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পাঠক সমাজের সংকট নয়। বাঘারু, মাদারির মা যে ‘উন্নয়ন’-র জোয়ারে খড়কুটোহীন হয়ে ভেসে যায়, সেই তথাকথিত ‘উন্নয়ন’-র বাস্তবতাই বরং বৃহত্তর শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজের আকাঙ্ক্ষা (যে পাঠকসমাজের সামাজিক অবস্থান আছে, পাঠকত্বের পরিধির বাইরে

তাঁদেরও আর্থ-সামাজিক দৈনন্দিন যাপন আছে)। বাঘারু-মাদারির মা-কেলু-খেতখেতুদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের দৈনিক বা সাহিত্যগত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার থেকে আলাদা, এমনকি, লেখকের/কথকের প্রতিক্রিয়ার থেকেও আলাদা। কিন্তু, তাঁদেরও বাস্তবতা আছে, বাস্তবতা ও যাপনের সংকট আছে। লেখককে তাই উৎসর্গ-পাতায় লিখতে হয়, “এই বৃত্তান্ত তারা কোনওদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারে জীবনের পর জীবন বাঁচবে” (রায় ২০১৩, উৎসর্গ) সচেতনভাবেই পাঠক-লেখক সম্পর্ক থেকে নিতাই সরকার, আকুলুদ্দিন, যমুনা উরাওনি, রাবণ চন্দ্র রায়ের বাস্তবতা থেকে আলাদা ক’রে নেন দেবেশ রায়। বইটি উৎসর্গ করা ওই চরিত্ররা বাস্তবজগতে আছেন, বাঘারু বা মাদারির মা কল্পনাসৃষ্ট; কিন্তু, পাঠক হিসেবে ক্রমশঃ বুঝে যাওয়া যায় যে, নিতাই-আকুলুদ্দিন-যমুনাদের আদলেই বাঘারু বা মাদারির মা নির্মিত হয়েছে। সাহিত্যে বাস্তবতার বিশ্লেষণে দেবেশের বক্তব্য,

উপন্যাসে বাস্তবতার যে প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে এমন আর কোনো শিল্পকর্মেই ঘটে না।

এমনকি আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসে বাস্তবতাকে ভেঙে ফেলার যে চর্চা, তাতেও ভেঙে ফেলার জন্য একটি বাস্তবের আশ্রয় উপন্যাসের দরকার হয়। এই বাস্তব, উপন্যাসে আসে একমাত্র উপন্যাসিকের মধ্য দিয়ে। যেখানে উপন্যাসিক একই সঙ্গে উপন্যাসের বাস্তবতার কনডুইট, আবার সেই বাস্তবতার বিন্যাসের শিল্পী। (রায় ২০০৬, ১৩৯)

সনৎ বসু যে যুক্তিতে উপন্যাসের ধর্মকে কবিতার ধর্ম থেকে পৃথক করছেন, দেবেশ সেই আলোচনাকেই এগিয়ে দেন আরও। সনৎ তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসের ‘realism’ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে চারটি মূল বিষয়ের কথা বলছেন, তার মধ্যে অন্যতম “উপন্যাসের চরিত্রগুলির সমাবেশ হওয়া দরকার বাস্তব সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে... চরিত্রগুলিকে এমন করে আঁকতে হবে যেন বাস্তবের সঙ্গে তার মিল থাকে” (বসু ২০১৩, ২৮৮) অর্থাৎ, কল্পনা সাহিত্যের ভিত্তি একথা অনস্বীকার্য হওয়া সত্ত্বেও, বাস্তবতার যথেষ্ট প্রতিফলন উপন্যাস ধারণ করে। বড়বাবুর

চরিত্রচিত্রণে রুশ গৃহযুদ্ধের প্রতিফলন প্রকট। কিন্তু, অনিমেস বা রণজয় বা গোরার চরিত্রচিত্রণে ষাট-সত্তর দশকের কোনও দ্রোহীর সাধারণীকৃত প্রতিফলন।

উপন্যাসের বাস্তবতা ও ‘বাস্তববাদী উপন্যাস’-র বিশ্লেষণে গিওর্গে লুকাচের মতামত দেখা যাক। এর আগে এরিক অয়েরবাখ “Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (1946)”-এ হোমার, ট্যাসিটাস থেকে শুরু করে উল্ফ, প্রস্টের উপন্যাস অবধি আলোচনার বিস্তার করেছেন। মূল যে তিনটি বিষয়কে বাস্তববাদের ভিত্তি ধরছেন, তা হচ্ছে, ১) সাহিত্যের উচ্চভাষা এবং যাপনের সাধারণ ভাষার মিশ্রণ। সমাজের অনভিজাত ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সাহিত্যরূপ দেওয়া ২) অনভিজাত ও নিম্নবর্ণীয় মানুষের যাপনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে স্থাপন করা এবং ৩) বিশেষ কোনও সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সেইসব সাধারণ মানুষের জীবনান্বেষণকে প্রতিষ্ঠিত করা ও আখ্যানে বুনন করা। গিওর্গে লুকাচ এই বাস্তবতার বুননকেই ভাঙাচোরা আধুনিকতার একমাত্র প্রকাশ বলে মনে করতেন। মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের তুলনা করছেন লুকাচ; মহাকাব্য যে সমগ্রতার প্রকাশ করে, তার বিপরীতে উপন্যাসের প্রকাশ অস্থির সময় ও দুর্বোধ্য জগতে। “for the novel form is, like no other, an expression of this transcendental homelessness” (Lukacs 1971, 41) মহাকাব্যে যে সমগ্রতার খোঁজ ও প্রকাশ থাকে, উপন্যাসে তা সয়াসরি থাকে না, জীবনের দুর্বোধ্যতা সেখানে সংকট তৈরি করে বলে লুকাচের ধারণা; যদিও, সমগ্রতার মাপকাঠিতেই উপন্যাসের ভাবনাপরিসর এগোয় যে ঐতিহাসিক-দার্শনিক বাস্তবতার সঙ্গে লেখকের সংঘাত, সেখানে¹²⁹। উপন্যাসের এমন এক ধরণ যা বিষয়ীগত (subjective), ব্যক্তিগত জীবনযাপনকে সামাজিক/সমষ্টিগত জগত, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে- লুকাচের মতে এটাই বাস্তববাদ। ব্যক্তি ‘আত্ম’ ও সামাজিক ‘আত্ম’ এই দু’য়ের সেতুবন্ধন (ইলিয়াস ব্যক্তিজীবন ও সমাজযাপনের অন্তরের স্পন্দনের কথা উল্লেখ করছেন)। ব্যক্তি উপন্যাসিকের পরিচিতি নয়, বরং উপন্যাসের

আখ্যান, ভাষা ও গঠন বাস্তববাদী উপন্যাসের প্রকরণ নির্মাণ করে এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক যে কাহিনির পরিচায়ক তা ব্যক্তি ও সমাজের দ্বারা অস্বিষ্ট ইতিহাসবিধৃত মানুষের সন্ধান দেয়। বাখতিনের মতে, উপন্যাসের বিষয় হিসেবে সাম্প্রতিক বাস্তবতা উপন্যাসের মধ্যে কৌতুকময়তা (laughter) ও বহুস্বর (polyphony) উপস্থিত করে। মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য নিরূপণে কৌতুকময়তা উল্লেখযোগ্য উপাদান কারণ, উপন্যাসে পরিচিত, অসম্পূর্ণ ও বহুমান জগৎ থাকে, তার তুলনায় মহাকাব্যের জগৎ আবদ্ধ, প্রাচীন জাতিগৌরবে (রামায়ণ, মহাভারত দু'য়ের ক্ষেত্রেই তাই) পরিপূর্ণ। উপন্যাসের মূলগত ভিত্তি মুখফেরতা আখ্যান, কিংবদন্তী ও জনপ্রিয় (যদিও, বাখতিনের মতে যে পপুলার কালচার অর্থাৎ ইউরোপীয় পপুলার কালচার ও ভারতীয় তথা বঙ্গীয় জনপ্রিয় সংস্কৃতির ধারণা আলাদা, মূলগত বেশ কিছু তফাৎ রয়েছে) সংস্কৃতি। বাখতিন লিখছেন,

This idealization of the past in high genres has something of an official air. All external expressions of the dominant force and truth (the expression of everything conclusive) were formulated in the valorized-hierarchical category of the past, in a distanced and distant image (everything from gesture and clothing to literary style, for all are symbols of authority). The novel, however, is associated with the eternally living element of unofficial language and unofficial thought (holiday forms, familiar speech, profanation) (Bakhtin 1981. 20)

উপন্যাসের এই দৈনন্দিন যাপনভাষা, অন্তর্ঘাতী ও 'unofficial' বয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসের দ্বিরালাপী (dialogic) প্রকরণের উল্লেখ করছেন বাখতিন। বাখতিনের মতে, মহাকাব্য এমন এক জগতের সাহিত্যপ্রকাশ, যাতে একটাই সাহিত্যভাষা (উচ্চবর্ণের বা কর্তৃত্বের) এবং সেই ভাষায় বর্ণিত কর্তৃত্ব-বর্ণের বাস্তবের একমাত্র ছবি। কিন্তু, উপন্যাস যে আধুনিক সময়ে

জন্মেছে ও ধারণ করছে, তাতে অসংখ্য ভাষা ও স্বর রয়েছে এবং প্রত্যেক ভাষার ভেতরেও অসংখ্য স্বর ও উচ্চারণ¹³⁰। বাখতিন একেই বিষমশব্দস্বর (heteroglossia) বলছেন এবং উপন্যাসের এই বহুস্বর, বিষমশব্দস্বরই আধুনিক সময়যাপনের সঠিক বাস্তবপ্রকাশ বলে তাঁর অভিমত। বাস্তবতাবাদ নিয়ে এঁদের পর্যবেক্ষণে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, তা হচ্ছে, বাস্তবতাবাদ মানে নিছক ‘বাস্তবঘটনা’র উপস্থাপন নয়। ঔপন্যাসিকের একমাত্র দায়িত্বও বোধহয় তা নয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস-দর্শনের সঙ্গেও তা মিলে যায়, “সমাজের বাস্তব চেহারা তাঁকে [ঔপন্যাসিককে] তুলে ধরতে হয় এবং শুধু স্থিরচিত্র নয়, তার ভেতরকার স্পন্দনটিই বুঝতে পারা কথাসাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য” (ইলিয়াস ৩৮) বাখতিন বলেছিলেন বিভিন্ন সামাজিক বাকরীতি ও ব্যক্তির স্বরের শিল্পসম্মত বিন্যাস উপন্যাসের নির্মাণ করে। আর, এই সামাজিক বাকরীতি ও ব্যক্তিক স্বরের উপাদানগুলিকে ‘শিল্প’ ক’রে তুলতে কোনও ঔপন্যাসিকের দক্ষতাই রাজনৈতিক উপন্যাসকে ‘সার্থক’ করতে পারে। অর্থের বহুবাচনিকতা থাকে। অর্থের বহুার্থ সমাজে নিহিত থাকে; সামাজিক প্রেক্ষিত, বিভিন্ন ঘটনা, সামাজিক অভিজ্ঞতা, শ্রেণিবোধ ও ইতিহাস ইত্যাদি ভাষার বহুার্থ তৈরি করে। আর, সংলাপ শুধুমাত্র এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির কথোপকথনেই নির্মিত হয় না, অন্যান্য কুশীলবেদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণির কুশীলবেদের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নির্মিত হয়। অন্যান্য কুশীলবের সঙ্গে তথা অন্যান্য স্তর ও শ্রেণির কুশীলবের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া কোনও একজন কুশীলব (অবশ্যই প্রোটাগনিস্ট ও অ্যান্টাগনিস্ট উভয়েই) পূর্ণতা পায় না। এবং, এই বহুার্থ ও দ্বিরালাপ/দ্বিবাচনিকতার সমন্বয়ে আখ্যান নির্মিত হয়। রাজনৈতিক আখ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ এই বৈশিষ্ট্যগুলির স্পষ্টতা বেশি প্রয়োজনীয়। কিন্তু, শুধুমাত্র কুশীলবের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক কিংবা অন্যান্য কুশীলবের সঙ্গে আদানপ্রদানই নয়, ইতিহাসের সঙ্গে মুখফেরতা কাহিনির বা মুখে মুখে ফেরা গল্পের, বাস্তবের সঙ্গে কাল্পনিক আখ্যানের দ্বিবাচনিক পরিসর তৈরি হয়। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের

‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’, ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ ও মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)’ ও ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)’ সেই দ্বিবাচনিক পরিসরকে ধারণ করে। কেন করে? কারণ, ভারতীয় কথা (বা, গল্প) আর ইতিহাসের পারস্পরিক অঙ্গঙ্গী সম্পর্ক। ওই কথা বা গল্পের প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, নিজস্ব কালস্থানিক অভিব্যক্তি রয়েছে এবং ‘মূলধারার’ ইতিহাসকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে শোষিতের সঙ্গে সমাজের ও শোষিতের সঙ্গে মৌখিক আখ্যানের আদানপ্রদান রয়েছে। বদ্রিনারায়ণ তাঁর ‘Documenting Dissent: Contesting Fables, Contested Memories, and Dalit Political Discourse’ গ্রন্থে কথা ও ইতিহাসের দ্বিরালাপকে ইঙ্গিত ক’রে বলছেন,

The way ‘Itihas’ has been defined, by a group of historians stretches its root to Puranic Stories. ‘Itihas’ in this sense stands for the story of a domnany tradition. On the other hand, the term ‘story’ liberates even marginalized groups of Indian society and enable them to enter the meaningful domain of knowing, inventing, creating the telling of the past as a constant dialogue with the present. (Badrinarayan 2001, 15-6)

এই যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের নিরন্তর সংলাপ/আলাপের কথা বলছেন বদ্রিনারায়ণ, আসলে তো তা বাখতিন উল্লিখিত দ্বিবাচনিকতারই বাড়িয়ে নেওয়া পরিসর। বাখতিন রুশ ভাষাতাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ তুলেছিলেন যে, তারা সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের নির্মাণে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ দিয়েছিলেন¹³¹। আর, ঠিক এখানেই যুক্ত করতে চাই ইতিহাসের সঙ্গে মুখফেরতা আখ্যানের এবং বাস্তবের সঙ্গে মিথ-গল্পের দ্বিরালাপের প্রসঙ্গ। বাখতিন দ্বিরালাপের পটভূমিতে ইতিহাস ও সমাজকে গুরুত্ব দেন, কারণ, ব্যক্তি মাঝেই স্বতন্ত্র কিন্তু একান্ত নয়¹³²। আর, প্রতিমুহূর্তে যে দ্বিরালাপ গড়ে ওঠে সেই মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের,

উপন্যাসকে ধারণ করে তা। উপরউক্ত ঔপন্যাসিকদের রচনায় ইতিহাস ও মিথের এবং লিখিত বাস্তবের সঙ্গে মুখফেরতা গল্পের বিরোধভাস স্পষ্ট হয়। সংলাপ বা ডায়ালগ নিয়ে বাখতিনের ধারণা, “A word, discourse, language or discourse undergoes ‘dialogization’ when it becomes relativized, de-privileged, aware of competing definitions for the same things. Dialogue may be external (between two different people) or internal (between an earlier and a later self)” (Bakhtin 1981, 426-7) এবং এর বিপরীতে একবাচনিকতা হচ্ছে কর্তৃত্বসুলভ, যা আখ্যানস্থিত কুশীলবের অনেকান্ত আদান-প্রদানের বদলে লেখকনির্ধারিত পরমতাকে প্রশ্ন দেয়। এবং তাঁর মতে, মানুষের জীবনের ধরণেই এই দ্বিবাচনিকতা রয়েছে। সংলাপের মধ্যে দিয়েই মানুষ সারাজীবন তার যাপনে অংশগ্রহণ ক’রে চলে। তার প্রতিটি শরীরী অভিব্যক্তি ও কাজের মধ্যে দিয়ে জীবন ও বিশ্বের সঙ্গে তার প্রতর্কমূলক অংশগ্রহণ¹³³। অর্থাৎ, সংলাপ ও দ্বিবাচনিকতায় মানুষ তথা আখ্যানস্থিত কুশীলবের আদানপ্রদানের কথা বলছেন বাখতিন। কিন্তু, শুধুমাত্র আখ্যানস্থিত কুশীলবের পারস্পরিক আদানপ্রদানের ওপরেই কি আখ্যানের দ্বিবাচনিকতা নির্ভরশীল? না। ইতিহাস ও মিথ এবং মুখফেরতা কাহিনির সঙ্গে শাসকরচিত বাস্তবের দ্বিরালাপও রচিত হয়। বাখতিন একথা না বললেও, তাঁর তত্ত্বের পরিসরকে বাড়িয়ে কি এই ধারণায় পৌঁছানো যায় না? দ্বিবাচনিকতা (ডায়ালজিসম) মানে যদি একবাচনিকতার (মনোলজিসম) পরমতাকে প্রতিস্পর্ধা জানানো হয়, তা’লে বৈরাগীর ভিটে, সন্ন্যাসীর থান ও ভবানী-মজনুর যুগলবন্দীর মুখফেরতা আখ্যান দিয়ে মূলধারার লিখিত ইতিহাসবোধকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে তা বোঝা যায়। নায়েববাবুর হিন্দুত্ববাদ কিংবা আনোয়ারের সগর্ব বিস্মৃতির উদাসীনতাকে প্রতিস্পর্ধা জানায় তা। আবার, ‘অরণ্যের অধিকার’-এ বিরসার মিথ্ হয়ে যাওয়া এবং মৌখিক গল্প শুনে বড় হওয়া বিরসার ফের কোনও মৌখিক গল্পের প্রবহমানতায় মিথ্ হয়ে যাওয়া সেই ইঙ্গিতই দেয়। বাজিকররা ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এ তাদের প্রায় দেড়শো বছরের আখ্যানে রহুর হাড় খুঁজে চলে

মুক্তির আশায়, তাদের পূর্বপুরুষদের ক্রমাগত অনিশ্চয়তার উত্তর খুঁজে চলে আর্থ-সামাজিক পরিসরে থিতু হতে চাওয়ার মধ্যে। শারিবার যাপনের দ্বিবাচনিকতায় শারিবা উত্তর খুঁজে পায় নিজেকে ‘বাজিকর’ হিসেবে সগর্ব ঘোষণার মধ্যে। ব্যক্তিমানুষ শুধু নয়, বাখতিন যে বলেছিলেন, ‘Dialogism continues towards an answer’¹³⁴ এই ক্ষেত্রে মৌখিক আখ্যান ও মুখফেরতা গল্প সেই উত্তর খোঁজার দিকে এগোয়। বিশেষ ক’রে ভারতীয় উপমহাদেশে গল্প বনাম ইতিহাস এবং মুখফেরতা বনাম লিখিতের এই দ্বন্দ্বই রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্যতম ধারক হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বাস্তবতা এই দ্বন্দ্বের বিরোধভাসের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়।

উপন্যাসের বাস্তবতা এবং বাস্তববাদী উপন্যাসের সামঞ্জস্যের দ্বন্দ্ব ইলিয়াসের মতামত ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে; সময় ও সমাজযাপনের মধ্যে দিয়ে যে আখ্যান উপন্যাসে বিধৃত হচ্ছে, তাতে উপন্যাসের ব্যক্তিকে বিকশিত হওয়ার পূর্ণ ‘স্বাধীনতা’ দেওয়াই আধুনিক উপন্যাসের সমাজবাস্তবতা রক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে রাখছেন ইলিয়াস¹³⁵। উপন্যাসে ‘ব্যক্তি’-র বিকাশকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তা ‘ঘরে-বাইরে’র মতো রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের নতুনত্বে বোঝা যায়। তিনজন কেন্দ্রীয় কুশীলবের প্রত্যেকেই তাদের আত্মকথনের সুযোগ পাচ্ছে, যদিও, তাদের কথনে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সমাজভাবনা স্পষ্ট, কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতে ‘ব্যক্তি’র বিকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ‘গোরা (১৯১০)’-কে অনেক সমালোচক সামাজিক উপন্যাস বর্গে বিবেচনা করলেও, ‘গোরা’-র রাজনৈতিক উপন্যাস বলে বিবেচিত হওয়ার অনেক বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন, “গোরাই বাংলা উপন্যাসের প্রথম ভদ্রলোক নায়ক যে গরিব কৃষকের পক্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করল, পুলিশ মেরে জেলে গেল।”¹³⁶ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে গ্রামসমাজের প্রায়-নিখুঁত বাস্তবতা থাকলেও, তাতে বহমান সময়-জীবনের স্পন্দনের অভাব দেখছেন ইলিয়াস। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস ‘পথের দাবী’-তে আরেকজন ‘বলিষ্ঠ’

রাজনৈতিক প্রোটোগনিস্ট পেল বাংলা সাহিত্য, কিন্তু সেই প্রোটোগনিস্ট রক্ত-মাংসের বাস্তবতার বহু দূরে অতিমানব হিসেবে উপস্থাপিত হল। অপূর্ব ও সব্যসাচীর শ্রেণি-অবস্থান প্রায় এক এবং দু'জনেই শিক্ষিত-ভদ্রলোক সামাজিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্বকারী। অপূর্বর নির্মাণ সব্যসাচীর প্রতিটি বীরত্ব, প্রতিটি আচরণের বৈপরীত্যে গড়া। কিন্তু সব্যসাচী আবেগ দিয়ে নির্মিত হলেও, রক্তমাংসের হয়ে উঠতে পারেনি। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে ব্রিটিশ-বিরোধিতা একমাত্র উপজীব্য হলেও, তাতে সম্পূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা নেই। উপরিউক্ত আলোচনায় ‘বাস্তবের বর্ণনা মানেই বাস্তববাদী উপন্যাস নয়’- এই প্রতর্কের প্রমাণ সাপেক্ষে ইলিয়াসের উপন্যাস-সম্পর্কিত আলোচনাটিকে দেখা যায়। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে সামন্তব্যবস্থার আসন্ন ক্ষয় দেখেছেন ইলিয়াস। ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাচ্ছে না বা সামন্তপ্রভু ক্ষয়িষ্ণু হয়ে তার ‘ক্ষমতা’ হারাচ্ছে না; বরং তার রূপান্তর ঘটছে নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে। কালাম মাঝি, শরাফত মণ্ডলদের সঙ্গে জেলেপাড়ার বা চাষীপাড়ার তথা কাংলাহার বিলের পাশে বসত করা নিম্নবর্গ শ্রমজীবীদের সম্পর্ক আগের মতোই থেকে যাচ্ছে। তার বড় কারণ এটাই যে, শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তরে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। এই বাস্তবতাবোধ ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র শহুরে মহাজন রহমতউল্লাহর সঙ্গে খিজিরের সম্পর্কনির্মাণেও থাকে। রহমতউল্লাহর সঙ্গে খিজিরের সম্পর্ক মালিক-ক্ৰীতদাসের; সমাজব্যবস্থা সেটাকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু ব্যক্তি খিজির সেই সম্পর্কের শেষ চায়। আনোয়াররা সেই সম্পর্ক থেকে মুক্তির জন্যে লড়াই করার কথা বলে। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্র তথা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক এখনও টিকে আছে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে গয়ানাথ জোতদার ও বাঘারুণ সম্পর্কও মালিক-ক্ৰীতদাসের। উপন্যাসের সমাজবাস্তবতায় উপন্যাসস্থিত সমাজশাসকেরা সেই সম্পর্ক (জমি/কৃষি যেখানে মূল উৎপাদন ভিত্তি) পাল্টানোর চেষ্টা করে কিন্তু গয়ানাথ জোতদার সেই উৎপাদন-সম্পর্ক (relations of production) অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। আবার, উপন্যাসস্থিত রাজনীতিতে তিস্তার-ওপরে-বাঁধ-দেওয়াকে কেন্দ্র ক’রে নতুন সমাজসম্পর্কের ইঙ্গিত থাকে,

পুরনো সমাজব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ থাকে। বাঘারু এই দু'টোকেই প্রত্যাখ্যান করে, বাঘারুর প্রত্যাখ্যানের রাজনীতির জন্যেই এবং বহুস্বর-বহুধ্বনি ও দ্বিরালাপীয় বিষমশব্দস্বরের বহুল উপস্থিতির জন্যেই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠে। দেবেশ রায় বাখতিনের বহুস্বর ও বিষমশব্দস্বর (দেবেশ বলছেন ভাষাবৈচিত্র্য) এবং উপন্যাসের ভাষার বহুধাবিভক্তির তত্ত্ব গ্রহণ করছেন। আধুনিক উপন্যাসের স্বরূপ ও সংজ্ঞা সন্ধানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নান্দনিক অভিজ্ঞতার সমতুলতা সন্ধান করেছেন বাখতিন, দেবেশ রায়ের মতে, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নান্দনিকতা অনুসন্ধানও সেই পদ্ধতি কার্যকরী¹³⁷; দেবেশ বাংলা আখ্যানকাব্যের মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের যাত্রাপথের বিবরণ খুঁজতে চেয়েছেন বাখতিনকে আদর্শ মেনে।

কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে কীভাবে আখ্যানভিত্তি নির্মাণ করে, এই প্রসঙ্গেই আরেকটি বিষয় আলোচ্য, তা হচ্ছে, সত্তর দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে বীভৎসতা যখন শিল্পসত্তা দাবি করে। দিব্যেন্দু পালিতের 'সহযোদ্ধা (১৯৮২)' উপন্যাসে সত্তর দশকের নকশাকবাড়ি কেন্দ্রিক হিংসা বিশেষ মাত্রা পায়। লেখক আদিত্য সংবাদপত্রে পাঠ করে নকশালপস্থীদের হত্যার জন্যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ, উপাংশুকে হত্যা করার বীভৎসতা আদিত্যর চেতনায় বারবার ফিরে আসে এবং তার মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানের চেতনা রাজনৈতিক হিংসার ফলে দোলাচলে ভোগে।

উপন্যাসের 'নায়ক'-এর বিবর্তনের হ্রদিশ

অ্যারিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' অনুযায়ী সামগ্রিক চরিত্রচিত্রণে চারটি জিনিশের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন- উৎকর্ষ, যাথার্থ্য, মূলানুগত্য এবং সঙ্গতি¹³⁸। নায়ক (যদিও মূলপাঠে তা 'চরিত্র', কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রধান চরিত্র) নৈতিক দিক থেকে খুব ভাল তথা উচ্চ-নৈতিকতাসম্পন্ন

হবে। নৈতিকতাহীন কুশীলব আমাদের সহানুভূতি পায় না। কথায়-কাজে পরিস্ফুট হওয়া চরিত্রের মধ্যে সিদ্ধান্তের প্রয়োগ থাকবে এবং সিদ্ধান্তটি উৎকৃষ্ট হলে চরিত্রটি (তথা, নায়কও) উৎকৃষ্ট হবে। যদিও, নিখাদ নিষ্কলঙ্ক নয়, নায়কের কিছু ত্রুটি থাকবে, যা কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। চরিত্রনির্মাণের অন্যান্য আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে- স্বাভাবিকতা, আনুগত্য ও সঙ্গতি। অর্থাৎ চরিত্র হয়ে উঠতে গেলে, বিশেষতঃ নায়ক হয়ে হয়ে উঠতে গেলে তার শ্রেণির পরিচায়ক হতে হবে, বাস্তবতাবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে ও তার আচরণ-কার্যকারণে যুক্তিনিষ্ঠতা থাকবে। বারবার অ্যারিস্টটল জোর দিচ্ছেন মূলের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে চরিত্রকে যথার্থ ক’রে তোলার ব্যাপারে¹³⁹। “ঘটনাবিন্যাসের মতই চরিত্র রচনাতেও লক্ষ্য হওয়া উচিত যা সম্ভাব্য, যা অনিবার্য, যাতে করে বোঝা যায় একটি চরিত্রের পক্ষে এই সব বলা বা করা সম্ভব (কিংবা) এই ঘটনার পরে ওই ঘটনার আবির্ভাব সম্ভব বা অনিবার্য” (দাশ ১৯৫৭, ৪২) উচ্চবংশজাত নায়ক দুর্ভাগ্যের কবলে পড়ে ভ্রান্তির শিকার হবে এবং বিপর্যয়ের কবলে পড়বে। ট্রাজেডির কাহিনিতে নায়কের চরিত্র সফল হবে, যদি তা একইসঙ্গে করুণা ও ভয়ের উদ্রেক করে পাঠক/দর্শকের মনে। ট্রাজেডি বিষয়ক পাশ্চাত্য দর্শন থেকে ফেরা যাক ভারতীয় সাহিত্য-ইতিহাসে। বিশ্বনাথ কবিরাজের ‘সাহিত্যদর্পণ’ নাটকের যে সংজ্ঞা দেয়, তাতে নাটকের তিনটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে, বস্তু (ইতিহাস বা পুরাণপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত), নেতা (নায়ক এবং তার সঙ্গে চার-পাঁচজন অন্য পুরুষ) এবং রস (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহার এবং সুখ-দুঃখ থেকে উদ্ভূত নানারস থাকবে)- বস্তুকে রসে রূপায়িত করতে বিভিন্ন কুশীলবের প্রয়োজন হবে। বিশ্বনাথের সংজ্ঞার্থে চরিত্র হয়ে উঠতে গেলে তথা ‘নায়ক’ হয়ে গেলে যে গুণটি আবশ্যিক তা হচ্ছে, “প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্/ দিব্যোহথঃ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ”¹⁴⁰ অ্যারিস্টটলের বিশ্লেষণে নায়কের যা বৈশিষ্ট্য, তার থেকে এই বক্তব্য আলাদা কিছু নয়। এমনকি, মহাকাব্যের নায়ক কেমন হবে, তার নির্দেশ দিয়েছেন দণ্ডী ও বিশ্বনাথ। তাঁদের দু’জনের মত মেলে যেখানে তা হচ্ছে, মহাকাব্যের নায়ক সদ্ধংশজাত ধীরোদাত্ত সর্বগুণান্বিত চতুর হবে এবং কাহিনি কোনও

ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা সজ্জন নীতিবানকে আশ্রয় ক’রে এগিয়ে চলবে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাকাব্যের নায়ক হিসেবে রামের পরিচিতি ‘রামায়ণ’-র শুরুতে। নারদ-বাল্মীকি প্রশ্নোত্তরে রাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পুরুষোত্তম ও সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক হিসাবে। সংস্কৃত কাব্যনাট্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নরনারীর প্রেমবর্ণনা, পঞ্চশরের লীলা ও শৃঙ্গাররসের উপস্থিতি। নায়কোচিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও গণ্য হয়। পালি সাহিত্যের দীর্ঘনিকায়ে প্রত্যেকটি কাহিনিতেই বৌদ্ধ দর্শনের সারকথাগুলি উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। নৈতিকতা এবং আদর্শের প্রচারই যে উদ্দেশ্য, তাতে সন্দেহ নেই এবং বেশিরভাগ কাহিনিতে উচ্চবংশজাত নীতি-অনীতির দ্বন্দ্ব ভুগে নৈতিক-আধ্যাত্মিক পথে সমাধানপ্রাপ্ত হওয়াই নায়কের উদ্দেশ্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ জাতকের গল্প ও ‘দশকুমারচরিত’-এর উল্লেখ ক’রে বলেছেন যে, এশিয়ার বিভিন্ন আখ্যানে গদ্যে গাথা কাহিনিতে বাস্তবকে স্বীকৃতি দেওয়ার রেওয়াজ অনেক পুরনো। কিন্তু ছায়ালক্ষণের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের যুগনির্ণয়ের বিরোধিতাও করছেন।¹⁴¹ বৌদ্ধসাহিত্যে ‘অবদানশতক’ বহু কাহিনির সমাহার; দিব্যাবদান, শার্দূলকর্ণাবদান ইত্যাদি কাহিনিগুলির কথাবস্তু থেকে উনিশ শতক ও বিশ শতকেও কাব্য রচিত হয়েছে। এই ‘অবদান’গুলির চরিত্ররা হয় উচ্চবংশজাত নয়তো নৈতিক আদর্শে উচ্চস্থানে আসীন। বুদ্ধের আদর্শে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথে জ্ঞানলাভ করার পথ কাহিনিগুলির বৈশিষ্ট্য। জাহ্নবীকুমার দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসাহিত্যের প্রভাব নিয়ে¹⁴²।

জৈনসাহিত্যে ‘কথানক’ এক বিশেষ বর্গ, যার মধ্যে ভবিষ্যতের ভারতীয় কথাসাহিত্যের উপাদানগুলি নিহিত রয়েছে। ‘কালকাচার্য কথানক’-র আখ্যান একালের রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে- কালক নামে এক রাজপুত্র জৈনধর্ম গ্রহণ ক’রে মুখ্য আচার্যের পদে উন্নীত হন এবং কালকের বোনকে উজ্জয়িনীরাজ অপহরণ ক’রে নিয়ে যাওয়ার পরে কালক উন্মাদের বেশে উজ্জয়িনী নগরে গিয়ে প্রজাদের সংগঠিত ক’রে শকরাজাদের উদ্ধৃত্ত করেন

উজ্জয়িনীর প্রজাদের সঙ্গে মিলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও, কথানকের আখ্যান ও চরিত্রনির্মাণ পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়েছে। জাহ্নবীকুমারের মতে,

জৈনধর্ম-কথার সহিত এই মঙ্গলকাব্যকাহিনির আশ্চর্য সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করিবার জন্যে দেবলোক হইতে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ, প্রেম, বীরত্ব ও অভিযানমূলক জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া ধর্ম-মহিমা প্রচার এবং ধর্ম-প্রচারান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণ- এইগুলিই জৈন ধর্মকথার বর্ণনীয় বিষয়। ঠিক এই প্রকারের কাহিনিরই বিস্তার দেখা যায় বাংলা মঙ্গলকাব্যে... বাংলা কথাসাহিত্যের বহু উপকরণ জৈন কথাসাহিত্য হইতে সংগৃহীত (চক্রবর্তী ১৯৬১, ৩০৫)

এই আলোচনার অবতারণা এইজন্মেই করছি কারণ, কাব্যে ধর্মগ্রন্থে কাব্যে আখ্যায়িকায় উপন্যাসের লক্ষণ ও উপাদানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল একথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর বইতে স্বীকার করেছেন¹⁴³। বিশ শতকের শেষার্ধের ও একুশ শতকের রাজনৈতিক উপন্যাসে নায়কের (তথা, প্রোটোগনিস্টের) বিবর্তনের সূত্র খুঁজে পেতে গেলে ভারতীয় সাহিত্যে নায়ক (তথা প্রোটোগনিস্টের) নির্মাণবৈশিষ্ট্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন আলোচনায় অচ্যুত গোস্বামী রূপকথা, লোককথা, ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় এসেছেন। মঙ্গলকাব্যের যুগে মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ আখ্যানে উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বের ছায়া দেখেছেন বহু সমালোচক¹⁴⁴। কালকেতু ব্যাধের সন্তান (উচ্চবংশজাত নয়), যদিও তার জন্মবৃত্তান্তে রয়েছে সেই দেবলোকচ্যুত হওয়ার কাহিনি, কিন্তু সে ক্ষমাসুন্দর, দয়াপরবশ ও নায়কগুণসম্পন্ন। প্রধান কুশীলবের ভাগ্যবিপর্যয় ও বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে শেষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া ও চরিত্র হয়ে ওঠার আখ্যান বিভিন্ন গীতিকা থেকে মঙ্গলকাব্য সবেতেই ব্যপ্ত। কিন্তু, কথানক-মহাকাব্য-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে উপন্যাসের উপাদান থাকলেও, পার্থক্যও প্রচুর। উপন্যাসের এক বিশেষ গুরুত্ব থাকে ব্যক্তির সংকট ও সংকট ঘিরে বেড়ে ওঠা আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর ভেতর। মঙ্গলকাব্যে ও প্রাচীনসাহিত্যে সেই সংকট মূলতঃ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রচারের মাধ্যম কোনও

ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক’রে কিন্তু, উপন্যাসের আখ্যানবিস্তৃতি বা চরিত্র-গভীরতা তা থেকে অনেক বেশি হওয়াই সম্ভব। ইলিয়াস কিংবা দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিক তাঁদের উপন্যাসে ইতিহাস ও সময়ধৃত ব্যক্তির বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছেন; ইলিয়াস তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণও করেছেন এই ভাবনাকে কেন্দ্র ক’রে। উপন্যাসে লোককথা-মিথ ইত্যাদির উপস্থিতি নিশ্চয় থাকতে পারে, এমনকি কোনও ঔপন্যাসিক বাস্তবোচিত নৈতিকতার সন্ধানও করতেই পারেন; কিন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উপাদানগুলি সময় ও সমাজধৃত ব্যক্তিমানুষের সংকটকে ঘিরে থাকবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাস্তবিক দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে ব্যাপকতর সত্যকে ফুটিয়ে তোলার গল্পকেই উপন্যাস বলেছেন।¹⁴⁵ প্রাচীন লোককথা-মিথ-নৈতিকতা ইত্যাদি আখ্যানকে সময়স্থিত করবে বা অশেষণের সহায়ক হবে কিন্তু, কেন্দ্রীয় প্লট কখনই নয়। আর, ধর্মাচরণ, সদাচরণের উপদেশ, অনুজ্ঞাসূচনা ও আধ্যাত্মিক-নৈতিকতার উপদেশ অন্ততঃ আধুনিক উপন্যাসের আখ্যানভূমি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার কাঠি’ প্রবন্ধে উপন্যাসের সঙ্গে বিবিধ মঙ্গলকাব্য ও ‘কাদম্বরী’র পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং সাহিত্যের বিবর্তনের যুক্তি তুলে ধরেছেন। আধুনিক বাংলা গল্প কাদম্বরী-মনসামঙ্গলের ছাঁচে ঢালা না-হয়ে বঙ্কিমের ‘সোনার কাঠির’ ছোঁয়ায় যে উপন্যাসে পরিণত হল, সেই সাহিত্যপদ্ধতির বর্ণনা দিচ্ছেন রূপকের ব্যবহারে। তাঁর কাছে যেমন সাহিত্যে একান্ত বাস্তবানুগত্যের কোনও মূল্য নেই, তেমনই পুরনো সাহিত্যখাঁচাকে আঁকড়ে থেকে নবায়নকে অস্বীকার করাও অর্থহীন তাঁর কাছে। “মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়”¹⁴⁶ উপন্যাস সম্পর্কে এই তাঁর অভিজ্ঞান। উদ্যমহীন দৈবনির্ভরতা এবং নিরঙ্কুশ ধর্মসাধনার আতিশয্যের বিপরীতে মনুষ্যত্বের জয়গান ও বিকাশ রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট ছিল বলেই হয়তো মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন তিনি। যদিও পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের মূল পার্থক্য এই যে, পুরাণে মানুষের ভূমিকা অতিনগণ্য এবং সে দেবতার অধীন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবতা মানুষের অধীন এবং মানবচরিত্রের দোষ-গুণ সবই তাঁদের মধ্যে আছে।

রাম, কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী কিংবা তদনুরূপ কোনও অবতার কিংবা মঙ্গলকাব্যের কোনও স্বর্গচ্যুত দেব-মানব উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট হয়ে উঠতে পারে না; এর কারণ মূলতঃ দু'টো- আধুনিক সমাজকাঠামোয় 'বিশুদ্ধ' নায়কের ধারণাকে আর ধারণ করা সম্ভব নয়, রাম বা কৃষ্ণের মত চরিত্রকে প্রোটোগনিস্ট সাজিয়ে লিখলেও তাতে 'রামচরিতমানস'-র মতো বিশুদ্ধ চরিত্রচিত্রণ সম্ভব নয়। এবং, আখ্যানের কলাকৌশলে ও উপন্যাসের অন্তর্বর্তী বহুস্তর বহুস্বরের নিয়ত নিরীক্ষায় পিছনপথে হেঁটে আর ওই পৌরাণিক নির্মাণকৌশলে বা বিষয়ে ফেরা সম্ভব নয়। অচ্যুত গোস্বামীর পর্যবেক্ষণে,

মধ্যযুগের কাহিনিতে ব্যক্তির গুরুত্ব খুব কম। রূপকথায় ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাটাই বড়; উপকথায় উপদেশটাই বড়; মঙ্গলকাব্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পিছনে আবেগ সঞ্চারটাই বড়। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে রচিত উপন্যাসে ব্যক্তি-চরিত্র অনন্য মর্যাদা লাভ করেছে। মহাকাব্যে ও মঙ্গলকাব্যে চরিত্র প্রধানত কতকগুলি (নৈতিক অর্থে) দোষ বা গুণের সমষ্টি... ব্যক্তি বনাম সমাজ- এই হল উপন্যাসের মূল ডায়েলেক্টিকস্; যেমন মধ্যযুগের কাহিনির মূল ডায়েলেক্টিকস্ হল ব্যক্তি বনাম ভাগ্য বা আকস্মিকতা।
(গোস্বামী ১৯৬১, ১২-৩)

রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষানিরীক্ষার পরিসর আরও বেশি। যেহেতু আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার বহুদ্যোতনাকে ধারণ ক'রে রাজনৈতিক উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণ, সেইজন্যেই তা মঙ্গলকাব্য-আখ্যানকাব্য কিংবা প্রাচীনসাহিত্য থেকে উপাদান সম্পৃক্ত ক'রে নিতেই পারে, কিন্তু তার স্বাভাবিক রয়েছে। আখ্যানের যে প্রবাহমানতা প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ছিল, তার ভাষা, কলাকৌশল কিংবা আখ্যানপদ্ধতি কোনওটাই অবিকল (অথবা, সিংহভাগ) আধুনিক উপন্যাসে (আর, রাজনৈতিক উপন্যাসে তো বটেই) থাকা সম্ভব নয়। প্রকটভাবে শুধুমাত্র নীতিকথা-মূল্যবোধকে জিতিয়ে দিতে উপন্যাসের অবতারণা বিশ বা একুশ শতকে এসে তাজ্য হল¹⁴⁷। দেবেশ রায় 'বাংলা আখ্যানকাব্যে নিহিত উপন্যাস' প্রবন্ধে বাখতিনীয় পাঠাভিজ্ঞান ছুঁয়ে

প্রাচীন আখ্যানসাহিত্যের অন্তর্নিহিত ঔপন্যাসিক উপাদান খুঁজেছেন। কিন্তু, এও স্বীকার করছেন যে, “আধুনিকপূর্ব আখ্যানসাহিত্যের এই প্যারডি প্রহসনেই উপন্যাসের জন্ম তৈরি হয়েছিল- উপন্যাস বহু রীতি, বহু স্বর, বহু আখ্যানের সাহিত্যরূপ। কিন্তু এগুলো মিলে তখনো উপন্যাস হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।” (রায় ১৪১২, ৫২) মধ্যযুগে আরাকান রাজসভায় রচিত সাহিত্যে, নাথ-সাহিত্যে এবং বিভিন্ন লোককথায় উপন্যাসের কিছু লক্ষণ ছিল। সমাকালীন যুগের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ত এগুলিতে। নাথ-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দু’টি অবদান ‘গোরক্ষবিজয়’ ও ‘গোপীচন্দ্রের গান’-এর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বাস্তবতার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন শ্রীকুমার। এই বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলির সঙ্গে ‘অতি আধুনিক ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর’ লেখা উপন্যাস তথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ও সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’-র তুলনা করেছেন।¹⁴⁸ উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের স্থান নেই, এমনকি আধুনিক রোম্যান্সেও যে ‘বাস্তবতার মস্ত্রে অনুপ্রাণিত সত্যের কঠোর সংযম’ স্বীকৃত, সেটিও শ্রীকুমারবাবুর মতামত।¹⁴⁹ আগের অধ্যায়ে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি, উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্য ভদ্রলোক-শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাজ্জার শিল্পকল্প হয়ে বিবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসের নায়কের কী বদল হচ্ছে? প্রথমেই স্বীকার ক’রে নেওয়া যাক যে, উপন্যাসের (বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের) প্রোটাগনিস্টের বিবর্তন উপন্যাসের নির্মাণপদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী। ঔপনিবেশিক কালপর্বে, আধুনিকতার পাশ্চাত্য-অনুকরণের সময়, জাতীয়তাবাদী আত্মানুসন্ধানের সময়, ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর্বে এবং ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরবর্তী পর্যায়ে প্রোটাগনিস্টের এবং উপন্যাসের অন্য কুশীলবেদের নির্মাণে বদল অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসের কলাকৌশল-ভাষা ইত্যাদি বদলাচ্ছে তো বটেই, সমাজবাস্তবতারও বদল হচ্ছে। ফলে, আখ্যানের ‘নায়ক’ মানেই বিপ্লব, নৈতিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা এবং অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধারের জন্যে দায়বদ্ধ- এই আরোপিত উপাদানগুলি প্রোটাগনিস্টের নির্মাণচিত্র থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। ‘নায়ক’ কেউ থাকছে না। মূল প্রোটাগনিস্ট প্রবলেমেটিক নায়ক থেকে ক্রমেই কি এপিক-নায়ক

হয়ে উঠছে? রণজয়, নিরুপম, দ্রোণ, বসাই- এরা কেউ ‘নায়ক’ নয়। আখ্যানের সময়, আখ্যানের প্লট কোনওকিছুই তাদের ‘নায়ক’ হয়ে উঠতে সাহায্য করেনা। অন্ততঃ যে অর্থে ভবানন্দ নায়ক, গোরা, সব্যসাচী-অপূর্বরা নায়ক সেই অর্থে এরা নায়ক নয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘পথের দাবী (১৯২৬)’ যে সময় লেখেন, তখন ভারতীয় রাজনীতিতে সশস্ত্র বিপ্লবেই মুক্তির পথ খোঁজার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবপ্রচেষ্টা হয়ে গেছে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের নবপর্যায়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিকরণও ততদিনে হয়ে গেছে- একদিকে বাঙালি হিন্দু-সাহিত্য ও বাঙালি মুসলমান-সাহিত্য মেরুকরণ হয়ে গেছে, অন্যদিকে বাংলা উপন্যাস পরিণতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। ‘পথের দাবী’ রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে সঘোষ আত্মপ্রকাশ করল, সম্ভবতঃ ‘আনন্দমঠ (১৮৮২)’-র পরে এই দ্বিতীয় কোনও রাজনৈতিক উপন্যাস সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করল। অপূর্ব, সব্যসাচী, সুমিত্রা, ভারতী- ‘পথের দাবী’-র মূল চরিত্র এঁরা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে,

সব্যসাচী, সুমিত্রা, ব্রজেন, তলোয়ারকর প্রভৃতি চরিত্র ও বৈপ্লবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ একদিন আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু অপূর্ব, ভারতী, শশী, নবতারা প্রভৃতি নর-নারী তাহাদের অন্তর-রহস্যের চিরন্তনতায় প্রেমের অক্ষয় জ্যোতির্মণ্ডিত হইয়া পাঠকের মনে স্মরণীয়তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবে।

(বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭, ২৭৫)

এই বিশ্লেষণ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, বাঙালি রাজনৈতিক উপন্যাসিকেরা চিরকালই রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রেম-রোম্যান্সকে প্রধান করে তুলেছেন। সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের চলতি বাণিজ্যসফল ধাঁচায় রাজনীতিকে কেন্দ্রে রাখার বদলে প্রোটোগনিস্টের প্রেমপর্ব ও তার সূচনা-পরিণতির উপাখ্যান আখ্যানের গতিপথে মূল-আখ্যান হয়ে ওঠে। ফলে, রাজনৈতিক উপন্যাসের পাঠকও আখ্যানে উপস্থিত রাজনীতির থেকে নায়ক-নায়িকার প্রেমের গতিপথের সঞ্চালন নিয়ে আগ্রহী থাকে। রোম্যান্স নিশ্চিতভাবেই একজন প্রোটোগনিস্টের

আখ্যানস্থিত জীবনের অন্যতম উপাদান, কিন্তু, একমাত্র নয়; এবং সেই রোম্যান্সের পরিণতি দ্বারা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রভাবিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে অপূর্বর বিপরীতে সব্যসাচীর চরিত্রনির্মাণ বা অপূর্বর না-হওয়া সমস্তকিছু পূরণ করতেই সব্যসাচীর হয়ে-ওঠা! অপূর্ব অনায়কোচিত বাঙালি, সে দুর্বল, পরনির্ভর এবং স্মৃতিমেদুর রোম্যান্সপ্রিয়; অপূর্বর নৈতিক দৃঢ়তার অভাবেই সে ‘বিশ্বাসঘাতক’-এ পর্যবসিত হয় এবং তার ত্রাতার ভূমিকা নেয় সেই সব্যসাচী। “এই দুর্বল, ভীতু মানুষটিকে শরৎচন্দ্র খুব জীবন্ত করিয়া ও সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন।”¹⁵⁰ শ্রীকুমারের এই পর্যবেক্ষণ ভুল নয় কিন্তু, একথাও ঠিক যে অপূর্বের ‘চরিত্র’ যতটা জীর্ণ, দুর্বল হবে, সব্যসাচীকে ততই সুদৃঢ় ক’রে তোলা যাবে বৈপরীত্যের আভাসে। এমনকি, ‘গোরা (১৯১০)’ রাজনৈতিক উপন্যাসের গোয়ার সঙ্গে সব্যসাচীর পার্থক্য এই যে, গোরা সমস্ত ‘না’-এর বাঁধন খুলতে খুলতে নিজেকে আবিষ্কার করে এক প্রবল রাজনৈতিক অভিঘাতপূর্ণ সময়ে-সমাজে কিন্তু সব্যসাচী প্রতিক্ষেত্রে তার ‘হ্যাঁ’-র জোরকেই প্রতিষ্ঠিত করতে করতে এগোয়। গোয়ার অশেষগণাও মূল, সমস্ত সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান ক’রে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতেই তার মুক্তি কিন্তু সব্যসাচী গোয়ার মতো দ্বিধাস্থিত নয় তার আকাঙ্ক্ষা প্রবল এবং ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছে (ঔপন্যাসিকের মতে) বলেই বিবর্তনহীন আদর্শের বাস্তবায়নে তার মুক্তি। যদিও গোয়ার ‘পৌরুষ’ এবং সব্যসাচীর ‘পৌরুষ’ তুলনীয় কিন্তু সব্যসাচীর অতিমানুষী লক্ষণ গোয়ার তুলনায় অনেকটাই বেশি। নাজমা জেসমিন তাঁর বইতে¹⁵¹ গোরা ও সব্যসাচীর যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য। সব্যসাচী সাম্রাজ্যবাদের অবসান চায়, কিন্তু ভদ্রলোক-শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের¹⁵² আকাঙ্ক্ষার নায়ক হয়েই তার অবস্থান ও সীমাবদ্ধতা। সব্যসাচীর উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তার মতাদর্শ ও অনুশীলন দেশের বৃহত্তম নিম্নবর্গীয় নির্বিক্ত জনসাধারণের শত্রু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্পর্কে উদাসীন। তবে, নাজমা জেসমিন সব্যসাচীর সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে সামন্তবাদের প্রতিভূ ও ‘ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণ’কারী¹⁵³ বলেছেন, তা সমর্থনযোগ্য না। নাজমা জেসমিন ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবকে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে “সন্ত্রাসবাদীরা যথার্থ অর্থে বিপ্লবী নয়” (চৌধুরী ১২৩) বলে

দিয়েছেন, সেটাও যথার্থ বিশ্লেষণ নয়। সব্যসাচীর প্রবলপৌরুষ, স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠা ও উচ্চবর্গীয় মানসিকতা ভুল মানেই যে সশস্ত্র বিপ্লবের মতাদর্শ ভুল কিংবা ‘পথের দাবী’ আখ্যানটি বর্জনীয় তা নয়। সব্যসাচীর অনুশীলন সামন্ততন্ত্রকে উদ্দেশ্য করে না। তার আচরণ অনুজ্ঞাসুলভ পুরুষতান্ত্রিক কিন্তু তা কোনওভাবেই ফ্যাসিস্টসুলভ নয়; ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার গুণগত ও পরিমাণগত উপাদান সব্যসাচীর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। অপূর্ব ও সব্যসাচী, ‘পথের দাবী’র দুই প্রধান চরিত্র ভদ্রলোক-শিক্ষিত কিন্তু একইসঙ্গে শিক্ষিত-ভদ্রলোক বাঙালির দুই রূপের প্রতিভূ- একদল যারা মুক্তি চায় কিন্তু নিজেরা স্বার্থপর এবং অন্যদল যারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হয়। ‘নায়ক’ হিসেবে সব্যসাচীর অতিমানবতা বোঝা যায়, “যে নির্মম, একান্ত দৃঢ়চিত্ত শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্বাক্ষ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহমন অহর্নিশ শিখার মতো জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে?” (চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৫, ২৮২) সব্যসাচীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, নিদাগ। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির সম্মিলিত খোয়াবে নির্মিত এমন এক বীর, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়, যার সাহসের সামনে নতজানু হওয়া যায়, কিন্তু ‘সব্যসাচী’ হয়ে ওঠা যায় না। অপূর্ব সব্যসাচীর ‘পৌরুষ’ না হুঁতে পেরে ফিরে যায় গ্রামে, মানুষের সেবা করার জন্যে আর সব্যসাচী নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে ফের অতিমানবীয় ভূমিকা খুঁজে ফিরতে চায়।¹⁵⁴ আর, খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এই দুই-পথের দ্বন্দ্ব বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে পরেও ফিরে এসেছে। শাসক-অনুশাসন মেনে মানুষের সেবা করা নাকি শাসকের বিরুদ্ধে দ্রোহ ক’রে মানুষের মুক্তির পথ খোঁজা- এই দ্বন্দ্ব থেকেছে। কিন্তু, সব্যসাচী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পয়লা নম্বর শত্রু হয়েও দেশী সামন্তপ্রভুদের চিহ্নিত করতে পারে না। শশীকে অনুজ্ঞাসূচক পরামর্শদানের মধ্যে দেশের সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র শিক্ষিত-ভদ্রলোকের পক্ষে সংগঠিত করাই সব্যসাচীর উদ্দেশ্য। শশী গান লিখতে চাইত ‘চাষাভূষা, কুলি-মজুর’-দের জন্য, সব্যসাচী তার এই প্রয়াসকে ‘অসম্ভব’ তকমা দিয়ে বলে যে, যদি সম্ভব হয় কোনওদিন তাহলে তারা নিজেদের সাহিত্য খুঁজে নেবে।

(২৫৫-৫৬) আর, শশীর এই অবস্থান এবং ‘খোয়াবনামা’-র কেরামত আলির অবস্থান কি এক নয়? “শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রিস্টানের নয়, শুধু আমার বাংলা দেশের কবি... তুমি হবে চারণ কবি” (২৬৪) এই আকাজ্ঞা তো কেরামতের সঙ্গেও মিলে যায়। কেরামত তেভাগার গান গাইত, কেরামত হিন্দু-মুসলিম মিলনের গান গাইত, কেরামত মিথ-লোকায়াত-প্রতিস্পর্ধা খুঁজে খুঁজে শোলোক পেতে চাইত, বস্তুতঃ কেরামত বাংলার গান পেতে চাইত। তবে, শশীর সামাজিক অবস্থান কেরামতের থেকে ভিন্ন। সব্যসাচীর মতোই আরেক বিপ্লবী চরিত্র ‘শেষ প্রশ্ন’-র রাজেন, যার কাছে বিপ্লবের চেয়েও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার সংকল্প বড়। দেশ এবং ধর্ম সব্যসাচীর আখ্যানকারের কাছে একই।

নকশালদের চরিত্র বর্ণনায় দুই বিরুদ্ধ-বর্ণনা প্রকট। ১) নকশাল ও ষাট-সত্তরের দ্রোহী মানেই আদর্শবাদী, সৎ, নীতিবাদী ও সাহসী এবং ২) নকশাল ও ষাট-সত্তর দশকের দ্রোহী মানেই আদর্শহীন, অসৎ, সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী ও কাপুরুষ। ব্রতীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবীকে কিছু নেতির নেতিকরণ করতে হয়; ব্রতীর মা সুজাতাকে পরিবারের অন্যদের চরিত্রাবলীর উদাহরণ দিয়ে বলতে হয়,

ব্রতী যদি জ্যোতির মত প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মত মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও এক টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছেন, তাই করত; ঝানু জোচ্চোর হত টোনি কাপাডিয়ায় মতো, দুশ্চরিত্র হত ওর দিদি নীপার মতো, যে এক পিসতুতো দেওয়ার সঙ্গে প্রায় বসবাস করে; তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।
অন্ততঃ ওরা যদি ব্রতীকে দেখে ভরসা পেত, যে বড় হয়ে ব্রতী ওদের মতোই হবে, তাহলেও ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না। (দেবী ৩২)

ব্রতীকে যারা ‘বিপক্ষ’ মনে করত, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনভাবে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুগত এবং ব্রতীর অস্তিত্বকে তারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, যেহেতু ব্রতীর রাজনীতি রাষ্ট্রের

বিপক্ষে। ব্রতী নিষ্কলঙ্ক তরুণ। ব্রতী চরম বিপদের ক্ষণে সহযোদ্ধাদের ছেড়ে পালায় নি। ব্রতী তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃচরিত্র বাবার বিরোধিতা করে। ব্রতী সমাজের অন্যায়ের পাশাপাশি গার্হস্থ্য অন্যায়েরও বিরোধিতা করে। টোনি কাপাডিয়া, দিব্যনাথ, সোয়ামীজি সহ যারা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শসমূহকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাজে চারিয়ে দিত, ব্রতী তাদের ‘বিপক্ষ’। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান থেকে ব্রতী উচ্চ-নৈতিকতা ও কঠোর সততার প্রতিমূর্তি। ব্রতী ‘আদর্শ’ শহীদ। উপন্যাসে ব্রতীর এই চরিত্র চিত্রায়ণ হয় সুজাতার চেতনাপ্রবাহে, কখনে এবং অন্য কুশীলবদের সঙ্গে সুজাতার কথোপকথনে। সুজাতা বুঝতে পারেন যে, ব্রতীকে খুন করেছে একটা আস্ত সমাজব্যবস্থা; পাঠকও এই উপলব্ধিতে উপনীত হয় সুজাতার চেতনাসূত্রের পথ ধরে আখ্যানে এগোতে এগোতে। এই চরিত্রনির্মাণ পদ্ধতির একটা ‘সাধারণ সূত্র’ নকশালবাড়ি-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসে ধাঁচা (stereotype) হয়ে উঠেছে যে, দারুণ মেধাবী ছাত্ররা ‘ভুল বুঝে’ বা তাদের জোর ক’রে ‘ভুল বুঝিয়ে’ একটি ‘হঠকারী’ পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের ‘সহযোদ্ধা (১৯৮২)’ উপন্যাসে এই হাছতাশ সরাসরি প্রকাশ পায় অন্যতম প্রধান কুশীলবের সংলাপে, “গত পাঁচ সাত বছরে বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল... বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশোনা করে সহজেই চাকরিবাকরি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। ভুল হোক, ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ” (পালিত ১৯৮২, ৩০০) খেয়াল ক’রে দেখার ‘বয়েজদের একটা জেনারেশন’ শব্দত্রয়, অর্থাৎ নকশালরা শুধু পুরুষই ছিলেন! আরও লক্ষ্য করার ‘কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ’ এই শব্দগুলি অর্থাৎ সেই হঠকারিতার তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং ‘বিপ্লব বিভ্রান্তিকর’ এমন ধারণাকে প্রশয় দেয়। শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে নদীয়া জেলায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের নির্মাণ আলোচনা করতে গিয়ে এই প্রশ্নটাই তুলেছেন যে, বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ্রা প্রেসিডেন্সির মেধাবী ছেলেদের বিপথগামী অ্যাডভেঞ্চারিস্ট আবেগ নিয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন; ফলে নকশালবাড়ি বিদ্রোহের মূল রাজনৈতিক অভিযুক্তকে গুলিয়ে দেওয়া গেছে।¹⁵⁵ ‘কালবেলা’ উপন্যাসের দীপক, অনিমেষের চরিত্র এই ধারণাকে পরবর্তী

আখ্যানধারায় প্রতিষ্ঠা দেয়। দীপক প্রেসিডেন্সি কলেজের ‘ব্রাইট ছেলে’, উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় স্থানাধিকারী ও শিক্ষিত-উচ্চবিত্ত-ভদ্রলোক পরিবারের সন্তান- দীপক শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠককূলের চেনাবৃত্তের আদর্শ প্রতিনিধি। দীপকের অবোধ ‘বিশ্বাস’ আর ‘আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়ানো’-র যে বয়ান দীপকের গুরুজনেরা বলেন, তাতে ‘রাজনীতি খুব খারাপ, ধংসাত্মক’ এমনটাই বোঝা যায়¹⁵⁶। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র সঙ্গে ‘কালবেলা’র আখ্যানের রাজনীতিগত ফারাক এখানেই। অনিমেষ ক্রমশঃ নিষ্পৃহ হয়ে পড়ে রাজনৈতিক প্রত্যক্ষতা থেকে। রণজয় কিন্তু নিষ্পৃহ বা বিরূপ হয় না। পুলিশি নির্যাতনে অনিমেষ পঙ্গু হয়ে গেছিল আর রণজয় মানসিক ভারসাম্যহীন। প্রতিবন্ধী অনিমেষের অসহায়তা আখ্যানের শেষ অংশে নকশাল রাজনীতির ‘কু’প্রভাব এবং দোষারোপ ও অপরিণামদর্শিতাকেই বড় ক’রে তোলে। রণজয়ের মানসিক ভারসাম্যহীনতা অসহায়তা বা দোষারোপ নয় বরং প্রতিরোধের ভাষ্য হয়ে ওঠে। রণজয় একদিকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে নব্বই দশকের উদারনৈতিক-বিশ্বায়নী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তার অনুসন্ধান জারি থাকে সত্তর দশকের দ্রোহবোধ পুনর্জাগরিত করতে চেয়ে। অনিমেষের সচেতন মানসিকতায় তার অতীতের ভদ্রবৃত্ত, নিশ্চয়তাসম্পন্ন জীবনযাপনের ছবি বারবার ফিরে আসতে থাকে তার আফসোসে, “স্বর্গছেঁড়া কিংবা জলপাইগুড়িতে থাকতে অনিমেষ স্বপ্নেও ভাবেনি তার স্ত্রী এবং ছেলে বস্তির এই পরিবেশে দিন কাটাবে।” (৩০২) কিন্তু, রণজয়ের মানসিক ভারসাম্যহীনতাও তাকে ভুলতে দেয়নি লুকিয়ে রাখা রাইফেলের কথা। রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা ভুলে যায়নি, তার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে গেছিল। দোপ্দ্দী মেঝেনও দ্রোহী হওয়ার অপরাধে সেনাবাহিনী দ্বারা ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হন, কিন্তু, সেই নির্যাতনের চিহ্নকে অসহায়তায় নয় বরং প্রতিরোধের বয়ান করে তোলেন। দোপ্দ্দী ও অনিমেষের শ্রেণিগত ও সামাজিক অবস্থানের যোজন তফাৎ, কিন্তু রণজয় ও অনিমেষের শ্রেণিগত ও সামাজিক অবস্থানের সাযুজ্য রয়েছে। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসের চার প্রোটাগনিস্টের মধ্যে দ্রোণাচার্য জেলের ভিতরে পুলিশি নির্যাতনে শহীদ হন। নিরুপম (পুলিশি

নির্যাতনের শিকার) এবং সুকান্তি আন্দোলনের বহু ভাঙ্গা-গড়ার সাক্ষী হয়েও হতাশা ও অসহায়তার পথে ‘অরাজনৈতিক’ হয়ে যাননি। পাঞ্চগলীও বহু বিপর্যয় পেরিয়ে এসে বিশ শতকের প্রথম দশকে তরুণতরুণী দ্রোহীদের সঙ্গে মিশে উদ্‌যাপন ক’রে চলেন। ‘সোনার টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি’- এই আখ্যানপ্রতর্ক সেই ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস থেকেই চলে আসছে। সত্তর-দশক কেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে এই প্রতর্ক মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোক পাঠকমননে আরও প্রতিষ্ঠা পেল। আরও একটা প্রতর্ক থাকে যে, পুরুষ-বিপ্লবীর সঙ্গিনী (সত্তর দশক-কেন্দ্রিক উপন্যাসে সমকামীতা যেহেতু ‘ব্রাত্য’ বলেই বিবেচিত হতো।) পুরুষ-বিপ্লবীর স্বার্থে অপরিসীম দুর্দাশায় পড়েছে কিংবা তার দ্বারা ত্যাজ্য হয়ে গেছে। ‘কালবেলা’ উপন্যাসে অনিমেষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং মাধবীলতার সংলাপে এই ধারণাই ন্যায্যতা পায়। মাধবীলতা আইনসম্মত বা সামাজিক বিয়েকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখায়; আবার মাধবীলতার সমর্পণও থাকে, “আমি তো তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনি কোনোদিন, শুধু তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে মনে হয় তা আমার জন্যেই করছি- এইটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে কেন?” (৩০১-২)- এই উচ্চারণের মধ্যে কি চিরাচরিত আত্মত্যাগী স্ত্রী, ভাল স্ত্রী, পতিব্রতা নারীর উচ্চারণই সামনে আসে না? “তুমি যদি বলো ওর পিতৃত্বের কোনো দায়িত্ব তুমি নেবে না, আমি কি তোমাকে জোর করতে পারি?” (৩০১)- মাধবীলতার এই উচ্চারণে সামাজিক রক্ষণশীলতাকে অবজ্ঞা ক’রে ‘একক মাতৃত্ব (single mother)’-র কথা বলে। আর, নারী-স্বাধীনতার এই বয়ান সম্পূর্ণতা পায় না ‘মাধবীলতা মিত্র’ নামের ব্যবহারে লেখকের উচ্ছ্বাসে এবং “শান্তিনিকেতনের সেই রাতটাকে আমি আকর্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। তারপর তিলতিল করে সেই আনন্দটুকু আমার শরীরে বড় হল। অনেক আঘাত অনেক অপমান সয়েও আমি সেই আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি।” (২৯৯) এই সংলাপে। লেখক একে ‘নিখাদ ভালবাসা’ এবং আত্মত্যাগে-নিষ্ঠ-ভালবাসা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, একজন পুরুষ-লেখকের পক্ষে তা আশ্চর্যের নয়। সমাজে প্রচলিত ধারণানুযায়ী, নারীরা আঘাত-অপমান সয়েও কখনও স্বামীর

জন্যে কখনও সন্তানের জন্যে আত্মত্যাগ ক’রে ‘আনন্দ’ পেলেই, তা নারীকে দেবীত্বে বা প্রকৃত নারীত্বে উন্নীত করে। নারীর স্বাভাবিক সত্তার উপস্থাপন না হয়ে, অধিকাংশ সময়েই হয় নারীরা অতিমানবীয় ‘দেবী/মহান’ নয়তো অবমানবীয় দমিত কুশীলব। আর, এই দুই উপস্থাপনাই ‘পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী’র উপস্থাপনা। কিন্তু, সমরেশের এহেন উপস্থাপনার ফলে মাধবীলতার সত্তার স্বাধীনতার যে সম্ভাবনা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, ‘নকশাল’ অনিমেঘকে দায়িত্বজ্ঞান-বিবর্জিত, গর্ভবতী স্ত্রী-কে ফেলে পালিয়ে যাওয়া, রোম্যান্টিক স্বার্থপর একজন চরিত্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দেয়। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, ‘কালবেলা’ নকশালবাড়ি কেন্দ্রিক সমস্ত বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম মুখ্য বাণিজ্যসফল উপন্যাস। আর, সেই উপন্যাসেই লেখক সচেতনভাবে এই মডেল তৈরি ক’রে দিচ্ছেন, যা পরবর্তীতে বাণিজ্যসফল রাজনৈতিক উপন্যাস, চলচ্চিত্র ইত্যাদির ‘আদর্শ’ মডেল হয়ে উঠেছে। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর ‘কম্পাস (২০১৬)’ উপন্যাসে এই ধাঁচকে কেন্দ্র করেই আখ্যান আবর্তিত হয়েছে। সত্তর দশকের দ্রোহীরা শুধু হঠকারীই নয়, বরং অসৎ স্বার্থপর এবং পলায়নবাদী; এবং, তারা জোর ক’রে কিছু মেধাবী সৎ ছেলে-মেয়ের জীবন-প্রেম সব নষ্ট ক’রে দিয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থে- এই মোদা বক্তব্যকেই ফুলিয়েফাঁপিয়ে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। প্রোটাগনিস্ট আদীপ্ত প্রথমেই নিজেকে ‘নিরপেক্ষ’ ও আন্দোলনের প্রতি ‘নিষ্পৃহ’ প্রমাণ করতে মূর্তিভাঙ্গার প্রসং এনে বিরোধিতা করে, অর্থাৎ মূর্তিভাঙ্গার ‘ভ্যান্ডালিজমই’ নকশালদের একমাত্র পরিচয়! তারপরই প্রোটাগনিস্টের মুখে বসানো হয় সেই একঘেয়ে সংলাপ, “এই ক’দিনে কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে শেষ হয়ে গিয়েছে, দেখছিস তো!... ওরা বেঁচে থেকে নিজের-নিজের কাজটা মন দিয়ে করলে তো দেশেরই উপকার হত। তুই এসবে জড়াস না”¹⁵⁷ এবং এরই সঙ্গে নকশাল রচিতের শ্রেণিঅবস্থানেরও উল্লেখ থাকে, “রচিত বড়লোক বাড়ির ছেলে। বাবা, কাকারা সবাই খুব বড় উকিল। তাই ওর পক্ষে এসব বিপ্লবের রোমাঞ্চ মানায়”- সেই পূর্বোক্ত মডেলটাই ঘুরেফিরে আসে; ‘বিপ্লব=রোমাঞ্চ’, ‘বিপ্লবী=ধ্বংসাত্মক শখের স্বার্থপর’- প্রোটাগনিস্ট নিরপেক্ষের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া বয়ান।

রাজনৈতিক আখ্যান তৈরির চেষ্টায় আন্তঃপার্টি-সংগ্রামকে নিছকই রাজনীতিহীন গুণ্ণামি দিয়ে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক; আর, এই প্রক্রিয়ায় কুশীলবেদের মুখে বসিয়ে দেন সত্তর দশকের কিছু মুখফেরতা শব্দ ও সংলাপ। উপন্যাসের নায়িকা মউরিমা (আখ্যানে যে অত্যন্ত সৎ, সরল এবং ভাল) রাজনীতি সহ্য করতে পারে না এবং আদীপ্ত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত জেনেই তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেয়। আর, নকশাল যুবক রচিতের যে প্রতিচ্ছবি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় ঔপন্যাসিক, তাতে উপরোক্ত বাণিজ্যসফল রাষ্ট্রীয়-মতাদর্শ প্রকট করাই যে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, তা বোঝা যায়। “রচিত চলে যাচ্ছে জানিস। কবে ফিরবে জানি না। কিন্তু ফিরবে... তাই ওকে আমি দিয়েছি... আমার যেটুকু ছিল, সেটুকু। সবটুকু।” (চক্রবর্তী ২০১৫, ৫১) স্মরণজিতের উপন্যাস-কৌশলের দু’টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য- আশ্চর্য্য সমাপন ও অহেতুক গ্রন্থিদেওয়া কাহিনি এই উপন্যাসেও থাকে, তাই, সিমিকে রচিতের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া ও রচিতের রাখতে দেওয়া বন্দুক ও পুস্তিকা রাখার ‘অপরাধে’ আদীপ্ত-মউরিমার মিলন হয়না। গোটা উপন্যাসের সংকটবিন্দু এটাই, এবং এই সংকট তৈরির জন্যে তথা ‘সুস্থ-স্বাভাবিক’ জীবন-পড়াশোনা-প্রেম থেকে নায়ক-নায়িকাকে বঞ্চিত করার জন্যে দায়ী হয়ে যায় রাজনীতি। মোটিফ হিসেবে ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’তে ফিরে আসে রণজয়ের খুঁজে না-পাওয়া রাইফেল এবং ‘কম্পাস’ উপন্যাসে মোটিফ হিসেবে থাকে ‘কম্পাস ইন পেয়ারস’, তথা একটা উত্তরমুখো ও আরেকটা দক্ষিণমুখো কম্পাস। এই উপন্যাসে নকশাল রাজনীতি, নকশাল যুবক রচিত কিংবা নকশাল যুবকের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপরতা না থাকলেও উপন্যাসের কিছু যেত আসত না; আখ্যানের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। কিন্তু, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যই বোধহয় পাঠককে নিরাজনীতিকরণের অভিমুখে ঠেলে দেওয়া এবং নকশালবাড়ির ‘রোম্যান্স’ পর্বের বাণিজ্যসফল ক্লিশে উপন্যাস-মডেলকে ব্যবহার ক’রে ‘প্রেম বনাম রাজনীতি’ প্রতর্ক তৈরি ক’রে দেওয়া। কেন এই ক্লিশে মডেলগুলির প্রয়োজন হয়? কেন এই একই ধাঁচায় আখ্যান পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন হয়? কারণ, শাসকের মতাদর্শ বিশ্বাস করাতে চায় যে, স্থিতিবস্থাই শ্রেয় এবং সেই স্থিতিবস্থার নিশ্চয়তাকে ভাঙতে চাওয়া ‘পাপ’; কখনও সেই ‘পাপ’ মেধার অপচয়ে আবার কখনও বা

ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির তছনছ হয়ে যাওয়ায়। শাসক মতাদর্শ কোনও দ্রোহঘটনার পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কাছে দ্রোহঘটনার উপস্থাপন এমনভাবে করে যাতে পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকের মনে বীতশ্রদ্ধা জন্মায়, যাতে ওই দ্রোহভাবনার মূল সূত্রগুলির আঁচ পাঠক কোনওভাবেই না পায়। শাসক মতাদর্শ কি দ্রোহঘটনার/দ্রোহমুহূর্তের ইতিহাসকে অস্বীকার করে? না। শাসকের সাংস্কৃতিক দমনমূলক আধিপত্য জানে যে, কীভাবে সেই ইতিহাসকে বাণিজ্যসফলতায় বদলে নেওয়া যায় (লাতিন আমেরিকান সশস্ত্র বিপ্লবী চে গেভারাকে যেভাবে বাণিজ্যসফল পণ্য বানিয়ে নিয়েছে শাসক মতাদর্শ) এবং কীভাবে রাজনৈতিক সূত্রগুলোকে নিরাজনীতিকরণের সিডেটিভে বদলে দেওয়া যায়। আর, বছরের পর বছর এই মডেলে আখ্যানের পুনরুৎপাদন হতে থাকলে পাঠকও একসময় তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, ফলে পাঠকের পাঠের স্বস্তিক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘শ্যাওলা (১৯৭৭)’ উপন্যাসটি হিরণ্ময় নামক এক নকশাল যুবকের ফিরে আসার কথা বলে। উপন্যাসটি সত্তর দশকের রাজনীতিকে আখ্যানে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখা, “নায়ক হিরণ্ময়, একদা যে ছিল উগ্রপন্থী, সে-ই পরে হয়ে পড়ে সর্বতোভাবে উদাসীন, নির্বিকার ও নিরাসক্ত” (মুখোপাধ্যায় ২০১৪, ২) এই যে ‘উগ্রপন্থী’ বিশেষণ হিরণ্ময়ের, আখ্যান এগোলে বোঝা যায় যে, সে নকশাল। অর্থাৎ, ভূমিকাতেই লেখক বুঝিয়ে দেন যে, নকশাল=উগ্রপন্থী। উপন্যাস-বইটির ব্লার্বে লেখা থাকে, ‘শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং সহপ্রতিপক্ষিত্বিক’- লেখকের পরিচয় তথা মতাদর্শগত অবস্থানের এইটুকু আঁচ জেনে রাখা দরকার, বিশেষতঃ প্রকাশক নিজেই উপন্যাসিকের এই ধর্মীয়-মতাদর্শগত অবস্থান পাঠককে জানাতে চান। কোনও ধর্মগুরুর মন্ত্রশিষ্য হওয়ার প্রভাবে সম্পূর্ণ জীবনদর্শন ও যাপন প্রভাবিত হলে, তিনি যে আখ্যানরচনা করেন, সেটাও প্রভাবিত হয় না কি? উপন্যাসটিতে রাজনীতির চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় ‘খতম’ রাজনীতির ওপরে এবং ‘অ্যাকশন’ বা ভায়োলেন্সের ওপরে। “তখন বড় মস্তানদের দিন গেছে, হিরণ্ময়রা পলিটিক্স করতে গিয়ে যে বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাতে মন্ত্রের মতো কাজ হত... চৌদ্দ-পনেরো

থেকে থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের নকশালদের কবজায় তখন পুঁটিমাছের মতো গোটা এলাকার প্রাণ” (১৩) এই ‘বিভীষিকা’, ‘পুঁটিমাছের মতো গোটা এলাকার প্রাণ’ বর্ণনাগুলি রাষ্ট্রের নথি-তথ্যাদিতে প্রচারিত বয়ানকেই তুলে ধরে। রাষ্ট্রের বয়ানকে আঁকড়ে ধরেই মূলধারার সাহিত্যিকরা নকশাল আন্দোলনকে পাঠকসমাজে উপস্থাপন করতে থাকেন, কলকাতা পুলিশ গেজেটে প্রকাশিত রিপোর্টের সঙ্গে হিরণ্যদের কর্মকাণ্ডের প্রভূত মিল,

Let us all remain cautious, careful, cool, unexcited and calculating and cunning. We shall have to deal with the anti-socials and Naxalites not only to defend ourselves, but (also) to protect million others whom we are pledged to protect. These are unusual instructions, but I want all to realise that we are facing an unusual situation and unusual and bold steps are required. Meanwhile let everyone realise that we are from the armed police. (CPG, January 2, 1971)¹⁵⁸

আর, এই বয়ান পুলিশনথিতে সীমাবদ্ধ না থেকে উপন্যাস-গল্প-চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে ছড়াতে থাকলে, তা জনমানসে প্রতিষ্ঠা পায়, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও হিংসাকে ন্যায্যতা দেওয়া যায় এবং ভুয়ো সংঘর্ষে দ্রোহীকে হত্যা করা মান্যতা পেয়ে যায়। কনস্টেবল খুন, পুলিশ খুন¹⁵⁹ ও নিরীহ নাগরিক খুন ইত্যাদির ওপরে জোর দিয়ে বিদ্রোহের মূল মতাদর্শকেই গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এখানেও অব্যাহত। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব উপন্যাসে কীভাবে আখ্যানভিত্তি নির্মাণ করে, এই প্রসঙ্গেই আরেকটি বিষয় আলোচ্য, তা হচ্ছে, সত্তর দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে বীভৎসতা যখন শিল্পসত্তা দাবি করে। দিব্যেন্দু পালিতের ‘সহযোদ্ধা (১৯৮২)’ উপন্যাসে সত্তর দশকের নকশাকবাড়ি কেন্দ্রিক হিংসা বিশেষ মাত্রা পায়। লেখক আদিত্য সংবাদপত্রে পাঠ করে নকশালপন্থীদের হত্যার জন্যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ, উপাংশুকে হত্যা করার বীভৎসতা আদিত্যর

চেতনায় বারবার ফিরে আসে এবং তার মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানের চেতনা রাজনৈতিক হিংসার ফলে দোলাচলে ভোগে। ‘শ্যাওলা’ উপন্যাসে পুরনো পরিচিতদের কাছে হিরণ্যয়ের সাম্প্রতিক পরিচয়, ‘গুপ্তা ছেলেটা যদি ছোরা-টোরা মারে?’, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রাজনীতি কেউ করলেই তাকে সামাজিকতা-বিচ্ছিন্ন ক’রে দেওয়া। এই নীতিতেই বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক ছাপা দেওয়া গেছে। তবে, এই উপন্যাসের আরেক বিশেষত্ব হিরণ্যয়ের মনোবিশ্লেষণ। আর, সেই মনোবিশ্লেষণের সুত্রেই হিরণ্যয়ের নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন, যেখান থেকে ধারণা পাওয়া যায় রাজনীতির,

তুমি আমাদের কাছে একটা ভিয়েতনাম চেয়েছিলে। তোমাকে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি।
তুমি ভেবেছিলে লং মার্চ করবে। সে-আয়োজনও করা গেল না শেষ পর্যন্ত। শেষে কিছু
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুমি অন্তত একটা গোষ্ঠী-বিপ্লব করার কথা ভাবতে। সে পরিকল্পনাও
বানচাল হয়ে গেল... এ-সব কথা হিরণ্যয়ের উদ্দেশে হিরণ্য নিজেরই বলে। (মুখোপাধ্যায়
২০১৪, ১০)

এই বয়ান থেকে বোঝা যায় যে, হিরণ্যয়ের রাজনৈতিক অভিমুখ বামপন্থী দ্রোহে ভিয়েতনামের সমর্থনে চীনের বিপ্লবের সমর্থনে এবং একটি ‘সশস্ত্র গোষ্ঠী-বিপ্লবে’। হিরণ্যয়ের চেতনাপ্রবাহে লেখকের মতাদর্শ ছাপ ফেলে কারণ, নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহের মতো সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত এক সশস্ত্র বিদ্রোহকে সামান্য ‘গোষ্ঠী-বিপ্লব’-এ বদলে নেন শীর্ষেন্দু। ‘রাজনীতি’ শব্দের প্রতি তদুপরি সশস্ত্র বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রথম সূত্র। এরপরে, কখনও চা-দোকানির প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক সংলাপে, কখনও দেশের জনগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যে শীর্ষেন্দু হিরণ্যকে ক্রমেই ‘অ-দেশপ্রেমিক’, ‘হিংসাকামী’, অকর্মণ্য চরিত্রে পরিণত ক’রে নেন। “মনের মতো দেশ তৈরি করতে পারোনি বলে এ দেশের প্রতি না আছে তোমার কোন টান, না আছে মমতা। বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলে তুমি ভেবেছ, এ দেশে আমি কেন কোনও কাজ করব?” (১২) হিরণ্য আর পার্টি করে না, আবার বিরূপ মনোভাবও নেই। হিরণ্য নিস্পৃহ হয়ে

যায়। তার নির্লিপ্ততা তার রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে, নকশাল রাজনীতির ‘ব্যর্থতা’-র প্রতীক হয়ে থাকে। হিরণ্ময়, পুরনো কমরেড যারা সমাজ-সংসারে অধুনা প্রতিষ্ঠিত, তাদের ব্ল্যাকমেল ক’রে পার্টির নামে টাকা নেয়; অথচ সে টাকা ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করে। নকশাল পরিচয়কে শুরু থেকেই সে টাকা ও খাবার জোগাড়ের উপায় ক’রে তোলে। হিরণ্ময়ের প্রতি পাঠকের ঘৃণা জাগে, তেমনি হিরণ্ময়ের পার্টি ও রাজনীতির প্রতিও ঘৃণা জন্মায় পাঠকের¹⁶⁰। মূলতঃ, পলায়নবাদী নীতিহীন স্বার্থপর রাজনীতিকেই তুলে ধরতে চান শীর্ষেন্দু। আর, এটাই বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রচলিত জনপ্রিয় ধারা হয়ে ওঠে। রাজনীতির সমাজ নয় বরং ‘ব্যক্তি’র অভিঘাতই সেখানে বড় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীনতাই মূল উপজীব্য হয়ে থাকে। নকশালবাড়ি আন্দোলন সামান্য পাড়া দখলের লড়াই এবং নকশাল দ্রোহীযুবকরা পাড়ার যেকোনও মস্তানের মতোই আর, শীর্ষেন্দুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও নারীর অস্তিত্ববিকাশের স্বাধীনতার জো নেই। রূপালীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সন্তা পুরুষ-ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাঁধা। এই উপন্যাসেও যথারীতি নকশাল হিরণ্ময় রূপালীকে বিয়ে ক’রে তাকে ফেলে রেখে বাঁকুড়ায় পালিয়ে যায়, রূপালী হিরণ্ময়ের মৃত্যুসংবাদ পায়। কিন্তু, পুলিশের গুলিতে হিরণ্ময়ের মৃত্যু রূপালীর কিংবা পাঠকের শোকোদ্বেগ করে না বরং হিরণ্ময়ের মতো এক অধঃপতিত চরিত্রের মৃত্যুতে রূপালী ও পাঠকের একই অনুভূতি হয়, “পুলিশের গুলি রূপালীকে অবশেষে মুক্তি দিয়েছিল হিরণ্ময়ের হাত থেকে” (৪৫) আবারও ন্যায্যতা পেয়ে যায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর বিষয়টি, যা বারবার রাষ্ট্রের বয়ানের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। আর, এই রাজনৈতিক উপন্যাসটির মূল সংকটবিন্দু হিরণ্ময়ের প্রত্যাবর্তন। হিরণ্ময় পুলিশের গুলিতে মারা না-গিয়ে ফিরে আসে এবং তার ওই ফিরে আসার ফলেই তার সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা কুশীলবেদের টানাপড়েন উপস্থিত হয়। আখ্যানের গঠনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় হিরণ্ময়ের মনোবিশ্লেষণ; বস্তুতঃ হিরণ্ময়ের চেতনাপ্রবাহে ও স্বগতকথনে ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দুর স্বর চেনা যায়। অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য হওয়ার যে তথ্যটুকু প্রকাশক জানিয়ে রেখেছিলেন

পাঠককে, তা যে অবান্তর নয়, তা আখ্যানের মধ্যে উপস্থিত ‘ইমপ্লায়েড অথর’-এর স্বরে বোঝা যায়। আর, এই স্বরেই নৈতিকতা, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত নির্ধারণ ক’রে দেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে হিরণ্যকে দিশাহীন কুশীলব হিসেবে উপস্থাপনের পাশাপাশি ‘ইমপ্লায়েড অথর’ তার ভিন্ন বাচনিকতার মধ্যবর্তিতায় অবতীর্ণ হয়- এই লেখক হিরণ্যের শরীর-মনের যাবতীয় খুঁটিনাটির খোঁজ জানেন। দিশাহীন, স্থিতিহীন হিরণ্যের অতীত কার্যক্রমের নিরিখে তার বর্তমানের কেন্দ্রহীনতার তুলনা করা এবং তার বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট ক’রে তোলাই এই ইমপ্লায়েড অথরের একমাত্র কাজ।¹⁶¹ বিলুর বন্ধুরা বখাটে এবং ‘ওদের যথার্থ মানুষ বলে মনে হয়না রূপালির’- কেন তারা লুস্পেন প্রকৃতির এবং অধঃপতিত তা অনেকগুলি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক লেখেন, “ওরা প্রকাশ্য রাস্তায় ছেলেতে-ছেলেতে চুমু খাওয়া-খাওয়ি করে” (৬৮) সমকামিতা যে ‘ভয়ানক খারাপ’ ও ‘অনৈতিক’, শীর্ষেন্দু সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। পলায়নবাদী রাজনীতিবিমুখ হিরণ্য তার আত্মীয়-পরিজনদের থেকে পালাতে থাকে অদ্ভুত নিস্পৃহতায় অথবা পুরনো সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বীতশ্রদ্ধ সম্পর্ককে দোহন করতে থাকে। হিরণ্য যাদবপুর এইট-বি চত্বর, বিজয়গড়ের যে এলাকায় ফিরে এসেছিল, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র রণজয়ও ওই অঞ্চলেই ফিরে আসে লুকিয়ে রাখা রাইফেল খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। হিরণ্যের মতো তারও দেখা হয়ে যায় পুরনো সহযোদ্ধাদের সঙ্গে, কিন্তু, রাজনৈতিক অভিমুখ ভোলেনি রণজয়। মানসিক ভারসাম্যহীন রণজয় স্বগতকথনে ও দৃষ্টিবিভ্রমে (হ্যালুসিনেশন) এইট-বি চত্বরের লেনিনমূর্তির সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ বুঝে নিতে চায়। হিরণ্যেরও দৃষ্টিভ্রম ঘটে- গবেষক অরূপ দাস হিরণ্যের স্কিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত হওয়ার আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন। এহেন মনোরোগীদের আচার-ব্যবহারে যেমন পরস্পরবিরোধিতা থাকে এবং কাজকর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলাজনিত বিপর্যয় থাকে, হিরণ্যের ক্ষেত্রেও তা ঘটে। তার এককালের বিশ্বাস আদর্শ তার সংশয়জনিত দ্বৈতসত্তার প্রকাশ এবং তার চরিত্রের সামগ্রিক বিন্যাসে বারবার বাধা উৎপন্ন হওয়া সেই মনোরোগের দিকে ইঙ্গিত করে।¹⁶² তার নৈরাশ্যজনিত ব্যর্থতা এতে

আরও পরিস্ফুট হয়। হিরণ্যয়ের স্মৃতিপটে দ্রোহী কর্মকাণ্ডের যেসব স্মৃতি ঝলসে ওঠে, তা কিছু বিক্ষিপ্ত খুনোখুনি এবং ব্যক্তিহত্যা; কিন্তু, রণজয়ের স্মৃতিপটে জেগে ওঠা কর্মকাণ্ডের স্মৃতির ধারাবাহিকতা আছে ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তালমিল আছে। আর, এখানে ‘ইমপ্ল্যায়েড অথর্’-এর স্বর নীতি-অনীতি, উচিত-অনুচিতের বাইনারি দিয়ে বেঁধে ফেলেনি আখ্যানকে। ‘প্রকৃত লেখক (রিয়াল অথর্)’-এর মতাদর্শগত ফারাকের জন্যেই দু’টি উপন্যাসের আখ্যানের সারবস্তুতে এই ফারাক থেকে যায়। উপন্যাসটির অন্তিমপর্বে গঠনমূলক শব্দটি প্রধান চাবি-শব্দ হয়ে ওঠে- হিরণ্যদের রাজনীতি তথা নকশাল রাজনীতিতে ‘গঠনমূলক’ প্রকল্পনার অভাব ছিল বলেই হিরণ্য ওই শব্দটির অভিঘাত সহ্য করতে পারে না- ঔপন্যাসিক এতক্ষণে তা প্রমাণ করে দেন। আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে তার প্রাক্তন সহযোদ্ধারা, প্রেমিকা, পরিচিতরা এবং সমাজছবি ‘গঠনমূলক’ শব্দের বাস্তব-প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। ক্লান্ত, হতাশ, পরিণতিহীন হিরণ্যময় ওই শব্দের অভিঘাত থেকে বাঁচতেই পুলিশের কাছে ফের ধরা দেয়- ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যও সফল হয়! “স্পষ্টতই শীর্ষেন্দু বোঝাতে চান নক্সালবাড়ি-রাজনীতির এরকমই পরিণতি- এই হতাশা, ক্লান্তি, নোংরামি”¹⁶³ ইরবান বসুরায়ের এই অভিমত যথার্থ।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি ও বনবিহারী (২০০০)’ নামক রাজনৈতিক উপন্যাসে আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছে পার্টির ত্রিয়াকলাপ, বিপন্ন মার্ক্সবাদ, কিছু বিশেষ রাজনৈতিক কুশীলবের উপস্থিতি এবং সাল-তারিখ-ঘটনা। আখ্যানকথকের স্বর রাজনৈতিক স্বরের উপস্থাপনা হয়ে ওঠে। সন্দীপনের এই উপন্যাসে রাজনীতির সঙ্গেই মিশে থাকে যৌনতার বর্ণনা এবং অতি-ব্যক্তিগত পরিসরগুলি। বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি ও যৌনতাকে একই বন্ধনীতে রেখে সাহিত্যভাষায় প্রকাশ করার ঝুঁকি হাতে-গোনা কয়েকজন ঔপন্যাসিক নিয়েছেন, সন্দীপন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সন্দীপনকে তাই ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে সচেতন নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। সম্ভবতঃ উচ্চ-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা রক্ষার সমাজনির্মিত ধারণাগুলি থেকেই

বাঙালি রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকরা যৌনতা ও রাজনীতির ব্যবধান রেখে গেছেন। সন্দীপন এই দু'ই পরিসরের ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'আমি ও বনবিহারী'-তে সন্দীপন লেখেন,

এসব কথা তখন সুধী পাঠক, যখন যে বিছানায় এবং নগ্ন... সে তো নিজেও তখন টের পেতনা সাম্য ও স্বাধীনতাকামী তার শরীরোত্তর সমস্ত স্বপ্ন কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সীমান্ত পেরিয়ে একটা মুক্তিকামী দেশের দখল নিচ্ছে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল, কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধী দেশপ্রেমিকেরা- সবচেয়ে যা হতাশার- তার শরীরও আক্রমণকারীর সঙ্গে নিয়েছে কোলাবরেটরের ভূমিকা। (চট্টোপাধ্যায় ২০০৬, ৩৫)

রাজনৈতিক, বিশেষতঃ বামপন্থী রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকদের নির্মিত বামপন্থী কুশীলবেরা বহুক্ষেত্রেই রক্তমাংসের 'চরিত্র'সম হয়ে ওঠেন না কারণ এই যাপনের পরিসর আখ্যানে আসেনা। আবার, এর উল্টোদিকে ঔপন্যাসিকেরা বাণিজ্যিক সফলমডেলে আখ্যানের রাজনীতি-সচেতন কুশীলবেদের যৌনতাকে এতই প্রাধান্য দিয়ে ফেলেন ও খাপছাড়া উপস্থাপনা করেন যে, তাতে রাজনৈতিক বোধ বেমালুম উবে যায়। সন্দীপনের উপন্যাসে ব্যক্তিগত যাপনপরিসর ও যৌনতা ওই ছুঁমার্গকেও মানে না আবার বাণিজ্যসফল মডেলের অতিযৌনতাকেও নস্যাৎ করে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো সন্দীপনও মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছাপূরণের পদ্ধতি থেকে সরে এসেছেন। যদিও, ইলিয়াসের তমিজ বা তমিজের বাপ বা খিজির বা জুম্মনের মা তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট না। সন্দীপন মধ্যবিত্ত প্রোটাগনিস্টদের আখ্যানকে গিনিপিগ বানিয়েছেন; জীবন ছেঁচে তাদের তুলে তুলে এনেছেন। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধে ইচ্ছারোপ করেননি এবং ভদ্রলোকীয় সাহিত্যের সেটে জোর ক'রে আঁটিয়ে নিতে চাননি। মধ্যবিত্তের খিস্তি, যৌনোদ্‌যাপন, ক্ষুদ্র-মহৎ সততাগর্ব, অসত্যতার পরিধি ছুঁয়ে দেখার উদগ্রবাসনা এবং সম্পর্ক-অতিসম্পর্ক-বিচ্ছেদের মুহূর্তগুলিকে জীবনজোড়া হাল্‌তাশের মধ্যে চেটে চেটে খাওয়ার তৃপ্তি- সবই আছে। তার আগুলে ভোটের কালিও আছে আবার 'আমি তো রাজনীতি বুঝি না' বলাও আছে। শাসকের 'গণতন্ত্রের উৎসব' পালনের নাটকের সঙ্গে নিরাজনীতিকরণের সিডেটিভ নিরন্তর যোগান

দেওয়াও আছে। সন্দীপনের সাহিত্যের রাজনীতি এই সমস্ত কিছুই সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করায়। কিন্তু, ইলিয়াস ও সন্দীপনের আখ্যাননির্মাণে তফাৎও রয়েছে অনেক। ইলিয়াস আধুনিক ফাঁপা মানুষদের নিয়ে ফাঁদা সাহিত্য থেকে ঘেঁষায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন আর সন্দীপনের লেখা আখ্যান তাদের ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। সন্দীপনের উপন্যাস-গল্পের সিংহভাগ প্রোটোগনিস্ট ‘অধঃপতিত’ ফাঁপা ভদ্রলোক কিন্তু সন্দীপন নিরাজনীতিকরণের মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সচেতনভাবেই।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি ও বনবিহারী (১৯৯৭)’ উপন্যাসের শুরুতেই লিখেছেন, “১৯৬৭ থেকে ১৯৯৭- বামপন্থী রাজনীতির এই ঐতিহাসিক সময়টা বেছে নিলেও (এবং তার ব্যবহার যথাসাধ্য তথ্যনিষ্ঠভাবে করা সত্ত্বেও)- এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়”¹⁶⁴। এই ঘোষণার পরপরই আরও একটি বিষয় জানিয়ে দেন যে, উপন্যাসের ভাষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি করবেন। সন্দীপন নিজেই উপন্যাসের বিভিন্ন বর্গভাগ নাকচ ক’রে দিচ্ছেন। উপন্যাসের রাজনীতিও শুরু হচ্ছে এই নাকচ করা এবং গ্রহণ করার যুগপৎ অভিযানে। ‘আমি ও বনবিহারী’-র বহিরঙ্গের আরও দু’টি বৈশিষ্ট্য হল- উপন্যাসটি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা (বুদ্ধদেব তখনও মুখ্যমন্ত্রী হননি) এবং এই উপন্যাসটির জন্যেই সন্দীপন আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। উপন্যাসের কথক তথা ‘আমি’ এবং বনবিহারী একই মানুষ কিনা, লেখক নিজেই সেই সংশয় তৈরি করেছেন। “সুখী পাঠক, আমাকে ‘প্রাণ’ বলে ডাকুন” (১৩) শুরুতেই বলে দিয়ে প্রাণ, আমি ও বনবিহারী এই তিনভাগে ভেঙে নিয়েছেন কথক ও প্রোটোগনিস্টকে। উপন্যাসের অংশ-১১ শেষাংশে পৌঁছে ‘আমি’র যে সংকট তৈরি হয়, তাতে বনবিহারী এবং আমি দু’জনকেই একই ফার্নেসে ঢুকতে হয়। লেখকের বারবার পাঠককে উদ্দেশ্য ক’রে “এখানে আমি আগাগোড়াই বনবিহারীর একটি প্রজেকশান” সচেতন বিবৃতির মাধ্যমে আখ্যানপাঠ সচকিত হতে থাকে। ঔপন্যাসিক আখ্যান ভাঙ্গাগড়ার সচেতন কারিকুরি অন্যান্য উপন্যাসেও দেখিয়েছেন। প্রোটোগনিস্টের আখ্যান থেকে বিযুক্তি কিংবা কথকের আচমকাই পাঠকের হাত ছেড়ে বেরিয়ে

যাওয়ার চেষ্টা কি বাংলা উপন্যাসে সন্দীপনীয় আমদানি? না। দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলিতেও এই সচেতন আঙ্গিক বিদ্যমান। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে কথক জানিয়ে দিয়েছিল যে, বাঘারু ও মাদারির মাকে নিয়ে আর এগোতে অপারগ সে। বরং বাঘারুদের অনন্ত পদক্ষেপে পা মেলাতে না-পেরে কথককে বলতে হয়, “আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না” (রায় ২০১৩, ৫০৩) এবং ঔপন্যাসিক স্বীকার ক’রে নেয়, “ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মত, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা যায়। তাই, অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে” (৪৯১) দেবেশের ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ উপন্যাসে রাজনৈতিক-সামাজিক সংকটের সন্ধিক্ষণে যোগেন মণ্ডলকে প্রোটাগনিস্টের চরিত্র ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয় “এই নভেল থেকে এখানেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি” এবং বেরিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণটাও ব্যাখ্যা ক’রে দেয় সে। কিন্তু এইসব তো নিম্নবর্গকে নিয়ে আখ্যান রচনার সমস্যা, নিরক্ষর-অতিপ্রান্তিক মানুষদের নিয়ে আখ্যান লেখার সাহিত্যবর্গীয় ‘সমস্যা’- ঔপন্যাসিক আখ্যাননির্মাণের সততা প্রমাণ করতে চান। ‘আমি ও বনবিহারী’ তো এমন কোনও নিম্নবিত্ত নিরক্ষর নিম্নবর্গের আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রামের উপন্যাস নয়। ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত পরিসরের সংকট। মধ্যবিত্ত কথক আর মধ্যবিত্ত ঔপন্যাসিক আমি-বনবিহারী-প্রাণ এই তিনজনের ভূমিকা অদলাবদলি ক’রে দিচ্ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যাপনের সংকটকে আখ্যায়িত করতে। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র শেষে গ্রন্থমুক্তি দিতে দিতে কথক জানিয়ে দিয়েছিল বহুক্ষণ একসঙ্গে চলার পর পাঠকের উষ্ণ করতল ছেড়ে বৃত্তান্তের দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা।¹⁶⁵ ‘আমি ও বনবিহারী’র কথকও ‘সুধী পাঠক’কে তেমনটাই জানান বারবার। কিন্তু, ওই আখ্যানবন্ধন ও আখ্যানমুক্তির মধ্যে জ্বলন্ত এক সময়ে পুড়ে যাওয়া একটি মানুষ ও পুড়ন্ত পারিপার্শ্বিকের কথা বলে দেন। ‘আমি ও বনবিহারী’ নঞর্থক মতাদর্শে স্থিতিবস্থার সময়ে পুড়ে যাওয়া এক ব্যক্তির আখ্যান। যতক্ষণ অ-স্থিতিবস্থা ছিল, সজীব-সদর্থক

ছিল বনবিহারী; স্থিতিবস্থায় তার মতাদর্শ পচে গেছে। বনবিহারী, প্রাণ ও আমি- এই তিনজন নকশালপন্থী রাজনীতি এবং সংসদপন্থী রাজনীতি এই দু'টির প্রতিনিধি।

“অ্যাই, তুমি তো একজন কমিউনিস্ট। নেতৃস্থানীয়। তোমাকে এক-এক সময় মানুষ মনে হয় না কেন?” (চট্টোপাধ্যায় ২০০৬, ২৭) প্রতিভার এই বিপন্ন বিস্ময়ের যথার্থ্য রক্ষা করতেই ৪ঠা জুন ১৯৮৯ সাল জেগে ওঠে কিংবা স্তালিনের রেড আর্মি কর্তৃক নিপীড়নের উল্লেখ থাকে। আর, প্রতিভার ‘সাম্য ও স্বাধীনতাকামী শরীরোত্তর স্বপ্ন কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে’ এই উল্লেখও জরুরি হয়ে পড়ে কারণ বনবিহারীর নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রতীক কমিউনিস্ট মতাদর্শের নষ্ট অনুশীলনের প্রতীক এর থেকে ভাল কীই বা হতে পারে!? আদতে উপন্যাসটির মোদা বক্তব্য সাধের সমাজতন্ত্র কীভাবে নষ্টদের অধিকারে যায় তা বিবৃত করা। সারকথা একজন বামপন্থীর দুর্নীতিগ্রস্ত খল বদের আঁটি বনে যাওয়া। সেই মূল্যবোধহীন স্বঘোষিত কমিউনিস্ট তরুণী পরিচারিকাকে অর্থের বিনিময়ে যৌনসম্পর্কে বাধ্য করে ও তার মৃত্যুর কারণ হয়। ষাট-সত্তর দশকের আগুনখোর বামপন্থী থেকে আশির দশকে বামফ্রন্টের চোখের মণি বনে যাওয়া ব্যক্তিটি কতটা অনৈতিক হয়ে গেলে “বাবা... বাবাই বলত আমাকে। ইচ্ছে ছিল ওকে সৎপাত্রস্থ করব।” (৫৩) এমত সম্পর্কিত তরুণীকে প্রতি খেপে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যৌনসম্পর্ক করে- এই আদিমতা বিবৃত করতেই কি যাবতীয় আখ্যানকৌশল? ভাষার মারপ্যাঁচ? কথকের সংযুক্তি বিযুক্তির আঙ্গিকবদল? উত্তর হ্যাঁ এবং না। ‘হ্যাঁ’-এর উত্তর উপন্যাসের শব্দ, যতিচিহ্ন, বাক্যবিন্যাস, চিত্রকল্প এগুলোতে ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। কিন্তু, উত্তর যে ‘না’-ও, তা কয়েকটি সূত্র ধরে এগোতে এগোতে টের পাওয়া যায়।

facts gathered in the documentary novel are, in principle neither willing to depart too far from reality nor are they utilized to intentionally endorse an imposed vision or interpretation of reality (Flis 2010, 68)

ফ্লিস বলছেন যে, সাধারণত তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস ‘documentary data’-র ভিত্তিতে রচিত হয়¹⁶⁶- সন্দীপনের ‘আমি ও বনবিহারী’ উপন্যাসেও কি তেমনই আখ্যানের বাস্তবতা ও কাল্পনিকতার সামঞ্জস্য রক্ষার কৌশল? ১৯৭১ সালের ১২ অগাস্ট কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যা। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিয়োনানমেন স্কোয়ার ৪ঠা জুন ১৯৮৯। ১৯৬৯ সালের ১লা মে চারু মজুমদার কানু সান্যালের বক্তৃতা, সিপিআই(এম-এল) প্রতিষ্ঠা। ২১শে জুন ১৯৭৭ জ্যোতি বসুর শপথ পাঠ। সরোজ দত্তের ‘মৃত্যু’, ৫ই অগাস্ট ১৯৭১। বাগনান কৃষক সম্মেলন। ‘আমি ও বনবিহারী’ সংবাদপত্রের আর্কাইভ না। কিন্তু এই প্রত্যেকটি তথ্য ও তারিখের সঙ্গে বনবিহারী-আমি-প্রাণ-প্রতিভা অঙ্গঙ্গী। তাদের মতাদর্শগ্রহণ, মতাদর্শবিচ্যুতি এবং মতাদর্শাক্রান্ততা জড়িয়ে রয়েছে। আখ্যানের রাজনীতিতে এই ডকু-ফিকশন জরুরি। নইলে একে নিছক ‘সব চরিত্র কাল্পনিক’ বলে উড়িয়ে দেওয়াই যেত। যায় না, কারণ অজয় মুখার্জীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর দ্বন্দ্ব, রামেশ্বরের সঙ্গে শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র কমিউনিস্ট সংগ্রাম মিলিয়ে নেওয়া এবং জ্যোতি বসুর ভোটে জেতার পরিসংখ্যান খুঁতহীন বাস্তবতার খুঁটিনাটি বিবরণ উপন্যাসে ছেয়ে থাকে। বাস্তবের কমিউনিস্ট নেতৃত্বগের নাম একের পর এক আছড়ে পড়তে থাকে। আর থাকে পার্টি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শয্যাদৃশ্য থেকে পণ্যসম্ভোগ সবেতেই পার্টির উপস্থিতি। “আমি জানতাম, আমিই ওকে পাব। কমরেড প্রতিভা সেনকে। সব চেয়ে বড় কথা, পার্টি জানত।” (১৪)- বনবিহারীর গর্বিত বয়ানে কথকের পর্যবেক্ষণ মেশে। প্রাণ-প্রতিভা-বনবিহারীর ত্রিমুখী সম্পর্কের ইঙ্গিতে রাজনীতির অনপনেয় ছায়া-নকশাল প্রাণকে সিপিআই(এম) পার্টি থেকে এবং নিজের জীবন থেকে একইসঙ্গে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিপিআই(এম) সহকর্মী বনবিহারীকে বিয়ে করে প্রতিভা। বনবিহারী তাত্ত্বিক ভদ্রলোক নেতা। প্রতিভার প্রতিবাদী স্বর অন্তর্ঘাতী বয়ানে উপস্থিত থাকে আখ্যানে এবং তার অন্ধত্ব সেই বয়ানের পরিপূরক হয়ে ওঠে। প্রতিভার অন্ধত্ব কি অযাদিপাউসের মতোই দৈব নির্ধারিত? প্রতিভার প্রতি করুণাসিক্ত মায়া জাগে না পাঠকের? চক্ষুস্মান হয়ে প্রতিভা যা দেখেছে সব ভুল বলেই ‘প্রতিভা আরও কী কী দেখতে পাবে না/ করতে পারবে না’ নামক এক আপাত-

অপ্রয়োজনীয় অংশ জুড়ে নিতে হয় কথককে। আর, এই যে পার্টির সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব, এই পার্টিতন্ত্রও তো বাস্তব ছিল তিন দশক- তথ্য আর মুখফেরতা গল্পে গল্পে এবং সংবাদপত্র থেকে প্রজন্মান্তরের অভিজ্ঞতায় অ-কাল্পনিক দৈনন্দিন ছিল। সবকিছু নথিতে থাকেনা, তার মানেই তা মিথ্যে নয়। যা নথিবদ্ধ, উত্তর-সত্য জমানায় তার সবটুকু সত্যি নাও হতে পারে। “There is no longer any such thing as fiction or nonfiction; there’s only narrative”- এই বাক্য মেনেই ডকু-নভেলের সংরূপকে আগিকে ঢেলে সমসাময়িক স্থিতিবস্থার রাজনীতির আবরণহীন নির্মাণ করছেন সন্দীপন?

নকশালবাড়িসহ ষাট-সত্তর দশকের গণআন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে জারিত প্রোটোগনিস্টরা বাংলা নভেলে নির্মিত হওয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা যা আখ্যানবৈশিষ্ট্য, সন্দীপনের ‘আমি ও বনবিহারী’-তে সেই সবই মজুত। কিন্তু এরপরেও দু-তিনটি কথা বাকি থেকে যায় যা ওই ‘আধিকাংশ’ বস্তাপচা নির্মাণের থেকে ‘আমি ও বনবিহারী’-কে একটু বেশি রাজনৈতিক ক’রে তোলে- ডং-এর মুখে সেই লোকটির আদল “৭০-এর দশকে দেওয়ালে দেওয়ালে স্টেনদিলে যার মুখ আঁকা থাকত।” (চট্রোপাধ্যায় ২০০৬, ৫৫) আর, ডিং-এর আদলে, “গায়ের উড়ন্ত ওভারকোট, এলোমেলো আলগা টাই, মাথাভর্তি লালচে টাক- চলমানতা হঠাৎ থামিয়ে বাঁ দিকে ঈষৎ মুখ ফেরানো।” (৫৩) এই কাল্পনিক লেনিন আর মাও-সে-তুং অধঃপতিত ধান্দাবাজ পণ্যসম্ভোগী উচ্চবর্গ বনবিহারীকে চুল্লীতে ঢোকায় দায়িত্ব নিয়ে। ডিঙ ও ডঙের সামনে কোনও মুখোশ পরা চলে না, মতাদর্শ-বেচা-ভোটবাজ হওয়ার অভিনয় চলে না এবং একটা ‘হেস্তুনেস্ত’-তে পৌঁছতেই হয়! বনবিহারীকে ছেড়ে ‘আমি’ আবারও বেরিয়ে আসে অথবা কথক তাকে বের ক’রে আনে। মতাদর্শই কি শুদ্ধিকরণের একমাত্র পথ নয়? উপন্যাসটি কেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করেছিলেন, সন্দীপন তা ভাঙ্গেনি কোনওদিন; কিন্তু সন্দীপন কেন সিপিআই(এম)-র জার্সি পরেননি সেই রাজনৈতিক অবস্থান উপন্যাসেই রয়েছে। ‘আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি (১৯৮৫)’ উপন্যাসে ‘কংগ্রেসের মাতাল ছেলেগুলো’ ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল ‘একজন

নেশাচুর অবসরপ্রাপ্ত মার্কসিস্ট'কে এবং সেই মাতাল মার্কসিস্ট কংগ্রেসকে বিপজ্জনক খিস্তি মেরে নাক-মুখ ভেঙে ঘরে ফিরেছিল। কিন্তু, 'আমি ও বনবিহারী'-তে দক্ষিণপন্থীদের (মূলতঃ কংগ্রেস) সামান্য জায়গাও দেওয়া হয়নি, আখ্যানের বাস্তবতায় কোনও ঠাঁই নেই তাদের! কংগ্রেসকে বোধহয় ঘৃণাসূচক অবজ্ঞাই করতেন সন্দীপন, তাই প্রায় সব উপন্যাসেই তাদের হিরণ্ময় অনুপস্থিতি। “আসলে লেখাটাই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব করা আর সেটাই করে যেতে হয়।”¹⁶⁷ বলেছিলেন সন্দীপন। যদিও সন্দীপন-রচিত সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য না কারণ (১) সংস্কারবাদী স্থিতিবস্থার সাহিত্যপথ থেকে উত্তরণের কোনও অভিমুখ নেই (২) শোষিত নির্বিত্তের বিপ্লবী ক্রোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রকট/প্রধান দ্বন্দ্বগুলির কোনও সূত্র নেই এবং (৩) মধ্যবিত্তের চেতনাকেন্দ্রিক ভাষা ও আখ্যানপট ছাড়া চলমান দ্বন্দ্বগুলির ও শ্রেণিসংগ্রামের (এবং নিম্নবর্ণের) বিকাশের অভিমুখে কোনও দিশা নেই। সন্দীপন বিবর্তনশীল মধ্যবিত্তের অবক্ষয় আখ্যানবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং প্রচলিত সংস্কারযাপন-প্রথা ভাঙার কিছু নির্লিপ্ত সূত্র কাহিনিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন- সেখানে তিনি সফল।

‘কোলাজ (১৯৯৮)’ উপন্যাসের শুরুতেই নকশালপন্থী কমিউনিস্টদের খুন হওয়ার বিবরণ বালসে ওঠে। আখ্যানের বাস্তবতা প্রমাণে যুগান্তর ও শারদীয় চন্দ্রবিন্দু থেকে উদ্ধৃত করেছে কথক। সাহিত্যিক হিমাদ্রি রায়চৌধুরীকে সৃষ্টি করতে হয়েছে লেখককে, যার দিনলিপির অন্তর্ভুক্তি ২৮শে অগাস্ট ১৯৭১ সালের। সন্দীপনের নিজের ডায়েরিতে এই ঘটনা বিবৃত। তাঁর সমকালীন কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর ডায়েরিতেও। ১৯৭১ সালের ১২-১৩-১৪ অগাস্ট তিন রাত ধরে ঘটে চলা কাশীপুর-বরানগরে সিপিআই(এম-এল) সদস্য ও সমর্থকদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন কোনও কোনও সাহিত্যিক, নিভৃত ডায়েরিতে বা আলাপচারিতায়। হিমাদ্রি নকশালপন্থীদের পত্রিকায় লিখেছিল বলে গণহত্যার রাতে আতঙ্কে লুকিয়ে পড়ে, “সে রাতে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বনানী। ভয় থেকে বাঁচতে আমি ওর সায়ার মধ্যে আশ্রয় চাই” (৩৭২) লেখে ডায়েরিতে এবং “আমার কী, আমি তো আর নকশাল নই (সত্যিই নই)” আউড়ে

নকশালনিধন যজ্ঞের আগুন থেকে বাঁচতে চায়। বেঁচেও যায়। নিরাপদ থাকে। আখ্যানস্থ হিমাদ্রি রায়চৌধুরীরা যে বাস্তবের ‘নিরপেক্ষ’ সাহিত্যকূলের ‘অরাজনৈতিক’ রাজনীতির প্রবক্তা এবং অন্ধ সেজে প্রলয় বন্ধ দেখাতে চায়, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা (১৯৭৭)’ উপন্যাসেও এদের কথা থাকে। সুজাতা এদের নিরপেক্ষ নিরাপদ সাজার প্রাণান্তকর প্রয়াসকে অভিযুক্ত করে। আদতে শাসকবিরোধী না-হওয়ার রাজনৈতিক অবস্থান। মহাশ্বেতা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “সত্তর থেকে বাহাত্তর- পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা ও কলকাতা যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল তখন পেশাদারী সাহিত্যিকরা কতখানি নীরব ছিলেন সবাই জানেন... এই আনইনভলভমেন্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ।”¹⁶⁸ সন্দীপন নিজেও সরব হননি কখনও। তাই কি উপন্যাসে এই মুহূর্তগুলির উল্লেখ ‘অবিবেকী পাপ’ স্থালনের চেষ্টা করতেন?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথের গোরা প্রথম ভদ্রলোক উচ্চবর্ণ নায়ক, যে কৃষকদের পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখিয়ে জেলে গেছিল। বস্তুতঃ এই পুলিশ মেরে, ব্রাহ্মণ জোতদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে গোরা জেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘দেশ’ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এরপরেই জীবন ও ঘটনার গতিপ্রবাহে গোরা আত্মাবিকার করে। তার ভারতবর্ষের সন্ধান পায়, তার জন্মরহস্য উন্মোচিত হয়। ব্যক্তি সঙ্গে সমাজের অঙ্গঙ্গী সম্পর্কে কালস্থানধৃত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা ব্যক্তিমানুষকে অনুসন্ধান-গোরার সার্থকতা সেখানেই। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর বাংলায় গোরার মূল চালিকাশক্তি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও অহমানুষসন্ধান। গোরার সামাজিক অবস্থান উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণি (ধর্মপরিচয়ের উৎস পাল্টে যাওয়ার পরেও, গোরার ধমনীতে ক্ষাত্র স্কটিশ রক্ত প্রবাহিত) এবং অবশ্যই গোরা শিক্ষিত-ভদ্রলোক! গোরার আত্মাবিকার, বিবর্তন ও গোরার চোখ দিয়ে দেখা নিম্নবর্ণ নিম্নশ্রেণির বাস্তবতাই এই উপন্যাসের উপজীব্য। তার পরের উল্লেখযোগ্য নায়ক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব্যসাচী। সেও উচ্চবর্ণ, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত; সব্যসাচীর আদর্শ এবং সব্যসাচীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি লেখকের নিয়ন্ত্রণ সব্যসাচীকে অতিমানব অ-

সাধারণ অতিনায়ক ক'রে তুলেছে। কিন্তু, দেশবাসীর জন্যে জীবন উৎসর্গ করা এমন শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-আদর্শবাদী নায়ক ভবানন্দের পরে সস্যাচাঁই প্রথম; ভবানন্দ ও জীবানন্দের থেকে সব্যসাচী অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও সর্বগুণসম্পন্ন! 'আনন্দমঠ', 'গোরা' ও 'পথের দাবী'- তিনটি উপন্যাসেই শাসকের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করে প্রটোগনিস্টরা। শাসকও তাদের প্রতি কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায়; যুদ্ধ, প্রতিআক্রমণ, জেল কিংবা চক্রান্তের জাল- উক্ত প্রটোগনিস্টদের এইসব সহ্য করতে হয়। দ্রোহীদের প্রতি শাসকের হিংসা তথা রাষ্ট্রীয় হিংসা (violence) এই রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত। ষাট-সত্তর দশককে কেন্দ্র ক'রে লেখা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে দ্রোহীদের ওপরে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও হিংসা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু, উচ্চবংশের সন্তান, উচ্চবিত্ত হলে কি নির্যাতনের পরিমাণ কম হয়েছে? গ্রেপ্তার হওয়া দ্রোহীর 'ভদ্রলোক' ছাপ থাকলে, কড়া-পুলিশ গলা-পুলিশ খেলা কিছুটা বেশি সময় চলত। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জার্নাল সত্তরে' উল্লেখ করেছেন। গলা-পুলিশরা জেরা করতে এলে, কফি-সিগারেট খাইয়ে পঁচিয়েঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে, "ভদ্রসন্তানের স্বীকৃতিটুকু পাওয়া যেত।" কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন তাঁর বাড়ির পরিচয় জেনে অফিসারের নরম আচরণ। 'আটটা নটার সূর্য'-তে নিরুপম বা পাঞ্চগলী কোনও মুহূর্তে ওই 'ভদ্রসন্তানের স্বীকৃতি' পেয়ে যায়। 'কমুনিস' উপন্যাসটির আখ্যানে কালস্থানিকতা সত্তর দশকের প্রথমে বেলেঘাটা অঞ্চলে নকশালপন্থীদের কর্মকাণ্ড। প্রটোগনিস্ট গোরা 'ভদ্র-শিক্ষিত' কিন্তু নিম্নবিত্ত। তার সহযোদ্ধারা নিম্নবর্ণের ও নির্বিত্ত শ্রেণির। 'হাজার চুরাশির মা'-তে ব্রতী ও সমু দু'জনেই রাষ্ট্রের গুলিতে শহীদ হয়েছিল, কিন্তু, শ্রেণিবিভাজন কি কাজ করেছিল সমুর মা এবং ব্রতীর মায়ের (সুজাতা)-র আচরণে? ব্রতীর মা সুজাতা সমুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় শহীদপুত্রদের চেতনাকে ধারণ ক'রে। কিন্তু, শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের বৈপরীত্য প্রকট হয়। 'কালবেলা' উপন্যাসে অনিমেষের সহবন্দি দীপক পুলিশি হেফাজতে প্রবল নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে; অনিমেষ নিজের ও দীপকের শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের ফারাক সম্বন্ধে সচেতন হয় জেল থেকে বেরিয়ে।

জয়ন্ত জোয়ারদারের ‘এভাবেই এগোয় (১৯৭৮)’ এমন কয়েকজন কুশীলবের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়, যারা ব্রতী, বিনু, নিরুপমদের মতো ‘সং আদর্শবাদী’ নয়। দেবেন, পীযুষরা কেউ তাত্ত্বিক নয়, মুক্তির ‘লাল স্বপ্ন’ নিয়েও নকশালবাড়ির দ্রোহে যোগ দেয়নি; কলকাতা শহরের তথাকথিত ‘লুস্পেন’ ও ‘ফেলনা’ সমাজের অংশ এরা, সাদা-কালো বাইনারির বাইরে আখ্যানের মধ্যে রক্তমাংসের কুশীলব। তাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু বাস্তবের দমবন্ধ প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি এবং তাদের প্রতি ভদ্রসমাজের সমস্ত দুরছাইকে জবাব দেওয়া। দেবেন, পীযুষরা পরিবারের ওপর বীতশ্রদ্ধ, রাষ্ট্রের প্রতি বিস্মুদ্ধ এবং সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত। গোবিন্দ, সমর, নরেশ, সুবল, ইদ্রিসদের কেউই তথাকথিত ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি নয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে শহরে সংগঠন গড়ে তোলা কয়েকজন তরুণের রাজনৈতিক কথোপকথন পাঠকের সামনে আসে, যেখানে আন্দোলনে মধ্যবিত্ত প্রবণতার প্রতি দুর্বলতার দিকে আঙুল তোলে গৌতম ও স্বপন। আর, এই পর্বেই ব্রাহ্মণ্যবাদী টেক-নেম প্রত্যাখ্যান করে গৌতম-স্বপন “বামুন মানেই সাধারণ মানুষ থেকে দূরত্ব” (৮) সরাসরি ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করছে কুশীলবেরা- লেখকের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ গভীর না হলে এমনটা হয়না। সুবলের নিজের উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রতি বিরক্তির কারণ তার বাবার পিতৃতান্ত্রিক আচরণ ও রেশন-ব্ল্যাক করা। মিনুর আদর্শ বারবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কঠোর মতাদর্শ ও বাস্তবের আর্থ-সামাজিক সংকটের মধ্যে। ইরাবান বসুরায়ের বিশ্লেষণে, “রাজনৈতিক লাইন নিয়ে উপন্যাসে আলোচনা আছে কিন্তু ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ওপরে ভর দিয়ে চরিত্রগুলি দাঁড়ায় না। মনে হয় বিতর্কসভার বিবরণ” (বসুরায় ১৯৮০, ২৭) ইরাবানের এই বিশ্লেষণের কারণ গৌতম-স্বপন-দেবেন-মিনুর কথোপকথনে রাজনৈতিক আলোচনা যত এসেছে, তাদের ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত তত স্পষ্ট হয়নি। এই কুশীলবেদের চরিত্র ক’রে তোলায় লেখকের কর্তৃত্ব বড় বেশি, লেখক আগে থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কন কুশীলবকে দিয়ে কোন সংলাপ বলাবেন এবং কোন কুশীলবের মতাদর্শগত অবস্থান কীভাবে ন্যায্যতা দেবেন।

অ-ভদ্রলোক অ-শহুরে নায়কের নির্মাণ

নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির প্রধান কুশীলবদের মধ্যে নিম্নবর্ণ-নির্বৃত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি খুব বেশি নেই। ব্যতিক্রম ‘কমুনিস (১৯৭৫)’, ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)’ এবং ‘মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭)’। ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ ও ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ এই দু’টো উপন্যাসে দু’জন পূর্ণাঙ্গ ‘অশহুরে অভদ্রলোক অশিক্ষিত’ প্রোটাগনিস্ট পেল বাংলা সাহিত্য। নকশালবাড়ি বিদ্রোহে দলিত/নিম্নবর্ণ ও আদিবাসী মানুষদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। কৃষিজীবী ও শ্রমিক নিম্নবর্ণ যোগদান না করলে, এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি হত না। কিন্তু, তাঁরা ক’টি রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হতে পেরেছেন? নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের জমিদখলের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। ১৯৬৭ সালের ২৫শে মে পুলিশের গুলিতে প্রসাদজোতে আটজন নারী ও তিন শিশুসহ মোট ১১জন শহীদ হলে জোতদার, পুলিশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত ও শহুরে ছাত্রছাত্রীযুবরা এই বিদ্রোহে বিপুল পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। তরাই এলাকার সেই আন্দোলন এরপর ভারতের কৃষিবিপ্লবে নতুন তত্ত্ব ও অনুশীলনের জন্ম দেয়, যার রেশ এখনও চলছে। আর, যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, সেই আটজন কৃষক নারী রাজবংশী ও আদিবাসী জনজাতির ছিলেন- অর্থাৎ নিম্নবর্ণ। তাঁরাও কেউই রাজনৈতিক উপন্যাসের মুখ্য কুশীলব হয়ে ওঠেননি, উপন্যাসিক গল্পকারেরা কেউ তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে আখ্যানের কেন্দ্রে রাখেননি। কিছু গল্প উপন্যাসে তাঁদের নাম এসেছে, অথবা কয়েকটি মাত্র অনুচ্ছেদে তাঁদের কথা এসেছে। কিন্তু, নকশালবাড়ি বিদ্রোহে ও ’৬০-র দশকে কৃষিবিপ্লবের অনুশীলনে এঁরাই পথিকৃৎ ছিলেন। ১৯৬৭ সালের জুলাইতে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কাছে প্রতিবাদপত্র পেশ করেন ধুলিয়াজোত, ঝিঙ্গাজোত, রামবলোজোত, রাইমতিজোত ও লক্ষ্মীজোতের মহিলারা। ওই

প্রতিবাদপত্রের বয়ানে পুলিশি আক্রমণে ঘরদোর বিপর্যস্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে ও পুলিশ কর্তৃক দৈহিক নির্যাতনের বিরোধিতা করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিবাদপত্রে ‘টিপসহি’ দেওয়া ১৯ জনের নাম- তাঁরা প্রত্যেকেই সাঁওতাল ও রাজবংশী জনজাতির¹⁶⁹। আর, অ-ভদ্রলোক, অ-পুরুষ, অ-মধ্যবিত্ত নিম্নবর্ণের এই সম্ভবতঃ প্রতিবাদের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বহু দশক আগে রাজমহলের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল ও মাল-পাহাড়িয়া জনজাতি বসতি গড়ে তোলেন। তেভাগা আন্দোলনের সর্বাধিক বিস্তৃতি এবং সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ এই অঞ্চলেই সবথেকে বেশি ছিল। শুধুমাত্র নকশালবাড়ির প্রসাদজোতের ওই কৃষকনারীরা নয়, বা জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের আদিবাসী ও তপসিলি জনজাতি নন, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই নকশালবাড়ি বিদ্রোহের মতাদর্শগত প্রভাবে নিম্নবর্ণের অসংখ্য মানুষ যোগ দিয়েছিলেন আন্দোলনে। ক্ষেতমজুর, দিনমজুর¹⁷⁰, গরিব ও মাঝারি কৃষক এবং নিম্নবিত্ত¹⁷¹ মানুষের যোগদান ও শাহাদাতের উদাহরণ প্রচুর। রুহিতন কুর্মি, দোপ্দি মেঝেন, বসাই টুড়ুদের শ্রেণি অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও পরিচিতির-রাজনীতিও (identity politics) বোঝা প্রয়োজন। ১৯৭০-৭১ সালে বীরভূমে সিপিআই(এমএল)-র ২৭০ জন কর্মীর মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণি অনুযায়ী ১১১জন ছিলেন ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, গরিব ও মাঝারি কৃষক এবং ৪৩ জন ছিলেন নিম্নবিত্ত¹⁷²। তৎকালীন বীরভূমের মোট জনসংখ্যার ৩০% তফসিলি জাতি ও ৭% তফসিলি জনজাতির অনেকেই নকশালবাড়ি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন- উক্ত ২৭০ জনের মধ্যে ২৮.৫১% ছিলেন তফসিলি জাতিভুক্ত ও ৯.২৫% ছিলেন তফসিলি জনজাতিভুক্ত।¹⁷³ পুলিশ-রেকর্ড অনুযায়ী শহীদ হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের ৬৮% ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, গরিব ও মাঝারি কৃষক এবং নিম্নবিত্ত; আর, তাঁদের মধ্যে ৪৯% নিম্নবর্ণের মানুষ¹⁷⁴। কিন্তু, সিংহভাগ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে এঁদের প্রতিনিধিত্ব নেই, কিংবা থাকলেও তা নগণ্য। মধ্যবিত্ত নায়ক, উচ্চবর্ণের উদারচেতা নায়ক-নায়িকার বীরত্ব-কাহিনির অনুশঙ্গে এঁদের উপস্থিতি কখনও টের পাওয়া যায় আখ্যানে। এঁরা যে

বৃহত্তর মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজের কাছে মূলতঃ অপরিচিত থেকে যান, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ ভাস্করজ্যোতির বইটিতেও পাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় নকশাল দ্রোহী ও শহীদদের শ্রেণিগত ও জাতিগত তালিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মানে শহীদদের যে ছবির তালিকা দিয়েছেন, তাতে তফসিলি জাতি ও জনজাতির কারোর ছবি নেই। শহীদতালিকায় ‘কাহার’, ‘মাল’, ‘বাগ্‌দী’, ‘বাউরি’, ‘কিসকু’ পদবীভুক্ত অনেকের উল্লেখ আছে, কিন্তু লেখক তাদের ছবি জোগাড় করতে পারেননি। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে হুগলি জেলার সাঁওতাল-অঞ্চলের রূপা বাউড়ির দ্রোহী ভূমিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার পরিসর দু’টি অধ্যায়ের বেশি না। আরও কয়েকটি অধ্যায়ে দ্রোণাচার্য ঘোষ, পাঞ্চালীদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার ভিত্তিভূমি হিসেবে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলটির কথা থাকে এবং আখ্যানস্থ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভূমিকা দ্রোণাচার্য, পাঞ্চালীদের সমগুরুত্ব পায়না। মূলবাসী দ্রোহী হিসেবে বাসন্তী হাঁসদার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়, কিন্তু কতটুকু? স্বর্ণ মিত্রের ‘গ্রামে চলো (১৯৭২)’ উপন্যাসের আখ্যানভূমি ঝরিয়া-তালডাংরার সাঁওতাল পরগণা। কালীপদ, ভোলা শবর, সত্যবান- এঁরা মূলবাসী মানুষ এবং সত্যবান অন্যতম প্রধান চরিত্রও বটে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে ‘গ্রামে চলো’ই প্রথম উপন্যাস যা শহুরে পরিসরের বাইরে আখ্যানভূমি ও অ্যাকশনভূমিকে প্রতিষ্ঠা দেয় ও একজন মূলবাসীকে প্রধান চরিত্রে চিত্রিত করে। কিন্তু, আখ্যানের মূল উদ্দীপক ও অন্যতম প্রধান চরিত্র রঘু, যে শহুরে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত মেধাবী রাজনীতিবোদ্ধা। সত্যবান, কালীপদদের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা, শ্রেণিবোধ ও সংস্কারমী মনোভাবকে জাগিয় তোলে রঘু। উপন্যাসটি আখ্যানের রঘু ও লেখক স্বর্ণ মিত্রের মনোবাঞ্ছার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। গুণময় মান্নার ‘শালবনি (১৯৭৮)’ উপন্যাসে মোহন দুলে ও শ্যামলী দু’জনেই দলিত নিম্নবর্গীয়। কিন্তু, এখানেও লেখক গুণময়ের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেণিবোধ চেপে বসে আখ্যানের কুশীলবেদের ওপরে। অমলেশ চ্যাটার্জী-র মেসিহা-ভূমিকা ছাড়া মোহন, মথুরা হয়তো জাগতে পারত না। মথুর কৌড়ির শ্রেণিবোধ ও সংগ্রামে তার সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয় অবস্থান প্রকট হয়। মূলবাসী যে কুশীলবেরা যথার্থ চরিত্র হয়ে

উঠতে পারত, তা হয় না; সমালোচকও একথা স্বীকার করেন, “বনা টুডু চরিত্রটির মধ্যে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, লেখক এই চরিত্রটিকে বিকশিত করেননি।”¹⁷⁵ ‘গ্রামে চলো’ ও ‘শালবনি’ দু’টি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নকশালবাড়ি বিদ্রোহের চেতনা বড্ড সহজে যেন বুঝে ফেলে মূলবাসী ও দলিতরা, কনভিন্সড হয়ে যায়; অথচ তাঁদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বোধের দ্বন্দ্ব ত্রিাশীল থাকে না। জাতিগত বর্ণগত নিপীড়নকে উদ্দেশ্য না করেই সরলীকৃত পথে তাঁরা শ্রেণিসংগ্রামে উদ্দীপিত হয়ে পড়েন- লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রের জন্যে তা আদর্শ হলেও, বাস্তবের শোষণপদ্ধতিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর, পশ্চিমবঙ্গের বর্ণ ও জাতিভিত্তিক রাজনীতির সমীকরণে নিম্নবর্ণের সকলেই যে কৃষিবিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তা নয়। রণবীর সমাদ্দার তাঁর প্রবন্ধে নমঃশূদ্র দলিত ও অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় তফসিলি জাতি ও জনজাতির আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য খুঁজেছেন আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে নমঃশূদ্র মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন উদ্বাস্তুশিবিরে বসতি গড়েছেন এবং কৃষি ও নিম্নবিত্ত-জীবিকায় উপার্জনের পথ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী পরিচিতির খোঁজ করেছেন। তাঁর মতে, ষাটের দশকের শেষভাগে উত্তরবঙ্গ, দঃ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও বীরভূমের নিম্নবর্ণের দ্রোহী ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলনের সঙ্গে নমঃশূদ্রদের যোগ সেভাবে স্থাপিত হয়নি¹⁷⁶

the lower castes who in the mid and late-1960s had joined in large numbers the militant agrarian movements in north Bengal, Birbhum, South 24 Parganas, and in Medinipur, had little affinity to share with the struggling Namasudras. Names of agrarian militants from a lower-caste background, such as Babulal Biswakarma, Kadam Mullick, Hajera Sanpui and Indra Lohar, will feature in any history of the popular movement for justice in the mid and late-1960s. (Samaddar 2013, 78)

যদিও, রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার উদাহরণ প্রচুর। উত্তরবঙ্গের জোতদারদের অধীনে বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর হয়ে কিংবা চা-বাগানের শ্রমিক হয়ে এঁদের অনেকেই দিনাতিপাত করতেন। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ শুরুর প্রথম মাসেই জোতদারদের এক সম্মিলিত বাহিনী পাঁচ জন কৃষককে খুন করে, তাঁরা ছিলেন ফাঁসিদেওয়া এলাকায় মুসলমান ও রাজবংশী কৃষক¹⁷⁷। বাবুলাল বিশ্বকর্মা নকশালবাড়ি বিদ্রোহের শহীদ; ভূমিহীন কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ, মাত্র ১৭ বছর বয়েসে কৃষকসভার সদস্য, ১৯৬০-র দশকে খড়িবাড়ি-ফাঁসিদেওয়ায় জোতদারদের বেআইনি জমিদখল করার কৃষক-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব এবং ১৯৬৮-র সেপ্টেম্বরে শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পরে চারু মজুমদার প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যাতে শহীদের রক্ত বৃথা না যায়। কৃষিবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠার লড়াই বসাই টুডু, রুহিতন কুর্মি, দোপ্দি মেবেনরা করেছিল। বীরভূমের আদিবাসী কৃষকরা যে নকশালবাড়ির দ্রোহে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, তা ভাস্করজ্যোতি রায়চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এবং ভূয়ো সংঘর্ষে বিদ্রোহের শুরুর দিকে যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম মোহন চ্যাটার্জী, রঘুনাথ সেনগুপ্ত, লক্ষণ মাল, গোপাল কিসকু ও বুধন বাগদী¹⁷⁸। শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে তাঁর গবেষণাগ্রন্থে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন নদীয়া জেলায় নকশাল আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। চূর্ণী নদীর উত্তর দিকে খিস্মা অঞ্চলে ‘বুনো’ বা সর্দার সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে আদিবাসী ভূমিহীন কৃষকেরা একটি দীর্ঘ-পদযাত্রা (লং মার্চ) করেছিল শোষণের বিরুদ্ধে এবং প্রায় ৬০ জন আদিবাসী মাওবাদী যুবকযুবতী নদীয়ায় গেছিল বলে গোয়েন্দানথি উল্লেখ করে।¹⁷⁹

মহাকালের রথের ঘোড়া-র প্রোটোগনিস্ট রুহিতন কুর্মি একজন আদিবাসী বিপ্লবী। একদিকে তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিনিধিত্ব, আত্মপরিচয়ের সীমাবদ্ধতা থেকে সামাজিক উত্তরণের প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে জমির অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবে

অংশ নেওয়া; যে বিপ্লবচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রচণ্ড অভিঘাতে সমাজবদল কতটা হয়, সে ব্যাপারে লেখকের সংশয় প্রকাশ পেলেও, রুহিতন কুর্মির আত্মপরিচয়ের যন্ত্রণা প্রকট হয় পুরোপুরি। কৃষ্ণমূর্তির বিশ্লেষণে,

Basu empathetically releases the Naxalite uprising and its revolutionary agent from the futility of post revolutionary dreariness by framing it within the epic narrative of *Mahabharata*, whose central plot of a massive ,self-destructive war becomes an apt metaphor for the revolutionary war. In the totality of epic time, the individual is at once a sacrificial victim on the rack of history *and* an indispensable instrument of revolutionary change. (Krishnamurthy 2017, 144)

মহাভারতের মিথের অনুষ্ণ ‘দ্রৌপদী’ গল্পেও স্পষ্ট। সমরেশ বইয়ের ভূমিকায় কবিতার প্রকরণে কিছু কথা লিখেছেন, যেখানে তিনি স্পষ্টতই ইতিহাসের আড়ালে থেকে যাওয়া মানুষদের কথা লিখতে চেয়েছেন, “কী হয় বিচার আঠারো অক্ষৌহিণীর/ দলীয় বিশ্বাসে বিশ্বস্ত সমর্পিত-প্রাণ-নেতাদের প্রতি/ লড়েছিল জান কবুল, কী নাম ওদের? শহীদ?” (বসু ১৯৮৮, ভূমিকা) অক্ষৌহিণী (সৈন্যসংখ্যা পরিমাপের একক) সেনার উল্লেখ মহাভারতে রয়েছে, এঁদের কারোর নাম পাওয়া যায় না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এঁরা পাণ্ডব ও কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, অথচ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়ে এঁদের গুরুত্ব প্রবল; রুহিতন কুর্মিকে এই আঠারো অক্ষৌহিণীর এক ‘অনামী’ সৈন্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন সমরেশ। আখ্যানের অভ্যন্তরীণ বিরোধভাসও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে- রুহিতনের সশস্ত্র বিপ্লবের গর্বিত আত্মানুভব ও নিজের প্রতি ঘৃণানুভবের দ্বন্দ্ব, প্রগতিশীল-আধুনিকতা ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব, রুহিতনের নিম্নবর্গীয় অবস্থান ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার দ্বন্দ্ব। উপন্যাসটি এক নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক চাষীকে কেন্দ্র ক’রে, তার

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন্দোলন-পরবর্তী স্থিতিবস্থাকে দেখতে চাওয়া। সময় এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য মোটিফ, কারণ উপন্যাসের নামেই ‘মহাকাল’-র ইঙ্গিত রয়েছে, যে মহাকাল সময়ের যাত্রাপথের নিয়ন্ত্রা। আখ্যানের গতি একরৈখিক নয়, রুহিতনের বর্তমানের সঙ্গে রুহিতনের অতীতের সংযোগ ঘটান লেখক; আর, আখ্যানের কথক রুহিতনের বর্তমান থেকে রুহিতনের অতীত (কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্রোহে যোগদান) ঘটনাগুলি ছিঁড়েকুটে আলাদা ক’রে ফেলতে চান। আখ্যানের কথক আখ্যানের পাঠককে বুঝিয়ে যায় যে, রুহিতনের আকাজ্জা-বিশ্বাস-আদর্শের সঙ্গে তার পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শের ভয়াবহ দূরত্ব রয়েছে। কলকাতার মনুমেন্টের নিচে সভায় “রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানতো না। সভা শেষ হতেই তার মনটা কেমন হতাশায় ভরে উঠেছিলো।” (২০) রুহিতনের সঙ্গে কলকাতার, রুহিতনের সঙ্গে দিবা বাগচির অমোঘ দূরত্ব। আখ্যানের কথক রুহিতনের ভাবনার ‘এজেন্সি’ নিয়ে জানিয়ে দেন যে, রুহিতন ও তার চা-বাগানের সহকর্মীদের কোনও ‘রাজনৈতিক উপলব্ধি’ হয়নি কলকাতার সভায় গিয়ে¹⁸⁰। লেখক সমরেশ রুহিতনকে ‘সামান্য এক ঘোড়া’ হিসেবে দেখেছেন, যাঁর দায়িত্ব আনুগত্যপূর্ণ অবস্থান থেকে মহাকালের রথ টেনে নিয়ে যাওয়া, আর, আখ্যানের কথকও সমরেশের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই ন্যায্যতা দিয়ে চলে। রুহিতন দিবা বাগচির দেখানো রাজনৈতিক স্বপ্নের কথা মনে করে জেলের ভেতরে বসে দিবা বাগচির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে। কিন্তু, এখানেও আখ্যানকথক পাঠককে এক অনপন্যেয় দূরত্বের ধরতাই দিয়ে রাখে; আখ্যানকথকের কথনে রুহিতনের দেখা স্বপ্নের উল্লেখ থাকে। “সেই সফল স্বপ্নে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবায় কথা কয়। বক্ষ্য নারীর সন্তান হয়। ভূমিহীনে ভূমি পায়। জনমজুরে রাজ্য চালায়” (৫০) ভূমিহীনের ভূমি আর জনমজুরের রাজ্য চালানোর ‘স্বপ্ন’টুকু বাদ দিলে বাকি স্বপ্নসফলতার প্রত্যাশা নেহাৎই অবৈজ্ঞানিক, অরাজনৈতিক ও অবাস্তব। হয়তো লেখক সমরেশ আখ্যানকে কাব্যময় করতেই এমন সব কাব্যিক বাক্য-উপমা-রূপক প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু, আখ্যানের কথক কি এই উদাহরণগুলো দিয়েই পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চান যে, রুহিতনের দেখা স্বপ্নগুলি

আসলে রুহিতনের নয়? কিংবা রুহিতন-দিবা বাগটির স্বপ্নে ‘ভুল’ ছিল এবং রাজনৈতিক অধিকারের প্রত্যাশাগুলিও আসলে কাল্পনিক/অবাস্তব? কারণ, রুহিতনের বকলমে আখ্যানকথক পাঠকের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করছে এই বর্ণনার অংশে। আর, বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে প্রান্তিকচাষীদের জমি-বাড়ির সংস্থান দেওয়ার পরে আখ্যানের কথক রুহিতন কুর্মির চোখমুখের তৃপ্তিকুণ্ডল বুঝতে পারেন ঠিকই। রুহিতনের বিপ্লব করার বা জমির অধিকারের রাজনীতি করার প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়েছে, তা আখ্যায়কের বকলমে লেখকই আখ্যানের পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চান। রুহিতনের বিফল হওয়া এবং তার শ্রেণি-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ফুরানোর যে আখ্যান সমরেশ রচনা করেছেন, সমালোচক পুলক চন্দ তার রূঢ় সমালোচনা করেন,

উপন্যাসের শেষে যখন একজন বিফল, ভগ্ন-হৃদয় মানুষের জন্যই শুধু জেগে থাকে সমবেদনা, বিষাদ আর ব্যক্তি রুহিতনের জন্য চোখের জলের প্লাবনেই ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় বিপ্লবী রুহিতনের সংগ্রামী জীবনাদর্শ- তখন সমরেশের উদ্দেশ্যের দাঁত-নখ গোপন থাকে না কিছুই (চন্দ ১৯৭৭, ১২০)¹⁸¹

উপন্যাসে মিথ্ ও সংস্কার বারবার ফিরে আসে রুহিতন ও আখ্যানকথকের সংলাপে। সব উপন্যাসেই কোনও এক আবিষ্কারের বিন্দু থাকে, যে মুহূর্তটিতে কোনও কিছু ‘আবিষ্কার’ করা যায় আখ্যানের ভেতর এবং তাতে আখ্যানের গতিপথ সঞ্চালিত হয়। এই আবিষ্কারের মুহূর্তটি এই আখ্যানে আসে রুহিতনের কুষ্ঠরোগ প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে। তার আগে পর্যন্ত জেলের ভেতরে অন্য দ্রোহী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তার যে আত্মিকযোগ তৈরি হয়েছিল, তা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। “তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো না নাকি? তোমার হাত পায়ের গোড়ায়, মুখে লাল চাকা চাকা দাগ কিসের? নিজের নাক মুখ দেখে বোঝ না?” (বসু ১৯৮৮, ৫৩) জেলবন্দি হওয়ার পরে খেলু চৌধুরীর সঙ্গে সংলাপে রুহিতনের ‘নিরাজনীতিকরণ (depoliticization)’ হচ্ছিল, কিন্তু, তার দেহে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ আবিষ্কার হওয়ার পরে তার ‘একলা’ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে, আখ্যানের এই অংশের পর থেকেই ‘রুহিতন

কুর্মি'র সঙ্গে জুড়ে থাকা সব মিথ্ ভেঙে পড়ছে এবং রাজনীতি থেকে তার বিযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া যুক্তিসিদ্ধ হচ্ছে আখ্যানে। রুহিতনের চেতনাপ্রবাহে বিভিন্ন মিথ্, অলৌকিক, লৌকিক সংস্কার ফিরে ফিরে আসে, আখ্যানবুনোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। আখ্যানকথক রুহিতনকে এক নিম্নবর্গীয় ট্রাজিক নায়ক ক'রে কখন এগিয়ে নিয়ে যেতে চান বলেই কি আদিবাসী সমাজের উপরিতলের বিভিন্ন মিথ্ ও অলৌকিকের উদাহরণ দেন? জেলের ভেতর সহযোদ্ধাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে তার মনে হয়, “এ সবই যেন তার প্রাক্তন জীবনের বোঙর অলৌকিকতা। খেলুবাবুর এই সব কথা। তার শরীরের এই ব্যাধি” (৫৪) কিংবা, দিবা বাগচির রোগেভোগা চেহারা নিয়ে তার মনে হয়, “লেখাপড়ার কি এই দোষ? রুহিতনের মনে অবাক জিজ্ঞাসা। তা না হলে দিবা বাগচির এত রোগ ব্যামো কেন? যেন বোঙর কোপ। অর্থাৎ অপদেবতার” (২০)- এই ভাবনাগুলো যে রুহিতনের, তা আখ্যানকথক পাঠককে জানিয়ে দেয় এবং রুহিতনের চেতনাপ্রবাহের ইজারা (agency) নিয়ে অলৌকিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয় আখ্যানকথক। কিন্তু, এই মিথ্, মুখফেরতা বিশ্বাস বা অলৌকিক আখ্যান কোনও প্রতিরোধের আখ্যান হয়ে ওঠে না; ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ কিংবা ‘খোয়াবনামা’তে যেমন প্রতিরোধের আখ্যান হয়ে উঠেছিল। বরং, লেখক সমরেশ এই অলৌকিক বিশ্বাস, মিথ্গুলির উল্লেখ করেন শুধুমাত্র রুহিতনের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শের দূরত্ব বোঝাতে এবং রুহিতনের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ‘অনাধুনিক’ সামাজিক অবস্থানকে উপস্থাপন করতে। রুহিতন প্রবল বিষাদমুহূর্তে উচ্চারণ করে ছড়া, “উত্তরে ঘনাইল মেঘ/ পচ্ছিমে বরষিল গা!/ ভিজি গেল গাবানি কাপড়” (৫৫) এবং আখ্যানকথক পাঠককে ওই ছড়ার মর্মার্থ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেন। দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র বাঘারুও এইরকম লোকায়ত ছড়া উচ্চারণ করে কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য থাকে। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তে মেঘ-বৃষ্টির ছড়া বসাই ও মুসার মুখে উচ্চারিত হয় কিন্তু তার সঙ্গে তাদের যোগ নিবিড়। রুহিতনের মুখে এই ছড়ার উচ্চারণের নির্দিষ্ট প্রতিরোধক্ষমতা বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তা আখ্যানকথক উল্লেখ করে রুহিতনের ‘অপরত্ব’ বোঝাতে। উপন্যাসের ৬৩-৬৭ পাতায় রুহিতন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের

বর্ণনা নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহের ‘অ্যাকশন’মুখর বর্ণনা এবং ব্যক্তি রুহিতনের সঙ্গে সশস্ত্র-সংগ্রামী রুহিতনের দ্বন্দ্বও চলতে থাকে। আর, আখ্যানকথক এবং লেখক সমরেশ রুহিতনের চেতনাপ্রবাহে বিদ্রোহ-পরবর্তী সময়ের ধারণাও তুলে ধরেন। “সেই মুক্ত এলাকার চেহারা এখন কী রকম?... সত্যি মিথ্যে জানে না, তবে সব খবরই আশাহীন ব্যর্থতায় ভরা” (৬৮) রুহিতন সেই ব্যর্থতাকে নিজের মতো বিশ্লেষণ করে স্মৃতিপ্রবাহের মধ্যে। আখ্যানকথক রুহিতনের স্মৃতিপ্রবাহে চলতে থাকা রাজনৈতিক বর্ণনায় রুহিতনদের যে ‘অ্যাকশন’কে প্রাধান্য দেন, তা হচ্ছে “হত্যা, জখম, লুট, ক্ষেত্রবিশেষে আগুন লাগানো, আর অস্ত্রাগার তৈরি সবই সত্যি। মিথ্যা না” (৬৮) আগের আলোচনায় দেখিয়েছি যে, শাসকের মতাদর্শ নকশালবাড়ি বিদ্রোহের ‘ভায়োলেন্স’ বা হিংসাত্মক কার্যকলাপকে তাদের রাজনীতির একমাত্র পরিচায়ক বলে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত পাঠকের সামনে পেশ করেছে। রাষ্ট্রের গেজেটে কিংবা বাণিজ্যিকধারার উপন্যাস-গল্পে নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহ গঠনমূলক রাজনীতির নয় বরং ধ্বংসের উগ্রপন্থার নেতিবাচকতার দ্যোতক। সমরেশের লেখায় রুহিতনের চেতনাপ্রবাহ দিয়ে আখ্যানকথকও ওই নেতিবাচক শব্দগুলিতেই (খুন, আগুন লাগানো ইত্যাদি) জোর দেন। আর, ‘মুক্ত এলাকা’র অস্তিত্ব যে নেই, রুহিতনের সঙ্গে পাঠকের দ্বিরালাপে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। রুহিতন অদূর অতীতের ‘ভূত’ হয়ে ফেরে তার নিজের এলাকায়, রুহিতনের আত্মোপলব্ধির অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে একদা ‘মুক্তাঞ্চল’-র বাসিন্দাদের গণস্মৃতিলোপ ও সময়ের অভিমুখে নিজেদের ‘গুছিয়ে নেওয়া’-র নির্লিপ্ত যাপন। কৃষ্ণমূর্তির বিশ্লেষণে,

In prison, among comrades, the diseased body of the erstwhile revolutionary offered a critique of the doctrinal quality of the movement, but in a new postrevolutionary landscape, Ruhiton’s identity ironically reverses itself into a sublated signifier of collective activism, idealism, and progressivism. In the new Naxalbari, once a

“liberated zone” under his leadership, but now an unfamiliar site of prosperity with “tall shiny buildings,” Ruhiton returns as a phantasmagoria from the not-too-distant past to challenge the acquisitive amnesia of the survivors. (Krishnamurthy 2017, 155)

রুহিতনের অন্তর্বয়ান, রুহিতনের ক্ষয়ে যাওয়া এবং রুহিতনের সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে সময়ের অভিমুখে ধাবমান সমাজের আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। কিন্তু, কৃষ্ণমূর্তি রুহিতনকে ‘delinked from Maoist frameworks’ বলেছেন, রুহিতন কুর্মির সময়ে অর্থাৎ নকশালবাড়ি দিদ্ৰোহের সময় ‘মাওয়িস্ট’ শব্দটা সিপিআই(এম-এল) ব্যবহার করত না, বরং ‘মাও সে তুং চিন্তাধারা’-তেই বিশ্বাস রাখতেন তাঁরা।

এই উপন্যাসে সহনায়কের ভূমিকায় দিবা বাগচি, যার চরিত্রনির্মাণে নকশালবাড়ি কৃষকদিদ্ৰোহের অন্যতম পথিকৃৎ চারু মজুমদারের ছায়া স্পষ্ট। “দিবা বাগচি বরাবরই রুগী মানুষ... দিবা বাগচির বল তার চোখের আগুনে, মুখের কথায়... দেশ স্বাধীন হওয়ার দু বছরের মধ্যে পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিয়েছিল” (২০)- এই বর্ণনাগুলি মিলে যায় চারু মজুমদারের জীবনীর সঙ্গে। দিবা বাগচির গ্রেপ্তার হওয়া ও মৃত্যুর বর্ণনাও চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর সনে সাদৃশ্যপূর্ণ¹⁸²। আখ্যানকথকের ভূমিকা স্পষ্ট হয় দিবা বাগচির সঙ্গে রুহিতনের সংযোগস্থাপনে। খেলু চৌধুরীসহ অন্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তার যে দূরত্ব সাধিত হয়, তাও দিবা বাগচির ‘পরোক্ষ’ উপস্থিতির জন্যেই। রুহিতন মহাকালের রথের অনুগত ‘ঘোড়া’র মতোই দিবা বাগচির রাজনৈতিক আদর্শকে আঁকড়ে ধরে। জোতদারের বংশগত শ্রেণিপরিচয় প্রত্যাখ্যান ক’রে দিবা বাগচি ভূমিহীন আধিয়ার ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলিয়ে দেয়- রুহিতনের মতো আদিবাসী ক্ষেতমজুরের চোখে দিবা বাগচিকে ‘দেবতা’ ক’রে তুলতে চান আখ্যানকথক। রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিকে ‘পূজ্য’ বানানোর যে সংঘাত, রুহিতনের ভাবনার মধ্যে দিয়ে আখ্যানকথক তা জানিয়ে দেন পাঠকদের। ‘ব্যক্তি বনাম রাজনীতি’- একটি বাংলা

রাজনৈতিক উপন্যাসের বহুচর্চিত ডিসকোর্স- এই ডিসকোর্সটি এই আখ্যানে প্রকট হয় রুহিতনের ভাবনায় দিবা বাগচির উপস্থিতিতে, রুহিতন বনাম খেলু চৌধুরীর রাজনীতি-সংক্রান্ত সংলাপে এবং আখ্যানকথকের সঙ্গে পাঠকের দ্বিরালাপে। রুহিতনের চরিত্রনির্মাণে রুহিতনকে ‘অপর’ বলে নির্মাণ করতে গিয়ে সমরেশ রাষ্ট্রের চোখে ও সম্বোধনে রুহিতনকে ‘তুমি’ ক’রে দেন। একমাত্র জেলের একজন ডাক্তার তার সঙ্গে ‘আপনি’ সম্বোধনে বাক্য-বিনিময় করে। রুহিতনের নিম্নবর্ণীয় অবস্থানের জন্যেই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা সহজেই তাঁকে ‘আপনি’-র সম্মান না- দিয়ে, ‘তুমি’ সম্বোধনকে প্রাধান্য দেয়। খেলু চৌধুরির সংলাপে রুহিতনের ‘অপরত্ব’ প্রকট হয় আরও। রুহিতনের কুষ্ঠরোগের জন্যে খেলু চৌধুরি রুহিতনের ‘অনিয়ন্ত্রিত’ আদিবাসী জীবনযাপনকে চিহ্নিত করে; কারণ, না-আদিবাসী ভদ্রলোকেদের চোখে সাঁওতাল-সংস্কৃতি মানেই অপরমিত মদ্যপান, ‘লুবু খাঁকড়ি’ নিয়ে ফুর্তি করা ও অপরিস্ফুট যাপন¹⁸³। খেলু চৌধুরি রুহিতনের রাজনৈতিক মতামতের বিরোধী হয়ে খুব সহজেই তাকে ব্যক্তি-আক্রমণ করতে পারে কারণ, রুহিতন অ-ভদ্রলোক, অ-শিক্ষিত এবং আদিবাসী; আর, এই তিন বৈশিষ্ট্যই খেলু বা রাষ্ট্রের চোখে সে ‘অপর’। ‘মহাভারত’-র সঙ্গে আরও বেশ কিছু সাদৃশ্য সমরেশ এই আখ্যানে রেখেছেন। উপন্যাসের শেষে পার্টি, সামাজিক স্তর ও পারিবারিক স্তরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুষ্ঠরোগী রুহিতন তার লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের কাছে ফেরে। মহাভারতের ‘বিরাট পর্বে’ অর্জুন তার সমস্ত দিব্য অস্ত্র ও শস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল শমীগাছের ডালে। সেই অস্ত্রের খোঁজ শুধুমাত্র পাণ্ডবরা জানত। রুহিতনও ‘শেষ সম্বল হিসাবে কিছু জিনিস (অস্ত্রের বাক্স)’ লুকিয়ে রেখেছিল জঙ্গলের ভেতর একটি অর্জুন গাছের নিচে, তার পার্টির নেতা দিবাবাবু একমাত্র সেই লুকোনো অস্ত্রের কথা জানত। “অনেক্ষণ চেষ্টার পরে, ডবল ব্যারেল একটা বন্দুক বেরিয়ে এল... তার সঙ্গে কতগুলো টোটা” (৮৬) যে রুহিতন মহাকালের রথের সামান্য এক ‘ঘোড়া’ মাত্র, সত্তর দশকের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে সে অস্ত্র পুনরাবিষ্কার করল। কিন্তু, অর্জুনের সঙ্গে তার পার্থক্য এখানেই যে, অর্জুনের অস্ত্র খুঁজে বের করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ও সেই অস্ত্রের নির্দিষ্ট অভিযুক্ত ছিল

(এই অস্ত্র দিয়েই উত্তরকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুন বিশাল কৌরববাহিনীকে পরাজিত করে); কিন্তু, রুহিতনের অস্ত্রের অভিমুখ নেই। ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য’ও নেই। “সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে” (৮৬) অর্জুনও তাদের অজ্ঞাতবাস পর্বের ‘অপমান আর অভিশাপ’ থেকে মুক্তি পায় ওই অস্ত্র ব্যবহারের পরেই। এই লুকোনো রাইফেল পুনরুদ্ধারের ঘটনা ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)’-তেও ঘটে, রণজয় অ্যাসাইলাম থেকে সুদূর কলকাতায় পালিয়ে আসে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র উদ্ধার করতেই। কিন্তু, রণজয়ের লুকোনো রাইফেলের ওপরে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেছিল দু’দশকের মধ্যে। ভোগবাদী-পুঁজিবাদী সংস্কৃতি দ্বারা বিপ্লবী সংস্কৃতি চাপা দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের নিশ্চিত নিশ্চয়তা নির্মাণের কথা নবারণ বলছেন, কিন্তু, রণজয় তার উদ্দেশ্য ও আদর্শবোধ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে না। অথচ, অস্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে রুহিতন “কাত হয়ে মাথাটা রাখল জোড়া ব্যারেলের ওপরে”, রুহিতন ঘুমিয়ে পড়ল। রণজয় আর রুহিতনের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য আছে- রণজয় আর রুহিতনের মানসিক স্থিতিও এক নয়। নিম্নবর্ণের রুহিতন রাষ্ট্রীয়-সামাজিক-পারিবারিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত, তার বিচ্ছিন্নকরণ (alienation) তীব্রতর হয়েছে আখ্যানের গতিপথে। রণজয়কে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতাসালীরা প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তার সামাজিক অবস্থানের জন্যেই তার পরিবার ও সমাজের কিয়দংশ (যারা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে) তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সর্বোপরি, যে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় রণজয় স্মৃতিকে প্রতিরোধের অস্ত্র ক’রে তুলেছিল, যে মানসিক ভারসাম্যহীনতাকে সঙ্গী করেই সে অস্ত্র-তত্ত্ব-রাজনীতি পুনরুদ্ধার ক’রে লড়াই জারি রেখেছিল, সেই ‘মানসিক ভারসাম্যহীনতা’ রুহিতনের বাস্তবতায় নেই। রুহিতন তাঁর শ্রেণি-অবস্থান ও সামাজিক-অবস্থান থেকে রণজয় হতে পারবেন না; আর, রণজয়ও আখ্যানের শেষে রুহিতনের মতোই ঘুমিয়ে পড়বেন কিন্তু কোবাকে যুদ্ধফ্রন্টে পাঠানোর স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)’ ওই একই সময়ে লেখা এবং এই উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট বসাই টুডুও রুহিতনের মতো অ-ভদ্রলোক, অ-মধ্যবিত্ত ও অ-শিক্ষিত।

কিন্তু, এই প্রত্যেকটা ‘অ’-কে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের শাণিত অস্ত্র ক’রে তোলে বসাই টুডু এবং আখ্যানকথক। বসাই টুডুর সশস্ত্র রাজনীতি ও শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রুহিতনের সাদৃশ্য এবং দু’জনেই তাঁদের নিজেদের আদিবাসী-সাঁওতাল পরিচিতি নিয়ে গর্বিত। কিন্তু, এটুকু সাদৃশ্য বাদ দিলে বসাইয়ের সঘোষ প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আখ্যানকথকের দ্বারা উল্লিখিত মিথ-লোকাযত ইত্যাদির রাজনৈতিক ব্যবহার রুহিতনের আখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। বসাই টুডুর শত্রু শুধুমাত্র উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী নয়, বসাইয়ের শত্রু শুধুমাত্র পুলিশ-সিআরপি নয়, বসাইয়ের শত্রু ‘বাবু’রা, বসাইয়ের শত্রু কমিউনিস্ট পার্টির সেইসব নেতৃবৃন্দ যারা শ্রেণিগত ও বর্ণগত বৈষম্যের পুনরুৎপাদন ক’রে চলেন বাংলার। ‘ভদ্রলোক’ উচ্চবর্ণের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্রেণিই একমাত্র বিবেচ্য এবং জাতি-বর্ণ হচ্ছে উপরিকাঠামো (superstructure); আর, উচ্চবর্ণ বাবুরা তত্ত্ব নির্ধারণ ক’রে দেবে এবং নিম্নবর্ণ নিম্নবর্ণ সেই তত্ত্বের হুকুম তামিল করবে¹⁸⁴। বসাই টুডু পার্টি পরিসরের এই ক্ষমতাকাঠামকেই (power hierarchy) প্রত্যাখ্যান জানায়। বর্ণ-জাতিগত পরিচিতির রাজনীতিকে (identity politics) সামনে রেখে বসাই শুধু স্তরভেদকেই চ্যালেঞ্জ করে না, রণনীতি ও রণকৌশলেও ‘বাবু’দের প্রত্যাখ্যান করে, ‘বাবু’দের সমরনীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এমনকি কালী সাঁতরা, ভদ্রলোক পরিচিতির হয়েও যে বসাইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল, সেই কালী সাঁতরাও অবাক অবিশ্বাসী হয় যখন বসাই বলে, “আমু একটা লতুন পথ ভাবছ। পথটো পুরানা বলেই লতুন।” (দেবী ১৩৮৭ সাল, ২৩)। বসাইয়ের এই বাবু-ভদ্রলোকের তত্ত্ব-অনুশীলনকে প্রত্যাখ্যানের প্রেক্ষিত শুধু ‘৬০-’৭০ দশকের রাজনীতি নয়, বরং ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্বে ক্রমাগত আর্থ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শোষণের ধারাবাহিকতা। ভদ্রলোকেরা ‘দায়িত্ব’ নিয়েছে ‘ছোটলোক/নিচুজাতির’ ভাবনা ভেবে দেওয়ার, বাবুরা দায়িত্ব নিয়েছে নিজেদের মনোমত তত্ত্বে তপসিলি জনজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণের সমাধান ক’রে দেওয়ার- ব্রাত্য থেকে গেছে প্রকৃতপ্রস্তাবে শোষিত

নিপীড়িত নিৰ্বিক্ত নিম্নবৰ্গেরা। বসাই টুডু সেই নিৰ্বিক্ত নিম্নবৰ্গের প্রতিনিধি হয়ে নিজেদের রাজনীতি নিজেদের দ্রোহবক্তব্য পেশ করে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে বাবু সম্প্রদায়কে এমন রাজনৈতিক আক্রমণ বসাইয়ের আগে কেউ করেনি। প্রগতিশীল লেখকের পক্ষে রাষ্ট্র বনাম নিপীড়িত লড়াইয়ে পক্ষ বেছে নেওয়া সহজ, শাসকের মতাদর্শ বনাম শোষিতের মতাদর্শের মধ্যে শোষিতের মতাদর্শকে আখ্যানস্থ করা কঠিন নয়। সেটাই একজন প্রগতিশীল লেখকের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু, মহাশ্বেতা এই চেনা প্রগতিবৃত্তের পরিধিকে আরও প্রসারিত ক’রে দেন। আর, বৃত্তকে প্রসারিত করতে গেলে কেন্দ্রে কিছু রদবদল করতেই হয়। মহাশ্বেতা সমাজ-রাজনীতির কেন্দ্রে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের কৃষকসভাকেও রাখেন; তারপর সেই কেন্দ্রেই ক্রমাগত আক্রমণ ক’রে যান বসাইয়ের স্বর-উচ্চারণ-রাজনীতির প্রখরতায়। সে বলে, “ভদ্রলোক বাবুলোক লীডার। ভদ্রলোক বাবুলোকের কথা ভেবাছে... কমিনিস্ লীডারও বাবু, কংগ্রেস লীডারও বাবু” (দেবী ৩৭) যে কেন্দ্রকে বসাই আক্রমণ করে, সেখানে সংসদীয় কমিউনিস্ট আর কংগ্রেসের বর্ণ-রাজনীতিতে কোনও তফাৎ নেই! বসাইয়ের আক্রমণের উপাদানগুলিও তাই ক্ষুরধার হয়ে ওঠে, তার তত্ত্ব গড়ে ওঠে ওইসব বর্ণবাদী অনুশীলনের ধ্বংসাত্মক মুখে। আখ্যানপাঠক বসাইয়ের শত্রু চিহ্নিতকরণের তিনটি পথের হৃদিশ পায়- জাতিগত পরিচিতির রাজনীতি, শ্রেণিগত সংগ্রামের রাজনীতি ও ভাষার রাজনীতি। আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে দীর্ঘ দু’শতকের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ‘ভূঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাবরি জোতদার’। সামাজিক-জাতিগত ক্ষেত্রে সে শত্রু চিহ্নিত করে সামন্ত-মিসিরদের মতো লোকেদের, যারা কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোতেও বর্ণবাদী রাজনীতি অনুশীলন ক’রে চলে- “লতুন জমানায়, পার্টির বাবুরা সানতাল-কাওরা-তিওররে ভাই-ভাণা ভাবে? অ্যাঁ? তাখে সামন্তবাবুর বাসায় তুমরা পিয়ালায় চা খেতা, আমু মাটির ভাঙে?” (২৫)

“বসাই তো আগে লকসালী ছিল না। যবে থেকে হল, তবে থেকে বেটা লীডার। লীডার হয়ে বেটা নাকি নিভুঁই-নিচাষ সাঁওতাল ক্ষেতমজুর আর দাওয়ালদের নিয়ে আর্মি গড়েছিল” (১১)

এস.আইয়ের চেতনাপ্রবাহে বসাই টুডু সম্পর্কে রাষ্ট্রের ভীতিবয়ান ঝলসে ওঠে। বসাইয়ের পূর্বতন পার্টি সিপিআইএম নেতারাও বসাইকে ‘নকশাল’ বলে দেগে দিয়ে তাকে শত্রু বানিয়ে নেয় ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে মদত দেয়। সিপিআইএম ও কৃষকসভার সঙ্গে বসাইয়ের যে কারণে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল হয়, সেই একই কারণে সিপিআইএম পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিপিআই(এম-এল) পার্টি গড়ে ওঠে। একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যায়- বসাইদের আত্মপরিচিতি ও সামাজিক মর্যাদার রাজনীতি তাদের শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে সমগুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু, সিপিআই(এমএল) জাতিগত সমমর্যাদার প্রশ্নে গুরুত্ব দিলেও, শ্রেণিকে সর্বাগ্রাধিকার দিয়েছিল। বসাইয়ের কখনো প্রকাশ পায় সাঁওতাল জনজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি। বসাই তার সাঁওতাল জাতিপরিচিতিকে সগর্বে প্রকাশ করে। “ভুলবু কেনী? সাঁতালরে ভুলারে দিবু সি সান্‌তাল, সি কেমনু করে পারবু তোমরা?” (২৬) কালী সাঁতরাকে উপলক্ষ্য করে সিপিআইএম পার্টির প্রতি বসাইয়ের এই উচ্চারণে-প্রশ্নে জুড়ে থাকে সমাজে ও পার্টির অন্দরে বৈষম্যের বাস্তবতা। বসাই কমিউনিস্ট পার্টির অনুশীলনকে ও জাতি-বর্ণ বৈষম্যের প্রতি উদাসীনতাকে যে ভাষায় অভিযুক্ত করেছে, তার পরিসর আখ্যান ও বাস্তবতার নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করে। বসাইয়ের ওই অভিযোগের ভিত্তিগুলি যে প্রায় দু’দশক পরেও প্রবলভাবে অস্তিত্ববান ছিল, তার প্রমাণ মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে জ্যোতি বসুর উক্তি- ‘পশ্চিমবঙ্গে দু’টোই বর্ণ- গরিব আর বড়লোক’¹⁸⁵ আর, জাতিপরিচিতিকে ‘লজ্জা’ নয় বরং ‘গর্বে’ বদলে ফেলতে ফেলতে বসাই অভিযুক্ত করে সিপিআইএম পার্টির আভ্যন্তরীণ অনুশীলনকে; মতাদর্শ ও অনুশিলনের যোজনদূরত্বকে। “সান্‌তাল-কাওরা-তিওর কেমনে ভুলে সি কে? ভুলাবার কাজ তুমাদের ছিল, লয়? সি কাজ করেছে?” (২৭) কমিউনিস্ট পার্টি ভদ্রলোক-বাবুদের পার্টি হয়ে গেলে, পার্টির অন্দরে জাতবিভাজন বর্ণবৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিকতা বজায় থেকে যায়। কালী সাঁতরার কাছে বসাইয়ের প্রশ্নগুলি তেতো লাগলেও, প্রায় চার দশক পরেও সেই প্রশ্নগুলির উত্তর মেলে না-

It may be noted here that the Left Front government of 1977 did not include a single scheduled caste member in its ministry, for its need was, perhaps, not felt... If any regime has secured the dominance of the bhadralok in West Bengal, it has been the Left Front regime, as Chandra and Nielsen have argued well. It made illegitimate the language of caste. (Bandyopadhyay 2012, 73)¹⁸⁶

বসাই ঠিক এভাবেই চিহ্নিত ক’রে নেয়, “ভদ্রলোকের হক্, বড় চাষী-মধ্যম চাষীর হক্ বাবু লীডার দেখবু বল্যেই তো আজ অবধি বাবুঘর ছাড়া লীডার আস্যে নাই?” (৩৭) সংসদীয় কমিউনিস্টরা শাসক হলেও সেই ভদ্রলোকের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তাদেরই শাসন কায়েম হয়। ক্ষেতমজুরদের অর্থনৈতিক অধিকার ও দীর্ঘস্থায়ী অধিকার দু’টোই অপ্রাপ্ত থেকে যায়। আখ্যান থেকে সমাজবাস্তবতার যাতায়াত চলতে থাকে ‘অগ্নিগর্ভ’ জুড়ে। ‘অগ্নিগর্ভ’ রাজনৈতিক উপন্যাসের আরও এক নবায়ন ঘটায়, যেখানে আখ্যানস্থ রাজনীতি ও বাস্তবের রাজনীতি একই অভিমুখে চলতে থাকে এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দিয়েই বাস্তব ও আখ্যানের দূরত্ব কমতে থাকে। উপন্যাসের কুশীলব কাল্পনিক, উপন্যাসের স্থান কাল্পনিক। কিন্তু, উপন্যাসের রাজনীতি বাস্তব, কুশীলবদের পারস্পরিক ও সামাজিক-ব্যক্তিক সম্পর্কের রাজনীতি বাস্তব, কুশীলবদের স্বরসঙ্গতি বাস্তব-বাস্তব এই জন্যেই যে, প্রায় তিন চার দশক পরেও প্রশ্নগুলি একই রকম তীক্ষ্ণ ও উত্তরহীন থেকে যায়। বসাইয়ের প্রশ্নগুলি অভিযোগগুলি প্রবল দ্রোহে ফের ফিরে আসে ২০০৮ সালে লালগড় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। ভাষা ও লিপির স্বীকৃতির প্রশ্ন, জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতায়নের প্রশ্ন এবং জমি-জঙ্গলের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন একসাথে মিশে রাষ্ট্রবিরোধী অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। বহু সাহিত্য সমালোচক আদিবাসী সমাজের পরিচিতির প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন; কাঞ্চন কুমার ‘নকশালবাড়ি ও সাহিত্য’ গ্রন্থে লিখছেন, “মহাশ্বেতা দেবীর যে শ্রেণী দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাঁর লেখাগুলিকে ধারালো করে তুলেছিল, ক্রমে ক্রমের তিনি

শ্রেণী সংগ্রামহীন অরাজনৈতিক আদিবাসী উপাখ্যানের আশ্রয় নিয়ে এন.জি.ওদের যথাস্থিতির রাজনৈতিক পরিধিতে চলে গেলেন” (কুমার ২০০৬, ৯৫) আদিবাসী জনজাতির পরিচিতির সংগ্রামকে ‘অরাজনৈতিক’ ও ‘শ্রেণী সংগ্রামহীন’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের চিরকালীন উদাসীনতার ছাপ পাওয়া যায় আর, এতে বসাইয়ের অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয় আরও। মহাশ্বেতা দেবী নকশাল আন্দোলন ও বসাইদের অভ্যুত্থানকে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নয়, বরং সম্পৃক্ত বলেই দেখাতে চেয়েছেন। যদিও, বসাই-দোপ্দি-দুলনাদের অভ্যুত্থান নকশাল আন্দোলনের ‘সাবসেট’ নয়; মূলবাসী জনজাতির সশস্ত্র গণবিক্ষোভের ভিত্তিতে সেই ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছে, নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে তার মূলগত-গুণগত ঐক্য ছিল। আখ্যানকথক ইঙ্গিত দেন যে, বসাইদের জাতিগত ও শ্রেণীগত আকাজ্জকে নকশালপন্থী বীরু পাঠকরাই তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৭০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র যে কর্মসূচী ঘোষিত হয়, তাতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের জমিসম্পর্কের প্রশ্নটি অগ্রাধিকার পেয়েছিল। একইসঙ্গে “তপশীলি জাতিগুলির ওপর সামাজিক নিপীড়ন, হরিজনদের হত্যা করাও এর অঙ্গীভূত, আজও সমানভাবে চলেছে”^{১৮৭} এই বক্তব্যও উত্থাপিত হয়। বসাই টুডুদের ওপর শোষণের যে প্রশ্নগুলিতে বসাইরা স্থানীয় জোতদার-মহাজন ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রোহঘোষণা করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি সেই প্রশ্নগুলিকে প্রাধান্য দেয়। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজগুলির মধ্যে “জাতিভেদ বিলোপ করা, সমস্ত সামাজিক বৈষম্য দূর করা” ও “ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তে ন্যাগণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সাধন”-এর অঙ্গীকারগুলিকে আর্থ-রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সমগুরুত্ব দেওয়া হয়^{১৮৮}। বসাই টুডুদের রণনীতি সশস্ত্র কমিউনিস্টদের রণনীতির সঙ্গে মিলে যায়- আধা-সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে শ্রেণিশত্রু খতমের যে রাজনীতি, বসাইদের কর্মসূচীও তাই, “তৃতীয়বার মৃত্যুর পর বসাইয়ের সদর্প ঘোষণা, ‘ধান

কাটবু। টাহালে উঠাবু। সরকার মজুরি দিল নাই- তাথে জোতদার সূর্য সাউয়ের লাহাশ শকুনে খাওয়াবু।’... বসাই টুডু ধানের চিন্তাটিকে, ‘ধান’ শব্দটিকে হমিসাইড করে লালে লাল করে দিয়েছে” (দেবী ৯) বসাই টুডু তার জাতিগত পরিচিতিতে সর্বাত্মক রাখলেও, শ্রেণির প্রশ্ন থেকে সরে না। দীর্ঘ কয়েকদশক কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে তত্ত্ব ও অনুশীলনের ফাঁক বুঝতে পারে সে। আর, তাই সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তার প্রত্যাশাও ধাক্কা খায়। নকশালবাড়ি কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে বসাই টুডুর ‘লতুন পথের’ সাযুজ্য থাকে এখানেও, সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যহীনতাকে চিহ্নিত করায়। “আর কমন্স দল যা বুঝে, ভোট- হাঁ, ভোট!... কিন্তু যখন আমি খেতমজুর, তখন তোমরাও মোক্ লাথ মারবু। ভুখা মানুষ লয়ে ই খেলা ভাল খেল নাই হে” (৩১) বসাই টুডু কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণাকে চিহ্নিত করে ফেলে, চারু মজুমদারের সম্পাদনায় সিপিআই(এমএল)ও তাই করে¹⁸⁹। এখানে উল্লেখ্য, বসাই ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করে বারবার। তেভাগা আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভা বর্গাদারদের অধিকারের প্রশ্নে যতটা মনোযোগ দিয়েছিল, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অধিকারকে তত গুরুত্ব দেয়নি। বসাই সেকথা কালী সাঁতরাকে বলে, বসাই সমগ্র মূলবাসী ক্ষেতমজুর শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে কৃষকসভার সঙ্গে খেতমজুরদের সম্পর্ক তুলে ধরে। বর্গাদারদের তেভাগার দাবি, বাজে আদায় বন্ধের দাবিতে যে সংগ্রাম, তাতে ক্ষেতমজুরদের আত্মবলিদান সমগুরুত্বের, কিন্তু ক্ষেতমজুরদের দাবি উপেক্ষিত হয়েছিল কৃষকসভায়¹⁹⁰। বসাইয়ের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক অভিযোগ এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে উপেক্ষিত জাতি-বর্ণের প্রসঙ্গ সুমিত সরকারও উল্লেখ করেন। তেভাগা আন্দোলনের সমকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভায় ধনী ও মধ্য কৃষকদের উপস্থিতি বসাই টুডুদের আকাজ্জকে অবদমিত রেখেছিল,

a crucial feature of the Indian rural scene is that the most oppressed sections, ‘adivasis’ and ‘Harijans’, are a minority, and their oppressors

include not only landlords and big farmers but also small peasants who tend often to be extra conscious of their superiority over castes still lower than them in the social and economic scale (Sarkar 1983)

বসাই যে প্রশ্ন উত্থাপন করছে '৭০ দশকে, তা আসলে কুড়ি বছর আগের এবং আরও কয়েক দশক বা শতক আগের প্রশ্ন। সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে, তাদের লড়াইয়ের নীতিতেও প্রশ্নগুলি অসমাপ্ত থেকে গেছিল। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে বসাই টুডুর আগে কোনও কুশীলব শ্রেণি-বর্ণ দু'ই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শাসক মতাদর্শের বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ শানায় নি। সমরেশের রুহিতন কুর্মি রাজনৈতিক কর্মী হলেও, তার রাজনৈতিক পরিসরে এই দ্বন্দ্বগুলি অনুপস্থিত। বসাইয়ের সঙ্গে বিরূ পাঠকদের পথ মিলে যায় সংগ্রামের বাস্তবতায়, নীতি ও কৌশলের সাযুজ্যে। কিন্তু, রুহিতন কুর্মির ক্ষেত্রে তা নয়। সেইজন্যই বসাই যেভাবে তার তত্ত্ব ও অনুশীলনের কষ্টপাথরে কমিউনিস্ট নকশালদের যাচাই ক'রে নিতে পারে, রুহিতনের ক্ষেত্রে সেই দ্বন্দ্বিক বিচার অনুপস্থিত। “নকশালদের মদতে তার কাজ হলে সে মদত নেবে। কিন্তু তার নিজস্ব সংগ্রাম যতদূর বলবে ততদূর নেবে, তার বেশি নয়” (৪৩) আখ্যানকথকের বয়ান থেকে বেরিয়ে বসাইয়ের স্বর শোনা যাক, “যিথা আইনের কলা দিশাবে জোতদার, সিথা আঙুল বাঁকাবু। লকসাল মোক মদত দেয়, মদত ল্যিবু।” (৪৮) দিবা বাগচির প্রতি রুহিতনের যে অটলা ভক্তি, বসাইয়ের তা নেই। বসাই তার সমস্ত পূর্বাভিজ্ঞতা দিয়ে ভদ্রলোক বাবুদের চিনে নিতে শিখেছে। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে বহুলাংশে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েও বসাই তাদের জনজাতির আন্দোলনকে নকশালবাড়ি কৃষিবিপ্লবের নেতৃত্বের অধীনস্থ করে না। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে রূপা বাউড়িদের সঙ্গে পাঞ্চগলী-দ্রোণাচার্যদের যে সংযোগ, বসাইয়ের সঙ্গে বীরু পাঠকের এবং রুহিতনের সঙ্গে দিবা চৌধুরির যে সংযোগ, তার বাস্তবতা বাংলার বিস্তীর্ণ মূলবাসী-আদিবাসী বেল্ট জুড়েই ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সিপিআই(এমএল)-র দলীয় মুখপত্রে পার্টির উচ্চতর কমিটিতে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের তুলে আনার নির্দেশ আছে এবং কৃষিবিপ্লবে এঁদের

সাংগঠনিক ভূমিকাই যে গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাও বলা হয়¹⁹¹। বসাই টুডুর অভিযোগ ছিল কৃষকসভায় ও বড় কমিটিতে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের হক দেখা হয়না, কিন্তু উপন্যাসের নকশাল বীরু পাঠকেরা তাঁদের হক আদায়ে জোর দেন। চারু মজুমদারের বিশ্লেষণের সঙ্গে তৎকালীন সিপিআই(এম) পার্টির নেতাদের দ্বন্দ্ব ‘পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কৃষকসভায় একটি পেপার পড়া’ বীরু পাঠকের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেন মহাশ্বেতা। বড় ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ক্ষেতমজুরদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো এই ‘পেপার’-র সঙ্গে চারু মজুমদারের ‘আটটি দলিল’-র সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি, “বীরু পাঠক নিজে নয়, কিন্তু তার বাপ পনের বিঘা জমির মালিক... বীরুকে লিডাররা মনে মনে সি.জি কন্ডেম্‌ড গুড্‌স করে দেন।” (৭১) অংশটিতে চারু মজুমদারের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক অবস্থানের মিল আছে। বসাই তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে বানারিতে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে যেভাবে অ্যাকশন চালায়, তার নীতি-কৌশলগত প্রয়োগ সিপিআই (এমএল)-র শ্রেণিশত্রু খতমের আকশনের সঙ্গে সায়ুজ্যপূর্ণ। (৭২-৮৩) জোতদার প্রতাপ গোলদারের বিরুদ্ধে বসাই জনমত সংগঠিত করে, সহযোদ্ধা সাঁওতালদের সক্রিয় অ্যাকশনে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশু অর্থনৈতিক দাবি থেকে স্থায়ী রাজনৈতিক দাবিতে বদলে নেয়। বসাই বাইরে থেকে তত্ত্ব নিয়ে এসে ক্ষেতমজুর আদিবাসীদের লড়াই ঠিক ক’রে দেয় না, সে ‘অরগ্যানিক নেতা’ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। বসাই প্রতাপ গোলদারের থেকে বাজেয়াপ্ত বন্দুক নদীতে ছুঁড়ে ফেলে সড়কি দিয়ে তাকে খুন করে (বাবু-অস্ত্র প্রত্যাখ্যানের নীতি ক্রিয়াশীল এখানে) এবং জোতদারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ক্ষেতমজুরদের শ্রেণিক্রোধ জাগিয়ে তোলে। (৮২-৩) বীরু পাঠকদের সঙ্গে বসাইয়ের অ্যাকশন-পদ্ধতির সাদৃশ্য থাকলেও, জোতদারের ভাই নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় নকশাল ও আদিবাসীদের আলাদা রাখতে চায় এবং বসাই টুডুর পরবর্তী নীতিকৌশল বীরু পাঠকদের দলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু, বসাই টুডুর অধিকার আদায়ের অ্যাকশনে কিংবা দোপ্‌দি মেঝেনের ভূমিকায় স্পষ্টতই কমিউনিস্ট নকশালদের মতাদর্শগত প্রভাব। ভাস্করজ্যোতি তাঁর বইতে বীরভূমের সাঁওতাল

পরগণার যে দ্রোহজাগরণের কথা লিখেছেন, তাতে একটি গানের উল্লেখ করেছেন, “সিধু কানু চাঁদ ভৈরব/ হল দেকিন নাজ মাতালে/ মাও সেতুং চারু মজুমদার/ হল দেকিন রাফা রুয়ারকে” সাঁওতাল পরগণার রানীশ্বর থানার কৃষকরা এই গান বাঁধেন ১৯৭১ সালে।¹⁹² ১৯৬৭ সালের ২রা নভেম্বর ‘দেশব্রতী’ পত্রিকার সংখ্যায় ‘জেল থেকে কমরেড জঙ্গল সাঁওতালের বাণী’ শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়, যাতে জঙ্গল সাঁওতালের বয়ান প্রকাশিত হয় যে, তাঁর মতে নকশালবাড়ির পথই কৃষক ও আদিবাসীদের মুক্তির পথ; জঙ্গল সাঁওতালের ওই বয়ানে যে যুক্তিতে সিপিআইএম পার্টির তত্ত্বানুশীলনের সমালোচনা করা হয়েছে, বসাই টুডুর সমালোচনার সঙ্গেও তার কিছু সাদৃশ্য থাকে।¹⁹³ রাষ্ট্রদ্রোহিতায় বসাই টুডু দোপ্‌দী মেঝেনদের সঙ্গে বীরু পাঠকের পথ মিলে গেলেও, পার্থক্য হয়ে যায় বসাই তার জনজাতির আত্মনির্মাণের পথ খুঁজে পায় বলে। আর, এই আত্মনির্মাণের পথের সন্ধানেই নকশালদের সঙ্গে রণকৌশলের তফাৎ হয়ে যায়- “লকসালীদের ভুল আমু করবু নাই। যার তরে লড়াই, তারে বুঝাব না- তারে মারথে শিখাব না- পুলুস গ্রামে পশলে সকল ঘর জ্বালাবু- সবারে মারবু- জোতদার মের্যে পুলুশ লাচিয়ে গ্রাম লাহাশ করবু- উতে বসাই লাই” (৪৯)

‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ‘আবিষ্কার’ কালী সাঁতরা। কালী সাঁতরা যোগ্যতম মধ্যস্থতাকারী (mediator), যে নিজে ‘বাবু’ সামাজিক পরিচিতির কিন্তু বাবুত্বের সব উপাদানগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। সে নিজে মধ্যবিত্ত অবস্থানের হলেও, নির্বিক্তের শ্রেণি-অবস্থানকে প্রাধান্য দেয়। কালী নিজে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়েও পার্টির মধ্যে একঘরে-বসাইকে শত্রু বানিয়ে নিয়েছে যারা, সেই গোরা দাস, সামন্ত এরা কালী সাঁতরাকেও শত্রু বানিয়ে নেয় অচিরেই। কালী সাঁতরা ছাড়া বসাইয়ের সঙ্গে আখ্যানপাঠকের যোগসূত্র তৈরি হত না। আখ্যানের গতিপথে আবিষ্কার করা যায় যে, পাঠকের সঙ্গে বসাইয়ের প্রায় সমস্ত পরিচিতিই ঘটেছে কালী সাঁতরার চেতনাপ্রবাহে এবং কালীর সঙ্গে বসাইয়ের কথোপকথনের স্মৃতিতে। কালী সাঁতরা ‘ভদ্রলোক’, কালী সাঁতরা বসাইয়ের দ্বারা চিহ্নিত ‘বাবু’, কিন্তু শ্রেণিবিচ্যুত (de-classed)

হওয়ার পূর্বশর্তগুলি পালন করে চলে সে নিষ্ঠাভরে। বসাইয়ের ‘নতুন পথ’ তথা বর্ণ-শ্রেণিকে শোষণের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত ক’রে সশস্ত্র দ্রোহের পথ বেছে নেওয়াকে সিপিআইএম নেতৃত্ব ‘বাবুসুলভ’ সন্দেহের চোখে দেখলেও, কালী সাঁতরা উল্লসিত হয়। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতার কৃতিত্ব এখানেই যে, একই কালস্থানে বসাই ও কালী সাঁতরা দু’জনেই অস্তিত্ববান; তবু, কালী সাঁতরা নয় বসাই টুডু প্রধান কুশীলব হয়ে উঠছে! মধ্যবিভাগ্যনের চিরাচরিত সাহিত্য-সম্ভাবনাকে অস্বীকার ক’রে মহাশ্বেতা বসাই টুডুকে নির্মাণ করেছেন। আর, কালী সাঁতারার উপরেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আখ্যানের ভেতরে বসাই টুডুর লাশ শনাক্ত করার এবং আখ্যানের ভেতর-থেকে-বাইরের পথে আখ্যানপাঠকের কাছে বসাইয়ের রাজনীতিকে উপস্থাপনা করার। বসাই একদিকে প্রবল দ্রোহে ক্ষমতা-কাঠামোকে প্রতিস্পর্ধা জানায়। অন্যদিকে, কালী সাঁতরা পার্টির প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন এবং বসাইদের দ্রোহের প্রতি সমর্থনের দ্বন্দ্ব সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতি প্রতিস্পর্ধা জানায়। বসাইদের মতো সঘোষ প্রতিবাদ নয় তাঁর, কিন্তু কালী সাঁতরাই মধ্যবিভাগ্য ভদ্রলোক পাঠকমননের কাছাকাছি অবস্থান করেন। কালী সাঁতারার সমালোচনা আত্মসমালোচনায় জারিত প্রশ্নগুলি সমাজকাঠামোর প্রতি পাঠকমননের প্রশ্নের সঙ্গে মিলে যায়- আখ্যানের নির্মাণে কালী এবং পাঠকমননের এই সেতুবন্ধন হয়। ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’-তে কোনও কালী সাঁতরা নেই। কালী সাঁতরা এই কারণগুলির জন্যেই এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার! ‘অরণ্যের অধিকার’-র অমূল্য আব্রাহামের সঙ্গে কালী সাঁতারার প্রভূত মিল। “অমূল্যবাবু বিরসার হাত ধরতে গেল। বিরসা নিচু গলায় বলল, আমাকে ছুঁয়ো না তুমি। তুমি দিকু” (দেবী ১৪১৮ সাল, ৯৪) বীরসা মুগ্ধ অমূল্যকে ‘বাবু’দের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করে। বসাই যেমন কালীকে ‘বাবু কমরেট’ বলে শ্রেণিবিশ্লেষণ করে। অমূল্যর সহানুভূতিপ্রবণ দ্রোহ-সহায়ক ভূমিকা বুঝেছিল। অমূল্য বীরসা ও তাঁর সহযোদ্ধাদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; আইনি লড়াই লড়ে এবং তাঁদের কথা ‘সভ্য’ নাগরিক সমাজে ছড়িয়ে দেয়। কালী বা অমূল্য কেউই কিন্তু আত্মসমালোচনা দেখায় নি কিংবা বসাই ও বীরসাকে উচ্চবর্গসুলভ করুণা দেখানোর কথা

ভাবেনি। বরং নিজেদের শ্রেণি অবস্থান ও সামাজিক অবস্থানের বিশ্লেষণ থেকেই বীরসা ও বসাইদের দ্রোহের সমর্থক হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন। অমূল্য ও কালী সাঁতারার মতোই ভূমিকা জেকবের, যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা লড়ে মুণ্ডাদের হয়ে। জেকব বিরসাকে ভগবান নয়, বরং মুণ্ডাবিদ্রোহের সবচেয়ে উপযুক্ত নেতা বলে বিবেচনা করে। জেকবের সামাজিক অবস্থান ও বর্ণ-পরিচিতি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার ফর্বস ও স্ট্রিটফিল্ডের মতো হলেও শাসকশ্রেণির সঙ্গে তার সংঘাত বাঁধে। আর, আখ্যানস্থিত রাজনৈতিক সংঘাতে তার ভাষা ও সক্রিয়তা বিরসাদের পক্ষে। অমূল্য উকিল জেকবের কাছে সরকারবিরোধী তথ্যপ্রমাণ সরবরাহ করে। ‘উপসংহার’ অংশে জেকব ও ম্যাজিস্ট্রেটের বাদানুবাদ আখ্যানভুক্ত করেছেন লেখক¹⁹⁴। রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে ওঠার পথে চেনা সীমাগুলো সচেতনভাবে ছেড়ে আসে ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি। আর, একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক+ঐতিহাসিক+ডকুমেন্টেল হয়ে ওঠে, শুধু ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে নয়, প্রকরণেও। মৌখিক ঐতিহ্য ও মুখফেরতা আখ্যান তারই সহায়ক। “বিরসা legend হয়ে ওঠে, কেননা জীবিতকালেই সে Oral tradition-এ জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। আজকের তথ্য+তথ্যপ্রযুক্তি রোগজর্জর বিশ্বেও oral tradition দ্বারা জনচেতনাকে আক্রমণ ও সংক্রমণ করা দরকার” (দেবী ১৪১৮ সাল, ১৪) মহাশ্বেতা মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতিরোধী জয়গাথাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেই প্রতিরোধী জয়গাথাকে অনাদিবাসী শহুরে-মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। আখ্যানের ভেতরেও তো সেই শহুরে-অনাদিবাসী- আধুনিক ‘শিক্ষিত’ সমাজ রয়েছে; অমূল্য কিংবা কালীকে সেইজন্যেই প্রয়োজন হয়। মুণ্ডা, টুডু, মেঝেনদের ঐ মৌখিক ঐতিহ্য দ্বারা অনাদিবাসী অ-সাঁওতাল নাগরিক ও পাঠকবর্গকে সংক্রামিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় অমূল্য আর কালী সাঁতারার ওপরে। বিরসা যেমন উলগুলানের ডাকে ‘ভগবান’ হয়ে ওঠে, বসাই টুডুও তেমনই পুনর্জীবিত মিথ্ হয়ে ওঠে বারবার বেঁচে ওঠার মধ্যে দিয়ে। আর, বসাই টুডুর ওই বারংবার পুনর্জীবিত হওয়ার খবর রাষ্ট্রযন্ত্র ও পার্টির বাবুনেতাদের মধ্যে পৌঁছে যায় কালী সাঁতরা

মারফত; অন্যদিকে, রাষ্ট্রযন্ত্র আর বাবুনেতারা বসাইয়ের মৃতদেহ সনাক্ত করতে কালীকেই পাঠায়। অমূল্য আর কালী সাঁতরা দু'জনেই সাঁওতাল দ্রোহীদের মুখে 'বাবু' বা 'সাহেব' শুনে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়। অধস্তন সাঁওতাল সহকর্মীকে সে বলে- “আমি সাহেব নই” (২৩)। অমূল্য যে ডায়রিতে বিরসা ও তার সহযোদ্ধাদের কথা লিপিবদ্ধ করে, সেখানেও তার দিকু হওয়ার লজ্জার কথা লিখে রাখে বিরসার সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপে। “আমি জানি তুমি কি বলছ। বলছ, শালো অমূল্যবাবু, দিকু তুমি, ও হাতে শুধা কলম ধরছ, ধর নাই।” (১৯৪) অমূল্য বা কালী সাঁতরার প্রত্যাখ্যান আছে- বাবু বা সাহেব ডাকের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জনজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার লজ্জা এবং ওই ডাকগুলোর মধ্যে দিয়েই শিক্ষিত-সভ্য ক্ষমতাকাঠামোর সমান সামাজিক অবস্থানে উঠে আসা- এগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করে তারা।

বিরসা কিংবা বসাই আরও একটা বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যে, আদিবাসীরা না- হিন্দু, না-খ্রিস্টান- বারবার হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মমাথারা আদিবাসীদের নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চেয়েছে কিন্তু বিরসা বসাইরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আদিম মুণ্ডা ধর্মের প্রতি মুণ্ডা জনজাতির আস্থা ফেরানো এবং ধর্ম-অর্থনীতিতে বহিরাগত জাতিশত্রুদের উপড়ে ফেলা (১৫৩)- অরণ্যের অধিকারের রাজনীতিতে এই দু'টি বিষয়ই অঙ্গঙ্গী। বিরসা নিজেকে পৃথক ক'রে নিয়েছে মিশনারি শিক্ষা থেকে, ক্ষমতাবান ব্রিটিশদের আয়োজিত সংস্কৃতি-নীতি-রীতি থেকে। বসাই কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার সদস্য ছিল, কিন্তু পরে সেই প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ থেকে সরে আসে নিজেদের জনজাতির অধিকারের প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে। বিরসা খ্রিস্টান মিশনারি ইন্সকুলে পড়েছিল তাদের মতাদর্শকে কিছুকাল অনুশীলন করেছিল কিন্তু নিজের জনজাতির অধিকারের প্রশ্নে লড়াই করতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে। বসাই যেমন সচেতন ক্ষোভে বাবু-শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বিরসাও তেমন বলে, “যা লিখেছি, সব ভুলে যেতে হবে। মুণ্ডার অধিক মুণ্ডা হতে হবে আমাকে।” (৯৮) সমস্ত দিকুদের প্রতি জাতিগত ক্রোধ শাণিত করে সে। বিরসার দ্রোহের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার যে বসাই বহন করছে, তা স্পষ্ট হয়

তাদের রণনীতি ও রণকৌশলে। বিরসার সময়ে ছিল ব্রিটিশ শাসন এবং দিকু-জোতদার-মহাজনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সকল দিকুদের সঙ্গে, দিকুদের মদতদাতা সরকারের সঙ্গে লড়াই (১২১)- যে লড়াই সিধো-কানহো-ফুলো-ঝালোদের লড়াইয়ের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। বসাইয়ের দ্রোহের সময় উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি কিন্তু জোতদার-মহাজনদের আর্থ-সামাজিক শোষণ অব্যাহত; সরকারি তরফে দেশি শাসকের বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয় তারা। বিরসা ও বসাই দু'জনেই আধুনিক যুদ্ধতত্ত্ব বর্জন করে এবং চিরাচরিত প্রকৃতি-সহায়ক যুদ্ধতত্ত্বকে আঁকড়ে থাকে। সেই কুচিলা, সেই জঙ্গলের লড়াই, সেই তীর-ধনুক এবং সেই দলবদ্ধ শিকারের ভঙ্গিতে শত্রুনিধন। বসাই যেমন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল এবং কালী সাঁতরা সহ সমস্ত বাবু-নেতা আর রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল, বিরসাও তেমনই এক দ্রোহমন্ত্রের উদ্গাতা- “একসঙ্গে সকল মুণ্ডা সকল দেশ জুড়ে লড়ব। আমার এ লড়াইয়ের নাম- উলগুলান। বুঝলে?” (১২২) আর, বিরসা ও বসাইয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ক্ষমতা-আধিপত্যের স্বরেও অডুত মিল। দোপ্দি মেঝেনকে ‘নটোরিয়াস মেয়েছেলে’ বলা, বসাইয়ের খোঁজে ‘সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়’ হুকুম দেওয়া এবং ‘দ্যাট বিরসা ইজ্ এ পোটেনশিয়াল ডেঞ্জার’ বলে দেওয়ার কর্তৃত্বমূলক প্রশাসনিক স্বর ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করে। আর, এই প্রতর্কের বিরুদ্ধতায় বসাই টুডু বা বিরসাকে অতিকথার নায়ক হয়ে উঠতে হয়, বসাই টুডু মরেও মরে না কারণ তার মধ্যে অতিকথার নায়কের মৃত্যুঞ্জয় আদল তৈরি হয়ে যায়¹⁹⁵।

বসাই এবং বিরসা দু'জনেই অরণ্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উন্নয়নের নামে একের পর অরণ্য ধ্বংস হয়েছে, অরণ্যসন্তানদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং ভূমিকন্যাপুত্রদের জীবনযাপনের স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ নীরব বয়ানে মহাশ্বেতার উপন্যাসে থেকে গেছে। মহাশ্বেতা সাঁওতাল জনজাতির অরণ্যের অধিকারের আখ্যান লিখতে

গিয়ে প্রকৃতি ও মূলবাসী মানুষের অঙ্গঙ্গী সম্পর্কের কথা লিখেছেন। ‘অরণ্যের অধিকার’ শুধুমাত্র শাসকবিরোধী রাজনীতি নয় বরং পরিবেশ-রাজনীতির কথা বলে। শুধু উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব দিয়ে এই উপন্যাসকে পাঠ করলে, তা একমাত্রিক হয়ে যায়। “বিরসার মধ্যে আমি পরিবেশ চেতনার ব্যাপারটি আনতে চেয়েছিলাম... ‘অরণ্যের অধিকার’-এ বিরসার অরণ্যপ্রাণতার কথা আছে। বিরসা অরণ্যবাসীর কান্না শুনতে পাচ্ছিল। এর পরেই সে ধরতি-আবা হয়ে বেরিয়ে আসে” (দেবী ২০১৪, ১৩) এই ‘ভূমিকা (২০০৬)’ অংশে মহাশ্বেতা দেবী বিরসার আন্দোলনের সঙ্গে সমকালীন আদিবাসী-বিদ্রোহগুলি জুড়ে দিচ্ছেন। ধরতি-আবা ও ‘মডার্ন ম্যান’ হয়ে ওঠার দুই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য বিরসার মধ্যে ক্রিয়াশীল, তা বলছেন। বিরসা-বসাই এরা পরিবেশ রাজনীতির উত্তরাধিকারও বহন করে। মহাশ্বেতা দেবী এই বইয়ের ভূমিকায় গণেশ দেবীর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন- উপন্যাসটি বা প্রবন্ধটি অরণ্যধ্বংস, মূলবাসী মানুষ ও পরিবেশ রাজনীতির বহমানতার পাঠ দেয়- মুখফেরতা কাহিনি, অরণ্যমনের বিশ্বাস ও ‘বাঘজাই’ দেবী ও বাসুদেবের মিথ্ অরণ্যসন্তানদের যাপনের সঙ্গেই মিশে থাকে।

People see a thin man, his headgear adorned with peacock feathers.
Sometimes the man has on his chest a metal-like standard bearing
the emblem of the forest goddess. He is Vasudeva, the goddess is
Vaghjai... the Vasudevawill speak to them of stories heard a long
time ago. The forest, thus, visits the village. (Devy 2006, 3)

গণেশ দেবী উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন যে, উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে উন্নয়নের জোয়ারে এই মিথ্ এই জীবন সবই ভেসে গেছে। ‘অরণ্য গ্রামকে দর্শন ক’রে যেত’- এই বাক্যের মধ্যে যে পরিবেশপ্রীতি ছিল, আদিবাসী যাপনের যে সরল-গভীরতা ছিল, তা ভেঙে গেছে। গণেশ দেবী মহারাষ্ট্রের এক অরণ্যভিত্তিক গ্রামের কথা বলেছেন- বসাই টুডুর গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে- কিন্তু, তাঁদের যাপনের বিপন্নতায় ফারাক খুব বেশি নেই। জমির অধিকারের প্রশ্ন বসাই

তুলেছিল, বিরসা তুলেছিল, লালগড় আন্দোলনের মানুষেরা তুলেছিল এবং মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু জনজাতি সেই দাবি তোলে। চরসার জঙ্গল বসাই ও তার সহযোদ্ধাদের লড়াইভূমি কারণ এই জঙ্গলকে তাদের চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। কালী সাঁতরা জঙ্গলের পথে বসাইকে খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খায়, আঘাত পায় কিন্তু বেতুল বা দোপ্‌দী তাকে পথ দেখিয়ে দেয়। আদিবাসী জনজাতির মানুষেরা জঙ্গল থেকে খাদ্যসংগ্রহে দক্ষ, আকাশের মেঘ দেখে বৃষ্টির পরিমাণ আন্দাজ করতে পারে, মাটির রকমফের দেখে শত্রুর গতিবিধি আঁচ করতে পারে। দোপ্‌দী বসাই দুলনা বেতুলদের সঙ্গে বিরসা ধানী মুণ্ডা, সুনারা, সালী, গয়া মুণ্ডাদের মিল থেকে জমি-জঙ্গলের অধিকারের আকাঙ্ক্ষায়- “ভগবান বলেছিল, সিংভূমের সকল জঙ্গল আর মাটি আমরা ফিরে পাব” (দেবী ১৪১৮ সাল, ৩০) আখ্যানের উপস্থাপনায় নায়ক/নায়িকা অনৈতিহাসিক নয় বা সময়নিরপেক্ষ নয়। মানবিক অস্তিত্বকে ও অস্তিত্বরক্ষার প্রতিরোধকে ইতিহাসের পরিসর ও কালের মাত্রায় উপস্থাপন করে উপন্যাস। “a chronotopic understanding of the human being as saturated in historical existence” (Morris 1994, 19) ‘অরণ্যের অধিকার’ কালস্থানিকতার এই পরিসরে বিরসাদের নায়ক ক’রে তোলে পরিবেশ-রাজনীতি এবং রাষ্ট্রদ্রোহের রাজনীতির প্রেক্ষিতে। বিরসা ‘মিথ’ হয়ে যায় ভগবান বা ধরতি-আবা হয়ে গিয়ে আর বসাই বলে, “মরণ বোলথে কিছু নাই হে কমরেট”, মৃত্যুঞ্জয়ী পুনরুজ্জীবন নিয়ে বসাই ‘মিথ’ হয়ে যায়। এই মিথ অরণ্যের সঙ্গে জমির অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বসাই বিরসা তা জীবন দিয়ে বোঝায়।

‘নায়ক’দের বিশুদ্ধি, অশুদ্ধি ও নবনির্মাণ

সত্তর-দশক পরবর্তী কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস চেনা আখ্যানকাঠামো ভেঙে বেরোতে চাইল। ওই উপন্যাসের প্রোটোগনিস্টরা আর চিরাচরিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতাপেক্ষী হয়ে উঠল না; নায়ক মানেই বিশুদ্ধ দাগহীন গুণবান উদারহৃদয় এমনটা নাও হতে পারে। পরিস্থিতি, স্থান এবং সময়

তাকে আখ্যানের প্রোটাগনিস্ট ক’রে তুলছে। সে নায়ক বলেই সে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রা বা দ্রোহের অবিসংবাদী হোতা, তেমনটা নয়। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটাগনিস্টদের আরেকটি ‘ছুঁমার্গ’ লক্ষ্যণীয়- বামপন্থী মতাদর্শগত নায়ক যৌনতার ব্যাপারে ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ ও ‘পবিত্রতা’ মেনে চলে। অধিকাংশ সময়েই যৌনতাহীন প্রেমের উদ্গাতা তারা, ‘শরীর’-এর থেকেও মন নিয়ে বেশি চিন্তিত এবং নারীর ‘শুদ্ধতা’ নিয়ে ভাবিত। লেখকেরা নিজেরাও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না যৌনতার উপস্থাপনে। উপন্যাসের সৎ নিষ্ঠাবান দ্রোহী বিশেষতঃ বামপন্থী দ্রোহী মানেই সে শরীরী প্রেমে বিশ্বাসী নয় এবং প্রেমের উদ্‌যাপন সামাজিক নিয়মাবলী মেনে চলে। প্রগতিশীল শিবিরের লেখকেরাও এমন ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার প্রয়োগে বিশ্বাসী। চিরাচরিত সাদা-কালোর বাইনারি মেনে কমিউনিস্ট প্রোটাগনিস্ট ‘সাদা’কেই উজ্জ্বল করে আরও। অ-প্রগতিশীল শিবিরের উপন্যাসিকেরা এবং বাণিজ্যিক পত্রিকার বাঁধানীতিতে বিশ্বাসী লেখকেরা এর নীতি-মূল্যবোধকেই প্রয়োগ করেন বিপরীত প্রক্রিয়ায়। সেখানে নকশাল দ্রোহী বা ষাট-সত্তরের কমিউনিস্ট দ্রোহীর চরিত্র-চিত্রায়ণ ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের উল্টোদিকে দৌড়ায় এবং সেই প্রোটাগনিস্টকে (বা, অপ্রধান কমিউনিস্ট চরিত্রকে) খারাপ প্রমাণ করার দায়েই তাকে প্রবল যৌনকামনায় জারিত করে লেখক কিংবা দায়িত্বহীন পলায়নবাদের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে। তখন প্রেমের উদ্‌যাপন মানে কিছু সঙ্গতিহীন যৌনদৃশ্যের উপস্থাপন করে লেখক। আধুনিক সময়ের সঙ্গে তার তালমিল থাকে না। প্রোটাগনিস্টের রাজনৈতিক উত্তরণ বা আখ্যানবাস্তবে তার অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। একদিকে এই অতীব রক্ষণশীল ছুঁমার্গবিশিষ্ট চিত্রায়ণ এবং অন্যদিকে সঙ্গতিহীন উপস্থাপনা- রাজনৈতিক কুশীলব রক্তমাংসের চরিত্র হয়ে উঠতে পারে না। হয় প্রবল নীতিবোধ-বিশুদ্ধতা নয়তো প্রবল দুর্নীতি-অশুদ্ধতা এই সাদা-কালোর মাঝে দোদুল্যমান থাকে। প্রগতিশীল উপন্যাসিকদের যৌনতার রক্ষণশীল ধারণা ব্রিটিশনির্মিত ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ থেকে বেরোতে পেরেছিল কি? দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মতাদর্শে নিষ্ঠ সাহিত্যিক; ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে

মধ্যবিত্তের রাজনীতিবোধকে সমাজবাস্তববাদী প্রকরণে আখ্যানবদ্ধ করেছেন। কিন্তু, তাঁরই লেখায় থাকে,

স্ট্যাটিসটিস্ট বলে সমস্ত ধরণের অপরাধ বেড়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশে শিশু-অপরাধ, সমকামিতা, কুমারীর মাতৃত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উন্মাদরোগ, অসম্ভব সব উপায়ে হত্যা ও আত্মহত্যা, বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য প্রায় নারকীয় ধরণের ক্লাব ও চক্র প্রকাশ্যে গোপনে তাবৎ অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অজগরের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছে। সুতরাং উপনিবেশের মারফৎ তার বিস্তৃতি অন্যত্রও ঘটেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ২২৫)

প্রোটাগনিস্ট নিশানাথ সমকামিতাকে অপরাধ বলে মনে করছে, কুমারীর মাতৃত্বকে ধনতান্ত্রিক দেশের থেকে আসা বিকৃত অপরাধ বলে মনে করছে। ঔপন্যাসিক দীপেন্দ্রনাথ নিশানাথকে অস্তিত্ববাদী নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন, নিশানাথের বকলমে লেখক সমাজের প্রতি নিজের অনুযোগগুলি ব্যক্ত করছে। এই একই নিশানাথ নারীমুক্তির পক্ষে সওয়াল করে কাল্পনিক আদালতে দাঁড়িয়ে, “এখনও আমরা মেয়েদের পথে বেরোন, চাকরি করা, রাজনীতিতে নামাকে সুস্থভাবে মেনে নিতে পারলাম না” (২২৫) অস্তিত্বের সন্ধানে নিশানাথ তৎকালীন সভ্যতার সংকট ও আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির উল্লেখ করছে। পুঁজিবাদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ধারণার সহাবস্থান, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাস-সংস্কারের সহাবস্থান এবং আধুনিকতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব নিশানাথের স্বগতসংলাপে পাঠকের কাছে হাজির করেন লেখক। শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রোটাগনিস্টের আত্মবিলাপ এবং তাদেরই জন্য সাজানো ও তাদেরই দ্বারা নির্মিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরকে নিয়ত আঘাত ক’রে চলা নিঃসন্দেহে আধুনিক উপন্যাসের পরিচায়ক। কিন্তু, নিশানাথের রাজনীতি ভদ্র-মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকে। রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় চিহ্নিতকরণে নিজের নৈতিকতা দিয়ে বিচার করতে থাকে সবকিছু। পানশালায় মদ্যপান করতে গিয়ে এক দেহোপজীবীনির সঙ্গে নিশানাথের সংলাপ¹⁹⁶ সেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিসরকে আখ্যানের বাস্তবতায় প্রয়োগ করে। ‘সুবর্ণরেখা (১৯৬৫)’ ছবিতে ঈশ্বর ও হরপ্রসাদের

কলকাতা শহরের বীভৎস মজা আবিষ্কারের মুহূর্তে পানশালাকে যেভাবে দেখানো হয়, ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি (১৯৬১)’ উপন্যাসেও সেভাবেই দেখানো। হরপ্রসাদ এবং ঈশ্বরের যাবতীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকীয় মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে, নিশানাথেরও তাই হয়। এঁদের প্রত্যেকের দ্বিধা, নৈতিকতার সংশয়ে জারিত সংলাপ যাটের দশকের কলকাতার সংস্কৃতিকে বর্ণনা করে; একইসঙ্গে প্রোটোগনিস্টের প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতে চাওয়া ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধকে উপস্থাপিত করে। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’ উপন্যাসের মণিমোহন একইরকম আদর্শবোধে তাড়িত। মণিমোহন সিপিআই-র সদস্য এবং উপন্যাসের কালস্থানিকতায় জরুরি অবস্থার ত্রুটি সংশোধনে আন্তরিক তৎপর। মণিমোহনকে কংগ্রেসী যুবকরা নীতি-মূল্যবোধ নিয়ে খোঁচা দিতে এলে তার ভদ্রলোকীয় মূল্যবোধ অসম্ভব পবিত্রতা আঁকড়ে ধরে।¹⁹⁷ প্রেমের চিঠিতে উদগ্র কামনার কথায় তার ‘গা ঘুলিয়ে ওঠে’ এবং ‘আমি লম্পট নই’ এই ভাবনা আধিপত্য করতে থাকে। শত রাগেও মণিমোহন বা ‘শোকমিছিল’ উপন্যাসের বিনয়ভূষণরা গালাগালি দেয় না; উপন্যাসের অ্যান্টাগনিস্টরাও সাহিত্যিক শালীনতার সীমা মেনে কিছু ‘চটুল’ শব্দ প্রয়োগ করে কিন্তু তা গালাগালি নয়। প্রগতিবাদী লেখকদের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রের সফল প্রয়োগে এমন চরিত্রনির্মাণ চিরাচরিত। কিন্তু, ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পরিবারে বেড়ে ওঠা দ্রোণাচার্য ঘোষের বর্ণনা পূর্বোক্ত রক্ষণশীলতা মেনে চলে না। উপন্যাসের শুরুতে কথক দ্রোণাচার্যকে আলাদা ক’রে চিনিয়ে দেন, “ধবধবে ফর্সা, তীক্ষ্ণ নাক, এলোমেলো চুল, রোগাপাতলা ছেলেটির আয়ত চোখদুটি আশ্চর্য সুন্দর... দ্রোণের কথাবার্তাতেও স্বতন্ত্র আছে... সে প্রায়শই জীবনানন্দ দাশ নামে এক কবির কবিতা বলে যায়” (মুখোপাধ্যায় ২০১৩, ১২) দ্রোণের দু’হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, দ্রোণ কৈশোরের যে কোনও খেলায় সেরা এবং দ্রোণ পাখির প্রতি সহমর্মী- এই গুণগুলি তাকে সম্ভাব্য নায়ক ক’রে তুলতে সচেষ্ট। দ্রোণকে স্বতন্ত্র ক’রে নেওয়া লেখক-কথকের সচেতন প্রয়াস, কারণ পরবর্তী আখ্যানাংশে দ্রোণের আধিপত্য করার সম্ভাবনা পাঠককে বোঝানো প্রয়োজন। সমাজবাস্তবতার দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে দ্রোণের চেতনায় বদল আসে, কিন্তু সেই বদল আরোপিত নয়। কোনও উচ্চমূল্যবোধের অবাস্তব

প্রয়োগ কিংবা লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাসূত্রের নৈতিকতা এখানে নেই। দ্রোণাচার্য মাঝপথে ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে, সে গাড়ি চালানো শিখেছে এবং অণুপত্রিকায় কবিতা লেখে। বাংলা প্রগতিবাদী উপন্যাসের শাসকবিরোধী প্রোটোগনিস্ট প্রেমজ সম্পর্কের ব্যাপারে একমাত্র সঙ্গী/সঙ্গিনীতে বিশ্বাসী। যৌনকামনা বিপ্লবী হওয়ার পরিপন্থী এমন শুদ্ধতাবোধে বিশ্বাসী তারা। কিন্তু, দ্রোণাচার্য তেমন নয়, “শুধু ললিতা নয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পুতুল, পাপিয়া, অশোকাও। মেয়েদের মাধুর্য কাঙ্গালের মতো পেতে চায় দ্রোণ”।¹⁹⁸ স্নানরতাদের দেখে দ্রোণের ‘বিশেষ অঙ্গটি জগে ওঠে। প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যাবার উপক্রম’- দ্রোণের যৌনকামনার বর্ণনা রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষের¹⁹⁹, এই উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দ্রোণ কমিউনিস্ট দ্রোহী হয়ে উঠবে বলে তার এই প্রবণতাকে নালিফাই ক’রে দেননি লেখক। প্রগতিবাদী লেখকদের বর্ণনায় এমনটা আসে না, কিংবা সমাজবাস্তবতাবাদী লেখকদের ধারণায় দ্রোণের এহেন যৌনকামনা অশালীন অবর্ণনাযোগ্য। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান কুশীলব পাঞ্চগলী হাসপাতালের সেবিকা, রাজনৈতিক সংগঠক ও দ্রোণের প্রেমিকা। কিন্তু অসুস্থ নিরুপমকে হাসপাতালে সুস্থ ক’রে তুলতে তুলতে ও সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়তে পড়তে নিরুপমকে ভালবেসে ফেলে। তথাকথিত ‘একবিবাহ (monogamy)’ মডেল ও ‘এক প্রেমিকের প্রতি সমর্পিত প্রেমিকা’ সামাজিক মূল্যবোধ মেনে চলে না পাঞ্চগলী। লেখক অশোক মুখোপাধ্যায় সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে সরে আসেন বলেই কথকসুলভ নিস্পৃহতায় পাঞ্চগলীর এই হৃদয়বদল আখ্যায়িত করেন এবং মধ্যবিত্তসুলভ রোম্যান্সবর্ণনা ছেড়ে পাঞ্চগলীর রাজনৈতিক অভিযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। বিপ্লবী মানেই তিনি কামনা-বাসনার উর্ধ্বে, বিপ্লবী মানেই তাঁর ব্যক্তিগত ভালবাসা-মন্দবাসা থাকবে না এমনটা অবাস্তব। রাজনীতি বরং মানবিক প্রবৃত্তিগুলিকে আরও সচেতন ভাবে অনুশীলিত হতে শেখায়। এই বাস্তববোধ বহু বাঙালি রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক এড়িয়ে গেছেন নয়তো ‘বিশুদ্ধ-নীতিবাগীশ’ ঔচিত্যবোধ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। দ্রোণ শহীদ হওয়ার পরে নিরুপমের সঙ্গে পাঞ্চগলীর সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা হয়েছে তার পার্টির অভ্যন্তরে- ভোলানাথের

কর্তৃত্বসুলভ মনোভাবে ও যান্ত্রিক যুক্তিতে বাধা এসেছে। জনতোষী মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পাঞ্চগলীকে ‘শহীদ দ্রোণের বিধবা স্ত্রী’ ভূমিকাতেই থেকে যেতে বলে এবং নিরুপমের সঙ্গে সম্পর্কে নিজস্ব সংশয় প্রকাশ করে।²⁰⁰ ভোলানাথের কর্তৃত্ব ও সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পাশাপাশি জনতোষী সামাজিক বয়ানও এতে প্রকাশ পায়। পাঞ্চগলী ও নিরুপম দু’জনেই ভদ্রলোক-মধ্যবিভ পরিবেশ থেকে এসে কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুশীলনে আস্থা রেখেছে- সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনতোষী মতামতকে সমালোচনা করার উত্তরণ ঘটছে তাদের- লেখক এই উত্তরণ প্রকাশে দ্বিধাহীন এবং পাঞ্চগলী-নিরুপম-ভোলানাথরা বাস্তবস্থিতি কুশীলব হয়ে উঠেছে। এই ভদ্রলোক-মধ্যবিভ কুশীলবের রক্তমাংসের চরিত্র হয়ে ওঠা থাকে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট ওসমানের বর্ণনাতেও থাকে। প্রেমিকা শিবানীকে কল্পনা ক’রে দ্রোণের আত্মরতি, “কল্পনায় লেহন করে স্নানরতার সূর্যমুখী স্তন, নিম্ননাভির অরণ্যানী, কামড়ে ধরে স্তনবৃত্ত। হাত চলে মগরা-হাওড়া, হাওড়া-মগরা... বজ্রপাতের মতো বীর্য আসে” (৬২) জীবনের যে হতাশাবোধের উপলক্ষ্য ধরে আসে, ওসমানের আত্মরতির বর্ণনাতেও তেমনই। ছাত্রী রানুকে কল্পনা ক’রে ওসমান গনির ফ্যান্টাসি যৌনস্বাদ পেতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে²⁰¹। আর, এই কাল্পনিক যৌনতা হঠাৎ আসে না; ওসমানের ব্যর্থতা, দেশভাগের পরে তার ছেড়ে আসা গ্রামের স্মৃতি এবং কিশোর রঞ্জুর সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আসে। ৩৪ নম্বর অধ্যায়ে ওসমানের যৌনকামনার এক অদ্ভুত বদল ঘটে- রানুকে কল্পনা ক’রে স্বমেহন করতে করতে “ওসমানের হাতে এখন তার ফেঁপে-ওঠা শিশ্ন... বাঁ হাতে নিজের যৌনাঙ্গ ঝাঁকচ্ছে, এইতো, এই পেরেক দিয়ে রানুকে গেঁথে নেবে নিজের সঙ্গে” (ইলিয়াস ২০১৫, ২১৪) এই দৃশ্যকল্প বদলে যায় কিশোর রঞ্জুর সঙ্গে যৌনসঙ্গমের চিত্রকল্পে “সে কি-না ওর গালে অবিরাম চুমু খেয়ে চলেছে। রানুকে রঞ্জু সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়েছে”। আর, এই দৃশ্যকল্পের অন্তিম পরিণতিতে নিজেরই মৃতদেহের সঙ্গে শুয়ে থাকা দেখতে পায় ওসমান। উল্লেখ্য, ওসমান কিন্তু এই পর্বেই নিজের মধ্যবিভ-ভদ্র সীমাবদ্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে শাসকবিরোধী দ্রোহে সামিল হতে চাইছে এবং

দৃশ্যবিভ্রমে আইয়ুব খানের দেহ পুড়তে দেখার উল্লাসে খিজিরের নৈরাজ্যবাদী চিন্তার শরিক হতে চাইছে। আনোয়ারের অনুসরণ না ক'রে, শওকত-আলতাফদের সরিয়ে খিজিরের সঙ্গে সখ্য বাড়চ্ছে। তার যৌনকল্পনায় রানুর (একটি কিশোরী) বদলে রঞ্জু (একটি কিশোর) চলে আসাকে ইলিয়াস সমকামিতা দিয়ে দেখাতে চান না, বরং এক দোদুল্যমান মধ্যবিত্তের নার্সিসিজমের প্রবণতা দেখাতে চান²⁰²। ওসমানের শিকড়ছেঁড়া অতীত আর দেশভাগের ফলে উদ্বাস্ত হওয়ার বিপন্নতাকে আঁকড়ে সুখভোগের প্রবণতা দেখাতে চান। ওসমান সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চয়ই করে না, কিন্তু তার দোদুল্যমানতা-পিছুটান এবং সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরোতে চাওয়ার 'পাগলামি'র বৈশিষ্ট্যগুলি মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত সমাজে রয়েছে। ইলিয়াস সেটুকু বাস্তবকে আখ্যানে মিশিয়ে নেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট মধ্যবিত্ত থেকে শ্রেণিবিচ্যুত হয়ে সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী হওয়া ব্যক্তির। দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও ত্রিাশীল থাকে। সামাজিক বর্গে পার্টি ও পরিবার এই দু'য়ের নিয়ত গতিশীল দ্বন্দ্ব জারিত হয় তারা। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘ হওয়া ও আদর্শগত অনুশীলনের বিরোধভাসের পরিসরকে সদর্থক মতাদর্শ ও নঞর্থক মতাদর্শের সংঘাত হিসেবে দেখেছেন।²⁰³ একই উপন্যাসের আখ্যানবস্তুতে এই দু'রকম মতাদর্শের প্রভাব পড়ে কুশীলবেদের আচরণে এবং উপন্যাসস্থিত সময়ের ওপরে। রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য থেকে যে মনুষ্যত্ব ও মানবকল্যাণ বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং তা সক্ষীর্ণ হত্যা-প্রতিহত্যার নঞর্থক অনুশীলনের দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে পারুল। পারুল একদা রাজনৈতিক কর্মী কিন্তু বিনয়ভূষণের মতো 'হোলটাইমার' হতে পারেনি বরং সাংসারিক পরিসর থেকে পার্টি-রাজনীতি-মানবতা বিচার করে। 'বিবাহবার্ষিকী' উপন্যাসের মণিমোহনের নায়কত্ব আবিষ্কার করা যায় তার বিপরীত চেতনা এবং বিপরীত মানসিকতার কুশীলবদের সঙ্গে সংলাপে। মণিমোহনের মতাদর্শগত অবস্থান তার সমশ্রেণিভুক্ত মানুষদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার পরিসর অব্যাহত রাখে। অমিয় মণিমোহনের যৌবনের বন্ধু, এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, অতিস্বচ্ছল উচ্চ-মধ্যবিত্ত²⁰⁴ এবং মণিমোহনের অনমনীয় আপোষহীন রাজনৈতিক

মতাদর্শকে পাঠকের কাছে প্রকট করতেই আখ্যানে তার অস্তিত্ব। উপন্যাসে ইন্দ্র ও প্রসন্নর সংলাপ এবং মণিমোহনের সঙ্গে তাদের সংঘাত ও বৈপরীত্য রাজনৈতিক মতাদর্শের আখ্যানবদ্ধ রূপ। প্রসন্ন সিপিআই(এম) পার্টির সদস্য ও কলেজের অধ্যাপক এবং ইন্দ্র একদা সিপিআই পার্টির সক্রিয় সদস্য হলেও এখন নামী বিজ্ঞাপন কোম্পানির মালিক। প্রসন্নর সঙ্গে সংলাপে ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতির আত্মসমালোচনা ও সমালোচনা রাখেন মণিমোহন। উপন্যাসের ভাষা ও গঠনে সচেতন রাজনৈতিক দলিল মিশিয়ে নেন দীপেন্দ্রনাথ। সিপিআই-র সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী তথা মধ্যবিত্ত স্বজনবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেই মণিমোহন যে নায়কত্বে উত্তরণ চাইছে তা বুঝিয়ে দেন। আর, নায়ক মানেই সে সর্বদা নির্ভুল ও মতাদর্শের অনুশীলনে নিখুঁত এমনটা নয়। প্রসন্নর কাছে মণিমোহনের আত্মসমালোচনা ও উপন্যাসজুড়ে টুকরো-টুকরো স্মৃতিঝলকে সিপিআইয়ের রাজনৈতিক ভুলের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে মণিমোহনের মোক্ষণ সম্পূর্ণ হয়।²⁰⁵ ইন্দ্রদা উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং সিপিআইয়ের সমর্থক; কিন্তু, নিজের মতাদর্শগত অবস্থান নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে ও মণিমোহনের শুদ্ধ নৈতিকতাকে দারুণ সম্মান করে। নিজেকে পেটিবুর্জোয়া স্বীকার ক’রে মণিমোহন সম্পর্কে বলার “কোনও নৈতিক অধিকার আমার অন্তত নেই” (২৯০) বলে এবং “মাল খেতে খেতে উপমহাদেশের অসমাপ্ত বিপ্লবের জন্য চোখের জল ফেলি” (২৮৯) বলার মধ্যে দিয়ে মণিমোহনের রাজনৈতিক অবস্থানের অনমনীয়তাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরা হয়। ইন্দ্র ও প্রসন্নর সংলাপ দীপেন্দ্রনাথ নির্মাণ করছেন যাতে পেটিবুর্জোয়া পরিসরকে প্রত্যাখ্যান করার মণিমোহনীয় যুক্তিকাঠামো সবল হয়।²⁰⁶ সত্তর দশকের রাজনৈতিক সিন্ধুসিসের মধ্যে দিয়েই মণিমোহনের “ছাত্রজীবন থেকে শহরে রাজনীতি করলাম। এবার আসল জায়গায় যেতে চাই” (২৯০) উপলব্ধি ও তাগিদ অনুভূত হয়; ইলিয়াসের আনোয়ার ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় গ্রামে যায় এবং তার শহুরে আধুনিকতা ওই গ্রামবাংলার রাজনীতিতে দ্বন্দ্বিক অনুশীলনে অমসৃণ গতি উপলব্ধি করে। মণিমোহনের শুদ্ধতাবোধ, উত্তরণ, মতাদর্শের নির্ভুল উচ্চারণ উনিশশো সাতাত্তর সালের; কেন্দ্রে জনতা সরকার ও রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। মণিমোহনের প্রতিমুহূর্তের আর্থ-রাজনৈতিক সংকট (মণিমোহনকে নিজের শিশুপুত্রকে

বোঝাতে হয় যে তারা গরীব এবং কমিউনিস্ট), নীতিগত শুদ্ধতার সংকট “এইভাবেই পারিপার্শ্ব থেকে সব শুদ্ধতা আস্তে আস্তে উবে যায়” (২৪৮) এবং সাংস্কৃতিক সংকট (মণিমোহন পণ্যকামী সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়) মণিমোহনকে রাজনৈতিক উপন্যাসের রাজনৈতিক নায়ক ক’রে তোলে। সে বদ্ধতা থেকে উত্তরণের দিকে এগোতে চায়। সর্বশেষ বাংলা প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়ক মণিমোহন বিশ্বায়ন-পূর্ব জমানার শেষ প্রতিনিধি; সে বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বদলের পূর্বাভাস পায় কিন্তু রোধ করতে পারে না। ইলিয়াসের নির্মিত ওসমান-আনোয়ার কিংবা ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র রণজয় একই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের নির্মাণ ও আখ্যানবদ্ধতা আলাদা। তবে, ইলিয়াস যেমন ওসমানের মধ্যবিত্ত চেতনার নির্মাণে তার শিকড়হীনতার সংকট রেখেছেন, দীপেন্দ্রনাথও তেমনই মণিমোহন-বিনয়ভূষণের চেতনার নির্মাণে পার্টি-ভাঙ্গনের শিকড়নাড়া সময়ের সংকটকে বারবার আনছেন।²⁰⁷

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পার্টিজান-সাহিত্যিকের উপন্যাসে শহুরে প্রলেতারিয়েত যে বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়, ইলিয়াসের খিজির তার থেকে আলাদা। ‘শোকমিছিল’-এর শশী সমাজবাস্তববাদী ধাঁচায় ফেলা ‘আদর্শ’ প্রলেতারিয়েত। রাজনৈতিক শুদ্ধতাবোধ থেকে সে হাতে একদা-আঁকা রাম-সীতার উল্কি মুছে ফেলতে চায় বিনয়ভূষণের পার্টির মতাদর্শে এসে। সে পোষা টিয়াকে ‘বোলো লেলিন, বোলো স্টালিন’ বলতে শেখায়। অজয় খুন হওয়ার শোকে একবারই তার মুখে অপভাষা শোনা যায়, “অজুর খুনের বদলা না নিলে শশী খানকির ব্যাটা” (৪৪০) কিন্তু সেও শুধু ক্রোধের মুহূর্তে। তারপরেই মতাদর্শ-নিয়ন্ত্রিত ভাষাগত শুদ্ধতা মনে পড়ে যাওয়ার তার ক্রোধজাত ভাষা পাল্টে যায় অথবা, ভদ্রবৃত্তের পরিসরে দাঁড়িয়ে তার রুচিবোধ মার্জিত-শালীন হয়ে ওঠে, “না, না, উ কথাটি বলবেন না। বলবেন শশী বলেছে, কমরেড ভারী, রোও মং। শশীরা বদলা নিবে।” (৪৪০) শশীকে একদা মার্কসবাদের পাঠ দিয়েছিলেন বিনয়ভূষণ এবং তাকে বস্তুবাদী ক’রে তুলে ‘শ্রেণিচেতনা’ গড়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে- বিনয়ভূষণ মধ্যবিত্ত শহুরে পরিসরে থেকে এই রাজনৈতিক আখ্যানের নায়ক। শশীকে এবং উন্মাদিনী স্পষ্টবক্তা ননীদিকে

বিনয়ভূষণই নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর শ্রেণিচেতনা ও নৈতিক-রাজনীতি দিয়ে।²⁰⁸ খিজির লুস্পেন প্রলেতারিয়েত, তার আচরণে রাজনৈতিক শুদ্ধতাবোধ (political correctness) নেই। খিস্তি ছাড়া সে কথা বলে না, স্ত্রীকে অসম্মানজনক কথা বলে এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতায় মহাজনের কাছে নিজের পরিবারের শারীরিক-মানসিক দাসত্ব মেনে নেয়। এই খিজিরই বজলুর বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে যখন “পোয়াতি বৌকে বজলু লাথি মারছে... রক্তের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকে বজলুর বৌ।” (৯৫) এবং স্বশ্রেণির বজলুকে সে পেটায়। জুম্মনের মার গর্ভবতী হওয়ার খবরে খিজিরের রোম্যান্টিক হয়ে ওঠা সমাজবাস্তববাদী উপন্যাসের নায়ক বা আধুনিকবাদী উপন্যাসের নায়কের মতো নয়। শিক্ষিত-ভদ্রবৃত্তের রোম্যান্টিক বহিঃপ্রকাশ তার নেই; রুক্ষ খিজির কিছুটা নরম হয়, জুম্মনের মায়ে শ্রমভার নিয়ে চিন্তিত হয় এবং মহাজনের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়²⁰⁹। জুম্মনের মা উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত এবং শোষিত লিঙ্গের প্রতিনিধি। মহাজনের পরিবারের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে বাঁধা জুম্মনের মা অর্থনৈতিক ও দৈহিক শোষণের শিকার। কিন্তু, কোনও ‘ভদ্রমহিলা’-সুলভ স্ত্রীলতাবোধ ও ভিত্তিরীয় মূল্যবোধ তাকে পেড়ে ফেলে না। কামরুদ্দিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে খিজিরের সঙ্গে থাকে সে কিন্তু জুম্মনের সূত্রে কামরুদ্দিনের সঙ্গে সম্পর্কের সুতো থেকে যায়। মহাজন রহমতউল্লা তার সঙ্গে যৌনসম্বোগ করতে চায় জেনে জুম্মনের মা রহমতউল্লাকে ব্যবহার ক’রে নিতে চায় নিজের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য (১৬৫)। মহাজনের বাড়ি থেকে খাবার বা অন্যান্য সামগ্রী চুরি ক’রে এনে নিজের সংসারে ব্যয় করে সে। জুম্মনের মা, খিজিরের বৌ এবং শ্রমজীবী নারী এই তিন ভূমিকাতেই জুম্মনের মায়ে উপস্থাপনা তাকে আখ্যানের বাস্তবতায় রক্তমাংসের চরিত্র ক’রে তোলে। এই তিন ভূমিকার পরেও তার নিজস্ব সত্তা জাগরুক থাকে। মহাজনের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক কিন্তু তার প্রতি ঘৃণা- খিজিরের সঙ্গে গালিগালাজের (কদাচিৎ যৌনতার) সম্পর্ক কিন্তু তার প্রতি সুপ্ত ভালবাসা- জুম্মনের মাকে পাঠক আবিষ্কার করে তার শ্রেণিভিত্তি ও সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে। পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধ, নৈতিকতা বা স্ত্রীল-

অশ্লীলের মাপকাঠিতে তাকে বিচার করা যায় না।²¹⁰ খিস্তি ব্যবহারে খিজিরের মতোই পারদর্শী সে। মহাজনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চিন্তায় যুগপৎ আনন্দিত ও বিমর্ষ হয় সে; তার শ্রেণিঘণার সঙ্গেই ভবিষ্যতের নিশ্চিন্তির ভাবনাও ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজবাস্তববাদী উপন্যাসের প্রোটোগনিস্টের মতো তার উত্তরণ একমুখী নয় কিংবা মতাদর্শচালিত যান্ত্রিক না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে গর্ভপাতের জন্যে চাপ দিতে পারে, সেই ভয় খিজির ও জুম্মনের মা দু'জনেই পায়। জুম্মনের মায়ের সঙ্গে অশ্লীল সংলাপ বিনিময়ের মধ্যেই খিজিরের দ্রোহচিন্তা ঝলক দিয়ে ওঠে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিলে নিজের অত্যাশাহী ভঙ্গি কল্পনা করতে থাকে খিজির। ইলিয়াস কোনও মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত শ্রেণির সংকটের আখ্যান রচনা করেননি; 'চিলেকোঠার সেপাই' গ্রামের চেংটু-আলিবক্স আর শহরের খিজিরকে অক্ষ ক'রে ঘুরে চলে। আনোয়ার ও ওসমান সেই অক্ষকে কেন্দ্র ক'রে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে। ইলিয়াস নিজেও জানান যে, আলিবক্সই এই উপন্যাসের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অথচ অনাবিস্কৃত চরিত্র।²¹¹ খিজির ও চেংটু দু'জনেই মৃত, ওসমান মানসিক ভারসাম্যহীন (শেষ পর্বে হয়তো মৃতও) এবং আনোয়ার খোয়াবে ডুবে গেছে; এমতাবস্থায় '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধ অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভূমিহীন কৃষক আলিবক্স সবচেয়ে উজ্জ্বল অথচ কম আলোচিত কুশীলব। আলিবক্সও আনোয়ারের মতো চিনপন্থী। আনোয়ার আলিবক্সের শ্রেণিশত্রু চিহ্নিতকরণের যুক্তি খণ্ডন করতে পারে না এবং আলিবক্সের নির্দেশ মেনে নিতে তার শহুরে তাত্ত্বিক ভদ্র অহংবোধে আঘাত লাগে²¹²। ইলিয়াস তাঁর প্রবন্ধে আরও স্পষ্টভাবে এই গ্রাম-শহর তত্ত্ব-বাস্তবতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে লিখেছেন।²¹³ "শ্রমজীবীদের সঙ্গে বামপন্থী কর্মীদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা" (৩০) এবং কেন শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবেশে বড় হওয়া বামপন্থীরা সৎ ও সহানুভূতিশীল হয়েও গ্রামের মানুষের শ্রম-দারিদ্র্য-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে ঠোঁকর খান, সেই অভিমতগুলির সঙ্গে আনোয়ারের নির্মাণ কিংবা 'খোয়াবনামা'-র কমিউনিস্ট অজয় দত্তদের নির্মাণের হৃদিশ মেলে। 'নায়ক নির্মাণ'-এর জটিল পরিসরে আনোয়ার ও ওসমানের বর্ণনা যখনই এসেছে, আনোয়ার

তখন গ্রামে ও ওসমান শহরে। আনোয়ার এবং ওসমান যে একই মানুষের দু'ই ভিন্ন সত্তা, তা ইলিয়াস বলেছেন।²¹⁴ ওসমান খাঁচাবদ্ধ মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিভূ এবং আনোয়ার তাত্ত্বিক পরিসর থেকে বাস্তবতাকে বিচার করতে চাওয়া মধ্যবিত্ত। করমালি-খিজির-আলিবক্স এসে তাদের তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতায় আঘাত করে, তাদের ভদ্র-মধ্যবিত্ত পরিসরের আগল উন্মুক্ত করে এবং আখ্যানের নায়ক-নির্মাণের চেনাগুণ্ডি পেরিয়ে পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত বাড়িয়ে দেয়। 'বিবাহবার্ষিকী' উপন্যাসের মণিমোহন সাংস্কৃতিক দোদুল্যমানতায় শ্রেণি-রাজনীতি ভুলে যেতে বসলে এক শ্রমিকই তাকে ফের সচেতন ক'রে দেয়। ভিড় বাসে 'শির-ওঠা চ্যাটালো হাত, তেলকালি-মাখা ময়লা পোশাক' পরিহিত অবাঙালি শ্রমিককে দেখে “জনসংঘী! শালা খোট্টা” এই প্রাদেশিক ভাবনার পরমুহূর্তেই 'ছি ছি মণিমোহন, হুঁশিয়ার' বলে নিজেকে শ্রেণিসচেতন করে মণিমোহন।²¹⁵ আর, ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে সেই মজুরটিই 'সমর্থ হাতে তাকে বেড় দিয়ে ধরে রাখল।' এই দৃশ্যটি প্রতীকী- মধ্যবিত্ত বিচ্যুতি থেকে শ্রমিকটি তাকে বাঁচাচ্ছে; কিন্তু খিজির-ওসমানের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের ব্যাপ্তি নেই এতে।

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসেও নায়ক-নির্মাণের সংকট অব্যাহত থাকে। তমিজের বাপ উপন্যাস-পরিসরের মাঝামাঝি (আখ্যানের সবচেয়ে সংকটজনক মুহূর্তে) এসে চোরাবালিতে তলিয়ে মারা যায়। তখন দেশভাগ হয়ে গেছে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বৈকুণ্ঠ গিরির বুড়ো আঙুল উড়ে গেছে এবং ক্ষমতা-হস্তান্তরের পরে তেভাগার প্রত্যাশা ভুলিয়ে দিচ্ছে মুসলিম লিগ। তমিজের বাপের কাছে কিন্তু এইগুলি তার ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের সংকট নয়, তার কাছে প্রধান সংকট ওই কালস্থানিকতায় পাকুড় গাছ উধাও হয়ে যাওয়া।²¹⁶ তমিজের বাপের মেঘ তাড়ানো দিয়ে যে আখ্যানের সূচনা সেই আখ্যানের মাঝপথে তমিজের বাপ মারা যায়। তমিজ হারিয়ে যায় তেভাগার খোয়াব দেখতে দেখতে এবং সেই খোয়াবকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে। তমিজ নিরুদ্দেশ (নব্য ক্ষমতাবান আব্দুল কাদের ইঙ্গিত দেয় যে, তমিজ মারা গেছে²¹⁷) হয় ‘খোয়াবনামা’র শেষ পর্বে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে ক্ষমতাকাঠামোর হাতবদল হয়ে গেছে এবং

তেভাগার দাবিগুলিকে দমিয়ে দিয়েছে মুসলমান উচ্চবর্গ। তমিজ নিজের বংশের আদি পেশা অর্থাৎ মাঝি-পেশা ছেড়ে ভাগচাষীর পেশা বেছে নিয়েছিল এবং সেখান থেকেই তার তেভাগা সফল ক’রে জমির মালিক হওয়ার খোয়াব তাকে অস্থির ক’রে রাখে শেষ পর্যন্ত। শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের মতে, তমিজের এই একগুঁয়ের মতো তেভাগার স্বপ্ন সফল করতে চাওয়া ছোট কৃষকের ভবিষ্যতের সর্বহারা শ্রমিক হয়ে ওঠার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে এঙ্গেলসের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।²¹⁸ তমিজ যদি যথার্থ নায়কই হবে, তাহলে তমিজের পরিণতি লেখকের অজানা থাকার কথা নয়, অথচ ইলিয়াস তমিজের মারা যাওয়া-না-যাওয়ার দোলাচলে রাখছেন পাঠককেও। তমিজের বাপ বা তমিজের সমাজবাস্তববাদী সূত্রায়ন মেনে ‘সর্বহারা নায়ক’ হয়ে ওঠার অনেকগুলি সমস্যা দেখা দেয়- তমিজের বাপ আধোঘুম আধো জাগরণের রহস্যময়তার ভেতরেও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কুলসুমের প্রতি তমিজের বাপের আচরণ ও ভাষাপ্রয়োগ অশোভন পুরুষতান্ত্রিক। তমিজের বাপ কুলসুমের গায়ে হাত তোলে; তমিজ ও তমিজের বাপ দু’জনেই কুলসুমের বংশপরিচয় এবং ভবঘুরে অতীত নিয়ে খোঁটা দেয়।²¹⁹ ইলিয়াস নিম্নবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেন, দেশভাগের সমান্তরালে ঘটে চলা তেভাগা বিদ্রোহকে আখ্যানবস্তুতে রূপান্তরিত করেন আবার একইসঙ্গে তমিজ বা তমিজের বাপের বা নিম্নবর্গের প্রায়-প্রধান চরিত্রদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে আড়াল করেন না। যে বৈকুণ্ঠ বৈরাগী ভবানী সন্ন্যাসীর মিথপ্রবাহ ধরে উচ্চবর্গকে প্রতিস্পর্ধা দেখায় এবং মুনসি-ভবানীর যৌথদ্রোহের স্মৃতি জাগরুক রাখতে রাখতে প্রাণ দেয়, সেই বৈকুণ্ঠ বৈরাগী মুসলমানের ঘরে জল খায় না। পাকুড় গাছ উধাও হওয়ায় তার দুঃখ তমিজের বাপের দুঃখের মতোই জোরালো, চেরাগ আলির পাওনা-শোলোক শোনার জন্যে সে মুখিয়ে থাকে কিন্তু ধর্মবিশ্বাস থেকে বলে “লক্ষ্মীপূজার সরা তো! বেজাতের মানুষ হাত দিলে...” (২৯১)। আধুনিক ও সমাজবাস্তববাদ এই দু’য়ের কোনও নির্দিষ্ট সাহিত্যধাঁচাতেই এই চরিত্রনির্মাণ বাঁধা যায় না। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও মনস্তত্ত্ব ও যৌনতাকে আখ্যানবদ্ধ করতে কোনও ছুঁমার্গ রাখেনি ইলিয়াস; কুশীলবদের যৌনচিন্তা ও আচরণ সমাজনির্মিত নৈতিকতা-মূল্যবোধ মানে না। তমিজের

সঙ্গে কুলসুমের যৌনতার বর্ণনায় পারিবারিক সম্পর্ক বাধা হয় না বরং ‘মৃত’ তমিজের বাপের অদৃশ্য উপস্থিতিই অনুঘটকের কাজ করে। তমিজ তার বাপের উত্তরাধিকার বহন করে এবং কুলসুম তমিজের বাপকেই খোঁজে তমিজের শরীরে²²⁰- বাংলা উপন্যাসে এই যৌনদৃশ্য বিরলতম। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যের যে নির্মাণকল্প শুরু হয়েছিল এবং যে নীতিবাগীশ ভদ্র-মূল্যবোধের জয়যাত্রা এগিয়ে চলছিল, এই বর্ণনা সেই নির্মাণকল্পে ভাংচুর ঘটায়। তমিজের বাপ লম্বা হাত বাড়িয়ে ‘তমিজের তবন আর কুলসুমের শাড়ি’ আলগোছে টেনে নিলে আধুনিকতা, সমাজবাস্তববাদ, প্রগতিবাদ, বাস্তববাদ তথা যাবতীয় সাহিত্যপদ্ধতি ‘গরহাজির’ হয়ে যায়। প্রোটাগনিস্টের ‘শুদ্ধযৌনতা’-র যে পাঠ পেতে পাঠক অভ্যস্ত ছিল, সেই পাঠপ্রত্যাশাও সংকটে পড়ে। এই উপন্যাসের সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় কুলসুমের মৃত্যু। পাকিস্তানের নব্য ক্ষমতাবান ও নয়া-জোতদার কালাম মাঝির দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে এবং কেরামত আলির ভুলবশতঃ মারা কোপে কুলসুম মারা যায়। অথচ, ‘খোয়াবনামা’-র সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে কুলসুমের মধ্যেই। সে চেরাগ আলির উত্তরাধিকার, ছেঁড়াখোঁড়া দুর্বোধ্য তাবিরনামা তার কাছেই সযত্নরক্ষিত ছিল এবং আখ্যানের গতিপথ সম্প্রসারিত করায় তার ভূমিকা যথেষ্ট। কুলসুমও আখ্যানের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। উপন্যাস খুঁজে চলে সেই ব্যক্তিমানুষকে, যাকে ধরা থাকে ইতিহাস সময় আর সমাজের পরিসরে।²²¹ এই তিনটে উপাদানই আখ্যানবদ্ধ মানুষের সঙ্গে সমাজের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে জটিলতায় বোনা ‘উপন্যাস’ করে তোলে। আর, এই ব্যক্তিমানুষের সন্ধান থেকেই মনে হয় যে, কুলসুমই কি বাংলাদেশ? কুলসুমের ক্ষুধার আখ্যান আছে, যে ক্ষুধা মেটেনা কখনো। মাছ-ধান জীবিকাবাহী সংসারেও তার অনাহারে দিন কাটে। যার ঐতিহ্য রয়েছে, বিস্তার রয়েছে আর, যাকে নিয়ে ভাগাভাগির খেলা চলে। যার রূপে শোলোক খোঁজে কেরামত আলি। তাকে পেতে চায় কালাম ও কেরামত, দুই শ্রেণি আর তাদের দুই লক্ষ্য। কালাম শাসকশ্রেণি হয়ে জাঁকিয়ে বসে প্রতিপত্তি বাড়ায় নবগঠিত রাষ্ট্রে এবং কেরামত কুলসুমের তথা বাংলাদেশের রূপে আচ্ছন্ন থেকে, তাকে বাঁচবার তাগিদে, বিদ্রোহের স্বপ্ন লালন

করে জেলবন্দী হয়। কুলসুম চেরাগ আলির নাতনি, কিন্তু, চেরাগ আলিও নিরুদ্দেশ। তবুও, চেরাগ আলির শোলোক, আধোমিথ-আধোবাস্তব রহস্যময়তা তাকেই ঘিরে থাকে। কুলসুম বৈকুণ্ঠ গিরির গোঁড়ামি, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে ঠাট্টা করে। “হামার আম খাবার পারো, আর এটি পানি খেলে জাত যায় কিসক? (৩০১)”। ধর্ম আর দেশভাগের বিপরীতে কুলসুম আসে খোয়াবে। এমনকি, বৈকুণ্ঠ মৃত্যুমুহূর্তে দেখে তাকে, ‘মেঘলা-ছায়া-পড়া-মুখ’ যেন দেশভাগোত্তর খণ্ডবিখণ্ড বাংলা। আর, আশ্চর্যজনক ভাবে, যারাই কুলসুমের সঙ্গে কোনো না-কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে, খোয়াব তাদেরই মাথায় ভর করে। অনন্ত খোয়াব কুলসুমের সংস্পর্শে। কুলসুমের মৃত্যুদৃশ্যে কালাম ও কেরামত দু’জনেরই স্থিতি বিপন্ন হয়; মৃত তমিজের বাপ ছায়া ফেলে তিনজনের দৃষ্টিবিভ্রমে। কেরামত আলিও এই উপন্যাসের বহুলাংশ জুড়ে থাকা কুশীলব, যে আখ্যানকে পরিণতির দিকে গতিশীল রাখে। কিন্তু, কেরামত আলি আখ্যানের শেষ পরিণতি অবধি উপস্থিত থাকে না। কুলসুমকে হত্যার দায়ে তার জেল হয়ে যায়। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র মতো এখানেও সংকট তৈরি হয় যে, আখ্যানের পরিণতি অবধি কার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? ইলিয়াস সেই সম্ভাবনা রাখেন ফুলজান আর সখিনার মধ্যে। সখিনাই উপমহাদেশের সেই কৃষককন্যা যার ক্ষিধে অনন্ত। ফুলজান সেই কৃষক, যে ফসল ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিধের আখ্যান বোঝে। ফুলজানের বাবা হুরমতুল্লা ফুলজানের ‘মদামানুষ’ তথা ভাগচাষী হয়ে ওঠা নিয়ে দুঃখ করে আবার একইসঙ্গে ফুলজানের জেদে আউশ বোনা হলে গর্ব করে।²²² ফুলজান-তমিজের মেয়ে সখিনার মাটিতে পা গেঁথে দাঁড়িয়ে আকাশে জোনাকির হেঁসেল দেখার বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়; কিন্তু, তা আখ্যানের সমাপ্তি নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার সাক্ষী থাকে শোভন ধুমা, তমিজের বাপের উত্তরাধিকার সখিনা।

রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কনির্মাণে কিছু খাঁচাবদল

‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে দ্রোণের চিঠি শুনে নিরুপমের মনে হয় যে, “এমন প্রতর্কহীন মেনে নিতে জানলে তো কোনও সমস্যাই থাকে না।” (২৭৬) কারণ, দ্রোণের জেল থেকে লেখা চিঠি যেন পার্টির ইস্তাহার, কমিউনিস্টসুলভ নির্দেশে পূর্ণ। দ্রোণ ও নিরুপম একই কমিউনিস্ট পার্টি তথা সিপিআইএম-এলের কর্মী-সংগঠক হলেও তাদের আচরণের বৈপরীত্য লক্ষ্যণীয়। দ্রোণের অনমনীয় বিপ্লবী অবস্থান, মতাদর্শ ও পার্টিনির্দেশের প্রতি আস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (আদালত-পুলিশ-জেল কর্তৃপক্ষ) বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়ে যাওয়ার প্রতি নিরুপমের মুগ্ধতা। কিন্তু, নিরুপম তত্ত্ব ও অনুশীলনের ফারাকের প্রশ্নগুলিকে রেখে এবং বিতর্কের পরিসর খোলা রেখে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে। যে নিরুপম একদা চারু মজুমদার ও শশাঙ্কের লেখা তর্কহীন বিশ্বাসে মেনে নিত^{২২৩}, প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এরপরে সে রাজনৈতিক তর্ক ও মতপ্রকাশ করতে শেখে। দ্রোণাচার্য জেলের ভেতরে বসে পাঞ্চগলী-নিরুপমের প্রেমের কথা জানতে পারার পর যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা দ্রোণকে রক্তমাংসের কুশীলব ক’রে তোলে। দ্রোণ নিজেকে তুলনা করে নিরুপমের সঙ্গে। দ্রোহ-মতাদর্শ নয়, ব্যক্তিগত পরিসরে প্রেম ও প্রেমাস্পদের আকাঙ্ক্ষা সেই তুলনার মানদণ্ড।^{২২৪} দ্রোণের অতীত ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থেকে রাজনৈতিক উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাও এই চিন্তাসূত্র ধরেই আসে। নিরুপম ও দ্রোণের এই বৈপরীত্য-সায়ুজ্য এবং দ্বন্দ্ব শুধু দু’জন কুশীলবকে নির্মাণ করছে তা নয়। আখ্যানের বিরোধাভাস তৈরি করছে। সুকান্তি ও চারুর দ্বন্দ্ব কিংবা পাঞ্চগলী ও পার্টিনেতৃত্বের দ্বন্দ্ব আখ্যানের বিরোধাভাসকে স্পষ্ট ও পুষ্ট করে আরও। ‘আটটা নটার সূর্য’ রাজনৈতিক উপন্যাস বলেই রাজনীতিকে কেন্দ্র ক’রে আখ্যানের প্রধান দ্বন্দ্ব নির্মিত হয় যেখানে প্রতিটি কুশীলবের বিকাশ, গতিশীলতা ও উত্তরণ বর্ণিত হয়। এই উপন্যাস শুধু ষাট-সত্তর দশকের নকশালবাড়ি রাজনীতির ডকু-নভেল নয়, বরং কুশীলবদের শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের বহু বিশদ (detailed) বর্ণন করে। আর, দ্রোণের শ্রেণিঅবস্থান ও সামাজিক অবস্থান নিরুপমের থেকে ভিন্ন। আখ্যানের মূল কথক দ্রোণ ও নিরুপম দু’জনের রূপান্তর তথা পূর্বজীবন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় নেতৃত্ব হয়ে ওঠা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাত্রাপথ উল্লেখ করেছেন। দ্রোণের

বেড়ে ওঠা ও মানবমুখী আদর্শে বিশ্বাস রাখার প্রথম পর্যায়টুকু নিবারণের ডায়েরি লেখার মধ্যে দিয়ে কথিত হয়। সেখানে বাজারদরের ওঠানামা থেকে দ্রোণের স্কুলপালানো সবকিছুই উল্লিখিত। এর পরের অধ্যায়ে সুকান্তির ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক বীক্ষার কথা। আর, তার পরের অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গে চারু মজুমদার ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ এবং ‘আটটি দলিল’ লেখার প্রস্তুতি। এর পরে আসে নিরুপম ও নিরুপমের পারিপার্শ্বিক সমাজের কথা। তারপর পাঞ্চগলীকে কথক পরিচিত করান পাঠকের সঙ্গে। চারু ও তাঁর সঙ্গীরা এবং দ্রোণাচার্য বাস্তব থেকে আখ্যানে আসা চরিত্র অর্থাৎ আখ্যানপরিসরের বাইরের প্রকৃত বাস্তবে তাঁরা রক্তমাংসের ব্যক্তি ছিলেন; অন্যদিকে সুকান্তি কল্পনানির্ভর নির্মাণ। সুকান্তিই একমাত্র কুশীলব যার সঙ্গে ছোট-বড় সমস্ত কুশীলবের কোনও সাক্ষাৎ বা কথোপকথন বা সম্পর্ক রয়েছে। এঁরাই এই উপন্যাসের ভরকেন্দ্র। নিবারণের ডায়েরি, সুকান্তির বিশ্লেষণ, পাঞ্চগলীর কর্মবিবরণী এবং চারু মজুমদারের রাজনৈতিক অভিমুখকে উপস্থাপন করতে লেখক কোথাও নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন না, বরং এই কুশীলবদের আখ্যানস্থ রক্তমাংসের চরিত্র হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে দেন। আর, সময়ের প্রবাহে এই কুশীলবদের ভাসিয়ে দিয়ে ‘চরিত্র’ ক’রে তোলেন। নিবারণের ডায়েরি তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রতিরূপ এবং নিরুপম-সুকান্তির বয়ানে ও চিন্তাস্রোতে সেই আর্থ-সামাজিক রূপ রাজনৈতিক রূপে বদলাতে থাকে।

“The more the opinions of the author remain hidden, the better for the work of art. The realism I allude to may crop out even in spite of the authors’ opinions.”²²⁵ রাজনৈতিক সময়ে জারিত হয়ে এই উপন্যাসের প্রতিটি কুশীলবের নির্মাণ হয়। লেখক মতাদর্শদ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না। কালস্থানিকতার যোগসূত্রে রাজনৈতিক প্রবাহে নায়ক-প্রতিনায়ক নির্মিত হয়। লুকাচ যেমন বলেছিলেন যে, সাহিত্যে উপরিতল ভেদ ক’রে সমগ্র সামাজিক বাস্তবতার সমস্ত দ্বন্দ্বগুলিতে পৌঁছানো জরুরি, এই উপন্যাসেও তেমনটাই হয়। ‘good ‘realist’ literature portrays the totality through the use of

‘typical’ characters²²⁶ সমগ্রতায় পৌছানোর চেষ্টায় টিপিক্যাল চরিত্রদের পাশাপাশি সেই টাইপের ছক থেকে বেরনোর চেষ্টাও রয়েছে। এই উপন্যাসেও নায়ক নির্মাণের সংকট তৈরি হয় কারণ, যাদের নিয়ে উপন্যাসের একেকটি অধ্যায় শুরু হয়েছিল, আখ্যানের গতিপথে তারা একে একে মারা যেতে থাকে। দ্রোণাচার্য, নিরুপম, চারু মজুমদার প্রত্যেকেই মারা যায়। প্রতিনায়ক কনকেন্দু ভালমানুষ ভদ্রলোক থেকে টিপিক্যাল খলনায়ক হয়ে গিয়েও ফের আত্মশুদ্ধির দ্বন্দ্ব মানসিক ভারসাম্য হারায়। টিকে থাকে পাঞ্চালী এবং সুকান্তি। সুকান্তিই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আখ্যায়ক হয়ে ওঠেন। কিন্তু, একমুখী রাজনৈতিক উত্তরণের মধ্যে দিয়ে নয় বরং দ্বন্দ্বিক বিকাশ ও সংশয়পূর্ণ সচেতন পরিণতির পথে। আর, পাঞ্চালী বা সুকান্তি সদর্থক ও নঞর্থক মতাদর্শের অনুশীলনের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এসেও অরাজনৈতিক হয়ে যায় না বা নিরাজনীতিকরণের প্রবক্তা হয় না। রাজনীতিতেই আস্থা রাখে তারা, নতুন কালস্থানিকতায় নতুন নায়কসঙ্কানের তাগিদে। নিরুপম এই আখ্যানভাগের বড় অংশ জুড়ে উপস্থিত। নিরুপমের যাত্রাপথ শহুরে ভদ্রবৃত্তের মধ্যবিত্ত কলেজপড়ুয়া যুবক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী-সংগঠক হয়ে ওঠা। সে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়, রাজনৈতিক সেটব্যাকের সময়ে আন্দোলন পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয় এবং দল-উপদলের হত্যা-প্রতিহত্যার শিকার হয়ে মারা যায়। কিন্তু, ব্যক্তিগত রোম্যান্টিসিজম বা অ্যাডভেঞ্চারিজম নয় বরং রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুশীলনই তার চালিকাশক্তি- বাণিজ্যসফল রাজনৈতিক উপন্যাসের কাঠামো থেকে এখানেই তা আলাদা।

রাজনৈতিক উপন্যাসের ছকবাঁধা খাঁচাকেও চ্যালেঞ্জ করে ‘আটটা নটার সূর্য’। বাণিজ্যিক পত্রিকায় পরিবেশিত ও অধিকাংশ ‘প্রোডাক্টিভ লেবর্’-লেখক²²⁷ কর্তৃক লিখিত রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালদের সম্পর্কে যে বাণিজ্যসফল খাঁচা ব্যবহার করা হয়, তাতে মূল কুশীলব শহুরে, মধ্যবিত্ত, রোম্যান্টিক, মেধাবী ও যুবক। ব্যক্তিগত রোমান্স আর নির্বিত্তের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকে উপস্থাপন করা হয় এবং তাকে ঘিরেই উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিসর আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু, এই ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে এক বিশেষ

অংশে সুকান্তি তাঁর দিনলিপিতে লিখে রাখেন নিরঞ্জন-মালতীর কথা। যে মালতী সম্ভাব্য বিপদের খাঁড়া মাথায় নিয়েও সুকান্তি ও এক জেল-পালানো বিপ্লবী সামন্তলকে আশ্রয় দেন। “নিরঞ্জন রিষড়ায় থাকে। ওখানকার এক ইম্পাত কারখানায় কাজ করে। পার্টির সমর্থক। নীরবে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছে। নিয়মিত দশকপি করে দেশব্রতী কেনে ওরা।” (৩০০) সুকান্তি নিজের শ্রেণি-অবস্থানকে ঝালিয়ে নিতে ভোলে না; কারণ, কোনও বিপদ হলে জেলযাপনের পরেও সুকান্তি অন্যতর জীবন খুঁজে নিতে পারলেও, নিরঞ্জন-মালতীর শ্রেণি-অবস্থানে হয়তো তা সম্ভব হবে না। আর, নকশালবাড়ি বিদ্রোহের মতাদর্শ অনুযায়ী, কৃষিবিপ্লবই মূল অক্ষ (যদিও, শ্রমিকশ্রেণির অগ্রবর্তী বাহিনীর মতাদর্শেই কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়)। নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি অনুযায়ী নিরঞ্জন কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে। মালতী নিজেদের বিপন্নতাকে তুচ্ছ ক’রে ‘শেল্টার’ দেয় সুকান্তি-সামন্তলকে। “কিন্তু, এই নিরঞ্জন-মালতীদের কথা কেউ লিখবে না। গোপনীয়তা রক্ষার কারণে দেশব্রতী লিবারেশনেও স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না সামান্য মানুষের এমন অসামান্য ত্যাগের কাহিনি।” (৩০৩) দ্রোহ নায়কের জন্ম দেয়। সময়ের তাগিদে সমসাময়িক পরিসরে জারিত হয়ে ইতিহাসের নায়ক নির্মিত হয়। নিরঞ্জন-মালতী তেমনই নায়ক কিন্তু, নকশাল বিদ্রোহের তত্ত্ব-তথ্য সংকলনে এঁদের নাম অনেক সময়েই উহ্য। আর, ইতিহাস, তথ্যাবলির সত্যাসত্য ছাপিয়ে এখানেই কল্পনাখ্যানের তাৎপর্য। নিরঞ্জন-মালতীরা ঐ শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-রোম্যান্টিক-শহুরে-মেধাবী সেটগুলির কোনও সেটের মধ্যেই আঁটেন না, বাণিজ্যসফল রাজনৈতিক উপন্যাসের ধাঁচায় তাঁদের স্বর দুর্বল ও অবজ্ঞাযোগ্য। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসেও মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-শহুরে প্রোটোগনিস্টদের ঘিরে কাহিনির আবর্তন রয়েছে। কিন্তু, এই ধাঁচাকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর উপাদানও রয়েছে। নিরঞ্জন-মালতীদের কেন্দ্র ক’রে যে কাহিনি রচনা হয় না, সেই সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার রাজনৈতিক স্বরও রয়েছে। সুকান্তি নিরুপমের তত্ত্ব ও অনুশীলনের ভুলগুলি আলোচনা করেন, সুকান্তি সুশীতল রায়চৌধুরীর সমালোচনার সমর্থক এবং সুকান্তি বহু নকশালদ্রোহীকে বিপদের

মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক’রে দেন। অধিকাংশ উপন্যাসে কমিউনিস্টদের মূর্তি-ভাঙ্গা কর্মসূচি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করা এবং অ-কমিউনিস্ট বই/ছবি পোড়ানোর কর্মকাণ্ডকে প্রকট ক’রে তুলে নিন্দে করা হয়েছে শুধুই; কিন্তু সুকান্তি এই আখ্যানপরিসরেই নিরুপমের সঙ্গে তর্ক-আলোচনা চালান উক্ত বিষয়ে।²²⁸ ফলে, উক্ত কর্মকাণ্ডগুলির পক্ষে-বিপক্ষে মতামত পরবর্তী কালস্থানের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়- এই দ্বন্দ্বিক পরিসর সুকান্তিকে তো বটেই, এই আখ্যানকেও রাজনৈতিক হওয়ার অবকাশ দেয়। সুকান্তিই উপন্যাসের ভেতরকাঠামোর অন্যতম প্রধান পর্যবেক্ষক ও কথক। কিন্তু, প্রোটোগনিস্ট হিসেবে সুকান্তির সংকট শুধু অ্যান্টাগনিস্ট উপাদানসমূহ তথা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় না, তাকে নিজের পার্টির অভ্যন্তরেও লড়া চালাতে হয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিনয়ভূষণ-মণিমোহনের সঙ্গে সুকান্তির মিল এখানেই। এরা প্রত্যেকেই একই সময়ে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। এরা প্রায় সমবয়সী এবং শ্রেণি-মতাদর্শের তত্ত্বে-অনুশীলনে জারিত। তিনটি ভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য হয়েও এরা তিনজনেই পার্টিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে সাংগঠনিক পরিসরে। “ওসব ম্যানডেট পার্টি অফিসে গিয়ে মারাবেন। আমরা অ্যাকশন স্কোয়াড”- যুবনেতা পরেশের এই ভাষায় বিনয়ভূষণের ‘কমিউনিস্ট’ মূল্যবোধ আহত হয় এবং তাঁর নেতৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়ে। বিনয়ভূষণের দীর্ঘ কয়েক দশকের সংগ্রাম ত্যাগ সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে যায় যখন আধিপত্যকামী হয়ে ওঠে নঞর্থক মতাদর্শ হত্যা-প্রতিহত্যা। পার্টিতে সুকান্তির অস্তিত্ব আহত হয় দীপকের মতো তরুণ নেতার ব্যবহারে। কর্তৃত্ব আর নেতৃত্ব শব্দের মধ্যে যে ফারাক, কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ অনুশীলন সেখানেই দ্বিধাগ্রস্ত। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে আখ্যানের বাইরের তথা বৃহত্তর সত্যি বাস্তবের সুশীতল রায়চৌধুরী উপস্থিত থাকেন স্বনামে। চারু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য²²⁹ এই আখ্যানেও রয়েছে এবং পার্টিতে সুশীতলের ‘কোণঠাসা’ হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। “তাঁর [চারু মজুমদারর] অনুগামীরা সুশীতলকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না। সুশীতলকে বলা হত সংশোধনবাদী... দেশব্রতীর

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে তাঁর নাম ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। মাসোহারা বাবদ যে সামান্য দুশো টাকা তাঁকে দেওয়া হত, সেও বন্ধ হয়ে গেছে” (২১৮) যদিও সুশীতলের সঙ্গে চারুর মতবিরোধ পরবর্তীতে সদর্থক নিষ্পত্তিতে এগোনোর দিকে যায় যখন চারু পার্টির কিছু অনুশীলন সংশোধন করার কথা ভাবে, কিন্তু সুশীতলের এই প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে বিনয়ভূষণ, সুকান্তিদের প্রভূত মিল। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র প্রোটোগনিস্ট রণজয়ের প্রান্তিকতা বয়ে আনে তার মানসিক অস্থিতি ও স্মৃতিভ্রমের অসুখ। তার ক্ষেত্রে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংঘাত নয়, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন একমাত্র দায়ী। কিন্তু স্মৃতিভ্রমের পরেও তার মতাদর্শনিষ্ঠা অবিচল এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতির চেষ্টা নিরন্তর। তার প্রান্তিকতা ঘন হয় যখন যাদবপুর অঞ্চলে লুকিয়ে রাখা রাইফেলের ওপরে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাওয়ায়। রণজয়ের মতাদর্শে ও তাত্ত্বিক পরিধিতে আন্তর্জাতিকতার স্বাক্ষর পান পাঠক, রণজয়ের অনুশীলনের পরিধি বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং বিপ্লবমুখর দশক পেরিয়ে রণজয়ের একা হয়ে যাওয়া চিরাচরিত ট্রাজিক সাহিত্যের সমগোত্রীয়। তার আবেগপ্রবণ বাঙ্গালিত্ব কোন বাঙালি পাঠকের বাস্তবতার কাছাকাছি।²³⁰ যে সমকাল-রাজনীতি-ইতিহাস প্রতিমুহূর্তে রণজয়কে কেন্দ্র করে পাঠককে সচকিত রাখে এবং রণজয়ের বয়ানে আখ্যানকথক যেভাবে পাঠককে সচেতন করে দেন অনির্বাক্য দ্রোহের বিশ্বজনীনতার সঙ্গে, তা রণজয়ের ‘প্রান্তিকতা’কে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এই বিরোধভাস উপন্যাসের আখ্যানকে পুষ্ট করে, গতি দেয়। সুকান্তি বা সুশীতল পার্টিতে আভ্যন্তরীণ তাত্ত্বিক প্রান্তিকতাকে অস্বীকার করে মাও সে তুং-এর নির্দেশ মেনে চলতে চান, “স্বয়ং মাও সে তুং এমনভাবে সত্যি বলতে উৎসাহিত করেছেন সভ্যদের... সুশীতলবাবু মাওয়ের কথা মেনেছেন... ঠিক সময়ে সতর্ক করেছেন দলকে” (২১৮) সুকান্তির ভাবনায়েই বক্তব্য উঠে আসে। রণজয়ও তার বিপন্ন প্রান্তিকতায় লেনিনের সঙ্গে কথা বলে, কলকাতায় লেনিনমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পরামর্শ চায়।²³¹ এটি রণজয়ের দৃষ্টিভ্রম ও মানসিক অস্থিতি, কিন্তু তা রণজয়ের আত্মগত বাস্তবতাবোধ এবং বাইরের বস্তুগত বাস্তবতার টানাপড়েন তৈরি করে। রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেন এই আখ্যানকারেরা।

উপন্যাসের আখ্যায়ক ও নায়কের সংকট তৈরি হয় আখ্যানের গতিপথে এবং সমাজ-পরিবার-পার্টি-ব্যক্তি বহুস্তরীয় মিথস্ক্রিয়ায় একাধিক প্রোটাগনিস্ট ও আখ্যায়কের সম্মান চলে। দ্রোহসময় থেকে এই প্রোটাগনিস্টদের জন্ম- নায়কোচিত বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে গিয়ে সাধারণ কুশীলবেরা আখ্যানের নায়ক হয়ে উঠতে পারে। পাঞ্চগলী এই উপন্যাসের তেমনই এক নায়ক। আখ্যানের কয়েকটি অধ্যায় পেরিয়ে পাঞ্চগলীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয়, কিন্তু সুকান্তির সঙ্গে পাঞ্চগলীই অন্যতম প্রধান কুশীলব, যে কালস্থানিকতার পরিসরকে প্রসারিত করে। এই উপন্যাস যতটা দ্রোহের, যতটা নিরুপমের কিংবা যতটা সুকান্তির, ততটাই পাঞ্চগলীর। পাঞ্চগলীর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত যাত্রাপথ (journey) এবং বিবর্তন বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের পুরুষকেন্দ্রিক নায়ক-নির্মাণের স্টিরিওটাইপকে প্রত্যাখ্যান করে। পাঞ্চগলী পুরুষের জননী বা পুরুষের স্ত্রীর মতো সহায়ক ভূমিকায় কিংবা অপ্রত্যক্ষ-দ্রোহী আশ্রয়দাত্রীর ভূমিকায় চিত্রিত হয় না। পাঞ্চগলী প্রত্যক্ষ অ্যাকশনে অংশ নেয়, পাঞ্চগলী রাজনৈতিক মতাদর্শ আত্মস্থ ক’রে গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয় এবং পাঞ্চগলী রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও উপদলীয় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েও রাজনীতিতেই টিকে থাকে আখ্যানের প্রসারিত গতিপথে। পাঞ্চগলী ‘ভদ্রমহিলা’, শিক্ষিতা, মধ্যবিত্ত- কিন্তু, এতকালের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের পরিসরে উক্ত বর্গের যে আখ্যানভূমিকা থাকত, পাঞ্চগলী বহু ক্ষেত্রে তা নাকচ করে। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে নারীদ্রোহীকে প্রতিমুহূর্তে ‘নারী’ লিঙ্গপরিচয় বহন করতে হয়, পাঞ্চগলীর স্বরে সেই লিঙ্গপরিচয় একমাত্র পরিচয় হয়ে থাকে না। পাঞ্চগলীর পছন্দ (choice), ব্যক্তিগত অপছন্দ, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা এবং পার্টিতে ও বহির্সমাজে রাজনৈতিক মতাদর্শের দৃঢ়তা তাকে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস সংরূপে বিশেষ স্থানে উত্তীর্ণ করে। পাঞ্চগলীর স্বরে নারীবাদী প্রতর্ক উত্থাপিত হয়, যখন সংগঠনের অভ্যন্তরে পুরুষতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে।

জেলে থাকাকালীন চোর-ছিনতাইবাজ-ডাকাতদের সঙ্গে সহমর্মীতার সঙ্গে মেশে দ্রোণাচার্য। তাদের রুচি-পেশা-শাস্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে মানবিক গুণগুলিকে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যে বদলে

নিতে চায়। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে হিরণ্য, অনিমেষ এবং আখ্যায়িত অন্যান্য অ-নির্বিক্ত প্রোটাগনিস্টদের অমিল এখানে। ‘বিপজ্জনক অপরাধী’ তকমাপ্রাপ্ত এই মানুষগুলিকে সামাজিক ভদ্রবৃত্ত থেকে বিতাড়ন করেছে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, কিন্তু দ্রোণের আশা, “এইসব লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লবের সাথী করে নেওয়া যায়” (২৮০) দ্রোণের চিন্তার সঙ্গে ফ্রানৎজ ফ্যাননের চিন্তার সাযুজ্য রয়েছে।

It is within this mass of humanity, this people of the shantytowns, at the core of the lumpenproletariat, that the rebellion will find its urban spearhead. For the lumpenproletariat, that horde of starving men, uprooted from their tribe and from their clan, constitutes one of the most spontaneous and the most radically revolutionary forces of a colonized people... the pimps, the hooligans, the unemployed and the petty criminals urged on from behind, throw themselves into the struggle for liberation like stout working men. These classless idlers will by militant and decisive action discover the path that leads to nationhood. They won't become reformed characters to please colonial society, fitting in with the morality of its rulers... all the hopeless dregs of humanity... will recover their balance, once more go forward, and march proudly in the great procession of the awakened nation' (Fanon 1963, 129-30)

ফ্যাননের মতে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতদের সদর্থক কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা উচিত, নয়তো শাসকশ্রেণি তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক অসচেতনতার সুযোগে তাদের ব্যবহার ক’রে নেবে নির্বিক্তের সংগ্রামের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী পার্টি

রাজনৈতিক মতাদর্শগত শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে এদের সাহস ও কৌশলকে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির কাজে ব্যবহার করতে পারে। দ্রোণও এদের ‘উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং চেনাজানার পরিধি’কে রাজনৈতিক মতাদর্শের সহযোগী ভূমিকায় বদলে নিতে চায়। ইলিয়াসও মার্ক্স-কথিত এই ‘বিপজ্জনক শ্রেণি’-র মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন। খিজির সেই সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণ। শিক্ষিত-মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল যে। ভূমিহীন কৃষকের চেতনাকে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন মার্ক্স, সেই হিসেবে তমিজ লুম্পেন প্রলেতারিয়েত, যাকে উপমহাদেশের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী অথচ সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময়ের দ্রোহীচরিত্র হিসেবে নির্মাণ করছেন ইলিয়াস। অথচ ‘সহযোদ্ধা’ উপন্যাসে এই লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের শুধু তার-কাটা, ছিঁচকে ডাকাত হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা নকশালদের সঙ্গে জুড়ে এলাকার ‘ত্রাস’ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ, নকশাল রাজনীতিটাকেই সুকৌশলে বাদ দিয়ে আখ্যান ফাঁদা হল। বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত পরিসরকে যেহেতু প্রাধান্য দিয়েছেন আখ্যানবিষয় হিসেবে, তাই অধিকাংশ সময়ে শহুরে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের আখ্যান থেকে দূরে রেখেছেন বা এড়িয়ে গেছেন তাদের উপস্থিতি। আখ্যানে কুশীলব হিসেবে তাদের অবস্থান প্রধানতঃ নঞর্থক এবং তাদের রুচি-জীবনযাপন অভদ্রলোকীয় ও ‘নিম্ন’মানের। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠক পরিসরে এই উপন্যাসগুলি পঠিত হয়, তাতে পাঠকের একটা প্রত্যাশার মাপকাঠি পূর্বনির্ধারিত থাকে। ক্বচিৎ কদাচিৎ তাদের জীবনযাপন-রুচি আখ্যানবদ্ধ হলেও, অথরের সহানুভূতিশীল অনুকম্পাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তারা যে লুম্পেন এবং তারা যে গরিব, এই দুই ধারণাই তাদের নিয়ে আখ্যান রচনায় আধিপত্য করেছে। রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকরাও এহেন পাঠপ্রত্যাশার দিগন্ত বাড়িয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছেন। ফ্রানৎজ ফ্যানন লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের সদর্থক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সাদাত হাসান মাটোর সিংহভাগ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ওই লুম্পেন প্রলেতারিয়েত- গণিকা, দালাল, অস্থায়ী রোজগারে এবং আর্থ-সামাজিক স্থিতিহীন মানুষেরা। শাসক-মতাদর্শ এদেরকে ব্যবহার ক’রে

নিয়েছিল নিজেদের স্বার্থে এবং শাসকের মতাদর্শের অনুশীলনে এরাই অংশগ্রহণ করেছিল অসচেতন সক্রিয়তায়। নবারুণ এই লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের বোঝার কথা বলছেন।²³² তাঁর ছোটগল্পে ফোয়ারা, কালমন, মোগলাই, পাঁচুগোপালের মতো চরিত্ররা কেন্দ্রীয় আখ্যান দখল করছে। এরা সমাজের মূলস্রোতে টিকে থাকতে বেগ পায় কারণ বাজার-অর্থনীতি তাদের ভোগ্যপণ্যক্রয়ের অতিনিম্নতাকে বাতিল ক’রে দেয়। “কালমন আর আমি মোগলাই, চুরি করতাম। আমরা কলোনিতে থাকি। আমাদের জন্মের সাল আমরা জানি না” (ভট্টাচার্য ২০১০, ৯৫) কালমন আর মোগলাইয়ের ছিনতাই করার আনাড়ি অভিজ্ঞতার গল্প, মোগলাই এই গল্পের কথক। এদের রুচি, পেশা, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান ভদ্রবৃত্ত থেকে বহুদূরে, মোগলাই-কালমন নিজেরাও তা বলে। এরা ভাগছে নিয়ত তবুও তারা মরছে না। তারা মান্য চলিত ভাষার পরোয়া করে না, তারা উচ্চবিত্তের ‘সফিস্টিকেশন’-এর পরোয়া করে না। তারা শুধু বেঁচে থাকাটা উদ্‌যাপন করে চলে; অসম লড়াইয়ের উদ্‌যাপন। তারা টিকে থাকে। “This lumpenproletariat is like a horde of rats; you may kick them and throw stones at them, but despite your efforts they'll go on gnawing at the roots of the tree” (Fanon 1963, 130) ‘পাঁচুগোপাল’ গল্পে কোনোমতে দিন-গুজরান পাঁচুগোপাল সেই অসম লড়াইয়ের কল্পবাস্তবের মুখ, যে চোলাই কারখানার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে বা মরে গিয়েও টিকে থাকে; নবারুণ এই টিকে থাকার ওপরে জোর দেন, “সুখের কথা যে পাঁচুগোপাল এখনও মরেনি। এখনও ও নিজের মতো করে বেঁচে আছে।”। ফোয়ারাকে একাধিক গল্পের কেন্দ্রে রেখে নবারুণ মূলধারার বাণিজ্যিক পত্রিকা বনাম প্রতিরোধী অণুপত্রিকার সাংস্কৃতিক বাইনারি উল্লেখ দিচ্ছেন, “ফোয়ারার কথা এর আগে দু’টো গল্পে আমি রটিয়েছি। বেশি কেউ জানতে পারেনি। কারণ গল্পদু’টো বেরিয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনে... ফোয়ারাকে নিয়ে আমার এই তিন নম্বর গল্পও রুজপমেটম মাখা কোনো বড়ো কাগজে সায়া পরে বেরোচ্ছে না।” (ভট্টাচার্য ২০০৮, ১২০) ফোয়ারা-ল্যাংড়া-পাঁচুগোপালরা সাহিত্যের রাজনীতিকে বিনির্মাণ ক’রে

চলে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি, যখন আপাতভাবে রাজনৈতিক স্থিতিাবস্থা চলছে বাংলা সাহিত্যে। তখন রোমান্টিক-মধ্যবিভূ-শিক্ষিত রাজনৈতিক প্রটোগনিস্টদের কেন্দ্র ক’রে রাজনৈতিক সাহিত্যের নির্মাণ চলছে বাংলা সাহিত্যে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের হারবার্ট সরকারকে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত চিহ্নিত করায় কিছু সমলক্ষণ ও কিছু বিসাদৃশ্য থাকে। হারবার্টের বংশপরিচয় ক্ষয়িষ্ণু বনেদি পরিবার, যারা বিভিন্ন ব্যবসা ও বাবুয়ানি ক’রে ঔপনিবেশিক সময় থেকে উপার্জন করেছে। সেখ মোফাজ্জল হোসেনের পর্যবেক্ষণ- ‘এদেশে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের অবৈধ মিলনে’ যে জগাখিচুড়ি বিকৃত মূল্যবোধের জন্ম হয়েছিল, তাকেই বহন করেছে হারবার্টের পূর্বপুরুষেরা।²³³ সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বড় হয়েছে সে। ফলে, “হারবার্টকে লুম্পেন ও প্রলেতারিয়েত দুই-ই বলা চলে”²³⁴ এই মতের সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। হারবার্ট আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রলেতারিয়েত নয়। কিন্তু, নকশাল বিনু ও তার পার্টির কমরেডদের প্রতি সুপ্ত ভালবাসা থেকেই গেছিল হারবার্টের। লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণি নিজের শাসনরক্ষার্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহার ক’রে নেয়, কিন্তু হারবার্ট বিশ্বস্ত থাকে বিনুর প্রতি, শাসকবিরোধী অবস্থানে। তবে, হারবার্টের সঙ্গে যাদের সখ্য, যাদের সঙ্গে তার মদের আড্ডা, তাদের সঙ্গে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত পরিভাষাটি মিলে যায়। তাদের স্থায়ী আয় নেই, তারা মদ খায় ফুঁটি করে এমনকি রাজনীতি সম্পর্কেও অস্বচ্ছ মনোভাব তাদের। ব্যবসায়ী সুরপতি মারিকও তাদের লুম্পেন বলেই চিহ্নিত করেছিল। হারবার্ট তার বনেদি ভদ্রলোক ইমেজ অস্বীকার করতে চায় এবং পেশা হিসেবে বেছে নেয় লোক-ঠকানো। হারবার্টের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার পথে যে বর্ণনা, তা হারবার্টের ওই লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত অবয়বকে মান্যতা দেয়। “আমি এক হারবার্টকে চিনতাম। সে ছিল অতীতের প্রসিদ্ধ মস্তান এবং যখন দেখেছি তখন মরফিনখোর। নামটা তার থেকেই নেওয়া।”²³⁵ নবাবুর্গ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নিবন্ধে বলেছেন যে, এই কুশীলবেদের সঙ্গে বাস্তবে তাঁর সখ্য ছিল এবং বাস্তবের কুশীলবেদের তিনি গল্প-উপন্যাসের চরিত্র ক’রে তুলেছিলেন। নবাবুর্গ এদের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয়

ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত ক’রে দিলেন। কালমন মোগলাই ফোয়ারাদের মতো লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের বাস্তবতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ক’রে দিলেও, লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের সর্বোৎকৃষ্ট উদ্‌যাপন হচ্ছে ফ্যাতাডুদের²³⁶ মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালে ‘প্রমা’ অণুপত্রিকায় ফ্যাতাডুদের নিয়ে প্রথম গল্প লেখেন নবারুণ। রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়ক-নির্মাণের যাবতীয় প্রথামাফিক সূত্রায়নকে প্রত্যাখ্যান করে ফ্যাতাডু ও চোক্তাররা দ্রোহ ঘোষণা করেছে ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসে। পরের অধ্যায়ে এই নির্মাণ-রাজনীতির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে আখ্যানস্থান গতিশীল। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি থেকে বিস্তীর্ণ হুগলি থেকে চব্বিশ পরগণা- নির্দিষ্ট ষাট-সত্তর দশককে কেন্দ্র ক’রে আখ্যানস্থান ছড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা-কেন্দ্রিক নয়; নকশালবাড়ি আন্দোলন যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অ-শহুরে আন্দোলন এবং কৃষিবিপ্লবই তার তাত্ত্বিক ভিত্তি, এই উপন্যাসে তা স্পষ্টভাবে আখ্যায়িত। কলকাতার দু-তিনটি অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যুবক-যুবতী নয়, এই দ্রোহে বহু অনভিজাত ইন্সকুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী সক্রিয়ভাবে সামিল হয়েছিলেন। মধ্যবিত্তের বিপ্লবরোমাঞ্চ আর ব্যক্তিগত হতাশা-বিষাদের আখ্যানবস্তু থেকে বেরিয়ে নির্বিত্তের আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত উঠে এসেছে। শহরকেন্দ্রিক হত্যা-প্রতিহত্যা কিংবা ‘দুষ্ট বনাম শিষ্ট’ নীতিবাক্য-ঔচিত্যবোধ পেরিয়ে এটি তত্ত্ব-অনুশীলনে জারিত কুশীলবেদের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনি; এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের চারিত্রিক-মানসিক বিবর্তন এই সমগ্রতার অংশ। এই আখ্যানে শুধুমাত্র ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জনগণের অংশগ্রহণের রাজনীতি নিয়েই থেমে যায় না। বরং সাম্প্রতিক দশকের রাজনীতির সঙ্গে ও সেই রাজনীতিতে তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণের কথাও বলে। এখনও পর্যন্ত যে’কটি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হয়েছে সত্তর দশকের পরে, তাতে সত্তর দশকের রাজনীতি-সমাজই মূল প্লট। আর, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও পারিবারিক সম্পর্ককে কেন্দ্রে রেখে লেখা উপন্যাসগুলিতে রাজনীতি মাঝেমাঝে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তা কেন্দ্র নয় কিংবা সমাজ-রহিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির থোড়-বড়ি-

খাড়া। তার মানে কি এটাই দাঁড়ায় না যে, সত্তর দশকের পরে অন্ততঃ বাংলায় কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি অন্ততঃ নতুন শতকের প্রথম দশক অবধি? সেইজন্যই ঔপন্যাসিকদের বারবার সত্তর দশকের রাজনীতিকে আশ্রয় করতে হয়। নকশালবাড়ি ও নকশাল দ্রোহীদের নিয়ে মুখফেরতা আখ্যান, মিথ্, মিথ্যে, কল্পনা, বানানো বয়ান, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অপ্রত্যক্ষ প্রচার ইত্যাদি ফিরে ফিরে আসে উপন্যাসগুলিতে। সত্তর-দশক পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ উপন্যাসের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে পুজোসংখ্যার উপন্যাসের হাত ধরে। এক বিশেষ বাণিজ্যিক সাহিত্যগোষ্ঠী দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকায় ('দেশ'/ 'আনন্দবাজার পত্রিকা') প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের 'ব্রয়লার' উৎপাদন শুরু হয়। "মাথাকাটা কবন্ধ ব্রয়লারের সমাজ বানানোর একটা সর্বগ্রাসী চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তে কালচার ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় ভূমিকা আছে। পুজোর সাহিত্য নামধারী পয়দাগুলো তারই একটা কম্পোনেন্ট"²³⁷ 'বর্তমান' ও 'আনন্দবাজার' শারদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি ঘোষিতভাবে বামপন্থী মতাদর্শের বিরোধিতার রাজনীতি শুরু করে। বামপন্থী রাজনীতিক মানেই আদ্যন্ত অসৎ অথবা বোকা তাই সৎ- এই বয়ান উৎপাদিত হতে থাকল। কমিউনিস্ট মতাদর্শ গোঁড়ামিতে ভরা এবং বিশ্বায়নী জমানায় অচল কাল্পনিক বিশ্বাস। নকশাল কমিউনিস্ট মানেই সে শহুরে বিলাসিতা ও প্রেসিডেন্সীয় মেধা ত্যাগ ক'রে 'চাষাভুষো অশিক্ষিত'দের বিপ্লবের পাঠ দিতে গ্রামে গেছিল।²³⁸ নকশালপন্থী কমিউনিস্ট অর্থে হত্যা-প্রতিহত্যার রাজনীতি দেখে বীতশ্রদ্ধ পলায়নবাদী বা হতাশাগ্রস্ত প্রোটাগনিস্ট। নারী বিপ্লবী মানে সে কারোর স্ত্রী/মা/প্রেমিকা যে অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বলেই মানবতাবাদী; অর্থাৎ রাজনীতিকে মানবতার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। সর্বোপরি 'ভাল' প্রোটাগনিস্ট হওয়ার প্রাক্-শর্ত রাজনীতিবিমুখ হওয়া কিংবা ভোটকেন্দ্রিক উদারনৈতিক জনতোষী-মতামতসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া। এই উপাদানগুলিই রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রধানতম বিষয় হয়ে থেকেছে। ১৯৭৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শাসন শুরু হয় এবং ২০১১ অবধি তার ব্যাপ্তি। তারপর থেকে দক্ষিণপন্থী তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিরাজনীতিকরণের মতাদর্শ চারিয়ে দেওয়ার কাজ আশির

দশকের শুরু থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা অবিলম্বে রাখার উদ্দেশ্যে এবং ষাট-সত্তর দশকের বিশ্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের অর্থোজিকতা প্রমাণ করতে শাসক-মতাদর্শের এই সচেতন প্রয়াস। উপন্যাসে-গল্পে বামপন্থী ও নকশাল কুশীলবদের অধঃপতন এবং ষাট-সত্তর দশকের সার্বিকভাবে ব্যর্থ মুক্তিকামী আন্দোলন- এগুলি প্রমাণ করতে একই ফর্মুলায় অসংখ্য সাহিত্য সিনেমা তৈরি হয়েছে। সমসাময়িক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে (১৯৭১) বিষয়ীভূত করে যেক'টি রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হয়েছে তাতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লিগকে অনিন্দাযোগ্য নিখুঁত ও প্রবাদপ্রতিম করে তোলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে একদিকে যেমন নির্বিত্ত-নিম্নবিত্তের আকাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে তেমনি ধর্মীয় মৌলবাদের সমস্যাগুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একক নেতৃত্ব দ্রোহের জন্ম দেয়না বরং দ্রোহসময়ের বিক্ষোভে নেতৃত্ব সফল হতে পারে- এই সহজ ইতিহাসগত দ্বন্দ্বিকতাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শহীদুল জহির, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত উপন্যাসগুলি এই সূত্রগুলিকে প্রতিস্পর্শা জানিয়ে 'অন্য' বয়ানগুলি তুলে আনে। শাসকের আরোপিত ও অনুশীলিত মতাদর্শের বিরুদ্ধপাঠ দেয়।

শুধুমাত্র নকশালবাড়ি কৃষিবিপ্লবই নয়, প্রায় একইসময়ে তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশে শুরু হয় আদিবাসী অভ্যুত্থান ও খনি শ্রমিকদের বিদ্রোহ। শ্রীকাকুলাম, ওয়ারাঙ্গল, খাম্মাম, করিমনগরে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও জোতদার-জমিদারের জমি কেড়ে নেওয়ার আন্দোলনের সাযুজ্য ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে এবং বসাইয়ের যুক্তির সঙ্গে। ১৯৭২ সালের পরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাময়িক ব্যর্থতা ও 'পশ্চাদপসরণ (set back)' ঘটে। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু, অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানায় নকশালবাড়ি বিদ্রোহের একটি ধারা ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে ১৯৮০ সাল থেকে। উল্লেখ্য, এই ধারাটি, যারা পরে 'জনযুদ্ধ' নামে পরিচিত হয়, তাদের মূল দ্রোহভিত্তি ছিল আদিবাসী জনজাতি ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। এঁদের অনুশীলনের আরও এক উল্লেখ্য বিষয়, সাংস্কৃতিক সংগঠন বিরাসম²³⁹ (বিপ্লবী লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ) মূলবাসী জনজাতির সাংস্কৃতিক

পরিসরকে দ্রোহের সঙ্গে যুক্ত করেন। কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগঠন কার্যক্রম চালিয়ে যাবে, এমনটাই পার্টি-গণসংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্ক; কিন্তু, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাংস্কৃতিক সংগঠন ভূমিকা নিচ্ছে এই উদাহরণ বিরল। বিরাসম সেই কাজ করতে সমর্থ হয় মূলবাসী জনজাতির সংস্কৃতিকে আত্মস্থ ক’রে। অন্ধপ্রদেশের বিপ্লবীরা দেশীয় কথকতার প্রকরণ, লোকনাট্যের আঙ্গিকে প্রচারের হাতিয়ার ক’রে তুলেছিলেন। সুব্বারাও পাণিগ্রাহী ১৯৬৯ সালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শহীদ হন, তিনি এবং তাঁর দ্রোহসঙ্গীরা ‘জমুকুলাকথা’ পারফর্ম করে বেড়াতে বিভিন্ন গ্রামে। বাংলায় প্রগতিবাদী সাহিত্য ও নাট্যধারা ১৯৪০-র দশকে নতুন প্রাণসঞ্চার করলেও, এই সাহিত্যধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকার ছিল না। অন্ধপ্রদেশ (এবং অধুনা তেলঙ্গানায়) ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে সজ্জবদ্ধ বিপ্লবী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুশীলন শুরু হয়েছিল- প্রগতিবাদী সাহিত্যধারার উত্তরাধিকার বহন করা এই সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উত্তরণ ঘটেছে সমসাময়িক রাজনীতিকে ধারণ ক’রে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিবাদী থেকে বিপ্লবী সাহিত্যে উত্তরণের এই সজ্জবদ্ধতা অনুপস্থিত। কিছু কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার বিপ্লবী সাহিত্য ও প্রতিরোধী সাহিত্যের অনুশীলন নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু তা ‘বিরাসম’-এর মতো সজ্জবদ্ধ রূপ পায়নি। বিশ্বায়ন-উদারিকরণের পরবর্তী জমানায় এই সজ্জবদ্ধতা অলীক ধারণায় পর্যবসিত হয়। নয়ন সেন লিখেছিলেন, “সমাজকে নতুন চিন্তা দিতে গেলে নিজেকে পাল্টাতে হয়। আর নিজেকে পাল্টানো কখনই সম্ভব নয় যদি না দেশের কৃষকশ্রমিকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারা যায়” (সেন ১৯৭৪, ২৩) বাঙালি ‘বামপন্থী’ সাহিত্যিকরা পার্টিকে কখনও প্রয়োগে আনতে দেননি এবং শ্রেণিসচেতনতার অভিমুখ সম্পর্কে নিশ্চিত সাহিত্য লিখতে পারেননি বলে নয়ন সেনের অভিমত।^{২৪০} মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক ও শ্রমজীবীবিমুখ সাহিত্যের বিপরীতে বিপ্লবী জাতীয় সংস্কৃতি^{২৪১} গড়ে তোলার যে প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা নিরলস চেষ্টায় গড়ে তুলতে পারেন নি। শ্রমিক-কৃষকের ভাষা এবং নিম্নবর্ণের ভাষা আয়ত্ত্ব ক’রে বাকি সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি বলেই, তাঁদের সাহিত্যের ভাষা বৃহত্তর জনতার ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি।^{২৪২}

বিরাসম এই কাজটি দীর্ঘদিনের নিরলস অনুশীলনে করতে পেরেছিল বলেই সংগঠিতভাবে
বিপ্লবী সাহিত্যের ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রাখতে পেরেছে।

-
- ¹ বিধানসভায় সোহরাওয়ার্দির ভাষণ, সূত্র- কুণাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রথ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৮৭
- ² মূল সূত্র- ‘কলস্রোতা’, বুলবুল পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৩
- ³ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, পৃ- ৮৭-৮৮
- ⁴ সূত্র- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মধ্যবিত্ত*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ- ৩৪৩
- ⁵ তদেব, পৃ- ৩৫১
- ⁶ সৈয়দ সামসুল ইসলাম, ‘আনন্দমঠ’, আল ইসলাহ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪০, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মধ্যবিত্ত*
- ⁷ আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৮, পৃ- ২১
- ⁸ Salma Sobhan, *Perceptions of Cultural identity, The Bangladesh Reader*, Duke University Press, London, p. 305
- ⁹ এম. মুনজুরুল হক, ‘বাঙলা ভাষা আন্দোলনঃ বায়ান্ন-পূর্ব পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, শীত সংখ্যা, খণ্ড ৩৮, ডিসেম্বর ২০২০, ১৬৯-২০১
- ¹⁰ এই সংলাপের সূত্র ধরে আবিষ্কার করা যায় মার্কিন অনুগত পাকিস্তানী শাসকদের নয়া-উপনিবেশিক শাসন এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় নিম্নবর্ণের জাগরণ। বদরুদ্দীন উমর এবং পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মার্কসবাদী লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও মেহনতি নির্বিশেষ নিম্নবর্ণের মানুষের আকাজ্জখাপূরণের ওপরে জোর দিতে চায়। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত শ্রেণির জাতিগত ও ভাষাগত মুক্তি নয়, শ্রেণির মুক্তির প্রশ্ন। দ্রষ্টব্য- বদরুদ্দীন উমর ও সত্যপ্রকাশ করের প্রবন্ধদ্বয়, *বাংলাদেশ প্রসঙ্গে*, অনীক, কলকাতা, ২০০৭
- ¹¹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিঠি, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ- ৪৪৭

¹² ১৯৪৮ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতা।

¹³ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ৮ ও ১৪৭-৮

¹⁴ ইন্দু সাহা, *কিষ্ণাণ বৌ*, হরপ্লা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

¹⁵ নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ- ২৫৬-৭

¹⁶ ‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’ লেখা শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ থেকেই, তারপরে ১৯৭৫ সালে আরও কিছুটা এবং ১৯৮০-র দশকের শুরুতে বাকিটা। ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ লেখা হয়েছে তার প্রায় এক-দেড় দশক পরে। কিন্তু, ‘খোয়াবনামা’র আখ্যানকাল ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র আখ্যানকালের থেকে প্রায় আড়াই দশক আগের।

¹⁷ জালাল মাস্টার বৈরাগীর ভিটে নিয়ে আনোয়ারকে বলে, “গল্প কেন হবে? ইতিহাসের কথা। ইতিহাসের কথা নিয়া মানুষ গল্প করে না? নাটক নভেল লেখে, বায়োস্কোপ করে” এবং জালাল মাস্টার বইয়ে লেখা ইতিহাসের চেয়েও ভরসা করে অন্তরঙ্গ মানুষদের মুখে-মুখে-ফেরা কাহিনিতে। সচেতনভাবেই ইলিয়াস গল্প ও ইতিহাসের মাঝের ওই অসংজ্ঞায়িত অঞ্চলের মাঝে আখ্যানস্থিত আনোয়ারকে ও আখ্যানপাঠককে টেনে নিয়ে যান পৃ- ১৩৩

¹⁸ William James, ‘The stream of Consciousness’, 1892, <http://webpace.ship.edu/cgboer/jamesselection.html>

¹⁹ Samuel Richardson, ‘Clarissa Harlowe History of a young lady’, Preface, last updated on January 2013, <https://www.gutenberg.org/files/9296/9296-h/9296-h.htm>

²⁰ ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বদরুদ্দীন উমর পূর্ববাংলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘গণশক্তি’তে ‘পূর্ব বাংলাকে নয়া উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত

করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিতাড়িত করুন' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় লেখেন। জোতদার-মহাজনদের সামন্তবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল ধনিকদের বিরুদ্ধে সমানতালে লড়ার জন্যে মেহনতি কৃষক-শ্রমিক ও বিপ্লবী ছাত্রযুবদের কাছে আহ্বান রাখেন। মুজিবর রহমান ও আওয়ামি লিগের পথ তাঁদের পার্টির কাছে কোনও সমাধান ছিল না, বরং খিজির চেংটুর মতো মেহনতি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব রাখেন। সূত্র-
বাংলাদেশ প্রসঙ্গে, অনীক ও পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা, পৃ- ৭-১৮

²¹ Karl Marx, *The Poverty of Philosophy (1847)*, Trans. By Institute of Marxism Leninism, 1955, Marx/Engels Internet Archive 1999, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-philosophy/index.htm>

²² *Engels to Franz Mehring*, Trans, by Donna Torr, International Publishers, 1968, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1893/letters/93_07_14.htm

²³ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ২১৫-১৬

²⁴ আনোয়ারের সঙ্গে বিতর্কের সময় আলতাফ স্পষ্টতই জানায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি তার একাত্মতার কথা। ফরিদ যখন বলে যে, মধ্যবিত্তের সমস্যা সমাধানই আশু কর্তব্য হওয়া উচিত, তখন আলতাফ তাকে সমর্থন জানিয়ে বলে, “সব দেশে মধ্যবিত্তরাই তো নেতৃত্ব দেয়।”
তদেব, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ৩২

²⁵ তদেব, ২৪-৫

²⁶ তদেব, ৩০৮-৯

²⁷ শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর বিশ্লেষণে আনোয়ারের পরিণতিকে “ultimately condemned to escapist inactivism” বলেছেন এবং ওসমান ও খিজিরের সঙ্গে তুলনায় আনোয়ারের এই

পরিণতিতে তাকে ‘Vital and credible’ হয়ে উঠতে দেখেছেন। Shubharanjan Dasgupta, ‘Revolt is the only reply’, *Elegy and Dream*, UPL, Dhaka, 2018, pp. 37-8

²⁸ ১৯৯১ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, শাহদুজ্জামানের নেওয়া, বাঘের বাচ্চা, ইলিয়াস সংখ্যা, ২০১৮, পৃ- ৩৫

²⁹ ‘খিজির একবচন character না, অনেকগুলো character ওর ভেতরে ঢুকেছে, ওকে ইংরাজীতে বলতে হবে they, কিন্তু আনোয়ার আর ওসমান একই লোক, দুটো ভাগ করে দেখানো হয়েছে’, সূত্র- ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, বাঘের বাচ্চা, পৃ- ৫৯

³⁰ ইলিয়াস, চিলেকোঠার সেপাই, ৪৪-৪৫। আর, এই ৬ নম্বর অধ্যায়ে খিজিরের বিপর্যস্ত শৈশব-কৈশোরের বর্ণনা রয়েছে। খিজিরের বেড়ে-ওঠা, বাড়ির পরিবেশ, বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক খিজিরকে সাদা-কালোর দ্বন্দের বাইরে রক্তমাংসের কুশীলব ক’রে তোলে। রহমতউল্লাহর প্রতি ‘ঈমান’ থেকে তার বিরুদ্ধে দ্রোহ বা সমাজ-সংসারের প্রতি নৈরাজ্যবাদী অবস্থানের ধরতাই পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে।

³¹ ইলিয়াস, চিলেকোঠার সেপাই, পৃ- ৬২-৬৪

³² এদের বয়ানে নিপীড়িত শ্রেণির অপরিবর্তিত দুর্দশাচিত্র উঠে আসে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে শ্রেণিগত নিপীড়নের হাতবদল হয়েছিল মাত্র, গৌরবদের সশস্ত্র সংগ্রাম তাই দেশি নিপীড়ক শ্রেণির বিরুদ্ধেও ছিল।

³³ কাদের মোল্লার সঙ্গে বদু মওলানার প্রভূত মিল পাওয়া যায়। কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল জনৈকা মোমেনা, এই একই নামের চরিত্রের কথা শহীদুলের উপন্যাসে ফিরে ফিরে আসে। যদিও, বাস্তবে মোমেনার গোটা পরিবারকে খুন করে কাদের ও রাজাকারেরা আর উপন্যাসে মোমেনা নৃশংসভাবে খুন হয় বদু ও রাজাকারের দ্বারা। সূত্র- বন্দলেখক, ‘কাদের মোল্লার আসল নকলঃ একটি নির্মোহ অনুসন্ধান’, ২০১৩

- ³⁴ “মহল্লায় যেদিন প্রথম মিলিটারি আসে, বদু মওলানা তাদেরকে আজিজ পাঠানের বাড়িতে নিয়ে যায়... মার্চের পঁচিশ তারিখের পর একদিন বদু মওলানা একদল লোক নিয়ে আসে। তারা মহল্লার হিন্দুদের বাসার তালা ভেঙে লুণ্ঠ করে।” শহীদুল জাহির, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, শহীদুল জাহির রচনাসমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ- ৩০৮
- ³⁵ হাসান আজিজুল হক, ‘সোনা-মোড়া কথাশিল্পীঃ শহীদুল জাহির’, শহীদুল জাহির রচনাসমগ্র, পৃ- ৭৯৪
- ³⁶ শহীদুল জাহির, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, তদেব, পৃ- ৩৩০-৩৩৩
- ³⁷ মহীবুল আজিজ, ‘আমাদের সাহিত্যে শহীদুল জাহির কেন থাকবেন’, শহীদুল জাহির সমগ্র, পৃ- ৮২৫
- ³⁸ সৈয়দ আলী আহসান, ‘পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ধারা’, মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, অগাস্ট ১৯৫১। পরবর্তীকালে তিনি এই মত পরিবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার করতে গিয়ে।
- ³⁹ গোলাম মোস্তাফা, *প্রবন্ধ সংকলন*, সম্পা. মহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৭৫, ১৯১-২১৫, পৃ- ২৩৪-২৬১
- ⁴⁰ শওকত ওসমান, ১৯৭১ *স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ- ১৫-১৬
- ⁴¹ ‘রুনুর শিকার’- এই শিরোনামে এই অংশটি রয়েছে বইটিতে। রুনু ও তার দল যাদের ওপরে অত্যাচার করেছিল পুলিশি হেফাজতে, তাদের কয়েকজনের জবানবন্দি রয়েছে।
- ⁴² ‘রুনু সাদা না, রুনু কালো’, এবং বিসংবাদ, কলকাতা, ১৯৯৭, PDF, পৃ- ২৫-৬
- ⁴³ সমরেশ মজুমদার, *কালবেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, ২৭৪-৬
- ⁴⁴ শেখ রফিক সম্পাদিত, *ইলা মিত্রের জবানবন্দি*, বিপ্লবীদের কথা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ- ১৩-১৫
- ⁴⁵ সেলিনা হোসেন, *কাঁটাতারে প্রজাপতি*, একটি ইত্যাদি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ- ২৪৫-৫৫
- ⁴⁶ মণিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ- ১৮৪-২১৫

⁴⁷ Javeed Alam, 'State and the Making of Communist Politics in India 1947-57', *Economic and Political Weekly*, Nov. 9, 1991, Vol. 26, No. 45 (Nov. 9, 1991), pp. 2573-2577+2579-2583 পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। তৎকালীন প্রগতিবাদী সাহিত্যের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিলাইনের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা।

⁴⁸ সেলিনা হোসেন, *কাঁটাতারে প্রজাপতি*, পৃ- ২০৫

⁴⁹ নবারণ ভট্টাচার্য, *যুদ্ধ পরিস্থিতি, উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ১৪০-১

⁵⁰ গথাম শহরের পুলিশ কমিশনার গর্ডন জোকারের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলে এবং ব্যাটমান জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই তাকে মারতে থাকে, তখন জোকার বলে, "Ah, the good cop, bad cop routine?", *দ্য ডার্ক নাইট*, ক্রিস্টোফার নোলান, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, ২০০৮

⁵¹ সমরেশ বসু, *মহাকালের রথের ঘোড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ- ৮-৯

⁵² মহাশ্বেতা দেবী, *হাজার চুরাশির মা*, দে'জ, পাবলিশিং, কলকাতা, PDF, পৃ- ৮২

⁵³ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, *আটটা নটার সূর্য*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ- ১৪৭-১৫১; নিরুপমের সঙ্গে কথোপকথনে কনকেন্দু সিপিআই(এম-এল) পার্টির সাহিত্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে খবর জানতে চায়। কৃষিবিপ্লব, চীন, দেশব্রতী পত্রিকা, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি ইত্যাদি খবর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কনকেন্দুর কণ্ঠস্থ থাকে।

⁵⁴ মহাশ্বেতা দেবী, *হাজার চুরাশির মা*, পৃ- ৩০-৩১

⁵⁵ Ashoke Kumar Mukhopadhyay, 'Through the Eyes of the Police: Naxalites in Calcutta in the 1970s', *Economic and Political Weekly*, Jul. 22-28, 2006, Vol. 41, No. 29 (Jul. 22-28, 2006), pp. 3227-3233

⁵⁶ Calcutta Police Gazette, 2nd January, 1971

⁵⁷ Translated into English by R Shamasastri; Chapter VIII, Book IV

⁵⁸ John H. Langbein, 'Torture and the Law of Proof', University of Chicago Press, 1977 and Alfred McCoy: A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror, University of Wisconsin- Madison News, New York, 2006, PDF

⁵⁹ "Torture of women in custody including rape is reported regularly in India. Custodial rape remains one of the worst forms of torture perpetrated on women by law enforcement personnel." Report of NCAT, 2019

⁶⁰ Law Commission of India, Implementation of 'United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' through Legislation, Report No. 273, October 2017

⁶¹ রুনু গুহনিয়োগীর সাক্ষাৎকার, *রুনু সাদা না রুনু কালো?*, এবং বিসংবাদ, পৃ- ১৯-২১

⁶² নবারণ ভট্টাচার্য, *যুদ্ধ পরিস্থিতি, উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৪৪

⁶³ "In police and criminal procedure and practice it is said that the "first degree" is practiced when the arrest is made; the "second degree" when the accused is confined; and the "third degree" when the accused is questioned in private quarters... The third degree is a secret practice and one which is illegal," Ohio State Law journal, vol 9, Legal consequences of the Third degree, p. 514

⁶⁴ মণি মুখোপাধ্যায়, 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার', পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রতিবাদের গল্পঃ নকশালবাড়ি*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৪৪-৫৩

⁶⁵ জয়া মিত্র, 'তিমির বিদার', *নকশালবাড়িঃ প্রতিবাদের গল্প*, পৃ- ১৭০-১৯৮

⁶⁶ নবারণ ভট্টাচার্য, *যুদ্ধ পরিস্থিতি, উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১০, পৃ- ১৪৭-৪৮

⁶⁷ Mallarika Sinha Roy, 'During West Bengal's Naxalbari Movement, Women Were Not Merely in the Background', The Wire, 4th October 2018

⁶⁸ Aruna Krishnamurthy, 'The Revolutionary Man in Naxalite Literature', Journal for the Study of Radicalism, Vol. 11, No. 1 (Spring 2017), 145-8

⁶⁹ পুলক চন্দ লিখছেন যে, 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-তে পাঠককে সংগ্রাম বিমুখতা ও আত্মবিনাশের পথে নিয়ে যেতে চাওয়ার বিপরীতে 'হাজার চুরাশির মা' পাঠককে জীবনে আত্মশীল করে ও অনুপ্রাণিত করে অস্তিত্ব যাচাই ক'রে নিতে। সূত্র- অনীক, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ১৯৭৭, পৃ- ১২২।

⁷⁰ নাজিম হিকমেত, *জেলখানার চিঠি*, অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঈগল পাবলিশিং কোং, কলকাতা, ১৯৫২, ১৫

⁷¹ নবারুণ ভট্টাচার্য ফিচারিং ঋত্বিক কুমার ঘটক, লাল জীপের ডায়েরি, <https://laljiperdiary.wordpress.com/2014/08/05>, নবারুণের সাক্ষাৎকারটি 'লাল জীপের ডায়েরি'তে প্রকাশিত হয় নবারুণের মৃত্যুর পরে।

⁷² বিনু নবারুণকে মাও সে তুং-র লেখা পড়ে শোনায়, চারু মজুমদারের ইস্তাহারের কথা বলে এবং বিনুর কথামতোই হারবার্ট নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির 'পত্রবাহক (কুরিয়ার)'-র দায়িত্ব পালন করে। নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ৩২

⁷³ হাইনৎস লাইপম্যানের কোনও খোঁজ ১৯৩৭ সালের পরে আর পাওয়া যায়নি। বইটি নাজি-শাসিত জার্মানিতে তিনি লেখেন। ১৯৩৪-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৫-র জুলাইয়ের মধ্যে। ১৯৪৬ সালে অশোক গুহ এর বাংলা অনুবাদ করেন 'অগ্নিগর্ভ' নামে। রাজনৈতিক উপন্যাসটি 'ডকুমেন্টারি-নভেল' গোত্রের। *অগ্নিগর্ভ*, র্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৪৬

⁷⁴ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সত্তর দশক', 'সত্তর দশক', সম্পা. অনিল আচার্য, অনুষ্ঠাপ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ১২-১৩

-
- ⁷⁵ সিতাংশুশেখর চক্রবর্তী, *সত্তরের চালচিত্র*, আশাবরী পাবলিকেশন, হাওড়া
- ⁷⁶ Ashok Kumar Mukhopadhyay, 'Through the Eyes of the Police', EPW, pp. 3227-3233
- ⁷⁷ অজয় বসুরায় ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *জেল থেকে মাকে*, বর্ণনা, কলকাতা, ১৯৭৭
- ⁷⁸ ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তরঃ এবং আগে পরে*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৫১৪
- ⁷⁹ অরুণকুমার দাস, *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাঙলা কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ১০৪-৫
- ⁸⁰ 'গেরিলা 'অ্যাকশন' সম্পর্কে কয়েকটি কথা', দেশব্রতী, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০
- ⁸¹ ১৯৭০ সালের নভেম্বর দিবসে প্রকাশিত প্রচারপত্র।
- ⁸² *বাল্মীকি রামায়ণ*, যুদ্ধকাণ্ড, ৯০ সর্গ
- ⁸³ *মহাভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, ২০০৩, পৃ- ২৬৩-৬৪
- ⁸⁴ বেদব্যাস বিরচিত *মহাভারত*, প্রথম খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, ২০০৬, পৃ- ৯৪-৯৮
- ⁸⁵ বেদব্যাস বিরচিত *মহাভারত*, দ্বিতীয় খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, ২০০৩, পৃ- ৫০৪-৫০৬
- ⁸⁶ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৫ সাল, ১০-১১
- ⁸⁷ তদেব, তৃতীয় খণ্ড নবম পরিচ্ছেদ, পৃ- ৯৮-১০০, ১২৫-২৭
- ⁸⁸ মহাশ্বেতা দেবী এই হিংসার বয়ানের থেকে নকশালদের চিহ্নিত করা সমাজসমস্যাগুলিকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন। হিংসা, 'অতিবাম বিচ্যুতি' ইত্যাদি তকমা দিয়ে আর্থ-সামাজিক

রাজনীতিকে এড়ানো যাবে না, এটা তাঁর উপন্যাসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন। ‘অগ্নিগর্ভ’-র রাজনীতিকে ধারণ করে এটিই। মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, ভূমিকা, পৃ- ছয়

⁸⁹ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ- ১২৪-২৫

⁹⁰ সিতাংশুশেখর চক্রবর্তী, *সত্তার চালচিত্র*, এই উপন্যাসে ১৯৬৯-৭২ এই তিনবছরের ঘটনা আখ্যায়িত হয়েছে

⁹¹ বিজিত ঘোষ সম্পা. *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা, PDF, ৪১২-৪১৯

⁹² শশাঙ্ক, দেশব্রতী, ৫ই অগাস্ট ১৯৭০

⁹³ Mallarika Sinha Roy, *Sexual Economies of Caste and Gender The Case of Naxalbari (1967-1975)*, Tata Institute of Social Sciences, June 2016, 9-10

⁹⁴ শশাঙ্ক, দেশব্রতী, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

⁹⁵ ‘সাহিত্যে নকশাল আন্দোলন’,
<https://lalshongbad.wordpress.com/2017/04/25/নকশাল-সাহিত্য-2/>, accessed 25th July, 2021

⁹⁶ শশাঙ্ক, দেশব্রতী, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০, ‘এবং জলাক’ দেশব্রতী সংকলন ৭, জানুয়ারী-জুন ২০০৩, ২৩২

⁹⁷ “elitist historiography should be resolutely fought by developing an alternative discourse based on the rejection of the spurious and un-historical monism characteristic of its view of Indian nationalism...” (7)
মূলতঃ সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক’রে সরোজ দত্তের যুক্তি আবর্তিত হয়েছে; রমেশচন্দ্রা একে ‘জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ’ বলতে চাননি ও রাজনীপামরা একে ‘প্রগতিশীল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে

প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান' বলেছেন- এই দু'য়ের বিরোধিতা ক'রে সরোজ দত্ত পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে 'ইতর'জনের বোধের প্রতর্ক নিয়ে এসেছেন। (২৩০)

⁹⁸ 'দেশব্রতী', মে-জুন ১৯৭০, 'কলিঙ্গ স্কুলের ছাত্রদের বিপ্লবী অভিযান', *এবং জলার্ক দেশব্রতী* সংকলন ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, ১৩৫-৬

⁹⁹ যদিও, 'দেশব্রতী'তে নিয়মিত রাজ্য সরকারি ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ও ধর্মঘটকে সমর্থন জানানো হত। ১৯৬৮-র মে থেকে সেপ্টেম্বর 'দেশব্রতী'-র সংখ্যাগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা জ্ঞাপন ক'রে রাষ্ট্রবিরোধী সর্বাঙ্গিক আন্দোলনে নামার আবেদন করা হয়েছিল।

¹⁰⁰ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ- ১২৫

¹⁰¹ জেলে বসে অনিমেষ ভেবেছে, 'হঠকারিতা থেকে কোনো সুন্দর সৃষ্টি হয় না।' পৃ- ২৯২
অনিমেষ ও দীপকের ঠাকুমার কথোপকথনে যে সমালোচনা আসে, তা রাষ্ট্রের মতাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করে 'হঠকারী', 'আফসোস' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। কমিউনিস্টদের 'হিংসা'র জন্যেই রাষ্ট্রের প্রতিহিংসা এমন প্রতর্কই স্বীকৃত হয়।

¹⁰² শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে, *ষাট-সত্তরে নদীয়াঃ নকশালবাড়ির নির্মাণ*, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০০০, পৃ- ১৫৫

¹⁰³ Atreyee Sen, 'Torture and Laughter: Naxal insurgency, custodial violence, and inmate resistance in a women's correctional facility in 1970s Calcutta', *Modern Asian Studies* 52, Cambridge University Press, 2018, p. 926

¹⁰⁴ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭০, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ৯৪ ও ১১৪

¹⁰⁵ পাঞ্চগলী বৈদ্যবাটি পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণের অ্যাকশন স্কোয়াডে স্বেচ্ছায় থাকতে চাইলে আঞ্চলিক নেতৃত্ব ভোলানাথ তাতে বাধা দেয় 'মেয়ে থাকলে অ্যাকশনে টেকনিক্যাল সমস্যা' হবে এই অজুহাতে। এবং এই ভোলানাথই বিপ্লবী দলে পাঞ্চগলীর ভূমিকা নির্ধারণ ক'রে দিতে চায়

‘শহীদ দ্রোণের বিধবা স্ত্রী’ এই ইমেজরক্ষার কথা বলে। প্রেমিক পছন্দ করার স্বাধীনতাতেও পুরুষতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ করে ভোলানাথ। অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, *আটটা নটার সূর্য*, পৃ- ৩২০-২৭

¹⁰⁶ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, কমনিস, ১৯৭০, পৃ- ১০৬-৭

¹⁰⁷ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শোকমিছিলঃ একটি ব্যক্তিগত পাঠ’, দিবারাত্রির কাব্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ- ১৩১-৩৮

¹⁰⁸ আখ্যানের এই অংশের গঠন ও খাঁচ অবিবর্তন অনুসৃত হয়েছে ‘কালবেলা’ উপন্যাসে। অনিমেঘ জেলে থাকাকালীন মাধবীলতা শিশু অর্ককে বড় ক’রে তোলে। পার্থক্য একটাই- মাধবীলতা পারুলের মতো পার্টিসদস্য ছিল না।

¹⁰⁹ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শোকমিছিলঃ একটি ব্যক্তিগত পাঠ,’ দিবারাত্রির কাব্য, ১৯৯৭, পৃ- ১৩১-৩২

¹¹⁰ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিবাহবার্ষিকী, উপন্যাস সমগ্র*, একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৮, ২৩৯ ও ২৫০-৪

¹¹¹ তদেব, পৃ- ২৫২-৫৪

¹¹² কিম্-কি-দুক পরিচালিত ‘স্টপ্ (২০১৫)’ চলচ্চিত্রেও এক মায়ের আতঙ্ক তার আসন্নসন্তানের জন্যে। সেও তেজস্ক্রিয়তার আতঙ্ক। জাপানে পরমাণুচুল্লী ক্ষতিগ্রস্ত হ’লে, তার বিকিরণের রেশ এসে পড়ে গর্ভবতী মিকির ওপরে। সেই হয়তো-বিকলাঙ্গ শিশুকে পৃথিবীতে আনবে নাকি, রাষ্ট্রীয় অনুরোধ মেনে নিয়ে গর্ভপাত করাবে, এই দোলাচলে ভুগতে থাকে হবু বাবা-মা সাবু-মিকি।

¹¹³ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, *আটটা নটার সূর্য*, পৃ- ২৫৪

¹¹⁴ তদেব, পৃ- ২৩০-৩১

¹¹⁵ তদেব, পৃ- ২৫২-৫৮

¹¹⁶ নবারণ ভট্টাচার্য, *ম্যালোরি, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ*, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ১৯২-৯৩

¹¹⁷ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ- ১৫২-৫৫

¹¹⁸ শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'দ্য কালচারাল ব্যাটল', *ফ্রম পপুলার মুভমেন্টস টু রেবেলিয়নঃ দ্য নক্সালাইট ডিকেড*, সম্পা. রণবীর সমাদ্দার, সোস্যাল সায়েন্স প্রেস, নিউ দিল্লি, ২০১৮, পৃ- ২৬৯-৭১

¹¹⁹ দ্রৌপদীকে পেছন থেকে দোপদি বলে ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। তাতে তার চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তার সংগ্রামী এলাকায় নতুন নাম উপী মেঝেন। আত্মপরিচয় গোপনের জন্যই এমন ছদ্মনাম নেওয়া। মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, ১৭২

¹²⁰ Paula banerjee and Sucharita Sengupta, 'The Refugee Movement as a founding moment of Popular Movements in Post-independent West Bengal', *From Popular Movements to Rebellion: The Naxalite Decade*, Ed. By Ranabir Samaddar, pp. 19-47

¹²¹ মহাশ্বেতা দেবী, *হাজার চুরাশির মা*, পৃ- ৩৪

¹²² নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্রোতের সঙ্গে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮, কলকাতা, ১৫০-৫২

¹²³ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শোকমিছিল, গল্প সমগ্র*, একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ- ৪৪৮-৫০

¹²⁴ Paula banerjee and Sucharita Sengupta, The Refugee Movement as a founding moment of Popular Movements in Post-independent West Bengal, pp. 24-25

¹²⁵ অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, *আটটা নটার সূর্য*, দে'জ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২৭৫-৭৮

¹²⁶ তদেব, পৃ- ৩৩৯-৪১

¹²⁷ জয়ন্ত জোয়ারদার, *এভাবেই এগোয়*, বুক মার্ক, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ- ৯৯-১০২

-
- ¹²⁸ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, *প্রগতি*, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪, পুনর্মুদ্রণ *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক*, ধনঞ্জয় দাশ সম্পা., করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৩৬৯-৭১
- ¹²⁹ Georg Lukacs, *The Theory of The Novel*, Trans. From German by Anna Bostock, The Merlin press, London, 1971, p. 56
- ¹³⁰ M. M. Bakhtin, *The Dialogic Imagination: Four Essays* by M. M. Bakhtin Ed. by Michael Holquist Trans. By Caryl Emerson and Michael Holquist, University of Texas Press, Austin, 1981, pp. 10-24
- ¹³¹ রণবীর লাহিড়ী, *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৫২-৩
- ¹³² বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, 'মিখাইল বাখতিনের উপন্যাস ভাবনা', *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব*, সম্পা- অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ, গাঙ্গেয়পত্র, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ- ১৯
- ¹³³ Bakhtin, M. M, *Problems of Dostoevsky's Poetics*, Ed. and translated by Caryl Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, p. 293
- ¹³⁴ Bakhtin, M. M, *The dialogic imagination: Four essays*, p. 280
- ¹³⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা', *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ- ৪১-৩
- ¹³⁶ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গোরাঃ তমিজ- বাংলা উপন্যাসের মুক্তি', *অনুষ্টিপ শারদীয় ১৪১০*, সম্পা. অনিল আচার্য, কলকাতা, পৃ- ৫৩৪
- ¹³⁷ দেবেশ রায়, 'বাংলা আখ্যানলাবো নিহিত উপন্যাস', *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, দে'জ, ২০০৬, ৩২-৪
- ¹³⁸ অ্যারিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, অনুবাদ- শিশিরকুমার দাশ, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ- ৪২
- ¹³⁹ অ্যারিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, পৃ- ৪৩-৪

- ¹⁴⁰ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার*, ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৬৭, পৃ ৭-৮
- ¹⁴¹ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ১-২
- ¹⁴² জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার*, পৃ- ২৭৬-২৮৭
- ¹⁴³ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬৭ সাল, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ- ২-৩
- ¹⁴⁴ অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ- ৯-১০
- ¹⁴⁵ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পৃ- ১৯
- ¹⁴⁶ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সোনার কাঠি', পরিচয়, ১৩২২
- ¹⁴⁷ যদিও, বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বে লেখা 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ নৈতিকতার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। বাবুদের নিয়ে লেখা আখ্যানগুলিতে উপন্যাসের ধরতাই রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাষা-প্রকরণ-গঠন-প্লট কোনও দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ উপন্যাসের আকার পায়নি। কিন্তু, প্রতিটিতেই অধঃপতিত সমাজের প্রতি বিদ্রূপ এবং উচ্চ-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ স্থাপন করার চেষ্টা প্রকটভাবে রয়েছে।
- ¹⁴⁸ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ১৮
- ¹⁴⁹ তদেব, পৃ- ৬৫
- ¹⁵⁰ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পৃ- ২৭৪
- ¹⁵¹ নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পৃ- ১১০-৩
- ¹⁵² সব্যসাচী স্পষ্টতই শশীপদকে জানায় যে, বিপ্লবগাথা রচিত হবে শুধু 'শিক্ষিত ভদ্রজাতের জন্যেই' (২৫৫) এবং সব্যসাচী এও বলে যে, 'অশিক্ষিতদের জন্য... সাহিত্য পরিবেশন করা যাবে না' (২৫৪-৫৫), তাদের জন্যে শুধু দাক্ষিণ্য সম্বল। বস্তুতঃ সব্যসাচীর এই উচ্চবর্গীয় মানসিকতা

তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিফলন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, পৃ- ২৫৭-২৫৮

¹⁵³ নাজমা জেসমিন চৌধুরি, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, পৃ- ১১১

¹⁵⁴ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৩৬৫, পৃ- ২৮৯

¹⁵⁵ শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে, *ষাট-সত্তরে নদীয়া*, পৃ- প্রাক্কথন

¹⁵⁶ নকশালবাড়িপর্বের সাহিত্য গবেষকরাও অনেকে এই বিপথগামিতা, রাজনীতি খারাপ এবং হিংসার প্রাধান্যই সত্তর দশকের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধি এমন ময়ামত রেখেছেন। অরুণকুমার দাস তাঁর গবেষণাগ্রন্থে ‘সহযোদ্ধা’ উপন্যাসের আলোচনায় ‘বিপথগামী হঠকারী রাজনৈতিক সঞ্চালনের সুযোগে অজস্র অনাত্মক যুবকের বৈপ্লবিক দৌরাভ্য’ এমন বাক্য লেখেন। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ মেনে নিয়েই রাজনৈতিক উপন্যাস বিশ্লেষণ করছেন। সূত্র- অরুণকুমার দাস, ‘ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাঙলা কথাসাহিত্য’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ১২৮

¹⁵⁷ স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, *কম্পাস*, শারদীয় দেশ, ১৪২২, পিডিএফ, পৃ- ২৩

¹⁵⁸ Ashoke Kumar Mukhopadhyay, ‘Through the Eyes of the Police: Naxalites in Calcutta in the 1970s’, p. 3229

¹⁵⁹ মেসের সহবাসিন্দা অভ্যকে নৃশংসভাবে মেরে আধমরা ক’রে দেওয়া, তরুণ এস.আই নীলাদ্রিকে ছুরি মেরে খুন করা, চোখের সামনে সহযোদ্ধাদের বীভৎসভাবে মরতে দেখা-হিরণ্ময়ের স্মৃতিপটে ঝলসে ওঠে বারবার।

¹⁶⁰ ‘কম্পাস’ উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ‘বিভীষিকা’ ও ‘অধঃপতন’-র ওপরে মূল নিবন্ধতা উপন্যাসিকের। রাজনৈতিক সংসর্গের ফলেই রূপালির জীবন ও হিরণ্ময়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

-
- ¹⁶¹ অরুণকুমার দাস, *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাঙলা কথাসাহিত্য*, পৃ- ১১৩
- ¹⁶² তদেব, পৃ- ১১৫
- ¹⁶³ অনিল আচার্য (সম্পা.) *সত্তর দশক*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ১৯৩
- ¹⁶⁴ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, *উপন্যাস সমগ্র ১*, আজকাল, কলকাতা, ২০০৬, পৃ- ১১
- ¹⁶⁵ দেবেশ রায়, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ- ৬৫৭-৫৮
- ¹⁶⁶ Leonora Flis, *Factual Fictions: Narrative Truth and Contemporary American Documentary Novel*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 73
- ¹⁶⁷ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, *সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দু'টো একটা কথা যা আমরা জানি*, অদ্রীশ বিশ্বাস ও প্রবীর চক্রবর্তী সম্পা., লিরিকাল বুকস, ২০২০, ভূমিকা
- ¹⁶⁸ মহাশ্বেতা দেবী, 'আজকের লেখাঃ কি ও কেন', প্রস্তুতিপর্ব, ১৯৮৬
- ¹⁶⁹ ওই মহিলাদের পদবী সাঁওতাল, মুণ্ডা, রাজবংশী, মল্লিক ও নেপালী। সূত্র- দেশব্রতী, ১০ই অগাস্ট, ১৯৬৭।
- ¹⁷⁰ দিনমজুর সাধারণতঃ অ-কৃষি আর্থ ব্যবস্থায় জড়িত, শহরে বা মফস্বলে থাকেন এবং শ্রম বিক্রি ক'রে বাঁচেন।
- ¹⁷¹ নিম্নবিত্ত অর্থে যিনি মালিক বা মজুর নন এবং নির্বিত্তও নন। কিন্তু, তিনি শ্রম বিক্রি করে উপার্জন করেন। নিজের একটি বাসস্থান বা এমন কোনও সম্পদ থাকে (কখনও সেই সম্পদ কারোর থেকে ভাড়া নেন তিনি) যাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার ক'রে তিনি উপার্জনের ব্যবস্থা করেন।
- ¹⁷² ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৫৬১-২
- ¹⁷³ তদেব, পৃ- ৫৬২

¹⁷⁴ তদেব, পৃ- ৫৫৯-৬০

¹⁷⁵ ফটিক চাঁদ ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, ১৯৬

¹⁷⁶ Ranabir Samaddar, 'Whatever Has Happened to Caste in West Bengal?', *Economic and Political Weekly*, SEPTEMBER 7, 2013, Vol. 48, No. 36 (SEPTEMBER 7, 2013), p. 78

¹⁷⁷ রাজবংশী ও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় জোতদারেরা। মুসলমান কৃষককর্মী শোভান সহ পাঁচজন মুসলমান ও রাজবংশী কৃষক নিহত হন। সূত্র- দেশব্রতী, ১৩ই জুলাই ১৯৬৭।

¹⁷⁸ ভাস্করজ্যোতি রায়চৌধুরী, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর*, পৃ- ৫০৭-৮

¹⁷⁹ শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে, *ফাট সত্তরে নদীয়া*, পৃ- ১৫৫-৫৬

¹⁸⁰ সমরেশ এখানে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করেছেন ১৯৬৯ সালের ১লা মে সিপিআই(এম-এল) পার্টির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ময়দানে যে প্রকাশ্য বিশাল জনসভা হয়, তার প্রতি।

¹⁸¹ পুলক চন্দ, 'মহাকালের সন্ত্রাস ও সত্তরের নির্ভীক জননীঃ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের একটি দিক', *অনীক*, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, বহরমপুর, ১৯৭৭

¹⁸² খেলু চৌধুরী রুহিতনকে বলে যে, "এই তো সেদিনের কথা, দিবা বাগচি ধরা পড়লো, মারাও গেল। হার্টফেল করে নাকি মারা গেছে" (৪৯)। চারু মজুমদার গ্রেপ্তার হন ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই এবং লালবাজারে পুলিশ হেফাজতেই ২৮শে জুলাই শহীদ হন, সরকারি নথিতে মৃত্যুর কারণ ছিল হার্টফেল।

¹⁸³ সমরেশ বসু, *মহাকালের রথের ঘোড়া*, সপ্তম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ- ৫৩-৫

¹⁸⁴ Sarbani Bandyopadhyay, 'Caste and Politics in Bengal', Economic and Political Weekly, DECEMBER 15, 2012, Vol. 47, No. 50 (DECEMBER 15, 2012), pp. 71-73

¹⁸⁵ অঞ্জন ঘোষ ২০০১ ডিসেম্বরে 'Caste(e) out in West Bengal' সেমিনারে ও হিমাঙ্গি ঘোষ ২০২১ ফেব্রুয়ারিতে 'West Bengal's Landscape is Shifting from 'Party Society' to 'Caste Politics' প্রবন্ধে এর উল্লেখ করেছেন।

¹⁸⁶ কিশাণসভা ও সিপিআইমের প্রতি বসাইয়ের অভিযোগও একই, “কিশাণসভায় জিলা সেক্রেটারি করার সময়ে বসাইয়ের কথা ভাব নাই কেও?” মূলবাসী ক্ষেতমজুরকে ব্রাত্য রাখা হয় বলে অভিযোগ তার। মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৭ সাল, পৃ- ৩৭

¹⁸⁷ ১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী, দেশব্রতী, ২৮মে-৪জুন, ১৯৭০, কলকাতা।

¹⁸⁸ তদেব, 'জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজগুলি করবে'।

¹⁸⁹ 'নির্বাচন বয়কট করুন', 'ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে' ও 'সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবই মুক্তির পথ' নকশালদের রণনীতিগত স্লোগান এইগুলোই ছিল। বসাই টুডুর শ্রেণিবোধ ও সমরচেতনার সঙ্গে যার বহুল সাদৃশ্য।

¹⁹⁰ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ৩৪-৩৫

¹⁹¹ চারু মজুমদার, '৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন, দেশব্রতী, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭০

¹⁹² ভাস্করজ্যোতি রায়চৌধুরী, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তর*, পৃ- ৫০৮

¹⁹³ দেশব্রতী, ২রা নভেম্বর ১৯৬৭, এবং জলার্ক দেশব্রতী সংকলন। যদিও, জেলে জনৈক কমরেড তাঁর সাথে কথোপকথনে এমনটা জেনেছেন বলে উল্লেখ করা আছে। কোনও নথিবদ্ধ 'প্রামাণ্য' বিবৃতি নেই তার।

- ¹⁹⁴ এই আখ্যান নির্মাণে কাল্পনিকতার সঙ্গে ইতিহাসের বহু দলিল দস্তাবেজের সাহায্য নিয়েছেন লেখক। সরকারি নথিপত্র থেকে উল্লেখ রেখেছেন। মহাশ্বেতা দেবী, *অরণ্যের অধিকার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ সাল
- ¹⁹⁵ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সময়ের দাগ ও বিদীর্ণ দর্পণ’, দেশ, ২রা এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ- ৬০-৬১
- ¹⁹⁶ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গগন ঠাকুরের সিঁড়ি, উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৭২-৭৮
- ¹⁹⁷ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিবাহবার্ষিকী, উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৬৫-৬৮
- ¹⁹⁸ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন মিথ্যে বলে দ্রোণ। মণিকা, শিবানী এবং আরও অনেকের প্রতি ‘তীব্র ভালবাসা’ বোধ করে দ্রোণ। তার কবিতাতেও তার ছাপ পড়ে। মণিমোহন প্রেমের চিঠির যে ভাষা পড়ে প্রবল অস্বস্তি বোধ করে, দ্রোণের কবিতায় সেই ভাষাই সহজপ্রকাশে প্রেমের কথা জানায়। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, ‘আটটা নটার সূর্য’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৪৫-৪৬
- ¹⁹⁹ তদেব, পৃ- ৬১-৬২
- ²⁰⁰ তদেব, পৃ- ৩২৩-২৪
- ²⁰¹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ৮৯
- ²⁰² আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সাক্ষাৎকার, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, ২০১৮, পৃ- ৬০-১, ওসমান রঞ্জুকে হত্যা করতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অতীতকে খুন করতে চাইছে যখন সে আর মিডলক্লাস ম্যান নয়, ওসমানের এই সম্ভাব্য পরিণতির কথা ইলিয়াস ভেবেছিলেন বলে শাহদুজ্জামানকে জানান। ‘লিরিক’, ইলিয়াস বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত ১৯৯২, পুনর্মুদ্রণ বাঘের বাচ্চা পত্রিকা
- ²⁰³ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শোকমিছিলঃ একটি ব্যক্তিগত পাঠ’, দিবারাত্রির কাব্য- দীপেন্দ্রনাথ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃ- ১৩৩-৩৪

²⁰⁴ অমিয় কলেজে অধ্যাপনা করে, নামী সেমিনারে গবেষণাপত্র পড়ে। অমিয়র সন্তান নামী-দামী ইস্কুলে পড়ে এবং অমিয়র আচরণ-রুচি যুগোপযোগী আধুনিক। মণিমোহন যা হতে পারত অথচ হয়নি, সেই মস্ত না-হওয়াটাই অমিয়র অস্তিত্ব। মণিমোহনকে অর্থনৈতিক সাহায্য করেও মণিমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবনত সে।

²⁰⁵ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিবাহবার্ষিকী*, পৃ- ২৮৯-৯৩

²⁰⁶ তদেব, পৃ- ২৮৮-২৯০

²⁰⁷ দীপেন্দ্রনাথ নিজেও খুব আহত হয়েছিলেন ১৯৬৪ সালের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনে। বিষ্ণু দে উল্লেখ করেছেন দীপেন্দ্রনাথের সেই অস্থিরতা ও অবসাদের কথা। পরিচয়, *দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯, পৃ- ২২৭

²⁰⁸ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গল্পসমগ্র, একুশ শতক*, কলকাতা, ২০০৫, পৃ- ৪২৬-৫২

²⁰⁹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ১৭৮

²¹⁰ ইলিয়াস শ্রমজীবীর রুচি-সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যবিত্তের রুচি-সংস্কৃতির তুলনা করছেন। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও যে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে শ্রমজীবীর ভাষা-সংস্কৃতি-মূল্যবোধকে নিজেদের শ্লীল-অশ্লীলের ছাঁদে ঢেলে সাজিয়ে সাহিত্যে প্রকাশ করতে চান, সেই ব্যাপারে মন্তব্য করছেন। ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, পৃ- ৩২-৩৪

²¹¹ ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, *বাঘের বাচ্চা*, পৃ- ৬৪

²¹² আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ১৯৩, ১৯৯

²¹³ ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, পৃ- ২৩-৩৪

²¹⁴ ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, *প্রাণ্ডু*, ৫৯। আর, ইলিয়াস এই অংশেই বলেন যে, খিজির শহুরে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বহু ‘ক্যারেঙ্টার’ ঢুকে বসে আছে।

²¹⁵ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিবাহবার্ষিকী*, পৃ- ২৩১-৩২

²¹⁶ তমিজের সঙ্গে তমিজের বাপের সংলাপ। *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ- ২৪৫-৬

²¹⁷ ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ৩২৮-৯

²¹⁸ “Tamij also etches the real consciousness, the real praxis and the real Utopia”- Subhoranjan Dasgupta, *Elegy and Dreams*, p. 65

²¹⁹ ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ৩৬-৭

²²⁰ তদেব, পৃ- ২৫৫

²²¹ দেবেশ রায়, *বাংলা উপন্যাসের নতুন ধারার খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ৮৭

²²² আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ৩২৬-২৭

²²³ নিরুপমের সঙ্গে সুকান্তির কথোপকথন পার্টি নিয়ে ও তত্ত্ব নিয়ে, *আটটা নটার সূর্য*, পৃ- ২১৮-১৯

²²⁴ তদেব, পৃ- ২৮৫

²²⁵ ‘Engels’ letter to Margaret Harkness’, April 1888, Marx-Engels Correspondence 1888, marxists.org

²²⁶ Janet Wolff, ‘Aesthetics’, *A Dictionary of Marxist Thought*, Tom Bottomore (Ed.), Maya Blackwell, New Delhi, 2000, pp. 6-7

²²⁷ Labour *with the same content* can therefore be both productive and unproductive. Milton, for example, who did *Paradise Lost*, was an unproductive worker. In contrast to this, the writer who delivers hackwork for his publisher is a productive worker... for his product is from the outset subsumed under capital, and comes into being only for the purpose of

increasing that capital. Source- Productive and Unproductive Labourer, Capitalist Production as the Production of Surplus Value, 'Economic Works of Karl Marx (1861-64)', marxists.org

²²⁸ অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, *আটটা নটার সূর্য*, পৃ- ২১৮-১৯

²²⁹ চারু মজুমদার ও সুশীতল রায়চৌধুরী সিপিআই(এম-এল) পার্টির অন্যতম দুই প্রতিষ্ঠাতা এবং সিপিআই(এম) পার্টির সঙ্গে নিরন্তর মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানোর নেতৃত্ব। ১৯৭০ সাল থেকে শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ও শহরের গণআন্দোলনের প্রশ্নে দু'জনের মতপার্থক্য হয়।

²³⁰ নীল কমল সরকার ও রাজীব চৌধুরী সম্পাদিত অক্ষরেখা পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, কলকাতা, ১৮৬-৮৭

²³¹ নবারণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৬৪-৬৫

²³² নবারণ ভট্টাচার্য, 'ব্যক্তিগত ফিউচারিজম', *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, ১০০

²³³ সেখ মোফাজ্জল হোসেন, নবারণের আখ্যান বিশ্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ- ১১১

²³⁴ তারক সরকার, 'হারবার্টঃ এক মানবিকচীটের গল্প', সংবীক্ষণ, সম্পা. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২০০৩, পৃ- ১১

²³⁵ নবারণ ভট্টাচার্য সাক্ষাৎকার, আফসার আমেদ ও অনিশ্চয় চক্রবর্তী সম্পা. *আখ্যান ১*, ১৯৯৬, পৃ- ৬০

²³⁶ প্রধান তিন ফ্যাতাডু মদন, ডিএস ও পুরন্দর ভাট। ডিএস শেয়ার বাজারের দালাল, মদনের নির্দিষ্ট পেশা নেই হরেক রকমের জুয়া বা দালালি ইত্যাদি এবং পুরন্দর ভাট রোজগারহীন কবি।

ফ্যাতাডুদের প্রধান লক্ষ্য ‘ড্যামেজ। পারলেই ড্যামেজ করো’। লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের সংজ্ঞায় খাপ খেয়ে যায়।

²³⁷ বাণিজ্যিক পত্রিকাগোষ্ঠীর অধীনে সাহিত্য কীভাবে পুঁজিবাদী-মতাদর্শমুখী হয়ে যায় নবাবুণ তা বলছেন। ‘রাজনৈতিক শান্তিকল্যাণ রক্ষা করা’র উদ্দেশ্যে এই সাহিত্য ফর্মুলা মেনে রচিত হচ্ছে। বিশ্বায়নী পর্বে পুজোসংখ্যা গুলির সাহিত্যে গুণমানগত বদলই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। নবাবুণ ভট্টাচার্য, ‘এটা বাজার, হাট নয়’, *আনাড়ির নাড়িজনন*, পৃ- ১৩৪-৬

²³⁸ গ্রাম ও মফস্বলের ছাত্রযুবরা সক্রিয় দ্রোহী ছিল এবং শহীদ হয়েছিল কিন্তু “মফস্বলের খারাপ ছাত্রদের জীবনদান তেমনভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে নাড়া দেয়নি” শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে, *ঘাট-সত্তরের নদীয়া*, প্রাককথন। আদতে এই ‘হায়ারার্কি’র বয়ানকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে কমিউনিস্ট দ্রোহের ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

²³⁹ বিরাসমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রী শ্রী, চেরাবান্ডা রাজু, ভারভারা রাও, গদর প্রমুখ। ১৯৪০ দশকের প্রগতিবাদী সাহিত্যধারার অভ্যুত্থান রচয়িতালা সঙ্ঘম এবং ১৯৬০ দশকের দিগম্বরী সাহিত্যধারার বহু উপাদান বিরাসমের মধ্যে ছিল। প্রগতিবাদী সাহিত্যধারা থেকে বিপ্লবী সাহিত্যধারার এই উত্তরণ ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

²⁴⁰ নয়ন সেন, ‘কেন লেখা? গতকাল আজকাল আগামীকাল’, প্রতিভা পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় ও সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৪

²⁴¹ এই সংস্কৃতি দেশের মূল জনগণের (শ্রমিক-কৃষক) জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এই সংস্কৃতির সঙ্গে সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ অঙ্গঙ্গী, তাই একই সঙ্গে এটি জাতীয় সংস্কৃতি এবং বিপ্লবী সংস্কৃতি। নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ- ৭৮-৭৯

²⁴² তদেব, পৃ- ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

আখ্যানধর্মে বিবর্তন- বৈশিষ্ট্য, নতুন উপাদানসমূহ এবং প্রত্যাশ্বানের ধরন

বাংলা রাজনীতিকেন্দ্রিক আখ্যানের গড়ন-গঠন বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আখ্যানকারদের আখ্যানে কীভাবে আখ্যানের বিবর্তন সম্ভব হচ্ছে? কোন কোন উপাদানগুলি উপন্যাসের গড়ন-গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটচ্ছে? ভূত কীভাবে রাজনৈতিক আখ্যানের তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে? প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কোন কোন উপাদানগুলি বেছে নিয়ে ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসের ফ্যাতাডু-চোজাররা রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চবর্গকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে? তাদের হুল্লুড়ে উদযাপন অতীতের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে সাহিত্যের চেনাছকে অন্তর্ঘাত ঘটচ্ছে কীভাবে? উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ এবং প্রগতিবাদী সাহিত্যপদ্ধতি থেকে ভিন্ন আখ্যাননীতি কেন বেছে নিচ্ছেন? কী বলা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছে এই দু’টি মূলগত প্রশ্নের থেকেও কি কে বলছে তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর, ‘কে বলছে’ তাতে দৃষ্টিনিবদ্ধতা (focus) কেন্দ্রীভূত বলেই কি প্রচলিত আখ্যানধর্ম প্রত্যাশ্বায়িত (challenged) হচ্ছে? আখ্যানস্থ সত্যের উপস্থাপনায় প্রচলিত উপন্যাসধর্মে ঘাটতি থাকছে বলেই কি তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের নীতি প্রয়োজন হচ্ছে?

নির্বিন্দ-নিম্নবর্গ-নিপীড়িত লিপ্সের জনজীবনের গভীর প্রতিক্রিয়া যে সমস্ত উপন্যাসকে রাজনৈতিক ক’রে তুলেছে, তার মধ্যে অনুরূপ উপাদান (shared element) ক্ষুধা। একলব্য ঘোষের ‘হাবা’¹ গল্পে ক্ষুধা ও খাদ্য অঙ্গঙ্গী হয়ে থাকে। ক্ষেতমজুর হাবা চুনো মাছের আশায় ঘোরে, তার বউ চালের জোগাড় করতে বেরোয়; এবং এই খিদের তাড়নাই তাদের ‘গরিবির অবস্থা ওলট-পালট’ করার দিকে এগিয়ে দেয়। ‘নকশাল’ হিসেবে তাদের ভূমিকা একাধারে অপ্রত্যক্ষ এবং

সাহায্যকারীর। নকশাল দ্রোহীদের আশ্রয় দেয় তারা এবং রাজনীতির পাঠ নেয়, যা খিদের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। শৈবাল মিত্রের ‘সংগ্রামপুর যাত্রা’ গল্পে থাকে পিছুরুদ্দির কথা।^২ পিছুরুদ্দি গ্রামীণ ভারতবর্ষের নিম্নবর্গ-নির্বিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, যে মধ্যবিত্ত অমিয়দা এবং কথকের চেতনায় ‘খিদে’ শব্দটাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করায়। “মোর উপোস করার অভ্যেস আছে। শুধু মোর কেন, গোটা পরিবারের আছে। মোর বাপ, ঠাকুর্দাও উপোস দিয়েছে বহুদিন। তবে মা হল বড়লোকের মেয়ে। তাই আজো তার যখন-তখন ক্ষিদে পায়।” (মিত্র ২০১৮, ১১১) সুস্থ শরীরে প্রবল খিদেয় তাদের ‘উপোস’ করার রোজনামাচায় অমিয়দা ও কথক অভ্যস্ত নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন?’ গল্পে দুর্ভিক্ষের সময় যোগীর সাথে চলতে ও যোগীদের খিদে বুঝতে বেগ পেতে হয় বাবুকে। যোগীর খিদে সম্পর্কিত সন্দর্ভ ‘বাবু’দের তাত্ত্বিক সন্দর্ভকে আক্রমণ ক’রে চলে অন্তর্লীন বয়ানে। যোগী ডাকাত, তার ডাকাতি ধান-চাল লুণ্ঠের জন্যে এবং সেই ‘বেকানুন’ দিয়েই খিদের সঙ্গে মেশানো দ্রোহতত্ত্ব অনুশীলনের চেষ্টা করে; “না খেয়ে মরছে যারা তাদের শেখাতে হবে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচতে”^৩ যোগীর ক্ষিদেনিবৃত্তির তত্ত্ব-অনুশীলন সমাজবদল ও শ্রেণিসচেতনতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। যোগী খিদে ভুলতে চায় না, ত্রাণের খিচুড়িতে শান্ত থাকতে চায় না বরং আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার গোড়াকে চিহ্নিত করতে চায়। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র বাঙ্গু-বৈশাখুর কথোপকথনে খিদে ভুলে থাকার জন্যে বানানো নিত্যনতুন গল্পের হৃদিশ পায় পাঠক। ‘খোয়াবনামা’-তে কুলসুমের খিদে-ভোলার পদ্ধতি খাদ্যের নান্দনিকতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পূর্বধারণাকে নস্যাত্ত্ব ক’রে দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় শেখা খাবারের গন্ধের কথা ভেবে পেট ভরানোর কৌশল বাকি জীবনেও প্রায়ই প্রয়োগ করে কুলসুম। বাংলা রাজনৈতিক গল্পে-উপন্যাসে খিদের মুহূর্ত বারবার এসেছে এবং তা আখ্যানের রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ করেছে। শৈবালের গল্পে কথকের উপলব্ধি, “সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় পাঁচপো আটা, আলু, ভেলিগুড় এবং ভারতীয় বিপ্লব সমান জরুরী” (মিত্র ১১২) ভারতীয় রাজনৈতিক পরিসরের ধারণাকে বিস্তৃত করে এবং বাস্তবোচিত করে। মানিকের গল্পে যোগীও খিদের সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের সম্পর্ক আবিষ্কার করে

দুর্ভিক্ষের বাস্তবতায়, “একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেতে বাঁচার তাগিদও কিমিয়ে যায়। দুচারদিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুদিন খেতে না পেলে ফের কিমিয়ে যায়।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০) যোগী তার নিজের পথে ক্ষুধামুক্তির উপায় খুঁজতে চায়; সেই উপায় বাবুদের নৈতিকতার সঙ্গে বা ক্ষমতাকাঠামো-নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধের সঙ্গে না মিললেও কিছু যায় আসে না যোগীর। নবাবুগ তঁর প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি (১৯২৯)’ ও ‘আরণ্যক (১৯৭৬)’ উপন্যাসদুটিকে পড়ছেন ক্ষুধার দলিল হিসেবে।^৪ ‘পথের পাঁচালী’ তঁর কাছে এক নিয়ন্ত্রিত দুর্ভিক্ষের প্রবহমান কাহিনি এবং আখ্যানের সব মৃত্যুই ক্ষুধাজনিত অপুষ্টির কারণে ঘটেছে।^৫ ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে খাদ্যের হরেক রকম ভাগ হয়ে যায় শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক অবস্থানের বিন্যাস অনুযায়ী। বাংলার চেনা আখ্যানস্থানের বাইরে বাংলা উপন্যাসে বিহারের মানুষের দুর্দশা এবং তাঁদের ক্ষুধা ও বঞ্চনার ‘অসামান্য আখ্যান’ বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন।^৬ ড্যানিয়েল রীস তঁর গ্রন্থে সাহিত্যে খিদে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; ‘খিদে’ মোটিফ হিসেবে যে যে উপন্যাসে লেখকদ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, তার সংরূপ ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছেন। খিদে কীভাবে পাঠ্য ও পাঠ্যাভুক্ত প্রটাগনিস্টদের নির্মাণ ক’রে নেয় তাইই শুধু নয়, বরং আধুনিক সাহিত্যপরিসরে খিদে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে, তাই নিয়েও আলোচনা করেছেন। জেমস ভের্ননের ‘Hunger: A Modern History’ বইতে ক্ষুধা কীভাবে রাজনীতি হয়ে ওঠে, তার আলোচনা আছে।

Vernon examines the shift in the perception of hunger as being an individual problem to the perception of it being a matter of politics, as well as the view that the poor and underfed were no longer simply idle, but victims of forces beyond their control. Vernon sees hunger as a material and cultural phenomenon, and yet argues that it has increasingly developed a strong political dimension, as food and

nutritional matters have become entrenched in issues of class. (Rees 2016, 1)

ক্ষুধা শুধুমাত্র একটি সামাজিক রাজনীতিই নয়, বরং সাহিত্যের রাজনীতিরও অংশ। কুন্ট হামসুনের ‘ক্ষুধা’ উপন্যাসগুলি আলোচনা ক’রে রীস মূলতঃ ক্ষুধার বিষয়ীগত উপস্থাপনা এবং ধারণাসঙ্গতি খুঁজতে চেয়েছেন- দু’টি মূল ক্ষেত্রের ওপরে জোর দিয়েছেন। প্রথমতঃ, শরীর ও মনের সঙ্গে সম্পর্কে ক্ষুধার অস্তিত্ব। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিকতার শর্তমধ্যে লেখকের দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান এবং ক্ষুধা ও শিল্প কীভাবে তাঁদের লেখায় প্রতিফলিত হচ্ছে।⁷ ১৯৭০ সালের পরবর্তী সময়ের বাংলা রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাসে ক্ষুধা কীভাবে আখ্যানের বিষয় ও গড়ন-গঠন হয়ে উঠছে, সেই বিশ্লেষণে আসা যাক।

খিদে-সাহিত্য ও তার উপাদান

‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে এপার বাঙলার উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী মানুষদের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত। চ্যারকেটু, খেতখেতু, টুলটুলি, বেঙ্গা; এখানেও বংশপরম্পরায় সেই অনাহার ও খিদের কাহিনি। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে ‘বিগত তিনদিনের বাসি খিদে ও আগামী ক’দিনের অনিশ্চিত ক্ষুধা’ মোটিফ হিসেবে ফিরে ফিরে আসে প্রতিটি অধ্যায়ে। ‘বৃত্তান্ত’ শুরু হয় কার্তিক মাসের শেষ রাতের বর্ণনা দিয়ে। চ্যারকেটু ও তার পরিবার ধানের দুধ শুকিয়ে শক্ত না-হওয়া অবধি খিদের সাথে যুঝে চলবে। বিগত মরসুমের সংস্থান শেষ। আপাততঃ তাদের হালের গোরু বিক্রি করতে হবে। উপকরণগুলো বাঁধা রাখতে হবে। তবে কয়েকদিনের খাওয়া জুটবে। একদিনের এই ‘বৃত্তান্ত’-তে চ্যারকেটু সেই গোরু বেচে অন্ন-সংস্থানের পথে কী কী ঘটনার সম্মুখীন হয় সেই কথা রয়েছে। আখ্যানের চতুর্থ ভাগে আসে টুলটুলির কথা। খিদের দিনগুলোতে বুনো ওল, আলু খুঁজে আনে সে। তার চিন্তায় শুধু তিন ছেলেমেয়েকে খাওয়ানোর চিন্তা, আগামী কয়েকদিন ধান না-পাকা

অবধি সংসার চালানোর চিন্তা। তার পাহাড়ের খাঁজ, জঙ্গল ইত্যাদি দুর্গম স্থান থেকে আলু, কচু খুঁজে আনার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায় খিদেমাখা চিন্তার ভাষা, “বুনা আলু বা ওন্দা কচু এত বড় হবা ধরিলে এই একোটা দিয়া তো হামরালা তিনজন পুরা মানষির আধপেটা আর তিন বাচ্চার একবেলা পুরা পেটা আর একবেলা আধপেটা হবা পারে।” (রায় ১৯৮৯, ৬০) বেঙ্গু বৈশাখু আর চার বছরের খেতেশ্বরীর গেলাসভর্তি ভাতের ফ্যান খাওয়ার দৃশ্য বর্ণনায় প্রলম্বিত করেন লেখক। নৈর্ব্যক্তিক পরিসর থেকে লেখক যে বর্ণনা দেন, তাতে নিষ্ঠুরতা, অসহায়তা ও অনন্ত খিদেকাতরতার ভাষা মিশে থাকে। একটাই তোবড়ানো গেলাস থেকে তিন শিশুর ফ্যান খাওয়ার দীর্ঘ বর্ণনা দীর্ঘায়িত করার কথকীয় যুক্তি তাদের খিদে-মেটার প্রত্যাশার প্রতিরূপ তৈরি করা (খিদে না-মেটার বাস্তবতার প্রতিরূপও তৈরি হয়)।^৪ “খেতেশ্বরীর জিভের জলে গেলাশের ভেতরটা জলজলে হয়ে থাকে। সেটাই খেতেশ্বরী চেটে যাবে, গেলাশটা নামালেই খাওয়া শেষ হয়ে যাবে- এই ভয়ে” (৩৩) বেঙ্গু আর বোশেখু সারাদিন খিদে তাড়ায় এক নিজস্ব উপায়ে; প্রত্যাশা, না-পাওয়া, খিদে আর আগামী স্বপ্ন মিলেমিশে তাদের বালকবয়ানে এক অন্য কথন তৈরি করে নেয়। বৈশাখু আর বেঙ্গু ভাত আর দুধের গল্প বলে, এ তাদের স্বপ্নের খাবারের গল্প, “হয়, হয়, অ্যানং নম্বা করিম এক্কেরে সন্ঝাবেলায় ঠেকাম” (৪৫)- কারণ, টেনে-টেনে লম্বা করা গল্প সন্ধ্যাবেলায় শেষ হলে সারা সকাল-দুপুর-বিকেল তারা গল্পে গল্পে খিদে ভুলে থাকবে। তাদের কথোপকথন পাঠককে সমাজের একটি বহুআকাজ্জিত মানবিক দিনের ইঙ্গিতে পৌঁছে দেয়, যেখানে ব্যক্তিসত্তা নয় যৌথসত্তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।^৫ সেই যৌথসত্তার সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভবিষ্যৎসমাজের নান্দনিক অভিব্যক্তি বেঙ্গু আর বৈশাখুর প্রশ্নোত্তরে- সগার বাছুর, সগার বাঁটত দুধ, কোনো বাছুরের পেটত ভুখ নাই এবং একোর বাছুর সগার বাছুর। গল্পকথনের ভাষার শেষে লেখকের স্বর শোনা যায়, “বহুবার বলা, বহুবার শোনা গল্পটা বৈশাখু আর বেঙ্গুর গলায় গলায় নতুন হয়ে যায়। এখন কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতে উপকথার নতুন জন্ম হচ্ছে” (৪৭) আর, এই উপকথার নতুন জন্ম পাঠককে ক্রমশঃ তার এতদিনের চেনা আখ্যানবৃত্ত

থেকে দূরে নিয়ে যায়। ‘বিপরিচিতিকরণ’ বা, defamiliarization ঘটতে থাকে পাঠচেতনায়। পাঠক সাধারণতঃ সুখী, সে অল্প-আলোর সংস্থান নিয়ে সাহিত্য পাঠ করে। সেখানে এই খিদে-তাড়ানোর ভঙ্গি, খিদের স্বর তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। গেলাশের গায়ে খেতেশ্বরীর দাঁতের ঘষা ও জিভের চুকচুকে শব্দের সঙ্গে শেয়ালের হাড় চিবোনোর শব্দের তুলনা খেতখেতুর পরিবারের বেঁচে-থাকার আদিম চেষ্টার উপমা।¹⁰ মানুষের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে পশুর জীবনসংগ্রামের বস্তুতঃ কোনও ফারাক নেই সেটা শব্দ-দৃশ্যের বীভৎসতায় বোঝানোর চেষ্টা করে কথক। বৃত্তান্তের পঞ্চম অধ্যায় জুড়ে খেতখেতুর বয়ানে খিদে, শোষণ ও জমিহরণের সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত। পেটের আলসার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আর পরিবারের জন্যে কয়েকদিনের ধান জোগাড় করার চেষ্টা খেতখেতুর চিন্তা ও ভাষার অন্দরে ঢুকে পড়ে-

আলসার ফেটে মুখ দিয়ে গলগল করে পড়া রক্ত, এই ধান-মাড়াইয়ের জন্য তৈরি জায়গাটায় তাজা রক্ত অবস্থাটাকে এত দ্রুত পালটে দিত যে তখন খেতখেতুকে ভাবতেও হত না, কথা বলতেও হত না- রমণী পঞ্চণয়েতকেই যা করার করতে হত। হয়ত ধান দিত (রায় ১৯৮০, ৮৮)

বৃত্তান্তের শেষে এক পরাবাস্তব বর্ণনা, গোরুর পিঠে চেপে সমস্ত মিছিলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চ্যারকেটু। সারাদিনেও সে অল্প সংস্থান করতে পারেনি, সারাদিনের এত মিছিল, এত রাজনৈতিক বক্তব্য তার খিদে মেটাতে পারেনি এবং তাকে আগামী নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। “কার্তিকের জ্যোৎস্না আর কুয়াশাতে সে দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখে- ধানের ভেতর দুধ জমাট হচ্ছে, এখন, কার্তিকের এই হিমে, কুয়াশায়, বাতাসে।” (রায় ১৯৮০, ১৯৫) বৃত্তান্ত শেষ হয় সেই না-মেটা ক্ষুধার দীর্ঘতর কাহিনির ইঙ্গিত রেখে। আর, চ্যারকেটু, টুলটুলিরা সমাজের বৃহত্তর অংশের অনিশ্চয়তা, খিদে ও শোষণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিভাত হয় কার্তিক মাস ও ধানের গন্ধের রূপক সামনে রেখে। এখানে ইতিহাস জেগে থাকছে দেশের বীক্ষাগত সংহতির ভেতর।

দেবেশ রায় যখন তাঁর মফঃস্বলি বৃত্তান্ত উপন্যাসের মাধ্যমে চ্যারকেটু চরিত্রের ক্ষুধার সঙ্গে গাছ পাতা ডাল শিকড় প্রকৃতি হয়ে নিজেই সত্তাগত অবলোপে মিশে যেতে থাকেন- তখন বোঝা যায়- উভয়ের এই তৃণভূমি, ধানগোছা, জ্যোৎস্না ও নিসর্গনির্ভর বহুস্বরিক ডিসকোর্স বিশ্বায়নজাত বিনোদনপ্রক্রিয়ার বাইরের জীবনচরিতেই ক্রমাগত স্বস্তি খুঁজছে।

(সেনমজুমদার ২০০৭, ৬৯)

খেতখেতু টুলটুলিদের ধান-খিদের আখ্যান রাম রায়ের ‘প্রতিরোধ (১৯৭৭)’ গল্পের কেষ্ট-নন্দ-রামপদদের যাপনের সঙ্গে সাযুজ্য রাখে। মহাজন গোকুলের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের বিরোধ গল্পের মূল উপজীব্য এবং গ্রামের ধান শহরে পাচার করার মহাজনীয় দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে ‘এ ধান মোরা শহরে যেতে দেব না’ বলে সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তোলে ক্ষেতমজুররা। তাদের সংলাপ, “শীতে সোনালী ফসল মাঠে দেখা যায়, কিন্তু তারপর যে কোথায় যায় কেউ জানে না। সারা বছর চাষীর ভিটেতে শেয়াল কাঁদে। অনাহারে মানুষ মরে।”¹¹ সংলাপের সঙ্গে ‘মফঃস্বলি বৃত্তান্ত’-র ক্ষেতমজুরদের অনাহারক্লিষ্ট সংলাপ মিলে যায়। চ্যারকেটু টুলটুলির মতোই একমাস ক্ষুৎকাতর থেকে ‘জোয়ানমদ’ রামপদ পড়ে মরে যায়- প্রগতিবাদী সাহিত্যের পরে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার সাহিত্যকরণ ঘটছে সত্তর দশকে এসে। আর, এই নব্য সাহিত্যকরণ আরও স্পষ্ট, শাণিত এবং দিশাসম্পন্ন। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’ সেই অভিমুখকে স্পষ্ট করে আরও; এবং ‘অগ্নিগর্ভের’ মধ্যে থাকা উপন্যাস ও গল্পগুলিতে ক্ষেতমজুরদের খিদের আখ্যান ফল্গুধারায় বইতে থাকে। ‘দ্রৌপদী’ গল্পে সূর্য সাউয়ের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের আদিবাসী ক্ষেতমজুররা সংগঠিত হয় জমি ও খিদের প্রশ্নে, কারণ সূর্য সাউ সেচের জল না ছাড়ায় চাষের ক্ষতি ও অনাহার বাড়ছিল। তৃষ্ণা খিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষে জলেরও রাজনীতি আছে। মহাশ্বেতা ‘জল’কে পুনরাবৃত্ত মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করেন ‘অগ্নিগর্ভ’ বইতে। ‘জল’ গল্পে দ্রৌপদী, টুলটুলি, বেঙ্গু, বৈশাখুদের খিদের আখ্যান প্রসারিত হয় জলের অভাববোধে। একসঙ্গে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় বেঠবেগারদের সংকট ও জাতপাতের রাজনীতিকে উপস্থাপন করেন মহাশ্বেতা। প্রশাসনের কাছে ‘জল অ্যাজিটেটরদের

তৈরি একটি ইস্যু মাত্র', জল সন্তোষ পুজারীর মতো উঁচুজাত ব্রাহ্মণের কাছে কুক্ষিগত ক'রে রাখার মতো 'বস্তু' মাত্র কিন্তু এই জলই ধুরা, মঘাইদের কাছে জীবন ও প্রকৃতির দ্যোতক। শ্রেণি ও বর্ণের বৈষম্য এই জলের রাজনীতি দিয়ে আখ্যায়িত করতে মহাশ্বেতা গল্পের প্রচলিত আগ্নিকে ও কথকের ভঙ্গিতে ভাঙচুর করতে থাকেন বারবার। জিতেন মাস্টারের ভদ্রলোকের ভাষার সঙ্গে মঘাইদের অপরিশীলিত 'কাঁচা' ভাষার সংঘাত বাধে, কিন্তু প্রশাসন ও জোতদার সন্তোষের চোখে জিতেন, ধুরা, মঘাইরা প্রত্যেকেই সন্ত্রাসবাদী নকশাল বলে পরিগণিত হয়। আর, নীরবে বইতে থাকা খিদেবৃত্তান্তের এই আখ্যানগুলিতে মহাশ্বেতা বারবার গল্প থেকে বাস্তবে, কাল্পনিকতা থেকে তথ্য-নথির বিবরণে টেনে নিয়ে যান সাহিত্যকে তথা পাঠককে। চ্যারকেটুর ওই পরাবাস্তব ধুরা, দোপ্‌দীদের অতিবাস্তবে বদলে যায়। একইসঙ্গে লৌকিক বিশ্বাস আর মুখফেরতা আখ্যানকে 'অগ্নিগর্ভ'-র উপন্যাস গল্পে সাজিয়ে নেন, যেখানে তৃষ্ণার ও সেচের জলের জন্য আর্তি ক্রমেই প্রতিরোধে বদলাতে থাকে। মঘাই বিপন্নতার ভাষায় তাদের সম্প্রদায়ের অলৌকিক ভাষার উচ্চারণ মিশিয়ে যে মন্ত্র পড়ে, তাতে জলের দেবীর ক্ষুধার প্রতি নৈবেদ্য থাকে- "তার আঁজলা থেকে চাল-চিনি-ঘি খসে পড়ে" (দেবী ১৩৮৭, ১৮২)। আর, এই মঘাই ডোম যখন 'মনসার ধ্বজার বাঁশ' নিয়ে পুলিশের দিকে ছুটতে থাকে, তখন চ্যারকেটুর ওই গোরুর পিঠে চেপে দিক্‌বিদিক ছুটে যাওয়ার সঙ্গে তফাৎ থাকে না। মহাশ্বেতা শুধু এর একটা পরিণতি দেন মঘাই ও ধুরাকে প্রশাসনের চোখে 'উগ্রপন্থী নকশাল' সাব্যস্ত ক'রে এবং তাদের মৃত্যুদৃশ্য এঁকে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসেও খিদের অনন্ত আখ্যান। কুলসুম, তার ঠাকুর্দা চেরাগ আলি, তমিজের বাপ, তমিজ এবং তার মেয়ে সখিনা- খিদে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। সামাজিক-রাজনৈতিক বহু ঘটনা বা ইভেন্ট ঘটে যায় দেশভাগ, ক্ষমতা-হস্তান্তর, নয়া রাষ্ট্রগঠন, নতুন ক্ষমতাসীন শ্রেণি; কিন্তু, বদলায়না শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের রোজনামা, ভাগচাষীদের অনাহারের বৃত্তান্ত। 'খোয়াবনামা'-তে গোরু-হাল সমস্তই তমিজ, হরমতুল্লা, যুধিষ্ঠিরদের নিতে হয় শরাফত মণ্ডল বা জগদীশ সাহার থেকে। টাকা জমিয়ে নিজের গোরু,

হাল কেনার খোয়াব তাদের বারেবারে আসে কিন্তু সে খোয়াব বাস্তবতা পায় না। বাস্তবে যেমন উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক, দলিত কৃষকেরা আর্থ-সামাজিক ঋণে বাঁধা থাকে বাহেবাবুর কাছে, তেমনি তাদের ‘মালিক’ শরাফত। কালাম মাঝির কাছে তমিজের বাপের জমি-ঘর এবং পরে জীবিকার মাছচাষের কাৎলাহার বিল বাঁধা থাকে। উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই অর্জিত ধানে সংসারের ভরণপোষণ এবং আগামীতে ফের ধানচাষের জন্যে প্রস্তুতি- এর মধ্যেই খিদে ফের জেগে ওঠে। কুলসুমের খিদে তাড়ানোর এক আশ্চর্য ভঙ্গি, টুলটুলি বা বাঙ্গু-বৈশেখুর মতোই। সে খাবারের গন্ধ শুঁকে পেট ভরায়!

...(খিদেকে কাবু করার কায়দা) জানে তো জন্ম থেকেই, তবে নতুন ফন্দিটা শিখেছে বছর দুই আগে আকালের সময়। কী রকম সেটা- জোরালো কোনো গন্ধ পেট ভরে নিতে পারলেই পেটটা তার বেশ ফুলে ওঠে। থুথু যতবার আসে একটু জমতে দিয়ে গিলে ফেলতে হবে, তাতে পাতলা ডাল খাওয়ার কাজ হয়। কিন্তু বমি করা চলবে না, বমি হলেই পেট খালি (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩)

কখনো ফাঁকা হাঁড়ি থেকে বাসি গন্ধ, কখনো তমিজের বাপের মুখের পচা আঁশটে গন্ধে, “কুলসুমের জিভ জুড়ে এখন পচা মাছের বাসনা” (২৩), কখনো বা স্নেহ গন্ধের ভাবনাতেই খিদে জয় করে নেয় কুলসুম। খিদে-অন্ন-সুঘ্রাণ এই ‘সুখী’ বয়ানকে বিপরিচিতকরণের মধ্যে দিয়ে বাস্তবে এনে ফেলেন লেখক, পাঠক আবারও অস্বস্তিতে পড়ে চেনা সাহিত্যঝোঁকের বিপরীতে। কালেভদ্রে ভালমন্দ খাওয়া জোটে প্রায়-অর্ধাহারে দিন গুজরান করা তমিজের বাপের। তমিজের বাপ মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার ফলে পায়খানা-বমি করে। কিন্তু ‘হা-ঘরে’ তমিজের বাপের কাছে ‘খাদ্যগ্রহণ’ এমন এক উদ্‌যাপন, যার সামান্যও বদহজম হলে ব্যর্থ হয় তার খাওয়া। সুখাদ্যের সামান্যও যে তার কাছে কত দামি, তা বোঝাতে সচেতনভাবেই ইলিয়াস রসাস্বাদনের চিরাচরিত পদ্ধতিকে বিপরিচিতকরণের দিকে ঠেলে দেন। “পায়খানা করার সময় শরীরের বেআক্কেলে নিয়মে মলদ্বারে খাদ্যবস্তুর স্বাদ একটুও পায়নি, এখন বমি করতে গিয়ে

গলা দিয়ে ওগরানো ভালো ভালো জিনিসের স্বাদ পেয়ে সে একটু চাঙা হয়ে ওঠে” (৩৮)

ইলিয়াস তাঁর আখ্যানকৌশলে রসাস্বাদনের এক ‘বিপ্রতীপ পদ্ধতি’ আবিষ্কার করেন- এখানে নান্দনিকতার নিশ্চয়তাসুখ নেই। ‘পেট খালি হওয়ার হাহাকার’ মিশে যায় বমির শেষবিন্দুতেও কালেভদ্রে খাওয়া ওই ভাল খাবারের রসস্বাদ গ্রহণের মধ্যে। খাদ্যগ্রহণের নান্দনিকতা ভেঙে খানখান হয়ে যায়, আখ্যানকথক পরমযত্নে এই ভাঙার দায়িত্ব নেন। কারণ, খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে শ্রেণিবোধ জড়িয়ে থাকে, নান্দনিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শ্রেণিচেতনা। কুলসুমের দীর্ঘদিনের অনাহারের খিদে-মেটানোর কৌশলে অনিশ্চয়তা এবং সংকটের গভীর মিশেল, তাই খাদ্যের ‘সৌন্দর্য’ নয় বরং আশু খিদেমুক্তির তাগিদটাই বড়¹²। আখ্যানকথক মধ্যবিত্ত-সুস্থিত-নিশ্চয়তাসম্পন্ন পাঠরুচির সঙ্গে কুলসুমের ও তমিজের বাপের দৈনন্দিন সংকটের অনপনয় দূরত্ব রচনা করতে চান বলেই এমন এক অভূতপূর্ব চিত্রকল্প তৈরি ক’রে দেন পাঠকের সামনে, ‘বিপ্রতীপ পদ্ধতি’ ব্যবহার করেন আখ্যানকৌশলে। এক্ষেত্রে ‘বিপ্রতীপ পদ্ধতি’ হিসেবে এটার নামকরণ করছি, কারণ, খাদ্যগ্রহণের ও রসাস্বাদনের চেনা পদ্ধতির ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায় খাদ্যরসাস্বাদন হয় এখানে। তমিজ কিন্তু তার বাবার মতো খিদেসর্বস্ব নয়, বরং খিদে ও খাদ্যগ্রহণের সামঞ্জস্য রক্ষা করে- নিশ্চয়তর ভবিষ্যতের স্বার্থে। বস্তুতঃ, এই সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদেই তমিজ পেশা পরিবর্তন ক’রে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হয় এবং অর্জিত ধান-ফসলের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। অগ্রহায়ণে ধান কাটার পরে তমিজের ভাগে জোটে কণামাত্র ধান; তার লালিত স্বপ্নে জল ঢুকে যায়। কুলসুম নবাগত ধানের গন্ধে সারাবছরের খিদে ভুলতে চায়। কিন্তু, তমিজ বলে, “খালি খাওয়ার চিন্তা! আগে গোরু কেনা লাগবি, হাল নাঙ্গল ইগলান করার পরে খাওয়া দাওয়া।” (১৩২) চ্যারকেটু, খেতখেতুরাও এই সমস্যায় বছরযাপন করে। তমিজদের খিদে মেটে না, মিটতে নেই। তার খোয়াবে জমিদখলের, জোতদার-রাজ উচ্ছেদের প্রতিস্পর্ধা যতই চলতে থাকুক, বাস্তবে শরাফত, আজিজদের জমির মালিকানার কাছে নত হয়েই থাকতে

হয় তাকে। তার খোয়াবে সতত ফিরে আসে আমাদের বহুপঠিত, বহুচিত্রিত ‘গ্রামবাংলার মডেল’ এবং আদর্শ কৃষকজীবনের সুখী-স্বচ্ছল বর্ণনা-

জমি হয়ে আছে মাখনের মতো, লাঙ্গল ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ঢুকে যাচ্ছে দুনিয়ার অনেক ভেতরে, তমিজ সেখান থেকে পানি পর্যন্ত টেনে আনতে পারে। শান্তাহারের গাড়ির ধোঁয়ায় আসমানে এখন আবার লেখা হয় ধানজমির ছবি। কী জমি গো! ধানচারা রুইতে না রুইতে ধানের শীষ বড়ো হয়, ধানের শীষ দুধের ভারে নুয়ে পড়ে নিচের দিকে। জোতদাররা এসেছে পুলিশ নিয়ে। চাষারা তাদের তাড়া করছে কাস্তে নিয়ে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৩০৯)

ধানের চারা রোয়া থেকে ধান কাটা পর্যন্ত ওই খোয়াবে-দেখা ছবিতে তমিজের দীর্ঘদিনের খিদে জড়িয়ে আছে। জোতদারের হাতে সব ফসল তুলে দেওয়া ক্ষেতমজুর থেকে দুই-তৃতীয়াংশ ধান নিজের ঘরে আনার শ্রমমর্যাদা ওই খোয়াবের ভেতর। ক্ষেতমজুর হিসেবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরেও খিদে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির স্বাদ ওই কাস্তে হাতে পুলিশ-লেঠেলদের তাড়া করার মধ্যে। কিন্তু আদর্শ কৃষিজীবনের এই ছবি ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় সমস্ত আখ্যানে। খিদে আর প্রান্তিক-শোষিত জীবন এই দুইকে কেন্দ্রে রেখে আখ্যানের তদুপরি খোয়াবের নির্মাণ ও বিনির্মাণ চলতে থাকে। তমিজ শুধু তীব্র আকাজ্জ্ব্য দিন গোনে তেভাগা-আইন বাস্তবায়নের, ওই খিদে-মেটার খোয়াবই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কৃষকদ্রোহের শরিক হতে। তমিজের মেয়ে সখিনাও কিন্তু সেই বংশপরম্পরা ক্ষুধার শরিক হয়ে পড়ে। ফুলজান সেই খিদেয় লাগাম পরায়, “তবে এখন ওকে (সখিনাকে) ভাত দেওয়া চলবে না। এখন খেলে রাত না পোহাতেই বেটি বিছানায় শুয়ে ঠেলতে শুরু করবে ফুলজানকে” (৩৩১) ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র শেষ বাক্যটি ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসেরও শেষ বাক্য হতেই পারে- “চারকেটু এখনো দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে চলে যেতে পারে” (রায় ১৯৮০, ১৯৫) ‘খোয়াবনামা’র শেষ অংশে সেই ইঙ্গিতই তো দিচ্ছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, “ভাত খাওয়া ছাড়া ছুঁড়ি আর বোঝে কী”, ‘জোনািকির শিখায় চাঁদের

ওপরে সেদ্ধ আউশের চালের ভাতের গন্ধে সে পেট ভরাক’; সখিনা, চেরাগ আলি, বাঘাড় মাঝি, তমিজের বাপের উত্তরাধিকারী এবং সমস্ত বাংলাদেশের প্রান্তিক-শোষিত মানুষের প্রতিনিধি হয়েই ‘জোনাকির হেঁসেলের দিকে’ তাকিয়ে থাকে। খিদেই কি এই উপন্যাস দুটিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ কুশীলব হয়ে উঠছে না?

খিদে ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানকে কাবু ক’রে ফেলে আবার জাগিয়েও রাখে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই। তমিজের বাপ আর কুলসুমের খাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে আখ্যানকথক স্বাদেন্দ্রিয়ের সঙ্গে আরেকটি ইন্দ্রিয়কে যোগ করেন, তা হচ্ছে ঘ্রাণ। কুলসুম কাল্পনিক ঘ্রাণের সঙ্গে থুতু গিলে নিয়ে কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় পেট ভরায়, সেই আলোচনা করেছি। এবার দেখা যাক, তমিজের বাপের খিদে ও খিদে-মেটার বর্ণনা। তমিজের বাপ কালেভদ্রে ভালমন্দ খায়। শাপলার ডাঁটার মরিচ আর রসুন দিয়ে “কুলসুম কী সুন্দর চচ্চড়ি রেঁধে ফেলে। একটু চচ্চড়ি হলে পোড়া মরিচ কয়টা ডলে নিয়ে তমিজের বাপ তিন সানকি ভাত সেঁটে ফেলে একাই” (ইলিয়াস ১৫) তমিজের বাপ ‘পেট ঠাণ্ডা’ হলে তবেই প্রচুর ঘুমোয় এবং খোয়াব দেখে এবং খোয়াবে বিড়বিড় ক’রে শোলোক বলে। কুলসুমের উপোস, শাপলা-মরিচ-রসুন দিয়ে কুলসুমের রাঁধা তরকারি এবং পরিতৃপ্ত তমিজের বাপের ঘুমের ভেতর খোয়াবের মধ্যে অদৃশ্য যোগসূত্র থেকে যায়। লেখক তার ধরতাইটুকু দেন, কিন্তু পাঠক সেই যোগসূত্রকে আবিষ্কার করে যখন শোলোকের সূত্র ধরে চেরাগ আলির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। তমিজের বাপের ঘুমঘোরে মুনসি তাকে শাসন করে। কুলসুম-তমিজ-তমিজের বাপের অর্ধাহার অনাহারের জীবনে খাবারের খোয়াবই বা কম কী? কাৎলাহার বিলের ট্যাংরা মাছ ধরে এনে “খিয়ারের চিকন চালের ভাত, চিরল চিরল করে কাটা এলোকেশী বেগুনের সঙ্গে খুব ঝাল দিয়ে রাঁধা চচ্চড়ি, মাসকলায়ের ডাল আর নতুন আলুর ভর্তা” (১৯) কুলসুম তমিজদের নিম্নবর্গীয় যাপনে উৎসবের উত্তেজনা এনে দেয়। ক্ষুধার্তের দৈনিক অর্ধাহারের নিয়মে জেয়াফত বেনিয়মের মতোই, শাপলা-মরিচ দিয়ে একবেলা ভাত খাওয়া তমিজের বাপের কাছে পেটপুরে গোস্তু-ভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ উৎসবের সমান। জোতদার-

মনিবের নাতি হুমায়ূনের চল্লিশায়¹³ জেয়াফত পাওয়া তমিজের বাপ তা পূর্ণমাত্রায় উদ্‌যাপন করে; যদিও, এই উদ্‌যাপনের নান্দনিকতা কিংবা আহারের নান্দনিকতা নিয়ে যাবতীয় পাঠসৌন্দর্য চুরমার হয়ে যায় তমিজের বাপের গোথ্রাসে খাওয়ার বর্ণনায়। কিন্তু, তমিজের বাপ বা আখ্যানকথকের কাছে আহারের নান্দনিকতা নয়, খিদে-মুক্তির প্রবল বাসনাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তখন মোটা একটা হাড় থেকে মজ্জা বের করার কাজে তমিজের বাপ খুব ব্যস্ত, গফুর কলুর নির্দেশ মানা তার পক্ষে অসম্ভব। বরং, গফুরের হুমকিতে তার খিদে বাড়ে দশ গুণ এবং মজ্জা চোষা স্থগিত রেখে ভাত মুখে দিতে থাকে, তখন তার একেকটা গ্রাস তেআঁটিয়া তালের সমান... তা তমিজ তো কিছুক্ষণ আগে নিজেই বাপকে পাত ভরে ডুমা ডুমা গোশত ঢেলে দিয়েছে। গোয়ালঘরের পেছনে এক পেট খেয়ে বাপকে ফের এখানে বসতে দেখে তার হাসিই পায়ঃ বুড়াবেটার খাবার হাউসটা একটু বেশি। তা খাক, বুড়ামানুষ, এরকম খাবার ফের কবে জোটে আল্লাই জানে। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৯৮-৯)

তমিজের বাপের খাওয়ায় কোনও রাখঢাক নেই। মাঝিপাড়া আর কলুপাড়ার জন্যে আলাদা আসন পাতা হয়েছে এবং সেই আসন উচ্চবর্ণীয় ‘মেহমান’দের থেকে অনেক দূরে (অনাদরেরো বটে) পড়েছে। নিম্নবর্ণের তথাকথিত চাষাভূষো, মাঝিজেলেরদের খাবার ‘হাউস’ বেশি; সেইজন্যেই তাদের জন্যে আলাদা হাঁড়িতে গোশত-ভাতের ব্যবস্থা করেছিল শরাফত। কিন্তু, জোতদার শরাফত মণ্ডল এই যে নাতির চল্লিশায় উদারহস্ত হল, তারই শাসিত বর্গাদার আর মাঝিদের পাত পেড়ে খিদে মেটাল, এর সঙ্গেও ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে এবং রাজনীতি জড়িয়ে থাকে। “তার বর্গাদারদের দুনিয়াদারির সঙ্গে আখেরাতের দেখভালের জিম্মাদারি শরাফতের এখতিয়ারেই পড়ে” (৯১) শরাফতের বর্গাদারদের ‘খুশি’ রাখা আসলে তার আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের দায়। আধুনিকমনস্ক আজিজ বা কাদের জোতদা-বর্গাদার সম্পর্ক থেকে সমস্তরকম মুনাফা নিষ্কাশন করতে চায় বলেই হুমায়ূনের চল্লিশায় বর্গাদারদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বিদায়

করতে চেয়েছিল কারণ, “একেককজনের হাতির খোরাক জোটাবার চেয়ে পৌষমাসের খেতমজুরির রেটে পয়সা দিলে বরং অনেকটা সাশ্রয় হয়।” (৯১) এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের প্রবল খিদের প্রতি অসম্মানে, উৎসবের বাড়িতে তাদের ‘গোথাসে’ ভালমন্দ খাবার খাওয়াকে আজিজ-কাদেররা ভাল নজরে দেখে না। আর, শরাফত মণ্ডলও যে বর্গাদারদের একদিন খাবার খাইয়ে সারা জীবনের জন্যে অনুগত ক’রে রাখতে চায়, তা মাগনায় নয়। সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে বর্গাদার-ক্ষেতমজুরের শ্রমকে ব্যবহার ক’রে নেয় সুকৌশলে। বর্গাদারদের কারোর বাড়ির গাছ কাটিয়ে, তাদের দিয়ে হাট থেকে গরু বয়ে আনিয়, কয়েক মাইল দূর থেকে রান্নার সরঞ্জাম আনিয় এবং তাদের দিয়েই রান্না-পরিবেশন করিয়ে শরাফত ‘আখেরাতের সঞ্চয়’ করে। মেহমানদের খাওয়া কত সংযত, প্রণালীবদ্ধ। মওলানা যখন মোনাজাত শুরু করে, তখন সকলের হাত জোড় করার নিয়ম; অথচ ‘গোরুর গোশতের সুরুরার গরম ধোঁয়ায়’ মাঝিপাড়া চাষীপাড়া কলুপাড়ার মানুষরা ধর্মাচরণ দোয়া সব ভুলে যায়। গোথাসে খেয়ে খিদে-মেটানোর থেকে বড় দোয়াপ্রাপ্তি তাদের আর কিছু নেই। এই প্রবল ভুখের বৈপরীত্যে টাউনের মেহমান আর মুসলিম লিগের হোমরাচোমড়া ব্যক্তিবর্গের সংযত-রুচিশীল-পরিচ্ছন্ন খাওয়াদাওয়া। গ্রামের নিম্নবর্গের জন্যে গোরুর গোশত আর ভাত; কিন্তু, উচ্চবর্গের মেহমানদের স্বাদরুচির কথা ভেবে বিশেষ ভাত ও খাসির মাংসের ব্যবস্থা। তাদের জন্যে শেষপাতে দইয়ের ব্যবস্থা (কলু-মাঝি-চাষীদের পেট ভরাটাই আসল কথা বলে, তাদের খাদ্যতালিকায় এত বৈচিত্র্য রাখেনি শরাফত-আজিজরা)। আর, খিদের শ্রেণিভাগ এইজন্যেই বাস্তব কারণ, “খানকা ঘরের মেহমানদের আসার পরপরই ভারী নাশতা দেওয়া হয়েছে, তাদের খিদে লাগতে একটু সময় দেওয়া দরকার” (৯৮) উচ্চবিত্ত-নিশ্চয়তাসম্পন্নদের খিদে পাওয়ার নির্দিষ্ট সময়-অসময় রয়েছে কিন্তু নিম্নবিত্ত-নির্বিত্ত-অনিশ্চয় সংকটে যারা বাঁচে তাদের ক্ষিদের সময়-অসময় নেই। তাই, একবার খেয়ে উঠে আবার খেতে বসে যায় তমিজের বাপ। উঁচুবর্গের এবং খানদানি বংশের অতিথিদের আলোচনায় আসা মুসলিম লিগের রাজনীতি ও ভারি ভারি উর্দু বাক্যবন্ধ যে নিম্নবর্গের

আমন্ত্রিতদের বোধগম্যতার বাইরে¹⁴ সে তো ইলিয়াস পাঠককে বুঝিয়েই দেন। কিন্তু, শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের রাজনীতিতে খিদে ও খাদ্য অন্যতম উপাদান, তা প্রতীয়মান হয় উপন্যাসের এই চতুর্দশ অধ্যায়ে এসে। তমিজের বাপের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি অবস্থান নিম্নবর্গের এবং সমধর্মের শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-জোতদার শ্রেণির সঙ্গে তার অনপনয়ে বৈপরীত্যের হৃদিশ পাঠক পায় বিয়াল্লিশ অধ্যায়ে। তমিজের বাপ মারা যাওয়ার পরে তমিজ তার স্মৃতিচারণে সেই খিদে ও খাদ্যগ্রহণের ‘রাজনীতি’র উল্লেখ করে ফেলে। তমিজের বাপের নিজের পয়সায় ভালমন্দ খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তাই সে জেয়াফতের প্রত্যাশায় থাকে। “জেয়াফতে খেতে খেতে তার তবনের গেরো খুলে গেছে, বমি করে ফেলেছে, খেতে বসে পাদতে শুরু করে পাশের লোকের গালি খেয়েছে” (২৫৪) না, তমিজের বাপ এবং তার খাওয়ার পদ্ধতি কোনওটাই তথাকথিত রুচিশীল-নান্দনিক নয়। ‘মক্ষ্মলি বৃত্তান্ত’-তে চার বছরের খেতেশ্বরী যখন ফ্যানের ফাঁকা গ্লাস ‘হা-ঘরে’-র মতো খেতে চায়, তখন “তার চোয়ালের হাড় সামান্য নড়ে, চোখের পাশের শিরাটা দবদব করে, যত বেলা যায় তত বেশি দবদব করে, কপালে বিনবিন ঘাম জমে, টলটল করে, ভেঙে গড়িয়ে যায়” (রায় ১৯৮৯, ৩৩) তাদের প্রবলতর খিদেই আখ্যান নান্দনিকতার অন্তর্গত হয়ে ওঠে। তাদের অমন ‘হা-ঘরে’-র মতো খাওয়াকে সাহিত্যভুক্ত করা যায় কিনা, সে প্রশ্নও উঠে যায়। কিন্তু, ইলিয়াস ও দেবেশ প্রথাগত সাহিত্যরীতিকে প্রত্যাখ্যান করেই এই বর্ণনা রাখেন। খাদ্যরুচিতে শ্রেণির সঙ্গে সামাজিক-অবস্থানও জড়িত, তা বোঝা যায় কমিউনিস্ট পার্টির অজয় দত্ত ও মিনতি দত্তের প্রসঙ্গে। মুসলিম-অধ্যুষিত মাঝিপাড়া বনাম হিন্দু-অধ্যুষিত কামারপাড়ার মধ্যে প্রাণক্ষয়ী দাঙ্গার পরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অজয় ও মিনতি দুই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে নিবৃত্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু, কাদের-কালাম-সাদেক কিংবা নায়েব-অনিলদের উগ্র-সাম্প্রদায়িক প্রভাব যত সহজে নিম্নবর্গের মানুষদের শ্রেণিঐক্য থেকে ধর্মীয়বিভেদে নিয়ে যেতে পারে, অজয়-মিনতিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তত সহজে ফের ধর্মীয়ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আশু ধর্মীয় ঐক্যের লক্ষ্যপূরণে শ্রেণিবোধকে কি এড়িয়ে যায় অজয়-

মিনতিরা? তাই শোষক জোতদার শরাফত মণ্ডলের বাড়িতেই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। “ইসমাইল, অজয় দত্ত ও মিনতি এই গরমে খাওয়ার এত আয়োজন দেখে কাদেরকে মিষ্টি করে বকে, কিন্তু পেট পুরে পোলাও কোর্মা খায়। বড়ো জাতের শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে এভাবে খাওয়াতে পেরে শরাফত গদগদচিৎ।” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৩) শরাফতের ‘গদগদচিৎ’ হওয়ার দু’টো স্পষ্ট কারণ, নিজের সামাজিক অবস্থানের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করা এবং চাষী-মাঝী-কলুদের থেকে নিজের উচ্চতর শ্রেণি-অবস্থানকে শিক্ষিত-ভদ্রলোক কমিউনিস্টদের কাছে ন্যায্যতা দিতে পারা। কিন্তু, ‘শিক্ষিত ভদ্রলোক’ তকমা মুছতে না-পারা ও জোতদারের বাড়িতে ‘পোলাও কোর্মা’ খাওয়া কি অজয়-মিনতিদের নিম্নবর্গ-নির্বিন্তদের থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়? কারণ, ওই খাওয়ার সময় ও খাওয়ার পরপরই তাদের কাছে ভিটেমাটি বন্ধক-রাখা তমিজের বাপ আসে তমিজের মুক্তির আবেদন জানাতে ও পাকুড়গাছ উধাও হওয়ার কথা বলতে। কিন্তু, তার ওই সঙ্কট কাদের-ইসমাইলের কাছে ‘সামান্য’ বলেই কোনও সুরাহা হয়না।

খিদে ও খাদ্যের সঙ্গে শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ক ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র খিজিরকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়। ভাড়ার-রিকশা-চালানো খিজির ‘হাপুশ হুপুশ করে খাওয়া শেষ করে’ কারণ, খিদেয় ভরপুর পেট ভরানোর চেয়ে বড় নান্দনিকতা তার জানা নেই। খিজিরের বৌ তথা জুন্মনের মা খিদের জন্যেই যে মহাজনের কাছে যায়, অর্থ সংস্থানের জন্যেই যে মহাজন রহমতউল্লাহর অন্যায় আবদারে সায় দেয়, খিজির তা জানে। খিজিরের প্রতি জুন্মনের মা’র উদাসীনতা খিজির অসহায় অভিমানে মেনে নেয় এবং তার সেই রাগ এসে জমা হয় খাদ্যের ওপর। “ঈদের দিন স্বামী কি খাবে না খাবে সেদিকে তার কোনো নজর আছে?” (৫৯) এবং নির্বিন্তের যে খাদ্যের ওপরে বেশিক্ষণ রাগ দেখানো চলে না তা খিজির প্রমাণ করে দেয়, “...তার চোখ পড়ে ঘরের কোণে রাখা গামছায় জড়ানো গামলার দিকে। থালার নিচে গামলায় পোলাও ও মুরগির ১টা আস্ত রান। মাগী রানটা সরালো কিভাবে?— রান খেতে খেতেও বৌয়ের ওপর খিজিরের রাগ কমে না” (৫৯) খিজিরের ক্ষুধা খিজিরকে বাধ্যতঃ মহাজনের দাসে পরিণত

করে, খিজিরের সমস্ত বিরুদ্ধ-উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে। অভুক্ত খিজিরের অভিমান-রাগ-খিদে মেশানো অভিব্যক্তি ও ‘হাপুশ হুপুশ’ ক’রে খাওয়া তমিজের বাপের প্রতিরূপ। এই খাওয়ার দৃশ্যের পুনর্নির্মাণ হয় ২৬ নম্বর অধ্যায়ে। জুম্মনের মা এবং খিজিরের সম্পর্কের টানাপড়েন এই খিদের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয় পাঠকের কাছে। তবে, এই টানাপড়েনে পৌঁছানোর অব্যবহিত আগে দু’টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা খিজির ও জুম্মনের মায়ের সম্পর্কে ঘটে যায়- প্রথমতঃ, খিজির মহাজনের বিরুদ্ধতা ক’রে বজলুকে মারে ও বজলুর হাতে মার খেয়ে আহত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিক্ষোভকারী রিকশাশ্রমিকরা মহাজনের গ্যারাজে ও বাড়িতে আগুন ধরাতে যায় কিন্তু খিজির তাদের আটকায় ও জুম্মনের মা এতে ক্ষুব্ধ হয়। সেই মহাজনের বাড়িতে রান্না করা গোরুর গোশতের ভুনা জুম্মনের মা খিজিরের জন্যে নিয়ে আসা যেমন তার ভালবাসার প্রকাশ, তেমনি ওই গোরুর গোশত দিয়ে পেটভরে ভাত খেতে খেতেই জুম্মনের মার ক্ষোভ আছড়ে পড়ে খিজিরের বিরুদ্ধে- “পাবলিকে মহাজনরে জ্বলাইয়া দিবো, পুড়াইয়া মারবো, খতম করবো- তোমার কি? তুমি ক্যাঠা- আমি জিগাই- তুমি গ্যারেজের মইদ্যে আগুন দিবার দিলা না ক্যালায়?” (১৭৭) খিজির ও জুম্মনের মা দু’জনেই আর্থিকভাবে মহাজনের ওপর নির্ভরশীল, তাদের শ্রম মহাজনের উন্নতিকল্পে। মহাজনের বাড়ি থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা খাবার দিয়েই ভালমন্দ ‘ভোজ’ জোটে তাদের। তবু, ওই খাওয়ার মুহূর্তেই শ্রমের শোষণের বিরুদ্ধে শোষক মহাজনের প্রতিবাদী সত্তা প্রকাশ হয় জুম্মনের মায়ের। শ্রেণিচেতনা অবদমিত থাকে খিদের জন্যেই, কারণ অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। না, জুম্মনের মা বা খিজির কেউই মহাজনের প্রতি শ্রেণিক্ষোভে মহাজনের বাড়ির খাবার প্রত্যাখ্যান করে না^{১৫}, কিন্তু সেই খাদ্যগ্রহণের পরে শ্রেণিবোধ বিসর্জন দিয়ে মহাজনের প্রতি গদগদ হয়েও যায় না। আখ্যানকথক জুম্মনের মায়ের খাওয়ার দৃশ্যে নান্দনিক অভিব্যক্তিগুলো বর্জন করেন সচেতনভাবেই। “...সে ভাত খায়। ২/৩ গ্রাস মুখে তোলার পর তার গ্রাসের পরিমাণ ও খাওয়ার গতি বাড়ে। খিদে যেরকম পেয়েছে, সব ভাত আবার খেয়ে না ফেলো! থালার ভাত আঙুলের দাগে বিভক্ত করতে করতে ছেলেকে ডাকে, ‘এই

জুম্মন, ওঠ! ভাত খাইবি তো ওঠ!” (১৭৬) খাদ্যগ্রহণের এই বর্ণনা এক শহুরে নিম্নবর্গ-নির্বিন্ত পরিবারের খুব ব্যক্তিগত পরিসরকে রাজনৈতিক ক’রে তোলে। বিশেষতঃ, জুম্মনের মায়ের জুম্মনের প্রতি স্নেহ ও খিজিরের প্রতি ভালবাসা কোনও একঘেয়ে অবাস্তব ধাঁচাগত অবয়ব মেনে চলে না। পরিবারের এক শ্রমজীবী নারীর ক্ষুধা ও খাদ্য নিয়ে উদ্বেগকে প্রকাশ করে। কিন্তু, ওই স্নেহ ও ভালবাসা মুহূর্তেই খানখান হয়ে যায় জুম্মনের প্রতি “শুওরের বাচ্চা, উঠলি? গোশতো ফুরাইয়া গেলে ঘ্যানঘ্যান করবার পারবি না কইলাম।” (১৭৬) বাক্যে আর, খিজিরের প্রতি ক্রোধবাক্যে। এবং নির্বিন্ত পরিবারের বালক জুম্মনের গোশত খাওয়ার তীব্র বাসনার বাস্তবায়নে ঘন সুরুরা মাখা ভাতের সঙ্গে থাকে অপ্রাপ্তি, “গোশতো কই? খালি হাড়ি লইয়া আইছো!” (১৭৬) আর, এই পারিবারিক ‘সু’খাদ্য গ্রহণের উদ্‌যাপনের মধ্যেই জুম্মনের মায়ের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানতে পারে খিজির। ইলিয়াস যে বরাবরই ‘উইশফুল থিঙ্কিং’ ও গদগদ ‘ন্যাকান্যাকা’ আরোপিত সংলাপ ও আখ্যান প্রত্যাখ্যান ক’রে নির্লিপ্ত ও বাস্তবোচিত বয়ান খুঁজে নিতে চেয়েছেন, এই অংশে তা বোঝা যায়। তমিজের মেয়ে সাকিনার মতো জুম্মনও বংশপরম্পরায় খিদের শরিকানা বহন করে, তার গোত্রাসে খাওয়ার ধরনের সঙ্গে খিজিরের মিল, তার খাদ্যরুচি নিম্নবর্গ-নির্বিন্তের শ্রেণিপরিচয় বহন করে “বজলুর বৌ কোথেকে ঝোলা ভর্তি কাঁঠালের বিচি বার করে, কবে কার বাড়ি থেকে সরিয়ে এনেছিলো কে জানে? সেই বিচি সেদ্ধ করে সবাই মিলে খাওয়া হলো। জুম্মনের গোত্রাসে খাওয়া দেখে বজলুর বৌ আফসোস করে” (২৩৬) আর, খিজিরের রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠা কিংবা নির্দিষ্ট অভিমুখে সেই সচেতনতাকে ধাবিত করার অন্তঃসলিলা বয়ান স্পষ্ট হয় যখন খিদেকে উপেক্ষা করে সে মিছিলে যোগ দেয়। ‘পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা’ একটি একশ টাকার নোট নিয়ে স্বচ্ছলবিত্তের রেস্তোঁরা ‘নিজামি রেস্টুরেন্টে’ রুটি-গোশত খেতে ঢুকেও সে শাসকবিরোধী মিছিল দেখে স্লোগান শুনে বেরিয়ে আসে¹⁶। মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্যে খাবারের জন্যে অপেক্ষা না করা খিজিরের রাজনৈতিক অভিমুখকে দিশা দেয়। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে সমাজবিপ্লবের জন্যে বোমা বাঁধতে গিয়ে জখম

নেপুর খাওয়ার ভঙ্গির সাথে জুস্মনের মা, খিজিরের মিল- “টিফিন কৌটোয় করে শান্তা হররোজ ওর খানা নিয়ে আসে... নেপু হাসে। হাসে আর গোথাসে গেলে। বহুদিন পরে ঘরে বানানো ঝাল ঝাল তরকারি দিয়ে নেপু আশ মিটিয়ে খাচ্ছিল” (১০৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে শ্রেণিচেতনার থেকেও খিদে ও খিদে নিবৃত্তির তাড়না প্রবল হয়ে ওঠে; খেতে পাওয়া না-পাওয়ার ওপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ার মাত্রা নির্ধারিত হয়। ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’ গল্পের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষেরা মজুতদার-বিত্তবানের গুদাম থেকে খাবার ছিনিয়ে নিতে রাজি হয়, লঙ্গরখানার খিচুড়ি-আলু খেয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনা চেতে ওঠে, কিন্তু পরের দু’দিন খেতে না পেলেই সেই চেতনা লুপ্ত নয় ত্রাণের আশায় ‘ঝিমিয়ে পড়ে’।

পুরো চারটে দিন ঘন খিচুড়ির সাথে একটা করে আলুসেদ্ধ খেল ভিথিরির দলকে দল সবাই... ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচবার কথা যারা কেউ কানে তোলেনি, দুটো দিন দু’বেলা এক মগ চাল ডাল আর একটা করে আলুসেদ্ধ খেয়ে সকলে কান পেতে শুনতে লাগল আমার কথা, সায় দিতে লাগল যে এই ঠিক, এ ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৭, ২০৯)

যোগী যে কথা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তা হচ্ছে, ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তির অন্ন মৌলিক আকাঙ্ক্ষা। আর, সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে নান্দনিকতা যতটা, প্রয়োজন ও রাজনীতি তার থেকেও বেশি। অনাহারে উপোসে মরতে বসা চিরদরিদ্র মানুষদের কাছে বিপ্লবের শ্রেণিচেতনা বিমূর্ত বরং ওই জোলো খিচুড়ি আর একটি আলু অনেক বেশি মূর্ত। সেই প্রয়োজনটুকু মিটলে শোষক-শাসক-মজুতদারের গুদাম থেকে খাদ্যবস্তু তথা মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার তাকত আর হচ্ছে দু’টোই বাড়ে।

ওসমানের খাদ্যরুচিতে মধ্যবিত্ত সচেতনতা, সাবধানতা ও রুচিশীলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খিজির, জুস্মনের মা এমনকি তমিজের বাপের মতো খাওয়ার ‘হাউস’ তার নয়। মাঝে মাঝে বড় রেস্টোঁরায় ঢুকে গোশত, পরোটা-কলেজি খায়, মদ্যপান করে। আবার, খাওয়ার পড়ে হজমের

ওষুধ খেতেও ভোলে না। ওসমানের বদহজম হওয়ার একটা সূত্রপাত আখ্যানে পাওয়া যায় যখন মিলিটারি প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি ক’রে মানুষ মারে। ওসমান ঢাকা শহরের রাস্তায় মিলিটারির টিয়ার গ্যাস, গুলি ও রক্তাক্ত মৃতদেহের বর্ণনায় উদ্বিগ্ন-বিপর্যস্ত হয়ে আশ্রয় খোঁজে ফেলে আসা ইন্ডিয়ার গ্রামের বাড়িতে। “মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে দুটো গরম ভাত খেতে পারলে সব ঠিক হয়” (৩৭) ওসমানের স্মৃতিতে ও আকাজ্জ্বায় মাগুর মাছের ঝোল ও গরম ভাত উপশম এনে দিলেও, বাস্তবে তা নেই। “সবচেয়ে দরকার দু’টো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট।” (৩৮) ওসমানের সুস্থিত নিশ্চয় মধ্যবিত্ত জীবনের বিপন্নতা ওখান থেকেই শুরু হয়, যখন একের পর এক লাশ পড়ে ঢাকার রাস্তায়, মিলিটারি লাশগুলি গায়েব করে দেয়; সেই বর্ণনা শুনে ওসমানের পেটে-মাথায় ব্যথা শুরু হয় ও খাবার রুচি চলে যায়। আইয়ুব খানের মিলিটারির দমন-খুন-পীড়ন তার মধ্যবিত্ত স্থিতিকে বিপন্ন করে বলেই কি তার বদহজম হয়ে যায় এবং অ্যান্টাসিডের প্রয়োজন পড়ে বিবমিষাময় তেতো লালা রোধ করতে? মধ্যবিত্ত বিষণ্ণতা আর দোদুল্যমানতা ওসমানের খাবার খাওয়ার ইচ্ছেকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেকসময়। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে রানুর সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন ক’রে ওসমানের খাবার ইচ্ছে চলে যায়। তখন গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাত, তার প্রিয় ধলেশ্বরী নদীর ইলিশের পাতুড়ির “কোনওটিতেই ওসমানের রুচি নাই” (২৩০) ওসমানের কাছে খিদে সেইসময় অপ্রধান হয়ে যায়। খিজির, তমিজের বাপ, চেংটুদের থেকে ওসমানের শ্রেণিচরিত্র আলাদা কারণ, তাদের কাছে খিদে ও খাদ্যবস্তুই প্রধান! যদিও, ওসমানের চেতনাপ্রবাহে যখন বিপর্যয় ঘটান সূচনা হচ্ছে, ওসমান আরও বেশি একাত্ম হচ্ছে মিলিটারি বিরোধী দ্রোহীদের সঙ্গে এবং তার মানসিক স্থিতি মধ্যবিত্ত নিশ্চয়তা ছিঁড়ে বেরোতে চাইছে। তখন তার খিদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের-নির্বিন্তের খিদের পার্থক্য থাকে না। তখন ওসমানের মধ্যবিত্ত খাদ্যরুচি ও ‘ম্যানার্স’ বজায় থাকে না আর,

হাতটাত না ধুয়েই গপগপ করে খেতে শুরু করলো। ভাতের গামলায় আলু ভর্তা, টেঁড়সের চচ্চড়ি, ডাল এক সঙ্গে মেখে যতাই খায় মনে হয় পেটের সবটা বধহয় খালিই

পড়ে রয়েছে। এতো যে খাচ্ছে, শরীরের অজস্র ফাঁক ফোকর তবু একটুও ভরে না। ইলিশ মাছের কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেললো। ওসমানের বুক পর্যন্ত ফাঁকা- যতোই ঠাসো আর যতোই গাদো আবক্ষউদরের চাহিদা মেটে না। গ্লাস গ্লাস পানি খেয়েও শরীরের খাঁ খাঁ করা আর থামে না। খিদে ভোলবার আশায় ওসমান তখন ঘরের শূন্যতার দিকে দ্যাখে। কিন্তু ঘর তার পেটের মতোই শূন্য। (ইলিয়াস ২০১৫, ২৩১)

সেই মুহূর্তে জেগে থাকে শুধু ওসমানের সর্বগ্রাসী খিদে। এই মুহূর্তটায় খিজির, তমিজ, জুম্মনের মায়েদের সঙ্গে তার কোনও ফারাক থাকে না। কোনও ‘নান্দনিক’ রুচিশীলতার ধার ধারে না সে। উপন্যাসের আখ্যানকথক ওসমানের ওই না-মেটা খিদের সঙ্গে জুড়ে দেন ওসমানের যৌন আকাজ্জাকে। ওসমানের যৌন-ফ্যান্টাসি তৃপ্ত হয় পর্নোগ্রাফির বই পড়ে, রানুর সঙ্গে কাল্পনিক যৌনসঙ্গমে এবং স্বমেহনে। কিন্তু, ৩৬তম অধ্যায়ে বর্ণিত ওসমানের এই সর্বগ্রাসী খিদে তার যৌন ফ্যান্টাসির উদ্যাপনে মেটে না। তার নিশ্চয়তাকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণিবোধ থেকে সরে আসার অন্যতম ইঙ্গিত কি এটি? কারণ, তারপরেই ওসমানের ফ্যান্টাসির গতিপথ পরিবর্তিত হয় মিলিটারি-খানসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আনোয়ার, খিজির, আবু তালেবদের সহযোদ্ধা হয়ে সেও গুলি খাওয়ার কাল্পনিক সুখে বিভোর হয়ে যায়। আর, একটু আগের ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বদলে যায় শাহাদাতের ফ্যান্টাসিতে, “অন্নজলমুক্ত, মলমূত্রমুক্ত, রক্তমাংসমুক্ত, শত্রুধাতুমুক্ত ওসমান এখন অনায়াসে বুলে পড়তে পারে বুলেট বিদ্ধদের লম্বা ঝাঁকে।” (২৩২) উপন্যাসের লেখক এই অংশে প্রয়োগ করেন চেতনাপ্রবাহরীতি, আখ্যানকথক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে উদ্যত সময়ে ব্যক্তি ওসমানের অবস্থান আখ্যায়িত করেন এবং আখ্যানপাঠক ক্ষুধা-যৌনতার সঙ্গে ওসমানের রাজনৈতিক ‘ফ্যান্টাসি’র উত্তরণের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারেন। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র আলোচনায় এই মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা থেকে রাজনৈতিক আখ্যান ছেঁকে নিতে পেরেছেন,

Like Musil, he is also deeply interested in aberration, schizophrenia, psychopathology and the rest but he is not sucked up by this Freudian pool. Even after granting substantial weightage to the ‘minds’ of his protagonists and to reality’s inner terrain... Elias remains an obstinate Marxist determined to give due recognition to the political unconscious. (Dasgupta 2018, 36)

ক্ষুধার বর্ণনার মধ্যেও ওসমানের মতো রাজনৈতিক উত্তরণের এই অন্তঃসলিলা বয়ান খুঁজে নেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত খাদ্যরুচি যে নিয়ন্ত্রিত, মাপা ও সচেতন, তার একটা উদাহরণ মানিক দেন তাঁর গল্পে, ‘বাবু’ দের খাওয়ার প্রতি যোগীর সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ থেকে। বিন্দি বাবুর জন্যে প্রচুর চিড়ের মোয়া আর নারকেল নাড়ু সাজিয়ে দিলে যোগী নির্বিকার ‘গোথাসে গেলা’র সঙ্গে বাবুদের সচেতন নিয়ন্ত্রিত খাওয়ার পার্থক্য বলে দেয়, “বাবুকে কি রান্ধস ঠাওরালি নাকি, অ্যাঁ? দুটো মোয়া, দুটো নাড়ু রেখে তুলে নিয়ে যা সব” (২০৮)। এই খাবার তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশের মধ্যে নিজেদের জন্যে খাবার বাঁচিয়ে রাখার সঞ্চয়ীভাব হয়তো আছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়ও ‘বাবু’র খাদ্যানিশ্চয়তার (যার জন্যে বাবুরা যোগীদের মত গোথাসে যা পায় তাই খেতে পারে না) প্রতি ঠাট্টাও রয়েছে।

৪৬ নম্বর অধ্যায়ে, ওসমানের তখন মানসিক স্থিতি বিপর্যস্ত, একইসঙ্গে তার শ্রেণিবোধও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর, তখন ওসমানের দৃষ্টিবিভ্রমে হানা দেয় মৃত খিজির এবং তার শ্রেণিচেতনাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে খিজিরের ভূত তাকে রাষ্ট্রবিরোধী অভ্যুত্থানের সঙ্গী ক’রে নেয়। আনোয়ার তার অসুস্থ বন্ধু ওসমানকে দেখতে এসে উলঙ্গ ওসমানকে আবিষ্কার করে; ওসমানের চিলেকোঠার ঘরের মেঝের কোণে “ছড়িয়ে রয়েছে ভাত, পুঁইশাক, আলু ও ইলিশ মাছের টুকরো” (২৮৪) অস্বাভাবিক ওসমানের তখন ক্ষুধাবোধ বিলুপ্ত। আর, সেই সময়েই এমন এক

বক্তব্য পেশ করে ওসমান, যাতে তার স্বচ্ছল শ্রেণিঅবস্থান ফুটে ওঠে এবং একইসঙ্গে খিজির যে তার স্বচ্ছলতা, নিশ্চয়তা এবং মধ্যবিত্ত অবস্থান বিপন্ন ক'রে তুলছে, তারও ইঙ্গিত থাকে,

ওসমান বলে, 'দ্যাখো তো আনোয়ার! আমাদের বিলের জমির রাজভোগ ধানের চালের ভাত, কি সুন্দর জুঁইফুলের মতো সাদা! আমরা নিজে রেঁধে দিলো, আমি নিয়ে এলাম, খিজিরকে বললাম, খাও, তুমিও খাও, আমিও খাই। ব্যাটা নিজেও খাবে না, আমাকেও খেতে দেবে না। আবার রঞ্জুর পিঠে লাগি মেরে ঘর থেকে বের করে দিতে চায়।' (ইলিয়াস ২০১৫, ২৮৪)

যে খিজির নিজেই অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকত প্রায়শই, যে খিজির খিদের তাড়নায় বাধ্যতঃ দাসখত লিখে দিয়েছিল মহাজনের কাছে এবং যে খিজির নিজের মা-বউকে খিদে-অনটনের সাঁড়াশি চাপে বাধ্যতঃ মহাজনের কাছে নিজেদের শ্রম 'বন্ধক' রাখতে দেখেছে, সেই খিজির মৃত্যুর পরে প্রবল শ্রেণিচেতনায় জেগে উঠবে এতে আশ্চর্য কী! আর, সেই নির্বিক্তের শ্রেণিচেতনায় শহুরে লুম্পেন থেকে দ্রোহী শাসকবিরোধী হয়ে ওঠা খিজির যে ওসমানের বাড়ি ভাত বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে নিজের শ্রেণিযুদ্ধে সামিল করিয়ে নিতে চাইবে, এতেই বা আশ্চর্য কী!

ব্যক্তি আর রাষ্ট্র এই দু'য়ের দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক নিয়ে উপন্যাসের আখ্যানবুনন চলে। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ যে যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ব্যক্তি'কে শাসিত বিষয়ীসত্তা (interpellated subject) ক'রে গড়ে নেয়, তার অন্যতম হচ্ছে ধর্ম। খাদ্যরুচি ও খিদে পাঠককে শুধুমাত্র কুশীলবেদের শ্রেণিবোধ বা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেই সচেতন করে না, বরং ধর্মচেতনার ইঙ্গিতও দেয়। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে ডাক্তার শিশির সেনকে লিপটনের চা, ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট ও পায়ের খাইয়ে খুশি করতে পেরে 'খাদ্য গ্রহণে তার সম্মতি আছে নিশ্চিত হয়ে' খুশি হয় কাদের। প্রশান্ত কম্পাউন্ডার কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুশীলনের জন্যে মুসলমান শরাফতের বাড়িতে চা বা জল এমনকি তার গাছের কলা অবধি ছুঁয়ে দেখে না¹⁷। প্রশান্তের তুলনায় সামাজিক অবস্থানে উচ্চতর কিন্তু জাতে নিম্নতর শিশির ডাক্তারকে নিজের হাতে খাওয়াতে পেরে কাদের যতটা তৃপ্তি পায়,

ঠিক ততটাই অভিমান-ক্ষোভ তার জমে প্রশান্তের ব্রাহ্মণ্যবাদী অস্পৃশ্যতার দোহাই শুনে। আর, এই ক্ষোভই তার ‘খোয়াবে’ মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধ (এবং হিন্দু বিদ্বেষ) জাগিয়ে তোলে। কিন্তু, শুধুই কি প্রশান্ত কম্পাউন্ডার? ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের গুণকীর্তন করা, নিজেকে ভবানী সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী বলা বৈকুণ্ঠ গিরিও তো খাবারের ছোঁয়াছুঁয়ি বজায় রাখে। চেরাগ আলি বা তমিজের বাপের ঘরে বৈকুণ্ঠর জলস্পর্শ করায় জাত খোয়ানোর ভয়! “এদের ঘরে বৈকুণ্ঠ বসতে পারে, মুড়ি খেতে পারে, গুড় দিয়ে তো পারেই, এমন-কি, নুনতেল দিয়ে মাখালেও দোষ নাই। কিন্তু পারে না কেবল জল স্পর্শ করতে। জাতের দোষ হয়ে যাবে” (৬০) বৈকুণ্ঠ বৈরাগীর প্রিয় খাবার চিড়ে-মুড়ি-গুড় এবং জর্দা-পান। তমিজের বাপের ঘরে বৈকুণ্ঠ ধামা-ধামা মুড়ি খায়, তেষ্ঠা মেটাতে আম খায় কিন্তু জল খায় না! আর, খুন হওয়ার আগের মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ কুলসুমকে দেখে সেই আম খাওয়া এবং পানি না-খাওয়া নিয়ে ভর্ৎসনা করতে। বৈকুণ্ঠ দেশভাগের পরেও সেই সন্ন্যাসী-ফকির ঐক্যদ্রোহের মিথ-আশ্বাস নিয়ে থেকে গেছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু জনমানসে সন্ন্যাসী-ফকিরের দ্রোহাদর্শ লোপ পাওয়ার অপ্রত্যাশিত প্রতিফলনেই হয়তো সে খুন হয়ে যায়। আধোচেতনে অথবা চেতনা নিভে আসার সেই মুহূর্তে শুধু যে কুলসুমের অবয়ব আর অস্পৃশ্যতা নিয়ে ভর্ৎসনা শোনে বৈকুণ্ঠ, তা কি তারই মনের অবচেতনে থেকে যাওয়া অনুতাপ? ব্যক্তির উত্তরণ, ব্যক্তির চেতনাপ্রবাহে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের সূক্ষ্ম উপস্থিতি আখ্যানকে জীবন্ত ক’রে তোলে। উপন্যাস আসলে ব্যক্তিকে খোঁজার নিরন্তর প্রয়াস। আর, ব্যক্তিকে অন্বেষণের মধ্যেই বিধৃত থাকে ইতিহাস ও সমাজের চেতনা। দেবেশ রায় তাঁর ‘উপন্যাসচিন্তা’ প্রবন্ধে বলছেন,

উপন্যাসের অস্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অস্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ।

এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অস্বিষ্ট। (রায় ২০১৫, ৮৭)

আখ্যানে ‘ব্যক্তি’-কে খোঁজার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান ইলিয়াস এবং দেবেশ দু’জনেই। ব্যক্তি আর রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব রাষ্ট্র যেখানে প্রান্তিক ব্যক্তিকে ছুঁতে ব্যর্থ হয়, শাসক ও আগামী-শাসক যখন তার মতাদর্শ দিয়ে প্রান্তিক ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে না কিন্তু তাকে ব্যবহার করে নিতে পারে, তখনই ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাখ্যানের বয়ান তৈরি হয়-

...সমস্ত দৃশ্যের ভেতর চ্যারকেটু এমন একটা প্রধানতা পেয়ে যায় যে তাকে দেখলে মিছিলের কথা মনে পড়ে। কিন্তু কোনো অর্থেই চ্যারকেটু এই এতগুলো মিছিলের কেউ নয়, কোনোটারই নয়... চ্যারকেটু তখন মিছিলে ঘুরেছে, যখন যে-মিছিল পেয়েছে। তখনো কোনো মিছিল তার নিজের ছিল না (রায় ১৯৮৯, ১৬৫)

অথবা, নির্বাচনপ্রেমী রাজনীতিকদের বয়ানে, কর্মকাণ্ডে বারবার সবচেয়ে শোষিত ‘ব্যক্তি’টিকেই উন্নয়নের বয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়।

খালি গা, কোমরের নিচে গামছা জড়ানো, কাঁধে লাঙ্গল, কোমরে গোঁজা কাঁচি-দাও, সামনে গরু, সব মিলিয়ে চ্যারকেটুকে একটা প্রদর্শনীর ‘বাংলাদেশের কৃষক’-এর মাটির মডেলের মতো লাগে, হঠাৎ চোখ পড়লে সেই মডেলের স্বাস্থ্য, তৃপ্তি, পূর্ণতা জীবন্ত মনে হয় (রায় ১৬৫)

‘ব্যক্তি’ নির্মাণ করে নেওয়ার এ এক শাসক-মতাদর্শ, যে মতাদর্শে বৃন্দ হয়ে থাকে সমাজব্যবস্থা। কিন্তু, লেখক এর পরেই সেই ‘মডেল ব্যক্তি’ নির্মাণের খোঁয়ারি ভেঙ্গে দেন, “চ্যারকেটুর পেটে তিনদিনের বাসি খিদে।” চ্যারকেটুর ওই বাসি ক্ষিদে রাষ্ট্রের ও শাসকের মনমতো নির্মিত বয়ানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং আখ্যানকে তাড়িত করে এবং পাঠককে ওই খিদে সম্পর্কে সচেতন করে।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ উপন্যাসে ‘ভুখ’ শব্দে জোর পড়ে। ‘ভুখ’ তখন আর শুধুমাত্র একটা নিস্প্রাণ শব্দ থাকে না, হয়ে ওঠে রাজনৈতিক শব্দ। “ তখন ‘ভুখ’ শব্দটা

হাড্ডিকল আর চামড়াপট্টির বিকট গন্ধ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাকস্থলীর মতো রেললাইন ধরে ঝড়ের মতো ছুটে আসবে।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ১৫৭) এই খাবার ফেলেই শ্রেণিশত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে যায় সোনা। ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানকথক তমিজের বাপের খিদের বর্ণনা ৫ম অধ্যায়ে বেশ সচেতনভাবে পাঠককে শোনান। কালেভদ্রে ভালমন্দ খাওয়া জোটে তার, শমশের পরামণিকের নিমন্ত্রণে গিয়ে,

অনেকদিন পর রাতে গলা পর্যন্ত আউশের নতুন চালের ভাত, গোরুর গোশত ও হাতিবান্দার দই এবং এর আগে দুপুরবেলা ভাত ও আলু দিয়ে পাক-করা-বোয়াল মাছের ঘাঁটি সালুন এবং সকাল থেকে দুপুর ও দুপুরে ভাত খাব পর থেকে রাতে খাবার আগে পর্যন্ত দুই দফায় মুড়ি, বাতাসা ও খাগড়াই খেয়ে বাড়ি ফিরে তমিজের বাপ টাইটুম্বর পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। (ইলিয়াস ১৯৯৮, ৩৮)

কিন্তু, এই ‘খানদানি খানা’ তমিজের বাপের পেট থেকে বেরিয়ে যায় বমন ও মলত্যাগে। তমিজের বাপের সর্বগ্রাসী ভুখ শুধু শ্রমের সঙ্গে নয়, খোয়াবের সঙ্গেও সম্পর্কে জুড়ে থাকে। তবে, বেলেঘাটার বস্তির শ্রমিকদের মতো তার খিদে বা খাওয়ার ‘হাউস’ শ্রেণিচেতনাকে জাগিয়ে তোলে না। রাঘব খিদে ও খাদ্যের কিছু অদ্ভুত উপমা ব্যবহার করেছেন- “ইজেরের ওপর ভাসছিল ঢেবির পেট। লাউখোলার মতো পেটটা যেন একতারা বাজাচ্ছে।” (৩১) কিংবা “চ্যাপটা রাস্তাটা শিককাবাবের মতো সরু আর চোখা হয়ে তেইশ নম্বর বস্তির লাইনবাঁধা ঘুপচিগুলো মাংসের টুকরোর মতো গেঁথে রয়েছে।” (৩১) রাঘব কলকাতার যে অঞ্চলের বর্ণনা দিচ্ছেন, সেখানে ছোট-ছোট কারখানা ও বস্তির সহাবস্থান এবং অতি-নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের জীবন যাপিত হয়। খিজিরের খাদ্যরুচির সঙ্গে তার খুব তফাৎ নেই, বরং নৈমিত্তিক জীবন উদ্‌যাপনের কাহিনি একই। শ্রমিক সুকুর পরিবার- এই সুকু পার্টিকর্মী, সুকুর দাদা মদনা একই কারখানার শ্রমিক। রোজ রাতে চোলাই খেয়ে ফেরা আটার ঠোঙা হাতে, তার সঙ্গে ডাল^{১৮} পার্টি করতে গিয়ে সুকু

বাড়ি না ফিরলে, ভাঙা কলাইয়ের বাটি নিয়ে তার খেতে বসার স্মৃতি মায়ের কথনে ঝলসে ওঠে।
গোরার নেতৃত্বে এই বস্তির লোকেরা মজুতদারের চালের গুদাম লুণ্ঠ করে ন্যায্য দামে সেই চাল
বাঁটোয়ারা করে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে।

হারবার্টের খাদ্যরুটির পরিচয় তার পাড়াভূতো বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসরের বর্ণনায়
পাওয়া যায়- ঝাল চর্বির বড়া দিয়ে বাংলা মদ। আত্মহত্যার রাতে চিংড়ির কাটলেট, বাদাম সবই
ছিল তালিকায়। হারবার্ট যে তার গর্বিত-উপনিবেশিত পূর্বপুরুষদের অক্ষম উত্তরপুরুষ, সেটা
বোঝা যায় তার পূর্বপুরুষের সঙ্গে পানরুটির পার্থক্যে। ওদের ফরাসি মদ আসত চন্দননগর
থেকে কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু বাবুয়ানার হারবার্টের আর্থিক ক্ষমতায় বাংলা বা রাম জুটতে পারে বড়জোর।
হারবার্টের বাবা ললিতকুমার স্কচ ও দামি সিগারেট খেত- কিন্তু হারবার্ট তার বাবা-জ্যাঠার টাকা-
ওড়ানো বাবুয়ানির উত্তরাধিকার পায় নি। ফ্যাতাডু এবং চোজাররাও বাংলা মদের ওপরেই ভরসা
রাখে। বাংলা মদে কৌলীন্য নেই; ওপরতলার সংস্কৃতিবানদের নাক-কুঁচকানো অবজ্ঞা আছে
ওতে। আর, ফ্যাতাডুরা যাদের পরিশীলিত উচ্চবর্ণীয় সাংস্কৃতিক পরিসরে অন্তর্গত ঘটায়, সেই
সমস্ত উচ্চবর্ণীয়ের খাদ্যতালিকায় কী থাকে? “তন্দুরি মোজা পরা পা, তন্দুরি ব্রেস্ট, তন্দুরি রাঙ,
তন্দুরি আঁখি, তন্দুরি চুল উইথ রাইস নুডলস্, তন্দুরি ব্লিডিং হার্ট, তন্দুরি নাড়ি, তন্দুরি লিপস,
তন্দুরি আর্মপিট” (ভট্টাচার্য ২০০৬, ১৯) এই খাদ্যতালিকাতে ‘তন্দুরি’ নামক সাধারণ
(common) শব্দটি সরিয়ে রাখলে আস্ত একটা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পরিধানের ছবি ফুটে
ওঠে। ফ্যাতাডুরা ভদ্রলোক উচ্চবর্ণের তথা এলিট সমাজের ওই খাদ্য-উদ্যাপন নষ্ট ক’রে দিতে
ফ্লোটেলে দলবদ্ধ আক্রমণ করে। তারপর বাড়িতে বা পার্কে বসে নিজেরা বাংলা মদ আর সস্তা
চাট দিয়ে হুঙ্কোড় উদ্যাপন করে।

এক আখ্যানের সঙ্গে অন্য আখ্যানের সংযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক

রণবীর লাহিড়ী ‘আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান’ গ্রন্থে লিখছেন, “অনেক সময়েই একটি বই আরেকটি বইয়ের সঙ্গে কথা বলে। অনেক সময় একটি নিরীহ বইয়ের মধ্যে থেকে যায় এমন এক বীজ, যা পরবর্তী সময়ে পল্লবিত হতে পারে বিপজ্জনক কোনও গ্রন্থে” (লাহিড়ী ২০১১, ১১০) এই সন্দর্ভের আলোচনায় আন্তঃপাঠ (Intertextuality) প্রসঙ্গ এবং একটি আখ্যানের সঙ্গে অন্য আখ্যানের মিল-অমিল গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা (১৯১০)’ উপন্যাসে এক অতিনগণ্য চরিত্র তমিজ প্রায় ৩৫০ পাতার উপন্যাসে মাত্র ২টি লাইনে তার উপস্থিতি, “ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমন-কি, তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক-পুত্র তমিজ... সে খাইতে পায়না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে।” (ঠাকুর, ১২৮) ‘খোয়াবনামা’র তমিজ হয়েই কি বাংলা উপন্যাসে ফিরে আসে তমিজ? তমিজের বাপের নাম ফরু কিনা জানা যায় না কখনোই কারণ আখ্যানে বরাবর ‘তমিজের বাপ’ সম্বোধন তার। গাণিতিক হিসেবে ‘গোরা’-র তমিজ এবং ‘খোয়াবনামা’-র তমিজের বয়েস অভিন্ন হওয়া হয়তো অসম্ভব। কিন্তু, দু’ই উপন্যাসে তমিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ভেদ নেই। ‘খোয়াবনামা’-তে তমিজ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের জায়গাদখল করে নিয়েছে! তার দারিদ্র্য, আকাজ্জা, খোয়াব এবং রাজনৈতিক বোধ সেখানে আরও প্রসারিত। আর, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র চ্যারকেটু, খেতখেতুরা আসলে তমিজের উত্তরাধিকার। তমিজের কালস্থান থেকে তিন দশক পরে তাঁদের কালস্থানিকতা- অথও উত্তরবঙ্গ ততদিনে ভাগ হয়ে গেছে। এঁরা প্রান্তিকতার এবং বঙ্গদেশের কৃষকের দারিদ্র্যের সুবিস্তৃত গাঢ় ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলেছেন দশকের পর দশক। আর, সাহিত্যের আধুনিকতা বলে যদি কিছু হয়, তাহলে তা এদের অবস্থানকে চিহ্নিত করা, সাহিত্যের বুনে এদের আখ্যানকে কেন্দ্রে রাখা। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সংস্কৃতির ভাঙা সেতু’-র ভূমিকায় লিখছেন, “বাংলা ভাগ হলেও, মাঝখানে সীমান্তপ্রহরা বসলেও, ‘আমাদের আধুনিকতা’ যে ভাগ হয় নি, ‘আধুনিকতা’র সমস্যা ও সম্ভাবনার শরিক যে দু-পারের লোকজন, এই মস্ত খবরটা স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়ে তুলে বেবাক রাষ্ট্র করে দিয়েছেন ইলিয়াস। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৭, ১৯) দেবেশ রায়ও সেই কাজটিই করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’ উপন্যাসের ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ আখ্যানে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’-র উল্লেখ সরাসরি। শুধুমাত্র উল্লেখই নয়, কালী সাঁতারার মতো শিক্ষিত ভদ্রলোক কুশীলব নিরক্ষর সশস্ত্র দ্রোহী বসাই টুডুর কাছে এলে ওই উপন্যাসের বিশেষ একটি অংশের কথা মনে পড়ে তাঁর।¹⁹ দু’টি উপন্যাসের আখ্যানস্থ কালের ফারাক থাকলেও সহিংসা-অহিংসা ও বৃদ্ধ বিপ্লবী-তরুণ বিপ্লবী দ্বন্দ্বগুলির সাদৃশ্যের জন্যেই এই উল্লেখ। দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’তে যে গয়ানাথ জোতদার, তাঁর সমনামের জোতদারের উল্লেখ তেভাগা আন্দোলনের সময় পাওয়া যায়। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৭ সালে ডুয়ার্সের চালসার মঙ্গলবাড়িতে বড় জোতদার গয়ানাথের খোলানে তেভাগা করতে যান আধিয়াররা; শ্রমিকরাও তাতে সহর্ষ যোগদান করেন।²⁰ দেবেশ উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই গয়ানাথ জোতদার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই কি সমনামী জোতদারকে ক্ষমতালোভী, জমিলোভী, আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতাবান কুশীলব হিসেবে নির্মাণ করলেন? একটি বইয়ের আরেকটি বইয়ের সঙ্গে কথা বলা আখতারুজ্জামানের ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ ও মিহির সেনগুপ্তের ‘বিষাদবৃক্ষ (২০০৫)’-র পাঠে টের পাওয়া যায়। এই যোগসূত্রে দু’ভাবে স্থাপিত হয়। ১- উপন্যাসের বাইরের সম্পর্ক, ‘অন্তরঙ্গ ইলিয়াস’ বইতে মিহির সেনগুপ্ত যেমন লিখেছেন। আর, ২- ‘বিষাদবৃক্ষ’ উপন্যাসের আখ্যানকাহিনি ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানকাহিনির পরবর্তী কালপর্বে সংযোগ রক্ষা করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ‘বিষাদবৃক্ষ’ স্মৃতিকথন। রাজনৈতিক উল্লেখ থাকলেও, আর্থ-সামাজিক আখ্যাননির্মাণ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের মূল সময়কাল ১৯৪০-র মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ পর্যন্ত আর ‘বিষাদবৃক্ষ’-র সময়পর্ব ১৯৫০ দশকের শুরু থেকে ষাট দশকের শুরু পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গের দু’টি আলাদা স্থানে দাঙ্গা-দেশভাগ কীভাবে ধরা দিচ্ছে দুই লেখকের কথনে, শ্রেণিকার্টামো আখ্যানের ভাষার নির্মাণে কোন ভূমিকা নিচ্ছে এবং স্মৃতিপথ ধরে পিছিয়ে ইতিহাস-মিথ-লৌকিক পরিসরের কোন স্তরে পৌঁছানো যায়, তা দু’টি উপন্যাসের সেতুবন্ধের উপাদান এনে দেয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘দেশভাগঃ আখ্যান রচনার সংকট’ প্রবন্ধে ‘খোয়াবনামা’কে দেশভাগের কেন্দ্রিকতায় দেখতে চাননি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে,

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় দেশভাগ বলেই তার সঙ্গে তেভাগা আন্দোলন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নবসাহিত্যায়ন ও বিচ্ছেদ-সম্প্রীতির ভাষা জুড়ে থেকেছে অনায়াসে। খোয়াবের ভাষায় রচিত হয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে সংকটজনক কালপর্বের অন্য-ইতিহাস। ‘বিষাদবৃক্ষ’ প্রসঙ্গে মিহির সেনগুপ্ত ‘পরবাস’ পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছেন যে,

আমি লিখেছি যে অঞ্চলটুকু নিয়ে, খুবই ছোট জায়গা, একেবারে অজ গ্রাম এবং যে গ্রামটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দাঙ্গার পর। অথচ সেখানে কোনো দাঙ্গা হয়নি। এখান থেকে আমার ট্রমা শুরু। এটা বলতে গেলে এখনও আমার ইমোশন কাজ করে। এটা কী কষ্টকর পর্যায়, যার জন্য আমি কখনোই বলতে পারি না আমাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। (সেনগুপ্ত, ২০১৯)

অথচ, দেশভাগ, প্রিয়জন-বিচ্ছেদের ছায়া আর জোড়া রেনদ্রি-র বিষাদকল্পে বারবার ফিরে যাওয়া স্মৃতিকথনের কাঠামো নির্মাণ করেছে। ‘এই খাল এই বৃক্ষ নিয়েই তো এই আলেখ্য’ (সেনগুপ্ত ২০০৩, ১২)। সাংস্কৃতিক শূন্যতার যে ইতিহাস তৈরি হয় বাংলা ভাগের প্রভাবে, সেই শূন্যতার উল্লেখ বা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক স্তরের নিজস্ব সংলাপ তথ্য-নথিতে কি থাকে? নাকি তা রয়ে যায় স্মৃতিকথনে কিংবা তমিজের না পূর্ণ-হওয়া খোয়াবের ভাষায়? দেশ কী? মানুষের ভালবাসা আর অস্তিত্বের সঙ্গে শাসনকাঠামোর টানাপড়েনে যে কালস্থানিকতা গড়ে ওঠে আখ্যানে, সেখান থেকে বাস্তবকে কীভাবে ফিরে দেখা যায়?

‘ধর্ম’ যে কখনও স্মৃতিপথ ধরে জেগে ওঠে, ধর্ম যে কখনও খুব অপ্রকাশ্যে ফল্গুধারার মতো আমাদের বিশ্বাস-আচরণের ভেতর বয়ে চলে, তার উদাহরণ থাকে ‘খোয়াবনামা’ ও ‘বিষাদবৃক্ষ’তে। দেশভাগের পরেই ভূগোল-শিক্ষক নীরেন লাহিড়ীর পিসেমশাই ভারতে চলে যান। নীরেনের প্রিয় ছাত্র বাবরের বাবা আব্দুল আজিজ খুব সস্তায় কিনেন নেন কালীতলার সেই বাড়িটি এবং নিজেদের পছন্দমতো বাড়ির সংস্কার করেন। বাবরের ‘নতুন’ বাড়িতে বেড়াতে এসে বাবরের ‘প্রিয় স্যার’ নীরেন আবিষ্কার করে এটাই ছিল কার্তিক ভাদুড়ির বাড়ি এবং

পিসিমার কনকচাঁপা গাছ, পঞ্চজবা ফুলগাছ না-থাকাটাও আবিষ্কার করে। এই দুই আবিষ্কারের মুহূর্ত যে বিষাদবাপ্প জাগিয়ে তোলে নীরেনের মনে, তা পরিণতি পায় পিসিমার একদা-ঠাকুরঘর কিন্তু এখন বাবরের পড়ার-ঘরে ঢুকে। নাস্তিক নীরেনের স্মৃতিতে পিসিমা আর ঠাকুরঘর সমার্থক হয়ে যায়, '৪১ সালে মৃত পিসিমা ও দেশছাড়া পিসেমশাই যাঁদের আর কোনওদিন কালীতলায় ফেরার সম্ভাবনা নেই, তাঁদের গাছ-ঠাকুরঘরের স্মৃতিই নীরেনকে দিয়ে বলিয়ে নেয়, 'এটা আমার পিসিমার বাড়ি (ইলিয়াস, ২৬৩)'। অদূরে তখন জনৈক ধর্মোন্মাদ গুক্কুর আলির নেতৃত্বে হিন্দুপাড়ায় আক্রমণ ও হত্যা-বাড়িদখল চলছে এবং বাড়ির ভেতরে আব্দুল আজিজের বিবি কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুদের হাতে ভাইয়ের খুনের আতঙ্কে প্রলাপ বকছে- ঠিক সেই সময় পৈতে দিয়ে খাতা সেলাই করা নীরেনের নাস্তিকতা থেকে পিসিমার স্মৃতিতে ফেরা ইঙ্গিতবহ,

এখন তার প্রিয় ছাত্রের দেওয়াল জুড়ে টাঙ্গানো পৃথিবীর মানচিত্র, আলমারির ওপর গ্লোব, বাবরের টেবিলে ইন্সট্রুমেন্ট বক্স, রঙের বাক্স, বইখাতাপত্র। তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলো দেখেও ঠাকুরের অভাবে নীরেনের বুকটা পিসিমার জন্যে হুহু করতে থাকে।
(ইলিয়াস, ২৬৬)

ধর্মবোধের এহেন আবিষ্কার ইলিয়াসের আগে বাংলা উপন্যাসে বিরল। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাস 'আনন্দমঠ (১৮৮২)' ধর্মবোধ আবিষ্কার হয় পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উপন্যাস 'গোরা (১৯০৮)'-তে ধর্মবোধের আবিষ্কার গোরার আত্মানুসন্ধানের ফসল। পরবর্তী প্রগতিশীল উপন্যাসিকেরা ধর্মবোধের প্রসঙ্গ তাঁদের আখ্যানকাহিনি থেকে এড়িয়ে গিয়েছেন। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস চল্লিশের দশকের পর থেকে মার্ক্সবাদী ছোঁয়াচ পেয়ে ও 'সমাজবাস্তবতাবাদ'-র সূত্র বুঝতে চেয়ে ধর্মচেতনাকে সরিয়ে রেখেছে। হয়তো ধর্ম শুধুই 'আফিম' বলে মনে হয়েছে তাঁদের। প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সতীনাথ ভাদুড়ী, যিনি টোড়াইকে নির্মাণ করলেন ধর্মগ্রন্থসম 'রামচরিতমানস'-র আদলে। বাংলা প্রগতিবাদী উপন্যাসে শ্রেণিবোধকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ধর্মবোধকে নস্যাত্ত করার প্রবণতা প্রবল হল। কিন্তু, ইলিয়াস

এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান নি। উপমহাদেশে শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ অবিচ্ছেদ্য থেকে আর্থ-সামাজিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে- রাজনৈতিক উপন্যাসের ব্যক্তিমানুষ ও সময়কে খুঁজতে গেলে তাই ধর্মবোধকে অস্বীকার করা চলে না। ইলিয়াস সেই সত্য জানতেন। ‘খোয়াবনামা’ শ্রেণি ও ধর্মের বহুস্তরীয় উপাদান মিশিয়ে নিয়েই আখ্যানবুনন করলেন। নীরেনের ধর্মবোধ স্মৃতিপথ ধরে জেগে ওঠে; এর সঙ্গে ধর্মোন্মাদনার সম্পর্ক নেই, ধর্মীয় বিদ্বেষের সম্পর্ক নেই। বরং ধর্মীয় উগ্রতার এক সন্ধিক্ষণ (১৯৪৬-৪৭) পেরিয়ে এসে সম্পর্কের-স্মৃতির শূন্যতাকে অনুধাবনের চেষ্টা রয়েছে। হিন্দু নীরেনও কিন্তু দেশভাগের পরে ‘সংখ্যালঘু’ হয়েও পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাচ্ছে সেই সমস্ত সম্পর্কের ও স্মৃতির শূন্যতাকে বহন করেই। মিহিরও থেকে গেছিলেন, অন্ততঃ ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত। ‘বিষাদবৃক্ষ’তে দাঙ্গা-দেশভাগের ঢেউ যখন পিছারার খালের দুই তীরবর্তী বসতঅঞ্চলে এসে লাগে, তখন নিস্তরঙ্গ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে আলোড়ন ওঠে। মিহির সেনগুপ্তের কথনে, সেই সময়টা তালুকদার ও অন্য উচ্চবর্গীয় সম্ভ্রান্তদের দেশছাড়ার সময়, সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধ স্থলনের সময় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার সময়। প্রতিবেশীর দেশত্যাগ কিশোরবয়সে যে ক্ষতস্থান তৈরি করে, স্মৃতিকথার বয়ানে তা আসে,

তার দেশত্যাগের সাথে সাথে আমার পিছারার খালের জগৎ তার আধুনিকতার প্রবেশের পথটিই হারিয়ে ফেলল... জীবন তেতো বোধ হতে শুরু করল আমার আশপাশের বিশেষ বিশেষ মানুষদের অন্তর্ধানের সময় থেকে। (সেনগুপ্ত ৪৮)

আর, এরই সঙ্গে যোগ হয় ‘হিন্দু’ মেয়েদের সঙ্গে ‘মুসলমান’ ছেলেদের বিবাহের দু-একটি ঘটনা কিংবা আশপাশের অঞ্চল থেকে আগত খবর ও গুজব। মিহিরের বাবার পিসিমা (যাঁকে মিহিররাও পিসিমা বলতেন) যখন এই সমস্ত ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ভবিষ্যতের সুরক্ষায় ‘হিন্দুস্থানে’ চলে যান, এক সাংস্কৃতিক শূন্যতা তৈরি হয়। ঠাকুর-দেবতা বা ধর্মাচরণ নিয়ে কখনই বিশেষ ভাবিত না হলেও পিসিমাকে ঘিরে থাকা পার্বণ, ব্রতকথা, মানত, পাঁচালি ইত্যাদির অবসানে সর্বোপরি একটি যুগের অবসানে বিচলিত হন মিহির,

এইসাথে আমাদের ব্রতকথা, পাঁচালি, বিভিন্ন খেলার মোচ্ছব এবং সমুদয় কিংবদন্তীর যুগের অবসান হল। এরপর আর এমন কেউই থাকলনা যে প্রতিটি ক্রান্তিকালে বা সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্লবতার সময় সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্নের কথা কাহিনি শুনিয়ে আতঙ্কিত জনেদের খানিক আশ্বস্ত করতে পারেন। (সেনগুপ্ত, ৮৩)

থেকে গেলেন মিহির ও বাকি পরিবার। কিন্তু, বিচ্ছেদজনিত এই শূন্যস্থান পূরণ হল না। ‘বিষাদবৃক্ষ’-র কথনে লেখকের বয়ানে বারবার তাই ফিরতে থাকে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদবেদনা। মিহিরের ‘পিসিমা’র মতোই প্রাণের চেয়ে ‘ইজ্জতের’ ভয় থেকেই যে বিপুল পরিমাণ দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছিল এবং সাংস্কৃতিক আবহে ক্রমেই দূরত্ব বাড়ছিল নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানে, সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দেশভাগঃ স্মৃতি আর সত্তা’ বইতেও,

নানারকমের গুজব আর বিক্ষিপ্ত কিছু বাস্তব ঘটনা থেকে এরকম আতঙ্ক তৈরি হয় যে, হিন্দুরা ওখানে আর মানসম্মান নিয়ে বাস করতে পারবেন না। হিন্দু মহাসভার সেই সময়কার প্রচারের ধরনটাও ছিল সেই রকম। বলা হচ্ছিলঃ হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতি, মানমর্যাদা, ধনসম্পত্তি কিছুই আর পূর্ববঙ্গে অক্ষত থাকবে না। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১, ১৮)

এই সংস্কৃতি ও মানইজ্জতের অক্ষত থাকা না-থাকার দোলাচল উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই মিহির উল্লেখ করতে ভোলেন না পূর্ববঙ্গের হিন্দু তালুকদার বা জমিদারদের উন্নাসিক মনোভাব ও অন্য সম্প্রদায় বা বর্ণকে সামাজিক প্রথার নাম দিয়ে অচ্ছুৎ করে রাখার সুদীর্ঘ ‘অপ’সংস্কৃতি। দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানে একদিকে যেমন এই তালুকদার-জমিদারদের আধিপত্য খর্ব হওয়ার অক্ষম হতাশা ছিল, তেমনই ছিল পুরনো আভিজাত্যের অহংকার টিকিয়ে রাখার মরিয়া প্রয়াস। মিহির তাঁর কৈশোরের স্মৃতিকথনে এর’ম বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর জ্যাঠামশাই বা ইস্কুলের কিছু শিক্ষক কীভাবে সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের দোহাই পেড়ে ঘৃণার চাষ করতেন গ্রাম্যসমাজে,

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত ব্যক্তিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রায় অশিক্ষিত অবস্থাপন্ন কোনও মুসলমান হতেন এবং জ্যাঠামশাইয়ের হাতের পুতুল হয়েই থাকতেন... মুসলমান মানেই তাঁর দুশমন। বিশেষ করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ক্ষমতাভোগে তাঁর ভূমিকা থাকবে না, এ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। (সেনগুপ্ত ১৯৩-১৯৯)

স্মৃতিকথনে এই অভিজাতবর্গের ভাষা ও বিভিন্ন লজের উল্লেখ করেছেন মিহির। ভাষার ব্যবহারে সাংস্কৃতিক আধিপত্য কীভাবে প্রসারিত হয় এবং নিম্নবর্গের ওপরে খবরদারির এক হাতিয়ার যে ভাষাও, তা এঁদের বাকভঙ্গিতে উঠে আসে মিহিরের কথনে, যখন জ্যাঠামশাইয়ের বাচনভঙ্গি তুলে আনেন তিনি, ‘মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাঠামশাই এই ‘ইনশাল্লাহ’ শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করতেন ব্যঙ্গার্থে’ (২০২) এবং নব্য-তালুকদার বা সম্পন্ন মুসলিম কৃষক সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা (যে ভাষা সেই কৃষক বুঝবে না), ‘He is virtually a fool and he must pay for his foolishness’ (২০০)। এই যে মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক উত্থান এবং আধুনিক শিক্ষায় ‘উচ্চবর্ণ হিন্দু’দের একচেটিয়া অধিকারের বিপরীতে মুসলিম তরুণ সমাজের উঠে আসা, এতে হিন্দু ভদ্রলোকেরা আতঙ্কিত হতে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই। অখণ্ড বাংলা নয় বরং যে কোনও মূল্যে বাংলা খণ্ডিত ক’রে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য থেকে নিজেদের ‘আলাদা’ করা, হিন্দু মহাসভার এই উগ্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক সন্দর্ভে বহু হিন্দু ভদ্রলোক গা ভাসিয়েছেন এই জন্যেই। সন্দীপবাবু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন,

‘পাকিস্তান’ যে শুধু একটা রাজনৈতিক দাবি নয়, হিন্দু আধিপত্য থেকে মুসলমানের মুক্তি আর তার আত্মমর্যাদার চেতনাও যে ওই দাবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এটাই সম্ভবত বুঝতে চায়নি উন্নাসিক হিন্দু মানসিকতা। মুসলমান চাষি যে কোনদিন হিন্দু জমিদারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে, এটা বোধহয় তাঁদের কল্পনাতেও ছিল না। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১, ১৮)

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে ডাক্তার শিশির সেনের হিন্দু কম্পাউন্ডারের ছুৎমার্গে আহত হয় আব্দুল আজিজ ও শরাফত মণ্ডল; এর সঙ্গেই তাঁরা বোঝেন যে নিজেদের ধর্মের একজন ভাল ডাক্তার এবং ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ কেন প্রয়োজন। মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণি তাঁদের ভাষ্যে ঢুকিয়ে দিতে থাকেন ‘আমরা-ওরা’র বিভেদ এবং প্রভাবিত করতে থাকেন নিম্নবর্গের মানুষকে। কখনও মুক্তির স্বপ্ন দেখা কৃষকের ‘তেভাগা’-র স্বপ্নে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হন ধর্মের বীজ; সমাজবদলের সাম্যকে জাতিগত বঞ্চনামুক্তির অন্ধকুঠুরিতে নিয়ে যান; ডাক্তার সাহেব ও কাদেররা আলোচনা করে,

দেখেন না, শিক্ষাদীক্ষা, স্কুল কলেজ, কোর্ট কাছারি, অফিস, বিজনেস সব হিন্দুদের হাতে। মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট। পাকিস্তান ছাড়া মোসলমানের টেকার পথ নাই।
মোসলমান কী ছিলো আর আজ কোথায় নেমেছে... (ইলিয়াস ৯৫)

আর, খেয়াল করলে দেখা যায় যে, এই শেষ বাক্যটির ভেতরে থেকে যাওয়া জবরদস্তি হীনম্মন্যতার ভাষা আজও বহমান। উগ্র ধর্মবাদীরা, উগ্র জাতিবাদীরা ঠিক এই বয়ানেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা আর জাতিপ্রেম জাগিয়ে তোলে, ‘অপর’ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার সমস্বর নির্মাণ করে।

স্মৃতিকথনে এই সম্প্রদায়গত নবনির্মাণের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকলেও, মিহির বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তা পরিহার করেন। তাঁর আখ্যানে দুই সম্প্রদায়ের ন্যায়-অন্যায়ের কথাই থাকে। বরিশাল দাঙ্গার²¹ প্রভাবে বিধ্বস্ত সম্ভ্রান্ত ‘ঘোষ পরিবার’-র মাসিমার নিম্নবর্গে পতনের আখ্যানে জড়িয়ে থাকে ট্রমা বা আতঙ্কের অনুষ্ণ। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ধর্ষিতা সেই মাসিমার নিজের পরিবার তাঁকে আর গ্রহণ না করলেও, এক মুসলিম পরিবারই তাঁকে আশ্রয় দেয় ও শুশ্রূষা করে। আবার, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের গোঁড়া সাম্প্রদায়িক কর্মচারীর প্রতিহিংসামূলক মনোভাবে পরীক্ষা দিতে না পারলেও, সেই কলেজেরই উদারমনা অধ্যক্ষের স্নেহশীলতার বিবরণ দেন তিনি। দেশভাগ আর দাঙ্গার আতঙ্কদিনে যখন ন্যায়নীতির দুনিয়ায় ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে

যাচ্ছে, যখন যুক্তিবোধ ভেসে যাচ্ছে আবেগ ও গুজবের প্রাবল্যে, তখন শাসকশ্রেণির নির্মিত বয়ানেই চালিত হয় আমাদের আদর্শ, মূল্যবোধ। আশিস নন্দী যে ‘collapse of the moral Universe’²² উল্লেখ করছেন, তখন দাঙ্গা-প্রতিরোধকারীদের ভাষার থেকেও ধর্মীয় উস্কানির এই ভাষা অনেক সহজে পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের কাছে, তাদেরকেও হত্যালীলায় অংশগ্রহণ করিয়ে নিচ্ছে। আর, এই সমস্যা তো এখনো প্রবহমান।

‘বিষাদবৃক্ষ’-তেও ভাষা কখনও হাতিয়ার হয়ে ওঠে, স্মৃতিকথনের ব্যক্তিগত পরিসর ভেঙে উঠে আসে নিম্নবর্ণের প্রতিবাদ। দেশভাগ ও দাঙ্গা পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটের যুগে এবং বিলুপ্ত না হওয়া শ্রেণিবৈষম্যের কাঠামোয় যখন ধর্মীয় অনুশাসন ও সামন্ততান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাকতে চাইছে, তখন পুতুল-কাসেমের কথা আসে মিহিরের স্মৃতিকথনে। মুসলমান কাসেমের সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দু বিধবা পুতুলের বিয়েতে ‘রাড়ি মাইয়াডারে কাসেমইয়া বাইর করইয়া নেছে’ (৫৮) বয়ান ছড়িয়ে পড়ে পিছারার খালের তীরবর্তী অঞ্চলে; ফলে, দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ আরও গাঢ় হয় এবং কাসেমের পরিবার ও পুতুলের পরিবার সমাজে একঘরে হয়ে যায়। এরপর গ্রাম্য বিচারসভা কাসেম-পুতুলের প্রণয়কে ‘অবৈধ’ দাগিয়ে অকথ্য গালাগালিতে আক্রমণ করলে, পাল্টা প্রতিরোধে যায় পুতুল-

আফনেরা এহানে য়ারা য়ারা আছেন, বেয়াকের ধারে কই, মোরে আর মোর ঐ মাইয়াডারে দুগ্গা ভাত দেওয়ার কেউ আছেন এহানে? মোগো ভাত জোডেনা। মোর বাপ জেডারাও এহানে হাজির... দেবেন কেউ মোগো দোবেলা দুগ্গা ভাত? (সেনগুপ্ত, ৫৮)

সমাজের মুরব্বিদের অসহায়তার মুখে ফেলা এই প্রশ্নবাণে একটাই কথা ক্ষুরধার হয়ে জেগে থাকে- ক্ষুধা; যার সামনে যে কোনও ধর্মাত্মতা বা পুরুষতান্ত্রিকতা অসহায়। এই প্রশ্নই উত্তর পায় কাসেমের দৃঢ় জবাবে- ‘মুই দিমু। লও, তুমি আর তোমার মাইয়ারে লইয়া মুই গঞ্জৈ যাইয়া থাকুম। তোমার মাইয়া মোরও মাইয়া ইনশাল্লা’ (৫৮) সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটঘন মুহূর্তেও

নিম্নবর্ণের এই প্রতিরোধ কিন্তু হারিয়ে যায় না। বিভিন্ন রটনায় ও সংকটে এরপরে ওই অঞ্চলের অনেক নিম্নবর্ণই উদ্বাস্তু হয়ে চলে যায় ভিন্ন শহরে-গ্রামে বা হিন্দুস্থানে। এমনকি, এর পেছনে যে একদল দালালের বাড়িঘর দখলের স্বার্থে স্বেচ্ছাও কাজ করেছে, একথাও মানেন মিহির। মূলতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিম্নবর্ণ/বর্ণের প্রতি ও মুসলমানদের প্রতি অপমান-অশ্রদ্ধা এবং মুসলিম লিগের নেতাদের ধর্মীয় উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের বহু উদাহরণই মিহিরের এই স্মৃতিকথনে রয়েছে। ‘খোয়াবনামা’-র মতো এই আখ্যানেও থাকে গ্রামসমাজের অপরিবর্তনশীল কিছু বিভেদকামী মনোভাব। তাই, ‘যুগীরা জোলাদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না, কেননা তারা জাতিত্যাগী হয়ে মোছলমান হয়েছে’ (৬২) কিংবা ‘ছোডোলোগেরা য্যান্ হারগো [হিন্দু ভদ্রমহিলাদের] ছুরং না দ্যাহে’ (১২) মনোভাবের পরেও ঠিক থেকে যায় জারিগান, থেকে যান কাসেম মাস্টার যিনি কথকের বাবাকে উর্দু শায়েরি শেখান এবং ‘আন-আল্-হক’-র মর্মার্থ বোঝান, “আপনি হিন্দু আমি মুসলমান। আপনাকে যদি আমি মহব্বত করি, তার জন্য আমার সমাজ আমার বদনাম করে। আপনার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই হয়। জনাব, এ এক ধরনের ‘জাহিলিয়াৎ’। এই জাহিলিয়াৎ মানুষকে ধ্বংস করে।” (সেনগুপ্ত, ৬২) ‘বিষাদবৃক্ষ’তে নিম্নবর্ণের প্রতিরোধের আখ্যান থাকে মুসলমান-প্রধান বাউলকান্দা গ্রামে, ‘গাজি সাহেবের সম্পর্কে খ্যাতি ছিল, তিনি দাঙ্গাবিরোধী। একান্নর দাঙ্গার সময়ে গাজি একটি বাহিনী [দাঙ্গাবিরোধী] গঠন করেছিলেন’ (৬০)। ‘৫০ দশকের শুরুতে ও মাঝামাঝি ‘ভদ্র গৃহস্থেরা’ মান খোয়াবার আতঙ্কে উদ্বাস্তু হলেও ‘অ-ভদ্রলোকেরা’ তথা যুগী, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, কামার, নমঃশূদ্ররা থেকে গেছিলেন তাঁদের গ্রামে। ‘খোয়াবনামা’-র পোড়াদহের মেলার মতো মিহিরদের গ্রামেও হত ‘তেন্নাথের মেলা’, যেখানে প্রবেশাধিকার সমস্ত ধর্মের মানুষের। কেরামত আলির মতো রাখাল নাগরালি আছে ‘বিষাদবৃক্ষে’, যাঁর গানে সম্প্রীতি আর বিচ্ছেদের বিষাদ থাকে,

শোনে শোনে আছেন যত হিন্দু মুছলমান

নেক নেক্কর ইমানদারির হইল অবসান।

বন্ধুর ঘরে বন্ধুর আর বওয়ার দলুজ নাই,

হিন্দু মোছলেম জুদা হইল আখেরে সবাই।। (সেনগুপ্ত ১৫০)

মিহিরের স্মৃতিকথনে উঠে আসে নিম্নবর্ণের সেই মানুষদের কথা, যাঁরা এই বিচ্ছেদের আজাদি মানতে পারেননি। নিম্নবর্ণীয় নাগরালি ‘অমার্জিত’ ক্রোধের ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বাধীনতাকে, ‘বালের আজাদি। প্যাডে নাই ভাত, ল্যাঙ্গে নাই কাপড়, মোরা স্বাদিন দ্যাশের নাগর।’ (১৫০) কথক দেখেন, কীভাবে নিম্নবর্ণের সংস্কৃতিতে আঘাত করা হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসনে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-শিল্পকে ‘হিন্দুয়ানি’ মুক্ত করার প্রাণান্ত প্রয়াস শাসকশ্রেণির। জারিগান, শারদোৎসব শেষে যার আসরে মূল গায়ক-শ্রোতা ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানেরা, সেই গানগুলোর ভাষায় দখলদারি চালানো হয়েছে ধর্মের নামে, বদলানো হয়েছে বন্দনার শব্দ- “কী ভাবে সাধারণ মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগতে হানাদারি হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু আর মুসলিমে যেরকম মেলামেশা হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধহয় তেমনটা হয়নি। সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে, লোকায়ত স্তরে কলুষিত করছে যারা।” (সেনগুপ্ত, ১৮৯)

যে কোনও লেখাই পাঠকের সঙ্গে চায় সংযোগ ঘটাতে। পাঠককে দেখাতে চায় তার এতদিনের চেনা পাঠ ও স্মৃতির বাইরের অন্যপথ। আর, উপদ্রুত সময়ের আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভাষা, ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানেও ভাষা তার শ্রেণিচরিত্র খুঁজে খুঁজে ঠিক বসে যাচ্ছে সংলাপে। ফলে, সংলাপের মধ্যে লেখকের শ্রেণিচরিত্র কিংবা মান্যভাষার অভিজাত শ্রেণিচরিত্র আধিপত্য কায়ম করেছে না। ‘বিষাদবৃক্ষ’ স্মৃতিকথন বলেই এবং কথকের ‘হিন্দু-ভদ্রলোকীয়’ শ্রেণি অবস্থানের জন্যেই আখ্যানের ভাষায় কথকের নিজস্ব মতাদর্শ থাকছে। তবুও বহুক্ষেত্রেই সংলাপের বহুস্বর প্রতিটি শ্রেণিচরিত্র প্রতিফলিত করছে, ‘অথর্’-র স্বরের অধীন তারা নয় এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র স্বরের গুরুত্ব উপন্যাসের বুনাট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উপন্যাসপাঠে বাখতিন যে ‘polyphony’-র অবতারণা করছেন, তার অর্থ বহুস্বর। অথরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে প্রতিটি স্বরের নিজস্বতা রয়েছে, তাৎপর্য রয়েছে, স্বীয় দিশা রয়েছে

এবং উপন্যাসের আখ্যানবুননে প্রতিটি স্বর নিজস্ব আখ্যানভার বজায় রাখে।²³ ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-তে ভাষা সচেতনভাবেই রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়, হিংসা ও আতঙ্কের কালপর্বকে সেই ভাষাতেই বিবৃত করে। উপন্যাসের শেষদিকে, দেশভাগের মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় পাকুড়গাছ, যেখানে বসতি ছিল মুনসির ভূতের তথা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সেই দ্রোহপুরুষের। বৈকুণ্ঠ গিরি, কুলসুম, তমিজ খুন হয়, চেরাগ আলির শোলোক আর জাগে না। মিহিরের রেইন-ট্রিও তো থাকে না আর, পিছারার খালের দু’তীরের হিন্দু-মুসলিম বসতির ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস শুধু জানত জোড়া রেনট্রি। বিভাজনপর্বে ও বিভাগান্তর সময়ে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ট্রমা, আতঙ্ক ও নিঃসঙ্গতা তৈরি হয়, তা কোনও নথি-দলিলে লেখা থাকে না। নীরেনদের স্মৃতিতে আর হেরে যাওয়া কাসেম মাস্টারের স্মৃতিতে থাকে। আতঙ্কের ছাই রঙের মেঘ তাড়ালে লালনযোগ্য স্মৃতিরা বালসে ওঠে, দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন ইতিহাস-স্মৃতি-সত্তা-সাহিত্যের নিয়ত দ্বন্দ্বের,

For a historical analysis of the event of the partition, the event itself would have to be fundamentally open to explanation. What cannot be explained normally belongs to the marginalia of history - accidents, coincidences, concurrences that remain important to the narrative but which can never replace the structure of causes that the historian looks for. (Chakrabarty 1996, 2143-44)

‘বিষাদবৃক্ষ’-র কথক নিজ সম্প্রদায়ের বা প্রিয়জনের আঘাতে আহত হলে খোয়াবে আসে ইসমাইল-আজেরার কাহিনি। কথনের ভাষায় থেকে যায় অন্য-সংস্কৃতির শব্দ, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ। পিসিমা স্বপ্ন দেখতে থাকেন ‘হিন্দুস্তান-পাকিস্তান বেয়াক ভাগাভাগি মিডইয়া গেছে। বেয়াক কিছুই আবার আগের লাহান’ (সেনগুপ্ত, ৭৯)। আতঙ্কের দিনরাত্রির পরেও তো এই খোয়াবগুলো থেকে যায়। ‘খোয়াবনামা’-র বৈকুণ্ঠও তেমনই খোয়াব দেখত। দেশভাগের পরে সে কোনও অক্ষয়

বিশ্বাসে বহু অপমান নিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের বাসভূমিতে থেকে যায়। তার অল্পসংস্থানের উর্ধস্তন কর্তা মুকুন্দ সাহা কলকাতায় চলে গেলেও বৈকুণ্ঠ থেকে যায় ভবানী পাঠক আর মজনু শাহের যুগলবন্দীর শোল ও কীর্তনসুরের খোয়াব বাস্তবায়নের আশায়।

‘চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)’-এর ওসমান ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। আর, ইলিয়াস সচেতনভাবেই ওসমানের শিকড়ের বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস রেখেছেন। “ওসমানের ভেতর প্রথম থেকেই একটি rootlessness আমি তৈরি করতে চেয়েছি। তার একটা ভিত্তি তৈরি করা দরকার ছিলো। তার physical ভিত্তিটা তৈরি করলাম Indiaতে তার originটা দেখিয়ে।”²⁴ ওসমানের মধ্যে এক অসহায় দিশাহীনতা খেলা করতে থাকে ওইজন্যেই। শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮)’ উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান জনতার উল্লেখ, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চিহ্নক, তাদের ধর্মীয়-সামাজিক স্বাভাব্য এবং আখ্যানের গতিপথে বিভিন্ন উপাদানগুলি চিনে নেওয়ার ব্যপ্ত পরিসর থাকে। শহীদুলের উপন্যাসটি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মোচন করে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরে লক্ষ্মীবাজার মহল্লায় দু’জন টিকে থাকে, খাজা আহমেদ আলী ও বদু মওলানা- উল্লেখ্য, বদু রাজাকার এলাকার আতঙ্কের মূল কারণ এবং খাজা আহমেদ জনশূন্য “লক্ষ্মীবাজারে একমাত্র তিনি বাতি জ্বালিয়েছিলেন।” (জহির ২০১৩, ৩১৯) বদু মওলানার নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী মহল্লায় যাঁদের খুন করে, তার মধ্যে অন্যতম খাজা আহমেদ আলী ও তাঁর সন্তান খাজা শফিক। খাজা শফিককে মিলিটারিরা গুলি ক’রে মারলে খাজা আহমেদ ছাদে উঠে আজান দেন। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, “আজানের মাঝখানে তাকে গুলি করা হয়, তারা তা মেনে নিতে পারে না। তারা বলে যে, তিনি আজানের শেষে চারবার মহল্লার সকলকে বলেছিলেন যে, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ। তারা বিভ্রান্ত বোধ করে এবং তাদের এই বিভ্রান্তি আজীবন থেকে যায়।” (৩০৬) ‘মহল্লার লোকেদের’ জ্ঞাত পরিসরে আখ্যানবস্তুকে সাজিয়ে নেন শহীদুল এবং সেই আখ্যানবস্তুতেই ধরা থাকে রাষ্ট্রের কাছে সাধারণ মানুষের অসহায়তার কথা। ‘আল্লাহই শ্রেষ্ঠ’ বিশ্বাস এবং আজান রাষ্ট্রের বুলেট থেকে

বাঁচাতে পারে না; যে মিলিটারি গুলি চালাচ্ছে, তাদেরও ইস্ট সেই আল্লাহ্‌ই! লক্ষ্মীবাজার মহল্লা সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিভূ হয়ে ওঠে কারণ একাত্তরের মার্চ-ডিসেম্বরের পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান-বিরোধী মানেই রাষ্ট্রের শত্রু, তা সে মুসলিম বা হিন্দু যাই হোন না কেন। তুলসীগাছ এবং জবাগাছকে হিন্দুদের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়ে উন্মত্ত হিংস্রতা চালায় বদু মওলানার নির্দেশিত রাজাকার ও খানসেনারা। শওকত ওসমানের লেখায় উল্লেখ থাকে হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রাম কীভাবে 'কতলে আম (গণহত্যা)'-র শিকার হয়ে জনশূন্য হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চিহ্নগুলিও ছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই সমস্ত ঐক্যচিহ্ন উপড়ে ফেলে বিদ্বেষকেই প্রাধান্য দেয় রাষ্ট্রনেতারা।- পূর্ব পাকিস্তানের জন্মে ও বৃদ্ধিতে এই ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের উল্লেখ সাহিত্যিক শওকত করেছেন, "যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমান শুধু জীবন-যাপনের আবশ্যিক ধারায় এক রেখাতে দাঁড়াতে বাধ্য। পারস্পরিক সহযোগিতা এখানে সমন্বয়ের কাজ করে যায়... মুসলমানের মহরম। কিন্তু ঢোল বাজায় ঢুলী। সমন্বয়ের এই রাখী ছিঁড়েই পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় থাকে না।" (ওসমান ২০০৯, ২০) মহল্লায় বদু মওলানার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ফের ধর্মান্ধতা-মিশ্রিত রাজনীতির চিহ্নায়ক হয়ে থাকে।

ভূত, প্রেতচর্চা ও আখ্যানের রাজনীতি

'ভূত'^{২৫} উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় আলোচ্য উপন্যাসগুলোর কাহিনিনির্মাণে। 'ভূত' শব্দের একাধিক অর্থ যথা মৃতের আত্মা, দেবযোনি, অশরীরী, অতীত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শাস্ত্রীয় উপাদান, ক্ষিতি অপ্‌তেজ মরুৎ ব্যোম। জীবন্ত কুশীলবেদের পাশাপাশি মৃতরাও আধিপত্য করে এইসব পাঠে, কখনও বা বর্তমানকে ছাপিয়ে তারাই কেন্দ্রস্থান দখল করতে চায়। 'খোয়াবনামা', 'চিলেকোঠার সেপাই', 'হারবার্ট', 'কাঙাল মালসাট'- এই সমস্ত উপন্যাসে একাধিক কুশীলব দেখি

মৃত। কেউ আখ্যান শুরুর আগেই মারা গেছে, কেউ বা আখ্যান চলাকালীন; কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে না কেউই। কথকও প্রশ্নই দেন এইসব ভূতদের উপস্থিতিতে। ভূত না জীবিত না মৃত, না অনুপস্থিত না উপস্থিত, না বাস্তব না অবাস্তব বরং অতীত ও বর্তমান দু'ইই, যার অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য ও বিভ্রমজনক দু'ইই, 'It can be a translucent vision, an echo without a communicating body, something forgotten that remains in place, or a recurrence without a future'²⁶ 'হারবার্ট'-র কথক আবিষ্কার ক'রে ফেলেন "মানুষ যদি ১ হয় তাহলে ০ হল মরা মানুষ। মানুষ + মরা মানুষ = ১ + ০ = ১ = খোড়োরবি²⁷" এই সূত্র। 'কাঙাল মালসাট'-এ দণ্ডবাস আর বেগম জনসন তো কবেই মৃত, পুরনো শতকের ও পুরনো কলকাতার বাসিন্দে, তবু তাঁরাই বর্তমানের ফ্যাটাডু চোজারদের বিদ্রোহের দিনক্ষণ আর নীতি-কৌশল ঠিক ক'রে দেন। ভূতেরা কালিপুজোর রাতে দখল ক'রে নেয় কলকাতার আকাশ ও অলিগলি। অতীতের বিভিন্ন বস্তু নতুন ব্যবহারে ফিরে আসতে থাকে একুশ শতকের শুরুতে। দেরিদা তাঁর 'Spectre of Marx' গ্রন্থে প্রেত (ghost) থেকে ভূত (specter)²⁸ ধারণায় পরিবর্তিত করছেন। অস্তিত্ব অনস্তিত্ব বা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন তেমন বিবেচ্য নয়, বরং আলোচনার মূল কেন্দ্র সরে যাচ্ছে 'spectral quality'তে, অবস্তুগত অস্পর্শযোগ্য দশায়।²⁹ 'for Derrida, specters are a perceptible manifestation of conditions that are immaterial and immeasurable and, as such, we should learn to live with them'³⁰ 'পেদ্রো পারামো' উপন্যাসে মেহিকোর কোমালা জনপদের মৃতদের কথোপকথন পাঠককে সচকিত রাখে পাল্টানো সমাজ সম্বন্ধে। নগরায়ণের আর্থ-সামাজিক ধ্বংসস্তূপে সুসানা, দোন পেদ্রো, প্রেসিয়াদো সকলেই কোমালা জনপদের ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কার আঁকড়ে থাকে। 'বিলাভেড' উপন্যাসে সেথ, পল ডি, ডেনভাররা একইসঙ্গে বর্তমান ও অতীতে বাঁচে, একই সাথে তারা মৃত ও প্রবলভাবে জীবন্ত। উনিশ শতকের আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ, নিপীড়িত কৃষগঙ্গ ও শোষক শ্রেতাঙ্গরা আখ্যানে জেগে ওঠে, পাঠকের সঙ্গে সাঁকো গড়তে চায়। এই ভূত আসলে কারা?

Ghosts often operate in magic-realist fiction as disembodied memorialisations of a trauma experienced by the subaltern, normally in the past. Given that the non-subaltern, or controlling, agencies of society are actively involved in suppressing knowledge of trauma of this kind, it is not surprising that, from an empiricist-official point of view, ghosts do not exist. Ghosts, thus, rupture the socio-spatio-temporal membrane of society and, in magic-realist fiction, operate as traces of subaltern trauma. (Hart 2007, 87)

সমাজের শোষিত-নিপীড়িত যে আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রাখে ক্ষমতামূলক উচ্চবর্গ, তাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসে এই ভূতেরা। নিম্নবর্গের আতঙ্কের স্মৃতি, না-পাওয়া আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-মুহূর্তের অবদমিত স্মৃতি অতীতের অবশেষ বা ভূত হয়ে ফিরে আসে। শুধু খোয়াবনামায় নয়, ‘চিলেকোঠার সেপাই’তেও তাই। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-র খিজির, লুস্পেন প্রলেতারিয়েত, উচ্চবর্গের শাসনের বলি হয়। তার ভূত জীবন্ত থাকে ওসমান নামক ওই মধ্যবিত্ত প্রোটোগনিস্টের চেতনায়। তাড়িয়ে নিয়ে যায় দ্রোহের দিকে, দোদুল্যমানতা থেকে মুক্তি দেয়। খিজির যে আশ্চর্য মিছিল দেখত, ওসমানও সেই মিছিল দেখতে পায়। ওসমানের দেখা মিছিলে ইতিহাসের ধুলো মেখে উঠে আসে এককালে শাসকদ্বারা অবদমিত মানুষেরা। সেই মিছিলে আঙুল-কাটা মসলিন শিল্পীদের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষে না খেতে পাওয়া মানুষেরা থাকে। দাঙ্গাবিরোধী মিছিলে নিহত সোমেন চন্দের সঙ্গে সে মিছিলে আলিবর্দি খাঁর আমলের পিঠে চাবুক খাওয়া কৃষকেরা হাঁটে। ‘৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের মিছিল এদের ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী সে মিছিল নিছক ভূতদের নয়, সে মিছিল উৎসবের। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সমস্ত অবদমিত বিক্ষোভের ফেটে পড়া ক্রোধ ও উল্লাস। ওসমান প্রথম ওই মিছিল দেখে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে আইয়ুব খানের মিলিটারি মেরে ফেলার পরে। কথক মিছিলের বর্ণনা শুরু করেন, আসাদের রক্তমাখা লাল শার্টের পতাকায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া দিয়ে।

ঐ তো, মিছিলের মাঝখানে ইসলাম খাঁর আমলের খাটো-ধুতি পরা ঢাকাবাসী!... শায়েস্তা খাঁর টাকায়-আট-মণ-চালের আমলে না-খেয়ে-মরা মানুষ দেখে ওসমান আঁতকে ওঠে... মোগলের হাতে মার-খাওয়া, মগের হাতে মার-খাওয়া, কোম্পানীর বেনেদের হাতে মার-খাওয়া- সব মানুষ না এলে এই মিছিল কি এতো বড়ো হয়? রেসকোর্সের কালীবাড়ির ইটের শুকনা পরত খুলে খাঁড়া হাতে নেমে এসেছে মারাঠা পুরোহিত, মজনু শাহের ফকিররা এসেছে, ঐ তো বুড়ো আঙুল-কাটা মুষ্টির ঘাই ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে মসলিন তাঁতী, তাদের কালো কালো খালি গা রোদে ঝলসায়... যুগান্তর অনুশীলনের বেনিয়ান ও ধুতি-পরা মাতৃভক্ত যুবকেরা আসে, তাদের মাঝে কলতাবাজারের নিহত ছেলে ২টিকে আলাদা করে চেনা যায়!... সীমাহীন কাল, সীমাহীন স্থান অধিকারের জন্য ঢাকা শহর আজ একাগ্রচিত্ত। (ইলিয়াস ২০১৫, ১৩৮-৯)

ওসমানের দেখা এই অতীত-ইতিহাস আর কেউ দেখে না। শওকত না, আনোয়ার না। কিন্তু, ওসমানের চেতনায় এই মিছিলের শুরু হয়েছে ৪০০ বছর বা তারো আগে থেকে। যে মানুষেরা মিছিলে হাঁটছে, তারা প্রত্যেকে ইতিহাসের নিভে যাওয়া অধ্যায়ের অংশ। বিজেতাদের কাছে গুরুত্ব নেই তাদের, শাসকের চাপে ও দমনমূলক আধিপত্যের প্রাবল্যে সেইসব হেরে যাওয়া মানুষেরা কোনও অন্ধকারে ছিল। এখন ধুলো ঝেড়ে, শতক-দশকের সমস্ত ভেদাভেদ মুছে, লৌকিক-অলৌকিকের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে তারা ছুটে আসে। “where memory and fantasy propel each other to articulate the utopian longing.” শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত ‘ম্যাজিক ন্যারেটিভ’-এর উদ্গাতাদের আখ্যানের সমগুরুত্বে রাখছেন এই অংশটিকে।³¹ ইতিহাস এসে যদি বর্তমানের পাশে না দাঁড়ায়, ইতিহাসের শোষিত-বিজিত নিম্নবর্গ যদি বর্তমানের শোষিত-নিম্নবর্গের চেতনায় প্রভাব না ফেলতে পারে, তাহলে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল নির্দিষ্ট

রাজনৈতিক অভিমুখ পায় না। আর, ওসমানের মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-আধুনিক মননের সমস্ত দোদুল্যমান অবস্থানে প্রথম ধাক্কা লাগে এই মিছিল থেকেই। “কে ডাকে? তার শরীর শিরশির করে। তাকে কে চেনে? এখানে কে চেনে?” (১৩৯) ওসমান সেই মিছিলের মুহূর্তে ওই ডাককে অস্বীকারও করতে পারে না আবার সেই ডাকে সাড়া দিতেও জড়তা তার। এই জড়তা কেটে যায় আখ্যানের শেষপর্বে এসে, যখন হাড্ডি খিজিরের মতো লুম্পেন প্রলেতারিয়েত তার চেতনায় বাসা বাঁধতে শুরু করে, যখন ওসমান ইতিহাসের এই সব ‘ভূত’-দের অনন্তিত্বমূলক অস্তিত্বের আত্মহানে সাড়া দিতে দিতে এবং বর্তমানের আইয়ুব-বিরোধী দ্রোহোত্তাপে ‘আগুন জ্বালো’ শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হতে হতে মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকে। আর, খিজির যখন নিজেই ‘ভূত’ হয়ে ওসমানের বাস্তবতায় আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন ওসমানের আর কোনও সংশয়, ‘শরীর শিরশির’, ‘গা ছমছম’ থাকে না। এইভাবেই কি ইতিহাস ঢুকে পড়ে বর্তমানের সঙ্কল্পে? হাড্ডি খিজিরও তো বিজিত নিম্নবর্গ, বারবার রহমতউল্লা-আলাউদ্দিনের শোষণের কাছে হেরে যাওয়া মানুষ, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবজ্ঞা-নিয়ে-বাঁচা শ্রেণির প্রতিনিধি; তাই কি সেও ঢুকে পড়ে ইলিয়াসের ‘অন্য ইতিহাস’-এর আখ্যানের কেন্দ্রে? স্টিফেন হার্ট তাঁর প্রবন্ধে ‘জাদুবাস্তবতাবাদ’-এ অতিলৌকিকের উপস্থিতি প্রসঙ্গে বলেছেন, “the use of the supernatural as a means of drawing attention to the ideological rifts within a given society”³² আর, এই উপন্যাসে ভূত ও অতিলৌকিক আখ্যানপরম্পরাও তো সেই মতাদর্শগত চিহ্নকই হয়ে ওঠে- উচ্চবর্গের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের বিদ্রোহের চিরন্তন ইতিহাস, ছাই ঝেড়ে উঠে ফিনিক্সের মতোই বারবার ক্ষমতাশালীদের প্রতিস্পর্ধা জানানোর মতাদর্শ। আসাদ আর সোমেন চন্দের প্রভেদ থাকে না, বেরিলির সেপাইয়ের সঙ্গে খিজিরের তফাৎ থাকে না, ‘মাথার খুলি উড়ে যাওয়া’ বরকতের সঙ্গে ওসমান একাত্ম বোধ করতে পারে। আর, ওই মিছিলেই ওসমানের চেতনায় মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-আধুনিকমনস্ক পাঠকেরাও প্রত্যক্ষ করে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ধর্ম-জাতি-ভাষার বিভেদ মুছে নিপীড়িত-নির্বিক্তের উৎসব! বাখতিন

কি একেই বলতে চাননি ‘কার্নিভ্যাল’? যে মহোৎসবের উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকের মধ্যে তফাৎ ঘুচে যায়। “Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it, and everyone participates because its very idea embraces all the people. While carnival lasts, there is no other life outside it” (Bakhtin 1984, 7-8) ওসমান ওই মিছিলের মুহূর্তে বেঁচে থাকে, অংশ নেয়। কাল-স্থান-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনতার স্রোত স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মিছিলে ধেয়ে যাচ্ছে- ইতিহাসের চরিত্র, ঘটনা বর্তমানের বিরুদ্ধস্বরে মিশে থাকছে। শুভরঞ্জন এই প্রসঙ্গে ডিল্যুজের স্কিজোফ্রেনিক পাঠের তুলনা করেছেন। বর্তমান অতীতের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আঁটা থাকে আশ্চর্যজনক খাপছাড়া ভঙ্গিতে। ‘খুলি ওড়া’ বরকত ডিল্যুজের লেখার স্কিজোফ্রেনিক উপাদানের মতোই পূর্ববর্তী উপাদান তথা সোমেন চন্দের শাহাদাতের সঙ্গে জুড়ে থাকে।³³ অনস্বীকার্য যে, বাংলা উপন্যাসে ‘বাস্তব’ ও ‘অলীক’-এর চলাচলের নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছেন ইলিয়াস। আলেহো কার্পেস্তিয়েরের উপন্যাস বিশ্লেষণে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ- স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমারেখা চিরকালের মতো ঝাপসা হয়ে গেছে।³⁴ ইলিয়াস নিছক ‘বাস্তববাদের কুহেলিকুহকে’ আবদ্ধ থাকেন নি বলে ‘ভদ্র’বয়ানের বাইরের কুশীলবদের উপন্যাসের কেন্দ্রের দ্বিধাবিভক্ত ‘ব্যক্তি’ ক’রে তুলেছেন।³⁵ ১৯৪৩ সালে আলেহো কার্পেস্তিয়ের ‘লো রিয়েল মারাভিঝোসো’-র উল্লেখ করেন প্রবন্ধে- আমেরিকার বাস্তবতা আলাদা হয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় বাস্তবতার থেকে। মিথ, লোককথা, ব্যর্থ বিদ্রোহ, শোষিত ক্রীতদাসের সংস্কার-বিশ্বাস আমেরিকার বাস্তবতার উপাদান হয়ে উঠছে- ইউরোপীয়দের কাছে যতই তা অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, জাদুসম হোক আমেরিকার মানুষদের কাছে তা বাস্তব। কার্পেস্তিয়ের বাস্তব (real) আর চমৎকার (marvelous) যেভাবে সংযুক্ত করছেন, তাতে নিপীড়িত প্রান্তিকতম মানুষগুলির সংস্কার, ব্যর্থ দ্রোহ, নিরক্ষর জগতের রঙিন উপন্যাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করছে। বাস্তব এতটাই অতিকায়, মাত্রাছাড়া ও চমৎকার যে, সেই চমৎকার আর আশ্চর্যকেই বাস্তব বলে মনে হয়।³⁶ ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এবং

‘খোয়াবনামা’-তে প্রান্তিকতম কুশীলবদের অব্যাখ্যাত অনুভূতি, তুখোড় কল্পনা, মুখফেরতা কাহিনি, বিশ্বাস সবকিছু মিশে আছে। কিন্তু, ইলিয়াসের লেখা আখ্যানকে শুধু ‘জাদুবাস্তব’ তকমা এঁটে দিলে তাঁর আখ্যানবিশ্বের বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ইলিয়াসের লেখাতে জাদুবাস্তবের উপাদান রয়েছে, কিন্তু তা তাঁর উপন্যাসের একমাত্র উপাদান বা অভিজ্ঞান না। ইলিয়াস একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে চেয়েছেন ইতিহাসধৃত সময়ে- রাজনীতিজারিত ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের সংশয়াদীর্ঘ পথ খুঁজতে চেয়েছেন। এই সংশয়ী সন্ধানপথ নিছক জাদুবাস্তবতা না। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর সবচেয়ে উল্লেখ্য মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী উপস্থিতি খিজিরের। সমাজের নিচের তলায় থাকা, চালচুলোহীন, বংশপরিচয়হীন, রিকশাচালক খিজিরের মৃত্যু পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে অবজ্ঞাযোগ্য সামান্য ঘটনা। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানে যোগ দিয়ে নৈরাজ্যবাদী খিজির মিলিটারির গুলিতে রাজপথে মরে পড়ে থাকে। বিক্ষোভকারী কয়েক লক্ষ জনগণের মধ্যে খিজির অন্যতম। অথচ ওই ‘সামান্য’ মৃত্যুই ‘শাহাদাত’ হয়ে ওঠে এবং অরাজনৈতিক ওসমানকে প্রবল রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবিরোধী ক’রে তোলে। জীবদ্দশায় খিজির ছিল লক্ষ্যহীন দিশাহীন, কিন্তু সে স্বপ্নে বাঁচত; আইয়ুবশাহী থেকে মুক্তির স্বপ্ন ও মহাজনের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তির স্বপ্নে বাঁচত সে। রাজনৈতিক দাসত্বের ভারী তত্ত্ব না বুঝলেও আর্থ-সামাজিক থেকে ব্যক্তিগত স্তরের দাসত্বের অভিজ্ঞতা ছিল খিজিরের। পুঞ্জীভূত ব্যর্থতা ক্রোধ অসহায়তাকে দ্রোহের আগুনে বদলে নিয়ে নিরাপদ দ্রোহপথের সন্ধান করেনি খিজির। প্রতিটি মিছিলে বিক্ষোভে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রভাবিত করেছে অন্যদের। বজলুকে, সঙ্গী রিকশাচালকদের এবং ওসমানকে প্রভাবিত করে খিজির।

‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে মরা মানুষের প্রসঙ্গ প্রথম আসে হারবার্টের বন্ধু খোড়োরবির আত্মহত্যার ঘটনায়। “অথচ শত শত বছর ধরে চাঁদের আলোয় বা শীতের ভোরে কুয়াশায় তার প্রেম নিয়ে খোড়োরবি ঐ মরণজলে ভেসে থাকবে। তাদের ঘিরে মৎস্যকন্যারা ওলটপালট করবে, যারা কাঁদলেও তাদের চোখের জল কেউ দেখতে পাবে না” (ভট্টাচার্য ২০০৪,

২২) হারবার্ট জীবিত ও মৃত মানুষের এক সমীকরণ আবিষ্কার করে। এই উপন্যাসের প্রতিটা মৃত্যুই অস্বাভাবিক মৃত্যু। হারবার্ট নিজেও আত্মহত্যা করে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের আঙ্গিকে জীবন্ত ও মৃতের টানাপড়েন চলে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে হারবার্টের আত্মহত্যা। শেষের আগের অধ্যায় (নবম অধ্যায়) থেকে ফের হারবার্টের আত্মহত্যার বর্ণনা ও শেষকৃত্যের ঘটনায় ফিরছেন কথক। শ্মশানে বিস্ফোরণজনিত টালমাটালের (chaos) বর্ণনাও এই অংশে। আর, মার্কের সবক’টি অধ্যায় জুড়ে প্লট উন্মোচন করছে কথক। এক্ষেত্রে লেখক নবারণ যে পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, তা নিছক বিগতদর্শন (flash back) পদ্ধতি নয়, কারণ কথক বিভিন্ন সময়ে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠক যাত্রা করছে তা এক মৃত মানুষের গল্প।³⁷ কথক প্রায়ই আখ্যানের মধ্যে হাজির হয়ে “হারবার্ট নেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, হিপোড্রাম সার্কাস নেই” (২৯), “বিনুর মৃত্যুর পরে ঘরটি কয়েকবছর বন্ধ ছিল। পরে এটি হারবার্টের অফিস এবং শেষ রাত অবধি তারই ঘর ছিল” (২০), “বুকি, লেডি ডাকার, পরী... দীর্ঘশ্বাস আসেই কিন্তু এদিকে স্বর্গের দরজা যে একটু একটু করে খুলছে” (৫৬) ইত্যাদি কখন রেখে পাঠককে বুঝিয়ে দেন আদতে এটি মৃত হারবার্টের দিকে যাত্রা। আখ্যানে প্লট উন্মোচন করতে করতে অর্থাৎ হারবার্টের জীবদ্দশার কথা বলতে বলতেই ঢুকে পড়ে, “এমনকি তার নিজের শেষযাত্রায়ও এতটা গাম্ভীর্য ছিল না” (২৫) বাক্যটি। পাঠককে সজাগ রাখে ‘মৃত হারবার্ট’-এর আখ্যানে। মৃত ললিতকুমার আর শোভারানীও অনায়াসে আখ্যানে ঢুকে পড়ে কোনও স্বপ্নদৃশ্যে নয় বা আখ্যানবহির্ভূত দৃশ্যে নয়। হারবার্টের মনথারাপের দৃশ্যের বর্ণনা দিতে দিতেই তাদের সংলাপসমেত নিয়ে আসেন লেখক। হারবার্টের মৃত বাবা-মা হারবার্টের জীবন্ত যাত্রাপথের ও মৃতদেহের শোভাযাত্রার³⁸ সাক্ষী। নবারণ ভট্টাচার্যের গদ্যসাহিত্যে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিভিন্ন অনুষ্ণ ফিরে ফিরে আসে।

হারবার্ট সরকার যাকে প্রথম ‘ভূত’ হিসেবে স্বপ্নে পায় এবং সেই প্রথম ‘পাওয়া’কে ‘ভূতের সহিত কথোপকথন’ ব্যাবসায় বিনিয়োগ করে, সেই বিনুই সমস্ত ভূত-বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। নবাবুর্গ কীভাবে বিনুকে পেয়েছিলেন, তা সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

হারবার্টকে নকশালি বুদ্ধিটুঙ্কি শিখিয়েছিল বিনু বলে একজন। এবং সুবর্ণরেখার বিনু, ছোট বিনু, যে আমার ভাই, যে মারা যায় লেকের জলে ডুবে... সুবর্ণরেখার শেষ হচ্ছে আমার সঙ্গে সে যাচ্ছে আর বলছে আমরা নতুন বাড়িতে যাবো যেখানে প্রজাপতি আছে, গান হয়, সেখানে গেলে মাকে পাবো, বাবা আছে... এই নতুন বাড়িতে যাচ্ছিলো বিনু। এখানেই ছবিটা শেষ হয়। এবং এর পরবর্তী যে বিনু, আমি যাকে কনশাসলি হারবার্টে নিয়ে এসেছিলাম; সেই বিনু তখন বড় হয়েছে। এবার সে নতুন বাড়িটা নিজে বানাবার চেষ্টা করছে। এবং আজকেও এই চেষ্টাটা ফুরিয়ে যায়নি। আজকে আমার যে মাওবাদী বন্ধুরা জঙ্গলে বা জেলে রয়েছেন তারা ঐ নতুন বাড়িটার জন্যই ভাবছেন... আর কিছু না। এবং প্রত্যেক যুগে, সমস্ত সময়ে বিনুদের এটা অধিকার, বিনুরা এটা করবেই! সেটা ঠিক হোক কি ভুল হোক (ভট্টাচার্য, laljiperdiary.wordpress.com)

‘সুবর্ণরেখা (১৯৬৫)’ চলচ্চিত্রের বালক বিনুকে উপন্যাসে ফিরিয়ে এনেছিলেন নবাবুর্গ। আন্তঃপাঠ (intertextuality)-র উদাহরণ বিনুর এই ফিরে আসা। জুলিয়া ক্রিস্তেভার মতে লেখকেরা পূর্ববর্তী বিভিন্ন পাঠ থেকে নিজেদের শিল্পসৃজন করেন। প্রতিটি পাঠই আন্তঃপাঠ। প্রতিটা শব্দ বা পাঠ অন্যান্য/অসংখ্য শব্দ বা পাঠসমূহের আন্তঃচ্ছেদী (intersection) যেখান থেকে অন্য আরেকটা পাঠ পাওয়া যায়।³⁹ পূর্বের বিভিন্ন পাঠ বা প্রতর্কের অর্থব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার বুননে নতুন পাঠ গড়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে জুলিয়া ক্রিস্তেভা ‘Word, Dialogue and Novel’ প্রবন্ধে লেখেন, “the writer’s interlocutor... is the writer himself, but as reader of another text. The one who writes is the same as one who reads. Since his interlocutor is a text, he himself is no more than a text

rereading itself.” (Kristeva 1980) বিনুর উপস্থিতি ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের চার নম্বর অধ্যায়ে। এছাড়া অন্য দু’টি অধ্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে তার কথা এসেছে। কিন্তু, সত্তর দশক পরবর্তী সময়ে হারবার্টের জীবনে ‘অলৌকিকভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে বিনুর ডায়রি পাওয়ার ঘটনাটি’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। মৃত্যুমুহুর্তে বিনুর বলতে চাওয়া ছেঁড়া-ছেঁড়া বাক্যগুলির সূত্র ধরেই হারবার্ট বিনুর ডায়রি আবিষ্কার করে। তারপর পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক’রে মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে মৃতের যোগাযোগের ‘মাধ্যম’ হয়ে ওঠে হারবার্ট, ভূতই হয়ে ওঠে তার আয়বুদ্ধির পথ। অথচ, বিনুই ১৯৭০ সালে হারবার্টকে বলেছিল, “ওসব ধাপ্লা। রিডিকিউলাস। এ মরল, ভূত হয়ে এল, ও মরল ভূত হয়ে গেল- এই যে পাতায় পাতায় ভূত কিলবিল করছে, বলো, নিজে কখনও দেখেছো?” (ভট্টাচার্য ২০১০, ৩০) কমিউনিস্ট বিনু দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী, মানবসমাজের সাম্যে বিশ্বাসী, তাই অলৌকিক ভাববাদে তার আস্থা নেই। হারবার্টের প্রেতবিশ্বাসের অলৌকিককে সে বিরোধ জানায় লৌকিক শাহাদাতের উদাহরণ এবং মাও সে-তুংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে। কিন্তু, হারবার্টের জীবনজুড়ে প্রেতবন্ধুত্ব। ‘জলে ডুবে কবে মরে গেলেও খোড়োরবি আসতেই পারে। হারবার্টদা ডাকলে তো আসবেই’⁴⁰ এই বিশ্বাস উপন্যাসের প্রথম পাতা থেকেই সোমনাথ কোটন কোকাদের বয়ানের মাধ্যমে পাঠকের চেতনাতেও চারিয়ে যায়। এর ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই হারবার্টের আত্মহত্যার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং সেই বর্ণনার পরিপূরকে দু’টি বইয়ের উল্লেখ রয়েছে- ‘পরলোক-রহস্য’ ও ‘পরলোকের কথা’। মৃণালকান্তি ঘোষের ‘পরলোকের কথা (১৯৩৩)’ বইটি বাঙালি পাঠকসমাজে বেশ আলোড়ন তোলে। বইটির ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করেছেন যে, এই বইটি নিবিষ্টভাবে পড়লে পাঠকদের “জড়বাদ রক্ষা করা কঠিন হবে” এবং প্যারীচাঁদ মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রেত-কেন্দ্রিক ‘অদ্ভুত’ ঘটনার সাক্ষী, তা উল্লেখ করেছেন।⁴¹ রসিকমোহন দেবশর্মার মতে পরলোকে অবিশ্বাস, আত্মায় অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা চরম নিন্দার্ত এবং বৈজ্ঞানিক স্পিরিচুয়ালিজম প্রকৃত পথ। আধ্যাত্মিকতার জয়গানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও রক্ষা করেছেন তিনি, কারণ পরলোকে

বিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্বে প্রতিটি ধর্মই জড়বাদের বিরোধী।⁴² “একভাবে দেখলে এঁদের প্রতি হারবার্টের একটি টান ছিল, ছিল এঁদের সঙ্গে একজাতীয় সখ্য যা ঠিক প্রত্যক্ষ আলাপ বা সমসাময়িকতার অপেক্ষা রাখে না” (১১) উপন্যাসের গতিপথে সার্কাসের ভূত, পুরনো কলকাতার বেতুল স্মৃতি, মৃত কুশীলবেদের প্রতি টান সবই ফিরে আসতে থাকে।

these friends returned as the phantom of our past- in sum, our memory, the silhouette of the ghost who not only appears to us (phantasmata, phenomena, phantoms, things of sight, things of respect, the respect which returns and comes down to the spectre), but an invisible past, hence a past that can speak, and speak to us in an icy voice, 'as if we were hearing ourselves. (Derrida 2005, 287-88)

এমনকি খোড়রবির সঙ্গে হারবার্টের যে প্রেতবন্ধুত্ব আর নিশ্চিত ডাকের ইশারা, তাও তো নবাবুজ্জামান নিজের ছোটবেলার স্মৃতি থেকেই তুলে এনেছিলেন।⁴³ হারবার্টের ভূত নামানোর ব্যবসা শুরু হয়েছিল আশির দশকের মধ্যভাগে, যখন পরিকল্পিত নিরাজনীতিকরণের স্থিতিবস্থা জারি হয়েছে। একদিকে স্থিতিবস্থা “ভূমিকম্পের পরে আবার যে কে সেই” অন্যদিকে সেই স্থিতিবস্থাতে আলোড়ন তুলে দেওয়ার জন্যে হারবার্টের একক মরিয়াদা প্রচেষ্টা। উপন্যাসের বিরোধাভাস বা টানাপড়েন এটি। হারবার্ট তাই হৃদয় পায়ে, তাকে দাপাতে হবে এবার এবং ‘সব ফাঁতরাফাঁত করে বিশ্বসংসারে একটা তাণ্ডব লাগিয়ে দিতে হবে’।⁴⁴ হারবার্ট কারোর পরোয়া করেনা তাই। হারবার্ট মৃত বিনুর প্রতি ট্রিবিউট দেয় কোনও সংসদীয় নির্বাচনেই ভোট না দিয়ে। হারবার্টই বিনুদের নিষিদ্ধ বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল সাংগঠনিক গোপনীয়তা রক্ষার্থে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যখন ভেঙে পড়েছে, নকশাল আন্দোলন যখন আপাত-স্তিমিত, হারবার্টের ভূত নামানো কি তখন স্থিতিবস্থাকেই প্রতিস্পর্ধা জানায় না? হুয়ান রুলফোর ‘পেদ্রো পারামো (১৯৫৫)’ উপন্যাসে হুয়ান প্রেসিয়াদো তার মৃত জননীর নির্দেশে কোমালায় আসে, যে

কোমালা বহুদিন আগেই মৃত শহর এবং মৃতদের স্বর যেখানে জাগরুক। ছয়ান প্রেসিয়াদোর মা তাকে প্রাপ্য বুঝে নিতে পাঠায় এবং অবিচারের বিচার চেয়ে বলে, “make him pay dearly”- কোমালার মতো মৃতের শহরে জুয়ানের প্রবেশের মূল চালিকাশক্তি ওই বাক্যের রাজনীতিই। ভূতদের জেগে থাকার শহরে প্রেসিয়াদো কোমালাকে আবিষ্কার করে সম্মিলিত সন্ত্রস্ত বয়ানে। হারবার্ট যেমন বিনুকে পায়, তেমনই ‘মৃত পশ্চিমী নারী’ কিংবা ত্রস্ত রুশী যুবতীরা থাকে আখ্যানের গতিপথে। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ের প্রেক্ষিতে ও নকশাল আন্দোলনের বিশেষ ‘ডিটোনেশনে’ এই উপন্যাসের ভিত, ‘পেদ্রো পারামো’ উপন্যাস বিশেষ সময়ের মেক্সিকোর প্রেক্ষাপটে। যখন প্রবল অনৈতিকতা ও হিংসায় বিরুদ্ধস্বর পিষে দেওয়া হচ্ছে, যখন গভীর আর্থ-সামাজিক ক্ষত প্রজন্মান্তরে তাড়িয়ে ফিরছে এবং যখন বিষম আধুনিকতা ও উন্নয়নের আর্থ-রাজনৈতিক অভিঘাত বর্তমানকে সন্ত্রস্ত ক’রে রাখছে, তখন এক প্রেতশহরের আবহ তৈরি হয়। সেখানে প্রেতদের ভিড় এবং প্রতিধ্বনি। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের চার নম্বর অধ্যায়টির প্রেত বা ভূত উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত হয়। বারাসাতে শহীদ সমীর মিত্রের কবিতা, নকশালদের দ্রোহকাণ্ডের সঙ্গে হারবার্টের জড়িয়ে পড়া এবং হারবার্টের একটু একটু ক’রে পোড়ানো সশস্ত্র কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের নথি-পত্রিকা-চিঠি সত্তর দশকের যুদ্ধআঁচ জাগিয়ে রাখে উপন্যাসে। মার্ক্স যেমন ইউরোপে বুর্জোয়াব্যবস্থাকে সদাত্রস্ত রাখা কমিউনিজমের ভূতের কথা লিখেছেন, বিনুদের মতাদর্শের ভূতও তেমনই ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে ত্রস্ত রাখে। বিনুকে হারবার্ট ছাড়া কেউ ‘ট্রিবিউট’ দেয়নি, কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু, বিনুদের লুকিয়ে রাখা ডিনামাইট কুড়ি বছর পরে হারবার্টের মৃতদেহ-টোকানো চুল্লির উত্তাপে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণ রাষ্ট্রকে ত্রস্ত করে এবং স্থিতিবস্থাকে সাময়িক অস্থির ক’রে তোলে। নব্বই দশক শুরুর বিশ্বরাজনীতি বর্ণনাতেও আধিপত্য করে ‘ভূত’ শব্দটি। ভূত এক্ষেত্রে প্রতীকার্থে ব্যবহৃত। “রাশিয়াতে বরিস ইয়েলৎসিন জব্বর ভূতের জলসা বসিয়েছেন। লাখ লাখ কমিউনিস্ট ক্যাপিটালিজমের ভূত দেখছে। সলঝেনিৎসিনের ছদ্মবেশে রাসপুটিন ফিরে আসছে... কমিউনিজম

কেলিয়ে পড়েছে” (৬১) যে বিনু কমিউনিস্ট মতাদর্শের জন্যে লড়তে গিয়ে শহীদ হল, যে বিনুকে স্বপ্নে দেখে হারবার্টের উপার্জনের উপায় হল, সেই কমিউনিস্ট মতাদর্শ নব্বই দশকের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বস্তিজনক অবস্থানে নেই। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্সের বক্তব্য ছিল, ‘ইউরোপে পুঁজিবাদকে তাড়া করে ফিরছে সাম্যবাদের ভূত’; আর, ‘হারবার্ট’-র কথক নব্বই দশকের শুরুর রাজনৈতিক বর্ণনায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার কথা বলছে। নব্বই দশকের শুরু মানে আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনীতিতে দু’টি যুগান্তকারী বদল- সোভিয়েতের পতন এবং উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের জয়যাত্রা শুরু হওয়া। ঠাণ্ডাযুদ্ধে ইউএসএ ব্লকের জিতে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ কমিউনিজমকে ‘মৃত’/অচল ঘোষণা ক’রে দেয়। নবাবুণ নিজেও স্বস্তিক্ষেত্রে ছিলেন না, নিশ্চিত স্থানাক্ষের সন্ধানরত ছিলেন।

১৯৮৯-র পর থেকে বিশ্বে যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে তাল রেখে, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি তালকানা লেখক ও সেইসঙ্গে ভিত্তি বজ্রারে পরিণত হয়েছি... মানুষ যে কারণে মৌমাছির থেকে আলাদা বলে মার্ক্সবাদ আমাদের বুঝিয়েছিল সেখানেই ঘুমের মধ্যে বালিশ চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে মাথাটি এখন গ্যাস বেলুন বা মমির মাথা হয়ে শূন্য ভাসমান (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৮৮)

আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনীতির সংবাদপত্রধর্মী বিবরণ যে অংশে রয়েছে, তার আগে এবং পরে কথক ভূতের উপস্থিতি আনেন। জ্বরের ঘোরে হারবার্ট সরকার তার মৃত পূর্বপুরুষ ধুঁইয়ের সঙ্গে কথোপকথন করে। মৃত বনেদিয়ানা আর ঔপনিবেশিকতার ভূত বয়ে বেড়াচ্ছে হারবার্ট- ধুঁই সেই প্রত্যেকটি ভূতকে চিনিয়ে দেয়।⁴⁵ জেঠামশাইয়ের ‘পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা’ আচমকা চিংকার অতীত সম্পর্কে সচেতন করে পাঠককে আর একইসঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপ্রতীপ বিন্যাস তৈরি ক’রে দেয়। ঔপনিবেশিকতার মৃত উপাদানগুলি, মৃত উৎপাদন-সম্পর্ক, মৃত বাবুয়ানি আখ্যানে ছায়া ফেলে।

হারবার্ট নিজেও কি জানতো না যে, এসবই লোকঠকানো? “হারবার্ট একটি ফ্রিক... টাকার লোভে যা খুশি তাই সে করত” (৪১) এই কথা কথক জানিয়ে দেন পাঠককে। এমনকি হারবার্টের পূর্বপুরুষ ধুঁই তাকে স্বপ্নে এসে বলে যায়, “অ্যাভায় গুণ্ডা মেরে তো ভালই চালাচ্চিস! শালা খচ্চর” (৬১) এই স্বপ্নদৃশ্যের দর্শক হারবার্ট এবং পাঠক হারবার্টের বংশপরিচয় আবিষ্কার করে। নিশানাথ কেশব, হরিনাথ, গোপাললাল, ঝুলনলাল, বিহারীলাল, ললিতকুমার- আঠারো ও উনিশ শতকের কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির ভূত আবিষ্কার করে হারবার্ট।^{৪৬} উনিশ শতকের নব্য-বড়লোক বাবুশ্রেণির যা যা চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তার প্রত্যেকটাই উপস্থাপিত হয় এদের বর্ণনায়। আর, ধুঁই এবং শ্রীধর এই স্বপ্নেই ‘কালীমন্ত্র’ শিখিয়ে যায় হারবার্টকে, কারণ দু’জনেই জানত যে, ফেরেব্বাজ লোকঠকানো হারবার্টের ‘মুক্তি’ আধ্যাত্মিক ধ্যানেই সম্ভব। দেবী কালী ভূত-প্রেত-ডাকিনী ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন এমনটাই লৌকিক বিশ্বাস। হারবার্টের লৌকিক প্রেতানুশীলন এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে বিরোধ জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সমিতি। হারবার্ট যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল এবং অতীত-ভূত-স্মৃতি মিলেমিশে যে স্বস্তিবলয়ে হারবার্ট নিশ্চিন্ত ছিল, তাকে চুরমার ক’রে দেয় যুক্তিবাদী সমিতির চিঠি ও প্রত্যক্ষ বিরোধ।^{৪৭} হারবার্টের ‘ভূত নামানো’ একদিকে যেমন লোকঠকানো, তেমনি যান্ত্রিক বস্তুবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে মস্করা ছুড়ে দেওয়া। প্রণব ঘোষ ও যুক্তিবাদী সংস্থাকে আখ্যানের ‘বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এলিমেন্ট’ বলেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।^{৪৮} তাঁর মতে হারবার্ট চরিত্রের মতোই এলোমেলো আখ্যানে এবং বহুবিধ জটিলতা ও সারল্যের টানাপড়েনের মাঝে যুক্তিবাদী সমিতির উপস্থিতি আয়াসসাধ্য চেষ্টা। কিন্তু, যুক্তিবাদী সংস্থা ও প্রণব ঘোষদের চেতাবনী দিয়ে হারবার্টের ভূত নামানোর ব্যবসা বন্ধের আদেশ দেওয়া নিছক ‘চাপিয়ে দেওয়া এলিমেন্ট’ নয়। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্বের সঙ্গে এবং দেশীয় প্রেতচর্চার পদ্ধতির সঙ্গে হারবার্টের পদ্ধতির দূরত্ব ছিল, যে দূরত্ব সম্পর্কে কথক পাঠকদের অবহিত করে বারবার।^{৪৯} ভারতীয় লোকবিশ্বাস এবং প্যারাসাইকোলজির পাশ্চাত্য চর্চার এক অদ্ভুত বিমিশ্রিত অনুশীলন আদতে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী

কাঠামোকে কটাক্ষ করে- ঔপনিবেশিক কলকাতার প্রেতচর্চাকে তথ্যায়িত নথিবদ্ধ করেন নবাবু, যা চেনা যুক্তিকাঠামোকে গুলিয়ে দেয়।⁵⁰ উনিশ শতকে মাদাম ব্লাউভস্কি ও কর্নেল অলকট থিয়সফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অতীন্দ্রিয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও আত্মাচর্চা করা।⁵¹ প্যারীচাঁদ মিত্রসহ অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই সোসাইটির সদস্য ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘অভেদী (১৮৭১)’, ‘আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)’ ইত্যাদি গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত আবহ, আধ্যাত্মশক্তির বিশদ বর্ণনা। এমনকি, প্যারীচাঁদ বিদেশের ‘স্পিরিচুয়ালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের’ সদস্য হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে প্ল্যানচেট চর্চার কথা বলছেন, যেখানে তাঁর বড়ো জ্যাঠামশায় পার্শ্ব দীননাথ ঘোষালের আত্মার থেকে পরকালের বৃত্তান্ত জানতে চেয়েছেন।⁵² উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি একদিকে পশ্চিমী যুক্তিবাদের শিক্ষায় লৌকিক সংস্কারকে মেনে নিতে লজ্জাবোধ করছে অন্যদিকে থিয়সফি সোসাইটির চর্চায় দৈবশক্তিতে বিশ্বাস রাখছে ও প্রেতচর্চা সম্পর্কে অবিশ্বাস শিথিল করছে।⁵³ প্রণব ঘোষের বয়ানে আরও এক দ্বন্দ্বিকতার প্রতীক তৈরি হয়, উচ্চশিক্ষিত ইংরেজি-জানা কাঠামোর সঙ্গে অশিক্ষিত খিস্তিবাজ হারবার্টের দ্বন্দ্ব, “অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আপনি তো অশিক্ষিত- এগুলো এফিসিয়েন্টলি করতে হলে যে সফিস্টিকেশন লাগে সেটা আপনার নেই” (৬৮) প্রণব ঘোষের এই চাঁছাছোলা ধমক ক্রমশঃ আরও কয়েকটি বিষয় স্পষ্টতর করে- হারবার্ট কেন বুকি বা লেডি ডাক্তারকে পাবে না, হারবার্ট কেন ‘সফিস্টিকেটেড’ রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে এবং হারবার্টের মধ্যে বনেদিয়ানা-বাবুশিক্ষা-ভদ্রলোকীয় কোনও কিছুই কোনও অবশেষ নেই। হারবার্টের ‘মৃতের সহিত কথোপকথন’ ব্যবসার খরিদদার কারা? কলকাতা শহরের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবর্গের লোকেরা। অলৌকিক অযৌক্তিকে বিশ্বাস তাদেরও, হারবার্ট সেই বিশ্বাসকে উপার্জনের কাজে ব্যবহার ক’রে নেয়। একুশ শতকে পৌঁছে সে বিশ্বাস বেড়েছে বই কমেনি; অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানযুক্তির নিত্যনতুন প্রয়োগাবিস্কারের যুগে অলৌকিক-ধর্ম-ভাববাদ গাঁড়ে বসে আছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। উচ্চশিক্ষিত অত্যাধুনিকরা ‘সফিস্টিকেটেড’ ভাববাদের প্রয়োগ ক’রে চলেছে⁵⁴ এবং হারবার্টের এর কোনও গুণই নেই। এর একশ বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ‘কঙ্কাবতী

(১৮৯২)’ উপন্যাসে এই প্রতর্কের অবতারণা করেছিলেন ঔপনিবেশিক পরিসরে এবং অদ্ভুত রসের প্রয়োগে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির হালচাল দেখিয়েছিলেন। হারবার্ট সরকার ‘মৃতের সহিত কথোপকথন’ নাম দিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিল এবং সুরপতি মারিক তাকে বুঝিয়েছিল যে, ইংরেজি নাম ও চাকচিক্য ছাড়া ব্যবসার প্রসার হয় না। প্রণব ঘোষেরা হারবার্টকে অশিক্ষিত বলে দাগিয়ে দেয়। কথকও জানিয়ে দেয় যে, ‘মেসমেরাইজ করার ক্ষমতা হারবার্টের নেই’ ও ‘মিডিয়াম’ হবার ক্ষমতা তার নেই তথা পশ্চাত্য আদবকায়দায় মোড়া কুসংস্কারকে বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তোলার মতো দক্ষ সে নয়। উচ্চশিক্ষিত ইংরেজিবুলির আদবকায়দার বিরুদ্ধে হারবার্টের ঘৃণা বারবার ফুটে ওঠে। “ও ইংরেজি করে বলে ভেবেচেন ভেবড়ে দেবেন, সেটি হবে না। ইংরেজি মারাচ্ছে” (৬৬) ‘কঙ্কাবতী (১৮৯২)’ উপন্যাসে স্কল ও স্কেলিটন নামে দু’টি ভূত ইংরেজি নামে কোম্পানি খুলে ব্যবসা ফাঁদে, যাতে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়। তাদের যুক্তি অনুসরণ করেই কি হারবার্টের রাগ, সুরপতির পরামর্শ ও প্রেতচর্চার আধুনিকীকরণ ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে থাকে? স্কল জানায় যে, “ইংরেজি-নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, নাম হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম ‘খুলি, কঙ্কাল অ্যান্ড কোম্পানি’... বরং ইংল্‌জ পিংল্‌জ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানির কথা লোকে বিশ্বাস করে না।” (মুখোপাধ্যায় ১৩৬৪, ১৮২) ভূত স্কল কঙ্কাবতীকে বলে যে, উচ্চবর্ণ বাঙালিরা ‘জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের’ দোকান করলেও তার ইংরেজি নাম দেয়।^{৫৫} এতে দু’টি বিষয় স্পষ্ট হয়- (১) দেশি ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদেশি ভাষার প্রতি ভালবাসার ঔপনিবেশিক বিশ্বাস এবং (২) উপনিবেশিত মানুষের সংস্কৃতির ওপরে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আধিপত্য সমাজের সকল স্তরেই ছড়িয়ে পড়ে, সেইজন্যেই গুণগত মান নয় বিচার্য হয় নামের বহর। হারবার্টের যেমন ‘ইংরেজি মারানো’দের প্রতি রাগ, স্কল ও স্কেলিটনেরও তেমন রাগ, ‘ইংরেজি-পড়া’ বাবুটির সঙ্গে কথোপকথনেই তাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়। “ইংরেজী পড়িয়া বাবুটির মতিগতি একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল... এক্ষণে চল, অন্যান্য বিকৃতমতি বাবুদিগকে অন্বেষণ করি।” (১৮৩) স্কেলিটনকে উদ্দেশ্য ক’রে স্কল যখন কথাগুলি বলছে, তখন উক্ত আধুনিক

ইংরেজিশিক্ষিত বাবুর ভূতে ‘বিশ্বাস’ ফিরেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে তথা বিশ্বায়নের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে হারবার্ট দৃঢ় বিশ্বাসে ‘ভূত আছে, ভূত থাকবে’ বলে জানায় বারবার। বিনু দ্বন্দ্বিক যুক্তিবাদী ও বিপ্লবী প্রতর্ক দিয়ে তার ভূতবিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেও, হারবার্ট তাতে ‘কনভিন্সড’ হয়নি। আর, যান্ত্রিক যুক্তিবাদের প্রয়োগকর্তা ‘পশ্চিমবঙ্গ যুক্তিবাদী সমিতি’-র সঙ্গে হারবার্টের সংঘাত আরও প্রবল। হারবার্ট তাদের সঙ্গে ‘চ্যালেঞ্জ’ হেরে যায় বলেই হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। স্কল ও স্কেলিটন পেরেছিল ইংরেজিশিক্ষিত বাবুকে দেশীয় তত্ত্বে বিশ্বাস ফেরাতে, কিন্তু হারবার্ট পারেনি। হারবার্ট যে যুগসন্ধিতে অবস্থান করছে, তাতে হয়তো তা সম্ভব নয়। এই অংশটুকুতে শুধু যে ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব তা নত, বরং হারবার্টের চেতনায় প্রভাব ফেলছে ক্ষয়ীভূত ‘বাবু’ সমাজের অবশেষ, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সিনেমা (ফল অব বার্লিন), সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের পতন, প্রেতচর্চার বিশ্বাস ও বিশ্বায়নী বাণিজ্যিক সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত। এই দোলাচল নব্বই দশকের শুরু। নবাবু নব্বই দশক পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বদলের অভিমুখে নিজের স্থানাক্ষ নির্ধারণ করায় কমিউনিস্ট মতাদর্শ থেকে সরে আসেননি, তাঁর গল্প উপন্যাসে কবিতায় সেই মতাদর্শের প্রতিফলন হয়েছে। একইসঙ্গে নবাবু যুক্তিবাদের উল্টো দিকগুলিকেও সাহিত্যে (বিশেষতঃ গল্প উপন্যাস) নিয়ে আসছেন। লিখছেন, “গুলিয়ে দেবার জন্য বলে নিই যে আমি মৌলকণা, রশ্মি, কোয়াসার, নীহারিকা- এসবের সঙ্গে মৃত্যুবিজ্ঞান ও স্বপ্নবিজ্ঞানেও বিশ্বাসী... মৃত্যুতে বিজ্ঞান শেষ হয়। হোক। আমার ধারণায় মৃত্যুর পরে স্বপ্নের পর স্বপ্নের পর স্বপ্ন...” (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৯০) এই ‘গুলিয়ে দেওয়া’র প্রকল্পনা ‘হারবার্ট’, ‘ভোগী’ ইত্যাদি উপন্যাসেও। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট শুধু যে ভূত অলৌকিকের ধ্বজা ওড়াচ্ছে তা নয়, কথক নিজেও ওই প্রোটাগনিস্টকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। তাই উপন্যাসের মধ্যে যখন-তখন ‘ভূতের জলসায় গোপাল ভাঁড়’ ও ‘সার্কাসে ভূতের উপদ্রব’-এর কোলাজ জুড়ে দেয় কথক। উপন্যাসের শৃঙ্খলকাঠামোকে বিপর্যস্ত ক’রে দেয় এই কোলাজগুলি। আধুনিকতার যুক্তি, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠাভ্যাসকে সমস্যায়িত অস্পষ্ট ক’রে দেয়। অর্ক চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, “‘ভেগেনেস’ তথা

অস্পষ্টতা অপাঠ্যতার দিকে হেলে থাকে; যুক্তির রৈখিক পাঠকে সমস্যায়িত করে তোলে। এই অস্পষ্টতা নবায়নীয় প্রেতের স্বাক্ষর। এই প্রেতেরা বিমূর্ত হলেও সংক্রামক।” (চট্টোপাধ্যায় ২০১৬, ১১৫) হারবার্ট যে বইগুলি পড়ে নিজের বিশ্বাস দৃঢ় করে এবং ব্যবসার রসদ খুঁজে পায়, তেমন বই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেকগুলি লেখা হয়েছিল। বহুপাঠিত ঔপন্যাসিকদের বাইরেও সাহিত্যে ভূতচর্চা যথেষ্ট প্রাণবন্ত ছিল- সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক, যিনি একাধিক উপন্যাস ও প্রেতচর্চা-গ্রন্থ লিখেছিলেন।⁵⁶ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে অলৌকিক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রভাব পড়ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেনের মেয়ে (১৯১৯)’ উপন্যাসে তান্ত্রিক বর্ণনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পারলৌকিক আলাপে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজে প্ল্যানচেট করতেন; তবে, রবীন্দ্রনাথ থিয়সফিস্টদের মতো পরলোকতত্ত্বকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নি।⁵⁷ উনিশ শতক একদিকে যেমন স্পষ্টবাদিতা যুক্তিবাদ আধুনিক বিজ্ঞানমননের যুগ, তেমনই এহেন বিশ্বাসভিত্তি কুসংস্কারের চর্চারও যুগ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দু’য়ের ক্ষেত্রেই এই দোলাচল থেকেছে। এই অস্পষ্টতা কি হারবার্টকে প্রভাবিত করে? ‘হারবার্ট’ উপন্যাসকে অস্পষ্টতার দিকে এগিয়ে দেয় পরীর উপস্থিতি- মৃত হারবার্টের ঘরের জানলার কাঁচে তার শোকপ্রকাশ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই। পরী হারবার্টের প্রথম প্রেম বুকি নয়, পরী হারবার্টের শেষ প্রেম লেডি ডাক্তার নয় কিংবা রক্তমাংসের অবয়বময় মানুষী নয়। পরী পাথরের, তার সোনালী চুল এবং পাথরের কাপড় জড়ানো গায়ে। এই পরীর সঙ্গেই হারবার্টের শেষ মায়াবন্ধন তৈরি হয়, যে মায়া হারবার্টকে ফেলে আসা অতীত আর ভূতের দিকে টেনে নিয়ে যেত বারবার।⁵⁸ ‘ফল অব বার্লিন’ সিনেমায় দেখা হুবহু সেই সম্ভ্রান্ত রুশী যুবতীও নয়; “ঐ পরীর দিকে তাকিয়ে হারবার্ট কানে মৃতা পশ্চিমী নারীদের গান শুনতে পেয়েছিল।” (৫২) এই উপন্যাসে ‘নেই’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াপদ। একইসঙ্গে অস্তিত্বহীনতা ও ভূতময়তা (অতীত অর্থে) বোঝানো যায় এই ক্রিয়াপদে। একদা যা যা ছিল, এখন সেগুলি মৃত তা কথকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। পরী, বুকি, লেডি ডাক্তার কেউই হারবার্টের জীবনে নেই। উপন্যাসের রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে বিনু, নকশালবাড়ি

আন্দোলন, সোভিয়েতের কমিউনিজম, ঔপনিবেশিক অধঃক্ষেপ ইত্যাদি যা কিছু ছিল, সেগুলিও ক্রমে ক্রমে ‘নেই’ হয়ে যায়।

হায়, সেই বুকি আজ কোথায়? সেই চিলছাদে শোভা পাচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা। হারবার্ট নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। হিপোড্রোম সার্কাস নেই। সিমলা স্ট্রিটে প্রসিদ্ধ গৌঁসাইবাড়ির পাশে দীনুর হোটেল নেই। “শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর চক্ষুদ্বয় প্রায় সর্বক্ষণ মুদ্রিত থাকিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে আঁজুবাবু বলিত।” তিনিও নেই। (ভট্টাচার্য ২০০৪, ২৯)

যে চিলছাদ ছিল হারবার্টের কৈশোরের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল, সেটাও ‘নেই’ হয়ে যায়। বস্তু বা প্রাণী সবকিছুই আখ্যানে ক্রমশঃ ‘নেই’ হয়ে যেতে থাকে। কথক তার একটা ধরতাই রাখেন হারবার্টের সঙ্গে টিভির তুলনায়- “আসলে গুপ্তগোল হয়েছিল মেশিনে। সাউন্ড আছে, পিকচার নেই। পিকচার আছে, সাউন্ড নেই” (৫৩) ঐ একই বাক্য আখ্যানের শেষলগ্নে ফিরে আসে ফ্লপ ছবির উপমায়। যে ‘মৃতের সহিত কথোপকথন’ ব্যবসাকে উপার্জনের পথ মনে করেছিল, আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের সঙ্গে সংঘাতে সেটাও ‘নেই’ হয়ে যায়। আর, শেষ অধ্যায়ে হারবার্টের ব্যবহার্য ও স্মৃতিবিজড়িত সমস্ত কিছুই ‘নেই’ হয়ে যায় তথা অতীত হয়ে যায়। বই, সাইনবোর্ড, অলেস্টার, চিঠিপত্র সবকিছুই বিক্রি হয়ে যায়। হারবার্টের এই সমস্ত কিছুর জন্যেই ছিল অফুরান মায়া, অথচ সেই সবকিছুই অতীত হয়ে গেল। এও একপ্রকার মৃত্যু।

“বিনু পরলোকে আগ্রহী হারবার্টকে মৃত্যুর একটা অন্য মানে বুঝিয়েছিল” (ভট্টাচার্য ৩১) হারবার্টের পাগলামি কি হ্যামলেটের উন্মাদাবস্থার সাথে তুলনীয়? পলোনিয়াস হ্যামলেটের সঙ্গে কথোপকথনের সময় স্বগতোক্তি করে, “Though this be madness, yet there is method in ’t”⁵⁹ ধন্বনাদাদার ছেলেদের ‘ঘুষি খেয়ে হারবার্টের অপরিণত ব্রেন বোধহয় নড়ে গিয়ে থাকবে’ (২৯) এমন দ্বিধাযুক্ত বিবৃতি রাখে কথক। হারবার্টের কখনভঙ্গি, আচরণ, প্রেতবন্ধু ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আদানপ্রদান তার ‘পাগলামি’র দিকেই কি ইঙ্গিত করে না?

হারবার্টের মধ্যে অনেক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস খুঁজতে চেয়েছেন নবারুণ।⁶⁰ ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে ওসমানের মানসিক স্থিতি বিপন্ন হওয়ার পরে দৃষ্টিভ্রমে বহু শতাব্দীর ভূতের মিছিল ও খিজিরের ভূতকে প্রত্যক্ষ করে সে; হারবার্টের ‘অপরিণত ব্রেনের’ ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে হয় কথককে। হারবার্টের সমস্ত অসঙ্গতি এবং জীবনের কাঙ্গালপনার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষাতেও প্রবহমান। হারবার্টের সঙ্গে হ্যামলেটের কি আরও কিছু মিল থাকে না? পচাগলা ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট নৈতিকতা-শাসন সহ রাজতন্ত্রের এক অধঃপতিত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে। হারবার্ট ঔপনিবেশিক সময়ের অধঃপতিত অবক্ষয়ী উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে, হারবার্ট চলমান রাজনৈতিক দিশাহীনতায় ভরা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে।⁶¹ আর, হ্যামলেটকে যেমন প্রেত এসে সচেতন ক’রে যায় বারবার, তেমনই প্রেতের আনাগোনা হারবার্টকে সচেতন রাখে। কখনও বিনু, কখনও পূর্বপুরুষেরা, কখনও ভূত-সম্পর্কিত বইয়ের প্রতি বিশ্বাস, কখনও খোড়োরবি কিংবা হারিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি সম্পর্কের টান- এদের উপস্থিতি তাকে জাগিয়ে রাখে। ভূত ললিত-শোভারানীকে কথক আখ্যানে বসিয়ে নেন; কলকাতার অতীত আর বিভিন্ন ‘মৃত’ কোলাজ দিয়ে সচেতন ক’রে দেন পাঠককে। বিনুর ভূত না থাকলে হারবার্ট অমন ক’রে বিশ্বসংসারে তাগুব লাগিয়ে দেওয়ার ও দাপিয়ে বেড়ানোর হৃদিশ পেত কি? হারবার্টও কি কোনও এক প্রতিশোধ খুঁজে পেতে চাইত? যুক্তিবাদী সংস্থা, পুলিশ, ধন্বাদাদা, বিনুর শত্রুরা- হারবার্টের লড়াই অনেকের বিরুদ্ধে। আর, সেই প্রেতবন্ধুত্বই তার ভরসা- উপার্জন ও পাগলাটে সামাজিক অবস্থান দু’ই ক্ষেত্রেই। ক্রিস্টিনা রিভেরা গ্রাজা এক সাক্ষাৎকারে বলেন- আমাদের মৃতেরা আমাদের কথোপকথনে ঢুকে পড়তে চায়। তারা আমাদের কিছুতেই ভুলতে দেয় না। তারা বারবার বলতে থাকে যে, আমরা আমাদের জীবনযাপনে যে সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকি, তার মধ্যে আসলে বর্তমানে অস্তিত্বহীন সব সম্প্রদায়ই মিশে থাকে।⁶² “Our dead want to be part of our conversation, they do not allow us to forget, they tell us that the communities that are no longer present are

also part of the communities we create in life.” (Graza 2013) ক্রিস্টিনা রিভেরা তাঁর উপন্যাসে প্রেত ও সবাক মৃতেরা কীভাবে অতীতের সঙ্গে ইতিহাসমুখর সম্পর্ক গড়ে তোলে সেকথা বলেছেন। এই প্রেতদের উপস্থিতি দ্বন্দ্বিক, প্রতিমুহূর্তে বর্তমানের জীবিতের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যায়, যাতে অতীতের কোনও আপাত অনুপস্থিতি ঝলসে উঠতে পারে। ‘পেদ্রো পারামো’ উপন্যাস যেমন এই ভূতদর্শনের পাঠ দেয়, তেমনি ভূতের আনাগোনা ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ উপন্যাসে এক আশ্চর্য বাস্তবের সামনে হাজির করে পাঠককে। এই বাস্তব পাঠকের চেনা ও অচেনা দু’ইই। হারবার্টের প্রেতবন্ধুত্বের মতো চোক্তার ও ফ্যাতাডুদের সঙ্গেও প্রেতবন্ধুরা জোট বাঁধে। বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের শুরুর সন্ধিক্ষণে এই অলৌকিক বন্ধুত্ব অতীত-বাস্তবের এক সেতু বেঁধে দেয়। হারবার্টের বিশ্বাস ‘ভূত আছে। ভূত থাকবে’ এই আখ্যানে এসে বাস্তবতা ও যুক্তিশৃঙ্খল খুঁজে পায়। দণ্ডবায়স, বেগম জনসন, বহু শতক আগের ‘নুনুকামান’, কালোজাদুচর্চা এবং চাকতির ঘর ওতঃপ্রোত হয়ে যায় চোক্তার-ফ্যাতাডুদের যুদ্ধাঙ্গানে।⁶³ দেরিদা ‘পলিটিক্স অব ফ্রেন্ডশিপ’-এ লিখছেন,

Not the past friend, but the friend to come. Now what is coming is still spectral, and it must be loved as such. As if there were never anything but spectres, on both sides of all opposition, on both sides of the present, in the past and in the future (Derrida 2005, 288)

আখ্যানে যে সমাজকাঠামো হাজির করা হয়, তা পাঠকের চেনা, নব্বই দশক ও তৎপরবর্তী বাস্তবতা। কিন্তু, ফ্যাতাডু ও চোক্তারেরা সেই চেনা বাস্তবের গণ্ডি উপকে বারবার অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে দেয়। চোক্তার-প্রধান ভদি তন্ত্র ও কালোজাদু (ব্ল্যাক ম্যাজিক) চর্চা করে- পূর্বপুরুষ দণ্ডবায়সের সঙ্গে কথোপকথন চালায়- প্রায় সওয়া শো বছর আগে মৃত বেগম জনসন তাদের অভ্যুত্থানে মদত জোগায়- প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা কালীপূজোর রাতে ভূতদের উদ্‌যাপনের সঙ্গী হয়। ফ্যাতাডুরা উড়তে পারে। ফ্যাতাডু ও চোক্তারের যুগলবন্দী রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সমস্ত অনুশাসনে

অন্তর্ঘাত ঘটাতে থাকে বারবার। “চাকতির খেলা যখন শুরু হয় তখন চোক্তারের সঙ্গে ফ্যাটাডুরা এক পার্টি হয়ে যায়” (২৪৩) আর, এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে কথক অতীত সম্পর্কে সচেতন করতে থাকে পাঠককে। বিস্মৃত কবিতাংশ উদ্ধৃত করে এবং আখ্যানের ভেতরেও সুদূর অতীতের বিভিন্ন পাঠ ক্রিয়াশীল থাকে- অতীত ও বর্তমানের সংঘাতে আখ্যানের বিরোধভাস জমে ওঠে। অতীতসূত্রগুলিকে বারবার বর্তমান পাঠকের চেতনায় জাগিয়ে রাখা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কথক তা বলে, “একদা যে প্রান্তরে পাঠানরা যুদ্ধ করেছিল এখন সেখানে পাঁঠা চরছে। এমতাবস্থায় পাঠককে জেগে থাকতে হবেই। সাহিত্য নামধারী বিশাল জঞ্জালের পাহাড় থেকে একটি কুটোও যেন না হারায়।” (২৪৮) অতীত ও ভূতের এত আধিপত্য কেন বিশ্বায়ন পরবর্তী উপন্যাসে? বারবার কথককে কেন বর্তমানের অবক্ষয় ও অতীতের বিস্মৃত সমৃদ্ধি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতে হয়? আলবের্তো রিবাস ও আমান্দা পিটারসেন তাঁদের প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকার স্প্যানিশভাষার উপন্যাসে ভূতের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন- আধুনিকতার দিকে যাত্রা ও তৎসহ বৈষম্যমূলক অর্থনীতির প্রভাব উপন্যাসে কীভাবে পড়ছে। লাতিন আমেরিকার প্রায় সবক’টি দেশেই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দখলদারি চলেছে ইউরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা- সামরিক ও পুঁজিগত বিনিয়োগে ‘আধুনিকতা’কে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বঞ্চিত নিপীড়িত বিযুক্ত জনগণকে ‘অপর’ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Modernity in the Transhispanic world is haunted by the Other who is segregated, disenfranchised, and excluded by processes of colonization and modernization. Spectrality or haunting rises as an aesthetic opposed to conditions or moods generated by military, political, or economic violence in the context of modernity (Ribas-Casasyas, Petersen 2015, 6)

এই ভূতময়তা ও তাড়িয়ে ফেরার নান্দনিকতা আছে, যা সামরিক, আর্থ-রাজনৈতিক দখলদারির বিরুদ্ধবয়ান ও জবরদস্তি বিস্মৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শাসকশ্রেণি ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক উৎপাদন যেভাবে বাস্তব ও অতীতকে উপস্থাপন তাতে নিপীড়িতের বাস্তব চাপা পড়ে যায় বা উহ্য থেকে যায়, তাই ভূতময়তা অন্তর্ঘাতের নান্দনিকতা নিয়ে জেগে ওঠে। ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক উপন্যাস যা অরাজক্ষরী সশস্ত্র যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জ্বাজ্বাল্যমান রাখে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে মৃত্যুর উল্লেখ অনেকগুলি, কিন্তু এই উপন্যাসে একটিও মৃত্যুর উল্লেখ নেই। ভূত আছে, অতীতের চরিত্রদের জেগে থাকা আছে, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের অবিচ্ছেদ্য ও বহুসম্ভাবনাময় সেতুবন্ধন আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই! আভেরি গর্ডন বলছেন, ভূত এমন এক রূপ যার দ্বারা কোনও হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, অদৃশ্য, অনুপস্থিত কোনোকিছু নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। দমনমূলক আধিপত্যের (hegemonic) বয়ান বিজিতের ইতিহাসকে, ক্ষমতাহীনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দেয়। শোষণমূলক, বৈষম্যজনক ও হিংসাত্মক রাজনৈতিক শাসনের অধীনস্থ সামাজিক বয়ানে অনেক কথা ‘চুপ করিয়ে দেওয়া’ হয়। শাসিত জনগণও সেই বয়ানগুলিকে ভুলে যায় ক্রমশঃ কারণ যা দৃশ্যমান, যা উপস্থিত, যা ঘটনাবল্ল সেটাই মনে রাখা হয়।⁶⁴ তবুও যে শাসিত আর্থ-সামাজিক ‘বিষয় (subject)’ এবং শাসকদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ওই অদৃশ্য বিস্মৃত অতীতসমূহ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিস্মৃত অতীত, ভূতেরা প্রতিমুহূর্তে প্রতিস্পর্ধা জানাতে থাকে দমনমূলক আধিপত্যকে এবং সম্মিলিত বিস্মৃতিপ্রবণতাকে (collective amnesia)। “Ghosts also flourish in rapidly modernising societies, in fiction and in popular imaginations, and often as critiques of modernity”⁶⁵ ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে দণ্ডবায়স ও কথক স্বয়ং উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ দিয়ে চলে প্রতিনিয়ত। দণ্ডবায়স জাদুঘরের কিউরেটরকে তথা যে ঔপনিবেশিক জ্ঞান প্রজন্মান্তরে বহমান, তাকে প্রতিস্পর্ধা জানায়। কথক প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে বিস্মৃতপ্রায় কবিদের কবিতা উদ্ধৃত ক’রে পাঠককে প্রতিস্পর্ধা জানায়

তৎসহ ঔপনিবেশিক আধুনিকতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকাণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করে। ধুঁই হারবার্টকে যে বংশপরিচিতি দেয়, তাতে ঔপনিবেশিক দাসত্বের প্রতি হারবার্টের পরিবারের বদান্যতা প্রমাণিত হয়। ইংরেজরা না থাকলে হারবার্টের পূর্বপুরুষরা নব্যবাবু হয়ে উঠতে পারত না। মুৎসুদ্দি বেনিয়া হয়ে ওঠার যে ‘বনেদিয়ানা’, তার শেষ প্রতিনিধি হারবার্টের বাবা ললিতকুমার, যিনি যুদ্ধের বাজারে ছাঁট লোহা ও তামার ব্যবসায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ললিতকুমারের সংগ্রহে থাকা রঙিন ফোটো-অ্যালবাম ও মোটরান এবং স্কচ-সিগারেট ঔপনিবেশিক হ্যাংওভারের সাক্ষ্য বহন করে।⁶⁶ আর, হারবার্ট সেই ঔপনিবেশিক অবশেষের কিছুই পায়নি, নামের সাহেবিয়ানা ছাড়া। ফোটো-অ্যালবাম থেকে মোটর থেকে প্রভূত অর্থ কিছুই উত্তরাধিকার হারবার্টের ছিলনা। হারবার্ট নিজেই এক মূর্ত বিষম প্রত্যাখ্যান। তার সমপ্রজন্মের ধর্মলাল ও কৃষ্ণলাল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক আর্থ-সংস্কৃতিতে অভিযোজিত হয়ে গেছিল কিন্তু, হারবার্ট তাতেও বেমানান। ‘কাঙাল মালসাট’-এ জাদুঘরের যে কিউরেটরকে দণ্ডবাস “চার্নক ওয়াজ এ গ্রেট বাল। ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাতার পত্তন করল- তোর মতো হারামি না হলে ওই লুটেরা মাগিবাজটাকে আদিপিতা বলে চালানো যেত?” (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৯৫) ধমকায়, সেই কিউরেটর হারবার্টের পরিবারের মতোই ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও বদান্য। ‘মহাপণ্ডিত’ কিউরেটর ও ‘কলকাতার ওলডেস্ট দাঁড়কাক’-এর সংলাপে ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার কাটাতে না-পারা সাহেবিয়ানাময় বাবুর সঙ্গে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক দাসত্বকে প্রতিস্পর্ধা জানানো ভূতের দ্বন্দ্ব চলে। ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসে অমনুষ্যেরা কথা বলতে পারে, অমনুষ্য প্রাণীরা ভূত হয়ে ও জীবন্ত হয়ে মানুষের সঙ্গে কথোপকথন করে, তেমনই ‘কাঙাল মালসাটের দাঁড়কাক’। ‘ভূত কোম্পানী’ শীর্ষক অধ্যায়ে ইংরিজি-পড়া বাবুটিকে স্কল ও স্কেলিটন যে ভাষায় বুঝিয়ে অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী ক’রে তোলে, দাঁড়কাকও প্রায় একই ভাষায় কিউরেটরের পাশ্চাত্যমোহ কাটিয়ে তাকে ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্বন্ধে অবগত করে।⁶⁷ জোব চার্নককে ‘কলকাতার জনক’ বলে মাহাত্ম্য প্রচার করার যে প্রচলিত জনতোষী রীতি, তাতে

এটাই প্রমাণিত হয় যে, কলকাতা শহরটি ১৬৯০ সালের ২৪শে জুন ‘প্রতিষ্ঠিত’ হয়েছিল এবং চার্নকের প্রতিষ্ঠিত শহরটি এরপরে ইংরেজকর্তৃক সভ্য-শিক্ষিত হয়ে ওঠে। দাঁড়কাকের উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা এই বয়ানকে নাকচ করে। চার্নকের বহুলপ্রচারিত মহত্ব ও মিথগুলিকে প্রত্যাখ্যান ক’রে দেড়শ বছরের দাঁড়কাক ইতিহাসের পাঠ দেয়। আর, দাঁড়কাকের সহযোগী বেগম জনসন, যিনি “সেন্ট জনস চার্চ গোরস্থানে জব চার্নক ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের কাছেই কবরস্থ আছেন” (২৪৬) বেগম জনসন আঠারো শতকের এক বাস্তব চরিত্র যিনি ফ্যাতাডু-চোক্তারদের উৎসাহ দেন এবং প্রথাগত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী তিনি।

‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে ভূতের আনাগোনা এবং কালোজাদু-তন্ত্রের উল্লেখ কোনও ভীতিজনক আবহ নির্মাণ করে না। অদ্ভুত রসের মোড়কে ও হাস্যরসের মোড়কে আখ্যানে কুশীলবেদের উপস্থাপনা করা হয়। চাকতির ঘর খুলে যাওয়া, প্রাচীন দণ্ডবায়সের ‘অনুপ্রবেশ’ কিংবা নুনুকামানের অস্তিত্ব আবিষ্কার হওয়ার ‘willing suspension of disbelief’ অর্থাৎ অবিশ্বাসী মনকে ক্ষণস্থায়ীভাবে চুপ করিয়ে রেখে ডানা মেলতে দেওয়া উপন্যাসের কাল্পনিকতার অন্যতম শর্ত। কিন্তু, ‘কাঙাল মালসাট’-এ এগুলি ঠিক ঐন্দ্রজালিক বাস্তবের উপাদান নয়; প্রতিবাস্তব হিসেবে এগুলিই কার্নিভালের প্রত্যাঘাত হয়ে ওঠে।^{৬৪} এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য- ‘কঙ্কাবতী (১৮৯২)’ ও ‘ডমরু চরিত’। ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসে অতীতের সমৃদ্ধি, দেশজ লোকাচারের বিরুদ্ধে আধুনিকতার অতিশিক্ষিত উন্নাসিকতার প্রতর্ক রাখা থাকে অদ্ভুত রসের আড়ালে। ‘কাঙাল মালসাট’-এর ভূত যেমন ভীতিপ্রদর্শন করে না, তেমনি ‘কঙ্কাবতী’-র ভূতেরা বা লুল্লু ভূত (১৮৯৬) ভয়ের উদ্রেক করে না। বহুস্তরীয় উপন্যাসগুলিতে ভূতের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ বহুার্থ বহন করে। ত্রৈলোক্যনাথ দেশজ ভূত ও দেশজ ভূতবিশ্বাস দিয়ে আরোপিত আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করছেন এই বলে যে, ইংরেজের প্রভাবে অন্য সকল দেশি ব্যবসার মতো ভূতের ব্যবসাও লোপ পেয়েছে।^{৬৫} গল্পের সংলাপে ভূতেরা ও কথক বলে, “ভারতের ভূতকুল ও ডাইনকুল আজ তাই মৌনী ও স্তিমিমাণ... ভারতের সকল

গৌরবই একে একে লোপ হইল, এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে?” (মুখোপাধ্যায় ২০০১, ১৫৮) দেশজ প্রেততত্ত্ব নিয়ে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবজ্ঞা, নবজাগরিত বাঙালি সংস্কৃতির অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের অপ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং ইংরেজদের নকলনবিশি- ত্রৈলোক্যনাথ এই সবকিছুকেই ব্যঙ্গ করছেন। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২)’র কথক হুতোমও ভূতের উল্লেখ করছেন উনিশ শতকের কলকাতায়; কিন্তু, সেই উল্লেখ ব্যঙ্গার্থে। ক্রমাধুনিক, শিক্ষামুখর সমাজেও ভূতের ভয় ও স্বঘোষিত ‘মহাপুরুষ’-এর অলৌকিক কারবার দেখার হুজুগ যে উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, হুতোম সেই নিয়েই ব্যঙ্গ করছেন। ‘হুজুক’ অধ্যায়ের ‘মহাপুরুষ’ অংশে এবং ‘বুজরুকী’ অংশে ‘ভূত নাবানো’ অংশে ভূতের উল্লেখ রয়েছে। ‘মহাপুরুষ’ অংশে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ কীভাবে সাধারণ মানুষে পরিণত হলেন, ‘তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাচে’ তার বর্ণনা। এক্ষেত্রে এক ডাক্তার সাহেবের আরকের গুণে তার মহাপুরুষত্ব ভেঙে যায়।⁷⁰ ‘ভূত নাবানো’ অংশে সেকেলে কলকাতার ভূতে বিশ্বাস করাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে আগাগোড়া। সুশিক্ষিত অভিজাত ব্রাহ্মসমাজের উচ্চপদস্থদের মধ্যেও যে ভূতে বিশ্বাস ছিল এবং যুক্তিবাদ আধুনিকতার পাশাপাশি ‘ভূত চতুর্দশী’তে প্রদীপ দেওয়ার সাবাকি রীতিও যে বহাল ছিল, হুতোম তাকেই ব্যঙ্গ করছে।⁷¹ রোজা কর্তৃক ভূত আহ্বান করা, ভূত নামানো এবং কাঠের পিঁড়ে দু-আধখানা হয়ে ভেঙে যেতেই ‘রোজা সভয়ে বলে উঠলেন- শ্রীযুৎ এসেচেন’- মূলতঃ রোজা ও তার চ্যালাদের ভণ্ডামির কথা বলছেন হুতোম। “সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না” (হুতোম ২০১২, ১১৮) ত্রৈলোক্যনাথ এবং নবারণ কি হুতোমের এই উপলব্ধিকেই পুনর্নির্মাণ করছে? হারবার্টের মৃতের সঙ্গে কথোপকথন ও মৃতের ব্যবহৃত বস্তু ছুঁয়ে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনের সমতুল্য চেষ্টা রোজা ও তার চ্যালারা করত হুতোমের সমসাময়িক কলকাতায়। ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় স্কল নামক মুণ্ড ও স্কেলিটন নামক ধড় দু’টি ভূত- তাদের বয়ানে ও আচরণে ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসের উদ্দেশ্য বোঝা যায়। নবারণ ‘কাঙাল মালসাট

(২০০৩) উপন্যাসের শুরুতেই কাটা মুগুর ‘অলৌকিক’ ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। “সাইক্লোনজনিত ঘোলাটে আকাশের তলায় খলবলিয়ে মাথার খুলি নাচছে। আগে অনেকগুলো নাচছিল। কিন্তু যেই পুলিশ এল অমনি বাকিগুলো ভ্যানিশ হয়ে মাত্র তিনটে রইল।” (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৩১) এই কেরোটিন্‌ত্য ভবিষ্যতের প্রকাশ কাণ্ডের ইঙ্গিত, তা কথক জানান; বস্তুতঃ এই খুলিনৃত্যের ‘অশুভ’ ইঙ্গিত আখ্যান জুড়ে কার্যকরী থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের বিমূঢ় অসহায়তার প্রারম্ভিক ইঙ্গিত এখান থেকেই শুরু হয়⁷² এবং এই অসহায়তা এরপরে আরও বিস্তৃত হয়। ‘কঙ্কাবতী’র স্কল নামক মুগুভূত উচ্চশিক্ষিত বাবুকে বলে, “বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না? ইংরিজি পড়িয়া তুমি না কি ভূত মানো না?... কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই?” (১৮০), সেই অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করতেই চাকতির খেলা, কাটা মুগুর নাচ ও জাদুটোনা-অশৈলী কাজকর্ম চলে ‘কাঙাল মালসাট’-এর আখ্যানে। টালিগঞ্জ থানার অবিশ্বাসী ‘টাকলা ও.সি’ ভূতচতুর্দশীর⁷³ রাতে কলকাতায় ভূতদের মহোৎসবের সাক্ষী হয়।⁷⁴ ভূত অর্থে প্রেত ও অতীত দুই অনুষ্টিই এখানে ক্রিয়াশীল। এন.সি বসাক, গোপাল পাঁঠা, মিনা পেশোয়ারির মতো একদা-বাস্তবের চরিত্রদের পাশাপাশি অধুনালুপ্ত আখড়ার বাঙালি লাঠিয়াল, পুরনো কলকাতার মস্তান, শ্মশানের রংবাজ বা মৃত নকশাল সকলেই আসে। সময় ও স্থানের যৌক্তিক বাধা অতিক্রম ক’রে এবং শ্রেণিবিভাগ ও সামাজিক অবস্থানগত বিভেদের তোয়াক্কা না ক’রে ভূতচতুর্দশীর মহোৎসবে সামিল হয়। বাখতিন ‘Rabelais and his world’-এ লিখছেন, “During carnival time life is subject only to its laws, that is, laws of its own freedom. It has a universal spirit, it is a special condition of the entire world, of the world’s revival and renewal, in which all take part” (Bakhtin 1984, 7-8) মহোৎসবের অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্‌যাপনকে সমৃদ্ধ করে, সফল ক’রে তোলে। ‘রাঙ্গাজবা কম্পিটশন’, বোমচার্জ, খিস্তি-খিল্লি, শ্মশানকালীর পূজো এই সমস্ত কিছুই ঘটছে। সমাজের যাবতীয় বিধি-রীতি-শ্লীলতা উল্লঙ্ঘন ক’রে এবং প্রচলিত ‘সিস্টেম’ নস্যাৎ ক’রে অদ্ভুত

অসম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে থাকে প্রশাসনিক প্রতিনিধির বাস্তবতায়। খুলি তথা মুণ্ডুর নাচের অনুষ্ণ ফের আসে দ্বাদশ অধ্যায়ে, যখন পুলিশ কমিশনার জোয়ারদারের মুণ্ডু কেটে ফেলে উড়ন্ত চাকতি। কাটা-মুণ্ডু স্কলের মতো কাটা-মুণ্ডু জোয়ারদারও অনায়াসে কথা বলে।⁷⁵ পার্থক্য এই যে, জোয়ারদার ‘ভূত’ নয়। স্কল ও স্কেলিটনের মতো ছোট ব্যবসাদার নয়, জোয়ারদার নগরপাল; প্রশাসনিক কর্তা, শিক্ষিত উচ্চবর্গ, আদবকায়দা জানা এবং যুক্তিবাদী। ‘বিহেডেড’ হওয়া তাকে আশ্চর্য (যেহেতু ‘প্রায়র ইনফরমেশন’ ছিল না) ও লজ্জিত করে (স্ত্রী ও বাবুর্চিদের সামনে)। গলা কাটা গেলেও তার মনুষ্যগুণ লুপ্ত হয় না, কারণ তার মুখের স্বাদ, স্ত্রী সম্পর্কে মনোগত ভাবনা ও সচেতন চেতনা অবিকৃত থাকে। ‘ভূত’ হয়ে অতীত থেকে বর্তমানকে বিচার করা নয়, বর্তমানে থেকেই বর্তমানকে বিচার করে মুণ্ডু-কাটা নগরপাল। সরকারের সঙ্গে ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ওই অবস্থাতেই সাক্ষাৎ করে সে। ফলে, নগরপালের গলা-কাটার দৃশ্য বা পরবর্তী উপস্থিতি ভৌতিক আবহ নির্মাণ করে না, বরং অদ্ভুত রসের মোড়কে অন্যবাস্তবের আবহ নির্মাণ করে। ‘Postmodernist Fiction’ গ্রন্থে ম্যাকহেলের মতামত, “The fantastic, in other words, involves a face-to-face confrontation between the possible (the real) and the impossible, the normal and the paranormal. Another world penetrates or encroaches upon our world, or some representative of our world penetrates an outpost of the other world, the world next door.” (McHale 1987, 75) টোডোরভও বিশ্বাস করতেন যে, ‘ফ্যান্টাস্টিক’ সংরূপটি আসলে বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে বোঝাপড়া। যে রিয়েলিটি শাসকের সম্মতি পাচ্ছে এবং যে রিয়েলিটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়ে নিচ্ছে শাসক, গদ্যের আবাস্তব দিয়ে সেই ‘রিয়েলিটি’কে প্রত্যাখ্যান করা নবাবরণের উদ্দেশ্য। সেই বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করছে নবাবরণ কারণ, সেই আপাত বাস্তব থেকে কোনও ‘মহৎ সাহিত্য’ তৈরি হয় না।⁷⁶ নবাবরণ তাঁর লেখার পরিসরে এক পাল্টা-বাস্তব নির্মাণ করতে চেয়েছেন নিষ্ঠভাবে, যা ক্ষমতাসীনদের বাস্তবকে প্রতিস্পর্ধা জানায়। তারা ভাংচুর করে, খিস্তি

করে, অর্থহীন ঝামেলা পাকায়, নৈরাজ্যের উদযাপন করে- কারণ, তারা উপস্থাপিত বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান ক’রে নিজেদের বাস্তবতা তৈরি ক’রে নেয়। শুভেন্দু দাশগুপ্তের ভাষায়, যে বাস্তবতা উন্নয়নের নামে বিস্থাপনের রাজনীতি করে, যে বাস্তবতা হাইরাইজ বানিয়ে বস্তিবাসীদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়, যে বাস্তবতা আদিবাসীদের তাড়িয়ে কর্পরেটদের লুঠের পথ সুগম ক’রে দেয় সেই জবরদস্তি ‘মান্য’ বাস্তবের বিপ্রতীপে ‘হার্ড রিয়ালিটিকে আনরিয়েল বানিয়ে’ দেওয়ার প্রয়াস নবাবুগের।⁷⁷ গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাসে ‘নতুন কৃৎকৌশল’ দিয়ে সাহিত্যের প্রচলিত কৃৎকৌশল এবং কাণ্ডজে মান্য বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান জানানোর নিরন্তর চেষ্টা রয়েছে। কাণ্ডজের পাতায় সীমাবদ্ধ থেকে কিংবা শাসক-মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের কৃৎকৌশল দিয়ে জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তোলা যায় না, তাই নতুন কৃৎকৌশল প্রয়োজন হয় অবমূল্যায়িত জীবনকে বিশ্বাসযোগ্য করার তাগিদে।⁷⁸

আধিপত্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিকতা ও প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ- ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’

আমি একটু আমোদগেঁড়ে আছি, কার্নিভাল ভালবাসি। পুজোটুজো এলে আমার প্রচণ্ড আনন্দ হয়... এই যে মানুষের হাজারো দুঃখের মধ্যে তার বেঁচে থাকার প্রাত্যহিক সেলিব্রেশন এইটা আমাকে অসম্ভব আনন্দ দেয়, মানে কী বলব মোটিভেট করে। তার প্রাত্যহিক জীবনে সেরকম কোনো দুঃখ নেই। সে যখন একটা বিড়ি ধরায়, সে কিন্তু রাজা। তার এই রাজকীয় ভাবটুকু আমি তার কাছ থেকে গ্রহণ করি। এই celebration of life, এইটা কিন্তু আমার কাছে খুব দরকারি একটা ব্যাপার। এইটাই আমাকে অনেকদূর অবধি নিয়ে গেছে, মানে ‘কাঙাল মালসাট’ অবধি নিয়ে গেছে। বা ‘মসোলিয়াম’ অবধি নিয়ে গেছে। (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৪৭-৪৮)

‘কথাবার্তা’ বইতে নবারণ হুজ্জোড়-উদ্‌যাপন (carnival) এবং তার বাস্তবের উৎসবস্তু সম্পর্কে এই কথাগুলি বলছেন। আর, হুজ্জোড়-হুজ্জুত-আমোদের আখ্যান রচনা করছেন ওই ‘রাজার মতো বিড়ি ধরানো’ লোকটি/গুলিকে কেন্দ্রে রেখে। বজরা ঘোষ যেমন ‘fucktion’ লেখে বা পুরন্দর ভাট যেমন ‘বাল সিরিজ’সহ অন্যান্য কবিতায় সমাজ-রাষ্ট্রের খিল্লি ওড়ায়, ‘কাঙাল মালসাট’ ও ‘মবলগে নভেল’-এর লেখকও তেমনই রাজনৈতিক ‘fucktion’ লেখে। ‘ফ্যাটাডুর বোম্বাচাক’-এ পূর্বপ্রস্তুতির মালমশলা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং দণ্ডবাস, বনবেড়াল, বেগম জনসনদের বিস্মৃত অতীতের প্রতিনিধিত্ব সমেত তুলে এনে লেখক প্রচণ্ড আমোদময় হুজ্জোড়-হুজ্জুতের বাস্তবতা তৈরি করেন। যা একান্তভাবেই উপন্যাসের সত্য। কিন্তু, বাস্তবের সত্য ও ইতিহাসের সত্যের স্পর্শক হয়েই সেই উপন্যাসের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্যাটাডুদের অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্যের মধ্যে ‘উইশ ফুলফিলমেন্ট’ রয়েছে- ভাঙ্গাভাঙ্গি, অদ্ভুত অস্ত্র দিয়ে মারামারি, ক্ষমতাকাঠামোকে উল্টে দিতে আমুদে সংলাপ ও ক্রিয়া, ঝামেলা পাকাবার জন্যে চোক্তারদের সঙ্গে ভিড়ে রাষ্ট্রকে নাস্তানাবুদ করা- এই সমস্ত কিছুই প্রবলভাবে পলিটিক্যাল থিম।⁷⁹ আখ্যানের ভাষা ভাবগম্ভীর নয় আবার পিচ্ছিল-তরলও নয়। সাহিত্যবাজারের চলতি ভাষাকে প্রত্যাহ্বান ক’রে আমোদের ভাষার রকমফের তথা বহুস্তরীয় স্বরবৈচিত্র্য আখ্যানের শিরদাঁড়া। সাহিত্য নামক প্রতিষ্ঠানকে বহুকৌণিক আক্রমণ- ঔপনিবেশিক থেকে উত্তরাধুনিক যা যা আদেখলামো (hangover) সাহিত্যপাঠকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সবকিছুকেই প্রত্যাহ্বান জানানো। রাষ্ট্র, প্রশাসন ও সংসদীয় রাজনৈতিক দলের ত্র্যহস্পর্শে নিপীড়িতের জীবন ওষ্ঠাগত বলে সেই নিপীড়িতকে সমরাস্ত্রে বলীয়ান ক’রে রাষ্ট্রদ্রোহের স্বাদ দেওয়া- মার্শাল ভদি ও তার বাহিনীকে ‘সুপিরিয়র’ বানিয়ে ক্ষণিকের রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া। প্রেত জীবন্ত হয়ে ওঠে স্বাভাবিক চালচলনে, অতীতের বিস্মৃতপাঠ নতুন পঠন নিয়ে হাজির হয়, রাশিয়ার প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তিরা কলকাতার হুজ্জুতে নিম্নবর্ণের সঙ্গে সামিল হয়ে যায়- কালস্থানিকতার রৈখিক বিন্যাসও কি ঠিক থাকতে পারে? আখ্যানে কবিতা থাকে, নাটকীয় বা অতি-নাটকীয় সংলাপ থাকে, দু’টি লাইনের

মধ্যবর্তী নীরবতার সংকেতস্বরূপ থাকে, গদ্যের নিটোল ও ভাঙাভাঙা দু'টি গড়নই থাকে- আখ্যানের ভেতরে বিবরণ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস সবকিছু মিলিয়েই একটা বড় আখ্যান রচিত হচ্ছে- নবাবু বললেন যে আখ্যান রচনা উপন্যাস রচনার থেকে আলাদা।^{৪০} দেবেশ রায় 'গল্পসমগ্র'-র ভূমিকায় বলেছেন যে, আখ্যানকে একটিই ছোটগল্প বা উপন্যাসে আঁটাতে গেলে তার সর্বাতিশয় খর্ব হয়- সেই বন্ধন থেকে আখ্যানকে মুক্ত করা গেলেই তা বিরণে, উপন্যাসে, গল্পে, কাহিনীতে ছড়িয়ে যেতে পারে। আর, সেই ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভেতরের ঐক্যটিই আসলে আখ্যানের শিল্পগত ঐক্য।^{৪১} 'কাঙাল মালসাট'-এ সময়ের রাজনীতিকে ধারণ করে প্রতিবাস্তব তৈরি ক'রে নিচ্ছে কথক এবং পাঠক তাতে প্রবেশ করছে ও সেই প্রতিবাস্তবের ফ্যান্টাসিময় জগতে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে- সাহিত্যের রাজনীতির 'হিডেন এজেন্ডা' প্রকট হচ্ছে, যেখানে ভাষা উপস্থাপনা চরিত্রায়ণ সমস্ত কিছুই সম্মিলিত প্রথাভাঙা উদ্‌যাপনে উপন্যাস-জিজ্ঞাসা তৈরি হচ্ছে।^{৪২}

কাঙাল মালসাট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে- (১) রাষ্ট্র (২) পুলিশ ও প্রশাসন (৩) বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪ক) ভদ্রলোকীয় পরিশীলিত সংস্কৃতি (৪খ) ভদ্রলোকীয় সাহিত্যভাষা ও সাহিত্যোপাদান (৪গ) ঔপনিবেশিক ও বিশ্বায়নী সংস্কৃতি (৫) সংসদীয় রাজনৈতিক দলসমূহ (৬) সামাজিক উচ্চবর্গ এবং (৭) বর্তমানের ঘটমান ও অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতে অতীতের ফিরে ফিরে আসা।

(১) 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসে জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র অবসরপ্রাপ্ত করণিক কে.জি সরখেল 'পিঁপড়ার ডানা ওঠে' শীর্ষক ইস্তাহারে জানিয়ে দেয়,

আমার এই বিনামূল্যে বিতড়িত রচনাটির লক্ষ্য সরকার ও প্রশাসনকে আগাম হুঁশিয়ারি দেওয়া। কারণ এক প্রলয়ান্বক সংঘাত ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। কাহারও ক্ষমতা নাই এই লড়াই হইতে আমার পরিচিতদের মালসাট মারিয়া লাফাইয়া পড়া হইতে ঠেকায়। এই পক্ষে উড়িতে সক্ষম ও অক্ষম- দুই ধরনের পালোয়ানই আছে। আছে

যাদুটোনা। কুহকছাতা ও নানা সাইজের হনুর ছানা যারা নানা মাপের রন্ধ্রে ঢুকিতে সক্ষম। সরকার ও প্রশাসন যদি মোকাবিলার পথ বাছিয়া নেয় তাহা হইলে রচনাটির শিরোনাম স্মরণ করিতে বলিব। সেই পাখা যদি গজায় তবে তাহা উড়িবার তরে গজাইবে না। মরিবার জন্য গজাইবে। (ভট্টাচার্য ২০১০, ৩০৩-৪)

সরখেল নিজে ‘উড়িতে অক্ষম’দের দলভুক্ত কিন্তু ‘উড়িতে সক্ষম’রা হল ফ্যাতাডু। এই চিঠি জনগণ ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করে সরখেল, যে চিঠিতে রাষ্ট্রকে সরাসরি প্রতিস্পর্ধা জানানো হয়। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের নামোল্লেখ ক’রে প্রত্যাশ্বান থাকে। ‘পালোয়ান’দের যদিও বা মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু যাদুটোনা, কুহকছাতা ইত্যাদি ভাববাদী প্রাগাধুনিক কৌশল মোকাবিলা করা কি আধুনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ? এই উপন্যাসের ভাষায়, কখনভঙ্গিতে, কুশীলবদের উপস্থাপনায় এবং সমগ্র বিষয়বস্তুতে লেখক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণ সচেতন। কারণ রাষ্ট্র সক্রিয় থাকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, তাই এদের প্রত্যাশ্বান জানানো জরুরি। সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে যে আর্থ-রাজনীতি, তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণের উদ্দেশে কথক আখ্যানকথনে বিভিন্ন ছক ভাঙার প্রয়াস করেন। উপরোক্ত লিফলেটের বয়ান পুলিশের বড়বাবু ও খোঁচড়দের কাছে, ‘ডিক্লারেশন অব ওয়ার’ এবং ‘ব্লাড বাথ... সরকার ও প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো’ কিন্তু গোয়েন্দামহলের ওপরতলার দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই চেতাবনী অবজ্ঞাত হয় ‘পাগলাচোদা’ নোটের সাথে। “রাষ্ট্রের টনক যখন নড়ে তখন যা নড়ে না চড়ে না তেমনদেরও নড়ে বসতে হয়। রাজ্যের টনক নড়াও অন্যরকম নয়।” (৩২৫) রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগ নড়েচড়ে বসার সঙ্গে তুলনা হয়ে চলে জড়দগবের নড়া বসার। রাষ্ট্র ভয় পায় এবং ‘পাগলাচোদা’ লেখা ফাইলগুলি চেয়ে পাঠায়। আরও উল্লেখ্য দাঁড়কাকের অভয়বাণী এবং ফ্যাতাডু+চোক্তারদের অন্তর্ঘাতে উৎসাহ পেয়ে অবজ্ঞাত ‘সাবঅল্টার্ন’^{৪৩} গোলাপ ও তারকনাথ সাধু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর সাহস পায়। রাষ্ট্রবিরোধী প্রতিস্পর্ধার পরিকল্পনায় গোয়েন্দাবিভাগের

নিচুতলার কর্মী গোলাপ দ্রোহীদলে নাম লেখায়- “ভদি, গোলাপ মিউটিনিতে নাম লেকাল” (৩২৮)। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ‘মিউটিনি’ শব্দটি কারণ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ (Sepoy Mutiny) রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবেই ব্রিটিশ নথিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মিউটিনি শব্দটি উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে আর কখনও প্রযুক্ত হয়েছিল কি? পুলিশ কনস্টেবল নক্ষত্র নাথ হাওলাদার এবং প্রথম বিদ্রোহী গোয়েন্দাপুলিশ তারকনাথ সাধু দু’জনেই অধস্তন। বিশাল পুলিশবাহিনী ও ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের’ সঙ্গে তুলনীয় ধুরন্ধর গোয়েন্দাবিভাগের ভেতর ‘ছুঁচ থেকে ফাল’ হয়ে ওঠা ‘বিদ্রোহী’ এই দু’জন^{৪৪} কি সিপাহী বিদ্রোহের মঙ্গল পাণ্ডেকে মনে পড়িয়ে দেয় না? কথকের বারবার ‘মিউটিনি’ শব্দের প্রয়োগও সেই ইঙ্গিত দেয়। আর, ‘কাঙাল মালসাট’ খিল্লি, হুজুত, উদ্যাপনের মোড়কে মুড়ে যে রাষ্ট্রদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়, শেষ পর্যন্ত তারও কি সফলতা আসে? ঐকান্তিক সং প্রচেষ্টার পরেও ষাট-সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছিল কমিউনিস্ট নকশালরা। আর, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট শাসনকে রাষ্ট্রের মুখ চিহ্নিত ক’রে ফাটাডু ও চোক্তাররা বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু সেই বামফ্রন্টও ষাট-সত্তর দশকের কমিউনিস্ট দ্রোহচেষ্টার ফসল হিসেবেই ক্ষমতাসীন হয়েছিল। বিপ্লবচেষ্টাকে ভোটবাক্সে রূপান্তরিত ক’রে ক্ষমতাসীন হয়েও তারা তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী বিপ্লবাত্মক কিছু করতে পারেনি। অরুণা মুখোপাধ্যায় এই প্রশ্নটিই রাখতে চেয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কোনও বিপ্লবই কি সফল হয়েছে? আজাদ হিন্দ বাহিনী বা নকশালবাড়ি কৃষকদ্রোহ প্রত্যেকটিই গভীর রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেও ব্যর্থ- নবারণ ‘কাঙাল মালসাট’-এ এটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।^{৪৫} রাষ্ট্রদ্রোহের আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এই এখ্যানে। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধপদ্ধতি (psychological warfare) আধুনিক সমরবিজ্ঞানের অন্যতম মান্য শাখা এবং এর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গী সমরবৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি।

কোনো অজানা পদ্ধতিতে এক রাতের মধ্যেই এঁদের প্রত্যেকের মাথায় লোবোটমি করা হয়েছে এবং তাই শুধু নয়- এঁদের মাথায় যা যা থাকার কথা নয় সেইসব নানাধরনের

র্যাডিকাল চিন্তা ও তথ্য, সাজেশান বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এঁরা প্রত্যেককে দেখতে এক পিস করে হলেও এঁদের মধ্যে দুটি করে শিবির সক্রিয়। একটি ক্যাপিটালিস্ট, অন্যটি বিপ্লবী বা ওই গোছের কিছু একটা- মার্ক্সবাদী, স্তালিনপন্থী, নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কো সিভিকালিস্ট, ট্রটস্কিপন্থী বা বার্নস্টাইনমার্ক, দুবচেক-ঘেঁষা, টিটোপন্থী, মাওবাদী- নানা ধারাই রয়েছে। (ভট্টাচার্য ২০১০, ৩৪৫-৪৬)

এঁরা সেইসব শিল্পপতি যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট শাসনে বিনিয়োগ করতে এসেছিলেন। এই শিল্পপতিরা শাসক-মতাদর্শ প্রয়োগ ক’রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। সংসদীয় রাজনৈতিক দল কিংবা কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকরা এঁদের সুবিধামতো আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে খাপ খাওয়ানোর নীতি প্রণয়ন করেন। সেইজন্যেই মি. ঢোলাকিয়া ‘মিলিট্যান্ট ওয়ার্কারদের ওপর দমদম বুলেট ফায়ারিং হোবে... দনাদন, দনাদন, একতা লাশ পড়ল...’ বলে দাবি করে কিংবা বিলিমোরিয়া “লেবর পাওয়ার হল একটি পণ্য” বলে কিংবা সমস্বরে ‘দুনিয়ার পুঁজিপতি এক হও’ বলে চিৎকার করে। পুঁজিপতি বিনিয়োগকারীদের থেকে এই মতাদর্শই প্রত্যাশিত, রাষ্ট্রব্যবস্থা এতেই সচল নিরাপদ থাকে। কিন্তু চাকতির খেলা দিয়ে এঁদের মাথায় প্রতিস্পর্ধী-মতাদর্শ (counter ideology) পুরে দেওয়ার পরে এরা রুশ বিপ্লব নিয়ে সদর্থক বক্তব্য পেশ করে, ‘ক্যাপিটালিজমের ডেঞ্জার ইন রাশিয়া’ তত্ত্ব আউড়ে সিপিআইএমের তাত্ত্বিক নেতাকে মার্ক্সবাদের পাঠ দেয় কিংবা “কমরেড ট্রটস্কি লাল সেলাম। লং লিভ দ্য রেড আর্মি” শ্লোগান দেয় এবং “শ্রমিককে আপনারা কতদিন বঞ্চিত করিবেন? কতদিন দাবাইবেন?” বলে মার্ক্সবাদী প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।^{৪৬} রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ যাদের স্বার্থে নির্মিত হয়, তাদেরই মাথায় যদি শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শ ঢুকে যায় এবং তাদেরই মুখ দিয়ে যদি নির্বিক্রমের ক্ষমতায়নের শ্লোগান নিঃসৃত হয়, তাহলে রাষ্ট্রের কাছে তা সবচেয়ে বিপজ্জনক। সর্বোপরি, পুঁজিপতিদের সংলাপে আর্থ-রাজনৈতিক বিরোধভাস প্রকট- এমন বিরোধভাস শাসনের স্থিতি নষ্ট করে এবং শাসনপ্রক্রিয়া পুনঃপুনঃউৎপাদনের স্বাভাবিকত্বকে বিনষ্ট করে। দাঁড়কাক আর চোক্তারদের

চাকতি সামরিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অনুশীলনে রাষ্ট্রদ্রোহী মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে প্রায়-পর্যুদন্ত ক'রে ফেলছে। বামফ্রন্ট নেতৃত্ব এবং তদাদেশানুসারী প্রশাসন সেনা কম্যান্ডোদের তলব করে ফ্যাটাডু ও চোক্তারদের মোকাবিলায়। রাষ্ট্রীয় বাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুগামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চোক্তার ও ফ্যাটাডুদের দ্রোহের আখ্যানস্থ বাস্তবতা পাঠকের ফ্যান্টাসিকে উস্কে দেয়- আখ্যানের বাইরে যা আদৌ বাস্তব নয়, তাকেই উপন্যাসের বাস্তবজগৎ বানিয়ে নেয়। আর্থ-রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও বামফ্রন্টের বামপন্থী শাসনের ভেতরে যে প্রবল অন্তঃসারশূন্যতা এবং সুশিক্ষিত-সুপরিপক্কিত নষ্টামি, তাকেই আখ্যানের বাস্তবতায় কার্নিভালের প্রত্যাঘাতে চমকে দেয় কথক। মুখোশের ভিড়ে দৈনন্দিন দমবন্ধ পরিবেশে বাস্তব আর কাহিনি যখন গুলিয়ে যায়, তখন প্রতিবাস্তব ও প্রকল্পনার নাগরিক কুহকই একমাত্র প্রতিষেধক হয়ে ওঠে। প্রণালীহীনতার তুমুল হট্টগোলার মধ্যেই প্রণালী সন্ধান ক'রে নেন নবাবরণ।^{৪৭} রাষ্ট্রবিরোধী অন্তর্ঘাতের আখ্যান বলেই কাঙাল মালসাটে সামরিক পর্যবেক্ষণ প্রচুর থাকে কথকের বয়ানে এবং দাঁড়কাক, ভদি ও বেগমের বয়ানে। “মিলিটারির এই হল খাঁচ। ন্যায্য খিস্তি তারা সংযতভাবে ভক্ষণ করে। আবার উল্টোটা হলে যে নল ঘুরিয়ে ধরে না, এমনটাও বলা যাবে না।” (৩৬৭) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সামরিক বাহিনীতে একাধারে জো-হুকুম অধস্তন হয়ে থাকার অভ্যাস ও বিরূপ পরিস্থিতিতে দ্রোহী হয়ে ওঠা- এই দু'য়ের উদাহরণই রয়েছে। গেরিলা যুদ্ধ, পজিশনাল ওয়ারফেয়ার, রাষ্ট্রের কৌশল আঁচ করা- উপন্যাসের গড়ন-গঠনে ওতঃপ্রোত হয়ে থাকে। মেজর ভদি বলে, “যাই হোক, আমি ওয়ার ডিক্লেয়ার করচি” (৩৬৯)। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এত সহজ পাঁচটা শব্দে যুদ্ধঘোষণা করা, যার শুরুতে ‘যাই হোক’ শব্দদ্বয়- যুদ্ধের ইতিহাসে বিরলতম। উনিশ ও বিশতম অধ্যায়ে পৌঁছে পাঠক উপলব্ধি করে- আখ্যানের শুরু থেকে বাঙালির বিস্মৃত দুঃসাহসের ইতিহাস, দ্রোহের তথ্য, শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের তথ্য ইত্যাদি কথক কেন উল্লেখ করেছেন। ‘কাঙাল মালসাট’-এ আখ্যানের পরম্পরা চূর্ণ হয়ে গেছে বলে তপোধীর ভট্টাচার্যের মত।^{৪৮} আখ্যানের টুকরো টুকরো কথাগুলি জুড়ে গিয়ে এতক্ষণে সংকেতদ্বারের অন্তিম পরিণতির দিকে যেতে থাকে- রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ওয়ার ডিক্লেয়ার’ করার

জন্যে পাঠককেও প্রস্তুত ক'রে নেওয়া। নবাবুণের যে আখ্যানে রাজনৈতিক এবং উদ্দেশ্যমূলক অভিমুখ সহ যে নাশকতাবাদী ক্রিয়াকলাপ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে,^{৪৯} সেই 'কাঙাল মালসাট'-এ ফ্যাতাডু+চোক্তাররা যে যে অস্ত্রে 'র্যাফ সহ বিশাল পুলিশবাহিনী'কে আক্রমণ করে সেগুলি আতঙ্ক নয় মজার উদ্দ্রেক করে। মেজর বল্লভ বক্সি নুনুকামানে গোলা ভরে 'ফায়ার' চিৎকার করছে, টাকলা ও.সি সমেত পুলিশ+র্যাফ 'হেভি শেলিং হচ্ছে স্যার' বলে আতঙ্কিত হচ্ছে, শেল ফেটে অসংখ্য মার্বেলের বল বেরোচ্ছে, হাড়-জিরজিরে গজা পায়খানার মগ থেকে কামানে জল ঢালতেই 'ভ্যাঁসভেঁসিয়ে' শব্দ হচ্ছে, থানায় পেটো ফাটছে বিকট শব্দে কিন্তু তা থেকে পেরেক-বলবিয়ারিং বেরোচ্ছে না, কাদাভরা জলবোমা, গাছসুন্ধ টব, ভাঙা বালতি, থানকা ইঁট ভবানীপুর থানায় আছড়ে পড়ছে এবং আতঙ্কিত পুলিশবাহিনী 'কার্পেট বম্বিং' হচ্ছে বলে ভয়ে কাঁপছে- এই সমস্ত দৃশ্য ও শব্দের যুগপৎ সমাবেশ কার্নিভালের আবহ ঘন ক'রে তোলে। রাষ্ট্রের নাকানিচোবানি খাওয়ার দৃশ্য-শব্দে পাঠকের ফ্যান্টাসি মুক্তি পায়। অডুতরস প্রধান, উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বাখতিন 'Rabelais and his World (1965)' গ্রন্থে রেনেসাঁকালীন ইউরোপের কার্নিভালের জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করছেন মানবদেহের উৎকট পরিবেশনা, ভাষা-স্বরবৈচিত্র্য ও প্যারোডির উদ্‌যাপনের হেতু হিসেবে। প্রাচীন সাহিত্যে, ক্রবাদুর সাহিত্যে হুল্লোড়-যাপন বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের নবজাগরণকে বাখতিন এই কার্নিভালের প্রসারিত বৈচিত্র্য হিসেবেই দেখেন, যেখানে মানবচেতনা, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির হুল্লোড়-উচ্ছ্বাস উদ্‌যাপিত হয়েছে।^{৯০} কার্নিভাল এমন এক পরিসর তৈরি হয় যেখানে সামাজিক বিধিনিষেধ এবং ক্ষমতাকাঠামোকে ওলোটপালোট ক'রে দেওয়া হয়। কর্তৃত্বমূলক সবকিছুকে ব্যঙ্গ করা, কর্তৃত্বের বাঁধাছককে অন্তর্ঘাত করা কার্নিভালের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাবলের মতোই বাখতিন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম এবং নিয়ম বদলানোর জন্যে নিচুতলার আকাঙ্ক্ষার সজ্জাতকে উন্মোচন করছেন; পুরনো ও নতুনের সংঘাত, স্বীকৃত/অনুমোদিত ও অস্বীকৃত/অননুমোদিত সংঘাতকে লেখায় তুলে আনছেন।^{৯১} আখ্যানের উপরোক্ত অংশে রাষ্ট্রকে দেখে আখ্যানস্থ নিম্নবর্গ, প্রান্তিক

কিংবা অসহায়রা আর আতঙ্কিত হয় না, বরং মজা পায়। প্রকৃত পাঠকের (actual reader) বাস্তবতায় রাষ্ট্র মোটেই সুখকর অনুভূতির জন্ম দেয় না, বরং ত্রাস সঞ্চার করে বিবিধ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রকল্পের দ্বারা। সেই প্রকৃত পাঠকও ‘কাঙাল মালসাট’-এ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এহেন দুর্দশায় আমোদ পায়, খুশি হয়। ফ্যাতাডু মানুষের স্বপ্নের উদ্‌যাপন, প্যাশনের উদ্‌যাপন করায়।⁹² উল্টোদিকে ফ্যাতাডু+চোজারদের যুদ্ধও পাঠককে ভয় পাওয়ায় না, আমোদ দেয়। বাখতিন ‘carnivalistic laughter’-এর কথা বলছেন যা বিভিন্ন বিরোধভাস থেকে উঠে আসে এবং সমগ্র জগৎ সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি তাতে ধরা থাকে।⁹³ ছল্লোড়-উদ্‌যাপনের (Carnival) একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তো ‘the mock crowning and subsequent decrowning of the Carnival King’- অর্থাৎ একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ নগণ্য প্রান্তিক ব্যক্তিও ছল্লোড়-উদ্‌যাপনের মুহূর্তে রাজা হয়ে ওঠে! যে বাঙালি যুদ্ধের স্বাদ প্রায়-বিস্মৃত, যে বাঙালিকে ঔপনিবেশিক কিংবা উত্তর-ঔপনিবেশিক হেজিমনিক চর্চায় যুদ্ধস্বাদ ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের কোনও ‘ছোটলোক’ প্রতিনিধি মার্শাল (ভদি) হয়ে উঠতে পারে, হাড়-জিরজিরে গজা সৈনিক হয়ে উঠতে পারে এবং লাথখোর-বাংলাখোর ফ্যাতাডুরা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসেনানীর পদ পেতে পারে। যে রাষ্ট্র শোষিত মানুষের টুঁটি টিপে রেখেছে, সেই রাষ্ট্রকে ছল্লোড়-উদ্‌যাপনের মুহূর্তটুকুতে নাস্তানাবুদ করা রক ‘বীভৎস আনন্দ’ তো বটেই। কারণ, কার্নিভালের উদ্‌যাপন ফুরিয়ে গেলে আবার যে-কে-সেই হয়ে যাবে। ফ্যাতাডুরা “পরদিন সকালে কোনো সংঘর্ষ হয়নি... সকালে দেখা গেল যে ম্যানহোল যেখানে ছিল সেখানেই গেঁড়ে বসে আছে। নাইট, ফলস্ সাঁজোয়া গাড়ি- সব হাওয়া” (৩৭৮) পূর্ববং বাংলার ঠেকে যাবে, নলেন আগের মতোই পাদবে, ভদি-বেচামণি আগের মতোই, বড়িলাল-কালীর সম্পর্ক আগের মতোই, পুলিশ কমিশনার জোয়ারদারের কাটা-মুন্ডু জুড়ে গেছে এবং শাসক ও শাসিত শান্তির সহাবস্থান করছে। রাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে গিয়েও আশ্চর্য হয়ে যায় বারবার- কারণ যে কোনও যুদ্ধের প্রধান পরণতি অর্থাৎ হত্যা-রক্তক্ষয় (casualty) এক্ষেত্রে হয় নি। “নো ক্যাজুয়ালটি অথচ পুলিশের মধ্যে ওয়াইডস্প্রেড প্যানিক।” (৩৭৪-৭৫) আতঙ্কের ‘প্যারোডি’ রচনা করে দাঁড়াকের নেতৃত্বাধীন চোজার+ফ্যাতাডুরা। ঠিক যে যে উপায়ে রাষ্ট্র

নাগরিকদের আতঙ্কিত ক’রে রাখে, সেই উপায়গুলির ‘প্যারোডি’ বানিয়ে রাষ্ট্রকে ‘চমকায়’ ফ্যাতাডু+চোক্তার। বাখতিন লিখেছিলেন, “Parodying is the creation of a decrowning double; it is that same ‘world turned inside out.’ For this reason parody is ambivalent” (Bakhtin 1999, 127) আর, এই প্যারোডি বা হুল্লোড়-উদ্‌যাপনের হুজুতি যে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা বোঝা যায় বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী যখন কমরেড আচার্যকে লেনিনের যুদ্ধনীতি বোঝান ভদ্রির সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে যাওয়ার আগে।⁹⁴ ‘মবলগে নভেল (২০১৬)’ উপন্যাসে লেনিন উপস্থিত হয়ে আমোদের সঙ্গে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত ক’রে দিয়ে যান- “Why not combine pleasure with utility? Why not resort to some humorous or semi-humorous trick to expose something ridiculous, something harmful, something semi-ridiculous, something semi-harmful?” (ভট্টাচার্য ২০১৬, ৪৯) আখ্যানের কথক যুদ্ধের উপমা ব্যবহার করে, যুদ্ধের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়- নবাবরুণ রাষ্ট্রবিরোধিতায় ফ্যাতাডু+চোক্তারের ‘অ্যানার্কিজম’কে শুধু কয়েকটি শব্দ ও হুল্লোড়-হুজুতির বয়ানে প্রকাশ করেননি। ফ্যাতাডু+চোক্তারের রীতিমত সেনাবাহিনী গঠিত হয়, তাদের যুদ্ধাস্ত্র যুদ্ধোপকরণ কোনও প্রশিক্ষিত বাহিনীর থেকে কম না। মেজর বল্লভ বক্সির মিলিটারি মেজাজ ও রণকৌশল রয়েছে। আলটপকা থানকা হুঁট আর ভাঙা বালতি ছুঁড়ে মারাই নয়, তাদের রয়েছে পর্তুগীজ ‘নুনুকামান’। ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ‘সাঁজোয়া বাহিনী’ বেরিয়ে আসে। “আকাশ থেকে প্যাঁদাব, ডাঙাতেও ছাড়ব না” (৩৭৬) বলে ভদ্রি; ফ্যাতাডুসহ চাকতির আক্রমণ এয়ারফোর্সের আক্রমণ মনে করায়। কোন সেনা এবং কোন অস্ত্র যুদ্ধের সময় কোথায় সাজাতে হবে সেই রণকৌশল সম্পর্কে ভদ্রি ও বল্লভ বক্সির যুদ্ধজ্ঞান পেশাদার রণসেনাপতির থেকে কম নয়। সর্বোপরি, একটিও প্রাণনাশ না ক’রে, সামান্য রক্তপাত না করেও রাষ্ট্রকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে হারিয়ে দেওয়া- “একেই বলে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার” (৩৭৬)। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশলে আখ্যানের শুরু থেকেই পাঠককেও সামিল ক’রে নেয় কথক। লেখক নবাবরুণ শ্রীলঙ্কায় ট্রটস্কিবাদীদের অভ্যুত্থানে⁹⁵ সমর্থন জানিয়েছিলেন,⁹⁶ নবাবরুণ লালগড়ে রাষ্ট্রবিরোধী অভ্যুত্থানকে

সদর্থক দৃষ্টিতে দেখেন এবং অপারেশন গ্রিন হাণ্টের সর্বোপর্য পরাজয় চান।⁹⁷ ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ এবং ‘কাঙাল মালসাট’ দু’টি উপন্যাসেই যুদ্ধতত্ত্ব ও বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল বিষয়ে লেখকের জ্ঞানের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। ‘হাওয়ালাওয়ালাদের হালাল করো’⁹⁸ প্রবন্ধে যুদ্ধবিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহের উল্লেখ করার সাথে সাথে যুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে অনেকগুলি বইয়ের হদিশ দিচ্ছেন নবাবু।

(২) পুলিশ ও প্রশাসন নবাবুগের গল্প ও উপন্যাসের অন্যতম চাঁদমারি। প্রশাসন কী? শান্তিশৃঙ্খলা, আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা রক্ষার কাজ এবং পুলিশ কী? শান্তিরক্ষার জন্য সরকারি বিভাগ; আরক্ষা⁹⁹। ফ্যাতাডুরা এই শৃঙ্খলা শাসনের বিরোধী। তারা নৈরাজ্যের উদ্‌যাপনে বিশ্বাসী, যেখানে কোনওরকম চাপিয়ে দেওয়া নীতি শাসন বাঁধানিয়ম তারা প্রত্যাখ্যান করে। ফ্যাতাডুরা যে সামাজিক বর্গের প্রতিনিধিত্ব করে, উচ্চবর্গ প্রতিনিয়ত নিজেদের সুবিধার্থে বানানো নিয়ম-শাসনের নিগড়ে সেই বর্গকে বেঁধে রাখে। উচ্চবর্গ ও উচ্চ সামাজিক-অবস্থানের প্রতিনিধিরা নিজেদের রুচি-সামর্থ্য অনুযায়ী বানানো মানদণ্ডে নিম্নবর্গকে ‘বিচার (judge)’ ক’রে চলে। পুলিশ ও প্রশাসনের কাজ সেই নিয়ম শাসন শৃঙ্খলা নৈতিকতার মানদণ্ডগুলিকে যথাযথ রাখতে সহায়তা করা। ফ্যাতাডুরা প্রতিমুহূর্তে ওই চাপিয়ে দেওয়া মানদণ্ড ভাঙতে চায়। আর, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। নবাবু এই বিরোধমূলক (antagonistic) সম্পর্ক খুঁটিয়ে তুলে আনছেন সাহিত্যে, ফ্যাতাডুদের প্রশাসন-বিরোধিতাকে ন্যায্যতা দিচ্ছেন সাহিত্যে। কিন্তু, এই বিরোধ ও সংঘর্ষ রক্তপাতহীন; কেউ মারা যাচ্ছে না বা বীভৎস হিংসার বর্ণনা থাকছে না। নবাবু বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর লেখা বিপ্লব ও মুক্তির পথ থেকে সরবে না। নৈরাজ্যকে ছুঁয়ে থাকার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখার ঝুঁকিও থাকবে তাঁর লেখায়।¹⁰⁰ নবাবুগের সাহিত্যীয় অন্তর্ঘাত ফ্যাতাডুদের মনন ও অনুশীলনের মজ্জায় মজ্জায়। ‘কাঙাল মালসাট’-এ চোক্তারদের সঙ্গে মিলে ফ্যাতাডুরা পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আক্রান্ত হয়। কিন্তু, ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’-র কয়েক বছর আগে যখন থেকে বাংলা সাহিত্যে ফ্যাতাডুদের আবির্ভাব, তখন থেকেই পুলিশ প্রশাসনের

বিরুদ্ধে তাদের নৈরাজ্যবাদী অবস্থান। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রোটাগনিস্টের আক্রমণ ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসেও রয়েছে। রণজয় মানসিক বিভ্রাটে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও দু’টো জিনিস বিস্মৃত হয়না- (১) কমিউনিস্ট তত্ত্ব ও গেরিলা যুদ্ধের নীতি-কৌশল এবং (২) শ্রেণিশত্রুকে লিকুইডেট করা। বসাককে খুঁজে পেয়ে নিড়ানি দিয়ে তার ওপরে আচমকা আক্রমণ ক’রে চিরস্থায়ীভাবে বসাকের কপালে ও মনে ক্ষত তৈরি ক’রে দেয় রণজয়।¹⁰¹ ষাট-সত্তরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অত্যাচারী বসাক এবং নব্বই দশকের বিশ্বায়নী আর্থ-সংস্কৃতিতে প্রভূত অর্থ-প্রতিপত্তির মালিক বসাক ‘পাগল’ রণজয়ের আক্রমণের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। রণজয় কোনও বিপ্লব করেনি এমনকি তার স্বপ্নের নয়া-গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা হয়নি শাসককে উৎখাত করে, রণজয়দের দ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু, সরকারের কমিউনিস্ট-দমননীতির প্রয়োগকারী¹⁰² ‘দেবী রায়ের ডানহাত’ বসাক সমস্ত আখ্যানে আতঙ্কে থাকে। বসাকের উচ্চারণ এবং বসাকের সমস্ত আচরণ তাকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ অনুসারী দমনযন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে- বসাক লিঙ্গের মাপ দিয়ে বিপ্লবীদের চিহ্নিত করত- বসাকের অত্যাচারে উর্ধ্বতন সহকর্মীরা চমকে যেত। কিন্তু, বসাকের মাথা থেকেও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ছায়া সরে যায়।¹⁰³ সে ঘুমের মধ্যে ধ্বংসের দুঃস্বপ্ন দেখে, সে নেশার ঘোরে রণজয়ের আক্রমণ দেখে এবং জাগ্রত অবস্থায় চোখের ভুলে সেই রণজয়কেই তেড়ে আসতে দেখে। ক্ষমতার যে বৃত্তে ব্যক্তির বুদ্ধিনাশ হয়, তাকেই চিনিতে দেন নবাবু; আর, তাদের জন্যে ভবিষ্যতে কোনও সম্মান অপেক্ষা করে না তারা জীবন্ত ‘বডি’ হয়ে যায়।¹⁰⁴ হারবার্টের অনূক্ত শত্রু পুলিশ। “পুলিশ বিনুকে মেরেছিল” একথা সে ভোলে না। শেষপর্যন্ত মৃত হারবার্ট পুলিশ-প্রশাসনকে আতঙ্কিত ক’রে দিয়ে যায়, যার অন্তর্ঘাতী সূত্র বিনুর দ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল। কথককে রেখে দিতে হয় একটি সূত্র- রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে- “কখন কোথায় কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে, সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে” (৭৮) নবাবু তঁর নিজের লেখায় এই বিস্ফোরণের ঝুঁকি রেখে দিতে চাইতেন পাঠকের জন্য। কিন্তু, আখ্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্যের সমাধান কথক বলে দেওয়ার পরে

উক্ত ঘোষণাটি ক’রে দেওয়া কি আখ্যানের সবচেয়ে দুর্বল অংশ নয়? ‘হারবার্ট’ আখ্যানের প্রতিটি পরত খুলে খুলে পাঠাস্বাদনের পরে পাঠক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিমূঢ়তা বুঝতে পারেই। উক্ত সুত্রটি দিয়ে রাষ্ট্রের অজ্ঞান-বিমূঢ়তাকে স্থূলভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আখ্যানের গড়ন-গঠনে খাপ খায় না। একই আখ্যানে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের ব্যাখ্যা তৈরি রাখলেও লেখক হারবার্টের স্বপ্নে আসা ধুঁই-শ্রীধরদের কোনও ব্যাখ্যা রাখেননি। হারবার্টকে তারা পূর্বপুরুষদর্শন, ঔপনিবেশিক নীতিদর্শন ও আধ্যাত্মদর্শন করিয়ে যায়। হারবার্ট যে কাঠের চিতায় পুড়বে, সেই ভবিষ্যাবাণীও ক’রে যায়। কেন, কীভাবে? ললিতমোহন আর শোভারানী মরে গিয়েও অনায়াস যাতায়াতে আখ্যানে ঢুকে পড়ে হারবার্টকে লক্ষ্য করে, মন্তব্য করে। তারা মৃত হয়েও কিছুটা কথনসূত্রের দায়ভার নিয়ে নেয়। কেন নেয়, কীভাবে নেয়? সেই ব্যাখ্যাও অন্তঃলেখক বা প্রকৃত লেখক দেয় না। আর, এই অব্যাক্ষাত অংশগুলিই ‘হারবার্ট’-কে রহস্যময়, বাস্তব-বিপ্রতীপ, বহুস্বার্থসম্ভাবী ক’রে তোলে। আখ্যানরসস্বাদ গাঢ় হয়।

‘কাঙাল মালসাট’-এর ফ্যাতাডু+চোক্তার জোটের লোকেরা আলথুসার কথিত ‘দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র (Repressive State Apparatus)’-এর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অভ্যুত সব অস্ত্র জোগাড় করে। “ভদি গোপনে যে অস্ত্রাগারটি বাড়িয়ে চলেছে তার দেখভাল সরখেলই করে” (২৮৩)- এই অস্ত্রাগার নির্মাণ পুলিশি ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলারক্ষার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত। কমিউনিস্ট কিন্তু, অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমানোতেও বাখতিনীয় কার্নিভালের উদ্‌যাপন অব্যাহত। ‘বিপ্লব জনতার উৎসব’- লেনিনের এই বাক্যকে স্মরণে রেখেই প্রবল উন্মাদনায় পর্তুগীজ আমলের নুনুকামান থেকে জলবোমা সব অস্ত্রই হাতে আসে। অস্ত্রের তালিকা দেখা যাক- পর্তুগীজ জলদস্যুদের ফেলে যাওয়া নুনুকামান, ‘দোনলা গাদা বন্দুক তাও সেই মাস্কাতা আমলের’, ‘দুটো ঢপের পিস্তল’, ছুরি, কাঁচি, শাবল আর, সবচে বড় অস্ত্র চাকতি যা নগরপালের গলা কেটে নিয়েছিল। ফ্যাতাডু-চোক্তারের দেশি কায়দায় অভ্যুত্থানের সময় পুলিশ-মিলিটারির দিকে ছোঁড়া অস্ত্রসম্ভারে থানকা হুঁট, ভাঙা বালতি, কাদা-ভরা ভাঁড়, টব ইত্যাদি। কিউরেটর বলেছিল ‘মানুষ যে সুপারম্যানের

দিকে এগিয়ে চলেছে' (২৯৪-৯৫); আর, ফ্যাটাডুদের উড়ন্ত অবস্থান, চাকতির যথেষ্ট ব্যবহারে চোক্তারদের পারদর্শীতা তাদের আমেরিকান সংস্কৃতির 'সুপারম্যান' বা 'সুপারহিরো'-র তকমা দিতে পারে কি? পারেনা। এরা 'ফ্যান্টাস্টিক' ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু আদতে তারা ছদ্ম-সুপারহিরোইজমকে ব্যঙ্গ ক'রে চলে। যে সমাজব্যবস্থা জনগণকে অসহায় অথচ ক্ষুধা এবং অক্ষম অথচ প্রতিরোধকামী ক'রে রেখেছে, সেই ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে এরা।¹⁰⁵ আক্রমণের অস্ত্রগুলি অত্যাধুনিক নয়; সামরিকখাতে বিপুল ব্যয় ক'রে বানানো বা কেনা সমরাস্ত্রের থেকে গুণমানে অনেক কম ফ্যাটাডু+চোক্তারদের অস্ত্র। তবু, এইসব দিশি অস্ত্রের বিপজ্জনক ব্যবহার রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। এর একটা সূত্র কি থেকে যায় মাও-সে-তুং ও চারু মজুমদারের আস্থানের মধ্যে? মাওয়ের মতে,

Now U.S. imperialism is quite powerful, but in reality it isn't. It is very weak politically because it is divorced from the masses of the people and is disliked by everybody and by the American people too. In appearance it is very powerful but in reality it is nothing to be afraid of, it is a paper tiger. Outwardly a tiger, it is made of paper, unable to withstand the wind and the rain. (Mao 1956)

সাম্রাজ্যবাদ যত শক্তিশালীই হোক, সে আসলে কাগজে বাঘ। মাও নীতিগত দিক থেকে একথা বলেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যে শক্তিশালী ও তার দাঁতনখ ধারালো তা অস্বীকার করেননি। তবে, আসল নিয়ন্ত্রা জনগণ এবং সঠিক যুদ্ধকৌশলে সেই দাঁতনখ ভেঙে দিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করা যায়, এই বিশ্বাস বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মধ্যে জাগাতে চেয়েছিলেন।¹⁰⁶ 'বাস্তবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কাগজে বাঘ' বলে মাও যে বাস্তবতার কথা বলছেন, নবাবুণ সেই বাস্তবতার একটা প্রকল্পনা তৈরি করছেন তাঁর উপন্যাসের পরিসরে। প্রথমে চাকতির ঘর খুলে রাষ্ট্রকে সাবধানবাণী দেওয়া, তারপর নগরপাল জোয়ারদারের গলায় চাকতির আক্রমণ, তারপরে বিভিন্ন অস্ত্র জড়ো

ক’রে প্রশাসনকে ভয় পাওয়ানো এবং শেষে সম্মিলিত আক্রমণে প্রবল প্রতাপাশ্বিত সরকারকে নাস্তানাবুদ করা- আখ্যানস্থ বাস্তবতায় এই কৌশলগুলি ব্যবহার হয়। চারু মজুমদারের জনযুদ্ধ তত্ত্বের অনুশীলনে দিশি অস্ত্র তথা ঘরের সাধারণ অস্ত্র নিয়েই প্রশাসনের অস্ত্র লুণ্ঠ ক’রে বিপ্লবী অস্ত্রাগার তৈরি করা সম্ভব এবং প্রবল প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব।¹⁰⁷ চারু মজুমদার তাঁর লেখা ষষ্ঠ দলিলে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান রাখছেন এবং পার্টিজান সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহের কথা বলছেন; সেখানেও যাদের আঘাত হানার নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছে (১) রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিভূ অর্থাৎ পুলিশ ও মিলিটারি অফিসার (২) ঘৃণিত আমলাতন্ত্র এবং (৩) শ্রেণিশত্রু।¹⁰⁸ ফ্যাডাডু+চোক্তার ও দাঁড়কাক এই তিন শত্রুর সঙ্গে উচ্চবর্গের সংস্কৃতিকেও শত্রুতালিকায় জুড়ে নিয়েছিল। রাইফেল, গাদা বন্দুক, পিস্তল সংগ্রহের সত্তর দশকীয় নির্দেশের মতোই ভাঙাচোরা বন্দুক রাইফেল ছুরি সংগ্রহ করে সরখেল ও ভদি। অস্ত্রাগার তৈরির অন্তর্ঘাতী প্রচেষ্টা প্রসারিত হয় ‘হুমদো চেয়ারম্যান’-এর সঙ্গে ভদি, বেচামণি ও কালাশনিকভের মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে। বন্দুক তৈরির কারখানার পরিকল্পনা তৎসহ রাষ্ট্রের সমান্তরাল বাণিজ্যিক অস্ত্রাগার নির্মাণের ছক প্রশাসনকে স্বত্তি দিতে পারে কি? “স্রেফ বন্দুক বেচে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাল হয়ে যাবে। বাঙালির ঘরে ঘরে নোটের তাড়া আর কার্বাইন।” (২৭৪) ভদি-বেচামণির এই পরিকল্পনার সঙ্গে জুড়ে যায় বাঙালির সশস্ত্র দ্রোহের ইতিহাসের সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান। বাঙালিকে বন্দুকের স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহী ভদির সঙ্গে কালাশনিকভের যৌথ চেষ্টায় প্রশাসন রাষ্ট্র বিপন্ন হলেও লেখককে ফ্যান্টাসি-প্রকল্পনার অবতারণা করতে হয় আবার। অসম্ভব সম্ভাব্যতাকে প্রকট করতে লেখককে সোভিয়েত-স্তালিন-কালশনিকভ-সিপিএমের চেয়ারম্যান-ভদিদের স্থানান্তর উদ্দেশ্যে মিশিয়ে গুলিয়ে দিতে হয়।¹⁰⁹ আখ্যানে প্রায়শঃই বাঙালির বিস্মৃত সমরেতিহাস ও বিস্মৃত বীরদের কাহিনি জাগিয়ে তোলা হয়- গোলকায়িত দশকের বাঙালিকে ভুলে যাওয়া দ্রোহ ও দ্রোহীদের ইতিহাস নিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে কথক। আর, গেরিলা যুদ্ধের প্রতি দগুবায়েসের বিশেষ প্রীতি খেয়াল করা যায় ভদিকে দেওয়া পরামর্শে, “এরকম একটা জালি, খুপরি খুপরি শহরে কোথায় গেরিলা হুজুতি খান্দা করবে, তা না, গাণ্ডুটা

একেবারে আর্মির ঢঙে পজিশনাল ওয়ারের ছক কষছে। নুনুকামান দিয়ে পজিশনাল ওয়ার। এঁড়ে চোদা” (২৯২) দণ্ডবায়স ভদিকে গেরিলা যুদ্ধের সামরিক তত্ত্বের বই পড়তে দেয় যেখানে মাও, মারিঘেল্লা, টিটো প্রত্যেকের সামরিক তত্ত্ব রয়েছে; কিন্তু, উল্লেখ্য যে, দণ্ডবায়স ভদিকে বিদেশি গেরিলা সামরিক তত্ত্বের অনুকরণ করতে বলেনি। সামরিক তত্ত্বগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিজের মতো ছক কষে নিতে পরামর্শ দিয়েছে, এমনকি বেগম জনসনের থেকে টিপু সুলতান, হায়দার আলিদের সামরিক নীতির পাঠও নিতে বলেছে।¹¹⁰ প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতি প্রযুক্ত ভাষা, প্রশাসনিক ব্যক্তিদের উদ্দেশে ভাষাব্যবহার আক্রমণ শানিয়ে যায়। ভাষা দিয়ে ভাষার সঙ্গে ‘কেন্দ্র’ বনাম ‘প্রান্ত’ লড়াই উস্কে দেওয়া হয়, যেখানে কেন্দ্রে থাকা প্রশাসন-রাষ্ট্র-উচ্চবর্গ এবং প্রান্তে থাকা অ-ভদ্রলোক নিম্নবর্গ। অতীক মজুমদার খুশি হন বাবুদের ‘সরকারি’ ভাষায় নিম্নবর্গকে ধরা হয়নি বলে।¹¹¹ লালবাজারে পুলিশের কুচকাওয়াজ দেখে দাঁড়কাক ফ্যাঁতাডুদের বলে, “গভরমেন্ট ধন দাঁড়াচ্ছে কিনা দেখছে, গরীবের গাঁড় মারবে বলে।” (৩৫৭)

(৩) নবাবরূপের মতে, সাহিত্যের আসল কথা হচ্ছে দুনিয়া পাল্টানোর ও মানুষের স্বাধীনতার উপযুক্ত চিন্তাক্ষেত্র প্রস্তুত করার। এই স্বাধীনতা ও দুনিয়া পাল্টানো ‘আশ্চর্য উৎসব’-এর মতো; ‘ভাল সাহিত্য’ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে এই উৎসবের উপযোগী দ্বন্দ্বিক বোধ এনে দেয়।¹¹² বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে যুগপৎ আক্রমণ করা হয়েছে অনেকগুলি পর্যায়ে। এক পর্যায়ে সমকালীন সাহিত্য ও বাজি বানানোর মধ্যে প্রভেদ করা হয়নি, কারণ কথকের মতে, “সবই প্রায় আলগা ঠাসা বসন তুবড়ি যা থেকে ভাঁস ভাঁস করে এবং অচিরেই নিঃশেষিত তামাশায় পর্যবসিত হয়” (২৬৫)। আখ্যানে বারবার ফিরে আসে বিস্মৃতপ্রায় গ্রন্থের তালিকা, বিবরণ। বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত আধুনিক শব্দটি ব্যবহারের প্রতি প্রশ্ন তুলতে থাকেন নবাবরূপ। এই আধুনিকতার প্রত্যেক বাংলা মূল্যবান সাহিত্যসম্পদ বিস্মৃত হয়েছি আমরা। দেশজ উপাদানে সমৃদ্ধ সাহিত্য, লোকজ সাহিত্য এবং বহু সাহিত্যিককে আধুনিকতার প্রত্যেক বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে আধুনিকতার সংজ্ঞা পাশ্চাত্যের সাহিত্য-

সংস্কৃতির মাপকাঠিকেই একমাত্র বলে ধরে নিয়েছে, তাতে এই সমস্ত সমৃদ্ধ সাহিত্য বাদ হয়ে গেছে। নবাবরুণ এই সাহিত্যসম্ভারের প্রতি ট্রিবিউট রাখেন ‘কাঙাল মালসাটে’। নবাবরুণ বাংলা উপন্যাসের পাঠককে স্বস্তিক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যান। সচেতনভাবে উপন্যাসের গড়ন-গঠন ও বিষয়বস্তুকে যে ভাষায় উপস্থাপিত করেন এবং যে যে উপাদান শহুরে ক্ষেত্রের প্রান্তিক উপাদান থেকে তুলে আনেন, তা পাঠককে খুব একটা স্বস্তি দেয় না। নবাবরুণ বলছেন যে, লেখার ব্যাপারটা তাঁর কাছে নিছক আনন্দ দেওয়া নয় বরং এক গভীর অ্যালকেমি যেখানে বিস্ফোরণের ঝুঁকি থাকে।¹¹³ বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কথকের তীব্রতম শ্লেষ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। একশ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অঘোষিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই গোষ্ঠীর নির্বাচিত সাহিত্যিকরা যে সাহিত্য উৎপাদন করেন, বিক্রয়ের বিচারে ও জনপ্রিয়তার বিচারে তা অগ্রগণ্য। এই পত্রিকাগোষ্ঠীর একাধিক পুজোসংখ্যায় নিয়মমাফিক ‘নির্দিষ্ট সূত্রায়িত’ উপন্যাস উৎপাদন হয়। সংবাদপত্রের বিচারে আনন্দবাজার পত্রিকা উচ্চ ও মধ্য সামাজিক অবস্থানের পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয়। “দুইহাতে সংবাদ ও সাহিত্যের মন্দিরা যে প্রতিষ্ঠান নিয়তই বাজিয়ে চলেছে তার পোঙ্গায় লাগতে যাওয়া মোটেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। উল্টে হলো হয়ে যেতে পারে” (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৩২) বাক্যটি বলে কথক ওই ‘পোঙ্গায় লাগা’র কাজটিকেই আরও মান্যতা দেয়। আখ্যান শুরু হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হদিশে। আর, দাঁড়কাক সেই আনন্দবাজার সম্পর্কে বলে- “কাল সাত লাখ বাঙালি এটা পড়েই বিচি চুলকোবে” (৩৫৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ট্রাজিক ফিগার’ বলার ধৃষ্টতা এই আখ্যানের কথকের আগে কেউ দেখায়নি; এর সঙ্গে যুক্তি ও উদাহরণ হিসেবে পেশ হয় ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’-এর ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী (অ্যাকোয়া)’ গল্পে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্চবর্গের সংস্কৃতি-বিড়ম্বনা এবং পুরন্দর ভাটের লেখা কবিতার শব্দে। সংস্কৃতিজগতের তাবড় ব্যক্তির রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের কুক্ষিগত পুঁজি বানিয়ে নিয়েছে বলেই পুরন্দর ভাটসহ ফ্যাতাডুরা সেই পুঁজিকে আক্রমণ করে। পুরন্দর ভাটের কবিতায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান নেই, কিন্তু রবীন্দ্রিক ভাষা ও শ্লীল সাহিত্যভাষার প্রকাশও নেই। “এই ভাষা অসম্ভব ধারালো বিদ্রূপের বাহন হয়ে উঠতে পারে... শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট দাঁড়ের ময়না বাংলা ভদ্রলোক সাহিত্যে এমন ‘কাদামাথা পা’ দেখলেই শুরু হয়ে যায় সবার ‘মাথাব্যথা!’” (মজুমদার ২০০৮, ১৫৪) দাঁড়কাক এবং ফ্যাতাডুরা নিজেদের ভাষা দিয়ে রাতের কলকাতা চেনায় পাঠককে, সেখানে জমকালো অন্তঃসারশূন্য সাহিত্য উৎসব, সংবাদপত্র ছাপা ও সাহিত্যবাসরে পুলিশ-মন্ত্রীদেব আনাগোনা একটানা সংলাপে ঢুকে পড়ে। সাহিত্য রাষ্ট্রের মতাদর্শবাহী হয়ে পড়ছে বলেই সাহিত্যোৎসবে পুলিশ-মন্ত্রীর ভিড় কিংবা সংবাদপত্রে রাষ্ট্র-অনুসারী খবর ছাপা হয় বলেই তাতে নিম্নবর্গের দৈনন্দিনের খবর থাকে না। কবি পি.ডি পালের কবিতায় ‘শারদীয় দেশ’ পত্রিকাকে নিয়ে ব্যঙ্গ, সেখানে ‘রবীন্দ্রনাথ’কে পুঁজি ক’রে সাহিত্যব্যবসাকে ঠাট্টা করা হয়েছে- ব্যবহৃত হয়েছে ‘এক আঁটি’ শব্দবন্ধ¹¹⁴। শারদীয় পত্রিকা তথা পুজোসংখ্যা বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উৎপাদনস্থল। নবাবুণ একে ব্রয়লারের সঙ্গে তুলনা করছেন, কারণ কালচার ইন্ডাস্ট্রি এই ছকেবাঁধা উপন্যাস-গল্প-কবিতার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুজোসংখ্যার সাহিত্যিকদের ‘প্রত্যেকটা হাউসের কিছু বাঁধা অ্যানাকোন্ডা, পোষা ঢোঁড়া ও হেলে আছে’ উপমা দিয়ে ‘সাহিত্যের বাজার’কে আক্রমণ করছেন।¹¹⁵ অমলেন্দু চক্রবর্তীও নবাবুণের মতোই বাংলা উপন্যাসকে ‘সুপারমার্কেট’-এর সঙ্গে তুলনা ক’রে পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসসম্ভারের প্রতি বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করছেন। সিংহভাগ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ‘এক প্রকার বয়স্ক রূপকথা’ কারণ বাস্তবের সঙ্গে ও বাস্তবের মানুষদের বৃহত্তর দৈনন্দিনের সঙ্গে উপন্যাসের যোগ নেই।¹¹⁶ উপন্যাসের পটভূমি শুধুই কলকাতাকেন্দ্রিক কিন্তু সে কলকাতার শুরু বা শেষ মধ্যবিত্তের পারিবারিক চার-দেওয়ালে অথবা সুউচ্চবর্গের শিষ্ট-প্রমিত সংস্কৃতির নক্ষত্রলোকে। আখ্যানরীতি ও ভাষার ক্ষেত্রে অমলেন্দু চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ প্রাধান্যযোগ্য- “যে নিরাভরণ গদ্যের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল শরৎচন্দ্রের রচনাগুণের বৈশিষ্ট্য, তাকে অকুণ্ঠনে রেখে, তাঁরই ব্যর্থ অনুসৃতিতে এক প্রকার পিচ্ছল গদ্যের তারল্যে নিটোল গল্প তৈরি

করা” (চক্রবর্তী ১৯৯৭, ৬৪) সাহিত্য প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যের বিপ্রতীপে সাহিত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া হাংরি জেনারেশনের কবি ও গদ্যকাররা ষাটের দশকের শুরু থেকেই শুরু ক’রে দিয়েছিলেন। সাহিত্যে শুদ্ধতার প্রাতিষ্ঠানিক রীতিকে প্রত্যাঙ্কান জানিয়ে এবং সাংস্কৃতিক মধ্যবিত্তায়নের উপাদানগুলিকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে হাংরি সাহিত্যিকরা তথাকথিত ‘শিল্প’-র বিরুদ্ধে শিল্পযুদ্ধ ঘোষণা করেন। পণ্যসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আত্মউন্মোচনের নিরন্তর প্রক্রিয়া, পণ্যসমাজের (commodity fetishism) সময়কে প্রত্যাঙ্কান জানিয়ে দৈনন্দিন যাপনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে আনা, ক্ষুধা ও যৌনতার মতো অতিস্বাভাবিক কিন্তু সমাজকথিত ‘অশ্লীল’ বিষয়গুলি সরাসরি সাহিত্যে উপস্থাপনা ক’রে প্রতিনান্দনিক (anti-aesthetic) নন্দনতত্ত্বে সাহিত্যরচনা- ক্ষুধার্ত আন্দোলনের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। ‘হাংরি জেনারেশন এবং নবাবরণ ভট্টাচার্যঃ তুলনামূলক পাঠ’-এ লিখছি,

হাংরি-দের লেখায় আত্ম-কে আবিষ্কার, জীবনের কেন্দ্রের মূল উৎস গুলোয় ফেরা, সন্ধান করা অসুখের উৎসের। কবিতা থেকে কবিতাযাপন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। ক্রাইসিস-গুলোকে চিনে নিতে নিতে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠা। কবিতা মানে বাস্তব থেকে দূরে সরার, অথবা কিছু মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা আর নেই; চাঁদ ফুল তারা নদী আর অতটাও সুন্দর নেই যে তারাই হয়ে উঠতে পারে ‘Aesthetic’-র মাপকাঠি। এস্টেটিক্স-ও নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজির দ্বারা, পুঁজির স্বার্থেই! সেই এস্টেটিক কে প্রবল বিক্ষোভে উপহাস করেন হাংরি সাহিত্যিকরা। (ঘোষ ২০২১, ৩৪২)

হাংরি সাহিত্যিকরা তেলুগু সাহিত্যের ‘দিগম্বর কবি’-দের মতোই নতুন ভাষা ও আঙ্গিককে হাতিয়ার ক’রে প্রচলিত সাহিত্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা দেখিয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে তাঁদের এই প্রয়াস; কিন্তু রাজনৈতিক দিশাহীনতা এবং নির্দিষ্ট বিকল্পের সন্ধানহীন গোলোকধাঁধাতে আটকে থেকেছিলেন ক্ষুধার্ত প্রজন্মের লেখকরা। তাকেই এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবয়ব দিয়ে বিকল্পের সন্ধান ও বিক্ষোভের সম্ভাবনাগুলো তুলে আনতে চাইলেন

নবাবুণ। নবাবুণের প্রতিরোধ শুধু প্রতিষ্ঠানকেই নয়; বরং তাঁর প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবীদের দোদুল্যমানতার প্রতিও।¹¹⁷ নবাবুণের উপন্যাস ও কবিতা অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন এবং সুনির্দিষ্ট অভিমুখী। নবাবুণের সময়-চেতনা তাঁর গল্পে গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের স্রোতে নির্দিষ্ট মানবসমষ্টি কোনও একটি কালখণ্ডে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ক’রে চলেছে; একজন ঔপন্যাসিক নির্বিশেষ একজন মানুষ হিসেবে তাঁর সমকালের কেন্দ্রে অবস্থান ক’রে নিজের সময়কে বিশ্লেষণ ক’রে চলেন। আর, কথাসাহিত্যিকের ভাবনাকাঠামো এভাবে গড়ে ওঠে। কালচারিড্র্য ব্যাখ্যাই উপন্যাস ও গল্পের প্রধানতম বিষয়-সম্পদ।¹¹⁸ সমকালীনতার বিশ্লেষণে জাঁ বর্দ্রিয়ারের মত, অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন, পণ্যকৌশলে ভুলিয়ে দিতে চাওয়া দেশকাল-ইতিহাস আর, এমনকি প্রকৃত যৌনতা, প্রকৃত সামাজিকতা সবকিছুরই মৃত্যু ঘটছে- তখনই অধিবাস্তব টেনে নিয়ে চলেছে ‘ভার্চুয়াল’ জগতে। এই সত্য তো হাংরি জেনারেশন এর লেখাতেও উদ্ঘাটিত হয়েছে! স্টেটাস, কমফর্ট, কমোডিটি ফেটিসিজম ইত্যাদি শব্দে জারিত ব্যক্তিয়াপনকে হাংরিদের মতোই নবাবুণও আক্রমণ করছেন; অন্যদিকে এমন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিপ্রগতির যাপনকে অনুমোদন (endorse) দেয়, বৈধতা দেয় শাসক-মতাদর্শ। নবাবুণের ‘কনথ্যাচ্যুশেন’ গল্পটির পাঠ নেওয়া যেতে পারে।

গল্পের প্রোট্যাগনিস্ট শাস্ত্রত স্টেটাস, কমফর্ট অর্জন করেছে। বিশ্বায়নের গলিঘাঁজি চিনে সে আজ সফলতমদের মধ্যে একজন। প্রত্যেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সফলতার শিখরে শেষ অবধি তাকে একটি ‘অপ্শন’ বেছে নিতে বলা হয়- তার মৃত্যুর অপ্শন। আশ্চর্য, সেটা মিলে যায় তার সৌভাগ্য নম্বর ৪ এর সাথে। পণ্যসমাজ ও উত্তর-আধুনিকতা বিষয়ে জাঁ বর্দ্রিয়ারের ধারণানুযায়ী, অধিবাস্তবতার (hyper-reality) ধারণানুযায়ী¹¹⁹- অতিরিক্ত পণ্যচাহিদায় ও ভোগের আতিশয্যে বাস্তব মরে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ‘কমোডিটি ফেটিসিজম’ বা পণ্যসঙ্গম; সেখানে পণ্যকে ব্যবহার করতে করতে মানুষ পণ্য হয়ে যাচ্ছে। তার জীবন, যাপন ও দৃষ্টিভঙ্গি সমস্তটাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো বস্তুকে ভোগ করার অর্থ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তা কিংবা মানসিক আনন্দে আটকে থাকছে না, তা সংস্কৃতিক প্রয়োজনের বৃহত্তর ক্ষেত্রও তৈরি করে

নিচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে। আর, তখনই প্রকৃত বাস্তবের থেকে বেরিয়ে একটা হাইপার-রিয়ালিটি বা অধিবাস্তব তৈরি করে নিতে হচ্ছে।¹²⁰ আদতে কিন্তু মানুষটা মরে যাচ্ছে। তবুও সে এক অদ্ভুত ভোগ্য-পণ্য বোধের মধ্যে দিয়েই চলেছে, যা আপাত তৃপ্তির। ‘কনথ্যাচ্যুশন’ গল্পের শাস্বতর মতই। অথবা, ‘কোল্ড ফায়ার’ গল্পের সেই চরিত্রেরা; যারা বিলাস-ব্যাসনে অভ্যস্ত এতটাই যে মৃত্যু-পরবর্তী চিতার তাপ, শ্মশানের নরকাবস্থা থেকেও আরাম চায়, তাই সুখানুভূতি নিতে নিতে ‘কোল্ড ফায়ার’ বা বরফশীতল অগ্নিচুল্লীতে মরার জন্যে এবং বিশেষ ডিস্কাউন্টের ব্যবস্থাও করে যায়। এতটাই পণ্যসঙ্গমে অভ্যস্ত তারা।

পুরন্দর ভাটের কবিতা বাজারচলতি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের বিকল্প রণকৌশলের সন্ধান দেয়। ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’ পুরন্দরের প্রতি-সাহিত্যের (anti-literature) সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ‘কাঙাল মালসাট’-কে লড়তে হয় পিশাচদমন পালের প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে। যে পিশাচদমন নাজি-জমানায় বই পোড়ানোর উৎসবে ‘কাঙাল মালসাট’ পোড়াতে চেয়েছিল এবং যে পিশাচদমন পাল এগারোতলার স্টাডি রুমে দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্বের ওপরে লেখা বই পড়ে, তাকে তার বাঙালি শিকড় তৎসহ ‘পেদো পাল’ ডাকনাম মনে করিয়ে প্রজ্ঞা-মুকুট খসিয়ে দেয় (decrowning) দাঁড়কাক। ‘মসোলিয়াম’ উপন্যাসে ‘পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচ টু পলিটিক্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন’ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনারের বক্তৃতা প্রস্তুতের সময় দাঁড়কাক ও বনবেড়াল তাকে ফের নিজের শিকড় মনে করিয়ে দেয়।¹²¹ রণজয়কে লড়তে হয়েছিল অ-কমিউনিস্ট সাহিত্যভাণ্ডারের বিরুদ্ধে; আমেরিকানদের করা মাওয়ার বইয়ের ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্ত অনুবাদ, বুর্জোয়া সাহিত্যসম্ভারের বিরুদ্ধে সাহিত্য দিয়েই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলেছিল সে। ফ্যাতাডু বা চোক্তারদের মার্ক্সবাদী সাহিত্যের দায় নেই। কিন্তু ‘মসোলিয়াম’-এ মার্শাল ভদি যে নাটক লেখে ‘সিকান্দার কা ভগন্দর’, সেখানেও ওই মুকুটপরা মুকুটখোলার অনুষ্ণ।¹²² বিকল্প সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে ‘ভদি বুক হাউস’-এর আত্মপ্রকাশ; যার প্রত্যেকটি বই প্রচলিত শিষ্ট প্রমিত সাহিত্যকে প্রত্যাঙ্গান জানায়।

(৪) ভদ্রলোকীয় পরিশীলিত সংস্কৃতির প্রতি আক্রমণ ফ্যাতাডুকেন্দ্রিক প্রতিটা গল্পে উপন্যাসে বিদ্যমান। কাঙাল মালসাটের কথক প্রতিটি অধ্যায়ে নিয়ম মেনে ওই ভদ্রলোকীয় সংস্কৃতির প্রতি ঠাট্টা ছুঁড়ে দেয় এবং ‘ভালগার’ ভাষায় আক্রমণ করে। এই সংস্কৃতির শিকড় একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তেমনই অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে চেতনা-সমর্পণের বশব্দ ইতিবৃত্ত। ‘বেবুন থেকে বাবু’ হয়ে যাওয়ার মধ্যে নিষ্ঠুর ঠাট্টা আছে, অথচ সাহেবদের করা ঠাট্টা গর্বভরে মাথায় নিয়ে বাঁচছে নাচছে বাঙালি। “কিছু বেবুন থেকে গেল, কিছু মধ্যপথে বেবুনবাবু ও বাবুবেবুন এবং অবশ্যম্ভাবী কিছু বাবু” (২৭৯) কথকের লক্ষ্য এদের হ্যাটা করা। আখ্যানের পাঠক যে নিজেও যে ওই শ্রেণিতেই পড়ে, নবাবুগ তা জানেন; আর, সেইজন্যেই উহ্য পাঠকের জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের আঁটঘাট বেঁধে ভাষাকে সাজানো হয়। কুশীলবদের তৈরি ক’রে নেওয়া হয়। প্রতিবাস্তবের উপাদানগুলিকে ‘ভালগার’ ও ‘ভায়োলেন্ট’ ক’রে নেওয়া হয়- বাবুদের সাহিত্য এর ফলে অসহ্য অস্বস্তিতে ছটফট করে। ‘বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ঢামনামি নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে’ বলে শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। ঠাকুর পরিবার ওই ভদ্রলোক উচ্চবর্গ সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই; কিন্তু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও তৎকেন্দ্রিক জ্ঞানপ্রসারের বহু শুভ উদ্যোগ তাঁরাই নিয়েছিলেন। কথকের লক্ষ্য সেইসব বাঙালি যারা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহনের নামে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব পরিবেশকে শহুরে উন্মাদনায় ধ্বংস করে; তারা শান্তিনিকেতনকে মোচ্ছবময় ভ্রমণস্থল বানিয়ে নিয়েছে, সপ্তাহান্তে সেখানে গিয়ে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা জাহির করে এবং উন্নত রুচিবোধ প্রদর্শনের নামে সাঁওতাল সংস্কৃতিকে নিছক বিপণনের পণ্য বানিয়ে নেয়। কলকাতার কলামন্দির শহরের শিল্প-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান মঞ্চ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার প্রাকপ্রস্তুতিতে সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হিসেবে কলামন্দিরকে বেছে নেয় ফ্যাতাডুরা। ফ্যাতাডু প্রোটাগনিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে ‘অসংস্কৃত’, সবচেয়ে ‘অশুদ্ধ ভালগার’ যে ডিএস, সেই ডিএস উচ্চবর্গ সংস্কৃতিবান এলিটদের এই সভায় তার অসংস্কৃত অনুশীলন নিয়ে ঢুকে পড়ে। ডিএসের

শরীরী ভাষা, তার মুখের ভাষা এবং ফ্যাতাডুদের সম্মিলিত হুজুতি উচ্চবর্গ সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল ও সেই সমাজের রক্ষাকারী প্রশাসনকে বিড়ম্বনায় ফেলে। ব্যক্তি ও সমাজ যখন নিরর্থক বুদ্ধদরাশির মধ্যে ডুবে আছে, তখন চূড়ান্ত খিল্লির ‘না-পরিস্থিতি ও বিস্রস্ত শূন্যতার প্রতিসন্দর্ভ রচনা করে’ সমকালীন আদেখলামিতে ভরা পরিসর সম্পর্কে ঘৃণা ও তিক্ততা প্রকাশ করেন নবাবু।¹²³ ভদ্রলোকীয় বাবু সংস্কৃতির অন্যতম ধারক-বাহক বুদ্ধিজীবীরা। ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটি বিশ ও একুশ শতকের অন্যতম বিতর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দ- কারণ এর বহু ব্যাখ্যা হয়। কয়েকটি বিশেষীকৃত সংকেত বহন করে ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটি- (১) সমাজে ও রাজনীতিতে এঁদের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। (২) আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় এঁরা কিছু তত্ত্ব ও অনুশীলনের অবতারণা করেছেন। (৩) এঁরা উচ্চ-সাংস্কৃতিক পরিসরে ঘোরাফেরা করেন অথবা এঁদের নিয়েই উচ্চ-সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মিত হয়। (৪) নাগরিক সমাজ (civil society) এঁদের মতামতে প্রভাবিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে বৌদ্ধিক সেতুবন্ধনের কাজ করেন। (৫) বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশ ভদ্রলোক এবং উচ্চআয়ের পেশার সঙ্গে বা সর্বজনমান্য উচ্চ-অবস্থানের (high status) পেশার সঙ্গে যুক্ত। (৬) উনিশ শতকে উদ্ভূত শিক্ষিত, রুচিশীল, শিষ্টভাষী, ভদ্রলোক, বাবু সম্প্রদায়ের একটা অবশেষ (residual) বিশ শতকের বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তরিত হল। তাঁদের অনেকের সামাজিক অবস্থান ও উচ্চবর্গীয় আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বস্তিক্ষেত্র তাঁদের বুদ্ধিজীবী বানিয়ে নিল। তাঁদের মূল দায়িত্ব শাসকশ্রেণির মতাদর্শকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শাসিতের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। গ্রামশির আকাজ্জিত ‘বুদ্ধিজীবী’ তাঁরা নন। নিম্নবর্গীয় পরিসর থেকে শাসক-মতাদর্শকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে উঠে আসা জৈবিক বুদ্ধিজীবী (organic intellectual) তাঁরা নন। নবাবু এই বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করছেন সাহিত্য নামের অস্ত্র দিয়ে- ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’, ‘কাঙাল মালসাট’, ‘মসোলিয়াম’ ইত্যাদি সেই অস্ত্র। “আমাদের কাজ হল ওদের খচানো, ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিক সেদিক নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তেরপল চাপা দিয়ে প্যাঁদানো। খেঁটো বাঁশ দিয়ে বেধড়ক

ক্যালাও। কী নিজীব কী নিজীব/ নির্ঘাত ওটি বুদ্ধিজীব” (২৫৬) এই বুদ্ধিজীবীরা কথায় কথায় পাশ্চাত্য তত্ত্ব আওড়ায় তথা বিভিন্ন স্বনামধন্যের নাম আওড়ে বোদ্ধা সাজে, এরা ঔপনিবেশিক আদেখলামিতে মেতে থাকে, এরা শাসকের সাজানো স্বস্তিক্ষেত্রে সাহিত্য-চলচ্চিত্র-শিল্প চর্চা করে, এরা অরাজনৈতিক হয়ে ওঠার সরকারি পরিকল্পনায় সামিল হয়ে গৌরবোজ্জ্বল দ্রোহের ইতিহাস ধামাচাপা দিয়ে রাখে, এরা শ্লীল ভদ্র রাষ্ট্র-অনুমোদিত ‘বাবু’ভাষায় প্রমিত উচ্চারণে কথা বলে। ‘মসোলিয়াম (২০০৬)’ উপন্যাসে দাঁড়কাক ও বনবেড়াল ভদ্রির সপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের চিঠি লেখানোর জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। উপরোক্ত অংশে বর্ণিত বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আদেখলামি ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে পাশ্চাত্যতত্ত্বের অন্ধ অনুসরণের মোহ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার কিউরেটর, পিশাচদমন পাল ও ‘অন্যান্য বিস্তর খ্যাতিমান ঢামনা’ রয়েছে বলে কথক জানিয়ে দেয়।¹²⁴ এই বুদ্ধিজীবীদের চোখ থেকে জ্বরদস্তি রাষ্ট্রমোহাঞ্জন মুছে দিয়ে মার্শাল ভদ্রিকে ‘সাপোর্ট’ দেওয়ার প্রচেষ্টা ক’রে বিরুদ্ধ-মতাদর্শের অবতারণা করে বনবেড়াল ও দাঁড়কাক। আবার ‘কাঙাল মালসাট’-এর শেষে বাংলার এবং বিশ্বের তাবড় বুদ্ধিজীবীরা “সংগ্রাম যেমন দরকার, তেমন বিশ্রামেরও দরকার। শেষোক্ত প্রয়োজনটি আমাদের আমাদের খুবই বেশি” (৩৭৭) চিঠি লিখে ‘সরকার-বাহাদুর ও চোক্তার-ক্যাতাডু যুগ্মশক্তির মধ্যে অ-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম’-এর মধ্যস্থতা করে। ভৃষুকুপাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, বিষ্ণু দে থেকে মিখাইল বাখতিন, হাইজেনবার্গ, মিশেল ফুকো, ভ্লাদিমির নবোকভরাও সামিল। ঔপনিবেশিক, উপনিবেশোত্তর থেকে পাশ্চাত্য প্রাচ্য রুশ ইউরোপ সমস্ত চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী সাহিত্যিক ওই সন্ধিপত্রের আবেদনে সই করেছেন। কথক আখ্যানের মধ্যে যাঁদের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উপস্থিত; যবনিকা পতন বা কার্টেন কলের পরে যেমন সব কুশীলব দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে আসেন, তেমনই তাঁরা প্রত্যেকে উপস্থিত। অথবা, আখ্যানে উল্লিখিত বলেই আখ্যানের পরিণতিতে একবার ‘সাম-আপ’ ক’রে নেন লেখক। কিন্তু, এই বহুশতকব্যাপী সুবিস্তৃত নামের তালিকায় কার্ল মার্ক্স না থাকা তাৎপর্যপূর্ণ। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ নেই ওই আবেদনে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায়

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে কথক যে নাতিদীর্ঘ অনুচ্ছেদটি বলে, তার সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সাদৃশ্য প্রচুর।¹²⁵

পাঠসংস্কৃতি তাৎপর্যময় নবায়নের রাজনৈতিক উপন্যাসে। হারবার্টের পাঠসংস্কৃতিতে ধুলো ঝেড়ে উদ্ধার করা পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া বই ‘পরলোকের কথা’, ‘পরলোক রহস্য’, ‘ভূতের জলসায় গোপাল ভাঁড়’ ইত্যাদি আধিপত্য বিস্তার করেছিল। হারবার্টের ঠাকুরদা বিহারীলাল সরকারের সংগ্রহ থেকে পাওয়া বইগুলির মতোই তার জগতের কোনও কিছুই আস্ত থাকে না- হারবার্টের বোধ, স্বপ্ন, প্রেম এমনকি ভূতের ব্যবসাও আস্ত না থেকে এক নিপাট আত্মনাশের দিকে এগিয়ে যায়।¹²⁶ আখ্যানের গঠন-গড়নের সঙ্গে এই ছেঁড়াখোঁড়া বইগুলির অদ্ভুত সঙ্গতি রক্ষিত হয়। আখ্যানের গতিতে ও আখ্যানবিষয়ের আধুনিক বাস্তবতায় মাঝেমাঝে এই বইগুলি থেকে তুলে আনা উদ্ধৃতাংশ বিষম বাধার মত জেগে থাকে; এর ফলে আখ্যানপাঠের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এবং বিপ্রতীপের সংঘর্ষ তৈরি হয়। আখ্যানে বিভিন্ন অসঙ্গতিকে জুড়ে জুড়ে রাখতে চাওয়া এবং শৃঙ্খলাবিন্যাসকে বিপর্যস্ত করার অন্যতম হাতিয়ার ওই বইগুলি। মার্ক্সবাদের বইয়ের সংস্পর্শে সে এসেছিল, কিন্তু গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিনু হারবার্টকে মাও সে-তুংয়ের ‘রেড বুক’ থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনায়। বিনুর পাঠধারায় ‘দক্ষিণদেশ’, ‘দেশব্রতী’, গেরিলা যুদ্ধের ম্যানুয়াল ও চারু মজুমদারের আটটি দলিলের সঙ্গে সঙ্গে সমীর মিত্রের কবিতাও ঢুকে পড়ে। হারবার্ট বিনুর বইগুলি পুলিশের ভয়ে পুড়িয়ে ফেলার আগে হয়তো পড়েও ফেলেছিল। কিন্তু সেই পাঠ তার পাঠপ্রবণতায় রূপান্তরিত হয় না। বিনু আর হারবার্ট দু’জনের পাঠপ্রবণতাই অন্তর্ঘাতী; বিনুরটা মূলতঃ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের জন্যে এবং হারবার্টেরটা আধুনিক ভদ্র পাঠকরুচির জন্যে। হারবার্টের রুচি, সংস্কৃতি ও পাঠাভ্যাস আরও অপরিণীলিত এবং কাঁচাগড়নে (raw form) প্রসারিত হয় ‘কাঙাল মালসার্ট’ ও ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’-এ। হারবার্টের ভাষা ও বন্ধুবৃত্তের সঙ্গে ফ্যাতাডুদের মিল যেমন থাকে, তেমনই আধুনিক যুক্তিমার্জিত ভদ্রসভ্য উচ্চপাঠকরুচির প্রতি খিল্লি ওড়ানোতেও মিল থাকে। ‘পরলোক রহস্য’ খুলে প্রণব ঘোষেদের মুখে

ছুঁড়ে মারার স্পর্ধা ফ্যাতাডুরা এগিয়ে নিয়ে যায় আরও দারুণ উদ্‌যাপনে। বিনুর পাঠপ্রবণতা ষাট-সত্তরের বিপ্লবী তরুণ-যুবদের পাঠরুচির চিহ্নক এবং হারবার্টের ‘লিবারেটেড রিডিং’ যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের পাঠপ্রবণতার প্রতি ঠাট্টার সুরে বেজে ওঠে; হারবার্ট পাশ্চাত্যবাদী আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে তার ‘সাবজুগেটেড রিডিং’ দিয়ে।¹²⁷ বিনুর পাঠপ্রবণতা দীর্ঘায়িত বিবরণে ফিরে আসে ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র রণজয়ের পাঠপ্রকল্পে। এই উপন্যাসে রণজয় বিনুর মতোই মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত, কমিউনিস্ট পাঠক। তার পাঠপ্রবণতা কমিউনিস্ট সাহিত্যপাঠের নির্দিষ্ট সূত্রপথ ধরে এগোয়। কিন্তু, লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে রণজয়ের পাঠভঙ্গির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ায়- রণজয়ের পাঠভঙ্গি ও পছন্দের বইগুলি নেহাৎ কিছু বই নয় বরং প্রতিরোধের পাঠ হয়ে ওঠে। ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে নব্বই দশকে পৌঁছে রণজয়কে রাজনৈতিক মতাদর্শে অটল থাকতে হয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ জারি রেখে। লুকোনো রাইফেলের ওপরে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে যাওয়া যেমন রাজনৈতিক পরাজয়, তেমনই ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক টেক্সটগুলি ভুলে যাওয়া সাংস্কৃতিক পরাজয়। লেখককে এবং রণজয়কে তাই সজাগ সচেতন থাকতে হয় টেক্সটগুলিকে আখ্যানে বারবার ফিরিয়ে আনতে কিংবা উদ্ধৃত করতে। রণজয় তার উত্তরপ্রজন্ম কোবার পড়ার জন্যে যে পাঠগুলি (texts) সাজিয়ে রাখতে চায় তাতে কমিউনিস্ট পাঠধারার অনিবার্য কিছু বই ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিন’, মস্কো পাবলিকেশনের অনূদিত সোভিয়েত সাহিত্য এবং চিনের কমিউনিস্ট লেখকদের সাহিত্য থাকে কিন্তু তার সঙ্গেই বাংলা প্রগতিবাদী সাহিত্যের কিছু নমুনাও থাকে। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’¹²⁸ এই পাঠধারায় রণজয়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রণজয় কোবাকে প্রগতিবাদী ঘরানায় মানুষ করতে চায় এবং কোবার পাঠসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে চায় নির্দিষ্ট পাঠধারার সূত্রায়ণে। অথচ, আখ্যানের ক্রমোন্মোচনে দেখা যায় যে, কোবার পাঠপরিসরে এই পাঠগুলি থাকছে না। কোবার বাস্তবতায় এই পাঠধারা অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু রণজয়ের বাস্তবতায় কোবার জন্যে এই পাঠগুলি সাজিয়ে রাখা থাকে; রণজয়ের প্রসঙ্গে কথক বারবার এই পাঠগুলি থেকে অংশ ভুলে আনেন।

কোবা উনিশশো নব্বই দশকের তরুণের পাঠপ্রবণতা অনুযায়ী পড়ে, লেখে। তার পাঠধারায় ঢুকে পড়ে এপিডিআরের তথ্যনথিসম্বলিত পুস্তিকা। ফলে, কোবা শাসকের রাজনীতি ও শাসকবিরোধী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়; আর, ষাট-সত্তরের দ্রোহীদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে। পাঠপ্রবণতার ধারায় আরেক উল্লেখযোগ্য সংযোজন রণজয়ের ছাত্র কৌশিক। এই কুশীলবের নির্মাণ ভারতীয় সমাজের ‘মডেল বুদ্ধিজীবী’-র প্রতিক্রিয়া হিসেবে; কৌশিক দারুণ মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত, অধ্যাপক, নকশালদের প্রতি সহমর্মী এবং সমাজের ওপরতলায় থাকা ‘আদর্শ ভদ্রলোক’। তার পাঠরুচি গড়ে দিয়েছিল রণজয়। রণজয়ের সত্তর-দশকে-আটকে-থাকা চিন্তাস্রোতে কৌশিককে নিরন্তর মার্কসবাদের নীতি কৌশলের পাঠ দিয়ে চলে রণজয়- দিমিত্রভের বই থেকে লু শূনের কবিতা কিংবা স্তালিনগ্রাদ থেকে কিউবার মুক্তিযুদ্ধ।¹²⁹ রণজয়ের ‘পাগলাটে’ চিন্তায় কমিউনিস্ট পাঠধারাই শুধুমাত্র জেগে থাকে, যা তার তত্ত্ব ও অনুশীলনে পাথেয় জোগাতে থাকে; নিজের দশক (’৭০ দশক) থেকে ছিটকে গিয়েও তাই এগুলিই তার অবলম্বন। অরিত্র চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে পাঠসংস্কৃতির অন্তর্ঘাতী প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মিশেল দে কোর্তুর ‘The Practice of Everyday Life (1984)’-র আলোকে নবাবুণের আখ্যানের কুশীলবদের পাঠ-প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছেন।¹³⁰ পাঠকদের পাঠাভ্যাস কীভাবে প্রতিরোধের অস্ত্র হতে পারে এবং শাসক-নির্দেশিত অর্থের বিরুদ্ধে অর্থ নির্মাণ করতে পারে। রণজয়ের কাছে পূর্বে পঠিত পাঠ্যগুলি হাতিয়ার হয়ে ওঠে বীভৎস পুলিশি জেরার সামনে। ‘তাত্ত্বিক’ পুলিশের মার্কসবাদ পাঠ যে ভুল, রণজয় তা তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ ক’রে দেয়।¹³¹ রণজয়ের পাঠরুচির বিরুদ্ধে আসে নিপীড়ক পুলিশ অফিসার বসাকের পাঠরুচি। বসাক ‘আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সারকথা’ পড়ে, বীর্যাস্তম্ভের অধিকার নিয়ে লেখা পড়ে। বসাক তাত্ত্বিক পুলিশ নয়; রাজনৈতিক অভিযুক্ত/বন্দীদের সঙ্গে ‘ভাল পুলিশ মন্দ পুলিশ’ খেলার ‘মন্দ পুলিশ’ সে।¹³² রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার কাজ শুধুমাত্র দমনমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিপ্লবীদের দমন করা। তার বয়ান আখ্যানে এলে পাঠরুচিহীন, টাকার গরমে মত্ত, ব্যক্তিজীবনে অসুখী ও

সামাজিক ক্ষমতাবান প্রতিকল্প (prototype) পুলিশ-অফিসারের ছবি স্পষ্ট হয়। রণজয়ের চেতনা ও আচরণ যেমন তাকে কমিউনিস্ট বিপ্লবীর প্রতিকল্প বলে প্রতিপন্ন করে, তার বিপ্রতীপে বসাকের নির্মাণ। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে কথকের বকলমে লেখক নবাবের পাঠপ্রবণতার হদিশ পাওয়া যায়, যেটা নিরন্তর হেজিমনিক পাঠপ্রবণতাকে প্রত্যাশ্রয় জানায়। (ক) ঔপনিবেশিক আদেখলামির ভ্রান্তি কাটাতে বিরুদ্ধ পাঠপ্রস্তাব (খ) হেজিমনিক বিদ্যাচর্চার বিরুদ্ধ পাঠোপদেশ (গ) মার্ক্সবাদী সাহিত্যচর্চা যার মধ্যে কমিউনিস্ট নথি, সাহিত্য, তত্ত্ব, তথ্যনির্দেশ সবই অন্তর্ভুক্ত (ঘ) উনিশ শতকীয় বাঙালি সাহিত্যিকদের পাঠোন্মুখ, যাঁদের অধিকাংশই অধুনা পাঠকদের দ্বারা বিস্মৃত (ঙ) তথাকথিত বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী উভয় শিবিরের লেখা পাঠসূচিতে রাখা, কারণ ‘বিপ্লবী’ ও ‘প্রতিবিপ্লবী’ এই দু’টি তকমার উদ্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় (চ) পাশ্চাত্য তত্ত্ব, উত্তরাধুনিক তত্ত্বকেন্দ্রিকতা এবং ‘আধুনিক’ পাঠপ্রবণতাকে ঠাট্টা ক’রে ‘দেশীয়’ তত্ত্ব ও দেশীয় সাহিত্যকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা। (ছ) বিশ্বায়ন পরবর্তী বাংলা আধুনিক সাহিত্যের লেখক এবং পাঠক উভয় সম্প্রদায়কে নাকচ ক’রে বিকল্প পাঠরণনীতি প্রস্তুত করা। সর্বোপরি, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নিরাজনীতিকরণের যাবতীয় বন্দোবস্ত যা শাসক নিরন্তর পাঠকবর্গের জন্যে সাজিয়ে রেখেছে/রাখছে, তাকে প্রত্যাশ্রয় জানিয়ে রাজনীতি-সচেতন বিরুদ্ধ-পাঠধারা নির্মাণ করা। ‘কাঙাল মালসাট’-এর কথক এবং দাঁড়কাক অন্তর্ভুক্ত পাঠকের (implied reader) কাছে এই বিকল্প পাঠের হদিশ দেয়। লেখক নবাবের কথকের স্বরে ও দাঁড়কাকের স্বরে এই যে বিকল্প পাঠরণনীতি তুলে ধরেন, বইগুলি নবাবের নিজেও পড়েছেন। মার্ক্সবাদী পাঠধারার সুবিশাল সুগভীর সূচির সঙ্গে তিনি পরিচিত বলেই আখ্যানে তা উল্লেখ হয়ে চলে অনায়াস উচ্চারণে। আখ্যানের হাড়-মাস পুষ্ট হয় এই পাঠপ্রবণতার উল্লেখ; লেখক নবাবের এই পাঠধারা আখ্যানের গড়ন-গঠনে সম্পৃক্ত। তথাগত ভট্টাচার্য তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, নবাবের তথ্য ও গবেষণাতে গুরুত্ব দিতেন এবং প্রতিটি রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ে আপ-টু-ডেট থাকতে গভীর ব্যাপ্তিতে পড়াশোনা করতেন।¹³³ তাঁর পাঠে স্বদেশ ও বিদেশের কমিউনিস্ট

সাহিত্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীত, দেশি ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্রও ছিল। নবাবুণ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ভ্যাসিলি গ্রসম্যান, মিখাইল বুলগাকভ, মায়াকোভস্কি, সেজারে পাভিসের সাহিত্যের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা।¹³⁴ দেবেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে রুশ, জার্মান, ফরাশী, সোভিয়েত উপন্যাসের বাস্তবতাবাদ বিষয়ে গবেষক-দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত দিচ্ছেন।¹³⁵ নবাবুণের পাঠপ্রবণতা মার্ক্সবাদী সাহিত্যসমালোচনাকে যে সর্বৈব সত্য বলে মানে না, সেটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিশ্লেষণেই পরিস্কার হয়।¹³⁶ “একই সময়ে যখন ‘যুথপতি’, ‘চিত্রগ্রীব’, ‘লাল-কালো’, ‘মানুষ-পিশাচ’ ইত্যাদি পড়ে আশ্চর্য শৈশব কাটিয়েছি তখনই ‘আম আঁটির ভেঁপু’ অন্য কোনো পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিল যা মানুষের দুঃখকষ্ট বুঝতে শেখায়, তার পাশে দাঁড়াতে বলে” (তদেব, ৩০) সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তত্ত্ব মেনে পাঠধারা নির্মাণ নয়, বরং শিল্পী-লেখকের স্বাধীনতার মতোই পাঠকেরও স্বাধীনতা থাকা উচিত- এমনটাই বিশ্বাস ছিল নবাবুণের। কিন্তু, ‘সাহিত্যের বাজার’ যে পাঠকের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ ও খর্ব করে, সে সম্পর্কেও সচেতন ক’রে দেন প্রবন্ধে। কখনও কখনও পাঠপ্রবণতাকে আধিপত্যমূলক নির্দেশে খর্ব করে কমিউনিস্ট শাসকরাও; তাই ট্রটস্কি, বুখারিন, গ্রামসি বুলগাকভদের কথা মনে করিয়ে দেন পাঠককে। আখ্যানের প্রত্যেক কুশীলবের চেতনার মাপ অনুযায়ী তাদের পাঠপ্রবণতার উল্লেখ করেছেন নবাবুণ। স্তালিন, লেনিন ইতিহাসের ফ্রেম থেকে এসে যে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যায়, সেগুলিও তো লেখকের পাঠের অভিমুখের কথাই বলে।

ফ্যাতাডুদের পাঠসংস্কৃতি তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্যাতাডুরা দন্ধ বইমেলায় হামলা ক’রে যা বই কুড়ায়, তাতে সচেতনভাবে বাদ দেয় কবিতা উপন্যাস গল্পের বই অর্থাৎ ‘উচ্চ-সাহিত্য’। যা ভদ্রলোকীয় পাঠসংস্কৃতি, তা বাদ। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিপ্লব ও রাজমোহন’¹³⁷ গল্পটি স্মরণীয়। রাজমোহন সুসজ্জিত উচ্চপাঠপ্রবণ বইয়ের আলমারিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। “মডার্ন লাইব্রেরির আলোকবর্তিকা হাতে লোকটি এখন আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটছে” (১৪০) আধুনিক

সাহিত্যের নিদর্শনগুলি পুড়িয়ে দিয়ে সেই হিংসাত্মক দৃশ্য উপভোগ করে রাজমোহন। রাজমোহন উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলার এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং আত্মহত্যাপ্রবণ। রাজমোহন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কত নিষ্ঠা পাঠক তা বোঝানোর জন্যে সন্দীপন আন্তঃপাঠের অবতারণা করেন বারবার। আত্মহত্যার পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের রোহিণী রাজমোহনের চিন্তাক্ষেত্রে ও গল্পের আখ্যানে ভেসে ওঠে বারবার। গুন্টার গ্রাসের ‘টিন ড্রাম (১৯৫৯)’ উপন্যাসের আলব্রেষ্ট গ্রেফ ও অস্কার¹³⁸ রাজমোহনের বাস্তবতায় কড়া নাড়ে বারবার। রাজমোহনের ব্যক্তিগত যাপন ও অরাজনীতির পরিসর আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যায় ষাটের দশকের অস্থিরতার দিকে এগিয়ে দেয়। রাজমোহন সযত্ননির্মিত বইয়ের আলমারিতে যখন আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন সে ‘সুখী’ মানুষ এবং নিশ্চিন্তি-সুখের মধ্যবিত্ত পরিসরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যেই তার নিজস্ব পাঠসংস্কৃতিকে পুড়িয়ে দেয়; প্রায় দুপাতা জুড়ে কী কী বই পুড়ছে তার বর্ণনা দেন সন্দীপন। গীতবিতান, গোরা, আরণ্যক, ‘শ্রেষ্ঠ জার্মান উপন্যাস’ থেকে জোনাথন কেপের বই সমস্ত কিছুই পুড়িয়ে দেয়; “ঘরটা রাতারাতি সাফ করে ফেলতে হবে। ঘরের আর কিছুই পোড়ে নি, আগে থেকে এমন সুবিবেচনা করে সেল্ফটি রেখেছিল সে” (১৪১) শুধুমাত্র বইগুলি নয়, বইয়ের চরিত্রগুলির পুড়ে যাওয়াও আলাদাভাবে উল্লেখ করছেন লেখক; ‘আধুনিকতা’র যে স্থানক্ষেত্র রাজমোহন অবস্থান করছে, সেখানে এই চরিত্রগুলি তাকে আর সংজ্ঞায়িত করে না। অথবা, এই চরিত্রগুলি যে আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া, তাকে নিজের স্থানক্ষেত্র দাঁড়িয়ে প্রত্যাখ্যান করে রাজমোহন। ‘রাজমোহন’স ওয়াইফ’ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম। রাজমোহন আর ফ্যাতাডু এক নয়; শ্রেণি-অবস্থান আলাদা, শ্রেণিবোধ ভিন্ন, সামাজিক অবস্থান আলাদা, লজ/মুখের ভাষায় প্রভূত পার্থক্য এমনকি পাঠরুচিতেও তফাৎ। সন্দীপনের উপন্যাস-গল্প মধ্যবিত্তের সংকট ও যাপন-পরিসরের অবক্ষয় নিয়ে।¹³⁹ ফ্যাতাডুদের সঘোষ অবস্থান শব্দে নিম্নবর্ণের উদ্‌যাপন নিয়ে, তাদের সগৌরব নৈরাজ্যের বর্ণনার কার্নিভ্যাল। কিন্তু, রাজমোহন ও ফ্যাতাডুদের মিল এখানেই যে, এরা ‘আধুনিকতা’র পাঠচিহ্নগুলি প্রত্যাখ্যান করছে। ভদ্রলোকীয়

পাঠের ‘পবিত্র’ গ্রন্থাদি যা উচ্চপাঠপ্রবণতার স্বাক্ষরবাহী তাদের নাকচ ক’রে দিচ্ছে। ফ্যাতাডুরা বইপত্র পুড়িয়ে দেয়নি, কিন্তু পোড়া বইমেলা থেকে উচ্চপাঠরুচির সাহিত্য বাঁচানোর ন্যূনতম তাগিদও দেখায়নি। ‘বইমেলায় ফ্যাতাডু’ গল্পে ডিএসের কাছে ‘বইমেলা’ বলে কোনও মেলারই অস্তিত্ব নেই, বরং বারোভূতের মেলা তার রুচি ও বিনোদনের খোরাক। বইমেলা রুচিবান বাঙালির মহোৎসব, কিন্তু ডিএসের চিন্তাচেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন।¹⁴⁰ সমস্ত ‘আগডুম বাগডুম’ নভেল কবিতা গল্পের বই ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরামর্শ দিয়ে মদন ডিএসকে বলেছে ডাকিনীবিদ্যা তত্ত্বের বই ও তথাকথিত ‘অনাধুনিক’ বই খুঁজতে।

-আমিও হেভি বই পেয়েছি... ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’।

-ছুঁড়ে ফেলে দাও। বললাম যে কাব্যফাব্য নয়। ইডিয়েট কোথাকার।

-তাহলে এটা নেব? ‘জ্যোতির্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা’।

-বিদঘুটে নাম কিন্তু কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

-‘তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত’। আধখানা নেই।

-আধখানাতেই জমে যাবে। বগলে করে একবার তারাপিঠে পৌঁছতে পারলে হয়।

(ভট্টাচার্য ২০০৪, ৩৯-৪০)

পুলিশ দমকল ধরতে এলে তারা ‘বঁই মঁরা ভুঁত’ সাজে এবং পালাবার সময়ে যে ‘বোঁদপড়া ডোবার জলের’ জলবোমা ছোঁড়ে পার্কস্ট্রিটের ফূর্তিরত জনগণের ওপরে তাতে অজান্তেই লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ডের হোমরাচোমরারা। ‘বাংলা সাহিত্যে ফ্যাতাডু-র অবদান’ অংশের অবতারণা করতে হয় বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফ্যাতাডুদের দূরত্ব ও বিরোধের পরিধি বোঝাতে। ফ্যাতাডুরা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিক হিসেবে নবনী ধরকে মান্য করে। নবনী ধরের বইয়ের নাম ‘ধজভঙ্গুর’, ‘সায়ী ঢাকা কায়া’, ‘সতী ও ভীমরতি’ ও ‘ধরাধরি’ সিরিজ।¹⁴¹ নবনী ধরের বইয়ের নামে ও বইয়ের বিষয়বস্তুতে ফ্যাতাডুরা পরিশীলিত আধুনিক উচ্চ-সাহিত্যের অন্তর্গত খুঁজে পায়। নবনী ধরের

লেখায় রাজনীতিগত বিশুদ্ধি (political correctness) নেই, গভীর তত্ত্বসন্দর্ভ নেই এবং আরোপিত শুদ্ধতা নেই। নবনীর বই অবদমিত যৌনবোধ ও ফ্যান্টাসি¹⁴² উসকে দেয়, যা উচ্চকোটির সাহিত্য-সমালোচকদের চোখে নিন্দার। সর্বোপরি, নবনী ফ্যাডাডুদের মতোই মদপ্রিয় তাই নবনীর জন্য মদ খাওয়ার সব বন্দোবস্ত ক’রে দিয়ে ফ্যাডাডুরা বলে, “বাংলা সাহিত্যের জন্যে এটুকু যদি না করতে পারলাম তা হলে বাঙালি বলে পরিচয় দেব কোন মুখে?” (৯৬)। স্নীল-অস্নীল বাইনারি দিয়ে সাহিত্যকে মাপার চেষ্টা বা ফ্যান্টাসিতে ভদ্রতা-শ্রদ্ধা মিশিয়ে দেওয়ার সাহিত্যচেষ্টা নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাঙালিদের অবদান। বৈষ্ণব পদাবলী যে যুগে রচিত হচ্ছে, সেই যুগে সাহিত্যে শৃঙ্গার রস অন্যতম প্রধান রস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আরও কয়েক শতাব্দি আগে কালিদাসের ‘মেঘদূতম’ কিংবা ‘কুমারসম্ভব’ রচিত হয়েছে, সেখানে শৃঙ্গাররসের প্রাবল্য এবং ফ্যান্টাসির সঙ্গে সাহিত্যের মিশেল লক্ষণীয়। ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে দেবদেবীর শারীরিক বর্ণনায় যৌন রূপকল্পের আতিশয্য ও বস্তুগত উপমার ব্যবহার সাবলীলভাবে হচ্ছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণ পুরাণের কোনও দূরবাসী ‘দেবতা’ হয়ে থাকছেন না, তাঁর লৌকিক ক্রিয়াকলাপ এবং অলৌকিক লৌকিকতার (লীলা) বহুমুখী প্রকাশ ঘটছে মর্ত্যে। কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেম মানুষীপ্রেমের দোষ-গুণ-বৈশিষ্ট্য সমেত পাঠকের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। বটতলার সাহিত্যের সঙ্গে নবনী ধরের লেখা ও ফ্যাডাডুদের পাঠরচির সাযুজ্য রয়েছে। বটতলার সাহিত্যে যে ‘অপরত্ব’ রয়েছে, সেই বিষয়ে অদ্রীশ বিশ্বাস লিখছেন, “তথাকথিত ভদ্রবাড়িতে এই বই ব্যবহারের মধ্যে একটা চাপিয়ে দেওয়া উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। সেটার সঙ্গে কখনও ঔপনিবেশিক নীতিনিষ্ঠ সমাজের যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে আবার হয়তো বর্ণ ও শ্রেণিগত দৌরাভ্য প্রতিষ্ঠার রাজনীতিও কেউ কেউ খুঁজে পেতে পারেন” (২২) বটতলার বই নিম্নবর্ণের ও নিম্নশ্রেণির মহলে জনপ্রিয় ছিল এবং অস্নীলতার তকমা এঁটে সাংস্কৃতিক হেজিমনির অনুশীলনে আভিজাত্য উচ্চ-নন্দনতত্ত্বের বৃত্তের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বটতলার বইকে।¹⁴³ ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা, ইউরোপ-অনুসৃত আধুনিকতা ও নবজাগ্রত উচ্চসংস্কৃতিতে যে ফ্যান্টাসি অস্নীল বা বিকৃত বা

স্থূলরসের বলে বিবেচিত হত, বটতলার সাহিত্য সেই সুপ্ত-গুপ্ত ফ্যান্টাসিকে বিষয়বস্তু ক’রে তুলল এবং বইয়ের মলাটে তার ছবি ছাপা হল।¹⁴⁴ পুরন্দর ভাটের কবিতায় বাস্তববোধের সঙ্গে অশ্লীল মিশে যায়, অদ্ভুতরস নির্মাণ করে। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি থেকে সামাজিক পাঠ- পুরন্দরের কবিসত্তা সচেতন। ‘আইপিএলে ফ্যাতাডু’ গল্পে কথক পুরন্দর ভাট সম্পর্কে একটি টিপ্পনি রাখেন, “সচরাচর কবিদের মধ্যে যে মোলায়েম ম্যাদামারা ভাবটা থাকে, সেটা পুরন্দর ভাটের মধ্যে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কারণ সে ঘোর রাজনৈতিক এবং চান্স পেলেই বলতে ছাড়ে না যে আগে সে ফুল নকশাল ছিল, এখন হাফ।”¹⁴⁵ পুরন্দরের কবিসত্তা ও কাব্যভাষার লক্ষ্যনীয় দিকগুলি হল- (ক) পুরন্দরের কাব্যভাষা নিত্যব্যবহৃত শব্দভান্ডারে নির্মিত (খ) যে ভাষা অশোভন, নিম্নরুচির, উচ্চপাঠপ্রবণতা বিরোধী (গ) পুরন্দরের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ওপরঅলা/বন্ধু নেই (ঘ) উচ্চরুচির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উচ্চ-সামাজিক বর্গের সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে পুরন্দর (ঙ) রাজনৈতিক ও সামাজিক হেজিমনি-অনুশীলনকারীদের নিয়ে মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারে পুরন্দর- যে প্রবণতা উনিশ শতকের কলকাতার পক্ষী-সং-জেলেদের ছিল। ফ্যাতাডুদের আরেক প্রিয় সাহিত্যিক বজরা ঘোষ, কলকাতায় এক ওড়াউড়ির রাতে যে বজরা ঘোষকে আবিষ্কার করে তারা। বজরা ঘোষ ঔপন্যাসিক, পুরন্দর ভাটের সঙ্গে তার অমিল প্রচুর কিন্তু প্রধান মিল একটাই- সাহিত্যের ভাষা ও প্রকরণে বাংলা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের বিপ্রতীপ অভিমুখে তার যাত্রা।¹⁴⁶ বজরা ঘোষ সম্বন্ধে দাঁড়কাক ও বনবেড়াল বলে, “কেউ ওর কোনো লেখা পড়েনি। কেউ ওর নাম জানে না” (৪৭৭) অথচ সেই বজরা ঘোষই নিজেকে স্বঘোষিত ‘সাহিত্যসম্রাট’ দাবি করে এবং পুরস্কারের দাবি করে। ‘উইকলি ভ্যাম্পায়ার’ পত্রিকা ও বজরা ঘোষ বাংলা লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন ও লিটল ম্যাগাজিনের প্রথাবিরোধী সাহিত্যকর্মীর প্রতি ট্রিবিউট, যাদের অনন্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোনও স্বীকৃতি দেয়নি পাঠ-প্রতিষ্ঠানগুলি।¹⁴⁷ বজরা ও পুরন্দরের সাহিত্য স্বঘোষিত মহান সাহিত্যের প্রচার থেকে দূরে কিন্তু অন্তর্ঘাতী, তাই নবাবুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা বড় প্রকাশনী সংস্থার বশংবদ লেখককূলের থেকে ‘খারাপ’ নয়।¹⁴⁸

নবাবুণ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, এক শ্রেণির মান্য মানুষ আর তাদের বানানো মান্য ভাষা এ দু'টোকেই বোমা মেরে ওড়াতে চান তিনি।¹⁴⁹ ‘মসোলিয়ামে’ ‘কাঙাল মালসাট’ জুড়ে যে পাঠসংস্কৃতি, তাতেও উচ্চ পাঠসংস্কৃতির প্রতি খিল্লি ওড়ানো থাকে। ‘মসোলিয়াম’ উপন্যাসেও ফিরে আসে এই উপন্যাসের চরিত্ররা, তাদের অন্তর্ঘাত নিয়েই। বজরা ঘোষ আধুনিক কবিতা-উপন্যাসের নান্দনিকতায় বিশ্বাসী নয়, বরং ভূতের গল্প লেখে। ভূতের গল্প উচ্চপাঠপ্রবণ নাকউঁচু পাঠকদের অবজ্ঞার বিষয়। কিন্তু, ফ্যাতাডুদের আগ্রহ ভূত, তন্ত্রসাধনা, অলৌকিক ইত্যাদি গল্পে। সরকারি অবসরপ্রাপ্ত করণিক, যে ফ্যাতাডু+চোক্তার মহাজোটের সুহৃদ, সেও বইমেলায় ‘সবই আলবাল’ বই বাদ দিয়ে ভূত সিরিজের তিনটি বই কেনে- ‘মানুষখেকো ভূত’, ‘মস্তান ভূত’ ও ‘রেলগাড়িতে ভূত’।¹⁵⁰ বজরা ঘোষের ভূতের গল্প¹⁵¹ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। উল্লেখ্য, তন্ত্র সংস্কৃতির প্রতি যখন ফ্যাতাডু ও চোক্তারদের এত ঝোঁক, তখন কিন্তু অতি-সাম্প্রতিক কালের মতো তন্ত্রভিত্তিক উপন্যাস লেখার বহুল চল ছিল না। তাদের উদ্দেশ্যও বর্তমান তন্ত্রচর্চাকেন্দ্রিক ঔপন্যাসিকদের থেকে ভিন্ন ছিল।

‘মসোলিয়াম’ উপন্যাসে সরখেল ‘ডাইনোসরের তন্ত্রসাধনা’ নামক গবেষণা-গ্রন্থ লেখে। বেগম জনসন ও দাঁড়কাকদের পরামর্শে ‘উইকলি ভ্যাম্পায়ার’ পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করে চোক্তার ও ফ্যাতাডু। এই পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধতাকল্পের অংশ, তা বোঝা যায় যখন দাঁড়কাক ভদিকে বলে যে, এই পত্রিকা ‘উনিশ-কুড়ি’র মতো ‘নতুন রোঁয়ার চুলবুলুনি কেস নয়’।¹⁵² ‘উইকলি ভ্যাম্পায়ার’ পত্রিকায় চল্লিশ শতাংশ ভূতুড়ে খবর ও ষাট শতাংশ অভূত খবর ছাপানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়; অর্থাৎ যে খবরগুলি কোনও নামী বা অনামী সাহিত্যপত্রিকা ছাপাবে না এবং নিম্নরুচির খবর বলে বাতিল ক’রে দেবে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যে খবরগুলি ছাপা হয়, তা ‘সংবাদ’ হিসেবে শিক্ষিত-আধুনিক-যুক্তিবাদী পাঠকমহলে গ্রাহ্য নয় এবং তার সাহিত্যগুণও কিছুই নেই। পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে বোঝা যায় যে, দাঁড়কাক বেগম জনসন ভদিদের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের লেজুড়রা এবং বহুল বিক্রীত সংবাদপত্র-

পত্রিকা। পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি চোক্তার ও ফ্যাতাডুদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞাপন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, ‘উইকলি ভ্যাম্পায়ার’ বাজারচলতি নামী পত্রিকাগুলির মতো বাণিজ্যিক/পণ্যকেন্দ্রিক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে অর্থোপার্জন করতে চায়নি; সরখেলের বই, বেচামণির বিউটিপার্লার, পুরন্দরের কাব্যগ্রন্থ, মেজর বক্সির যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনের ভাষা ও প্রকরণ সমসাময়িক বিজ্ঞাপনী ভাষার¹⁵³ প্রতি ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিচ্ছে। লেখক কি লিটল ম্যাগাজিনের প্রকরণকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না? নবাবুণ নিজে ‘ভাষাবন্ধন’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন ২০০৩ সাল থেকে, সম্পাদকও তিনিই ছিলেন। লেখকের পাঠ-প্রবণতার গুরুত্ব বোঝা ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে।

ঔপনিবেশিক ও বিশ্বায়নী সংস্কৃতি উভয়েই লেখক নবাবুণের সাহিত্য-রাজনীতির শত্রু। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে ঔপনিবেশিক আদেখলামি (Colonial Hangover) পদে পদে আক্রান্ত হয় দাঁড়কাকের দ্বারা। দাঁড়কাক কে? সে ‘জীবিত’ ও ‘মৃত’ দুই পৃথিবীর সংযোগে দক্ষ চোক্তারদের নেতা- সে অতীত থেকে ভবিষ্যতে অবাধে বিচরণ করে; সমালোচকের ভাষায় এই গ্রন্থের তুরূপের তাশ।¹⁵⁴ দণ্ডবায়সের বয়ানে জীবিত ও মৃতের মধ্যে আখ্যানমধ্যস্থ তফাৎ অনেকটাই ধূসর হয়ে যায়। অতীত থেকে তাদের ‘জীবন্ত’ প্রতিরূপ উঠে আসে এবং পাঠকের সঙ্গে সেতুবন্ধন করে। এখানে দু’টি বিষয় লক্ষ্যণীয়- (১) দণ্ডবায়স কুইজমাস্টার নয়, পাঠকের সাধারণ জ্ঞান (general knowledge) বাড়ানোর জন্যে আলটপকা তথ্য ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় না। আখ্যানের সঙ্গতিতে বিস্তৃত তথ্য, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান হাজির করে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যোদ্ধৃতির উল্লেখ কুইজমাস্টারদের উদ্দেশ্যে লেখেন, “ঐ কবিতাটি কার লেখা? অনেক কুইজ মাস্টারও কেলিয়ে পড়বে। এবং শিশুদের প্রশ্নটি করে লাভ নেই। তাদের বাপগুলিও জানে না” (২৪৭) কুইজমাস্টারদের প্রশ্নোত্তরে ওই আলটপকা সঙ্গতিহীন তথ্যভারের প্রাসঙ্গিকতা নেই, তা নির্মম পরিহাসে খোলসা করে কথক। (২) দণ্ডবায়স মুখফেরতা ইতিহাসের মহাফেজখানা (archive), প্রথাগত এমনকি বিদ্যায়তনিক ইতিহাসচর্চা ও সরকারি নথিতথ্য তার

বিপুল জ্ঞানের কাছে কুটোসম।¹⁵⁵ ভিক্টোরিয়ার বাঙালি কিউরেটর ঔপনিবেশিক আদেখলামিকে জ্ঞানচর্চার একমাত্র দৃষ্টিকোণ বলে মনে করে, তাই ‘সবই চার্নকের দয়া’ বলাটা তার লজ্জা। দাঁড়কাক জোব চার্নক সম্বন্ধে কিউরেটরের আদেখলামিকেই শুধু আক্রমণ করেন না, বরং হেজিমিনিক বিদ্যাচর্চার ধারাকেও প্রত্যাশ্রয় জানান। দাঁড়কাকের তথ্যপ্রমাণসহ উদাহরণে চার্নক ‘কলকাতার আদিপিতা’ ও ‘গ্রেটম্যান’ থেকে ‘লুটেরা মাগিবাজ’ ও ‘গ্রেট বাল’ হয়ে যায়।¹⁵⁶ কলকাতার পত্তন যে জোব চার্নকের হাতে নয়, তার ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ বহু আছে, কিন্তু ঔপনিবেশিক আদেখলামির হোতারা ১৬৯০ সালটিকেই কলকাতার ‘জন্মদিন’ বিবেচনা করে- দাঁড়কাক যে কলকাতাকে পাঠকের সামনে হাজির করতে চায় সেই কলকাতার ‘জন্মদিন’ বলে কিছু নেই, সে কলকাতা বহু পুরনো। শ্রীপাঙ্ক দাঁড়কাকের বর্ণনার সাযুজ্যে জোসেফ টাউনসেন্ডের সঙ্গে চার্নকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করছেন, দেশীয় মহিলাদের প্রতি লালসা ছিল সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটরের সঙ্গে দাঁড়কাকের বাদানুবাদের একটি কারণ কি এটিই যে, ভিক্টোরিয়াতে ১৯৭৪ সালে চার্নকের একটি দুস্তাপ্য প্রতিকৃতি এসে পৌঁছোয়।¹⁵⁷

(৫) ফ্যাতাডুদের প্রধান চাঁদমারি শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দল। ‘কাঙাল মালসাট’-এর আখ্যানপট যেহেতু বামফ্রন্টশাসিত পশ্চিমবঙ্গ, তাই দণ্ডবায়স, ফ্যাতাডু ও চোক্তারদের রাজনৈতিক সংঘাত বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেও। ফ্যাতাডুরা ভোট দেয় না। হারবার্টও বিনুর প্রতি ‘ট্রিবিউট’ দিতে ভোট দেয় না। হারবার্টের পাঠরুটি ও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রবণতার সঙ্গে হারবার্টের প্রভূত মিল। হারবার্টের প্রেতচর্চার ভড়ং-এর পরিপূরক হিসেবেই ফ্যাতাডু-চোক্তারদের কালোজাদু তন্ত্রচর্চা প্রেতসংযোগ ন্যায্যতা পায়। ‘মার্কসবাদ সত্য কারণ ইহা বিজ্ঞান’ নামক বিজ্ঞাপন দিয়ে কঠোরকঠিন অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়া রেওয়াজ বামফ্রন্টের ছিল। সিপিআইএম সম্পর্কে কথকের মূল্যায়ণ একে ব্যঙ্গ করেই- “শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসা, প্রোমোটারি ইত্যাদি বিভিন্ন মহলের কৃতী দিকপালদের পরামর্শের সঙ্গে অভ্রান্ত

বিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটিয়ে এঁরা [সিপিআইএম] বাঙালির সামনে যে মডেলটি রাখলেন, তার নাম ‘বাঁদর থেকে সি.পি.এম’” (ভট্টাচার্য ২০১০, ২৭৯) এই অংশে খেয়াল করার বিষয়, কথক ‘সিপিএম’ বলছে, যা প্রচলিত উচ্চারণ। শিক্ষ, সাহিত্যের সঙ্গেই ব্যবসা ও প্রোমোটোরিকে জুড়ে দিচ্ছে সিপিআইএমের আর্থ-সাংস্কৃতিক গুণাবলীতে, কিন্তু উহ্য থাকছে ‘মতাদর্শের রাজনীতি’। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি ও বনবিহারী (২০০২)’ উপন্যাসে এই অনুশাসনের প্রতিরূপ তুলে আনা হয়েছে। তেমনই ‘মসোলিয়াম (২০০৬)’ উপন্যাসে আরও স্পষ্ট আক্রমণ শাণিত হয় এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে- “হুঁ বাবা, এর নাম সিপিএম। যার পোঁদে লাগবে, তাকে ছাঁচাপোড়া করে মারবে। সারাক্ষণ লোক লাগিয়ে রেখেচে... সিপিএম বলে কতা!” (ভট্টাচার্য ২০১০,) প্রতিস্পর্ধায় কি ফ্যাতাডুদের এমন কালোজাদুবাস্তবের অবতারণা? পার্টি-অনুশাসনকে পদে পদে ব্যঙ্গ করছেন নবারুণ। তাই আলিমুদ্দিনের সদর দফতরে কমরেড আচার্যকে প্রত্যাহ্বান জানাতে হাজির হয় স্তালিন। এর একটা কারণ সিপিআইএম স্তালিনপন্থী তাই স্বয়ং স্তালিনকেই উদয় হতে হয় আচার্যর অভিভাবকরূপে। দ্বিতীয় কারণ স্তালিনপন্থাকে প্রশ্নহীন আনুগত্যের একমেবাদ্বিতীয়ম শাসনপন্থা হিসেবে ব্যবহার করে বলেই আচার্যর ‘বামপন্থা’-র ঠিক-ভুল বুঝিয়ে দিতে স্তালিন উদয় হয় ও নিজের শাসনপদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক উদাহরণ টানে। দেয়ালের ফটো থেকে নেমে এসে স্তালিন কমরেড আচার্যকে মুখঝামটা দেয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা ধরিয়ে দিতে- “করিস তো শালা ভোট। আর কিছু করতে পারবি বলেও মনে হয় না... গণতন্ত্র! হাতি ঘোড়া তল পেল না, কালকা যোগী উনি এসেছেন গণতন্ত্র মারাতে!”¹⁵⁸ স্তালিন নিজের মুখে ‘প্রতিবিপ্লবী’-দের হত্যা করার তালিকাসহ পদ্ধতি কমরেড আচার্যকে বলছে- এটা সম্পূর্ণতই উপন্যাসের সত্য। কিন্তু, বাস্তবে স্তালিনবিরোধী কমিউনিস্টরা এই রাজনৈতিক ‘সত্য’গুলিই প্রচার করে। স্তালিনকে দিয়ে লেখক যখন হত্যার বয়ানগুলি রাখে, “অতগুলোকে মারলুম, নামের লিস্ট আসত। নামের পাশে লিখতাম- নীল পেন্সিলে ‘For Execution, J.St...’ আমার আরো নির্মম হওয়া উচিত ছিল। আরো। আরো।” (২৬১) তখন স্তালিন-জমানার প্রচলিত প্রতর্কগুলি প্রত্যাহ্বায়িত হয়। লেখক বা কথকের জবানে এই বয়ান থাকলে, তা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে

পারত, তাই স্বয়ং স্তালিন এসে নিজের কীর্তিগুলি গর্বের সঙ্গে বলে। আখ্যানস্থ সত্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতেই এই ‘অসম্ভব সম্ভাব্যতা’-র কৌশল নেন লেখক। সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন বা সিপিআই (মাওবাদী) প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টিই স্তালিন-জমানাকে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ধাপ মনে করে। স্তালিনের নিজের বয়ানে গণতন্ত্রের বিরোধিতা ও ‘প্রতিবিপ্লবী’দের হত্যার বিবরণ কি স্তালিন-জমানার ‘গৌরবগাথা’কে নাকচ করে না?¹⁵⁹ এই উপন্যাসপাঠে লেখক নবাবুকে স্তালিনবিরোধী মনে হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে এই একই লেখক প্রোটোগনিস্ট রণজয়ের বয়ানে স্তালিনের নামে প্রশংসা-মিথ ছড়িয়ে রাখে। রণজয়ের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় এবং আখ্যানজুড়ে তার মতাদর্শ একটা স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু, ফ্যাতাডুদের রাজনীতিগত বিশুদ্ধি (political correctness)-র দায় নেই, তাদের নির্দিষ্ট কোনও মতাদর্শও নেই- ফলে ‘কাঙাল মালসাট’ আখ্যানে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শের প্রতি অনায়াসে খিল্লি ওড়ানোর পরিসর গড়ে ওঠে। সেই খিল্লির উদ্যাপনে দেশবিদেশের রাজনীতিও ঢুকে আসে। নবাবু সোভিয়েতের পতনে রাজনৈতিক দুঃখকাতর ছিলেন, রণজয়ের বয়ানে স্তালিনসম্পর্কিত মিথ উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু গুলাগের সন্ত্রাস মেনে নেন নি। নবাবু স্তালিন-জমানার আরও একটি বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ছিলেন- লেখকদের স্বাধীনতা হরণের ইতিহাস। যা কিছু সাহিত্য পার্টির অনুমোদন পাবে না, তাকেই চেপে দেওয়া বা জনমনে ভুলিয়ে দেওয়ার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সোভিয়েতের স্তালিন-জমানায় জারি ছিল। নবাবুগের প্রবন্ধে লেখকদের হত্যার বিরোধিতা আছে, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে মাদেনলস্তাম, বাবেল, পিলনিয়াকদের হত্যা করে স্তালিন-জমানা নিরাপদ হতে চেয়েছিল, এ ক্ষোভ নবাবুগের ছিল।¹⁶⁰ গুলাগ, পল পট চক্র, কাতিন অরণ্যের গণহত্যার সঙ্গে নবাবুগ তাঁর নিজের স্থানান্ত্রে ঘটে যাওয়া নন্দীগ্রাম গণহত্যা, সিপিআইএমের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের ‘জমিতে কঙ্কালের চাষ’-কে মিলিয়ে দেখেন¹⁶¹; তাঁর অভিমতে এই ইতিহাসকে অস্বীকার ক’রে এগোনো যায় না।¹⁶² পুরন্দর ভাট নিজেকে হাফ-নকশাল বলে দাবি করে। তার ছড়ায় সিপিএম ও তৃণমূল দুই সংসদীয় দল উদ্দিষ্ট। বিজেপির দেশপ্রেমের ভড়ং

নিয়ে পদ্য বলে পুরন্দর, যেখানে কারগিল যুদ্ধে বাজপেয়ীর ভূমিকাকে ব্যঙ্গ করা হয়। পুরন্দরের কাব্যান্তে ‘জয় গঙ্গা, জয় রাম’ থাকায় ডিএস বিরক্ত হয় ‘একটা বিজেপি লাইন চলে আসছে’ (২৩৯) বলে। ‘কাঙাল মালসাট’ যে সময়ে প্রকাশ হচ্ছে তখন কেন্দ্রে বিজেপিকেন্দ্রিক এনডিএ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির একমাত্র সাংসদ তপন শিকদার। বিজেপির মতাদর্শগত লক্ষ্য নিয়েও তাই কথক ব্যঙ্গ করে, “অপর এক সদাহাস্য শিকদারের কর্মসূচি খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর- ‘মানুষ থেকে হনুমান’।” (২৭৯) সামগ্রিকভাবে সংসদীয় রাজনীতির সিরিয়াস কর্মকাণ্ডের প্রতি খিল্লি ওড়ানো অব্যাহত রাখে ফ্যাতাডুরা- ভোটবাক্স ও জনগণের প্রত্যাশাকে জবাই করে ক্ষমতা-দখলের সার্কাস উপলব্ধি করেই ‘তাকিয়াচালান’-র মতো শব্দকে রাজনৈতিক অভিধানে ঢুকিয়ে নেয় তারা। ভাল ফরাসে ভালতাকিয়া নিয়ে না বসলে রাজনৈতিক নেতাদের পিঠ থেকে তাকিয়া সরে গিয়ে ‘হ্যাটা’ হয়ে যাবে¹⁶³- সংসদীয় রাজনৈতিক নেতাদের নীতিহীনতার কথা বলে। ফ্যাতাডু ও চোক্তারদের রাজনৈতিক মতাদর্শের দায়ভার না থাকলেও, একটিই দায়বদ্ধতা থাকে- “গরিবের গাঁড় যারা মারে/ ফ্যাতাডুরা হাগে তার ঘাড়ে”; অর্থাৎ বড়লোকদের প্রতি, এলিটদের প্রতি এবং ক্ষমতাসীনদের প্রতি নৈরাজ্যবাদী ক্ষোভ। ‘গরিবের গাঁড়’ যেহেতু সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলই ‘মারে’, তাই তারা সকলেই ফ্যাতাডু+চোক্তারদের শত্রু। যাঁরা সমাজে অকিঞ্চিৎকর, ব্রাত্য অথচ সমাজ যাঁদের জন্যে কোনো সংস্থান করতে না-পেরে প্রান্তিক ক’রে দিয়েছে, তাঁদের সকলের দীর্ঘশ্বাসকে পুঞ্জিত ক’রে ফ্যাতাডুসম্প্রদায় ও চোক্তারবাহিনী গড়ে ওঠে।¹⁶⁴ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মিটিং-এ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনার পরে দাঁড়কাক চেয়ারম্যানকে সামরিক তত্ত্ব ও যুদ্ধাস্ত্রকৌশল নিয়ে জ্ঞান দিয়ে চমকে দেয়। আর, তার উদ্দেশ্য খোলসা করে- “কোনো টপবাজকে আমরা রেয়াৎ করব না। কম করে ৫০ হাজার ছোট বড় কারখানা হয় বন্ধ নয় হাঁপের টানে ধুকছে। সেদিকে কারো খেয়াল নেই, বাঁড়া, ডাউনস্ট্রিম মারাচ্ছে” (২৭৭) বিশ্বায়নী মডেলের ফাটকা পুঁজির বাড়বাড়ন্তে উপস্থিত কলকারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে সরকারি উদ্যোগকে আক্রমণ শানায় দাঁড়কাক। কংগ্রেস হোক বা বিজেপি বা বামফ্রন্ট বা তৃণমূল- গোলকায়িত পণ্যমুখী

সমাজে আর্থ-সামাজিক নিম্নবর্গ ক্রমশঃ প্রান্তিকায়িত হবে, উচ্ছেদ হয়ে যাবে। যে দলই শাসনক্ষমতায় থাকুক, শাসকশ্রেণির মতাদর্শ মতোই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে, যেখানে “ঝিৎচ্যাক বাদে কিছু থাকবে না” (৩৫৭) এই সত্য সম্পর্কে দাঁড়কাক ফ্যাতাডুদের অবগত ক’রে দেয়। পাঠকও অবগত হয়।

(৬) ‘শুভবিবাহে ফ্যাতাডু’ গল্পে মদন ও ডিএস যায় হরিরাম আগরওয়ালার ছেলের বিয়ে ভণ্ডুল করতে। হরিরাম আগরওয়ালা সাহিত্য কিংবা রাজনীতির প্রতিষ্ঠান নয় এমনকি আধিপত্যমূলক উচ্চবর্গ সংস্কৃতির প্রতিভূ নয়- হরিরাম কলকাতার অন্যতম বৃহৎ অলঙ্কারব্যবসায়ী। হরিরাম আর্থিক ক্ষমতার জোরে পুত্রবধূকে মেরে সেই কেস ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছিল। ফ্যাতাডুরা “ঐ বাঞ্ছিত আজ সেই ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে” (৪৯) বলে হরিরামের ছেলের জাঁকজমকপূর্ণ দ্বিতীয় বিয়ে পণ্ড করতে যায়- এতে ফ্যাতাডুদের নৈরাজ্যবাদী কাজকর্মের যে ধাঁচ (pattern) অনুধাবন করা যায়- (ক) তারা বড়লোকের যে কোনও দেখনদারি জাঁকজমকের বিরোধী (খ) হরিরামের প্রথম পুত্রবধূ পণপ্রথার বলি হয়েছিল বলে ফ্যাতাডুরা সামাজিক ন্যায়বিচার করতে চায় (গ) বিয়ে পণ্ড করার পদ্ধতিকে ভূতের উপদ্রব (মৃত বৌয়ের আত্মা ফিরে এসেছে এমনত পরিকল্পনা সাজায়) বলে প্রতিপন্ন করে (ঘ) যে অস্ত্র দিয়ে (থ্যাংলানো পচা শামুক, সিঁদুর মাখানো মুরগির হাড়, গেরো দেওয়া লাল সুতো) তারা এই বিয়ে ভণ্ডুল করে, সেই অস্ত্রেরই বিভিন্ন রকমফের অন্যান্য গল্পেও ব্যবহার করে তারা।

নবাবুগ যখন ফ্যাতাডুর প্রতিটি বচনে ও তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্তের না-পারা ইচ্ছেগুলোর উন্মুখ উড়ান দেখাতে চান, তখন মনে মনে ফ্যাতাডুদের মত সেই কাজগুলি করতে চেয়েও দ্বিধাপথে আটকে থাকা পাঠকেরা ‘মুক্তি’-র হৃদিশ পান। আর, ‘ফ্যাং ফ্যাং সাঁই সাঁই’ দমবন্ধ ভদ্রলোকবৃত্তে আটকে থাকা দ্রোহস্বপ্ন দেখতে চাওয়া পাঠকের অব্যক্ত মন্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু, চিরাচরিত সমাজনির্মিত সুষ্ঠু ‘সাহিত্যবোধ’ মেনে নিতে পারেনা সেই ভাষা, সেই কর্মকাণ্ড! বড়লোকের গাড়ি দেখলেই টায়ার ফুটো করে দেওয়ার ইচ্ছে, দামি অফিসে গিয়ে

হতাশা লুকোতে গদিতে নাক খুঁটে আসা, শূন্যগর্ভ সাহিত্যবাসর দেখে সুপ্ত শ্লেষেচ্ছা জেগে ওঠা কিংবা জ্ঞানীশূন্যসমাবেশে ভণ্ডলোকেদের ‘সংস্কৃতিবান সাধু’ হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে সঘোষ আওয়াজ তোলা- এগুলির বিপরীতে থাকে ‘সুপারইগো’ দ্বারা পরিশীলিত থাকা, ‘সভ্য’ থাকা; মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বৌদ্ধিক স্তরে এমন বৈপরীত্য চলতে থাকে। কিন্তু, সে শেষপর্যন্ত নীরব দর্শকের মতই মেনে নেয়; আর, নবাবুর্গ তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের নির্মাণ করেন এগুলোরই প্রতিবাদে। তাদের ‘কাঁচা’ভাষা বিনোদন-সাহিত্যের পাঠকের কাছে শুধুমাত্র ‘খিস্তির সম্ভার’ হলেও, শিল্পবাস্তবতা-সচেতন পাঠকের কাছে বহুস্তরীয় এবং বাস্তবনিষ্ঠ। কুশীলবরা উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের ‘আমি কলকাতার তলায় থাকি’ বলা মেথরের মতোই বেশ খানিকটা ময়লা ছুঁড়ে দেয় ওপরের তলার মানুষদের দিকে। এই ময়লাগুলো সমাজশোষণের উদ্ভূত ও বৈষম্য থেকে ছিটকে আসা ঘৃণা।¹⁶⁵ দমিত, অবাস্তব মানুসদের অসহায় প্রতিরোধ। আর, নবাবুর্গ গভীর পর্যবেক্ষণে এঁদের রাজনৈতিক অশুদ্ধি (political incorrectness), এঁদের অ-সংস্কৃত হুল্লোড় এবং এঁদের অ-শুদ্ধ ভাষা দিয়েই সাংস্কৃতিক হাতিয়ার (cultural weapon) প্রস্তুত করেন। শুধু ফ্যাভাডু নয়, কাল্মন-মোগলাই, ফোয়ারা, পাঁচুগোপাল এবং নাম জানা বা না-জানা আরো অনেকের যাপনপ্রয়াস, সংস্কৃতি-বিরোধিতা জারি থাকে। শাসক-মতাদর্শ এদের শাসনখোপে আঁটতে না পেরে লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত তকমা দেয়, কখনো বা অশিক্ষিত ছোটলোক বলে দাগিয়ে দিয়ে অ-গুরুত্বপূর্ণ অবজ্ঞাযোগ্যের দলে ঠেলে দেয়। কিন্তু, নবাবুর্গ নিশ্চিত, “লুম্পেন প্রোলেতারিয়েতের মেজাজ না জানলে প্রোলেতারিয়েতের কবি হওয়া যায় না।” (ভট্টাচার্য ২০১৫, ১০০) নিজের দেশের প্রকৃত জটিল চেহারা জানার জন্যেই এঁদেরকে জানা এবং এঁদের বোধকে ছোঁয়া প্রয়োজন। রমাপ্রসাদ নাগ লিখছেন,

সমাজের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একদল মানুষ মিলে মিশে ফ্যাভাডু সম্প্রদায়ের জন্ম।

তাদের ওপর কোনো প্ল্যানেটের ইনফ্লুয়েন্স নেই। ‘তেঢ়ামনা’ এই মানুষেরা আসলে

হোপলেস কেস, লাথখোর ছেলেদের নিয়ে তৈরি। বৈচিত্র্য ও অনিশ্চয়তায় ভরা

ফ্যাঁত ফ্যাঁত সাঁই সাঁই উচ্চারণসহ তাদের আকাশপথে গমন (নাগ ২০০৮, ৭৫)

ফ্যাতাডুরা যে কোনওভাবেই সামাজিক উচ্চবর্গের অন্তর্গত নয়, তা বোঝাতে ফ্যাতাডুদের চেহারার বিবরণ দেয় কথক। মদন সিড়িঙ্গে, বাবরি চুলো এবং নোংরা পাঞ্জাবির পকেটে ফলস্ দাঁত নিয়ে ঘোরে। পুরন্দর ভাট খ্যাঁচামারা তিরিক্ষে মুখাবয়বের কবি এবং চিরাচরিত ‘কবি’ ইমেজের লেশমাত্রও তার চেহারায় নেই।¹⁶⁶ পুরন্দর যে আগে পুরো নকশাল ছিল, এখন হাফ-নকশাল, তা পুরন্দরের মুখ দিয়েই অনেকবার বলিয়ে নেয় লেখক। ডিএস ফ্যাতাডুত্রয়ীর মধ্যে সবচেয়ে বাচাল, আদরসাত্ত্বক, ভিতু, অশিক্ষিত-অসংস্কৃত এবং বাওয়ালবাজ। ডিএসকে হাতেকলমে ফ্যাতাডুমস্ত্রে দীক্ষা দেওয়া দিয়েই বাংলা সাহিত্যে ফ্যাতাডুর প্রথম আখ্যান শুরু হয়েছিল। “ডি এস। কালো। কুৎকুতে কোলা ব্যাঙ। টেরিলিনের শার্ট পরা। দুই বোতামের ফাঁক দিয়ে মহাপ্রভুর ছবি বসানো লকেট বেরিয়ে... অ্যাটাচি কেসের মধ্যে নোংরা চিরুনি যাতে অনেক লোকের মাথার ময়লা গোড়ায় ফসিল হয়ে আছে।”¹⁶⁷ নবাবুর্গকে বিভিন্ন গল্পে বারবার ফ্যাতাডুদের পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করাতে হচ্ছে। তাতে কিছু বর্ণনা ও বিবরণ পাল্টে যাচ্ছে কিংবা নবীকরণ হচ্ছে। কিন্তু, কেন নবাবুর্গ মাঝেমাঝেই পাঠকের সামনে ফ্যাতাডুদের বিবরণ আনছেন? একটা কারণ হচ্ছে যে, ফ্যাতাডুদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি ১৯৯৫-২০১২ সময়পর্বে লেখা হয়েছে, পাঠক যাতে পাঠ-অনভ্যাসে ভুলে না যান সেইজন্যে এমন করছেন নবাবুর্গ। “এই পাবলিক জানবে হাড়ামির হাড়, না-জানান দিলেই ভুলে যাবে” (ভট্টাচার্য ৩০) আরেকটা কারণ হতে পারে যে, লেখকের সংশয় থাকছে এই চরিত্রগুলিকে পাঠক গুরুত্ব দেবে কিনা, তাই বারবার তাদের অসংস্কৃত, নিম্নবর্ণীয় ও নৈরাজ্যপ্রবণ চরিত্রবর্ণন করতে হচ্ছে। আখ্যানের কথক পাঠকের স্মৃতিকক্ষে ঝাঁকি দিয়ে ফ্যাতাডুদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বারবার, যাতে বাংলা সাহিত্যের ভদ্ররুচি-মধ্যবিত্ত-শোভন প্রটাগনিস্টদের থেকে ফ্যাতাডুদের স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরন্দর ভাটকে দু’বার ইন্ট্রোডিউস করেন নবাবুর্গ ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী (অ্যাকোয়া)-তে ফ্যাতাডু’ এবং

‘কবি সম্মেলনে ফ্যাতাডু’ এই দু’টি গল্পে। তিন ফ্যাতাডুর মধ্যে ডিএসের ঘরের বর্ণনাই শুধু পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি গল্পে। সে ঘর বাঙালি ‘ভদ্রলোকের’ ঘরের থেকে আলাদা, তাতে রুচির ছাপ নেই, সংস্কৃতির ছাপ নেই এবং আর্থিক স্বচ্ছন্দ্যের ছাপ তো নেইই। এঁদো গলিঘুঁজির নোংরা টপকে একতলা ধচাপচা গাছের শিকড়-গজানো বাড়িতে ডিএস পরিবারসমেত থাকে। “দরজায় কড়া নেই। একটা শেকল আছে। ভেতরে খিল নেই। রাতে ডিএস দরজার গায়ে তিনপেয়ে টুল ঠেকিয়ে তার ওপরে টিনের কৌটো, হাঁড়ি, থালা সাজিয়ে রাখে” (৩৪-৫) তিন ফ্যাতাডু যেসব স্থানে বৈঠক করে, তা ভদ্রবৃত্তের বৈঠকস্থল থেকে আলাদা। এরফান বা মণ্ডলের বাংলার ঠেক, পাবলিক ইউরিনালের পাশে, ‘এঁদো মুতখানাসহ খালি পার্ক’ ইত্যাদি। ফ্যাতাডুদের আরেক বৈঠকস্থল ডিএসের ঘর। ডিএসই তিন ফ্যাতাডুদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিত।¹⁶⁸

‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’ গল্পে ডিএসের বৌ ও শালাকে ফ্যাতাডু হওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দেয় মদন ও ডিএস এবং বলে, “ফ্যাতাডুগিরি কারো বাপের সম্পত্তি নয়।” (৩৩) উচ্চবর্গ ও ভদ্রবৃত্তের লোকেরা অধিকারবোধ ভালবাসে। যা কিছু তার অর্জিত, তার ওপরে স্বত্ত্বাধিকার চায়। ফ্যাতাডুরা অর্জিত জ্ঞান অমন কুক্ষিগত ক’রে রাখায় বিশ্বাসী না। তাই মদন ওই কথা বলে। আর, ডিএসকে অত্যধিক বাচালতার জন্যে ‘ফ্যাতাডুদের লিস্ট থেকে নাম কেটে দেব’ বললেও, তা যে সত্যিই হবে না, সেটা পাঠক ও কুশীলবেরা সকলেই জানে। উচ্চবর্গীয় স্বীয়বৃত্তে শিক্ষা-সংস্কৃতি কুক্ষিগত ক’রে রাখার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ফ্যাতাডুদের অন্তর্ঘাতী পরিকল্পনা ‘বসন্ত উৎসবে ফ্যাতাডু’ গল্পে। মদন-ডিএস-পুরন্দর তেলেপাড়া বস্তির ‘রুস্তম আর ক্যাওড়া’দের ক্ষেপিয়ে তোলে উচ্চবর্গের কুক্ষিগত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। “ওরা হল বড়লোক। নিজেরা গান শুনবে, আমরা শুনতে চাইলে- গাঁড়ে কিক” (৪২) মদন অভিজিৎ ও কুমার শানু গানের অনুষ্ঠান হবে বলে তেলেপাড়া বস্তিকে উত্তেজিত ক’রে তোলে। কারণ, শানু ও অভিজিৎের হিন্দি গান সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে জনপ্রিয় কিন্তু উচ্চবর্গীয় অর্থবানেরা তাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাবলে এদের গানের অনুষ্ঠান আয়োজন ক’রে সামনাসামনি শুনতে পারে; অথচ সে অনুষ্ঠানে নিম্নবর্গীয় এবং

না-ভদ্রলোকদের কোনও অধিকার থাকে না।¹⁶⁹ পুরন্দর ভাটের কবিতা প্রত্যাখ্যান করার পেছনেও ছিল উচ্চবর্গের কুক্ষিগত সংস্কৃতিজ যুক্তি। কবি-সম্মেলনে এবং রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পুরন্দরের কবিতা নাকচ করেছিল যারা, তারা সংস্কৃতিজগতের স্বঘোষিত কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রক। সংস্কৃতিকে কুক্ষিগত ক'রে রাখে তারা এবং সংস্কৃতিচর্চাকে সামাজিক অবস্থানের (Social Status) মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে সামাজিক উচ্চাবস্থানের দ্যোতক, কিন্তু জীবনানন্দকে তারা চেনে না।¹⁷⁰ পিয়ের বোর্দ্যু সাংস্কৃতিক পুঁজির (Cultural Capital) অবতারণা করছেন। তিনরকম সাংস্কৃতিক পুঁজির কথা বলছেন- গুণবাচক (Embodied), বস্তুগত (Objectified) এবং প্রতিষ্ঠানগত (institutionalized)।¹⁷¹ ফ্যাতাডুরা বাংলা ও চোলাই খায় এবং অবরেশবরে রাম কিনে খায়। অন্যদিকে নবনী ধরের বস্তুগত (objectified) সাংস্কৃতিক পুঁজি রয়েছে বোঝা যায় যখন ফ্যাতাডুরা তার সঙ্গে স্কচ খাওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করে। স্কচ সাধারণতঃ উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের রুচি-স্বাদের পরিচায়ক। 'ফ্যাতাডু (১৯৯৫)' গল্পে প্রথম যখন ফ্যাতাডুদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাচ্ছে কথক, তখনই উচ্চবর্গের সঙ্গে চরম বৈপরীত্যগুলি বর্ণনা ক'রে দেওয়া হয়। মদন ডিএসের সঙ্গে সমগ্র ফ্যাতাডুবাহিনীর পরিচয় করিয়ে দেয়- হাওড়ার সব 'মাল' যারা এঁদো গলিঘুঁজি বস্তিতে থাকে, খিদিরপুর কাঁটাপুকুরের 'বিটক্যাওড়া' লোকজন, উত্তর কলকাতার চিটিংবাজ, সোনাগাছি গরানহাটার 'মাগের পাল' এবং তেলবাদ্যরত হিজড়ে ফ্যাতাডু।¹⁷² এরা যে কেউ সামাজিক উচ্চবর্গ ও ভদ্রলোক নয়, তা এদের আচরণ ও সাজপোশাকের বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে দেন নবাবু। আর, সহ-ফ্যাতাডু হওয়ার মাপকাঠিগুলি স্পষ্ট হয়ে যায়। জাঁ বর্দ্রিয়ায়ের মতে, উত্তর-আধুনিক সমাজে শ্রেণিবিভাগ আর শুধুমাত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকছে না, বরং তা এখন নির্ভর করছে ভোগের ওপর। কে কোন পণ্য ভোগ করছে, তার 'ব্র্যাণ্ড' এবং দামের ওপর নির্ভর করছে তার শ্রেণিঅবস্থান। শ্রমিক সত্তা থেকে ভোক্তাসত্তায় (consumer identity) বদল ঘটে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক দলগত সম্পর্কে (কে কোন পণ্যের ভোক্তা তা দিয়ে নির্ধারিত দল)

বদলে যাচ্ছে, ভোগ্যপণ্যানুবর্তীতার মধ্যেই সব তৃপ্তি- একজন ‘ভদ্রলোক’ মধ্যবিত্ত কিংবা একজন শ্রমজীবীও বদলে যাচ্ছে ভোক্তাশক্তিতে (consumer force)।¹⁷³ ফ্যাটাডুরা এই ভোগ্যসত্তাদ্বারা নির্ধারিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ঘটায়। যারা ফ্যাটাডু বর্গভুক্ত, তাদের ভোক্তাশক্তি প্রাণ্ডিকায়িত। ভোক্তাসত্তা অনুযায়ী তারা ‘দীনের থেকেও দীন’ এবং উচ্চবর্গদ্বারা ব্যবহৃত ব্র্যান্ডফেটিশের ধারাকাছেও পৌঁছতে পারে না তারা। তাদের ভাষা ব্র্যান্ডেড নয়, তাদের মদ ব্র্যান্ডেড নয়, তাদের পোশাক-রুচি সবচেয়ে কমদামি। তারা যে দলে বাস করে, সেই দলকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক মধ্যবিত্তরা অপছন্দ করে। দাঁড়কাক যখন ‘ঝিংচ্যাক ছাড়া কিছু থাকবে না’ বলে সরকারকর্তৃক গরিব প্রান্তিকদের উচ্ছেদের প্রশাসনিক যুক্তি ব্যাখ্যা করে, তখন শ্রেণিগত বৈষম্যের থেকেও সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্যের ছবি স্পষ্ট হয়। ফ্যাটাডু চোক্তারদের পাঠরুচি কিংবা পেশাও বর্দ্ধিয়ার কথিত ভোগ্যপণ্যানুবর্তী সমাজের সবথেকে নিচে অবস্থান করে। আর, ফ্যাটাডু+চোক্তার+দাঁড়কাক+বজরা ঘোষ+সরখেল এমন উত্তরাধুনিক সমাজকাঠামোয় মূর্ত অন্তর্ঘাত রূপে হাজির হয়ে স্থিতাবস্থাকে টলিয়ে দেয়।

(৭) ‘মসোলিয়াম’ উপন্যাসে বনবেড়াল উপস্থিত হয়, যে দাঁড়কাকের ‘ওল্ড ফ্রেন্ড’। ফ্যাটাডু এবং চোক্তারদের মিলিত হুজুতে সহায়তা করার জন্যেই বনবেড়াল কলকাতায় আসে। ‘বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২)’ ও দাঁড়কাককে বারবার আসতে হয় একুশ শতকের শুরুতে চোক্তার ও ফ্যাটাডুদের গাইড করতে, উজ্জীবিত করতে এবং নীতিকৌশল ঠিক ক’রে দিতে। নবারণ যে কলকাতার ক্রমস্থানে পাঠকদের নিয়ে যান, সেখানে জোব চার্নক ‘আদিপিতা’ নয়; সেখানে বেগম জনসন আদিনায়িকা বা আদিমাতা! চার্নক সেখানে গুরুত্বহীন। বেগম জনসনের সঙ্গে ইতিহাসের ও বাঙালি সংস্কৃতির যোগ কলকাতার নগরায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দণ্ডবায়সের মতো বেগম জনসন কল্পনায় বানিয়ে তোলা চরিত্র নয়, জোব চার্নকের সমাধির পাশেই তাঁর সমাধি। আঠারো শতকের কলকাতার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সাক্ষী তিনি। সিরাজদৌল্লার কারাগার থেকে অন্দরমহলের বেগমদের ভালবাসা অর্জন করা, মিসেস ওয়াটস থেকে রেভারেন্ড জনসনের স্ত্রী

হওয়া এবং শেষ বয়েসে কলকাতাকে ভালবেসে এদেশে থেকে যাওয়া- জোব চার্নকের থেকে তাঁর নাড়ির টান কলকাতার সঙ্গে অনেক বেশি। বেগম জনসনের ফেয়ারলি প্লেসের বাড়ি তথা ‘হাওয়া-খানা’ স্বপ্নে দেখেছিল বড়িলাল এবং জাগন্ত অবস্থায় দেখেছিল ফ্যাতাডুরা- সেই মজলিশ আর অভিজাত-ইংরেজ সংসর্গের অলৌকিক দৃশ্য শ্রীপাস্থর লেখাতেও উল্লিখিত। “ঘোড়া, পালকি, জুড়ি, কাচ-হাসি-গড়গড়ায় ফেয়ারলি প্লেস তখন সন্ধ্যার পরে অলৌকিক। বেগমের অফুরন্ত আকর্ষণ, অটেল পয়সা, অভাবিত অভিজ্ঞতা” (শ্রীপাস্থ ২০১৪, ৭৬)¹⁷⁴ বেগম জনসনকে উপন্যাসের সত্যে রূপান্তরিত ক’রে চোক্তার-ফ্যাতাডুদের উৎসাহ দেওয়ানো কথকের পরম উদ্দেশ্য। তাই উপন্যাসে জীবন্ত-প্রেত বেগম ‘স্লেভ গার্লের পিঠে আপনমনে ঘামাচি মারতে’ পারেন- তাতে সময়ের ছবি আরও জীবন্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ম্যাচিউরিটি নেই, তারা আহাম্মক এবং ‘পশ্চাতে ধাবমান শূল দেখিয়াও তাহারা রেকটাম সরাইয়া নেয় না’ সংলাপের দ্বারা বেগমের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় থাকে।¹⁷⁵ বেগম জনসনের মৃত্যুর বছরেই তাঁর নাতি আর্ল অব লিভারপুল ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন।¹⁷⁶ এহেন বর্ণময় চরিত্রকে আখ্যানের অনুঘটক ক’রে ‘জীবন্ত’ ক’রে তোলে লেখক- চার্নক ও তার বশংবদদের ছড়ানো ইতিহাসের প্রত্যাহ্বানে বেগমই লেখকের তুরূপের তাস; প্রবল প্রতাপাশ্বিত দাঁড়কাকও যাকে মান্য করে। যাঁর সমাধিফলকে লেখা “The oldest British resident in Bengal/ Universally beloved respected and revered”¹⁷⁷ সেই বেগমের দোসর শহরের সুপ্রাচীন দাঁড়কাক। “দণ্ডকাক যে সাঁ ক’রে পুরাণ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল, সে কথা তো বলতেই হবে। এর আর এক নাম যমকাক। বা, কাকরূপী যম।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৮, ৪৩) অতীতের বিস্মৃত বই থেকে ‘কোট আনকোট’ করে দাঁড়কাক, আবার ‘নাইট ভিশন’ দিয়ে ভবিষ্যতের কোনও সূত্রও দিয়ে যায়। আখ্যানের গড়ন-গঠনেও অতীত থেকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অনায়াস যাতায়াত জারি থাকে। ফ্যাতাডু+চোক্তাররা নাগরিক সমাজ, উচ্চবর্গীয় সমাজ, বুদ্ধিজীবী সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুকেই মানে না; আর, দাঁড়কাক তাদের নেতা। এই নেতার সঙ্গে

কলকাতার রকের আড্ডার বাতেলাবাজ, বহুজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষটির ছাপ পাওয়া যায়? যাদের ভাষা, যাদের প্রচলিত জ্ঞানকাণ্ডকে প্রত্যাহ্বান জানানোর স্পর্ধা এবং যাদের যে কোনো আলোচনার মাঝে ঢুকে অবলীলায় মতামত দেওয়ার সাবলীলতা ‘কাঙাল মালসাট’-এর দাঁড়কাকের সঙ্গে মিলে যায়। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ অনুধাবন করেছেন যে, লিখিত ও মৌখিক ছোট ছোট ট্র্যাডিশনকে পুঁজি হিসেবে লগ্নি করা হয়েছে কাঙাল মালসাট কোম্পানি; যে কোম্পানিটি লোক্যালও না গ্লোবালও না বরং ‘দুনিয়ার ছোটলোকের মারহাব্বা আখ্যান’।¹⁷⁸ রোলাঁ বার্থ যাকে আদর্শ পাঠ্য (ideal text) বলছেন, তার সঙ্গে হাইপারটেক্সটের ধারণার বেশ কিছু সাযুজ্য রয়েছে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা একরৈখিক হবে না। যে কোনও পরম্পরায় আখ্যানস্থ ঘটনা বিভিন্ন শাখায় সংযোগে আখ্যানে ছড়িয়ে থাকে। লেখক অর্থ-পরম্পরা বা পাঠের অর্থোদ্ধারের সংকেত পাঠকের ওপরে চাপিয়ে দেন না, পাঠকের স্বাধীনতা থাকে বহুার্থ খুঁজে পাবার। পাঠাভ্যন্তরে বাস্তব ও সাজানো ঘটনার মধ্যে সীমারেখা মুছে যেতে থাকে উপস্থাপনার আঙ্গিকে-

the networks are many and interact, without any one of them being able to surpass the rest; this text is a galaxy of signifiers, not a structure of signifieds; it has no beginning; it is reversible; we gain access to it by several entrances, none of which can be authoritatively declared to be the main one; the codes it mobilizes extend as far as the eye can reach, they are indeterminable (Barthes 2002, 5-6)

আদর্শ পাঠ্যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে, অর্থাৎ পাঠকও ঢুকে পড়তে থাকে লিখনপ্রক্রিয়ার অর্থোদ্ধারে। বার্থ লেখকসুলভ পাঠ্য (Writerly Text) ও পাঠকসুলভ পাঠ্যের (Readerly Text) মধ্যে পার্থক্য করছেন। পাঠকসুলভ পাঠ্যে পাঠকের জন্যে অর্থ নির্দিষ্ট ক’রে

দেওয়া থাকে; প্রথাগত উপস্থাপনপদ্ধতি এবং চিহ্নক-চিহ্নিতের প্রথাগত পদ্ধতিতে বহুার্থ প্রক্রিয়াকে একমুখী অর্থোদ্ধারে সীমাবদ্ধ রাখে। লেখকসুলভ পাঠ্যে পাঠক অনেকার্থদ্যোতনা খুঁজতে পারে এবং আখ্যানের প্রচলিত কাঠামো প্রশ্নের মুখে পড়ে। সংস্কৃতিগত ও বিভিন্ন মতাদর্শগত চিহ্নায়কের দ্বারা পাঠকও অনেকার্থের পরত খুলতে খুলতে এগোয়।¹⁷⁹ রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাঁচ, ভাষা ও গড়ন-গঠনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হতে পারে এই পদ্ধতিতে, কারণ পাঠকও পুনর্লিখনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ‘কাঙাল মালসাট’ পাঠের চিরাচরিত পদ্ধতিকে প্রশ্ন ক’রে পাঠকের পাঠভঙ্গির ওপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করে অনেকার্থ খুঁজে পাওয়ার। দাঁড়কাকের অস্তিত্বের তথা রাষ্ট্র-প্রশাসনবিরোধী অন্তর্ঘাতের অনুঘটক হিসেবে কাজ করার অর্থ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে পান পুরাণে- মরুত্তরাজের যজ্ঞে রাবণের ভয়ে ভীত যম দণ্ডবায়সের ছদ্মবেশ ধারণ করে- এই দাঁড়কাকই সে।¹⁸⁰ যমের মতোই দাঁড়কাক ত্রিকালজ্ঞ। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের কাছে তার আবির্ভাব যমের চেয়ে কিছু কম না! বেগম জনসনের বিপুল জ্ঞানের অধিকারী দাঁড়কাককে দোসর মানে বলেই সেক্স-ভিকিলের আসল পরিচয় ফাঁস ক’রে দেয়। সেক্স-ভিকিল ও কিউরেটরের ওপরে চাকতির আক্রমণ হয় বেগম জনসন ও দাঁড়কাকের উৎসাহে। পাঠের অনেকার্থ সন্ধানের সম্ভাবনাময় বাক্য হিসেবে থাকে পুলিশের ম্যাজিক দেখানোর উদাহরণ।¹⁸¹

‘কাঙাল মালসাট’ প্রচ্ছন্ন ও প্রকট তুলনা টানে বারবার- বেশিরভাগ সময়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কালীপুজোর রাতে কলকাতার বর্ণনা দিতে প্রেমাক্ষুর আতর্ষীর লেখার উল্লেখ, ক্যাণ্ডেন হেমেন্ড করের লেখায় থ্রেনেড দিয়ে মাছ ধরার উল্লেখ এবং বোমা-বন্দুক দিয়ে দুঃসাহসী বাঙালির ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ার উদাহরণ মনে করিয়ে দেওয়া হয়। নেহাৎ অতীতচারণ নয়, এর উদ্দেশ্য “সেই বাঙালি আজ ত্রস্ত বেড়ালের মতো, ভীত মার্জারের ন্যায় মাছের বাজারে চক্রর মারে ও ম্যাও ম্যাও ক্রন্দন করে” (২৬৫) এই বাক্যটিকে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসের নয়া অনুসন্ধানী পাঠ দণ্ডবায়সের ভাষ্যে। ঔপনিবেশিক শাসক তো বটেই এমনকি

উপনিবেশোত্তর শাসকও ইতিহাসপাঠের শাসকমনোনীত ধারা বজায় রাখে। ক্রমশঃ বিস্মৃতির পাঠে একটা জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, উত্তরণ, গৌরবোপাদান সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে শাসকের সংস্কৃতি ও ইতিহাসচেতনা আধিপত্য করতে পারে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধিতে সহমত হয়ে লিখেছিলেন- “বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ইতিহাস আছে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাসের পরিবর্তে আমরা কিছু পৌরাণিক রূপকথা মনে রাখিয়াছি।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৩, ৩৭৮) শরদিন্দু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা নিচ্ছেন ইতিহাসানুসন্ধানের পাঠ থেকে। তিনি বাঙালি জাতির একটা ঐতিহ্য (tradition) খুঁজতে চাইছেন সাহিত্যকে হাতিয়ার ক’রে; চারণকবিদের দায়িত্ব বর্তমানের সাহিত্যিকদের ওপরে ন্যস্ত হয়েছে বলেই তাঁর বিশ্বাস।¹⁸² শরদিন্দু বাংলার গৌরবময় ইতিহাস খুঁজতে চেয়েছেন প্রাক-মুসলমান যুগে, সমস্ত বিস্মৃতি সরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথের সাহিত্যতত্ত্ব অনুসরণ করে শরদিন্দু বাঙালির ‘হত’গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। আব্দুল কাফি এই প্রক্রিয়াকে তুলনা করেছেন হবস্‌বমের ‘ইনভেন্টিং ট্র্যাডিশন’-এর সঙ্গে এবং বলেছেন যে, অতীতকে সম্প্রসারিত বর্তমান হিসেবে দেখতে উৎসাহ দেয় শরদিন্দুর আখ্যান।¹⁸³ নবাবরূপ ‘কাঙাল মালসাট’-এ এবং আখতারুজ্জামান ‘খোয়াবনামা’-তে ইতিহাসের অনুসন্ধান করছে; আরও বিশেষভাবে বাঙালির হতগৌরব পুনরানুসন্ধান করছেন। কিন্তু তা হিন্দুদের গৌরবোদ্ধার নয়। হিন্দু উচ্চবর্গের গৌরব পুনরুদ্ধার নয়। আখতারুজ্জামান যে ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করছেন, তাকে সম্প্রসারিত বর্তমান হিসেবে মধ্য-উনিশশোচল্লিশের কালস্থানিকতায় প্রতিষ্ঠিত করছেন; কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের দ্রোহ, গৌরব, প্রত্যাশা ও ইংরেজবিরোধিতা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে, তার অন্তর্গাতী সম্ভাবনা প্রবল। অন্যদিকে নবাবরূপ ফ্যাতাডু, চোক্তারদের মতো লুম্পেন সমাজবহির্ভূতদের আখ্যানের মাঝে উপনিবেশিত বাঙালির বিস্মৃত গৌরব পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। হিন্দুদের ও উচ্চবর্গের গৌরববিস্মৃতি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সাহিত্যকে হাতিয়ার ক’রে বাঙালির

ঔপনিবেশিক-ধুলো ঢাকা ইতিহাসের ধুলো সরাতে চাইছেন নবাবু। বাঙালি পাঠককে ভরসনার চাবুক মেরে তাকে হীনম্মন্যতার বোধ আর ঔপনিবেশিক আদেখলামো থেকে বের ক'রে আনার চেষ্টা। 'বাঙালি ভীরা কোমলস্বভাব যুদ্ধ-অপারগ ও ব্যবসাবুদ্ধিহীন'- এই প্রচলিত ধারণাগুলিকে প্রত্যাশ্রয় জানাতেই সাহিত্যকে হাতিয়ার করেন নবাবু। কথক প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি সূত্র দেয় কোনও বিস্মৃত বাঙালির বিস্মৃত বীরত্বের এবং পরবর্তী অধ্যায়ের শুরুতে সেই সূত্রের নিষ্পত্তি ক'রে পাঠকের স্মৃতিপটে কিছু তথ্য-উদাহরণ পুরে দেয়। টাকলা ওসি-র কানে 'অদৃশ্য ভৌতিক রেডিও'-তে¹⁸⁴ ধারাবিবরণী বাজতে থাকে ব্যায়ামবীর ও লাঠিখেলায় পারদর্শী বাঙালিদের সম্পর্কে। বাঙালি পাঠকও 'কাঙাল মালসাট'-এ রাষ্ট্র বনাম ফ্যাতাডু যুদ্ধ কীভাবে দেখতে আগ্রহী তা নিয়ে টিপ্পনির পরে তেমনই একটি তথ্য জুড়ে দেয় কথক- চন্দননগরে হারান চক্রবর্তী ও গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বল ও সাহসের মিথ্রায় তথ্য।¹⁸⁵ একাদশ অধ্যায়ের শুরুতে কথকের বিলাপ বাঙালি যে কবিদের মনে রাখল না, তাঁদের নিয়ে- বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, গোপাললাল দে, কালিদাস রায়। সপ্তম অধ্যায়ে দাঁড়কাক ঘোষণা করে গর্বিত বংশপরিচয়- তারা যাদুবিহারদ আত্মারাম সরকারের বংশধর। আত্মারামের বংশের নিয়ম কয়েক দশক পর পর চাকতির খেলা, 'মহামণ্ডলের ঘুঘুচক্রর' দেখানো। আত্মারাম সম্পর্কে দাঁড়কাক সুবল মিত্রের বিস্মৃত অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দেয়। আর, আত্মারাম সরকারের বিবরণ 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতাতেও রয়েছে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে ভারতের প্রাচীন ভোজবিদ্যার ঐতিহ্য তিনি সফলভাবে অনুশীলন করতেন।¹⁸⁶ শিকড়ে ফিরে গিয়ে বাংলার উজ্জ্বল হতগৌরব ফিরে না পাওয়ার বেদনা কুরে কুরে খায় তাঁকে, দাসের মত নতজানু হতে পারেননি আধুনিকের কাছে, তাই আত্মখননে নিরন্তর রত থাকেন নবাবু।¹⁸⁷

খেয়াল ক'রে দেখার যে, নবাবুণের প্রতিটি উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা। চোক্তার-ফ্যাতাডুরা কলকাতায় তাদের যাবতীয় হুজুত করে। হারবার্টের আখ্যানে কয়েক শতকের কলকাতা প্রচ্ছন্নভাবে আছে এবং আষি-নব্বইয়ের দশকের কলকাতা। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র রণজয়

উত্তরবঙ্গের অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে আসে এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার বিচরণ। ‘কাঙাল মালসাট’ “এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা”-র কলকাতাকে ভূমিতলের নিচ থেকে ওপরে এবং অবজ্ঞাদৃষ্টি থেকে বহুদূরে থাকা প্রাণীদের দৃষ্টির ভেতরে নিয়ে আসে। যে কলকাতাকে ভেঙে দুমড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে ‘শাইনিং কলকাতা’ বানানো হচ্ছে, সেই কলকাতার ওই দুমড়ানো ভাঙা ছিটকে যাওয়া জীবন্ত উপাদানদের নিয়েই কার্নিভ্যালের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। সিন্থেটিক প্রশাধনীতে ঢাকা কলকাতার নিচের তলায় থাকা ‘আসল কলকাতা’-র বন্ধু পাগল ও চামচিকেরা এবং রং-মাখা মেয়ে, কুকুর, বেড়াল, ছুঁচো, আরশোলা, ভিখারি, পিঁপড়ে ইত্যাদি। কথক এই অংশের পরে যতিচিহ্ন দেয় নি, বরং এই মনুষ্যের ও মনুষ্যের সহাবস্থানের সম্ভাব্য পরিসরকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার ভার পাঠকের ওপরে ছেড়ে দিয়েছে।¹⁸⁸ ‘হারবার্ট’ যে কলকাতাকে আবিষ্কার করে, সেখানে লেডি ডাক্তার আর পরী আছে। বন্ধ অ্যান্টিকের দোকানে পাথরের পরী, যার সঙ্গে হারবার্ট ‘ফল অব বার্লিন’ চলচ্চিত্রের নগ্ন রুশী যুবতীর মিল পায়, যার সাথে হারবার্ট কথোপকথন করে এবং যে আত্মঘাতী হারবার্টের ঘরের জানালায় ছটফট করে। হারবার্ট তার পাড়ার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটকে ‘আবিষ্কার’ করে তার দৃষ্টিকোণ থেকে। সাহেবি কেতার পার্ক স্ট্রিটের বাইরে অন্য পার্ক স্ট্রিট, যেখানে সব কিছুতেই মায়া জড়ানো এবং যা হারবার্টের মতোই আত্মঘাতের দিশাহীন পথে এগোতে থাকে। কথক মায়াভরা বিকেলে হারবার্টের পার্কস্ট্রিট আবিষ্কার তৎসহ অলেস্টার পরে নিজেকে আবিষ্কারের মধ্যে হলিউডের অমোঘ উপমা খুঁজে পায়- এই হলিউড ষাটের দশকের।¹⁸⁹ হারবার্টের অতীতের সঙ্গে ঔপনিবেশিক কলকাতার ক্ষীণ হয়ে আসা যোগাযোগটুকু তখন মুছে যাচ্ছে। হারবার্ট পার্ক স্ট্রিট ও তার বাড়ির পথের মধ্যে আবিষ্কার করে ওই ‘আরেকটা কলকাতা’-কে। “গাছ, কুষ্ঠরোগী, বারান্দার থাম, সাইনবোর্ড, চায়ের দোকান, ডিউটি সেরে বাড়িতে ফেরা আয়া, নার্স, বেশ্যা, পার্কের রেলিং, জলাধারের গায়ে আঁকা সিংহ ও মিকিমাউসের ছবি, শহরের পাতাল থেকে উঠে আসা জন- প্রত্যেকের আলাদা করে কিছু না কিছু বলার ছিল” (৫২-৩) হারবার্টের পাড়ার গলির

বর্ণনা দিয়েই আখ্যানের শুরু। নর্দমার ঝাঁঝি দিয়ে আরশোলারা বেরোয়, গয়লাবস্তির মুখে সরকারি কলে পাগলিবিড়ি জল ছেটায়, বাড়ির মেথর ঢোকার দরজা গলির সঙ্গে যুক্ত। ডিএস যে গলিতে থাকে কিংবা বড়িলাল কালীঘাটের যে বেশ্যার বাড়িতে যায় এই সবই ‘বাবু’দের কলকাতার সমান্তরাল শহুরে ল্যান্ডস্কেপ নির্মাণ করে। ‘হারানো কলকাতা’-র বর্ণনার জন্যে আঁজুবাবুর না থাকা, হিপোড্রাম সার্কাসের না থাকা কিংবা চিলছাদ না-থাকা বিস্তৃত এক ক্যানভাস তৈরি ক’রে দেয় কখনে। ফ্ল্যাটবাড়ি ওঠা কলকাতায় চিলছাদ বিলুপ্তপ্রায়, কিন্তু হারবার্টের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ওই চিলছাদ। অতীত কখনও মৃত নয়, এমনকি তা অতীতই হয়নি কখনও¹⁹⁰— এই বোধকে ধারণ ক’রে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের শহরের ছিঁড়ে যাওয়া সুতোগুলো কথক খুঁজতে থাকে অদ্ভুত মায়ায়। এই কথক এবং ‘কাঙাল মালসাট’-এর কথকের পাঠককে কলকাতা দেখানোর কথনে সাদৃশ্য প্রচুর। আশির দশকের শেষাংশে কলকাতার অন্য একটা ছবি দেবেশ রায়ের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র ‘ডেভেলাপমেন্টের সময় এ-রকম ঘটে থাকে’ এবং ‘নগর খণ্ড’-তে। প্রথম আখ্যানে কলকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আবাসন ও তৎকেন্দ্রিক শহুরে ছবি। ঠেলারিক্সকে কেন্দ্রে রেখে ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর শহরের অর্থনীতি ও মনুষ্যজীবনের বর্ণনা এসেছে। “কিন্তু কে যে কার জন্যে স্মৃতি রাখে! কেই-বা কার জন্যে স্মৃতি রাখে!” (রায় ২০০১, ৩৮) এটি শুধু মিতুকে নিয়ে বলা নয়, শহরকে নিয়েও। শহুরে অবয়বের উন্নয়নের ফসল ‘হাউসিং’ বা ফ্ল্যাটবাড়ি মিতুর নকশাল কাকা এবং মিতুর জন্যে নতুন কিছু বয়ান হাজির করে। উন্নয়ন যেহেতু এই আখ্যানের মূল ঋণাত্মক শব্দ তথা ‘অপশব্দ’, তাই কলকাতা-দর্শনেও এই উন্নয়নের ঠেলায় উচ্ছেদ হওয়া রূপড়ির বর্ণনা বিস্তারিত।¹⁹¹ নবাবগঞ্জের উপন্যাসে দক্ষিণ কলকাতার পুরনো অঞ্চল ও পার্ক স্ট্রিট যতটা স্থানাধিকার ক’রে আছে, দেবেশ রায়ের লেখায় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কলকাতা; মানিকতলা, উল্টোডাঙ্গা, ফুলবাগান, বেলেঘাটার বিস্তৃত অঞ্চল। মূলতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত অঞ্চল- উপনিবেশোত্তর সময়ে প্রসারিত হয়েছে জনসংখ্যার আধিক্য সামলাতে। তাঁদের চোখ দিয়ে দেখা শহর, এবং “বড়দের শহরটা মিতুরও হয়ে ওঠে” (৪৬) আশির দশকে কলকাতার এই অঞ্চলের নবরূপায়ণ ঘটছে কারণ শহরের

উন্নয়ন ও প্রসারণ আরও পূর্বদিকে সল্টলেকে ছড়িয়ে যাবার আগে নতুন বাস টার্মিনাস, ট্রামলাইন, বাজার, ফ্লাইওভার, নতুন নতুন বহু মানুষের নতুন নতুন আবাসনে আগমন- বিশ্বায়নী জমানার প্রাক্‌মুহূর্তে এই শহরের নকশা মেলে ধরে। মৌলালির মোড়ে খানাখন্দভরা রাস্তা, বাস কন্ডাক্টরের চিৎকার, শহরের ক্যাকাফোনি, শেয়ালদায় জনস্রোত, মিনিবাসের সঙ্গে টেম্পোর টক্কর এবং মিছিলের ছন্দ- নবাবুণের থেকেও আরও বিস্তারিত আরও সুপরিকল্পিত দৃশ্যায়নে দেবেশ রায়ের কথক শহর চেনায় পাঠককে। নবাবুণ ও দেবেশ প্রায় একই সময়ের শহরের ইতিকথা লিখছেন, কিন্তু দু'ই ভিন্ন সাহিত্যকৌশলে। প্রচ্ছন্ন মিল একটা থাকে- শহরে ল্যান্ডস্কেপের এবং শহরে যাপনের বদলাভিমুখের ইঙ্গিতে।

নবাবুণের উপন্যাসগুলিতে উপমা, তুলনা ও চিত্রকল্পের অন্তর্গামী ব্যবহার আগে সাহিত্যে হয়েছে কি? এমন তুলনা দেওয়া হচ্ছে যা পাঠককে যুগপৎ বিস্মিত করছে ও ইতিহাস বিষয়ে কোনও সংকেত দিচ্ছে। তুলনার উপাদান অথবা উপমেয় হিসেবে যে বস্তুটির (বা, শব্দটি) সঙ্গে উপমানের সংযোগ ঘটানো হচ্ছে, সেই সংযোগটি অভূতপূর্ব ও চমকপ্রদ। আখ্যানে চিত্রকল্প নির্মাণের জন্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি নিছক সঙ্গতিহীন চিত্রকল্প তৈরি করছে না, তা আখ্যানে অঙ্গঙ্গী। শব্দের দায় শুধু মুহূর্তটুকুর বিবরণ দিয়ে যাওয়া নয়, আখ্যানের অন্য কোনও পাঠমুহূর্তে তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ফিরে আসে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসটি শুরু হয় কয়েকজন মাতালের বমির বর্ণনা তৎসহ গলি, নর্দমা ও পরিবেশের বর্ণনা। এই বর্ণনার জন্যে যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন লেখক, তাতে অ-ভদ্রলোকীয় শব্দের প্রাচুর্য। চিত্রকল্পটি মাতালদের মাতলামির পরিবেশকে অর্থবহ ক’রে তোলে।¹⁹² “বমির সুতো সুতো লালা ঝরিয়ে” (৯) বাক্যাংশটি এই পর্যায়ের আখ্যানাংশের মূল সুতো। হারবার্ট যে খুব ‘ভদ্রলোক’ ছিল না, হারবার্টের যে ‘পাড়ার লুম্পেন মাতাল’দের সঙ্গেই বেশি বন্ধুত্ব ছিল এবং হারবার্ট যে মৃতদের কখনও ভুলতে পারেনি বলেই তার যাপন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে- এইসবের ধরতাই হয়ে থাকে শুরুর ওই অনুচ্ছেদগুলি। সর্বোপরি প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ এলোমেলো, ময়লাটে ও কেওটিক বর্ণনাসমৃদ্ধ। ঠিক এই অনুচ্ছেদগুলির ধারাবাহিকতা

ফিরে আসে নবম অধ্যায়ে। যে ‘সাসপেন্স’ অর্থাৎ পাঠকের উদ্গ্রীব ‘তারপর? তারপর কী হল?’ জিজ্ঞাসা জাগে প্রথম অধ্যায়ের পরে, তার ধারাবাহিকতায় নবম অধ্যায় শুরু হয়। বমি-ধুনকি-মাতাল চিত্রকল্পের ধারাবাহিকতায় মৃত হারবার্টকে নেশার চিহ্নছড়ানো ঘরে আবিষ্কার করে অন্তঃপাঠক (implied reader) এবং কথন-গ্রাহক (narratee)। এলোমেলো, ময়লাটে, কেওটিক চিত্রকল্প এই অংশেও ফিরে আসে- বোতলের তলানি রামটুকু ধাঙড় খেয়ে নেয়, দরজা ভেঙে ভুস ক’রে মড়ার গন্ধ বেরোয়, পাড়ার লোক ও আত্মীয়দের সংলাপ এবং সারারাত বন্ধঘরে আটকে থাকা মাছির মুক্তি পাওয়া এবং শোভারানী-ললিতমোহনের ভূতের অনায়াস অধিষ্ঠান।¹⁹³ আর, দু’টি অধ্যায়ের শুরুর দুটি বাক্য- ‘২৫শে মে। ১৯৯২।’ ২৫শে মে হারবার্টের মৃত্যুদিন, শ্মশানে ডিনামাইট বিস্ফোরণ কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়ে যায় ১৯৬৭ সালের ২৫শে মে নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহের অভ্যুত্থানের তারিখ দিয়ে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে যুদ্ধের চিত্রকল্প ফিরে আসছে বারবার।¹⁹⁴ শব্দের ব্যবহারে, কমিউনিস্ট সাহিত্য ও দ্রোহী কমিউনিস্ট ব্যক্তিবর্গের আখ্যানস্থ উপস্থিতিতে এবং নকশাল রণজয়ের চেতনাস্রোতে এই চিত্রকল্পগুলি তৈরি হচ্ছে। রণজয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে না-থেকেও স্বকল্পিত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সক্রিয় রয়েছে। পাঠকের কাছে যে রণজয়ের যে শত্রুরা ‘কাল্পনিক’, রণজয়ের কাছে সেই শত্রুরা বাস্তব; আর, সেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নীতি-কৌশল সাজিয়ে যাচ্ছে রণজয়।¹⁹⁵ রণজয়ের স্বরচিত/স্বীয়কল্পিত যুদ্ধমুহূর্ত যুদ্ধের চিত্রকল্পে রূপান্তরিত হয়- চিন বিপ্লব ও বলশেভিক বিপ্লবের বিভিন্ন ঘটনা রণজয়ের চেতনাদ্বারা নির্মিত হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন লেখক। রণজয় পূর্বপঠিত সাহিত্য ও পূর্বপঠিত যুদ্ধের তত্ত্ব থেকে এই ঘটনাগুলি ধারাবাহিক দৃশ্যকল্পের (episodic) ভঙ্গিতে স্বীয়চিন্তায় সাজিয়ে নেয়। বাস্তবের সত্যের সঙ্গে আখ্যানের সত্যের মিলমিশের অসম্ভব সম্ভাব্যতায় (improbable possibility) লেনিন ও মাও-সে-তুংয়ের সঙ্গে কাল্পনিক আলাপন চলে রণজয়ের। বাস্তবে ১৯৭০-র দশকে কিংবা ১৯৯০-র দশকে এঁরা প্রত্যেকেই মৃত, কিন্তু আখ্যানের নিজস্ব সত্যে রণজয়ের স্বগতচেতনায় এঁরা উপস্থিত থাকেন।

তাই যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধকৌশলের বিভিন্ন দৃশ্যকল্প নির্মাণ হয়ে চলে আখ্যানে। সেখ মোফাজ্জল হোসেন ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসের ভাষায়, চিত্রকল্পে রাজনৈতিক সংলগ্নতা স্পষ্টভাবে খুঁজে পেয়েছেন।¹⁹⁶

নবাবগের উপন্যাসের বহু রাজনৈতিক উপমা, চিত্রকল্পের মধ্যে কয়েকটি-

(ক) ভারতীয় পার্লামেন্টের মত বলয়াকৃতি প্রস্রাবাগারের সামনে... (যুদ্ধ পরিস্থিতি, উপন্যাস সমগ্র, ১২৫)

(খ) দেশলাই কাঠির মাথায় বারুদ জ্বলতে দেখে ভাল লাগে রণজয়ের (১১৮), একা একা কুপিটা জ্বলছে কালো ধোঁয়া শিখার ওপরে (১২৬), ক্যারামবোর্ডের ওপরে পোকাকার মরার দৃশ্যায়ন “যারা ভাগ্যহীন তারা স্ট্রাইকারের বাড়িতে, ঘুঁটির অপ্রকৃতিস্থ নড়াচড়ায় থেঁৎলে যায়” (১০০)

(গ) বনবেড়ালের মুখে সেই হাসি যার বর্ণনা লুই ক্যারলের মতো কোনো মনসবদারই দিতে পারে নি। (মসোলিয়াম)

(ঘ) লাল বেলুন, নীল বেলুন- সব ফেটে যাবে। আবার নতুন বেলুন ফুলিয়ে লাগানো হবে। আবার ফেটে যাবে। সেরকম হওয়ারই কথা (হারবার্ট, ৮০)

প্রগতিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ এবং মার্ক্সীয় সাহিত্যধারা

মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস- এঁরা কেউ ‘প্রগতিবাদী লেখক’ তকমায় আটকে থাকছেন না। বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রগতিবাদী সাহিত্যের বিপর্যয় ঘটেছিল এবং তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। কেন এই বিপর্যয় ঘটেছিল? অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসাহিত্যের প্রগতিবাদী ধারাতেও কি এমন ঘটেছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও অনুশীলনের খ্যাতি ছড়াবার পরে বাঙালি মনীষাও এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়। ‘কল্লোল’ যুগ শুরু হওয়া বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল কারণ, রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির চেষ্টা শুরু হয় বহু লেখকের মধ্যে। যদিও, ‘কল্লোল’ পত্রিকা নিজেকে কখনোই সমাজতান্ত্রিক বা মার্ক্সীয় মতাদর্শে অনুপ্রাণিত বলে দাবি করেনি।¹⁹⁷ বিষ্ণু দে ব্যক্তিগত পরিসরে ও তাঁর নিজস্ব কাব্যিক-প্রাবন্ধিক অনুশীলনের স্তরে মার্ক্সবাদী প্রয়োগ ঘটাতে চাইলেন। মণীশ ঘটক এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ‘কল্লোল’-এ থেকে তাঁদের সাহিত্যগত অনুশীলনে মার্ক্সবাদের বোঝাপড়া আনতে চাইলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’ পত্রিকা এবং সাহিত্যগোষ্ঠী স্তরে প্রথমবার সমাজতন্ত্রের মূলগত বোঝাপড়া নিয়ে বৌদ্ধিকমহলে চর্চা শুরু করল।¹⁹⁸ রোম্যান্টিক কাব্যতত্ত্ব থেকে ততদিনে বাস্তবমুখী ও সমাজতন্ত্রছোঁয়া কাব্যতত্ত্বে আশ্রয় পেতে চাইছে। ১৯৩২ সালে ‘অঙ্গারে’ প্রকাশ ও ১৯৩৫ সালে প্রগতিবাদী সাহিত্য সম্মেলনের পরে মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিক সাহিত্যতত্ত্বে আঘাত আরও জোরদার হয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যতত্ত্বও বাঙালি অগ্রণী সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করে। পিসি জোশি এইসময়েই (১৯৩৫) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয়ে পার্টি-মতাদর্শ এবং সাহিত্য-শিল্পকে মেলাতে ব্রতী হন। পার্টির পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক বি.টি রনদিভে (১৯৪৮-৫০) পার্টি ও শিল্প-সাহিত্যকে মেলানোর ব্যাপারে যোশির মতো উদ্যোগী ছিলেন না। শহরকেন্দ্রিক অভ্যুত্থানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ১৯৪৬-র এপ্রিল থেকে ১৯৫১-র অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি চারবার নিজেদের ‘পার্টিলাইন’ বদলেছে¹⁹⁹ - এই সংশয়ের প্রভাব গণসংগঠনের কর্মীদের ওপরে তথা ভারতীয় মার্ক্সবাদী সাহিত্যিকদের ওপরেও পড়েছিল। রাজেশ্বর রাও তথা অঙ্ক-কমিটি তেলেঙ্গানার উদাহরণ সামনে রেখে কৃষিবিপ্লবের পক্ষে জনযুদ্ধের পথকে সুগম করার সুপারিশ করেন। রণদিভের পরে পার্টি সম্পাদক হওয়ার পরে রাজেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম অথবা আধা-সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় নেহরু সরকারের নৃশংস আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য।²⁰⁰ মুহূর্মুহু

পার্টিলাইন বদলের ফলে পার্টির শীর্ষমহলে অসন্তোষ এবং নিচুস্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তৈরি হয়। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গ, সচ্চিদানন্দ ঘাটে ও অজয় ঘোষের লিখিত দলিল অনুযায়ী চিনের গেরিলাযুদ্ধের পথ এবং রাশিয়ার অভ্যুত্থানের পথ দুইই প্রত্যাখ্যাত হয়।²⁰¹ অজয় ঘোষের সম্পাদনায়/নেতৃত্বে পার্টির ক্রমশঃ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক অবস্থানে সরে আসা পূর্ববর্তী সাহিত্যবিতর্কগুলিকে নিষ্পত্তি ক'রে দিয়েছিল।²⁰² প্রগতিবাদী সাহিত্যের উদ্গাতারা সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে উদ্দেশ্য ক'রে সাহিত্য রচনা করাকেই কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে মনে করেছিলেন। এবং সাহিত্যের দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে ইস্তাহারে বলা হয়েছিল- (১) অর্থোজিক, অবান্তর ও পশ্চাৎপন্থী সামাজিক ধারণা ও রীতিনীতিকে সমালোচনা করা এবং (২) মানুষকে উন্নততর জীবন ও মুক্তির দিশা দেখানো এই দু'টি হবে প্রগতিবাদী সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। প্রগতিবাদী সাহিত্যের উৎস-উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ দু'য়ের বিরোধিতা করা। এরপরে অন্তর্ভুক্ত হয় ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনা এবং সেই চেতনাকে সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকতর জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। মার্ক্সবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরে প্রগতিবাদী সাহিত্য নতুন অভিমুখ পায়। শ্রমিক-কৃষকের তথা নিপীড়িত ভারতীয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যরচনা করা এবং সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে তাদের শোষণমুক্তির দিশারী হওয়ার উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়। ক্রমে অন্যান্য সাহিত্যান্দোলন ও তত্ত্ব যথা অস্তিত্ববাদ, আধুনিকতাবাদ, বাস্তবতাবাদ ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহিত্যের ভেতর থেকে যে বদলগুলি তাঁরা আনতে চান, তার মধ্যে অন্যতম সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষার ব্যবহার। ভাষার স্থানীয় রূপ ব্যবহার, যে ভাষায় নিম্নবর্গের মানুষ আদানপ্রদান করেন, সেই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করলেন তাঁরা। প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রভাব ভারতের প্রায় সবক'টি ভাষার সাহিত্যে পড়েছিল। প্রেমচাঁদের মতে, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের কাটাছেঁড়া, তা সে যে কোনও সংরূপ বা আঙ্গিকেই হোক না কেন। নান্দনিকতার ধারণা ও ন্যায্যতার ফহারণা প্রগতির দিকে নিয়ে যায় একজন লেখককে। উনিশশো কুড়ির শেষ থেকে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সাহিত্য

একে অপরকে প্রভাবিত করছিল।²⁰³ সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হওয়া নিছক সমাপতন নয়। ১৯৩২ সালে 'অঙ্গারে' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে রশিদ জাহাঁ, মাহমুদ-উজ-জাফররা রক্ষণশীল সাহিত্য ও রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহঘোষণা করছেন। তাঁদের গল্পে যৌনতার অনুষ্ণু সাবলীলভাবে এল। সাহিত্যে যা নিয়ে ছুঁৎমার্গ ছিল, সাহিত্যিকেরা যে বিষয়কে লেখার পরিসরে আনতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন, এঁরা তাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির 'নৈতিকতা'বোধকে প্রতিস্পর্ধা জানালেন এঁরা। তৎকালীন বিশ্বসাহিত্যে 'আধুনিকতা' যেভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছিল, ভারতীয় পরিসরে তাকেই অভিযোজিত করলেন তাঁরা। এরই সঙ্গে সাহিত্যে জনগণের অন্তর্ভুক্তি এবং জনগণের জন্যে সাহিত্য এবং পার্টিলাইনের সঙ্গে সাহিত্য-অভিযুক্তিকে মেলানোর দ্বন্দ্বগুলিও চলতে থাকল। এই তর্কের অনুশীলনগত ক্ষেত্র শুধু ভারতেই নয় বরং বিশ্বের অন্যত্রও চলছিল এবং এই তর্কের সূচনা ঝানভের (Zhdanov) সময় থেকেই সোভিয়েতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছিল। উপন্যাস বিষয়ে লুই আরাগঁ ম্যাক্সিম গোর্কির সমালোচনাত্মক বাস্তব ও বিপ্লবাত্মক রোম্যান্টিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চললেন। "The Novel is a machine invented by man for the apprehension of reality in all its complexity"²⁰⁴ ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের ইস্তেহার এবং তৎপরবর্তী ইউরোপে ফ্যাসিবাদ-নাজিবাদের দাপাদাপির পরে ইউরোপের সাহিত্যপরিমণ্ডলে ব্যাপক বাঁকবদল হয়েছিল। বিশের দশক থেকে ইউরোপে ডাডাবাদ, স্যুররিয়ালিজম ইত্যাদি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ডাডাবাদ চিরাচরিত শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিক ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করল যেখানে বৌদ্ধিক মুক্তি দ্বারা প্রথাগত শিল্প-সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ স্বীকৃত হল; লুই আরাগঁ সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব ছিলেন। ত্রিশের দশকের শুরুতে সোভিয়েতের লেখকবর্গের সংস্পর্শে এসে তাঁর বৌদ্ধিক মুক্তচিন্তার অনুশীলনের ধারণার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। এমনকি স্যুররিয়ালিস্ট তত্ত্বানুশীলনকেও প্রগতিবাদী সাহিত্যের বাস্তবতায় ভাবিয়ে তুলেছিল

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব তথা নতুন বাস্তবতার সন্ধান।²⁰⁵ তৎকালীন সময়ের সাহিত্য-বিতর্কে ঝানভের সঙ্গে ট্রটস্কি ও লুনাচারস্কির সাহিত্যধারণাও উল্লেখ্য ছিল। অধিকাংশ ভারতীয় প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের কাছে ট্রটস্কির নামোচ্চারণ ‘নিষিদ্ধ’ হলেও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা মার্কসবাদী সাহিত্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।²⁰⁶ ঝানভ নির্দেশিত সাহিত্য-নির্দেশিকাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মাও-সে-তুংয়ের সাহিত্য-সমালোচনাকেও অবজ্ঞা করেছিল সোভিয়েতবাদী তাত্ত্বিকরা। মাও স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের নামে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপরে নির্দেশিকা চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও সর্বোত্তম শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতার সামঞ্জস্যের কথা বলছেন মাও, যেখানে শিল্পগত নান্দনিকতাকে ছাপিয়ে উঠবে না পোস্টার-ক্লোগানের ভাষা আবার নিছক অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রাধান্য পাবে না।²⁰⁷

ঝানভের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের (socialist realism) মতাদর্শকে শিল্প-সাহিত্যে অনুশীলনের প্রক্রিয়া প্রবলভাবে শুরু হল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান স্তালিনের নির্দেশে ঝানভ সম্পাদক পদে দায়িত্ব নিয়ে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় জোর দিলেন। স্তালিনের বিশ্বাস ছিল যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উত্তম ও সর্বোত্তমের মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ঝানভ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রয়োগের লক্ষ্যে অ-সোভিয়েত ও অ-কমিউনিস্ট সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দৃঢ়ভাবে নাকচ ক’রে দিলেন।²⁰⁸ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ছাঁচে ঢালা কাহিনি, প্লট, চরিত্রনির্মাণ ও পরিণতি উপন্যাসের প্রধান উপাদানে পর্যবসিত হল। প্রয়োজন একজন আশাবাদী প্রগতিশীল নায়কের (Positive Hero), যে নিপীড়িত ‘পিছিয়ে পড়া’ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদকে ন্যায্যতা দেবে। এছাড়াও, শিল্পী সাহিত্যিকদের মতাদর্শকেন্দ্রিক গণসংগঠনে যুক্ত হতে হবে সাধারণ শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে তাঁদের বৌদ্ধিক শ্রমকে অভিন্ন ক’রে তুলতে (ও দেখতে) হবে। আর, অবাস্তব কল্পনা, উপমা, বাস্তবতাহীন চিত্রকল্পের জটিল প্রয়োগ ক্রমশঃ কমিয়ে দৈনন্দিন-বাস্তব থেকে সরল শিল্পমুখী ক’রে তুলতে হবে। ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যিক সঙ্ঘগুলি যেগুলি বামপন্থী

মতাদর্শে বিশ্বাস করত, তারাও এই নিদানগুলি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে তথা এই নিদানগুলির প্রয়োগ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে ও গনসংগঠগুলিতে বিতর্ক তৈরি হয়। বাংলা ও উর্দু ভাষার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা মার্ক্সবাদী সাংস্কৃতিক নন্দনতত্ত্বে আগ্রহী হয়েছিলেন, তাঁরা এমত নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সংশয়াস্থিত হলেন ও দ্বিধাবিভিক্ত হলেন। বিষ্ণু দে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ফ্যাসিবিরোধী লেখকশিল্পী সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন) মতো লেখকরা শিল্পীর স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেন অর্থাৎ, শিল্প কোনও মতাদর্শের নিদান মেনে এবং মতাদর্শের ছাঁচে ঢালা হয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। সাহিত্য কখনোই কোনও নির্দিষ্ট নন্দনতত্ত্বের অঙ্ক দাসত্ব করতে পারে না। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ভবানী সেনের মতো তাত্ত্বিকরা এই মতামতের বিরুদ্ধবয়ান উপস্থিত করলেন।²⁰⁹ তাঁদের মতে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব দিয়েই একমাত্র শিল্পের বিচার সম্ভব এবং এর মধ্যেই মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। ধনঞ্জয় দাশের মতে, তারাশঙ্কর ও বিষ্ণু দে'র শিল্পদৃষ্টি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে বঙ্গীয় মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীরা কোনওদিনই ভাল ভাবে নেন নি।²¹⁰ বিষ্ণু দে ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো বুদ্ধিজীবীরা একদিকে আধুনিক নগরসভ্যতা অন্যদিকে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির প্রতি টানের দ্বন্দ্ব এবং একদিকে ইউরোপীয় ঘরানার শিল্পবোধ অন্যদিকে মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতার প্রতি দুর্বলতার দ্বন্দ্ব জর্জরিত ছিলেন বলেই শৈল্পিক অহংবোধ থেকে বেরিয়ে মার্ক্সবাদী শ্রমজীবীকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বে সমর্পিত হতে পারেননি।²¹¹ অন্যদিকে, বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে আরেকটি ধারার সূচনা হয়, 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ', যার পুরোভাগে ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, মোহিতলাল মজুমদার, বনফুল ও সজনীকান্ত দাস। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ ছাড়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখের সন্ধান দিতে পারেনি এই শিবির। বিশেষতঃ প্রগতি-সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব ঘিরে সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের মতো কোনও বৌদ্ধিক স্তরেও এই শিবির উন্নীত হতে পারেনি। চল্লিশের দশক জুড়ে প্রগতিবাদী সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে বিতর্ক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটককে ঘিরেও আলোড়ন তোলে। হিরণকুমার সান্যাল, তারাশঙ্করের মত সমালোচক 'নবান্ন'কে প্রশংসা করতে দ্বিধাবোধ করলেন কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালিদাস রায় প্রমুখ সমালোচক 'নবান্ন'র ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সমর

সেন ও সরোজ দত্তের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিতর্ক প্রাধান্যযোগ্য।²¹² মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের অনুশীলনে ও সমালোচনায় সরোজ দত্তের ক্ষুরধার লেখনী আরাগাঁ বা ঝানভের অনুসারী ছিল। ১৯৩৮ সালে সমর সেনের 'In defence of the decadents' প্রবন্ধটি নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্র 'New Indian Literature' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৩৯) হওয়ার দেড় বছর পরে 'অগ্রণী (এপ্রিল, ১৯৪০)'²¹³ পত্রিকায় সরোজ দত্তের 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক প্রত্যুত্তরজ্ঞাপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমর সেনের প্রবন্ধের নির্যাস এই যে, ধনতান্ত্রিক পতনোন্মুখ সমাজে সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনা অসম্ভব তাই অবক্ষয়ের (decadent) সাধনাই একমাত্র আন্তরিক। সমাজব্যবস্থাই যেহেতু অবক্ষয়ী, তাই অবক্ষয়ের শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যেই বৈপ্লবিক শক্তি বিদ্যমান। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল যে, বিপ্লবোত্তর ভবিষ্যৎ সমাজে প্রগতির গতি অবাধ হবে কিন্তু কিষাণ-মজদুর লালঝাণ্ডা ইত্যাদি নিয়ে উদ্ধৃদ্ধকারী সাহিত্যসৃষ্টির যে নিদান পাটি থেকে এখন দেওয়া হচ্ছে তাতে যেটুকু প্রগতি অর্জন করা গেছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে,

If we consider the changes effected in Bengali poetry in the last fifteen years we must admit that it has definitely 'progressed.' The best of it has almost got clear of that sickening vice bequeathed by the Tagorean tradition—sentimentalism. It has improved and made considerable changes in technique. From a loose and ineffective language to a highly polished and flexible one, from a mere turning loose of emotion to a consciousness of the disruptive forces threatening society, —there are considerable achievements. To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be dangerous sacrifice. It will mean a swim backward in literary tradition and will revive the sentimental age in

a changed garb. Such demands on poetry, backed by the newspapers and the progressives, will have dangerous consequences for the rising generation, which has every chance of being taken in by these easy methods of cheap and quick popularity. The critic who asks for such a literary change in the name of progress, we repeat, is at best a sentimental humanist. (Sen 1991, 142-146)

সরোজ দত্ত ‘অতি আধুনিক বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধে সমর সেনের ‘নিশ্চয়তাপ্রিয় মধ্যবিভূ’ চেতনা তথা অবক্ষয়পূজারী সাহিত্যাদর্শকে আক্রমণ ক’রে পরামর্শ দিলেন অবক্ষয়ী সমাজের প্রগতিমুখী ধনাত্মক উপাদানগুলিকে সাহিত্যে পরিণত ক’রে বাকিটুকু বর্জন করার।²¹⁴ সমর সেনের মধ্যবিভূ বিদ্যুতিকে আক্রমণ ক’রে সরোজ দত্ত তাঁর কবিতাকে আঙ্গিকসর্বস্ব জনগণের অবোধ্য বলে বিশ্লেষণ করেছেন।²¹⁵ সাহিত্যিকের কাজ যে পার্টিজান হয়ে ওঠা এবং প্রতিমুহূর্তে শ্রমজীবী-কৃষিজীবীর সংগ্রামের পাশে কমরেড হয়ে দাঁড়ানো, সরোজ দত্ত সেই দায়বদ্ধতায় জোর দেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর চিন্মোহন সেহানবীশের সাহিত্য-দায়বদ্ধতা বিতর্কের নির্যাসও এটাই।²¹⁶ কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সমর সেন অবক্ষয়ের যুগের সাহিত্যিক-আদর্শ বলে যে এলিয়টের সাহিত্যপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, সেই এলিয়ট ধর্মীয় নিশ্চয়তাতে সুখ খুঁজেছিলেন। কিন্তু, সমর সেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বস্তুবাদী ও বামপন্থী হয়েই থেকেছেন তত্ত্বে ও অনুশীলনে। এই বিতর্ক উল্লেখযোগ্য কারণ এলিয়টের ক্লাব্যদর্শনে বাঙালি অগ্রণী কবিরা কমবেশি প্রায় সকলেই প্রভাবিত ছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ফরাসি কবিতায় ইউরোপীয় আধুনিকতার অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা এবং হতাশবাস্তবের চিত্রকল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিভূ কবিকূলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। মধ্যবিভূকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-রিরংসা এবং ভদ্রলোককেন্দ্রিক ব্যর্থতা-মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছেপূরণ-নীতিহীনতার বেদনা এইসমস্ত থাকলেও তাঁদের সাহিত্যে তেমন আশাবাদী প্রোটোগনিস্ট, দ্বন্দ্বিক চেতনাসম্পন্ন প্রলেতারিয়েত কিংবা

সমাজবদলানোর সূত্রায়িত আখ্যান ছিল না। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে বঙ্গীয় মার্ক্সবাদী সমালোচকরা চিরকাল হয়/অবজ্ঞা ক'রে এসেছে কারণ, তাঁর কবিতায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রতিফলন কিংবা গণজাগরণের উচ্ছ্বাস নেই। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'নির্জনতার কবি' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'গজদন্তমিনারনিবাসী কবি' বলে প্রগতিবাদী ঘরানা থেকে বিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। ননী ভৌমিক, গোপাল হালদারের মতো সমালোচকরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু, 'প্রগতি'র এক অর্থ তো সমাজব্যবস্থার বদলের চিহ্নগুলোকে আবিষ্কার করা। 'ঘোড়া' কবিতায় জীবনানন্দ লিখলেন 'বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে'- এই একটা পংক্তিতে চল্লিশের দশকের আধুনিকতার সামাজিক ভাষ্য ধরা রইল। গ্রামসমাজের পতন, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবর্তন এবং যন্ত্রসভ্যতার অভিমুখে এগোনোর ইঙ্গিত এই পংক্তিতে রয়েছে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দাঙ্গা ও দেশভাগের যন্ত্রণার সঙ্গে সমাজ-অভিমুখ বদলের বাস্তবতাও বিবৃত হচ্ছে, 'বাংলার লক্ষ গ্রাম নিস্তেল অন্ধকারে ডুবে' এমন অজস্র পংক্তিতে। 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'²¹⁷ কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলিতে ইতিহাস থেকে অবক্ষয়ী বর্তমানের গতিপথে বাংলার বিবর্তিত রূপ ধরা পড়েছে যা আধুনিক কাব্যের বিশেষ দিগ্দর্শী। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদীদের চোখে জীবনানন্দ প্রতিক্রিয়াশীল কবি। প্রদ্যোৎ গুহ আন্দ্রেই ব্লানভের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'নবান্ন' নাটকের সমালোচনায় বলেছিলেন যে, মরণাপন্ন কৃষকেরা মারা গেল অসহনীয় দুর্দশায় কিন্তু পাঁচটা শ্রেণিসংগ্রাম করল না! কৃষকের ভাষা তুলে ধরলেও শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারেনি ফলে, 'নবান্ন'কে বিপ্লবী নাটক বলা যায় না, এমনটাই তাঁর মত।²¹⁸ এই প্রবন্ধেই প্রকাশ রায় বিষ্ণু দে-কে 'মার্ক্সবাদের শিবিরে প্রতিক্রিয়ার দ্রোজান অশ্ব' বলে আক্রমণ করেছেন, যদিও, বিষ্ণু দে 'পরিচয়' পত্রিকায় উদ্ধৃত বিতর্কে "মানিকবাবুরা মনে করেন বাঙালী ও সোভিয়েট মন একই ছন্দে চলছে"²¹⁹ বলে মন্তব্য করেন, তার যাথার্থ্য রয়েছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতে নির্বিত্তের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোতে অর্থনীতি সংস্কৃতি সাহিত্য সমস্তকিছুকেই আদর্শগত উপাদানে সাজাতে চাওয়া বিশেষ অর্থ বহন করে। বুর্জোয়া ও 'ধ্রুপদী' সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদান ও অভিমুখের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধ্য ছিল নতুন সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যে।

কিন্তু ভারতের উপনিবেশিত (যখন এই বিতর্কের শুরু) বা সদ্য-উপনিবেশোত্তর সমাজে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত (বিশেষত শ্রমজীবীদের) চেতনার মান সোভিয়েতের নাগরিকদের সমতুল ছিল না। শাসক ও শাসিতের চেতনার মানের ফারাকের সঙ্গে এও বিবেচ্য যে, ভারতবর্ষের সুসমৃদ্ধ সাহিত্যধারার সঙ্গে সোভিয়েতের (এবং পূর্ববর্তী রাশিয়ার) সাহিত্যধারার পার্থক্যও ছিল। ইতিহাসচেতনা, মৌখিক সাহিত্যের ধারা, লোকায়ত এবং জটিলবিন্যাসী ধর্ম-মিথ-সংস্কারে জুড়ে থাকা সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এগুলিকে বাদ দিলে সাহিত্য আধুনিক ও পাশ্চাত্যানুসারী হয়, কিন্তু ‘নীরস’ হয়ে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের ‘প্রগতি’ চেতনায় এগুলির স্থান সঙ্কুলান হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃতচেতনার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটাতে গেলে এগুলির তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রগতিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদেরও তফাৎ রয়েছে। প্রগতিবাদী মানেই যে সেই সাহিত্যিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের মডেল-অনুসারী, এমনটা নাও হতে পারে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী সাহিত্যক্ষেত্রে বিতর্কের এও এক উল্লেখযোগ্য ভিত্তি।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ বাস্তবতাবাদ (Realism), সমালোচনাত্মক বাস্তবতাবাদ (Critical Realism) ও বিপ্লবাত্মক রোমান্টিকতা (Revolutionary Romanticism) থেকে গুণগত মানে আলাদা। উনিশ শতকে বাস্তবতাবাদ জীবনের সত্যি ও বিশ্বস্ত প্রতিফলনের কথা বলেছিল, আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সেই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল। এই সাহিত্যপদ্ধতি লেখককে বাস্তবতার বর্ণনায় আরও বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিমুখসন্ধানী হতে বলল, যাতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে আখ্যান নিবদ্ধ থাকে এবং নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তিবাস্তবতা প্রাধান্য পায়। সমালোচনাত্মক বাস্তবতাবাদ পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল তথা প্রগতিবিরোধী সমাজোপাদানগুলির সমালোচনা করে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ সেখানেই থেমে না থেকে সমাজবদলের অভিমুখে স্বচ্ছ ক্রিয়াশীলতার ইঙ্গিত দেয়। সমালোচনাত্মক বাস্তবতাবাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা সমাজবাস্তবের সত্যনিষ্ঠ ছবি বর্ণনা করেন কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত উৎস খুঁজে

তার সমাধানের সূত্র দিতে ব্রতী হন না; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ পৃথিবীকে শুধু বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতেই চায় না বরং দ্বন্দ্বগুলির সমাধান ক’রে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে তাকে নতুন ক’রে গড়ে তুলতেও চায়। নিপীড়িত জনতার মুক্তি এবং নতুন যুগ (সমাজতান্ত্রিক) মূল উদ্দেশ্য। এনভার হোজার মতে,

Socialism is the faithful reflection in all its aspects of the socialist life we are building, of the colossal material transformations which our country, our society, our people, are undertaking at revolutionary speed on the basis of Marxist-Leninist theory and on the basis of the measures and decisions elaborated by our Party²²⁰

গোর্কির ‘মা (১৯০৬)’ উপন্যাসকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা হয়। এই উপন্যাসে শোষক ও শাসকপ্রতিনিধিরা পচনশীল ক্ষয়িষ্ণু সমাজ টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা ক’রে যায় কিন্তু নতুন যুগের আহ্বান নিয়ে নবচেতনার মানুষেরাও উপস্থিত হয়। তারাই শ্রমজীবী শ্রেণির তথা নির্বিত্তের প্রতিনিধি- তাদের শ্রেণিচেতনা তীক্ষ্ণ এবং সমাজবদলের আকাঙ্ক্ষা মার্ক্সবাদ অনুসারী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে অনুধাবন ক’রে বর্তমান বাস্তবতায় শ্রেণিসংগ্রামের পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে। অর্থাৎ, সাহিত্যিকে হতে হবে শ্রেণিসচেতন, পার্টিজান, শ্রমজীবীপক্ষাবলম্বী এবং প্রগতিপন্থী সৃজনশীল।²²¹ গোর্কি সমালোচনাত্মক বাস্তবতাকে ‘superfluous people’-এর ব্যক্তিগত নির্মাণ বলেছেন এবং তার সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করছেন। সমালোচনাত্মক বাস্তবতাবাদ সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিমানুষকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে পারে না; সমস্ত কিছুকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করতে পারে, কিন্তু কোনও প্রগতির দিশা দেখাতে পারে না।²²² এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে পারে এবং মধ্যবিত্ত দুর্বলতার হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার ক’রে নির্বিত্তের ক্ষমতায়নের পরিপূরক

(এবং সহযোগী) ক'রে তুলতে পারে। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকসঙ্ঘের কংগ্রেসের পরে ১৯৬৩ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তত্ত্ব সংহতকরণ শুরু হয়।

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব, কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ বনাম শিল্পীর স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব এবং চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি বনাম কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রয়োগের দ্বন্দ্ব কাজ করত সর্বদা। উর্দু গল্পকার সাদাত হাসান মান্টো ও ইসমাত চুঘতাইয়ের সঙ্গে প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘের বিরোধ বাংলা সাহিত্যের দ্বন্দ্বের আরেক প্রতিরূপ। 'আলমগীর' ও 'হুমায়ুন' নামের দু'টি উর্দু সাহিত্যপত্রিকায় মান্টোর অনূদিত গল্প প্রকাশিত হত 'রুশী আফসানে' নামে এবং মান্টো রাশিয়ান গল্পের ছাঁদে 'তামাশা' গল্প লেখেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নিয়ে। তৎকালীন সমালোচকরা মান্টোর রুশপ্রীতি তথা সোভিয়েত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ খুঁজে পেয়েছিলেন।²²³ প্রগতিবাদের প্রতি তথা রুশী প্রগতি গল্পের প্রতি মান্টোর আকর্ষণ প্রথম ধাক্কা খেল প্রগতিবাদী লেখক শিবিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাজ্জাদ জাহিরের সমালোচনায়। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'বু'²²⁴ গল্পের সমালোচনা করে উর্দু প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে সাজ্জাদ জাহীর ১৯৪৫ সালে বলেন যে, অশ্লীলতা ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের উপাদান এবং প্রগতিবাদী সাহিত্যে তাকে প্রাধান্য দেওয়া অনুচিত। মান্টোর লেখায় কিছু প্রগতিশীল উপাদান থাকলেও, তা মূলতঃ ইউরোপীয় ঘরানায় ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের অসুখরূপে প্রতিভাত অনৈতিকতা অশ্লীলতার অনুরূপ প্রকাশ।²²⁵ ইসমাত চুঘতাইয়ের 'লিহাফ' গল্পটিও একই সময়ে অশ্লীলতার দায়ে আদালতে এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘে অভিযুক্ত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রগতিবাদী লেখক শিবিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আলিম প্রগতিবাদী সাহিত্য থেকে অশ্লীলতা বর্জন করতে চেয়ে খসড়া অঙ্গীকার প্রস্তুত করেন, যা অধিকাংশ প্রগতিবাদী উর্দু সাহিত্যিক দ্বারা সমর্থিতও হয় কিন্তু মৌলানা হসরত মোহানি ও কাজি আব্দুল গফফররা খসড়ার বিরোধিতা করেন। মান্টো নিজের সাহিত্যভাবনার পক্ষে বলেছিলেন যে, নগ্ন সভ্যতার মেকি পোশাক আলাদা করে তিনি খোলেননি বরং সবসময় ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চক দিয়ে লিখেছেন যাতে ওই কালো রঙটি খোলতাই হয়।²²⁶ মান্টোর এই বক্তব্য ফের সময়

সেন বনাম সরোজ দত্ত বিতর্ককে মনে করায়, যেখানে সমর সেনেরও যুক্তি ছিল যে, অবক্ষয়ী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতা ও দ্বন্দ্বগুলিকে তুলে ধরাই সাহিত্যের প্রগতিক নিদর্শন করে। মন্টোর ‘বাবু গোপীনাথ’ গল্পটি প্রগতিবাদী লেখক সজ্জের দ্বারা অতীব নিন্দিত হয় অনৈতিক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে, অথচ ওই একই সমালোচকরা কিছুকাল আগে গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন।²²⁷ উর্দু প্রগতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী সর্দার জাফরি মন্টোর ‘খোল দো’ গল্প এবং রশিদের ‘ইন্তিকাম’ কবিতাকে অসুস্থ ও অতি-আবেগপ্রবণ বলে বর্ণনা করে প্রতিক্রিয়াশীল তকমা এঁটে দেন। “The difference between Krishan's and Manto's stories is this, that Manto's heroes are mutilated men, therefore they cannot be representative... Krishan's heroes are courageous and conscious builders of life. They express evolution.”²²⁸ অর্থাৎ, মন্টোর গল্পের প্রতি প্রগতিবাদীদের আক্রমণের ভিত্তি অশ্লীলতা, অনৈতিকতা, যৌনতার বর্ণনা এবং বিকৃত মনুষ্যত্ব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার খাঁচে আঁটা যাচ্ছে না বলে মন্টোর গল্পকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দেগে দিচ্ছেন তাঁরা। অথচ সাজ্জাদ জাহিরদের প্রথম গল্পপুস্তিকা ‘অঙ্গারে’ একইভাবে উত্তর ভারতের ‘উলেমা’-দের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিল।²²⁹ রোমান্টিকতা এবং মধ্যবিত্ত নিশ্চয়তার আখ্যান থেকে মুক্ত হতে চেয়ে ‘অঙ্গারে’ নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে ভারতীয় সাহিত্যে, কিন্তু যৌনতার অনুষ্ণ তো সেখানেও ছিল। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন হিসেবে পাকিস্তানের প্রগতিবাদী লেখক সজ্জের যে ইস্তাহার ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেও মন্টোসহ আহমদ আলি, আখতার হুসেন রায়পুরীদের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুত বলে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।²³⁰ মন্টোর গল্পে তাঁরা ‘ব্যক্তিস্বাভাববাদ’ দেখছেন, কিন্তু সমাজ-সম্প্রদায়ের সামূহিক বাচন খুঁজে পাচ্ছেন না। মন্টোর গল্পে যৌনতা ও যৌনকর্মীদের ‘অশ্লীলতা’ খুঁজে পাচ্ছেন, অথচ সমাজের গভীরতর অসুখের বাস্তবতা খুঁজে পাচ্ছেন না। মন্টোর গল্পে কৃষক-শ্রমজীবীরা দ্বন্দ্বচেতনায় উদ্ভাসিত সংগ্রামী নায়ক নিশ্চয় নয়, কিন্তু তাদের প্রান্তিকতার বয়ান কিংবা চেতনার দ্বন্দ্ব প্রকাশিত বহুমুখী দোলাচল সমালোচনামূলক বাস্তবতায় জারিত। ‘টোবা টেক সিং’ সমাজতান্ত্রিক মডেলের আদর্শ

প্রোটোগনিস্ট নিশ্চয় নয়, কিন্তু দেশভাগের মতো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিবাদ। রাকশান্দা জলিলও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মান্টোর সমসাময়িকরা কেউই এত নিষ্ঠুর বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমাজের আয়না হতে পারেননি এবং একরঙা নয় সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব ভরা বহুমুখী মানুষের প্রতিনিধিত্বের জন্যেই মান্টোর সাহিত্য প্রগতিশীল।²³¹ ইসমত চুঘতাই প্রগতিবাদী লেখক সজ্জের উর্দু শিবিরের সদস্য হয়েও মান্টোর মতোই সজ্জের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ‘ইয়াঁহা সে ওঁহা তক্’ গ্রন্থে ইসমত লিখেছিলেন যে, প্রগতিবাদী সাহিত্যই লেখকের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে। বর্তমানের লেখক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা যদি সমসময় থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করার জন্যে লেখে, তাহলে তা অর্থহীন বিরস হয়ে পড়তে বাধ্য।²³² সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই নিরাপত্তাময় শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন ইসমত।²³³ ইসমতের লেখাকে প্রতিক্রিয়াশীল তকমা দেওয়া হয়েছিল, মূলতঃ ‘লিহাফ’ গল্পে উচ্চবর্গের নারীর সমকামিতা নিন্দিত হয় রক্ষণশীল সমাজ²³⁴ ও কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা। আদালতে মান্টোর মতোই ইসমতও সওয়াল করেন যে, সমাজের সমস্ত খারাপ ও নোংরা জিনিস নিয়ে লেখা প্রয়োজন যাতে সমাজ তা সংস্কার করায় যত্নবান হয়।²³⁵ ১৯৪৯ সালে প্রগতিবাদী সাহিত্য সজ্জের ইন্তেহারে স্পষ্টতঃ জানানো হয় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism), অশ্লীলতা ও জনতোষী সংবেদনশীলতাবাদ (sensationalism) আদতে ধনতান্ত্রিক শোষণের সঙ্গে যুক্ত।²³⁶ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও প্রগতি লেখক সজ্জ সমকামিতাকে বরাবর ‘অসুখ’ বা ‘বিকৃতি’ বলে মনে ক’রে এসেছে এবং অলিখিতভাবে তার বিরোধিতা ক’রে এসেছে। প্রোটোগনিস্টের যৌন অভিব্যক্তি এবং ভাষা বরাবরই ভিক্টোরিয় ‘শুদ্ধতা’ মেনে আখ্যায়িত হয়েছে। আখ্যানে প্রয়োজনীয় যৌন অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধতার দোহাই দিয়ে কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলতার অজুহাতে ব্রাত্য হয়ে থেকেছে। অধিকাংশ পার্টি-অনুসারী মার্ক্সসবাসী সাহিত্যিক সেগুলি এড়িয়ে গিয়েছেন সযত্নে। মান্টো, ইসমতদের সঙ্গে প্রগতিবাদীদের সংঘাত বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যের সংঘাতের তথা ব্যক্তি

বনাম পার্টি-মতাদর্শের সংঘাতের প্রত্যংশ (counter-part)। যদিও, বাংলা সাহিত্যে ‘অশ্লীলতা’-র অভিযোগ তুলে ঝামেলা তেমন হয়নি কিন্তু সাহিত্যে দু’টি বিষয় প্রকট ছিল- ভদ্রলোক কমিউনিস্ট প্রোটাগনিস্টের আখ্যান এবং নির্বিক্ত শ্রমজীবী প্রোটাগনিস্ট হলেও ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে আখ্যায়িত করা। উইশফুল থিঙ্কিং-এর জন্যে ‘আদর্শ’ শ্রমজীবী তৈরি হলেও, তা বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী হল, সেই শ্রমজীবী রক্তমাংসের শ্রমিকের প্রতিক্রিয়া না হয়ে বঙ্গ-সোভিয়েত মিশ্রমডেল তথা মিশ্রচেতনার ফসল হয়ে উঠল। ভাষা নিয়েও আশ্চর্যরকম গুচিবায়ুগ্রস্ততা ছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে- সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ভূতের বেগার (১৯৫৪)’ গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শন অতিসহজ ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ‘গতর নেবে গো, গতর?’²³⁷ বাক্যটি প্রয়োগের জন্যে তৎকালীন প্রগতিবাদী শিবিরের চক্ষুশূল হয় এটি। অথচ এই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই সফলতম পরীক্ষায় ছন্দ ও আঙ্গিকে মার্ক্সবাদী দর্শনের প্রকাশমাধ্যম করে তুলেছিলেন। ‘পদাতিক (১৯৩৮)’, ‘অগ্নিকোণ’ কিংবা ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কাব্যগ্রন্থের কবিতায় নন্দনতত্ত্ব ও রাজনৈতিক মতাদর্শের আশ্চর্য সমন্বয়সাধন করেছিলেন। ইসমত চুঘতাই ও রশিদ জাহা যাঁদের আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত করলেন, তাঁরা শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র কৃষক নয়। কিন্তু, তাঁরাও প্রান্তিক এবং শোষিত। উপমহাদেশের নারীরা বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের নারীরা তাঁদের সাহিত্যনিরীক্ষার বিষয় হয়ে উঠলেন। প্রগতিবাদী লেখক সঙ্ঘের সদস্য হয়েও চুঘতাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পার্টি-নির্দেশিত ধাঁচকে এড়িয়ে চললেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত অংশকে তিনি অনেক বেশি কাছ থেকে চিনতেন এবং তাদের ব্যাখ্যা-আকাঙ্ক্ষা-শোষিতসত্তাকে বুঝতেন; তাই কৃষক-শ্রমিকদের থেকে তাদের নিয়ে লেখাকেই প্রাধান্য দিলেন। পার্টি-নির্দেশিত ধাঁচার থেকে প্রাধান্য দিলেন স্বতন্ত্র চিন্তা ও ‘ব্যক্তি’নারীর যন্ত্রণার আখ্যানকে।²³⁸ ইসমত তাঁর বিশ্বাসে ‘না-বরাবরি’ ও ‘না-ইনসাফি’র বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু আটকে থাকতে চাননি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সীমাবদ্ধতায়। অস্তিত্বশীল সমাজব্যবস্থার সামন্ততান্ত্রিক ঘৃণা ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে আক্রমণ করা কি

‘তরক্কি (প্রগতি)’-র লক্ষণ নয়? সমাজের যে দ্বন্দ্বগুলিকে শাসকশ্রেণি এড়িয়ে যায় কিংবা দমন করে, সেই দ্বন্দ্বগুলিকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করা কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবের অংশ নয়? নাকি ভারতীয় মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক ও সাহিত্যধারা বরাবরই শ্রেণির ‘উত্তর’ দিয়ে লিঙ্গের ‘প্রশ্ন’কে ধামাচাপা দিতে চেয়েছে?²³⁹ অথচ, ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েত সাহিত্যের নয়া দিশার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাহিত্যে সোভিয়েত নারীদের উপস্থাপনার প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন। নারীরা শুধু ‘ঘরোয়া’ নন কিংবা সন্তানোৎপাদনের যন্ত্র নন বরং তাঁদের অবদান সমাজক্ষেত্রে অনেক বেশি। নারীর শ্রম ও মানসিকতাকে আখ্যায়িত করার মতো সাহিত্যভাষা প্রয়োজন যা প্রথাগত মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক একঘেয়েমি থেকে আলাদা।²⁴⁰ কিন্তু অধিকাংশ বাংলা রাজনৈতিক আখ্যানে নারীর ভূমিকা গৌরবান্বিত করা হয়েছে মা অথবা প্রেমিকার ভূমিকায় অথবা পুরুষ-বিপ্লবীর সহযোগীর ভূমিকায় যাঁদের ‘দায়িত্ব’ গার্হস্থ্য সামলে রাখা। সাবিত্রী রায় বাংলা ভাষায় যেন ইসমত-রশিদের প্রত্যংশ, তাঁর উপন্যাস তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ‘বাতিল’ ক’রে দেয় অ-মার্ক্সীয় তকমা এঁটে। ইসমত-রশিদের মতো অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত না হলেও, পার্টিলাইন না-মানার অভিযোগে তাঁর লেখা ব্রাত্য হয়ে যায়। ‘ত্রিশ্রোতা’ উপন্যাসে উচ্চশ্রেণির চাপিয়ে দেওয়া নন্দতত্ত্বের বিরোধিতা এবং নারীর ভাষ্যে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার চিত্র আছে। শ্রেণি ও লিঙ্গসাম্যের লড়াই যে ওতঃপ্রোত, তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে। সাবিত্রীর ‘স্বরলিপি’ কমিউনিস্ট পার্টির রণদিভে লাইনের দ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্যে আনল এবং সোমা মারিক ‘Critiques of Nation and Gender in South Asia’ প্রবন্ধে সাবিত্রী রায়ের ‘স্বরলিপি’-র বিশ্লেষণে লিখছেন, “Women of the middle class with all the attendant social markers, the uncertainties of the 1940s and 1950s emerge with clarity and a sensitivity no male leftist writer of that time had achieved. But so do peasant women, in Swaralipi and the urban poor” (Marik 2019, 102) নন্দলালের মতো পার্টির উচ্চপদস্থ পুরুষতান্ত্রিক ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, ‘ত্রিশ্রোতা’র

পদ্মা একাধিক প্রেমে পড়ছে কিংবা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও লিঙ্গসাম্যের অসচেতনতা পার্টি-কমরেডদের চেতনাকে প্রভাবিত করছে- এই বাস্তব সমস্যাগুলি স্বীকার করতে সিপিআই-এর অস্বস্তি ছিল বলেই হয়তো সাবিত্রী রায়ের বই পার্টির নির্দেশে ব্রাত্য হয়ে গেছিল। মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক সাহিত্যধারা কি ভারতে অস্তিত্বশীল বর্ণব্যবস্থা তথা বর্ণবৈষম্যের রাজনীতিকে চিহ্নিত ক’রে শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে একই গুরুত্ব দিতে পেরেছে? ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক উপাদান ধর্ম- মার্ক্সবাদী আখ্যানকারেরা সেই ধর্মকে আখ্যানে কীভাবে স্থান দিয়েছে? সেখানে কি কাল্পনিক ‘সম্প্রীতি’র বয়ানই বেশি প্রাধান্য পায়নি? বাস্তবতার দ্বন্দ্ব থেকে সরে গিয়ে দু’ই প্রধান বিবদমান ধর্মের (হিন্দুত্ব ও ইসলাম) মধ্যে সম্প্রীতির বয়ান প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ‘ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার’ এমন নিরপেক্ষতার টালমাটাল বয়ান হয়তো জনতোষী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম নামক দ্বেষসৃষ্টিকারী উপাদানটির বিরুদ্ধতার (অথবা নাস্তিকতা) বয়ান কি প্রধান হয়ে উঠতে পারে? ম্যান্টোর অধিকাংশ রেখাগল্প (Sketches) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ের নির্যাস- কিন্তু সেখানে জোর ক’রে সম্প্রীতিপ্রতিষ্ঠার উইশফুল থিঙ্কিং নেই। আরোপিত ‘মানবিকতা’ বা ‘নিরপেক্ষতা’-র থেকেও সেখানে অমানবিকতা নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের সূত্র মেনে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার উদ্‌যাপন আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করেনি, বরং ধর্মীয় আবেগের প্রাবল্য শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষের চেতনাকে গ্রাস করেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে শ্রমজীবীর তথা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের খোয়াবে তেভাগা আন্দোলনের উদ্‌যাপন হয়েছে এবং তার চেতনা ক্রমেই শ্রেণিসংগ্রামের চেতনায় আকার পেয়েছে; কিন্তু তা আখ্যানের নির্ধারক চেতনা নয়। নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণিচেতনাকে গ্রাস ক’রেছে ধর্মীয় এবং উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক আধিপত্য। ইলিয়াসের উপন্যাসে মিথ-লোকবিশ্বাস-মুখফেরতা কাহিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের কঠোর অনুশাসনের বিপরীতে আখ্যানে প্রাধান্য পেয়েছে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় মিথ ও মহাকাব্যের অনুষ্ণ বহু ব্যবহৃত হয়েছে। ‘পদধ্বনি’ কবিতায় মহাভারতের ‘মৌষলপর্ব’ পুনঃকথিত হয়েছে

ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষিতে। বিলাসব্যসনে মত্ত ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ধ্বংসের মুখে এবং নবযুগের সূচনায় ‘দস্যুদলের’ রূপকে নির্বিক্রম বাহিনী পুরনো ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে ধৈর্যে আসছে। মহাকাব্যের যাজ্ঞসেনী ১৯৭০ দশকের দ্রোহী দোপদী মেঝেন হয়ে পুনঃআখ্যায়িত হয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মহাকাব্য ও ধর্মীয় অনুষ্ণের পুনঃব্যবহার উল্লেখ্য। ‘জটায়ু’ গল্পে দুর্গা ও নেত্যাচরণের নিম্নবিত্ত জীবনের সংগ্রাম বিভিন্ন প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা নির্মিত হয়। নেত্যাচরণের হাহাকারের সঙ্গে জটায়ুর ব্যর্থতার মিল, বর্তমানের জটিল জীবনের সঙ্গে পৌরাণিক জটায়ুর জীবনভাষ্যের মিল। ‘মহাভারত’-র আখ্যানবস্তুর প্রভাবে দীপেন্দ্রনাথের ‘স্বয়ম্বর সভা’ লেখা হয়েছে। পুরাণকথাকে দীপেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন বিশ্রুত অতীতের সমাজচিত্র রূপে। পুরাণগুলিতে সে যুগের সংঘাতপূর্ণ সমাজের কথা রয়েছে, সেই সমাজেও শোষণ রয়েছে; এবং মহাভারতের ধর্ম-অধর্মের অস্পষ্ট সীমারেখাগুলো নতুন ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে।²⁴¹ দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলিতে কেলু কিংবা বাঘারুর শোষিতচেতনা সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক বা আকার পায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ যেমন প্রোটোগনিস্টকে আদর্শ (মডেল) হিসেবে বিবেচনা করে, বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলুরা তা নয়। সমাজতন্ত্রমুখী শ্রেণিচেতনাও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু, শাসকের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলে তাদের এবং নিজেদের সাধ্যমতো প্রত্যাখ্যানের অবয়ব তৈরি ক’রে নেয়। নবাবরূপ ভট্টাচার্যের শহুরে লুপ্তপ্রায় প্রলেতারিয়েতরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের খাঁচা অস্বীকার করে। পরিশীলিত ভাষা, সুনির্মিত সাংস্কৃতিক পরিসর, উচ্চবর্গীয় স্থিতিশীল নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণের প্রতি খিল্লি-ঠাট্টা ছুঁড়ে দিতে থাকে। সেই খিল্লি-ঠাট্টার চাঁদমারিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও থাকে। ফ্যাতাডুরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ ব্যবস্থার বদল ঘটাতে চায় না কিংবা শ্রেণিসংগ্রাম করতেও তাদের আগ্রহ নেই। তাদের ভাষা অশ্লীল, তাদের রুচি অমার্জিত এবং তাদের আচরণ-চেতনা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ থেকে বহুযোজন দূরে। হয়তো প্রগতিবাদী লেখক সঙ্ঘের ইস্তেহার অনুযায়ী ‘কাঙাল মালসাট’ ও ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’ অশ্লীলতা ও

প্রতিক্রিয়াশীলতার দায়ে অভিযুক্ত হত। বিশ্বায়ন-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং সমাজের আধিপত্যকারী চেতনাকে তারা আক্রমণ করে নির্দয়ভাবে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রোটাগনিস্ট ‘মডেল’ হওয়ার কথা এরকম-

its principal protagonist should be the positive hero, the fighter who destroys the old and creates the new, who defends the interests of the people, the hero inspired by the lofty spirit of partisanship and class struggle, who rejects bourgeois and revisionist ideology, who is ready to sacrifice even his life for the cause of socialism and communism. (Mato 2000)²⁴²

নবাবুর্গ এবং ইলিয়াস যাদের উপন্যাসের প্রধান কুশীলব ক’রে তুলছেন, তারা কেউ আদর্শ চরিত্র নয়। হারবার্ট বদলাভিমুখী সময়ের এক সংশয়দীর্ঘ চরিত্র। সে অবস্তুবাদী অলৌকিককে পূঁজি করে, সে খিস্তি দেয়, সে মস্তান-‘ছোটলোক’দের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে এবং সে ব্যর্থ দ্রোহী বিনুর স্মৃতিতে ওলোটপালট হয় মাঝেমাঝেই। তার ‘অপরিণত ব্রেন’ এবং ‘সবেতেই বড্ড মায়া’। হারবার্টের জীবনযাপন থেকে পেশা থেকে মৃত্যু-পরবর্তী ‘বিষ্ফোরক’ মুহূর্ত কোনওকিছুই কি আদর্শ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হতে পারে? ফ্যাতাডুরা কোনও আদর্শ নয়। বাঘারু-কেলু-খেতখেতু-চ্যারকেটুরা আদর্শ চরিত্রের ধারণাশা যায় না। ওসমান উন্মাদ আর আনোয়ার কমিউনিস্ট হয়েও দিশাহীন। বিশেষতঃ গ্রামীণ রাজনৈতিক পরিসরে তার মধ্যবিত্তসত্তার সঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে নির্বিকার দ্রোহচেতনা খাপ খায় না। খিজিরের উত্তরণ ঘটে দিশাহীন শ্রেণিচেতনাহীন ‘ব্যক্তি’ থেকে শাসকবিরোধী সামূহিক দ্রোহের ‘প্রতিনিধি’ হিসেবে, এমনকি আদর্শের জন্যে সে প্রাণও দেয়। তবু, তার ভাষা-আচরণ-চেতনা সমাজতান্ত্রিক মডেলের থেকে অনেক বেশি নৈরাজ্যবাদপ্রবণ। তমিজ ও তমিজের বাপ নিম্নবর্ণের হেরে যাওয়া মানুষ। তমিজের খোয়াব সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যমডেল মেনে কোনও পরিণতি পায় না। এরা কেউ সমাজতান্ত্রিক

মডেলের ‘আদর্শ’ চরিত্র নয়। কিন্তু, এরা উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরের নির্ভরযোগ্য আয়না।

ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েত লেখকদের সামনে কিছু উদ্দেশ্যমূলক কাঠামো তুলে ধরছেন, যাতে উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও কুশীলবদের আদর্শ প্রকরণ সম্বন্ধে অবহিত করছেন।

As the principal hero of our books we should choose labour, i.e., a person, organized by the processes of labour, who in our country is armed with the full might of modern technique, a person who, in his turn, So organizes labour that it becomes easier and more productive, raising it to the level of an art. (Gorky 1934)

ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখক সংঘের ইস্তেহারের নির্যাসও প্রায় এক। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ‘শ্রমজীবী’ কোনও অপরিবর্তনশীল অখণ্ড সত্তা নয়, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী সহজাত শ্রেণিচেতনাসম্পন্ন স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নয়; ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শ্রেণি ছাড়াও লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্ম তাঁদের দৈনন্দিনের এবং তাঁদের সত্তানির্মাণের অংশ। প্রগতিবাদী বাস্তবতায় এই বিষয়গুলি এড়িয়ে গেলে বাস্তব তো বর্ণিত হয়ই না, প্রগতির লক্ষ্যেও এগোনো যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ শ্রেণি ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ওপরেই সমস্ত গুরুত্ব ন্যস্ত করতে বলে। প্রগতিবাদী লেখক সঙ্ঘ শ্রমজীবী শ্রেণির অগ্রসরতার ওপরে আখ্যান নিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। রোম্যান্টিকতা ও মধ্যবিত্তনির্ভরতাকে নাকচ ক’রে শ্রমজীবী ও নিম্নবর্গকে আখ্যানে প্রতিষ্ঠা দেওয়া নিশ্চয় বিপ্লবাত্মক চিন্তা, কিন্তু এই প্রশ্নটিও থেকে যায় যে, ‘বিশুদ্ধ প্রলেতারিয়’ সাহিত্য-শিল্প আদৌ সম্ভব কিনা। আর, প্রলেতারিয় বা নির্বিত্ত মানেই তার চেতনা মার্ক্সবাদ-অনুসারী হবে কিংবা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী গুণের আধার হবে সে, এমনটা অবাস্তব কিংবা আরোপিত জবরদস্তি-বাস্তব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ তথা মার্ক্সীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নন্দনতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল এনেছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু শাসকবিরোধী সাহিত্যে সেটিই একমাত্র ধ্রুবতত্ত্ব, এমনটা নয়। যদিও,

গোর্কি তাঁর তত্ত্বে যান্ত্রিক আদর্শবাদের বদলে সৃজনশীলতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন, কিন্তু সেই সৃজনশীলতা নেতৃত্ব পাবে পার্টিনেতৃত্বের নৈতিক প্রভাব থেকে। লেখকদের মনে যৌথদায়িত্ব তথা শ্রমজীবীদের মুক্তির দিশাদর্শী সাহিত্যরচনা ও সাম্যবাদী যাপন সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলাই তার মূল কাজ।²⁴³ গোর্কি ব্যক্তি লেখকের চিন্তা ও বিকাশকে রুদ্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব করছেন না, বরং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ব্যক্তির চেতনার স্ফূরণ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে সেই আশা করছেন। চিন্মোহন সেহানবীশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দেন যে, সাহিত্যিককে সংগ্রামী এলাকায় গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে লেখার কথাবস্তু তথা সৃষ্টিশীলতা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু, মানিক এই উপদেশকে আদর্শের যান্ত্রিকতা এবং সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে নাকচ করেন।²⁴⁴ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানিকের বেশ কয়েক দশক পরে উপন্যাস গল্প লিখছেন, কিন্তু ইলিয়াসও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে নিজস্ব আখ্যানপদ্ধতি নির্মাণ করছেন। রাজনৈতিক অসচেতনকে (political unconscious) উপস্থাপনের পাশাপাশি খোয়াব, আকাঙ্ক্ষা, লোকবিশ্বাসের ভিতরের সত্যকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক'রে তুলছেন। বাস্তবতার পৃষ্ঠদেশ নয়, বরং বাস্তবতার ভেতরে অপ্রকাশ্য যে দ্বন্দ্বগুলো থাকে, ইলিয়াস মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তাকে খুঁজতে চাইছেন আখ্যানে। ফ্রেডরিখ খোয়াবদর্শনের পাঠ, ইউরোপীয় আধুনিকতা এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ- ইলিয়াস এই সব পদ্ধতি এড়িয়ে নিজস্ব দেশীয় পদ্ধতি খুঁজে নিচ্ছেন। “In this broken scenario without socialism Elias had to create his own model which remained faithful to the aesthetic integrity of the critical realists and to the elegiac correlative of his reality.”²⁴⁵ ইলিয়াস তত্ত্বায়িত শ্রমজীবীদের ছাঁচ নাকচ ক'রে উপমহাদেশে বহু সত্তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা শ্রমজীবীর বাস্তবতা আখ্যায়িত করেছেন। ‘খোয়াবনামা’-র তমিজ আখ্যানের শুরু থেকেই শ্রেণিসচেতন, সংগ্রামাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার চেতনার স্তর একরৈখিক গতিতে এগোয়নি। তেভাগা আন্দোলনরত বর্গাচাষীদের প্রথমে ‘উপদ্রব’ মনে করলেও, আখ্যানের গতিপথে তার চেতনার স্তর উন্নীত হয়েছে। পেশাবদল হয়েছে, শ্রেণিসচেতনতা এসেছে, কৃষিকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষার

বদল হয়েছে এবং লড়াইবিমুখ থেকে লড়াকু কৃষকে পরিণত হয়েছে। আর, এই উত্তরণের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাও জড়িয়ে থেকেকেছে। শ্রেণিচেতনা ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উন্নতি একে অন্যের পরিপূরক। শত্রু-মিত্র চিনে নেবার অনুশীলনে তমিজ সংশয়দীর্ণ। তাই ‘ক্লাস-ইন-ইটসেল্ফ’-র চেতনা তার তৈরি হয় নি; আখ্যানের শেষেও তাকে একাই যেতে হয়েছে শান্তাহার-নগরায় জঙ্গি কৃষকান্দোলনে যোগ দিতে। আদর্শ প্রগতিবাদীর মতো লিঙ্গসাম্যের ধারণা কিংবা নাস্তিকতার চেতনা তমিজের মধ্যে নেই। কেরামত আলি, বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কুলসুমের মতো নিপীড়িত সত্তারা ধর্মবিমুখ নয়; কিন্তু তাদের ধর্মবোধ সামাজিক উচ্চবর্গের (হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের) ধর্মবোধ থেকে স্বতন্ত্র। ইলিয়াস ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু বৈকুণ্ঠ, কেরামতদের বয়ানে এবং চেরাগ আলির অদৃশ্য উপস্থিতিতে লোকেয়ত বিশ্বাস প্রতিরোধের ভাষ্য হয়ে উঠেছে। সামাজিক উচ্চবর্গের আধিপত্যকারী (hegemonic) ধর্মীয় প্রতর্কের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী বয়ান হাজির করেছে। আর, এই উপাদানগুলি উপন্যাসকে রাজনৈতিক ক’রে তুলেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদী সাহিত্যবিতর্কের কয়েকটি উল্লেখবিন্দু হচ্ছে- উনিশ শতকীয় ‘নবজাগরণ’, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্যব্যাপ্তি এবং উপনিবেশিত চেতনার পরিসর থেকে সাহিত্যকে বের ক’রে আনা। সত্তর দশক এবং তৎপরবর্তী দশকেও এই প্রতর্কগুলির বিতর্ক চলতে থাকে। উত্তর-উপনিবেশিক বাংলায় সাহিত্যের অভিমুখ কী হবে এবং সাহিত্য নিপীড়িত জনগণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারবে কিনা, এই প্রশ্নগুলি চলতে থাকে। সাহিত্যের আঙ্গিক, ভাষা এবং স্থানিকতা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকে। অন্ধপ্রদেশের বিপ্লববাদী লেখক সংঘ এই বিতর্কগুলি সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা জারি রেখেছে আজও। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যান্ত্রিক সূত্রায়ণ এবং উচ্চশ্রেণি+উদারনৈতিক মতাদর্শের এঁচে দেওয়া আধুনিকতার সূত্রসমূহ (যার অধিকাংশই ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া) এই দু’টিকেই অস্বীকার ক’রে দেশীয় অনুশীলন পদ্ধতিতে তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করছে তারা।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের অন্যান্য ভাষায় প্রগতিবাদী সাহিত্য সঙ্ঘ থেকে বিপ্লববাদী লেখক সংঘের এমন ধনাত্মক বিবর্তনের উদাহরণ আর নেই।

উপন্যাসের ‘আঞ্চলিকতা’-র রাজনীতি এবং ‘বৃত্তান্ত’-র নির্মাণ

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ ও ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ কি আঞ্চলিক উপন্যাস? আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে?

“A novel describing people and landscape of an actual locality outside the metropolis... primarily studies of individual societies and characters”²⁴⁶

উপন্যাস সংরূপের একটি শাখা হিসেবে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বিকাশলাভ করে আয়ারল্যান্ডে ও স্কটল্যান্ডে। মারিয়া এজওয়ার্থ (আইরিশ) ও জন গল্ট (স্কটিশ) নামক দুই ঔপন্যাসিক ‘মূল জনপদ (metropolis)’ থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের মানুষজন, তাদের যাপন ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাস লেখেন।²⁴⁷ ওয়াল্টার স্কট ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ আঞ্চলিক রীতি-প্রথার সঙ্গে প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা ক’রে আঞ্চলিক উপন্যাস লিখলেন। এই ধারা ইংরেজি সাহিত্য থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় প্রতিগৃহীত হল। স্কট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের আদি প্রাণপুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারায় সুবিখ্যাত অবিখ্যাত অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখেছেন। মেট্রোপলিস বা মূল জনপদের বাইরের জীবন নিয়ে এঁরা অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপন্যাসই মেট্রোপলিসের বাইরের তথা বিশেষ কোনও অঞ্চলের বিশেষ কোনও সময়ের ইতিহাসগত তথ্য ও মানুষদের নিয়ে লেখা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো এত বিস্তারে বাংলার পল্লীসমাজ ও পল্লীসমাজের মানুষকে কেউ উপন্যাসবদ্ধ করেননি। কিন্তু, এগুলি কোনওটাই আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নির্দিষ্ট এলাকা ও পল্লীসমাজের বহু উল্লেখ থাকলেও, কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের অভাবের জন্যেই সেগুলি ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বলে পরিগণিত হয় না। মেয়ার আব্রামস আঞ্চলিক

উপন্যাসের সংজ্ঞায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলেন, তা হচ্ছে আঞ্চলিক রঙ (local colour). একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিন্যাস, ভাষা, সামাজিক কাঠামো ও রীতি-প্রথাকে আখ্যানবদ্ধ করায় জোর দেয় আঞ্চলিক উপন্যাস। এইগুলি শুধু আঞ্চলিক রঙ ফুটিয়ে তুলতেই নয়, বরং প্রতিটি কুশীলবের চরিত্রগঠন ও বিকাশ এবং তাদের আচরণ, ভাষা, চিন্তাভাবনা ও বহির্জগতের সঙ্গে আদানপ্রদানেও জরুরি।²⁴⁸ লি টেমেন ‘Regional and local colour Literature’-এর বর্ণনা করছেন, এবং তাঁর যুক্তিমতো এই বর্ণ রোম্যান্টসিজমের কিছু উপাদান থেকে বিকাশলাভ করেছে।²⁴⁹ মার্টিন গ্রে²⁵⁰, জে কাডন²⁵¹ প্রমুখ সমালোচকরা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের (প্রধানতঃ মফস্বল বা গ্রামীণ) ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং মানুষের যাপন, ভাষা ও চেতনার প্রকাশের ওপরে জোর দিয়েছেন। স্নেল তাঁর বিশ্লেষণে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তাতে আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রদের শ্রেণি ও বিভেদের কথা বলেছেন। মূল চরিত্ররা মধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষ হন এবং তাঁদের সংলাপ ও আদানপ্রদান বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়।²⁵² ক্যারেন ল্যামবার্ট আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রগুণে যোগ করলেন সেই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সত্তার কথা।²⁵³ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত, সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত’ কোনও অঞ্চলের সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবীদের জীবনবোধের বৈশিষ্ট্য জুড়ে নিলেন আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়। কিন্তু, আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল এবং সেই সংশয়ের পেছনে কিছু যুক্তিও ছিল। প্রধান যুক্তি হচ্ছে, বাংলার রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমির আঞ্চলিক জীবনকাহিনীতে সমাজরীতি ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও সার্বিকভাবে সেগুলি বৃহত্তর অঞ্চল বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ।²⁵⁴ শ্রীকুমার আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য যে উপাদানগুলির উল্লেখ করছেন, সেগুলি ইউরোপীয় উপাদানের থেকে আলাদা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা ছোট ভূমিখণ্ডের পটভূমিতে লেখা উপন্যাসে ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসন গুরুত্ব পায়, বাসিন্দাদের ‘আদিমযুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার’ থাকে এবং সমষ্টির ইচ্ছে ব্যক্তির ইচ্ছের কণ্ঠরোধ করে- এগুলিই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান উপাদান।²⁵⁵ এই গোষ্ঠীচেতনা,

শ্রমজীবীদের বিশেষত্ব, নিম্নশ্রেণির মানুষের বিশ্বাস-ধর্ম-রীতি-প্রথা ও অঞ্চলের সঙ্গে সেখানকার মানুষের ‘অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগ’-এর কথা দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ও তাঁর নির্ধারিত সংজ্ঞায় বলেছেন।²⁵⁶ আব্রাম উল্লিখিত ‘আঞ্চলিক রঙ (local colour)’-এর কথাই এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ‘টোঁড়াইচরিত মানস’কে সার্থক ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বলেছেন তিনটি উপাদান তথা শর্তের ভিত্তিতে- অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও শিল্পগত নির্লিপ্তি।²⁵⁷ আঞ্চলিক উপন্যাসের যে দু’টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন তা হল, প্রকৃতি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠে মানবমনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠীচেতনার সামঞ্জস্যে জীবনবোধের একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।²⁵⁸ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন,

১. একটি বিশেষ পরিবেশধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস- বিশেষ সেই গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতি, ২. তাদের জীবিকার সাবেকি পরিচয়, ৩. তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য... প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসে দেখা যায়- বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৩, ২৫৩)

তবে, বাংলা সাহিত্যের রাজনীতিতে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বর্গভাগের রাজনীতিটিও খেয়াল করা প্রয়োজন। উপরোক্ত প্রত্যেক সমালোচকের নির্ণীত সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানবজীবনে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ছাড়াও যে সাধারণ উপাদানদু’টির কথা রয়েছে, তা হচ্ছে কৌমজীবন (বা/ও অনাধুনিক জীবন) ‘উপভাষা (dialect)’। উপভাষা শব্দটি প্রয়োগের রাজনীতি রয়েছে। উপভাষা কী? একই ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক পার্থক্য, তাকে বলে আঞ্চলিক উপভাষা- এই আঞ্চলিক পার্থক্যগুলির মধ্যে কোনও একটি উপভাষাকে মান্যভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বাকি ভাষাগুলি ‘উপভাষা’ হিসেবেই গণ্য হয়। অর্থাৎ, যা মূল ভাষা না। উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ, যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে

প্রচলিত এবং যার সঙ্গে মান্যভাষা (Standard language) ও সাহিত্যভাষার (Literary Language) ধ্বনিগত রূপগত ও বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য রয়েছে।²⁵⁹ অর্থাৎ মান্যভাষার থেকে ‘মান’ কম হল এবং ওই ভাষায় সাহিত্যরচনা করলে তা ‘সাহিত্য’ভাষা বলে পরিগণিত হবে না এমন ইঙ্গিতও রইল। রামেশ্বর শ দু’টি বিষয়ে ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য করতে চেয়েছেন- স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে ভাষাপার্থক্য, যদিও এই পার্থক্যগুলিকে ‘আপেক্ষিক’ বলেও মন্তব্য করেছেন।²⁶⁰ ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা যে উপভাষার অন্যতম শর্ত, তার বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন রাঢ়ী ও চট্টগ্রামী উপভাষার পারস্পরিক বোধগম্যতাহীনতার যুক্তিতে। কারণ, বোধগম্যতা বিষয়টি ব্যক্তিভেদে পাল্টায় (subjective)। এরপরেই রামেশ্বর বাবু দু’টি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট বলছেন- ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শ রূপ থাকে, যাতে সমস্ত মান্য কাজকর্ম ও সাহিত্যরচনা সম্পন্ন হয়; ‘আধুনিক শিষ্ট সাহিত্যে উপভাষার ব্যবহার’ হয় লোকজীবনকে তুলে ধরতে। এবং, “উপভাষাগুলিতে সাধারণত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিশেষ রচিত হয় না” (শ ১৮১৯, ৬৪৮)। বাংলা ভাষাকে পাঁচটি উপভাষায় (অঞ্চলভিত্তিক পৃথক রূপ) ও তাদের বিভাষায় (sub-dialect) ভাগ ক’রে বিশ্লেষণ করেছেন রামেশ্বর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রাঢ়, পুণ্ড্র, কামরূপ ও বঙ্গ এই চারটি ভাগে বাংলার উপভাষাবিভাগ করেছিলেন।²⁶¹ ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব সরিয়ে রেখে সাহিত্যের রাজনীতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ‘উপভাষা’র অবজ্ঞা অবহেলাজনিত সংজ্ঞায়ন বোঝা যায়। ‘উপ’ অর্থে যা প্রধান নয়, যা মান্য নয় এবং সহজেই যাকে অবজ্ঞা করে বা ছেঁটে ফেলে মূল ভাষাতে ফিরতে হয়। ভাষার অপমানটি ঠিক এইখানে হয়। আর্থ-সামাজিকভাবে সবচেয়ে ‘এগিয়ে’ থাকা অঞ্চল তথা বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষাকেই ‘আদর্শ’ বিবেচনা করা হয়। প্রান্তিক হয়ে যায় একই ভাষার ভিন্ন কথ্যরূপের অধিবাসীরা, প্রান্তিক হয়ে যায় তাদের মাতৃভাষা। প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রয়োজনীয়তায় তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে অভিযোজিত হতে হয় শাসকের ও শাসককেন্দ্রিক অঞ্চলের ভাষায় সংস্কৃতিতে। নাহলে অবজ্ঞা, নাহলে ঠাট্টা এবং ‘উপভাষা’ বলে কোণঠাসা ক’রে

দেওয়া। কখনও বা মান্যভাষা যাঁদের মাতৃভাষা, সেই সাহিত্যিকরা অনুকম্পাবশতঃ ‘আঞ্চলিক ভাষা’য় কয়েকটি সংলাপ রাখেন তাঁদের লেখা আখ্যানে। রামেশ্বর যেমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উপভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচনা হয় না এবং মান্যভাষাচর্চাকারী সাহিত্যিকরা মান্য-অঞ্চলের আখ্যানের সহায়ক কোনও লোকজীবনকে বর্ণনা করতে উপভাষা ব্যবহার করেন। সাহিত্যের মান্যভাষাকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে নিম্নবর্ণের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা ক’রে তোলার সচেতন প্রতিস্পর্ধা ষাট-সত্তর দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতির সবচেয়ে বড় সাফল্য। তার আগে কি কুশীলবদের সংলাপে অ-প্রমিত বাংলা বা ‘আঞ্চলিক’ ভাষা থাকত না? নিশ্চয়ই থাকত। প্রথমতঃ, মান্য সাহিত্যভাষার আধিপত্যে সেই ভাষা ঠেকনা দেওয়ার কাজ করত বা অবাস্তর বয়ান হিসেবে রয়ে যেত। মূল কুশীলবদের তুলনায় আখ্যানে তাদের স্থান যে কতটা নগণ্য, সেটাও নিষ্ঠ পাঠক অনুধাবন করতেন। দ্বিতীয়তঃ, যে কুশীলবেরা এই মাতৃভাষা ব্যবহার করতেন সংলাপে, তাঁরা আখ্যানের অপ্রধান বা অতিনগণ্য কুশীলব। ফলে, প্রমিত শুদ্ধ বিশিষ্ট মান্যভাষাকে প্রত্যাহ্বান জানানোর প্রশ্নই উঠত না। তৃতীয়তঃ, কথ্যভাষার প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই আরোপিত। সেই ভাষা কুশীলবদের চেতনাজারিত শ্রমজারিত ও সংস্কৃতিজারিত নয়। আখ্যানের সঙ্গে মিশে যেতে পারত না, কারণ আখ্যানকার ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের চেতনার ছাঁচে কুশীলব ও তাঁদের ভাষাকে সাজিয়ে নিতেন। বসাই টুডু এই প্রতর্কের বিরুদ্ধে সঘোষ বয়ান নিয়ে উপস্থিত হল সত্তর দশকের মাঝামাঝি। জঙ্গলমহলের বসাই টুডু, দোপ্‌দী মেঝেনরা ‘বাবু’ সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করল। মান্য ও প্রমিত ভাষাপ্রয়োগের আধিপত্য এড়িয়ে মহাশ্বেতা বসাই টুডু দোপ্‌দী মেঝেনদের ভাষাকে আখ্যানের ভাষা ক’রে তুললেন। দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বাঘারুর ভাষাহীনতার ভাষাকে আধিপত্যমূলক ক’রে তুললেন। না-ভাষা দিয়েই মান্য ভাষার রাজনীতিকে প্রত্যাহ্বান ক’রে চলল বাঘারু। ভাষা মানে শুধু সংলাপে এঁটে দেওয়া কুশীলবের বাচনভঙ্গি নয়। ভাষা মানে প্রবাদ, প্রবচন, প্রচলিত ছড়া-গান, টিটকিরি, অঞ্চলভেদে পাণ্টে যাওয়া শব্দ ও শব্দার্থ এবং ভাষা মানে প্রবহমান সংস্কৃতি। ভাষা মানে কুশীলবদের শ্রেণিচরিত্রের

ও সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন। বাংলা ভাষার বহু রূপভেদ, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলা সাহিত্য সেই সবকিছুকেই ধারণ করে, শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাকাঠামো আর প্রমিত শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে লেখা সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য নয়। ‘আঞ্চলিক সাহিত্য’ বর্গভাগকে প্রত্যাঙ্গান জানিয়ে সৈকত রক্ষিত, দেবেশ রায়ের মতো সাহিত্যিকেরা মান্যভাষার তথা ‘মূলধারা’র সাহিত্যের রাজনীতিকে প্রশ্নের মুখে ফেললেন। সৈকত রক্ষিত মানভূম অঞ্চলের ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্যরচনা করলেন। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ার্সনের চর্চা থেকে বহু আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে (ক) মানভূমের ভাষা বাংলা এবং এর ভাষিক রূপ ঝাড়খণ্ডী উপভাষার অন্তর্গত এবং (খ) উচ্চারণের সাপেক্ষে মান্য বাংলার সঙ্গে এর সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।²⁶² সুনীতিকুমার যদিও মানভূমের ভাষাকে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি না দিয়ে রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিন্তু ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত জেলা গেজেটে স্বতন্ত্র মানভূমি উপভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর, এই গেজেটে ১৯৭১ সালের আদমসুমারির হিসেব ধরে মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এই অঞ্চলের নিম্নবিত্ত কৃষক ও শ্রমজীবীরা বিশেষতঃ নিম্নবর্ণ মানুষ মানভূমি বিভাষায় (sub-dialect) কথা বলেন। মানভূমিকে একই অঞ্চলের বিভাষা ও উপভাষা দু’ভাবেই উল্লেখ ক’রে মান্যভাষা ও উপভাষা সম্পর্কিত বক্তব্য রাখা হচ্ছে গেজেটে, “The Manbhumia-speakers replace certain vowel sounds of the Standard Colloquial Bengali by certain other vowel sounds” (Sen 1985, 108)- মান্য বাংলা তথা সাহিত্যিক বাংলার থেকে উপভাষা যে কতটা আলাদা, তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষা ও সাহিত্যকে প্রমিত আখ্যা দিয়ে মান্যতার মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার রাজনীতির সঙ্গেই ‘আঞ্চলিক সাহিত্য’ বর্গভাগের রাজনীতিও জড়িয়ে থাকে। কলকাতা ও তৎকেন্দ্রিক অঞ্চলের মানুষজনের ভাষা, পোশাক-আশাক, ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে লেখা উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয় না! কলকাতার বাসিন্দাদের উচ্চারণে যে বৈশিষ্ট্য, তা কি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য? ‘আঞ্চলিক রঙ (local colour)’ আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম

উপাদান বলে সমালোচকরা স্বীকার করছেন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক রঙ নেই, যাতে ‘শ্রমজীবীদের বিশেষত্ব, নিম্নশ্রেণির মানুষের বিশ্বাস-ধর্ম-রীতি-প্রথা ও অঞ্চলের সঙ্গে সেখানকার মানুষের ‘অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগ’, যেমনটা দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তেমনটা ধরা পড়ে? সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ‘অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য’-এর কথা বলেছেন, ভদ্রলোক কলকাতাবাসীদের সঙ্গে এই শব্দগুলি মানায় না বলে কি ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের অনুভূতি নিয়ে লেখা উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস বলে পরিগণিত হয় না? প্রশাসনিক মান্য অঞ্চলে কৌমসংস্কৃতি ও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচেতনার অভাব দেখা যায় দু’টি কারণে- (১) প্রশাসনিক মান্য শহরে বহু গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন এবং (২) তথাকথিত আধুনিকতার লক্ষণগুলি অতিপ্রকট হয়। কিন্তু, আঞ্চলিক উপন্যাস তকমা দিয়ে মূলবৃত্তের উপন্যাসের থেকে ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাসকে প্রান্তিক ক’রে দেওয়ার ভদ্রলোকীয় চেষ্টা বহু দশকের। যে আখ্যানে মধ্যবিত্তের যাপন, তাদের আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা, তাদের প্রমিত-অপ্রমিত মূল্যবোধ এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদান নেই, সেগুলিকেই ‘আঞ্চলিক’ বর্ণভুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে।

দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ ও ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’, সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসগুলি বা ‘মাড়াইকল’ গল্পগ্রন্থ, অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ এগুলি কি আঞ্চলিক উপন্যাস? অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যে ‘টোঁড়াইচরিত মানস’কে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, সেই ‘টোঁড়াইচরিত মানস’-ই প্রথম বাংলাসাহিত্যের মান্যসাহিত্য মান্যভাষা ও মান্যচরিত্রের নির্মাণকে প্রত্যাহ্বান জানায়। এই উপন্যাসের নির্মাণ সম্পর্কে দেবেশ রায়ের অভিমত, “আমাদের বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত ফর্ম প্রত্যাহ্বাত হল আর প্রস্তাবিত হল কাহিনির এক নতুন বিন্যাস।”²⁶³ সতীনাথ ভাদুড়ি বাংলা উপন্যাসে বাঙালিকে প্রান্তিক কুশীলব ক’রে ঠাঁই দিলেন আখ্যানে এবং শূদ্র নিম্নবর্ণ টোঁড়াইকে ক’রে তুললেন নায়ক। বাংলাভাষী কুশীলবদের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন সতীনাথ, সচেতনভাবেই তার সঙ্গে কলকাতাইয়া

‘আদর্শ’ মান্য চলিতের পার্থক্য রেখেছেন। ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এ স্থানীয় ভাষার ব্যবহার বেশি এবং সিংহভাগ কুশীলবের ভাষা পূর্ণিয়া জেলার মৈথিলী। ‘অচিন রাগিনী’ উপন্যাসের মুখ্য কুশীলবেরা বাঙালি অথচ মূল বঙ্গভূমের বাইরের বাসিন্দা তাঁরা। পিলে নামক চরিত্রের উচ্চারণ ও বাংলাকথন কলকাতার চলিত বাংলাভাষীদের কাছে হাস্যকর ঠেকে। সতীনাথকে বারবার পাদটীকা সংযোজন করতে হয় ‘জাগরী’ এবং ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ উপন্যাসে। কারণ, ‘প্রমিত’ বাংলার পাঠকদের কাছে পূর্ণিয়ার স্থানীয় ভাষা ও বাংলা উচ্চারণ ‘অবোধ্য’ ঠেকবে বলেই সতীনাথ উপন্যাসে ‘পাদটীকা’ দেওয়ার মতো অভূতপূর্ব কাজ করেছেন। যদিও, উদয়নারায়ণ সিংহের মতে, পাদটীকায় স্থানীয় মৈথিলী ভাষার যে বাংলা প্রতিশব্দ দিয়েছেন সতীনাথ, তাতে কিছু ভুল থেকে গেছে এবং কুশীলবদের উচ্চারণে স্থানীয় ভাষা আখ্যানবদ্ধ করতে গিয়ে উচ্চারণে কিছু ভুল লিখেছেন সতীনাথ।²⁶⁴ বিহারের পূর্ণিয়ার এক অনামী প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজীবন, সামাজিকতা ও রাজনীতি সমগ্র ভারতবর্ষের আয়না হয়ে উঠল বাঙালি পাঠকের চোখে। ভদ্রসন্তানদের নিয়ে লেখা আখ্যান, ভদ্রসন্তানদের দুঃখ-সুখ-প্রত্যাশার হালহকিকত নিয়ে লেখা আখ্যান এই উপন্যাস নয় বরং ক্রমশঃই সেই চেনাবৃত্ত থেকে পাঠককে বিযুক্ত ক’রে চলে। বাংলাদেশের এসএসসি প্রোগ্রাম পাঠ্যপুস্তকে ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ ও ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উভয়কেই আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।²⁶⁵ কিন্তু, ঢোঁড়াইয়ের আখ্যান যে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’-র সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা বোঝা যায় রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বয়ানে। দেশ কী? দেশের নাগরিক কারা? তাঁদের প্রত্যাশা, যাপন, দৈনন্দিন ও দৃষ্টিভঙ্গি কী? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হতে থাকে ঢোঁড়াই। আখ্যানের রূপান্তর ঘটতে থাকে রাজনীতি ও ইতিহাসের বিশাল পরিসরে অন্তর্ঘাত ঘটাতে ঘটাতে। বাখতিনের ‘নভেলাইজেশন’ বা নবায়নের পদ্ধতি উদ্ঘাটিত হতে থাকে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানসে’ এবং মহাকাব্যিক কাঠামো ভেঙ্গেচুরে আধুনিক সংজ্ঞায়নের ‘উপন্যাস’-র আঙ্গিক পরে নিতে থাকে এই আখ্যান।²⁶⁶ সুমিতা চক্রবর্তী লিখছেন “ভারতবর্ষের সমগ্রতাকে একটি উপন্যাসের আধারে

বিন্যস্ত করবার অতিদুরূহ প্রয়াস এতটা সার্থক আর কোনও উপন্যাসে হয় নি।”²⁶⁷ ঢোঁড়াইয়ের বিবর্তন তাকে জননায়ক ক’রে তোলে। তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’-এর রাম জনমননায়ক হয়ে উঠেছিল যেভাবে, আধুনিক রাজনৈতিক সমাজে ঢোঁড়াইয়ের নির্মাণও তাকে অনুসরণ করে। উপন্যাসের পর্বভাগও রামায়ণের ‘কাণ্ড’গুলির অনুকরণে নামাঙ্কিত। এই উপন্যাসের চরণ ও কাণ্ডগুলিতে ‘সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট বা কালচারাল এনথ্রোপলজিস্টের সততা’ মিশেছে বলেই মহাকাব্যসম আখ্যান হতে পেরেছে।²⁶⁸ মহাকাব্য রামায়ণের বীররস ও রৌদ্ররস ঢোঁড়াইয়ের আখ্যানে নেই, বরং আধিপত্য করছে করুণরস ও শান্তরস। ঢোঁড়াই জন্মের পরেই অনাথ²⁶⁹, ঢোঁড়াই আত্মসন্ধানের পথে এগোতে এগোতে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যায়; তাৎসাম্যমাজের থেকে শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে না, ধাক্কর সমাজের সঙ্গে শিকড়ের সম্পর্কে জড়াতে পারে না এবং কোয়ারীটোলায় রাজনীতিতে জড়িয়েও পরাজয়ের ছাপ এড়াতে পারে না। “ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়”²⁷⁰ এই উপন্যাসে রামায়ণ তথা ‘রামচরিত মানস’-এর পুনর্পাঠ হয়, যেখানে ‘রোজা, রোজগার, রামায়ণ’ নিয়ে তাৎমাটুলির জীবন হলেও ঢোঁড়াই সেই জীবনযাপনকে অস্বীকার ক’রে নিজের সত্তানুসন্ধান করে। পুরনো সমাজকে অস্বীকার ক’রে, শিকড়কে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়ে এবং নতুন সংঘাতের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা পেতে চেয়ে ঢোঁড়াই কোয়েরী সমাজের রাজনৈতিক-সামাজিক নেতা হয়ে ওঠে। ঢোঁড়াই তার নিজস্ব সত্তাবলে ‘রামচরিতমানস’-এর প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারত কিন্তু একইসঙ্গে তা প্রামাণিক বিবরণ হয়ে উঠতে পেরেছে ঔপন্যাসিকের কল্পনার স্বায়ত্তশাসনের জোরে।²⁷¹ সামাজিক উচ্চবর্গের (রাজপুত, ভূমিহার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ) নেতা হয়ে গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় রাজনীতির অন্ত্যজশ্রেণির প্রতিভূ হয়ে ওঠে ঢোঁড়াই। কিন্তু, মহাকাব্যের রামচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক ‘রামচন্দ্রজীর’ পার্থক্য এই যে, জাতীয় রাজনীতির সর্বগ্রাসী শূন্যতা বুকে নিয়ে তাৎমাটুলি ধাক্করটুলির শিকড়েই ফিরতে হয় ঢোঁড়াইকে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শাসনের জোড়া ফলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঢোঁড়াই উপলব্ধি করে, “সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে কোথাও নেই পা রাখবার একটু শক্ত জমি”²⁷² এবং এই

উপলব্ধিই উপন্যাসটিকে মহাকাব্য হতে দেয় না বরং নিম্নবর্ণের সর্বভারতীয় আখ্যান ক’রে তোলে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অন্ত্যজ, রাজনীতিগতভাবে অশুদ্ধ (politically incorrect) ঢোঁড়াই মহাকাব্যের রামচন্দ্র তো নয়ই, এমনকি আধুনিক উপন্যাস সংরূপে নির্মিত মান্য, শুদ্ধ, দিগ্‌দর্শী নায়কও হতে পারে না। কিন্তু, সতীনাথ এহেন ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই আধুনিক ভারতকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং এই আবিষ্কারের পদ্ধতিতেই সামাজিকতা ও লোকরীতির খুঁটিনাটি বর্ণনা পরিত্যাগ করেননি। এই বর্ণনাগুলি উপন্যাসের আধুনিকতার পথে অন্তরায় এবং আধুনিক সমাজের আখ্যানবদ্ধতার বিপ্রতীপমনস্ক, কিন্তু ভুলে গেলে চলে না যে ভারতবর্ষের বিশালতায় কিংবদন্তী, মৌখিকতা, লোকবিশ্বাস, ‘অসংস্কৃত’ উদ্‌যাপন ঘোরতর বাস্তব। এগুলিকে উপন্যাসের পরিসর থেকে প্রাগাধুনিক তকমা এঁটে বা অসংস্কৃত তকমা এঁটে কিংবা আঞ্চলিক বলে দেগে দিয়ে বাদ দেওয়া মানে সামাজিক রাজনীতির শিরদাঁড়াকে অস্বীকার করা। ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রে ভারতীয় এপিকতা একমাত্র ‘রামচরিতমানস’-এর আধারেই মানায়- ঢোঁড়াইয়ের মত চরিত্র এবং উপন্যাসমাধ্যম দু’য়ের সম্পর্কে এটি আবিষ্কারের মধ্যেই রয়েছে ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে নতুন এক আধুনিকবোধ।²⁷³ ধাক্করদের জীবনে বাঙ্গা-বাঙ্গীর নির্দেশের গুরুত্ব অসীম। বৌকামাই মৃত্যুশয্যায় লৌকিক বিশ্বাসে পূর্ণ উপদেশ দিয়ে যায় বৌকাকে- তাতে প্রকৃতিতত্ত্ব যেমন থাকে, তেমনই থাকে কুসংস্কার। প্রকৃতি আখ্যানের সঙ্গে অঙ্গঙ্গী হয়ে থাকে, কিন্তু সতীনাথ প্রকৃতিবাদী চোরাবালিতে আটকে যান না বরং ‘ঢোঁড়াইচরিত’-এর আঞ্চলিকতা আদতে বাস্তবিকতার নামান্তর²⁷⁴ এবং সতীনাথের বস্তুনিষ্ঠ মানবপর্যবেক্ষণের ফসল। দেবদেবীর জন্ম নিয়ে সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস, জিরানিয়ায় লৌকিক বিশ্বাসে তৈরি হওয়া মন্দিরের গল্প- এসবই দেশজ উপন্যাস নির্মাণ করে। জিরানিয়ায় রামজির মন্দির বানানো ‘মিলিট্রি বাওয়া’-র সমাধিস্থানে ‘মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি’ তৈরি হয়ে যায়। ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিয়ের বর্ণনায় লৌকিকতা-সংস্কারের বিশদ বর্ণনা দেন কথক। প্রবাদ-প্রবচন আখ্যানের দেশজ উপাদানের গভীরতা বাড়ায় আরও। লৌকিক বিশ্বাস, মুখফেরতা কাহিনি ও কিংবদন্তী যেগুলি আখ্যানে আছে, তা শুধু সমাজের নিশ্চলতা ও

পশ্চাদপদ সংস্কৃতি বোঝানোর জন্যে নয়। এগুলির রাজনৈতিক অভিমুখও আছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ লাউয়ের খোসায় ‘গান্ধী বাওয়ার’ মুখ আবিষ্কারের ঘটনা। গান্ধীর জনপ্রিয়তা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে গান্ধীর নিজস্ব অবয়ব তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। কোথাও সেনাপতির বেশে, কোথাও সশস্ত্র অশ্বারোহীর বেশে কোথাও দুঃখহরণ ভগবানের রূপকল্পে গান্ধীকে কল্পনা ক’রে নিত দেশবাসী।²⁷⁵ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা উদ্ভূত ‘অস্পৃশ্য’দের মর্যাদাবৃদ্ধি ও উন্নয়নে ১৯৩০ সালের পর থেকে গান্ধী ও আশ্বেদকরের মতবিরোধ হলেও, মহাত্মা গান্ধীর সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা নিম্নবর্ণ নিম্নবর্ণ জনপদের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। লাউয়ের খোসায় মহাত্মা গান্ধীর ‘কাল্পনিক’ মুখ খুঁজে পাওয়াকে ঘিরে যে উন্মাদনা তৈরি হয়, তাতে গান্ধী বাওয়া ভগবানের আসন পান। আর, গান্ধীর জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ভলান্টিয়ারবাবু বা লাডলীবাবুরা আখের গুছিয়ে নেয়। শ্রেণিরাজনীতি আর বর্ণরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে জিরানিয়া এবং বহিজিরানিয়ার রাজনীতি-সমাজনীতিকে। শোষণ, নিপীড়ন আর দুর্নীতির কাছে বারবার ঠকে গিয়েও হেরে গিয়েও সংগ্রামের শক্তি জুগিয়ে নিয়েছে ঠিক। এই আখ্যান ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়কাল নিয়ে, যখন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ের সঙ্গে অজ্ঞতা-অশিক্ষা সমান্তরাল প্রবাহে বইছে এবং ঢোঁড়াই যখন গণনায়ক হয়ে উঠে ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক অভিমুখ খুঁজতে চাইছে। বারিদবরণ চক্রবর্তীর অভিমত, ঢোঁড়াই আঞ্চলিক স্বাদ-গন্ধে ভরপুর হয়েও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকে নি, বরং মহান সাহিত্যের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে।²⁷⁶ ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’ যে নিছক ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বলে অবজ্ঞাযোগ্য নয়, তা অশীন দাশগুপ্তের বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে। এই উপন্যাসকে তিনি ইতিহাসধর্মী সাহিত্য বলছেন কারণ সতীনাথ নিষ্ঠ দর্শকের ভূমিকায় নেমে এসে সৃষ্টি করছেন বলেই সাহিত্য ও ইতিহাসের বিশেষ সাযুজ্য তৈরি হচ্ছে; ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে সময়-সচেতনতার সঙ্গে ঢোঁড়াই-রামিয়ার সম্পর্কে গল্পের একটি প্রধান অবলম্বন ক’রে তুলেছেন।²⁷⁷ ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ আঞ্চলিক উপন্যাস নয় কারণ কোনও একটি গোষ্ঠীর জীবনযাপন তথা প্রকৃতির সঙ্গে

আত্মীভূত গোষ্ঠীচেতনা এখানে অনুপস্থিত। তিস্তাপারের মূল বাসিন্দা রাজবংশী জনজাতি, ওঁরাও জনজাতি, মদেশীয় জনজাতি এবং পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা নমঃশূদ্র ভাটিয়া মানুষ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাসিক বৈশিষ্ট্য’-র কথা বলেছেন; আঞ্চলিক উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে তিস্তাপারের মানুষজনের অনুভূতিকে অসংস্কৃত বলে ধরে নিতে হয় এবং শুধুমাত্র ‘উপভাষা’ ব্যবহার করেই সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন লেখক, এমন উল্লাসিক অবস্থান স্বীকার ক’রে নিতে হয়। উপন্যাসটিতে রাজবংশী ভাষা ও বাংলা ভাষার সংলাপ রয়েছে। বাংলা ও রাজবংশী ভাষার নানা কথ্যরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আর, উপভাষা ও মান্যভাষা এই বস্তুপচা বিভেদকে প্রাধান্য দিলে আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান শর্ত বহুস্বরকে (polyphony) অস্বীকার করতে হয়; ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় বহুস্বরের প্রয়োগকে নবায়নের পদ্ধতিতে জুড়ে নিল। তৃতীয়তঃ, বাঘারুর সঙ্গে প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু তাতে বিচ্ছেদও ঘটে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগে বাঘারুর বুলি ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং তার ‘অনাধুনিক’ চেতনা ভাষা পায়। বাঘারুর শরীরী ভাষা ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা এই বৃত্তান্তের অস্থিমজ্জা- সামান্য ‘উপভাষা’সুলভ সংকীর্ণতায় বা আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতায় কি একে আটকে রাখা চলে? চতুর্থতঃ, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র আঙ্গিক ও অবয়ব- মোট ছ’টি মূল পর্বভাগ এবং দু’শো আঠারটি অংশে ভাগ ক’রে আখ্যানের বিস্তৃতি। দেবেশ ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বর্গভাগের সংকীর্ণতা তো মানলেনই না, উপরন্তু ‘উপন্যাস (Novel)’ নামক সংরূপের খোলনলচে পাণ্টে দিতে ব্রতী হলেন। পঞ্চমতঃ, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ রাজনৈতিক আখ্যান- ১৯৭৭ সাল পরবর্তী ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। ভূমি সংস্কারের ব্যর্থতা এবং স্থানীয় জোতদার জমি-মালিকদের জমির অধিকার বজায় রাখার রাজনীতি তিস্তাপারের রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আখ্যান জুড়ে থাকে বিস্থাপনের রাজনীতি। একুশ শতকের আধুনিকতায় পরিবেশের রাজনীতি অন্যতম প্রধান উপাদান, এই উপন্যাস প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য কুশীলব এবং পরিবেশের রাজনীতিকে বিবেচনায় আনল। সর্বপরি, ‘তিস্তাপারের

বৃত্তান্ত’ নিছক ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ নয় কারণ শুধুমাত্র দেশকালপরিধিকে বাইরে থেকে আধার হিসেবে চিহ্নিত করেই কথকের ও আখ্যানের দায় ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বরং তা অন্তর্বস্তুর গভীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।²⁷⁸ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ ভূখণ্ডকাল এবং তার ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি উপন্যাসের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে অঙ্গঙ্গী হয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিকতা ও উপন্যাসের অন্তর্বস্তুর যেখানে রাজনৈতিক অনুশীলনের সঙ্গে একীভূত, সেই আখ্যানকে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বর্গে জোর ক’রে টেনে আনা অপ্রয়োজনীয়।

মফস্বলি বৃত্তান্ত ও তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ ও ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ এই দু’টি আখ্যান উত্তরবঙ্গের দু’টি অঞ্চলের মানুষের জীবনের কথা, ক্ষমতা ও রাজনীতি এবং ভাষা ও আঞ্চলিকতা থেকে সর্বজনীনতা- এই নিয়েই রচিত। মফস্বলি বৃত্তান্তে কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো এক ব্যক্তি নয়, বরং জলপাইগুড়ির দ্বারিকামারি গ্রামের একটি পরিবার। চ্যারকেটু-খেতখেতু-তুলতুলি-বেঙ্গু-বৈশাখু- একটি পরিবারের সদস্যদের কথন ও অঞ্চলের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক কথন এই আখ্যান নির্মাণ করেছে। অঞ্চলের সামগ্রিকতার এক আখ্যান ধরা থাকছে একটি দিনের বর্ণনায়। দ্বারিকামারি গ্রাম ও সংলগ্ন অঞ্চলের কৃষিজমি, শাসনব্যবস্থা, ক্ষমতা-সম্পর্ক সবটুকুই ওই কার্তিক মাসের ধানের দুধ শক্ত হওয়ার আগের একদিনের কথকতায় ধরা থাকছে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে মূল প্লট গড়ে ওঠে তিস্তাপারের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ঘিরে। গাজোলডোবা, আপলচাঁদ, ডায়নার জঙ্গল, মাদারিহাট, মউয়ামারি এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের সালতামামি। ‘চরপর্ব’তে, ‘ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস’ শিরোনামে দেবেশ রায় এই তিস্তাপারের অঞ্চলকথা ও ক্রমবিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত খতিয়ান রেখেছেন। রাজবংশীদের সাথে এই অঞ্চলের যুগ-যুগান্তরের একাত্মতা, ১৯৪৭-র পরে পদ্মা-মেঘনার গন্ধ নিয়ে আসা উদ্বাস্তু ভাটিয়ারা অঞ্চলের প্রধান বসবাসকারী। চরগুলোকে দখল করে থাকা

‘নমঃশূদ্র’ সম্প্রদায়, খাশজমির কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিক এবং এই সমস্ত সম্প্রদায়েই বেমানান বাঘারু। আর, এর সাথেই জুড়ে থাকে তিস্তার নিজস্ব বাঁকবদল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে অঞ্চলের বিবর্তন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তিস্তাপারকে সর্বজনীন আবেদনের সঙ্গে জুড়ে নেয়। আঞ্চলিক বিবরণে লেখকের সিদ্ধান্ত, “ভূগোলের ওপরে ইতিহাসের জয়” ঘটেছে আর রাজনৈতিক বিবরণে লেখকের সিদ্ধান্ত, “বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল।”

‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র পদ্মনাথ বা বাহেবাবু-রা ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে নির্বাচিত নতুন সরকারের শাসনকালেও ক্ষমতা-সম্পর্ক টিকিয়ে রাখেন। আর, ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর থেকেই এই অঞ্চলের ক্ষমতা-সম্পর্ক পাঁটাতে পাঁটাতে আখ্যানের কালপর্বে আসে। জলপাইগুড়ির আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও দ্বারিকামারিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রণীত আইনগুলো লাগু হয় ঠিকই, কিন্তু সে সব আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবতার মধ্যে যোজন ফারাক রয়ে যায়। বামপন্থী কর্মী বিশু তার শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আইন প্রয়োগ করে আদিবাসী-মদেশিয়াদের নিয়ে বাহেবাবুর জমি দখল করে। সেই জমির পাট্টা বিলিয়েও দেওয়া হয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। ফলে, অঞ্চলে সাময়িক কৃষক-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, উৎপাদনের উপকরণগুলো থেকে যায় বাহেবাবুর হাতে। তাই শুকরাপাড়ার কৃষকদের হাল-বলদের জন্য, বিছনের জন্য এবং আশু ক্ষুধানিবারণের জন্য সেই জোতদার বাহেবাবুর কাছেই হাত পাততে হয়। “দখল করা খাশজমি আবার আধিতে ফিরে গেল লড়াইয়ের শুকরাপাড়া এখন বাহেবাবুর ঘরের আধিয়ার” (রায় ১৯৮৯, ১৬৬) সমাজকাঠামোর পরিবর্তন হয় নি। তাই, আঞ্চলিক ক্ষমতা-সম্পর্কও অটুট থেকে গেছে। ঠিক যেমন তিস্তাপারের বৃত্তান্তে গয়ানাথ জোতদারের অধীনে চলে যায় সমস্ত অঞ্চল। আর, বাঘারু থেকে শুরু করে সমস্ত জমি ও মানুষ গয়ানাথের দাসে পরিণত হয়। হয়তো তিস্তা নদীও তাই। আর, অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এই ক্ষমতা-সম্পর্ক বিস্তৃত হয় দেবেশের কলমে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাঘারুর বর্ণমালা ও আমাদের অক্ষরজ্ঞান’ প্রবন্ধে লিখছেন মানুষের ও ভূখণ্ডের নাম বদলে ক্রমসংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার

কথা; এমনকি প্রশাসনিক কর্মী (প্রাক্তন নকশাল) সুহাসের ধারণাতেও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, কালক্রমে অঞ্চলের দখলদারি ‘গয়ানাথের জোত’ বলেই পরিচিত হবে।²⁷⁹ বাঘারু জানে, “সগায় গয়ানাথের। এই আপলচাঁদের জঙ্গলখান গয়ানাথের। হুই তিস্তা নদীখান গয়ানাথের। ঐঠে জমিগিলান গয়ানাথের” (রায় ২০১৩, ১৭৫) একটা অঞ্চলের পরিচয় ক্রমেই বদলে যেতে থাকে রাজনীতিতে, কখনে ও চেতনায়। যা ছিল একদা প্রকৃতি-নির্মিত, তা-ই হয়ে ওঠে মানুষের নিজস্ব অধিকারের, ক্ষমতার প্রতীক। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্তে’ও কিছুতেই স্থান-কালে বাঁধা যায় না ছিন্নমূল কেলুকে। কেলু অনেকগুলো সময় আর ততোধিক ঘটনার মধ্যে মিশে থাকে। ‘কেলু’র নির্মাণ ও উচ্ছেদ হয় এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়েই। কেলুর নির্দিষ্ট স্থান নেই কোনও। কারণ, কেলু-কে কোনও স্থান দেয় না রাষ্ট্র। অজয় নদীতে পুনাসি বাঁধ তৈরি করার সরকারি উদ্যোগে পাড়ারিয়া, পুনাসি, গোয়ালবান্দিয়া গ্রামগুলোকে ‘তুলে দেওয়া’র সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। উন্নয়ন, নদীবাঁধ ও বাস্তুচ্যুত হওয়ার চিরন্তন আখ্যান শুরু হয় পুনাসি বাজার সংলগ্ন জনপদগুলোর উচ্ছেদে। বর্ধিষু জনপদ, বাজার, বাসস্থান, অর্থনীতি সমস্ত কিছুই উন্নয়নের করাল গ্রাসে চলে যায়। তিস্তার বাঁধ হওয়ার কর্মকাণ্ডে যেমন সংলগ্ন বসতি, গ্রাম এবং বাঘারু-মাদারিরা বাস্তুহীন হয়, সেই উচ্ছেদবৃত্তান্ত এখানেও। নর্মদা নদীর সর্দার সরোবর বাঁধ ও তৎকালীন ব্যাপক উচ্ছেদ-বাস্তুহরণ বিষয়ে অরুন্ধতী রায় ‘The Greater Common Good’ প্রবন্ধে লিখছেন,

The millions of displaced people in India are nothing but refugees of an unacknowledged war... We’re told that it’s being done for the sake of the greater common good. That it’s being done in the name of Progress, in the name of National Interest. (Roy 1999).

তিস্তাপারের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জোতদার-মহাজনদের উন্নয়নের সম্মতি নিয়ে শুরু হয় বাঁধনির্মাণ। চরমপ্রান্তিক, উৎপাদন-অর্থনীতিহীন বাঘারু-রা শুধু নির্দেশ পেয়েছিল নির্বাসনের। কেলুরাও আইনি নির্দেশ পায়। তারপরেও যখন স্বেচ্ছায় ঘর-জমি ছাড়ে না চেতনী-তেগিয়া-

রাধিয়ারা, তখন পুলিশ-কর্তৃক ধর্ষণ ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে- অনিবার্য উচ্ছেদ। “পাড়ারিয়া গ্রামটা না তুললে পুনাসি বাঁধ তৈরি হত না... [ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের] ঘটনার পরে কেউ আর নিজেদের পাড়ারিয়ার লোক বা মেয়ে বলে পরিচয় দিচ্ছে না। পুনাসি বাঁধ শেষ হওয়ার আগেই পাড়ারিয়া জনপদ লোপ পেয়েছে” (রায় ২০০১, ১৭০) জনপদটির এতদিনের বাসিন্দাদের অস্তিত্ব, আইনি অধিকার সবই ‘লোপ’ পেয়ে যায় রাষ্ট্রের বয়ানে।

মফস্বলি বৃত্তান্তেও রমণী পঞ্চগয়েতের প্রতিপত্তি, তার ক্ষমতায় দ্বারিকামারি গ্রামে ক্ষমতা-বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়। তার নিজের ভাষায়, “মুই ছিলো জোতদার, হম ব্যাপারি- ধান-পাটা-মাছার ব্যাপারি। তুই ছিলো আধিয়ার হবি মানষি- ধান-পাটা-মাছার নগদ পাইসার মানষি।” (রায় ১৯৮৯, ৯৯) জোতদার রমণী পঞ্চগয়েত বংশ পরম্পরায় জোতদার। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ও রূপান্তরের সাথে সাথে তারও প্রতিপত্তির রূপান্তর ঘটে। গয়ানাথ জোতদারের মতোই সে একদিকে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আবার অন্যদিকে অঞ্চলের ক্ষমতা-সম্পর্কের শীর্ষব্যক্তি। অঞ্চলটাকে সে নিজেরই সম্পত্তি বলে মনে করে; কিন্তু, সেটা সে বানিয়ে নিয়েছে আইন মোতাবেক। বাহেবাবু, পদ্মনাথ ও পঞ্চগয়েতের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে অঞ্চলের সব জমি-ক্ষেত। যুক্তফ্রন্ট সরকারের জমি বর্গার আইন কিংবা বেআইনি জমির বাঁটোয়ারার আইনের ফাঁক গলেই রমণী পঞ্চগয়েতদের ক্ষমতা প্রসারিত হয়। সে তার প্রবল দাপটে যখন যুক্তফ্রন্টের জিলা নেতাদের এবং আইন-প্রধান ডিসি সাহেবকে অস্বীকার ক’রে বলে যে, আইনের কাজ আইন করুক আর চাষ-আবাদ-জমির কাজ তাকে করতে দেওয়া হোক, যাতে তার ক্ষমতা বজায় রাখতে সুবিধে হয়। এর সপক্ষে সে যুক্তিও দেয়, “তা, আধিয়ারটাক মুই খাওয়াম, বাঁচাম, আধিয়ার মোর জমিটাও মোর” (৯৫) আর, এভাবেই কংগ্রেস আমল, যুক্তফ্রন্ট আমল, বামফ্রন্টের আমল সবেতেই আঞ্চলিক ক্ষমতার শীর্ষস্থান দখল ক’রে থাকে গয়ানাথ বা পঞ্চগয়েতেরা। ঠিক যেমন ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে বাহেবাবু বনাম গোপাল বনাম তমাল বনাম বিশু এরকম অবস্থান হয়ে যায়, তেমনি ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তেও বীরেনবাবু বনাম রাধাবল্লভ বনাম

গয়ানাথ বনাম সুহাস বনাম সুস্থির বয়ান ও বিরুদ্ধ-বয়ানের প্রসারণ ঘটতে থাকে। কৃষক-মজুর, রাজবংশী-ভাটিয়া, উত্তরখণ্ডী-সিপিএম এই দ্বন্দ্বগুলো প্রকট হতে থাকে অঞ্চলের দখল নিয়ে, খাশজমির অধিকার নিয়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের নেতারা এই দ্বন্দ্বগুলোকে চারিয়ে দেয় তিস্তাপারের গভীরে। অঞ্চলক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তারাই। গয়ানাথ বা বাহেবাবুর নিয়ন্ত্রণ যতই আঁটসাতো হয়, ততই রাশ আলাগা হতে থাকে খেতখেতু, চ্যারকেটু, বাঘারুদের। প্রবল আক্ষেপ নিয়ে খেতখেতু বলে, “পদ্মনাথ, অমনীকান্ত, নরেন সরকার সগায় এইঠেকার মানসি থাকি গেইল্ আর মুই খেতখেতু, হয়্যা গেইল্ বিদেশিয়া?” (১২৮) আর, যেহেতু সে গিরিও নয়, আখিয়ারও নয় তাই সে আইনত ‘বিদেশিয়া’, রমণী পঞ্চায়েতের মতে, “এই সনত্ না যাস পরের সনত্ যাবি। পরের সনত্ না যাস, তার পরের সনত্ যাবি, কিন্তুক যাবা তোর নাগিবেই।” (রায় ১৯৮০, ৯৯)” উচ্ছেদ তাকে হতেই হবে। ভূখণ্ডের সামাজিকতা, অর্থনীতি, ভৌগোলিকতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইতিহাসের পাঠ, পুনর্পাঠও বদলে যায়। ‘চরপর্ব’তে, ‘ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস’ শিরোনামে দেবেশ রায় এই তিস্তাপারের অঞ্চলকথা ও ক্রমবিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত খতিয়ান রেখেছেন। রাজবংশীদের সাথে এই অঞ্চলের যুগ-যুগান্তরের একাত্মতা, ১৯৪৭-র দেশভাগের পরে পদ্মা-মেঘনার গন্ধ নিয়ে আসা উদ্বাস্তু ভাটিয়ারা অঞ্চলের প্রধান বসবাসকারী। চরগুলোকে দখল করে থাকা ‘নমঃশূদ্র’ সম্প্রদায়, খাশজমির কৃষক, চা-বাগানের শ্রমিক এবং এই সমস্ত সম্প্রদায়েই বেমানান বাঘারু। কোনও অঞ্চলের সামাজিকতা, অর্থনীতি, ভৌগোলিকতার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইতিহাসের পাঠ, পুনর্পাঠও বদলে যায়। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র পরিশিষ্টে দেবেশ রায় লেখেন, “ব্যারেজ উদ্বোধনের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বৃত্তান্তের তিস্তা ইতিহাস হয়ে গেল... এখন প্রকৃতির সেই নদীর পুনর্জন্ম ঘটবে মানুষের হাতে... তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী।” (রায়, ৪৯৫) বাঘাডু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যায়। ক্ষমতার প্রশ্ন ও রাজনৈতিক পালাবদলের প্রসঙ্গ অনস্বীকার্য। আঞ্চলিকতার সাথে ক্ষমতার যে সম্পর্ক, তা বেরিয়ে আসে খেতখেতুর মনোলগে-

মোর কুনো খতিয়ান নাই। জমির মালিকানা অ্যালায় নদীর জলের নাখান- হেই চড়া পড়িবার ধরিছে আবার হেই ভাসি যাছে। সগায় বদলাবার ধরিছে। পদ্মনাথ আছিল জোতদার- হইছে নিজচাষি। অমনীকান্ত আছিল পঞ্চগয়েত- হইল মেস্কার। নরেন সরকার আছিল জোতদার- হইছে এফ-সি-আই-এর এজেন্ট। তামান বদলাই গিছে। কিন্তু মুই খেতখেতু থাকি গিছে। মুই বদলাও নাই। তাই হামাক বেদেশিয়া বেগাঁউয়াইয়া মতন খায়। (রায় ১৯৮৯, ১২৭)

বাঘারু যতই তার ‘আদিমতা’ নিয়ে, নিম্নবর্গীয় অবস্থান নিয়ে ও প্রান্তিকতার আখ্যান নিয়ে তিস্তাপারের ভূখণ্ডে শিকড় গেড়ে থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে এই সব কিছু ছেড়ে চলে যেতেই হয়। এই অঞ্চলে তার আর অধিকার থাকে না। তিস্তা ব্যারেজ তৈরির জন্যই হোক বা গয়ানাথ জোতদারদের ক্রমপ্রসারিত সর্বগ্রাসী রাজনীতির জন্যই হোক, বাঘারুর চলে যাওয়াই অমোঘ পরিণতি। পরিশিষ্টে লেখক-কথক জানান, “আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না।” (৫০৩) তার একটা কারণ কি এটাই নয় যে, তিস্তাপারের অঞ্চলকথায় এতদিনের প্রান্তিক বাঘারুরা এবার সম্পূর্ণরূপেই ব্রাত্য; তাদের ছেঁটে ফেলা ভিন্ন আর উপায় নেই। কারণ, বাঘারু-মাদারির পার্টি নেই, অর্থনীতি নেই, উন্নয়ন নেই, ভোট নেই, উৎপাদন নেই; তাই তার অস্তিত্বও আর নেই! ঠিক এভাবেই তো চ্যারকেটুও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। খেতখেতু ‘অধবা-বিধবার নাখান’ হয়ে পড়ে। তার না আছে আধিয়ার-পরিচয়, না আছে রেশন। শুধু শ্রম আর খিদে আর প্রত্যাখ্যাত হওয়া। তাই, তাদেরও অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ঠিক এই সমস্যাই আরও ঘনীভূত হয় বাজিকরদের জীবনে। তাদেরও কোনও নির্দিষ্ট পরিচয় স্বীকৃত হয় না। তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই বা বলা ভাল, তাদের ‘স্থান’ নেই কোনও। বাজিকরদের শুধু কাল আছে। তারা প্রায় দু’টো শতকের সাক্ষী, ইতিহাসের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় তারাই মিশে থাকে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, ঘরহীনতা তড়িয়ে বেড়ায় তাদের, ‘মূলধারা’র অর্থনীতিহীনতা তাদের অনিশ্চয়তায় ঠেলে দেয় বারবার; আর, সেইজন্যই

ইতিহাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেও তারা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে না কখনই। বাঁশবাজি, দড়িবাজি, ভিক্ষাবৃত্তি, জড়িবিটি, পুতুল নাচানো- এই তাদের পরস্পরার অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত। “বাজিকরের করম অ্যাটা আছে বটে, তো সিটা হল ভিখ-মাঙ্গার কাম... কাম হইল খেতির কাম, কলের কাম, কামার, কুমার, চাষি, মজদুরের কাম। হামরা তো ওলা কাম কদাপি করি নাই” (সেন ২০০০, ২) বাজিকরের ভান্‌মতির খেলা, পশুচারণ, নররাক্ষস সাজা, ভালুক-বাঁদর নাচানো আর কালোজাদু রাষ্ট্রনির্ধারিত উৎপাদন ব্যবস্থায় সামিল হতে পারে না। রাজমহলে সাঁওতালদের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে কৃষিজীবী হওয়ার বাসনা জাগে কিন্তু কিছু মাসের স্থায়িত্বের পরে ইংরেজ-জমিদারের যৌথ অত্যাচারের আভাস পেয়ে ঘর ছাড়ে তারা। পরতাপের প্রজন্মের দু-একজন স্থায়ী অর্থনীতির খোঁজে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করে কিন্তু, “কৃষিকর্মের মূল বিষয় ধৈর্য ও অপেক্ষা। সেটা তাদের স্বভাবের মধ্যে ছিল না... বাজিকরদের দ্রুত নিষ্পত্তি করা স্বভাবের সঙ্গে এটা [কৃষিসম্বন্ধীয় অনুশাসন] সহজে খাপ খেতে চাইল না” (সেন ২০০০, ১০৭) বরং স্থায়ী জীবনের জন্যে হন্যে হয়ে এক সময় থেকে অন্য সময়ে যাত্রা করে। তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি তাদের বারবার অর্থনীতির নিশ্চিন্তি থেকে সরিয়ে দেয় দূরে আবার নির্দিষ্ট অর্থনীতি না থাকার জন্যই তাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয় বারবার, বাজিকর সম্প্রদায় বিপন্ন হয়ে পড়ে কৌম রক্ষায়। তাদের ঝোঁক থাকে গৃহস্থ জীবনে, তারা বাঁধা পড়তে চায় সংসারে কিন্তু, কোনও দুর্বিপাকে আবার গৃহহীন হতে হয়, তাই বহু প্রজন্মের উত্তরাধিকারলব্ধ জ্ঞানে সালমা বলে, “বাদিয়া, বাজিকর, বানজারার জীবনে তো সোনার জন্যে একই রকম রাস্তা। কিন্তু এই গেরস্তের রাস্তা সবার আলাদা। গেরস্ত হওয়া মানে বাঁধা জানোয়ার হওয়া...” (সেন ২০০০, ১৭) যাযাবরী অর্থনীতি ছেড়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে বাজিকররা বাধ্যতাপূর্ণ আশ্রয় করে, অন্ন-বাসস্থানের তাগিদে রূপা সাপুড়েবৃত্তি গ্রহণ করে ‘হিন্দু’ হয় আর অনেকঘর বাজিকর ‘মুসলিম’ হয় জমি পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাতেও স্থায়ী ঘর বা সামাজিক স্বীকৃতি পায়না তারা; উচ্ছেদের খাঁড়া ও ভোটর-তালিকা থেকে বাদ পড়া বন্ধ হয় না।

বাজিকরদের ঘরের সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করে শাসক শ্রেণি ও তাদের বংশবদেরা। ভায়রো, আজুরা মণ্ডলদের নাম আর স্থান পালটায় কিন্তু, শাসকবয়ান একই থাকে বাজিকরদের দিকে, “তুমাদের বসত এবার তুলবার লাগে... তুমাদের উচ্ছেদ হবার লাগে” (সেন ২০০০, ২০১) কখনও ধর্মের নামে, কখনও সংস্কৃতির নামে তাদের প্রত্যাখ্যান করে শাসক শ্রেণি। লালমিয়া বা মহিমবাবু কিংবা আজু শেখ ধর্মের প্রশ্ন তোলেন বাজিকরদের বেঘর করতে। হিন্দু জমিদার চৌধুরিবাবু বা লালকুঠির ম্যানেজার মহিমবাবু প্রশ্ন করেন, “হাঁই বাপু, তোরা গরুও খাস, গুয়ারও খাস, ই কেম্কা জাত রে বাপো!” (সেন ২০০০, ৪) আসলে, সমস্ত পাঠ্য জুড়ে এই প্রশ্ন চলতেই থাকে। জাতহীন-ধর্মহীন বাজিকরদের কিছুতেই কোনও একটা নির্দিষ্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্যে বাঁধা যায় না। ভারতীয় ধর্মভিত্তিক সমাজে ব্যক্তির ‘অবস্থান’ অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় তার ধর্মাচরণ দিয়ে, কিন্তু সেখানেই বাজিকরদের নিয়ে মুশকিলে পড়ে উচ্চবর্গের শাসক এবং পাঠকরাও। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু- সব ধর্মের আচরণকেই অস্বীকার করে বাজিকররা। ফলে, তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু, বাজিকররা কি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী? প্রার্থনায় অবিশ্বাসী? না, তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করে অলৌকিকতায়। তাই, যে অঞ্চলে ঘর খুঁজতে যায়, সে অঞ্চলের আধিপত্যকারী ধর্মাচরণের পদ্ধতি অনুকরণ ক’রে নেয় কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। প্রাচীন দলপতি রহুই তাদের ‘পথপ্রদর্শক’; তিনি মিথ্ কিন্তু ঈশ্বর বা আল্লা নন, তিনি নিজেই সমাজচ্যুত ভ্রাম্যমাণ তাই ‘দেবত্ব’হীন, পথের হৃদিশদাতা। বাজিকররা দীর্ঘ যাত্রাপথে পাওয়া লোকায়ত দেব-দেবীদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের রীতি-আচরণ পালন করে নিজেদের সুবিধেমতো। কিন্তু, নিম্নবর্গের মানুষের ইষ্ট দেব-দেবী যেমন, ‘ওলামাঈ’, ‘বিগামাঈ’, ‘ধরতিমাঈ’ এঁরা কেউই বাজিকরদের অন্ন-বাসস্থান নিশ্চিত করতে পারেন না। শাসক ধর্ম নামক মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে শাসিতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে। ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীকে চেনা-জানা ধর্মের লক্ষণরেখায় বেঁধে ফেললে নিজেদের আধিপত্যকারী মতাদর্শকে চারিয়ে দিতে সুবিধে হয়; মূলধারার প্রথাগত ধর্মের ছাঁচে ফেলে দিলে

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাগুলো নিয়ন্ত্রণে আস্থা অর্জন করে শাসক। কিন্তু, বাজিকরদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের লঙ্ঘন হয় বলেই, শাসকশ্রেণি অস্বস্তি বোধ করে আর, বাজিকরদের ‘অস্তিত্ব’ সম্পর্কে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দেখায়।

বাজিকরদের ঘর ছাড়তে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগেও। স্থায়ী কৃষি অর্থনীতিতে চিরকালীন অনভ্যাসের ফলে, বন্যা-খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে যুঝে জমি বাঁচানো তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই, উত্তরবঙ্গের তিস্তা, আত্রাই, পুনর্ভবা নদীর জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায় নমনকুড়ি, জামিলাবাদ। এই নমনকুড়িতেই বহু প্রজন্ম পরে কৃষিজমি ও অর্থনীতির নিশ্চিতস্বাদ পেয়েছিল বালি, জামিররা। সাঁওতাল, গুঁরাওরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় জানতেন যে, জল নামলে মাটি ফের উর্বর হবে কৃষিকাজের জন্য; কিন্তু বাজিকরদের সেই বিশ্বাসের ভিত ছিল না। “পরতাপ, জামির ও তাদের মতো আরও দু-চারজন, যারা জমির সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা তৈরি করতে পেরেছিল, দূরে জলের মধ্যে তাকিয়ে নিজেদের জমিগুলোর দিকনির্ণয় করার প্রয়াস পায় বৃথাই।” (সেন ২০০০, ১২২) বড় বা মাঝারি কৃষকরা অথবা যাদের হাতে কৃষিকাজের উপকরণগুলো মজুত আছে, তারা সাময়িক ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যতের লাভের আশায় থাকতে পারে। দেদোন ঘোষ, অন্যান্য স্বচ্ছল সদগোপ ও অবস্থাপন্ন মুসলমানদের তাই সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে টিকে থাকে কিন্তু বাজিকরদের ফের বাস্তব হওয়া। ‘এক কালো অন্ধকারের শনিবার’ ঘর্ঘরা নদীতীরের জনবসতিতে ভূমিকম্পের ভয়াবহ স্মৃতি ফিরে আসে লুবিণির স্মৃতিকথনে। “এভাবে তিনবার ঘর ভাঙার স্মৃতি শারিবার সারাজীবন থাকে।” (সেন ২০০০, ৩) প্রজন্মান্তরে বেঘর হওয়া আর অভিবাসনের চলমান স্মৃতি। আবার, মহিমবাবু, মুর্শিদাবাদের শোভারাম, পাঁচবিবির দিগিন অর্থনীতির দিক থেকে প্রান্তিক করে জমিছাড়া করে বাজিকরদের। আর, জামিলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংঘাত বাঁধে তরমুজের চাষ নিয়ে। তরমুজ চাষী রমজানের সঙ্গে তরমুজ চাষ করে জামির যখন উৎপাদন-ব্যবস্থার অংশ হতে চাইছে, “আমি এক চাষা, দেখবাই পাচ্ছেন’ কথাটা বলতে পেরে এই অস্থির সময়েও জামিরের বুকটা ভরে ওঠে” (সেন ২০০০, ১৪৭) তখনই

নব্যবাবু শোষকেরা আক্রমণ করে। রমজান ও আবুর হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ‘খুনী’ হয়ে যায় জামির। সেই খুনের দায় মাথায় নিয়ে বাজিকরদের ছাড়তে হয় বাসস্থান। সরে যেতে হয় রাজশাহির দিকে। ভি এস নইপলের উপন্যাসের বিশ্লেষণে পরমচাঁদ বা লিখছেন, “The traumas of a tainted and troubled past, of attempting to find some meaning and purpose of life. It beautifully analyses the pangs of exile, their living half a life, their sense of alienation and their cultural traditions.” (Jha, 2001-02, 47) বাজিকরদের বারবার ঘর ছাড়া ও ঘর খোঁজার মধ্যবর্তী আখ্যান এটাই। নতুন অঞ্চলে তারা বয়ে আনে পুরনো আতঙ্ক। পাঁচবিবির হিন্দু-মুসলিম জমিদারের দ্বন্দ্ব সেই আতঙ্ক আরও তীব্র হয়। তাদের চাষ করা জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, অপবাদ দেওয়া হয়, ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। তাদের আধিয়ারি অস্বীকৃত হয়ে যায় জোতদার দিগিন মণ্ডলের মালিকানায়। ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক আক্রোশে নমনকুড়ি-জামিলাবাদের দেদোন ঘোষ আক্রমণ করে বাজিকরদের। ক্ষমতাশালী দেদোন ও তার দলবল “সব ক-টি ঘরে আগুন লাগিয়েছিল, ধর্ষণ করেছিল রমণীদের... আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল পরতাপের দু-টি সন্তানকে” (সেন ২০০০, ১১৬) দশক-শতক জুড়ে দলের নেতা বাজিকর নির্দেশ দেয় বাকিদের ‘পীতেম, এখান থেকে পালিয়ে চল’, ‘আরো পুর্বের দেশে চল’ বা ‘এখানে আর নয়, নতুন জায়গা খুঁজতে হবে’ ইত্যাদি; আর, তখনই অসুখী পূর্বস্মৃতি জাগে, তাড়া খেয়ে পালানোর, ঘর চেয়েও না-পাওয়ার স্মৃতি ঝলসে ওঠে।

এই স্মৃতি তাদের বহু শতক বয়ে চলতে হচ্ছে। একদা তাদের পূর্বপুরুষ রহুকেও উচ্ছেদ হতে হয়েছিল স্বপ্নের নিজভূমি থেকে। যে ভূমিকে শস্যশ্যামলা, সম্পদশালী করে তুলেছিল রহু ও তাঁর স্বজাতির সেখানেই এলো দখলদারেরা। তারা মন্দিরে দেবতা স্থাপন করল, বিচিত্র রীতিপদ্ধতির অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করল এবং রহুদের ‘চণ্ডাল’ বলে দাগিয়ে চাপিয়ে দিল শাসন। নবাগত মানুষদের সম্পর্কে রহুর আত্মোপলব্ধি, “এরা আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে,

আমাদের পবিত্র নদীর স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে, আমাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারকে প্রবেশ করিয়েছে।” (সেন ২০০০, ৬৫) রত্ন এই উপলব্ধি প্রতিটি সভ্যতায় আক্রান্ত উদ্বাস্তর উপলব্ধি, প্রতিটি উচ্ছেদ ও দখলের সারকথা এবং বিদেশি বহিরাগতরা যেভাবে রত্ন চণ্ডালদের অর্থনীতি-সংস্কৃতি দিয়ে হীনবল করে দিয়েছিল তা প্রত্যেক ঔপনিবেশিকের শাসনপদ্ধতি। দ্রোহকালে রত্নর আত্মবলিদান যে মিথের জন্ম দিয়েছিল, তাকেই অমোঘ নির্দেশ মেনে বাজিকরদের মানচিত্র তৈরি হয়, উচ্ছেদ-পুনর্বাসন-পুনঃউচ্ছেদের মানচিত্র।

বাসভূমির সঙ্গে সংযুক্তি ও বিযুক্তি

অঞ্চলের কর্মকাণ্ড থেকে বাঘাডু বা খেতখেতু, চ্যারকেটুদের বিযুক্তির বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়। যে অঞ্চলটা আসলে বাঘারুর, সেই অঞ্চলের ‘জনমুখী’ কর্মকাণ্ডগুলোর সঙ্গে বাঘারু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, তিস্তাপারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হলকা ক্যাম্প এবং জমি জরিপের সরকারি প্রক্রিয়া। বাঘাডু এই সরকারি প্রক্রিয়ার ক্রমশঃ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করতে পারে যে, আসলে এই অঞ্চলের কিছুই তার অধিকারের নয়। এমনকি, তার আত্ম-অধিকারও স্বীকৃত নয়। বাঘারুর নাম বদলে বদলে যায়। কুড়ানির ছোয়া, গাছারু, ফরেস্টুয়া, কুড়ালিয়া-কোটা, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মণ। নির্দিষ্ট নামে তাকে বেঁধে দেওয়া যায় না, কারণ, তিস্তাপারের সমস্ত কাজে তার অবধারিত উপস্থিতি। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত যেমন সংক্ষিপ্ত হতে পারে না, তেমনি বাঘারুর নামও সংক্ষেপ হয়না কখনো। এমএলএ সাহেবকে বারবার অনুরোধ করেও একটা সুস্থিত ‘নাম’ জোটেনা বাঘারুর, মন্ত্রীও পারে না তার নামসংক্ষেপ করতে। জমিপঞ্জীকরণের তালিকায় নাম থাকে না বাঘারুর। অঞ্চলের সঙ্গে মানুষের পরিচয় একাত্ম। আঞ্চলিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে মানুষের পরিচয় জ্ঞাপনই রীতি। কিন্তু, বাঘারুর ক্ষেত্রে সে রীতিও প্রযুক্ত হয় না। কেন? না, বাঘারু নিজেই অস্বীকার করে তার পরিচয়। সে তার না-জানার পরিসরে আসলে

প্রত্যাখ্যান করতে থাকে বংশপরিচয়-জন্মপরিচয়-কর্মপরিচয় সমস্তকিছু। “মুই রাজবংশী না হও... মুই এইঠেকার না হয়... মুই ভাটিয়া না হও... মোর কুনো ঝাণ্ডা নাই।” (রায় ২০১৩, ৪২৯)

উত্তরখণ্ডী দলের সক্রিয় কর্মী তিলকের দাবি মতো, বাঘারুকে হয় রাজবংশী নয়তো ভাটিয়া কোনো এক ক্যাটেগরিতে মানিয়ে নিতেই হবে; কারণ, উত্তরবঙ্গের এই নির্দিষ্ট অঞ্চলে যত মানুষ তথা আদিবাসী-মূলবাসী মানুষ, তারা হয় রাজবংশী নয়তো ভাটিয়া। আর, তাই, আঞ্চলিকতার পরিচয়েই বাঘারুকে এই দু’টোর কোনো একটা পরিচয় স্বীকার করতেই হবে! একদিকে তিস্তা যেমন প্রতিমুহূর্তে তার পরিচয়, অবস্থান ও গতি বদলে নিতে বাধ্য হয়, তেমনি বাঘারুর আত্মপরিচয়ও বদলে বদলে যায়। শুধুমাত্র আঞ্চলিক পরিচয়ে তাকে বেঁধে ফেলা যায় না। অথচ, অঞ্চলের সমস্ত কর্মকাণ্ডেই সে থাকে, বেশ প্রবলভাবেই থাকে। হলকা ক্যাম্প, অপারেশন বর্গা, গয়ানাখের অতিউদ্যোগ, উত্তরখণ্ডীদের মিছিল, বন্যা কিংবা শ্রীদেবীর নাচে মাতোয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- সবেতেই তার উপস্থিতি। কিন্তু, একই সাথে তার বিযুক্তিও। কারণ, অপারেশন বর্গায় তার জমি মাপা যায় না, তার অস্তিত্ব প্রকটভাবে নেতিবাচক হয়ে পড়ে। গোটা বৃত্তান্তে বাঘারুর সঙ্গে অন্যদের সংলাপ মাত্র তিনবার আর প্রতিটি সংলাপেই তার আত্মপরিচয় দ্বিধাগ্রস্ত, তিস্তাপারে ক্রমেই ‘অপর’ হয়ে যায়, “এখন সে শুধু বলতে পারে সে কী কী নয়, তার কী কী নেই। দশ-বার বছরে মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ- তাও ক্রমেই নেতিবাচক” (রায় ২০১৩, ৪২৯)

উত্তরখণ্ডীদের মিছিলে সে থেকেও নেই কারণ তার নিজের কূলপরিচয় সে জানে না, তার ঝাণ্ডা সে চেনে না! শ্রীদেবীর নাচের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার প্রায়-নগ্ন চেহারা ও অমার্জিত উপস্থিতি সংস্কৃতি-বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। বাঘারু মাদারির মায়ের মতোই একাধারে তিস্তাপারের ওই অঞ্চলের প্রতিভূ এবং প্রতিভূ নয়ও। বাঘারুর অপরায়েনের এই দ্বন্দ্ব লেখক তাঁর কথকভাষাতেও স্বীকার করেন এবং পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করেন। তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে মিছিলে প্রশাসনের লাঠি-বন্দুক তাকে উপেক্ষা করে আবার, বাঘারুও তার আপলচাঁদ, তার জংলাজমি, গাছগাছালির চেনা অঞ্চলকথা উপলব্ধি করে। “শুধু তিস্তার ভেতরে ঐ বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের

ওপর অত গোট আর মঞ্চ, গেটে আর মঞ্চ এত ঝাঙা- এই সব ঐ তার স্বদেশের সঙ্গে ঠিক মেলে না।” (৪৩৫) বাঘার বিযুক্ত হতে হতেও সংযুক্ত হয়ে যায় আখ্যানে আর তিস্তাপারের রাজনীতিতে। তার বিযুক্তি ধরা পড়ে নথিপত্রে, সরকারি-প্রশাসনিক নথিপত্রে; কিন্তু তার সংযুক্তি হয়ে চলে তিস্তাপারের নিজস্ব কথনে, বন্যাপর্বে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকায়।

চারকেটু মিছিলে গিয়ে, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। আর, খেতখেতু কোনো এক কাল্পনিক মাসানের সাথে স্বগতঃসংলাপে তার অঞ্চলের সাথে যুক্ত-বিযুক্ত হওয়ার দোলাচলে ভুগতে থাকে। সে যে ওই দ্বারিকামারি গ্রামের, ওই অঞ্চলের ভূমিপুত্র এটা সে জানে কিন্তু প্রমাণ করতে পারে না। কারন, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক অভিঘাতে বারবার তার গিরির নাম, ভূমিমালিকের নাম বদলে গেছে; তার প্রদেয় খাজনা-পদ্ধতি বদলে গেছে। ফলে, তার পরিচয়েও টান পড়েছে। খেতখেতুকে তার অঞ্চল, তার নিজভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সরকারি আইন মোতাবেক জমিতে নিজ-চাষ দিতে হবে, আধিয়ার নেওয়া যাবে না। আর, এই রাজনীতির ফাঁদে পড়ে ভূমিহীন খেতখেতুদের উচ্ছেদ হতেই হয়। হতে পারে সে জন্মচাষী, বংশপরম্পরায় কৃষিজীবী; কিন্তু, ‘পঞ্চগয়েত’ তাকে বলে, “মোর আগত নিজ চাষ শুরু শুরু করার কাম আছিল আর তোকে জমি ছাড়িবার নাগিবে... বাড়ি ছাড়িবার নাগিবে, বাড়ি তো গিরির... নিজের বাড়ি না থাকিলে কি আর টাড়ি থাকে রে খেতখেতু!” (রায় ১৯৮৯, ১০১-১০২) খেতখেতু চাষের হালহকিকত জানে, বোঝে প্রতিটি ধানচারার সুখদুঃখ। ধানখেতের সোনাহলুদ রঙের ক্রমবিবর্তন, ধানের দুধ আসা, দশদিনে দুধ শক্ত হওয়ার নির্দিষ্ট হিসেব খেতখেতু শিখে গেছে জন্মসূত্রে পাওয়া কৃষি-অভিধানে। শুখা মাটির গন্ধ, কাল মাটির গন্ধ আর কুয়াশার ‘ওম’-এর গন্ধের প্রতিটা সে পার্থক্য করতে পারে; এতই সম্পৃক্ত সে জমির সাথে, অঞ্চলের সাথে। কিন্তু, সে সবে তার আইনি অধিকার ফিকে হয়ে যায়। অঞ্চলের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে ও ক্ষমতার হাতবদলের নিত্যনতুন আইনের সাথে সাথে খেতখেতুর অধিকারের বদল হতে থাকে। এই

অঞ্চল যে তার নখদর্পণে, তার প্রমান সে রাখে মনোলগে- যখন ভুলা মাসানের কাছে তার প্রমান করার দায় থাকে যে, সে ‘পরদেশি’ নয়, সে এই অঞ্চলের সন্তান। তার ভাষায়,

মোক আফ্রিয়া রাতিত দুই চক্ষু বাকি ছাড়ি দে কেনে, মুই সিধা চলি যাম, ধর কেনে উত্তরের পাকে ন্যাশনাল হাই, দক্ষিণের পাকে ধরো কেনে হুই জহুরি কলোনি, পুব পাকে পদ্মনাথের খোলান, পশ্চিম পাকে তালমা নদীর উপরের ভাঙা সাঁকোখান, মুই চক্ষু বন্ধ করি পার হয়্যা চলি যাম। (রায় ১৯৮৯, ১২২)

অঞ্চলের সাথে, এই অঞ্চলের মানুষদের সাথে নিজেকে প্রাণপণে যুক্ত করে নেয় খেতখেতু। পাঠক নিশ্চিত হয় যে, এই অঞ্চল খেতখেতুর। পাঠক নিশ্চিত হয় যে, কৃষিনির্ভর ভারতীয় অর্থনীতিতে এক ভূমিহীন কৃষক নিজের অঞ্চলে স্বাধিকার খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু, খেতখেতুর দোলাচল শেষ হয় না। তাই, এই নিশ্চয়তার পরেই ফের অনিশ্চয়তার বাস্তব আবহে খেতখেতুকে তদুপরি পাঠকে নিয়ে যান লেখক। যখন খেতখেতুর উপলব্ধি হয়, “টাড়ি ছাড়িলে তো গ্রাম ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর গ্রাম ছাড়িলে তো অঞ্চল ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর অঞ্চল ছাড়িলে তো এই ভুবনই ছাড়ি যাবার নাগে” (১১০)। সেই একই উপলব্ধি হয় চ্যারকেটুরও। তার উৎপাদন, ক্ষেতলব্ধতা আইনিভাবে অস্বীকৃত হয়ে যেতে থাকে, তাই তার উচ্ছেদ হওয়াটা ঠেকানো যায় না। বাঘারুর মতো তারও সংলাপে এসে যায় প্রত্যাখ্যান। যখন পুলিশ বা শহুরে সাংবাদিক তাকে অঞ্চলের কিংবা অঞ্চলের ঘটমান রাজনীতির শরিক করে নিতে চায়, তখনই বিরুদ্ধ বয়ান দিতে শুরু করে চ্যারকেটু। “কুনো পার্টি না হয় বাবু... কারো বাগা না হয় বাবু” (১৯০)

জমি ও বাসস্থান দখল-বেদখলের এবং বসতি উচ্ছেদের শাসন-পদ্ধতির বৃত্তান্ত ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসেও ফিরে ফিরে আসে। “কোনোরকম সাবধানতা না জানিয়ে ঈশ্বরপুরের জমিদারের লাঠিয়ালেরা চাষিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা, নিয়মটা এমনই। দখল কিংবা

বেদখল করতে হলে আচমকা সন্ত্রাস ছাড়াতে হয়...” (সেন ২০০০, ৪৬) ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে সন্ত্রাসের পরে কেলু-কেও ছাড়তে হয় তার অঞ্চল, কারণ প্রান্তিক কেলু কোনওভাবেই রাষ্ট্রদ্বারা স্বীকৃত হয় না। কেলু-রাধিয়া পাড়ারিয়া গ্রামের বাসিন্দা, পুনাসি বাঁধ ও বাজার তাদের সংস্থান দিত কিছুটা। খেতখেতু-চারকেটুর মতো কেলুও ভীষণ ভালভাবে চিনত নিজের পাড়ারিয়া। কিন্তু, খেতখেতুদের মতোই সেই স্থানও তার নিজের হয়ে ওঠেনি কখনও, তার অধিকার স্বীকৃত হয়নি। কেলুকে গ্রাম ছেড়ে পুনর্বাসন নিতে হয় শহরে, কিন্তু বাসা সে পায় না। তাকে উদ্বাস্তু হতে হয় বটে, কিন্তু শহর তার বাসস্থান হতে পারে না। গ্রাম ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে এবং পাড়ারিয়া গ্রামে নিজের পরিবারকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে দেখে কেলুকে শহরের পরিকল্পনায় ঢুকে পড়তেই হয়, “কেলু ঘরের বিকল্প খুঁজতে খুঁজতে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।” (রায় ২০০১, ৩৫৭) কেলুকে কেন ঘর ছাড়তে হয়? ১৯৮৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাড়ারিয়া গ্রামে ঘটে চলা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং আদালতে অপ্রমাণিত ধর্মণের ঘটনা কেলুকে গ্রাম থেকে ছিঁড়ে নেয়। ইতিবাচক বা স্টোনম্যানের মতো নেতিবাচক- কোনও পরিচয়ই প্রতিষ্ঠিত না-হওয়ায় শহর থেকে নির্বাসন তার। কেলুর অস্তিত্ব-সন্ধান চলতে থাকে। গ্রামে হোক বা শহর কলকাতায়, কেলুকে অস্তিত্ব ও পেটের জন্য লড়াই করে যেতেই হয়; বরং গ্রামে নিজের জন্মভিটের সামান্য নিশ্চিন্তি ছেড়ে কলকাতার অচেনা ভাষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে তার ব্যক্তিসত্তা নতুন নতুন প্রশ্নোত্তরের মুখে পড়ে। খেতখেতুর মতো কেলুও বিযুক্ত হতে থাকে পাড়ারিয়া গ্রাম থেকে, কলকাতা শহর থেকে।

সারা শহরটাতে যে এমন আপনমনে স্বয়ংনির্ভর ঘুরে বেড়াতে পারে সে এ-শহরের কোনো ঠিকানা জানে না, কোনো হদিশ জানে না, কোনো বাড়ি চেনে না, কোনো রাস্তা চেনে না... এ শহরের কোনো নাম তারা জানা নেই, তার নাম এ শহরের কারো জানা নেই, এ শহরে তার কোনো নিশানা নেই, এ শহরে সে আকণ্ঠ ডুবে আছে, এ-শহরের কোথাও তার এই নিমজ্জনের কোনো ইতিহাস নেই (রায় ২০০১, ৪৮২)

শুধুমাত্র ‘নেই’-এর মধ্যে দিয়েই কেলুকে আবিষ্কার করা যায়; অথচ, খেতখেতু যেমন তার গ্রাম, ক্ষেত, ধান সবথেকে ভাল চিনত কেলুও তেমনই কলকাতা শহরকে আনখশির চেনে। কিন্তু, এ শহর কেলুর নয় কারণ খেতখেতুর মতোই সে কোনো ‘সমাজসম্মত’ প্রমাণ দাখিল করতে পারে না এই অঞ্চলের সঙ্গে তার একাত্মতার। কথক নিজেও পারেন না এই একাত্মতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে। কেলুর এই অস্তিত্বহীনতা ও প্রান্তিকায়নের বয়ান সম্বন্ধে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

রাষ্ট্রসংজ্ঞা অনুসারে যার ব্যক্তিসত্তাই নেই, তার আবার অধিকার, বিশেষত সম্পত্তির অধিকার কিসের! ব্রাহ্মণ সদাচারের সনাতন অনুশাসনের মতোই আধুনিক অধিকারদর্শনেরও সাফ নির্দেশঃ না, কেলুরা কোনো কিছুই অধিকারী নয় (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, ৫৩)

নিম্নবর্গকে প্রত্যাখ্যানের, প্রান্তিকায়িত মানুষদের প্রত্যাখ্যানের যে বয়াননির্মাণ করে রাষ্ট্র সেখানে বাঘারু, জামির, পীতেম, চ্যারকেটু, কেলু একই জাতীয় মানচিত্রের মধ্যে থেকেও একে অপরের কথা জানতে পারে না। বেনেডিষ্ট অ্যান্ডারসন সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রে এক কাল্পনিক একাত্মবোধ ও সার্বভৌমতার বোধ তৈরি করে রাখা হয় যা বাস্তবিক বিচ্ছিন্নতা, শোষণ ও বৈষম্যকে একটি অদৃশ্য কথনে বেঁধে রাখে।²⁸⁰ কিন্তু, খেতখেতু-মাদারি-লুবি-সুমিয়াদের নিয়ে মুশকিল এই যে, কোনও এক সার্বভৌম জাতীয়তার মধ্যে এদের স্থান নিশ্চিত করা যায় না, এমনকি এদের একে অপরের সাথে কোনও বিনিময় বা সংলাপ নেই। কিন্তু, এরা প্রত্যেকেই স্বদেশকে হারিয়ে ফেলে এবং সেই হারানোর বোধ নিয়েই অস্তিত্ব সন্ধান করে চলে। রাষ্ট্রই তো পরিচয়পত্র দেয়, ভাষার মান্যতা ঠিক করে দেয়, সম্প্রদায়গত অভিব্যক্তি ঠিক করে দেয় এবং সমর্পণের বোধ তৈরি করে দেয়। আর, সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে এদের সংলাপ ও দেয়া-নেয়া প্রায় নেই, যেটুকু আছে তার বহুলাংশ রাষ্ট্রের কাছে এবং পাঠকের কাছে অবোধ্য এবং বাকিটুকুও ক্রমেই নেতিবাচক হয়ে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

উচ্ছেদের ভাষা বাস্তবহীনের ভাষা

বৃত্তান্ত নির্মাণের প্রারম্ভে কথকের সচেতন স্বীকারোক্তি, “এ বৃত্তান্তের সব কাহিনি, সব নথি তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন নিয়েও কোনো যুক্তির শৃঙ্খলা যেন তৈরি করে না ফেলে।” (রায় ২০১৩, ৩০) বাস্তবের নথি ও কল্পনার আখ্যাননির্মাণের ছেঁড়াখোঁড়া সুতো যেমন পাঠককে অনিশ্চয়তায় ফেলে, তেমনই কেলু ও বাঘারুর ভাষাহীন অভিব্যক্তি, ভাঙা ভাঙা ভাষা তাদের ক্রমাগত বিযুক্ত করে চলে তাদের ভূখণ্ডের আখ্যান থেকে। কারণ, অঞ্চলকথার যে নির্দিষ্ট আঙ্গিক শাসক-নির্ধারিত, সেখানে শাসক-নির্দেশিত ভাষা-সংস্কৃতির ভূমিকা থাকবেই। অথচ, বাঘারুর না-ভাষা, কেলুর দুর্বোধ্য ভাষা সেই আধিপত্যকারী ভাষাকে উপেক্ষা করে। এনগুগি ওয়াথিং’ও তাঁর ‘The Language of African Literature’ প্রবন্ধে লিখছেন- “Culture embodies those moral, ethical and aesthetic values, the set of spiritual eyeglasses, through which they come to view themselves and their place in the universe.”²⁸¹ মাদারির মা কিংবা বাঘারু শাসকের ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে না; এক অনপনেয় দূরত্ব থেকে যায়। কাজেই, শাসককেও শেষপর্যন্ত মাদারির মা, বাঘারু, কেলুদের বাদ দিতে হয় তার তৈরি মানচিত্র থেকে। কেলু নিজেকে ‘খুনী’ প্রতিপন্ন করতেও চেষ্টা করে যাতে অন্ততঃ খুনী হিসেবেও একটা পরিচিতি পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ কেলু। চ্যারকেটুর মতো তারও যে অসহায় ‘না’! ‘স্টোনম্যান’ পরিচিতি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ-অপ্রমাণের সময় কেলু পুরো শহর কলকাতা ঘোরে। “কেলু শব্দের ভঙ্গির পেছনে-পেছনে পেছনে-পেছনে হাঁটে। শব্দের শুধু মুদ্রা আছে কেলুর কাছে। ধ্বনি নেই। ধ্বনির কোনো অর্থ নেই।” (রায় ২০০১, ৪৬১) লেখকও অসহায় বোধ করেন সেই ধ্বনিকে শব্দে এবং শব্দকে সুসংহত বাক্যের রূপ দিতে। কেলু এই শহরের, এই শাসকের কাছে অ-নাগরিক হয়েই থেকে যায়।

বাজিকরদের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের ভাষা, কোনো একক ভাষা নয়, একইসঙ্গে যুঝে চলে শাসকের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। অভিজিৎ সেনের শতকব্যাপী উচ্ছেদের আখ্যানের প্রোটোগনিস্ট কোনও ‘ব্যক্তি’ নয়, বরং গোষ্ঠী। ‘বাজিকর’ একটা পরিচিতি, এক ব্যাষ্টি। অনেকে মিলে তৈরি করা অনেকের আখ্যান। আর, এত দীর্ঘসময় উচ্ছেদ-পুনর্বাসনের আখ্যানে অনেকের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে এক অন্য ভাষার জন্ম হয়েছে। থিয়ং’ও ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের গভীরতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন- “A specific culture is not transmitted through language in its universality but in its particularity as the language of a specific community with a specific history” (Thiong’O 2003, 15) বাজিকরদের প্রতিবার ভাষাবদলের পিছনে প্রতিটি নতুন ইতিহাস, উচ্ছেদ ও চলমানতার ইতিহাস। প্রতিবার উদ্বাস্তু হয়ে বাধ্যতঃ পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাষা-সংস্কৃতি; ঘর্ঘরা নদীর তীর থেকে রাজমহল, মালদা, রাজশাহি শুধু পুর্বের দিকে চলতে চলতে বাজিকরদের ইতিহাস তৈরি হয় সঙ্গে ভাষা। ইলিয়াস তাঁর ‘অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ্গ’ প্রবন্ধে লিখছেন,

তার যা আছে তাকে বড়জোর বুলি বলা যায়। পায়ের মতো জিভও তার বড়ো পিচ্ছিল, কোনো জায়গার বুলিই তার মুখে ভাষা হওয়ার সময় পায় না, দেখতে না-
দেখতে বাজিকর চলে যায় অন্য কোথাও, সেখানে গিয়ে সে নতুন বুলি রপ্ত করে
(ইলিয়াস ১৯৯৭, ১৩৮)

সেই বুলি এবং মিশ্রভাষাতেই বংশান্তরে বয়ে চলে তাদের মিথ্, পরম্পরা, গান ও লোকায়ত। এর’ম নির্দিষ্ট ভাষাহীন কোনও গোষ্ঠীকে কোনও মান্যতায় বাঁধা যায় কি? কোনও ‘উপভাষা’ তকমা-আঁটা সংকীর্ণতায় ঢুকিয়ে ফেলা যায় কি? লেখক নিজেও কোনও মান্য সাহিত্যভাষার মধ্যে তাই বেঁধে রাখতে চাননি বাজিকরদের।

সামাজিক বহুস্বর ও অনেকার্থদ্যোতনা উপন্যাসের প্রতিবেদন তৈরি করছে।

“Heteroglossia stratifies and fragments Ideological thought into multiple views of the world.” (Morris 1997, 15) পরস্পরবিরোধী ও ভিন্ন ভিন্ন স্বরের মিথস্ক্রিয়ায় নানা অর্থের দ্যোতনা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আখ্যায়ক বা লেখক শুধুমাত্র আর সর্বজ্ঞ অবস্থান থেকে আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। কারণ, তাঁদেরও শ্রেণি-সীমাবদ্ধতা রয়েছে। চ্যারকেটু, খেতখেতুদের ভাবনা ‘ভদ্রলোক’ লেখক পাঠক বাবুরা বরাবর ভেবে এসেছে। তাদের কী করণীয়, তাদের কী দৈনন্দিন যাপন, অধিকার এসব ভাবার দায়-দায়িত্ব বহন করে এসেছে শহুরে, শিক্ষিত লেখক-পাঠক সম্প্রদায়। আর, এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে চ্যারকেটু, খেতখেতু এবং বাঘারুৱা। বাবু/ভদ্রলোকি চিন্তার ছকে তাদের আটকে রাখেন না দেবেশ। তাই জনোই ‘ভাষাসমস্যা’ তৈরি হয়। শহুরে নেতা তমাল, গোপাল কুণ্ডু, জোতদার বাহেবাবু, পদ্মনাথ, নিষ্ঠ ক্যাডার বিশু এরা কেউই সম্পূর্ণ আত্মীকরণ করতে পারেনি সাঁওতাল-মদেশিয়াদের সংস্কৃতি, চ্যারকেটুদের রোজনাচা কিংবা ভূমিপুত্র ফোকলা দেবেনের ভাষা। সেই ফারাক ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই ফারাক একদিনের নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক ফারাক নয় বরং সুদীর্ঘ সময় ধরে লালিত। আর, চ্যারকেটু, মদেশিয়া যুবতীটি- এদের প্রান্তিকতার সাথে তমাল, বাহেবাবু, বিশু এদের প্রত্যেকের সংলাপ ভিন্ন। এমনকি, গোপাল, বাহেবাবু, তমাল, বিশু এদের নিজেদের মধ্যেও শ্রেণিগত অবস্থানের পার্থক্য- “গোপাল কুণ্ডু, বিশুকে ‘তুমি’ বলে, বিশু গোপাল কুণ্ডুকে ‘দাদা’ বলে কিন্তু তমাল বিশুকে কোনদিনই ‘দাদা’ বলবে না, আর তমালকে বিশু ‘তমালবাবু’ বলেই ডেকে যাবে।” (রায় ১৯৮০, ১৪১) নব্য কংগ্রেসের শহুরে, ‘মার্জিত’, ইংরেজি-বলিয়ে নেতা তমাল তার আচরণেই আরোপিত লীডার হয়ে ওঠে; বাহেবাবু জোতদারি ক্ষমতায় জোর করেই নেতা বনে যান, আদি কংগ্রেসের মিছিলে তাঁর জমির আধিয়ারদের নিয়ে আসেন; আর, বিশু এদের সবার থেকে সামাজিক ও শ্রেণি অবস্থানে কিছুটা নিচে, তাই সে সহজেই তার ভাষা-সংস্কৃতি-আচরণে মিশে যেতে পারে উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী, ভূমিহীন মানুষদের সাথে কিন্তু

উচ্ছেদ ঠেকাতে পারে না। মদেশিয়াদের নিয়ে জোতদারের জমি দখল করে কৃষক-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে সে, কিন্তু বাহেবাবু পুনরায় সমস্ত জমি আত্মসাৎ করে।

প্রান্তিক মানুষ, শোষিত মানুষ যাঁরা ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির নির্ধারক (কিন্তু অবজ্ঞার পাত্র) তাঁদের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের পার্থক্য এই ভাষাব্যবহারের মধ্যে দিয়েই আরো পরিস্ফুট হয়। ভূমিহীন কৃষক ও অস্থায়ী শ্রমিকদের (যাদের বাস্তবচ্যুত করা আইনত সহজ) এতদিন এবং বরাবর জমির ভয় দেখিয়ে, খাদ্যের লোভ দেখিয়ে এবং পতাকার রঙ চিনিয়ে মিছিলে আনা হয়েছে। ভাষার এক দুস্তর ব্যবধানে মিছিলের লোকেরা নেংগুর (বাহেবাবুর লোক) পেছন পেছন ‘দলা পাকিয়ে হাঁটে’, পদ্মনাথ-বাহেবাবুরা তাদের জমি ছলে-বলে-কৌশলে দখল নিয়েছে জেনেও, তাদের নির্দেশের ভাষাই মিছিলের সেইসব মানুষের সহজবোধ্য। মাদারির মা বা বাঘারুকেও সেভাবেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলে। মাদারির মা যায় খাবারের জন্য আর বাঘারু যায় নাম ও পরিচয়ের সন্ধানে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’তে যুক্তফ্রন্টের বড় নেতারা, জেলার ডি.সি তাঁদের পরিশীলিত ভাষায় আধিয়ারের অধিকার, আধিয়ার উচ্ছেদ বে-আইনি, জোতদারের ক্ষমতাহ্রাস বিষয়ে সভায় বক্তব্য রাখলেও, সে ভাষা আধিয়াররা বুঝতে পারে না। বরং, তারা বোঝে তাদের ভাত-কাপড়ের মালিক পঞ্চগয়েতের ভাষা। পঞ্চগয়েত যুক্তফ্রন্টের পঞ্চগয়েত, কংগ্রেস-বিরোধী কিন্তু তার সংস্কৃতি-ভাষা যুক্তফ্রন্টের বাম-নেতাদের শ্রেণিচেতনার বিপরীত। সেই শ্রেণিচেতনার প্রতিফলন হয় তার রাজবংশী উচ্চারণে, “পার্টির কাম পার্টি করো- ভোটাভুটি, আইন-কোর্ট, ডিসি, এসডিও এসব করো। চাষ আবাদের কাম চাষিক ছাড়ি দাও, হাল-বলদ-বিছন আধিয়ার- এইসব কামে পাড়ি-পুড়ি কোটহ আসে হে, অ্যাঁ?” (রায় ১৯৮০, ৯৫) রমনী পঞ্চগয়েত বা গয়ানাথের নিয়ন্ত্রণেই আধিয়ারদের অধিকার-অনধিকার, উচ্ছেদ, জমিলোপের সরকারি ভাষ্য লেখা হয়। ‘মান্য’ সংস্কৃতি, ‘মান্য’ সাহিত্যভাষা বনাম দ্বারিকামারি গ্রামের, তিস্তাপারের চরুয়া, রাজবংশী, ভাটিয়া ও আগত উদ্বাস্তুদের ভাষার টানাপড়েন চলতে থাকে। একইভাবে, যা পাঠককে বিযুক্ত করে সাহিত্যের মান্য ‘আঞ্চলিকতা’ থেকে ও সংযুক্ত করে

বৃহত্তর স্থান-কালের ধারণার সঙ্গে। বৃত্তান্তের কথক বহুভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জোর করে এক করেও দেন না, কোনো একটি ‘মান্য’ সাহিত্যভাষার অধীনতা মেনে নেন না। আলাদা আলাদা ভাষাসত্তাকে, তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন সামাজিক সংলাপের প্রকাশকে একটা অদৃশ্য কখনসুতোয় বেঁধে রাখেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনার মধ্যে দ্বিবাচনিকতা ত্রিাশীল থাকে যা ভিন্ন শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের ভাষার অন্তর্বয়নে উপন্যাসের সময়কে গড়ে তোলে। একবাচনিকতার থেকে দ্বিবাচনিকতা আরও বেশি ‘নৈর্ব্যক্তিক’ ও ‘বাস্তব’ হয়ে ওঠে কারণ বাস্তবকে লেখকের মতাদর্শাধীন রাখে না। দ্বিবাচনিকতায় প্রত্যেক চরিত্রের স্বর/কথন আছে; বহুস্বরের মধ্যেও তার নিজস্ব ওজন রয়েছে এবং অন্য চরিত্রের কথনের সঙ্গে আদানপ্রদান রয়েছে।²⁸² আর, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ বা ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এর মতো এখানেও পাঠক পাঠের গভীরে ঢুকে চিনে নিতে পারেন ক্ষমতার ভাষা, শোষক ও শোষিতের ভাষা এবং প্রশাসন বনাম অধিকার চাওয়া মানুষের ভাষা। রহু চণ্ডালের উত্তরসূরীদের আখ্যাননির্মাণে তাই অনিবার্য যাবাবরী ভাষা, বাজিকরের খেলা দেখানোর গান কিংবা হাপু খেলার ভাষা। অঞ্চলের নিজস্ব রাজনীতি, অর্থনীতি অনিবার্য প্রভাব ফেলে ভাষার ওপরে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলা উপন্যাসে ‘ওরা’ গ্রন্থে লিখছেন,

‘ভাষাতত্ত্বের বহির্ভূত কারণ’ যে ভাষাকে পালটে দিতে পারে। ভেঙ্গে ফেলতে পারে ভাষাতত্ত্বের অনড় কাঠামো তার কারণ ভাষা সামাজিক সম্পর্কেরই একটি মূর্ত রূপ, তাতে রয়েছে সামাজিক লেনদেনের অনপনয় ছাপ (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, ৩৯)

তিস্তা-বাঁধ প্রসঙ্গে বক্তৃতায় যারা বক্তব্য রাখে, তাদের প্রায় সবাই ‘বাইরে’ থেকে আসা ‘বাবু’; এলাকার সঙ্গে তাদের ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা নেই। ফলে, এদের ভাষণে পরস্পরবিরোধিতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে কেন্দ্রিকতার অভাব। আসাম থেকে আসা নেতা রাজবংশীদের স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের বিরোধী এক নতুন পার্টির

কথা বলেন। সভাপতি পঞ্চগনন মল্লিকের ভাষণে ভারতীয় হিন্দুদর্শন ও ভারতবর্ষের অখণ্ডতার ইতিহাস তুলে ধরেন। “তাঁর বক্তৃতা শুরুই হল গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে, তাও অনুবাদে নয়, সংস্কৃতে।” (রায় ২০১৩, ৩৮৭) দার্জিলিং থেকে আসা অধ্যাপক বলেন, “আমরা তো এখন বিচ্ছিন্ন হয়েই আছি- নিজের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের হকের জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন (ঐ, ৩৮৯)।” আর, এদের প্রত্যেকের বক্তব্যের সারবত্তা তিস্তাপারের রাজবংশীদের উন্নয়ন, বিকাশ ইত্যাদি হলেও এরা কেউই অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে ছুঁতে পারেন না। নিজেদের ‘ভদ্রলোক নেতা’ অবস্থান থেকে তাদের বক্তব্য, সংস্কৃত শ্লোক, হিন্দুদর্শনের ও ভারতেতিহাসের ব্যাখ্যা তিস্তাপারের নিজস্ব কখন হয়ে ওঠে না। ভাষা ও সংস্কৃতির অনতিক্রম্য এক ব্যবধান রচিত হয়েই থাকে। বরং, মফস্বলি বৃত্তান্তের রমণী পঞ্চায়েতের মতো গয়ানাথের ‘অমার্জিত’ ও অগোছালো ভাষা-বক্তব্য বোধগম্য হয় মিটিঙ্গের লোকেদের। তার বক্তব্যে আসলে এই তিস্তাপারের অঞ্চলে তার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনাই ফুটে ওঠে। কিন্তু, সে বক্তৃতার ভেদক্ষমতা অনেক বেশি বাকি নেতাদের ভাষণের চেয়ে। কৃষক সমিতির সভায় রাধাবল্লভের বক্তৃতায় কৃষকদের জ্ঞান-বহির্ভূত শব্দ ঢুকে পড়তে থাকে। চা-বাগানের নেতা ফাগু ওঁরাও-র বক্তৃতায় হিন্দি, ইংরাজি, সাঁওতালি ও মদেশিয়া ভাষার অবাধ ব্যবহার।

লেकिन সাথিমन, চিয়া-বাগানকো ভেস্ট ল্যান্ডপর किषानलौको जबरदखल कायेम करता थे। एतना जबर दखल ये ई गवमेन्टको सेटेलमेन्ट भि उ होना नाहि देगा। ई अफिसारलग अउर जोतदारलोगको यो कलकजा होता ह्याय, यो क्यापासिटी होता ह्याय... (रায় २०१३, ८३)

তিস্তাপারের কৃষক-মজুরের ব্যবহৃত শব্দে পার্থক্য অনেক। ওই অঞ্চলের চা-শ্রমিকরা সিংহভাগই অভিবাসিত। আর, কৃষকেরা বংশপরম্পরায় ‘দখলীকৃত’ জমির বাসিন্দা। কিন্তু তাদের মিল থাকে, ইনকিলাব শব্দের সঘোষ উচ্চারণে, লালঝাণ্ডায়। যদিও, অঞ্চলের খাশজমির দখল নিয়ে ‘কৃষক বনাম মজুর’ এই প্রতর্কও জোরদার হয়ে ওঠে। আবার, এই সমস্ত কিছুকেই ঘেঁটে দেয়

বাঘার! কারণ, সে কৃষক না মজুর, তা-ই তো নির্ধারণ করা যায় না! ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশের দুই সীমান্ত-সেনাপতির সংলাপেও চলে আসে শাসনকাঠামোর কেন্দ্রিকতা-আঞ্চলিকতার দ্বন্দ্ব, “তমরা কলকাতা দেখবা, আমরা রংপুর দেখব। আর সব আলাদা- নদী আলাদা, ফ্লাড আলাদা, টাইম আলাদা।” (রায় ২০১৩, ২৬৪) শাসকবয়ানে এভাবেই আলাদা ক’রে নেওয়া হয় ভূখণ্ড, আলাদা ক’রে নেওয়া হয় মানুষদের, সেইমতোই শাসন-নির্বাসন-অভিবাসন। আর, আছে কথকের নিজস্ব কথন। বৃত্তান্তের এক অধ্যায়ের সাথে অন্য অধ্যায়ের, এক চরিত্রের সাথে অন্য চরিত্রের সংযোগ-ভাষা। সেই মান্য চলিত ভাষায় তিস্তাপারের উন্নয়ন ও বিস্থাপনের আখ্যান। এই যে, আঞ্চলিকতার গভীর ছাপ পড়ছে, এত এত ভাষান্তর পরস্পরের সাথে যোগ-বিয়োগে রয়ে যাচ্ছে, এই বহুস্বর ইতিহাস ও সামাজিকতার চলমান নিদর্শন। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ বিষয়ে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিভিন্ন ভাষা ও বাংলা ভাষার প্রকারভেদসম্পন্ন এই বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আঞ্চলিক বিশিষ্টতা তুলে ধরাই নয়।^{২৪৩} এই বৃত্তান্ত তার চেয়েও অনেক বেশি এক রাজনৈতিক বিস্থাপনের আখ্যান। বিস্থাপন ও উচ্ছেদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাষার কথন।

বাঘার মতই কেলু অসংখ্য ‘না’ দিয়ে তৈরি, কারণ তাকে কিছুতেই চেনাজানা ছকগুলোতে এঁটে ফেলা যায় না। কেলুর ভাষা ও যাপনকে আখ্যানে বাঁধতে কথককে সাহায্য নিতে হয় নথিপত্রের, সংবাদপত্রের এবং অন্যান্য তথ্যাবলির। সাল-তারিখের খতিয়ান দিয়ে কথককে প্রমাণ করতে হয় যে, কেন কেলু বাস্তুচ্যুত এবং আইনি-পদ্ধতিতে কেলু-রাধিয়া-পাড়ারিয়া গ্রাম কেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। পাড়ারিয়া গ্রাম উচ্ছেদে সরকারি নির্দেশ আসার পর থেকেই প্রশাসনিক ভাষা বদলাতে থাকে। পুনাসি সংলগ্ন নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর সরকারি জুলুম মান্যতা পায় বাঁধের জন্য গ্রাম উচ্ছেদ করার পুলিশি ভাষ্যে। “পিটিয়ে বাঁধের ধার থেকে ওদের তুলে দেব। ঐ সব আনঅথরাইজড গাঁও থেকেই দুনিয়ার বদমায়েসি চালু হয়।” (রায় ২০০১, ১৫৪) এভাবেই রাতারাতি জারি হওয়া সরকারি হুকুমে ‘আনঅথরাইজড’ হয়ে যায়

জনপদ ও মানুষ। পুলিশকর্তৃক ঘর ভাঙচুর, বাঁধসংলগ্ন গ্রামে আগুন লাগানো ও মহিলাদের গণধর্ষণ প্রশাসনিক ‘স্বীকৃতি’ পেয়ে যায় যেহেতু গ্রামগুলিই তখন অবৈধ ঘোষণা হয়ে গেছে। পুলিশ আর মানুষের, শোষক ও শোষিতের দ্বিবাচনিকতার মধ্যে কথকের স্বর মিশে যায় উচ্ছেদ, বিস্থাপন ও ইতিহাসের বিষয়ে, “নদীকে ঘাড় ধরে মানুষের তৈরি খাতে নিয়ে আসছিল আধুনিক প্রযুক্তির যে-বাঁধ, তার ঢালে একটি আইনত উঠে যাওয়া গ্রাম আর সভ্যতার আইনসঙ্গত হাজার বছরের ইতিহাস একই সঙ্গে লোপাট হয়ে যাচ্ছিল” (রায় ২০০১ ১৬৮) ইতিহাস লোপাট করে মানুষকে বাস্তবহীন করার এই সুসংহত প্রক্রিয়ারই প্রতিফলন দেখা যায় রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে, ইউরোপে শরণার্থী হয়ে ঢুকে পড়া মানুষদের আখ্যানে। জেপেনটেক তাঁর ‘Migration, Diaspora, and Ethnic Minority Writing’ প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন, “they are not only "peripheral" but also "in-between”²⁸⁴ বাজিকর সম্প্রদায় বা কেলুর ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রযোজ্য হয়। তারা উদ্বাস্তু হয়ে যখন এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়, তখন নিজেদের এতদিনের সংস্কৃতিকে মাথার ভেতর নিয়েই যায়; আর, যে নতুন অঞ্চলে নিজেকে স্থাপিত করছে, সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক প্রভাবের আওতায় এসে পড়তে বাধ্য হয়। তাদের প্রান্তিকতা নিজেদের বিস্থাপিত করার মধ্যে এবং নতুন অঞ্চলের অর্থনীতি-সংস্কৃতিতে ‘বেমানান’ হওয়ার মধ্যেও। “এই সমস্ত পৃথিবী তার, কিন্তু এমন কোনো জায়গা তার নেই যেখানে সে পা রেখে দু-দণ্ড দাঁড়াতে পারে” (সেন ২০০০, ১৬১) বাজিকররা কখনো কোনও স্থানের ‘আপন’ হতে পারে না, আর সেইজন্য তারা নিজেরাও অঙ্গঙ্গী ভাবে মিশে যেতে পারে না নতুন নতুন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। ভাষার বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ, অর্থনীতির বিরোধ এবং অস্তিত্বের বিরোধ চলতেই থাকে, ফলে রাষ্ট্র-নির্ধারিত মান্য মানচিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়, “কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্র [যদি] সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদলে যায় তাহলে কি সেই সঙ্গে দেশের মানস-মানচিত্রটাও পালটে যাবে না?” (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, ২৮) বাজিকররা যখনই নতুন স্থানে পরিচালিত করে, সেখানকার সংস্কৃতি ভাষায় অভিযোজন করে নেয় তারপর আবার অন্যত্র পরিচালনের সময় আবার নতুন সংস্কৃতি-ভাষাতে

মানিয়ে নেয়। এইভাবে তাদের নিজস্ব রীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বারবার নতুন নতুন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব পড়ে। জেপেনটেকের ভাষায় ‘self-referentiality’- সঙ্গে আধুনিক নতুন সংস্কৃতির এই প্রবল দ্বন্দ্ব আরও বেশি প্রান্তিকায়িত হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বাজিকরেরা। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র কেলু তার পাড়ারিয়া থেকে নিজেকে ছিঁড়ে এনে কলকাতা শহরে প্রোথিত করতে চায়। কেলুর নাম ও অস্তিত্ব বিষতেল, স্টোনম্যান ইত্যাদি নামের মধ্যে দিয়ে নতুন করে জেগে ওঠে। কেলু কোনওভাবেই এই পরিচিতিগুলো নয়, কিন্তু এই পরিচিতিগুলো, রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত এই নামসংকেতগুলো তার অস্তিত্বকে প্রতীয়মান করে। কেলুর মতো প্রান্তিকদের অস্তিত্ব কোথায়? অস্তিত্ব সেটুকুই, যেটুকু রাষ্ট্র তাকে অনুমোদন দেয়। কিন্তু, নিজের না-পরিচয়গুলো দিয়ে রাষ্ট্র ও সহনাগরিকদের কাছে এ শহরের হয়ে উঠতে চাইলেও, কেলু তা পারেনা; এই ক্ষেত্রে সমাজনির্মিত এক দুস্তর ব্যবধানের দোদুল্যমানতা জেগে থাকে- “ছোটবাবুর [থানার এস.আই] শহর আর কেলুর শহর পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়... কেলুর কলকাতা ও ছোটবাবুর কলকাতা এক নয়। কলকাতার কেলু ও কলকাতার ছোটবাবুর মধ্যে তাই কোনো বিনিময় নেই” (রায় ২০০১, ৪৮২-৮৩) পাড়ারিয়া ও পুনাসি বাঁধ-সংলগ্ন ছোট ছোট গ্রামের উচ্ছেদের প্রাকমুহূর্তে পুলিশ যে গণধর্ষণ করে, তাতে নিম্নবর্গের আইনি অধিকার ও ন্যায়বিচার আরওই অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেবেশের ভাষায়, ‘নথির ভেতর উপন্যাসের সংক্রমণ’ ঘটে যায়। ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গকে বাস্তবচ্যুত করতে ক্ষমতাশালী ক্ষমতাহীনের পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করে- এতে পরিবারও উজাড় হয় এবং ত্রাসের সঞ্চার ঘটানো যায়- শাসকের চিরায়ত নীতিমালার মধ্যেই পড়ে এই কাজ। আর, পুলিশ যেহেতু গণধর্ষণ করেছে, তাই জজসাহেবের যুক্তি-প্রতিযুক্তিতে ‘মিথ্যে’ হয়ে যায় ধর্ষণ। নিম্নবর্গের কামিন মেয়ের জবানবন্দির থেকেও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয় পুলিশি যুক্তি- তাই আদালতের নথির ভাষা থেকে কথক জানান যে ধর্ষণের বিরুদ্ধ-যুক্তি ও অপ্রমাণের সামনে জজসাহেবও অসহায়। এই অপ্রমাণিত রাষ্ট্রীয় ধর্ষণই রাধিয়া-সুমা-দরিয়া-নিমিয়াদের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করে। আর, সুহাস শহর থেকে আসা সরকারি কর্মচারী, সেই

ভূমিকায় দেখে কীভাবে একই অঞ্চলে ভাষার রূপভেদ হচ্ছে, ভাষার সংমিশ্রণ ঘটছে। আবার, সুহাস যখন প্রাক্তন নকশাল বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে, তখন বোঝে অঞ্চলের নিজস্ব রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত; যা তার এতদিনের দেখা ও বোঝা শহুরে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক ‘আদর্শের’ সাথে মেলে না। সে তার রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে অঞ্চলকে বোঝে, অঞ্চলের ক্ষমতা-বিভাজন বোঝে। সরকারি ম্যাপ, মৌজা সব থাকা সত্ত্বেও অঞ্চল কীভাবে ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে যায় তার প্রমাণ সে পায় যখন গয়ানাথের দাবি (জবরযুক্তি) অনুযায়ী নদী আছে কী নেই তা ঠিক হয়ে যায়। ক্ষমতাকাঠামোয় মানুষ বাড়ি-জমিহীন, অধিকারহীন হয়ে যায়। সুহাস দেখে লালবাগা নিয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে জমিদখলের ‘সংগ্রাম’ করছে কৃষক বনাম মজুর অথচ, লালবাগার বামফ্রন্ট সরকারেরই নীতি অপারেশন বর্গ। এই তিস্তাপারের অভিজ্ঞতা তাকে চেনা তত্ত্বের সক্ষীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয় ও ‘ভারতবর্ষ’ নামক বিশাল বহুত্ববাদী ভূখণ্ডের সাথে যোগ করায়।

বাস্তবচ্যুত নিম্নবর্ণের প্রত্যাখ্যানের ভাষা

“বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল” (রায় ২০১৩, ৫০৪) ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে শাসকের ‘উন্নয়নমুখীনতা’, রাজনীতি-প্রশাসনের কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক স্তরবিভাজন ও শ্রেণিবৈষম্যের প্রকটতা- এই সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করার নিজস্ব ভাষা খুঁজে নেয় নিম্নবর্ণীয় ও প্রান্তিক মানুষেরা। বাজিকরদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, ধর্মহীনতা ও পথচলায় কুড়িয়ে পাওয়া লোকায়ত রীতি-সংস্কার শেষ পর্যন্ত উপনিবেশোত্তর ভারতের সমাজশাসকদের কাছে সমর্পণ করতে হয়। তাদের অসহায় সমর্পণ এবং এক প্রাচীন গোষ্ঠীর পরাজয়ের ট্রাজিক আখ্যানের মাঝেও প্রত্যাখ্যান থাকে। ক্রমশঃ ‘অপর’ বলে প্রতীয়মান হয়ে বারবার উচ্ছেদের শিকার হতে হতে অধিকাংশ টিকে যাওয়া বাজিকর হয় হিন্দু নয় মুসলিম ধর্মের শরণ নেয়।

অন্ন-বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেতে গিয়ে বাজিকর গোষ্ঠী ভাগ হয়ে যায়- রূপা ও কয়েকটি পরিবার সাপুড়েবৃত্তি নিয়ে ‘হিন্দু’ হয় এবং ইয়াসিন সহ বাকিরা মৌলবির কাছে ‘ইসলাম’ গ্রহণ করে। বাদা-কিসমত গ্রামে ইসলাম ধর্মগ্রহণের পরেই সাত-পুরুষের বাস্তুহীন জীবনে প্রথম স্থিতি পায় বাজিকরেরা, শাসকপ্রতিনিধি সোনামিয়া ইয়াসিনকে বলে “এখন তুমি মালিক হলে এই বসত জমির ভিটার। কেউ তোমাকে আর উচ্ছেদ করতে পারবে না।” (সেন ২০০০, ২২৯) কিন্তু শারিবা বাজিকর পদবী ছাড়ে না। সরকারি চাকরির আবেদনপত্রে ধর্মের শূন্যস্থানে প্রথমাক্ষিক হিন্দু বা মুসলিম লিখলে চাকরি হয়ে যেতে পারে জেনেও সে বলে, ‘লিখেন বাজিকর। বাজিকর!’ শ্রমিক হানিফকে গর্বভরে সে বলে, “শারিবা বাজিকর। আমরা বাজিকর, আমারদের জাত নাই।” (ঐ, ২০৮) হানিফের সঙ্গে শারিবার ভাবনা মিলে যায়, “বাজিকরের কোনো জাত নাই” (ঐ, ২১৭) আর, এই যে উদ্বাস্তু জীবন থেকে সরকারি পাট্টাজমিতে বসতের দীর্ঘ যাত্রাপথ, তারপরেও বাজিকরদের ভয় থাকে উচ্ছেদের, আজুরা মণ্ডলের, ভায়রোর। শাসকের ক্ষমতাবদলের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্গীয় বাজিকরদের ‘অপরায়ন’ প্রক্রিয়ায় বদল আসে। আর, বাজিকররা তাই ধর্মান্তরণের মধ্যেও লুকিয়ে রাখে ক্রোধ, “কেন্ত এতে বাজিকরের লাভ আছে... সামাজের মানুষে নানাকারণে বাজিকর বাদিয়াকে ছিড়া খায়। তিন-চার পুরুষ ধরা আমরা থিতু হবার চাছি। কেন্ত থিতু হবার চালেই বাজিকর থিতু হবার পারে না। কারণ কী, তার যি ধরম নাই” (সেন ২০১০, ২৪৪) ধর্মহীনতার জন্যে শাসকের চাপে উৎখাত হতে হয়েছে তাদের বারবার, তাই ধর্মকেই ব্যবহার করে বাজিকরেরা নিজেদের ঘরের স্বার্থে।

বাঘারু বারবার নির্বাসিত হয় ক্ষমতা-কাঠামোর যথেষ্টাচারে, শেষপর্যন্ত উৎখাত হয়। বাঘারুর যত বিযুক্তি ঘটে গয়ানাথ-অধিকৃত তিস্তাপার থেকে, ততই কথকবয়ানে তার সংযুক্তি প্রকৃতির সঙ্গে। তিস্তাপারের সবকিছুর অস্তিত্ব গয়ানাথ জোতদারের নিয়ন্ত্রনাধীন জেনেও বাঘারু প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেবে ফেলে,

পাখিগুলোর কোনো গয়ানাথ নাই রো, কিন্তুক পাখিগুলোর তো মুই আছে... সব আল-
বাড়িটাড়ি-ফরেস্ট-গরুবাছুর ডোবানো এই জলটাই থাকুক, যে জলটা দিয়ে বাঘারু ভেসে
এল সে-রকম জল দিয়েই বাঘারু আরো ভেসে যাক, এতই ভাসুক যে গয়ানাথ আর
আসিন্দির আর তাকে খুঁজে পাবার সুযোগ পাবে না (রায় ২০১৩, ২৮৭)

‘বৃক্ষপর্বঃ বাঘারুর প্রত্যাবর্তন’ অধ্যায়ে বারবার বাঘারুর চিন্তায় গয়ানাথের শাসন উপেক্ষা করার
কথা আসে। বাঘারু, সমাজবয়ানে যে বাস্তবহীন, অস্তিত্বহীন তাকে ছাপিয়ে বারবার বাঘারুর সঙ্গে
তিস্তাপারের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্যতার কথা আসে।²⁸⁵ প্রত্যাখ্যানের আরেক ধরণ সেই ধর্মিতা
মেয়ের জবাবেও। সেনানায়ক ঘোষের সব প্রশ্নেই তার ‘না’! তার দেশ না ইন্ডিয়া না বাংলাদেশ।
তার দেশ নেই, মানুষ নেই, পরিবার নেই। সে রাজনৈতিক ভূগোল ও কেন্দ্রিকতাকে প্রত্যাখ্যান
করে বলে যে, সে রাজীব গান্ধী বা এরশাদ কারোর নামই শোনে নি। ভোট সম্পর্কে সে কিছু
জানে না! চ্যারকেটুর ভাঙা সংলাপেও এসে যায় প্রত্যাখ্যান। যখন পুলিশ বা শহুরে সাংবাদিক
তাকে অঞ্চলের কিংবা অঞ্চলের ঘটমান রাজনীতির শরিক করে নিতে চায়, তখনই বিরুদ্ধ বয়ান
দিতে শুরু করে চ্যারকেটু। সে না করছে আইন অমান্য, না করছে অবস্থান এমনকি ‘তোমার
লিডার কে?’ প্রশ্নের জবাবে সে বলে, ‘কায়ও না বাবু’ তার এই ক্রমাগত ‘না’ শেষ হয় না;
“কুনো পার্টি না হয় বাবু... কারো ঝাঙা না হয় বাবু” (রায় ১৯৮০, ১৯০) এত ‘না’ দিয়ে যার
অস্তিত্ব প্রতীয়মান হচ্ছে, সে কি আইন-প্রশাসনের ধর্তব্যের মধ্যে পড়তে পারে? খেতখেতু
স্বগতোক্তিতে কাল্পনিক মাসানের কাছে প্রতিবাদ ব্যক্ত করে। আর, চ্যারকেটু প্রতিবাদ করে চলে
সেই সমস্ত মিছিলের যেগুলো কৃষকদের অধিকারের কথা বলে জোতদার-শোষকের নেতৃত্বে!
চ্যারকেটুর এই প্রত্যাখ্যান আখ্যানের শেষ অংশে ধরা দেয়। এইসব মিছিল, রাজনৈতিক
দলগুলোর সঙ্কীর্ণতা, বাহেবাবু-পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, উচ্ছেদের ভয়- এইসব কিছুকে ছাপিয়ে
চ্যারকেটুর খিদে। তার বিগত তিনদিনের ও আগামী কয়েকদিনের অনিশ্চিত খিদের প্রবল
প্রভাবে সে ও তার গরু “সার্কিট হাউসের সামনে বসে থাকা মিছিলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ট্রাষ্টরের মত বেগে সমস্ত মিছিলটা চষতে চষতে তারা আরো সব মিছিলের দিকে ছুটে যায়” (রায় ১৯৮৯, ১৯৪) তার নিজেরই হাতে রোয়া ধানখেতে মাথায় উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়েও সে আর কারোর পরোয়া করে না, গিরির পরোয়া করে না। কেলুর প্রতিবাদের ভাষা পাঠকের চেনা-জানা প্রতিবাদের ভাষার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারেনা। ‘উপন্যাস’ নামক আখ্যানশৈলী ঔপনিবেশিক সময় থেকেই নিজস্ব পাঠ ও পাঠকবর্গ তৈরি করে নিয়েছে- দীর্ঘ প্রায় দেড় শতক তার ক্রমবিবর্তন হয়েছে এবং পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত বদল হয়েছে। মধ্যবিভূ, নিশ্চিন্তির ঘেরাটোপে বাঁচা সেই পাঠকবর্গের সঙ্গেও এক দূরত্ব যেন তৈরি হয়েই চলে কেলুর, বাঘারুর, পীতেমের। পাঠক শুধু বিবরণ পায় কেলু কেন বেমানান, কেন বিচ্ছিন্ন। আর, কেলুও বোঝে তার অ-নাগরিক হয়ে যাওয়া, তার উচ্ছেদ। সে ভীষণভাবে উপলব্ধি করে অস্তিত্বহীন সত্তার অভিব্যক্তি; আর, তাই নিজের শ্রদ্ধ সম্পন্ন করে, পিণ্ডদান করে।

সৈকত রক্ষিতের ‘মাড়াইকল’ গল্পের চেপুলাল মালিক কুঞ্জর ক্ষমতাদম্ভের সামনে নুয়ে থেকেও অন্তর্ঘাতী দু’একটি বয়ান ছুঁড়ে দিতে পারে। যদিও তার চেতনায় শ্রেণিবোধ উজ্জ্বল নয় কিংবা শোষণ সম্পর্কে খুব-সচেতন যে এমনটা নয়। কিন্তু, তার নিরক্ষরতা আর অমার্জিত ব্যবহারের ভাষাই কখনও প্রতিস্পর্ধা হয়ে ওঠে। চেপুলালের সামান্য হাসিতে বিরক্ত কুঞ্জ যখন ‘তোমার বউ আজ ব্যাটা ধ্যানাবেক’ বলে আদরসাত্ত্বক ঠাট্টা ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চতর ক্ষমতা-অবস্থান জাহির করে, তখন চেপুলাল তার সরল ‘আবোদা’ যুক্তি দিয়ে বলে, “ব্যাটা হোক আর বিটি হোক, হামার বউ যদি আখিরে ধ্যানায়, ত স্যাটা তুমারেই লাভ... হামার পারা উ-ও তুমার শালে কাম করবেক।” (রক্ষিত ১৯৯৪, ২১) চেপুলাল তার চেতনা অনুযায়ী শ্রেণিসম্পর্ক বুঝে নেয়। হতাশা আর সুদীর্ঘ দাসত্বের প্রজন্মান্তরের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত ক’রে কুঞ্জর বদ রসিকতার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বাঘারু অস্ফুট শব্দ, ভাঙাখোওয়া চিন্তা এবং আধো-অচেতন-আধো-সচেতন অগোছালো চেতনায় জারিত ভাবনা দিয়ে ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে ফেলে। বসাই টুডু প্রান্তিকতার সবকটা খুঁটিতে টান মেরে জোরালো স্পর্ধায় জোতদার আর প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত

ক’রে তোলে। কিংবা, দোপ্‌দী মেঝেনের সংলাপ সেনানায়ককেও আতঙ্কিত ক’রে তোলে। ভাষা এসব মুহূর্তে হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শুধু যোগাযোগের মাধ্যম কিংবা মান্য-উপ প্রতর্কে আটকে থাকে না। ‘খাদান (১৯৯১)’ গল্পে দু’ই বিপন্ন দিনমজুরের সংলাপে ভোট সম্পর্কে মনোভাব টের পাওয়া যায়। তাদের চেতনায় ও বাস্তবে ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বিবেচ্য নয়। ভোট নিশ্চয়তাজ্ঞাপক বা সুরক্ষাকবচ নয় কিংবা তাদের দৈনন্দিন যাপনও কিছু বদলাবে না। ভোট তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ভোট না দিলে সংসদীয় দলগুলি তাদের শাসিয়ে যাবে বা ক্ষতি ক’রে দেবে। “ভুট না দিলে? তখনকে দেখবে কি সিপ্যাম-কি কংরেস-কি ঝাড়খন্দ- সব তুমার ঘরকে আইসে তুমাকেই ঢাঁড়াছে... এখন ভুট না দিলেই তুমি দুশমন” (রক্ষিত ৬১) ভোট না দিলে পঞ্চায়েত তাদের থেকে পাথর কিনবে না, আর, খাদানে কাটা পাথর বেচতে না পারলে খাদ্য-সংস্থান হবে না হাবল, মৈত্‌লাল, জলধরদের। সংসদীয় রাজনীতিকরা যেমন ক্ষমতার স্বার্থে ভোটদানের ব্যবহার ক’রে নেয়, খাদানের বাউরি ও রাজপুতরাও তেমনি নিজেদের পাথর বেচার স্বার্থে ভোটকে ব্যবহার ক’রে নিতে চায়। ভোটের প্রচার যত বাড়তে থাকে, তাদের পাথর বিক্রির আশা আরও উজ্জ্বল হতে থাকে- নিজস্ব বুলিতে আলোচনায় ও সরকারি অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনায় নিজেদের ভোটদানটুকুর ফায়দা তুলে নিতে চায় তারা।²⁸⁶ নিম্নবর্ণীয় শ্রমজীবী, যাদের কাছে ভোট ও পঞ্চায়েতের আদৌ কোনও সমাজমূল্য নেই, তাদের এই চেতনা উল্লেখযোগ্য বটেই। বাউরি বউদের ভাষাতেও থাকে বৃহত্তম গণতন্ত্রের কারবারিদের প্রতি শ্লেষ-যাকে ভোটবাবুরা আপাত-সরলতা জ্ঞানে অবজ্ঞা করলেও, শ্লেষের তীক্ষ্ণতা তো থেকেই যায়- “বাউরি বউরা জিজ্ঞেস করে বসে, ‘কি লিবে বাবু? ভুট লিবে ন পাথর লিবে?’ বলা বাহুল্য, দুটো জিনিসই তারা অকাতরে দিতে পারে” (৭০) ‘মুলুন’ গল্পের দুয়ারা প্রতিবাদ জানে না। তার চেতনায় ও সংলাপের ভাষায় খিদের সঙ্গে লড়াইয়ের শব্দ আধিপত্য করে। নগরায়নের ও উন্নয়নের আভাস পেয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করে দিগাম ও দুয়ারা, মুলুন তোলার কাজ চলতে থাকে। আর, ক্ষুধাক্লিষ্ট দুয়ারা তথা মুলুন ফুরিয়ে আসার বাস্তবসঙ্কটে বিপর্যস্ত দুয়ারা যখন বলে,

“ইস্কুল হবেক, ওপিস হবেক, হোক হোক। ওপিস যদি হয়েই, তবে হামার ই ব্যাটাকে তাইলে অপিসার বানাব। নাই বনবেক?” (৯৬) তখন সেই বিপন্নতা ও প্রজন্মান্তরের নিরক্ষরতার বেদনা ভাষা পায়। মুলুন ফুরিয়ে গেলে পুকুরের শূন্যতায় যে বিষণ্ণতা থাকে, প্রখর গ্রীষ্মদুপুরের নৈঃশব্দে যে বিষণ্ণতা থাকে, সেই বিষণ্ণতার ভাষা অনূদিত হয়ে থাকে দুয়ারার এই সংলাপে। পাঁকই দুয়ারা-আদরিদের অল্পসংস্থানের পথ, তার ভাষা সৈকত রক্ষিত অনুধাবন করেন, “তার চোখে শুধু পাঁক আর পাঁক। তার খড়ি-ওঠা গা যেন সেই পাঁকেরই আরেক রূপভাষা” (রক্ষিত ১০২) দেবেশ রায় ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্তে’ বাঘারুকে নিয়ে লেখেন, “বাঘারু কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘাড়ুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু কিছু-কিছু কথা বলতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই।” (রায় ২০১৩, ৫০৪) বাঘারু আসলে ভদ্রলোকীয়, মান্য ভাষায় প্রতিবাদ বা প্রত্যাখ্যান জানাতে পারে না। সেই আদবকায়দা তার রপ্ত নয়। সে তাই শরীর দিয়ে প্রতিবাদ ক’রে, সে তার শারীরিক অস্তিত্বকে আপলচাঁদ, তিস্তাপারের অঞ্চল থেকে উৎখাত ক’রে নিয়ে চলে যায়। সে একইসাথে নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতিকে ভদ্রলোকীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে এবং স্বাধিকারের রাজনীতিকে নিজের মতো ক’রে টিকিয়ে রাখতে চায়। এনগুগি ওয়া থিয়ং’ও উপনিবেশিক শাসকের ভাষাশ্রমতার আধিপত্য নিয়ে যা বলেছেন, তা প্রযোজ্য হতে পারে এমনকি উপনিবেশোত্তর সময়ের শাসক-ক্রিয়ায়। নিম্নবর্ণের কিছু-না-থাকা মানুষদের জবানের ওপরেও আধিপত্য কায়ম করে শাসক- “...impose its tongue on the subject races, and then downgrade the vernacular tongues of the people. By so doing they make the acquisition of their tongue a status symbol” (Thiong’O 1997, 72) শাসকের ভাষা, সংস্কৃতি ও আধিপত্য মানলে শাসিতের ক্রমবিচ্ছিন্নতা নিজের মূলের থেকে। আর, না মানলে সে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শাসিত অঞ্চল থেকে। বাঘারু, কেলু, জামিরদের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। বাঘারু সন্ধানে নতুন কোনো অঞ্চল। বাঘারু শরীরী ভাষায়, নিজস্ব এলোমেলো কথন-ভাষায় সাবভার্সন চলতে থাকে। যে অঞ্চল থেকে তাকে নির্বাসন দেয়

গয়ানাথের ক্ষমতা-কাঠামো, সেই অঞ্চলকে সে নিজের অধিকারে নামকরণ করে, “হেঃ গয়ানাথ, মোক এইঠে পাঠাছে অচিনা দেশত্। আর, মুই এইঠে একখান বাড়ি বানি নিছু। বাঘারুবাড়ি। শালো, কোটত খুঁজবে কোর দেউনিয়া, মোক?” (রায় ২০১৩, ১৭৬) মাদারির মা-ও জানে না ‘প্রতিবাদ’, ‘দারিদ্র্যসীমা’ ইত্যাদি শব্দ, নিজের ভূমি থেকে উদ্বাস্ত হয়ে জাতীয় সড়কের পাশে ঘর বানিয়েছিল। কিন্তু, তিস্তা বাঁধের আগামী উন্নয়নকাণ্ডের জেরে তাকে সেখান থেকেও চলে যেতে হয়। আখ্যায়কের কথনে মিলে যায় ভারতবর্ষের প্রতিটি নদীবাঁধ-উন্নয়ন-বিস্তাপন-ঘরছাড়ার বাস্তব, “তিস্তা ব্যারেজ, কাবেরী ব্যারেজ, হীরাকুঁদ ড্যাম, ভাকরা-নাঙ্গাল এই সবের বিরুদ্ধে তার নিজের এক শ্যাওড়াঝোরা বানাতে পারে।” (রায় ২০১৩, ৪৯১) দেশের ভিতরে এক নিজস্ব দেশ গড়ে তোলার প্রতিস্পর্ধা দেখায় মাদারির মা। বাঘারুও কোথাও স্থির হতে পারে না, তাই তার পদার্পিত স্থানগুলোতে সে নিজের সুস্থিত নিশ্চয়-ঘর সন্ধান ক’রে। আর, হয়তো সে অনন্ত সন্ধান, কিন্তু বাঘারুদের থামলে চলে না। ইতিহাস ও কথনকে এবং ‘অন্য’ আখ্যানকে এগিয়ে দেবার দায়িত্ব তো তাদেরই।

‘অপর’জনের সাহিত্য ও সাহিত্যের অপরজন

সাহিত্য কাদের? ভারতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে সমাজের ‘নিচুতলা’র মানুষদের, প্রান্তিকদের কথা আর প্রান্তে পড়ে থাকছে না। বরং, তাঁরাই কেন্দ্র হয়ে উঠছেন। তাঁদের আখ্যান, তাঁদের অনিশ্চয়তা, ঘর-হারানোর কাহিনি সাহিত্যের নতুন দিগন্তের প্রসার ঘটচ্ছে। তাঁদের রাষ্ট্রদ্বারা অস্বীকৃত শ্রম ও প্রত্যাখ্যাত অধিকার সাহিত্যের মাপাসুখী চেনাছকের কেন্দ্র দখল করে নিচ্ছে। মধ্যবিত্ত নায়ক, নিশ্চয়তার মধ্যে থেকে ‘বাইরের অশান্তি’ নিয়ে আখ্যান-কল্পনার পরিসর ছেড়ে সরাসরি নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্গের ছিন্নমূল মানুষদের প্রোটোগনিস্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কেলু, বাঘারু মতো একক ব্যক্তি হোক, বা চ্যারকেটু-খেতখেতু-টুলটুলির মতো পরিবার হোক, অথবা

বাজিকরদের মতো সম্প্রদায়- এক বৃহত্তর আখ্যানে এঁরা এক হয়ে যান। এঁদের আখ্যান ‘মূলধারার’ সাহিত্যের ধারণাটাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। তৈরি হতে থাকে এক আধুনিক রাজনৈতিক বয়ান যেখানে নিম্নবর্ণীয়, প্রান্তিকদের সংস্কৃতি, চিন্তা ইত্যাদির সঙ্গে ‘রাষ্ট্র’র আইন, সংস্কৃতির সংঘাত ও বিযুক্তির পরিসর তৈরি হতে থাকে। হোমি ভাবা তাঁর ‘The Location of Culture’ গ্রন্থের ‘Dissemination: Time, Narrative and the margins of the modern nation’ প্রবন্ধে লিখছেন,

This supplementary space of cultural signification that opens up- and holds together- the performative and the pedagogical, provides a narrative structure characteristic of modern political rationality: the marginal integration of individuals in a repetitious movement between the antinomies of law and order (Bhaba 1994, 155)

আর, প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্ছেদ বা সম্ভাব্য উচ্ছেদের পটভূমি তৈরি হতে থাকে। লেখক ক্রমশঃ বুঝে যান যে রাধিয়া কেলু, বাঘারু, মাদারির মা এরা ‘ভারতবর্ষ’ নামক রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, যে যে গুণাবলীতে এঁরা ভারতের পরিচয়-পত্রযুক্ত নাগরিক হতে পারতেন সেইসব গুণাবলী এঁদের নেই। আদালত-আইনের জনসমক্ষে রাধিয়া, সুমা, নিমিয়ারা গণধর্ষণের অভিযোগ করলে তাদের ‘ভারতীয় নারীত্ব’ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। নিম্নবর্ণের কামিন মেয়েরা ‘সাচ্চা ভারতীয়’ নয় তাদের যৌনজীবন (ধর্ষণের ক্ষেত্রে) ভদ্র, আকর্ষনীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন নয় বলেই তারা ভারতীয় সংস্কৃতির নয়- এমনটাই সিদ্ধান্ত বিচারব্যবস্থার। ‘মাদারির মায়ের স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন’ অধ্যায়ে মাদারির মায়ের উচ্ছেদ, তিস্তাপারের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের উচ্ছেদ, বাঘারু অনন্ত গমন আটকানো যায় না। “মাদারির মায়ের প্রতিদিনের বাঁচাই এক স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বরাট, স্বাবলম্বী বাঁচা।” (রায় ২০১৩, ৪৯১) রাষ্ট্রস্বীকৃত কোনো ভূমি তার জন্যে বরাদ্দ নেই। মাদারির মা আর যাই হোক, ‘ভারতবর্ষ’-র কেউ নয় কারণ তাকে বিস্থাপিত করেছে উন্নয়ন, ক্রমবিকাশমান,

আধুনিক ভারত। তাই মহাকাব্যসম বৃত্তান্তের শেষেও তার কথা লেখার যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয়ী লেখক। বাঘারু, মাদারির মা সহ ভারতের ছ-সাত কোটি নিরক্ষর প্রান্তিকতম মানুষকে নিয়ে লেখা সাহিত্য কোন অক্ষরে বাঁধবেন কথক? এনআরসি-র তালিকা থেকে নাম বাতিল হয়ে রাতারাতি অনুপ্রবেশকারী অ-ভারতীয় হয়ে যায় যে মানুষেরা, তাদের সাহিত্য লেখা হবে কোন রাজনীতিতে?

এই বৃত্তান্তগুলো ও ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ না-শেষ হওয়া আখ্যান। ‘উপন্যাস’-এর এযাবৎ নির্মিত ধারণাকে বাড়িয়ে নিয়ে চলে এই সাহিত্যপাঠ। পাঠকের প্রত্যাশার দিগন্ত বেড়ে যেতে থাকে; কারণ, পূর্বপরিচিত আখ্যানশৈলী ভেঙ্গে-গড়ে নতুন সন্ধানে এগোতে থাকে ভাষার মধ্যে দিয়ে, কেন্দ্রিকতা বনাম অপরাধনের মধ্যে দিয়ে, উন্নয়ন বনাম বিস্থাপন এবং কথনের নিজস্ব রাজনীতির মধ্যে দিয়ে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বৃত্তান্ত’ থেকে উপন্যাসের যাত্রাপথকে বলছেন ‘নবায়ন’। দেবেশ রায় অন্যত্র স্বীকার করছেন, “সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অস্থিষ্ট।” (রায় ১৪১২, ৮৭) আঞ্চলিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য এই সমস্তই পুনরানুসন্ধানের প্রয়োজন ব্যক্তিমানুষের বিস্তারকে কেন্দ্রে রেখেই। মানবিক অস্তিত্বকে ইতিহাসের পরিসরে ও কালের মাত্রায় বিন্যস্ত করতে গিয়ে উপন্যাস আর স্থির সময়ের কথা, আবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকতে পারছে না। বরং, চলমানতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে এতদিন সাহিত্যের কেন্দ্রিকতার বাইরে থাকা মানুষদের। স্থির সময়ের কেন্দ্রকে অস্বীকার ক’রে পরিধির ক্রমবিস্তারী, ক্রমবিবর্তনশীল বোধ ঢুকে পড়ছে বৃত্তান্ত থেকে উপন্যাসের যাত্রাপথে। মিখাইল বাখতিনের ক্রনোটোপ বা কালস্থানিকতার ধারণানুযায়ী,

...in the discourse of the novel a reader encounters "the zone of direct contact with inconclusive present day reality", which implies that it deals with the contemporaneity of 'here and now'. A novelistic discourse, therefore, generates in us "an interest in the present, a

reality that was contemporaneous, showing closer proximity and kinship to the future than to the past (Kabthiyal, Dangwal 2016, 473)

বৃত্তান্তে কথকের ভূমিকা বিবরণকারীর; কিন্তু, কখনো সেই কথকও সামূহিক বাচনের দার্শনিকতায় বলেন, “জল, আকাশ, এর কোনো কিছুই তো দেশীয় সীমান্তের উর্ধ্বে নয়। সেই সীমানা যখন লোপাট হয়ে যায়, তখন সেই সীমানা নির্ধারক শাসদনকাঠামোও লোপাট।” (রায় ২০১৩, ২৬৯)- কথকেরও তো নিজস্ব প্রত্যাখ্যান থাকে! বাঘাড়ু, চ্যারকেট, খেতখেতু, তুলতুলিদের কেবল ‘অপর’ বলেই মনে হয়। তারা যে আমাদের বৃত্তের নয়, একথাই যেন বুঝিয়ে দিতে চান দেবেশ। বাঘাড়ু বলে, “মোর কুনো মিছিল নাই”। তার সবেতেই শুধু ‘নাই’। সবেতেই ‘না হয়’। বাঘারু তার ভূমিতে হওয়া উন্নয়ন-উৎপাদনের অর্থনীতির দিকে পেছন ফিরে চলে যায়, প্রত্যাখ্যান করে। তিস্তাপারের অঞ্চল, দ্বারিকামারি গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চল সমস্ত কিছুকেই ক্ষমতাবানেরা কুক্ষিগত ক’রে ফেলেছে। বৈষম্যের প্রসারতায় কখন, পরিচয় আর স্থান থেকে প্রত্যাখ্যাত হয় বাঘারু, চ্যারকেটুরা। তাই, বিরুদ্ধ-বয়ানে বাঘাড়ু, মাদারি এই অঞ্চলকেও প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা রাখে কারণ, এই অঞ্চল তখন তিস্তার নয় আর, এই অঞ্চল মানুষ-নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং এই অঞ্চল একান্তই গয়ানাথের জোত! যে ধর্মিতা মেয়েটি দেশকে প্রত্যাখ্যান করে সে শুধু তিস্তানদী, চর ও বন্যা চেনে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’-র ভানুমতী যেমন প্রশ্ন করেছিল, ‘ভারতবর্ষ কোন্ দিকে?’; তেমনি এই মেয়েও চেনে না ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ। রাষ্ট্র তার কাছে পৌঁছেছে ধর্মক হয়ে। কামিন খাটা রাধিয়া বারবার তার ওপরে হওয়া রাষ্ট্রীয় গণধর্মণের অভিযোগ জানালে ভদ্রবাবু জজসাহেব তার ভারতীয়ত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়। রাধিয়াদের অ-নাগরিকত্বের সরকারি যুক্তিতে ভানুমতীর প্রশ্নটাই যেন জেগে থাকে, “রাধিয়া কি জানে সে ভারতীয় মেয়ে? তাকে দেশের নাম জিজ্ঞেস করলে সে পাড়ারিয়া গাঁয়ের নামই করবে হয়ত!” (রায় ২০০১, ২৩৭) সমুদ্রে স্বেচ্ছানিমজ্জনের মুহূর্তে কেলুকে লেখক শেষপর্যন্ত সামান্যই বিসংকেতীকরণ করতে পারেন, “কেলু তো ভারতবর্ষ চেনে না। অথচ সে তাকিয়ে ছিল

ভারতবর্ষেরই এক শেষ স্থলভাগের দিকে। সেই স্থলভাগ কেলুর অজানা ভারতবর্ষ, কেলুর জানা পাড়ারিয়া” (রায় ২০০১, ৫৬২) ছিন্নমূল কেলুর এত চেষ্টাতেও যে অস্তিত্ব স্বীকৃত হল না, তার যে অস্তিত্ব ঘর-মানুষ-অর্থনীতি-ভাষা কিছু পেল না, সেই অস্তিত্বের পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধসম্পন্ন করে কেলু। চ্যারকেটু প্রত্যাখ্যান ক’রে ধানজমির, বাসস্থানের মালিকদের, জোতদারদের; কারণ, ফসল ও জমির ওপর চিরায়ত অধিকার তার মতো কৃষকদের। বাঘারু প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে চলতে থাকে। ‘হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক...’। চ্যারকেটু তার না-মেটা বাসি খিদে নিয়ে এখনো দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে চলে যেতে পারে। খাদ্যের সন্ধান, অধিকারের সন্ধান লগ্ন হয়ে থাকে বৃত্তান্তগুলো ও ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ আখ্যানে। উপন্যাসের শেষেই যেন পরবর্তী আখ্যানের ভার ছেড়ে দেওয়া হয় শারিবা, বাঘারু, চ্যারকেটুদের ওপরে। দেশব্যাপী, কালব্যাপী রাষ্ট্র-নির্দেশিত উচ্ছেদ প্রকল্প, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাস্তুহরণের এক বৃহত্তর আখ্যানের দিকে তাদের যাত্রা শুরু হয়।

বৃত্তান্তঃ উপন্যাসধারণার বিস্তৃতি নাকি নতুন সংরূপ (genre)

বৃত্তান্ত কী? ‘বৃত্তান্ত’ সাহিত্যের কোনও পৃথক সংরূপ বলে পরিগণিত হয় না। অথচ দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলি পড়ার পরে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে উপন্যাসের সঙ্গে এগুলির মিল-অমিল নিয়ে।²⁸⁷ উপন্যাস অর্থে উপ+নি+অস = নি-পূর্বক অস্ ধাতুর সঙ্গে অ প্রত্যয় যোগে উপন্যাস শব্দের নির্মাণ। উপন্যাসের মূল বাহন গদ্যকৌশল। কুশলী গদ্যকারের নির্মাণভাবনায় এবং গদ্যের যৌক্তিক শৃঙ্খলায় উপন্যাস বিকশিত হয়। নির্দিষ্ট বাক্যবিন্যাস, যুক্তিবোধ, চরিত্র-অভিযুক্ত এবং ঘটনাপরম্পরা সাজিয়ে উপন্যাস তৈরির নীতিবোধ আধুনিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যুগের ফসল। উপন্যাসের প্রাথমিক শর্তানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকবে এবং সেই কাহিনি মূলচরিত্র (প্রধান) ও পার্শ্বচরিত্রগুলিকে (অপ্রধান) কেন্দ্র ক’রে বিকশিত হয়ে পরিণতির দিকে ক্রমশঃ এগোবে। অথচ মানব এবং মানবসত্তা চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়। আর,

আখ্যানে তাদের বিকাশের প্রয়োজনে সংলাপ ও ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন। উপন্যাসের আধুনিকতায় ব্যক্তিমানুষের উদ্ঘাপন অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলা উপন্যাসের সূচনার যুগে গদ্যভাষা, সংস্কৃত-অসংস্কৃত দ্বন্দ্ব, নব্যোদ্ভূত পাঠক ও লেখকবর্গ এবং সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতার চেতনাজারিত ব্যক্তিমানুষের বিকাশের কাহিনি উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল। আগের অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু, বৃত্তান্ত এই উপাদানগুলির বহু শর্ত অমান্য করল; লেখক দেবেশ নভেল-উপন্যাস এই ধাঁচকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে দেশজ মঙ্গলকাব্য ও লোককথাসমূহের আঙ্গিক বিবর্তিত করলেন বৃত্তান্ততে। প্রথমেই যা পরিত্যক্ত হল তা হচ্ছে নভেলের নিটোল গল্প বলার মডেল- যে গল্পের আদি-মধ্য-অন্ত্য থাকবে এবং নির্দিষ্ট আখ্যানবন্ধনের মধ্যে সূচনা থেকে পরিণতি/উপসংহার সমস্তই আঁটা থাকবে। “তার অনুমোদিত স্বাধীনতার গণ্ডির বাইরে উপন্যাস চলে আসতে চাইবে না কেন?... উপন্যাসকে যারা নিরাপদ করে ফেলেছে তাদের প্রতি বশ্যতা থেকে উপন্যাস মুক্তি পাক” (রায় ২০০১, ২৮) ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র আখ্যানে তিনটি স্বতন্ত্র অবলম্বন হচ্ছে নথি, উপন্যাস আর, বৃত্তান্তকার। অর্থাৎ উপন্যাসের প্রথাবদ্ধ আখ্যানশৈলীর সঙ্গে আরও দু’টি উপাদান যে মিশছে, তা লেখক বলেই দিচ্ছেন এবং উপন্যাস ও বৃত্তান্ত এই দু’টির সাবসেট-সেটের সম্পর্কের কথা বলছেন। উপন্যাসের কাল্পনিকতার সঙ্গে বাস্তবের যে সংঘাত অনিবার্য, তাকে মেনে নিয়েই স্বতন্ত্র রচনাপদ্ধতি আশ্রয় নিচ্ছেন দেবেশ, “না, কোনো আলঙ্কারিক অর্থে নয়, নেহাৎ বাস্তব অর্থেই এ-বৃত্তান্তের সব কাহিনি নথিভুক্ত কাহিনি” (২৬)। এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কাছে গুরুত্বই বলে নিচ্ছেন বাস্তবের নথি তথা রহস্য থেকে আখ্যানবস্তুতে রূপান্তরের সচেতন উদ্দেশ্যটুকু। বাস্তবের রহস্য থেকে আখ্যানবস্তুতে রূপান্তর করতে কাল্পনিকতার প্রয়োজন হয়, যা উপন্যাসের শিরদাঁড়া, কিন্তু দেবেশ ‘নথির ভিতর উপন্যাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছি’ বলে ঘোষণা করে দেওয়ার পরে উপন্যাসের চিরাচরিত মডেলটিকেই কি প্রত্যাহ্বান জানানো হয় না? এই উপন্যাসের ‘কনস্ট্রাকশন’, ‘ডেভেলপমেন্ট’, ‘কম্পিউটার’, ‘আমলাতন্ত্র’ ইত্যাদি শব্দগুলি দৈনন্দিন

বাস্তবের শব্দ যার প্রত্যেকটি নিজস্ব আখ্যানভঙ্গি সমেত কাহিনিকে বৃত্তান্তের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। আর, এই প্রত্যেকটি শব্দই রাষ্ট্রস্বীকৃত ও সরকারস্বীকৃত শব্দ যেগুলি দ্বারা শাসিতের সম্মতি নিয়ে শাসিতকে শাসন করা হয়। দেবেশ বারবার নথির ভিতরে উপন্যাসকে পুরে ফেলতে চান অথবা উপন্যাস নামক কাল্পনিক আখ্যান নির্মাণের কৌশলে নথি-ইতিহাস-সালতারিখ ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটিয়ে দিতে চান। যাতে উপন্যাস থেকে ‘কল্পনা’ নামক শিরদাঁড়া ক্ষইতে থাকে এবং বৃত্তান্তের অবয়ব জেগে উঠতে পারে। পাঠকের মনেও সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে থাকে কতটুকু কাল্পনিক আর কতটুকু নথি- তাই ‘গ্রন্থমুক্তি’র নিছক দায়রক্ষাকেও পরিহাস করেন দেবেশ। “এ-বৃত্তান্তের ভিতরে এত আখ্যান শুরু হয়েছে আর শেষ হয়েছে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে আর ফিরে এসেছে...” (৬৫৭) অর্থাৎ নিটোল একমুখী গল্পকথনের আবেশ ভেঙে দিচ্ছেন লেখক নিজেই, সচেতনভাবে। জৈন ‘কথানক’, বৌদ্ধ ‘জাতকের গল্প’ এবং মঙ্গলকাব্যের বিবিধ আখ্যানে তো এমনই বহু গল্পের সমাবেশ ঘটছে- এক আখ্যান থেকে আরেক আখ্যানে সরে যাওয়া এবং নতুন ক’রে শুরু হওয়া আর ফিরে আসা। ‘আরব্য রজনী’, ‘ডেকামেরন’ প্রভৃতি আখ্যানে যেখানে ‘নভেল’ অথবা ‘উপন্যাস’ মডেলটি নেই কিন্তু আখ্যানের পর আখ্যান গেঁথে গেঁথে নির্মাণসম্ভাবনা আছে, সেই প্রাক-উপন্যাস পদ্ধতিই কি দেবেশ অনুসরণ করছেন? আর, এরই সঙ্গে ইঙ্গিত রেখে দিচ্ছেন নতুন আরম্ভের অর্থাৎ এই বারবার আখ্যানের শেষ আর শুরু গুলিয়ে যেতে যেতে বৃত্তান্তের শেষে এসে আরও নতুন কোনও বৃত্তান্তের সূচনা হতেই পারত।²⁸⁸ আদি-মধ্য-অন্ত পর্বভাগে এসেও উপন্যাসের প্রথাবদ্ধ সমাপ্তি সম্ভব হল না। একটি সম্পূর্ণ আখ্যান অন্যরেকটি আখ্যানসম্ভাবনা তৈরি করে নিচ্ছে। এই মুক্তপরিসরের ধারণা শব্দার্থসম্ভব (semantic open-endedness), যা থেমে যায় কিন্তু ফুরোয় না।²⁸⁹ “বাংলা উপন্যাসের নামকরণে পাঁচালী, ইতিকথা, উপকথা, বৃত্তান্ত এভাবেই এসেছে- দেশীয় ফর্ম ও কালচেতনাকে অধিগত করতে করতে।” (দাস ২০১০, ৪০) ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র শেষে পোঁছেও আলাদা একটি পর্ব লিখতে হয়েছে দেবেশকে। সেখানে উপন্যাস ভেঙে বৃত্তান্ত

তৈরির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করতে হয়েছে। কিন্তু, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে এই মডেলটি অনুসৃত হয় নি। তার কারণ কি এই যে, ক্রমশঃ দেবেশ এই বৃত্তান্ত নামক আখ্যান-সংক্রপের তথা উপন্যাস থেকে বিচ্যুতির সচেতন দেশজ পথ গবেষণা করতে করতে ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে এসে থামলেন? নভেল তথা উপন্যাস নিয়ে নিরীক্ষা শতক-দশকব্যাপী। আখ্যানের কাল ও স্থান নিয়ে মূলতঃ নিরীক্ষা। নভেল অর্থে বিশাল ব্যাপক স্থানের আখ্যান হবে এমন ধারণাও যেমন ধ্রুব নয়, তেমনই দীর্ঘ কালের বিস্তারে উপন্যাসের আখ্যান ধরা থাকবে তাও ধ্রুব নয়। দেবেশ রায় নভেল থেকে উপন্যাস থেকে বৃত্তান্তের যাত্রাপথে নিরীক্ষা জারি রাখেন। উপন্যাসের গঠন ও উপন্যাসের ঐতিহ্য বিষয়ে বলতে গিয়ে আকার-সংকটের কথা বলছেন দেবেশ- বাংলা উপন্যাসের আকার-সংকট বিশ্ব উপন্যাসের আকার-সংকটের অন্তর্গত।²⁹⁰ তাঁর কাছে এই সংকট অর্থে আঙ্গিকের দুরূহতা; “একটি বিশেষ ধরনের স্থানিক পরিস্থিতি যা উৎরোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের কুশলতা আয়ত্ত্ব করতে হয়।” (রায় ২০১৮, ৪৯) ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ একটি দিনে শেষরাত থেকে শেষসন্ধ্যা অবধি বিস্তৃত কাহিনি। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে তিস্তাতীরস্থ জনপদ, জঙ্গল ও প্রকৃতি মূল ভরকেন্দ্র যেখানে বহির্জগতের রাজনীতি আর্থ-সামাজিক ঝড় ছায়া ফেলে। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে নভেলের ইউরোপীয় আঙ্গিক পরিহার ক’রে এমনকি উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসের সূত্রায়ণকে প্রত্যাখ্যান ক’রে নির্দিষ্ট কালস্থানে স্বদেশের সন্ধান জারি থাকে। “ভাষাকে, প্রথাকে, অপরীক্ষিত তথ্যকে, বয়ানের ধারণাকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে আখ্যানের গড়ন বা ভাষার সত্যকে নবমাত্রায় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তিনি।” (ভট্টাচার্য ২০১৩, ১২২) বৃত্তান্তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা থেমে থাকে না। নভেল বা উপন্যাস জীবনের জটিলতা ও বিশালতা থেকে ছেঁকে নেওয়া পাত্রপাত্রী, সময় ও কাহিনিকে আখ্যানবদ্ধ করে। কিন্তু বৃত্তান্ত জীবনের অনিশ্চিত বিস্তারের মতোই অসংখ্য চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনিকে আখ্যানে সংযুক্ত বিযুক্ত করতে করতে এগোতে থাকে। উপন্যাস অর্থে বিরোধভাসের অবশ্য উপস্থিতি, বৃত্তান্তগুলিতেও সেই টানাপড়েন চলে। আখ্যান (Narrative)

আর বাচনের (Discourse) মধ্যে টানাপড়েন চলে, যা আগাগোড়া বৃত্তান্তগুলির সন্দর্ভ হয়ে ওঠে।²⁹¹ এই টানাপড়েনের অংশ হিসেবে ভারতীয় বাস্তবতার দ্বন্দ্বগুলিও উপস্থিত থাকে- আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিণত হওয়া ‘বৃত্তান্ত’গুলির বড় অবলম্বন। স্বদেশের ও স্বকালের সত্যকে বিধৃত করতে গিয়ে “যে-বৈপরীত্যের সমস্যা ভারতের ইতিহাসকে দীর্ঘকাল ধরে বিপর্যস্ত করেছে, তার পুনরাবিষ্কার” করছেন দেবেশ।²⁹² উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে পরাধীন দেশের আর্থ-রাজনৈতিক অসঙ্গতিগুলি কমল না, বরং বৈষম্য বাড়ল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গরিবি হটাও, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতিও বিপরীতে অচল-অটল হয়ে রইল পশ্চাদ্গত ভারতের বৃহৎ জনসংখ্যা। বিকাশ, প্রগতি ও ‘শাইনিং ইন্ডিয়া’-র প্রতর্ক সেই বৃহত্তর জনসমাজকে ছুঁতে পারল না। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র শুরুর আখ্যানে ‘কম্পিউটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ’ ও ‘ল্যাংগুয়েজ অব দি মেশিন’ উপপর্বে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় কথক- অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ শুরু হতে চলেছে নতুন ভাষার সূচনাপর্ব প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কথক ও লেখক উন্মোচন করতে থাকেন পাড়ারিয়ার বাস্তবতা। ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা নিম্নবর্ণের নিরক্ষর প্রান্তিক ধর্মিতা মহিলাদের ন্যায়বিচার দেওয়ার যথাযোগ্য তথ্য খুঁজে পায় না। তথ্য-প্রমাণাদির অভাবে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক ধর্মণের ‘সত্যতা’ নাকচ হয়ে যায় আদালতে। নয়াভাষার প্রাকসূচনাপর্বে রাধিয়া মাহাতোনি ভগবতী দেবী, নিমিয়া, দরিয়াদের ভাষার সঙ্গে প্রশাসনিক ভাষার বিস্তর দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়; বিচারব্যবস্থার কাছে পৌঁছেও সরকারি নথি ও বিচারকের ভাষার সঙ্গে ব্যবধান বেড়েই যায় তাদের। “দরিয়া যে দরিয়া তাই সে প্রমাণ করতে পারল না, দরিয়া আদালতকে জানানর মতো ভাষা সংগ্রহ করে উঠতে পারল না, এমন কি একটা শাড়ি পর্যন্ত প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করতে পারল না” (২৩০) কথক আদালতের নথি, প্রশাসনিক ভাষা ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভাষা ছেনে তুলে তুলে বিশদ বর্ণনা করেন কীভাবে বিংশ শতকের শেষ দশকে দেশ ও কালের জটিল সত্য বৈপরীত্যের টানাপড়েনে নির্মিত হচ্ছে। কেলুর সঙ্গেও এই ভাষাব্যবধান বাড়ে কলকাতায় এসে। আর, ঠিক সেই কালখণ্ডে কলকাতার অফিসে যন্ত্রের ভাষার সর্বজনীন বোধগম্যতা নিয়ে আলোচনা চলে, মেশিনের ভাষা

কতটা বিজ্ঞানসম্মত ও ভবিষ্যপ্রসারী তা নিয়ে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের কথোপকথন চলে।²⁹³

‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ আখ্যানে দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেতের সঙ্গেই রয়েছে চ্যারকেটুদের পরিবারের অনিশেষ ক্ষুধা। বালক বেঙ্গু ও বৈশাখুর কথোপকথন ধানক্ষেতের মধ্যে শুয়ে, যে বালকদের পেটে তিনদিনের বাসি ক্ষিদে এবং পরবর্তী আরও কয়েকদিনের অমোঘ ক্ষিদে। “ভাত কুন্ঠে পাবি?” বেঙ্গুর প্রশ্ন উঠে আসে। ‘পাম, পাম, এতো ধান আর ভাত পাম না কেন রে?’ বৈশাখু ধানের গোড়ায় তাকায়” (৪৪) ক্ষুধা ও বঞ্চনার আখ্যান এবং জমিবাড়ি হারাবার ভীতির অদূরেই রয়েছে পঞ্চায়েত, আইন, মিছিলসমেত আস্ত একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু, নিরন্ন কৃষক তাকে ছুঁতেও পারে না। আর, ঐ উত্তর-ঔপনিবেশিক সর্বশক্তিমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাও বঙ্গদেশের কৃষকের মর্মস্থল ছুঁতে পারে না।²⁹⁴ বৈপরীত্যের প্রতর্ক আরও জমাট বাঁধে যখন ধানক্ষেত-বাসিখিদে-নিঃস্বকৃষক-গ্রামভারতের সুবিশাল বর্ণনায় ইংরেজি বুলি, শহুরে আদবকায়দা, রাজধানীকেন্দ্রিক রাজনীতি ও ভরাপেট-নেতারা ঢুকে পড়ে। গরুর গাড়ি ঢুকে পড়ে নগরায়নমুখী হাইওয়েতে এবং গরুসমেত চ্যারকেটু মিছিলের ভেতরে বেখাপ্লাভাবে ঢুকে পড়ে। গ্রাম-শহরের বিরোধ এবং সমসাময়িকতা ও নাগরিকতার অভিজ্ঞান তীব্র হয়ে ওঠে।²⁹⁵ উপন্যাসে বিপ্রতীপ বিন্যাসের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় নবাবুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’ উপন্যাসেও। ‘বৃত্তান্ত’গুলির মতো সুবিশাল গ্রামভারত এই উপন্যাসের পটভূমি নয়- ‘হারবার্ট’-এর মূল পটভূমি চার দশকের কলকাতার বদল, রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক অভিমুখ এবং ঔপনিবেশিক স্মৃতিপথের সঙ্গে আধুনিক সময়খণ্ডের সংঘাত। ক্ষুদ্র আয়তনের উপন্যাসিকায় বৃহৎ সময় ও পরিসরের বিবর্তন ঢুকে পড়ে। জীবনের অজস্র ক্ষয়িষ্ণু ছবির মধ্যে বিবর্তনের অনুভূতি সত্য হয়ে ওঠে এবং পরিত্যক্ততার বোধের প্রকাশ জাগরুক থাকে।²⁹⁶ বিবর্তনের কালস্থানিক আখ্যানবদ্ধতায় অজস্র বিপ্রতীপ বিন্যাস থাকে, য পাঠকের চেতনার স্থিতি আলোড়িত করতে থাকে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে বমির ধুনিকি দিয়ে বর্ণনা শুরু হয়, “পেটের অন্তেরা থেকে চপ, চানা আর হুইস্কি, রাম, বরফজল সব গ্যাঁজগোঁজিয়ে উগরে আসছে।” (ভট্টাচার্য ২০০৪, ৯) আর, আখ্যান জুড়ে বিষণ্ণতা ও মায়া থাকে। হারবার্ট মৃতের সঙ্গে কথোপকথনের

ব্যবসা খোলার পরেই কথক হারবার্টের মায়াবিজড়িত মনের কথা বলে। এই অধ্যায়েই বড়িলালকে তার মৃত ভাইয়ের পরলৌকিক অবস্থানের ব্যাপারে হাবিজাবি কিন্তু ‘বিশ্বাসযোগ্য’ কথা বলার সময়ে কথক বলে, “হারবার্ট থামে না, থামলে এখন চলবে না, থামা যায় না” (৪০) অথচ এই অধ্যায়ের শেষেই হারবার্টকে জড়িয়ে রাখে মায়া আর টান, যা তার ওই ‘থামা যায় না’-র বিপ্রতীপ সূর। বিশ শতকের শেষ দশকে হারবার্ট তার জ্যাঠাইমার বিয়ের গান শুনে স্মৃতিকাতর হচ্ছে, তার ‘মন কেমন করে। চিলছাদ, ছায়া, রাত, সকাল, কাকের ডাক সব কিছুর জন্যে মন কেমন করে।’^{২৯৭} হারবার্টের সমস্ত স্থিতি নড়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ আধুনিকতার ক্রমপ্রসার। হারবার্টের জীবন অন্যতম হতে পারত কিন্তু হয়নি তার কারণ ললিতকুমারের ঔপনিবেশিক উৎপাদন-সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বজ্বল হয়ে গিয়ে মরে যাওয়া।^{২৯৮} হারবার্টের প্রিয়তমা বুকির স্মৃতিবিজড়িত ছাদ মুছে যায় কারণ হালদারদের দোতলা ওঠে।^{২৯৯} হারবার্টের স্বপ্নে ধুঁই শ্রীধররা এসে আধিদৈব ভাষ্যে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়ে যাওয়ার পরের অধ্যায়েই যুক্তিবাদী সমিতির প্রণব ঘোষের দলবল এসে সেই খোঁয়াড়ি চুরমার ক’রে দিয়ে যায়। এই বিরোধভাস বাক্য ও অনুচ্ছেদ বিন্যাসেও রয়েছে। একই বাক্যে হারবার্টের অতীত বলতে বলতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত- “এ চিলছাদেই হারবার্ট সবকিছু উপলব্ধি করেছিল। যে আশ্চর্য স্বপ্ন তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি দিয়েছিল অথচ প্রকারান্তরে যা ছিল তার সমূহ বিনাশের কারণ, সেই স্বপ্নও হারবার্ট দেখেছিল এই চিলছাদেই। চিলছাদে ছিল গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক।” (২৪) একই অনুচ্ছেদে বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের সংকল্প চলে আসে।^{৩০০} ভাষার ক্ষেত্রে তৎসম বাক্যবিন্যাসের পরেই কলকাতাইয়া চলিত আর খিস্তি ঢুকে পড়ে। শব্দের ব্যবহারে কবিত্ব আর চিত্রকল্পের বিন্যাসের পরেই তা ভেঙে যায় শব্দের অতিতদ্রব অতিসাধারণ ব্যবহারে।^{৩০১} বিনয়েন্দ্র ও অতসী নামে পুত্রশোকে মূহ্যমান পিতামাতাকে পুত্রের ব্যাপারে আধ্যাত্মিক ভাষায় অতীন্দ্রিয় মতামত দেওয়ার পরেই পাড়ার রকের ভাষায় ফিরে আসে হারবার্ট।^{৩০২} ‘মধ্যমধার্মিক’, ‘চতুর্থস্তর’, ‘যক্ষকিন্নরাদি তদুপযুক্ত সুখ-দুঃখ ভোগ’ ইত্যাদি উচ্চমার্গীয় শব্দের মধ্যে মধ্যেই তার মুখ দিয়ে

বেরোয় ‘বন্দোবস্ত’, ‘লাতিঝাঁটা’ শব্দসমূহ এবং ‘শুনব না, শুনব না’ বলে বিকট চিৎকার।
 কথকও জানিয়ে দেন যে, পরলোকের সঙ্গে যোগস্থাপনকারী আধ্যাত্মিক-আশ্চর্য হারবার্ট ওই
 রোজগারের টাকায় বাংলা মদ খায়। খদ্দেরের সঙ্গে হেঁয়ালির ভাষায় কথা বলে হারবার্ট, আবার
 পরক্ষণে সেই হেঁয়ালির ভাষা থেকে “মানে কিছু বোজেন যে প্যাঁক প্যাঁক করচেন?” (৪৭), “কী
 লটফট আছে নাকি কোতাও?” (৪৭) ইত্যাদি অতিসরল দৈনন্দিন কথ্যভাষা। নবাবুর্গের ‘হারবার্ট’,
 ‘কাঙাল মালসাট’ সহ অন্য কথাসাহিত্যে মুখের বুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন; তৎসম শব্দ, তদ্ভব
 শব্দ, শহুরে নিত্যব্যবহার্য শব্দ, মুখফেরতা চলতি শব্দ এবং ‘অপশব্দ’ অনায়াস বাস্তবতায়
 কুশীলবদের বয়ানে বসে যায়। এইসব বিপ্রতীপ বিন্যাস ও অস্থয়ের জন্যেই সমগ্র পাঠ জুড়ে
 অস্থিরতা তৈরি হয়। ফলে, প্রচলিত উপন্যাসকাঠামো এবং কথাসাহিত্যের ভাষাকাঠামো সেই
 বিপ্রতীপতায় বিনির্মিত হতে থাকে। তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে এই প্রক্রিয়াটি ণ্ঠাতিষ্ঠানিক চিন্তা-
 প্রকরণ ও অভ্যাসের প্রতি আখ্যানকারের প্রবল ধিক্কার; তাই তিনি অচলায়তনের সম্পূর্ণ
 কাঠামোটিকে ধ্বংস করতে চান। “তিনি ভাষা-সংস্কার ও ণ্ঠপন্যাসিকতার মধ্যে উপস্থিত
 প্রতাপের সদর দণ্ঠরে কামান দেগেছেন। ফলে বয়ানের বিন্যাস থেকে সামাজিক ও অসামাজিক
 ভাবনা কিংবা বাকব্যবহার সম্পর্কিত প্রচলিত জনবিভাজন রেখা মুছে গেছে।”³⁰³ ‘হারবার্ট’
 উপন্যাসে সাধু-চলিত, প্রমিত ভাষা-খিস্তি মিশে যাচ্ছে, এমনকি অভিধান-বহির্ভূত বহু শব্দ
 অক্লেশে (আরোপিত নয়) ঢুকে পড়ছে- ‘ঝিম বিলা!’ (৯), গ্যালাখ্যালা (১৩), ‘ক্যান্টার করে
 দেওয়া’ (৫২), দোবেড়ের চ্যাং (৬৯) ইত্যাদি শব্দাবলী। উপন্যাসের গঠন-গড়নে, ভাষায়,
 আখ্যানগতিতে, কথকের কথনকালে সচেতনভাবেই বিভিন্ন অসঙ্গতি তৈরি করেন নবাবুর্গ। আর,
 সচেতন অসঙ্গতি তৈরির পেছনেও রাজনৈতিক কারণ দর্শান নবাবুর্গ- বিজ্ঞান, নাটক ও সঙ্গীত
 থেকে সঙ্গতি (সিমেট্রি) ও আখ্যানের গঠন গড়নের (স্ট্রাকচার) মধ্যে মিল পান নবাবুর্গ, কিন্তু
 সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই মিলের ধারণা ভেঙে যায়।³⁰⁴ সোভিয়েত ইউনিয়ন
 আস্ত না থাকা, বিনুদের স্বপ্ন আস্ত না থাকা, এমনকি হারবার্ট যে আধা-ণ্ঠপনিবেশিক সংস্কৃতি

পূর্বপুরুষের থেকে বহন করে সেটাও আস্ত না থাকা- এই সবকিছুই যেন হারবার্টের দাদু বিহারীলাল সরকারের থেকে পাওয়া বইয়ের মতোই ছেঁড়াখোঁড়া। বস্তু, বোধ, স্বপ্ন কিছুই আস্ত থাকে না বরং এক দূরারোগ্য বিকৃতির ফাঁদে পড়ে আত্মনাশের পথে এগিয়ে যায়।³⁰⁵ আখ্যানের বিষয় এবং আঙ্গিক এই এগিয়ে যাওয়ার আধার হয়ে থাকে। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে প্রতिसন্দর্ভের নির্মান হয় আখ্যানের গতিপথে, যা এটির ‘উপন্যাসত্ব’ বা উপন্যাসধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। আখ্যানের গড়ন-গঠন ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের মতোই টুকরো-টুকরো জুড়ে সাজানো। ‘হারবার্ট’-এর থেকেও আরও স্পষ্ট এর জোড়ের দাগগুলো। নবাবুণ প্রবন্ধে জানান যে, “পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক নিরিখের হিসেবে সাহিত্যের কোনো আধুনিকতার সংজ্ঞায় আমি আস্থাশীল নই” (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৩০) অসম বিকাশের, বৈষম্যমূলক উন্নয়নের এবং জনবহুল শোষণজর্জর দেশের নির্যাতিত মানুষের সাহিত্যের যথাযথ আঙ্গিক ও ভাষা নিরন্তর খোঁজেন তিনি।³⁰⁶ ‘হারবার্ট’, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’, ‘কাঙাল মালসাট’-এর আখ্যান খোঁজার রাজনীতি স্পষ্ট হয়।

‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ রচনাটিকে উপন্যাস বলা যায় কি না³⁰⁷ এবং উপন্যাসের আঙ্গিকে অন্যান্য রচনারীতির অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটছে, তা নিয়ে পাঠকের কাছে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় লেখক। লেখক নিজেই বলে যে আখ্যায়িত ঘটনাগুলি ও চরিত্রগুলি সত্য, চরিত্রগুলির প্রতিটি আচরণ বাস্তবের। এই বাস্তবতার প্রমাণ দিতে কথকের বয়ান যথেষ্ট নয়, তা জেনেই লেখক সরকারি নথি ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের টুকরো আখ্যানের অনুচ্ছেদে সাজিয়ে রাখেন। এতে সর্বাত্মে উপন্যাসের কাল্পনিকতার ভিত্তি আঘাত লাগে। ‘বৃত্তান্ত’গুলিতে কোনও কেন্দ্রীয় কাহিনি থাকেনা। এক বৃত্তান্তের ভেতর অনেক কাহিনি- পাড়ারিয়া গ্রামের ভেতর অনেকের কাহিনি তথা অনেকগুলি কাহিনি। কলকাতার ভেতরে অনেকের কাহিনি। কিন্তু, প্রত্যেক কাহিনি স্বতন্ত্র হয়েও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি কাহিনি বিশদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সম্পূর্ণ। অসংখ্য কাহিনির প্রত্যেকটিতে যে কুশীলবেলা আছে, তারা কেউ নিছক গৌণ নয়, তাদের কথাও কথক বিশদে বলছে। ফলে, ওই স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাহিনিটির নিজস্ব ভার তৈরি হচ্ছে। কাহিনি ও

চরিত্রের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধিকার একটা বিকেন্দ্রীকতার ধারণা নিয়ে আসছে। দেবেশ রায় কথাসিঙ্গের কেন্দ্র বিষয়ে সচেতন কিন্তু ইউরোপীয় কথাসাহিত্য মডেলের মতো কেন্দ্রের অতিনির্দিষ্টতা প্রত্যাখ্যান ক’রে বিকল্প খুঁজছেন।³⁰⁸ ‘বৃত্তান্ত’গুলির প্রত্যেক ব্যক্তির কাহিনি ও পটভূমি অন্য কুশীলবের কাহিনি ও পটভূমির সঙ্গে জুড়ে থাকে। এর সর্বোত্তম প্রমাণ ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র আখ্যানে বারবার এক কাহিনি থেকে আরেক কাহিনিতে ছুটে বেড়ানোয়। নির্দিষ্ট গতিময়তা, উত্থান-শীর্ষবিন্দু-অবনমন-ক্লাইম্যাক্স ইত্যাদি পর্বগুলি উধাও। খণ্ড খণ্ড দেশ ও কালের বাস্তব মিশে যাচ্ছে বৃহত্তর দেশ ও কালের বাস্তবে। আর, এই সংলগ্নতার চেতনা থেকেই ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র কেন্দ্র-ভাবনা গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি বৃত্তান্তেই মানুষের সঙ্গে তার জীবন ও জীবিকার উপকরণ এবং প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে উপস্থাপিত করেন। আর, এরই সঙ্গে আঙ্গিক-ভাষায় মেশে কবিত্ব। নিছক নীরস গদ্যভাষা থেকে প্রায়ই বিযুক্ত হয়ে উপমা, রূপক, চিত্রকল্প দ্বারা কাহিনি বর্ণিত হয়। এই কাব্যধর্মী বর্ণনার সেরা নজির ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র আখ্যানে। শুরুতেই কার্তিকের হিমঝরা রাতের বর্ণনার পরে চ্যারকেটুর পেছাপের আওয়াজের সঙ্গে হিমঝরার তুলনা ও গরুর পেছাপের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দের তুলনা উপমা ব্যবহারকে নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক ক’রে তোলে। বেঙ্গু ও বৈশাখু কল্পনায় কল্পনায় খিদে ভুলে থাকতে চায় কার্তিকের রোদে ভরা ধানক্ষেতে বসে। তাদের ক্ষুধাতুর গল্প প্রকৃতি ও মানুষের অস্বয়সাধন করে। কিন্তু, সেই অস্বয়ের মধ্যে কথকের কথনের নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠুরতা কি নেই? চ্যারকেটুর বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানুষের অস্বয় আরও গভীর- কাব্যিক শব্দের ব্যবহারও বেশি। জর্জ কালিনেস্কুর মতে, কাব্যিক শব্দের উৎস প্রকৃতি থেকে।³⁰⁹ “কার্তিকের এই জ্যোৎস্নাময় ঘরটার দিকে তাকালে, চ্যারকেটুর বেশ ভালই লাগে... আর উত্তরের ঘরের সিঁড়ির গাছের গুঁড়ির ওপর নগ্ন চ্যারকেটুর বুক থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেই জ্যোৎস্নায় শুধু যেন মাথাটুকু জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে রাখা” (২২-২৩) ভাতের স্বপ্ন দেখা চ্যারকেটুর বর্ণনা প্রবল গদ্যবাস্তবে কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে, তারও চিত্রকল্পভিত্তি জমি ও ধান। “ভাত আর চাঁদ একো জিনিশ্, আকাশত্ থাকে

মাঝরাতত” (২৩) কবিতার তুলনাযোগ্যতা গদ্যে সমর্পিত হচ্ছে। দেবেশের মতে, উপন্যাস পড়তে পড়তেই পাঠকের ভেতরে উপন্যাসের সংজ্ঞা তৈরি হয়ে যায় এবং উপন্যাসিকের ক্ষেত্রে তা তৈরি হয় লিখতে লিখতে। সংজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা ও স্থিরসিদ্ধান্ত এবং ছকেবাঁধা সূত্রায়ন থাকে না বলেই কথাসাহিত্যের বিকাশ অভাবিত ও অনিশ্চিত পথে এগোতে থাকে।³¹⁰ ইলিয়াসও কি লেখকের এই সংশয়ের পক্ষেই কথা বলেন?³¹¹ কেলুর কাহিনি স্থির নয়। তাতে অন্য আখ্যান মিশে যাচ্ছে। উপন্যাসে একটা থিতু কাহিনি থাকে, যে কাহিনির গতি ও বিকাশ থাকে। সেই কেন্দ্রীয় কাহিনির সঙ্গত রক্ষায় অন্য কাহিনি জুড়ে যায়, পার্শ্বচরিত্রেরা সঙ্গত দেয়। কিন্তু, মূল কুশীলব ও মূল কাহিনি বারবার অস্থির হয় বৃত্তান্তে। পাড়ারিয়ার ভেতরে অনেকগুলো কাহিনি- প্রত্যেকটা কাহিনি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। পাড়ারিয়ার কাহিনিতে রাধিয়ার বাবা, ছোটকীবছ, লালড়িয়ার বুড়োরা তাদের নিজস্ব স্বর নিয়ে ঢুকে পড়ে।³¹² একরৈখিক ও সরলরৈখিক আখ্যানের সময়খণ্ড বারবার ভেঙে কেলু ও রাধিয়ার সঙ্গে পাড়ারিয়া গ্রামের সাংস্কৃতিক দিগ্‌দর্শন থাকে এই ‘অলৌকিক খণ্ড’-তে। উপন্যাস নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায় ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ উপন্যাসের ‘যোগেনের নভেল ত্যাগ’ অধ্যায়ে। “নভেল তো একটা খোলা পরিসর। সেখানে ঢোকার কোনও পথ থাকে? আমন্ত্রণপত্রও অন্তত দেখাতে হয় না। তারপর বেরিয়েও আসা যায়, যখন ইচ্ছে তখন? প্রবেশ ও প্রস্থান অবাধ?” (রায় ২০১০, ১০৪৮-৪৯) নভেলের কোনও পার্শ্বচরিত্র নয়, বরং মুখ্যচরিত্রই বেরিয়ে যাচ্ছে আখ্যান ছেড়ে। এই ‘বেরিয়ে যাওয়া’র রাজনীতি রয়েছে। নির্দিষ্ট গঠন-গড়ন বিনির্মাণ ক’রে যে যোগেন মণ্ডলের আখ্যান উপন্যাস³¹³ হয়ে উঠেছিল, সেই গঠন-গড়নকে অস্বীকার ক’রে যোগেন মণ্ডল বেরিয়ে যায়। কারণ, ততদিনে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়ে গেছে, লিয়াকত আলি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। একদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান অন্যদিকে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনের চাপে সংখ্যালঘু হিন্দু হয়ে টিকে থাকতে না-পারার যন্ত্রণা- সর্বোপরি যোগেনের নিজের স্বরে ‘আমি শূদ্র’ প্রতিস্পর্ধী ঘোষণা- যোগেনকে পাকিস্তান থেকে ও নভেল থেকে বের ক’রে আনতে ‘বাধ্য’ হয় কথক। আর, এই বেরিয়ে আসার সূত্র ধরে যোগেন মণ্ডল প্রশ্ন করতে থাকে ‘মহাভারত’ এপিককেও।³¹⁴ এবং

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সঘোষ প্রতিবাদ রেখেই যোগেনের স্বর এবং তজ্জনিত লেখকের স্বর ‘হিস্ট্রিখেলা’কে প্রত্যাহ্বান জানায়। ‘হিস্ট্রিখেলা’ শব্দটি লেখক তৈরি ক’রে নেন এবং কথক তা জানিয়ে দেয় পাঠককে- শব্দটি প্রচলিত ইতিহাসপাঠকে প্রত্যাহ্বান জানায়। এবং, সাহিত্যকেও। যে ইতিহাসে যোগেনরা পাদটীকা হয়ে রয়ে যায়, যে সাহিত্যে যোগেন মণ্ডলের স্বর অশ্রুত, সেই ইতিহাস ও সাহিত্যরচনার বিপ্রতীপে যোগেনের জেগে থাকা। কখনও কখনও কোনও উপন্যাসই ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলিকে সংশ্লেষ ক’রে নিতে পারে, যে-ইতিহাসের প্রতি একজন উপন্যাসিকের প্রাথমিক আনুগত্য।³¹⁵ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাম্প্রতিক প্রবণতায় তথ্য ও কল্পনা এবং বহু ভাবধারার মিশ্রণ ঘটে থাকে। আত্মকথার ধরন, স্মৃতিকথন, কল্পনাখ্যান মিশে যেতে পারে খণ্ডবিখণ্ড আখ্যানসূত্রে; আর, এগুলি থেকেই আখ্যানপথে এগোতে এগোতে পাঠক তার নিজস্ব নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক অবস্থান ও ইতিহাসবোধ থেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।³¹⁶ আখ্যানের কালস্থানিকতায় একুশ শতকের প্রথম দশকের রাজনৈতিক টীকাগুলি সংযোজিত হয়ে যায়। যোগেন নিজেকে ‘আমি চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার নয়’ (১০৫৪) বলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে ‘নাশকতা’ করেছিলেন বলে উচ্চবর্গের অভিযোগ, সেই নাশকতার তুল্যমূল্য বিচারেই শ্রীলঙ্কার তামিল, আফগানিস্তানের তালিবান, ইরাকের আত্মঘাতী ও অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয়দের উদাহরণ দেন লেখক। যোগেনের প্রয়োজন ১৯৫০ সালে ফুরিয়ে গেলেও দেবেশ যখন বরিশালের যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক ইতিহাসকে আখ্যায়িত করছেন ২০১০ সালে, তখন এই সুদূরবিস্তারী বাস্তবগুলির সাথে কোথাও আখ্যানের অন্তর্বস্তুর সংযোগ থেকে যায়। আখ্যানের সত্যের সঙ্গে আখ্যানকার যে কালস্থানে বসে আখ্যানটি লিখছেন তার সত্যের আদানপ্রদান চলে। ফলে, উপন্যাসের চিরাচরিত ধরণধারণ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। বাখতিনও তাঁর ‘ডায়ালজিক ইমাজিনেশন’ বইতে কল্পকাহিনি (fiction) ও বাস্তবকাহিনি (non fiction) এবং সাহিত্য ও সাহিত্য-বহির্ভূতের মধ্যে সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন

তুলছেন। বাঁধাছক আর পুনরুৎপাদিত গড়ন-গঠনের গণ্ডিতে সাহিত্য কখনও বাঁধা থাকতে পারে না; প্রতিনিয়ত তা বদলাবেই এবং তার নবায়ন ঘটবে।³¹⁷ দেবেশ তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকে ভাংচুর ক’রে কথাসাহিত্যের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করেছেন।

দেবেশ রায়ের ‘প্রতিবেদন (১৯৯২-৯৬)’ সিরিজের আখ্যানগুলিতে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ‘সংক্রমণ’ ঘটেছে, যেখানে সংলাপ ও প্রয়োজনীয় সংযোগরক্ষা ছাড়া ‘বানানো ঘটনা’ প্রায় নেই। দেবেশ মিডিয়ারকে বিশ্বকোষ বলে তার বিষয় হিসেবে খরা-আক্রান্ত মন্দা-আক্রান্ত আলাদা আলাদা মানুষের ওপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন।³¹⁸ প্রতিবেদন যেহেতু ‘প্রামাণিক বিশ্বকোষ’ এবং তা কঠিন তথ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বিন্যাসে সজ্জিত, তাই তাকে কথাসাহিত্যের নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করলেন দেবেশ। প্রচলিত পাঠের আদলকে ভেঙ্গেচুরে প্রতিবেদনের নিরিখে ভিন্ন পাঠ দিতে চায় দেবেশের এই লিখনপদ্ধতি, সাংবাদিকতার আদল এখানে মুখ্য এবং কাল্পনিকতার উপন্যাসসম্মত রেওয়াজ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। লেওনারা ফ্লিসের আমেরিকান ও গ্লোভেনীয় সাহিত্যধর্মী প্রতিবেদনের আলোচনা প্রসঙ্গে দারিয়া লেসকোভার জানাচ্ছেন উত্তর-সমাজতান্ত্রিক সমাজে কীভাবে তথ্যাশ্রয়ী কল্পনাখ্যানের (factual fiction) গুরুত্ব বাড়ে।³¹⁹ শিল্পায়নোত্তর সমাজে (postindustrial society) পণ্যকামী সমাজ, গণমাধ্যমায়িত সমাজে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে “presenting reality as nonfiction does” (Flis 2010, 1)। ফ্লিসের আন্তঃসম্পর্ক খুঁজছেন তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস, সাহিত্যধর্মী প্রতিবেদন এবং নয়া সাংবাদিকতার মধ্যে।³²⁰ সাহিত্যের নিজস্ব সত্য থাকে, লেখক সেই সত্য সৃষ্টি করেন আখ্যানে যা পাঠক বিশ্বাস করে সাহিত্যের সত্য বলে। উপন্যাসে বিশেষ একটি সময়কে অথবা একটি ঘটনাকে নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক এবং তাকে ‘সত্য’ বলে বিশ্বাস করাতে চান পাঠককে। সাহিত্যে সময়ের ব্যবহারে ও ঘটনা নির্মাণে ঔপন্যাসিকের বিশেষ অধিকার থাকে। তিনি ঘটনার উপস্থাপনায় দর্শক হিসেবে অথবা স্রষ্টা হিসেবে সেই অধিকারের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। ঐতিহাসিক কিংবা সাংবাদিকের সীমাবদ্ধতা শুধুই দর্শক হিসেবে ঘটনার উপস্থাপনায়, তাঁরা

কাহিনির/ঘটনার স্রষ্টা হতে পারেন না। কিন্তু, দেবেশ সেই সাহিত্যের সত্যে সীমাবদ্ধ থাকছেন না অথবা সেই সাহিত্যের সত্যকে বাস্তবের সত্যের সঙ্গে আরও বেশি সাযুজ্যপূর্ণ করতে চাইছেন। উপন্যাসের শুরুতে কখনও ‘নভেলের বাইরে’, কখনো ‘গ্রন্থমুক্তি’ লিখে নভেলের সঙ্গে উপন্যাসকে আলাদা করছেন এবং উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন। উপন্যাসকে ইউরোপীয় মডেল থেকে স্বতন্ত্র ক’রে নিতে এবং দেশীয় বাস্তবতার ‘প্রকৃত’ বোধকে আখ্যায়িত করতে দেবেশ এই সচেতন আখ্যানমুক্তির পথ বেছে নিচ্ছেন? “এখানেই রয়েছে উপনিবেশোত্তর চেতনার বীজ। আর এই মূল্যবোধ ও চিন্তন সাধারণত প্রতিবাদী ও বিনির্মাণপন্থী” (দাশ ২০১১, ২৪৭) আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় কাল্পনিক ও অ-কাল্পনিকের ক্রমধূসর সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ওনেগা জেন ও গার্সিয়া লান্দা। কল্পনাখ্যান (fiction) সম্পূর্ণতঃ কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তবের থেকে কথাবস্তু সংগ্রহীত হয় অন্যদিকে বাস্তবতার উপস্থাপনাতেও কাল্পনিকতা মিশে থাকে। যে কোনও উপস্থাপনার নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থাকে, উপস্থাপিত বিষয়ের (represented object) বিশেষীকরণ থাকে, প্রাসঙ্গিকতার বিচার্য উপাদান থাকে- প্রতিবেদক ও ঐতিহাসিকরাও তথ্যের সত্যকে আখ্যানবদ্ধ করেন।³²¹ ‘খরার প্রতিবেদন (১৯৯২)’ উপন্যাসে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি, খরার মারণরূপ এবং মানুষের সঙ্গে এগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বর্ণনা। “পশ্চাৎভূমি ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের প্রধানভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে” (রায় ২০০৭, ১৫) এই বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের রাজনীতি ভারতবর্ষ জুড়ে স্পষ্ট। তথ্যাদি ও প্রতিবেদনের আধিক্য পাড়ারিয়াকে ‘উল্লয়ন’ ও ‘নির্মাণ’ শব্দদুটি দিয়ে জবরদস্তি প্রধানভূমির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা বর্ণনা করে। সাংবাদিকের সঙ্গে উপন্যাসিকের অনেকগুলি পার্থক্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক আবেগহীন বর্ণনায়। খরা কবলিত মানুষ যখন শিকড়-বাড়ি-জন্মভিটে ফেলে যাত্রা করে তখন সাংবাদিকের মননে দেবেশ তা লেখেন। “জল আর খাবার কাজ আর বিশ্রামের খোঁজে মানুষ নিজের গ্রাম ছাড়ছে, তহশিল ছাড়ছে, জিলা ছাড়ছে, রাজ্য ছাড়ছে। কখনো সেই জনপ্রবাহে পুরুষ তার নারীকে, বৃদ্ধকে,

গৃহপালিত পশুকে সঙ্গী করছে। কখনো তাদের পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছে” (রায় ২০০৭, ১৮)

এই বর্ণনায় কথকের নিরুত্তাপ অভিব্যক্তি লক্ষণীয়, উপন্যাসের কথক-অভিব্যক্তি থেকে যা আলাদা। খরা-আক্রান্ত জনগণের সিংহভাগ আদিবাসী জনজাতি। তাঁদের মৃত্যুর খবর নির্লিপ্ত বিবৃতিতে পাঠককে জানিয়ে দেন কথক, সংবাদপত্রের ভাষাতেই। কারণ রাষ্ট্রের কাছে ‘খরা ঢুকে যাওয়া’ মানুষের মৃত্যু ও তাঁদের সত্তা নিছক সংবাদের থেকে বেশি কিছু নয়। সরকারপক্ষ থেকে তাদের ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’র বিবৃতি দেওয়া হয়, বড় ডাক্তারবাবু বড় বড় অসুখের নাম বলেন মৃত্যুর কারণ হিসেবে কিন্তু ক্ষিদের কথা অনাহারের কথা ও অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর কথা বলেন না; এবং দোষ পড়ে আদিবাসীদের মদজনিত তথা ‘অনিয়ন্ত্রিত’ জীবনযাপনের ওপর।³²² এই বিবৃতিগুলি এবং রাষ্ট্রের মতাদর্শ বহনকারীদের সংলাপগুলি শ্রেণিচরিত্র খুঁজে নেয়। উপন্যাসে সাক্ষাৎকারের আদলে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক অবস্থানের (social status) বিভেদ লক্ষ্য করা যায়।³²³ ‘খরার প্রতিবেদন’ বৈষম্যময় ভারতকে উপস্থাপিত করে। পাঠক সংবাদপত্রও পড়েন আবার উপন্যাস-গল্পও পড়েন; সেই পাঠকের চেনাজানার পরিসর বাড়িয়ে দেয় এই আখ্যান। যেকোনও মৃত্যু বা বিপর্যয়ে সরকারি নথি ও প্রতিবেদন যে বয়ান তৈরি ক’রে দেয়, বাস্তবের সত্যতা অনেকেই তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। রাষ্ট্র নিজের অক্ষমতা ঢাকতে বিবৃতি দেয়; প্রতিবেদন-উপন্যাসের পাঠক বিবৃতির সেই দায়সারা উদ্দেশ্য কথকের নিষ্পৃহ কথনে উপলব্ধি করতে পারে। উপন্যাসের ফর্ম বা গঠন-গড়নে কথকস্বরের নির্লিপ্ততা পাঠক অনুধাবন করেন এবং এরই সঙ্গে উপন্যাসপাঠের পূর্বপ্রস্তুতি বিপর্যস্ত হয়। তবে, নৈর্ব্যক্তিক কথনভঙ্গিই সব নয়, ‘বৃত্তান্ত’গুলির মতো প্রতিবেদনেও কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে, পাঠককে ‘সাহিত্য’ সম্পর্কে সজাগ রাখতেই কি এই বর্ণনা নিষ্পৃহ নির্লিপ্ত বর্ণনার উপরিকাঠামো ভেদ ক’রে ঢুকে পড়ে? “বীজকুড়া কোথায় তা মেঘকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। বীজকুড়ার আকাশে যাওয়ার আগে মেঘ ফুরিয়ে যায়। বীজকুড়া কোথায় তা নদীকে জিজ্ঞেস করলে কোনও লাভ নেই। বীজকুড়ায় কোনও নদী নেই। বীজকুড়া কোথায় হাওয়াকে জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ নেই। কারণ হাওয়া বীজকুড়ায় থামে না।” (রায় ২০০৭, ৪৫) আর, এহেন

কাব্যিক বর্ণনার পরেই রাজনৈতিক ফর্দতৈরি ও রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির বর্ণনা ঢুকে পড়ে কথনে। “দেবেশ রায় কাহিনি, ভাষা আর ফর্মের ভিতরে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন... যৌক্তিকভাবেই কাহিনির অযৌক্তিক বিন্যাসের দিকে এগিয়ে যান তিনি।” (কামালী ২০১০, ৫১) ‘দাঙ্গার প্রতিবেদন’ উপন্যাসে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এয়াবৎ ঘটে যাওয়া সবচেয়ে সংবেদনশীল ও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আখ্যানের শুরু হচ্ছে গম্বুজের বর্ণনা দিয়ে, যা ধর্ম-সঙ্কীর্ণ নয় বরং গভীরতার।³²⁴ মসজিদের গম্বুজের বর্ণনায় অতীত ও বহমান ইতিহাস ধরা পড়ে। ইতিহাসের সত্য ও তথ্যের সত্য থেকে উপন্যাসের সত্যে সেতুবন্ধন হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণিঅবস্থানের মানুষের প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের সত্যের অংশ হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত রুটিন-যাপনে অভ্যস্ত অরবিন্দুবাবু নৈতিকতা ও বাস্তব পরিস্থিতির সংশয়ে ভোগেন। হিন্দু ভদ্রলোক পরিসরে আলোচনা হয় “মশাই, এ তো ঘরজামাইয়ের চাইতেও বেশি আহ্লাদ, ওরা চারটে করে বিয়ে করবে আর যত খুশি বাচ্চা হবে আর আমাদের বেলায় জোড়া পিছু একটা... ওরাই হবে মেজরিটি, আমরা মাইনরিটি” (রায় ২০০৭, ৯১)। এই আলোচনা হয় তখন যখন ভারতবর্ষের রাজনীতি দাঙ্গাপ্রবণ যুগে প্রবেশ করতে চলেছে, যখন বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিজেপি। কিন্তু, এ তো ইতিহাসের পাতায় লেখা একটা ঘটনা- শুধু তথ্য আর ঘটনার বিবরণে কিছু সংলাপ জুড়ে দেওয়াকেই কি উপন্যাস বলে? না, শুধু এটুকু উপন্যাস নয় বলেই লেখক নামহীন চরিত্রদের সংলাপে ধর্মীয়-সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের প্রতিক্রিয়া আখ্যানবদ্ধ করেন। প্রতিবেদন-উপন্যাসের গড়ন-গঠনকে প্রভাবিত করে এই উপাদান। আর, একইসঙ্গে আখ্যানস্থিত বর্তমান কাল এবং আখ্যানবহিঃস্থ বাস্তবসহ ভবিষ্যকালের সামাজিক-রাজনৈতিক ভাষ্য ধরা থাকে। কথকের নিরাসক্ত নির্লিপ্ত বর্ণনা সত্ত্বেও লেখকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্ট হয়; লেখক যখন লেখেন, ‘সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ঘৃণার ওপরে, সেই পুরো সমাবেশটা তৈরি হয়েছে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে’ তখন এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়।³²⁵ একুশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্মীয় পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান

বিভাজন আরও তীব্র হয়েছে। ধর্মীয় বিভাজনসূত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যা সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘জয় শ্রীরাম’ ধর্মীয় অর্থসঙ্কেত ছাপিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অর্থসঙ্কেত হয়ে উঠেছে। হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলিম সম্প্রদায় হিংসাত্মক পদ্ধতিতে নিজেদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছে ফলে হিন্দুসংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে- এমন বয়ানের দীর্ঘমেয়াদী প্রচারে আরোপিত হীনম্মন্যতা বেড়েছে। আর, এর ফলে হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের চেতনায় আতঙ্ক-মনস্তত্ত্ব (fear psychosis) উত্তরোত্তর বেড়েছে; বিগত কয়েক দশকে রাষ্ট্র নিজের মতাদর্শ নাগরিক সমাজে ছড়িয়ে দিতে এই আতঙ্ক-মনস্তত্ত্বের প্রসার ঘটিয়েছে। দেবেশ সেইসব নাগরিকের আতঙ্কিত-মনস্তত্ত্বের ও তাদের দ্বারা আরও ছড়িয়ে যাওয়া নিরন্তর ‘মুসলমান বনাম হিন্দু’ বয়ানের চর্চাগুলিকে আখ্যানের চরিত্রনির্মাণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। অরবিন্দুবাবুর কাছে তাঁর শহর কলকাতা ‘অপরিচিত’ হয়ে ওঠে গুজব ও সংবাদমাধ্যমের পরিবেশনায়। নিছক উপন্যাসের কাল্পনিকতায় তৎকালীন ভারতবর্ষের দাঙ্গা-পরিস্থিতি তুলে ধরা সম্ভব নয় বলেই আখ্যানধর্মে বদল আনছেন দেবেশ। গুজব, তথ্য, প্রতিবেদন, মুখফেরতা বানানো-আতঙ্ক আলাদা ক’রে ক’রে চিনে নেওয়া যাচ্ছে বর্ণনার মধ্যে। অযোধ্যা থেকে সুরাট থেকে কলকাতা- দাঙ্গা ও তজ্জনিত আতঙ্ক আখ্যানে বর্ণিত হয়। দেবেশ বারবার বলেন যে, ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা খুঁজতে চান তিনি তথা ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের আখ্যান লিখতে চান; তাই সুরাট শহরের শিল্পবিকাশের ইতিহাস ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের কথা লেখেন।³²⁶ কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিক্রিয়া আর সুরাটের শ্রমিক মহল্লার প্রতির একই আখ্যানে জুড়ে থাকে। অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে নিম্নমানের গণতন্ত্রে মালিক-মজুর সমান এর’ম ভুয়ো বোধ তৈরি হয় শ্রমিকদের চেতনায় কিংবা শ্রমিকরা টিভি-ব্লুফিল্ম-হত্যাধর্মণের ছবি দেখতে উৎসাহী হয়- এমন কথনে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ কিংবা প্রগতিবাদী সাহিত্যের সূত্রায়িত মডেল উঠে আসে না। শ্রমজীবী অর্থেই স্বাভাবিকভাবেই সে আদর্শ, মহৎ ও উচ্চনৈতিকতার এমনটা নয়- দেবেশ সেই বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিককে আখ্যায়িত করেন। ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে

নিম্নবর্গের কৃষিজীবী মানুষের চেতনায় শ্রেণির থেকেও ধর্ম বেশি আধিপত্য করে, তাই ধর্মীয় উস্কানি ও মিথ্যে-আশায় তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অধিকার করে উচ্চবর্গের স্বার্থান্বেষীরা। আর, উচ্চবর্গের নির্দেশে প্রভাবিত হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে দশরথ কামার, আফসার মাঝি, গফুর কলুরা। কারখানার শ্রমিক প্রতাপের সুপ্ত ধর্মবোধ জেগে ওঠে এমনই উস্কানিমূলক প্রচারে, “এই মুসলমানেরা রক্তবীজের ঝাড়। তারা একদিন আমাদের এই পুরো দেশটাকে পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়বে... সুরাটে আমরা কি চুপচাপ থাকব, মুসলমানদের ওপর আমাদের বদলা নেব না?” (রায় ২০০৭, ১১১-১২) প্রতাপ দাঙ্গায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে মুসলিমনিধনে মেতে ওঠে। যারা কয়েকঘণ্টা আগেও একই মহল্লাবাসী সমশ্রেণির প্রতিবেশী ছিল, ধর্মের প্রাবল্যে তাদের নৈতিকবোধ গুঁড়িয়ে যায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ভারতের মুসলমানদের ধ্বংস করার রাজনৈতিক প্রস্তুতি এবং মুঘলযুগের ইতিহাসকে মুছে ফেলে সনাতনী-ইতিহাস বানিয়ে তোলার প্রস্তুতি। অন্যান্য প্রতিবেদনের থেকে এই ‘দাঙ্গার প্রতিবেদন’-এ কথকের স্বর অনেক বেশি শোনা গেছে। ঘটনা-চরিত্রনির্মাণ-কাহিনিবিস্তারের মাঝে মাঝে কথকের স্বর ধারাভাষ্যের মতো বা যোগসূত্রের মতো রয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের কথকের স্বরের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য এই আখ্যানের কথকের স্বরে থাকে- কথকের স্বর অনেকটা প্রবন্ধের ঢঙে পাঠককে ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠ দেয়।

জাতি হিসাবে ভারতবাসীরা অন্ধভাবে গড়াতে গড়াতে খাদের কিনারে এসে পৌঁছেছে, আর কোনো প্রত্যাবর্তন নেই... ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি আমরা গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কতবার ব্যবহার করেছি। অযোধ্যায় আমরা বুঝলাম- এটা কোনো শব্দমাত্র নয়, আমাদের জাতির মূল পেশি ও স্নায়ুকেন্দ্র। যদি সেই কেন্দ্রে ঘা পড়ে তাহলে শরীরের সমস্ত আচরণেই বিকৃতি দেখা দেয়। (রায় ২০০৭, ৯১)

এই প্রতিবেদনধর্মী উপন্যাসের সূত্রগুলি ভবিষ্যৎ ভারতের। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ও আখ্যানটি রচনার প্রায় ত্রিশ বছর বাদে এই বয়ানগুলি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। যে ভাষায় কুশীলবেরা

ভেবেছে, সংলাপ বলেছে ও অ্যাকশন করেছে, সেই একই ভাষা আজও ভারতের নাগরিক সমাজ ব্যবহার করে। ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টি ও অনুমানক্ষমতা গভীর বলেই আখ্যানের বাস্তবতা এখনও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপন্যাসে দাঙ্গার বীভৎসা, হিংসার ছড়িয়ে পড়া ও মৃত্যুর কথা একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়। দাঙ্গায় মৃত মানুষ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে সংখ্যা হয়ে থাকে অথবা নিছক কোনও নাম হিসেবে- কিন্তু ‘দাঙ্গার প্রতিবেদন’-এ অজস্র লাশের বিবরণ সর্বোপরি একটি এগারো মাসের শিশুর লাশের বিবরণ নিছক প্রতিবেদনের বয়ানে আটকে থাকে না- মৃতদেহ ইতিহাসের স্বর হয়ে ওঠে, মৃতদেহ প্রতিবাদ হয়ে ওঠে³²⁷- যে ইতিহাস দাঙ্গামুহূর্তে অংশগ্রহণকারী মানুষের, নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত মানুষের এবং ধর্মীয় সত্তাকে আঁকড়ে ধরা মানুষের ইতিহাসহীনতার ইতিহাস। ‘শিল্পায়নের প্রতিবেদন’ উপন্যাসে তথ্যের সংক্রমণ আরও বেশি। খরার প্রতিবেদনের মতো এই উপন্যাসেও প্রকৃতির বর্ণনা, প্রাণীদের বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী হয়ে ওঠে। এর সঙ্গেই জুড়ে যায় অগাস্টাস মুণ্ডার নিঃসঙ্গ যাপন। ইতিহাসধৃত ব্যক্তিকে সন্ধানের কাহিনি। “তার বিশ্বাসের জগৎ তাই একটি বেশি সাদাসিধে, একটু বেশি সরল” (রায় ২০০৭, ১৭০) টোপনোর বিশ্বাসের জগতে চাঁদ বোঙ্গা, যিশু, মারাও বুরু, চা বাগানের মালিকের প্রতি অটলা ভক্তি সবই থাকে। প্রায়-পরিত্যক্ত চা-বাগান ছেড়ে না চলে যাওয়ার জন্যে যে স্থাপু বিশ্বাস কাজ করে, কথক সেই বিশ্বাসঋদ্ধ জীবনে অগাস্টাসের দৈনন্দিন সংগ্রামের বিবরণও দিয়ে রাখেন।³²⁸ নৈর্ব্যক্তিক প্রতিবেদনের বয়ান ছেড়ে কথককে বেরোতে হয় একজন ধর্মান্তরিত আদিবাসীর শ্রেণিঅবস্থানের সন্ধানে। সৃষ্টিতত্ত্ব, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ইত্যাদির বৈপরীত্যে তথ্য পরিসংখ্যান বলে চা-শ্রমিকদের দুর্দশার সালতামামি। বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে বাস্তবের জগতের সংঘাত বাড়ে এবং কখনপ্রক্রিয়ায় কথকের ভূমিকাবদল চা-শ্রমিকদের অন্তর্হীন বিপর্যয়ের প্রতিবেদন পেশ ক’রে চলে। চা-বাগান উঠে যাবে জেনেও হাতে হাতে নগদ-টাকা পেয়ে গেলে শ্রমিকমহলায় হরষেবিষাদ মাখা উদ্‌যাপন শুরু হয়; আখ্যানের ভাষা সেই উদ্‌যাপনের হরষেবিষাদকে ধারণ করে। আখ্যানের আঙ্গিকে সম্পৃক্ত হয়ে যায় প্রকৃতির ভাষা, অগাস্টাস

মুণ্ডার প্রাগাধুনিক বিশ্বাস অনুচ্ছেদগুলিতে ফিরে ফিরে আসে। অগাস্টাস টোপানো মুণ্ডার নিঃসঙ্গতা, নেশাসক্তি, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস আখ্যানকথনে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আখ্যানের আঙ্গিক ও ভাষা পরস্পরের সঙ্গত রক্ষা করে কীভাবে, তার নমুনা থাকে কথকের স্বরে, “চাঁদ বোঙ্গা, মারাং বুরুর স্বপ্ন দেখে ভগতরা। প্রভু যিশুর স্বপ্ন দেখে চার্চের ফাদার। বাগানে একটা কালীবাড়ি আছে। তার পুরতও নিশ্চয়ই তেমন স্বপ্ন দেখে। ভগবানের স্বপ্ন দেখে ম্যানেজারবাবু, লেবারবাবু, কোম্পানিবাবু” (১৯০-৯১) প্রতিবেদনের সঙ্গে উপন্যাসের বিযুক্তি ঘটে যায় স্বপ্নকে এভাবে ক্ষমতা-কাঠামো অনুসারী ক’রে ফেললে। অগাস্টাসের ব্যক্তিজীবন উত্তরবঙ্গের চা-বাগান ও সংশ্লিষ্ট চা-শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের কেন্দ্রে থেকে আর্থ-রাজনৈতিক বদলের অভিমুখ তুলে ধরে পাঠকের কাছে। অগাস্টাসের সঙ্গে বাঘারুর মিল প্রচুর; বাঘারুর মতোই “টোপানো সেই শেষ রাত ও সূর্যোদয় জুড়ে এইটুকুই শুধু জানল, তার আর কোনও ফরেস্ট নেই” (২০৭) টোপানো একদা আদিবাসী সত্তা ও কৌমসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমিকসত্তা লাভ করেছিল। বাঘারুর অবশ্য তেমন সত্তা ছিল না। কিন্তু, দু’জনের অনিশ্চয়তা এবং অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে অমিল থাকে না। বাঘারু গয়ানাথের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার খোয়াব দেখে, তার অস্ফুট চিন্তাস্রোতে সেই খোয়াব সারজল পায় আপলচাঁদ ফরেস্টে। টোপানোও ফরেস্টের ভেতরে নিজের ভুবন বানিয়ে নেওয়ার খোয়াব দেখে।³²⁹ কিন্তু এখানেও বাদ সাধে সরকারি নীতি, আর্থ-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তিস্তাপার বদলে যায় বাঁধের সিদ্ধান্তে; প্রাকৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক বদল। আর, টোপানো মুণ্ডার স্বপ্নের অরণ্যজীবন বিপর্যস্ত হয় সরকারি অরণ্য-নীতির জন্য।³³⁰ একদিকে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন চা-বাগান ধ্বংস ক’রে দিচ্ছে, অন্যদিকে অরণ্যকে গ্রাস করছে সেই পুঁজিবাদী উন্নয়নই। অগাস্টাস টোপানো মুণ্ডা সেই রাজনীতির শিকার হয়ে নির্দিষ্ট কালস্থানে সমষ্টির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এবং বিপন্ন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। অগাস্টাসের দেশ, মাটি থেকে উৎখাত হওয়ার সংকট তার দীর্ঘ পথ হাঁটার ফলশ্রুতি। সে নেশার গাডডায় পড়বে নাকি উৎখাত হওয়া সমশ্রেণিভুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলন গড়ে তুলবে, তা জানা যায় না।³³¹ অগাস্টাসের

হেঁটে যাওয়া অনিশ্চিতের দিকে, বাঘারুর মতোই। প্রতিবেদন শুধু বিবরণ দেয়, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তার কাজ নয়। এই আখ্যানও সেই মুক্তসমাপ্তির ইঙ্গিতে শেষ হয়। বৃত্তান্তগুলির সঙ্গে শিল্পায়নের প্রতিবেদনের আখ্যানগড়ন মিলে যায়।

‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসের দু’টি চরণেই রাজনীতি গুরুত্ব পেয়েছে। অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসের মতো ‘রাজনীতি বাজে’, ‘রাজনীতিতে অসততার প্রাবল্য’ ইত্যাদি প্রতর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে উনিশশো ত্রিশ-চল্লিশের রাজনীতিকে আখ্যানের অন্তর্বর্তী উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন সতীনাথ। কংগ্রেসী রাজনীতির একদা সক্রিয় সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক শঠতা বর্ণনায় আপোস করেননি সতীনাথ, এমনকি রাজনীতির গান্ধীবাদী মডেলকেও আধিপত্যের স্থানে বসাননি। রাজনীতি বহিরঙ্গের বিষয় নয়, মানুষের জীবনদর্শনের সত্য খোঁজার সঙ্গে তার অঙ্গঙ্গী সম্পর্ক। এই রাজনৈতিক বীক্ষা থেকে তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সত্তা সন্ধানের তাগিদ থেকে ঢোঁড়াই চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে দেবেশ রায়ের বাঘারু বা কেলু কি তুলনীয় নয়? বিশ শতকের শুরুতে ‘গোরা’ উপন্যাসের গোরা চরিত্রের বিশালতা দিয়ে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনীতিকে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঢোঁড়াই কিংবা বাঘারু বা কেলু সেই চারিত্রিক বিশালতা দিয়ে সমসাময়িক রাজনীতিকে আখ্যায়িত করতে চাওয়ার উত্তরসুরী। যদিও, গোরার নির্মাণ ও রাজনীতির সঙ্গে ঢোঁড়াই ও বাঘারু-কেলুদের শ্রেণিগত এবং সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য প্রকট। কিন্তু ঢোঁড়াই, কেলু, বাঘারুরা নিম্নতল থেকে জাগা ইতিহাস (History from below) আখ্যায়িত করার সার্থক প্রতিনিধি। যদিও ঢোঁড়াই বেশ রাজনীতি সচেতন। কোয়ারিটোলায় সে নেতা হয়ে ওঠে, নিষ্পেষিত স্বরহীনদের রাজনৈতিক স্বর হয়ে ওঠে। উচ্চবর্গের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভারতের একজন শোষিত দ্রোহী হওয়ার চেতনা সে অর্জন করে, সঙ্গে নিম্নবর্গের নেতা হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঘারু বা কেলুর এমন সচেতন শ্রেণিদ্রোহ নেই, অনেকের নেতা হয়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। কেলুর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের

কী অদ্ভুত মিল! তাদের দু'জনের আচরণে, তাদের ভাগ্যহীনতায় এবং তাদের দু'জনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বপথে প্রচুর মিল। ঢোঁড়াই যেমন নিঃসঙ্গ, শিকড়-উপড়ানো মানুষ, বাঘারু কিংবা কেলুও তাই। কেলুকে নিজের শিকড় ছেড়ে উচ্ছেদ হয়ে যেতে হয়। কেলু পরাজিত ঢোঁড়াইয়ের মতোই; তারা ন্যায়বিচার পায় নি। গ্রামসমাজ থেকে শহুরেসমাজের জটিল আবর্তে ঘুরপাক খায় সে। ঢোঁড়াই গানহী বাওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং কোয়ারিটোলার মানুষদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে যে মহাকাব্যিক জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কেলু তার বিপ্রতীপে সেই মহাকাব্যকে বাঁচাতে ছোট। ফলে, ঢোঁড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষিত 'নিজের রামায়ণখান' লেখা হল না এবং কেলুর কালস্থানিকতায় পুরনো রামায়ণটি সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে।³³² ঢোঁড়াইয়ের যাত্রা আছে, সে যাত্রা পৌঁছায় না কোথাও; কেলুর যাত্রা গ্রাম থেকে শহরে, কেলুর যাত্রা ব্রাত্য থেকে ব্রাত্যতর হওয়ার দিকে। যে বিপন্ন ভারতবর্ষকে ঢোঁড়াই বা কেলুর নির্মাণের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করা যায়, তা কি গোরার ভারতবর্ষ আবিষ্কারের থেকে কোনও অংশে কম? গোরার আবিষ্কারে আধ্যাত্মিক অন্তর্শক্তি ছিল, কিন্তু ঢোঁড়াই ও কেলুর আবিষ্কারে আধ্যাত্মিক উন্মোচন প্রধান বিবেচ্য নয়। এছাড়াও, গোরার পারিপার্শ্বিক সমাজ 'প্রাগাধুনিক' বিশ্বাস, রীতিনীতি, লোকাযত যাপনে বাঁধা নয়। তাৎমা, ধাঙড়, কোয়েরিদের সমাজজীবন পালাবদলের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশ্বযুদ্ধ এবং তীব্রতর স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগপৎ অভিঘাতে আর্থ-রাজনৈতিক ব্যাবস্থা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে ধাঙড়, কোয়েরি, তাৎমাদের জীবনবোধও পাল্টে যেতে থাকে। ইউরোপীয় আধুনিকতা নয়, দেশজ 'আধুনিকতা'র দ্বন্দ্বগুলি প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও সামাজিক উচ্চবর্গরা ক্ষমতাকাঠামোয় যত গেঁড়ে বসতে থাকে, ততই নিম্নবর্গের সঙ্গে বৈষম্য বাড়তে থাকে। এই বিরোধভাস উপন্যাসে বজায় থাকে। এঁদের কৌমজীবন ও মস্তুরগতির সমাজজীবন পরিবর্তনশীল। পুরনো মূল্যবোধ নৈতিকতা সংস্কার ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় বহির্জগতের সঙ্গে দ্বন্দ্বিক সম্পর্কে, কিন্তু নাগরিক আধুনিকতার থেকে মস্তুরতর গতিতে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র সামাজিক জীবনও মস্তুর এবং তার নিজস্ব গতিবেগ আছে। বাইরের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাতে গতিসঞ্চার করে। বাঘারু কিংবা কেলুর জীবন এবং পাড়ারিয়া গ্রামবাসীদের

জীবনও পাঁচটাতে থাকে আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে। তিস্তাবাঁধ এবং পুনাসি বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জুড়ে থাকে ‘ডেভেলপমেন্ট’ ও ‘উন্নয়ন’ শব্দগুলি। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে এই দু’টি শব্দ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিভাষা নয়, বরং রাজনৈতিক শব্দ! ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র দ্বিতীয় আখ্যানে ‘কলকাত্তাকশনের সময় এরকম ঘটে থাকে’ শিরোনামে পুনাসি বাঁধ লাগোয়া জনপদ উচ্ছেদ হওয়া এবং সরকারকর্তৃক জবরদস্তি উচ্ছেদ-প্রক্রিয়ায় পুলিশদ্বারা ধর্ষণের আখ্যান থাকে। “পাড়ারিয়া তো পুনাসি বাঁধের নিচে চাপা পড়া গ্রাম। পুলিশবাহিনীর কাছেও ওটা পুনাসি বাঁধ। পাড়ারিয়ার মেয়েদের কাছেও ওটা পুনাসি বাঁধ। ঐ বাঁধের নির্মাণের সঙ্গে এই ধর্ষণ যেন অনেকটা ওতপ্রোত” (রায় ২০০১, ১১২) রামিয়া-টোঁড়াইয়ের বিয়ের মতোই রাধিয়া-কেলুর বিয়ে হয়। এই দু’টি বিয়েই যেন ‘ভাগ্যনির্ধারিত’ তথা পূর্বনির্ধারিতএ বং এই বিয়ের ওপরেই আখ্যানের ভবিষ্যৎও কিছু নির্ভরশীল। রাধিয়ার বাবা অর্ধোন্মাদ^{৩৩৩}, সে চাঁদনি রাতে ‘মাছেদের আসঙ্গলীলা’ দেখতে দেখতে মারা যায় জল-শুকোনো মাঠে। চালচুলোহীন কেলু টোঁড়াইয়ের মতো স্থিতিহীন জীবনে রাধিয়াকে পায়। ‘রাধিয়া বিয়ের জন্যে খেপে উঠল’ থেকে ‘লালডিকোলার বুড়োরা পাড়ারিয়ায় প্রস্তাব নিয়ে গেল’ শীর্ষক অংশ পর্যন্ত বর্ণনায় কেলু ও রাধিয়াকে পরস্পরের জন্যে মানানসই ক’রে তুলতে আখ্যানকার দু’জনের জীবন, আচরণ ও পারিপার্শ্বিক বিধৃত করেছেন। কেলুর সঙ্গে রাধিয়ার বিয়ের বর্ণনায় লোকায়ত ও লোকোত্তরের মিশ্রণ ঘটে। কেলুকে মুকুট দিয়ে সাজায় বাচ্চারা ও বুড়িরা, কেলুর জন্যে রঙিন পাগড়ি বানায় বুড়োরা, কেলুকে যেমন খুশি মনের মতো রঙে সাজিয়ে দেয় তল্লাটের লোকেরা- এই বর্ণনায় কি দেবতার পূজোর দিন দেবতাকে ইচ্ছেমতো সাজানোর অনুষ্ঠান থাকে? কেলুর পেটে ছাই মাখিয়ে দেওয়া, কেলুর বরযাত্রীর দলে পশুপাখি ভূতপ্রেত সেজে ঢুকে পড়া লোকদের উল্লাস কার্নিভালের মেজাজ আনে এবং একইসঙ্গে মনে পড়িয়ে দেয় শিবের বিয়ের মুখফেরতা আখ্যান ও পৌরাণিকীর মিশেল। কথক এই বর্ণনায় কেলুকে শিব সাজাতে ত্রুটি রাখেন না বলেই সিদ্ধির শরবত খায় উৎসবযাত্রীরা, শিবপার্বতীর বিয়ের গান হয় এবং যশোদাজী রাধিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে-

“ভগবান তোকে এত রূপ দিয়ে শেষে কি না তোর জন্যে এমন একটা পাগল বর জোটাল?” (২৬৭) কেলু পুরাণের শিব বলেই রাধিয়ার সঙ্গে বিয়ের পরেও তার শিবস্বভাব (লোকাযত শিবস্বভাব, যে উলোঝুলো শ্মশানেমশানে ঘোরা সংসার-উদাসী) যায় না। যাদের কথায় আখ্যান ফাঁদছে কথক, তাদের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে এবং কেলু-রাধিয়ার উপাখ্যানকে লোকাযত ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ করতে কথককে জানাতে হয় ভারতীয় সমাজে এপিকের গুরুত্ব³³⁴ তথা নিম্নবর্গীয় দৈনন্দিনে পুরাণ ও এপিকের অনিবার্য অস্তিত্ব।³³⁵ কেলু-রাধিয়ার দাম্পত্যে শিব-পার্বতীর উপাখ্যান- রাধিয়া অন্নপূর্ণার মতো সংসার আগলে রাখে আর কেলু লোকাযত শিবাখ্যানের শিবের মতো উদাসীন ঘুরে বেড়ায়। “কেলুর হাত ধরে রাধিয়া পথ দেখাচ্ছে।” (২৭২) এবং রাধিয়া নিজের জমি-ঘরের স্বপ্নদেখার শরিক করতে চায় কেলুকেও। কিন্তু, যতই এপিক/পুরাণের গুরুত্ব থাক, লোকাযত ও লোকোত্তর দু’য়ের সঙ্গে আধুনিক সময়ের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে পুরাণচ্যুত হয় তারা। আধুনিকতা পুরাণকে স্বীকার করে না বলেই কেলুকে কলকাতার নরকে ঢুকে পড়তে হয়, পাড়ারিয়ার উচ্ছেদের সাক্ষী থাকতে হয় এবং রাধিয়ার কাছে ফিরে দেখে ততদিনে রাধিয়ার জীবনে চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিনষ্ট পাড়ারিয়ার ধ্বংসসূত্রে ধর্ষিতা রাধিয়াকে ঘিরে কেলুর স্বগতঃবিলাপ তাকে ঘিরে এযাবৎ তৈরি হওয়া পৌরাণিকসম্ভাবনাকে নস্যাৎ ক’রে দেয়। কিন্তু, একইসঙ্গে কথকের কথনে কবিত্বের আরোপ অন্য পাঠসম্ভাবনাও জাগিয়ে তোলে। “রাধিয়া, তোহোর যোনিপর সমুদ্ররকো অনন্ত স্বাদ। সমুদ্রকে কি ধর্ষণ করা যায়?” (২৮০) রাধিয়া কি মহাকাব্যের ও পুরাণের দেবীরূপ পায় না? দেবাংশী বলেই রাধিয়া অক্ষতযোনি এবং কেলুর স্বগতঃবিলাপ ‘গান’ হয়ে তাদের জাগিয়ে তোলে পরবর্তী সকালে। টোঁড়াই পরাজিত নিম্নবর্গদের রামায়ণজি হয়ে ওঠে, আর, কেলু আশ্রয় পায় গঙ্গাসাগরে সাধুদের ডেরায়। গুরুর সঙ্গে যাদুঘর দেখতে গিয়ে প্রাচীন নিদর্শনগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে কেলুর শরীরে মনে পুরাণের ছোঁয়া লেগে যায়।³³⁶ বৌকাবাওয়া শিশু টোঁড়াইয়ের শরীরে ‘অবতারচিহ্ন’ আবিষ্কার করে। শিশু টোঁড়াই ভিক্ষে করতে বেরিয়ে

রামচন্দ্রজির গান গায়। টোলায় রামায়ণ পাঠ করার কারণে মিসিরজি অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা পায়।

টোঁড়াই রামায়ণজীকে আদর্শ মানে, ন্যায়-সত্যের প্রতি অবিচল থাকার মানসিক সাহস পায় রামায়ণ পড়ে। পাক্কী আর রামায়ণ টোঁড়াইয়ের আশ্রয়স্থল। রামায়ণকাহিনি নিছক সাহিত্য নয় জীবনদর্শন হয়ে ওঠে তাদের দৈনন্দিনে। তাহলে কি মার্ক্সয়ের ধর্মসম্পর্কিত কথাটাই ফলে যায় যে, নিপীড়িত-শোষিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসের আশ্রয়স্থল হচ্ছে ধর্ম? কিন্তু, সেই পাক্কী আর রামায়ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাস শেষাবধি টোঁড়াইকে রক্ষা করতে পারেনি- তার বিযুক্তি ঘটেছে সে রক্তমাংসের চরিত্র বলেই। রামরাজত্বের সন্ধানরত টোঁড়াই ব্যক্তিগত যুদ্ধে ও রাজনৈতিক যুদ্ধে বিকশিত হতে হতে পুরনো রামায়ণ ছেড়ে নতুন রামায়ণের মূল কুশীলব হয়ে উঠছে।

টোঁড়াই রামচন্দ্রের আধুনিক বিকল্প।³³⁷ মহাকাব্যিক চরিত্রসম বলেই টোঁড়াই সর্বজনীন; টোঁড়াই শুধু রামিয়ার বা তাৎমাটুলির নয়। বৌকাবাওয়ার থান, রামিয়া, তাৎমাটুলি সবকিছু ছেড়ে তাকে এগোতে হয়- কেলুও যেমন রাধিয়াকে ছেড়ে এগোয়, কলকাতা বা পাড়ারিয়া কোথাওই তার থেমে থাকলে চলে না। কেলু পাড়ারিয়া থেকে উচ্ছেদ হয়ে পরিবার হারিয়ে কলকাতায় এসে আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়। শেষপর্যন্ত তারও আশ্রয় হয় ঐ ধর্ম। কোয়ারিটোলার সঙ্গে তাৎমাটোলির সঙ্গে পাড়ারিয়ার মিলও কি কম? এই সবক'টি গ্রামই নগরায়নের আধুনিকতার ও উন্নয়নের 'বলি' হতে চলেছে। কেলু, টোঁড়াইরা তার ট্রাজিক নায়ক। জিরানিয়া আর পাড়ারিয়ার অসংখ্য চরিত্রসমাবেশ, মহাকাব্যিক আঙ্গিক ইউরোপীয় নভেল থেকে স্বতন্ত্র তো বটেই এমনকি দেশীয় পুরাণ-মহাকাব্যের লক্ষণ থাকলেও তা আখ্যানকে গিলে নিতে পারেনি। টোঁড়াই শুধু এক 'ব্যক্তি' নয় কিন্তু সে রামচন্দ্রের মতো অলৌকিক ক্ষমতাবানও নয়। রামায়ণ আর রামাখ্যান গ্রামীণ মানুষদের মুখফেরতা কাহিনি নিয়ে এগোতে থাকে বদলাতে থাকে; কোনও কোনও 'টোঁড়াই' সেই কাহিনিগুলির প্রতিফলনে গণনায়ক হয়ে ওঠে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির ক্ষুদ্রতা ও বিশালতার দ্বন্দ্বকে ধারণ ক'রে। সতীনাথ ও দেবেশ জানতেন যে টোঁড়াই কেলু বাঘারুঁরা মহাকাব্যের নায়ক নন, এমনকি আধুনিক সময়েও তাদের 'নায়ক' হয়ে ওঠা সম্ভব নয়; কিন্তু ইতিহাসের বড় সময়

আর ইতিহাসের ছোট সময়ের মধ্যে সমন্বয় তৈরি³³⁸ হয় এবং এঁদের লেখায় ইতিহাসের বড় সময়টা তৈরি হয় নিচ থেকে। সতীনাথের ইচ্ছে ছিল গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের মনবদলের গতিপথ নিয়ে ও তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে উপন্যাস লিখবেন; মানুষ ও পরিবেশ একে অপরকে কীভাবে বদলাচ্ছে, তার আখ্যান রচনা করবেন।³³⁹ সতীনাথ আখ্যানের প্লট নিয়ে গেছেন বাংলার বাইরে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে পাশ্চাত্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক সংকটের গভীরতা প্রসারিত হচ্ছে বৃত্তান্তগুলিতে এবং ইলিয়াসের উপন্যাসদ্বয়ে, মহাশ্বেতার ‘অগ্নিগর্ভ’-তে। চ্যারকেটু-খেতখেতুদের সমস্যার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ঘটনার যেমন সম্পর্ক রয়েছে; তেমনই তমিজের বাপ, তমিজ, কুলসুমদের সঙ্গে। ব্যক্তি-মানুষকে অন্বেষণ করতে করতে ইতিহাসের, সামাজিকতার অন্বেষণও চলছে। তমিজদের ক্ষুধার ইতিহাস সুপ্রাচীন; কখনো ইংরেজদের অত্যাচার, কখনো জমিদার-জোতদারের আবার ক্ষমতা-হস্তান্তর পরবর্তী নবগঠিত রাষ্ট্রের শাসকদের শোষণ। উৎপাদন ব্যবস্থার বদল হচ্ছে কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কগুলো পুরনো টান ছেড়ে বেরোতে পারছে না। শোষণের নতুন নতুন পদ্ধতি এসে পড়ছে। কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী উভয়েই ক্ষুধার ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলেছে। ঠিক তেমনি, চ্যারকেটু, টুলটুলি, বেঙ্গু প্রজন্মান্তরে ক্ষুধা বয়ে চলেছে। জমিদারি প্রথার অবসান, ভাগচাষীদের মধ্যে জমি ভাগ ক’রে দেওয়ার মতো আর্থ-রাজনৈতিক রদবদল ঘটছে। কিন্তু, সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বদলাচ্ছে না। বদলাচ্ছে না অস্তিত্বের সংকট। রাষ্ট্রেরও নিজস্ব সংকট আছে। রাষ্ট্রের মতাদর্শের প্রতিনিধি দলগুলো কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও নিজস্ব রাজনৈতিক সংকটে ভোগে। তার সাথেই জড়িয়ে যায় মানুষের প্রশ্ন। জমি বর্গা নিয়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে সরকারি অফিসার সুহাস ও জোতদার গয়ানাথের সংঘাত চলে। নিয়মের ফাঁক বের ক’রে এবং আধিপত্যের জোরে গয়ানাথের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে পড়ে তিস্তাপাড় এমনকি তিস্তাপাড়ের মানুষেরা। বাঘাড়ুর অস্তিত্বসন্ধান, ঘর-রুজির নিশ্চয়তা সন্ধান শেষ হয় না। বিশ্বের সঙ্গে বাহেবাবুর আধিয়ারদের দ্বন্দ্বও তারই প্রতিক্রিয়া

(রায় ১৯৮৯, ১৬৮-১৬৯) যুক্তফ্রন্টের (১৯৬৭) শাসনকালে কৃষকদের নিয়ে জোতদার বাহেবাবুর জমি দখল করে কমিউনিস্ট কর্মী বিশৃঙ্খল; তারা জমির পাট্টা আদায় করে। কিন্তু, সেই জমি ধরে রাখতে পারে না। তার কারণ, ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ এই সূত্র অনুযায়ী ভাগচাষীদের কাছে জমি যাওয়ার কথা থাকলেও, নিজস্ব লাঙ্গল, গাই-বলদ, বিছন ইত্যাদি কতজন ভূমিহীন কৃষকের থাকে? তাই, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর-ওপর আশ্বাস পেয়েও, কৃষকদের সংকট মেটে না। তাদের সংকট বরং আরো গভীর হয় কারণ, জোতদার গাই-বলদের মালিক, ঋণের মালিক; তাদের হাত পাততেই হয় বাহেবাবু জোতদারের কাছে। রাষ্ট্র কৃষকদের মৌখিক আশ্বাস দিয়েও ব্যর্থ হয় সংকট কাটাতে। “দখল-করা খাশজমি আবার আধিতে ফিরে গেল। লড়াইয়ের শুকরাপাড়া এখন বাহেবাবুর ঘরের আধিয়ার।” (রায় ১৬৬) নিপীড়িতকে সুরাহা না-দিতে পারার এই যে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা, তা কিন্তু সরাসরি জড়িয়ে ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে। রাষ্ট্র সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ তাই জোতদারের রাজনীতিই বাধ্যতঃ হয়ে ওঠে কৃষকের রাজনীতি।

এই সমস্যা কি দেশভাগোত্তর? ক্ষমতা-হস্তান্তর পরবর্তী সময়ের? না। ‘খোয়াবনামা’-তেও তমিজেরা ঠিক এমনই সমস্যার সম্মুখীন হয়। তমিজ, হুরমতুল্লা কিংবা যুধিষ্ঠির কামার- এরা প্রত্যেকেই শরাফত মণ্ডলের ভাগচাষী। আশ্বিনের শেষে নতুন ধান ওঠার পর থেকেই তাদের আশা থাকে প্রচুর ধান ঘরে তোলার। কিন্তু, উৎপাদনের উপকরণের মালিক সেই শরাফত মণ্ডল। শুধুমাত্র শ্রমের অধিকার তাই স্বীকৃতি পায়না; প্রায় শূন্য হাতেই ফিরতে হয় তমিজ, হুরমতুল্লাদের। শরাফতের দয়াদাক্ষিণ্যে কয়েক মাসের আহার জোটে, বাকি সময়ের অনাহারের চিন্তা এবং শরাফতের দাক্ষিণ্যে ফের ভাগচাষ করার ইচ্ছেয় দারিদ্র আর মেটে না তাদের। ‘দারিদ্রের দুষ্টচক্র’ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক বাঁধন মুক্ত হওয়ার ঠিক আগে আগেই যখন নতুন রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন বহু প্রতিশ্রুতি আসে তমিজদের কাছে। মুসলিম লীগের নেতা শরাফতের ছেলে আব্দুল কাদের, বামঘোঁষা মুসলিম লিগ নেতা ইসমাইল এরা কৃষক স্বার্থ রক্ষার কথা বলে। তেভাগার উত্তাল সময়ে আধিয়ারদের দ্বারা জোতদার-খতম ও

জমিদখলের বাস্তবতা মিথ্ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে, তমিজেরা আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু, নবগঠিত রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত শাসিতদের অস্বীকারই করে। শুধুমাত্র শাসকের মুখটা বদলে নেয়। ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানের প্রথম লাইন থেকেই যখন ছাই রঙের মেঘ তাড়ায় তমিজের বাপ, তার পর থেকেই পাঠকের কাছে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয় যে, তমিজের বাপের, তার সমশ্রেণিভুক্ত মানুষদের আসলে কিছুর ওপরেই অধিকার নেই। যে বিল থেকে তারা বংশপরম্পরায় মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ ক’রে, সেই বিল মিথ্ অনুযায়ী মুন্সির অধিকারে এবং বাস্তবে শরাফত মণ্ডলের অধিকারে। জীবিকান্তরে তমিজ কৃষিজীবী হলেও সেই জমির ওপরে অধিকার শরাফত মণ্ডলের। খিদের জন্যেই, অনাহারের জন্যেই দখল-করা জমি ফের জোতদারের পায়ে বাঁধা রাখতে বাধ্য হয় সাঁওতাল-মদেশিয়ারা। চ্যারকেটু তার খিদের জন্যেই পঞ্চায়েতের কাছে বারবার হাত পাততে বাধ্য হয়; এই খিদেই তাকে ‘স্বাধীন’ হতে দেয়না। কারণ, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই থেকে যায় শাসক শ্রেণির হাতে। তমিজকেও তাই বারবার ফিরতে হয় শরাফত মণ্ডলের কাছে। তমিজের বাপ তার আধো ঘুম-আধো জাগরণে শরাফতের ভূমিদাসত্ব ও মানসিক দাসত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। অথচ, সচেতন বাস্তবতায় শরাফতকে খিস্তি করে সে। আর, তাকেও দিনরাত তাড়িয়ে বেড়ায় খিদে।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ রচনা শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে তখন সবে বামফ্রন্ট শাসন (১৯৭৭) শুরু হয়েছে। যদিও, সিপিআই, অর্থাৎ দেবেশ যে দলের মতাদর্শে আস্থা রাখতেন, তারা বামফ্রন্টে যোগদান করে ১৯৮২ সালে। উপন্যাসটি রচনা শেষ হয় ১৯৮৭ সালে। এই উপন্যাসের আঙ্গিক বৃত্ত থেকে বৃত্তে ঘোরে, ‘পাখোয়ালপর্ব’-তে পৌঁছে কথক জানায়, “আর এক বৃত্তান্তের শুরু” (রায় ২০১৩, ১৮৭) আঙ্গিকের সাযুজ্যে এই নতুন পর্বের শুরুতে প্রকৃতির রূপ-রস বদলানোর বর্ণনা করে কথক। বৃত্তান্তরের কাহিনি মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসন্ধানের মধ্যে থাকে। সেখানেও প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ে মাদারির মা। দেবেশ রায় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত সর্বশেষ অংশে বৃত্তান্তের সঙ্গে প্রকৃতির অনপনেয় যোগের

কথা লেখেন, “এই ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ সেই প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত” (৪৯৫)। তিস্তাপারের বৃত্তান্তলিখন শেষ করার অনিবার্য কারণ তিস্তা ব্যারেজ তৈরি হওয়া, যার ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য টাল খাবে, ‘তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ’ হবে এবং বাঘারু ও মাদারির মায়ের মতো প্রায়-অস্তিত্বহীন মানুষদের অস্তিত্ব সমূলে উৎপাটিত হবে। বাঘার, মাদারির মা, মাদারি এরা প্রত্যেকেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে প্রত্যাখ্যাত। বাঘারুর থাকা না- থাকায় প্রশাসনের কিংবা তিস্তাপারের ক্ষমতাবান লোকেদের কিছু যায় আসে না। আর, বাঘারু ও মাদারির মায়ের উচ্ছেদমুখী বাস্তুহীনতায় চা-বাগানের শ্রমিক কিংবা ক্ষেতমজুরদেরও কিছু যায় আসে কি? না। বাঘারু, মাদারিরা এই শ্রমজীবীদের সঙ্গেও একাত্ম হতে পারেনি কখনও। রাজবংশী অধিকারের মিছিল, কৃষক সমিতির মিছিল, রঙিন ঝাঙার মিছিল বা উজ্জ্বল সভা-মিটিং কোনওটাই বাঘারুর নয়। বস্তুতঃ তিস্তাপারের সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতির কোনও অংশই এরা নয়। “না। মোর কোনো মিছিল নাই... মুই মিটিঙের মানষি না হই” (৫০০) বাঘারুর অতি বিক্ষিপ্ত অতি-সংক্ষিপ্ত সামান্য ক’টি সংলাপের মধ্যে এই সংলাপটি থাকে উপন্যাসের প্রক্ষিপ্ত পর্বে। মাদারির সঙ্গে বাঘারুর সাক্ষাৎ এবং পারস্পরিক ভরসায় ‘প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে’ হেঁটে যাওয়া প্রক্ষিপ্ত পর্বেই। বাঘারুর সঙ্গে মাদারির সেতুবন্ধন আখ্যানের ‘নিয়তি’, এই সেতু তাদের শ্রেণিজোট বা অন্ত্যজবর্ণজোট নয়, এই সেতু দুই অস্তিত্বহীন ও প্রত্যাখ্যাত মানুষের জোট। আখ্যানের পরিণতি, তিস্তার নিজস্ব গতিপথ হারিয়ে বাঁধে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরিণতি, তিস্তাপারের জঙ্গল আপলচাঁদ ফরেস্ট হারিয়ে যাওয়ার পরিণতি। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র প্রকাশসাল ১৯৯৩ হলেও, উপন্যাসটি লেখা শুরু হচ্ছে ১৯৮৩ সাল থেকে। অর্থাৎ কালবিচারে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮)’-র সমান্তরালে এই উপন্যাসটি লেখা চলছে। তিস্তাপারের জনপদের আখ্যান এবং বাঘারু-মাদারি-গয়ানাথদের ঘিরে আবর্তিত কাহিনির সঙ্গে বিহারের দেওঘরের জশিডির ‘পুনাসি বাঁধ’ জনপদের কেলু-রাধিয়া-আনোপীদের আপাতদৃষ্টিতে অমিল অনেক। পটভূমি আলাদা। ঘটনাক্রমের সময়কালের মধ্যে কয়েক বছরের ব্যবধান। আখ্যানদু’টির ভাষা ও

আঙ্গিকের মধ্যেও তফাৎ রয়েছে। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ নথি, প্রতিবেদন, সাল-তারিখসহ বাস্তবিক ঘটনা মিশিয়ে নেয় আখ্যানে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে ‘ডকু-নভেল’ উপাদান তুলনায় কম। বাঘারুর সঙ্গে কেলুর অজস্র মিল-অমিলের মধ্যে একটি মিল দু’জনের হাঁটা তথা চলমানতায়। আখ্যানের শুরু হয়েছিল হাঁটা ও মিছিলের বর্ণনায়। ক্রান্তির হাটের পথে দেউনিয়ারা যাচ্ছে, খন্দের যাচ্ছে, বিক্রেতা যাচ্ছে, সাইনবোর্ড যাচ্ছে, সুহাস যাচ্ছে, ভিড় যাচ্ছে- আর প্রত্যেকে হাঁটছে। এই হাঁটায় মিছিলের অবয়ব তৈরি হচ্ছে এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই পাঠককে নিয়ে অনেক মানুষের ‘কার্নিভ্যাল’এ যোগ দিচ্ছে কথক; হেঁটে। হাটের কার্নিভ্যাল ও অসংখ্য ছোট-বড় কুশীলবের হাঁটার শেষে ‘গয়ানাথের মানষি’ বাঘারুর প্রকাশ ঘটে আখ্যানে। বেমানান, বেখাপ্পা হলেও নাটকীয় আবির্ভাব তার। অন্ধকারে টর্চের আলো আর দেশলাইয়ের আগুনের আলোয় প্রকাশ ঘটে³⁴⁰ ফরেষ্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনের- পুরাণের দেবতার মতো আখ্যানে প্রবেশমুহূর্ত তার। বাঘারুকে পাছে পাঠক নিছক বাস্তবের সীমাবদ্ধ সংজ্ঞায় চিহ্নিত ক’রে ফেলে, তাই বাঘারুর বর্ণনায় আতিশয্য নির্ভর কমিকের আভাস।³⁴¹ বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটে নিঃসঙ্গ বাঘারু। মাথায় চাঁদ পাশে তিস্তা নিয়ে আপলচাঁদ জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে বাঘারু খেতবাড়ি-টাড়ি-বস্তি বাতাস বাঁশঝাড় চা-ফ্যান্টরি সবকিছু পেরিয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে বাঘারুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কবিষ্কারও এই পর্ব থেকেই শুরু হয়।³⁴² হাঁটতে হাঁটতে বাঘারু যতই গয়ানাথের দখলদারির সীমা পেরোতে থাকে, ততই সে নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকে, পাঠক বাঘারুর প্রাকৃতিকসত্তা আবিষ্কার করতে থাকে এবং কথক আবিষ্কার করে “সেই নতুন দুনিয়ায় এখন পর্যন্ত এক বাঘারু আছে আর ঐ চাঁদ আছে” (১২৪-২৫) বাঘারুকে তিস্তাপার ছেড়ে জঙ্গলে ‘নির্বাসিত’ হতে হয়, আবার ফিরে আসতে হয় এবং শেষে অনন্ত হাঁটার মধ্যে দিয়ে তিস্তাপার ছেড়ে চলে যেতে হয় মাদারিকে সাথে নিয়ে। কেলুরও হাঁটা এবং পালানো অনন্ত। কলকাতার রাস্তায় তার হাঁটা, পাড়ারিয়ায় তার ছোট্টা ও হাঁটা এবং গঙ্গাসাগরে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তার হাঁটা প্রতিটিই নির্দিষ্ট দ্যোতনা বহন করে। কলকাতায় কেলুর হাঁটা বিশিষ্ট, শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটেও তা শহর স্পর্শ করে না। বহু ঘটনা, বহু জীবন, বহু শব্দ ভেদ ক’রে কেলুর ওই হেঁটে

যাওয়াটাই হেঁটে যাওয়াটাই বড় হয়ে ওঠে।³⁴³ এই বর্ণনা অনেকটা কোনও স্থিরচিত্রে ধাবমান
 ‘ব্লারড’ পশ্চাৎপটের ওপরে প্রতীয়মান ‘সাবজেক্ট’-এর মতো। কেলু পাড়ারিয়ায় রাধিয়ার কাছে
 পৌঁছতে চেয়ে জশিডি স্টেশন থেকে হাঁটতে থাকে- বহুবছর পাড়ারিয়া থেকে দাম্পত্য থেকে
 দূরে থেকে কেলু ছুটে হেঁটে যখন পাড়ারিয়া পৌঁছায়, ততক্ষণে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে এবং
 রাধিয়ারা ‘উজারা অওরত’ হয়ে গেছে।³⁴⁴ আর, এই বর্ণনায় বাঘারুর মতোই কেলু নিসর্গ এবং
 পরাবাস্তব চিত্রকল্পে একাত্ম হয়ে যায়। কলকাতায় পুলিশ কর্তাদের জেরার মুখে কেলু বলে,
 “হাঁটতেখোঁ সাব, হাঁটতেখোঁ” (৪৮৫) কেলু প্রতিরাতে হাঁটে। কেলু সারা শহর জুড়ে হাঁটে। তার
 স্থিতি নেই, বাঘারুর মতোই। কেলু কলকাতা শহরের নয়, কলকাতা শহরও তার নয়। এই
 দূরত্ব বুঝতে চেয়েই “কেলু এ-শহরটাতে হেঁটে বেড়ায়। হাঁটতে-হাঁটতে কোনো সময় সে খাবার
 কুড়ায়। হাঁটতে-হাঁটতে কোনো সময় সে কোথাও জিরিয়ে নেয়। হাঁটতে-হাঁটতে কোথাও কখনো
 সে ঘুমিয়ে পড়ে। এ-শহরটাকে সে পায়ে পায়ে চেনে।” (৪৮২) কেলুর বিরামহীন হাঁটা ও বিশিষ্ট
 চলনতত্ত্বের বিশ্লেষণে কেলুর সদাসক্রিয় নিত্যপ্রবৃত্তি চিরচলন্ত সত্তা খুঁজে পেয়েছেন শিবাজী
 বন্দ্যোপাধ্যায়। “যে ‘হয়ে-উঠছে’ বা ‘হয়ে-চলছে’ না, কেবলই ‘হয়ে-আছে’, তার বিষয়ে,
 নিদেনপক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়ঃ তার গমন আছে, সন্ধান আছে কিন্তু গন্তব্য নেই”
 (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, ১৩০) বাঘারুর সাথে কেলুর আরও এক বিষয়ে মিল থাকে, তারা
 দু’জনেই একা। তাদের কোনও দলবল নেই, কাজ নেই, কাজের সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট জায়গা নেই,
 ঠিকানা নেই; অসংখ্য ‘নেই’ দিয়ে বাঘারু আর কেলু নির্মিত। এই ‘নেই’ ও ‘না’ গুলি তাদের
 আর্থ-সামাজিক চিহ্নগুলি থেকে বিযুক্ত ক’রে দেয়। ফলে, তারা নিপীড়িত হয়েও তাদের মধ্যে
 শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠে না। তাদের শোষিতবোধ থাকলেও, তা দলবদ্ধ সংগ্রামের কোনও প্রতিভূ
 হতে পারে না। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ শেষ হয় বাঘারু ব্যারেজ, অর্থনীতি, ক্ষমতাকাঠামোর দিকে
 পিঠ দেখিয়ে ‘প্রত্যাখ্যানের রাত’ ধরে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য তৈরিতে; আর, কেলুর আখ্যান শেষ হয়
 সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে কেলুর অবাধ হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যে। “রাধিয়া, হাম আতহোঁ” (৫৬২)

আহ্বান দিয়ে কেলুকে একাই হেঁটে যেতে হয়। সে হাঁটা শেষপর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের জলের মধ্যে হারিয়ে যায়- এই বর্ণনায় নির্দিষ্ট পরিণতি দিতে চায় নি কথক। কারণ, কেলু যে ঢেউগুলি পেরিয়ে পেরিয়ে রাধিয়ার কাছে পৌঁছতে চাইছিল, তা কেলুর সারাজীবন ধরে পেরিয়ে আসা ঢেউয়ের প্রতিকূলতা। শেষ দৃশ্যের পরাবাস্তব বর্ণনায় বিরোধভাস থাকে আগুন ও জলের। “কেলুর চোখের সামনে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে” (৫৬২) কেলু সেই আগুনে পুড়তে দেখে তার অস্তিত্ব ও পরিচয়কে। পরিবার, সাকিন, জন্মস্থান, অতীত সবকিছু পুড়ে যায় বলেই কেলুর নবনির্মাণ হয়। রাষ্ট্রনির্দেশিত উন্নয়ন এবং কনস্ট্রাকশনের বাস্তবতা পুড়ে যায় বলেই উদ্বাস্তু নির্বাকব কেলু সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে। কেলু হয়ে ওঠে নবায়নের অপর নাম।³⁴⁵ আখ্যানের মুক্তসমাপ্তি ও পরাবাস্তব দৃশ্যনির্মাণের সঙ্গে তুলনীয় ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’র সমাপ্তিদৃশ্য। ‘কার্তিকের ধানি জ্যোৎস্নায়’ যখন ধানের দুধ জমাট হচ্ছে (ওই ধান পাকলে তবেই চ্যারকেটুর পরিবারে স্থিতি আসবে) তখন চ্যারকেটু চ্যারকেটু সমেত গরুটি ছুটে বেড়াতে থাকে। আখ্যানের শেষ বাক্যে মুক্তসমাপ্তির ইঙ্গিত, যেখানে চ্যারকেটুও কেলু ও বাঘারুর মতোই হাঁটতে থাকে ‘দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে’। বৃত্তান্তের একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়ে যাচ্ছে মুখ্য কুশীলবের অনন্ত হাঁটার ইঙ্গিতে। তা কি জীবনের বিশালতার দিকে ইঙ্গিত করে না? কেলু-বাঘারু-চ্যারকেটুদের হেঁটে যাওয়া তাদের মতোই ভারতবর্ষের আরও অনেক মানুষের হেঁটে যাওয়া ও আখ্যানের বদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে না? দেবেশ রায়ের উপন্যাস-দর্শন এই মুক্তসমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড চলমান জীবনকে আখ্যায়িত করতে চায়। তাঁর মতে প্রতিটি উপন্যাসে উপন্যাসের নতুন ফর্ম তৈরি হয়। উপন্যাসিক যেভাবে আখ্যানকে (ন্যারেটিভ) ধরেন, তার ওপরে নির্ভর করে উপন্যাসের ফর্মটি আকার পায়; এই আকারটিই হচ্ছে বিষয়।³⁴⁶ বাঘারু, অগাস্টাস মুণ্ডা ও কেলুদের অন্তহীন হাঁটার মুক্তসমাপ্তির পরে লেখককে বারবার আখ্যানের সঙ্গে নিজের বিযুক্তি ঘোষণা করতে হয়। ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ উপন্যাসেও এরকমই মাঝপথে উপন্যাস ছেড়ে বেরিয়ে যান। “এই নভেল থেকে এখানেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি। নিচু-জাতের

এমএলএ-দের যোগ্যতা প্রমাণ করা এবং আমার স্বার্থ ছিল ছোটজাতের সম্মান বাড়ানো। খুব কম দিনেই তা হয়ে গেল। সে সব কারণেই আমি এখন এই নভেলটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।” (রায় ২০১০, ১০৪৮) ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের সন্ধানকে উপন্যাসের মূল সাধনবস্তু ক’রে তুলতে চেয়েছিলেন দেবেশ- যোগেন মণ্ডল সেই সাধনার এক উল্লেখযোগ্য ফলাফল। যোগেন মণ্ডল এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যোগেন মণ্ডলের রাজনীতি ও তাঁকে ঘিরে আবর্তিত রাজনীতি এই আখ্যানের মূল কাহিনি, এবং ভারতভাগের আগের-পরের কয়েকবছরের বঙ্গদেশ এই উপন্যাসের কালস্থান। কিন্তু উপন্যাসটি কি শুধুই জীবনীমূলক উপন্যাস অথবা ‘ব্যক্তি’ যোগেন মণ্ডলের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করার জীবন-বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস অথবা এক ঐতিহাসিক কালখণ্ডে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির অতীতছায়ার স্মৃতিরোমন্থনকারী ঐতিহাসিক উপন্যাস? না, এর কোনওটাই না। এটি প্রায় মহাকাব্য যা একইসঙ্গে উপন্যাস এবং সমকালীন ইতিহাস, কিন্তু তা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বারবারা ফোলি সাম্প্রতিক তথ্যনির্ভর উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক ও তথ্যভিত্তিক উপন্যাসের ব্যাপারে দু’টি পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাস ক্রমেই আধি-ঐতিহাসিক (metahistory) উপন্যাস হয়ে যাচ্ছে। তথ্যনিষ্ঠতা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) সমস্যাগুলি তুলে ধরছে; “it no longer reinforces the selfevidence of the text's representation of a particular moment in the historical dialectic.”³⁴⁷ দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুগে কাল্পনিক আত্মজীবনী-র (fictional autobiography) পোশাকে ছদ্মতথ্যভিত্তিক উপন্যাসের প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে। “Where the eighteenth-century pseudofactual novel featured a clear disjunction between the perceptual stances of author and character, the fictional autobiography poses a differentiated but essentially nonironic relation between the two discourses.”³⁴⁸ দেবেশ এই দু’টি প্রবণতার কোনওটির ফাঁদেই পড়েননি। যোগেন মণ্ডল এক বিশেষ সময়ের বিশেষ রাজনীতির সাক্ষ্য বহন

করেন। এই রাজনীতিকে কেন্দ্রীয় ভাবনায় এনে সাহিত্যরচনায় অনাগ্রহী ছিল প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিকরা এবং ঔপনিবেশিক রাজনীতিতে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব উচ্চবর্ণের মাথাব্যথার কারণ ছিল। যোগেন মণ্ডল নমঃশূদ্র নিম্নবর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তৎকালীন বিধানসভায় ভোটে জিতে নিম্নবর্ণের সম্মান আদায়ের জন্য লড়াই করেন। ১৯৩৭ সালে ‘বরিশালের মেগাস্থিনিস’ যোগেন বিধানসভার আসনে জেতেন এবং উচ্চবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখেন। এগুলি ইতিহাসের তথ্য, ইতিহাসের বই ঘাঁটলে এই তথ্য ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উত্থানে আতঙ্কিত উচ্চবর্ণ-হিন্দুদের বয়ানগুলির খোঁজ মেলে। দেবেশ এই উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়ে দেন যে, ইতিহাসের বিস্মৃত চরিত্র যোগেন মণ্ডলকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসলেখকেরা স্থানীয় ইতিহাসের ফুটনোটেও স্থান দেননি; আর, এই বিস্মরণের পেছনে সচেতন রাজনীতি রয়েছে।³⁴⁹ দেবেশ তাই শুধু যোগেনের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে চাননি, বরং সেই রাজনীতির কথা লিখতে চেয়েছেন। উচ্চবর্ণের রাজনীতির সঙ্গে যোগেনের সংঘাতের ইতিহাস রয়েছে, ভবিষ্যতও রয়েছে। দেবেশ তা লিখতে চেয়েছেন বলেই যোগেন মণ্ডলের চেতনার কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছে। নিছক ইতিহাসের দলিল, নিছক রাজনৈতিক তথ্যের ভিড় এমনকি স্রেফ জীবনীগ্রন্থ নয় বলেই যোগেনের চিন্তাস্রোতে আর স্বগতবাচনে দলিত-রাজনীতি মিশে যায়। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই ‘কাল্পনিক’ পরিসরে পৌঁছানো সম্ভব নয় এবং জীবনীকারের পক্ষে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এত গুরুত্ব ন্যস্ত করা সম্ভব নয়- দেবেশ উপন্যাসের ভাষা তৈরি করছেন রক্তমাংসের যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাস ও সাহিত্যের সত্যকে মিশিয়ে। কলকাতা কর্পোরেশনে ধাঙড়দের প্রতিবাদী মিছিল ঐতিহাসিক তথ্যের সত্য; প্রায় কুড়ি হাজার ধাঙড়ের মিছিল-হরতালের পরে মধ্যপদস্থ কেরানী এবং কর্পোরেশন ইন্সকুলের শিক্ষকদের হরতালও ইতিহাসের সত্য। কিন্তু, উপন্যাসের সত্য হয়ে ওঠে যোগেন মণ্ডলের ভাবনার সঙ্গে কথকের কথন। সেই কথন ভদ্রলোক বাবুশ্রেণির ‘এজেন্সি’কে নাকচ করে। যোগেন মণ্ডলের ভাবনাস্রোতের বিপরীতে ‘যোগেন জানে না’ বাক্যাংশ জুড়ে দেয় কথক। কর্পোরেশনে মোট ধাঙড়ের সংখ্যা কত, তা যোগেন জানতেন না। কথক আর যোগেনের স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়-

“বাবুদের হরতাল বাবুদেরই হরতাল। বাবুদের জোর আর দিমাক, আমাদের জোর আর দিমাক আলাদা। আমরা আমাদের জোর আর দিমাক দিয়ে হরতাল শুরু করেছি। সেই হিসাব নিয়েই শেষ করব। বাবুদেরও সেই আজাদি” (৭৮৩) যোগেন মণ্ডলের আখ্যান সমগ্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। প্রচলিত গল্পের মাধ্যমে বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের কাহিনি যেমন থাকে, তেমনই পরিসংখ্যানের উল্লেখ থাকে।³⁵⁰ কেলুর চিন্তাস্রোত এবং কথকের কথনেও ‘বাবু’দের সঙ্গে এই বিযুক্তি থাকে। গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্যে ময়দানে হরেক মানুষের মেলাতে চালচুলোহীন কেলুর মিশে না-যাওয়ার সাথে বাবুদের ভিড়ে না-মিশে যাওয়ার পার্থক্য উল্লেখ করে কথক। গঙ্গাসাগরযাত্রীদের মেলা অনভিজাতদের, নিম্নবর্ণের ভিড় সেখানে বেশি। বাবুদের আচরণ, পোশাক, বাগভঙ্গি, উদ্দেশ্য কিছুই সেই বৃহত্তর ভিড়ের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না, এই বিশ্বাসটি পাঠকের মনে গেঁথে দেয় কথক। “বাবুরা মিশ না খেলেও বাবুদের ঘিরেই ভিড় থাকে। কেলু মিশ না খেলে কেলু ভিড়ের বাইরে পড়ে যায়, বাইরের থেকেও বাইরে” (৪৯৪) ভিড়ের মানুষদের থেকে সামাজিক অবস্থানে বাবুরা উচ্চবর্ণের আর কেলু সেই নিম্নবর্ণের সামাজিক অবস্থানেরও নিচে অবস্থান করে। এই ‘বাইরের থেকেও বাইরে’ বাক্যাংশটি বাঘারুণ ক্ষেত্রে এবং চ্যারকেটুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সেটা ওই দুই বৃত্তান্তের কথক বলে দিয়েছে। আর, এই বাক্যাংশটি কেলুর স্থিতি টালমাতাল ক’রে দেয়, কেলু-বাঘারু-চ্যারকেটুদের সঙ্গে প্রথাগত প্রোটাগনিস্টদের দূরত্বও নির্দেশ ক’রে দেয়। আর, এই বাক্যাংশটি কি আখ্যানের চেনা কেন্দ্র-প্রান্ত ছককেও প্রত্যাহ্বান জানায় না? এতদিনের কেন্দ্র-প্রান্ত সমালোচনাতত্ত্ব বিপন্ন হয় যখন ‘বাইরের থেকেও বাইরে’ অবস্থান সূচিত হয় কেলুদের। বৃত্তান্তের প্রোটাগনিস্টরা যদি প্রান্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে কেন্দ্রই বা রক্ষা পায় কী করে? রাজনীতির নিয়ন্ত্রা উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে “যোগেন মণ্ডল ঢুকে পড়ল ইতিহাসের ভিতরে” (১৩৬) আর, সেই যোগেনই নভেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ১০৪৮-তম পৃষ্ঠায় পৌঁছে। যোগেন মণ্ডলের আখ্যান ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের রাজনীতিকে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে আনে।

বহুআলোচিত হিন্দু বনাম মুসলিমের বয়ানের বাইরে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বয়ানও যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কথক তার বিবরণ দিয়ে যান। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে তাঁর দীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল লড়াই ট্রাজিক পরিণতি পায় পাকিস্তানের জিন্মা সরকারের শাসনে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে পূর্ব পাকিস্তানের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রয়ে যাওয়ার খেদ বড় হয়ে ওঠে; ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’-এ যোগেনের বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়- জিন্মার দেওয়া আশ্বাসে আস্থা রেখে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নিম্নবর্ণ-হিন্দুদের নিরাপদভূমির যে খোয়াব দেখেছিলেন যোগেন, তা ধূলিসাৎ হয়।³⁵¹ যোগেনকে জন্মভূমি ছেড়ে বাধ্যতঃ চলে আসতে হয়। ‘খোয়াবনামা’-তে বৈকুণ্ঠ গিরি উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ইতিহাসবোধকে প্রত্যাশ্বান জানিয়েছিল এককালে, শতকপূর্বের সমন্বয়স্মৃতিচারণে বৃন্দ হয়ে থাকত; কিন্তু নবগঠিত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু বৈকুণ্ঠ খুন হয়ে গেছিল। যোগেন কোনওভাবেই বাঘারু নয়, তার রাজনৈতিক সচেতনতা ও অবস্থান এক্ষেত্রে তুলনার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু, বাঘারুর চিন্তাস্রোতে প্রকৃতি আধিপত্য করে, তার উপমায়-ভাষাব্যবহারে প্রাকৃতিক অনুষ্ঙ্গ এসে পড়ে; যোগেনের চেতনাস্রোতেও প্রকৃতি প্রাধান্য পায়। ধাঙড়দের মিছিলে ‘প্রায় পুরো সমাবেশটারই খালি উর্ধ্বাঙ্গ প্রায় নেংটিমত কিছু পরা’ অবয়ব দেখে যোগেনের মনে হয় মানুষের নদী- কথক যোগেনের এই নদীনির্ভর উপমার ব্যাপারে পাঠককে সচেতন করে দেন এবং একইসাথে যোগেনের চিন্তাস্রোতে ‘পাথরের নদী’-র উপমাবদল অনুভব করতে পারেন।³⁵² ইতিহাস এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কিন্তু উপন্যাসের শিরদাঁড়া ইতিহাস-অতিক্রান্ত দেশ-কালে বিধৃত জীবনের সন্ধানে। একইসঙ্গে এই উপন্যাস জাতীয়তাবাদের আধিপত্যকারী বয়ানগুলিকে (narrative) প্রত্যাখ্যান করতে করতে এগোয়। যোগেন মণ্ডলের শূদ্র পরিচয়ের মাহাত্ম্য ভদ্রলোকীয় বয়াননির্মাণকে প্রত্যাশ্বান জানায় বলেই দেবেশ তাঁকে বিস্মৃত ইতিহাস থেকে তুলে এনে একুশ শতকে তাঁর রাজনৈতিক সন্ধানে ব্রতী হন। আর, যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক সাফল্য-ব্যর্থতা ইদানীংকালের ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক সূত্রগুলিও ধারণ করে।

‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ আরও একটি স্পষ্ট পার্থক্য নির্মাণ করে আখ্যানের বিষয়বস্তু ও ভাষায়। আইন, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন ও প্রশাসকের সঙ্গে নিম্নবর্গের দূরত্ব। আখ্যানটি রাজনৈতিক আখ্যান হয়ে ওঠে এই দূরত্বের গভীর পর্যবেক্ষণে। প্রথম পর্যবেক্ষণ পাড়ারিয়া গ্রামে গণধর্ষণের পরে বিচারব্যবস্থা এবং নিম্নবর্গের ধর্ষিতা নারীদের দূরত্ব; উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রশাসন ও ন্যায়বিচারের দূরত্ব। আর, দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটি আসে কলকাতা শহরে কেলুর সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার দূরত্বের মধ্যে দিয়ে। শহরে আদবকায়দা, আধুনিক ভাষা-আচরণ এবং নাগরিক সামূহিক বৃত্ত থেকে কেলুর অবস্থান এতই দূরে যে কেলু না-সত্তা বলে প্রতীয়মান হয়। যে পুলিশ-প্রশাসন তাকে একসময় ‘স্টোনম্যান’ প্রতিপন্ন ক’রে সত্তা বানাতে চেয়েছিল, তারাও কেলুর ভাষা-আচরণ-উদ্দেশ্যকে চেনা খাঁচে ফেলতে না পেরে তাকে না-সত্তা বিবেচনায় অবজ্ঞা করে। কেলুর বিযুক্তি বোঝাতে কথককে কিছু উপমা ব্যবহার করতে হয়। “যেমন মাসের পর মাস কলকাতার অভ্যন্তরে থেকেও কলকাতার বাইরে পড়ে যেতে হয়, যেমন সে হাসপাতালের রোগী হয়েও রোগী থাকতে পারে না, যেমন তার হাতে পাথর আর রক্তের ছোপ থাকলেও সে স্টোনম্যান হতে পারে না” (৫৩২) কেলু ‘স্টোনম্যান’ শব্দের অর্থ-দ্যোতনা বুঝতে না পেরেও স্টোনম্যান হতে চায়, কারণ কাগজ ও প্রশাসনের বানিয়ে তোলা এই শব্দটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে তার জীবনে সামান্য নিশ্চয়তা আসবে। নিম্নবর্গের সঙ্গে প্রশাসনের দূরত্ব ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসেও প্রতীয়মান, উনিশশো সত্তরের দশকের বাস্তবতায়। জোতদার প্রতাপের দাপটে ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গের কাছে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধে পৌঁছতে পারে না। ক্ষমতাকাঠামোর ওপরতলায় থাকা প্রতাপকে সেচের জলের টাকা, দুর্গত কৃষকদের নিমিত্ত শস্যবীজ-খাদ্যশস্য ও ঔষুধ দেয় প্রশাসন যাতে সে খেতমজুরদের মধ্যে বিলিবাঁটোয়ারা করে দেয়। কিন্তু, সেগুলি পীড়িত নিম্নবর্গের কাছে পৌঁছায় না। প্রতাপ জোতদার যে প্রশাসন ও নিম্নবর্গের মধ্যে আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতার দেওয়াল খাড়া ক’রে দাঁড়িয়ে থাকে, তা বোঝাতে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করতে হয় কথককে।³⁵³ প্রতাপ গোলদারের সুপারিশে গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ‘জেতে মুচি’ শিক্ষকের

অপসারণ হয়, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বদলি হয়ে যায়, মন্ত্রী-এমএলএরা তার ঘরে অতিথি হয় এবং বন্দুক-লেঠেলের জোরে শোষণ চালিয়ে গেলেও আইনরক্ষকরা সে সম্পর্কে উদাসীন থাকে। ফলে, নিম্নবর্ণ খেতমজুরদের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক শীর্ষব্যবস্থার দূরত্ব অনপনেয় থেকে যায়; “দশ শতাংশ খেতমজুর বলে, তারা জানে না ভারতবর্ষ স্বাধীন... দশ-শতাংশ বলে ন্যূনতম মজুরীর কথা তারা কখনো শোনেনি” (দেবী ১৯৮১, ৬৭) নতুন লেবর-কমিশনার, ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র সুহাস, ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক- এঁরা প্রত্যেকেই ব্যবস্থার সঙ্গে প্রান্তিক নিম্নবর্ণের ক্রমবর্ধমান দূরত্বের দর্শক; কিন্তু এঁরা কেউই সেই ফাঁক মেটাতে পারে না। সরকারি দলিল-নথি-টিপছাপের মধ্যে দিয়ে যে উপরতলের সত্য দেখা যায়, তা আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রকৃত প্রতিফলন নাও হতে পারে। ওই ব্যবস্থায় নিষ্পেষিতদের সত্য তারও অনেক গভীরে। ইংরেজি-জানা, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব সুহাস-শ্রম আধিকারিক আর্থ-রাজনৈতিক ফাঁকপূরণ করতে পারেন না, বরং নিজেরাই অস্তিত্বশীল ব্যবস্থার অংশীদার হয়ে যান অথবা সেটার দ্বারা আক্রান্ত হন।³⁵⁴ লেখক ও কথক প্রকৃত বাস্তবতার সত্যের সঙ্গে উপরিতলের বাস্তবতার ফারাক বোঝাতে কালী সাঁতরা নামক অন্যতম প্রধান চরিত্রকে হাজির করেন। আখ্যানে কালীর স্বরের মূল্য যথেষ্ট, অনেকক্ষেত্রে কালীর চিন্তাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কথকের স্বর তাকে ন্যায্যতা দেয় এবং শাসক-মতাদর্শ বনাম শাসিত-মতাদর্শের দ্বন্দ্ব কালী সাঁতরা শাসিত-মতাদর্শের সহমর্মী হিসেবে আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তবুও, ভদ্রলোক-শিক্ষিত এবং আদিবাসি খেতমজুরদের প্রতি সহমর্মী কালী সাঁতারার সঙ্গে আদিবাসী চেতনা-বাস্তবতার দূরত্ব যে থেকেই যায়, তা জানিয়ে দেয় কথক। “কালীর এই বোঝার চেষ্টা খুবই আরোপিত ব্যাপার... আদিবাসী হয়ে কেউ যদি জন্মায়, তবে সে বঞ্চনাবোধ নিয়ে জন্মায়, তার শরিক আপার কাস্ট কোনো বর্ণহিন্দু হতে পারে না” (১২৮) কেলু হয়ে কেলুকে বোঝা, চ্যারকেটুর মতো প্রান্তিকতম ভূমিহীন খেতমজুর হয়ে চ্যারকেটুকে বোঝা কিংবা রাধিয়া-ভগবতী-নিমিয়া হয়ে তাদের বোঝা ওপরতলার শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গের প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব না। তাই, ‘দ্রৌপদী’ গল্পের অর্জন সিং যেমন আদিবাসীদের গেরিলা-প্রতিরোধকে

সামরিক-পাঠ্যের কপিবুক কৌশলে মেলাতে পারে না, ভদ্রলোক-ক্যাডার কালী সাঁতরা যেমন নিজের সৎ-সাবমিসিভ-পার্টিনিষ্ঠ তাত্ত্বিক নীতির সঙ্গে বসাইকে মেলাতে পারে না, তেমনই আদালতের বিচারপতি রাধিয়া-ভগবতী-নিমিয়াদের ধর্মণের বাস্তবতায় পৌঁছতে পারে না। প্রশাসনিক নথি, সরকারি বয়ান এবং আইনি ভাষার মারপ্যাঁচে আটকে গিয়ে ‘ন্যায়বিচার’ শব্দটিকে বাস্তবতাহীন ক’রে তোলে আরও।

ন্যারেটিভ বা আখ্যান শব্দটির অর্থের সঙ্গে ওতপ্রোত ‘বলা’ ক্রিয়াপদটি। কী বলা হচ্ছে এবং কীভাবে বলা হচ্ছে এই দু’টিই আধুনিক আলহানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সতীনাথ থেকে মহাশ্বেতা থেকে দীপেন্দ্রনাথ থেকে দেবেশ থেকে ইলিয়াস থেকে নবারুণ থেকে অভিজিৎ সেন থেকে অশোককুমার মুখোপাধ্যায়- এই দু’টি বিষয়ে অহরহ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবের কথাই তাঁরা বলছেন কিন্তু প্রতিবাস্তবের নির্মাণের সন্ধান তাঁরা করছেন। অবভাসের পুরনো ধারণাকে বিনির্মাণ ক’রে আখ্যানের কাঠামো ও স্বরবিন্যাসকেও বদলে দিতে চাইছেন যেখানে ঔপন্যাসিকের সময়-ভাষ্য, ঔপন্যাসিকের প্রতিপ্রশ্ন ও জীবনসন্ধান আখ্যানের নতুন ধরন তৈরি করছে।³⁵⁵ কী বলছে এবং কীভাবে বলছে এই দু’ই প্রশ্নের থেকেও দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, নবারুণ ভট্টাচার্যদের আলোচ্য উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ‘কে বলছে’ সেই প্রশ্নটিও। প্রতিপ্রশ্ন হিসেবে এই বিষয়টি উঠে এসে আখ্যানের স্বরান্তর ঘটানো-স্বরের ভেতর বহুস্বর ও অর্থের ভেতর বহুর্থদ্যোতনা (heteroglossia) তৈরি হয়। “Both art and lived experience are aspects of the same phenomenon, the heteroglossia of word, values and actions whose interaction makes dialogue the fundamental category of dialogism” (Holquist 2002, 111) কেলু বা বাঘার যখন বলছে কিংবা ফ্যাতাডুরা যখন খিল্লির ভাষায় হুজুতে আচরণে কার্নিভ্যাল উদ্‌যাপন করছে কিংবা বসাই টুডু যখন ‘বাবুশিক্ষায় সান্তাল মুতে দেয়’ বলছে, দোপ্‌দী যখন “এখানে কোনো মরদ নাই... লেঃ কাঁউটার কর্” বলছে, তখন কী বলা হচ্ছে ও কীভাবে বলা হচ্ছে-র থেকেও কে

বলছে তথা ‘কে কীভাবে কী বলছে’ তা তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে। আখ্যানের নতুন ধরণ ভাষা পাচ্ছে। আখ্যানস্থ কথকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ- কথক তথ্য দিয়ে কাহিনির বাস্তবতা প্রমাণের চেষ্টা করছে, কথক কখনও শ্লেষময় কথনে পাঠককে বিস্মৃত অতীত ও রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করছে। মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানে কথকের ভূমিকা নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক নয়। আখ্যানের বিবর্তন ও বদল বিষয়ে বলতে গিয়ে রলা বার্থ বলছেন যে, আখ্যান প্রাচীন ইতিহাস থেকে সমস্ত ধরণের মানুষের মধ্যে রয়েছে। মানুষের বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কথন নিরন্তর চলেছে, নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা সংরূপে তা আটকে থাকেনি।³⁵⁶ ওনেগা জেন এবং গার্সিয়া লান্দা যেমন সংজ্ঞায়িত করছেন, “narrative is the semiotic representation of a series of events connected in a temporal and casual way.” (Jaen & Landa 1996, 3) অর্থাৎ আখ্যান হল সংকেতময় উপস্থাপনা- লিখিত বা মৌখিক শব্দ, স্থির বা চলমান দৃশ্য ইত্যাদি সংকেতের মধ্যে দিয়ে কিছু অর্থ তৈরি হয় যার অর্থোদ্ধার/বিসংকেতীকরণ (decode) করে পাঠক/দর্শক। একটি আখ্যান ঘটনাক্রমের ধারাবাহিক উপস্থাপনা করে, যেখানে বিবৃত ঘটনাক্রমের ধারাবাহিকতায় সামঞ্জস্য থাকে। সময় ও কার্যকারণের পরিপূরক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানে, কার্যকারণের অসঙ্গতি কিংবা এলোমেলো সময়পথের হৃদিশ ওই ‘বলা (narration)’ ক্রিয়াপদে বিসদৃশতা এনে দেয়। এই গল্প বলা তথা অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে আখ্যানের সুতো দীর্ঘায়িত করা, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ভাষাতেই এর উপস্থিতি রয়েছে। আখ্যান মানে তা কল্প-আখ্যান (fictional) ও অ-কল্পাখ্যান (non-fiction) দু’ইই হতে পারে- লিখিত বা মৌখিক বা দৃশ্যমাধ্যমে তথ্যাশ্রয় আখ্যান হতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিক/বিষয়ীসত্ত্বাত্মক (subjective) কিংবা তথ্যধর্মী বা কাল্পনিক- আখ্যানের পরিসর সুবিস্তৃত ও বিবর্তনমূলক। আখ্যানকথনের দু’ই গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ কাল্পনিক আখ্যান ও অ-কাল্পনিক আখ্যান। সংরূপ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাঠ্যকে (text) বর্গায়িত করার পদ্ধতি। আখ্যানের পদ্ধতিগত পাঠ্যক্রম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল আখ্যানতত্ত্ব (narratology) অর্থাৎ

আখ্যানের গড়ন-গঠন কীভাবে কার্যকরী হয় এবং আখ্যানের সামগ্রিকতাকে তা কীভাবে প্রভাবিত করে। আখ্যানতত্ত্ব সংকেততত্ত্বের পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী, যেখানে চিহ্নক (signs) ও চিহ্নব্যবহার পদ্ধতি (signifying systems) দ্বারা সংকেত-নির্মাণের কাহিনি বিবৃত হয়। আখ্যানতত্ত্ব আখ্যানস্থ সংকেতপদ্ধতি উদ্ধারের চেষ্টা করে, যে পদ্ধতি আখ্যানের কথক ও লেখক এবং আখ্যানের অন্তর্গত পাঠক (implied reader) বহিরস্থ পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে।³⁵⁷

তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস (Docu Novel)

উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, খাঁটি কাল্পনিক-আখ্যান (pure fiction) ধারণা থেকে সরে আসছেন দেবেশ। তথ্য-আখ্যান (Docu fiction) বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে উঠে আসছে। তথ্য-আখ্যান একইসঙ্গে আখ্যানের কল্পনাপ্রবণতাকে প্রশ্ন করে এবং কথকের স্বর ও কুশীলবদের স্বরের ন্যায্যতা (justification) খোঁজার চেষ্টা করে। পাঠককে পাঠমুহূর্তে সচেতন ক'রে দেয় আখ্যানে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে।

It implicitly claims to replicate certain features of actuality in a relatively direct and unmediated fashion; it invokes familiar novelistic conventions, but it requires the reader to accept certain textual elements-characters, incidents, or actual documents-as possessing referents in the world of the reader. (Foley 1986, 26)

তথ্যভিত্তিক উপন্যাস কাল্পনিক আখ্যানের বিশেষ এক ধরণ যেখানে প্রকৃত-তথ্যভিত্তিক আখ্যানে (non fiction) ব্যবহৃত নীতি প্রয়োগ করা হয়। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বারবার এই তথ্য-বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে নির্ভরতাবদলের নীতি কাল্পনিক প্রতর্ক ও অ-কাল্পনিক প্রতর্ককে গুলিয়ে ফেলার

জন্যে নয়, বরং “they point instead to the changing terms of the fictional contract in different social formations.” (Foley 1986, 41) বারবারা ফোলি আফ্রো-আমেরিকান তথ্যাশ্রয়ী-উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন যে, এই উপন্যাসগুলির আখ্যান উপস্থাপনায় বাস্তবতাবাদী ও আধুনিকতাবাদী তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের নীতি অনুসৃত হলেও, তাতে তথ্যায়িত করার এমন পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে বুর্জোয়া আধিপত্য (hegemony) অন্তর্ঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু আফ্রো-আমেরিকান উপন্যাসে তথ্যায়িত অতুল্যলেখের সুস্পষ্ট- কারণ, বর্ণবাদী সমাজে কৃষগঞ্জ প্রটাগনিস্ট ও কৃষগঞ্জ লেখকের পূর্ণপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, ফলে বিষয়ীভূত (subjective) অবস্থান দৃঢ় করতে তথ্য-নথির উল্লেখ জরুরি যাতে সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে পাঠকের সংশয় দূর হয়। সামাজিক বাস্তবতায় নিপীড়িত জাতি-বর্ণের সত্তার মানুষদের উপস্থাপনায় অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে, শাসক-মতাদর্শের বিপরীত মতাদর্শের উপস্থাপনায় ‘বিশ্বাসযোগ্যতা’র প্রশ্ন ওঠে বারবার। সাধারণীকৃত বিষয় ও তথ্যপ্রমাণের (evidence) মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্কে ন্যায্যতা দিতে তথ্যায়িত প্রামাণ্যতা প্রয়োজন; উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাস্তবসম্পর্কিত সত্যোচ্চারণের চেষ্টা বারবার হলেও অনেক সময়েই তা অবজ্ঞাত বা ভ্রান্ত-বোঝাপড়ার শিকার হয়ে থাকে। উপন্যাসের তথ্যাশ্রয় সেই সম্ভাবনাগুলিকে নাকচ ক’রে শাসক-কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করে।³⁵⁸ মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তেও একই উদ্বেগ প্রকাশ পায় কথকের বয়ানে- বসাই টুডুদের বাস্তবতা বৃহত্তর সমাজের কাছে ‘সত্য’ হিসেবে পৌঁছায় না এবং প্রশাসন নিজেদের সুবিধেমতো ব্যাখ্যা রেকর্ড ক’রে রাখে। এমনকি, দুর্ঘটনা থেকে মিছিলে গুলি চালনা থেকে আন্দোলন দমন সব বিষয়েই ‘ট্রুথ অ্যাসাসিনেশন’ পদ্ধতিটি প্রশাসন এবং শাসক-মতাদর্শাবলম্বীদের দ্বারা ব্যবহার্য পদ্ধতি।³⁵⁹ শাসকশ্রেণি এবং ক্ষমতাকাঠামোর ওপরতলায় থাকা শ্রেণির সক্রিয়তায় উৎপাদন-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিন্যাসের ‘সত্য’ কীভাবে পাল্টে যায়, তা কালীবাবু ও বসাই টুডুর সংলাপে তুলে আনেন লেখক। কৃষিক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি (Statutory minimum wage for agricultural labourers) দেওয়ার সরকারি নিয়মের ‘সত্য’ এবং খাতা-কলমের ‘সত্য’ হিসেবে এড়িয়ে ভূস্বামীরা অনেক কম মজুরি দেয় খেতমজুরদের।³⁶⁰ ফলে,

‘বাস্তবতার সত্য’-র অনেকগুলি স্তর ভাগ হয়ে যায়- একটি ভাগে সরকারি খাতা-কলম-নথির হিসেব, আরেকটি ভাগে জমিমালিকদের খাতার হিসেব যেখানে খেতমজুরদের টিপছাপ থাকে এবং খেতমজুর প্রকৃত যতটাকা মজুরি হাতে পাচ্ছেন সেই হিসেব।³⁶¹ আখ্যানস্থ বাস্তবতার বিবরণে দ্রোহী খেতমজুররা প্রতাপ গোলদারের কোষাগার লুণ্ঠের সময় এই বহু-স্তরীভূত সত্যের উন্মোচন ঘটায় পাঠকের সামনে। আরও একভাবে এই সত্যের উন্মোচন হয়- সরকারি নথির সরাসরি উল্লেখ। ১৯৭৪ সালে খেতমজুরি রেট সংশোধন হওয়ার পরে দৈনিক খেতমজুরি কত ধার্য হয়েছে এবং উক্ত সরকারি বিজ্ঞাপনে কীভাবে ‘এগ্রিকালচারাল কনজুমার প্রাইস ইন্ডেক্স’-এর ওপরে ভিত্তি ক’রে মজুরি ধার্য হয়েছে সেটা সরাসরি সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে তুলে দেন লেখক।³⁶² কথকের ভূমিকা কিন্তু এখানেই শেষ হয় না, ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তথ্যের ভুল এবং আদিবাসী খেতমজুরদের বাস্তবতার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ফারাকগুলিও কথক উল্লেখ করে। আধুনিক প্রতিবেদকরা তাঁদের লেখা কাহিনিতে সাহিত্যকৌশল জুড়ে দেন যাতে তার নাটকীয় পরিবেশন হয়। কিন্তু তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসিকেরা সকলের জানা তথ্যগুলি লেখায় ব্যবহার করেন এবং সেগুলিকে বিষয়ীসত্তায় একাত্ম ক’রে ‘অ-সাংবাদিক’ পদ্ধতিতে বিস্তৃত করেন। ফলে সাহিত্যধর্মী প্রতিবেদনের বিষয়ীসত্তাকরণের প্রবণতা যেমন এখন বেড়েছে, তেমনই উপন্যাসের প্রতিবেদনীকরণ (journalization) হয়।³⁶³ বাখতিনের চোখে উপন্যাস হচ্ছে এমন এক সাহিত্যোৎপাদন যা ‘inconclusive present-day reality’ (বাখতিন ১৯৮১, ৩০) প্রকাশ করে। তাঁর কাছে প্রত্যেক উপন্যাসের জরুরি শর্ত বহুস্বরের স্বরসঙ্গতি (polyphony) এবং ফ্লিসের তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস হচ্ছে প্রবহমান ও রূপান্তরযোগ্য ‘textual unit’ উপস্থিতি।³⁶⁴ জেলার পরিদর্শকদের প্রতি ‘রাজনৈতিক সার্কলের নির্দেশ’ ইংরেজি বিবৃতিসহ সরাসরি আখ্যানে উপস্থাপিত করেন মহাশ্বেতা।³⁶⁵ এই বিবৃতিটি না দিলেও আখ্যানের গুণগত মানে কোনও বদল হত না, কিন্তু এই বিবৃতিটি প্রশাসনিক ও উচ্চ-রাজনৈতিক মহলের ভাষার সঙ্গে শোষিত খেতমজুরদের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য প্রকট করে আরও। ‘সত্য নির্মূলীকরণ’-এর যে

পদ্ধতির কথা আখ্যানে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন লেখক, সেই পদ্ধতির বাস্তবতা স্পষ্ট হয় আরও। সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনুশীলিত নীতিতে আদিবাসী খেতমজুররা যে অবজ্ঞাত থেকে গেছিল, সেকথা আরও জোরালো হয়। ‘এম ডব্লু বনাম লখিন্দ’ গল্পের শুরু হয় মৈত্রেয় ঘটকের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করে।³⁶⁶ ‘তথ্যাশ্রয়ী-উপন্যাস’-এর এই আরেক বৈশিষ্ট্য। ‘প্রতিষ্ঠিত’ সর্বজনমান্য প্রবন্ধের অংশবিশেষের উল্লেখ, যাতে আখ্যানের সত্য ন্যায্যতা পায়। আখ্যানের বাস্তবতা বোঝানোর জন্যে লেখক যে কৌশলগুলি প্রয়োগ করেন, তার অন্যতম হচ্ছে তৎকালীন সময়ের (আখ্যানে যে সময়ের কথা) সাংস্কৃতিক চিহ্নকগুলি (marker) উপস্থাপন করা। তাই বসাই টুডু, লখিন্দদের আন্দোলন দেখা হয় একজন হিপি যুবকের দৃষ্টিতে। যুবকটির ‘রক্তের দশকে’ মারিহুয়ানা সেবন, পশ্চিকার্তোর ছবির ফ্রেমের সঙ্গে তুলনা দেওয়া, বসাইকে চে গেভারার সঙ্গে তুলনাদান এবং ‘দিস ইজ রিয়েল মাইরি’ বাচন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ণ আখ্যানটিকে সত্তরের দশকের বাস্তবতায় আলোকিত করে।³⁶⁷ কিন্তু, ‘এগ্রিমেন্ট’, ‘মিনিমাম ওয়েজ’, সরকারি বিজ্ঞাপনের খতিয়ান সরাসরি উল্লেখে আখ্যানের সত্য ও বাস্তবের সত্যে সামঞ্জস্য পাকা হয়। মৈত্রেয় ঘটকের প্রবন্ধের না-কাল্পনিক সাহিত্য (nonfiction) এবং মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের (fiction) মধ্যে আদানপ্রদান চলে- পশ্চিমবঙ্গে ন্যূনতম খেতমজুরি অনুশীলিত হচ্ছে না এই আর্থ-রাজনৈতিক সত্যের উন্মোচন হয়ে চলে আখ্যানটি জুড়ে। নবাবুণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে কোবা যে সময়ে রয়েছে, তার বাস্তবতা বোঝাতে হেভি-মেটাল ব্যান্ড এবং সংস্কৃতির কিছু চিহ্নকের উল্লেখ করেন নবাবুণ। কোবার বাস্তবতায় নন্দন বাগচী-লু হিল্ট-অমিত দত্তদের ‘হাই’, ‘শিভা’, ‘ফারেনহাইট’ ব্যান্ডের সংস্কৃতি, মারুতি গাড়ি, বিশ্বায়নী প্রভাব, এপিডিআর ইত্যাদি ঢুকে পড়ে। কৌশিক-মেখলা-পার্থ-কোবা-বসাক এদের প্রত্যেকের বাস্তবতায় নব্বই দশকের চিহ্নকগুলি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যতিক্রম রণজয়। তার চেতনাস্রোতে ও আচরণে সত্তর দশকের চিহ্নকগুলি আধিপত্য করে, কমিউনিস্ট পাঠধারা আধিপত্য করে। ফলে, উপন্যাসের আখ্যানকে টুকর টুকরো অংশে ভেঙে নিতে হয় লেখককেও। কথককে ওই টুকরো টুকর অংশগুলি জুড়ে

জুড়ে এগোতে হয়। আখ্যানের দুই বিপ্রতীপ টানের টানাপড়েন চলতে থাকে বলেই, কিছুতেই নির্দিষ্ট একটা সময়ে থিতু হতে পারে না। “সময় বলতে আমরা যা বুঝি, তা আসলে সামাজিক সময়। আবার পাশাপাশি এও সত্য যে, ব্যক্তিগত একক সময়ের প্রতীতিও সম্ভব। এবং সামাজিক সময়ের সঙ্গে তার অনন্বয় ও সংঘর্ষ কখনো কখনো অনিবার্য” (ভট্টাচার্য ১৯৯৯, ১০৪) এই উপন্যাসে সময় কিছুতেই রাজনীতি ছেড়ে বেরোতে পারে না। এপিডিআরের বই থেকে তথ্য-বিবরণ পেশ হয় সেতুবন্ধন করতে এবং বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে সময়ের রাজনীতিকে উন্মোচন করতে। কোবা, মেখলার মতো ‘অরাজনৈতিক’ কুশীলবরাও ঐ রাজনৈতিক সময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কলকাতায় লুকোনো রাইফেল খুঁজতে এসে রণজয়ের সঙ্গে মিলনের সাক্ষাৎ ঐ রাজনৈতিক সময়ানুসন্ধানের ইঙ্গিত করে এবং দু’টি দশকের ব্যবধান অতীব প্রকট হয়ে যায়। যে টেকনেমের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছিল নব্বই দশকের বাস্তবতায়, সেই টেকনেমে রণজয়কে ডাকে সুশীল। সুশীলের সঙ্গে কথোপকথনে সত্তর দশকের বিপ্লবমুখর সময়কে অন্তর্ঘাত করে নব্বই দশকের ফ্ল্যাটবাড়ি-উঠে-যাওয়া নিরাপদ সময়।³⁶⁸ ‘মিলনদা, পুরনো লোকেরা চিনতে পারলে অসুবিধে হতে পারে’ এবং মদন-আশু-রাইফেল সবকিছুর ‘নেই’ হয়ে যাওয়া রণজয়সমেত পাঠককে নব্বই দশকের বাস্তবতায় আছড়ে ফেলে। রণজয়কে দিয়ে যে সময়-অন্তর্ঘাতী নীতি এতক্ষণ লেখক ব্যবহার করছিলেন, এইখানে তার বিপরীত-অন্তর্ঘাতের (reverse-subversion) কৌশল ব্যবহার ক’রে কথক দুই সময়ের দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেন। সত্তর দশক থেকে নব্বই দশকের মধ্যে আদানপ্রদানের মূল ভিত্তি রাজনৈতিক- রাজনৈতিক সময় সেটাই যখন সময়ের সাধারণ অভিজ্ঞান পালটে যায় এবং উজ্জীবনের গান গভীর থেকে উঠে আসে।³⁶⁹ নবাবুণ তাঁর আখ্যানে ডকুমেন্টেশনে বিশ্বাস করতেন- “আর একটা দায় আখ্যানের আছে- সেটা দলিল তৈরি করা, ডকুমেন্টেশন। ‘হারবার্ট’-এ যে দলটার কথা বলা হয়েছে সেই দলটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এই ডকুমেন্টেশনটাও আখ্যান রচনার একটি দায়।” (ভট্টাচার্য ২০০৮, ২৫৪) নবাবুণ ‘হারবার্ট’-এর কুশীলবদের মধ্যে থাকা বিচ্ছিন্ন ইতিহাসকে আখ্যানে তুলে

আনাটা আখ্যানের দায় বলেই মনে করেন। শুধু ইতিহাসের দলিল নয়, রাজনৈতিক দলিলও যে আখ্যান রচনার একটা দায় সেটা নবাবুণের অন্যান্য উপন্যাসে এবং গল্পেও স্পষ্ট। কারণ, আখ্যান শুধুমাত্র ব্যক্তির কাহিনি বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনি নয়।³⁷⁰ তাঁর বহু লেখায় সরাসরি রাজনৈতিক দল সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি ইত্যাদি দলের নামোল্লেখ থাকে। তাঁর ‘কাকতাদুয়া’ গল্পের শুরুতে বলে রাখেন “নির্দিষ্ট ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে ঘটেছে, ১৫ তারিখে... রচনাটির কোনো অংশই কাল্পনিক নয়।” বস্তুতঃ, শুধুমাত্র ‘বানানো’ সাহিত্য লেখার দায়ও যেন তাঁর নয়। বরং, ভারতের ‘স্বাধীনতা দিবসে’ বিহারে দলিত-নিধন ও উচ্চবর্ণ-শ্রেণির আধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তবতাই ভারতীয় সাহিত্যের এতদিনের অনূক্ত কথন। বাস্তবের পর্যবেক্ষণ, কাহিনি ও ‘বানানো’ কাহিনি মিলেই আখ্যানের নির্মাণ।³⁷¹ ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’ গল্পের বাস্তবতা পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো কারখানার। ইউনিয়ন-মালিকের আঁতাত এবং একের পর এক শ্রমিকের অপমৃত্যু, শ্রমিক শোষণ; অথচ গণমাধ্যম সেই শোষণ শক্তিরই অংশীদার। আর, এ গল্পের শেষেও পাঠকের কাল্পনিক গল্পপাঠের মৌতাত ভেঙ্গে নবাবুণ জানান যে, ‘প্রত্যেকটি তথ্য সত্য। মোহিনী মিলের ঘটনাবলীর সূত্র বন্ধু রতন চক্রবর্তীর রিপোর্ট।’ কারণ শাসকদ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের সত্য এবং শ্রমজীবীর সত্য আলাদা; নবাবুণ একজন শ্রমজীবীর সত্যের দলিলীকরণ চান তাঁর আখ্যানে। আর, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সূত্র ধরেই সরাসরি বিদেশি ব্র্যাণ্ড, বহুজাতিক সংস্থার সরাসরি নামোল্লেখ। ‘৯৮৬৪৪’ গল্পে আডিডাস, পুমা, নাইকি, রিবক ইত্যাদির নাম সরাসরি থাকে। সাধারণতঃ কোনো লেখায় ব্র্যাণ্ডের নামোল্লেখ থাকে তার বিজ্ঞাপনী প্রচারের জন্যে অথবা, ‘নঞর্থক উপায়ে বিপণন’ কৌশলের জন্য। কিন্তু, নবাবুণ তা করেন না, বরং সচেতনভাবে তিনি বিশ্বায়নবিরোধিতা ও পণ্যবিরোধিতা করে যান। তিনি যে সময়ের ও ইতিহাসের তথ্যায়নের (documentation) কথা বলেন, সেখানে এই পণ্যগুলি বাস্তব। রাজনৈতিক দলগুলি বাস্তব। সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ। তাদের অনুল্লেখে সময়ের ও ইতিহাসের তথ্যায়ন অসম্ভব। নবাবুণ যে সময়ে ‘হারবার্ট’ নির্মাণ করছেন, সেখানে একদা-বাস্তব সোভিয়েত

অতীত হয়ে গেছে। বিশ্বায়নী আর্থ- সংস্কৃতি দ্বন্দ্বিক প্রকল্পনা নিয়ে ঢুকে পড়েছে মানুষের যাপনে। সুরপতি মারিকের মতো জমি-বাড়ি-ভেড়ির দালাল থেকে বিনিয়োগ-পুঁজিপতি বনে যাওয়া লোকেরা সেই স্থানান্ত্রে জমিয়ে বসেছে।³⁷² যে নকশাল আন্দোলনের সময় বিনু সমীর মিত্রের কবিতা আওড়েছিল, “আমার চোখের সামনে, আমার এতকালের দেখা/ পুরনো দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে...” (৩৩-৩৪) সেই নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরের যে দশক যে সময় তা স্থিতিবস্থার। কমিউনিস্ট দ্রোহের সেটব্যাকের পরে স্থিতিবস্থা ও নিরাজনীতিকরণের আবহ তৈরি করা হয়েছিল শাসক-মতাদর্শের তরফে। দ্রোহপ্রচেষ্টা ভুল, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও অনুশীলনের বিস্তার গলদ রয়েছে, পুঁজির নিয়ন্ত্রণ আর্থ-সামাজিক মুক্তির একমাত্র পথ এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই সমস্ত দেশের একমাত্র বাস্তবতা ইত্যাদি ধারণাগুলি প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছে। অন্যদিকে বিশ্বায়নী উদরনীতিকরণের প্রকল্পগুলির প্রস্তুতি চলছে এবং সামাজিক-অবস্থানের (social status) ধারণায় ওলোটপালট শুরু হচ্ছে। বাঙালির খাদ্যরুচি, সাংস্কৃতিক রুচি ও ভোগ্যপণ্যকামী চেতনায় বদল আসতে শুরু করেছে। শাসক-মতাদর্শ সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে যাতে ষাট-সত্তর দশকের দ্রোহোত্তোল দিনগুলিকে অশান্ত, সন্ত্রাসময়, রক্তঝরা, হিংসাত্মক ইত্যাদি বিশেষণে ইতিহাসিত করা যায়। নবাবুণ এই বাস্তবতার তথ্যায়ন ঘটাতে চান হারবার্টকে কেন্দ্রে রেখে। তাই বিনুর মৃত্যুর পরের শহুরে বর্ণনায় অবশ্যম্ভাবী বিবরণ- “এই ঘটনার পরে যে পচা, বদ্ধ, অকিঞ্চিৎকর কালপর্ব চলেছে তা এতই ক্লান্তিকর যে ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। এবং হারবার্ট কলকাতা শহরের যে খণ্ডের বাসিন্দা সেখানে যুগযুগান্তেও কিছু পাল্টায় কিনা সন্দেহ।” (৩৫) অরূপ কুমার দাসের মতে, ওই ‘পচা বদ্ধ কালপর্ব’-র মধ্যে জরুরি অবস্থার দিনগুলি বা ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট গঠনের দিনগুলিও ঢুকে থাকে বলে ওই বাক্যবন্ধের প্রয়োগ প্রশ্নযোগ্য।³⁷³ কিন্তু নবাবুণের মতো রাজনীতিসচেতন লেখক উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার ক’রে কি এটাই বোঝাতে চান যে, নতুন শাসকের ক্ষময়তায়নের পরেও ‘পচা, বদ্ধ অকিঞ্চিৎকর কালপর্ব’ অবিকল থেকে গেছিল? এর পরের বিবরণে কলকাতার আর্থ-

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বদলের কিছু তথ্য আসে- পুরনো বাড়ি ভেঙে প্রমোটারদের তৈরি বহুতল, ভিডিওর দোকান, রাস্তার বড় বড় গাছ কেটে প্রসারিত রাস্তা, ঠেলাওলাদের আড্ডা উঠে যাওয়া।³⁷⁴ ওই স্থিতিবস্থা তথা পচা বন্ধ কালপর্ব এবং রাজনৈতিক দ্রোহচেষ্টার অনুষ্ণে তুলনা হিসেবে কথক ভূমিকম্পের উদাহরণ দেন। ভূমিকম্পের পরের সকালে ‘ডেকাডেন্ট রাস্তা’ একইরকম নিষ্পৃহ স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু ভূমিকম্পে সবথেকে বেশি আঁচ লেগেছিল ঘুমন্ত ঠেলাওলাদের, যাঁরা ‘ভুঁইডোলারে ভুঁইডোলা!’ বলে একে অপরকে সতর্ক করেছিল। ষাট-সত্তর দশকে কমিউনিস্টদের দ্রোহচেষ্টা ওই ঠেলাওলাদের সমশ্রেণিভুক্তদের মুক্তির উদ্দেশে ছিল এবং তাদের সচেতন করেছিল; স্থিতিবস্থাপ্রেমী উচ্চশ্রেণিভুক্তরা এতে নিষ্পৃহ থাকলেও বা ওই বন্ধ অকিঞ্চিৎকর কালপর্বকে মদত দিলেও দরিদ্র ঠেলাওলারা ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। এহেন রূপকার্থ বর্ণনাকে রাজনৈতিক ক’রে দিতে কথক বলে, “অবশ্য কয়েকবার ভোট হয়েছিল। হারবার্টের তাতে কিছু যায় আসে না। সে কখনো ভোট দেয়নি” (৩৫) প্রথমতঃ সময়ের ও ইতিহাসের তথ্যায়নের দায় নিয়ে আখ্যানরচয়িতা সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিবস্থার (পচা, বন্ধ, অকিঞ্চিৎকর) যোগ তৈরি ক’রে নিলেন। দ্বিতীয়তঃ ওই ‘অবশ্য’ শব্দটির ব্যবহার- অবশ্য অব্যয় পদটির অনেকার্থদ্যোতনার একটি দ্যোতনা হতে পারে ভোটব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা। কারণ আখ্যানকেন্দ্রে থাকা হারবার্ট বিনুর রাজনীতির প্রতি রাজনৈতিক ‘ট্রিবিউট’ দিতে ভোট দেয় না। সময়ের তথ্যায়ন করলেও ‘হারবার্ট’ কিন্তু তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস নয়। যে অর্থে দেবেশ রায়ের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা-নটার সূর্য’ বা নবারুণের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’, সে অর্থে তো নয়ই। রাজনৈতিক তথ্য, সাল-তারিখের উল্লেখ, বাস্তবিক বই থেকে তুলে আনা উদ্ধৃতি ইত্যাদি থাকলেও উপন্যাসের প্রতিবেদনীয়করণ বা প্রতিবেদনধর্মী সাহিত্যের উপন্যাসীকরণ³⁷⁵ ‘হারবার্ট’-এ করা হয়নি। রাশিদ আসকারী ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসকে নব্য ইতিহাসবাদী পঠনের আলোয় দেখতে চেয়েছেন। পাঠ্যকে গোঁড়া আদর্শিক অবস্থান প্রকাশকারী হিসেবে এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশকারী

হিসেবা- এই দুই ভিন্ন নব্য-ইতিহাসবাদী প্রক্রিয়ায় পাঠ করেছেন তিনি। গতানুগতিক কল্পাখ্যানের (fiction) ধারা থেকে ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর গড়ন-গঠন, অবস্থান ও ভাষানির্মাণ আলাদা। বিভিন্ন কুশীলব কাল্পনিক নাম ও পরিচয়ে আখ্যানে উপস্থাপিত হলেও তাদের অবস্থান কাল্পনিক না, ঐতিহাসিক বাস্তবতানির্ভর। ইতিহাসকে গ্রন্থায়িত করার এবং উপন্যাসকে ঐতিহাসিকায়ন করার বিষয়ে জোর দিচ্ছেন রাশিদ।³⁷⁶ ইলিয়াস আখ্যানটিকে কেবল জাতীয়তাবাদী চেতনার গণঅভ্যুত্থান হিসেবে দেখতে বা দেখাতে চাননি বলেই নির্বিত্তের, নিম্নবর্গের চেতনাকে সমান্তরালে রেখেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তের ফ্রেমে কাল্পনিক কুশীলবদের বসিয়েছেন, যারা একইসঙ্গে ইতিহাসের বিশেষ সময়ে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজের স্তরগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে। ঢাকা শহরের অলিগলি, মহল্লা, দোকানপাট ইত্যাদি বাস্তব- ইলিয়াস বাস্তবানুপুঞ্জ বিবরণে জোর দিচ্ছেন; কিন্তু, সেই বাস্তব প্রবলভাবে সম্পৃক্ত থাকছে রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসেও তথ্য-বাস্তব ও কাল্পনিক পরিসর অনায়াসে মিশে যাচ্ছে- দু’টিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় কিন্তু একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় না। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বাস্তবতা থেকে মুখফেরতা আখ্যান এবং প্রজন্মান্তরে প্রবহমান কাল্পনিক কাহিনিগুলিকে পৃথক করা যায় না। ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গামুহূর্তে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র সরাসরি নামোল্লেখ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সরাসরি নামোল্লেখের পাশাপাশি অতীত-বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটানোর কাল্পনিক উপাদানও মজুত রয়েছে। ইতিহাসের বিশাল যাত্রাপথে অসংখ্য কুশীলবের সমাহারে যে আখ্যানের নির্মাণ হচ্ছে, তাতে বৃহৎ ইতিহাস (macro history) এবং ক্ষুদ্র ইতিহাসের (micro history) পরিপূরক পাঠ তৈরি হচ্ছে- এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের অনুপ্রেরণা ইতিহাসের অবশিষ্ট যৌথ মানুষের স্মৃতিকথায়।³⁷⁷ ইলিয়াস নথিবদ্ধ তথ্য, অপ্রামাণ্য কাহিনি এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার সামঞ্জস্যে আখ্যান গড়ে তুলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস-গল্পের যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ্য- (ক) বাস্তবের রক্তমাংসের কোনও মানুষের নাম ও কর্মকাণ্ড সরাসরি তথ্যসহ আখ্যানে উপস্থাপন। (খ) সাল-তারিখের উল্লেখ, যে সাল-তারিখ বাস্তবের পাতা থেকে তুলে আনা; অর্থাৎ পাঠক আখ্যানে উল্লিখিত ঘটনার সাল-তারিখ নিয়ে খোঁজ করলে, তা সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, সর্বজনবিদিত ঘটনা বা সর্বজনমান্য ব্যক্তির জীবনের সাল-তারিখের হিসেব নয়। বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা, ‘তুচ্ছাতিতুচ্ছ’ ব্যক্তি বা নিপীড়িত কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও কাহিনি সাল-তারিখ-প্রামাণ্য তথ্য সমেত আখ্যানে অন্তর্ভুক্তি। (গ) সংবাদপত্রের কোনও খবর বা প্রতিবেদন বা প্রকাশিত প্রবন্ধ সরাসরি আখ্যানে উল্লেখ করা। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ বাস্তবতার ভিত্তিতে, এটা ধরে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। (ঘ) বাস্তবে লেখা কোনও চিঠি, সরকারি বিবৃতি, প্রামাণ্য দলিল, ব্যক্তিগত দিনলিপি অথবা সাক্ষাৎকার সরাসরি আখ্যানে উপস্থাপনা কিংবা কুশীলবদের বাচনে তার ন্যায্যতাপ্রাপ্তি। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’-র মধ্যেও তথ্য দিয়ে আখ্যানের কাল্পনিকতাকে নাকচ করা অথবা কথকের স্বরকে ন্যায্যতা (justify) দেওয়ার চেষ্টা প্রতীয়মান। ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসের আখ্যানপট তৈরির জন্যে সরকারি নথির আশ্রয় নিতে হয়েছে লেখককে। কথকের বয়ান ও আখ্যানের মূল কথক অমূল্য আব্রাহামের কথনে সেই তথ্যাশ্রয়ের ইঙ্গিত থাকছে। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা ন’টার সূর্য (২০১৩)’ এযাবৎ লেখা নকশালবাড়ি-কেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্য-নথি-দলিলের উল্লেখ রাজনৈতিক সংরূপের প্রতি নিষ্ঠ। কল্পনানির্মিত আখ্যান ও কুশীলব-নির্মাণের সমান্তরালে দলিল-ইস্তেহার-চিঠি ও বাস্তবের রক্তমাংসের চরিত্রদের কুশীলব হিসেবে আখ্যানস্থ অবস্থান চিনে নিতে পারেন পাঠক। লেখকের উদ্দেশ্যও হয়তো সেটাই। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখেন,

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি এক বিশেষ ঢং-এ রচিত- যাকে বলা যেতে পারে documentary novel বা তথ্য-নির্ভরশীল ঐতিহাসিক দিনলিপি ও চরিত্রের সঙ্গে

কাল্পনিক ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার একীকরণের রচনামূলক... অশোক সরাসরি উদ্ধৃত করেন সিপিআই (এম-এল)-এর পত্র-পত্রিকা থেকে, সংবাদপত্র ও রেডিওর ঘোষণা বা পুলিশ কর্তৃপক্ষের সরকারি নির্দেশ। এই প্রামাণিক দলিল-ভিত্তিক বিবরণীর গণ্ডি ভেঙে কাল্পনিক চরিত্রগুলি মনোজগতে ডুব দেয়। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩, ভূমিকা)

সমকালীন ইতিহাসের ছবিগুলি পাঠকের সামনে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সেই ইতিহাসকে অস্বীকারের উপায় থাকে না। অশোক নিজে জানাচ্ছেন যে, বহু ঐতিহাসিক চরিত্রের গমনাগমন থাকলেও, তাঁদের চলনের ৯৯% কল্পনাপ্রসূত। যদিও, তিনি দু’টো শব্দ নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন- ‘নকশালপন্থী রাজনীতি নিয়ে তথ্য-উপন্যাস’ এবং ‘নকশালবাড়ির প্রেক্ষাপটে শুধু নয়, তার তত্ত্ব নিয়ে উপন্যাস’।³⁷⁸ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ বাস্তবব্যক্তিত্বের নামের পাশাপাশি ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতির তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের উল্লেখ থাকে।³⁷⁹ কাহিনিগুলি যে কল্পনাপ্রসূত নয় তা পার্টি কংগ্রেসের সাল-তারিখ, পাত্রপাত্রীর বিবৃতি ও দলিল ঘাঁটলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সুমন্ত স্বীকার ক’রে নিচ্ছেন যে, লেখকের রাজনৈতিক অ-নিরপেক্ষতা তথা রাষ্ট্রশক্তি বনাম বিপ্লবীশক্তির লড়াইয়ের আখ্যানে বিপ্লবীশক্তির প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট হয়েছে। তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসে এই পক্ষপাত অস্বাভাবিক নয়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’তেও এই পক্ষপাত স্পষ্ট। লেখক নিজেও তা স্বীকার করেছেন ভূমিকায়। “শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র স্পষ্টতর হচ্ছে। ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষণের সপক্ষে। অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।” (দেবী ১৩৮০, আট) ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যাসের সত্যের দ্বন্দ্বিক বিচার থেকেই মহাশ্বেতার আখ্যানের সত্য নির্মিত হয়। মহাশ্বেতা ঐ উভয় সত্যকেই ভাঙ্গেন ও গড়েন; এবং ঐ দু’ই সত্যের দ্বন্দ্বিক ক্রিয়ার জন্যেই ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘চোড়ি মুগা ও তার তীর’ কিংবা ‘ঝাঁসির রাণী’-র নায়করা মহাকাব্যিক মাত্রা অর্জন করে।³⁸⁰ দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তগুলিতে কথকের স্বরে রাষ্ট্রের প্রতি শ্লেষ, বিচারব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক নৈর্য্যজিক বয়ান এবং শোষিত নিম্নবর্ণের প্রতি

সহানুভূতি গোপন থাকে না। বাঘারু শরীর দিয়ে ব্যারেজ, অর্থনীতি ও উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল; বাঘারু প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে হাঁটুক- এই সঘোষ বয়ান কথকের নৈর্ব্যক্তিকতা ছাপিয়ে বাঘারু পক্ষ নেয়। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে কথকের সহর্ষ উল্লসিত কথনভঙ্গি রাষ্ট্রের পক্ষে নয়। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসে তথ্য-দলিল-বই আখ্যানের কাল্পনিকতাকে প্রশংসা না দিয়ে পাঠকের সামনে কমিউনিস্ট রাজনীতির বাস্তবতা হাজির করে; আখ্যানে বসাক বনাম রণজয়ের মতাদর্শগত সংঘাতের মুহূর্তে রণজয়ের রাজনীতির প্রতি পক্ষানুরাগ স্পষ্ট হয়। লেখক সমাজ-বহির্ভূত নয় এবং লেখক সচেতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সমকালীন পটভূমিতে আখ্যানটি রচিত হলে, লেখক নিজে সেই বাস্তবতায় অস্তিত্বশীল; ফলে, লেখক নিজে সেই বাস্তবতায় ‘নিরপেক্ষ’ অবস্থানে নাও থাকতে পারেন। মহাশ্বেতা দেবী ও নবারণ তাঁদের বহু প্রবন্ধে এমন অবস্থানের কথা সোচ্চারে বলেছেন। লেখক নিশ্চয়ই তাঁর মতাদর্শের প্রচার করবেন না অথবা নিজবিশ্বাসের মতাদর্শ আখ্যানের মধ্য দিয়ে পাঠকের ওপরে চাপিয়ে দেবেন না। কিন্তু, নিজের বাস্তবতার অবস্থানকে আরোপিত নিরপেক্ষতায় সাজিয়ে দেওয়ার দায়ও তাঁর নেই। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শোকমিছিল’ আখ্যানের কথক ও প্রটাগনিস্ট ১৯৬৪-র পার্টিভাগের বাস্তবতায় আহত হয়েছিলেন, তা স্পষ্ট হয়। ‘বিবাহবার্ষিকী’ উপন্যাসে জরুরি অবস্থার ‘সত্য’ আখ্যানের সত্যে রূপান্তরিত হয় এবং প্রটাগনিস্টের আত্মসমালোচনামূলক বয়ান পক্ষ নেওয়াকে জরুরি মনে করে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বাস্তবের নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ লেখকের কাছে যথেষ্ট নয়। এই উপন্যাসেও ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র প্রতিবেদন, কুট্রির ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) এবং রেডিওর ভাষণ তথ্য হিসেবে আখ্যানের কাল্পনিক পরিসরকে আক্রমণ করে। তাতে ইতিহাসের বড় সময়ের সত্যের সঙ্গে ছোট সময়ের সত্যের³⁸¹ সাযুজ্য রক্ষা পায়। রাজনৈতিক আখ্যানের ক্ষেত্রে তথ্য-আখ্যানের প্রয়োজনীয়তা কি আরও বেশি? উত্তর-সত্য জমানায় ফিকশন, ইতিহাস ও ট্রুথক্লেইমের মধ্যে সীমারেখাগুলি ঝাপসা হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ইতিহাসকে ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারী ক’রে তোলা হচ্ছে অথবা শাসক-মতাদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ‘সত্য’ বানিয়ে তোলা হচ্ছে

আখ্যানে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র এক্ষেত্রে শাসকের বড় হাতিয়ার, যাতে শাসিত জনগণের চেতনাকে বানিয়ে নেওয়া যায়। তথ্য-আখ্যানে কাল্পনিক ‘গল্পের গরু গাছে তোলা’র মাত্রা কম হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, কুশীলবেদের বাচনে বা ঘটনার বর্ণনায় এটা জাস্টিফাই করা যাবে না। নকশাল আন্দোলন নিয়ে শাসক-মতাদর্শের অনুসারী এত আখ্যান লেখা হয়েছে যে নকশাল আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পরে কোনও পাঠকের কাছে আন্দোলনের রাজনৈতিক সত্যতা বহু ধোঁয়াশার বহু মিথের ও বহু অবাস্তব বয়ানের জগাখিচুড়ি উপস্থিত করেছে। কিছু পুনরুৎপাদিত খাঁচায় বাণিজ্যিক সাহিত্যে নকশাল আন্দোলন নিয়ে উপন্যাস-গল্প লেখার প্রবণতা স্থায়ী হয়ে গেছে। নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং তারই একটি ধারাবাহিকতা সিপিআই (মাওবাদী) পার্টিকে নিয়ে চলচ্চিত্র বানানোর ধুম পড়ে গেছে বিগত দশক জুড়ে। যে চলচ্চিত্র বা ওয়েব-সিরিজ বা সাহিত্যে রাষ্ট্রের চোখ দিয়ে দেখা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিভিন্ন পার্মুটেশন-কম্বিনেশনে পুনঃপুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকদিন মিথ্যার বীজবপন হচ্ছে যে বীজ থেকে আমাদের চেতনার জন্ম হচ্ছে- প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র মিথ্যে থেকে সংবাদপত্রের মিথ্যে, বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের বানানো খবর বা সাহিত্য-চলচ্চিত্রে পরিবেশিত সংবেদী ভুয়ো আবেগ প্রতিদিন আমাদের যাপনকে ছেয়ে ফেলছে।³⁸² অধিকাংশের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হিংসাকে ন্যায্যতা দিতে সশস্ত্র কমিউনিস্টদের প্রতিরোধকে ‘বেপথু/বিপথগামী’ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে; অনেকগুলি চলচ্চিত্র ও ওয়েব-সিরিজে নিরাজনীতিকে (depoliticization) প্রতিষ্ঠিত করতে রাজনৈতিক পাঠ থেকে উদারনৈতিক পাঠে (liberal text) পর্যবসিত করা হচ্ছে। নবাবু নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমস্ত শহীদ ও শাহাদাতের ঘটনাবলী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শাসক দ্রোহের প্রকৃত ইতিহাসকে গুলিয়ে দিতে চায়, বিজিতের ঐতিহাসিক সত্যকে মুছে দিতে চায় এবং ইতিহাসে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ‘নন-পার্সন’ ক’রে দিতে চায়।³⁸³ নবাবু তাই এপিডিআরের বই থেকে সরাসরি তথ্য তুলে আনেন, নাম তুলে আনেন এবং ঘটনার বিবরণ তুলে আনেন। কখনও কোবা বলে বা কখনও কথক। কিন্তু, তাতে রাষ্ট্রীয়

সম্ভ্রাসের ভয়াবহতা অন্যান্য আখ্যানের থেকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। লেখক সবসময়েই পাঠ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চায় পাঠককে। অর্থাৎ, উপন্যাসের কাহিনি ‘সত্য’ এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা প্রতিটি আখ্যানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এপিডিআরের বইয়ে উল্লিখিত ঘটনার পুনরুল্লেখ সেই বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ট্রুথক্লেইমকে ন্যায্যতা দেয়। নবাবুগের আরও একটা লক্ষ্য ছিল- একুশ শতকের পাঠকদের কাছে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে প্রাসঙ্গিক ক’রে রাখা। “বলার চেষ্টা চলছে মতাদর্শের যুগ শেষ, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের যুগ শেষ- এখন চলবে করপোরেট ডেমোক্রেসির খেলা।” (ভট্টাচার্য ২০১৫, ৮২) স্বনির্মিত বাস্তবতায় রণজয় কোবার সঙ্গে কথা বলে- আসলে রণজয় প্রকৃত পাঠকের (real reader) সঙ্গে কথা বলে- প্রকৃত লেখক (real author) মার্ক্সবাদী সাহিত্যভাণ্ডার ও তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের খোঁজ কোবার বকলমে পাঠককে জানিয়ে দেয়। নবাবুগ এমন এক সময়ে সাহিত্যরচনা করছেন, যখন সব বন্ধ পচা জলার মতো হয়ে আছে। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসে শুধুমাত্র ফ্যান্টাসি বা কল্পপ্রবণতাকে গুরুত্ব দিলেই চলে না, খেয়াল রাখতে হয় তথ্য ও প্রামাণ্য ইতিহাসের সাল-তারিখ। ইতিহাসের বই, বিস্মৃত সাহিত্যভাণ্ডার ও অসংখ্য বাস্তব নামের সমাহার সেখানে। কমরেড আচার্যর সঙ্গে স্তালিনের কথোপকথন অবশ্যই ফ্যান্টাসি, তাতে কালস্থানের যুক্তিগ্রাহ্য হিসেব গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, সেখানে স্তালিন কমরেড আচার্যকে ধমকাতে গিয়ে যে তথ্যগুলি দেয়, তা ইতিহাসসম্মত। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, স্মিরনভ অর্থাৎ যাঁরা কোনও-না-কোনও সময় স্তালিনের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের পরিবারসমেত হত্যা করার সাল-তারিখ-বয়েসের তথ্য। “১৯৩৬ সালের ২৪শে আগস্ট কী হয়েছে, জানিস?” (২৬১) এই প্রশ্নটা কমরেড আচার্যর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের প্রতিও করা হয়। আর, প্রকৃত পাঠককে (actual reader) প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উহ্য পাঠককে (implied reader) প্রশ্ন করার ধরণধারণ সমগ্র পাঠ জুড়ে থাকে। এই সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিস্মৃত ইতিহাস, বিস্মৃত লেখক এবং বিস্মৃত সংস্কৃতি³⁸⁴। উহ্য লেখক (implied author) পাঠককে স্মৃতিকামুক (nostalgic)

ক’রে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে একাজ করে না, বরং ইতিহাসবোধ সম্পর্কে সচেতন ক’রে দেয়। দাঁড়কাকও জোব চার্নকের ‘প্রকৃত সত্য’ বিবৃত ক’রে কিউরেটরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে মিথ-গালগল্প সম্পর্কে সজাগ ক’রে দেয়। ঔপনিবেশিক আদেখলামির (colonial hangover) মিথ্যে গালগল্পের মোহাঞ্জন কাটিয়ে তথা ঔপনিবেশিকদের দ্বারা ছড়িয়ে দেওয়া জনপ্রিয় গল্পের আবরণ ভেদ ক’রে উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ তুলে ধরছে। “পাঠককে জেগে থাকতে হবেই। সাহিত্য নামধারী বিশাল জঞ্জালের পাহাড় থেকে একটি কুটোও যেন না হারায়।” (২৪৮) পাঠককে জাগিয়ে রাখার জন্য বেগম জনসন দু’শো বছর আগের কবর থেকে উঠে আসেন, দাঁড়কাক তথ্যভাণ্ডার খুলে ধরেন ফ্যাতাডুদের (এবং, পাঠকের) সামনে এবং পাঠকের সামনে বিস্মৃত কিন্তু একদা-বাস্তব ঘটনা-সাহিত্য-ব্যক্তিরাজি হাজির হন। ইতিহাসের সত্য, তথ্যের সত্যের সঙ্গে আখ্যানের সত্য, উপন্যাসের সত্যের নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলে; ইতিহাসের সত্যকে উপন্যাসের সত্যে রূপান্তরিত করেন দেবেশ, মহাশ্বেতা, নবারণ ভট্টাচার্যরা। আর, এখানেই প্রশ্ন আসে, এই ‘সত্য’ কি সমাজের সমস্ত শ্রেণি আর সামাজিক স্তরের মানুষের কাছে এক ও অভিন্ন? কোনও এক নির্দিষ্ট কালস্থানের বাস্তবতাকে আখ্যানস্থ ক’রে লেখক সেই সত্যে পৌঁছতে চান পাঠককে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু, শাসকের সত্য ও শাসিতের সত্য এক হতে পারে কি? চোটি মুণ্ডা, বসাই টুডু, দোপ্দ্দী মেবোন, মঘা ডোম, লখিন্দদের সত্য বর্ণহিন্দু সমাজের সত্য নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিক কালপর্বের মহাজন-জোতদারদের সত্য নয়। মহাশ্বেতার ‘সত্য’ প্রচলিত ও শাসকনির্মিত সত্যের বিপরীত- তা সে সুজাতারই হোক বা বসাই টুডু বা বন্দঘটি গাঁও বা বাঁসির রাণীর সত্য।³⁸⁵ শোষকের সত্য আর শোষিতের সত্যের তফাৎ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসেও থাকে। সময় সেখানে উপন্যাসের কেন্দ্র ও পরিধি জুড়ে বিরাজমান। লেখক, কথক ও কুশীলবদের দ্বিবাচনিকতায় যে বহুস্তরীয় আদল ফুটে ওঠে, তাতে উপন্যাসের প্রথাগত “unified and integral fabric of narration” (Gibson 1990, 9) নিরন্তর বিনির্মিত হতে থাকে। মহাশ্বেতা, অভিজিৎ সেন, ইলিয়াস, দেবেশ রায় এঁরা খণ্ডকালের

আখ্যান লিখলেও সেই খণ্ডকালকে নিছক খণ্ডিত অস্তিত্ব বলে বিবেচনা করেন নি; বহুত্ববাদী প্রেক্ষণবিন্দু থেকে মহাসময়ের জটিল সম্পর্কে শিল্পকাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসেছেন।³⁸⁶

তথ্যাশ্রয়ী আখ্যানে প্রচলিত পন্থার বাস্তব ও সত্যের ধারণার উপস্থাপনা থেকে সরে এসে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাস্তবতা, ব্যক্তিগত সত্যোপলব্ধি, ব্যক্তির সত্য ইত্যাদি তুলে ধরছে। তথ্য যখন কাল্পনিকতার থেকেও আরও বেশি কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, তখন কাল্পনিকতা ও তথ্যধর্মীতার নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে আখ্যানে। দেবেশের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র ধর্মণের রাতের বিবরণ এবং আদালতের সাক্ষ্য-তথ্য-নথি কি পাঠকের কাছে কাল্পনিকতার থেকেও বেশি কাল্পনিক নয়? যেসব পাঠকরা রাধিয়া-সুমিয়া-ভগবতীদের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত নয়, তাদের কাছে? মহাশ্বেতা তথ্য-নথি দিয়ে বসাই-দোপদীর খেতমজুরির কাহিনি লিখলে, কিংবা মঘা ডোমের খরাতুর জীবনের কথা লিখলে সেই তথ্যগুলি কি কল্পনার থেকেও কাল্পনিক মনে হয় না? অথবা, নবাবু যখন এপিডিআরের বইতে পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারে মৃত ব্যক্তিদের নাম-বিবরণ তুলে ধরেন? রাষ্ট্রীয় মতাদর্শানুসারী আখ্যানের পুনঃপুনঃ উৎপাদিত বয়ান পাঠ ক’রে যে পাঠক অভ্যস্ত তাঁদের কাছে ‘আটটা-নটার সূর্য’-র তথ্যধর্মীতা এবং সত্তর-দশকের বাস্তবতার আখ্যানস্থ পুনর্নির্মাণ কি কাল্পনিক মনে হয় না? লেওনেরা ফ্লিস তিনটি প্রধান উপাত্তের (premises) ভিত্তিতে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করছেন- লেখক ও পাঠক উভয় দ্বারা স্বীকৃত একটা সাধারণ (common) বাস্তবতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধুনিক মতবাদের তত্ত্বে বাস্তবতাকে সম্পূর্ণতঃ অনুধাবন করা যায় না কিংবা বাস্তবতাকে সত্যাশ্রয়ীভাবে পুনর্নির্মিত করা যায় না। তৃতীয়তঃ শব্দের, পাঠের অনেকার্থ এবং বহুমুখী দৃষ্টিকোণ রয়েছে।³⁸⁷

উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলি বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত গড়ন-গঠনকে প্রশ্ন ক’রে এক প্রতি-সন্দর্ভ নির্মাণ করে। উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলি যে আধুনিকতার কথা বলে, সেখানে কেন্দ্রে থাকে নিম্নবর্গীয়, কৃষিজীবীদের আখ্যান। তাদের বয়ানে আর্থ-রাজনৈতিক আধুনিকতার শাসক-নির্মিত মডেল এবং সাহিত্যের আধুনিকতার চেনা মডেল প্রত্যাহ্বায়িত হয়। বাঘারু কেন ‘নায়ক’ হতে

পারে না কথক এবং লেখক স্বয়ং তা জানিয়ে দেন আখ্যানের শেষলগ্নে। বাঘারু কিংবা কেলু আশির দশকের প্রেক্ষাপটে ভারতকে চিহ্নিত করে এবং ভারতবর্ষে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের নগণ্যতাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে পাঠককে। সতীনাথ ভাদুড়ির ঢোঁড়াই ১৯৪০র দশকের বাস্তবতায় নিজেকে ও ভারতবর্ষকে চেনাতে চেয়েছিল। বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলু, মাদারির মা, খেতখেতু- এরা উন্নয়নকামুক সমাজে সেই চেনাজানার পরিসরটিকে বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কেন বাঘারু চরিত মানস হয় নি, তা বাঘারুর ক্রমবিকাশে পরিষ্কার হতে থাকে। সে শুধু অজস্র 'না'-এর সমাহার। খেতখেতু ও চ্যারকেটুর অস্তিত্ব শুধু প্রত্যাখ্যান হওয়ার মধ্যে দিয়েই ভ্রমসমাজের নজরে আসে। মাদারির মায়ের 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' তত্ত্ব আর উচ্চবর্ণীয় জ্ঞানকাণ্ডের পরোয়া না করেই প্রত্যাখ্যানের ভাষা খুঁজে নেয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কিন্তু বাঘারু বা কেলু নয়; তার ভাষা আছে, তত্ত্ব আছে, জ্ঞানকাণ্ড আছে এবং সচেতন প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু তা দিয়ে ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া যায় কি? বিশ্বনাথ আর কেলু পরস্পরের পাশে বসেও একে অপরকে চেনে না।³⁸⁸ কথককে দায়িত্ব নিতে হয় দু'জনের কাল্পনিক সংলাপ দিয়ে কাল্পনিক সেতু (নাকি, সাঁকো) গড়ে দিতে। অথচ দু'জনের ট্রাজিক জীবনের জন্যে রাষ্ট্র দায়ী, রাষ্ট্রের আর্থ-রাজনৈতিক বীভৎস মডেলটি দায়ী। তথ্যাশ্রয়ী আখ্যান ও বানানো আখ্যান- এই দু'য়ের মধ্যে দিয়ে বৃত্তান্তের যাত্রাপথ উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজ দেয়। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' যে আধুনিকতার কথা বলে, তা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা থেকে আলাদা। আধুনিক সামাজিকতায় শাসিতের বয়ান, বচনকে কেন্দ্রে রেখে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ও আর্থ-রাজনীতিতে ব্যক্তি মানুষের অনুসন্ধান। 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' আঞ্চলিক উপন্যাসের সংকীর্ণ তকমা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, এমনকি নভেল নামক পাশ্চাত্যশিল্পের উপাদানগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব পাঠঘরানা তৈরি করে নেয়। একইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের যে সূত্রগুলি, তার সংকীর্ণতাতেও আটকে পড়ে না। কেন? দেবেশ নিজেই এর উত্তর দিচ্ছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে-

আমার উপন্যাস লেখবার একমাত্র কাজ যদি হয় ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা খোঁজা, তাহলে আমাকে আর একটা শক্তিতেও বিশ্বাস করতে হয়- যে শক্তি ইতিহাসটা তৈরি করতে পারে। ব্যক্তি, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেও সেই শক্তি সক্রিয় থাকতে পারে। সেই শক্তিই কমিউনিস্ট পার্টি। ব্যক্তির একটা ইতিহাস আছে সেটা যদি আমি বিশ্বাস করি, তাহলে সে-ইতিহাস আরও বড় একটা ইতিহাসের অংশ- এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। আর সেই ইতিহাসটা মানুষ তৈরি করে- এটা বিশ্বাস না করলে আমার ব্যক্তির ইতিহাসের কাহিনিও হয়ে যাবে- ব্যক্তির নিয়তির কাহিনি। (দেবেশ রায় সাক্ষাৎকার, ১৯৯১, ২০০)

দেবেশ, ইলিয়াসের মতো লেখকেরা শাসক-বয়ানের বিরুদ্ধে বয়ান তৈরি করতে চান। ইলিয়াস বিজিতের বয়ানে ইতিহাস আর অতীত পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেন। তমিজের দৃষ্টিভঙ্গি, তার ইতিহাস শরাফত মণ্ডল বা ইসমাইলদের তৈরি ইতিহাসের থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। আধুনিক সমাজব্যবস্থার সাথে প্রতিটি চরিত্রের দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক স্বতন্ত্র গুরুত্ব নিয়ে ফুটে ওঠে এই পাঠ্যগুলোতে। অথর্ আর তাঁর শ্রেণিঅবস্থান বা ভাষাগত মান্যতা দিয়ে চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করেন না (বা, করতে অপারগ); বরং কুশীলবদের দৈনন্দিন সংঘাত, বচন ও শ্রেণিঅবস্থান স্বকীয়তায় প্রতিভাত হয়। উপন্যাসিক তাকেই শুধু আখ্যানবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। আর, সাহিত্যের আধুনিকতার রূপান্তর শুধুমাত্র যে সাহিত্যভাষা বনাম বচনের বিরোধে হচ্ছে তা নয়। এতদিন সাহিত্যে প্রান্তিক/ব্রাত্য হয়ে থাকা মানুষদের জীবনছবি তুলে এনে আধুনিকতার নতুন রূপে উপনীত হচ্ছে। ‘সংস্কৃতি’, যা আসলে শাসকের মতামত প্রকাশের মতাদর্শগত পীঠস্থান হিসেবে এবং শাসনব্যবস্থার সপক্ষে অনুমতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করানো হয়, তার বিরুদ্ধেই গোপনে গোপনে যেন এক বিরুদ্ধতা করে চলে তমিজ, চ্যারকেটু, খেতখেতুরা। এই অন্তর্ঘাত তাদের অস্তিত্বের লড়াই এবং ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাকামী দুই দলের কাছেই অস্বস্তির- বারেবারে এই কথাই প্রকাশ পায় উপন্যাসের বিস্তৃতির সাথে সাথে। ‘কাঙাল মালসাট’ যাঁদের পরিচিতি ঘটাল

বাংলা সাহিত্যে, তারা অভূতপূর্ব। উনিশ শতকের কিছু পাঠ (text) যখন গদ্যের আঙ্গিক নির্মিত হচ্ছে, যখন আখ্যানের নতুন সংরূপসন্ধান ও বিস্তারসন্ধান চলছে, যখন উপন্যাসের গড়ন-গঠন তৈরি ক’রে নেওয়ার চেষ্টা চলছে- তখন ফ্যাতাডু+চোক্তারদের কিছু ধরতাইসূত্র পাওয়া যায়। ভাষায়, অশুদ্ধ চরিত্রনির্মাণে, সাংস্কৃতিক অশুদ্ধিতে এবং ব্যঙ্গ-খিল্লি-হুজুতে। কিন্তু, উপন্যাসের রাজনীতি উনিশ শতকে সেই প্রচেষ্টাকে স্থায়ী হতে দেয়নি, তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হতে দেয়নি। ফ্যাতাডুরা একদিকে উনিশতমকীয় ঔপনিবেশিক প্রকল্পনায় আঘাত করে, অন্যদিকে উপনিবেশোত্তর ঔপনিবেশিক খোঁয়াড়িকে (colonial hangover) প্রত্যাহ্বান জানায়। একদিকে তারা ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নির্মাণকে ধূলিসাৎ করে, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু সবটাই নাগরিক পরিসরে। নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বস্তিক্ষেত্রকে (comfort zone) আঘাত করতে করতে হুক্কোড়-হুজুত উদ্‌যাপনে মাতে তারা। সতীনাথ থেকে মহাশ্বেতা থেকে দেবেশ থেকে নবারুণ থেকে ইলিয়াস- এঁরা বাংলা রাজনীতিকেন্দ্রিক আখ্যানের গড়ন-গঠন বিবর্তিত করেন অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে দিয়ে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘গোরা- তমিজঃ বাংলা উপন্যাসের মুক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, “সমস্ত বড় লেখকই উত্তরকালের হাতে কিছু কিছু সাহিত্যিক দায় অর্পণ করে যান। নতুন প্রজন্মকে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। আমাদেরও হয়েছে... তমিজ গ্রামীণ গরিবদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রক্তাক্ত শ্রেণী-সংগ্রামের সন্তান। ভারতবর্ষে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই তার অস্বিষ্ট হতে পারে। তমিজের কাহিনি যতদিন না লেখা হচ্ছে ততদিন বাংলা উপন্যাসের মুক্তি নেই।” সেই তমিজের কথাই তো লিখছেন ইলিয়াস। আর, ‘বৃত্তান্তে’ এসে কখনো সে হয়ে যাচ্ছে চ্যারকেটু আর কখনো বা বাঘারু। জগতের সঙ্গে তার অস্তিত্বের সন্ধান, সাহিত্যের সীমান্ত প্রসারিত ক’রে নতুন মানবরাজত্ব সম্ভাবনার অস্তিত্ব-সন্ধান জারি থাকছে।

-
- ¹ একলব্য ঘোষ, *হাবা*, প্রস্তুতি, জুলাই, ১৯৭৪
- ² শৈবাল মিত্র, ‘সংগ্রামপুর যাত্রা’, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পা. *নকশালবাড়ির গল্প*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ১০৫-১১২
- ³ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ- ২০৭
- ⁴ উপন্যাসটি ধারাবাহিক মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হত ১৯৩৭-৩৯ সালে।
- ⁵ নবারণ ভট্টাচার্য, ‘বিভূতিভূষণঃ ক্ষুধার দলিল ও প্রাসঙ্গিকতা’, *আনাড়ির নাড়িঞ্জান*, ভাষাবন্ধন, ২০১৫, ৩১-৩২
- ⁶ তদেব, পৃ- ৩৪-৩৬
- ⁷ Daniel Rees, *Hunger and Modern Writing: Melville, Kafka, Hamsun and Wright*, Modern Academic Publishing, Universitat Zu Koln, Koln, 2016, pp. 1-8
- ⁸ দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ- ৩২-৩৩
- ⁹ দেবাশিস মহান্তি, ‘দেবেশ রায়ের মফস্বলি বৃত্তান্তঃ একটি আলোচনা’, কঙ্ক পত্রিকা, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, অগাস্ট ২০১৪, পৃ- ২৭৫-৭৬
- ¹⁰ তদেব, পৃ- ২৭৫
- ¹¹ রাম রায়, ‘প্রতিরোধ’, সমকাল, অগাস্ট, ১৯৭৭
- ¹² কুলসুম যে আকালে এই খিদেমুক্তির পদ্ধতি আবিষ্কার করে, সেই আকালেই ছিনিয়ে খাওয়ার পদ্ধতিকে উদ্‌যাপন করতে চায় যোগী। আকালের দিনে নির্বিত্ত নিম্নবিত্তের খিদেমুক্তির দুই পদ্ধতি- ভিক্ষে করা নয়তো ছিনিয়ে খাওয়া, যোগী এই দুই পদ্ধতির যোগসূত্র তুলে ধরে। আর,

যোগীর বর্ণনা এবং বর্ণিত মানুষদের খিদের আখ্যানও নান্দনিক পরিসরকে প্রশ্ন করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ*, পৃ- ২০৪-১১

¹³ ইসলাম ধর্মে কোনও ব্যক্তির মারা যাওয়ার চল্লিশ দিনের মাথায় আত্মীয়-পরিচিতদের যে ভোজ খাওয়ানো হয়।

¹⁴ এখানেই কাদের বলে যে, পাকিস্তান হলে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে এবং টাউনের ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ তার বিরোধিতা করে কারণ ‘পাকিস্তান’ হলে হিন্দুদের থেকে জমিদারি-জোতদারি-ব্যবসা নিয়ে শ্রেণিবৈষম্য বলবৎ রাখার পক্ষপাতী সে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *‘খোয়াবনামা’*, পৃ- ৯৫-৭

¹⁵ তীব্র পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বে খিজির জুন্মনের মায়ের আনা গোরুর গোশত প্রত্যাখ্যান করেও শেষপর্যন্ত খায়।

¹⁶ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ২৩৫-৬

¹⁷ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ৭৭-৭৮

¹⁸ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭০, চর্চাপদ, চর্চাপদ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ- ৩৪

¹⁹ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৭ সাল, পৃ- ২৩

²⁰ কল্যাণী দাশগুপ্ত, ‘তেভাগায় জেলার মেয়েরা’, *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা*, *তেভাগা সংখ্যা*, সম্পা. তরুণ ভট্টাচার্য, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মে ১৯৯৭, পৃ- ৪১

²¹ বরিশাল দাঙ্গা সংঘটিত হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ফজলুল হকের মৃত্যুর গুজবকে কেন্দ্র করে হিন্দুঅধ্যুষিত পাড়ায় গণহত্যা শুরু হয়। বহু মানুষ, নিহত, ধর্ষিতা ও ঘরছাড়া হন।

²² The Ashis Nandy interview: ‘People didn’t have the moral sanction to kill even during the Partition’, August 10, 2017, scroll.in, accessed on 6th February, 2020.

²³ Andrew Robinson, 'In Theory Bakhtin: Dialogism, Polyphony and Heteroglossia', Ceasefire Magazine, July, 2011, <https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-bakhtin-1/>, accessed on 20th September, 2017

²⁴ শাহাদুজ্জামানের নেওয়া আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, ২০১৮, ৫৯

²⁵ Soul or spectre of a dead person usually believed to inhabit the netherworld and to be capable of returning in some form to the world of the living (*Encyclopedia Britannica*, Chicago: Encyclopedia Britannica, vol. 5, 1995

²⁶ Alberto Ribas-Casasayas and Amanda L. Petersen, *Theories of the Ghost in a Transhispanic Context*, Santa Clara University, 2015, p. 2

²⁷ নবাবুণ ভট্টাচার্য, হারবার্ট দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ২৩

²⁸ বাংলায় ghost ও specter দু'টির প্রতিশব্দ হিসেবেই 'ভূত' শব্দটি ব্যবহার হয়। 'চলন্তিকা' অভিধান মতে, ভূত অর্থে দেবযোনি (৪৪১) এবং প্রেত অর্থে ভূত, পিশাচ বা মৃতের আত্মা (৩৬৪)। 'প্রেতাত্মা' প্রচলিত শব্দ। রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা

²⁹ Maria de! Pilar Blanco and Esther Peeren, "Introduction," in *The Spectralities Reader*, ed. Blanco and Peeren, Bloomsbury Academic, New York, 2013, p. 9

³⁰ Alberto Ribas-Casasayas and Amanda L. Petersen, *Theories of the Ghost*, pp. 2-3.

³¹ Subhoranjan Dasgupta, *Elegy and Dream*, University Press Limited, Dhaka, 2018, 40-41

³² Stephen Hart, 'Magic Realism in Americas: Politicised Ghosts in *One Hundred Years of Solitude*, *The House of Spirits*, and *Beloved*', in *Bloom's Modern Critical Views: Gabriel García Márquez*, 2007 pp- 83-94

³³ Subhoranjan Dasgupta, *Elegy and Dream*, p. 42

³⁴ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাস্তবের কুহক, কুহকী বাস্তবতা এবং আলেহো কার্পেস্তিয়ের', *আলেহো কার্পেস্তিয়ের-এর রচনাসংগ্রহ*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ- ৩৫৭

³⁵ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ- ১৭-১৮

³⁶ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *আলেহো কার্পেস্তিয়ের-এর রচনাসংগ্রহ*, পৃ- ৩৫১-৩৫৮

³⁷ শুভময় মণ্ডল, 'হারবার্ট- বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারা', *নবাবরণ ভট্টাচার্যের হারবার্টঃ আলোচনাপত্র*, আখ্যান ১ পত্রিকা, সম্পা. আফসার আমেদ ও অনিশ্চয় চক্রবর্তী, মার্চ ১৯৯৬, পৃ- ৬-৭

³⁸ ললিতকুমার হারবার্টের মৃতদেহ শ্মশানে পৌঁছবার পরে জনসমাগমের বৈচিত্র্য দেখে বলে, "এ তো কার্নিভাল!"

³⁹ Julia Kristeva, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Ed. Leon S. Roudiez. Trans. Thomas Gora et al. New York: Columbia University Press, 1980, pp. 65-66

⁴⁰ নবাবরণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ১০

⁴¹ মৃণালকান্তি ঘোষ, *পরলোকের কথা*, ইন্টারনেট আর্কাইভ, ১৯৩৩, পিডিএফ, পৃ- ৪

⁴² রসিকমোহন দেবশর্মা, *পরলোকের কথা*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ

⁴³ নবারুণের ভাই অশোক ভট্টাচার্য, যিনি সুবর্ণরেখায় ‘বিনু’-র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, ঢাকুরিয়া লেকে ডুবে মারা যান। ‘সুবর্ণরেখা’র প্রায় সকলেই যে ‘নেই’ হয়ে গেছেন, সেই আক্ষেপও রয়েছে। নবারুণ ভট্টাচার্য, *আনাড়ির নাড়িঞ্জান*, পৃ- ৫৭

⁴⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ৩৭

⁴⁵ তদেব, পৃ- ৬২-৬৩

⁴⁶ তদেব, পৃ- ৬১-৩

⁴⁷ তদেব, পৃ ৬৫-৮। এই পর্বে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সঙ্গে অলৌকিক দুর্বলতার সংঘাত আখ্যানের বিরোধভাস।

⁴⁸ সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ‘হারবার্টঃ পঞ্চভৌতিক উল্লাস’, আফসার আমেদ ও অনিশ্চয় চক্রবর্তী সম্পাদিত, *আখ্যান ১, নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্টঃ আলোচনাপত্র*, মার্চ ১৯৯৬, পৃ- ৩০

⁴⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ৪০-৪১

⁵⁰ অর্ক চট্টোপাধ্যায়, ‘নবারুণের প্রেত ও অনুপস্থিতির বিশ্বাস’, *নবারুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, বৈভাষিক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ- ১১৫

⁵¹ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২য় খণ্ড*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২, পৃ- ১৮৭

⁵² অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আপন কথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ই-বুক সংস্করণ, কলকাতা, ২০২০, পৃ- ৫

⁵³ সুকুমার সেন, ‘ভূতের গল্পঃ দেশে’, সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন সম্পা. *উপছায়া*, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬৪, পৃ- ২২

⁵⁴ সম্প্রতি আইআইটি-র মতো শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের এক অধিকর্তা রামনাম পড়ে ভূত তাড়ানোর অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে বলেছেন। মঙ্গলয়ান প্রেরণের আগে বেদপাঠ-পুজো ইত্যাদি হয়।

The Wire, 15th January, 2022.

⁵⁵ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, *কঙ্কাবতী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৪ সাল, পৃ- ১৮১-৮২

⁵⁶ সুরেন্দ্রমোহন ‘জন্মান্তর রহস্য (১৯০৫)’, ‘প্রেততত্ত্ব (১৯০৮)’ ও ‘ডাকিনীবিদ্যা (১৯১৮)’ নামক তিনটি বই লিখেছিলেন প্রেতচর্চা অলৌকিক বিষয়ে। আর, ‘প্রেততর্পণ (১৯০৭)’ ও ‘নরকোৎসব (১৯১৪)’ নামে দু’টি উপন্যাস লেখেন। পরলোক তত্ত্বে পূর্ণ উপন্যাসগুলি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

⁵⁷ অমিতাভ চৌধুরী, একত্রে রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা*, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৮৩, পৃ- ১৩

⁵⁸ সব কিছুতে মায়া, টান থেকে যাওয়া এবং হারানো সব কিছুর জন্যে হারবার্টের মনখারাপ করা (পৃ- ৪৬) হারবার্টের বর্তমানের ওপরে অতীতের আধিপত্য বিস্তার করে। তার জীবনাখ্যানে এই টান ও মায়া অবিচ্ছেদ্য।

⁵⁹ William Shakespeare, *The Tragedy of Hamlet: Prince of Denmark*, Edited by Barbara A. Mowat and Paul Werstine, Folger Shakespeare Library, Act 2 Scene 2, p. 95

⁶⁰ দেবেশ রায়ের সঙ্গে নবাবুণ ভট্টাচার্যের কথাবার্তা, আখ্যান ১, মার্চ ১৯৯৬

⁶¹ সত্তর-দশক পরবর্তী স্থিতিবস্থার প্রসঙ্গ আনছে কথক। ‘কমিউনিজম কেলিয়ে পড়ছে’ এই বিষয়েও সচেতন।

⁶² মনিকা মারিস্তেইনের নেওয়া ক্রিস্টিনা রিভেরা গ্রাজার সাক্ষাৎকার, জুলাই ২০১৩, সূত্র- Alberto Ribas-Casasayas, *Theories of the Ghost in a Transhispanic Context*, p. 10

⁶³ মালসাট শব্দের অর্থ যুদ্ধের আহ্বান করা এবং এই উপন্যাসে কাঙালরা তা করছে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

⁶⁴ Avery F. Gordon, *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination*, University of Minnesota Press, 2nd edition, Minneapolis, 2008

⁶⁵ Cheryl McEwan, 'A very modern ghost: postcolonialism and the politics of enchantment', *Environment and Planning D: Society and Space* 2008, volume 26, p. 34

⁶⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ২০

⁶⁷ কথক জানাচ্ছেন যে, এই কিউরেটর বুদ্ধিজীবী মহলের 'ঘ্যাম' ব্যক্তি এবং 'সবই চার্নকের দয়া' তাঁর প্রিয় লজ। নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৯৪-৯

⁶⁸ তপোধীর ভট্টাচার্য, 'কার্নিভালের বিস্ফোরণ', সম্পা. রাজীব চৌধুরী, অক্ষরেখা (মূল সম্পাদক নীলকমল সরকার), কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ১৫০

⁶⁹ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসংগ্রহ*, আনিসুজ্জামান সম্পা. সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ- ১৫৮

⁷⁰ *সটীক হতোম প্যাঁচার নকশা*, অরুণ নাগ সম্পা., আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ৯১-৯৪

⁷¹ তদেব, পৃ- ১১৭

⁷² নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩১-৩২।

⁷³ হিন্দুমতে ভূতচতুর্দশীর রাতে পূর্বপুরুষের প্রেত পৃথিবীতে আসে উত্তরপুরুষের কাছে। কালীপূজার আগের এই রাতে প্রেত-ভূত-পিশাচ-আত্মা মর্ত্যে আসে বলে শাস্ত্রীয় ও প্রচলিত বিশ্বাস।

⁷⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৬৬-৬৯।

- ⁷⁵ জোয়ারদার স্ত্রীকে বলে, “লুক হানি, আই অ্যাম পারফেক্টলি নরম্যাল। শুধু হেডপিসটা মানে মাথাটা হোল্ড করতে হচ্ছে” (৩০৯) জোয়ারদারের আচরণে কোনও গুণগত পরিবর্তন হয়নি মাথা কাটার পরে পৃ- ৩০৮-১০
- ⁷⁶ শুভেন্দু দাশগুপ্ত, ‘নবারুণের অবাস্তব কিংবা আসল বাস্তব’, *ভাষাবন্ধনঃ নবারুণ সংখ্যা*, ত্রয়োদশ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ৩৯
- ⁷⁷ তদেব, পৃ- ৩৯-৪০
- ⁷⁸ তপোধীর ভট্টাচার্য, *বাখতিনঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ- ৮০
- ⁷⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *কথাবার্তা*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ- ২৮
- ⁸⁰ নবারুণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার, অক্ষরেখা, সম্পা. নীলকমল সরকার, সংখ্যাটির সম্পা. রাজীব চৌধুরী, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ২৫৪-৫৫
- ⁸¹ দেবেশ রায়, *গল্প সমগ্র ওয় খণ্ড*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃ- ১২-১৩
- ⁸² রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভূতিয়া ললাট লিখন’, অক্ষরেখা, পৃ- ৪০
- ⁸³ ধ্রুপদী অর্থে সাবঅল্টার্ন হচ্ছে অধস্তন কর্মচারী/আধিকারিক কিংবা হুকুম তামিলকারী নিচুপদের ব্যক্তি। গোলাপ স্বীকার ক’রে নেয় যে, “শালাদের [লালবাজারের ওপরতলা] ওপরে আমার হেবি খার” (৩২৮)
- ⁸⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬৬
- ⁸⁵ অরুণা মুখোপাধ্যায়, ‘সখা আতলেমি কারে কয়?’, অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৭
- ⁸⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ৩৪২-৩৪৪
- ⁸⁷ তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘আখ্যানের সাতকাহন’, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর, জানু ২০০৫, পৃ- ১৩১-৩২
- ⁸⁸ তদেব, পৃ- ১২৪
- ⁸⁹ অভীক মজুমদার, ‘কাঙাল মালসাটঃ সহজপাঠ কঠিনপাঠ’, অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৫

⁹⁰ Mikhail Bakhtin, *Rabelais and his World*, Trans. By Helene Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington, 1984 p. 274

⁹¹ Katrina Clark and Michael Holquist, *Mikhail Bakhtin*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1984, p. 297

⁹² নবারণ ভট্টাচার্য, *কথাবার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬২

⁹³ Mikhail Bakhtin, *Problem of Dostoevsky's Poetics*, Ed. and translated by Caryl Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984, p. 127

⁹⁴ নবারণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭৮

⁹⁵ নবারণ ভট্টাচার্য, *কথাবার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪

⁹⁶ শ্রীলঙ্কায় ট্রটস্কিবাদীরা যদিও অভ্যুত্থান ঘটাননি। পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্ট (JVP) এই দ্রোহে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সিংহলি জাতিসত্তা এবং মার্ক্সবাদী মতাদর্শের মেলবন্ধনে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল। Nirmal Ranjith Dewasiri, 'Mainstreaming Radical Politics in Sri Lanka: The case of JVP post-1977', PCD Journal Vol. II, No. 1 2010, pp. 69-94

⁹⁷ নবারণ ভট্টাচার্য, *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ- ১৩০-৩৩

⁹⁸ তদেব, পৃ- ৯৭-৯৮

⁹⁹ রাজশেখর বসু সঙ্কলিত *চলন্তিকা*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স, সপ্তম সংস্করণ, পৃ- ৩৪১

¹⁰⁰ নবারণ ভট্টাচার্য, 'অসীম পথ ও স্থানাক্ষ সম্পর্কে', *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান*, পৃ- ৯২

¹⁰¹ নবারণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১২৮

¹⁰² বসাকের স্বগতচিন্তায় জানা যায় যে, পুলিশ কাস্টডিতে বীভৎস অত্যাচার ক'রে সে কর্তব্য পালন করেছে তথা সরকারি নির্দেশ মেনেছে। এতে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনও বাতায় ঘটেনি, কোনও অনুশোচনা হয়নি।

-
- ¹⁰³ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৪৩
- ¹⁰⁴ নীলকমল সরকার সম্পা. অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৮-৯৯
- ¹⁰⁵ মালিনী ভট্টাচার্য, ‘নব্য-উপনিবেশবাদী আগ্রাসন ও নবারুণঃ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ’, *নবারুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, সম্পা. অদ্বয় চৌধুরী ও অর্ক চট্টোপাধ্যায়, বৈভাষিক, কলকাতা, ২০২১, পৃ- ১৫৩
- ¹⁰⁶ Mao Tse Tung, ‘U.S. IMPERIALISM IS A PAPER TIGER’, July 14, 1956, selected works of Mao Tse Tung, Transcription by the Maoist Documentation Project. HTML revised 2004 by Marxists.org
- ¹⁰⁷ চারু মজুমদার, ‘কোন এক সংগঠক কমরেডকে লেখা চিঠি’, ৯ই জুন ১৯৬৭, চারু মজুমদার রচনাবলী, লাল সংবাদ, lalshongbad.wordpress.com
- ¹⁰⁸ চারু মজুমদার, ‘ষষ্ঠ দলিল’ ৩০শে অগাস্ট ১৯৬৬, <https://lalshongbad.wordpress.com/2017/01/26/>
- ¹⁰⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৭৫-৭৬
- ¹¹⁰ তদেব, পৃ- ২৯২-৯৩
- ¹¹¹ অতীক মজুমদার, ‘কাঙাল মালসাটঃ সহজপাঠ কঠিনপাঠ’, অক্ষরেখা, পৃ- ১৫৪
- ¹¹² নবারুণ ভট্টাচার্য, আলবোর কামু ও সুখী মৃত্যু, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, পৃ- ১১৬-৭
- ¹¹³ নবারুণ ভট্টাচার্য, *অন্ধবেড়াল ও অন্যান্য গল্প*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ- ৯
- ¹¹⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ৩৬০
- ¹¹⁵ নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘এটা বাজার, হাট নয়’, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, পৃ- ১৩৪-৬

-
- ¹¹⁶ অমলেন্দু চক্রবর্তী, 'উপন্যাস ভাবনা', *এবং মুশায়েরাঃ উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা*, সম্পা. সুবল সামন্ত তৃতীয় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-ডিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ- ৬৩-৬৪
- ¹¹⁷ প্রবুদ্ধ ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশন এবং নবারুণ ভট্টাচার্যঃ তুলনামূলক পাঠ', *নবারুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, পৃ- ৩৩৯
- ¹¹⁸ অমলেন্দু চক্রবর্তী, *উপন্যাস ভাবনা*, পৃ- ৫৪
- ¹¹⁹ Anthony King, 'A critique of Baudrillard's hyperreality: towards a sociology of postmodernism', *Philosophy & Social Criticism*, vol.24, no.6, SAGE journals, 1998, pp. 47-66, doi.org/10.1177/019145379802400603
- ¹²⁰ Jean Baudrillard, *Simulacra and simulation*, Trans. By S. F. Glaser, Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1994, pp. 1-4
- ¹²¹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *মসোলিয়াম*, উপন্যাস সমগ্র, পৃ- ৪৭৫
- ¹²² তদেব, পৃ- ৪৭২
- ¹²³ তপোধীর ভট্টাচার্য, 'কার্নিভালের বিস্ফোরণ', *অক্ষরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৪
- ¹²⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৭৬
- ¹²⁵ আন্তর্জালের প্রসারের যুগে এমন সই সংগ্রহের ঘটনা আরও বেড়েছে। অধিকাংশ সময়েই বুদ্ধিজীবীরা দ্রোহীদের শাস্ত করার জন্যে এমন মধ্যস্থতা চান। আবেদনপত্রে সইয়ের পদ্ধতি নিয়েও কথকের ঠাট্টা বাস্তবানুগ।
- ¹²⁶ শুভময় মণ্ডল, 'হারবার্টঃ বাংলা উপন্যাসের নতুন ধারা', *নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্টঃ আলোচনাপত্র*, আখ্যান ১, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪-৯

-
- ¹²⁷ Aritra Chakraborti, 'Reading and Resistance in the Works of Nabarun Bhattacharya', *Sanglap: Journal of Literary and Cultural Inquiry*, Vol 2: Issue 1 Supplement, pp. 25-26
- ¹²⁸ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি লেখার সময় 'কমিউনিস্ট মতাদর্শ' থেকে দূরে অবস্থান করছেন। প্রগতিবাদী সাহিত্য বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের নিয়মমাফিক উপন্যাস এটি নয়।
- ¹²⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৪-৩৫
- ¹³⁰ Aritra Chakraborti, 'Reading and Resistance in the Works of Nabarun Bhattacharya', pp. 16-32
- ¹³¹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৪৪-৪৫
- ¹³² বসাকের স্বরে বোঝা যায় যে, ষাট-সত্তর দশকের তরুণ পুলিশ-অফিসাররা কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ও গেরিলা রণনীতি সম্পর্কে পড়াশোনা করলেও বসাক জানত যে, 'আসল কাজে লেখাপড়ার ভূমিকা ছিল না।' বসাক যে তরুণ অফিসারদের কথা বলছে, 'আটটা নটার সূর্য' উপন্যাসের কনকেন্দু এমনই অফিসার। কিন্তু, আখ্যানের গতিপথে ক্রমাশয়ে রূপান্তরিত হয়ে কনকেন্দু বসাকের মতো প্রোটোটাইপড নিপীড়ক পুলিশে পরিণত হয়।
- ¹³³ তথাগত ভট্টাচার্য, 'হারবার্ট বাবাকে বাবা হতে দেয়নি', অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯-৩০
- ¹³⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৮-৮৯, ১০০-১০২
- ¹³⁵ দেবেশ রায়, 'নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা', অক্ষরেখা, পৃ- ২৫৬
- ¹³⁶ নবারুণের প্রবন্ধ 'ভিন্ন পাঠে একই গল্প' এবং 'বিভূতিভূষণঃ ক্ষুধার দলিল ও প্রাসঙ্গিকতা' দ্রষ্টব্য, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, পৃ- ২৬-৩৭
- ¹³⁷ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, *বিপ্লব ও রাজমোহন*, মিনিবুক, কলকাতা, ১৯৬৯

¹³⁸ অস্কারের জীবন ঘিরে উপন্যাসের আখ্যান আবর্তিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজিদের পোল্যান্ড দখলের পটভূমিতে এবং এই রাজনৈতিক উপন্যাসটি স্মৃতিকথন ও মিথ-বাস্তবতার দোলাচলে ভোগে।

¹³⁹ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ‘আখ্যানে রাজনীতি ও আখ্যানের রাজনীতিঃ সন্দীপনের রক্তমাংস’, *সন্দীপনঃ মনন ও দর্শন*, বৈভাষিক প্রকাশনী, কলকাতা ২০২২, পৃ- ৪০-৫৫

¹⁴⁰ নবারুণ ভট্টাচার্য, *ফ্যাঁতাডুর বোম্বাচাক*, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ৩৫-৬

¹⁴¹ তদেব, পৃ- ৯১-২

¹⁴² তদেব, পৃ- ৯৯। নবনী ধর স্বগতকথনে ‘ধরেছি গো ধরেছি’ উপন্যাসের প্লট ও সূচনাত্মক লাইন বলে। সাহিত্যগত নৈতিকতার ধার ধারে না এই লাইনগুলি।

¹⁴³ অদ্রীশ বিশ্বাস, *বটতলার বই*, প্রথম খণ্ড, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, ভূমিকা, পৃ- ২২-৩

¹⁴⁴ কামোদ্বেগকরী ছবি আঁকা হত মলাটে। ‘সচিত্র লজ্জতনেচ্ছা’ বইয়ের মলাটে বাবু-বিবির ছবি, ‘সচিত্র রতিশাস্ত্র’ বইয়ের লেখা ও ছবি কিংবা পুজো উপলক্ষ্যে সামান্য দামে প্রকাশিত পুজোপুস্তিকায় সতীনের ঝগড়ার ছবি পরকীয়ার ছবি ইত্যাদি প্রকাশিত হত।

¹⁴⁵ নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘আইপিএল-এ ফ্যাঁতাডু’, *ফ্যাঁতাডুর কুস্তীপাক*, ভাষাবন্ধন, কলকাতা, পৃ- ২২, PDF

¹⁴⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৬৯-৭০

¹⁴⁷ ‘পিওর পাঁচু না হলে পাঠক বুঝবেন যে বজরা ঘোষ এক মহান ঔপন্যাসিক এবং হালের বাংলা নভেল রচনার নামে যে ত্যাঁদরা হারামিগিরি চলছে তার মধ্যে বজরা ঘোষকে ভাবাই যায় না’- এর পরের অংশে কথক বজরা ঘোষের তুলনা করছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্তাঁদাল, তলস্তয়দের সঙ্গে অর্থাৎ যারা ‘নভেল’ সংরূপের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করেছিলেন। *মসোলিয়াম*, উপন্যাস সমগ্র, পৃ- ৪৮০-৮১

- ¹⁴⁸ Aritra Chakraborty, 'Reading and Resistance in the Works', pp. 26-27
- ¹⁴⁹ শুভেন্দু দাশগুপ্ত, 'নবাবুগের অবাস্তব কিংবা আসল বাস্তব', *ভাষাবন্ধনঃ নবাবুগ সংখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯
- ¹⁵⁰ নবাবুগ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ৩০১-৩০২
- ¹⁵¹ বজরা ঘোষ 'মাগিবাড়ির পেত্নী', 'গলাকাটা জামাই', 'মড়ার বৌভাত' ইত্যাদি শিরোনামে গল্প লেখে। নবাবুগ ভট্টাচার্য, 'টিভির গ্যাঞ্জামে ফ্যাতাডু', ফ্যাতাডুর কুস্তীপাক, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৩
- ¹⁵² 'উনিশ-কুড়ি' আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী দ্বারা প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। যার উদ্দেশ্য- পাঠক মূলত সদ্যতরুণ যুবকযুবতীরা। এতে প্রকাশিত গল্প, কবিতা, ফিচার, উপন্যাস ওই ধাঁচাতেই লেখা হয়।
- ¹⁵³ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দ্বিতীয় পাতায় জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন বেরোয়, কথক তাকেও ব্যঙ্গ করছে। *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৮১
- ¹⁵⁴ অতীক মজুমদার, 'কাঙাল মালসাটঃ সহজপাঠ কঠিনপাঠ', অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৫
- ¹⁵⁵ অনুপর্ণা মুখার্জী, 'কলকাতার জলছবি ও প্রেতশহরের নকশা', *নবাবুগ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, পৃ- ৭৮
- ¹⁵⁶ নবাবুগ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৯৪-৯৬
- ¹⁵⁷ শ্রীপাশু, 'জোব চার্নকের মুখোমুখি', *কলকাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, ই-বুক ২০২০, কলকাতা, পৃ ৩৯-৪৭
- ¹⁵⁸ নবাবুগ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৬০-৬১
- ¹⁵⁹ জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' ও মিখাইল বুলগাকভের 'দ্য মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা' উপন্যাসদুটিতেও এই বয়ানই তুলে ধরা হয়েছে।
- ¹⁶⁰ নবাবুগ ভট্টাচার্য, 'অসীম পথ ও স্থানাক্ষ সম্পর্কে', *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৯

¹⁶¹ নন্দীগ্রাম গণহত্যায় সিপিআইএমের দায় বা সুশাস্ত ঘোষের ছোট আগারিয়ায় ‘কঙ্কালকাণ্ড’
সিবিআই দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। উত্তর-সত্য বয়ানে এগুলি ‘মিথ্যা প্রচার’। কিন্তু, ঔপন্যাসিক
আদালতের সত্যের বাইরের সত্যটাও লেখায় আনেন

¹⁶² নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘প্রসঙ্গঃ মার্কস’, *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান*, প্রাপ্ত, পৃ- ১২৭

¹⁶³ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রাপ্ত, পৃ- ২৪৪-৪৫

¹⁶⁴ সুমন ভট্টাচার্য, ‘কথার কিস্তি-খেলাপের অক্ষরেখা’, পৃ- ৯৭

¹⁶⁵ প্রবুদ্ধ ঘোষ, ‘হাংরি জেনারেশন এবং নবারুণ ভট্টাচার্য’, *নবারুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, পৃ-
৩৩৯-৪০

¹⁶⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, আইপিএল-এ ফ্যাতাডু, *ফ্যাতাডুর কুস্তীপাক*, পৃ- ২২

¹⁶⁷ নবারুণ ভট্টাচার্য, ফ্যাতাডু, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক*, প্রাপ্ত, পৃ- ৯-১০ বিভিন্ন গল্পে ডিএসের
বর্ণনায় এরপরে যোগ হয়েছে, ‘কালো, মোটা ও বেঁটে’ বিশেষণগুলি।

¹⁶⁸ ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক’ গল্পে পাওয়া যায় যে, মদনের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু মদনের বয়ানে,
“আমারও তো বৌ ভাগলবা হয়েছিল। গেল তো গেল...” (২৩) আর, পুরন্দর সমস্ত কাহিনিতেই
অবিবাহিত। ডিএসের বৌয়ের বর্ণনা করতে কালো, মোটা, কোলাব্যাং-এর মতো ইত্যাদি বিশেষণ
ব্যবহৃত হয়েছে। ‘গ্লোবাল টেরর ও ফ্যাতাডু’, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক*, পৃ- ১২৩

¹⁶⁹ তেলেপাড়া বস্তির মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এরপরে হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টের উৎসবে
হামলা চালায় বসন্ত উৎসবে যোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে এবং অনুষ্ঠানটি বানচাল হয়ে যায়।

¹⁷⁰ জীবনানন্দকে ‘ময়রার মতো দেখতে’ বলে সম্বোধন করে এবং রবীন্দ্রনাথের সইআঁকা শাড়ি
পরে এক উদ্যোক্তা।

¹⁷¹ Cultural capital can exist in three forms: in the embodied state, i.e., in
the form of long-lasting dispositions of the mind and body; in the
objectified state, in the form of cultural goods (pictures, books, dictionaries,

instruments, machines, etc.), which are the trace or realization of theories or critiques of these theories, problematics, etc.; and in the institutionalized state, a form of objectification which must be set apart because, as will be seen in the case of educational qualifications, it confers entirely original properties on the cultural capital which it is presumed to guarantee. Pierre Bourdieu, 'The Forms of Capital', Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport, CT: Greenwood, 1986, pp. 241-58

¹⁷² নবারুণ ভট্টাচার্য, ফ্যাতাডু, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচার*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮-১৯

¹⁷³ Jean Baudrillard, *The Consumer Society: Myths and Structures*, Sage Publications, New Delhi, 1999, pp. 69-87

¹⁷⁴ শ্রীপাশু লিখেছেন বেগম জনসন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়েছিলেন ফেয়ারলি প্লেসের মজলিশে আগত অমাত্যদের নামে। স্বাধীনচেতা বেগম জনসন নবাবি মহলের গাল্লগল্ল করতেন, নিজের শর্তে বাঁচতেন। নবারুণ বেগম জনসনের মজলিশ, অভিজাতসঙ্গ ইত্যাদি 'কলকাতা' বইটির বর্ণনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে লিখেছেন। শ্রীপাশু, *কলকাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৯-৭৭

¹⁷⁵ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ ৩০৬

¹⁷⁶ P. Thankappan Nair (compiled), *Calcutta in the 18th Century: Impression of Travellers*, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1984, p. xii

¹⁷⁷ ফ্রান্সেস জনসনের সমাধিফলকে লেখা কবিতার শেষ দু'লাইন। পার্ক স্ট্রিট গোরস্থান, কলকাতা।

¹⁷⁸ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূতিয়া ললাট লিখন', অক্ষরেখা, পৃ- ৪১

-
- ¹⁷⁹ Roland Barthes, *S/Z*, Translated by Richard Miller, Blackwell Publishing, UK, Original 1972, Latest 2002, pp. 4-6
- ¹⁸⁰ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূতিয়া ললাট লিখন', অক্ষরেখা, পৃ- ৪৩
- ¹⁸¹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ৩২০
- ¹⁸² শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, সম্পা. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ- ৩৭৮
- ¹⁸³ আব্দুল কাফি, 'স্মৃতি, পরিচিতি আর সময়ের স্বাদ', দেশ পত্রিকা, সম্পা. সুমন সেনগুপ্ত ২রা জুন ২০১৮, পৃ- ২৫-২৭
- ¹⁸⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৬৭-৬৮
- ¹⁸⁵ তদেব, পৃ- ২৮৫
- ¹⁸⁶ প্রবাসী পত্রিকা, 'পুরনো গল্প', ৪র্থ সংখ্যা, পৃ- ৪৯৩
- ¹⁸⁷ অরুণা মুখোপাধ্যায়, 'নবারুণ ভট্টাচার্যঃ সখা আঁতলেমি কারে কয়?', অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৪-৫৫
- ¹⁸⁸ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৫৩
- ¹⁸⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট, দে'জ* পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ৫২
- ¹⁹⁰ William Faulkner, *Requiem for a Nun*, Act 1, Scene 3, First Publication 1951, Vintage, 2019, E-Book
- ¹⁹¹ দেবেশ রায়, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ- ৪১-৪৩
- ¹⁹² নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ৯-১০
- ¹⁹³ তদেব, পৃ- ৭১-৭৩
- ¹⁹⁴ 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র শুরুই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায়। ২-১১-১৯৯৪ সালে কালীপুজোর রাত্রি রণজয়ের চেতনায় ও চিন্তাবিভ্রমে গেরিলানীতির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। অনুচ্ছেদভাগহীন

নিরন্তর বর্ণনা রণজয়ের স্বগতচিন্তার যুদ্ধ, মেখলার স্বর, কোবার বেড়ে ওঠা এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের বীভৎসতার ছবি মিশিয়ে নেয়। নবাবুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১০৯-১১৪

¹⁹⁵ ক্রিস্টোফার নোলানের ‘ডানকার্ক (২০১৭)’ ছবিতে এমন এক যুদ্ধ পরিস্থিতির অবতারণা করা হয়, যেখানে শত্রুপক্ষের কাউকে পর্দায় সরাসরি দেখা যায় না। কিন্তু, তারা যে অস্তিত্বশীল তা বোঝা যায় একপক্ষের সৈনিকদের সংলাপে, গুলিচালনায় ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণে।

¹⁹⁶ সেখ মোফাজ্জল হোসেন, *নবাবুণের আখ্যানবিশ্ব*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ- ১৭১-৭২

¹⁹⁷ ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদ.) *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ২

¹⁹⁸ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় নাটক, উপন্যাস, গল্প ও কবিতা সম্পর্কে এবং সার্বিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। সেই সমস্ত বিতর্কের নির্যাস ছিল সাহিত্যের অভিমুখ এবং সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকদের সমালোচনা। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত ‘মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক’ এই সাহিত্যেতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ।

¹⁹⁹ Javeed Alam, ‘State and the Making of Communist Politics in India 1947-57’, *Economic and Political Weekly*, Nov. 9, 1991, Vol. 26, No. 45 (Nov. 9, 1991), pp. 2573-2577+2579-2583

²⁰⁰ Report on Left Deviation Inside the CPI. (approved by the CC in June 1950, pp. 753-4

²⁰¹ Javeed Alam, ‘State and the Making of Communist Politics in India’, pp. 2575-76

²⁰² Subhoranjan Dasgupta, *People, Politics and Protests III Marxian Literary Debates and Discourses*, Mahanirban Calcutta Research Group, Kolkata, 2016, pp. 10-11

²⁰³ মূলক রাজ আনন্দ ও সাজ্জাদ জাহির ১৯৩৫ সালের জুন মাসে প্যারিসের 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর দ্য ডিফেন্স অব্ কালচার' সম্মেলনে সক্রিয় যোগদান করেন। বাকস্বাধীনতা এবং শিল্প ও সমাজের মেলবন্ধনের দিশা নিয়ে আলোচনা মতামত আদানপ্রদান হয় সম্মেলনে।

²⁰⁴ Michael Kelly, 'Gorky, Aragon and Socialist Realism', *The Crane Bag*, Vol. 7, No. 1, Socialism & Culture (1983), pp. 108-111

²⁰⁵ তদেব, পৃ- ১১০

²⁰⁶ Subhoranjan Dasgupta, 'People, Politics and Protests', pp. 7-8

²⁰⁷ Mao Tse-Tung, 'Yenan Lecture on Art and Literature, May 1942', Transcription by the Maoist Documentation Project, Marxists.org

²⁰⁸ Michael Kelly, "French Intellectuals and Zhdanovism", *French Cultural Studies*, vol. 8, no. 22, 1997, pp. 017-028

²⁰⁹ শিল্প সাহিত্যের আরেক পীঠস্থান ফ্রান্সেও সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও লেখক-শিল্পী সঙ্ঘের অন্দরে এহেন বিতর্ক চলছিল। Roger Garaudy শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতা ও স্বয়ংক্রিয় ভাবনা-অনুশীলনের ওপরে জোর দিলেও Louis Aragon-র মতো শিল্পী জোর দিলেন সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব শ্রমজীবীদের চেতনার মানোন্নয়ন এবং পার্টির প্রগতিচেতনার অভিমুখে সাহিত্যরচনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। Damodaran, Sumangala. *The Radical Impulse: Music in the Tradition of the Indian People's Theatre Association*. Tulika Books, 2017, p. 50 এবং ধনঞ্জয় দাশের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

²¹⁰ ধনঞ্জয় দাশ, *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯-৩০

²¹¹ তদেব, পৃ- ২৯-৩১

²¹² এটিকে বাংলা সাহিত্যমহলে লুনাচারস্কিপন্থী আর ঝানভপন্থীদের বিতর্ক বলে অভিহিত করছেন শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত।

²¹³ নিখিল ভারত প্রগতিশীল লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই মাসিক পত্রিকা হিসেবে ‘অগ্রণী’ প্রকাশিত হতে থাকে দেবকুমার গুপ্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ, অদ্বৈত দত্ত ও বীরেন মজুমদারের সহ-সম্পাদনায় এবং প্রফুল্ল রায়ের সম্পাদনায়। মার্ক্সবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম শিবির এটি।

²¹⁴ সমর সেন, *বাবুবৃত্তান্ত*, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ- ১৪৬-১৫১

²¹⁵ সরোজ দত্ত ‘Technique fetishism’ ও ‘Intellectual clique’ শব্দবন্ধদুটি ব্যবহার করেছেন সমর সেনের কবিতা ও কবিতার দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে।

²¹⁶ Subhoranjan Dasgupta, *People, Politics and Protests*, p. 9

²¹⁷ জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে ‘রূপসী বাংলা’ নামে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল।

²¹⁸ প্রকাশ রায়, ‘বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা’, মার্কসবাদী, চতুর্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯, ১০৯-৪০

²¹⁹ ‘পরিচয়’ পত্রিকার অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে এই বিতর্ক চলে, প্রকাশ রায় ‘উর্মিলা গুহ’ ছদ্মনামে বিষ্ণু দে-র সমালোচনামূলক ‘সাহিত্য-বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি’ প্রবন্ধটি লেখেন ‘মার্কসবাদী’, ১৯৪৮ পত্রিকায়।

²²⁰ Jakup Mato, Socialist Realism 'Foreign Literature', Part Two, Ilford, Translated from the Albanian by William Bland, 1987, Revolutionary Democracy Vol. VI, No. 2, September 2000, <https://revolutionarydemocracy.org/rdv6n2/socialreal.htm>

²²¹ ibid.

²²² Maxim Gorky, 'Soviet Literature, speech delivered in 1934', Gorky, Radek, Bukharin, Zhdanov and others "Soviet Writers' Congress 1934," page 25-69, Lawrence & Wishart, 1977. First published in 1935

²²³ আব্দুল বারির মতামত দ্রষ্টব্য।

²²⁴ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল আহমদ নাদিম কাসমি সম্পাদিত আদাব-এ-লতিফ নামের প্রগতিবাদী পত্রিকায়।

²²⁵ 'Being serious writers, Progressive writers have never encouraged obscenity', Sajjad Zaheer, Roshnai, translated by Amina Azfar, The Light: The History of the Movement for Progressive Literature in the Indo-Pakistan Sub Continent, Oxford University Press, Karachi, 2007, p. 252

²²⁶ Saadat Hasan Manto, Lazzat-e Sang, Naya Idara, Lahore, 1956, p. 20

²²⁷ Rakhshanda Jalil, 'Loving Progress, Liking Modernity, Hating Manto', Social Scientist, November-December 2012, Vol. 40, No. 11/12 (November-December 2012), p. 47

²²⁸ তদেব, পৃ- ৪৮

²²⁹ 'জন্মত-কি-বশারাত' গল্পে এক মৌলভি নমাজ আদা করতে বসে কোরান হাতে স্বর্গের নগ্ন ছুরীদের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মৌলভির স্ত্রী তা লক্ষ্য করে।

²³⁰ ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্য সামনে রেখে গোর্কি, মায়কভস্কি, হাওয়ার্ড ফাস্টের প্রতিকৃতি সামনে রেখে সভা হয়েছে। এবং মান্টোদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হচ্ছে ফৈজ আহমদ ফৈজের সভাপতিত্বে।

²³¹ তদেব, পৃ- ৫০-৫১

²³² Abid Khan, 'Ismat Chughtai: Telling it like it is, livehistoryindia.com', 8th

March 2020

²³³ Taraqqī pasand adab aur main, 'Aṣrī Āgahī 1, no. 1 (May 1979), p. 11

²³⁴ ইসমত চুঘতাই, কাগাজি হায় পৈরহান, পৃ- ২৯

²³⁵ তদেব, পৃ- ৫০-৫১

²³⁶ "Those writers who depend on the capitalists raise the slogan of 'Art for art's sake' and applaud the concept of individualism in literature. They produce a literature that is obscene, naked and sensational." Carlo Coppola, *Urdu Poetry 1935-1970*, p. 284

²³⁷ গতর শব্দটির অর্থ শরীর কিন্তু অপমানসূচক/হেয়সূচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার হয় এটি।
ভদ্রলোকীয় শব্দভান্ডারে শব্দটি অপশব্দ হিসেবে প্রচলিত।

²³⁸ Abid Khan, Ismat Chughtai: Telling it like it is, op. cit.

²³⁹ Priyamvati Gopal, *Marxism, Modernity and Postcolonial Studies*, Cambridge University Press, 2002, p. 151

²⁴⁰ Maxim Gorky, 'Soviet Literature, 1935', pp. 25-69

²⁴¹ সুমিতা চক্রবর্তী, 'দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাণ চিত্রকল্প নির্মাণ', দিবারাত্রির কাব্য
দীপেন্দ্রনাথ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ- ১৮৭-১৯৮

²⁴² Jakup Mato, Rinush Idrizi et al., *Socialist Realism*

²⁴³ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'সোভিয়েত সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাঃ তত্ত্ব ও সমীক্ষা',
মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ- ১১০-১৪

²⁴⁴ শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'সাক্ষাৎকারঃ চিন্মোহন সেহানবীশ', কলকাতা, ১৯৮৫

²⁴⁵ Subhoranjan Dasgupta, *Elegy and Dream*, pp. 38-39

²⁴⁶ Margaret Drabble Ed., *Regional Novel*, Oxford Reference, oxfordreference.com, accessed on 14th April, 2022

²⁴⁷ এজওয়ার্থের ‘Castle Rackrent’ উপন্যাস আয়ারল্যান্ডের একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখা আখ্যান এবং গল্টের ‘The Provost’ উপন্যাস আয়ারশায়ার অঞ্চলের প্রকৃতি ও জনজীবনের বাস্তবতার আখ্যান।

²⁴⁸ M. H Abrams & Geoffrey Galt Harpham, *A Glossary of Literary Terms*, ninth edition 2009, Wordsworth Cengage Learning, Boston, p. 231.

²⁴⁹ Lee Lemon, *A Glossary for the study of English*, Third Impression, Oxford University Press, Delhi, 1988, p. 116

²⁵⁰ Martin Gray, *A Dictionary of Literary Terms*, York Press, Beirut, 1985, p. 171

²⁵¹ J A Cuddon, *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, Penguin Books, 1999, p. 737

²⁵² K. D. M Snell Ed., *The Regional Novel in Britain and Ireland*, Cambridge University Press, First Published 1998, Digitally Printed Version 2008, p. 1

²⁵³ Peter Melville Ed., *The Encyclopaedia of the Novel*, Blackwell Publishing Ltd., 2011, p. 667

²⁵⁴ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পৃ- ৭৬৩

²⁵⁵ তদেব, পৃ- ৭৬৪

²⁵⁶ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’, *সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য*, সম্পা. অলোক রায়, সাহিত্যলোক, ২০০২, পৃ- ২-৩

- ²⁵⁷ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ- ২৪৫
- ²⁵⁸ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আঞ্চলিক উপন্যাস (প্রবন্ধ)', *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*, সম্পা. বাসুদেব মোশেল, বুকস্‌ওয়ে, কলকাতা, ২০০৮, পৃ- ৪২৪-৪৩০
- ²⁵⁹ রামেশ্বর শ, 'উপভাষা', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, চতুর্থ সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪১৯ সাল, পৃ- ৬৪৬
- ²⁶⁰ তদেব, পৃ- ৬৪৫-৬৮০
- ²⁶¹ Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of Bengali Language*, part 1, Calcutta University Press, 1926, pp. 138-140
- ²⁶² G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol. 5, Part 1, Office of the Superintendent, Government Printing, India, 1903, pp. 69-70
- ²⁶³ দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ- ৪০
- ²⁶⁴ বৌকা বাওয়া না হয়ে বৌকা ববা হওয়া উচিত কিংবা খব্বাস ন আহয়ে খবাস হওয়া উচিত বলে উদয়নারায়ণ সিংহের অভিমত। উদয়নারায়ণ সিংহ, 'সমালোচনার নামতা ও ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ি', *সাহিত্যের ভাষা ও ভাষার সাহিত্য*, অনুষ্টিপ, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৮৮-৯০
- ²⁶⁵ http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/SSC/ssc_1601/uponnash.pdf, পৃ- ১৯৭-৯৮
- ²⁶⁶ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টোঁড়াই-এর আগে-পরে', *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ২০-২
- ²⁶⁷ সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ৭২-৩
- ²⁶⁸ গোপাল হালদার, *সতীনাথ ভাদুড়িঃ সাহিত্য ও সাধনা*, পৃ- ৩৫

²⁶⁹ ঢোঁড়াইয়ের জন্মের পরে তার বাবা মারা যায় এবং মা বুধনি বাবুলাল চাপরাশিকে বিয়ে ক'রে ঢোঁড়াইকে বৌকাবাওয়ার কাছে রেখে দিয়ে চলে যায়। তাৎমাটোলি ও তাৎমা সমাজের প্রতি ঢোঁড়াইয়ের বীতশ্রদ্ধা বাড়ে এতে।

²⁷⁰ সতীনাথ ভাদুড়ি, *ঢোঁড়াই চরিত মানস*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ২৫৫

²⁷¹ দেবেশ রায়, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা', *বিজ্ঞাপনপর্ব*, সম্পা. রবিন ঘোষ, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১-২, কার্তিক ১৩৯৬, পৃ- ৫৩

²⁷² সতীনাথ ভাদুড়ি, *ঢোঁড়াইচরিত মানস*, দ্বিতীয় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ- ২১১

²⁷³ দেবেশ রায়, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা', *বিজ্ঞাপনপর্ব*, পৃ- ৫৩

²⁷⁴ অরুণকুমার ভট্টাচার্য, *আঞ্চলিকতাঃ বাংলা উপন্যাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ- ৯৭-৯৮

²⁷⁵ অশীন দাশগুপ্ত, 'বাপু', *প্রবন্ধ সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ- ৩১৬

²⁷⁶ বারিদবরণ চক্রবর্তী, *বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, ৩২০

²⁷⁷ অশীন দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫০-৫১

²⁷⁸ অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, 'অপরের খোঁজে বাংলা উপন্যাসঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'কঙ্ক' পত্রিকা, শ্রাবণ ১৪২১, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, পৃ- ৬৯-১০০

²⁷⁹ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, পৃ- ১০৯

²⁸⁰ It is imagined as a *community*, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of

people, not so much to kill, as willingly to die for such limited imaginings.-

Anderson, *Introduction to Imagined Communities*, 2006, p. 7

²⁸¹ Ngugi Wa Thiong'O, *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*, James Currey: Oxford, EAEP: Nairobi, Heinmann: Portsmouth, 2003, pp. 14-15

²⁸² Robinson Andrew, 'Bakhtin: Dialogism, Polyphony and Heteroglossia', *Ceasefire Magazine*, Jul, 2011

²⁸³ “কেবল আঞ্চলিক বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তোলাই যদি এর উদ্দেশ্য হত, তাহলে তা আদৌ উল্লেখযোগ্য হত না; নিছক দলিলচিত্র হলে আর দশটা বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের তালিকায় এর নামটাও যুক্ত হত, এর বেশি নয়... ইতিহাসের টানে তিস্তাপারের কোনো ভাষার, সে বাংলাই হোক বা রাজবংশী, সুস্থিত ও সুসংহত আদল নেই, সে-সবে সময়ের ছাপ পড়েছে, পড়েই চলেছে।” (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, ১১৫)

²⁸⁴ Totosy de Zepenttek & I-Chun Wang Ed., *Perspectives on Identity, Migration and Displacement*, National Sun Yat-sen University, Taiwan, 2010, p. 87

²⁸⁵ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ- ২৮৬-৯৯

²⁸⁶ সৈকত রক্ষিত, *মাড়াই কল*, বাগর্থ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ৫০-৭২

²⁸⁷ ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)’-র গ্রন্থবন্ধন অংশে দেবেশ লিখছেন যে, উপন্যাসের সঙ্গে নথি মিলিয়ে বৃত্তান্তের ধরণটা বেছে নিয়েছেন এবং এও শেষ পর্যন্ত উপন্যাসেরই রকমফের।
দেবেশ রায়, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, পৃ- ২৮

²⁸⁸ তদেব, ৬৫৭

²⁸⁹ অমিতাভ দাস, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৩৯-৪০

-
- ²⁹⁰ দেবেশ রায়, *উপন্যাসের বিবিধ সংকট*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৪৮-৪৯
- ²⁹¹ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কথোপকথন দেবেশ রায়', *উপন্যাস নিয়ে*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২০১
- ²⁹² অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭২
- ²⁹³ কম্পিউটার ও যন্ত্রের ভাষা তথা কার্যক্ষমতা আধুনিকতার অন্যতম মাপকাঠি হয়ে উঠছে, সেটাও এই অংশ থেকেই বোঝা যায়। আধুনিকতার বৈপরীত্যগুলি প্রকট হতে থাকে আরও।
সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, পৃ- ৮০-৮৯
- ²⁹⁴ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করেছিলেন বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার জন্যে। উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলায় সেই বন্দোবস্তের কুপ্রভাব বজায় রয়েছে। মফস্বলি বৃত্তান্তে উৎপাদন সম্পর্ক ও শ্রেণিসম্পর্ক সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়। ভূমি আইন প্রবর্তনেও আইনের ফাঁক গলে কৃষকশোষী ব্যবস্থা রয়ে গেছে।
- ²⁹⁵ অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক পত্রিকা, পৃ- ১৫৭
- ²⁹⁶ রমাপ্রসাদ নাগ, 'নবাবরুণ ভট্টাচার্যের কথাবস্তুঃ এক প্রতিস্পর্শী অ্যাজেন্ডা', অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯১-৯২
- ²⁹⁷ নবাবরুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ৪৫-৪৬
- ²⁹⁸ তদেব, পৃ- ২০-২১
- ²⁹⁹ তদেব, পৃ- ২৭
- ³⁰⁰ হারবার্টের ফ্যাকাশে চেহারা ও সবসময় ভয় পেয়ে থাকার কারণ বলতে গিয়ে যে যে বিষয়গুলির কথা বলা হয়, তাতে 'বিন আবার নতুন এক ধরনের ভয় নিয়ে এসেছিল' বলে কথক। কিন্তু বিনুর কথা আসে আরও দু'টি অধ্যায় পরে। আখ্যানস্থ কালকথায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে মিশ্রণ করা হয় বাক্যগুলিতে।

- ³⁰¹ খোড়োরবির মৃত্যুদৃশ্য, কুয়াশায় প্রেম, মরণজল, মৎস্যকন্যার ওলোটপালট ইত্যাদি শব্দবন্ধের চিত্রকল্পের পরে আচমকা “আমার নাম হারবার্ট। আমি বাঁট। বাঁট দেকেচো।” বাক্যগুলি চলে আসে। তদেব, পৃ- ২২
- ³⁰² তদেব, পৃ- ৪৩
- ³⁰³ তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘আখ্যানের সাতকাহন’, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৮
- ³⁰⁴ নবারুণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকারঃ দেবেশ রায়, অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৩-৫৪
- ³⁰⁵ শুভময় মণ্ডল, ‘হারবার্ট- বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারা’, *আখ্যান ১*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯
- ³⁰⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘বিভূতিভূষণঃ ক্ষুধার দলিল ও প্রাসঙ্গিকতা’, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, পৃ- ৩০
- ³⁰⁷ তদেব, পৃ- ১২০
- ³⁰⁸ অরুণ সেন, ‘দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত’, কঙ্ক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬২-৬৪
- ³⁰⁹ শিশির কুমার দাশ, *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৬, পৃ- ৬২-৬৩
- ³¹⁰ দেবেশ রায়, *বাংলা কথাসাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা*
- ³¹¹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, ১৯৯৭
- ³¹² দেবেশ রায়, অলৌকিক খণ্ড, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪৩-২৭৯
- ³¹³ লেখক এই আখ্যানের নামকরণ নিজেই করেছেন ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডলঃ উপন্যাস’।
- ³¹⁴ দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ১০৫২-৫৩
- ³¹⁵ অমলেন্দু চক্রবর্তী, ‘উপন্যাস ভাবনা’, *এবং মুশায়েরা, উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা*, সম্পা. সুবল সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-ডিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ- ৫৫

³¹⁶ Darza Mazi-Leskovar, 'Documentary Novel and Literary Journalism in the USA and Slovenia', *Journal of Modern Literature* Vol. 26 Num. 2, p. 184, JStor

³¹⁷ M. M. Bakhtin, *The Dialogic Imagination: Four Essays*, edited by Michael Holquist, translated by Caryl Emerson and Holquist, University of Texas Press, Austin, 1981, p. 33

³¹⁸ দেবেশ রায়, *প্রতিবেদন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, ভূমিকা, পৃ- তিন

³¹⁹ Darza Mazi-Leskovar, 'Documentary Novel and Literary Journalism in the USA and Slovenia', p. 181

³²⁰ নয়া সাংবাদিকতা শুরু হয় ১৯৬০-র দশকে; রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলনের আবহেই এর সূচনা। Darza Mazi-Leskovar, *ibid.*

³²¹ Jose Angel Garcia Landa, *Narrative Theory*, University of Zaragoza, online edition 2005, Introduction

³²² দেবেশ রায়, *প্রতিবেদন*, পৃ- ৫১-৫২

³²³ প্রিয়কান্ত নাথ, *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ- ৮৮-৮৯

³²⁴ দেবেশ রায়, *প্রতিবেদন*, পৃ- ৬৫-৬৬

³²⁵ রবিন পাল, *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৯৮

³²⁶ দেবেশ রায়, *প্রতিবেদন*, পৃ- ৯৬-৯৮

³²⁷ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেবেশ রায়ের গল্প-উপন্যাসঃ এক পাঠকের প্রতিক্রিয়ায়', সম্পা. উজ্জ্বল মজুমদার *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ২৩৯

³²⁸ দেবেশ রায়, *প্রতিবেদন*, পৃ- ১৬৯

³²⁹ তদেব, পৃ- ২০২

³³⁰ সরকারি সিদ্ধান্তে অরণ্যের শালগাছ কেটে ইউক্যালিপটাসের চাষ হয় বা কম সময়ে বেশি অর্থকরী।

³³¹ রবিন পাল, *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*, পৃ- ১০২

³³² শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ১৩৬-৩৭

³³³ রাধিয়ার বাপের সঙ্গে তমিজের বাপের সাদৃশ্য অনেক। তারা দু'জনেই মাছ ধরে এবং অলৌকিক আবহে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মাঝরাতে। প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত সম্পর্কে পড়ে মাছেদের 'অলৌকিক' ক্রিয়াকলাপ দেখে। পড়শি গ্রামবাসীদের কাছে সম্মাননীয় অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথনের জন্য। তমিজের বাপের মৃত্যু চোরাবালিতে আর রাধিয়ার বাপের জল-শুকোনো মাঠে।

³³⁴ ঋত্বিক ঘটকের *'তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৪)'* চলচ্চিত্রে পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গ বিশেষ উল্লেখ্য। মালোপাড়া ও তিতাসতীরস্থ নিম্নবর্গীয় গ্রামের জীবনযাপনে পৌরাণিক দেবদেবী লোকায়ত বিশ্বাস অঙ্গঙ্গী।

³³⁵ দেবেশ রায়, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬৬-৭০

³³⁶ তদেব, পৃ- ৫৪৮

³³⁷ গোপাল হালদার, *সতীনাথ ভাদুড়ীঃ সাহিত্য ও সাধনা*, অয়ন, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ- ৫৯

³³⁸ অশীন দাশগুপ্ত, *'ইতিহাস ও সাহিত্য', প্রবন্ধ সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ- ৫০-৫৯

³³⁹ সতীনাথ ভাদুড়ি, *গ্রন্থপ্রসঙ্গ, সতীনাথ গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ- ৪৯৪-৯৫

³⁴⁰ 'ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা' পর্বটি দ্রষ্টব্য। কিছুটা কমিক, কিছুটা প্রবল এবং কিছুটা অতিপ্রাকৃত আবির্ভাব।

-
- ³⁴¹ অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৮-৫৯
- ³⁴² দেবেশ রায়, বাঘার ও চাঁদ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, পৃ- ১২৩-২৫
- ³⁴³ দেবেশ রায়, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, পৃ- ৪৫৪
- ³⁴⁴ তিনটি উপ-অধ্যায় (৮৮, ৮৯, ৯০) জুড়ে কেলুর হাঁটার বর্ণনা। তাতে কেলুর বাস্তবের হাঁটাকে অলৌকিক খণ্ডে জুড়ে নিতে কথক নিষ্ঠ কাল্পনিকতার আশ্রয় নেয়। পৃ- ২৭৩-৭৭
- ³⁴⁵ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কেলুর শব্দসন্ধান ও রাষ্ট্রশব্দ', বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৬-৩৭
- ³⁴⁶ দেবেশ রায়, সাক্ষাৎকার, মুনিরা সুলতানার নেওয়া, ১২ই এপ্রিল ২০১৫, ঢাকা
- ³⁴⁷ Barbara Foley, *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1986, p. 186
- ³⁴⁸ Ibid. pp. 186-87
- ³⁴⁹ দেবেশ রায়, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, প্রাগুক্ত, ভূমিকা
- ³⁵⁰ তদেব, ২১-২২, পৃ- ৭৫-৭৭
- ³⁵¹ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'যোগেন মণ্ডলের একাকিত্ব', কঙ্ক পত্রিকা, পৃ- ৫৯-৬৮
- ³⁵² দেবেশ রায়, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, পৃ- ৭৮২
- ³⁵³ মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৬-৬৭
- ³⁵⁴ তদেব, পৃ- ৬৮-৬৯
- ³⁵⁵ তপোধীর ভট্টাচার্য, 'আখ্যানের স্বরাস্তর', দিবারাত্রির কাব্য, সম্পা. আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ- ১৩২

³⁵⁶ Roland Barthes, 'Introduction to the Structural Analysis of Narrative,' in *A Roland Barthes Reader*, ed. by Susan Sontag, trans. by Stephen Heath, Vintage, London, 1994, pp. 251-52

³⁵⁷ David Herman, *Basic Elements of Narrative*, Chichester, Wiley-Blackwell, UK, 2009

³⁵⁸ Barbara Foley, *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*, pp. 235-238

³⁵⁹ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ৪৩

³⁶⁰ তদেব, পৃ- ৪৯-৫০

³⁶¹ বানারির প্রতাপ গোলদারের অধীনস্থ খেতমজুরদের বাস্তবতা। রামেশ্বরের অধীনস্থ খেতমজুরদের বাস্তবতা।

³⁶² তদেব, পৃ- ১৩০-১৩১

³⁶³ Leonora Flis, *Factual Fictions: Narrative Truth and Contemporary American Documentary Novel*, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholar Publishing, 2010, p. 27

³⁶⁴ *ibid.* p. 28

³⁶⁵ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ১৫১-৫২

³⁶⁶ ইকোনমিক টাইমস পত্রিকায় ২০শে জুন ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত নিবন্ধ। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ভারতের প্রথমসারির পত্রিকা এটি।

³⁶⁷ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ২৪৫-৪৬

³⁶⁸ নবারণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ১৫৮-১৬০

³⁶⁹ তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের সময়*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ- ১৬৭

³⁷⁰ নবারুণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার দেবেশ রায়, অক্ষরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৪

³⁷¹ তদেব, পৃ- ২৫৬

³⁷² নবারুণের দূরদর্শীতা প্রশংসনীয়। সুরপতি মারিক রুসি মোদি, রতন টাটা, আত্মানিদের নিয়ে ‘বড় মাপের প্রফেশনাল ফুটবল’ চালু করতে চেয়েছিল (৫৪)। ২০১৪ সাল থেকে তেমনই পেশাদার ফুটবল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নামে চালু হয়েছে সারা দেশে। শিল্পপতি, চিত্রতারকা, ফাটকা পুঁজির মালিকরা বিনিয়োগ করছে সেখানে।

³⁷³ অরুণ কুমার দাস, ‘হারবার্ট উপন্যাসের রাজনীতি’, অক্ষরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ১১৫-১১৬

³⁷⁴ নবারুণ ভট্টাচার্য, হারবার্ট, পৃ- ৩৫

³⁷⁵ Leonara Flis, ‘Factual Fictions: Narrative Truth’, p. 27

³⁷⁶ রাশিদ আসকারী, ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাইঃ একটি নব্য ইতিহাসবাদী পঠন’, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৮

³⁷⁷ সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, ‘ঐতিহাসিক ইলিয়াসের চশমা ও বঙ্গভঙ্গরঙ্গ’, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, পৃ- ২৬৭

³⁷⁸ অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, আত্মপক্ষ, আটটা-নটার সূর্য, দে’জ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৫

³⁷⁹ তদেব, পৃ- ২৮-৩০

³⁸⁰ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মহাশ্বেতা দেবীঃ ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেলবন্ধন’, এবং মুশায়েরা উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. সুবল সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-দিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, ৪২-৫৬

³⁸¹ অশীন দাশগুপ্ত, ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’, প্রবন্ধ সমগ্র, পৃ- ৩৫-৭৮

³⁸² Mailer-এর উদ্ধৃতি, লেওনেরা ফ্লিস তাঁর বইতে উল্লেখ করছেন। এখান থেকেই ফ্লিস সত্য ও বাস্তবতার উপস্থাপনার সম্পর্ক খুঁজছেন এবং ফিকশন ও নন-ফিশনের প্রায়-বিলুপ্ত সীমার কথা বলছেন।

³⁸³ নবারুণ ভট্টাচার্য, ‘পেট্রল দিয়ে আগুন নেভাবার স্বপ্ন’, *আনাড়ির নাড়িঞ্জান*, পৃ- ৮২

³⁸⁴ ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে সশস্ত্র বাঙালিদের দুঃসাহসে ভরা অতীত মনে করিয়ে দেয় কথক। শ্লেষবাক্য দিয়ে কথক বিস্মৃত অতীতের রোমাঞ্চকর অবতারণা করে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে। পৃ- ২৬২-৬৩

³⁸⁵ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মহাশ্বেতা দেবীঃ ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেলবন্ধন’, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫০

³⁸⁶ তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘অভিজিৎ সেনের ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ’, *এবং মুশায়েরা উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭১-১০৮

³⁸⁷ Darja Mazi-Leskovar তাঁর প্রবন্ধে Leonara Flis-র গ্রন্থের পর্যালোচনায় এই বিষয়গুলি তুলে ধরছেন। “Documentary novel and literary journalism in the USA and Slovenia”, *Journal of Modern Literature*, Vol. 36, No. 2, Aesthetic Politics—Revolutionary and Counter-Revolutionary, Winter 2013, pp. 180-185

³⁸⁸ দেবেশ রায়, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, পৃ- ৬৪৯-৫০

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা, নিম্নবর্ণের প্রতিরোধ এবং আখ্যানের নবায়ন

বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ অন্তঃসংগতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭, ২২)

সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা ঔপন্যাসিকেরা আখ্যান-কাহিনী ও ভাষার নিরন্তর নিরীক্ষা চালিয়েছেন। চিরাচরিত ধারণায় উপন্যাস অর্থে যে আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত কাহিনীকে বোঝায়, তা অস্বীকৃত হয়েছে। কাল্পনিকতার সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব ও নৈকট্যের দ্বন্দ্বিক গতিপথে পরীক্ষা চালাতে চালাতে ঔপন্যাসিকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিলেন জীবন চিরাচরিত উপন্যাস-ধারণাকে মেনে চলা সূত্রায়িত যাপন নয় এবং নিটোল গল্প নয়। জীবনের গতিপথে যে নির্দিষ্ট সূচনা ও সমাপ্তিবিন্দু, তা উপন্যাসে থাকে না। যদি না আত্মজীবনী বা জীবনীমূলক উপন্যাস হয়, তাহলে ওই সূচনা ও সমাপ্তিবিন্দুর যথার্থ্য রক্ষা ক’রে উপন্যাস রচিত হতে পারে না। উপন্যাস প্রোটোগনিস্টের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত নয় এবং উপন্যাসের আখ্যান সেই জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তির গতিবিধি বর্ণনা ক’রে যাওয়া নয়। এমনকি মূল কুশীলবের বিস্তৃত জীবনবর্ণন কিংবা দীর্ঘ সাল-তারিখ-বছরব্যাপী ঘটনাক্রম উপন্যাসের কাহিনী না হতেও পারে। আখ্যানের নির্দিষ্ট/প্রধান কোনও সূচনা ও সমাপ্তিবিন্দু থাকতে পারে, কিন্তু এর পাশাপাশি বহু সূচনা ও সমাপ্তিবিন্দু থাকতে পারে। আখ্যানের এই না-কাহিনী হয়ে ওঠা উপন্যাসের বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল সত্তর দশক পরবর্তী সাহিত্যযুগে। প্রাতিষ্ঠানিক পণ্যসাহিত্যের মাপা ছাঁদ প্রত্যাখ্যান করা ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই বাচনের নিত্যনতুন বিন্যাস, বিচিত্রতর মানবিক সম্পর্কের টানাপড়েন, প্রকাশ্য জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল প্রচ্ছন্ন জীবনের আভাস এবং কালস্থানিকতার অস্বয়-বিচ্ছেদের দ্বন্দ্বকে উপন্যাসের ‘বিকল্প’মুখী ভাঙাগড়ার সচেতন পরীক্ষায় নিয়ে এলেন।¹ দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত (১৯৭৭)’ একটি দিনের কাহিনী,

কিন্তু সেই একটাই মাত্র দিন সমস্ত-জীবনের সিন্ধুদর্শন হয়ে উঠতে পারে। অনেক জীবন সেই একটা দিনের মধ্যে বহু সম্ভাবনা নিয়ে ঢুকে থাকে এবং কয়েকটা যুগ ওই একটা দিনের মধ্যেই উপস্থাপিত হয় পাঠকের সামনে। নবাবরুণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাস শুরু হয় একটি তারিখের উল্লেখে যেদিন রণজয় অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়ে আসে কলকাতায়, রাইফেলের সন্ধানে। লুকিয়ে রাখা রাইফেলের খোঁজ এই উপন্যাসের মোটিফ হয়ে ওঠে, যে সন্ধান শুধু বহিরঙ্গের উপাদান নয় বরং অন্তরঙ্গেরও। এই রাইফেল সন্ধানের অনুষ্ণেই ষাট-সত্তর দশক থেকে নব্বই দশকের মধ্যভাগ অবধি রাজনৈতিক সংস্কৃতি এসে পড়ে, রণজয়ের যাত্রাপথ এই বদলাভিমুখের প্রতিরোধী অবস্থানে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ও মিনিবুকে গদ্যের আঙ্গিক পুনর্নির্মাণ-বিনির্মাণ প্রবলভাবে উপস্থিত, যা বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ভাষাচরিত্র বদলে দেয়। আঙ্গিকের ভাঙাগড়া নিজেই এক কুশীলব হয়ে উঠে পাঠকে সচকিত ক’রে রাখে। ‘আমি ও বনবিহারী (১৯৯৮)’ রাজনৈতিক উপন্যাসটি আঙ্গিকের পরীক্ষায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কোলাজ জুড়ে জুড়ে আখ্যানকথন করে। উপন্যাসের শুরুতেই সংরূপভাগের বিরোধিতা ক’রে জানিয়ে দেন, এমন গদ্য-রচনার চেষ্টা করছেন যা বিষয়ে ও আঙ্গিকে কবিতার মুখপাত্র হতে পারে।^২ ‘একক প্রদর্শনী (১৯৭১)’ উপন্যাসে ঘোষণা ক’রে দেন, “আমি ও আমার উপন্যাস একই”। ‘গদ্য সাহিত্যকে যা ডোবায় তা হল ন্যারেটিভ স্টাইল। এখানে তা নষ্ট করেছি’- এই মর্মে ‘এখন আমার কোনো অসুখ নেই’ উপন্যাসের শুরুতে স্বীকারোক্তি রাখেন; অন্য উপন্যাসেও সচেতনভাবে এই পদ্ধতির পরীক্ষা চালান। দেবেশ রায়ের লেখকচেতনায় উপন্যাস সীমায়িত শিল্পপ্রকরণ নয়, সেখানে সামূহিক মানবজীবন ও তৎসংলগ্ন সময় নিয়ে নিরন্তর পাঠবদল চলে। ‘বৃত্তান্ত’ রচনায় এক অখণ্ড সময়ের অনুভব কাজ করে তাঁর চিন্তনে- সেই সময়স্থিত মানুষের চলমান জীবনের ইতিহাসকে আখ্যানবদ্ধ করতে সম্মুখপ্রসারী অন্ত-খোলা উপন্যাস লেখেন দেবেশ।^৩ মঙ্গলকাব্য, পাঁচালির ভেতরের বর্ণন থেকে আখ্যানরূপ খুঁজতে চান দেবেশ- দেবেশের বৃত্তান্তগুলিতে আগাগোড়া একটা সন্দর্ভ চলে যেখানে আখ্যান (Narrative) এবং বাচনের (Discourse) টানাপড়েন প্রতীয়মান হয়।

মৌখিক সাহিত্যের ভাষা দ্বারা লিখিত সাহিত্যের ভাষাও প্রভাবিত হচ্ছে। কথক আর শ্রোতা মিলেই গল্পটা তৈরি করেছে, গল্পের ভাষা তৈরি হচ্ছে। কারণ, সেই শ্রোতাই পরবর্তী কথক। চেরাগ আলির ‘পাওনা শোলোক’ এই ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখে। বৈকুণ্ঠ গিরি ভাষা ও গল্পের নির্মাণের এই প্রবহমানতাকে বয়ে নিয়ে চলে। জালাল মাস্টার প্রায় পাঁচ প্রজন্ম পরে মনে রাখে বৈরাগীর ভিটার মাহাত্ম্য, আনোয়ারের মতো আধুনিক শিক্ষিত যুবাকে সেই পাঠ দেয়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে মৌখিক সাহিত্যের উপাদান প্রচুর। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ বাজিকরদের বহু দশকের যাপন ও যাত্রাপথের আখ্যান। লিখিত সাহিত্যের ভাষা ও আখ্যানপদ্ধতি এর ফলে সংক্রামিত হচ্ছে- উপন্যাসের রাজনীতি প্রভাবিত হচ্ছে নিম্নবর্গীয় জীবনবৃত্তান্ত, যাপন ও ভাষার উপাদানগুলির দ্বারা।

নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়নের রাজনীতি এবং আখ্যানে নিম্নবর্গের অবস্থান

লৌকিক বিশ্বাসে অলৌকিকের প্রার্থনায় অ-ভদ্রলোক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ধারণ করতে পারে। ‘খোয়াবনামা’-র ক্ষেত্রে তা যেমন সত্যি, তেমনই মহাশ্বেতার ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘অরণ্যের অধিকার’-এর ক্ষেত্রেও সত্যি। নিম্নবর্গীয় সমাজের এই বিশ্বাস, লোকাচার, মুখফেরতা আখ্যান, বহমান আচার-রীতি উপন্যাসের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। সতীনাথ ভাদুড়ির ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসের আঙ্গিকে বিষয়বস্তুতে এই ধর্মভাব, এই ঐহিক থেকে দৈবীভাবে যাতায়াত, আরোপিত দেবত্বের মিথ ইত্যাদি অঙ্গঙ্গী হয়ে থাকে। এই ঐহিক থেকে দেবত্বে উত্তরণের মধ্যেও রাজনীতি থাকে, যে রাজনীতিতে অন্ত্যজ শ্রেণির রাজনীতি এবং সারা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ক্রিয়া করে। অন্ত্যজ শ্রেণি মহাত্মা গান্ধীকে মনে করে তাদের দ্রাভা; বিদেশি শাসকের থেকেও দেশি উচ্চবর্গের কাছে তারা আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরে ব্রাভ্য, সেই নিম্নবর্গীয় অবস্থানের ‘মুক্তিদূত’ হয়ে ওঠেন গান্ধী। অন্যদিকে, দেশের রাজনৈতিক পরিসরে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি দেওয়ার অবলম্বনও তিনিই। তাই তাৎমাটেলির নিম্নবর্গ বিলিতি

কুমড়োর খোসায় ‘গান্ধী বাওয়া’কে আবিষ্কার করে, তাকে পূজো করে। রেবন গুণীর মতো অঞ্চলপ্রসিদ্ধ সিদ্ধবাক্ তাতে শ্রদ্ধাভরে বলে, “লোহা মেনেছি; লোহা মেনেছি আমি গান্ধী বাওয়ার কাছে।” (ভাদুড়ি, ২০১১, ২৬) গান্ধী বাওয়ার দেবত্ব প্রকাশ পায় বেলগাছের তিনটি পাতায় লেখা নামের আদলে এবং মুখফেরতা গুজবে গুজবে। উপন্যাস যে সময়ের রাজনীতিকে ধারণ করে, তার প্রমাণ আরেক বিরোধভাসেও পাওয়া যায়। গান্ধী-সম্পর্কিত-মিথ তথা ‘গান্ধী বাওয়া’র আরোপিত দেবত্বের প্রভাব যখন মুছে যায় কংগ্রেসের রাজনীতির প্রভাবে। বিদেশি শাসক থেকে দেশী শাসকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় এবং উচ্চবর্ণ-উচ্চবর্ণ শোষণকাঠামো অপরিবর্তিত রাখে। লাডলিবাবুর মতো জোতদার বৃহৎচাষীদের হাতে ক্ষমতাব্যয় ন্যস্ত হয় কংগ্রেসের ও অঞ্চলের। ঢোঁড়াই এই রাজনীতিকে ধারণ করে। “কংগ্রেসী আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্ত ক’রে নিম্নবর্ণের আশাভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের বেদনা, এই বেদনার অন্তর্দর্শী সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা, এই সংবেদনশীলতার সংযত গভীর মর্মস্পর্শিতা অনুধাবন করতে ঢোঁড়াই ছাড়া বিকল্প নেই।” (সামন্ত ২০০২, ১৮) সতীনাথই সম্ভবতঃ প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক, যিনি অ-বাঙালি কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখলেন নিম্নবর্ণের যাপন নিয়ে এবং উপন্যাসের পটভূমি স্থাপিত করলেন বাংলার বাইরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের প্রবেশধিকার আখ্যানে থাকল না। নিম্নবর্ণের যাপন, লোকাচার, বিশ্বাস এবং ঐহিক-দেবত্বে উত্তরণ অবতরণের ভাষা আখ্যানের প্রতিটি পরত নির্মাণ করল। রণজিৎ গুহ লিখছেন- “নিম্নবর্ণের চৈতন্যের অপর যে দিকটি লক্ষণীয়, তা হচ্ছে ধর্মভাব... ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়” (গুহ ১৯৯৮, ৪৩) এখানে ধর্মভাব বলতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করছেন না রণজিৎ। তাঁর ইঙ্গিত চেতনার এক ‘এলিয়েনেটেড’ অবস্থার প্রতি, যা জড় বা জীব কোনও সত্তাকে ধারণার মধ্যে আনতে পারেনা এবং এক বিষয়ের গুণ অন্য বিষয়ে আরোপ করে। গান্ধী বাওয়ার নির্মাণ এই ধারণা থেকেই আসে। ঢোঁড়াই রামিয়ার হৃদয় জয় করতে রেবন গুণীর মন্ত্র পড়া আর ‘চক্রর মারা’র ওপরে আস্তা রাখে। “রোজা, রোজগার, রামায়ণ এই নিয়েই লোকের জীবন।”- তাৎমাটুলির লোকেদের এই উপলব্ধি

লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার আর অলৌকিক প্রার্থনার দিনযাপনের সারাংশ। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' আখ্যানে মানুষ হিসেবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ- সতীনাথের ইতিহাসবীক্ষা আলোচনায় তপোধীর ভট্টাচার্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন এই আখ্যানে- আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণমানসের নিয়ত নবীকৃত প্রতিরোধের বাস্তবতা, ধ্রুপদী রামায়ণকথার লোকাযত পুনর্নির্মাণ এবং নন্দনের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে আখ্যানপরিসরে।⁴ সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতে প্রাকৃত জীবনগাথা কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, সতীনাথ সেই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করছেন এবং জনজীবনের নিয়ত যাপনের চলমান ইতিহাসের বিবরণ দিচ্ছেন। আর, এহেন যাপনের ভাষা যে মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক ভদ্রলোকীয় আখ্যান থেকে আলাদা, তা বোঝা যায় 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসেও। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত আগের (১৯৪২-র অগাস্ট আন্দোলন থেকে) ও পরের ঘটনাবলী বিবৃত হচ্ছে তন্ত্রিমা ও পোলিয়াটেলির নিম্নবর্গীয় জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে। উপনিবেশোত্তর সময়েও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলি থেকে যাচ্ছে তথা আধিপত্য করছে। তাঁদের যাপনেও অজস্র লোকাচার, অনাধুনিক সংস্কার, মিথ-মুখফেরতা কাহিনীর সমাবেশ এবং অভদ্রলোকীয় সংলাপ। আখ্যানবদ্ধ এই জীবন যে এতদিনের চেনা মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোকি আখ্যানবদ্ধতা থেকে আলাদা, তা প্রশান্ত ডাক্তারের চিঠিতে প্রকাশ পায়, "তুমি যে ভাষায় কথা বল এরা তা বোঝে না। তুমিও এদের ভাষা বুঝবে না। তুমি যা খাও, এদের সে খাবার জোটে না। তুমি যা পর এরা সে-সব চোখে দেখে নি। তোমার শোয়াবসা, হাঁটাচলা, হাসা, বলা- কোথাও এদের সঙ্গে মিল নেই।" (রেণু ১৯৭৫, ২৩৩) এই যে যাদের সঙ্গে উপন্যাসের ভদ্র-শিক্ষিত কুশীলবের 'মিল' নেই, তাদের সঙ্গে বৃহত্তর 'মূলধারা'র পাঠকবৃন্দেরও মিল নেই। তবু, তাদের জীবনযাপন উপন্যাসের আধার। সতীনাথ, ফণীশ্বরনাথের আগে আরেকজন বাঙালি ঔপন্যাসিক এই 'অমিল যাপন'-এর এক সম্প্রদায়কে নিয়ে উপন্যাস রচেছিলেন, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের মাঝি সম্প্রদায়ের যাপন শব্দে ভদ্রবৃত্ত থেকে ভিন্ন, তবু কিছু সাংস্কৃতিক-সামাজিক উপাদানে মিল রয়েছে⁵। এই

উপন্যাসের পটভূমি বাংলা ও বাঙালির (এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের) যাপন, ইলিশ মাছ বাঙালি ভদ্রজীবনে ওতঃপ্রোত এবং নদীকেন্দ্রিক আখ্যান ও উপাখ্যান বাংলা উপন্যাসে অপরিচিত নয়। যদিও এই উপন্যাসে মানিক একাধারে উপনিবেশিত সাহিত্য প্রকল্পনা থেকে সচেতন দূরত্ব তৈরি করে নিচ্ছেন ভাষা ও কুশীলবনির্মাণে; এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী উত্থানের শীর্ষসময়ে মেহনতি মানুষদের নিয়ে শ্রেণিকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখছেন। মানিক মেহনতি মানুষের নিম্নবিত্ত জীবন সংগ্রামের সহমর্মী হলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোপাড়ার আখ্যান লিখলেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে। এই আখ্যানে ব্যক্তিগত ও সামূহিক অস্তিত্বের দ্বিবাচনিকতাকে ধারণ করেছে সরল দৈনন্দিন ভাষাপ্রকল্প। তিতাসের ‘শাহী মেজাজ’ (১৩) আখ্যানের শেষে ইতিহাসের অমোঘ সংকেত বয়ে নিয়ে আসে- “এখন সে মালো পাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই।” (মল্লবর্মণ ৩৫০)- সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলিতদের অনিবার্য ধ্বংসস্তূপ সাজানো রয়েছে ভাষায়, বিবরণে। মালোদের অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হওয়া এবং জাতিগত বৈষম্যে শোষিত হওয়া সমান্তরাল বিন্যাসে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। একইসঙ্গে আলাগা হয়ে যায় কৌমসমাজের বাঁধন এবং গোষ্ঠীবদ্ধ যাপনের সংস্কৃতি ক্ষইতে শুরু করে। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসের কাহিনিকাঠামো এই পরম্পরাতেই এগোয়। সেখানেও অর্থগত ও জাতিগত বৈষম্যের নিষ্ঠুর ছায়ায় বাধ্যতঃ দিনযাপন করে বাজিকররা এবং আখ্যানের শেষলগ্নে তাদের কৌমজীবন ভেঙ্গেচুরে যায়। মালোদের সঙ্গে বাজিকরদের একটাই পার্থক্য- মালোদের স্থিতি ছিল এবং তিতাস নদীকে ঘিরে সেই স্থিতি ছিল। বাজিকরদের শতক-দশকব্যাপী আর্থ-সামাজিক স্থিতি খুঁজতে হয়েছে, বিপন্নতার মধ্যে দিয়েই তাদের যাত্রা। কিন্তু, মালোদের যাত্রা বিপন্নতার দিকে; ক্রমশঃ আর্থ-সামাজিক ধ্বংসের দিকে যেতে যেতে তারা দেখে “নদীর দুই তীর ঘেঁষিয়া চর পড়িয়াছে। একটিমাত্র জলের রেখা অবশিষ্ট আছে। তাতে নৌকা চলে না... অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে” (মল্লবর্মণ ৩৫৩-৫৪) তাদের মাছ ধরার একমাত্র পেশা আঁকড়ে থাকে তারা। বাজিকররা উচ্চশ্রেণি, উচ্চবর্ণ ও ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে যুথবদ্ধ প্রতিবাদে ভয় পেত- স্বল্পকালীন স্থিতিটুকু হারানোর ভয়। মালোরাও প্রতিবাদ করতে ভয় পায় এবং সেই

প্রতিবাদহীনতায় তাদের সংস্কৃতি থেকে যাপন সবকিছুই ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে আরও।^৬ এই প্রতিবাদহীন অবস্থার ভিত্তিতে শুধুমাত্র আর্থিক নয়, সাংস্কৃতিকও। সেইজন্যেই যাত্রাদলের আধিপত্যে মালোদের সংস্কৃতি হীনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যাত্রাওলাদের আধুনিক সংস্কৃতি, যা শহুরে আধুনিকতা স্পর্শ ক'রে এসেছে, তা ধীরে ধীরে মালোদের কৌম-সংস্কৃতিকে ভেঙে ফেললেও নীরব অসহায়তা ছাড়া মালোদের কিছু রইল না। অদ্বৈত দু'টি উল্লেখযোগ্য উপাদান আখ্যানে সংযোজিত করলেন- (১) নিছক ভাঙনের আখ্যান নয়, সেই ভাঙনের আর্থ-সাংস্কৃতিক কারণগুলিও অনুসন্ধান করলেন আখ্যানের পরিসরে এবং (২) নিম্নবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিরোধ। উচ্চবর্ণের চাপিয়ে দেওয়া আর্থ-সামাজিক বদলের অভিঘাত সহজে মালোদের পেড়ে ফেলেছিল এইজন্যেই। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-র শারিবার আখ্যানগত পূর্বচরিত্র হয়তো 'তিতাস একটি নদীর নাম'-র অনন্ত- তাদের ঘিরে ভবিষ্যতের আশাপ্রবাহ চলতে থাকে। আখ্যানকার যে ভাষাচিত্র নির্মাণ করেন সেখানে সামাজিক ভাঙনের ভাষায় নদীর ভাষা ওতঃপ্রোত। তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে, উপন্যাসের বাচন গভীরভাবে চিহ্নিত এবং কথকতা সমাপ্তিতে পৌঁছে গেলেও কথা ফুরোয় না। আখ্যানের ভরকেন্দ্রে থাকে মালোদের সামূহিক অস্তিত্ব।^৭

রাজিৎ গুহের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সংজ্ঞায়নে ক্ষমতাকাঠামোর স্তরভেদ বিচার্য। উপনিবেশিত ভারতবর্ষে যারা যারা ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষস্তরে প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল তারা উচ্চবর্ণ, কিন্তু তাদের মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। বিদেশি উচ্চবর্ণের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উচ্চবর্ণের পার্থক্য অর্থাৎ যাঁরা শ্বেতাঙ্গ আমলা, কর্মচারী, সেনা, ভূত্ব ইত্যাদি এবং শিল্পপতি, বণিক, ক্ষেতের মালিক, যাজক, বেসরকারি শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী। দেশি উচ্চবর্ণের সর্বভারতীয় প্রভুরা বৃহত্তর সামন্তপ্রভু, আমলা, পুঁজিপতি, শাসনযন্ত্রের অন্যান্য ক্ষমতার অধিকারী। আঞ্চলিক ও স্থানীয় উচ্চবর্ণীয় প্রতিনিধিরা সর্বভারতীয় বেশি ক্ষমতালালী উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিশেষ অবস্থায় আঞ্চলিক উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়। স্থানীয় উচ্চবর্ণের আরেকটি রকমফের যারা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে “প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার

ধর্ম অনুযায়ী না।” (গৃহ ৩৩) স্থানীয় উচ্চবর্গদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অসমতার ফলে উদ্ভূত স্তরভেদ সংজ্ঞাগত জটিলতার সৃষ্টি করে, তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থানে খাটো হয়েও তারা কেউ কেউ ‘অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে’ উচ্চবর্গের হয়ে কাজ করে। এরা বস্তুতঃ দোদুল্যমান বর্গ, পরিস্থিতি অনুযায়ী এদের অবস্থানগত পক্ষপাত বদলায়, বেশিরভাগ সময়ে তা উচ্চবর্গের সপক্ষে। উপর্যুক্ত উচ্চবর্গীয় সংজ্ঞায় আঁটে না যারা, ‘শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি’ যাঁরা, তাঁরা নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়নের অন্তর্ভুক্ত।^৪ সতীনাথ ভাদুড়ি, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়ের উপন্যাসে এহেন স্থানীয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্বের সন্ধান মেলে। এঁদের উপন্যাস-গল্পে ঔপনিবেশিক পর্যায়েই শুধু নয়, উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও উপর্যুক্ত স্তরের উচ্চবর্গ অস্তিত্বশীল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা ও মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা দু’টির সমালোচনা রেখে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ধারা ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পুনর্বিশ্লেষণে ব্রতী হল। গ্রামশির ‘কারাগারে রচনা’-র পাতা থেকে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি প্রতর্ক হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, যেখানে সাবঅলটার্নের অর্থ অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যযুক্ত সমাজে আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্যকারীদের (hegemonic) অধীনস্থ শ্রেণি। আধিপত্যকারী শ্রেণি আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্র তো বটেই, এমনকি সাংস্কৃতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রেও শাসননির্দেশ বজায় রাখে- কৃষকচেতনা ও শ্রমিকচেতনাকে আচ্ছন্ন ক’রে রাখে শাসক শ্রেণির মতাদর্শ। আভিধানিক অর্থে ‘সাবঅলটার্ন’ অর্থ যে ব্যক্তি পদাধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা আচরণে নিম্নপদস্থ, যিনি নির্দেশপালনে বাধ্য।^৯ গ্রামশি এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিস্তৃত ক’রে প্রান্তিকদের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলেন।^{১০} সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গ সর্বদা ‘subject to the activity of the ruling class’ এবং শাসকশ্রেণির অধীনস্থ ‘বশব্দ’ থেকে বাধ্যতঃ শাসনপ্রক্রিয়ায় সম্মতি দিয়ে চলে তারা। শাসকশ্রেণির মতাদর্শগত আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান ক’রে চিরস্থায়ী বিজয় অর্জন করলে তবেই উচ্চবর্গের সামাজিক-রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারবে। ‘প্রলেতারিয়েত’ বা নির্বিত্ত

শ্রমিকশ্রেণির প্রতিশব্দ হিসেবে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি ব্যবহার করা ছাড়াও সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাবিন্যাসের প্রভুত্বকারী (dominant) শ্রেণির বিপরীত মেরুতে থাকা অধীনস্থ ক্ষমতাহীনের প্রতিশব্দ হিসেবেও গ্রামশি ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটি ব্যবহার করছেন। ‘hegemony’ শব্দের দ্বারা গ্রামশি বস্তুগত ও মতাদর্শগত শাসনযন্ত্রের যোগসাজশকে বোঝালেন এবং এই হেজিমনি অনুশীলনক্ষেত্রের (praxis) একটা রূপভেদ। গ্রামশি নাগরিক সমাজে মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, যে প্রতিষ্ঠানগুলি শাসকশ্রেণির আধিপত্য টিকিয়ে রাখে।¹¹ কর্তৃত্বের অধিকার, প্রভুত্বের অধিকার, শ্রেণিশোষণের অধিকারের সুস্পষ্ট পার্থক্য গ্রামশির লেখায় নেই বলে এবং কৃষকের চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা গ্রামশি বলছেন বলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সমালোচনা করছেন। যদিও, নিপীড়িত কৃষকর চেতনা সামন্তশ্রেণির চেতনার বিপরীতে অবস্থান করে বলে এবং সেই কৃষকচেতনার ভিত্তি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-ভাবাদর্শকে গুরুত্বসহ অনুধাবনের কথা গ্রামশি বলছেন বলে তাতে সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছেন পার্থ।¹² ভারতীয় নিম্নবর্গ তত্ত্বের উদ্গাতারা উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সংজ্ঞা নির্ধারণ করছেন ‘সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই মূল কথা।’ উৎপাদন সম্পর্ক তথা শ্রেণিসম্পর্কের বিকল্প হিসেবে নয় বরং শ্রেণিদ্বন্দের অসম বিকাশকে চিহ্নিত করার জন্য উৎপাদন সম্পর্কের সম্পূরক ধারণা হিসেবে এই সংজ্ঞায়েন হচ্ছে। (৭) রণজিৎ গুহ মূলতঃ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ধারাগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দিয়ে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনাকে উচ্চবর্গের চেতনার বাঁধাছক থেকে সরিয়ে আনতে চাইলেন- নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস ও কৃষকচেতনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজতে চাইলেন। একদিকে ঔপনিবেশিক ও বিদেশি ইতিহাসবিদদের দেখানো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাস অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের (বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসলেখ) কথিত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের জয়গাথা- দু’টি ধারাতেই উচ্চবর্গের ভূমিকা প্রধান এবং ব্যাপকতর নিম্নবর্গীয় জনগণ অবজ্ঞাত।¹³ নিম্নবর্গের চেতনা গড়ে উঠছে অধীনস্থ থাকার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও সংগ্রাম থেকে- এই সংগ্রাম মূলতঃ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। উচ্চবর্গের লিখিত ইতিহাসে, নথিতে

নিম্নবর্গের চেতনার সাক্ষ্য মেলে না; উচ্চবর্গের তৈরি করা নথি-দলিলে নিম্নবর্গের চেতনার খোঁজ পাওয়া যায় বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহদমনের ঐতিহাসিক দলিলে।¹⁴ ‘খোয়াবনামা’-র তমিজ, ‘অরণ্যের অধিকার’-এর বিরসা ও তাঁর সহযোদ্ধারা, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এর বাজিকররা এহেন সংজ্ঞায়নে মিলে যায়। উক্ত চরিত্রগুলির নির্মাতা লেখকরা প্রচলিত ইতিহাসলেখতে উপস্থিত উচ্চবর্গীয় চেতনায় অন্তর্ঘাত ঘটান। প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণি প্রভু-অধীনস্থ ক্ষমতাসম্পর্ক বজায় রাখতে একটা মতাদর্শগত আবরণ তৈরি করে এবং সেই আবরণ রক্ষা করে, তারই তৈরি করা ‘রেজিমেন্ট’।¹⁵ জহর সেন মজুমদারের মতে, এই রেজিমেন্টই মানুষকে অধীনতার সম্পর্ক মানতে বাধ্য করে। “কর্তৃত্ব যাদের ব্যবহার করতে করতে আর্থসামাজিক কাঠামোর তলানিতে পৌঁছে দিয়ে জীবনের স্বর ও সঙ্গতি কেড়ে নেয়, তারাই নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি।” (সেন মজুমদার ২০০৭, ১৩) বসাই টুডু এই নিম্নবর্গীয় চেতনার উপলব্ধিতে পৌঁছায়- একদিকে রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্র দ্বারা অত্যাচারিত, একদিকে স্থানীয় প্রভুবর্গ দ্বারা নিয়তশোষিত এবং অন্যদিকে তার পার্টির কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্বের তৈরি করা প্রভু-অধীনস্থ সম্পর্কের দ্বারা পিষ্ট। সামন্তর মতো নেতৃত্ব মতাদর্শগত ‘রেজিমেন্ট’-র অবতারণা করে বসাইদের ওপরে প্রভুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। দোপ্দি, মঘাই, বসাইদের দ্রোহ জীবনের হারিয়ে যাওয়া স্বর ও সঙ্গতি ফিরে পাওয়ার চেষ্টায়।

নিম্নবর্গ তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা নিম্নতল থেকে ইতিহাসকে দেখার (history from below) প্রতর্ক হাজির করলেন। এক্ষেত্রে ‘নিম্নতল’-এর ধারণা শুধুমাত্র শ্রেণিধারণায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। গায়ত্রী স্পিভাক ইতিহাসলেখ বিনির্মাণের যে ধারণা দিলেন, তাতে নিম্নবর্গীয় চেতনার সমস্যা, ইউরোপীয় মানবতাবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় বিদ্যাচর্চার বিরোধ, ইতিহাসলেখের নীতি (historiography as strategy) এবং নারীসম্পর্কিত ধারণাসমূহের (আঞ্চলিকতা ও নারীর ধারণা-রূপক এবং ক্ষমতার সাম্প্রদায়িক ধরণ ও নারীর ধারণা) বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করলেন।¹⁶ গায়ত্রীর মতে, ইতিহাস থেকে উঠে আসা নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর আসলে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয়, তা উচ্চবর্গের নির্মাণ- কারণ ইতিহাসের বহু কণ্ঠস্বরে যেখানে উচ্চবর্গীয়

‘আত্ম’-স্বরের আধিপত্য সেখানে নিম্নবর্গের ‘অপর’-স্বর শুনতে পাওয়া সহজ না। নিম্নবর্গের সমষ্টিগত চেতনা থেকে তাঁদের ‘নির্মাণ’ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান প্রয়োজন। “Subaltern consciousness as emergent collective consciousness” (Spivak 1987, 206) গায়ত্রী তৃতীয় বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্য জগতের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করতে ঔপনিবেশিকতার ‘উচ্চস্মন্যতা’কে প্রত্যাখ্যান জানালেন। স্পিভাক বিশ্লেষণ করলেন ঔপনিবেশিক-বিরুদ্ধতা কীভাবে এক স্বতন্ত্র বুর্জোয়া চরিত্রলাভ করল এবং উপনিবেশোত্তর যুগেও কীভাবে তা সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের পুনরুৎপাদন ক’রে চলল।¹⁷ ‘can the Subaltern Speak?’ প্রবন্ধে স্পিভাকের তত্ত্বে বিশ্লেষিত হচ্ছে যে, নিম্নবর্গ কিছু বলতে চাইলেও উচ্চবর্গের অন্যান্যদের তা শোনার সহিষ্ণুতা নেই। ঔপনিবেশিক উৎপাদনব্যবস্থায় নিম্নবর্গের ইতিহাস ম্লান, তাদের কথা অশ্রুত এবং নিম্নবর্গ হিসেবে নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়।¹⁸ স্পিভাক শ্রোতার সঙ্গে নিম্নবর্গের অশ্রুত স্বরের দূরত্বের জন্য ‘কোলাহল (noise)’-কে দায়ী করছেন- এই কোলাহলের জন্যই প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে যোগসাধন হয় না। নিম্নবর্গ হিসেবে নারীদের না-বলতে-পারা কথনের সিদ্ধান্তে আসছেন স্পিভাক- কিন্তু স্পিভাক ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গ-নারীদের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব (social agency) ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করছেন না। এই ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গসম নারীরা আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস-নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যেই তাঁদের রাজনৈতিক ও বাচনিক সত্তাকে খুঁজে পান।¹⁹ ঔপনিবেশিকদের চাপিয়ে দেওয়া সভ্যতার নীতিবোধ থেকেই বিশ্লেষিত হল তাঁদের আচরণ এবং তাঁদের প্রতি আচরণ। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা ভারতীয়দের ‘বর্বরতা’ থেকে মুক্ত করতে সংস্কারবাদী ‘দায়িত্বভার’ নিলেন।²⁰ দেশি বাবু উচ্চবর্গরা ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে দহরম মহরম বাড়িয়ে একযোগে দেশি নিম্নবর্গকে শোষণ করা শুরু করল বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গগত বৈষম্যের দ্বারা। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা মূলবাসী মানুষের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও দেশি উচ্চবর্গ বিদেশি উচ্চবর্গের সহায়তা করল- শাসনের ভাগ পেতে শ্বেতাঙ্গদের দলে যোগ দিল। ‘খোয়াবনামা (১৯৯৬)’ উপন্যাসে মিথপ্রবাহে আখ্যায়িত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ‘রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’ উপন্যাসে বাজিকরদের দৃষ্টিকোণ থেকে

দেখা সাঁওতালদের লড়াই, ‘অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)’ উপন্যাসে ইংরেজ ও দিকুদের বিরুদ্ধে বিরসা মুণ্ডার দ্রোহ নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের এই অবস্থান স্পষ্ট করে। শুধুমাত্র ‘শ্রেণি’ না, বর্ণ এবং ধর্মগত বৈষম্য উপরোক্ত আখ্যানগুলিতে তাৎপর্যপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক শোষণের ক্ষেত্রে বর্ণ, জাতিগত ‘উচ্চম্ন্য-হীনম্ন্য’ ব্যবধানের কথা ফ্রাঞ্জ ফ্যানঁ লিখছেন। উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক উপকাঠামো আদতে উপরিতলের (superstructure) অংশ ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রয়োগগত সমানুপাতিক সম্পর্ক ছিল।²¹ ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে হারবার্ট সরকারের পূর্বপুরুষেরা কেউ ফরাসিদের মদ, মহিলার যোগান দিত, কেউ বা ইংরেজদের তাঁবেদারি করত। মূলবাসী নিম্নবর্ণ ও অধীনস্থ নিম্নবর্ণ ‘অপর’ অভিধায় পর্যবসিত হল- নিম্নবর্ণকে হীনম্ন্যতায় তথা অধীনস্থ বর্ণের অবস্থানে বিশ্বাস করানো হল। রণজিৎ গুহর মতো ফ্যানঁও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছেন। উপনিবেশিত মানুষের মনে ‘আদর্শ রাষ্ট্র’-র ধারণায় গেঁড়ে বসল পাশ্চাত্যধারণার ‘রাষ্ট্র’ধারণা এবং তাঁদের মন চিরকালের মত উপনিবেশিত হয়ে রইল। উপনিবেশোত্তর (post colonial)²² রাজনীতিতে উচ্চবর্ণ সেই অধীনস্থ চেতনার ফায়দা তুলে নিম্নবর্ণের ওপরে শাসনভার বজায় রাখল- ‘খোয়াবনামা’, ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ উপন্যাসগুলিতে এই কাঠামো আখ্যায়িত হয়েছে। রমণী পঞ্চগায়েতের কাছে খেতখেতুর সমর্পণ, শরাফতের কাছে তমিজের বাপের সমর্পণ বা গয়ানাথ জোতদারের কাছে বাঘারুর সমর্পণ তারই উদাহরণ। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসচেতনায় ঔপনিবেশিক উপন্যাসচেতনাকে নস্যাৎ ক’রে দেশি উপন্যাসচেতনা নির্মাণের প্রক্রিয়া অনুশীলনের কথা বলছেন। ঔপনিবেশিক ইতিহাসবোধ এবং সাহিত্যবোধকে অস্বীকার করেই এই নিরন্তর নির্মাণক্রিয়া জারি থাকে। ঔপনিবেশিক নিজের শেখা ইতিহাস ও সাহিত্যবোধ চাপিয়ে দিতে চায় উপনিবেশিতর ওপর, তেমন ইতিহাসই লিখে রাখে- তা কখনো উপনিবেশিত দেশের নিজস্ব ইতিহাস হতে পারে না।²³ মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রাজনৈতিক আখ্যানে আদিবাসী জগতের বঞ্চনা, ক্ষোভ, ব্যর্থতা ও দ্রোহ যেভাবে চিত্রিত করেছেন, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা তাৎপর্যপূর্ণ। জাতিগত (ethnic) ও বর্ণগত (racial) বৈষম্যের শিকার তাঁরা, যে বৈষম্যকে ঔপনিবেশিক সময়ে দেশি ও বিদেশি প্রভুদের

ক্ষমতাকাঠামো ব্যবহার করত এবং উপনিবেশোত্তর সময়েও সেই ধারা অব্যাহত।²⁴ উপনিবেশোত্তর পর্বে মূলতঃ নিম্নবর্গের উপনিবেশিত পর্যায়ে অভিজ্ঞতাগুলিকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হল- অধীনস্থ শোষিত নিম্নবর্গ উপনিবেশিত পর্বে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। ঔপনিবেশিকরা তাদের ‘সভ্যতা, আধুনিকতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ’ থেকে উপনিবেশিতদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ দেখানোয় প্রয়াসী হয়েছিলেন; বহু দেশি উচ্চবর্গ সেই দৃষ্টিকোণ রপ্ত ক’রে দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন করেছিলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক/লেখকরা একাধারে উপনিবেশিতদের নিজেদের বিস্মৃত অতীত পুনরুদ্ধারের কথা বললেন এবং ঔপনিবেশিক মতাদর্শ-চেতনার হীনম্মন্যতা প্রত্যাখ্যানের কথা বললেন। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসের দাঁড়কাক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটরকে ধমকে এটিই বোঝাতে চায়- বেগম জনসন ইতিহাসের পুনর্পাঠ দেয়। কিন্তু, ঔপনিবেশিক পাঠ প্রত্যাখ্যান ক’রে নিম্নবর্গের অতীতুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য- কোনও উপনিবেশোত্তর সমাজই উপনিবেশবাদী সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব সম্পূর্ণতঃ কাটিয়ে উঠতে পারে না। বিশেষতঃ ভুবনায়নোত্তর (post-globalization) পর্যায়ে পাশ্চাত্য ফের নয়া-ঔপনিবেশিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে বলেই প্রক্রিয়াটি আরও বেশি কষ্টসাধ্য।²⁵ নবাবুণ তাঁর উপন্যাস ও গল্পের আখ্যানজগতে এই শ্রমসাধ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করছেন বলেই তাঁর আখ্যানগুলি বিশ্বায়নী সংস্কৃতির প্রতিরোধবিন্দু হয়ে উঠছে। স্পিভাক নিম্নবর্গ-তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের নারীদের লৈঙ্গিক অবস্থানের পরিচয়গত রাজনীতিকে যুক্ত করলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে ইউরোপীয় নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থান এবং ভারতীয় নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থানে পার্থক্য হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘স্তন্যদায়িনী’ গল্পের²⁶ বিশ্লেষণে যশোদার নিম্নবর্গীয় শোষিত অবস্থানকে উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেন স্পিভাক- যশোদার কাছে ‘মাতৃ’ পেশা। তার নিজের সন্তানের জন্য যে স্তন্যদুগ্ধ উৎপন্ন হয় তা ‘necessary labour’ কিন্তু বাবুদের পরিবারের সন্তানদের জন্য তার যে স্তন্যদুগ্ধ, তা ‘surplus labour’²⁷ কিন্তু, ‘দ্রৌপদী’ গল্পের বিশ্লেষণে স্পিভাকের বিশ্লেষণ একদেশদর্শী হয়ে গেল- দ্রৌপদী মেঝেনের দ্রৌহী সত্তা এবং জৈব-বিপ্লবী সত্তা হিসেবে নকশাল আন্দোলনের রাজনীতিকে ধারণ করার স্পর্ধা

স্পিভাকের বিশ্লেষণে উহ্য থেকে গেল।²⁸ দোপদি মেবোন শুধুমাত্র নারী বলে নির্যাতিতা হয়নি, তার কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসের জন্য রাষ্ট্র তাকে নির্যাতন করেছিল। আখ্যানের শেষে তার স্বর একজন আদিবাসী দ্রোহী কৃষকের স্বরে রূপান্তরিত হয়- এই শ্রেণিধারণা ব্যতিরেকে ‘দ্রোপদী’ পাঠ অসম্পূর্ণ। উপনিবেশিত পর্যায়ে ‘সতীদাহ প্রথা’-র সামাজিক রাজনীতি এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের বাচনকে কেন্দ্র করে উপনিবেশিত নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাত্ত্বিক নির্মাণকল্পে ব্রতী হলেন স্পিভাক। একদিকে ব্রিটিশ যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ‘সতী’-নারীদের ব্যক্তিস্বাধীনতার বাচন এবং অন্যদিকে ‘সতী’-নারীদের এই প্রথায় সামিল হওয়াকে স্বেচ্ছা-যোগদান বলে বর্ণনা করার হিন্দুকর্তৃত্বমূলক বাচন- একটি দ্বন্দ্বিক পরিসর তৈরি করল। দু’টি বাচনিক দ্বন্দ্বের জন্ম হল- শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা ভারতীয় নারীকে উদ্ধার করছে এবং ভারতীয় নারীরা স্বেচ্ছায় সতী হতে চাইছে। আর, এই দু’টি পরস্পরবিরোধী বাচনের চাপে নিম্নবর্গসম হিন্দুনারীদের নিজস্ব স্বর চাপা পড়ে যেতে লাগল। হিন্দুকর্তাদের চাপিয়ে দেওয়া ‘ঐতিহ্য’-র বয়ান এবং ব্রিটিশশাসকের চাপানো ‘আধুনিকতা’-র বয়ান নারীদের স্বরকে সচেতন অবজ্ঞা অবহেলা করল। রণজিৎ গুহ উচ্চবর্গের লেখা ইতিহাসে চাপা-পড়া নিম্নবর্গের স্বরমুক্তির সম্ভাবনা খুঁজতে চেয়েছিলেন- স্পিভাক উক্ত লৈঙ্গিক পরিসরে সেই খোঁজ জারি রাখলেন। এক্ষেত্রে পুরুষ-উচ্চবর্গ আধিপত্যমূলক অবস্থান থেকে নারীদের স্বরের প্রতিনিধিত্ব করার ‘দায়িত্ব (agency)’ নিল- অন্য কেউ নারীদের কথা তথা ‘তাহাদের কথা’ বলে দিতে চাইল। এর অনিবার্য পরিণতিতে নিম্নবর্গসম হিন্দুনারীরা ‘অপর (other)’ হয়ে যেতে লাগলেন। ‘আত্ম (self)’ অবস্থান অধিকার করে রইল হয় দেশি সমাজের পুরুষরা অথবা শ্বেতাঙ্গ সমাজের কানুন প্রণয়নকারী পুরুষরা। নারীদের আত্মাহুতি দেওয়া তথা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ার প্রথাকে গৌরবান্বিত করা পুরুষতন্ত্র+ধর্মান্তার যৌথক্রিয়া। অপরাধের পদ্ধতিতে ভারতীয় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে- বর্ণ, লিঙ্গ, জাতপাত প্রত্যেকটি আর্থ-সামাজিক উপাদান এই অপরাধন ত্বরান্বিত করেছে। মূলস্রোতের বাইরে ‘অপর’-এর প্রান্তিকায়িত সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। মূল বিষয়ীসত্তার (subject) ছায়া হিসেবে ‘অপর’-এর অস্তিত্ব সমাজে

প্রচলিত হয়ে পড়ে- পুরুষ বিষয়ীসত্তার (স্বামী) মৃত্যুতে ‘অপর’ (স্ত্রী) একা বাঁচতে পারে না- সতীদাহর এই সামাজিক রাজনীতিকে চিহ্নিত করলেন স্পিভাক। সামাজিক প্রথায় নারীর মূল্য পুরুষের পিতৃতান্ত্রিক সংসারে পরজীবীর বেশি কিছু না, ফলে স্বামীর মৃত্যুর পরে সহমৃতা হওয়া ওই সামাজিক প্রথার ‘স্বাভাবিকতায়’ গণ্য হল- ধর্মশাস্ত্র ও ঋগ্বেদ থেকে এই প্রথার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি মিলেছিল। (স্পিভাক, ২৯৯-৩০০) ব্রিটিশরা সতীদাহপ্রথা রদ করতে চেয়ে ‘ভারতীয় নারীদের উদ্ধারকারী শ্বেতাঙ্গ প্রভু’ এমন বয়ান প্রতিষ্ঠা দিল।²⁹ ভারতীয় হিন্দু নারীরা পিতৃতান্ত্রিক হিংসা এবং শ্বেতাঙ্গদের উচ্চম্মন্য সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে তাদের নিজেদের অবস্থান স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করতে পারেনি। এখান থেকেই স্পিভাক ‘কথা বলা (speaking)’ ক্রিয়াটির ওপরে জোর দিচ্ছেন- বলার মধ্যে দিয়েই সংযোগস্থাপন (communication) সাধিত হয়। talking ও speaking-এর মধ্যে তফাৎ ক’রে ‘speaking’ ক্রিয়াপদটি বেছে নিচ্ছেন স্পিভাক এবং এই আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগস্থাপনে নিম্নবর্গের স্বর কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তা বলছেন। যোগাযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় গোলমাল (noise) অনভিপ্রেত হট্টগোল- যা নিম্নবর্গের ‘বলা’কে বাধা দিচ্ছে- জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উপাদানের জন্যই নিম্নবর্গের ‘বলা’ ও অনিম্নবর্গের ‘শ্রবণ’-এর মধ্যে অনপনেয় দূরত্ব রয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ তখনই সফল হয়, যখন প্রেরকের বলতে-চাওয়া বার্তাটি যথাযথভাবে প্রাপক গ্রহণ করে- নারী-নিম্নবর্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি। শুধু নারী-নিম্নবর্গের ক্ষেত্রেই না, অন্যান্য নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও বশংবদ দেশি প্রভুরা কর্ণপাত করেনি। ব্রিটিশরা ভারতীয় জলপ্রণালি ধ্বংস করেছিল। খাল বিল নদীপথ রুদ্ধ ক’রে একদিকে কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অন্যদিকে বন্যার ফলে বহু গ্রাম উজাড় হয়ে গেছিল। এই দু’টি ব্যাপারে ক্ষতি হয়েছিল ভারতীয় নিম্নবর্গেরই। কিন্তু, তাদের ক্ষোভে-দ্রোহে কর্ণপাত না ক’রে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে আরও ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছিল ব্রিটিশরা।³⁰ উপনিবেশিত বা উপনিবেশোত্তর সমাজে উচ্চবর্গের স্বর আধিপত্যকারী ও দমনমূলক- নিম্নবর্গ ‘অপর’ বলে তাদের স্বর অশ্রুত, এবং উচ্চবর্গই বিষয়ীসত্তা (subject) হিসেবে একমাত্র শ্রুতস্বর। বাঘারুর সংলাপ খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগে পাঠকের

এবং লেখকের। জোতদারের স্বর, সরকারি আধিকারিকদের স্বরের মাঝে তার স্বর প্রায় অশ্রুত; তাই, লেখক বাঘারুর সংলাপ খুঁজে পাওয়ার আলাদা উপশিরোনাম দেন। ১৯৭০-র দশকে চ্যারকেটু-খেতখেতুর স্বর বিভিন্ন হট্টগোলের (noise) মাঝে হারিয়ে যায় বলে তাকে বারবার ‘না’ উচ্চারণ করতে হয়। সাংবাদিক থেকে পুলিশ থেকে মিছিল-সাজানো নেতারা কেউই তার স্বরের গুরুত্ব খুঁজে পায় না। নিম্নবর্গ তাদের স্বর শোনানোর জন্য অধীর থাকে, কিন্তু সমস্যা হয় যখন প্রাপক (receiver) তাদের স্বর বা বলা-কথা বুঝতে পারে না, বিসংকেতীকরণ (decode) করতে পারে না। তখন তাদের স্বরকে অসংস্কৃত-অশ্লীল-অপ্রমিত বলে দাগিয়ে দেয়। যেমন ফ্যাতাডুদের স্বর। বধির উচ্চবর্গকে শোনানোর জন্য তাদের উচ্চকণ্ঠ উচ্চবর্গ-নিয়ন্ত্রিত মাপকাঠিগুলিকে প্রতিস্পর্ধা জানায়। উচ্চবর্গের ছকে দেওয়া নৈতিক সীমারেখাগুলি অতিক্রম করে। বিদেশি প্রভু ও দেশি প্রভুরা উনিশ শতক থেকে ভাষার যে প্রকল্পনা নির্ধারণ ক’রে দিয়েছিল, তাকে প্রত্যাহ্বান জানায়। তারা এই কাজগুলি করে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে-তাদের আক্রমণের একটা অভিযুক্ত নিবন্ধ থাকে বিশ্বায়নী-উদারনৈতিক আর্থ-সংস্কৃতির প্রতি। আপাত-নান্দনিক বিশ্বে তারা যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং খাঁটি ভারতীয় শিকড়-অস্তিত্ব নিয়েও তারা ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক সমাজকাঠামোয় আকাজ্জিত মুক্তির স্বাদ পায়নি। বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারে ভেসে যাওয়া দেশ-সমাজেও তারাই চিরকালের অবদমিত হিসেবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।³¹ প্রযুক্তিকৌশলের হট্টগোল-বাতিল পদ্ধতিতে (noise cancellation model) তৈরি হেডফোনে অনভিপ্রেত শব্দ/ধ্বনি বাতিল করা হয় ধ্বনিতরঙ্গ ধ্বংসের প্রক্রিয়ায়- যে ফ্রিকোয়েন্সির ধ্বনি বাইরে থেকে আসছে, সেই একই ধ্বনিতরঙ্গ যদি উল্টোদিক থেকে তৈরি ক’রে বিরোধ (counter) করা হয়, তাহলে ধ্বনিতরঙ্গগুলি একে-অপরকে বাতিল করে দেবে। বাইরে থেকে আসা অনভিপ্রেত হট্টগোলের শব্দ ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে অভিপ্রেত প্রিয়শব্দ কানে জোরালো হয়ে পৌঁছায়। ফ্যাতাডুরা কি ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করে না? উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যধরানার বিপরীতমুখী অভিঘাত তৈরি করে- উচ্চবর্গীয় বিষয়ীসত্তা ক্রমশঃ নস্যাৎ হয়ে ‘অপরায়িত’ সত্তার বাচন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণের যে রূপরেখা রণজিৎ গুহ দিতে চেয়েছিলেন, তা বিবর্তিত ক’রে নিম্নবর্গকে কীভাবে উপস্থাপনা করা হয়, সেই অন্বেষণ জোর পেল। ‘অপর’ নির্মাণের ধারণা থেকে উচ্চবর্গের অপরস্বর হিসেবে নিম্নবর্গের উপস্থাপনার পদ্ধতি আবিষ্কার করা নিম্নবর্গচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে উঠল। সুমিত সরকার তাঁর ‘The Decline of the Subaltern’ প্রবন্ধে নিম্নবর্গতত্ত্বচর্চার ধারার কিছু প্রয়োজনীয় সমালোচনা রাখলেন। নিম্নবর্গ-তত্ত্বচর্চার নামে নতুন প্রবণতা তৈরি হচ্ছে স্বয়ংশাসন (autonomy) ও নিম্নবর্গ (subaltern) প্রকরণ বিভাজনের- এতে একটা নিশ্চল, প্রসঙ্গবহির্ভূত অর্থ ও গুণাবলী নির্ধারণ ক’রে দেওয়া হয়েছিল। নিম্নবর্গ-তাত্ত্বিক ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গীয় স্বশাসনের গুরুত্ব অনুসন্ধান করা থেকে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যের তত্ত্বে দোদুল্যমান থাকার কারণে নির্দিষ্ট কিছু বিশ্লেষণমূলক খাঁচায় (analytical framework) আটকে পড়েছিলেন।³² তাঁর মতে ভারতীয় নিম্নবর্গ-চর্চা তিনটি অবস্থানের মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে পড়ল- derivative discourse, indigenous community, এবং fragments। ভারতীয় নিম্নবর্গের ইতিহাস, তাঁদের প্রতিরোধ ইত্যাদি ছিল নিম্নবর্গ-বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল- ক্রমশঃ সেই কেন্দ্রস্থল ফুকো দেরিদা সাইদের প্রণীত তত্ত্ব মোতাবেক শ্রেণি-রাজনীতির অভিমুখ থেকে সরে এল ১৯৮০-র দশকের শেষ থেকে। বামপন্থী বিপ্লবাব্ধি ইতিহাসচর্চার ধারাকে ক্রমদখল ক’রে নিল সাংস্কৃতিক বিদ্যাচর্চা (cultural studies) এবং উপনিবেশবাদ-সমালোচনার ধারা- ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী ধারাগুলিকে ব্যর্থ ও অকার্যকরী হিসেবে প্রতিপন্ন করা হল। উপনিবেশিত ‘বিষয়ীসত্তা’ (এবং অপরসত্তা) শুধুমাত্র ‘derivative discourse’ অনুশীলন করে এমনটা প্রতিপন্ন হল তাঁদের আলোচনায়। সুমিত সরকারের মতে যেকোনও কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্বিক অভিমুখ খোঁজা মার্ক্সবাদী চর্চার প্রধান বিষয়, কিন্তু তা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যেতে লাগল “unitary vision of the modern bureaucratic state as the sole source of oppression” (Sarkar 1997, 5) এই ধারণায়। ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড বিচার এবং সম্প্রদায়গত অন্বেষণে জোর পড়ার ফলে নিম্নবর্গ-বিদ্যাচর্চার অখণ্ড সামগ্রিক পরিসর থেকে সরে এলেন তাত্ত্বিকরা।³³ ই.পি. থম্পসনের

‘শ্রেণি ব্যাতিরেকে শ্রেণিসংগ্রাম’ তত্ত্বপ্রকল্পনার সঙ্গে ১৯৮০-র দশকের শেষের নিম্নবর্গতত্ত্বচর্চার তুলনা করছেন সুমিত। থম্পসনের ইতিহাসদর্শনের প্রসঙ্গে ‘সংস্কৃতিবাদকে (culturalism)’ আক্রমণ করতে গিয়ে বলছেন যে, সংস্কৃতি বস্তুগত পরিস্থিতি থেকে বা সমাজের ক্ষমতাসম্পর্ক থেকে বিমূর্ত বিচ্ছিন্ন নয়।³⁴ ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে সাম্প্রদায়িকতার বিচারে নিম্নবর্গ-চর্চাকারীদের অভিমুখ বিহীন উদারনৈতিক গোলমেলে দৃষ্টিভঙ্গি নব্য-হিন্দুত্ববাদী প্রচার-মিথ্যাচারের সামনে দোলাচলে ভুগেছে। (১০১) জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গায় নিম্নবর্গের হিংসাত্মক ভূমিকায় ‘ভাল’ নিম্নবর্গ বনাম ‘খারাপ’ নিম্নবর্গ বাচনিক পরিসর তৈরি করছেন- তিনি ওই দাঙ্গামুহূর্ত বিচারের যে কাঠামোরূপ গ্রহণ করেছেন তাতে হিংসা ও তজ্জনিত বেদনাকে খণ্ডিতভাবে বিচার করছেন। কিন্তু দাঙ্গাজনিত হিংসা ও বিচ্ছেদবেদনা যদি অনুষঙ্গরহিত অবস্থানে বিচার করা হয়, তাহলে তা নির্দিষ্ট গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।³⁵ ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানে উপস্থাপিত বিশদ দাঙ্গামুহূর্ত এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। ইলিয়াস নিম্নবর্গের ‘ভাল-খারাপ’ মেরুকরণ করছেন না, উচ্চবর্গ-নিয়ন্ত্রিত দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের অসহায় আত্মসমর্পণ দেখাচ্ছেন এবং উচ্চবর্গের প্রচারিত বয়ানের বিরুদ্ধ-বাচন (counter-discourse) হাজির করছেন নিম্নবর্গের চেতনাজারিত ভাষায়। শ্রেণিধারণা বাদ দিলে কিংবা অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলে দশরথ কামার, আফসার মাঝি, কেষ্ট পাল, বৈকুণ্ঠ বৈরাগীদের রক্তমাংসসম উপস্থাপনা সম্ভব হত না। সুমিত সরকার যে সময় ভারতীয় নিম্নবর্গ-বিদ্যাচর্চার অবক্ষয়ের কথা লিখছেন সেই সময়ে বাবরি মসজিদ ভাঙা, তজ্জনিত দাঙ্গা এবং নব্য-হিন্দুত্ববাদী প্রতর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। তিনি বহু স্থানে উচ্চবর্গ হিন্দুত্বের বিজয়রথের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ দেখছেন এবং সেগুলিকে নিম্নবর্গের প্রতিরোধী ধারার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছেন।³⁶ নিবেদিতা মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে হোমি ভাবার ‘দ্য কমিটমেন্ট টু থিওরি’ বিশ্লেষণ ক’রে দেখাচ্ছেন যে, ভাবা শ্রমজীবী নারীর শ্রেণিচেতনার থেকেও লৈঙ্গিক-চেতনায় গুরুত্ব আরোপ করছেন, ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে।³⁷ নিবেদিতা লিখছেন, “Women’s collective agency around their gender and class interests have to be indispensable

parts of deepening that resistance.” (Majumdar 2021, 58) একইসঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের সমালোচনায় দেখাচ্ছেন যে, তা কী ক’রে বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে ভেঁতা ক’রে দিচ্ছে। নিবেদিতার আলোচনায় উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও আদিবাসী তত্ত্বচর্চার ফাঁকফোকরগুলি ধরা পড়ছে। কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান বড় ক’রে দেখতে গিয়ে আদিবাসী সমাজের জল-জমি-জঙ্গল রক্ষার লড়াই ও শ্রেণিচেতনাজারিত প্রতিরোধের বয়ানগুলি অবজ্ঞা করা হচ্ছে। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে আদিবাসী জনজাতি এবং তাঁদের মিথ, যাপনচিত্রের আলোচনায় স্পিভাকের উত্তর-অবয়ববাদী এবং সংস্কৃতিবাদী তত্ত্বায়নের সমালোচনায় কর্পোরেট+রাষ্ট্র বনাম আদিবাসীদের প্রতিরোধের বস্তুবাদী উপাদানকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তিনি।³⁸ সর্বোপরি, সুমিত সরকার ভারতের নিম্নবর্গ-বিদ্যাচর্চার অন্যতম কাণ্ডারী হয়েও মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের পথ থেকে সরে আসছেন না বরং শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে শোষিত বর্ণের প্রতিরোধের মেলবন্ধনের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরছেন। মহাশ্বেতা দেবী মূলবাসী-কেন্দ্রিক আখ্যানজগৎ, দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’-র আখ্যানজগৎ এই মেলবন্ধন ধারণ করে। কালী সাঁতারার প্রতি বসাই টুডুর প্রশ্নগুলি কিংবা সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তার অভিমানসূচক বিশ্লেষণ শ্রেণিসংগ্রামের প্রেক্ষিত ছাড়া মূর্ত হয় না। চ্যারকেটু-খেতখেতুর প্রান্তিকতম অবস্থান, বিস্থাপিত কেলু-রাধিয়ার জীবন শ্রেণিরাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন না। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র বসাক উপনিবেশোত্তর পর্যায়ে উচ্চবর্ণীয় শোষণের সহায়ক রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের প্রতিনিধি- নকশালবাড়ি কৃষকবিদ্রোহের নাগরিকশাখাকে দমন করেছিল সে। রাষ্ট্রের পরমপ্রিয় হয়েও সে রাষ্ট্রের দ্বারা ‘ব্যবহৃত’ হয়ে থেকে যায় এবং ভারসাম্যহীনতায় ভোগে। শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতির আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে। দেবেশ রায়কে ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কেলুর অসম্ভব কথোপকথন বানাতে হয় নিম্নবর্ণের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের যোগ সাধন করতে। ওসমান ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মিছিলে উপনিবেশিত সময়ের শোষিত নিম্নবর্ণকে যোগ দিতে দেখে। ওই মিছিলে মুঘল আমলের নিপীড়িত কৃষকরাও যোগ দেয়। মধ্যবিত্ত ওসমানের চেতনায় দ্রোহের সামগ্রিক পরিসর পুনর্জীবিত হয় আইয়ুব খানের

শাসনবিরোধী মিছিলে। আর, সাহিত্যের ভাষা তথা সাহিত্যের ভাষার নবায়ন এই যোগসাধন করতে পারে। মহাশ্বেতা, ইলিয়াস, দেবেশ রায়, নবারণ ভট্টাচার্যরা নিম্নবর্ণের ভাষাচেতনা অনুসন্ধান ক’রে চলেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’ গল্পে ভদ্রলোকি ভাষাবোধের সঙ্গে অ-ভদ্রলোকি ভাষার দূরত্ব রচিত হয় নিম্নবর্ণের লৌকিক পারফরম্যান্স ও অলৌকিক প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে। মঘাই ডোম যে মন্তোচ্চারণে চিরাচরিত পদ্ধতিতে মাটি থেকে জল তোলে, সেই মন্তোচ্চারণে চিরাচরিত বিশ্বাস আর মিথ সহাবস্থান করে। সেই ভাষা অমার্জিত। তাই জিতেন মাস্টারের মার্জিত ভদ্র শিক্ষিত বোধ ধাক্কা খায় সেই উচ্চারণ শুনে। “এক ফাটাচটা বুড়ো নদীকে বেবুশ্যে বলছে শুনে তিনি বেজায় চমকে গেলেন” (দেবী ১৩৮৫, ১৮৮) জিতেন মাইতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাধ্যতঃ স্কুলছুট হয়। তিনি সৎ, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি দাঙ্গাবিরোধী প্রগতিশীল এবং তিনি প্রত্যন্ত নিম্নবর্ণ পাড়ায় শিক্ষার আলো ছড়াতে চান। কিন্তু, গল্পের কথক জানেন তাঁর নৈতিকতা, ইচ্ছে এবং ডোম-দুসাদ-চামার-চাঁড়াল ছেলেমেয়েদের বাস্তবের মধ্যে দূরত্ব প্রচুর। কথক সেই দূরত্ব উন্মোচন করেন আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও ভাষার মধ্যে দিয়ে। জিতেন মাইতির ‘দেশ’-এর ধারণা এবং মঘাই ডোম, ধুরাদের ‘দেশ’-এর ধারণা আলাদা। জিতেন মাইতির বোধগম্যতায় প্রকৃতির সুজলাং-সুফলাং ছবির সঙ্গে মঘাই ধুরাদের রুক্ষ জলহীন ক্লিষ্ট প্রকৃতির বাস্তবতায় যোজন দূরত্ব। কথক এই দূরত্বের সূত্রায়ণ করেন, “আজন্ম ন্যাড়া জিতেন মাইতি শিক্ষা-প্রসারণে বিফল-সংগ্রামী। মঘাই জলের ব্যাপারে বিফল-সংগ্রামী। জিতেন মাইতির সংগ্রামটি মডার্ন ম্যান সৃষ্ট। মঘাইয়ের সংগ্রাম প্রাগৈতিহাসিক।” (১৮৯) আর, এই অনপনেয় দূরত্বের পরিধি বোঝাতেই জিতেন মাইতির আধুনিকতার সঙ্গে মঘাইয়ের অনাধুনিক রীতি-নীতির সংঘাত ঘটে এবং মিথ ও মুখফেরতা বিশ্বাস এক না-আধুনিক ভাষাকল্প গড়ে তুলে আখ্যানের কালস্থানিকতাকে ভদ্রলোকিয় পরিসর থেকে দূরে নিয়ে যায়। জিতেন প্রগতিশীল বলেই এবং জাতি-বর্ণের ভেদ মানেননা বলেই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরের সমস্ত অলঙ্ঘ্য

দূরত্ব লঙ্ঘন করার প্রয়াস করেন³⁹, এবং, গ্রামীণ উচ্চবর্ণ-উচ্চবর্ণ ও রাষ্ট্রের শত্রু বনে যান। মহাশ্বেতা ‘উইশফুল থিঙ্কিং’-র সাহিত্যতত্ত্বকে বর্জন করেন বলেই গল্পের শেষে প্রশাসনিক ভাষায় রাষ্ট্রের মতাদর্শগত আধিপত্যের বাস্তবতা থেকে যায়, “চরসা ব্লকে হরিজন-সমস্যা জাতীয় কোনো সমস্যা নেই। জল-সমস্যাও নেই।” (২১০)। পুলিশের ভাষায় ও আচরণে নিম্নবর্ণের প্রতি রাষ্ট্রের অবজ্ঞা ও দমনেচ্ছা প্রকাশ পায়। আর, মহাশ্বেতা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ-মানা সাহিত্যতত্ত্বের বিরোধিতা করেন বলেই কথকের ভঙ্গিতে অপরিসীম শ্লেষ ঢুকে পড়ে। আখ্যানে সন্তোষ পূজারীর স্বরের সঙ্গে মঘাইয়ের স্বরের পার্থক্য হয় শ্রেণি ও বর্ণগত কাঠামোকে ধারণ ক’রে। মঘাইয়ের সঙ্গে জিতেনের স্বরের তফাৎ হয় তাদের সামাজিক অবস্থানের তারতম্যের জন্যে। আর, রাষ্ট্রের তথা প্রশাসনিক উপাদানসমূহের স্বরের সঙ্গে জিতেন, মঘাই, ধুরাদের স্বরের পার্থক্য রচিত হয় মতাদর্শগত তফাৎয়ের জন্যে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী কাঠামোয় সন্তোষ পূজারীরা মঘাই ডোমেদের ব্যবহার ক’রে নেয়, তাদের মিথ-বিশ্বাস-লৌকিকতাকে নিংড়ে নেয়। দোপ্দি, দুলনা, ধুরাদের প্রতিরোধকে ‘সন্ত্রাসবাদী’, নকশালি, ‘ডিসেনটিং এলিমেন্টস’, ‘লং সাসপিশাস্ ক্যারেঙ্টার’ বলে চিহ্নিত ক’রে নেয় রাষ্ট্র। আর, এই সমস্ত রাজনৈতিক উপাদানকে ভাষাকাঠামোয় ধারণ করে ‘অগ্নিগর্ভ’।

ভদ্রলোকের সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় সংস্কৃতি ও ভাষার তফাৎ ধরা পড়ে মনসা পূজার মধ্যে দিয়ে। সন্তোষ ও মঘাই উভয়েই মনসা পূজা করে; কিন্তু, তাতে স্বার্থের পার্থক্য থাকে। সেই একই পুজোয় উদ্‌যাপনের পার্থক্য থাকে। সন্তোষের পুজোয় ক্ষমতামূলক⁴⁰ দেখনদারি ও আড়ম্বর; কিন্তু, “মনসা পুজো মঘাইদের অন্যরকম। মঘাই আগে মনসা পুজো করল। তারপর মুখে রঙ মেখে, মদ খেয়ে, সং সেজে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সার বেঁধে ওদের বাঁধের দিকে গেল।” (২০৫) এই নিম্নবর্ণীয় যাপনের উদ্‌যাপনে কিংবা মাটি থেকে জল তোলার প্রার্থনায় মঘাই যে গান গায়, যে স্বরে ‘ধরতি-আবা’কে প্রসন্ন করতে চায় তা জিতেন মাস্টার, সন্তোষ পূজারী ও রাষ্ট্রের প্রকল্পনা থেকে আলাদা। লেখককে এবং আখ্যানের

কথককে বারবার সেইসব মন্ত্র আখ্যানের ভেতরে তুলে আনতে হয়। ভদ্রলোক পাঠক তাতে অশ্লীলতা, অমার্জিত ভাষা ও ‘পলিটিক্যাল ইনকারেক্টনেস’ খুঁজে পেতে পারেন কিন্তু, আখ্যানের স্থান-কুশীলব-বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় তা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাঙ্গী। অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এও ভাষাকাঠামো ও স্থান-কুশীলবের সামঞ্জস্যে মিথ ও লোকাচার মিশে থাকে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে খেতখেতুর সঙ্গে মাসানের সাক্ষাৎ (encounter) মিথের সঙ্গে সঙ্গে জমিসম্পর্ক এবং অস্তিত্বের রাজনীতি উদ্ঘাটন করে। খেতখেতু জমিহীন ভবিষ্যৎ আর অস্তিত্ব হারানোর দ্রাসে জমির ওপর দিয়ে চলার সময় মাসান নামক ‘অপদেবতা’র সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথন করে। চার পুরুষের বাসিন্দে এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরি করেও পঞ্চায়েত প্রধানের নির্দেশে তাকে বাসস্থানের স্থিতিটুকুও ছেড়ে দিতে হবে- তার জন্য কোনও পাট্টা বিলি হয় না। খেতখেতুর অস্তিত্ব বিপন্ন করে আলসার, ভুখ এবং মাসান- তার নিম্নবর্গীয় অস্তিত্বে এই তিনটি শত্রু তাকে বিপন্ন ক’রে তোলে। ভুলা মাসান বেগাঁউয়া পরদেশিকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে- এই লোকায়াত অলৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জমির রাজনীতি আর খেতখেতুর অতিপ্রান্তিক অবস্থান অঙ্গাঙ্গী। মাসান উত্তরবঙ্গের এক লোকায়াত ‘অপদেবতা’।⁴¹ লোকবিশ্বাস থেকে এই উপদেবতা বা অপদেবতার জন্ম- তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাসে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাথা নুয়ে আসে। খেতখেতুকে স্বগতকথনে বা উচ্চৈশ্বরে তাঁর কাছেই প্রমাণ দিতে হয় যে, সে ভূমিপুত্র- অঞ্চলের অন্য যে কারোর থেকে অনেক বেশি পথ-জমি সে চেনে- ধানজমির প্রতিটি রঙবদল অন্য সবার থেকে সবচেয়ে ভাল বোঝে সে।⁴² নিজেকে ভূমিপুত্র প্রমাণ করতে করতে কাল্পনিক মাসানের সঙ্গে তার একাকীকথনের ভাষা কখনও নিবেদনের ভাষা কিংবা কখনও প্রার্থনার ভাষা হয়ে যায়। “মুই মিছা কহ নাই। মুই খেতখেতু। মুই বেদেশিয়া না-হই। মুই চিরজন্ম এইঠে আছি। মোর বাপার নাম কান্দুরা, মোর বুড়া বাপা ভাদুরা।” (রায় ১৯৮৯, ১২৫) যে জমি তার ভাত-রুজি, যে জমির সুখ-দুঃখ সে বোঝে, ভুলা মাসানের পাল্লায় পড়ে সেই জমিই তার কাছে অচেনা হয়ে যায়। ভুলা মাসানের ডাকে বিভ্রান্ত হবার ভয় তাকে আতঙ্কিত করে কারণ, তার জমির কোনো খতিয়ান নেই, তার মালিকানা নেই,

তার পদাধিকার নেই। এতগুলি ‘না/নেই’-এর জন্য মাসান তাকে বিদেশি বেগাউয়া ভেবে মেরে ফেলতে পারে। খেতখেতুর মাসানের প্রতি ভয়ভক্তি মিশ্রিত ভাষায় কি অন্তর্মুখী প্রতিবাদের ভাষাও থাকে না? “কুন্ঠে যাম! কুন্ঠে যাম? এনং ভোখ নিয়া মুই কুন্ঠে যাম? পদ্মনাথ আছিল গিরি, হইছে নিজচাষী। অমনি আছিল পঞ্চায়েত, হইছে মেস্বার। নরেন সরকার আছিল জোতদার, হইছে এজেন্ট। মুই ছিল খেতখেতু, খেতখেতুই আছো।” (রায় ১৯৮৯, ১১৩)

পরিবর্তনশীল আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতাকাঠামোর ওপরতলায় থাকা লোকেরা নিজেদের পদাধিকার বদলে নেয় কিংবা কার্যপ্রকরণের পোশাকি নাম পাণ্টে নেয়। ক্ষমতাকাঠামোর পরিবর্তন হয় না। প্রথম বামফ্রন্ট আমলে পাট্টা বিলির বন্দোবস্ত খেতখেতুর মতো ভূমিহীন, লাঙলহীন, গরুহীন, ফসলহীন কৃষককে কোনও সুরাহা ক’রে দিতে পারে নি। মাসানের সঙ্গে এককসংলাপের পারম্পর্যে খেতখেতু নিজের অসহায়তা ব্যক্ত করে- জমির খতিয়ান, রেজিস্ট্রি, বেনামি জমির হিসেব ইত্যাদি তথ্য-নথির হিসেবনিকেশ জানে না সে। সমাজের নিম্নতলের নিম্নতলে বাস করে খেতখেতু, সে শুধু দেখে জমির মালিকরা স্বনামে-বেনামে দখলদারি বজায় রেখেছে এবং সামাজিক-অবস্থানগত পরিচয়ে উচ্চাবস্থানে রয়ে গেছে। প্রতিবাদের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা তার জানা নেই; তাই ভুলা মাসান নামক অপদেবতার প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে সেই মাসানের কাছেই তাকে ক্ষোভ-বঞ্চনা জড়িত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। “পদ্মনাথ, অমনীকান্ত, নরেন সরকার সগায় এইঠেকার মান্ঘি থাকি গেইল্ আর মুই খেতখেতু, হয়্যা গেইল্ বিদেশিয়া?” (১২৮) খেতখেতুর স্বর সমাধানহীন অসহায় প্রতিবাদের নামান্তর। খেতখেতুর ক্ষেতজুড়ে হাঁটতে হাঁটতে পদ্মনাথের জমি অনায়াসে চিহ্নিত ক’রে দেওয়া, আঞ্চলিক মানচিত্র অনায়াসে বলে দিতে পারার দক্ষতা কিংবা ধানগাছের প্রতিটি পরিবর্তনের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দক্ষতা তাকে ভারতবর্ষের প্রকৃত কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। একইসঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষকের প্রতি আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর যুগান্তব্যাপী বঞ্চনা-নিপীড়নের সাক্ষীও দেয় কথকের বিস্তারিত বর্ণনা। খেতখেতু ভারতবর্ষের প্রান্তিকতম নিম্নবর্গীয় কৃষকের প্রতিক্রম হয়ে ওঠে- তার স্বর আখ্যানের মধ্যে আলাদা ক’রে চিনে নেওয়া যায়। লেখক বা

আখ্যানকথক খেতখেতুর স্বরে নিজের স্বর চাপিয়ে দেয় না কিংবা খেতখেতুর বাচনভঙ্গিকে ভদ্রলোক-পাঠকের রুচিমারফিক শুধরে দেয় না। কথকের স্বর ও ভাষা কি খেতখেতুর স্বরে সঙ্গত দেয় না? খেতখেতুর সঙ্গে কাল্পনিক ভুলা মাসানের সংলাপের মধ্যেই তাই কথকের স্বর শুনতে পাওয়া যায়- পদ্মনাথের মতো জোতদার কীভাবে আধিয়ারকে ফাঁকি দিয়ে জমির বন্দোবস্ত বজায় রেখেছে।⁴³ কথক জানাতে থাকেন যে, খেতখেতু ধানক্ষেতে সামান্য বাতাসের শিরশিরানিকে মাসান ভেবে নিচ্ছে এবং খেতখেতুর যাত্রাপথে তার ভুখা শরীর ও পেটের আলসার কীভাবে তার আতঙ্ক বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর, কথকের ভাষায় ভুলা মাসানের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়- ভুলা মাসান কী কী পদ্ধতিতে মানুষকে মৃত্যুপথে চালিত করে।⁴⁴

আধুনিকতার সঙ্গে মুখফেরতা আখ্যানের, শহুরে-ভদ্রলোকীয় চিন্তাকাঠামোর সঙ্গে দেশীয় চিন্তাকাঠামোর ফারাক উঠে আসে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে, মিথের প্রয়োগকে ঘিরে। জালাল মাস্টারের সঙ্গে আনোয়ারের সংলাপে মিথ-বিশ্বাস-অতিলৌকিক বনাম যুক্তি-ইতিহাসপাঠের দ্বন্দ্ব চলে। বামপন্থী আনোয়ারের তাত্ত্বিক বিশ্বে মুখফেরতা আখ্যানের কোনও গুরুত্ব নেই, তার ইতিহাসবোধে লেখা-ইতিহাসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু না এবং যা কিছু তার পঠিত মার্ক্সীয় দর্শনের বাইরে তা অবজ্ঞার যোগ্য। তার সেই বোধজারিত ভাষার সঙ্গে জালাল মাস্টারের বোধজারিত ভাষার দ্বন্দ্ব প্রকট হয় যখন আনোয়ার “বৈরাগীটা কে?” বললে জালাল মাস্টার তার প্রতিবাদ করে, “বৈরাগীটা নয়। এককালের সম্মানিত ব্যক্তি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ।” (ইলিয়াস ২০১৫, ১৩৩) বিদ্রোহের সঙ্গে প্রাচীন বটগাছের সম্পর্ক, বৈরাগীর ভিটের মাহাত্ম্য ফকির-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ছড়িয়ে থাকা হাজারো কাহিনি আনোয়ারের ইতিহাসবোধের সঙ্গে সঙ্গে মান্য ইতিহাসকেও প্রতিস্পর্ধা জানায়। কথক স্বয়ং মতামত রাখেন যাতে ইতিহাস সন্দেহের মুখে পড়ে ‘মানুষের কাছে শোনা’ কথাপ্রবাহে- ইতিহাস বইয়ের বাইরেও অনেকান্ত ইতিহাসের সম্ভাবনা জারি থাকে।⁴⁵ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে অংশ নেওয়া মুনসির ভূত, ভবানী পাঠকের দুঃসাহসী লড়াইয়ের গল্প ইত্যাদি গ্রামীণ আলোচনায় প্রবহমান থাকে। আব্দুল কাদের,

আজিজ, তমিজ, পূর্ণ চক্রবর্তী, সতীশ মুক্তার, ইসমাইলদের মতো আধুনিকমনস্করা এসব মানে না। চেরাগ আলি আখ্যানে একবারও মূর্ত না হয়েও রহস্য-মানুষ হয়ে শোলোকে আখ্যানে স্বপ্নের রেশ চারিয়ে দেয়। আধুনিকমনস্ক কবি কেরামত কিন্তু অতীন্দ্রিয় শোলোকের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইলিয়াস বলেছিলেন, “প্রত্যেক গ্রামেই অনেক গল্প, দ্রষ্টব্য ছড়িয়ে আছে। গ্রামগুলোতে একটা না একটা মিথ থাকে। ভূত কিংবা জ্বিন থাকে। আমি বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো ইতিহাস লিখতে বসি নি।” (ইলিয়াস ২০১৫, ৭৩) ইলিয়াস ভূতের গল্পও লেখেন নি। ইলিয়াস নিজের বিশ্বাস, নিজের আধুনিকতা, নিজের ভাষাচেতনা আখ্যানস্থ কুশীলবের ওপরে চাপিয়ে দেন নি। ইলিয়াস ইতিহাসের গতিপথকে নিজের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তাপ্রবাহে রুদ্ধ ক’রে দেননি। তাই বহুস্তরীয় সমাজের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বগুলি আখ্যানের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে।

‘রহ চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)’ এক বিশাল কালখণ্ডে পরিব্যপ্ত। এই উপন্যাস এক যাযাবর সম্প্রদায়ের ঘর হারানো ও ঘর খোঁজার শতাব্দীব্যাপী কাহিনী; তারা পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আর্থ-সামাজিক স্থায়িত্ব খোঁজে। তাদের সংস্কৃতি-ধর্ম-অর্থনীতি ক্ষমতাবানের রাজনীতির প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে বারবার। যে গোষ্ঠীচেতনার রাজনীতির কথা এবং শাসনের বিরুদ্ধে নিয়ত প্রতিস্পর্ধার আখ্যান রচনা করেন অভিজিৎ তাকে শুধু ‘সামাজিক উপন্যাস’ বা ‘কৌমচেতনার উপন্যাস’ সংরূপে বেঁধে ফেলা যায় না। তা রাজনৈতিক হয়ে ওঠে কুশীলবেদের চেতনার উত্তরণে, কুশীলবেদের সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘাতে এবং কালচেতনার প্রবহমানতায় কুশীলবেদের ভূমিকা-প্রতিক্রিয়ায় এবং ভাষার রাজনীতিও এক মুখ্য উপাদান হিসেবে উপস্থিত থাকে। আর, এই আখ্যানভাষার সঙ্গেই ওতঃপ্রোত থাকে মিথ-লোকাচার-মুখফেরতা কাহিনীর প্রয়োগ। বাজিকরদের কাছে রহ চণ্ডালের হাড় একটা মিথ, তাদের পূর্বপুরুষ পুরার কাহিনী একটা মিথ এবং যে দনুকে আখ্যানে আবছা সংকল্পে বাজিকরদের পথনির্দেশ করতে দেখা যায় সেও একটা মিথ। এতগুলো মিথ আখ্যানের আঙ্গিকে ধারণ করে। দনু ও রহ চণ্ডালের মিথ

কার্ল ইয়ুং কথিত ‘আর্কেটাইপ’-এর অংশ, যে আর্কেটাইপের ধারণা ফ্রয়েডকথিত ‘ব্যক্তিগত’ চেতনামগ্নতাকে পেরিয়ে ‘সমষ্টিগত’ চেতনামগ্নতার যুগান্তব্যাপী সত্যকে তুলে ধরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, লৌকিক ও অলৌকিকে বিশ্বাস মিথপ্রবাহের মধ্যে ধরা থাকে। স্থান-কাল ব্যতিরেকে বিভিন্ন দেশের মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যের মধ্যে এবং গান-মুখফেরতা কাহিনি-লোককথার মধ্যে সমধর্মী রূপ ও ভাব ছড়িয়ে থাকে। এই সমধর্মী মিথগুলি ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন প্রত্ন-চেতনের আভাস নিয়ে জেগে থাকে।⁴⁶ আর্কেটাইপের পুনরাবর্তিত প্রতীক এবং মোটিফের মধ্যে নায়ক-আর্কেটাইপ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এর মধ্যে অন্বেষণ, বিচ্ছেদ, বিবর্তন, পুনর্জীবন, প্রত্যাবর্তন এই থিম-মোটিফগুলি রয়েছে। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ যে জনগোষ্ঠীর আখ্যানবর্ণন করে, তাদের ক্ষেত্রেও এই মোটিফগুলি লক্ষ্যণীয়। রহুকথিত সেই পরম স্থানের সন্ধানে অবিরাম যাত্রা, গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন, শতকব্যাপী যাত্রাপথে বারবার বিবর্তিত ও অভিযোজিত হতে হতে টিকে থাকা, আদিরূপের (archetype) বিভিন্ন চিত্র-প্রতীকের উদ্ভাস কিংবা দনুর স্বপ্নে আসা-অভিজিৎ সেন বাজিকরগোষ্ঠীর আখ্যানে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন। ‘অরণ্যের অধিকার’ এবং ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসেও এমন প্রত্নচেতন্য ফিরে ফিরে আসে। বসাই তার ষষ্ঠবার মৃত্যু পেরিয়েও বেঁচে উঠতে পারে। বিরসা ঘোষণা ক’রে দেন যে, “মানুষ হয়ে ফিরে আসব হে আমি, নতুন ধরতি গড়ে নিব... যে মুণ্ডাটা ফের উলগুলানের কথা বলবে, তারে আমি বলে চিনে নিবি” (দেবী ২০১১, ২৮-২৯) শিবন, সালীরা তাদের আজন্মলালিত মিথবিশ্বাস এবং অলৌকিক-অসম্ভবে বিশ্বাস থেকে বিরসার ছাই জঙ্গলে উড়িয়ে দেয়। তাঁদের প্রত্নচেতন্যে কিংবা বসাই টুডুর সহযোদ্ধা সাঁওতালদের প্রত্নচেতন্যে ‘নায়ক আদিরূপ’ বারবার ফিরে আসে। তবে, আদিরূপধর্মী চিত্র-প্রতীক নিশ্চল হয়ে থাকে না তথা মিথ-বিশ্বাস-মগ্নচেতন্য অভিমুখহীন থাকে না। মুণ্ডাদের বহুযুগব্যাপী শোষিত হওয়া, তাদের অনাহার, তাদের আর্থ-রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নায়ক-আদিরূপের (Hero-archetype) প্রতীকগুলিকে প্রতিরোধের প্রতীকে রূপান্তরিত করে। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-এও প্রতিরোধ অন্তর্লীন থাকে। তার সঙ্গে আসে বাজিকরদের খেলা দেখানো, তাদের পারফরম্যান্স এবং নিজস্ব বুলির গান নাচ। তারা

বিশ্বাস করে মুখফেরতা কাহিনীতে। প্রজন্মান্তরে বহমান বিশ্বাস তাদের ক্লাস্তি অপনোদন করে, তাদের নতুন যাত্রাপথে প্রতিরোধ-শক্তি যোগায়। বাজিকরদের ভাষা ‘মান্য’ বা সরকার-স্বীকৃত কোনও ভাষা তো নয়ই, বরঞ্চ তাদের তাদের কোনও ‘একটি ভাষা’ও নেই। তারা যাত্রাপথে যে সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে, তাদের ভাষা জিভে তুলে নেয়, তাদের বাচনভঙ্গি আত্মস্থ ক’রে নেয়। “এলা বুলি বাজিকর দ্যাশ দ্যাশ ঘুরে শিখা লয়। যেথায় ঘুরে সিখাকার বুলি ধরে লয়, সিখাকার ধরমকরম শিখে লয়” (সেন ১৯৮৫, ৭) কারণ, এটা তাদের জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই পদ্ধতি ছাড়া তারা নতুন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশতে পারবে না, তাদের অর্থনীতির ভাগ পাবে না। আর, বাজিকরদের স্থায়ী অর্থনীতি নেই, তারা কৃষিজীবী নয় শ্রমজীবী নয় এমনকি চারণ-অর্থনীতিতেও থিতু নয়। তাদের জীবিকা ‘ভিখ-মাসা, পিচ্লা-বুড়া পিচ্লা-বুড়ির পুতুল নাচিয়ে খেলা দেখানো, বাঁশবাজি, দড়িবাজি’ ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনওভাবেই বাজিকরেরা ভদ্রলোক নয়, ‘মান্য’ নয় এবং সুবিশাল বাঙলা উপন্যাসের চিরাচরিত বিভূ/বৃত্তের কুশীলব নয়। লেখক প্রতিমূহূর্তে তাদের সংলাপে, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণে এবং কথকের স্বরে আধুনিকতা ও ভদ্রলোকে গুণাবলীর সঙ্গে অলঙ্ঘ্য দূরত্ব রচে চলেন। উপন্যাসের শুরু থেকেই শারিবা-লুবিনী-পীতেম ও অন্য বাজিকরেরা যে ভাষায়/বুলিতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তুলে ধরে তা মূলধারার উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ-রাজনীতির থেকে আলাদা। “প্রেম, কাম, ক্রোধ, হিংসা, বাৎসল্য, ঈর্ষা, ক্ষোভ, লোভ এবং সাধ এই উপন্যাসে এসেছে এক একজন মানুষের ভেতর দিয়েই, কিন্তু তা কখনই আলাদা হয়ে থাকে না, একই সঙ্গে পরিণত হয় বাজিকরের গোষ্ঠীর সাধারণ অনুভূতিতে” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৩৯) এই গোষ্ঠীচেতনার ও কৌম্যাপনের উদ্‌যাপনেই উপন্যাসটির আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য রক্ষা হয়ে চলে। রাজমহল, তিনপাহাড়, সাহেবগঞ্জের হাটে তাদের খেল দেখানোর সঙ্গে গাওয়া গানের ভাষায় বহুভাষা মিশ্রিত ‘অদ্ভুত’ ভাষার নিদর্শন স্পষ্ট। আর, সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের ভাষা তাদের মুখের ‘পিচ্লা বুলি’তে খাপ খেয়ে যায়। “যে ভাষা কেউ বোঝে না, কিন্তু সুরের মাদকতা এড়াতে পারে না।” (১৪) সাঁওতালি গানের সুরের মাদকতাও কি এড়ানো যায়/ ভদ্রলোকে মান্য ভাষার সঙ্গে তার বহু অমিল, তবু

মাদক সুরের টানে ভদ্রবাবুরা যেমন সাঁওতাল পরগণার উদ্‌যাপনে যুগ যুগ ধরে আকৃষ্ট হয়েছে,⁴⁷ তেমনই কি বাজিকরদের গান-নাচের ক্ষেত্রেও ঘটে? আর, এই যে ভাষার পিচ্ছিলতা, না-থিতু প্রবহমানতা, তা তো বাজিকরদের জীবনদর্শনের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

কথক-কথন

ভামহ ও দণ্ডী সংস্কৃত গদ্যকাব্যের দুটি প্রধান শাখা কথা ও আখ্যায়িকা বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন। ভামহর মতে, আখ্যায়িকার নায়ক নিজের কথনে নিজের অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্ত করবেন এবং তাঁর সুযোগ থাকবে ইচ্ছেমতো কল্পনাশক্তি প্রয়োগের। আখ্যায়িকার লক্ষণ অনুসন্ধানে নায়ককে কথকরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এবং কথকদ্বারা কথকের অভিজ্ঞতা বিবৃত করাকে মান্যতা দিয়ে আখ্যায়িকার বিষয়বস্তুতে সত্যনিষ্ঠার কথা বলতে চেয়েছেন ভামহ।⁴⁸ ‘কথা’ মূলতঃ কল্পিত কাহিনি। ঐতিহাসিক কাহিনির ধারা ও কল্পিত কাহিনির এই ধারা মানতে চাননি দণ্ডী, তাঁর কাছে এই দু’টিই ‘একজাতি’-র অন্তর্গত।

কথক বা আখ্যায়ক কে? আখ্যায়ক হচ্ছে এমন এক মাধ্যম বা মধ্যস্থিত ব্যক্তি (agent) যে কোনও ঘটনা বা কোনও অস্তিত্বময় কাহিনী বলে বা বলার ধারাকে প্রবহমান রাখে। আখ্যায়ক/কথকের উদ্দিষ্ট শ্রোতা থাকে, আখ্যানের সঙ্গে সেই শ্রোতার সেতুবন্ধনের কাজ করে আখ্যায়ক। সিমুর চাটম্যানের (Seymour Chatman)-র ‘কমিউনিকেশন থিওরি অব ন্যারেটিভ’ মডেলটিতে একাধিক কুশীলবের উপস্থিতি। শুধুমাত্র লেখক-পাঠকের দ্বৈত সম্পর্কে তা বিচার্য নয়; বরং লেখকের মধ্যেও অপর সত্তার সন্ধান বা পাঠকের মধ্যেও অন্য সত্তার সন্ধান চলতে থাকে। লেখক-পাঠক দ্বৈত সেতুবন্ধনের ভেতর জড়ো হয় অন্য কিছু ছায়া। আখ্যানবুনন শুরু হয় প্রকৃত লেখকের কলম থেকে।

প্রকৃত লেখক → উহ্য লেখক → কথক উদ্দিষ্ট শ্রোতা → উহ্য পাঠক
প্রকৃত পাঠক⁴⁹

আখ্যানের শুরুয়াং হয় প্রকৃত লেখকের থেকে, যে উহ্য লেখক (implied author) তৈরি ক'রে নেয় এবং আখ্যানের ভেতরের সেই উহ্য বা অপ্রকৃত লেখক একজন কথক নির্মাণ ক'রে নেয়। তার কথন শোনার জন্যে উদ্দিষ্ট শ্রোতা থাকে (বা, উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করেই তার কথন এগোয়)। উহ্য বা অপ্রকৃত লেখকের দ্বারা নির্মিত এই কথক ও উদ্দিষ্ট শ্রোতার যোগাযোগের মাধ্যমে উহ্য বা অপ্রকৃত পাঠকের কাছে আখ্যান পৌঁছায়। আর, এই পদ্ধতিতেই প্রকৃত লেখক প্রকৃত পাঠকের কাছে পৌঁছে যান। চাটমানের মতে, অমৌখিক তথা লিখিত আখ্যানে কথক ও উদ্দিষ্ট শ্রোতা অনুপস্থিত থাকতে পারে, সেখানে সরাসরি অপ্রকৃত লেখকের সঙ্গে অপ্রকৃত পাঠকের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকৃত লেখক ও প্রকৃত পাঠকের সেতুবন্ধন হয়। কিন্তু, মৌখিক আখ্যানে কথক ও উদ্দিষ্ট শ্রোতা কেন্দ্রে থাকে, বিশেষতঃ কথক। যখন প্রকৃত লেখক লেখে, তখন একজন আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ কাউকে তৈরি করে নেন না, বরং একজন উহ্য (implied) নিজস্ব সত্তা তৈরি ক'রে নেন, যে অন্যান্য লেখকের দ্বারা সৃষ্ট 'অপ্রকৃত লেখক'-এর থেকে আলাদা হয়। কথক যেমনটা বলে, উহ্য লেখক (implied author) তেমন কিছু বলে না। উহ্য লেখকের কোনও নিজস্ব স্বর নেই বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম নেই। নিঃশব্দে পাঠককে নির্দেশ দিয়ে চলে সামগ্রিক বুননের মধ্যে দিয়ে এবং আখ্যানস্থ সকল স্বরের মধ্যে দিয়ে।⁵⁰ ওয়েন বুথের মতে উহ্য লেখক (implied author) আসলে পাঠ্যটি লেখে না, কিন্তু যে পাঠ্যটি লেখে তার অভিক্ষেপ (projection) হিসেবে থাকে।⁵¹ যেমন, ইলিয়াস, দেবেশ, দীপেন্দ্রনাথ, মহাশ্বেতা, নবারণ এঁরা প্রত্যেকেই মৃত- তাঁদের রচিত উপন্যাস যখন আমরা পড়ি, সেখানে তাঁরা নিজেরা এসে উপন্যাসের আখ্যানকাহিনী আমাদের বলে দেন না। কিন্তু পাঠ্যের অন্তর্গত উহ্য লেখকের শৈলী, স্বরব্যবহার, উদ্দেশ্য ইত্যাদি থেকে পাঠ্যটি খুঁজে নেয় পাঠক। তেমনই কোনও পাঠ্য (text) কোনও নির্দিষ্ট পাঠকের উদ্দিষ্ট নয়। বহু পাঠকের দ্বারা (বিভিন্ন সময়ের ও

বিভিন্ন কালস্থানের) সেই পাঠ্যটি পঠিত হয়। পাঠ্যের অন্তর্গত উহ্য পাঠকের (implied reader) উদ্দেশ্যে উহ্য লেখক আখ্যানটি ব্যক্ত করে। ইলিয়াসের লেখা যে কোনও যুগের যেকোনও কালস্থানের প্রকৃত পাঠক (actual reader) যখন পাঠ করে, তখন ইলিয়াসের উপন্যাসের উহ্য কথক/লেখক যে উহ্য পাঠকের উদ্দেশ্যে কাহিনি ব্যক্ত করছে, সেই উহ্য পাঠকের মধ্যে সে প্রবেশ করে। উহ্য লেখক উহ্য পাঠকের কাছে বার্তা পাঠায়; আখ্যানের প্রতর্ক (narrative discourse) সেই মাধ্যম, যার মধ্যে দিয়ে আখ্যানটি উহ্য লেখকের থেকে উহ্য পাঠকের কাছে পৌঁছায়। আখ্যানকথন, কাহিনি, ভাষা, বিষয়বস্তু এইসবই আখ্যানপ্রতর্কের অন্তর্ভুক্ত। আখ্যানপ্রতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাহিনি বা ‘গল্প’, যে ‘গল্প’টা কথক (narrator) বলবে আখ্যানশ্রোতার (narratee) কাছে। কথক ও উদ্দিষ্টশ্রোতা আখ্যানপ্রতর্কের মধ্যেই অবস্থান করে। কাহিনীর পটভূমি (plot), কাহিনীবিন্যাস (setting) ও কুশীলবদের নির্মাণ নিয়ে বিন্যস্ত হয় কাহিনী। কাহিনী হচ্ছে কালপরম্পরা অনুযায়ী ঘটনার বিন্যাস, আর, কথক যেভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে উদ্দিষ্ট আখ্যানশ্রোতার কাছে উপস্থাপনা করে সেটাই পটভূমি, যেখানে কার্যকারণ সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে। পটভূমির মধ্যে অন্তর্গত পরম্পরা বিরাজ করে, যা দ্বন্দ্ব, প্রটাগনিস্ট ও অন্য কুশীলবদের সংঘাত এবং পরিণতি ইত্যাদিতে সুবিন্যস্ত থাকে। পটভূমি ঘটনাপরম্পরায় যুক্তিগ্রাহ্যতা ও উদ্দেশ্য যুক্ত করে। গুস্তাভ ফ্রেটাগ পাঁচটি স্তরে আখ্যানের পটভূমিকে বিন্যস্ত করেছিলেন। উন্মোচন (Exposition)- আখ্যানের আবহ এবং প্রটাগনিস্টের আগমন ঘটে। ক্রিয়াকলাপের উত্থানপর্যায় (Rising Action)- আখ্যানের মূল দ্বন্দ্বের উন্মোচন হয় এবং বিরোধাভাসসহ প্রটাগনিস্টের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। তুঙ্গমুহূর্ত (Climax)- আখ্যানের দ্বন্দ্ব ও বিরোধাভাস চরমে পৌঁছায়। এই ক্লাইম্যাক্স থেকেই আখ্যান সম্ভাব্য পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। ক্রিয়াকলাপের পতনোন্মুখীতা (Falling Action)- উত্থানপর্যায়ের মতো ঘটনাবিস্তার ও গভীরতা এই পর্যায়ে থাকে না। দ্বন্দ্ব ও বিরোধাভাস কমে সম্ভাব্য পরিণতি স্পষ্টতর হয়। পরিণতি (Resolution)- প্রটাগনিস্ট বা অ্যান্টাগনিস্টের জয় বা পরাজয় ঘটে। যাবতীয় দ্বন্দ্ব, বিরোধ, কুশীলবদের কর্মকাণ্ড শমে পৌঁছে পরিণতির কাছে সমর্পণ করে।⁵²

দেবেশ কিংবা মহাশ্বেতা আদৌ এই ইউরোপীয় মডেল মানছেন কি? আখ্যাননির্মাণের এই নীতি-কৌশলগুলি অবজ্ঞাত হচ্ছে কি? রহস্যঘনীভবন (suspense) ও বিস্ময়নির্মাণ (surprise) আখ্যানপটের অন্যতম প্রধান দু'টি উপাদান। ক্রিয়াকলাপের উত্থানপর্যায় থেকে পরিণতির দিকে যত এগোতে থাকে, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই দু'ই কৌশলও সেভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। রহস্যঘনীভবনের জন্যে পাঠকের পাঠভঙ্গিও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অব্যবহিত পূর্বে পঠিত ঘটনা থেকে একটা ঘটনাপ্রত্যাশা তার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় আর সেখান থেকেই ‘পরমুহূর্তে কী হতে চলেছে’ সেই ধারণা তৈরি ক’রে নিয়ে পাঠ্যে একাত্ম হয়ে যায় পাঠক।⁵³ উপন্যাসের ‘টানটান ভাব’ আসলে এইটিই। যদিও, চ্যাটম্যানের মতে রহস্যঘনীভবন ও বিস্ময়ের মধ্যে সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে যা পাঠকের পাঠভঙ্গির ওপরে নির্ভরশীল। আখ্যানপাঠের গতিতে পাঠকের কিছু প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায় এবং সেইভাবেই পরবর্তী ঘটনাবলি সে আনন্দাজ ক’রে নেয়; কিন্তু, পরমুহূর্তে প্রত্যাশিত ঘটনাটি না ঘটায় কিংবা কোনও কুশীলবের পাঠক-প্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপ প্রত্যাশানুসৃত না হওয়ায় রহস্য বা বিস্ময় তৈরি হয়।⁵⁴ এই দু'ই কৌশল পাঠককে সদাসচেতন রাখে এবং একইসঙ্গে আখ্যানস্থ টানাপড়েন বজায় রাখে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এককালরৈখিক কাহিনীবর্ণন না থাকলেও, রহস্যঘনীভবন ও বিস্ময়ের উপাদানে কমতি নেই। উপন্যাসের শুরুর অধ্যায়ে পরিণতি জানিয়ে দেওয়া হয়- প্রোটাগনিস্ট হারবার্ট আত্মহত্যা করেছে। এরপরে সেই পরিণতির দিকে যাত্রা চলতে থাকে বাকি অধ্যায়গুলিতে। ‘পরিণতি কেন?’- এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপন্যাসের শেষের আগের অধ্যায়ে আরেকটি ‘বিস্ময়নির্মাণ’ পর্ব চলে, যেখানে হারবার্টের তোষকের নিচে লুকোনো ডিনামাইটের বিস্ফোরণ আরেকটি ক্লাইমাক্স মুহূর্ত হাজির করে। ‘কীভাবে ঘটল’- এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ। কুশীলব (character) আখ্যানস্থ জগতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কুশীলবদের কার্যক্রম, পারস্পরিক সম্পর্ক, কুশীলবদের উত্তরণ/অবতরণ আখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কুশীলবরাও অনেকক্ষেত্রে কথক হয়ে ওঠে- তাদের কথনস্বরে আখ্যানে তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকবদল বা অন্তর্ঘাত ঘটতে পারে। কথকসম্বন্ধীয় আলোচনায় ওয়েন বুথ বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত কথকের প্রসঙ্গ আনছেন- যিনি উহ্য লেখকের অনুবর্তী বা অনুবর্তী নয়। কথক

মূলতঃ তিনধরনের কথনভঙ্গি প্রয়োগ করতে পারে- লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগের তিনরকম অক্ষ হতে পারে- প্রতিবেদনধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী এবং বিচারধর্মী।⁵⁵

স্ট্যাঞ্জেল লেখক এবং লেখকসুলভ কথকের (authorial narrator) মধ্যে পার্থক্যের কথা বলছেন উপন্যাসে, যেখানে কথক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এবং কাহিনি ও পাঠকের মধ্যে। কেইসার ও হামবার্গারের তুলনা করছেন স্ট্যাঞ্জেল। কেইসারের বক্তব্য উপন্যাসে কথকের ভূমিকা একজন প্রতিবেদনকারীর মতো, যে রোজকার ঘটনা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করবে। হামবার্গার কথকের পৃথক কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহান-কথনক্রিয়ার (narrative function) ধারণা দিচ্ছেন, ‘the act of narration is a function’ যার দ্বারা কথিত কুশীলব, ঘটনা ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে ফ্রিডম্যান যখন কথকের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে, ‘evaluates, who is sensitively aware, who observes’⁵⁶- এই ধারণার সঙ্গে সন্দর্ভে আলোচ্য ঔপন্যাসিকদের আখ্যাননির্মাণকৌশল সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে। ‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘কাঙাল মালসাট’ ইত্যাদি উপন্যাসের কথক নিরপেক্ষ নিষ্পৃহ থেকে প্রতিবেদনকারীর ভূমিকা পালন করেছে না। কথকের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যযোজনা, বিষাদপূর্ণ রসিকতা (dark humour), পর্যবেক্ষণের গভীরতা আখ্যানকে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা দিচ্ছে। ভাষাপ্রয়োগ, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি এহেন কথনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। স্ট্যাঞ্জেলের মতে, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কথক উপন্যাসের কথনপ্রবাহের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব কথকের দৃষ্টিভঙ্গি ও কুশীলবদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা বলে। কথকের চিন্তাচেতন প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি অভিব্যক্তি এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত হয় যা শুধুমাত্র ক্রিয়ার (action) সঙ্গে স্থানগত বা কালগত দূরত্বজনিত অবস্থান দিয়েই কমবেশি সংজ্ঞাত হয় না, বরং বহির্গত ও অন্তর্গত ঘটনাসমূহের (events) প্রতি অন্তর্দৃষ্টি/সম্যকদর্শন দ্বারাও সংজ্ঞাত হয়।⁵⁷ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্বৈত স্বরের তত্ত্ব (dual voice hypothesis)- মুক্ত অপ্রত্যক্ষ প্রতর্ক ও তৎসম্পর্কিত ঘটনা একই বাক্যে একজন

কুশীলব এবং কথকের স্বর সংযুক্ত করে। স্ট্যাঞ্জেল পাকালের তত্ত্বের উল্লেখে মুক্ত অপ্রত্যক্ষ রীতির কথা বলছেন, যা দ্বৈত স্বরের অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। যদিও স্ট্যাঞ্জেলের মতে, এই দ্বৈত স্বরে লেখকের স্বর প্রায় অশ্রুত হয়ে যায়।⁵⁸ উত্তম-পুরুষ কথকের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রত্যেক বাক্যের অভিব্যক্তি একজন অদৃশ্য কথক কথিতকে (narratee) উদ্দেশ্য ক’রে ব্যক্ত করছে (যে বাক্যগুলি কুশীলবের সংলাপের বহির্ভূত)। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে কথক-কথনের যে মডেল অনুসৃত হয়, সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাষা। উপন্যাসের কথক ‘সর্বজ্ঞ’ হতে পারছে না, বাঘারুর না-ভাষার কথনকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে এবং কথন-কথক সামঞ্জস্যে রদবদল ঘটছে। বিভিন্ন স্থানগত প্রসঙ্গ উপন্যাসের ব্যক্তিতে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে এবং বিবর্তিত সময় আর্থ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধারণ করে আছে। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্ব-বিন্যাসে অনুপুঞ্জ কথন-ক্রিয়ার সমাহারে বৃত্তান্তের কথক ঘটনা নির্মাণ ক’রে নিয়েছে।⁵⁹ উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজ, ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চস্তরে থাকা মুষ্টিমেয় মানুষের পাশাপাশি তিস্তাপারের আদি বাসিন্দা, বিভিন্ন জনজাতির দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক কথক-কথন মডেলকে প্রভাবিত করে। কথকের ভূমিকা আখ্যানস্থ সর্বজ্ঞ উচ্চস্তরীয় অবস্থান থেকে নিজের স্বর প্রতিষ্ঠা নয় বরং তিস্তাপারের ওই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজসম্পর্ক ইত্যাদি যথাসম্ভব বাস্তবতায় উপস্থাপন করা। হাটুরেদের শব্দ, শ্রমিকদের ভাষা, কৃষিজীবীর ভাষা, গয়ানাথ জোতদারের শব্দ ইত্যাদির সমাহারে অঞ্চলের ইতিহাস-ভূগোল চিনিয়ে দিচ্ছে কথকিয়া।⁶⁰ দেবেশ রায় বহুস্বরের গুরুত্ব অনুধাবন করছেন বলেই রাজবংশী ভাষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয় প্রয়োগ করছেন, যা আখ্যানকথনকে প্রভাবিত করছে। স্বাভাবিক গদ্যে লেখা বাংলা ভাষার গল্পে রাজবংশী ভাষার সংলাপ স্বাভাবিক প্রবণতায় এসে গেলে “গল্পটার আখ্যানভাগ একটা অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সেখান থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি” বলে নিজের লেখক-উপলব্ধির কথা জানাচ্ছেন দেবেশ। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হয়ে উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে রাজবংশী ভাষা শিখে তাকে উপন্যাসে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যাতে আখ্যানকে দু-তিনটি স্তরে ছড়িয়ে দেখা যায়।⁶¹ আখ্যানকৌশলের বিবর্তনে কথনভঙ্গি পাল্টানোর মতোই তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণের বদল। কথকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি একমাত্র

দৃষ্টিভঙ্গি না হয়ে প্রোটোগনিস্ট বা অন্য কোনও কুশীলবের দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পেতে পারে। এই রদবদলটি মতাদর্শের সঙ্গে জড়িত।⁶² কথকের দৃষ্টিকোণ কখনবিশ্বের একমাত্র পরিচায়ক না। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ তাই বাঘারুর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করতে পারে। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তে বসাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে হাডি খিজিরের দৃষ্টিকোণ আখ্যানকৌশলের ধরন বদলে লেখক-পাঠক সংযোগ তৈরি করে। ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এ কথক ঢোঁড়াইদের বহির্বিশ্বের কিন্তু ঢোঁড়াইদের দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দেন; আবার, বাংলা উপন্যাস হয়েও চিরাচরিত বাঙালি সত্তাকে মূল আখ্যানপটের বাইরে অবস্থান করিয়ে বিচার করেন। নিম্নবর্ণের ব্রাত্যজনদের প্রতি মধ্যবিত্ত-ভদ্রজনের বিচ্ছিন্নতা ও ঔদাসীনি্যের আখ্যানের সমান্তরালে ঢোঁড়াইদের বাস্তবতা নির্মিত হতে থাকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আখ্যানকৌশলে দৃষ্টিকোণের ব্যবহার বদলে অন্তর্ঘাতী কথন নির্মিত হয়। লেখক-পাঠক সংযোগ তৈরি করতে আখ্যানকথনে কালের গুরুত্ব অনস্বীকার্য- “The narrative time line is not one monolithic sequence; the time line is segmented into a foreground and background, or into a narrativepresent and a nonpresent.” (Ronen, Ruth 1994, 208) কাহিনিকাল ও কথনকাল নিয়ে আখ্যানের সময় গঠিত হয়। কথক কাহিনির অন্তর্গত বাস্তবের মধ্যে বিরাজ করছে নাকি সেই কাহিনিতলের বাইরে তার অস্তিত্ব, এই দুই অবস্থানগত দ্বন্দ্বের ওপরে নির্ভর করে আখ্যানের কথনকাল।⁶³ ‘খোয়াবনামা’-র সূচনাবাক্যগুলি কাহিনিকাল ও কথনকালের দূরত্ব নির্দেশ করে। তমিজের বাপের শক্ত কাদায় দাঁড়িয়ে থাকা বর্তমানের শক্ত জমিতে, কথনকাল ওটিই (সেই কথককাল উপন্যাস রচনার [১৯৯৬] প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের [১৯৪৬-৪৮])- কিন্তু পরের বাক্যে কাহিনিকাল পৌনে দু’শ বছর পেছনে ফিরে যাচ্ছে- এই দুই আখ্যানস্থ সময়ের পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। কথক কাহিনিপটের অন্তর্ভুক্ত কোনও কুশীলব না। নিকট অতীত (১৯৪৬-৪৮) আর সুদূর অতীতের (১৭৬৩-৯০) যোগস্থাপন করতে ভাষা, মিথ, মুখফেরতা কাহিনি, রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্য নিতে হচ্ছে তাকে। আখ্যানের কালগত সংগঠনে ক্রমের (order) ধারণা জরুরি। কাহিনিকালের নিজস্ব একটা ক্রম থাকে,

আবার বাচনে (discourse) সেই ক্রমের পুনর্বিন্যাস দেখা যায়। আখ্যানকথনে ঘটনাক্রম কীভাবে বিন্যস্ত হবে তা নির্ভর করে ঘটনাগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী এবং তাদের পারস্পরিক যোগসূত্র অনুযায়ী।⁶⁴ বিষয়গত ক্রমের আলোচনায় ‘শূন্যমাত্রার কথন’ প্রসঙ্গে ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’-এর উদাহরণ দিচ্ছেন অমিতাভ দাস। ‘রামচরিতমানস’-এর সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য রেখে ‘ঢোঁড়াইচরিত’-এর গঠন গড়ে উঠেছে, যেখানে অধ্যায়-শিরোনামগুলি ক্রমসজ্জিত করলে আখ্যানের বিষয়গত ক্রমের ধারণা স্পষ্ট হয়। লেখক তাঁর সৃষ্ট কথককে সরিয়ে নিয়ে উপশিরোনামগুলিতে নির্মম বাচনভঙ্গি সজ্জিত করেন।⁶⁵ চিরাচরিত উপন্যাসকথনের অন্তর্ঘাতী প্রয়োগ শূন্যমাত্রার কথনের ফলে নির্মিত হচ্ছে- দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ ও ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে এই কথনভঙ্গির মডেলটি লক্ষ্যণীয়। উপ-অধ্যায়গুলির শিরোনাম কখনও নির্বিকার বিবরণের (ভোরের আগে চা-বাগান, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার), কখনও নির্লিপ্ত নিষ্পৃহ ভঙ্গিতে কুশীলবদের সঙ্গে পরিচয় করানোর (ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা, দুই সেনাপতির সংলাপ, মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র), কখনও বা পাঠককে আখ্যানের বিশেষ কোনও ব্যাপারে সচেতন ক’রে দেওয়ার (কৃষক-মজুরঃ সংগ্রাম, কৃষিবিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত, বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপ, বাঘারুর তৃতীয় সংলাপ, মাদারির মা কতবার মা)। উপন্যাসের অন্তর্ঘাতী পরিসর স্পষ্ট হয় ব্যঙ্গাত্মক বাচনে- লেখক শিরোনামে এই ব্যঙ্গপ্রবণতা ঢুকিয়ে দেন শব্দের ব্যবহারে। ‘বাঘারুর কমলেকামিনীতুল্য অন্তর্ধান’, ‘শ্রীদেবী কতটা দেখান’ ইত্যাদি উপশিরোনামে প্রমিত সাংস্কৃতিক পরিসরের কথনে অন্তর্ঘাত ঘটান লেখক। ‘জমি জরিপঃ গয়ানাথী পদ্ধতি’, ‘গয়ানাথী প্রমাণ’- গয়ানাথী পদ্ধতি সরকারি জমি-জরিপ পদ্ধতিকে প্রত্যাঙ্কান জানিয়ে আঞ্চলিক ক্ষমতা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে; গয়ানাথের দেওয়া প্রমাণে গয়ানাথের জোতদারি আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্য রক্ষিত হয় সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। ক্ষমতাকাঠামোর এই অনুশীলন নিষ্ঠুর কিন্তু বাস্তব। ‘বন্যার মুখে একটু ভেজা ধর্ষণ দিয়ে চরপর্বের শেষ অধ্যায়’- এই শিরোনামের অন্তর্গত কথনবিষয় মর্মান্তিক, বাচনভঙ্গি নির্বিকার নির্মম, কিন্তু একটি মহাকাব্যিক আখ্যানের কথনে তাৎপর্যপূর্ণ। জেরার জেনেট কথনবিন্যাসের

ক্রমবিপর্যাসে পশ্চাৎ-উদ্ভাস (flashback) ও সম্মুখ-উদ্ভাস (flashforward) কৌশলের উল্লেখ করছেন। পশ্চাৎ-উদ্ভাসের ক্ষেত্রে প্রোটাগনিস্ট হয়তো আখ্যানের শুরুতেই মৃত, তারপর তার জীবন, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বর্ণিত হচ্ছে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই আখ্যানকৌশল অনুসৃত হয়েছে। হারবার্ট আত্মহত্যা করেছে, তা পাঠক উপন্যাসের শুরুতেই জেনে যাচ্ছে- এরপর হারবার্টের জীবনসম্পর্কিত সমস্ত পরিসরের হৃদিশ পাচ্ছে পাঠক, যেখানে ‘কেন আত্মহত্যা’ এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান চলছে। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসে বসাইয়ের মৃত্যুর খবর পাঠক জেনে যায়, এরপরে কালী সাঁতারার দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চাৎ-উদ্ভাস চলতে থাকে। “The theme in nonlinear novels often deals with the ways people experience memory and time, and the role these elements play in human experiences.” ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসেও এমনই ক্রমবিপর্যয় ঘটে আখ্যানকথনে। অ্যাসাইলাম থেকে রণজয়ের পালিয়ে যাওয়ার বিবরণে আখ্যানবর্ণন শুরু হয়। রণজয়ের দৃষ্টিকোণে সে বন্দিদশা থেকে বিপ্লবের জন্য পালিয়ে যাচ্ছে- শ্রেণিশত্রুবেষ্টিত অঞ্চল থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তাঞ্চলে লুকিয়ে-রাখা রাইফেল খুঁজে বিপ্লব করার জন্যই তার যাত্রা। এই দৃষ্টিকোণের সংঘাতে অন্যান্য দৃষ্টিকোণে কথক জানায় রণজয়ের স্মৃতিবিভ্রম ও দৃষ্টিভ্রমের কথা। রণজয় নিজের ‘সময়’কে নির্মাণ ক’রে নেয়। এই সময় ১৯৬০-৭০ দশকের, যখন কৃষিবিপ্লবের প্রস্তুতি তুঙ্গে এবং বামপন্থী রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিরোধমূলক অবস্থানে দৃঢ়। তার নির্মিত এই সময়ে লেনিনের থেকে সরাসরি পরামর্শ নেওয়া যাচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধের অনুশীলন জারি আছে এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেক হত্যার বদলা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আখ্যানের অন্যান্য কুশীলবদের দৃষ্টিকোণে যা ‘অতীত’, রণজয়ের দৃষ্টিকোণে ও চেতনাসূত্রে সেটাই ‘ঘটমান বর্তমান’। উপন্যাসের আখ্যানকথন নব্বই দশক থেকে ষাট-সত্তর দশকে ঘোরাফেরা করেছে- এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনা, এক স্বর থেকে অন্য স্বরের সেতুবন্ধন করেছে। কিন্তু, রণজয় আখ্যানকথনের সময়ের সমান্তরালে নিজস্ব বাচনের সময়ক্রম সাজিয়ে নিচ্ছে।

Time is made by human beings and human beings and has to do with power which they exercise over one another with the aid of strategies of time. Time unites and separates, combatants as well as lovers. As with every form of power, there is a counter-power, every strategy finds its counter strategy. (Nowotny 1994, 142-143)

রণজয় সময়কে বিরুদ্ধ-নীতি হিসেবে ব্যবহার করছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাতিষ্ঠানিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জারি রাখছে। রণজয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত আখ্যানক্রমে রণজয় একজন অপরাজেয় লড়াকু নায়ক।⁶⁶ স্মৃতি এখানে প্রতিরোধ, অতীত রণজয়ের হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা তার কাছে স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, নীতিনির্দেশক সমাজ তাকে ‘মূলস্রোত’ থেকে বিচ্ছিন্ন ক’রে দিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষণা ক’রে দিয়েছে। তাই সেই ‘ভারসাম্যহীনতা’কে প্রতিরোধের অস্ত্র গড়ে তুলে আখ্যানক্রমকে সংক্রমিত করছে রণজয়। উপন্যাসের কথক রণজয়ের দৃষ্টিকোণ ও এলোমেলো কখনভঙ্গি দ্বারা সংক্রমিত বলেই সামগ্রিক আখ্যানকথনে সময় একরৈখিক একমুখীন হচ্ছে না। হাউস্টন টেলরের মতে, অরৈখিক কথনে (non-linear narrative) পশ্চাৎ-উদ্ভাস ও সম্মুখ-উদ্ভাস কৌশল ব্যবহৃত হয়, যেখানে বর্তমানের কোনও ঘটনাবর্ণনে স্মৃতিপথ ধরে বা অন্য কোনও উপায়ে অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনাবলির উন্মোচন হয়।⁶⁷ রণজয়ের বাস্তব ও কল্পনা-দৃষ্টিবিশ্রমের মধ্যে আদানপ্রদানের সেতুটি রাজনৈতিক। কালগত মাত্রার হেরফের ঘটছে বলেই আখ্যানের ‘প্রকৃত’ সময় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, স্বরভেদ অনুযায়ী বদলে বদলে যাচ্ছে।

বাখতিন উপন্যাসের প্রতর্কের আলোচনায় স্বর (voice) ও রীতির (style) কথা বলছেন। ভাষার মতাদর্শগত অর্থ নিজের ভেতরে বহন করে। কোনও ভাষাই একস্তরীয় একীভূত তন্ত্র নয়, বরং বিভিন্ন সমাজোচ্চারণ (sociolects) ও নথিকরণের (register) সমাহার। শ্রমজীবীর ভাষা-উচ্চারণ এবং বিদ্বজীবীদের ভাষা-উচ্চারণে তফাৎ খেয়াল করা যায়, প্রত্যেকটিই

নিজেদের বৃত্তের মূল্যবোধ-উপাদান বহন করছে। বাখতিনের মতে উপন্যাসে বহুস্তরীয় সমাজোচ্চারণ মিশে দ্বিবাচনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা আবশ্যিক। এই দ্বিবাচনিকতা একটা বাক্যের মধ্যেও প্রকাশ করা যায়, যেখানে দ্বৈতস্বর-প্রতর্ক (double-voiced discourse) তৈরি হচ্ছে। ঔপন্যাসিকেরা ভিন্নস্তরীয় সমাজোচ্চারণকে আখ্যানে উপস্থাপিত করেন, কখনও অন্য সমাজোচ্চারণকে দমিয়ে একটি সমাজোচ্চারণ আধিপত্য করে, কখনও বা তা কর্তৃত্বমূলক সমাজোচ্চারণের স্বরের সমালোচনা করে। বাখতিন দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে এই সমাজোচ্চারণের স্বরসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছেন। বাখতিন বলছেন যে, কথকের স্বর বা কথকের নিজের প্রতর্ক আখ্যানের অনেক-প্রতর্ক ও বহুস্বরের মধ্যে অন্যতম। বাখতিনের মতে, উপন্যাস পাঠকের সামনে একটা দরজা খুলে দেয় “to know one’s own belief system in someone else’s belief system” (Bakhtin 1981, 365), যাতে উপর্যুক্ত বহুস্বরের পারস্পরিক সংলাপ চলতে পারে আখ্যানের ভেতর। প্রতিটি স্বরের পৃথক ক্ষেত্র (space) জরুরি, যাতে একে অপরের ঘাড়ে উঠে না পড়ে, যাতে প্রত্যেক স্বরের গুরুত্ব উপস্থাপিত হয়। বহুস্তরীয় সমাজোচ্চারণ যখন মতাদর্শগত অর্থ বহন করে এবং একে অপরের সঙ্গে মিশে আখ্যানের বাক্য তৈরি করে, তখন বহুার্থ ও বহুস্বরের জন্ম হয়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের প্রথম দু’টি বাক্য লক্ষ্যণীয়। বাক্যদু’টিতে তমিজের বাপের মতো নগণ্য মানুষের ক্রিয়া- তারপর ইতিহাস থেকে বর্তমানের এক দীর্ঘ যাত্রাপথ- সেই যাত্রাপথে ঔপনিবেশিক আছে, দ্রোহী উপনিবেশিত আছে এবং অ-দ্রোহী সাধারণ উপনিবেশিত রয়েছে। বহুার্থ ও বহুস্বরের ইঙ্গিত স্পষ্ট হচ্ছে শুরুর ওই বাক্যদ্বয়ে। দেবেশ রায় ঔপন্যাসিক-কথক সম্পর্ককে বাখতিনীয় বিশ্লেষণের আলোতে দেখেন। “বহুস্বর আর লেখকের স্বরের যে দ্বৈততা তা থেকেই তৈরি হয় উপন্যাসের আততি।” (রায় ২০০৬, ৩৩) বাখতিন নবায়নের (Novelization) যে লক্ষণগুলি উপন্যাসে খুঁজে পাচ্ছেন, তাতে ভাষার নিয়ত নবীকরণের কথা বলছেন- অন্যান্য সাহিত্য-সংরূপের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে নমনীয় এবং উদার, তাতে নির্দিষ্ট সাহিত্যভাষার বহির্জগৎ থেকে বহুস্তরীয় বহুস্বরের শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়। উপন্যাসের অনিশ্চয়তার সংরূপকল্পে সময়ের প্রসারিত ধারণা রয়ে যায় যা মুক্তসমাপ্তির

ইঙ্গিতবাহী এবং সাম্প্রতিক বাস্তবতার (contemporary reality) নিয়ত-বিবর্তনশীল সূত্রধারী।⁶⁸ উপন্যাসের উপসংহারহীন বিকাশমান বৈশিষ্ট্যের জন্যই তা অন্য সংরূপগুলিকে নিজের আখ্যানপরিসরে ঢুকিয়ে নিতে পারে এবং “it infects them with its spirit of process and inconclusiveness” (Bakhtin 1990, 7) মহাকাব্যের (epic) সঙ্গে উপন্যাসের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তৃতি ও সাম্প্রতিক গ্রহণযোগ্যতার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করছেন বাখতিন। উপন্যাসে বহু আঙ্গিক ও পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে পারে, কারণ লেখকের সার্বিক জ্ঞান কুশীলবদের থেকে (এমনকি নায়কের থেকেও) বেশি থাকে; লেখকের সর্বজ্ঞতা মূল কুশীলবদের থাকে না। (৩২) উপন্যাস এমন এক আখ্যানজগৎ গড়ে তোলে যেখানে প্রথম তথা আদর্শ শব্দ বলে কিছু হয় না আর অন্তিম শব্দ এখনও অজ্ঞাত।⁶⁹ দেবেশের উপন্যাস-দর্শন এই ধারণার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- ‘বৃত্তান্ত’ এহেন সংজ্ঞায়নের ফসল। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর শেষপর্বে মুক্তসমাপ্তির ইঙ্গিত বাখতিনের উক্ত উপন্যাসতত্ত্বের অনুরূপ। বহু সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকছে সেখানে। সিমুর চাটমান উপন্যাসের কথক বা আখ্যায়কের যে মডেলটি তৈরি করেছেন, সেখানে অন্তর্নিহিত লেখকের কোনও স্বর নেই, প্রত্যক্ষ সংযোগের কোনও উপকরণ নেই। নীরবে সামগ্রিক বিন্যাস ও সমগ্র স্বরের মধ্যে দিয়ে তা নিহিত পাঠক ও প্রকৃত পাঠকের সঙ্গে সংযোগসাধন করছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, দেবেশের ধারণার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, দেবেশ রায়ের প্রবন্ধচিন্তা বা ‘ব্যক্তি’ দেবেশের দর্শন এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়; দেবেশের উপন্যাস বিশ্লেষণ করা উদ্দেশ্য। দেবেশ তাঁর উপন্যাসের-দর্শনকে তথা চ্যাটমানের মডেল ও বাখতিনীয় আখ্যানদর্শনকে প্রয়োগ করছেন তাঁর উপন্যাস নির্মাণে। এই মডেলের সঙ্গে দেবেশ ও ইলিয়াসের দর্শন তুলনীয়।

চাটমানের উপন্যাস-দর্শনের সঙ্গে বিশেষতঃ উপন্যাসের কথক-ভাষা-সত্য এই ত্রিস্তম্ভের ব্যাখ্যার সঙ্গে দেবেশ রায়ের ‘উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে’ মিলে যায়। দেবেশ রায়

উপন্যাসের ভাষা ও সেই ভাষায় প্রকাশিত সত্যের প্রকাশে ঔপন্যাসিকের শিল্পসংকটকে বুঝতে চেয়েছেন,

আমি শুধু একজন ঔপন্যাসিকের শিল্পসংকটের কথা ভাবছি- এমন কোনো ঔপন্যাসিক যে আজ বা আগামীকাল উপন্যাসের এমন এক ভাষার অধিকার চাইতে পারে যে-ভাষায় তার কথা সত্য মনে হবে, বানানো মনে হবে না। আমি এমন একজন ঔপন্যাসিকের শিল্পসংকটের কথা ভাবছি যে আজ বা আগামীকাল চাইতে পারে সে যে-বাক্যটি রচনা করবে আর সেই বাক্যের ভিতরে যে-অর্থটি ভরে দিতে চাইবে তার মাঝখানে একমাত্র সংযোজক হিসেবে সেই থাকবে লেখক হিসেবে, কথক হিসেবে; সে কোনো কলোনির প্রজা হিসেবে কলোনির কোনো শিক্ষা তার বাক্যের ভিতরে ভরে দেবে না। (রায় ২০০৬, ২২)

ইলিয়াস ‘উপন্যাসের বুর্জোয়া মডেল’ বিষয়টি আত্মস্থ করছেন বলেই তাঁর নিজের উপন্যাসের সঙ্গে এই মডেলের সচেতন দূরত্ব বজায় রাখছেন। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশের ব্যর্থতার জন্যে উপন্যাসের ‘ব্যক্তি’-কে ইউরোপীয় মডেলানুসারে খুঁজে পাননি ইলিয়াস। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অভিমত ছিল যে, ঋত্বিকের কাছে হয়তো ‘হলিউড’ বলে কিছু অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের হলিউডিয় নির্মাণ, হলিউডিয় কৌশল, হলিউডিয় আখ্যানবর্ণন এবং হলিউডিয় অভিনয়তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন নিষ্পৃহতা ছিল ঋত্বিক ঘটকের। ঋত্বিক দেশজ আখ্যান দেশজ সত্তাসহ উপস্থাপিত করতেন। আখ্যানবর্ণনার সফল, জনপ্রিয় আঙ্গিকের বিষয়ে তিনি সচেতন দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। তাই তাঁর চলচ্চিত্রের ভাষা প্রচলিত জনপ্রিয় চলচ্চিত্রভাষার থেকে আলাদা। ঋত্বিকের এই সন্ধান সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইলিয়াস, দেবেশ, মহাশ্বেতা, নবাবুগদের সন্ধানের সঙ্গে মিলে যায়। দেবেশ যে শিল্পসংকটের উল্লেখ করছেন, ইলিয়াসও তা উল্লেখ করছেন। উপন্যাসের মূল ভিত ভাষা- আখ্যানের গড়ন-গঠন, বিষয়বস্তু, কুশীলবনির্মাণ ও আখ্যানপট প্রত্যেকটিই ভাষাকে ভিত্তি ক’রে পূর্ণতা পায়। উপরোক্ত গদ্যকাররা

উপন্যাসের নতুন ভাষার পরীক্ষানিরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালিয়েছেন বলেই দেশজ সত্তার প্রখর উপস্থিতি রয়েছে তাঁদের উপন্যাসে। ভাষা শুধুমাত্র প্রমিত, মান্য, প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার গণ্ডিতে আটকে থাকছে না। দেশীয় নাগরিকদের বহুস্তর থেকে উঠে আসা বহুমাত্রিক ভাষা উপন্যাসের পরিসরে অনায়াসে মিশে যাচ্ছে। উপভাষা, অপশব্দ ইত্যাদি যাবতীয় তকমাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভাষার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে হাজির হচ্ছে। মধ্যবিত্তের, ভদ্রজনের এঁচে দেওয়া ভাষার নিয়মনীতি সচেতনভাবে অবজ্ঞা ক'রে ও লঙ্ঘন ক'রে শিল্পসংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছেন তাঁরা। বাংলা গদ্যসাহিত্যের নির্মাণে ও বিবর্তনে ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। আলোকায়নের ফলে ঔপনিবেশিক নীতি-মূল্যবোধ-ধারণায় শিক্ষিত বাঙালি জাতি ঔপনিবেশিকদের চোখ দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করতে শিখল।⁷⁰ ভাষার প্রশ্ন আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বহুস্তরীয় বহুমাত্রিক ভাষা আখ্যানকে ধারণ করেছে। প্রগতিবাদী ভাষা, কমিউনিস্ট ভাষা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদী ভাষা বলে আলাদা আলাদা বর্গ হয় না। দেশজ মানুষের চেতনাকে আখ্যানে প্রতিফলিত করতে গেলে ভাষার ছুঁমার্গ চলে না। সেই ভাষা রাজনীতিগত বিশুদ্ধ না-হলেও কিংবা সেই ভাষাপ্রয়োগে কমিউনিস্ট মতাদর্শমাত্রিক শব্দচেতনার প্রতিফলন না-থাকলেও, সেই ভাষাকে অস্বীকার করা যায় না। বহুস্তর, বহুশ্রেণি, বহুবর্ণে বিভক্ত দেশজ মানুষের প্রত্যেকের চেতনার মানে বিভিন্নতা আছে বলেই আখ্যানের ভাষা রাজনীতিগত বিশুদ্ধি মেনে কুশীলবদের মুখে বসতে পারে না। কমিউনিস্ট মূল্যবোধ-নীতি ইত্যাদি যদি বিমূর্ত তত্ত্বে থেকেও থাকে, তাহলে তা হুবহু মেনে আখ্যানের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না। যদি লেখক তা করেন, তাহলে তা লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তার প্রয়োগ হবে। বিপ্লবের অভিমুখে ভাষাকাঠামো সমানুপাতে পরিবর্তিত হতে পারে না, বা বিপ্লবের পরে ভাষাকাঠামো হঠাৎ বদলে যেতে পারে না। ভাষা মার্ক্সকথিত সামাজিক ভিত্তি-উপরিকাঠামো (base-superstructure) গড়ন মানে না। নিকোলাই মারের যুক্তি ছিল যে, ভাষা সমাজের উপরিকাঠামোর এবং তা নিয়মমাত্রিক অর্থনৈতিক ভিতের ওপরে নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সমাজব্যবস্থার আর্থকাঠামোর বদল হলে ভাষা বদলে যাবে। কিন্তু রাশিয়ায় বা অন্য কোনও দেশে বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে ভাষার আমূল

কোনও পরিবর্তন হয় নি বা ব্যবহারিক উল্লেখযোগ্য বদল হয় নি। নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থার প্রকৌশল, উৎপাদনপদ্ধতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের দরুণ কিছু শব্দের ব্যবহার পালেটছে, ব্যবহারজনিত অর্থের তারতম্য ঘটেছে কিংবা কিছু শব্দের সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে; কিন্তু পূর্বতন সমাজের তুলনায় ভাষার মূলগত বদল বা ব্যাকরণবিন্যাসে বদল ঘটেনি। ভাষা যদি উপরিকাঠামো হত, তাহলে আর্থ-রাজনৈতিক বিপ্লবের পরের সমাজে তা আমূল পালেট যেত। কিন্তু, তা হয় না। পুরনো সমানব্যবস্থায় ও নতুন সমাজব্যবস্থায় মানুষ একই ভাষায় কথা বলেন। কোনও একটা নির্দিষ্ট শ্রেণি ভাষা তৈরি করে না, সম্পূর্ণ সমাজের জন্য ভাষাপ্রকল্প ত্রিাশীল থাকে। শাসক ও শোষিত একই ভাষায় কথা বলেন। বহু শতক ধরে ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও বদলের ইতিহাস রচিত হয়। কিন্তু, সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্য ও সংস্কৃতিগত বৈষম্যের জন্য আধিপত্যকারী গোষ্ঠী ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চস্থানে থাকা গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণি নিজেদের শাসনের স্বার্থে ভাষার প্রমিত-অপ্রমিত, শিষ্ট-অশিষ্ট, ভালশব্দ-অপশব্দ ইত্যাদি বয়ান প্রতিষ্ঠা ক'রে 'মান্য' ভাষাপ্রকল্প গড়ে নিতে চায়। মারের তত্ত্বায়নের একটা সমস্যা ছিল যে, মার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে কাঁচা ছিলেন এবং তাঁর শ্রেণিবিষয়ক ধারণায় গলদ ছিল। রোজালিয়া অসিপোভনা সর ১৯২৬ সালে সামাজিক স্তরভেদের প্রসঙ্গ ভাষাতত্ত্বে জুড়েছিলেন- সামাজিক স্তরবৈষম্যের জন্য ভাষার সামাজিক স্তরপ্রভেদ হয়, ফলে একই ভাষার বহু 'সোশ্যাল ডায়ালেক্টস' থাকে। মারের শ্রেণিভাষা তত্ত্বের বিরোধিতা ক'রে সর মারের শ্রেণি-বোঝাপড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন যদিও বস্তুগত ভাষাতত্ত্বে (materialist linguistics) মারের অবদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলেন।⁷¹ লেভ পেত্রোভিচ জাকুবিনস্কি মনে করতেন যে, সমাজের শ্রেণিভাগ থেকে ভাষার সামাজিক স্তরভেদ উৎপত্তি এবং একমাত্র শ্রেণিহীন সমাজে একস্তরীয় একীভূত ভাষা থাকতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজে উচ্চশ্রেণিকর্তৃক নিপীড়ন ও শ্রেণিসংঘাত চলমান বলে একীভূত ভাষাপ্রকল্প অসম্ভব। মারের মতোই জাকুবিনস্কি ভাষাকে উপরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন। যদিও, জাকুবিনস্কির মতে, প্রলেতারিয়েতের ভাষার শ্রেণিচরিত্র 'পোশাকি-কৌশলগত (formal-technical)' বা ভাষাগত (linguistic) স্তরে প্রতীয়মান হয় নো; বরং

প্রতীয়মান হয় “in a specific way of using linguistic material that is shared by all classes.” (Jakubinskij 1931, 31-32) কিছু নির্দিষ্ট ‘discursive method’-এর ফলে প্রলেতারিয়েতের ভাষা অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির ভাষার থেকে স্বতন্ত্র হয়- জাকুবিনস্কির তত্ত্ব মারের তত্ত্বের থেকে এখানেই আলাদা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ভোলোশিনভের তত্ত্ব যিনি ভাষাগত স্তরের সামাজিক ও মতাদর্শগত আন্তঃসম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। ভাষা উপরিকাঠামোর অন্তর্গত না, (উপরিকাঠামো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত না) বরং ভাষা মানুষের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ভাষার রাজনৈতিক বিশুদ্ধি, শ্রেণিগত বিশুদ্ধি হয় না ঠিকই, কিন্তু বোধগম্যতার সমস্যা থাকে। ভাষার প্রায়োগিক অর্থবিস্তার এবং বাচনের বহুদ্যোতনা সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে। ভারতীয় সমাজে জাতিগত, ধর্মগত, সামাজিক-অবস্থানগত ফারাকের জন্য দেবেশ, মহাশ্বেতা, ইলিয়াস ওই বোধগম্যতার সমস্যাগুলি আখ্যানে উপস্থাপিত করেছেন। বামপন্থী সত্তাবিশিষ্ট লেখক হয়েও ভারতীয় ও বাংলাদেশি সমাজের বহুস্তরীয় ব্যবধান থেকে স্বতন্ত্র হওয়া ভাষাকাঠামো তাঁরা আত্মস্থ করেছেন। তাই প্রত্যেক কুশীলবের স্বর চিনে নেওয়া যায়, প্রত্যেকের স্বরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাডিড খিজিরের ভাষা ‘আদর্শ শ্রমজীবী’-র কাল্পনিক পরম কমিউনিস্ট মডেল এবং ইউরোপীয় উপন্যাস-মডেল দু’টিকেই প্রত্যাহ্বান জানায়। বাঘারু, কেলুদের স্বরে ভারতবর্ষের প্রান্তিকতমদের সঙ্গে ভদ্র-সুধীজনের অনপনেয় দূরত্ব, বোধগম্যতার ফারাকগুলি প্রতীয়মান হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রজন এতকাল বাঘারু, কেলুকে যে ছকে দেখতে চেয়েছে ও দেখাতে চেয়েছে, তাতে অন্তর্ঘাত ঘটে। বসাই টুডুর রুক্ষ, অমার্জিত, অপ্রমিত ভাষা প্রগতিশীল ছাঁদে আঁটে থাকে না, ঔপনিবেশিক আখ্যানপ্রকল্পে আঁটে না এবং কথক-ভাষা-সত্য এই ত্রিস্তম্ভের নবায়ন ঘটিয়ে দেয়। নিছক কিছু বিশিষ্ট-শব্দবন্ধ (jargon) বা বাচনভঙ্গি না, সমগ্র ভাষাকাঠামোর বহুমাত্রিক সত্তা প্রতিফলিত হচ্ছে এঁদের লেখায়।

আখ্যানের ভাষা, মিথ ও প্রতিরোধের সন্ধান

‘অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)’ উপন্যাস মৌখিক আখ্যান এবং অ-লিখিত সাহিত্যের গর্বিত উদ্‌যাপন করে। উচ্চবর্গ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুণ্ডা জনজাতির কৃষিজীবী নিরক্ষররা বিদ্রোহ করেছিলেন। ‘দিকু’দের দখল থেকে নিজেদের ভিটেমাটি জন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য যে দ্রোহ, তারই আখ্যান এটি- উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের ব্যর্থ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ দ্রোহ করেছিলেন বিরসারা। দিকুরা সেই উচ্চবর্গ, যারা আঞ্চলিক ক্ষমতার অধিকারী, যারা দেশী এবং বর্ণগত-শ্রেণিগত শোষণে আস্থাশীল। রণজিৎ গুহর বিশ্লেষণে এরা দেশি প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মধ্যে ধনী কৃষক, অধুনা-ক্ষমতাহীন ভূস্বামীরাও আছেন, যাঁরা সর্বদা উচ্চবর্গের স্বার্থরক্ষার্থে কাজ করেন।⁷² উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে দিকুদের অবস্থান কিছুমাত্র বদলায়নি কারণ শোষণকাঠামো অব্যাহত থেকেছে- শোভেন্দ্রশেখর হাঁসদার আখ্যান তার বর্ণনা দেয়। ‘দ্য আদিবাসি উইল নট ডান্স (২০১৫)’ গল্পের প্রোটোগনিস্ট মঙ্গল মুর্মু বর্তমানে দিকুদের শোষণের বর্ণনা করে,

all Diku—Marwari, Sindhi, Mandal, Bhagat, Muslim. They turn our land upside down, inside out, with their heavy machines. They sell the stones they mine from our earth in faraway places- Dilli, Noida, Panjab. This coal company and these quarry owners, they earn so much money from our land. They have built big houses for themselves in town; they wear nice clothes; they send their children to good schools in faraway places; when sick, they get themselves treated by the best doctors in Ranchi, Patna, Bhagalpur, Malda, Bardhaman, Kolkata. What do we Santhals get in return? Tatters to wear. Barely enough food. Such diseases that we can't breathe

properly, we cough blood and forever remain bare bones.” (Hansda 2015, 171-72)

দিকুরা মঙ্গল মুর্মুদের জল-জঙ্গল-জমি দখল ক’রে তাঁদের জন্য দারিদ্র্য আর মৃত্যু সাজিয়ে রেখেছে। দিকুদের পরিচয়ে ধর্মগত বা জাতিগত বিভিন্নতা থাকলেও, শোষণকাঠামোর ভূমিকায় তফাৎ নেই। “আদিবাসীদের বঞ্চিত করে সকলে নিয়ে নিল সব, ভাগ করে নিল... আদিবাসীরা সকল শাসনব্যবস্থাতেই হতে থাকে বঞ্চিত।” (দেবী ১৯৮০, ১২৮) বসাই টুডুর প্রতিবাদের প্রতি সহমর্মী কালী সাঁতারার চেতনাপ্রবাহে কথকের স্বর স্পষ্ট হয়। না-আদিবাসী অবস্থান থেকে আদিবাসী জনজাতির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের ফাঁকটুকু সম্বন্ধে সচেতন হতে হতে কালী সাঁতারার বকলমে কথক আসলে উচ্চবর্ণীয় পাঠকদের সচেতন ক’রে দেন আদিবাসীদের ওপরে যুগযুগান্তরে হয়ে চলা শোষণ সম্পর্কে।⁷³ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের সমান্তরালে সাংস্কৃতিক শোষণের উল্লেখ করে মঙ্গল- ঝাড়খণ্ড-বিহারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঙ্গল মুর্মুদের নাচ-গান দিকুদের মনোরঞ্জন করে। মঙ্গল মুর্মুর প্রতিস্পর্ধী বিরসা বা বসাইয়ের মতো সশস্ত্র দ্রোহপথ নেয় না, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে কিছু ‘বেয়াড়া’ প্রশ্ন উত্থাপন করে। এই প্রশ্নগুলির মূলগত ভিত্তি জল-জঙ্গল-জমি লুণ্ঠ হয়ে যাওয়া নিয়ে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের বৈষম্য। ‘আদিবাসীরা নাচবে না’- এই দৃঢ়বাক্য ঘোষণা করা একাধারে রাষ্ট্রের আদেশকে নস্যাৎ করা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ‘নাচবে না’ উচ্চারণের মধ্যে একদিকে যেমন নিপীড়িতের প্রত্যাখ্যান রয়েছে তেমনই অন্যদিকে শাসক-মতাদর্শ প্রণীত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক উন্নয়নের মডেলকে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে আদিবাসীদের দ্রোহ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতা। বিরসা ও তাঁর সহযোদ্ধারা শাসকবিরোধী দিকুবিরোধী দ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন- তার প্রায় সাত দশক পরে বসাই টুডু ও তাঁর সহযোদ্ধারা উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসক এবং বাবুদের বিরুদ্ধে দ্রোহস্বর সোচ্চার করে। আর, তাঁদের দ্রোহ শুধু বাহ্যিক শাসনবিরোধী ছিলনা কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছিলনা বরং শাসকের মতাদর্শগত

প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ছিল। ভাষা এমনই এক মতাদর্শগত প্রয়োগমাধ্যম যার দ্বারা শাসক তার আধিপত্য চাপিয়ে দেয় শাসিতের ওপরে এবং ক্ষমতাকাঠামো অব্যাহত রাখার অনুশীলন চালিয়ে যায়। মৌখিক সাহিত্যের ওপরে লিখিত সাহিত্য ও অ-ভদ্রলৌকিক ভাষার ওপরে মান্যভাষা চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি শাসকের মতাদর্শকেই পুষ্ট ক’রে চলে নিরন্তর, ক্ষমতাকাঠামো অবিকল রাখে। বিরসার প্রত্যাখ্যান ওই মতাদর্শকেও; বিরসা নিজের ভাষা ও অস্তিত্বের গর্বে ওই প্রত্যাখ্যানের রাজনীতি স্পর্ধিত করে,

মিশনে শিখাল ইংরাজির মত ভাষা নাই, সে ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ। দিকুদের ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ। আমার মুণ্ডরীতে অত শব্দ নাই হে! লিখবার অক্ষর নাই! যত শব্দ দেখ, সব মোদের আঁত ছিঁড়া, রক্তে ভিজিয়ে সিজানো! মোরা লিখি না, গান সিজাই! লিখার অক্ষর যার নাই, সে নাকি বর্বর, অসভ্যটা। তেমন বর্বর-অসভ্য মুণ্ডরে আমি সাহেবদের সামনে দাঁড় করায়েছি গুলতি-নুড়ি হাতে। আমি ভগবান (দেবী ২০১১, ১৭৩-৪)

বিরসার এই ভাষাগর্ব ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র বিরসার সংলাপ হয়ে থাকে না বরং আখ্যান-নির্মাণের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে। ব্রিটিশ বনাম মুণ্ডা সংঘাতের সময়ে এই ব্যবধান অনপন্যে হয়ে ওঠে। লেখক বিরসাকে দিয়ে দিকুদের আক্রমণ শানিয়েও সেই দিকুদের ‘বাংলা’ ভাষাতে আখ্যান রচনা করছেন, কারণ আখ্যানের উদ্দিষ্ট পাঠক ‘দিকু’ ও ভদ্রলোকরা। মহাশ্বেতা যে কর্নেল সুরেশ সিংয়ের গ্রন্থ থেকে অনেকাংশে ইতিহাস-তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, তা ইংরাজি ভাষায় লেখা, সর্বোপরি তা উচ্চবর্গের এক প্রতিনিধির লেখা।⁷⁴ মহাশ্বেতার আখ্যানে ইংরাজি, বাংলা এবং আদিবাসী উচ্চারণ পাশাপাশি অবস্থান করছে- কিন্তু, আদিবাসী উচ্চারণ পূর্বোক্ত ভাষাদ্বয়কে যে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছে তা স্পষ্ট, সোচ্চার। ব্রিটিশদের আধুনিক সমরভাষা আর মুণ্ডাদের প্রাগাধুনিক সমরভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে, মুণ্ডাদের প্রতিরোধের ভাষা আধুনিক বনাম বর্বর প্রত্যেকের তোয়াক্কা করে না। আদালতে মুণ্ডারা বিচারব্যবস্থা দ্বারা শোষিত হয় ইংরাজী না জানার জন্যে- “সাহেবরা মুণ্ডরী জানে না... মুণ্ডাদের বিচার করে। দুভাষী যা বুঝায়, তাই বুঝে।” (১৭৫)

শাসকের ভাষা এবং শাসিতের ভাষার দূস্তর ব্যবধানের জন্যেই শাসিতের ভাষাকে যেকোনও উপায়ে দমিয়ে দিতে চায়। শাসক তার শাসনব্যবস্থার সমস্ত কিছুই নিজস্ব বোধগম্যতায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, নিজস্ব কাঠামোয় পুরে ফেলতে চায়- আর, যখনই তা পারে না, তখনই তাকে শত্রু বানিয়ে দমন করতে চায়। শাসকের শোষণের অন্যতম মাধ্যম যে ভাষা, তা প্রকাশ শাসকের পরিকল্পনাতেও; আইনি ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপদ্ধতি যে নিপীড়িতদের সহায়ক নয়- এই সত্য দুই প্রতিনিধির কথোপকথনের স্বরে উঠে আসে, “আইনের প্যাঁচে ফেললে মুণ্ডাদের যে শাস্তি হবে, অন্য কোনো প্যাঁচেই তা হবে না। প্রথম সুবিধে হল, জজ মুণ্ডারী বোঝে না। দ্বিতীয় সুবিধে হল, মুণ্ডারা আইন-ইংরেজী বোঝে না। তৃতীয় সুবিধে হল, থেংগার করে ওদের জেলে রেখে দাও” (১৮০) জেকব আর অমূল্য আখ্যানের গতিপথে মধ্যস্থতার ভাষা নিয়ে আসে। শাসকের ভাষা এবং শোষিতের ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে চায় তারা যাতে শোষণের মাত্রা কম হয় এবং শোষিতের স্বর বৃহত্তর জগতের সামনে হাজির হয়। জেকব মনে করেন, “আমি মনে করি বিরসা নিপীড়িত মুণ্ডাদের উপযুক্ত নেতা, যোগ্য মুখপাত্র।” (১৮৬) আর, অমূল্য তার আধুনিক শিক্ষা, ভাষাজ্ঞান ও যুক্তিমনস্কতার উর্ধ্বে উঠে বিরসাকে ভগবান বলে মেনে নেয়, অমূল্যর ভাষা দিকু বা বাবুর ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যায় মুণ্ডানেতার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে, “আমি এখন মনে করি ও ঈশ্বর। মানুষ যখন ভগবান হয়, তখন কোনো-না-কোনো বেইমান তার পতন ঘটায়।” (১৮৬) একইসঙ্গে অমূল্য আব্রাহাম স্বীকার ক’রে নেয় তার ভদ্রলোকসুলভ আধুনিকতাজনিত অক্ষমতার কথা- সে তীর ছুঁড়তে বা বলোয়া চালাতে পারে না, শুধু বিরসার ভগবান হয়ে ওঠার কাহিনি লিখতে পারে। বিরসা যে ভাষায় কথা বলে মুণ্ডা জনজাতির মানুষের মনে দ্রোহসঞ্চার করে, সেই ভাষা ‘ধরতি আবাব’ বা বিশ্বপিতার ভাষা- মিথের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাষ্য মিলে যায়।⁷⁵ কিন্তু শুধু রাজনৈতিক আখ্যান হয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যক্তিসত্তা কীভাবে সময়ের গতিপথে আত্মবিনির্মাণ ক’রে নেয়, তারও হৃদিশ দেয়। বিরসার মধ্যে যখন ‘ভগবানত্ব’ সঞ্চারিত হয় তথা নিপীড়িত জনজাতির মুক্তিপথের উদ্গাতা হয়ে ওঠে সে, তখন প্রতিরোধের বয়ান তার একক বাচন থাকে না; তা সামূহিক বাচন হয়ে ওঠে। বিরসার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের

মূল চরিত্রটি শক্তপোক্ত হচ্ছে, যেখানে মিথনির্মিত বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক বিভাগ পুনর্গঠিত হচ্ছে। মিথ ও ইতিহাসে সম্পর্ক পর্যালোচনায় লেভি-স্ট্রাউস বলছেন যে, মিথগুলিকে সবসময়ে গোছানো উপাখ্যানের আকারে পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই, অনেকসময়েই অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল গল্পের আকারে তাকে পাওয়া যায়।⁷⁶ স্বদেশীয় কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা দার্শনিক সেই টুকরো ছড়ানো মুখফেরতা কাহিনিগুলিকে বাঁধার কাজ করেন- যে কাজটি অমূল্য আব্রাহামের বকলমে মহাশ্বেতা করেন কিংবা বৈকুণ্ঠ বৈরাগী আর তমিজের বাপের বকলমে ইলিয়াস করেন। যেসব জনগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্যই মূল আধার, লিখিত ইতিহাসের চর্চা সেরকম নেই, তাঁদের ওই টুকরো-ভাঙ্গা মিথ জুড়ে জুড়ে ইতিহাসের কোনও অবয়ব অনুসন্ধানের ভার নৃতত্ত্ববিদদের ওপরে ন্যস্ত করছেন লেভি-স্ট্রাউস (স্ট্রাউস ২০০১, ১৬)। মহাশ্বেতা বা ইলিয়াস সাহিত্যকার হিসেবে এই মুখফেরতা আখ্যান ও মিথ জুড়ে সেই কাজটিই করেন। বিরসার ‘ঐশ্বরিক’ রূপান্তরের সময় কথকের ভাষায় সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়া বোঝা যায়, সেই ভাষা বিরসার ভাষা কিংবা মুণ্ডদের সামূহিক বাচনের থেকে আলাদা- কিন্তু, এই সবগুলি ভাষাই সম্পৃক্ত। বিরসার ক্রমে মিথ হয়ে ওঠা এবং জনজাতিকে প্রভাবিত করার আখ্যানের সঙ্গে তুলনীয় ‘খোয়াবনামা’-র মিথনির্মাণ- মিথ ও লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে রাজনীতির সম্পৃক্ততা মজনু শাহ ভবানী পাঠকদের মিথের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিন্তু, এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, ইতিহাস ব্যক্তিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক সময় ও ভাষ্যের অন্তহীন বয়ান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপন্যাসের প্রতিবেদনে অতীত পুনর্নির্মিত হয় কল্পনার সঙ্গে সময়ের আন্তরিক পারস্পরিক সংযোগে। ‘অরণ্যের অধিকার’ প্রান্তিকায়িত বর্গের এমন এক পুনর্লিখন, যেখানে সামূহিক বাচন প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে- বিরসার মরণ নাই, উলগুলানের শেষ নাই কিংবা প্রজন্মান্তরে লোকমুখে ভবানী-মজনুর মরণ নাই ইত্যাদির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সময়ের পুনরুদ্ধার হয়। “উপনিবেশোত্তর চেতনার অণুবিশ্ব হচ্ছে সর্বকালীন প্রতাপের বিরুদ্ধে সর্বকালীন প্রান্তিকায়িত অন্ত্যজ বর্গের চিরজাগ্রত প্রতিরোধ-প্রতিশোধ” বিরসা মুণ্ডার আখ্যানে তারই আরম্ভবার্তা, তমিজের খোয়াবে তারই ধারাবাহিকতা কিংবা খিজিরের হঠাৎ-জাগা চেতনায় তারই প্রতিক্রিয়া। মহাশ্বেতার রাজনৈতিক চেতনায় কিংবা ইলিয়াসের রাজনৈতিক

চেতনায় অবলীলায় মিশে গেছে নিপীড়িতের প্রত্নকথা, কিংবদন্তী এবং ধর্মবোধ। ভব্যতার শিল্প এবং সংস্কৃতগবী ভদ্রলোকের সময়কে প্রত্যাঙ্গান জানিয়ে ভরমি, গয়া, শিবন, চেংটু, খিজির, বৈকুণ্ঠ, তমিজদের মতো নিম্নবর্গের প্রতিনিধিরা অগ্নিশলাকা হয়ে ওঠে। ইলিয়াস একটা সম্প্রদায়ের সার্বিক অখণ্ড চিত্র উপস্থাপনা করতে চেয়েছেন। তাদের নিজস্ব ধর্ম, বিশ্বাস, মিথ, মুখফেরতা কাহিনি, খোয়াব, ফ্যান্টাসি সব মিলিয়েই তারা পূর্ণ হয়ে উঠছে। ইলিয়াস বলছেন যে, গোটা কমিউনিটির খোয়াব দেখাতে গিয়ে তিনি ফ্যান্টাসিতে চলে গেছেন, ফ্যান্টাসি বাস্তবের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। ওই সব খোয়াব, মিথ, ফ্যান্টাসি মিলিয়েই তাঁকে আখ্যানের ভাষা তৈরি করতে হয়েছে।⁷⁷ তমিজের বাপ পাকুর গাছের অনন্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, মুনসির বাসা উধাও হয়ে যাওয়াকে অস্বীকার করে, ভরমি-গয়া-সুখনরা বিরসা ভগবানের দেহ শনাক্ত করে না। মুনসির মিথ আর বৈরাগীর ভিটের লোয়ায়ত বিশ্বাস যেমন নিম্নবর্গের মুখে-মুখে ফেরে, তেমনই বিরসার ছাই জঙ্গলে ছড়িয়ে দেয় আদিবাসী নিম্নবর্গের মানুষরা। এই মানুষগুলির মধ্যে স্থান-কালের ভেদ থাকে, ভাষা-উচ্চারণের ভেদ থাকে, ধর্মাচরণের ভেদ থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে মিল তাদের নিপীড়িত সত্তা থেকে জেগে ওঠা দ্রোহচেতনায়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের নিম্নবর্গের প্রতিনিধিরা মিথকে হাতিয়ার ক’রে তোলে উচ্চবর্গের পৌরাণিক কল্পাখ্যানের বিরুদ্ধে- ইলিয়াস সেই প্রতিস্পর্ধার ভাষাকে ব্যবহার করেন বলেই প্রচলিত ইতিহাসবোধ নিয়ে সংশয় জাগে। ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মধ্যে স্তরভেদ থাকে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শাসকশ্রেণির ধর্মবিশ্বাস এবং অধীনস্থ শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস এক হলেও, তাদের চরিত্র ও আকার আলাদা, এমনকি তা বিরোধী রূপেরও হতে পারে। উচ্চবর্গকে বিপদাপন্ন করা নিম্নবর্গের বহু প্রতিরোধ এমন বিরোধী রূপ থেকে জন্ম নেয়।⁷⁸ স্বীয় বর্গের ইতিহাসবোধ অশিক্ষিত নিম্নবর্গের ওপরে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ভদ্রবাবু অনিল সান্যাল, সতীশ মুক্তাররা। কিন্তু, বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, দশরথ কর্মকার, কুমোর কেষ্ট পালরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মুখফেরতা আখ্যান ভুলে যায় নি। কাংলাহার বিল, পোড়াদহের মেলার যে মিথ তারা উল্লেখ করে, তাতে ভবানী সন্ন্যাসী আর মজনু শাহের যৌথদ্রোহের স্মৃতি ওতংপ্রোত।⁷⁹ আর, একইসঙ্গে ইলিয়াস

প্রশ্নবিদ্ধ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-এর ভাষ্যকেও। প্রথমতঃ উচ্চশিক্ষিত ‘বাবু’রা সরাসরি ‘আনন্দমঠ’-এর উদাহরণ তুলে পোড়াদহ মেলা আর কাৎলাহার বিলে হিন্দুয়ানির দাবির কথা বলে। “সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো, তা জানো? আনন্দমঠ পড়েছো?” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩৫) কেষ্ট পাল, দশরথ কামাররা ‘আনন্দমঠ’ না পড়লেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ফকির ও সন্ন্যাসীর মুখফেরতা কাহিনির ‘ইতিহাস’ বলতে শুরু করে। (২৩৫-৩৬) দ্বিতীয়তঃ নিম্নবর্ণের ইতিহাসবোধ নিয়ে উচ্চবর্ণের ঠাট্টার মধ্যেও স্বশ্রেণিনির্মিত কল্লাখ্যান মিশে যায়। যে ‘ইতিহাসকে’ প্রতিরোধ করতে করতে বৈকুণ্ঠ বৈরাগীরা বঙ্কিমচন্দ্র নির্মিত সন্ন্যাসীবিদ্বেষের রাজনীতিকে প্রতিরোধ ক’রে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বয়ান হাজির করে। লেভি স্ট্রাউস মিথের অর্থোদ্বারে মিথ বনাম ইতিহাসের প্রসঙ্গ মুখফেরতা কাহিনির সমস্যায় ইঙ্গিত করেছেন- কোথায় মিথ শেষ আর কোথায় ইতিহাসের শুরু?^{৪০} চিফ হ্যারিস এবং চিফ রাইটের লেখা বইয়ের মিথ-উপাদান সংগৃহীত হয়েছে একটি জনজাতির থেকে কিন্তু তাতে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই রয়েছে। স্ট্রাউস একটিকে বলছেন বিশৃঙ্খলার ইতিহাস এবং অপরটির উপস্থাপনায় টুকরো টুকরো মিথ-কিংবদন্তী জুড়ে জুড়ে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ইতিহাস অনুসন্ধানের হদিশ পাচ্ছেন। কিন্তু, দু’টির মধ্যে কিছু সাদৃশ্যগত সাধারণ উপাদান রয়েছে, যার জন্য স্ট্রাউস বলছেন যে, মিথোলজি ও ইতিহাসের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা নেই। ইলিয়াসের উপন্যাসে এবং মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে এই সীমারেখা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। শাসকশ্রেণি তাদের মতাদর্শগত অবস্থান থেকে অনেকসময়েই এই কাজটি করতে চায়- স্বশ্রেণির স্বার্থে মুখফেরতা ধোঁয়াটে কল্লাখ্যানকে ব্যবহার ক’রে নিতে চায় যাতে ইতিহাসের দখল রাখতে সুবিধে হয়। অনিল সান্যাল, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীরা দেশভাগ-দাঙ্গার বিপন্ন রাজনৈতিক মুহূর্তে সেই কাজটিই করেন।^{৪১} বাস্তবেও শাসকশ্রেণি প্রতিনিয়ত এই কাজটিই ক’রে যায়- তাই রামসেতুর মিথ অথবা রামজন্মভূমির কল্লাখ্যানকে ইতিহাস বলে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা চালায় শাসকশ্রেণি। মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ইতিহাস ও মিথের প্রাচীরে ধাক্কা দিয়ে নিম্নবর্ণের বয়ান অনুসন্ধান করেন- তাঁদের উদ্দেশ্য শাসকশ্রেণির মতাদর্শের বিপরীত। নায়েব পূর্ণচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠ-দশরথরা যে

মূল ঘটনাকে কেন্দ্র ক’রে ভিন্ন মিথের কথা বলে, তার কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকলেও মূল প্রতিপাদ্যের দিক থেকে তারা আলাদা, বিপরীতমুখী।⁸² ক্ষুদ্র-মিথের একটি উপাদান রূপান্তরিত হলে অন্য উপাদানগুলিকে পুনর্সজ্জিত করতে হয়- নায়েব পূর্ণচন্দ্র, সতীশ মুক্তাররা সেই কাজটি করে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার সময়। ইলিয়াস সেই পদ্ধতিটিকে চিহ্নিত করেন আখ্যানের ভাষায় এবং নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের সামান্য প্রতিরোধের স্বর তুলে ধরেন। লেভি স্ট্রাউস মন্তব্য করছেন যে, ইতিহাস একটি মুক্ত পদ্ধতি কিন্তু মিথোলজি স্থাবর- মিথের উপাদানগুলি বারবার ফিরে আসে একটি বদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে।⁸³ ‘খোয়াবনামা’-য় মিথের ব্যবহার কিন্তু বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়, বরং ইতিহাসের মুক্ত-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তাই পৌনে দু’শো বছর আগেকার মুখফেরতা কাহিনি ও কিংবদন্তী উপমহাদেশের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে নিম্নবর্ণের চেতনায় ক্রিয়াশীল থেকে উচ্চবর্ণকে ইতিহাসের পাঠ দিতে চায়। বিস্মৃত ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত ক’রে সেই ইতিহাসের সঙ্গে দ্বিবাচনিক আলাপে রত হয়- হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রতিরোধের প্রবহমানতা বজায় রাখতে চায়। মহাশ্বেতা দেবী ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তে বদ্ধ প্রক্রিয়ায় মিথের ব্যবহার করেন নি- বসাই টুডু ‘ইতিহাসসম্মত’ চরিত্র না হয়েও ইতিহাসের খোলা মুখের দিকে ইঙ্গিত করে। যদিও, গবেষক নির্মল ঘোষ বিহারের ভূমিহীন কৃষক-নেতা গম্ভীরার সঙ্গে বসাইয়ের নীতিকৌশল ও দ্রোহভাষার মিল পেয়েছেন। গম্ভীরা ১৯৭৪ সালে খেতিহার কিষাণ মজদুর সঙ্ঘ ছেড়ে বেরিয়ে এসে নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন ক্রান্তির ডাক দিয়ে- বসাই টুডুর কার্যপদ্ধতির সঙ্গেও প্রভূত মিল ছিল তাঁর কারণ বর্গাদারদের স্বত্ব ও ন্যূনতম খেতমজুরি সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনে জমিদার-জোতদার হত্যা ক’রে অধিকার আদায়ের ‘বসাই টুডু পথ’⁸⁴ বেছে নেন গম্ভীরাও। বসাই টুডুর মতোই নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে বহু আদর্শগত মিল সত্ত্বেও গম্ভীরা সিপিআই (এম-এল) পার্টিতে যোগ দেননি।⁸⁵ বসাই আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের দ্রোহের সময় উপস্থিত, সে মারা যায় এবং পরের দ্রোহের সময় পুনর্জন্মে ফের শাসকের ত্রাস হয়ে ওঠে।

“the magic of the myth runs through the narrative and lends it coherence

and unity” (Spivak 2002, XVIII) স্পিভাকের মতে, আখ্যানটির অন্তর্নিহিত পাঠপ্রক্রিয়ায় দ্রোহচেতনার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে মিথপ্রবাহ প্রধান ভরকেন্দ্র। বসাইয়ের মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম হয়ে বারবার ঝলসে ওঠার কাহিনিতে মিথ গুরুত্বপূর্ণ আখ্যাননীতি হয়ে ওঠে।^{৪৬} ‘অরণ্যের অধিকার’-এ বিরসা মুণ্ডার কাহিনি নিম্নবর্গের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলে তা উচ্চবর্গের দ্বারা রচিত ইতিহাসের অসারতা ধরিয়ে দেয়। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-র বাজিকররা মিথ বয়ে নিয়ে ইতিহাসের বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও সময়স্তর পাড়ি দিতে থাকে। দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে নিম্নবর্গীয় আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের মোড়ল সহরাই মিথপ্রতিম হয়ে ওঠে কথকের বয়ানে। জোতদার বাহেবাবুর জমিদখলের স্মৃতির সঙ্গে সহরাইদের চেতনায় লালঝাঙা ও উদ্যত প্রতিরোধ অঙ্গঙ্গী হয়ে মিশে যায়। এই সংগ্রাম যুগবদ্ধ, এই সংগ্রাম প্রাচীনকাল থেকে নিপীড়িত নিম্নবর্গ ক’রে আসছে- তাই সহরাইয়ের গলায় ‘প্রাচীন দৈবশ্রুতি পুরোহিতের কণ্ঠ’ জেগে থাকে লালঝাঙার অধিকারের বয়ানে।^{৪৭} লালঝাঙার অধিকার নিয়ে উচ্চবর্গীয় বিশু ও নিম্নবর্গীয় সাঁওতাল ক্ষেতমজুরদের টানাপড়েনের মধ্যে এমন বয়ান হাজির করে কথক। লেভি-স্ট্রাউস কথিত নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে সাহিত্যিকের পার্থক্য এখানেই- নৃতত্ত্ববিদ কিছু কঠোর-নীরস পদ্ধতিতে সূত্রায়িত পথের খোঁজ করেন, কিন্তু ইলিয়াস-মহাশ্বেতার মতো সাহিত্যিকেরা সূত্রায়িত অনুসন্ধানের জড়তা পেরিয়ে যেতে পারেন। মহাশ্বেতা পুরাণ, কিংবদন্তি, লৌকিক বিশ্বাস, প্রাকৃতিক উপাসনা থেকে দেশজ শব্দ আহরণ করেছেন- গদ্যরীতি নিয়ে বিস্তর ভাংচুর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন- ইলিয়াসও এই একই কাজ করেছেন তাঁর উপন্যাসদ্বয়ে। ফলে আখ্যানে বহুস্বরিকতা অঙ্গঙ্গী হয়ে থেকেছে- আখ্যানগুলি মৃত সময়ের নির্লিপ্ত রাজনীতির কঙ্কাল হয়ে থাকেনি। পাঠকের সঙ্গে (সে পাঠক যে স্থান-কালেই থাকুক) সংলাপ তৈরি করছে প্রতিটি পাঠমুহূর্তে। নিবেদিতা মজুমদার মহাশ্বেতা দেবীর ‘পূরণ সহায়, পিরখা ও টেরোড্যাকটিল’ উপন্যাসে মিথের ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছেন- টেরোড্যাকটিল শুধুমাত্র মিথ না, একটা বার্তাও পৌঁছে দেয় যা একটি জনজাতির যাপনচিত্রের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। সেই বার্তা রাজনৈতিক-কীভাবে উচ্চবর্গের স্বার্থে আর্থ-রাজনৈতিক শোষণ চলছে এবং রাষ্ট্র তাতে মদত দিচ্ছে তার

ইঙ্গিত দেয়।^{৪৪} বিশ্বাস, মিথ, মুখফেরতা কাহিনির মধ্যে দিয়ে যে বার্তা আসা, তা “foregrounds the spirit of an ancient people at the brink of forced extinction, the narrative urgently highlights the inextricable connections of cultural extinction with material deprivation” (Majumdar 2021, 147) আর, এই উপন্যাসগুলি অপরতার (Otherness) পরিসরকে মৌল উপজীব্য ক’রে তুলছে; অপরতার ধারণাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শাসককথিত ‘অপর’রা এই আখ্যানগুলির ‘আত্ম’ এবং কেন্দ্র-প্রান্ত গঠন এখানে আর কাজ করছে না, সেই পুরনো আখ্যানবিশ্বের নবায়ন ঘটে যাচ্ছে। আর, এরকম ঘটতে পারছে কারণ ভাষা এখানে হাতিয়ার হয়ে উঠছে। আখ্যানস্থ নিপীড়িতের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। আখ্যানরচয়িতার হাতিয়ার হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের আইনকানূনের ভাষা তাদের কাছে দুর্বোধ্য কিন্তু নিজস্ব বাচন ও ভাষা দিয়েই তারা পাঠকের সঙ্গে সংযোগ নির্মাণ করছে। ‘দ্য আদিবাসী উইল নট ডাঙ্গ’ গল্পে ভাষার বহুস্তর লক্ষ্যণীয়। গল্পটির মূল-হরফ এবং ভাষা ইংরাজি। কিন্তু সেই ভাষার ভেতর স্তরভেদ রয়েছে। মঙ্গল মুর্মুর জবানিতে আখ্যান উপস্থাপিত হচ্ছে পাঠকের সামনে। ভাষা বদলে যাচ্ছে আঞ্চলিক ইংরাজিতে। তাই ‘Delhi’ নয়, Dilli‘, ‘Christian’ নয়, ‘Kiristan’, ‘Jesus’ নয়, ‘Jisu’ কিংবা রবীন্দ্রনাথকে ‘রবিন-হারাম’ বলে মঙ্গল মুর্মু।^{৪৫} আখ্যানের ভাষা অর্থাৎ লেখকের লেখার ভাষা ইংরাজি হলেও তাতে মঙ্গল মুর্মুর আদিবাসী স্বর জোরালো হয়ে ওঠে। ইংরাজি ভাষার প্রথাগত বাক্যনির্মাণে ক্রিয়া (verb) এবং কালের (tense) পরিচিতি অস্বয়ের বিপরীচিতিরূপে ঘটে মঙ্গল মুর্মুর বয়ানে- “I am a musician. No, wait... I am a farmer. Or... Was a farmer. Was a farmer is right. Because I don’t farm anymore.” (Hansda 2015, 171) এই বিপরীচিতিরূপে আর্থ-সামাজিক শোষণের সঙ্গে জড়িত। একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আখ্যানরূপ থাকে- অভিজাত ও উচ্চবর্গ ভারত যেভাবে ‘সাঁওতাল সংস্কৃতি’কে দেখতে বা কল্পনা করতে অভ্যস্ত, তাতে অভিমানজনিত ঠাট্টা ছুঁড়ে দেয় মঙ্গল মুর্মু। ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার পরে দিকুরা তার সর্বসর্বা হয়ে ওঠে, মূলবাসীরা বঞ্চিত থাকে। অন্নসংস্থানের জন্য পবিত্র নাচ-গানকে দিকুদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়,

মিশনারিদের ইঙ্কুলে ভর্তি হয়ে ধর্মাস্তরিত হতে হয় এবং উচ্চবর্ণের আর্থ-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে করতে নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে পরিযানে যেতে হয়। মঙ্গল মুর্মু রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিস্পর্ধী প্রশ্ন করে এই বিশ্বাসে যে, রাষ্ট্রপতিও তাঁর মতোই বীরভূমের ভূমিপুত্র- কিন্তু তাঁর প্রতিস্পর্ধার শাস্তি মেলে পুলিশ-আধাসেনার মারে। বসাই টুডুর আখ্যানকথক জানেন যে, একজন উচ্চপদস্থ আদিবাসী সাঁওতাল প্রশাসনিক রাজনীতির অঙ্গ। শুধুমাত্র এক-দু'জন আদিবাসী সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সমগ্র সাঁওতাল জনজাতির 'উন্নয়ন'-এর উদাহরণ হতে পারেন না কিংবা গণতন্ত্রে নিপীড়িত আদিবাসী জাতিসত্তার প্রতিনিধি হতে পারেন না।⁹⁰ ভারতবর্ষের সাম্প্রতিকতম ঘটনা- একদিকে দেশজোড়া আদিবাসী নিপীড়ন এবং আদিবাসীদের জল-জমি-জঙ্গল লুণ্ঠ চলছে অন্যদিকে দেশের শাসক একজন আদিবাসী নারীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেছে।⁹¹ সমস্ত আদিবাসী জনজাতির প্রতি উচ্চবর্ণীয় শাসকশ্রেণির শোষণকাঠামো অবিকৃত রয়েছে। 'অপারেশন? বসাই টুডু'-র আখ্যানকথক এমনই ভয়ের ভাষা লেখেন- সাঁওতালরা ভারতবর্ষের মূলধারার সংস্কৃতি থেকে বাধ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং শাসকের সঙ্গে শাসিতের অনপনেয় দূরত্বে নীরস তথ্য-আইন সাঁওতালদের ক্ষতের উপশম আনতে পারছে না। ভদ্রলোক কালী সাঁতরার চিন্তাপ্রবাহে লেখকেরও প্রশ্ন থাকে 'সত্য'-র উপস্থাপনা এবং ভাষা নিয়ে। বসাই টুডুরা আদিবাসী সাঁওতাল বলেই তাঁদের ভুল বোঝার পরিসর তৈরি হয়ে যায় ভদ্রলোক-আধিপত্যকারী সমাজে এবং সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে। বসাই-দোপদি-দুলনাদের বলতে চাওয়া 'সত্য' বয়ানকে ধামাচাপা দিয়ে প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রত্যেকেই উচ্চশ্রেণির-উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে 'সত্য' বলে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা নথিতে, ইতিহাসে এবং পাঠ্যে।⁹² সেইজন্যই তথ্য-আখ্যানের ভাষায় আখ্যান উপস্থাপনার পদ্ধতি বেছে নেন লেখক। উনিশশো সত্তরের দশকের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে আধুনিক মিথ হয়ে জেগে থাকে বসাই টুডু। যতবার আদিবাসী ক্ষেতমজুররা শোষিত হয়ে দ্রোহপথ সংগঠিত করে, যতবার প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য তাদের হত্যা করে, ততবার বসাই টুডু বেঁচে ওঠে- একজন কমিউনিস্ট সাংবাদিকের (কালী সাঁতরা 'জেলা বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক) দায়িত্ব পড়ে তাকে

শনাক্ত করার। তথ্যায়িত বাস্তবতাবাদ ও বিপ্লবী ফ্যান্টাসির মিশ্রণ, ইতিহাস ও আখ্যানের ওতঃপ্রোত মিশে যাওয়া মহাশ্বেতা দেবীর এই আখ্যানে প্রতিষ্ঠিত হয়।^{৭৩}

রাষ্ট্রের আইনকানুনের ভাষার সঙ্গে শাসিতের ভাষার অনতিক্রম্য দূরত্বের উদাহরণ থাকে ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)’ উপন্যাসেও। একইসঙ্গে, ভদ্রলোকের মান্য ভাষার সঙ্গে অভদ্রলোকী চলতি ভাষার পার্থক্য ক’রে নেয় শাসকপক্ষ। আর, এই পার্থক্য সচেতন ও অসচেতন দুইভাবেই সামাজিক রাজনৈতিক স্তরে ক্রিয়াশীল থাকে বলে রাষ্ট্র তার মতাদর্শমূলক আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। পাড়ারিয়া গ্রামের মহিলারা ধর্ষিতা হওয়ার পরে আদালতে বিচার চাইতে গেলে প্রত্যাখ্যাত হয়। ‘অরণ্যের অধিকার’-এ বিরসা এবং তার সহযোদ্ধা মুণ্ডরা মুণ্ডরী ছাড়া অন্য ভাষা জানেনা বলে এবং যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ ইংরাজীতে হয় বলে ব্রিটিশ অফিসারদের যে উচ্চমন্যতা (সুপিরিয়রিটি) প্রকাশ পায়। আর, সেই উচ্চমন্যতার প্রয়োগে মুণ্ডাদের অধিকারকে পদদলিত করতে চায়। ঠিক তেমনই রাধিয়া, ভগবতী, সুমা, নিমিয়াদের অধিকার পদদলিত হয় উত্তর-ওপনিবেশিক ভারতে। বিচারের ভাষা ন্যায়ের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না- সরকারি নথি-দস্তাবেজের ভাষার সঙ্গে নিপীড়িত নারীর ভাষার ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে। এই ব্যবধানের বাস্তবতা বোঝানোর জন্য দেবেশ রায় আদালতের কেসের নম্বর-নথি উপন্যাসের পাতায় তুলে আনেন।

আখ্যানে ‘শরীরের রাজনীতি’

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত কিংবা মফস্বলি বৃত্তান্তে শরীরের রাজনীতি থাকে। ফুকো ‘ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ (১৯৭৯)’ বইতে ব্যক্তির শরীর ও সমাজের রাজনৈতিক-সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ রেখেছিলেন। ফুকো দেহকেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে লিখছেন,

But the body is also directly involved in a political field; power relations have an immediate hold upon it; they invest it, mark it, train it, torture it, or force it to carry out tasks, to perform ceremonies, to emit signs. The political investment of the body is bound up, in accordance with complex reciprocal relations, with its economic use; it is largely as a force of production that the body is invested with relations of power and domination; but, on the other hand, its constitution as labour power is possible only if it is caught up in a system of subjection (in which need is also a political instrument meticulously prepared, calculated, and used); the body becomes a useful force only if it is both a productive body and a subjected body (Foucault 1979, 25)

ব্যক্তিকে শাসনের ‘বিষয়ে’ পরিণত করা (subjection) শুধু দৈহিক অত্যাচারের মধ্যে দিয়েই না বরং সুপারিকল্পিতভাবে শাসিতের চেতনা ও সম্মতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে দিয়ে আরও ভাল ভাবে করা যায়। ফুকো একে জ্ঞানকাণ্ডের (knowledge)-র সঙ্গে তুলনা করছেন, যে জ্ঞানকাণ্ড শাসিতের মধ্যে গড়ে তোলা হয়, যাতে সে শাসিত হিসেবে নিজেকে ‘বিষয়ীভূত’ করতে পারে। ক্ষমতা ও আধিপত্য এমন এক নীতিগত চিরস্থায়ী অনুশীলনের পর্যায়ভুক্ত হয় যে, “effects of domination are attributed not to ‘appropriation’, but to dispositions, manoeuvres, tactics, techniques, functionings.”⁹⁴ বাঘারুকে গয়ানাথ যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা চ্যারকেটু-খেতখেতুকে রমণী পঞ্চায়েত, দেবা বাবুরা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের শ্রমকে যেভাবে শোষণ ক’রে নেয়, তাতে এই ধারণাগুলি স্পষ্টতর হয়। বাঘারুর ‘একান্ত লৌকিক অথচ ব্যক্তিক অনুভূতি’ লোককথার উপাদানে প্রতিমায়িত হয়। বাঘারুর কালহীন প্রাচীন

ছন্দ এবং তার শারীরিকতা ‘দেশকালের তরঙ্গায়িত পর্বের’ সঙ্গে মিলে যায় বৃত্তান্তে।⁹⁵ আখ্যানের ভাষা শারীরিক ভাষাকে জড়িয়ে থাকে, যখন ‘বনপর্ব’-তে চা-বাগানের শ্রমিকদের বর্ণনা আসে- ‘শ্রমিকদের দৈনিক উৎসব’ নামের উপপর্ব শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে যাওয়ার যাত্রাপথের বর্ণনা করে- এটাও একটা কার্নিভালের মতো। শ্রমিকরা ‘মেয়েমরদ, বুড়োবুড়ি, ছুকরাছুকরি’ প্রত্যেকে তাদের কাজে যাওয়ার উৎসবে সামিল হয়। এই বর্ণনায় শরীরের ভঙ্গি প্রাধান্য পায়, তাই কথককেও তেমন শব্দ ও উপমা খুঁজে নিতে হয়। “কতরকম হাঁটাতেই না এই চলাটা তৈরি হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে গিয়ে কেউ প্রায় দুলে-দুলে চলে, কেউ কোমরটা বেশি নাচিয়ে ফেলে, চুলের গোছার দোলায় কারো হাঁটার ছন্দও অন্যরকম দেখায়, কোনো আধবুড়ো হাঁটুর কাছে ঝোলা হাফপ্যান্টে মাটির দিকে তাকাতে-তাকাতে ছোট-ছোট পায়ে এগিয়ে চলে... এত গান এত জোরে একসঙ্গে বাজছে যে সেই সব মিলে একটা অর্থহীন কোলাহলের আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে ওঠে। এতগুলো লোকের একসঙ্গে ছোট্টা, কথা বলা, গান গাওয়া, হাসাহাসি ইত্যাদির ফলেও সেই আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে ওঠে” (রায় ২০১৩, ১৩০-৩২) বাঘারু এই কার্নিভালের মধ্যে হঠাৎ উঠে আসে। তার প্রতীয়মান হয়ে ওঠা ‘গয়ানাথের মানষি’ হয়ে। তার দৃশ্যমানতা বেখাপ্পা কিন্তু নাটকীয়। কিন্তু, বাঘারু তার শরীরী-ভাষা সমেত এই মিছিলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তার ছোট্টা গতি, তার শরীরী বিভঙ্গ, তার প্রায়-পোশাকহীন আবরণ কোনওটাই শ্রমিকদের শরীরী ভাষার সঙ্গে খাপ খায় না। তার শরীরী ভাষা তিস্তার স্রোতে উপড়ানো শালগাছের মতো। “এই সাতসকালে কাজের মিছিলে বাঘারু’র শরীরটা বড় বেশি নগ্ন হয়ে গেছে। এতটা নগ্নতা এই মিছিলেরও নয় না।” (১৩৪) বাঘারু’র শরীর থেকে মিছিল অথবা মিছিলের শরীর থেকে বাঘারু খসে পড়ে। শরীরের ভাষা দিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া চ্যারকেটুর ক্ষেত্রে ঘটে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে মিছিলের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও মিছিলে যোগদান উৎসবে পর্যবসিত হয়- ‘মেলা-মেলা ভাব’ এসে যায় অঞ্চলের প্রচুর মানুষের যোগদানে। মিছিলের প্রাণসঞ্চারের ভাষা মিছিলের বর্ণনাকে জীবন্ত ক’রে তোলে- এই প্রাণসঞ্চারের প্রধান উপাদান গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ, তাদের পোশাক, আচরণ।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক শ্রেণিভাগে আধিয়ার ও জোতদারদের বিভিন্ন বর্গের মানুষের সম্মিলনের বর্ণনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কথক আধিয়ারদের শরীর ও শ্রমের সঙ্গে মিছিলের সজ্জার তুলনা করেন। এই ভাষাপ্রয়োগ এবং ভাষাপ্রয়োগের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উপস্থাপন বাংলা আখ্যান উপস্থাপনায় বিরল, “মিছিল সাজিয়ে দিলেও তারা মিছিলটাকে ঠিক রাখতে পারে না, দলা পাকিয়ে ফেলে, লাইনে হাঁটতে গেলে এ ওর পায়ে ঠোকর খায়, এ ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে, শ্লোগান তুলে গেলে সবার সঙ্গে গলা মেলাতে পারে না, তারা একটা পিণ্ডের মতো এসে মিছিলে মিশে যায়।” (রায় ১৯৮৯, ১৪৪-৪৫) কথকের ভাষায় এই মিছিলে খুঁজে পাওয়া যায় ‘যুদ্ধজয়ের অনুষ্ঠান’। মিছিলের বহু শ্রেণিভাগ ও বহু উদ্দেশ্য থাকে বলেই তা উৎসবসম হয়ে ওঠে। মিছিলে অংশ নেওয়া নারী-পুরুষদের ভিড়ে চারকেটু বেমানান। “খালি গা, কোমরের নিচে গামছা জড়ানো, কাঁধে লাঙল, কোমরে গোঁজা কাচি-দাও, সামনে গরু... চারকেটুর পেটে তিনদিনের বাসি খিদে” (রায় ১৯৮০, ১৬৫) মিছিলে যাত্রাপথের গোটা বর্ণনায় চারকেটুর শরীরী ভাষা ও পরিচ্ছদ অন্যদের হাসির উদ্দ্যেক করে কিন্তু শরীর আর ‘বাসি খিদে’ দিয়েই নিম্নবর্গীয় ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে চারকেটু। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে শরীর রাজনৈতিক হয়ে ওঠে প্রতিটি অধ্যায়েই। চারকেটু তার শরীরী ভাষা ও উপস্থিতির জন্য সরকারবিরোধী মিছিলের অংশ হতে পারে না, আইন ভাঙার মিছিলে মিশে যেতে পারে না কিংবা পুলিশি জেরায় অপরাধী প্রমাণিত হয় না। তার ‘কুনো পার্টি না হয়... কুনো ঝাণ্ডা না হয়... কুনো ভাঙার আইন নাই’ (১৯০) সে দরিদ্রের থেকেও দরিদ্র, ভাষাহীনের থেকেও ভাষাহীন, প্রান্তিকদের থেকেও প্রান্তিক এবং গণতন্ত্রহীনের থেকেও গণতন্ত্রহীন।^{১৬} খালি গায়ে কোমরে কাঁচি-দাও নিয়ে গরুর পিঠে চেপে পেটে তিনদিনের বাসি খিদে নিয়ে ‘দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে’ চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও প্রত্যাখ্যানের বয়ান তার জানা নেই। এটা যে ‘প্রত্যাখ্যান’ সেতুকুও সে বোঝে না, কথক তা বোঝে। তার ভাষা কাগজের বাবুদের বোধগম্য হয় না, পুলিশের লোক তার ভাষা বোঝে না। তার একটা ভূমিহীন কৃষিজীবীর শরীর আর পেটের বাসি খিদে আছে- তার অস্তিত্ব এতেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের সাতটি অধ্যায়েই শুধু হাঁটার বর্ণনা- উপবাসী, দুঃখময়, নিরুপায়

হাঁটা।^{৭৭} চতুর্থ অধ্যায়ে টুলটুলি হাঁটে খাবার কুড়োতে, পঞ্চম অধ্যায়ে খেতখেতু হাঁটে। বৃত্তান্ত যে থামে না, বৃত্তান্ত এক কাহিনি থেকে অন্য কাহিনির দিকে এগোনোর ইঙ্গিত দেয়, সেই আঙ্গিক অফুরান হাঁটার বর্ণনায় থাকে। এই প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত হয়ে যায় দলীয় রাজনীতি, সংসদীয় বামপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতা, কংগ্রেসী রাজনীতির ভাগাভাগি এবং মানুষের সঙ্গে রাজনীতির দ্বন্দ্ব। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র শুরু থেকে বহু মানুষ আখ্যানে ঢুকে পড়ে। তাদের গতিতে আখ্যানের গতি সঞ্চারিত হয়। তাদের বহুমাত্রিক উপস্থিতিতে আখ্যান জীবন্ত হয়ে ওঠে। কথক হাঁটেন পাঠকদের সঙ্গে নিয়ে, ক্রান্তির হাট তেমনই এক গন্তব্য। কথক পর্যবেক্ষণ করেন কীভাবে বহু মানুষের সম্মিলিত শরীরী প্রতিক্রিয়া নিষ্প্রাণ হাটকে প্রাণবন্ত ক’রে তোলে- “বেশিরভাগই হেঁটে চলে মাথায় বা বাঁকে বোঝা ঝুলিয়ে... কেউ কারও দিকে তাকায়ও না, কথাও বলে না। তাড়াতাড়ি হাঁটার বা মাল বইবার ফলে মানুষজনের দ্রুত নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়।” (রায় ২০১৩, ১৩-১৪) ‘বনপর্ব’ জুড়ে বাঘারুর হাঁটা- বাঘারু যত হাঁটে ততই তিস্তাপারের প্রকৃতি-মানুষ-পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে পাঠকের। নদী, ফরেস্ট, খেতিবাড়ি, চাঁদ-সবকিছুকে পাঠক আবিষ্কার করে বাঘারুকে কেন্দ্রে রেখে। কথক বারবার বাঘারুর শরীরীভাষায় মনোযোগ দেন এবং বাঘারুর স্বাতন্ত্র্যকে বিভিন্ন শব্দে-উপমায় হাজির করতে থাকেন। “বাঘারু যে-ভাবে আগুনগুলির সামনে দাঁড়িয়ে, সে-ভাবে সাধারণত বনের পশুরা দাঁড়ায়, যেন পথ ঠিক করতে পারছে না। লম্বা হাত দুটো নাড়িয়ে ফরেস্টের বাতাস কেটে বাঘারু গন্ধ শোঁকে-ফরেস্টের” (১২৪) বাঘারু তথাকথিত ‘মনুষ্যপদবাচ্য’ থাকছে না আর। আর, এই বর্ণনায় গভীরতা পায় পরিবেশবাদী রাজনীতি (Eco-politics), বাঘারু তার শরীর, অনুভূতিমালা এবং ইন্দ্রিয়সচেতনতা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী হয়ে যায়, জঙ্গলের প্রাণীদের সঙ্গে তার তফাৎ থাকে না কোনও। কুকুরের সঙ্গে বাঘারুর হৃদয়তা^{৭৮} কিংবা পাখিদের সঙ্গে বাঘারুর আত্মিক বন্ধন^{৭৯} বাঘারুর মনুষ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা প্রমাণ করে- এক্ষেত্রেও তার শরীর দিয়েই আদি-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন হয় তার। বাঘারুর সঙ্গে পাখির তফাৎ শুধু শরীরের অবয়বে; তাছাড়া দোসর খোঁজায় পারস্পরিক ডাকে তারা অভিন্ন নয়। বাঘারু যখন টের পায় যে

কুকুরটি বাঘারুর পিঠে ঝুঁকতে ঝুঁকতে প্রাণীগন্ধ খুঁজে পেয়েছে, তখন বাঘারুর আরাম লাগে, “বাঘারু বোঝে, কুকুরটা তার পিঠে বাঘের খাবার দাগ চিনতে পেরেছে। চেটে-চেটে পরিষ্কার করে নিয়ে কুকুরটা আর-এক জন্তুর পুরো খাবাটার দাগ খাবাহীন মানুষটার শরীর চিনে নিতে চায়।” পরিবেশবাদী সমালোচনা (Eco-Criticism) একদিকে সাহিত্য ও প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করে, অন্যদিকে তাত্ত্বিক প্রতর্ক হিসেবে মানুষ ও না-মানুষ প্রাণীর সম্পর্কের আদানপ্রদান খোঁজে।¹⁰⁰ মাদারির মা গহীন অরণ্যের ভাষা বুঝতে পারে। লেখক তার প্রতিস্পর্ধী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সন্ধান পান, সেই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন শ্যাওরাঝোড়া এবং অরণ্য। মাদারির মা যেভাবে মানুষের গায়ের গন্ধ আর মানুষের আওয়াজ থেকে তাদের সঙ্গ পেতে চায়, তা তাকে প্রকৃতির প্রতিরূপ ক’রে তোলে। “মাদারির মা মানুষের এই সঙ্গটাই পায় না” (৪৭৬) এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়ার বাস্তবিক রূপকে কি এই সঙ্গহীনতা বাড়ে? তার বিশ্বাসে ফরেস্টে মৃত সামান্য জন্তুকে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে দিতে হয়, পাখি-পোকাদের খাদ্য সেই মৃত জীবজন্তু। প্রাকৃতিক বাস্তবত্বের এমন স্বাভাবিক জ্ঞান তাকে বহু প্রাচীন অরণ্যের প্রতিভূ ক’রে তোলে। আর, আখ্যানের ভাষা যখন মাদারির মায়ের বর্ণনায় নিবদ্ধ (focussed) হয়, তখন প্রকৃতিঘনিষ্ঠ শব্দের প্রাধান্য এবং প্রাকৃতিক বর্ণনার প্রাচুর্য। “তাদের [মাদারির মা ও মাদারির] নীরবতাও তো প্রাকৃতিক হয়ে যেত।” (৪৫৫) গাছকে বাহন ক’রে বাঘারুর জলস্রোতে ভেসে যাওয়া এবং গাছের শেকড় থেকে ডালপালার মধ্যে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে নেওয়া বৃক্ষের সঙ্গে তাকে অভিন্ন ক’রে তোলে। (২৮৪) বাঘারুর সংলাপ খুঁজে পেতে কথকের বা লেখকেরও বহু সময় লেগেছে- আখ্যানের চারটি পর্ব পেরিয়ে ‘বৃক্ষপর্ব’-তে এসে ‘বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপ’ খুঁজে পাওয়ার কথা পাঠককে জানান লেখক। মানুষের সঙ্গে তার দ্বিতীয় সংলাপ খুঁজে পেতে প্রায় ৩৫০ পাতা অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু সেই বাঘারুই কী অনায়াসে কুকুর, পাখি, মোষের সঙ্গে কথা বলে যায়। (১৪৯) মোষের সন্তান প্রসব করানোর সময় বাঘারুর সঙ্গে মহিষানীর তফাৎ থাকে না- সদ্যোজাত মোষটি বাঘারুর বুকে আঁকড়ে থেকে বিকল্প গর্ভের নিশ্চিন্তি পেতে চায়।¹⁰¹ বাঘারু অনায়াস দক্ষতায় দাই-মার ভূমিকা পালন করে; যে বাঘারুর ভদ্রলোকীয়

আদানপ্রদানের ভাষা নেই বলে সে মনুষ্যসমাজে চরম অবজ্ঞাত, সেই বাঘারু ‘কোঁথন দে, কোঁথন দে, দে’ (১৮৪) বলে মইষানিকে প্রসব করার নির্দেশ দেয়। বাঘারু মইষানির বোধগম্য “টর্-র-র-র-র-অ, টর্-র-র-র... ঝট কর, ঝট কর হেঁট হেঁট টর্-র-র-র” (১৮৬) ভাষায় বিয়ানি মইষানির সফল প্রসবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র কথকের বর্ণনায় একটি মিছিল প্রাকৃতিক থেকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের শব্দে-ভাষায় যাতায়াত করতে থাকে। ছোট নদীনালা, ছোট ঢিবিটিলা এবং কার্তিকের পাকা ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে মানুষের মিছিলে যোগ দিতে আসার বর্ণনা দেয় কথক। আর, সেই বর্ণনার চিত্রকল্প তৈরি করে প্রকৃতির ভাষা ও প্রাকৃতিক উপমা-রূপক। ঝাঙার তুলনা হয় ভোরের পাখি, মানুষের গতির উপমা হয় বাতাসে ওড়া শুকনো খড়কুটো, ঝাঙার নিচে মানুষের সারি বিকেলের ঝাঁকঝাঁপা পাখির সমতুল্য এবং বিশাল আকাশ-মাঠের ক্যানভাসে গুটিকয় মানুষের ছবি মূর্ত হয়।¹⁰² ধান ও কৃষিজমি- ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- রাজনৈতিক সাহিত্যেও তার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’-তে ধান শব্দটিকে মাতৃভাব, ধাত্রী ইত্যাদি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গজারিত বিশেষণে চিহ্নিত করার পরেই আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে কথক- “ধান মানেই জোতদারের জমি।” (দেবী ১৯৮০, ৯) কয়েকটি বাক্য পরে বসাই টুডুর কর্মকাণ্ডে তথা জোতদার-নিধনে ধান শব্দটির সঙ্গে ‘লাল’ রঙটি প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে আসে। এই বিরোধভাস আখ্যানের রাজনৈতিক নির্মাণ করে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র আখ্যান শুরু হয় কার্তিক মাসের রাতের বর্ণনায়, চ্যারকেটুর গোটা পরিবার যখন কয়েকদিনের উপোসী। ধানের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদক হয়েও তাদের এমন নিঃস্ব অবস্থা, অথচ প্রকৃতিই নীরব সাক্ষী থাকে শ্রেণিগত ও বর্ণগত প্রান্তিক পরিবারের শোষণের।¹⁰³ বাঘারুর সঙ্গে না-মানুষ প্রাণীদের যে আত্মিক নৈকট্য, তার অনুরূপ ছবি পরিলক্ষিত হয় চ্যারকেটুর সঙ্গে তার গোরুর সম্পর্কে। মনুষ্যসমাজের আর্থ-রাজনৈতিক শর্তগুলিতে প্রত্যাখ্যাত হতে হতেও সেই গোরুটিই আখ্যানের শেষপর্যন্ত তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে থাকে। পরিবেশবাদী সমালোচনায় কেন্দ্রে থাকে প্রকৃতি এবং কুশীলবদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক কার্যাবলী গুরুত্ব পায়; আখ্যানের ভাষার প্রকৃতিনির্ভরতাও লক্ষ্যণীয়।

‘বনপর্ব’-তে বাঘারুর অঙ্গলাভ উপপর্বের ভাষায় বাঘারুর মধ্যে প্রাকৃতিক আদিম সত্তার ঝলক বোঝা যায়- পাথর ছিল মানুষের প্রথম অস্ত্র- বিশ শতকের অতি-আধুনিক সভ্যতাকে পেছন দেখিয়ে বাঘারু সেই আদিম অঙ্গলাভ করে অরণ্যের সঙ্কুল পরিবেশে।¹⁰⁴ বাঘারুর সঙ্গে পাথরের সখ্য তথা একে-অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা বর্ণনা করার যথাযোগ্য ভাষা তৈরি ক’রে নিতে হচ্ছে কথককে। প্রতিটি ‘বৃত্তান্ত’-তে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হয়ে উঠেছে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ প্রকৃতির সঙ্গে উন্নয়নের বিরোধের অন্তর্ভুক্তি বুনে চলে- মানুষ কীভাবে তার স্বার্থে প্রকৃতির দখল নিতে চায় অথবা উচ্চশ্রেণির মুষ্টিমেয় ব্যক্তি কীভাবে প্রাকৃতিক উপাদানকে কুক্ষিগত ক’রে নেয়। ডায়না ফরেস্ট, আপলচাঁদ ফরেস্ট, তিস্তা নদী ‘সগায় গয়ানাথের’ এমনটা প্রকৃতিঘনিষ্ঠ বাঘারুর চেতনায় প্রোথিত হয়ে গেছে।¹⁰⁵ তিস্তানদীর ভবিষ্যৎ আর বাঘারুর ভবিষ্যৎ দুইই বিপন্ন কারণ গয়ানাথ এই দু’টির নিয়ন্ত্রক। তিস্তার পরিবর্তনের সঙ্গে বাঘারুর জীবনের পরিবর্তন একাত্ম হয়ে যায়; বাঘারুর আছে নিজস্ব চলার গতি, অবিরাম যাত্রাপথ ও হাঁটা। নদীর মতোই। বাঘারুও নদীর মতোই কোনও একটা নির্দিষ্ট পরিচয়ে বাঁধা পড়তে চায় না। বাঘারুর সবক’টি প্রাপ্ত নাম প্রাকৃতিক চিহ্নকে ভরপুর।¹⁰⁶ বাঘারু ‘আধুনিক, সভ্য’ সমাজের ভাষা জানে না বলে কথক সচেতন ক’রে দেন পাঠককে; তাই কথককেই দায়িত্ব নিতে হয় বাঘারুর চেতনাপ্রবাহের স্বরের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করানোর। সেই পরিচয়পর্বে বাঘারু গয়ানাথের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় প্রকৃতির সাহচর্যে। ‘বাঘারুবাড়ি’ গড়ে ওঠে অরণ্যের গভীরে, যেখানে নিজস্ব চেতনাস্বরে বাঘারু গয়ানাথের আধিপত্যকে প্রত্যাঙ্গান জানায়। গয়ানাথের সুবিশাল দখলদারির প্রতিস্পর্ধায় নিজের বাঘারুবাড়ি বানিয়ে ফেলে সে। (১৭৫-৭৬) লেখককে কান পাততে হয় খেতখেতু, চ্যারকেটুদের স্বর শোনার জন্য এবং পাঠক আবিষ্কার করে সেই স্বরের প্রকৃতিঘনিষ্ঠতা। নির্জন ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ভুলা মাসানের সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে করতে খেতখেতুর বিপন্ন হেঁটে চলা এবং ক্ষেতের তথা চারপাশের পরিবেশের খুঁটিনাটি অনায়াসে বলে দিতে পারা সেই ইঙ্গিতই দেয়। পরিবেশবাদী সমালোচনার আলোচনাবিন্দুও তাই, “how man’s relationships with his physical

environment are reflected in literature” (Tosic 2006, 43) নিবেদিতা মজুমদার পরিবেশবাদী সমালোচনাতত্ত্বের অন্তরে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণের গলদ সম্পর্কে সচেতন ক’রে দিচ্ছেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিবেশসমালোচকরা (postcolonial ecocritic) পুঁজিবাদ ও পরিবেশগত ন্যায়বিচারের বিপ্রতীপ সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন।¹⁰⁷ কিন্তু, ভারতের ক্ষেত্রে (নিবেদিতা নাইজেরিয়ার পরিবেশ আন্দোলনের শহীদের প্রসঙ্গও উল্লেখ করছেন) আদিবাসী জনজাতির বিপন্ন জীবন, কর্পোরেট লুঠ এবং পরিবেশবাদী আন্দোলন একই সুতোয় বাঁধা। দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলিতে নান্দনিকতা ও রাজনীতির মধ্যে যেমন আন্তঃসূত্র রয়েছে, তেমনই সংস্কৃতি ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে এবং পরিবেশবাদী উপাদান ও সংকটাপন্ন প্রান্তিকতমদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। মহাশ্বেতা কিংবা দেবেশ উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের সন্ধীর্ণতা ছাড়িয়ে চেতনা, ভাষা এবং শোষিতশ্রেণির বয়ান আবিষ্কারে জোর দিচ্ছেন। ‘চরপর্ব’-তে কথক আব্দুলের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেয়। আব্দুলের প্রতিস্পর্ধী স্বর বন্যার সময়ে জেগে ওঠে, অথচ, “আবদুল এ-এলাকার পরিচিত পাগল। বা, পাগলও নয়, হয়ত।” (২৩৫)। আব্দুলের পাগলামি অব্যাখ্যাত, তার আচরণ সংখ্যাগরিষ্ঠের আচরণ থেকে আলাদা। ভিড়ের ভেতরে থেকেও ভিড়ের বাইরে থাকে আব্দুল। তার শরীরী ভাষায় ও তার দাঁড়ানোর মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের প্রতি অবজ্ঞা থাকে। বাঘারুর আত্মপরিচয় বদলে যাওয়ার সংলাপে শারীরিক ভাষাই গুরুত্ব পায়। “ঐ ঐ বাবু, কামতই ত নামখান হয়। মোর ত সেইটাই গোলমাল। হাজারিয়া কাম। হাজারিয়া নাম।” (৯৪) কাম/কাজ দিয়েই নাম ঠিক হয়, বাঘারু তা জানে; আর, কাজ তো শ্রমের সঙ্গেই যুক্ত। বাঘারুর উদ্যোগ পিঠে, পাছায় নানান দাগ তার কাম ও নামের সাক্ষ্য বহন করে। বাঘারুর আন্ত শরীরের শক্তিতে বাঘকে হারানোর পরে তার নাম হয় বাঘারু। “মোর মাওখান তো গয়ানাথেরই আছিল। কাজকাম করিত। খোয়া খাইত।” (৯৫) অর্থনৈতিক দাসত্বে শ্রমজীবীর শরীরের ‘মালিকানা’ মালিকের কাছে থাকে- বাঘারুর আধভাঙ্গা চেতনা ও অ-প্রমিত শব্দ-ভাষায় সামন্তপ্রভু-দাস উৎপাদন সম্পর্কের বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়। বন্যায় ভেসে যাওয়া বাঘারুকে উদ্ধারের সময় যখন পাঠক ও কথক বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপ খুঁজে পান,

তখনই বাঘারুর নতুন নাম লেখা হয়ে যায় সরকারি খাতায়। কারণ, বাঘারু নিজের নাম বলতে পারে না, তার কায়িক শ্রমের সূত্রে ‘মালিক’ গয়ানাথের নামটুকু বলতে পারে শুধু। ‘গয়ানাথ জোতদারের জমিতে কর্মরত একজন কৃষিশ্রমিক’ (৩৪৪) লেখা হলে বাঘারুর শ্রম কিছুটা মর্যাদা পায়, কিন্তু বাঘারুর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তাতে ধরা পড়ে না। প্রতিটা মিছিলে, প্রতিটা সভায়, প্রতিটা রাজনৈতিক সমাবেশে বাঘারু তার বেমানান শরীর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেয়াড়াভাবে ঢুকে পড়ে। “আমাদের জ্ঞানের বা অনুসন্ধানের যে নিরুপায় সীমাবদ্ধতা, তারই প্রতীক বাঘারু” (সেন ২০১৪, ১৫৭) পাঠকের (এবং কথকেরও) রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকৌণিকতা প্রকট করতেই বাঘারু তার শরীরী প্রবলতায় হাজির হয়। বাঘারুকে নিছক বাস্তবের গণ্ডিতে বা সংজ্ঞায় আঁটা দুষ্কর বলেই তাকে বর্ণনা করতে উপমা আর শব্দবাহুল্য; তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে আতিশয্যনির্ভর কমিকের আভাস পাওয়া যায়।¹⁰⁸ এই ‘মজা (কমিক)’-তে বাঘারুর শরীর প্রধান ভূমিকা নেয় যখন শ্রীদেবীর নাচের অনুষ্ঠানে বেখাপ্পা অবাস্তিত বাঘারুর বেয়াড়া উপস্থিতি ‘সাংস্কৃতিক ফাংশন’ শব্দবন্ধকে টাল খাইয়ে দেয়। নাচ দেখতে আসা একটি দলের সঙ্গে বাঘারু অযাচিতভাবে ঢুকে পড়ে নাচগানের জলসায়। শ্রীদেবীর শরীরী বিভঙ্গে মুগ্ধ জনতার উচ্ছ্বাসের রসভঙ্গ ক’রে দিতে বা শৃঙ্গাররসের নাচের বৈপরীত্যে বাঘারুর ‘শরীর’ ‘রাজবংশী-মদেশিয়া-নেপালী ও বর্ণহিন্দু বাঙালিদের’ ভিড়ের মধ্যেও স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তার শরীর ওই সাংস্কৃতিক উচ্ছ্বাসের নয়, তার শরীর ওই ভিড়ের কোনও জনজাতির নয় এমনকি তার শরীর হবু-উন্নয়নেরও নয়।

বাঘারুর ঐ শালপ্রাংশু রাজবংশী শরীরের নগ্নতার সঙ্গে মঞ্চে বসে ফিল্মের যৌন প্রতীক নায়িকা শ্রীদেবীর জ্যান্ত শরীরের একটা অর্থগত সংযোগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার মুহূর্তে গানটা হঠাৎ থেমে যায়, অনেকক্ষণ আগেও যেমন থামতে পারত... এখন মঞ্চের আলোতে ও প্যাভিলনের বাইরে থেকে আসা আলোতে দেখা যায়- বাঘারু প্যাভিলনে ওই লক্ষ লোকের মাঝখানে তার উদ্যম শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে, পরনের নেংটিটুকু যেন থেকেও নেই। বাঘারুই যখন দৃশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনেকে তাকে দেখেও দেখে না। কিন্তু দেখেও না

দেখার সময়টা পেরিয়ে যায়- সকলে বসে আছে যেখানে সেখানে নিজের নগ্নতা নিয়ে বাঘারু এমনই বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে... বাঘারু ঐ নগ্নতা যেন তাই দর্শকদেরও অপমান। বাঘারু নিজের ঐ নগ্নতা নিয়ে মঞ্চের দিকে এমনই অনড়, যেন ঐ দাঁড়িয়ে থাকাটাই একটা বিদ্রোহ। (রায় ২০১৩, ৪১৬)

বাঘারু নগ্ন শরীর একটা বয়ান হয়ে ওঠে। তার অজান্তেই শরীর ভাষা পায়। কথক শ্রীদেবীর নাচের বিস্তৃত বর্ণনার পাশাপাশি তার শরীরী বিভঙ্গে মাতোয়ারা দর্শকদের বর্ণনা দিচ্ছেন- সেটিরও একটা নির্দিষ্ট বয়ান আছে যাকে প্রতিস্পর্শা জানায় বাঘারু বয়ান। বাঘারু নাম 'কুড়ানিয়ার ছোয়া' হওয়ার পেছনেও সেই শ্রম ও শরীরের সম্পৃক্ততা। 'অন্ত্যপর্ব'-তে মাদারির মায়ের চরিত্রনির্মাণে শরীরের রাজনীতি ও লিঙ্গ রাজনীতি দু'ইই ক্রিয়াশীল। "মাদারির মা এখন মাদারির মা, বড় জোর আট-দশ বছর, তার আগে সে আরো অনেকবার আরো অনেকের মা হয়েছে। কতবার কত মাদারির মা, তা এখন হিশেব কষে বের করতে পারবে না।" (৪৫৬) মাদারির মায়ের পরিচয় সন্তানের নামে কিংবা মাদারির বাপেদের পরিচয়ে, "ছেলে পেটে ধরতে হলে ছেলের একটা বাপ তো মাদারির মায়ের হাতের কাছে সবসময় বহাল থাকা দরকার" (৪৫৭) মাদারির মায়ের মাতৃত্ব সমাজব্যবস্থার প্রচলিত বৈধতার নিয়মনীতি গ্রাহ্য করে না। ঘরের পাটাতন খুলে যাওয়া আর ঘর ভেঙে যাওয়ার রূপকে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে একের-পর-এক শারীরিক চুক্তি ভেঙে যায় তার।¹⁰⁹ ঈঙ্গিতা হালদারের বিশ্লেষণে, মাদারির মায়ের পর্যায়ে এসে লেখক দু'ভাবে প্রচলিত আখ্যানগড়নকে নাড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রথমতঃ মাদারির মা 'পরিবার' নামক স্থিত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আখ্যানে বিবর্তিত হয় না। ফলে, তার নারীত্ব পরিবারকৃত হয় না। তার নারীত্ব/মাতৃত্বকে প্রচলিত সমাজধারণার মাপে এঁটে ওঠা যায় না। দ্বিতীয়তঃ মাদারির মা অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে শিকার ক'রে বাঁচে। পুরুষতান্ত্রিক বিবর্তনব্যখ্যা শিকারকে পৌরুষজাত শ্রম হিসেবে দেখতে ও দেখাতে অভ্যস্ত। কিন্তু শিকারি ও সংগ্রাহক এই বৈপরীত্যমূলক যুগ্ম পদে মাদারির মায়ের সামাজিক লিঙ্গ সজ্জিত হয়। আর, তার যে নিজস্ব 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' রয়েছে, তা

কথক জানিয়ে দিয়েছ। সেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রা সেইই।¹¹⁰ এই রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বসর্বা মাদারির মা- এই রাষ্ট্রব্যবস্থার নাগরিকরা তারই সন্তান। মাদারির মা তার বহু সন্তানকে খোঁজে- এই ‘বহু সন্তান’ যাদের বাবা রাজবংশী, মদেশিয়, নেপালি কিংবা মিলিটারি ছিল।¹¹¹ রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন বহু জাতিসত্তা বাস করে, তেমনই কি মাদারির মায়ের সন্তানেরা? মাদারির মা কি আস্ত একটা রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে ওঠে? তার ছেলে জন্মায়, ছেলেরা চলে যায়, আবার নতুন ছেলে আসে, মাদারির মায়ের হিসেব থাকে না সন্তানগণনায়। কথকের ভাষাতেও সেই সংশয় এসে পড়ে বারবার- মাদারির মা তার ছেলেদের খুঁজছে, সেই ছেলেরা যেকোনও জনজাতির যেকোনও বয়সের হতে পারে- কথক সন্তান খোঁজার জন্য মাদারির মায়ের হাঁটাকে তার খাদ্যের সন্ধানে হাঁটার সমতুল্য ক’রে দেন। তারপর সন্তানদের খুঁজে পেতে, অন্ততঃ একটি ছেলেকে কাছে রাখতে তার নিরন্তর খুঁজে চলা? বাঘারু, চ্যারকেটু, খেতখেতু, কেলুদের মতো মাদারির মাও হাঁটে। দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’-র মূল কুশীলবেরা প্রত্যেকেই হাঁটে; হাঁটা তাদের ব্যক্তিগত শারীরিক ভূমিকা পেরিয়ে আখ্যানের আঙ্গিক-বিষয়বস্তুতে আত্মীভূত হয়ে যায়। মাদারির মায়ের হাঁটা প্রতিদিনের। জঙ্গল থেকে খাদ্য জোগাড়ের জন্য। সন্তানকে খোঁজার জন্য। ‘খুঁজতে হবে’- এই বাক্যটিই ফিরে ফিরে আসে কথকের বয়ানে। মাদারির মা কিংবা বাঘারু কোনও মিছিল নেই, জাতিসত্তার গর্ব নেই, কোনও জাতিসত্তায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার বাসনা নেই, রাষ্ট্রস্বীকৃত পরিচয়ের সত্তা নেই; কিন্তু তাদের শরীরসহ অস্তিত্ব রয়েছে। মাদারির মা বিভিন্ন জুলুশে যায় খাদ্যের সন্ধানে, মাদারির মা শ্যাওড়াঝোয়ার জঙ্গলে দেবতার থানের প্রতিরূপ বানিয়ে অর্থ রোজগার করে। বিভিন্ন সভায়, মিছিলে সে যায় কিন্তু মিছিল বা সভা তাকে আত্মীকরণ করে না আর সেও মিছিল/সভাকে আত্মীকরণ করে না। নিজের সামান্য অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার ক’রে নেয়। এই প্রত্যাখ্যানের ধরণ চ্যারকেটু আর খেতখেতু বোঝে। তাদের শ্রমের দাম কোনও সরকার এমনকি যুক্তফ্রন্ট সরকারও দেয় না। তাদের অধিকারে জমি নেই, তাদের পেটে খাদ্যের অভাব। তাদের শুধু শ্রম রয়েছে। শ্রমের অর্থনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যই সে বিভিন্ন মিছিলে যায়; ‘যখন যে-মিছিল পেয়েছে।’ (১৬৫) সংসদীয় দলগুলি নির্বাচকদের প্রয়োজন

অনুভব করে নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে, চ্যারকেটকেও তেমনই পরামর্শ দেয় খেতখেতু- বিভিন্ন দলের মিছিলে মিছিলে ঘুরলেই জমি উদ্ধার করা যাবে।¹¹²

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিল্পী’ গল্পে শরীর অভ্যাস ও প্রতিরোধের আভাস দেয়। মদন তাঁতিসহ গ্রামের সব তাঁতি পরিবার বেগারখাটার বিরুদ্ধে তাঁত বন্ধ রেখেছে। ভুবনবাবু, মিহিরবাবুদের মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের সব তাঁতি সামিল হলে, তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ থাকে। তাঁত না-চালালে তাদের পায়ে খিঁচ ধরে, গায়ে ব্যথা হয়- দৈহিক শ্রমের ওপরে তারা নির্ভরশীল। শ্রমের অভ্যাস শারীরিক কসরতের সঙ্গে এক হয়ে যায়। মদন তাঁতি শ্রমজীবীর চেতনা নিয়ে ‘ক্লাস-ইন-ইটসেলফ’ বা শ্রমজীবীর ঐক্য উপলব্ধি করে। কিন্তু, শ্রমের অভ্যাস ভোলে না। “তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এটুটু।” খালি তাঁত চালিয়ে সে প্রতিরোধ জারি রাখে এবং শারীরিক শ্রম ক’রে শ্রমজীবীর যাপন বজায় রাখে। শরীরের রাজনীতি মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’ জুড়ে বিদ্যমান। শাসক সেখানে শাসিতের শরীরের ওপরে কজা রাখতে ব্যর্থ হয়, বরং শাসিতের শরীর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কাছে ত্রাস হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী মেঝেনের নিরস্ত্র শারীরিক ভঙ্গি এবং তার ছুঁড়ে দেওয়া রক্তমাখা থুতু রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রকে আতঙ্কিত করে। তার এই শারীরিক বয়ান লিঙ্গ-প্রতীক এবং বর্ণ-প্রতীকের অন্তর্ঘাতী বয়ান হয়ে ওঠে। আখ্যানের প্রচলিত ধরনে নায়ক-শরীরের বর্ণনায় পৌরুষছাপ প্রাধান্য পায়। দ্রোহের সমচিহ্নায়ক হিসেবে পৌরুষবৈশিষ্ট্য (masculinity) বহুকালের সাহিত্য-উপাদান। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসে বসাই টুডুর শারীরিক বৈশিষ্ট্য অতি-পৌরুষের ছাপ নেই, তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য অতি-সাধারণ বলেই প্রশাসনের অসুবিধে হয়।¹¹³ বসাইয়ের চেহারায় বাতাসের গলা মোচড়ায়, তার হাতের পেশি ফুলে ওঠে এবং চোখে মুখে ক্রোধের ভাষা পরিব্যপ্ত হয়। বসাইয়ের মৃতদেহও একটি রাজনৈতিক বক্তব্য হয়ে ওঠে- রাষ্ট্রের কাছে এবং তার পূর্বতন পার্টির কাছে। ‘শনাক্ত’ ও ‘লাশ’ শব্দদুটি দৈহিক পরিচয়ের সম্পৃক্ত- বসাই টুডুর ক্ষেত্রে শব্দদুটি রাষ্ট্রীয় উল্লাসের সমর্থক- বসাইয়ের ব্যঙ্গস্বর সেই রাজনীতির ইঙ্গিত দেয়- “লাহাশ হয়ে যেলছি, তাথেই

কমরেট শনাক্ত করতে আল্‌ছ?” (দেবী ১৯৮০, ৮) কথকের স্বর ‘প্রশাসনের শরীরে দুষ্‌ব্রণ’ হিসেবে চরসা স্থানটিকে তুলনা করে। এই তুলনা একইসঙ্গে চরসাকে জীবন্ত ক’রে তোলে এবং প্রশাসনিক সক্রিয়তার দ্যোতক হয়ে ওঠে।¹¹⁴ এর অব্যবহিত পরে কথক থানার ও.সির অতি সক্রিয়তার বর্ণনা দেন কয়েকটি শরীরকেন্দ্রিক বিশেষণের ব্যবহারে- শান্ত, সাহসী, হিংস্র, কর্তব্যপরায়ণ- শেষ শব্দটি (কর্তব্যপরায়ণ) রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অতি-সক্রিয়তায় প্রযোজ্য।

মঘাই ডোমের “শরীর দোমড়ানো, বুকের লোম সাদা”, তার সারা শরীরে ও মুখে দারিদ্র্য অনাহারের স্পষ্ট ছাপ, তবু কথক তার চোখে ‘সহজাত অধিকারের দার্দ্য’ আবিষ্কার করেন। কারণ, মঘাই জাতিতে ডোম ও উচ্চবর্ণের কাছে অচ্ছুৎ হলেও শুখা মাটি ফুঁড়ে জল তোলার মন্ত্র ও শরীরী পারফরম্যান্স একমাত্র সেইই জানে। শরীর যে দ্রোহের ভাষা বহন করতে পারে, তার একাধিক দৃষ্টান্ত ‘চিলেকোঠার সেপাই’-তে। শহুরে মহাজন রহমতউল্লা খিজিরের ওপরে আর্থিক ও শারীরিক আধিপত্য বিস্তার করে, খিজির তার অধীনস্থ কায়িক শ্রমদাস ছাড়া কিছু না। জুম্মনের মা রহমতউল্লার বাড়ির কাজের লোক এবং বাধ্যতঃ রহমতউল্লার যৌনপ্রবৃত্তির সঙ্গী- জুম্মনের মাকেও কায়িক শ্রমদাস হিসেবেই ব্যবহার করে রহমতউল্লা। জুম্মনের মায়ের শরীর ও মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখে বলেই রহমতউল্লা জুম্মনের মাকে গর্ভপাত করাতে বলে। কামরুদ্দিন জুম্মনের মাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করলেও, জুম্মনের মায়ের পেটে ‘ছোটলোকের সন্তান’ বলে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়- রহমতউল্লার নির্দেশ বড় হয়ে ওঠ।¹¹⁵ খিজিরের কাছে রহমতউল্লার শোষণ আর আইয়ুব খানের শোষণে তফাৎ নেই- রাষ্ট্রীয় শোষণব্যবস্থার ক্ষমতাশালী প্রতিনিধি রহমতউল্লার হস্তক্ষেপ খিজির ও জুম্মনের মায়ের ব্যক্তিগত যাপনকে বিপর্যস্ত করে। খিজির জুম্মনের মাকে গর্ভপাত করাতে বারণ করে কারণ আইয়ুবের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রহমতউল্লার শোষণ খতম হলে জুম্মনের মা নিজের শরীরের ওপরে অধিকার ফিরে পাবে; খিজিরও ওই বাচ্চাটির ওপরে সম্পূর্ণ অধিকার পাবে।¹¹⁶ রাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগত যাপন ও শরীরের রাজনীতি খিজির ও ওসমানের সংলাপে স্পষ্ট হয়।¹¹⁷ খিজির তার শরীরকে বারবার রিক্রার সঙ্গে

তুলনা করে। অসংগঠিত শ্রমিক খিজিরের শ্রমের উপকরণ তার দেহ এবং রিক্সা। তার পেশার সঙ্গতেই তার চেতনা এবং চিন্তাপ্রবাহ প্রভাবিত হয়। জুম্মনের মায়ের পোয়াতি হওয়ার খবর হঠাৎ শুনে তার ‘সারা শরীর জুড়ে নতুন ধরণের স্পন্দন’ (১৭৮)। জুম্মনের মায়ের পেটের সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার পাওয়ার আনন্দ তথা নতুন দায়িত্বভারের তুলনা সে পায় ‘খাঁ খাঁ রাস্তায় রিকশা চালাবার সুযোগ’-এর সঙ্গে (১৭৮)- এই রাস্তায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মহাজনের শাসনমুগ্ধ। কার্ফু ভেঙে মিলিটারির গুলি খাওয়ার পরে খিজিরের চেতনায় রিকশার উপমা, রিকশার যন্ত্রপাতির উপমা চলে আসে নিজের শরীরের তুলনায়- “তার বডির চেসিস কি ভেঙে গেলো? তার টায়ারে কি হাওয়া নাই?” (২৬০) প্রায় নিভে আসা চেতনায় ঢাকা শহরের রাজপথে, অলিগলিতে রিক্সা চালাতে থাকে খিজির- রিক্সা চালিয়েই শারীরিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে যেতে থাকে সে। কথক খিজিরের শরীর-সম্পর্কিত কয়েকটি শব্দ যথা ‘গতরটাকে বোধ করতে পারে সাজঘাতিক ব্যথায়’, ‘শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে’ ব্যবহার করেন প্রাক-মৃত্যু অবস্থা বোঝাতে। আর, একইসঙ্গে খিজিরের বয়ানে তার চেতনাপ্রবাহ চলতে থাকে, ‘ঢাকা তো আর চলে না। গাড়ির চেসিস ভেঙ্গে ফেলেছে’ (২৬০-৬১)। আখ্যানবর্ণনার ভেতরে কথকের বর্ণনা আর খিজিরের আধোচেতন আত্মগত বয়ানের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে- এই দ্বন্দ্বের শেষে কথকের স্বর টিকে থাকে। সেই স্বরে মৃত খিজিরের শরীরের বিবরণ। খিজিরের মৃতদেহের পাশে মাছির উড়ে আসা, নীল পাখার গোলাপি আভা ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে আশ্চর্য মিল ‘হারবার্ট (১৯৯২)’ উপন্যাসে হারবার্টের মৃতদেহের পারিপার্শ্বিক আবহের বিবরণের। পরী হারবার্টের মৃত্যুদৃশ্য জানলার বাইরে থেকে দেখে, তাকে ভোর অবধি পাহারা দিয়ে দোকানে ফিরে যায়।¹¹⁸ জুম্মন পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে খিজিরের মৃত্যুদৃশ্য দেখে, তার মৃতদেহ ভোর অবধি পাহারা দেয় এবং খিজিরের ক্ষু-ড্রাইভার প্লায়ার নিয়ে বাসায় ফিরে যায়। ‘হারবার্ট’-এর হারবার্টের ‘বাঁটপাখি’ নাম, তার সদাই ভয়ে-ফ্যাকাশে চেহারা কথক জানিয়ে দেন পাঠককে। ক্ষয়িষ্ণু যৌথপরিবারের অকস্মণ্য ও বসে বসে খাওয়া (তথা জ্যাঠা ও জ্যাঠাতো দাদার অল্পে প্রতিপালিত) হারবার্টের শরীরের ওপর মারাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছিল তার ভাইপোদের হাতে।¹¹⁹ কথক জানান যে,

ফুচকা-বুলানের হাতে “সামনে পেছনে ঘুমি খেয়ে তার অপরিণত ব্রেন বোধহয় নড়ে গিয়ে থাকবে” (ভট্টাচার্য ২০০৪, ২৯) তাই পনেরো বছর আগে মৃত বিনুর বলে যাওয়া কথা ‘আশ্চর্য এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে’ পুনরুজ্জীবিত হয়। হারবার্ট এরপরেই ব্যবসা খুলে বসে, তার ‘বসে-বসে-খাওয়া’ বা অকস্মিক্যতার জবাব দিতে পারে সে। তার মানে এও কি এক প্রতিরোধ না? ভাইপোদের মার, ধন্বনাদাদার দেওয়া খাওয়ার খোঁটা, তার ভয়ে-ফ্যাকাশে চেহারা ইত্যাদি প্রতিরোধের এক বাসনা কি তার মধ্যে জাগ্রত হয়? আর, নকশাল বিনুই সেই প্রতিরোধী বাসনার যোগসূত্র বা সূচনাবিন্দু।

বিবরণ, আখ্যাননির্মাণ ও ভাষার সেতুবন্ধন

‘হারবার্ট’ উপন্যাস সম্পর্কে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত একটি চিঠিতে ‘হারবার্ট’-এ থাকা খিস্তির সংখ্যা গণনা ক’রে উপন্যাসটিকে ‘অপাঠ্য’ বলে নিন্দা করা হয়েছিল।¹²⁰ ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের এহেন সমালোচনা একপেশে- কারণ এতে আখ্যানে ভাষার বহুস্তর ও প্রায়োগিক সৌন্দর্য অবজ্ঞা করা হয়। ‘হারবার্ট’ উপন্যাস একদিকে যেমন সমসাময়িক লজকে বিশ্বস্তভাবে ধারণ করেছে, তেমনই উপন্যাসের প্রথম পাতা থেকেই বিবরণের বিস্তৃতি লক্ষ্যণীয়। কয়েকজন মাতাল, গ্রীষ্মের ভ্যাপসা/গুমোট রাত, কলকাতার একটি নির্দিষ্ট গলি- এই বর্ণনাগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। কথক ‘সে রাতে এমনই ছিল বন্দোবস্ত’ বলে ‘বন্দোবস্ত’-র দৃশ্যগুলি পুনর্নির্মাণ করেন আখ্যানে। ওই নির্দিষ্ট রাতটি আখ্যানের সত্য, কথক সেই সত্যকে পাঠকের পাঠের সত্যে রূপান্তরিত করতে এত বিস্তৃত বর্ণনা রাখেন। যে বর্ণনায় কানিপরী পাগলীবুড়ি সত্যি, নর্দমা থেকে ভুরভুর করে আরশোলা বেরনো সত্যি, প্রবল নেশার ধুনিকিতে বমি করাও সত্যি। কথক সেই ‘বন্দোবস্তকে’ সত্যি করে তুলতে উপমা, রূপক ও চিত্রকল্প গড়ে নেন। চাঁদের গায়ে স্যাঁতলা সত্যিই পড়ে না, চিলছাদের বাটি-অ্যান্টেনা খসা-তারা ধরার জন্যে হাঁ ক’রে দাঁড়ায় না, ‘বস্তার মতো একটা তেলচিটে মেঘ’ হয় না- এগুলি কবিত্ব-

কল্পনার প্রয়োগ। গদ্যের বর্ণনায় পদ্যের কল্পনা মিশিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই কাল্পনিকতাই ওই রাতের বন্দোবস্তকে যথার্থরূপে পাঠকের সামনে হাজির করে। নবাবুণ তো স্বীকার করেই নিয়েছেন যে, আখ্যানের ভেতরে বিবরণ থাকতে পারে, উপন্যাস থাকতে পারে কিংবা কবিতাও থাকতে পারে।¹²¹ খোড়ো রবির আত্মহত্যা বা হারবার্টের একলা শহরভ্রমণে পরীর সঙ্গে মনোগতকথন- কবিতার সম্ভাবনা প্রসারিত করে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পাতায় হারবার্টের মৃত্যুর পরে তার ঘরে কয়েকটি অ-মানুষী প্রাণীর বর্ণনার বিস্তার লক্ষ্যণীয়। কথক তার ‘দেখার চোখ’কে পাল্টে নিচ্ছে ওই অ-মানুষী প্রাণীদের দৃষ্টিপাতের আনুমানিক কল্পনায়। আখ্যানের সত্যে ততক্ষণে হারবার্ট মৃত; কিন্তু কথক হারবার্টকে ‘ইন্ট্রোডিউস’ করাবার আগে তার মৃত্যুদৃশ্যের আখ্যানস্থ সত্য উপস্থাপন করছেন আরশোলা, টিকটিকি, পিঁপড়ে আর পরীর গতিবিধির দিকে খেয়াল রেখে।

রাস্তার দিকের দেওয়ালের মোটা টিকটিকিটা দেওয়াল থেকে নেমে, খাটের পায়া বেয়ে উঠে এমবার চুপ করে বুঝে নিল হারবার্ট ঘুমোচ্ছে কি না। সে দেখল হারবার্ট নিথর। তখন টিকটিকিটা হারবার্টের বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে তার বাঁ হাত বরাবর নেমে গিয়ে দেখল যে হাতটা রক্তের গন্ধওলা ঠাণ্ডা জলে ডুবে রয়েছে। সবুজ চোখে সে অন্ধকারের মধ্যে হাত থেকে বালতির কানা মাপ করে নিয়ে লাফ মেরে বালতির কানায় উঠেছিল। সেখান থেকে বালতির গা বেয়ে তরতরিয়ে নেমে কোন্ আরশোলাটাকে ধরবে এটা ঠিক করার নীল একটা আশ্চর্য আলোয় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। টিকটিকি ও আরশোলারা দেখেছিল সেই আশ্চর্য দৃশ্য। বাইরের দেওয়ালে, গলির দিকে যে বন্ধ কাচের জানালা তার ধুলোময়লায় মুখ ঘষে, ডানা ঝাপটে, একটা পরী ঘরে ঢুকে হারবার্টের কাছে আসার চেষ্টা করছে। তার নীলচে মুখের ভাপ কাচের ওপর পড়ছে, তার চোখের জলে ধুলো ধুয়ে যাচ্ছে। (ভট্টাচার্য ২০০৪, ১০)

এই অতিলৌকিক দৃশ্যের পরেই কালো, ডেঁয়ো ও লাল পিঁপড়াদের হারবার্টের মৃতদেহে খাদ্যাশ্বেষণে প্রবেশ করার নিখুঁত প্রলম্বিত বর্ণনা। দীর্ঘ অনুচ্ছেদে কথকের খুঁটিয়ে দেখা

পর্যবেক্ষণে টিকটিক ও আরশোলারা পর্যবেক্ষক। একমাত্র পরী বাদে উপরোক্ত বর্ণনার সবক'টি প্রাণী বাস্তবের। পরীটিকে হারবার্ট পার্ক স্ট্রিটের কোনও অ্যান্টিক শো-রুমে আবিষ্কার করেছিল। পরীর অবাস্তব উড়ে আসা ও হারবার্টের জন্যে শোক মনুষ্যের প্রাণীরা দেখে। আর, এত 'বন্দোবস্ত'-র জন্যে ভাষাকে সাজিয়ে নিতে হয় লেখককে। এরকম বহু অনুচ্ছেদ 'হারবার্ট'-এ রয়েছে, যা মূল কাহিনি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য এক অসম্পূর্ণ কাহিনিতে নিয়ে যায়। তারপর আবার ফিরে আসে মূল কাহিনিতে। টিকটিকি-আরশোলা-পিঁপড়ে এই আখ্যানে অপ্রয়োজনীয়। তবু তাদের প্রয়োজন হয় যাতে হারবার্টকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তার মৃত্যুর খবরটি দিয়ে দেওয়া যায়। আর, এই অনুচ্ছেদটি ফের শুরু হয় নবম অধ্যায়ে- সকালে হারবার্টের ঘর থেকে যখন তার লাশ উদ্ধার হয়। কিন্তু সেখানে আর পরীর কথা থাকে না; পরীর সঙ্গে হারবার্টের ফ্যান্টাসিময় প্রেম অষ্টম অধ্যায়েই ফুরিয়ে দিয়েছে কথক। একাধারে বিচ্ছিন্নতা তৎসহ অবিচ্ছিন্ন কাহিনি যেখানে টুকরো টুকরো পর্যবেক্ষণ, টীকা, তথ্য, মনুষ্য-পরিচিতি, কাব্যময় বর্ণনা, রাজনৈতিক সূত্র, অতীত-বর্তমান মেলানোর ধরতাই ইত্যাদি অনায়াসে মিশে গেছে, সেখানে ভাষার ব্যবহার বিশিষ্ট হতে বাধ্য। “একটা কৌটোর ভেতর থেকে যেমন আরেকটা কৌটো বেরোয়, তেমনি চিলছাদের মধ্যে থেকে বেরিয়েছে বংশলতিকা, বংশলতিকার ভেতর থেকে বেরিয়েছে বাড়ি, বাড়ির ভেতর থেকে শহর। মাত্র এইটুকু উপন্যাসে কত যে মানুষ তা ইয়ত্তা করা যায় না” (রায় ২০০৮, ২৪৯-৫০) এমনই গভীর পর্যবেক্ষণ, টীকা, তথ্য-টুকরো, কাব্যময় বর্ণনা, অতীত-অর্তমানের যোগসূত্র অনায়াসে মিশে যাওয়া ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসেও রয়েছে। চিলেকোঠার সেপাই নিঃসন্দেহে ওসমান, আখ্যানের শুরুতে ও শেষে তার কথা, কিন্তু আখ্যানজুড়ে তার তাৎপর্যপূর্ণ বিবর্তনের মধ্যে খিজির, আনোয়ার, শওকত, রহমতউল্লা, রানু, রঞ্জু প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের কাজ করে। এরা শ্রেণিগত ও সামাজিক অবস্থানে একে অপরের বিরোধী, এদের নিজেদের মধ্যেও বিরোধভাস রয়েছে, উত্তরণ রয়েছে। এরা ওসমানের চেতনাকে প্রভাবিত করে। কবীরের মতো স্বল্পস্থায়ী অদৃশ্য কুশীলব, ইফতিখার-সিকানদারের মতো স্বল্পোস্থিত কুশীলবরা ওসমানের দৌদুল্যমান অবস্থান স্পষ্ট করে, তার

স্মৃতিকামুকতা জোরালো করে তোলে। এতজন কুশীলবের ভিন্ন ভিন্ন ভাষান্তর, আখ্যানের গতিপথে তাদের ক্রমবিবর্তনের বর্ণনার ভাষা আখ্যানকে গতিশীল করেছে।

‘হারবার্ট’ উপন্যাসের মতোই রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ উপন্যাসে বহুস্তরীয় বহুস্তরীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। কলকাতার বিশেষ একটি অঞ্চল (বেলেঘাটা) এবং তৎসংলগ্ন কারখানা, লোকালয় (নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী বসতি ও মধ্যবিত্ত বসতি) এবং রাজনীতির ভাষা অনায়াসে মিশে গেছে সত্তর দশকের কয়েকটি দিনের রাজনৈতিক অভিঘাতের বর্ণনায়। সাহিত্যিকের ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার পরিচায়ক জড়বস্তুতে প্রাণসঞ্চার। কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে, জড়বস্তুর বর্ণনা বা কাল্পনিক অভিব্যক্তি দ্বারা জড়বস্তুকে জীবন্ত প্রদান করা। বাস্তবে তা অসম্ভব হলেও, কাব্যের কাল্পনিকতায় সম্ভব। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি সব ভাষাতেই কবিদের এই স্বাধীনতা রয়েছে। রাঘব আখ্যানের গদ্যে রাস্তাকেও প্রাণবন্ত ক’রে তুললেন, যেন সেটি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ‘তালতলার লর্ড পাড়ার মাজা ভাঙা রাস্তা’ (৪৯)- রাস্তার তুলনা শরীরের সঙ্গে। বেলেঘাটা, স্থানীয় উচ্চারণের বেলিয়াহাটা, শুধু স্থানমাত্র নয়- ষাট-সত্তরের দশকের উদ্ভাপ নিয়ে নিজেই আস্ত একটা কুশীলব “পচাখাল আর হাড়িকলের বেলিয়াহাটায় চিমনির বদ রক্তবমি আর কূটগন্ধ জাগ ধরে আন্ধার। তরতাজা একটা জানের শোকে বেলিয়াহাটায় রাতির। সত্তরের বেলেঘাটা। বারুদের গন্ধ বুকে নিয়ে চোখের ডিমে নখ বিঁধিয়ে পড়ে আছে।” (৭০) আখ্যানকথনে বারবার অন্ধকারের প্রাণসঞ্চার করা হয়- সময়ের চিত্রায়ণে অন্ধকার তাৎপর্যপূর্ণ রূপক আর, একইসঙ্গে প্রাণহীন সময়ের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এমন বর্ণনায়- “থিকথিকে অন্ধকার ওদের গিলছে একটু একটু করে... দুধের সরের মতো সকাল সোনার সিনার খুন নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে আসবে।” (৬৮) অন্ধকারের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের তুলনার ভাষা লক্ষ্যণীয়- “পুলিশ, খোচর আর সিআরপি-র বেয়নেট আর গোবদা মিলিটারি বুট ঠিক এই টাইমেই অন্ধকারের বোরখায় হামা দিয়ে হাঁটু ঢেকে হাঁটে।” (১৫৯) বেলেঘাটাকে তথা স্থানীয় নিম্নবর্গীয়দের বেলিয়াহাটাকে উপন্যাসের মূল কুশীলব ক’রে তোলা লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয়।

এর পদ্ধতিগুলি হল- বেলেঘাটাকে নিষ্প্রাণ জড় হিসেবে বর্ণনা না-করে বেলেঘাটাকে জীবন্ত ও সচল ক’রে তোলা। বেলেঘাটার মনন ও অনুভূতিকে মানুষের মননের সমতুল ক’রে তোলা। বেলেঘাটা সম্পর্কিত মিথ ও ছড়ার প্রয়োগে বেলেঘাটাকে জীবন্ত তথা বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তোলা। যে সময়ের আখ্যান, সেই সময়ের প্রধান চিহ্নগুলির সঙ্গে বেলেঘাটার যোগস্থাপন। রাঘব এই পদ্ধতিগুলি নিয়েছেন এবং কথকের বয়ানে এই পদ্ধতিগুলি অনুশীলিত হয়েছে। ‘বেলেঘাটার পোড়া বুক’, ‘আবাগি মাটি’, ‘বেয়াদপ বেলিয়াহাটার আশমান-উঁচা শির’, ‘হাভাতি শরীরের কোষে রক্তের বান ডাকিয়ে বেলিয়াহাটা গম্ভীর। ভয়ংকর গম্ভীর’ এমন অজস্র উদাহরণ উপন্যাসে রয়েছে, যেখানে বেলেঘাটা আর রাজনীতি আর তৎকালীন সময় অঙ্গঙ্গী হয়ে গেছে। আখ্যানের মনুষ্যচরিত্রের মতোই বেলেঘাটার অন্ধকার-আলো আছে, হর্ষ-বিষাদ আছে এবং প্রতিক্রিয়া আছে। তার দৃষ্টি আছে এবং সাক্ষ্য আছে। আর, এই সবই মূর্ত হয়ে উঠছে ভাষার ব্যবহারে। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের প্রথম পাতার রাতের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয় ‘কমুনিস’ উপন্যাসের রাত্রিবর্ণনা-

রাত ধুমসো হয়ে এলে সারাটা তল্লাট আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গতর-খাটিয়ে আধপেটা লোকজনের বাস। চুপড়ির মতো বস্তি। ধোঁয়া। সার সার চিমনি বেয়ে আকাশটাকে প্যাঁচাচ্ছে। রাস্তার কল থেকে ছরছর শব্দ উঠছে। খানিক আগেও একটা খেঁকি কুত্তা কলটার কাছে ল্যাজ নাড়ছিল। এখন মাতালের নাকি সুর কানে বাজছে- জিন্ দে... গি... ই। রাতভর গোটা চত্বরজুড়ে বেচাল মাতাল, খেঁকি কুত্তা আর খোচরের রাজত্ব চলে। আর গোরার দল রাত জেগে দেয়ালগুলোয় আগুনের টুকরোর মতো এক একটা শব্দ লটকে দেয়।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪, ৫৫)

এমন রাত্রিরে গোরা, সোনারা দেওয়ালে রাজনৈতিক শ্লোগান লেখে- ‘হারবার্ট’ উপন্যাসের উক্ত রাত্রিবর্ণনার সঙ্গে এই একমাত্র অমিল, হারবার্টের ইয়ারদোস্তু সেই রাত্রিরে মাতাল হয়ে বমি করছিল এবং হারবার্ট আত্মহত্যা করছিল। হারবার্ট যে সময়ের আঁচ পেরিয়েছে বিনুকে কেন্দ্র

ক'রে, গোরা, সোনা, নারায়ণদারা সেই বিনুর প্রতিরূপ। হারবার্ট নব্বই দশকের নিশ্চলতার আঁচ পেয়ে এবং স্থিতিবস্থায় বিনুকে ব্যক্তিগত 'ট্রিবিউট' দেওয়ার ব্যক্তিগত কৌশল নিয়ে আত্মহত্যা এগিয়ে গেছে- দ্রোহী সময়ের অবক্ষয় ঘটছে তখন। আর, গোরা-সোনারা সেই দ্রোহসময়ে বাঁচছে। 'হারবার্ট' উপন্যাস দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে হারবার্টের যাত্রাপথের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু 'কমুনিস' একটা নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকটা দিনের কাহিনিকে 'জুম-ইন' করে। হারবার্ট বিনুকে কেন্দ্র ক'রে নকশাল আন্দোলনকে বুঝেছিল, হারবার্টের ভাষান্তরে বহুস্বর মিশে থাকলেও 'কমুনিস'-এর মতো শ্রমিকমহল্লার স্বর আর দ্রোহীস্বরের গভীরতা অনুপস্থিত। রাত্রির বর্ণনায় ইতিহাস ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে- রাত্রি এক তাৎপর্যপূর্ণ কুশীলব হয়ে ওঠে- "তরল অন্ধকার উগরে উগরে এখন গহেরা রাত। অন্ধকারের সিনায় পা চেপে বিন্দিংটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ধূলো আর ইস্তেহারের গন্ধ নিয়ে।" (১৪৩) রাজনৈতিক শব্দের প্রাচুর্য আখ্যানজুড়ে- তার উচ্চারণ শব্দে নিম্নবর্ণের মানানসই। 'কমুনিস' শব্দটিও বিশেষ বাচনভঙ্গি- অ-শিক্ষিত শ্রমজীবীর আন্তরিক রাজনৈতিক উচ্চারণ 'কমুনিস'। 'শোকমিছিল (১৯৭৩)' আখ্যানে এমন অনেকগুলি শব্দে উচ্চারণ-স্তরের হৃদিশ মেলে। কারখানার শ্রমজীবী শশী 'লেলিন' বলে- সে উচ্চারণ ব্যকরণসম্মত নয় কিন্তু তা আন্তরিক মতাদর্শবাহী। পার্টিকমরেডের খুনের বদলা নেওয়ার বার্তা দিয়ে হিন্দি-বাংলা মেশানো নিজস্ব উচ্চারণ তার- "কমরেড ভাবী, রোও মৎ। শশীরা বদলা নিবে" (৪৪০) এই আখ্যানে ননীবালার বাচন ও শব্দোচ্চারণ সিপিআইএম পার্টির যুবদলের শোকসভায় অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে দেয়।¹²² অজয়ের শোকমিছিলে এসে বিজয়ের নামোচ্চারণ, অজু-বিজুকে এক শব্দবন্ধে জুড়ে শহীদ বলা এবং পার্টির স্থানীয় উঠতি নেতাদের অতীত নিয়ে ভৎসনা করা- ননীদি মূর্তিমান বিপর্যয় হয়ে ওঠে। বিনয়ভূষণের মূল্যবোধ থেকে সরে এসেছে পার্টির যে যুবনেতারা, তারা ননীদির প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয় কারণ, পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে অযাচিত প্রশ্ন উঠিয়ে দেয় ননীদি। আখ্যানকথক মন্তাজ ব্যবহার করছেন- বিনয়ভূষণের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে ননীদির আবির্ভাব, তারপরই বিনয়ভূষণ ফিরে যান বিজয়ের সঙ্গে তর্কের অতীতদৃশ্যে। অজয়-বিজয়ের লাশ এবং অজয়ের লাশকেন্দ্রিক শোকমিছিল বর্তমান, কিন্তু

বিনয়ভূষণের চিন্তাস্রোত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করে পাঠকের সামনে। ভাষাপার্থক্যের তাৎপর্য স্পষ্ট হয় অজয় ও বিনয়ভূষণের সঙ্গে বিজয়ের রাজনৈতিক তর্কে। অজয়ের স্বরে সিপিআইএম পার্টির নকশালবিরোধী প্রচার বড় হয়ে ওঠে। “মা ক্রমেই পার্টিবিরোধী কথাবার্তা বলা শুরু করেছে। একে তো বিজু। তার ওপর মা” (৪৪১) সংলাপে ব্যক্তি অজয়ের থেকে পার্টির যুবনেতা অজয়ের স্বর তীব্রতর। বিজয়কে সে যে ভাষায় দমিয়ে দিতে চায়, তা অবিকল ১৯৭১-৭২ সালে সিপিআইএমের প্রযুক্ত ভাষা সিপিআইএমএলের বিরোধিতায়।¹²³ বিজয়ের সংলাপে ‘দেশব্রতী’-র প্রবন্ধের ভাষা এবং সিপিআইএমএল নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রবন্ধের ভাষা অঙ্গঙ্গী মিশে থাকে। বিনয়ভূষণের সঙ্গে তর্ক করা মানে কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো ভুলভ্রান্তি ও ভোটসর্বস্বতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম- একথা বিজুর ভাষা; আদতে তা নকশালদের রাজনৈতিক মতাদর্শজাত সর্বজনীন উচ্চারণ। ‘কমুনিস’ উপন্যাসে এ.বি ও নারায়ণদার বাদানুবাদে আইনি পথের লড়াই বনাম আইন ভাঙার লড়াইয়ের প্রতর্ক উঠে আসে, যা সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির পথ বনাম সিপিআইএমএলের পথের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে।¹²⁴ বিজয়ের উচ্চারণ এবং অশোক বসুর উচ্চারণে প্রভূত মিলের একটা কারণ সমপার্টির সদস্যপদ এবং আরেকটি কারণ দু’জনেই শহুরে ভদ্রলোক অবস্থান থেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে শ্রেণিচ্যুত হতে চেয়েছে ও শহুরে পরিসরে সাংগঠনিক অনুশীলন করেছে।

ঠাণ্ডা মাটি না, ‘ঠাণ্ডি মাটি’।¹²⁵ হিন্দির সঙ্গে বাংলার সাবলীল মিশেল। ‘কাল বেলিয়াহাটা বন্ধ’ (৬৮)। এটা কার ভাষা? এরকম হিন্দি-বাংলা মেশানো ভাষা কাদের মুখে অনায়াস? শ্রমিকদের মুখে। বেলিয়াহাটার যে অঞ্চল, রাস্তাঘাট, দেয়াল, আস্তানাকে প্রাণবন্ত ক’রে তুলছেন লেখক, সেইসব ঘিরে আছে সিক্লিকল, হাড্ডিকল, রংকল, পুতলিকল, রবারকল ইত্যাদি। রাঘব মধ্যবিভের দ্রোহচেষ্টার গল্প ফাঁদেন নি- এই সমস্ত কারখানার শ্রমজীবীদের রাজনীতির গল্প বলেছেন। সুকু-মদনা অবাঙালি শ্রমিক, তাদের মা অবাঙালি- তার সম্পর্কে কথক বলছে, “বুড়ির বাংলা আসে জলের মতো। মাঝেমাঝে ঘরোয়ালি কথায় বেখেয়ালে হিন্দি বলে” (৩৫) একই

বাক্যের মধ্যে হিন্দি-বাংলা শব্দ স্বতন্ত্র ভাষাপ্রকল্প নির্মাণ করে, যে ভাষা ভদ্রলোকের ভাষাপ্রস্তাব থেকে আলাদা আবার কারখানা মালিক কিংবা প্রশাসনিক ভাষার থেকেও আলাদা। ভদ্রলোকের ভাষার নমুনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোরার পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্তদের সঙ্গে একই বস্তিতে বাস করেও গোরা এবং ব্রজেনবাবুর স্বরে ভদ্রলোকি সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট। ইংরাজি শব্দ ও বাংলা শব্দের মিশেল এবং সুস্পষ্ট বাক্য বিন্যাস তাদের।¹²⁶ উপন্যাসে বহু স্বরের মধ্যে কথকের স্বর আলাদা ক’রে চিনে নেওয়া যায় দু’টি বিষয় বুঝে- (১) কথকের (তথা, লেখকেরও) মতাদর্শগত অবস্থান দু’টি লাইনের অভ্যন্তরস্থ পাঠে থাকে (২) কথকের বাচন ও বচন মূল কুশীলবদের থেকে স্বতন্ত্র (শিষ্ট শুদ্ধ বাংলা)। কিন্তু, ‘কমুনিস’-এর কথক গোরার ভাষা যেমন আত্মস্থ করেছে, তেমনই সুকু, সোনা, নিবারণদের ভাষা। ভাষা অর্থে হিন্দি বা বাংলা বা ইংরাজি নয়, ভাষার লজ্জ, বুলি এবং রোজচলতি শব্দের অনায়াস মিশ্রণ। “সোনা এরই মধ্যে হাত ঘুরিয়ে সিগারেটের চুসকিটা নিল। খানিক শুকা গিলে ও লাস্ট টানটা মারল। টুসকি দিয়ে শেষটা ফেলে দিল” (৬৩) এটি কথকের বর্ণনার ভাষা- চুসকি, শুকা, লাস্ট, টুসকি অনায়াসে মিশে গেছে বাংলা বাক্যে। নারায়ণদা পোড় খাওয়া কমিউনিস্ট নেতা- বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দেহাতি মানুষদের মধ্যে থেকে সাংগঠনিক কাজ করে আবার শহরের শ্রমজীবী বস্তিতে রাজনৈতিক অনুশীলন করে। নারায়ণদার ভাষার নিবন্ধন (register) সোনা-সুকু-নিবারণদের থেকে আলাদা। সেই ভাষায় বাংলা-হিন্দির প্রয়োগ আছে, পারিবারিক শিক্ষা-রুচির ছাপ আছে এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের গভীরতা আছে।¹²⁷ “জিন্দেগিভর যে মজুরের লড়াইকে ইমানদারির সাথে সাথ দিতে পারে, সে বেটা কমিউনিস্ট” উচ্চারণ করে নারায়ণদা। মধ্যবিত্ত ভদ্রবৃত্ত থেকে শ্রেণিচ্যুত হয়ে শ্রমজীবীর লড়াইয়ের সঙ্গে দেওয়ার বোধ তাতে রয়েছে। নারায়ণদার চিঠির ভাষা পরিশীলিত- সোনা-সুকু এমনকি গোরার বাচনের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে। সাংকেতিক সম্বোধনে লেখা চিঠি, সাংগঠনিক গোপনীয়তা বজায় রেখে লেখা। ছ’টি নাতিদীর্ঘ বাংলা বাক্যের মধ্যে একটি মাত্র ইংরাজি শব্দ¹²⁸ বিহারে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সংগঠন করতে গিয়ে নারায়ণদার চেহারা-বেশভূষার

আন্তরিক রূপান্তর তার ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।¹²⁹ এবি-র সঙ্গে নারায়ণের দ্বন্দ্বের ভাষাপার্থক্য কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ।

উক্ত আখ্যানগুলিতে উল্লিখিত সময়পর্বের সমকালীন সময়পর্ব ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে। খিজির যে রাতে কার্ফু অগ্রাহ্য ক’রে মিলিটারির গুলিবিদ্ধ হয়, ওসমান যে রাতে আনোয়ারকে টপকে বদ্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে যায়, চেংটু-করমালি-আলিবক্সরা যে রাতে শ্রেণিশত্রুদের খতমের আয়োজন করে- এই প্রত্যেকটা ভাষাকাঠামো স্বতন্ত্র। আনোয়ার যে সময় গ্রামে যায় শ্রেণিসংগ্রামের পরিস্থিতি বুঝতে, তখন তাদের ‘পার্টি ভাঙছে। এখন যে ও কোন গ্রুপে বিলং করে’ বলে আনোয়ারের ভাই। (ইলিয়াস ২০১৫, ২৭) ১৯৬০-র দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আরও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় আলিবক্সের সঙ্গে আনোয়ারের কথোপকথনে- শ্রেণিশত্রু খতম, শোষিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত দ্রোহ এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলন বিষয়গুলি উঠে আসে। আনোয়ার ও আলিবক্স দু’জনেই অসংসদীয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতিনিধি কিন্তু দু’জনের ভাষা ও চেতনায় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় কৃষকদের মিথ-সংস্কারে বিশ্বাস করে আলিবক্স, একইসঙ্গে সে শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে পারে সহজে। আনোয়ারের ভাষায় দুস্তর ব্যবধান থেকে যায়; আলিবক্সের সঙ্গে বামমনস্ক চেতনা নিয়ে তার বিরোধ লাগে, আলিবক্সের সঙ্গে নেতৃত্বের ভাষা নিয়ে তার দ্বন্দ্ব চলে। “জনগণের সাইকোলজির সাথে তার [আনোয়ারের] অনেক ব্যবধান... আমি আলিবক্সকে আরও ডেভেলপ করতে পারতাম, এটা আমার খুব ভুল হয়েছে।” (ইলিয়াস ২০১৮, ৫৮) গ্রামীণ শোষকের আচরণে সর্বতোভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক, যৌন-নিপীড়কের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আফসার গাজীর যৌনোত্তেজনা বিকৃতকাম, নারীকে ভোগ্য ছাড়া কিছু মনে করে না সে, তার বিকৃতকাম অমার্জিত ভাষায় সোচ্চার ঘোষণা করতে দ্বিধা নেই¹³⁰। শহরের মহাজন রহমতউল্লাহর শোষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আফসার গাজীর থেকে আলাদা না, কিন্তু তার ভাষার ব্যবহার তুলনায় পরিশীলিত, তার আচরণে নাগরিক ভদ্রলোকসুলভ

গোপনীয়তা। তার স্বরে ভদ্রলোকবৃত্তে ব্যবহৃত শব্দ বেশি। আফসার গাজীর অম্লীল যৌন আচরণ, হোসেন মিঞার নারীলোলুপ সৈরাচারের সঙ্গে ‘গ্রামে চলো’ উপন্যাসের মহাজন সীতানাথ, ‘শালবনি (১৯৭৮)’ উপন্যাসের তারক হালদার, ‘অগ্নিগর্ভ’ আখ্যানের সূর্য সাউদের সৈরাচারের প্রচুর মিল। তাদের প্রতি নিপীড়িত কৃষকের ঘৃণার ভাষাতেও সাদৃশ্য রয়েছে।

ইলিয়াসের দু’টি উপন্যাসের আখ্যানকথনেই স্বপ্নের ভাষা স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। স্বপ্নদৃশ্য আখ্যানে বহুব্যবহৃত একটি রীতি। আখ্যানের প্রথাগত স্বপ্নদৃশ্যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ চলে, হঠাৎ ছেদ ঘটে স্বপ্নদৃশ্যে এবং অসংলগ্নতা থাকে। একজন কুশীলবের স্বপ্নদৃশ্য থেকে জেগে বাস্তবে আছড়ে পড়ার কখন হতে পারে অর্থাৎ বাস্তবের সাথে তার বহুলতফাৎ। দ্বিতীয়তঃ, কথক এমনভাবে তা হাজির করতে পারে যেন বাস্তবে তা ঘটছে কিন্তু আসলে তা কুশীলবের দৃষ্টিভ্রমে/স্বপ্নে ঘটছে। ইলিয়াস স্বপ্নদৃশ্য ও দৃষ্টিবিভ্রমকে এভাবে উপস্থাপিত করছেন না। ইসলামিক ঐতিহ্যে স্বপ্নব্যাক্য্যার নির্দিষ্ট জ্ঞানাহরণ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি রয়েছে। ‘খোয়াবনামা’-র চেরাগ আলির খোয়াবনামা শুধু বই মাত্র না, এবং অন্যদিকে এটি বিশেষার্থে ‘লিটরেচর’ কারণ প্রকৃত স্বপ্নব্যাক্য্যার জ্ঞানাদিকারী ব্যক্তিই একমাত্র তা পড়তে পারে।¹³¹ খোয়াব মুখফেরতা কাহিনির অতীত জাগানিয়া হয়ে উঠছে, তমিজের খোয়াব রাজনৈতিক প্রতিরোধ হয়ে উঠছে। ঈঙ্গিতা চন্দ বলছেন যে, ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানবুননের হচ্ছে স্বপ্নের বিষয়টিকে (থিম) কেন্দ্রে রেখে এবং এর গড়নগঠন নির্মিত হচ্ছে স্বপ্নব্যাক্য্যাকে ঘিরে। চিরাচরিত এবং সমকালীন খোয়াবনামার (স্বপ্নব্যাক্য্যার বই) প্রথাগত আঙ্গিক ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’য় প্রতিফলিত হচ্ছে না, বরং ‘নামা’ সংরূপের বহুলপ্রভাব এতে পরিলক্ষিত হচ্ছে।¹³² ‘খোয়াবনামা’-র ভাষাদর্শন তাই বাংলা উপন্যাসের চেনা আখ্যানগড়ন থেকে আলাদা হয়ে যায়।

কেন এমন ব্যতিক্রমী ভাষাদর্শনের প্রয়োজন হয়? প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের নেতৃস্থানীয়রা বাণিজ্যিক প্রচার ও বিজ্ঞাপনী বাহুল্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসসম্মু সময়কে যখন প্রতিবিপ্লবী কানাগলির সময়ে রুদ্ধ ক’রে ফেলে, তখন সমান্তরাল পথে প্রতিষ্ঠানবিরোধী চেতনা আপাত সময়

থেকে প্রকৃত সময়ে উত্তরণের পথ খুঁজে নেয়। এবং এইসব ব্যতিক্রমী পাঠকৃতিতে সময় নিজস্ব বাক্‌স্পন্দ নিয়ে সঞ্চরণশীল থাকে।¹³³ এই যে প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের সময়বোধকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে রাজনৈতিক সময়কে খুঁজতে চাওয়ার অদম্য বাসনা লেখকের, সেখান থেকেই অভূতপূর্ব রূপক, উপমা ও আশ্চর্য তুলনাসমূহের জন্ম হয়। এগুলি একাধারে রাজনৈতিক চেতনাপুষ্ট এবং কেন্দ্রীভূত একক বাচনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। কোনও কোনও লেখক উপন্যাসের আখ্যানে সময়ক কাজে লাগান সময়বোধের (যে সময়বোধ শাসক মতাদর্শ দ্বারা সৃষ্ট) বিরুদ্ধে। আর, এই পাল্টা-সময়বোধ থেকেই আখ্যানের নায়ক প্রতিনায়ক ও মূল কুশীলবেরা উঠে আসছেন। সাংস্কৃতিক ব্রয়লারে (কালচার ইন্ডাস্ট্রি) শাসক মতাদর্শের হেজেমনি মেনে নায়ক (hero) তৈরি হয়, কিন্তু এই উপন্যাসগুলিতে সেই হেজেমনিকে প্রত্যাঙ্গান জানিয়ে নায়ক নির্মিত হয়। গোপাল হালদারের মতে, গত-বাঁধা মজুতদার, গত-বাঁধা শ্রমিক নিয়ে লিখলে তাদের একজনও সত্য ‘মানুষ’ হয় না, বরং নকল হয়ে ওঠে।¹³⁴ ‘কমুনিস’ উপন্যাসে সোনা, মিণ্টু, নিবারণরা ‘মানুষ’ হয়ে ওঠে ওই চাপিয়ে দেওয়া গত-বাঁধা নির্মাণকে লেখক পাত্তা দেন না বলেই। তাদের ভাষা, তাদের কথন, তাদের সময়বোধ জারিত ক্রিয়াকলাপের জন্য তারা ‘মানুষ’ হয়ে ওঠে। ‘অগ্নিগর্ভ’ আখ্যানগ্রন্থটি বাংলা উপন্যাসের ভাষার নবায়ন ঘটিয়ে দিয়েছে- বহুস্বরের উদ্‌যাপন নিছক নির্মাণকৌশল (craft of literary narrative) নয় বরং আখ্যাননীতি। এই আখ্যাননীতি রাজনৈতিক চেতনা ব্যতিরেকে সম্ভব না। এই আখ্যানের গদ্যে অনেকগুলি ভাষার কোলাজ তৈরি হচ্ছে- সাহিত্যের বাংলা, চলতি/মুখফেরতা বাংলা, আমলা-প্রশাসনের বাংলা, আদিবাসীদের বাংলা এবং একইসঙ্গে এই গদ্যরীতিতে ধ্রুপদী থেকে জনপ্রিয় বহু ঘরানা মিশে আছে- রাজনৈতিক থেকে তথ্যাদির উদ্ধৃতি থেকে চলতি গানের উদ্ধৃতিও ব্যবহার হয়েছে।¹³⁵ কালী সাঁতরা প্রশাসনের জিপে চেপে কদমখুঁঞায় যাওয়ার পথে বসাই এবং বসাইয়ের সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মজুত পুলিশের দু’টি বাস দেখে। বাসদু’টির গায়ে ‘ওয়ার্ক মোর টক লেস’ এবং ‘দি নেশন ইজ অন দি মুভ’।¹³⁶ ১৯৭৬ সালের ভারতবর্ষে যখন জরুরি অবস্থা চলছে এবং কমিউনিস্টনিধন চলছে, তখন বাসের গায়ে লেখা এই বাক্যদু’টি রাজনৈতিক দ্যোতক হয়ে ওঠে। বসাইয়ের

প্রতিটি উচ্চারণে আদিবাসী সাঁওতালি উচ্চারণের বাংলা শোনা যায়- তার সঙ্গে বসাইয়ের নিজস্ব সামাজিক অবস্থান থেকে প্রাপ্ত প্রবাদ-প্রবচন মিশে যায়। কালী সাঁতারার ভাষার সঙ্গে বসাইয়ের ভাষার তফাৎ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থানগত তো বটেই, তার সঙ্গে রাজনৈতিক উপলব্ধির তফাৎও থাকে। কালী সাঁতারার ভাষায় সংশয় এবং সমর্পণ যুগপৎ ক্রিয়াশীল কিন্তু বসাইয়ের ভাষায় দ্রোহপথের নিশ্চয়তা ও প্রতিস্পর্ধা লক্ষ্য করা যায়।

ভদ্রলোক, নিম্নবর্গ এবং

মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক উপন্যাস ও গল্পে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ, শোষক ও শোষিত এবং বাবু-ভদ্রলোক ও তথাকথিত ‘ছোটলোক’-র সংস্কৃতির পার্থক্য জ্বলজ্বলে। বসাই টুডু, দুলনা মাঝিরা রাষ্ট্রের শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ার পাশাপাশি আইনকানুনের পক্ষপাতী প্রয়োগের বিরুদ্ধেও লড়াইলেন। উচ্চবর্গের তৈরি করা এই সন্ত্রাস ও পক্ষপাতী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। একইসঙ্গে ‘বাবু’দের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্মাণের বিরুদ্ধেও তাঁদের নিয়ত সংগ্রাম। কারণ, ‘বাবু’ নামক সেটের মধ্যে কংগ্রেস নেতা আর কমিউনিস্ট নেতা দু’ইই এঁটে থাকে। বসাইয়ের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের একটা অভিমুখ থাকে ‘বাবু নেতৃত্বের’ প্রতি, তথা কমিউনিস্ট পার্টিতে মধ্যশ্রেণির আধিপত্যের প্রতি। এই আধিপত্য শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়, বরং নীতিপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও নির্বিক্ত ও নিম্নবর্গের ক্ষমতায়নের প্রতিকূল। ১৯৭২ সালে সিপিআই (এম) পার্টিতে মধ্যশ্রেণি থেকে আগত সদস্যসংখ্যা ছিল শ্রমিকশ্রেণি থেকে আগত সদস্যসংখ্যার প্রায় তিনগুণ- সিপিআই (এম-এল) পার্টিতেও এই সংখ্যানুপাতের খুব হেরফের ছিল না।¹³⁷ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উচ্চবর্গের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি- শহুরে মধ্যশ্রেণি ও গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে দূরত্ব রয়েই যায়। বসাইয়ের ভাষা এবং বিপ্লবের নব্যনীতি প্রণয়নের চেষ্টা সেই দূরত্বের উদ্দেশে বার্তা দেয়। ‘অগ্নিগর্ভ (১৯৭৭)’ আখ্যান-ধারাবাহিকের ‘দ্রৌপদী’ গল্পে ক্যাপ্টেন অর্জন সিং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং একইসঙ্গে তিনি শিখ সম্প্রদায়ের

ধর্মপ্রাণ সুশিক্ষিত উচ্চবর্গের প্রতিনিধি। এই দু'ই সত্তার যুগলবন্দিতে তিনি ভারতরাত্নের হয়ে মূলবাসী সাঁওতাল দ্রোহীদের দমন করতে আসেন। রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাসের অগ্রণী প্রতিনিধি হলেও, ইডিওলজিকাল স্টেট অ্যাপারেটাসের প্রয়োগ বারবার তাঁর অনুশীলনে মিশে যায়- আখ্যানকথক ও লেখকের সাফল্য দ্রৌপদী বনাম অর্জন সিং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে ব্যক্ত করার মধ্যে। ভারতরাত্নের 'যথার্থ' প্রতিনিধি হিসেবেই অর্জন সিংয়ের চোখে মূলবাসী সাঁওতালরা সকলেই অভিন্ন ও 'অপর'¹³⁸, “উক্ত কুলকুলি ও নৃত্যশীল দম্পতিই যে পলাতক লাশদ্বয় তা জেনে অর্জন সিং কিছুক্ষণ 'জোমবি' অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ মানুষে তার এমন অহেতুক ভীতি জন্মায় যে নেংটিপরা কালো মানুষ দেখলেই সে 'জান লে লি' বলে অবসন্ন হয়ে ঘন ঘন জল ফেরায় ও জল খায়” (ভট্টাচার্য ১৯৭৭, ১৬৫) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অপরাধের (এবং অবমানবায়নের) এই পদ্ধতিতেই দ্রৌপদী বসাইরা সেনা-রাষ্ট্র-পুলিশ-উচ্চবর্গের চোখে অবমানুষ বলে পরিগণিত হয়। অর্জন সিংয়ের শিক্ষা, কর্মপদ্ধতি, তত্ত্ব, প্রশিক্ষণ ও বীরত্ব কোনও কিছুই তাঁর সহায় হয় না দোপদী, দুলনাদের সংস্কৃতি-অনুশীলনকে বুঝতে। মতাদর্শগত রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রের অনুশীলনে 'গ্রন্থসাহেব' তাঁর কাজে লাগে না এবং 'হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে পঞ্চ ক অবধি বিকল ও ব্যর্থ।' আখ্যানের গতিপথে অর্জন সিং ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে দ্রৌপদী ও তার নকশাল সহযোদ্ধাদের সংস্কৃতি-সমরশিক্ষা-সামাজিক অবস্থান বড় বেশি বিপ্রতীপ হয়ে পড়ে। এমনকি, 'দ্রৌপদী' নামের সঙ্গে এবং আখ্যানের ঘটনাক্রমের সঙ্গে 'মহাভারত'-র দ্রৌপদীর প্রভূত মিল যেমন থাকে, তেমনই বেশ কিছু পার্থক্যও থাকে। মহাভারতের খণ্ডঘটনার ও বিভিন্ন চরিত্রের পুনঃকথন ভারতীয় সাহিত্যে বারবার হয়েছে। কখনো বিষয়, কখনও আখ্যানবস্তু, কখনও চরিত্র আবার কখনও বিশেষ ঘটনার খণ্ডিত অংশকে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে আধুনিক/সমসাময়িক কালস্থানিকতায়। দোপদী মেঝেনকেও তেমনই পুনর্জীবিত করেন মহাশ্বেতা, কিন্তু, তার আদলে 'দ্রৌপদী'-র থেকেও যাজ্ঞসেনীর অবয়ব বেশি পরিস্ফুট। আর, আর্যকেন্দ্রিক মহাকাব্যের 'নায়িকা'র সঙ্গে অনার্য দোপদী মেঝেনের তফাৎ রাত্নের বয়ানেই প্রকাশ করেন মহাশ্বেতা- “দুই তকমাধারী যুনিফর্মের মধ্যে সংলাপ। এক তকমাধারীঃ

সাঁওতালীর নাম দোপ্দি, ক্যান?” (১৬৩) এবং সেই ‘মোস্ট ওয়ান্টেড নটোরিয়াস মেয়েছেলে’ কোনওভাবেই কি হিন্দু বিশ্বাসের ‘পঞ্চসতী’র এক সতী হতে পারে? সেই হিন্দু বিশ্বাসও তো ভেঙে দেন আখ্যানকথক এবং দোপ্দি মেঝেন নিজে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের (এক্ষেত্রে শুধু হিন্দু বিশ্বাস নয়, সকল প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাসই একরকম) বিচারে পুরুষের হাতে লাঞ্ছিতা/ধর্ষিতা হলে নারীর ‘সতীত্ব’ ‘নাশ’ হয় এবং ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের সেনাবাহিনী সেটাই করার চেষ্টা করে; কিন্তু, সেনাবাহিনীর গণধর্ষণের পরে ‘সতীত্ব’ নামক অবাস্তব ধারণাকেই প্রতিস্পর্ধা ছুঁড়ে দেন আখ্যানকথক ও দোপ্দি। প্রচলিত ধারণা ভেঙ্গেচুরে এক বিরুদ্ধ বিশ্বাস আখ্যান ফুঁড়ে ওঠে।

Dopdi ventures forth into seemingly indomitable myth to counter what has been miswritten, and then rewrites it. The story ought to be referred to as a counter-myth, because while on one hand it invokes the actions and events of the original myth, on the other, it counters the same through an allegory that seems ordinary in its context vis-à-vis the epic, but is phenomenal in the effect that it creates on the readers. (Sharma 2016, 154-5)

দোপ্দি মেঝেনের চেহারা, বেশভূষা, অসংস্কৃত যাপন ও ভাষা এবং যোদ্ধার সক্রিয়তা অর্জন সিংদের বাহিনীর পরিচিত নারী-অবয়বের সঙ্গে খাপ খায় না; আর, ভদ্র-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পাঠকরা চিও হোঁচট খেতে খেতে আখ্যানপথ ধরে এগোয় কারণ, তাদের পাঠপ্রত্যাশায় দোপ্দি অভূতপূর্ব এক দ্রোহী। দোপ্দির কুলকুলি দেওয়া, দোপ্দি-দুলনার ‘মা-হো’ বলে সমরান্বিত এই সবই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুদ্ধরীতির বিপরীত। নকশালবাড়ি বিদ্রোহের সময় রাষ্ট্র বনাম শোষিতের দ্বন্দের ভিত্তিভূমি ছিল মতাদর্শগত পার্থক্য; আর, এই দ্বন্দ্বকে পুষ্ট করেছিল দমনমূলক সংস্কৃতি বনাম দ্রোহ-সংস্কৃতি। দোপ্দি-দুলনা ও তাঁদের সহযোদ্ধাদের দমন করতে অপরাধের যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্র তথা সেনাবাহিনী, তার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল

সমরনীতি। ‘আর্মি হ্যান্ড বুক’ লেখা ছিল, “আদিম অস্ত্রাদি নিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দার্হ। উক্ত পদ্ধতির যোদ্ধাদের দর্শনমাত্রে নিধন হল সেনাবাহিনীর পবিত্র কর্তব্য।” (১৬৫) দোপ্দি-দুলনারা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ঘৃণার ও হত্যাযোগ্য শত্রু হয়ে ওঠে কারণ তাদের একমাত্র অস্ত্র টাঙ্গি-হেঁসো-তীর-ধনুক¹³⁹। এমনকি, এই সমরাস্ত্রের পার্থক্যও মহাশ্বেতা ক’রে দেন এই বলে যে, ‘সেনা’ হয়ে উঠতে আলা ক’রে প্রশিক্ষণ নিতে হয় অর্জন সিংদের কিন্তু, দোপ্দিরা তাদের জীবনযাপনের পরম্পরায় এই সব অস্ত্রচালনায় দক্ষ। “দুলনা ও দোপ্দি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করেছে জন্ম পরম্পরায়” (১৬৬) আর, এইজন্যেই সমরতত্ত্ববিশারদ অর্জন সিংয়ের থেকে ভিন্ন হয়ে যায় দোপ্দি-দুলনারা। সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহকে রাষ্ট্র দমন করছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে- এই প্রতর্ক বহু শতাব্দীর পুরনো; কিন্তু, দোপ্দি-দুলনাদের সঙ্গে অর্জন সিংদের পার্থক্য এই যে, অর্জন সিং রাষ্ট্রের বেতনভুক তাই রাষ্ট্রের নির্দেশে তার অস্ত্রচালনা কিন্তু দোপ্দি-দুলনাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বসাই টুড়ুর বিক্ষোভের পথও তার এবং তার সম্প্রদায়ের অস্তিত্বসন্ধান। রাজনীতির এই তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি মহাশ্বেতা আখ্যানকথনে স্পষ্ট করেন। বসাই টুড়ুও অনার্য দ্রোহী, “টুড়ু। সাঁওতাল। রগ চটলে রাক্ষসের জাত” (১১) প্রশাসনিক বয়ানে ক্ষমতাবান ‘মানুষ’দের থেকে দ্রোহী সাঁওতালদের আলাদা করে নেওয়া হয় ‘রগচটা রাক্ষসের জাত’ তকমা দিয়ে। প্রতর্ক সাজিয়ে নেওয়া হয় মানুষ বনাম রাক্ষস (=সাঁওতাল) এইভাবে। এই আদিম সমরাস্ত্র ও গেরিলা কৌশলেরই অনুশীলনকারী। রাষ্ট্রের সুসজ্জিত সমরনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ তার। বসাই স্পষ্টই পার্থক্য গড়ে নেয় আধুনিক সমরাস্ত্রের সঙ্গে নিজেদের সমরাস্ত্রের ও যুদ্ধনীতির। ‘বাবু’দের সমরতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে সে। ফ্যাতাডু+চোক্তার দ্রোহ যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়, তখন রাষ্ট্রের সমরকৌশলের বিরুদ্ধতায় বিকল্প রণনীতি প্রস্তুত করে তারা। লড়াই চলে অনেকগুলি ফ্রন্টে। ‘বাবু’দের প্রমিত ভাষার বিরুদ্ধে অশুদ্ধ নোংরা ভাষায় খিল্লি ছুঁড়ে দেয় তারা। ভদ্রলোকীয় পাঠপ্রবণতার বিরুদ্ধে দ্রোহজাগানিয়া পাঠপ্রবণতা উদ্‌যাপন করে তারা। শাসিত মধ্যবিত্তের মানিয়ে নেওয়ার চিরন্তন অসহায়তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের

ফ্যান্টাসিমুখর হুল্লোড়ে মাতে তারা। ঔপনিবেশিক আদেখলামি (colonial hangover) ও পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যাঙ্গান জানায় তারা দেশীয় জ্ঞানকাণ্ডের পুনরুত্থানে। লালবাজারের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাবাহিনী, সুপ্রশিক্ষিত র‍্যাফসহ পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে হাড়জিরজিরে সিভিলিয়ান গজা ও সরখেলের মতো অবসরপ্রাপ্ত করণিক লড়াই করে। রাষ্ট্রের বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভারের বিকল্প হয় থানকা ইঁট, ভাঙা বালতি, কাদা-ভরা ভাঙা বালতি, গাছসুন্ধ টব, নুনুকামানের গোলা ফেটে বেরোনো মার্বেলের বল, মরচে পড়া সোর্ড, ভাঙা গাদা-বন্দুক ইত্যাদি। যদিও, ‘কাঙাল মালসাট’ এক অ-রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফ্যান্টাসিপ্রবণ পাঠের হৃদিশ দেয়; কিন্তু বসাই, দোপদী, দুলনাদের কাহিনী ফ্যান্টাসিপাঠ নয়। উদ্ভট হাস্যরস, উৎকট চরিত্রবর্ণন এবং হুল্লোড়-উদ্‌যাপন এঁদের বাস্তবতা নয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বাস্তবতায় দেশজ প্রতিরোধ শ্রেণিবোধ ও জাতিসত্তার বোধসহ উদ্‌যাপিত হয়। শাসক-মতাদর্শের সঙ্গে আদিবাসী প্রতিরোধের বিরোধগুলি প্রকট হয়। “‘চরসা’ নামটি প্রশাসনের শরীরে দুষ্করণ। ‘সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয়’-‘অ্যাপ্রিহেনশন অ্যান্ড এলিমিনেশন’-‘শুট টু কিল’ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতেও প্রশাসনের শরীর থেকে ‘চরসা’ ব্যাধিটি নির্মূল করা যায়নি।” (৮) বসাই ‘টুডু’, দোপদী ‘মেঝেন’, দুলনা ‘মাঝি’, তাদের সহযোদ্ধারা ‘মুগ্ধা’- বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভদ্র-মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক প্রোটোগনিস্টদের সীমানাকে প্রত্যাখ্যান করেই আখ্যানে এঁদের গর্বিত গতিশীলতা।

নবারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে ফ্যাতাডুর পার্থক্যকেই নিয়ে আসেন তাঁর ‘কাঙাল মালসাট (২০০৩)’ ও ‘ফ্যাতাডুর বোম্বাচাক (১৯৯৯)’-র আখ্যাননির্মাণে। মধ্যবিত্তের সঙ্গে পার্থক্যও তৈরি হয়। কিন্তু, মহাশ্বেতা দেবীর মতো অ-শহুরে পরিসর থেকে নয়, বরং শহুরে পরিসরের মধ্যে নিম্নবর্ণের ও নির্বিত্তের উদ্‌যাপন চলে; শহুরে ভদ্রলোক তথা ‘এলিট’ শ্রেণির সঙ্গে ফ্যাতাডু, চোক্তার, মোগলাই, কালমন, ফোয়ারাদের সংঘাত তীব্র হতে থাকে। বসাই টুডু সগর্বে বলেছিল, “বাবু শিক্ষায় সান্তাল মুতে দেয়” (১১) আর, দাঁড়কাক বাবুদের শিক্ষাকে আক্রমণ করে- ভাষা, ইতিহাস, তথ্য দিয়ে। ‘কাঙাল মালসাট’-এ নেতা+পুলিশ+উচ্চবর্ণ আঁতাতের উল্লেখ থাকে;

সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক আচার্যের সঙ্গে পুলিশ কমিশনার জোয়ারদারের হৃদয়তা এবং শোষক উচ্চবর্গের সঙ্গে প্রশাসনের খাতির। পার্টির সঙ্গে প্রশাসনের ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসে দেওকী মিসিরের ‘কৌশল’ কখনও দেওকীকে সামন্তদের প্রিয় ক’রে তোলে, কখনও অন্য সংসদীয় দলের আস্থাভাজন ক’রে তোলে। আর, এই ‘কৌশল’ প্রমাণ করে যে, ‘পুলিশ ততক্ষণই ভাল, যতক্ষণ সে আমার পুলিশ!’ দেওকী মিসিরদের বারেবারে ‘প্রভু’ বদলানোর কৌশলে ‘সফট টার্গেট’ হয় বসাই টুডুরাই; “বসাইদের শতকরা নব্বইজনকে হয় ‘আর্মড এনকাউন্টার’ নয় ‘সার্চ অ্যান্ড ডেসট্রয়’ করিয়ে দিল” (১৩) আর, এই ‘করিয়ে দেওয়া’-র ক্ষমতা দেওকী বা জোয়ারদারদের হাতেই থাকে। রণজিৎ গুহর বিশ্লেষণে এরা দেশি প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মধ্যে ধনী কৃষক, অধুনা-ক্ষমতাহীন ভূস্বামীরাও আছেন, যাঁরা সর্বদা উচ্চবর্গের স্বার্থরক্ষার্থে কাজ করেন।¹⁴⁰ বসাই বা ফ্যাতারুদের শত্রুও তাই দেওকী মিসিররাই বনে যায়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে মুসলিম লিগের কার্যসিদ্ধির পরে তমিজরা খারিজযোগ্য (expendable) হয়ে যায়।

সাহিত্যের রাজনীতি ও ভাষা

ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসের কালস্থানিক অভিক্ষেপ আঠারো শতকের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আখ্যান স্পর্শ ক’রে ১৯৪০-র দশকের দেশভাগ-দাঙ্গা-পাকিস্তান রাষ্ট্রের আখ্যানে থিতু হয়। ইলিয়াস এই উপন্যাসটি লিখছেন ১৯৯৬ সালে; অর্থাৎ, উপন্যাসের মূল কুশীলবদের এবং সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে তাদের মিথস্ক্রিয়াকে প্রায় পাঁচ দশক পরে আখ্যানবদ্ধ করছেন। এই পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ও সাহিত্যসম্পর্কিত অভিঘাত ‘খোয়াবনামা’-য় থাকা স্বাভাবিক। উপন্যাসের ভাষাদ্বন্দ্ব নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের অবস্থান চিহ্নিত করার আগে মনে রাখা প্রয়োজন পূর্ব পাকিস্তান নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাষার রাজনীতি। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ১৯৪০-র দশক থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিপূরক ছিল। পাকিস্তানপ্রস্তাবের প্রত্যক্ষ

অনুপ্রেরণায় মুসলিম লিগের রাজনৈতিক দর্শনকে সাহিত্যে আত্মীভূত করতে কলকাতায় ও ঢাকায় দু'টি সংস্থা গড়ে ওঠে এবং 'মোহাম্মদী'-র মতো সাহিত্যপত্রিকা পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।¹⁴¹ ঐ সময়ে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের পরিসরে প্রগতিবাদী সাহিত্যের ধারা উত্থানশীল (emergent) এবং রোমান্টিক ও পশ্চাৎবাদী (regressive) সাহিত্যের বিরুদ্ধে তার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে প্রকট হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখকদের জোট সাহিত্যে রাজনৈতিক মাত্রা সংযোজন করছে; অন্যদিকে শ্রমজীবীর জীবন, নির্বিকার দৈনন্দিন যাপন এবং অতি-সাধারণ মধ্যবিত্তের নিয়তজীবন সাহিত্যের ভাষাকে প্রভাবিত করছে এবং সাহিত্যের ভাষা সেই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরক হয়ে উঠছে। এমত সময়ে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২)' ও 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪৩)' সাহিত্যরচনার কিছু নির্দেশিকা জারি করে। নিশ্চিতভাবেই বঙ্গীয় হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাহিত্যের ভাষাতেও সংস্কৃত ও হিন্দুপ্রবণভাষার ব্যবহার বর্জনীয় মনে করছিল তারা- এই ভাবনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য উন্মেষের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কায়কোবাদের মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিক 'মুসলিম বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনা' করেছিলেন ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম অধিবেশনে, সৈয়দ এমদাদ আলী তরুণ মুসলমান সাহিত্যিকদের নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় স্মরণে রাখতে বলেন- স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সদুদ্দেশ্যে হলেও ক্রমশঃ তা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাম্প্রদায়িকতার বয়ান খুঁজে পেতে থাকে।¹⁴² রেনেসাঁ সোসাইটির অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে উর্দু এবং ফারসি ভাষার প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ছিল এবং তাঁরা জোর দেন পুঁথি ও লোকসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দিয়েই পাকিস্তানবাদের রূপায়ণে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধারাকে নাকচ ক'রে আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত নতুন বাংলা ভাষায় সাহিত্যে রেনেসাঁ আনা সম্ভব, পুঁথি-সাহিত্য বা মুসলমানী বাংলা সাহিত্য নামকরণ ক'রে- এমন মতামত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সাহিত্যের হিন্দুয়ানিকে অস্বীকার করতে গিয়ে ইসলামি সুরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ধর্মীয় ভিত্তিকে সাহিত্যের ভিত্তি ক'রে তোলা পশ্চাৎবাদিতার নমুনা। এই ধর্মপ্রবণ পশ্চাৎবাদিতার নমুনা 'নওবাহার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও

পাওয়া যায়- কমিউনিজমকে রুখে দেওয়া তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করে।¹⁴³ ‘মাহে-নও’, ‘নওবাহার’ বা ‘মোহাম্মদী’ পত্রিকার নির্দেশমতো কিংবা পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশমতো বাংলা সাহিত্যের ইসলামিকরণের পদ্ধতিতে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে-অস্বীকৃত গ্রাম্য জীবনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে নিয়ে আসা, আবহমান ইসলামি ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ এবং হিন্দু-সাহিত্যিকদের রচনাভাষা ও রচনশৈলী থেকে বেরিয়ে নতুন ভাষার সন্ধান। কিন্তু এই প্রত্যেকটি নির্দেশের ভেতরে প্রকট ছিল ধর্মীয় সামন্ততান্ত্রিক পাঠ। সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রত্যাখ্যান করা নতুন সাহিত্যভাবনার জন্ম দিতে পারে, কিন্তু সেই ভাবনার ভিত্তি যদি হয় রাষ্ট্রের ধর্মীয়করণের লেজুড় হওয়া, তাহলে সেই ভাবনা পশ্চাৎবাদী ও প্রগতিবিমুখ হতে বাধ্য। গ্রামজীবনের নির্যাস সাহিত্যে আসা জরুরি, লোককথা ও আবহমান বাংলার সংস্কৃতিকে সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে আনা প্রয়োজনীয় এবং নিম্নবর্গের ভাষা দিয়ে উচ্চবর্গের সাহিত্যভাষাকে প্রত্যাঙ্গান জানানো জরুরি- কিন্তু এই সবগুলির মূল উদ্দেশ্য যদি হয় রাষ্ট্রের ধর্মীয় আধিপত্যের ভিত শক্ত করা এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রকল্পনার পুনর্প্রতিষ্ঠা, তাহলে তার শিল্পমূল্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা আধুনিকতার স্বাদ পেয়েছেন, প্রগতিবাদের স্বাদ পেয়েছেন এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করছেন। তাঁদের সামনে জোর ক’রে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্বের নামে ধর্মবাদী ভাষা-শৈলী উপস্থাপন করলে তাঁদের আধুনিক মননকে অবজ্ঞা করা হয়। সাহিত্যে ধর্মের ফতোয়া জারি করলে, তার রাজনৈতিক অভিঘাত সার্বিক সাহিত্যকে পশ্চাৎমুখী এবং যুগোপযোগী ক’রে তোলে।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৪৩-১৯৫১) ছিলো সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে প্রগতিবিমুখ, এবং শৈল্পিকভাবে অনাধুনিক ও অনুর্বর... বাংলা সাহিত্যে বিশেষ দশকের দ্বিতীয়াংশেই যে-আধুনিকতা সূচিত হয়ে গেছে, তা তাঁরা পুরোপুরি ভুলে থেকেছেন; তার বদলে তাঁরা

সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এমন এক সাহিত্য যা আধেয়তে মধ্যযুগীয় এবং আধারে
অমার্জিত-অসংস্কৃত” (আজাদ ১৯৯০, ১০)

এহেন ভাষাপ্রকল্পনায় সাহিত্যের মুক্তি সম্ভব ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তীতে বাংলাদেশের)
সাহিত্যের রাজনীতিতে এই পর্ব তাৎপর্যপূর্ণ এজন্যই যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বারা ও
কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকদের দ্বারা এই পর্বটি প্রত্যাহ্বায়িত (challenged) হয়েছে।
এই প্রতিক্রিয়াশীল ভাষাপ্রস্তাব তথা সাহিত্যপ্রস্তাবের বিরোধিতা ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের
ভিত্তি প্রস্তুত করেছে। পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র নির্মাণের যাত্রাপথে অন্যতম
উপাদান হয়ে থেকেছে। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যদর্শন চাপিয়ে দেওয়ার যুগে দু’টি প্রতিস্পর্ধী
উপন্যাস ‘লাল সালা (১৯৪৮)’ এবং ‘সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫)’¹⁴⁴। পাকিস্তানবাদী নব্যধারার
উপন্যাস রচনার একটি শর্ত মেনে তথা গ্রামজীবনের অমার্জিত অপরিশীলিত জীবনযাপন নিয়ে
আখ্যান রচিত হলেও উক্ত দু’টি উপন্যাসই ধর্মবাদী প্রকল্পকে অস্বীকার করে। পাকিস্তানের
ইসলামি সমাজের সমালোচনা, মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তীব্র শ্লেষ এবং পাকিস্তানের আর্থ-
সামাজিক পরিসরের ব্যর্থতা এই উপন্যাসগুলির উপজীব্য। ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’-র সূচনায় ভাতের
লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার কথা, শহর থেকে আশাহত হয়ে গ্রামীণ জীবনে বাধ্যত প্রত্যাবর্তনের
কথা থাকে।¹⁴⁵ জয়গুণের জীবনযুদ্ধ পাকিস্তানবাদী রাজনীতির তোয়াক্কা করে না বরং প্রগতিবাদী
সাহিত্যের সূত্রগুলি প্রকট হতে থাকে। রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অসুখ তুলে ধরতে
পাকিস্তানবাদী ভাষানির্দেশকে আমল না দিয়ে গ্রামীণ বাংলার দৈনন্দিন কথ্যভাষাকে প্রাধান্য
দিয়েছেন আবু ইসহাক। সেই ভাষা মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক কলকাত্তাইয়া উপন্যাসের ভাষার মতো
শীলিত-মার্জিত না কিন্তু পাকিস্তানবাদ নির্দেশিত মধ্যযুগীয় ইসলামের ঐতিহ্যধারী আরবি-উর্দুর
প্রতিনিধিত্বকারীও না। জয়গুণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণের চেতনায়
ধর্মীয় অনুশাসন তুচ্ছ হয়ে যায়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে কুলসুমের ক্ষিধেবর্ণনার দৃশ্যের সঙ্গে
জয়গুণের পরিবারের ক্ষিধেদৃশ্যের আশ্চর্য মিল- এর সম্ভাব্য দু’টি কারণ- প্রায় একই কালপর্বে

আখ্যানপট রচিত হচ্ছে এবং গ্রামীণ নিম্নবর্গের নিত্যদিনের ছবি দু'টি স্থানেই এক। প্যাচপ্যাচে পান্তাভাত পোড়া মরিচ দিয়ে মাখা; মায়মুনের পাতে সবটুকু পান্তার জল ঢেলে দিয়ে জয়গুন মুখে পান দিয়ে ক্ষিধে ভুলতে চায়- কুলসুম যেভাবে তমিজের বাপের খাওয়ার পর ভাতের শূন্য হাঁড়ি নিয়ে ক্ষিধে ভোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করে, তার সঙ্গে মিলে যায় এই দৃশ্য।¹⁴⁶ 'লাল সালু' উপন্যাসেও ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে শ্লেষ করে পড়ে। মজিদ ধর্মকে রোজগারের উপকরণ ক'রে তোলে। সে ধর্মের নামে নিম্নবর্গীয় গ্রামবাসীদের থেকে আর্থ-সামাজিক ফায়দা আদায় করে। পাকিস্তানবাদী নেতার গুজ্জল্য না থাকলেও, ধর্মীয় ভিত্তিকে ব্যবহার ক'রে মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করায় পাকিস্তানবাদী নেতার থেকে মজিদের ভূমিকা কম না। এই উপন্যাসে তাহের-কাদেরের বাপ নামক এক কুশীলবের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, যার নিজস্ব নাম আখ্যানে অনুপস্থিত। 'খোয়াবনামা'-র তমিজের বাপের মতোই নিজস্ব-নামহীন সে। মুসলিম লিগের ঘোষিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেশভাগের প্রাক্কালে মুসলমান নিম্নবর্গের সামনে উপস্থাপনের সময় ভাষার রাজনীতি লক্ষ্যণীয় 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে। উচ্চবর্গীয় মুসলমানদের পাকিস্তান রাষ্ট্র আদায়ের আকাঙ্ক্ষা যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তা নিম্নবর্গের মানুষের বোধের বাইরে থাকে। উকিল সাদেক আলি পাকিস্তান কায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় জেহাদের কথা বলতে গিয়ে বাংলার সঙ্গে ইংরাজি মিশিয়ে ফেলেন- সৈয়দ আমির আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম' তাঁর কণ্ঠস্থ। "ইসলামের বিজয়গাথা প্রচার ও সেই সঙ্গে রাজভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায়" রাখার সেই বক্তব্য 'শ্রোতারা তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না' একথাও কথক জানিয়ে দেন।¹⁴⁷ সৈয়দ আহমেদ আলি আশরাফ- তাঁর অভিজাত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপস্থিতি নিম্নবর্গীয় কৃষকদের 'দেখবার' বিষয় হয়ে থাকে। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে ময়মনসিংহের গফরগাঁয়ের জেলাভিত্তিক সম্মেলনে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লিগের সম্পাদক লিয়াকত আলি খান উপস্থিত এবং অন্যান্য উচ্চবর্গীয় উচ্চশিক্ষিত আশরাফরা উপস্থিত ছিলেন। আখ্যানের সৈয়দ আহমদ আলির সঙ্গে বাস্তবের 'নবাবজাদা'-র সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।¹⁴⁸ সৈয়দ আহমদ আলির পাকিস্তানপন্থী বক্তব্য 'বাঁকা বাংলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজির মিশেলে'

পরিবেশিত হলে তা শ্রোতাদের বোধগম্যতা ছুঁতে পারে না। ইলিয়াস পাকিস্তানবাদী ভাষাপ্রকল্পের সঙ্গে নিম্নবর্ণী কৃষিজীবীদের দূরত্ব বোঝাতে শ্লোগানমুহূর্তের উল্লেখ করেন। আরবি ভাষায় ধর্মীয় শ্লোগানের যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে পারে না সভায় উপস্থিত মুসলমান কৃষকেরা। (১৫৬) কেরামতের কৃষকদরদী গানের সহজ ভাষা তাদের বোধগম্য হয় অনায়াসে। কেরামত তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গান লেখে। কিন্তু, মুসলমান উচ্চবর্ণের বয়ানে তেভাগা ক্ষতিকারক¹⁴⁹- সেইসব উচ্চবর্ণ, উচ্চ সামাজিক অবস্থানের মধ্যে উকিল, ডাক্তার ও জোতদারদের মতো উচ্চ সামাজিক-অবস্থানের লোকেরা রয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে, ‘নওবাহার’ পত্রিকার অন্যতম ঘোষিত উদ্দেশ্য হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কমিউনিজমকে রুখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে মুসলমান ভদ্রলোকদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে তেভাগা আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ড। মুসলিম লিগের নিচুতলার বহু কর্মী তেভাগা আন্দোলনে এবং জমির ধান দখলে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁদের দুশ্চিন্তা বেড়েছিল। তিন হাজার বিঘা জমির মালিক¹⁵⁰ মজিদ সরকারের আতঙ্কের কারণ তাঁর পার্টির [মুসলিম লিগ] কর্মীরা কমিউনিস্টদের কথায় উৎসাহিত হয়ে জমির ধান দখল করেছে এবং তাঁর পরিচিত শ্রমজীবীরা বর্গাদারকে দিয়ে তেভাগা করাতে চাইছে। বাকিদের তুলনায় উদারমনা ইসমাইল হোসেনের ভাবিত হয় ‘কমিউনিস্ট পার্টি’ তার দলের ভাল ভাল কর্মীকে দিয়ে তেভাগার প্রচার করিয়ে নেওয়ায়। তেভাগা করিয়ে জোতদারের জমি দখলের ফলে মুসলিম লিগের উচ্চবর্ণীয় অংশের মধ্যে (কারণ তারাই মূল ভোটদাতা) বিভেদ তৈরি হলে তার রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ হবে না তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করা যাবে না। (১২৩) সাদেক উকিল ও শামসুদ্দিন ডাক্তারের আধিপত্যমূলক স্বরে ‘ইসলামিক ইডিওলজি ভালো করে বোঝাতে হবে’ (১২৪) এমন বাক্য শোনা যায়; এর অন্তর্নিহিত অর্থ কমিউনিস্ট মতাদর্শকে এবং শ্রেণিচেতনাকে নিষ্ক্রিয় করতে ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আদতে উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক মুসলমানদের স্বার্থ এবং সেই স্বার্থের জন্য নিম্নবর্ণীয় মুসলমানদের ব্যবহার ক’রে নেওয়া হয়েছে- ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যান সেদিকেই ইঙ্গিত করে। নিম্নবর্ণীয়দের সম্মতি আদায় করতে এবং

তাদের চেতনার ওপর নিজেদের শ্রেণির আধিপত্য চাপিয়ে দিতে ধর্মকে হাতিয়ার করে উচ্চবর্গ-বহুস্তরীয় ভাষার দ্বন্দ্ব সেই প্রতর্ক আখ্যানে প্রতিষ্ঠা পায়। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতর্ক আত্মস্থ করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘খোয়াবনামা’-র আখ্যানের ভাষা বয়ন করেছেন- সাদেক উকিল, শামসুদ্দিন ডাক্তার, মজিদ জোতদার ও ইসমাইলের সংলাপে মুসলিম লিগের প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার-মধ্যবিত্ত জোট বনাম প্রগতিশীল অংশের দ্বন্দ্বের দ্বিবাচনিকতা লক্ষ্যণীয়। বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণির সংগঠন মুসলিম লিগের একটি অংশের প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যা মজিদ সরকার, সাদেক উকিল, আব্দুল কাদেরদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।¹⁵¹ অজয় দত্ত এবং মিনতির রাজনৈতিক ভাষার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবী-মাঝিদের রাজনৈতিক বোধের ফারাক থেকে যায়। কমিউনিস্ট পার্টিকর্মী অজয় দত্ত ও মিনতি শহর থেকে আসা ভদ্রলোক। গ্রামীণ সংস্কার ও রাজনৈতিক পাঠ তাদের কম, তাই ইসমাইল হোসেন তাদের ভরসা। ইসমাইল শহুরে সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে- সে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও সেতু হয়ে দাঁড়ায়- ভদ্রলোক মুসলমান ও নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মুসলমানের মধ্যে সেতু রক্ষা ক’রে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবায়িত করতে চায়। অজয় দত্ত এবং মিনতি যখন এসেছিল, তখন হিন্দু বনাম মুসলিম দাঙ্গার পরিবেশ। কামারপাড়া আর মাঝিপাড়ার উত্তেজনা চরমে। অজয় দত্তের বক্তৃতার ভাষার নির্যাস- ১) ইসমাইলের রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির মতপার্থক্য রয়েছে, ২) হিন্দু ও মুসলমান চাষী উভয়েই জোতদারদের দ্বারা শোষিত বলে একসাথে তেভাগার লড়াই লড়ছে এবং ৩) গান্ধী-জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৩০-৩২) কিন্তু, ধর্মীয় প্রতিহিংসায় একাধারে উত্তেজিত ও শোকার্ত কামারপাড়া বা মাঝিপাড়ায় সম্প্রীতির ভাষা প্রভাব ফেলে না। কেরামতে আলির তেভাগা-প্রভাবিত গানের ভাষাতে কৃষকদের জোটের কথা এবং গান্ধী-জিন্নার মিলনের কথা উঠে আসে। অজয়ের ভাষণ বা কেরামতের গানে পূরণচাঁদ জোশীর স্বর অবিকল- কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতি অনুযায়ী কংগ্রেস-লিগের নেতৃত্ব স্বীকার করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে

জোরদার করা এবং লিগ-কংগ্রেসের সেতুবন্ধন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনে জোর দেওয়া ছিল মূল উদ্দেশ্য।¹⁵² অজয় দত্ত আর্থ-রাজনৈতিক সংকটের কথা মনে করিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের কথা বললেও, “সবাই চুপচাপ শোনে, নিজেরা কোনো কথাই বলে না। যুধিষ্ঠিরের ভগ্নীপতির চোখের আগুন নেভে না, সে বসে থাকে একটু দূরে” (২৩৩) এর পরের অধ্যায়েই (৩৭তম অধ্যায়) ইলিয়াস লেখেন ধর্মীয় দ্বেষের ভাষা কত সহজে সম্প্রীতির ভাষাকে হারিয়ে দেয়। অজয় দত্ত যে উচ্চশ্রেণির শোষণের দিকে আঙুল তুলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের দাবি করেছিল, সেই উচ্চশ্রেণির লোকেরাই মুসলিমবিদ্বেষের ভাষা দিয়ে নিম্নবর্গের চেতনাকে প্রভাবিত করে। মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু ভাসা-ভাসা ধারণা ও শব্দবিন্যাস ক্রমশঃ ঘণার ভাষানির্মাণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।¹⁵³ কেষ্ট পাল, যুধিষ্ঠির কামারদের ভাষার প্রতিরোধ সেই ঘণানির্মাণের সামনে অসহায়।

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র বাঁধ উদ্বোধনী সভাতেও ভিন্ন ভাষান্তরের চিত্র প্রকট হয়। ‘মিছিলপর্ব’-তে বাঁধের উদ্বোধনী সমাবেশে কামতাপুরী নেতা পঞ্চগনন মল্লিকের বক্তৃতাতে প্রাধান্য পায় ভারতীয় হিন্দুদর্শন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আস্থা এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি অনাস্থা। তাঁর বক্তব্য শুরু হয় গীতার শ্লোক দিয়ে এবং শেষ হয় কামতাপুর অঙ্গরাজ্য গঠনের দাবিতে। নকশাল-দমনকারী জোতদার সম্পৎ রায়ের ভাষণে ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক যুক্তির মিশেল; তাঁর ভাষণেও ভদ্রলোকীয় ভাষাকাঠামো বজায় থাকে। উত্তরখণ্ডের মুক্তির দাবিতে সরব অধ্যাপকের ভাষায় বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস অধ্যাপনাসুলভ ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়। কিন্তু এইসমস্ত পদধারী, সুবেশ, ভদ্রলোক অতিথিদের ভাষণ সভায় উপস্থিত কৃষিজীবী-শ্রমজীবীদের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারে না। তাদের ভাষার থেকে অনেক অমার্জিত ও অপরিশীলিত ভাষায় বক্তব্য রেখে ভাষাগত ব্যবধান মুছে দিতে পারে গয়ানাথ জোতদার। শুদ্ধ বাংলা, সংস্কৃতের প্রয়োগ এড়িয়ে রাজবংশী উচ্চারণে সহজ-সরল উপমায় এবং মেঠো বাচনভঙ্গিতে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক শ্রোতাদের হাততালি আদায় ক’রে নেয় গয়ানাথ।¹⁵⁴ “এলায় তিস্তা ব্যারেজের তানে ডাঙা

জমি নদীর ভিতর টানি নিবার ধরিছে... হামার তিস্তাত্ যে কুনোকালে ব্যারেজ-বুরেজ না আছিল্, তাহাতে ধান চাষ হইল্ কি না হইল্... মুই এইসব ব্যারেজ-বুরেজ না চাও” (৩৯২) গয়ানাথের ব্যারেজ না চাওয়ার স্বার্থ তিস্তাপারের অতিসাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে মেলে না; গয়ানাথ ভয় পায় তার জোতদারির পরিসর সঙ্কুচিত হবে বলে এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি কমে যাবে বলে।¹⁵⁵ কিন্তু, তার মতো নিপীড়ক দখলদারের ভাষা ওই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের নিত্যকার ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি, ফলে নিজের স্বার্থগত অভিসন্ধি প্রতিষ্ঠা ক’রে ফেলে সে। বাকি ভদ্রলোক বক্তাদের ভাষণ ‘বানানো ও কঠিন’ বলে উল্লেখ করলেও, আখ্যানকথক প্রাক্তন ‘নাকশালিয়া ভদ্রলোক’-এর মতাদর্শজারিত ভাষা স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। অন্যান্য ভদ্রলোক বক্তারা যে স্বার্থান্বেষী ভাষায় তিস্তাবাঁধের বিরোধিতা করেন, নাকশালিয়ার ভাষা তার থেকে আলাদা। কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার উদ্দেশে ভাষণ দেয় সে, তার বক্তব্যে রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতির জন্য কৃষকদের বিক্ষুব্ধ ক’রে তোলার প্রচেষ্টা থাকে। তিস্তাপারে বাঁধ হলে ভূমিহীন কৃষকদের ক্ষতি হবে, বহু মানুষ বিস্থাপিত হবে এবং কৃষক-শ্রমিক সম্পর্ক বদলে যাবে- নাকশালিয়া ভদ্রলোকের ভাষণে অদূরভবিষ্যতের এমন সত্য উপস্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনীতিতে প্রতিটা বাঁধ অসংখ্য আদিবাসী ও কৃষিজীবীর সর্বনাশের কারণ, তিস্তাবাঁধ তৈরি হলে তার অন্যথা হবে না।¹⁵⁶ সহজ বাংলায় বলা এত সচেতন রাজনীতির ভাষাও শ্রোতাদের বোধগম্যতায় প্রবেশ করতে পারে না, কৃষকস্বার্থবিরোধী গয়ানাথের মেঠো ভাষা সেখানে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিসরের চিত্র ভাষাগত স্তরভেদের মধ্যে দিয়ে প্রতীয়মান হয়।

‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র আখ্যানপদ্ধতিতে এমন ভাষাগত ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রতীয়মান হয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে। একইদিনে কংগ্রেসের মিছিল এবং সিপিআই ও সিপিআইএমের মিছিল নিম্নবর্গের কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত ক’রে সদরাভিমুখে যাত্রা করবে- সেই মিছিল সংগঠিত ও সজ্জিত করার প্রস্তুতিপর্ব এই অধ্যায়ের মূল বিষয়। মিছিলগুলি যতটা না রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা সংগঠিত, তার থেকে অনেক বেশি ‘ব্যক্তি’-র আনুগত্যের কাছে

সমর্পিত। ‘বীরেন রায়ের মিছিল’, ‘বাহেবাবুর মিছিল’, ‘পদ্মনাথের মিছিল’, ‘তমালবাবুর মিছিল’ ইত্যাদি পরিচয়ে মিছিলে আগত মানুষদের পরিচয় বাঁধা পড়ে যায়। নিম্নবর্ণীয় মানুষগুলির কাছে বাহেবাবু জোতদার হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকসম (কথক ‘ধর্মবাপা’ শব্দটি ব্যবহার করেছে), কারণ আর্থ-সামাজিক দাসত্বে তারা বাহেবাবুর জোতদারি ব্যবস্থায় বাঁধা পড়ে আছে। সংসদীয় বামপন্থী পার্টি-সংগঠক বিশু বাহেবাবুর রাজনৈতিক বিরোধী হলেও সামাজিক সৌজন্যে তাঁকে মান্য করতে বাধ্য- কথকের বয়ানে তা প্রকাশ পায়¹⁵⁷। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র বক্তৃতামঞ্চে ভদ্রলোক শিক্ষিত বাবুদের, বিশেষতঃ শহরের বাবুদের যেমন কদর করে স্থানীয় মানুষ, তেমনি ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-তে নেংগু বলে, “তোমরালা শহরের মানষি আসিছেন বাহাদুরত, আগত ত তোমাক বসা দিবার নাগে” (রায় ১৯৮৯, ১৩৭) বাহেবাবু জোতদার হয়েও সম্মম পায় ক্ষমতার ভাষায়, নেংগু তাঁর বশংবদ হলেও নেংগুর ভাষা সবচেয়ে ভাল বোঝে স্থানীয় কৃষকেরা, কিন্তু বিশু সেই কৃষকদের জন্যে লড়তে চাইলেও তার ভাষা পৌঁছতে পারে না কৃষকদের কাছে। বিশুর সঙ্গে চ্যারকেটু-খেতখেতুর অনেক অমিল কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মিল কয়েকটি আছে। খেতখেতু স্থানীয় কৃষিজমি ও চাষাবাদের খুঁটিনাটি সবচেয়ে গভীরভাবে জানা সত্ত্বেও তার আর্থ-সামাজিক স্থিতি সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে; বিশু বাহাদুর অঞ্চলের ও শুকরাপাড়ার মানুষদের দুঃখ-সুখ-সংগ্রাম সবচেয়ে গভীরে জানা সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক স্থিতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতাকাঠামোর নির্ভরযোগ্য উপাদান তারা, কিন্তু তাদেরই সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞাযোগ্য ভাবে সেই ক্ষমতাকাঠামো। স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমের চোরালড়াই চলে গোপাল কুণ্ডু, বিশু ও তমালের মধ্যে। এই চোরালড়াইয়ের ভাষা ১৯৭০ দশকে বাংলার রাজনীতির যথার্থ প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা, কংগ্রেসের ক্ষমতা পুনর্দখল, সোভিয়েত-আমেরিকার দ্বন্দ্ব আলোড়িত সিপিআই-কংগ্রেসের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামো মিলিতভাবে আখ্যানের রাজনৈতিক ভাষা নির্মাণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক শব্দবন্ধ, সংসদীয় পার্টিগুলির পারস্পরিক অল্পমধুর সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত বন্ধুতা-শত্রুতা তাদের সংলাপের কাঠামো নির্মাণ করে।¹⁵⁸ রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সামাজিক অবস্থানের

(social status) উচ্চ-নিচ ভেদ বোঝা যায় সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে- পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে ভাষা যেখানে কার্যকরী, ‘সম্বোধন’ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- কথক সেই উপাদানের স্তরভেদ লক্ষ্য করান পাঠককে-

গোপাল কুণ্ডু আর তমাল শহরের লোক। সেই সুবাদে গোপাল কুণ্ডু হয়তো তমালকে ‘তুমি’ বলে। আবার তেমন সুবাদেই বাহেবাবু গোপাল কুণ্ডুকে ‘তুমি’ বলেন। বিশুর বাড়ি কলোনিতে। সে তাই এদের সঙ্গে বসতে চায় না। এদের সঙ্গে তার সম্বোধনটা ঠিক হয় না, সম্বন্ধটাও ঠিক হয় না। গোপাল কুণ্ডু বিশুকে ‘তুমি’ বলে, বিশু গোপাল কুণ্ডুকে ‘দাদা’ বলে কিন্তু, তমাল বিশুকে কোনদিনই ‘দাদা’ বলবে না, আর তমালকে বিশু ‘তমালবাবু’ বলেই ডেকে যাবে। (রায় ১৯৮৯, ১৪১)

এই ভাষাগত দ্বন্দ্বের মধ্যে বৃদ্ধ ক্ষেতমজুর দেবেনকে হাজির করেন লেখক। কথক জানিয়ে দেয় যে, ফোকলা, বৃদ্ধ, ফোলা-মুখ, তোতলা দেবেনের ভাষা কেউ বোঝে না; বিশু তার উচ্চারণ সামান্য বোঝে। বিশু-তমাল-বাহেবাবুদের কাছে দেবেনের স্বর গুরুত্বহীন। অথচ দেবেন-বুড়ার আধোভাঙ্গা অবোধ্য স্বরের মধ্যে আঞ্চলিক রাজনীতির সমীকরণগুলি বোঝার সূত্র পেয়ে যায় কথক। কথকের স্বর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে দেবেনের হাসির সঙ্গে প্রাচীন বাউলের মুক্ত, বিস্তীর্ণ, নীরব হাসির তুলনায়- দেবেনের সরল বোধে প্রতিফলিত সংসদীয় দলগুলির ছদ্মরূপ উন্মোচনে।¹⁵⁹

‘খোয়াবনামা’-র বৈকুণ্ঠ বৈরাগী উচ্চবর্গের ‘ভদ্রলোক’ ছিল না, কিন্তু দু’টি বিষয়ে সে সচেতন ছিল- (১) ভবানী সন্ন্যাসী ও ফকিরের মিথের লৌকিকতায় এবং (২) নিজের হিন্দু ধর্মসত্তায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে বৈকুণ্ঠ ব্রাত্য হয়ে যায়, তার বিশ্বাস ব্রাত্য হয়ে যায় এবং তার অস্তিত্বের সবটুকু জবরদস্তি গ্রাস ক’রে ফেলতে চায় উগ্র ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদীরা। বৈকুণ্ঠের এই অসহায়তা কি তাকে বাস্তবের যোগেন মণ্ডলের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ক’রে তোলে? ১৯৪৬-র ১৬ই আগস্ট পরবর্তী দাঙ্গাগুলিতে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বিধ্বংসী ফল

হয়েছিল- মুসলমান নিম্নবিত্তের সঙ্গে হিন্দু নিম্নবর্ণের সম্পর্কের অস্বাভাবিক অবনতি হয়েছিল- ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির আদলে দলিত নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমান নিম্নবর্ণের সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম সমীকরণ স্পষ্ট হতে থাকে।¹⁶⁰ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ‘জাগরণ’ কাগজে বিবৃতি দেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ে দলিতরা কিছু অর্জন করতে পারবেন না এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কিছুমাত্র বদলাবে না। কিন্তু, তাঁর বহুজনবাদ ব্যর্থ হয়; প্রাণঘাতী দাঙ্গায় নিম্নবর্ণীয় মুসলমান ও দলিতদের অনেকে প্রাণ-সম্পত্তি খোয়ান।¹⁶¹ বৈকুণ্ঠ বৈরাগী দুই সম্প্রদায়কে বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। বৈকুণ্ঠ একদিকে আফসার মাঝির দাঙ্গা-পরবর্তী বালামুসিবতের সমব্যথী হয়, অন্যদিকে কামারপাড়ার দাঙ্গাপ্রবণ মানুষদের আটকাতে গিয়ে হাতের¹⁶² আঙুল খোয়ায়। কিন্তু, শেষাবধি ব্যর্থ হয় সেতুবন্ধনে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগেন মণ্ডল এক ‘রাজনৈতিক বাজি’ ছিলেন, ক্রমশঃ তাঁর রাজনৈতিক স্থান সঙ্কুচিত হতে থাকে। “যোগেন নিঃসংশয় জানে মুসলিম লিগও আর্থ, তারও শূদ্র দরকার” (রায় ২০১০, ১০৫৯) মূলধারার মুসলমানদের জন্য দলিত ও নিম্নবর্ণ হিন্দুরা ‘অপর’ হয়ে গেলেন, সংখ্যালঘু হিসেবে প্রতিনিয়ত তাঁদের অবস্থান সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছিল। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে কালাম মাঝি যেভাবে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে আচরণ করে, তাতেও এই কথাই প্রমাণিত হয়। বৈকুণ্ঠকে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত হতে হয়। ধর্মোন্মাদ শুক্লুর আলিরা হিন্দুদের বাড়ি জবরদখল ক’রে নিতে থাকে। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে অনিল সান্যাল, সতীশ মুজারদের ভাষার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক ভাষ্যের তফাৎ নেই। শ্যামাপ্রসাদ যে ভাষায় হিন্দু সংস্কৃতির বিপন্নতার কথা উল্লেখ করেন¹⁶³, সেই একই ভাষায় নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বৈকুণ্ঠ-দশরথ-কেষ্টকে মুসলমান আধিপত্যে হিন্দুদের সংকটের কথা বলেন। যোগেন মণ্ডলের মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ এবং পাকিস্তান ত্যাগের সঙ্গে তুলনীয় বৈকুণ্ঠের মৃত্যু। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে বৈকুণ্ঠের ধরে রাখা ফকির-সন্ন্যাসী মিথের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছিল। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের আধিপত্যের প্রতিস্পর্ধায় যেটুকু মুখফেরতা আখ্যান তুলে ধরত বৈকুণ্ঠ, কেষ্ট পাল, দশরথ কামাররা সেইসবের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছিল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগপত্রের ভাষায় সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার

ইঙ্গিত ছিল। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে উল্লেখযোগ্য অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল- হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, সরকারি মদতে হিন্দুদের নির্মূলীকরণ, মুসলমানদের সামাজিক স্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি।¹⁶⁴ দেবেশ রায়ের জীবনীমূলক তথ্যায়িত-উপন্যাসের আঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হয় যোগেন মণ্ডল নভেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে। প্রোটাগনিস্ট নভেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলে, যে শূন্যতা তৈরি হয়, সেই শূন্যতার পরিসরে রাজনৈতিক পরিসরকে ধরতে চেয়েছে ইমপ্লায়েড অথর্। যোগেনের পদত্যাগপত্রের অভিমানী ও ক্ষুব্ধ স্বর এই অংশে যোগেনের আত্মবয়ানে বিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।¹⁶⁵ পদত্যাগপত্রের সীমাবদ্ধতা ছেড়ে উপন্যাসে তা আরও বিস্তারিত। যোগেন মণ্ডলের পাকিস্তান ত্যাগের পরে পূর্ববঙ্গে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের ফেডারেশনের সাংগঠনিক অবলুপ্তি ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে আওয়ামি লিগ দাবি তোলে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক পরিষদে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের প্রভাব কমানো।¹⁶⁶ বৈকুণ্ঠর মৃত্যু ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানে এক অতীতদ্রোহের সঙ্গে শেষ সুতোটির ছেদ ঘটায়। যোগেনের জন্মভূমিত্যাগের যন্ত্রণা এবং বৈকুণ্ঠের জন্মভূমিতে বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্যে চেতনাগত মিল রয়েছে। যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক সংকট ‘বরিশালের যোগেন মণ্ডল’ উপন্যাসে যোগেনের পাকিস্তানত্যাগের মুহূর্তে নতুন মাত্রা পায়- যোগেন প্রচুর রিলিফ ক্যাম্প দেখতে পায়। উদ্বাস্ত শরণার্থীদের হিন্দু-মুসলমান পরিচয় খুঁজতে গিয়ে সংশয়াব্বিত হয়ে পড়েন যোগেন।¹⁶⁷ শূদ্র তথা নিম্নবর্ণ হিন্দুরা উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের নিপীড়নের শিকার। নিম্নবর্ণীয় মুসলমানেরাও তাঁদেরই মতো নিপীড়িত ক্ষতিগ্রস্ত- যোগেনের এই উপলব্ধি ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানের বৈকুণ্ঠ, তমিজ, হরমতুল্লাদের উপলব্ধির সঙ্গে অভিন্ন। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গুরুত্ব ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রতীয়মান হয়। আমজাদিয়া হোটেলে আলতাফ-আনোয়ার-ওসমান প্রভৃতি ভদ্রলোক মুসলমানের আড্ডায় জাতীয়তাবাদ বনাম কমিউনিজমের প্রতর্ক উঠে আসে। মধ্যবিত্তের অধিকাররক্ষা, ভাষার সম্মানরক্ষা, পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ থেকে জাতীয় মুক্তির দাবি প্রাধান্য পায় আলতাফ-ফরিদদের বক্তব্যে। অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং দেশের বৃহত্তর অংশ

তথা শ্রমজীবী/কৃষিজীবীদের মুক্তির দাবিতে সরব হয় আনোয়ার-ইফতিখাররা।¹⁶⁸ ‘স্বাধীনতা’ এবং ‘ভোটিং রাইটস’ দু’টি তাৎপর্যপূর্ণ চাবি-শব্দ হয়ে ওঠে। প্রায় দু-দশক আগে যে ধর্মভিত্তিক প্রকল্পনা থেকে ‘পাকিস্তানবাদী রাজনীতি’ সূচিত হচ্ছে, ১৯৬৯ সালের গণবিক্ষোভের সময় তা আরও বেশি অচল হয়ে পড়তে থাকে। ধর্মীয় রাষ্ট্রের দাবির থেকেও জাতির আর্থ-সাংস্কৃতিক মুক্তির দাবি জোরালো হয়ে উঠছে উক্ত ভদ্রলোক পরিসরে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রহরণ ও শোষণের অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাসমস্যাকে চিহ্নিত করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই প্রতিনিধিরা। “উর্দুভাষী ইফতিখারের যে কোনো কথার জবাব দেওয়ার সময় আলতাফ একটু কঠিন বাংলা ব্যবহার করে” (ইলিয়াস ২০১৫, ৩১) পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য ও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ অতিসক্রিয় ছিলেন, কিন্তু আলতাফ-ইফতিখার-আনোয়ারদের চেতনা তাদের প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যান আরও জোরদার হয় আমজাদিয়া হোটেলে ছাত্র-কিশোরদের মিছিলের একটা অংশ ঢুকে পড়লে। ইলিয়াস এই দৃশ্যে ছাত্র-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণা নৈরাজ্যপ্রবণতা দেখিয়েছেন- সুসজ্জিত আমজাদিয়া হোটেলের বিন্যাস তাতে তছনছ হয়ে গেছিল। কিন্তু, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৬৯-৭১ পর্যায়ে ছাত্র-কিশোরদের গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাররক্ষার লড়াইয়ে তাঁদের সোচ্চার অবদান সবচেয়ে বেশি।¹⁶⁹ ওই ছাত্র-কিশোরদের আমজাদিয়া হোটেলে ঢুকলে ভদ্রলোকীয় ভাষার বয়ানে আঘাত লাগে- স্বাধীনতার সঙ্গে ভোটের অধিকার নাকি আর্থ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কোনটা বেশি মানানসই সেই প্রতর্ককে ভাংচুর ক’রে “ভাগ্যে হালা চুতমারানির [আইয়ুব খান] ছবি ভাইঙ্গা ফালাও। কুত্তার বাচ্চায়ে লাখি মাইরা ভাঙ” (৩৩) প্রতর্ক জেগে ওঠে। ‘আইয়ুবের দালালি’, ‘জ্বালাইয়া দাও’, ‘খানকির বাচ্চা’ শব্দগুলি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়- আনোয়ার-আলতাফ-ওসমানদের ক্ষোভের ভাষার থেকে অনেক বেশি ক্ষুদ্র আক্রমণাত্মক ভাষা তাদের। ওসমান নিজের মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোক অবস্থান থেকে আলতাফ ও ফরিদের যুক্তিতে সায় দিয়েছিল- কিন্তু সেই ওসমানই ছাত্র-কিশোরদের নৈরাজ্যবাদী বিক্ষোভ-জ্ঞোপানে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘দালালের রেস্টুরেন্ট’ জ্বালিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত দেয় (৩৪)।

ওসমানের চেতনা ওই ভাষাবদলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হতে থাকে। ছাত্র-কিশোররা আইয়ুব খানের ছবি নামিয়ে যে হিংস্রতায় তা ভাঙে এবং জ্বালিয়ে দিতে চায়, সেই একই শরীরী ভাষা প্রত্যক্ষ করা যায় যখন সে দৃষ্টিবিভ্রমে আইয়ুব খানকে জ্বলতে দেখে।¹⁷⁰ আইয়ুব খানের বইপত্র, মঞ্চ এবং আইয়ুব খানকে শারীরিক ভাবে পুড়তে দেখা তার মনোবাঞ্ছাগত ভাবনার প্রতিফলন। আখ্যানের শুরুতে ছাত্রদের আগুন জ্বালার স্লোগান ওসমানকে প্রভাবিত করেছিল- ওসমানের মনোবিকলনের পর্যায়ে সেই ছাত্রদের ওপরেই আগুন জ্বালার ভার ব্যস্ত করে ওসমান।¹⁷¹ ওসমানের ভাষায় তখন তাৎপর্যপূর্ণ বদল ঘটে গেছে। ছাত্রদের সংলাপে জাতীয়তাবাদী প্রচারধারা জোরদার হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানবাদী তত্ত্ব রাজনীতিসহ সাংস্কৃতিক পরিসরেও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। ওসমানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে মনস্তাত্ত্বিক যৌন-বিশৃঙ্খলা, প্যারানয়েড স্কিজোফ্রেনিয়া, আত্মমুগ্ধ (নার্সিসিস্ট) প্রবণতা লক্ষ্য করছেন শহীদ ইকবাল।¹⁷² আত্মমুগ্ধ, বিবরবাসী ওসমান ক্রমশঃ নিশ্চয়তা, স্থিতি হারিয়ে ফেলে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। ওসমানের মনোবিকলন সম্বন্ধে শহীদ ইকবালের পর্যবেক্ষণ যথার্থ; কিন্তু ওসমানের শরীরী ভাষা ও মৌখিক ভাষার বদলে এই মানসিক অনিশ্চয়তা গুরুত্বপূর্ণ। কার্ফুর রাতে মিলিটারির গুলির শব্দ এবং জনতার বিক্ষিপ্ত মিছিলে শওকত, মকবুল হোসেন, রঞ্জুরা যখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন ওসমানের ভাষায় কার্ফু অগ্রাহ্য ক’রে দ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঘোষ উচ্চারণ (২৪১-৪২)। ওসমানের লাফানোর ভঙ্গিতে রঞ্জু, শওকতরা সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ে নাচের ভঙ্গি খুঁজে পেয়ে। কিন্তু স্বয়ং কথক ওসমানের লাফানোর ভঙ্গিতে তাল ও লয় চিহ্নিত করতে পারেন।¹⁷³ এই তাল-লয় মিলিয়ে পা-ফেলা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণলব্ধ পদক্ষেপ- ওসমান এতক্ষণে প্রকৃত ‘সেপাই’ হয়ে উঠছে? আপাতদৃষ্টিতে নৈরাজ্য-প্রতিনিধি হয়েও ওসমান জাতীয়তাবাদী দ্রোহে প্রকৃত সেপাইয়ের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে? গ্রামের আন্দোলন সম্পর্কে আনোয়ার বলে, “সেখানে আমাদের বেস বেশ ভালো। গ্রামের যারা মাথা, কয়েক জেনারেশন ধরে যারা ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আসছে, কর্নার্ড হতে হতে তাদের অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে, ঘোর মুসলিম লিগাররা পর্যন্ত শেখ মুজিবের রিলিজ চায়” (ইলিয়াস ২০১৫, ৩৬) গ্রামের আন্দোলনে আনোয়ার যত বেশি

জড়িয়ে পড়ে, ততই ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভূমিহীন কৃষিজীবীদের সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করতে পারে। খয়রার গাজী, আফসার গাজী পাকিস্তানবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী তথা আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ চালিয়ে মুনাফা অর্জন ক’রে পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী প্রকল্পে বিশ্বাসী। করমালি, চেংটুদের ঘৃণার ভাষা ব্যক্তি আফসার, খয়রারদের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার প্রতিও গর্জে ওঠে। ‘আগুন’ এই অধ্যায়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে খয়রার গাজীর উঠোনে ও গ্রামে আগুন ছড়িয়ে পড়ায়। প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রামের সময় আগুন হিংসার প্রতীক হয়ে ওঠে- হোসেন ফকির, আফসার গাজী, খয়রার গাজীদের মতো জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে করমালি, চেংটু, আলিবক্স, কানা মন্তাজরা শ্রেণিদ্বেষে অবতীর্ণ হয়। আগুনে করমালির পা পুড়ে যায় কিন্তু হোসেন ফকিরকে ওই আগুনে ফেলে দিয়ে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে করমালি-মন্তাজরা। ওসমান দৃষ্টিবিভ্রমে আগুনে জ্বলতে দেখেছিল আইয়ুব খান ও তার দালালদের। ওই একই সময়ে বাস্তবে আইয়ুব খানের শাসনব্যবস্থার গ্রামীণ দোসরদের গণ আদালতে বিচার করছিল ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা।¹⁷⁴ গণঅভ্যুত্থানের রাজনীতিতে শহুরে রাজনীতির ভাষায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা নির্বিকৃত নিম্নবিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত দ্রোহের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। কিন্তু, গ্রামীণ রাজনীতির ভাষায় মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে দ্রোহের ভাষা নির্মিত হতে থাকে। “শালা খানদানী শয়তান গো। খাঁচার মদ্যে তুল্যা জুতা দিয়া সালাম করো” (২০৭) “খয়রার গাজীক বার কর্‌য়া দাও। কুত্তার বাচ্চা এটি আছে” (২০৩), “হোসেন ফকিররে নিকবংশো করো” (১৯৭), “হাগে খয়রার গাজী, গু ছিটায় হোসেন আলি। ধরলে দুয়োটাকেই ধর্‌য়া লাগে” (১৯৬) ইত্যাদি ভাষাপ্রয়োগ নিপীড়িত ক্ষেতমজুরদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ। অমার্জিত অপরিশীলিত ‘গ্রাম্য’ ভাষার মধ্যে প্রবাদ মিশে থাকে, দেশজ শব্দ মিশে থাকে, স্থানীয় উচ্চারণ মিশে থাকে এবং নিপীড়িত শ্রেণিচেতনা মিশে থাকে। শহরের মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির থেকে স্বতন্ত্র এই ভাষা। যদিও, জালালউদ্দিন মাস্টারের মতো কোনও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বা আনোয়ারের বড়চাচার মতো উচ্চ সামাজিক-অবস্থানের কোনও মধ্যবিত্ত আধা-সামন্ততান্ত্রিক

মূল্যবোধ (প্রকারান্তরে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির অবশেষ) টিকিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু তারা আধিপত্যকারী হতে পারে না। আলতাফ, ইফতিখার, আলাউদ্দিনরা গণ-অভ্যুত্থানের শহরকেন্দ্রিক পর্যায়ের অন্তঃস্থ চেতনার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আর্মি কতটা শক্তিশালী, কীভাবে আন্দোলন দমন করতে পারে, তাদের দমনপীড়নে মধ্যবিত্তের নিশ্চয়তা কতটা বিঘ্নিত হতে পারে এইসব বিষয় শওকত-ওসমান-আলতাফদের আলোচ্য।¹⁷⁵ একই সময়ে সমান্তরাল গ্রামীণ ক্ষেত্রে গণ-আদালতে নিপীড়ক জোতদার-মহাজনদের বিচারের ভাষা স্পষ্ট হচ্ছে। গ্রামীণ পরিসরের এই অগ্রণী চেতনার সঙ্গে আনোয়ারের ভদ্রলোক সত্তা কিংবা তত্ত্বগত অনুভব কোনওটাই খাপ খায় না।

গণ-আদালত পর্বে শহুরে রাজনীতির সঙ্গে গ্রামীণ রাজনীতির দ্বন্দ্ব এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে কৃষিজীবীদের শ্রেণিসংগ্রামের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়। ইলিয়াস ভাষগত স্তরভাগ, কুশীলবদের চেতনালব্ধ স্বর, কুশীলবদের সামাজিক অবস্থান, কুশীলবদের শ্রেণি-অভিমুখ ইত্যাদি দ্বারা উক্ত দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ করছেন। খয়রার গাজীকে অত্যাচারী শোষক মহাজন তথা শ্রেণিশত্রু প্রতিপন্ন ক'রে তার বিচারের জন্য গণ-আদালত বসানো হয়েছে গ্রামে। আলিবক্স, চেংটুর মতো তরুণরা প্রতিশোধের ভাষাকে বড় ক'রে তোলে; তাদের স্বরে শ্রেণিঘৃণা বেশি। গণ-আদালতের অন্যান্য বহু কৃষকের স্বর তাদের স্বরের সঙ্গে মিলে যায়- খয়রার গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রায়ে তাদের কোনও জড়তা নেই। কিন্তু নাদু পরামাণিক, জালালউদ্দিন মাস্টারদের স্বরে খয়রার গাজীর সামাজিক অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকে, 'মানুষ খুন' করার নৈতিকতাজনিত সংশয় থাকে। একই সমাজব্যবস্থায় খয়রার গাজীদের মতো 'পশ্চিমা দালাল'দের দ্বারা শোষিত হয়েও এমন স্বরভেদ ক্রিয়াশীল থাকে। গণ-আদালত পর্বে শাস্তিদানের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছাত্র-যুবদের জাতীয়তাবাদী ক্লোপানের মিছিল আসে। মিছিলের আত্মিক চেতনা এবং গণ-আদালতের আত্মিক চেতনার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে- শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণি-অভিমুখের ব্যবধান। কলেজের ছাত্র-যুবরা ভাষণ শুরু করে- শেখ মুজিবুরের লড়াইয়ের কথা বলে, বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা

বলে। আলিবক্স-চেংটুদের কাছে জাতির মুক্তি, আইয়ুব খানের শোষণের থেকেও বেশি প্রয়োজন খয়রার গাজী, হোসেন মিয়াদের শোষণ থেকে মুক্তি। ইলিয়াস বলছেন যে, চেংটু-আলিবক্সদের আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না- বাঙালি না হলেও তারা এই আন্দোলনটা করত।¹⁷⁶ যমুনার চর অঞ্চলের গ্রামবাসীদের কাছে গরুচুরির নৈমিত্তিক ঘটনা, জোতদারের জমি কেড়ে নেওয়ার ঘটনায় তারা বেশি আলোড়িত, ক্ষুব্ধ। ভোটের অধিকার পেয়ে শাসকবদলের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার থেকেও জোতদারের জমি কেড়ে নিজেদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করা তাদের আশু প্রয়োজন।¹⁷⁷ তাই, শেখ মুজিবুরের মুক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিসত্তার ভাষণে আলিবক্স বলে, “আমাদের আদালতের কাম হয়। আপন না হয় পরে লেকচার দিইয়েন” (ইলিয়াস ২০১৫, ২৫১) জালাল মাস্টার তাঁর স্বশ্রেণিলব্ধ চেতনা থেকে তথা গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীর অবস্থান থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবদের ভাষণের ভাষায় আকৃষ্ট হন। আখ্যানে জাতীয়তাবাদী স্লোগানের সঙ্গে নৈরাজ্যপ্রবণ স্লোগানের সহাবস্থান রয়েছে। মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক মিছিলে ঐতিহাসিক ছ’দফা দাবি লাগু করার স্লোগানের সঙ্গে খিজিরের মুখে ‘আগুন জ্বালাও, ভাগ্গো’ স্লোগান উঠে আসে। ভিন্ন শ্রেণিচেতনা ও আশু-মুক্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে ভাষান্তরের পার্থক্য হয়ে যায়। চেংটু, খিজির, করমালিদের ভাষায় দ্রোহের যে তাগিদ, তাদের ভাষায় যে ‘অমার্জিত’ প্রকাশভঙ্গির দ্রুততা, আলতাফ-আনোয়ারদের ভাষায় তা নেই। শহুরে পরিসরে ওসমানের সঙ্গে খিজিরের ভাষার পার্থক্য, খিজিরের সঙ্গে রহমতউল্লাহর ভাষার পার্থক্য এবং আখ্যানের শেষ পর্যায়ে ওসমানের সঙ্গে অন্যান্য মধ্যশ্রেণির কুশীলবের ভাষার পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। ওসমানের ভাষা আলতাফের প্রভাব থেকে বেরিয়ে খিজিরের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসের কুশীলবদের নামকরণে বিশেষ ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। চেংটু, হাড্ডি খিজির, জুম্মনের মা, করমালি, নাদু। এমন নামগুলি সাধারণত মধ্যশ্রেণি বা উচ্চশ্রেণির ভদ্রবৃত্তে প্রচলিত না। উক্ত শ্রেণিগুলিতে বহু ভাবনাচিন্তাকে, অভিধান খুলে নামকরণ করা হয়, সেই নামের আভিধানিক অর্থ স্বীকৃত হয় ‘ভাল নাম’ বা পরিচয়পত্রের নাম হিসেবে। কিন্তু, চেংটু, নাদু ইত্যাদি নামগুলির কোনও আভিধানিক অর্থ নেই। আখ্যানে এই নামগুলিই ‘পরিচয়পত্র’।

ইলিয়াসের কথায়, নামের সঙ্গে শ্রেণির একটা সম্পর্ক থাকে। নামের ভাল বা খারাপ বিচার্য না, কিন্তু উক্ত নামগুলি প্রলেতারিয়েতের নামের সঙ্গে মেলে।¹⁷⁸ চেংটু, নাদু, পচার বাপ, করমালিদের নামোল্লেখের সমান্তরালে আনোয়ার, আলতাফ, আফসার, রহমতউল্লা, আলাউদ্দিন ইত্যাদি অভিধানস্বীকৃত নাম ব্যবহার করেন ইলিয়াস- নামকরণের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। খিজির আরবি শব্দ, যার অর্থ আল্লাহর সেবক। কিন্তু ‘হাডিড’ শব্দটি তার আগে জুড়ে লুপ্তপ্রায় প্রলেতারিয়েত খিজিরের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বোঝানো যায়, তেমনই তার প্রান্তিক অবস্থানও প্রতীয়মান হয়। জুম্মনের মায়ের ‘আসল নাম’ আখ্যানে কোথাও উল্লেখ নেই। সন্তানের নামে বা স্বামীর নামে নারীর নামোল্লেখ ক’রে পরিচয় দেওয়া নির্বিকৃত-নিম্নবর্ণের যাপনের সঙ্গে মেলে। ভদ্রলোক বৃত্তের আখ্যানবৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাহ্বান জানাতেই ভাষার এই বিশিষ্ট ব্যবহারে সচেতন ছিলেন ইলিয়াস।

নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ‘ভদ্রলোক’-এর অভিজ্ঞানঃ আখ্যানের ভাষা

বিনয়ভূষণ এবং মণিমোহনের মতো একা হয়ে যায় কালী সাঁতরা। বিনয়ভূষণ ও কালী সাঁতরা একই পার্টির কর্মী। মণিমোহন সিপিআই করেন। প্রত্যেকেই আদর্শবান, সৎ, মতাদর্শনিষ্ঠ- ফলে পার্টির সঙ্গে তাঁদের সংঘাতের প্রকারেও মিল থাকে প্রচুর। বিনয়ভূষণ ও মণিমোহন¹⁷⁹ কলকাতা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডে যুক্ত এবং তাঁদের সক্রিয়তার পরিসর মূলতঃ শহুরে-শিক্ষিত অংশে সীমাবদ্ধ। ‘বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)’ উপন্যাসের আখ্যান আবর্তিত হয় মণিমোহনের সঙ্গে সিপিআই ও সিপিআইএমের মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-ভদ্রলোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং মধ্য-সত্তর দশকের আর্থ-রাজনৈতিক সংলাপকে কেন্দ্র ক’রে। কালী সাঁতারার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, কালী সাঁতরা অশহুরে পরিসরে সক্রিয় এবং সেই সক্রিয়তার বৃত্তে বসাই টুডুর মতো ভূমিহীন মূলবাসী ক্ষেতমজুর থেকে নিম্নবিত্ত বর্গাদার থেকে সামন্তর মতো উচ্চবর্গ পার্টিনেতা সকলেই অন্তর্ভুক্ত। আখ্যানের ভাষা ও কুশীলব নির্মাণের প্রকল্পে ‘অগ্নিগর্ভ’-র মতো বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দীপেন্দ্রনাথের

উপন্যাসে নেই। কিন্তু, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সত্তর দশকের আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে কাহিনীগুলি আবর্তিত হয়। প্রথমতঃ, আখ্যানকথক কালী সাঁতরার স্মৃতি ও চেতনাপ্রবাহে অনেকসময় ভরসা রাখেন বসাইদের রাজনীতি ও সামগ্রিক রাজনীতির বিরোধভাসকে বুঝতে। মণিমোহন ও বিনয়ভূষণের স্মৃতিপটে ঝলসে ওঠা ঘটনবলীও অনেক সময় আখ্যানের রাজনৈতিক প্রকল্পনা গড়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, বিনয়ভূষণ এবং মণিমোহনকে পার্টির ক্ষমতাসালী গোষ্ঠী ব্যবহার করে নেয় নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কালী সাঁতরাও এই ব্যবহৃত হওয়ার বোধে উপনীত হন যে, সামন্ত বা উচ্চতর নেতৃত্ব বা পুলিশ-সেনা তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে নিচ্ছে। তৃতীয়তঃ, এই তিনটি উপন্যাসেই কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মতাদর্শগত দৃঢ়তা, ন্যায়নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও সততার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সঁটে থাকে। দীপেন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মান্যতা দেন। মহাশ্বেতা এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সহৃদয় হয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ১৯৭০ দশকের রাজনীতির প্রেক্ষিতে একজন অভিজ্ঞ কমিউনিস্টের অনুশীলনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিষ্ঠা পায় আখ্যানে। আর, এই তত্ত্বগত ও অনুশীলনগত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই কালী সাঁতরা, বিনয়ভূষণ, মণিমোহনের জীবনে সংঘাতের সূত্রপাত। সেই সংঘাত শুধু বহিসর্মাজে আর্থ-রাজনৈতিক পরিসরে নয় বরং সাংস্কৃতিক পরিসরেও ক্রিয়াশীল থাকে এবং ব্যক্তিগত পরিসরকেও প্রভাবিত করে। কালী সাঁতরা সাম্যবাদী মতাদর্শ মেনে ব্যক্তি মালিকানায বিশ্বাসী না। তিনি শ্রেণিচ্যুত হওয়ার অনুশীলনরত। তিনি ১৯৪৩ সালে নিম্নবর্গের ভূমিহীন কৃষক বেতুল ও ময়েশকে তিরিশ বিঘা জমি বিলি করে দেন। পরবর্তীতে তাঁর পারিবারিক সদস্যরা জমি বিলিয়ে দেওয়া নিয়ে কালীকে প্রশ্নবিদ্ধ করলে কালী আসন্ন বিপ্লবের মতাদর্শগত দায়িত্বের কথা বলে।¹⁸⁰ ব্যক্তিগত স্তরে মতাদর্শবাদী অনুশীলন করার পরেও সামগ্রিক স্তরে তা ব্যর্থ হতে পারে, তার উদাহরণ বেতুল ও ময়েশের জমি ‘মহাজনের জাবদা খাতায় ঢুকে যায়’- জমিসম্পর্ক এবং সামাজিক চুক্তির বদল সার্বিকভাবে অনুশীলিত হয় না। সৎ, আদর্শবাদী কালী সাঁতরা ব্যক্তিগত অনুশীলনে শ্রেণিচ্যুত হলেও তাঁর সংসদীয় পার্টি সে অনুশীলন থেকে দূরে চলে যায় এবং আধা-সামন্তান্ত্রিক ব্যবস্থার কুপ্রভাব বজায় থাকে। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-

র বিশু জলপাইগুড়ির শুকরাপাড়ার মদেশিয়া-সাঁওতালদের জমিদখল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের (১৯৬৭) আমলে জোতদার বাহাদুর ও জোতদার বাহেবাবুর জমির পাট্টা কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছিল। কিন্তু যে উপায়ে বেতুল ও ময়েশদের জমি জোতদারের জাবদা খাতায় ঢুকে যায়, সেই একই পদ্ধতিতে “দখল-করা খাশজমি আবার আধিতে ফিরে গেল। লড়াইয়ের শুকরাপাড়া এখন বাহেবাবুর ঘরের আধিয়ার।” (রায় ১৯৮৯, ১৬৬) নিম্নবর্ণের যে মানুষগুলি বিশুর পার্টির লোক ছিল, লাল ঝাণ্ডা বহিত, সেই লোকগুলিই কংগ্রেসী জোতদার বাহেবাবুর মিছিলে যোগ দিচ্ছে বলে বিশুর কমিউনিস্ট মতাদর্শের তাত্ত্বিক মন আহত হয়।¹⁸¹ কিন্তু মদেশিয়া-সাঁওতালদের মিছিলের প্রতি এখনও একাত্মতা বোধ করে বিশু-জোতদার বাহেবাবুর সামাজিক-অবস্থান ও শ্রেণি-অবস্থানের থেকে বিশুর অবস্থান ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অনেক বেশি কাছে। আখ্যানকথক বিশুর রাগান্বিত চিন্তার ভাষা অনুধাবন ক’রে লেখেন, “এখন এটা কার মিছিল? না, বাহেবাবুর আধিয়ারদের মিছিল। বিশুর রাগ হয়ে যায়। শুকরাপাড়া তাকে ছোট করে দিয়েছে।” (১৬৮) এর বিপরীতে সাঁওতাল-মদেশিয়াদের ভাষায় বিশুর প্রতি এবং লালঝাণ্ডার প্রতি ভালবাসা অবিকল রয়ে গেছে এক দশক পেরিয়েও, “হামলোগোকো ঝাণ্ডা হাম নেহি ছোড়বো... হে-এ বিশুকামরিড, জেরা ঠার যা হে” (১৭০) বিশুর লড়াইয়ের কমরেড হওয়া সত্ত্বেও ভাষার ব্যবধান থাকে। বিশু যে মতাদর্শগত অবস্থান থেকে জমিদখলের লড়াইকে বোঝে, বাস্তবতা তার থেকে আলাদা। মদেশিয়া-সাঁওতালদের বাস্তবতা তার থেকে আলাদা। কালী সাঁতরা বা বিশুকে আদিবাসী সাঁওতালরা ‘কা-ম-রি-ড’ বা ‘কমরেট’¹⁸² বলে ডাকে, সঠিক ইংরেজি উচ্চারণের ভদ্রলোকসুলভ বিশুদ্ধতা তাতে নেই কিন্তু সহযোদ্ধার আন্তরিকতা রয়েছে। দেবেশ ও মহাশ্বেতা নিম্নবর্ণের দ্রোহচেতনার এই স্বরকে ধরে রাখেন আখ্যানে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ উপন্যাসের অশিক্ষিত শহুরে নিম্নবর্ণ সোনা তার অপরিণীলিত ভাষায় ‘কমুনিস’ উচ্চারণ করে, কিন্তু তার রাজনৈতিক চেতনা নিখাদ। তার রাজনৈতিক চেতনা ওই মদেশিয়া-সাঁওতালদের মতোই গভীর এবং উচ্চারণ দেশজ। কালী সাঁতারার মতো বিশুর কমিউনিস্ট মতাদর্শবাদী অনুশীলনের ধারাবাহিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (এবং তা

ব্যক্তিগত অভিমানে পর্যবসিত হয়) পার্টি তাদের অনুশীলনের পাশে দাঁড়ায়না বলে। লালপতাকা নিয়ে বিশ্বর অভিমান ও গর্ব প্রতীয়মান হয় বিশ্ব যখন হিন্দি ভাষায় (আখ্যানস্থ সাঁওতাল কৃষকদের বোধ্য ভাষায়) ‘দালালিকো ঝাণ্ডা’ আর ‘লড়নেওয়ালা ঝাণ্ডা’-র পার্থক্য বোঝায়।¹⁸³ লালঝাণ্ডা মদেশিয়া-সাঁওতাল ক্ষেতমজুরদের হাতে মানায় না, বরং মালিক বাহেবাবুর ঝাণ্ডা তাদের হাতে শোভা পায়- এই বক্তব্য রাখার সময়ে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বোঝার চেয়ে মতাদর্শের অভিমান বড় হয়ে ওঠে। নিম্নবর্ণের ক্ষেতমজুররা লাল ঝাণ্ডার সম্মান বুঝতে পারল না, তারা দালালির ঝাণ্ডা বেছে নিল, এমন বয়ানই কি বিশ্বর চেতনায় আধিপত্য করে? ওই নিম্নবর্ণ ক্ষেতমজুরদের তুলনায় ভদ্রলোক-উচ্চবর্ণ বলেই কি বিশ্বর চেতনার স্তরে সহরাইদের অতিপ্রান্তিক অবস্থানের বাস্তবতা কোনও প্রভাব ফেলে না?¹⁸⁴ বিশ্ব যত অক্লেশে ‘কমিউনিস্ট’ তকমা ধারণ ক’রে ত্যাগ স্বীকার ক’রে গর্বাশ্বিত হতে পারে, নিম্নবর্ণীয় প্রান্তিকতম ক্ষেতমজুররা তা পারে না। ‘মালিক’ শব্দটার দ্যোতনা তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কথকের বয়ানে। নিম্নবর্ণীয় ক্ষেতমজুর যারা প্রান্তিকতম বলেই তাদের নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহার ক’রে নেয় সংসদীয় দলগুলি, সেইসব মানুষগুলির ‘রাজনৈতিক মালিক’ কে? সেই প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে সংসদীয় রাজনীতির পাকেচক্রে। কালী সাঁতরাকে সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছিল বসাই টুডু। সেইজন্যেই বসাইদের দ্রোহপথ সামন্তর মতো নেতৃত্ব বা উচ্চতর নেতৃত্বের অহং-এ আঘাত করেছিল। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে চেংটুর মতো নিম্নবর্ণীয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর আনোয়ারের তত্ত্ব-অনুশীলনের পরিসর থেকে দূরে থাকে। আনোয়ারের সততায় কোনও খাদ নেই, কিন্তু তার ‘ব্যক্তিগত’ শ্রেণিচেতনা সংগ্রামী এলাকার শ্রেণিচেতনার থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। গাজী স্থানীয় উচ্চবর্ণ এবং আনোয়ারের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই কি আনোয়ারের শ্রেণিঘৃণা বাধা পায়? ইলিয়াস তাঁদের কথা লিখছেন যাঁরা উচ্চশ্রেণি দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও তা চিহ্নিত করতে পারে না- বজলু বা তার সহকর্মীরা তা পারে না। অন্যদিকে খিজিরের ভাষায় থাকে ভাংচুর এবং নৈরাজ্য যা আখ্যানে গতি আনে। খিজিরের কোনও নেতা নেই অথবা নেতৃত্ব হিসেবে সে কাউকেই স্বীকার করতে পারে নি। ‘খোয়াবনামা’-তে মধ্যবিত্ত হিন্দু নেতাদের ভূমিকা এবং

উচ্চবর্গীয় মুসলিম নেতাদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। নিম্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা কালাম মাঝি অবস্থানগত বৈষম্যের প্রশ্ন উত্থাপন করে- ধর্মগত ঐক্যের বয়ানের ফাঁক গলে শ্রেণিগত বিভেদের বয়ান বেরিয়ে আসে। “মুসলমান তো হামরাও বাপু, তা হামরা হলাম মাঝি আর আপনারা সব ভদ্রনোক” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৯৮) মাঝিদের সামাজিক অবস্থান চাষী ও কলুদের থেকে নিচে-আখ্যানে এই বৈষম্য পরিস্ফুট হয় ফুলজান ও তমিজের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। আব্দুল কাদেরের মতো মুসলিম লিগের নিম্নপদস্থ নেতার স্বর যত সহজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গরজে উন্মুখ হয়^{১৮৫}, ইসমাইলের মতো উচ্চপদস্থ নেতার স্বরে ততটাই সাবধানতা এবং মাপা পদক্ষেপের কথা। লিগের কর্মীদের বাচনে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা স্পষ্ট, তাদের বাচনে কায়েদে আজমের ইসলাম ও মোল্লাতন্ত্রের পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু, ইসমাইল হোসেন নির্বাচনী পদপ্রার্থী বলেই হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের বয়ান নিজের বাচনে দমিয়ে রাখে সে। তার রাজনৈতিক স্বার্থের স্বর স্পষ্ট হয়- মাঝিপাড়ার সঙ্গে কলুপাড়ার বিরোধ কিংবা বড় চাষীদের নাকউঁচু মনোভাব সে নাকচ ক’রে দেয়। কৃষক প্রজার ‘ওয়ার্কার’ বাড়ানো আর মাঝিপাড়ার ভোট জোগাড় ক’রে পাকিস্তানের দাবি প্রতিষ্ঠা তার রাজনৈতিক লক্ষ্য। “ইস! এই করেই তো মুসলমান গেলো। এখনো তোমরা হানাফি আর মোহাম্মদি নিয়ে বাহাস করো। এসব ভুলে যাও কাদের, ভুলে যাও। ভোটের সময়তা অন্তত এসব কথা মুখেও এনো না।” (২০০) ভোটের স্বার্থে ইসমাইল, কাদেরদের স্বরে ‘ইসলাম সাম্যের ধর্ম’ প্রাধান্য পায়। ইসমাইলের বক্তব্যে কৃষকদের দাবির কথা থাকে। কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট তরুণ কর্মীবৃন্দের সঙ্গে তার হৃদয়তা ও সমাজসেবার আধুনিকমনস্কতা সাদেক উকিল ও শামসুদ্দিন ডাক্তারদের কাছে ‘চ্যাটাং চ্যাটাং’ কথা বলে গণ্য হয়।^{১৮৬} মুসলিম লিগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় ভাষণ দেওয়া বা বক্তব্য পেশ করা আলাদা সম্মত প্রদান করে এবং ‘ভদ্রলোক’ তকমায় উত্তীর্ণ করে। ইসমাইল, সাদেক উকিল, শামসুদ্দিন ডাক্তার এবং মজিদ সরকারের মধ্যে কার বয়ান প্রাধান্য পাবে এবং কৃষক-শ্রমজীবীরা কার বয়ানকে মান্যতা দেবে, তার ভিত্তি হচ্ছে কে কত ইংরিজি শব্দ ব্যবহার ক’রে বক্তব্য পেশ করবে।^{১৮৭} তাঁদের তর্কের ভাষায় কৃষিজীবী-শ্রমজীবীর অধিকারের দাবি ক্রমশঃ নস্যাত হতে থাকে এবং তেভাগা আন্দোলনে

জোতদার-জমিদারের জমি কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে তাঁদের ক্রোধান্বিত বিরাগ প্রকাশ পেতে থাকে। তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটের সন্ধিক্ষণে নিম্নবর্গের চেতনাকে দমিয়ে দিতে চেয়ে শিক্ষিত উচ্চবর্গের চেতনা কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে তার প্রমাণ এই ভাষাপ্রয়োগে- কারণ আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর ‘মালিক’ এই উচ্চবর্গীয় অংশ। ইসমাইল হোসেন মুসলিম লিগের গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ে তার অনুশীলনের জন্য এবং শহুরে রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হওয়ার জন্য। ভূমিহীন কৃষিজীবীদের যে স্বপ্ন সে দেখিয়েছিল, তা পূরণ হয় না; গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তার শহুরে উদারনৈতিক রাজনীতি ব্যর্থ হয়। ইসমাইলের স্বরে মুসলিম লিগের নেতৃত্বের একাংশের স্বরের অনুরণন শোনা যায়।¹⁸⁸ কমিউনিস্ট কর্মী মিনতি দত্তর শরীরী ভাষা মাঝি ও কামারদের সাহুনা দেয়। কমিউনিস্ট কর্মী অজয় দত্তর ভাষায় বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন থাকে। কিন্তু, তার ভাষণের প্রয়োজনীয়তা কমে আসতে থাকে দাঙ্গাপ্রবণ মুহূর্তে, ঠিক যেমন গান্ধি-জিন্নার মিলনের জ্লোগান কামারপাড়া ও মাঝিপাড়ায় নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কথকের স্বর শোনা যায়- “আর সবাই কথাগুলো ভালো করে ধরতেই পারে না” (২৩১) উচ্চবর্গীয় হিন্দুরাও তাদের ভদ্রলোকীয় বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক’রে দেয় অজয় ও মিনতিকে। “দত্তবাড়ির ছেলে” হয়ে মুসলমানদের ঘরে ভাত-জল খাওয়ায় উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের প্রকল্পনা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র বিশু, ‘খোয়াবনামা’-র অজয়-মিনতি এবং ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র সুহাস বা নকশাল ভদ্রলোকটি অজয় দত্ত, মিনতি দত্ত সহ কমিউনিস্ট কর্মীদের আন্তরিক সততা ইসমাইলকে প্রভাবিত করেছিল- তার ভাষায় এই প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।¹⁸⁹ কিন্তু, সেই ইসমাইলও তেভাগার দাবিতে অনড় থাকতে পারে নি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরে। “কৃষকরা যতই জঙ্গি অর্থনীতিবাদী আন্দোলন করুন- যে পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁদের শ্রেণিশত্রুদের হাতে, সে পর্যন্ত তাঁরা কোনও ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়।” (উমর ২০১৯, ১০০) কাদেরের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে তমিজ তেভাগা আন্দোলন ও বর্গাদারের বিলের কথা জানতে চাইলে কাদের তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা বলে; স্পষ্ট হয় মুসলিম লিগ শ্রেণিভিত্তিক সংগ্রামকে দমিয়ে ধর্মীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

কাদের ও তমিজের সংলাপে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই শ্রেণির স্বর উঠে আসে- সেই স্বর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের- পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয় আখ্যানের দ্বিবাচনিক পরিসরে।

তমিজ জানতে চায়, ‘তেভাগা হলেও কাম হয়। তেভাগা তো হচ্ছেই, না?’

‘এ কথা সে কথা, দে বুড়ি আলাপাতা’। কাদের তমিজের একটি ব্যাপারেই লেগে থাকা নিয়ে হাসে, ‘তোরা খালি এক কথা। উগলান তো সব শ্যাষ হয়ে গেছে বাপু। নাচোলের দিকে এখনো মাথাগরম কিছু চ্যাংড়া...’

...

‘লবাবগঞ্জ তো? চিনি না? জয়পুরেত যখন ধান কাটাচ্ছিলাম তখনি তো ওটি জোতদাররা সব দৌড়াচ্ছিলো পাছার কাপড় তুল্যা’

‘উগলান দিন শ্যাষ।’ (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৯৫)

সংগ্রামী কৃষক ও সুবিধাভোগী জোতদারের শ্রেণি-অবস্থান স্পষ্ট। তমিজের ভাষা অমার্জিত কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং শাসক-বিরোধী চেতনায় পুষ্ট। কাদেরের স্বরে তেভাগা আন্দোলন দমিত হওয়ার খুশি, সংগ্রামী কৃষকদের সে কাছে ‘মাথাগরম চ্যাংড়া’ শব্দবন্ধে বর্ণনা করে। কিন্তু, তমিজের ‘একঘেয়ে’ প্রশ্ন তার খোয়াব ও আকাজ্জার বহিঃপ্রকাশ। মুসলিম লিগের আকাজ্জিত রাষ্ট্রগঠনের পরে তমিজদের আকাজ্জার ও খোয়াবের মৃত্যু হয়; কালাম মাঝি ও শরাফত মণ্ডলরা ইসলামিক রাষ্ট্রে উচ্চতর সামাজিক অবস্থানে উঠে আসে।

কালী সাঁতরা, মণিমোহন, বিনয়ভূষণের মতো রণজয় ভদ্রলোক কমিউনিস্ট। শহুরে ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত পরিসরে তার প্রাথমিক রাজনৈতিক বিকাশ। তারপর শ্রেণিচ্যুত হওয়ার ব্যক্তিগত পরিসর পেরিয়ে, পুলিশি নির্যাতন সহ্য করে এবং সত্তর দশকোত্তর পর্বে ঘরে ফিরে সে ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত পরিসরে আশ্রয় পায়। রণজয়ের ভাষায়, চেহায়ায়, পোশাকে, আচরণে ভদ্রলোকী ছাপ অনপনেয়। প্রফুল্ল নামক যুবক তাকে সজ্জন ভদ্রলোক বলে বুঝে যায়।¹⁹⁰

আখ্যানের অ্যান্টাগনিষ্ট বসাকের সঙ্গে রণজয়-কৌশিক-কোবার রুচির পার্থক্য বিবৃত করে কথক। কোবাকে রণজয় যেভাবে তৈরি করে, তা শিক্ষিত ভদ্রলোক কমিউনিস্ট পরিচিতিকে আরও জোরদার ক'রে গড়ে। রণজয় তার অন্তর্গত চেতনার স্তরে কোবার জন্য কমিউনিস্ট সাহিত্যপঞ্জি (সোভিয়েত ও চিনের গ্রন্থমালা), বাংলা প্রগতিবাদী সাহিত্যপঞ্জি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে, যাতে কোবা বড় হয়ে ‘কিছু একটা হবেই’ বলে রণজয়ের বিশ্বাস।¹⁹¹ মণিমোহন তাঁর বালক ও বালিকা সন্তানের জন্য যে সাহিত্যপাঠ ভেবে রাখেন, তাতে ‘টিনটিন’ এবং আনন্দবাজার পত্রিকা বাদ রাখেন। যদিও উক্ত দু’টি সাহিত্য ও পত্রিকা বাঙালি মধ্যবিত্তের রুচিশীলতার প্রমাণবাহী, কিন্তু সেগুলি কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী বলে বাদ দেন মণিমোহন। লুম্পেন প্রলেতারিয়েত অ-ভদ্রলোক খিজির জুম্মনের জন্য বই বা শিক্ষার উত্তরাধিকার রাখার কথা ভাবে নি। খিজিরের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার সূত্রে তার শ্রমের উপকরণ প্লায়ার ও স্কু-ড্রাইভার জুম্মনের হাতে পড়ে। ফ্যাতাডুদের সঙ্গে ভদ্রলোকবৃন্দের দুরত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি- ভাষা, রুচি, গ্রন্থপঞ্জি এবং রাজনৈতিক অশুদ্ধতা। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র সুহাস, ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র বিশ্বনাথও ভদ্রলোক কমিউনিস্ট। যদিও, এই কুশীলবদের প্রত্যেকের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা বড় বিষয় ‘ভদ্রলোক’ সত্তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে শ্রেণিচ্যুত হতে চাওয়া। আখ্যানে তাঁদের চেতনাপ্রবাহ, দ্বন্দ্বিক পরিসর এবং ক্রমবিবর্তন সেদিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্তু, তাঁদের ভদ্রলোক সত্তা প্রকট হয় দু’টি স্তরে- (১) নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। এবং (২) ভাষাপ্রয়োগ। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আখ্যানের ‘কমিউনিস্ট কুশীলব’-এর নির্মাণে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে থাকে। একপ্রকার কমিউনিস্ট নৈতিকতা এই কুশীলবরা মেনে চলেন, ‘আদর্শ’ যাপন মেনে চলেন তাঁরা। আখ্যানের উচ্চশ্রেণিভুক্ত কুশীলবের নৈতিকতা, মূল্যবোধের থেকে তাঁদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সহজেই আলাদা ক'রে নেওয়া যায়। আখ্যানস্থ শ্রমজীবী-কৃষিজীবীরা যাঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁদের নৈতিকতা-মূল্যবোধ এই ভদ্রলোকদের নীতি-মূল্যবোধের অনুসারী হয়। ভাষার ক্ষেত্রে আখ্যানে এঁরা প্রমিত শব্দে, অপশব্দরহিত ভাষায় কথা বলেন। মধ্যশ্রেণির শিক্ষা, রুচি, মার্জিত অভিব্যক্তি তাঁদের

ভাষার ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্যণীয়। বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যে (এবং প্রগতিবাদী সাহিত্যে) বামপন্থী প্রটোগনিস্টদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এবং ভাষার এমন কিছু মাপকাঠি নির্মিত হয়েছে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। ‘খোয়াবনামা’-র অজয় দত্ত, মিনতি দত্তরা তেমনই কুশীলব। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর আনোয়ার নীতি মূল্যবোধের যাবতীয় প্রচলিত ধারণা আঁকড়ে থাকে। ‘খোয়াবনামা’-তে অজয় দত্ত, মিনতি দত্তের উপস্থিতি স্বল্প। প্রাক-দেশভাগ দাঙ্গার সময় তারা কংগ্রেস-লিগের মিলনের বার্তা নিয়ে দাঙ্গাবিরোধী প্রচারে আসে। কিন্তু, আনোয়ারকে ইলিয়াস অনেক যত্ন নিয়ে নির্মাণ করেছেন। তুলনায় বামপন্থী আলিবক্সকে আখ্যানে কম স্থান দেওয়ায় ইলিয়াসের আক্ষেপ ছিল।¹⁹² রাজনৈতিক আখ্যানে বামপন্থী প্রটোগনিস্টদের এমন ছকমাপা নির্মাণ ইলিয়াসের সাহিত্যচেতনার পরিপন্থী ছিল। প্রথমতঃ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উচ্চশ্রেণির স্বার্থরক্ষার্থে প্রযুক্ত মূল্যবোধ, উচ্চশ্রেণির অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে সৃষ্ট নৈতিকতাই একমাত্র রুচিশীল, মার্জিত, উচ্চনৈতিকতা ও মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়।¹⁹³ লুকাচ নির্বিক্তের শৃঙ্খলাকে নিছক অর্থনীতি না, বরং তাদের নৈতিকতার প্রশ্নে বিচার করছেন। শ্রেণিহীন সমাজে নির্বিক্তের মুক্তি সম্ভব, যেখানে ‘laws of socially blind forces’ তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে না। প্রগতির দিশা সেই অভিমুখে সম্ভব, যেখানে “ The direction, which social development takes depends on the self-consciousness, the spiritual and moral character, the judgment and altruism of the proletariat.” (Lukács 1972) মধ্যশ্রেণি থেকে আসা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তির যে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সামাজিক-আইনধারণা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন, নিম্নশ্রেণি থেকে আসা শ্রমিক-কৃষকের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক-আইনধারণা তার থেকে আলাদা। খিজিরের মুক্তির উদযাপন তার সংস্কৃতিমাফিক হবে, তার পারিপার্শ্বিক থেকে শেখা নীতি-মূল্যবোধ দিয়েই সে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলিকে বিচার করবে। বসাই টুডুর নীতি-মূল্যবোধ-আদর্শ মধ্যশ্রেণিভুক্ত কালী সাঁতারার মাপা ছকে এগোবে না। ইলিয়াস, মহাশ্বেতারা এই পার্থক্যগুলি আখ্যানে উপস্থাপনা করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কমিউনিস্ট নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে মার্ক্সবাদ-বিরোধী মানতেন ইলিয়াস। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের

শ্রমিক শোষিত-নির্ধাতিত এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও ‘সে মহাসাধু হবে এমনও আশা করতে পারি না।’ ওই শ্রমিক কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও ক্ষমতাকাঠামোর (যেখানে উচ্চবর্গ নীতিনির্ধারক) দ্বারা তৈরি সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা তাঁর চেতনাকে ছেয়ে আছে; তাঁর জন্যে আলাদা নৈতিকতা থাকতে পারে না।¹⁹⁴ ইলিয়াস বলছেন যে, “প্রোলেতারিয়েতের কাছে উঁচুমানের মানসিকতা আশা করা যায় না।” (ইলিয়াস ২০০১, ৫১) এক্ষেত্রে ‘উঁচুমানের মানসিকতা’ বলতে ইলিয়াস নিশ্চয়ই বোঝাতে চাইছেন ক্ষমতাকাঠামোর ওপরতলায় থাকা মানুষদের দ্বারা নির্ধারিত ক’রে দেওয়া মানসিকতা ও লেখক যে আকাঙ্ক্ষিত মানসিকতা চরিত্রদের ওপরে আরোপ করতে চায় এবং পাঠক যে মানসিকতা চরিত্রদের থেকে প্রত্যাশা করে সেই মানসিকতার কথা। নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গের অশোক মিত্র বলেছিলেন, ‘আমি ভদ্রলোক নই। কমিউনিস্ট।’

কালী সাঁতরার মতাদর্শনিষ্ঠা ও সততায় বিরক্ত হয় তার পার্টি ও পরিবার। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপের মতাদর্শগত অনুশীলন কালী সাঁতরার একক বিশ্বাসে থাকলেও, তার পরিবারে ব্যর্থ হয়, “ভীষ্মের কঠোরতায় গিনিমালা ধানজমি বিঘার পর বিঘা কিনতে থাকে, স্বনামে” এবং তার ছেলে কালী সাঁতরার প্রতি বীতরাগে “বাপের দেওয়া আদরের ‘লেনিনচন্দ্র সাঁতরা’ নামটি ব্যবহার করেনি।” (১৬) যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে কালীদের সংগ্রাম এবং বসাইদের দ্রোহের প্রতি কালীর সমর্থন সেই ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে থেকে সামাজিক ক্ষমতা পেতে চায় গিনিমালা ও অনির্বাণ। মণিমোহনের সৎ ও মতাদর্শনিষ্ঠ যাপনানুশীলনে আঘাত আসে আর্থ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে। মণিমোহনের সন্তান বালক বাবুয়া তার মূল্যবোধদান-শিক্ষাদানকে প্রত্যাখ্যান ক’রে বলে দেয় যে, “আমি কক্ষণও কমিউনিস্ট হবো না।” কালী সাঁতরার সততা তাকে সামন্তদের তুলনায় ‘ইনফিরিওর’ বানিয়ে দেয়, কালী সাঁতরার নিষ্ঠা তাকে ‘এক্সপেন্ডেবল্’ বানিয়ে দেয়। কালী সাঁতরার প্রহ্নহীন আনুগত্য ও সততা তার অজান্তেই বসাই, দুলাদের মতো সহযোগীদেরও ‘এক্সপেন্ডেবল্’ বানিয়ে দেয়; কালী সাঁতরা বোঝে না যে, পার্টির অভ্যন্তরে প্রহ্ন

এবং দ্বন্দ্ব পার্টির ভিত মজবুত করে। অথচ, সংসদীয় কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতাকাঠামোয় কালী ভাবতে বাধ্য হয় ঠিক এর উল্টো, “সং ক্যাডার সেই মাটি, যার ওপর পার্টি দাঁড়িয়ে থাকে... পার্টি নেই এমন দিনের কথা কালী সাঁতরা ভাবতে পারে না। পার্টি চিরকাল ছিল, তুমি থাকো। তোমাকে আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি কবে।” (৪০) বসাই টুডু কালী সাঁতারার অন্টার ইগো। কালী সাঁতরা যে আনুগত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচিতি ভুলে যায়, বসাই টুডু সেই আনুগত্যকেই প্রত্যাখ্যান করতে শিখে যায় শ্রেণি-জাতি সচেতনতার ভেতর দিয়ে। কালী সাঁতরা সিপিআই(এম)-র সঙ্গে যুক্ত থেকেও, বসাইয়ের চেতনার সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করে এবং খেতমজুরের দ্রোহের প্রশ্নে ঐক্যমত হয়।¹⁹⁵ কথকের বয়ানে এবং কালী সাঁতারার বাচনে যতবার মনে হয় যে, কালী সাঁতরা নীতিবাদী ভদ্রলোক ভালমানুষ, ততবার বসাই টুডুর বাচনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভালমানুষ নীতিবাগীশ হওয়ার দাম পায়নি কালী সাঁতরা। বসাই টুডু ‘অহিংস, ভদ্র, অনুগত, ভালমানুষ’ তকমাগুলিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলে যে, সে অনুগত হুকুম-বরদার ভালমানুষ হতে চায়নি বলেই পার্টির চোখে খারাপ প্রতিপন্ন হয়েছে।¹⁹⁶ নিম্নবর্গের ইতিহাসকে বুঝতে গেলে ঘটনার পারস্পর্য আর উচ্চবর্গের ইতিহাসলেখ দিয়ে বোঝা যাবে না। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বা সাধারণ পরিস্থিতিতে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা দরকার- যে সম্পর্ক আদতে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক।¹⁹⁷ বসাই টুডুর বাস্তবতায় এবং অনুভবে এমনটাই ঘটে- সামন্ত তাকে কাঁচের গেলাসে না দিয়ে মাটির ভাঁড়ে চা দেয়। সামন্তকে কাঁধে ক’রে নিয়ে সদরে ছুটতে হয় তাকেই। অথচ সামন্ত তাদের প্রশ্নগুলিকে অনায়াসে পার্টিবিরোধী বলে দাগিয়ে দেয় নিজের উচ্চাবস্থান থেকে। বাঘারুর চেতনার অন্তর্গত স্তরে বিশ্বাস প্রোথিত হয়ে যায় যে, সে ‘গয়ানাথের মানষি’। জমি, নদী, তিস্তার পাড়ের মতো জড়বস্তু থেকে বাঘারুর মতো জীবন্ত মানুষ সবই গয়ানাথের ‘অধীন’, একথা বাঘারুর চেতনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছায়। নিত্যনৈমিত্তিক পরিস্থিতিতে বসাইয়ের মতো ভূমিহীন ক্ষেতমজুর খেতখেতু বোঝে উপনিবেশোত্তর পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূলগত বদল আসেনি। বাহেবাবু এবং পদ্মনাথদের মতো দেশি উচ্চবর্গের সঙ্গে তার প্রভু-ভূত্বের সম্পর্ক অবিকল রয়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দুঃস্থ জীবনযাপনের গল্পকে আখ্যানস্থ পরিসরে আনছেন, তাদের কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় সত্য কিছু নেই। ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন?’ গল্পের যোগী সমাজনির্মিত ধারণায় ‘সৎ’ নয়, ভদ্রলোক নয় এমনকি নৈতিকতা-মূল্যবোধের চেনা গণ্ডিগুলিও তার কাছে খুব প্রয়োজনীয় নয়।¹⁹⁸ দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে সে লুঠ করে, ডাকাতি করে। বড়লোকের গুদামে লুঠ ক’রে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়। তার এই আচরণে রবিনহুডসম মহত্ব প্রকাশ পেলেও, ‘লুঠ’ বা ‘ডাকাতি’ নিশ্চয়ই নৈতিকতার আওতায় পড়ে না। যোগীর বউ দুর্ভিক্ষের সময় ‘হারিয়ে’ গেছিল খারাপ পাড়ায়। যোগী তাকে ফিরিয়ে আনে। ভদ্রলোক-পরিসরে এই ‘ফিরিয়ে আনা’ নিয়ে যে কুণ্ঠা থাকে বা নৈতিক দ্বিধা উপস্থিত হয়, যোগীর চেতনায় সেই সংকট নেই। কথক উদ্দিষ্ট পাঠককে প্রশ্ন করেন- “যে ভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো। তারপর আর কোন্ কথা আছে?” (২১১) এই উপলব্ধি সেই বাবুটিরও হয়। ওই বাবুটিই আখ্যানে যোগীর উদ্দিষ্ট এবং কথকের উদ্দিষ্ট। নৈতিকতার দ্বন্দ্ব এবং মূল্যবোধের চেনা চিহ্নগুলি ছেড়ে আসা আধুনিক যাপনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নীতি-মূল্যবোধের ধারণাগুলি সময়ের সাথে বরাবর বিবর্তিত হতে থাকে। প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের সঙ্গে পূর্বজরীতির সাহিত্যিকদের দ্বন্দ্বের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল এই নীতি-মূল্যবোধের মানদণ্ডগুলির পরিবর্তন। আখ্যানের ভেতরের পরিবর্তনও এই পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার, সাদাত হাসান মান্টো বা চুঘতাইদের সঙ্গে প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ণধারদের বিরোধের অন্যতম উপাদান ছিল ওই নীতি-মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। ইলিয়াসের বক্তব্য ছিল যে, সাহিত্যে বা সমাজে যে নীতিবোধ, অনেক কমিউনিস্টও যে নীতিবোধে বিশ্বাসী, তাতে তাঁর আস্থা নেই।¹⁹⁹ মার্ক্স নিজে নীতিবোধের ব্যাপারে কোনও ধ্রুবনির্দেশ দিয়ে যাননি, তেমন অনড় নীতিবোধে তিনি বিশ্বাসও করতেন না। জগদল আদর্শের ঠিক-ভুলে বিশ্বাস রেখে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করে ডেমোক্র্যাটরা, বিপ্লবী পার্টির তেমন বিশ্বাস বর্জনীয়।²⁰⁰ অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নৈতিকতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন বলেই শ্রেণিহিংসা নিয়ে ভদ্রলোকসুলভ ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করতেন না এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশের থেকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উৎপাদন নীতির সমালোচনায় তাঁর মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।²⁰¹ মাইকেল রোজেন

মার্ক্সের নৈতিকতার ধারণা হেগেলের ‘Moralitat’ ও ‘sittlichkeit’-র ধারণার সঙ্গে তুলনা করে মার্ক্সীয় নীতিবোধের উৎস বুঝতে চেয়েছেন। হেগেল যেখানে বলছেন যে, জিটলিশকেইট মোহালিটেটের সম্পূরক কিন্তু বিকল্প হতে পারে না, সেখানে মার্ক্সের মতে আধুনিক রাষ্ট্রে জিটলিশকেইট নির্ধারিত হয় মোহালিটেটের বিমূর্ততার দ্বারা এবং তারা অবিচ্ছেদ্য।²⁰² নৈতিকতার কোনও ধ্রুব মাপকাঠি থাকতে পারে না, বরং তা আপেক্ষিক। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়তন্ত্র, মূল্যবোধ ইত্যাদি রয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটে, সেই নীতি-মূল্যবোধ যুগে যুগে সম্পাদিত হয়ে চলে। আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি পরিমার্জিত হয়। চল্লিশের দশকের কোনও কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্বের নৈতিকতা, মূল্যবোধ দেশভাগ-পরবর্তী সংকটের সময় বদলে যেতে পারে। আবার, ষাট-সত্তরের দশকের কমিউনিস্ট ব্যক্তির নীতিজ্ঞান পূর্ববৎ থাকবে না। বিশ্বায়ন-উদারিকরণ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বদল সার্বিক নীতি-মূল্যবোধের ধারণাগুলি পাল্টেছে। মণিমোহন ১৯৭৬-৭৭ সালে সন্তানকে ‘টিনটিন’ পড়তে না দেওয়া, ক্যাডবেরি খেতে না-দেওয়ার মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন, কারণ ওগুলি উচ্চশ্রেণিঅবস্থানের দ্যোতক। বিশ্বায়িত জমানায় এগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে- এগুলি উপভোগ না-করা নীতিগত রক্ষণশীলতার সামিল। ভুবনায়িত সময়ে আন্তর্জাল, চলভাষ, এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বিবর্তন ঘটেছে। অনড় নীতিগত অবস্থান, কয়েক দশক আগের মূল্যবোধ দিয়ে এর বিচার করা অসম্ভব। কারণ, প্রকৌশল, লগ্নিপুঁজির ক্রমবদল ইত্যাদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। রণজয় নব্বইয়ের দশকে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ জারি রেখেছিল, যে প্রতিরোধ হয়তো তথাকথিত ‘সুস্থ মস্তিষ্কের’ কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হত না। রণজয় বহির্জগতের সব সাংস্কৃতিক বদল, আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্তর্জগতের বিপ্লবী পরিস্থিতির ভেতর বাঁচছিল বলেই নীতি-মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। নীতি-মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে ট্রুটস্কির মতামত প্রণিধানযোগ্য। ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের নীতিবোধ নিন্দনীয়, এমনটা না। ভারতীয় সমাজের বহু রাজনৈতিক দ্রোহে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের উপস্থিতি উজ্জ্বল, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির অবদান

অনস্বীকার্য। বাস্তবের যে কমিউনিস্টরা মণিমোহন, রণজয়, কালী সাঁতারার সমান আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনচেষ্ঠায় সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই নির্বিত্তের শ্রেণিযুদ্ধের প্রতি নিষ্ঠ। তাঁদের অনেকের অবদান, কৃষক-শ্রমিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, সৎ বিপ্লবচেষ্ঠা প্রশংসনীয়। কিন্তু, ভদ্রলোক মধ্যশ্রেণি যখন নিজেদের শ্রেণিঅবস্থান থেকে নির্বিত্তের শ্রেণিসংগ্রামের সবটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন তা নির্বিত্তের দ্রোহ-পরিসরে সমস্যা তৈরি করে। নিজেদের শ্রেণির অর্জিত শিক্ষা-রুচি-নীতিবোধ দিয়ে ভদ্রলোক মধ্যশ্রেণি যখন নিম্নবর্গের আন্দোলনের ঠিক-ভুল মেপে নিতে চায় এবং তা সাজাতে চায়, তখন তা নিম্নবর্গের দ্রোহক্ষেত্রে সমস্যাজনক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোক সাহিত্যিক নিজের অর্জিত মূল্যবোধ-চেতনা-রুচি অনুযায়ী নিম্নবর্গের নির্বিত্তের দ্রোহপ্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করতে চাইলে, তাতে বিস্তর গলদের সম্ভাবনা থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি নির্বিত্তের, নিম্নবর্গের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া পার্টি, কিন্তু মধ্যশ্রেণি থেকে আসা ভদ্রজনও তার সদস্য হন। দুই শ্রেণির সংস্কৃতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ একে অপরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে; বহু ক্ষেত্রে নেতৃত্বে মধ্যশ্রেণি থেকে আগত সদস্যরা থাকার দরুণ তাঁদের নৈতিকতা-মূল্যবোধ আধিপত্য করে। প্রত্যেক সদস্যই পার্টিতে তাঁদের ব্যক্তিগত বিকাশের ও যাপনের কিছু চিহ্ন নিয়ে আসেন। তাঁদের নিজেদের শ্রেণিঅবস্থানের, সামাজিক অবস্থানের, বর্ণগত অবস্থানের, লৈঙ্গিক অবস্থানের চিহ্ন নিয়ে পার্টিতে আসেন। ‘কমিউনিস্ট মূল্যবোধ’ (এটি কোনও পরম ধ্রুবক আদর্শ মডেল না) দ্বারা সেইসব চিহ্নগুলি পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হতে থাকে। প্রথমতঃ, এই পরিমার্জন ও পরিশোধনের পদ্ধতি রাতারাতি সম্পন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সুবিধাপ্রাপ্ত মধ্যশ্রেণি থেকে আগত নেতৃত্ব-সদস্যদের নৈতিকতা-মূল্যবোধ যদি উচ্চসমন্যতা দিয়ে অ-সুবিধাপ্রাপ্ত নির্বিত্তশ্রেণি থেকে আসা সদস্যদের প্রভাবিত করে ফেলে, তাহলে শ্রেণি-রাজনীতির থেকে নৈতিকতা-মূল্যবোধগত বিশুদ্ধির ওপরে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব ন্যস্ত হয়। সর্বোপরি, ‘বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট’ বলে কিছু হয় না- শ্রমজীবীর স্বার্থে প্রগতির অভিমুখে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার নিয়ত যাত্রা চলতে থাকে। মধ্যশ্রেণির ভদ্রজনের নীতি-মূল্যবোধ থেকে রক্ষণশীল বুর্জোয়া-মতাদর্শজনিত উপাদানগুলি ক্ষয়

পেতে পেতে এবং শ্রমজীবী নিম্নবর্গের নীতি-মূল্যবোধ থেকে পশ্চাদপদ উচ্চশ্রেণি-মতাদর্শজনিত উপাদানগুলি ক্ষয় পেতে পেতে নতুন সমাজব্যবস্থার নীতি-মূল্যবোধ নির্মিত হওয়া কাম্য। রাজনৈতিক আখ্যানের ভাষা এই বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারলে একাধারে বাস্তবানুসারী ও বিবর্তনপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর ওসমান, হাডিড খিজিররা এমন উদাহরণ। ‘আটটা নটার সূর্য (২০১৩)’ উপন্যাসের দ্রোণ, নিরুপম, পাঞ্চালীরা এমন বিবর্তনপ্রবণ।

সমাজতান্ত্রিক পরিসরে সাম্যবাদী অর্থনীতিতে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় নীতি ও মূল্যবোধের সমসত্ত্ব প্রয়োগ হবে, এমনটা নয়। লিয়ঁ ট্রটস্কি ১৯৩০-র দশকের সোভিয়েতের নীতি মূল্যবোধের সমালোচনা করছেন ‘দেয়ার মর্যালস অ্যান্ড আওয়ার্স (১৯৩৮)’ প্রবন্ধে। অক্টোবর বিপ্লব সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে দিয়েছিল, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির দাপট কমিয়েছিল, আমলাতন্ত্রকে সরিয়ে শ্রমিকের ক্ষমতায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ফলে সামাজিক নীতিবোধ-মূল্যবোধে পরিবর্তন আসছিল। স্তালিনের জমানায় সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির আমলায়ন ঘটল, জনগণের ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রীয় নজরদারির অধীনে চলে এল, ক্রেমলিনের একচ্ছত্র আধিপত্যে ক্ষমতার যথেষ্ট ব্যবহার শুরু হল- ফলে নীতি-মূল্যবোধের পুনরায় পরিবর্তন ঘটল।²⁰³ বলশেভিক নৈতিকতার অবক্ষয় সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে ট্রটস্কি বুর্জোয়া নৈতিকতা ও বিপ্লবী নৈতিকতার পার্থক্যের কথা বলছেন। বলশেভিকের নৈতিকতা উচ্চমানের, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টি গঠনে তা প্রয়োজনীয়, কিন্তু, “It is impossible to accomplish this task without complete independence from the bourgeoisie and their morality” (Trotsky 1938, 168) পেটি বুর্জোয়া, নির্বিক্ত, উদারনৈতিক প্রত্যেকের নৈতিক অবস্থানে তফাৎ রয়েছে। বলশেভিকদের রাজনৈতিক নীতিবোধ বিমূর্ত হতে পারে না বিশেষতঃ যে পুঁজিবাদী সমাজের নীতিবোধ শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্যের ওপরে ভিত্তি ক’রে তৈরি, তার বিরোধিতা আবশ্যিক। সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি-মূল্যবোধ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভরশীল বলেই

শোষকশ্রেণি তাকে নিজেদের স্বার্থে সাজিয়ে-বানিয়ে নেয়। বুর্জোয়া মতাদর্শে পুষ্ট শ্রেণিগুলি কখনোই শ্রেণিসংগ্রামকে মেনে নিতে চায় না, ট্রটস্কির ভাষায় ‘official morality’ চাপিয়ে দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামকে অনৈতিক এবং নির্বিত্তের রুচি-উদ্‌যাপন-মূল্যবোধকে অনৈতিক বলে দাগিয়ে দেয়। “Morality is one of the ideological functions in this struggle.” (Trotsky 1938, 170) ইলিয়াসও বিশ্বাস করতেন যে, নীতিবাগীশ হওয়া মার্ক্সবাদের সঙ্গে বেমানান এবং বুর্জোয়া সমাজ ওই নীতিবাগীশ মূল্যবোধ দিয়ে শোষণের কাজ অব্যাহত রেখেছে।²⁰⁴ প্রকৃত/সহি মার্ক্সবাদী বলে কিছু হয় না, কিন্তু ‘প্রকৃত মার্ক্সবাদী’ নামক বিমূর্ত উচ্চতায় পৌঁছাতে চেয়ে নীতি-মূল্যবোধের বিশেষ সেটের উপাদানের অনুশীলন চালিয়ে যান বামপন্থীরা। প্রকৃত মার্ক্সবাদী অনুশীলনকারী এবং ‘ভাল মার্ক্সবাদী’ এই দু’টি বিষয়ে ফারাক রয়েছে। প্রকৃত মার্ক্সবাদী অনুশীলনকারী সমাজের রক্ষণশীল অনুশীলনকে বিপদাপন্ন করেন এবং প্রচলিত অনুশাসন ভাঙতে ভাঙতে সমাজবদলের পথ খুঁজে নেন।²⁰⁵ নিপীড়িত নির্বিত্তের ক্ষমতায়নের পথে সহায়ক না যে নীতিবোধ-মূল্যবোধ, যা প্রগতিশীলতার বিপ্রতীপ, সেটাই কমিউনিস্ট নীতি-মূল্যবোধের পরিপন্থী। বৈপ্লবিক নীতি-মূল্যবোধ বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশলের নিয়ত অনুশীলনের সঙ্গে অঙ্গঙ্গী-এর কোনও পূর্বনির্ধারিত ‘আদর্শ রূপ’ থাকতে পারে না। বিপ্লব-পরবর্তী সমাজে রাতারাতি নীতি-মূল্যবোধ বদলে যায় না, পুরনো ব্যবস্থার গর্ভ থেকে নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মায় বলে তার কিছু জন্মচিহ্ন থেকে যায়,²⁰⁶ তেমনি পুরনো সমাজব্যবস্থার (বুর্জোয়া সমাজের) বহু নৈতিকতা-মূল্যবোধজনিত অবস্থান নতুন সমাজেও থেকে যায়। সর্বোপরি, সমাজপরিস্থিতি অনুযায়ী নৈতিকতার উপাদান পরিবর্তিত হয়। উন্নত পুঁজির সমাজব্যবস্থায় নির্বিত্তের মূল্যবোধ আর অনুন্নত পুঁজির সমাজব্যবস্থায় নির্বিত্তের মূল্যবোধের কিছু উপাদানে ফারাক থাকবে। গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ যে দেশে বেশি হয়েছে এবং অনুশীলিত হয়েছে, সেখানকার জনগণের নৈতিকতা, মূল্যবোধ তুলনামূলক কম গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের দেশের জনগণের নৈতিকতা, মূল্যবোধের থেকে আলাদা। বামপন্থার অনুশীলনেও স্বাভাবিক ফারাক থাকবে। অভিন্ন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণা নিয়ে কিংবা ‘বামপন্থী মূল্যবোধ’-কে আদর্শ জগদ্বল ধরে নিয়ে বিচার

করলে নির্বিত্ত-নিম্নবর্ণের বাস্তবিক নীতি-মূল্যবোধের হৃদয় পাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক আখ্যানের ক্ষেত্রে লেখকের মনোবাঞ্ছাগত চিন্তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতীয় সমাজে শ্রেণিভাগ একমাত্র বৈষম্যের ভিত্তি না। ধর্মগত, বর্ণগত এবং লিঙ্গগত বৈষম্য ভারতীয় আর্থ-রাজনীতির ভিত্তিকে পরিপুষ্ট করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। ভিন্নস্তরের নৈতিকতা-মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গগত স্তরভাগ। শ্রেণিমুক্তির আন্দোলনের নৈতিকতা বলশেভিকসম হলেও লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল্যবোধ পশ্চাদপদ, এমন বাস্তবিক উদাহরণ রয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক আখ্যানে এর হৃদয় মেলে। আবার, লৈঙ্গিক সাম্যের নৈতিকতায় উচ্চাবস্থানে থেকেও বর্ণবৈষম্যের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখেন, এমন বাস্তবিক উদাহরণ সমাজে রয়েছে। ভারতীয় উপন্যাসের কুশীলবদের এমন বহু স্তরের উপাদানে গঠিত বিভিন্ন সেটে ভাগ হওয়া বাস্তবিকতার প্রকাশ। বাঙালি উপন্যাসিকরা নিজেরা যে নীতি-মূল্যবোধের সেটে বিশ্বাস করেন, উপন্যাসের কুশীলবদের মধ্যে সেই নীতি-মূল্যবোধের দ্বন্দ্বিক অবস্থান ক্রিয়াশীল থাকে। আখ্যানের পরতে পরতে লেখকের বিশ্বাস-করা নৈতিকতা, মূল্যবোধ ছড়িয়ে থাকে এবং শেষে তা প্রতিষ্ঠা পায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি (১৯৫৯)’ উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট সমকামিতাকে পশ্চিমী মূল্যবোধ থেকে উদ্ধৃত অপরাধ বলে মনে করত- একইরকম অপরাধের তালিকায় ছিল কুমারির মাতৃত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উন্মাদরোগ ইত্যাদি।²⁰⁷ নিশানাথের দীর্ঘ স্বগতকথনে ভারতবর্ষের তথা বাংলার সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, সামাজিক অসুখ ইত্যাদি বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়। নিশানাথের বকলমে স্বয়ং কথক তাঁর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পাঠকের সামনে হাজির করেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলি, বিশেষতঃ সমকামিতা ভারতীয় সমাজে নিন্দিত; কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও দীর্ঘসময় এমন রক্ষণশীল ও পশ্চাদপদ মানসিকতা লালন করত। বিবাহ-বিচ্ছেদ ভারতীয় সমাজে সমালোচিত হয়, কারণ হিন্দু বিবাহে বিবাহকে ‘জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন’ বলে স্বীকার করা হয়। ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁদের ‘ব্যক্তিজীবনে’ এমন সামাজিক চেতনা নিয়েই বড় হন। ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত নীতি-মূল্যবোধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নীতি-মূল্যবোধকে প্রভাবিত করবে, এটা অস্বাভাবিক না, কারণ সমাজজীবনের প্রচলিত ধারণাগুলি

নিয়েই তাঁরা বড় হচ্ছেন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। উন্মাদরোগ তথা মানসিক অসুস্থতাকে গুরুতর অসুখের স্বীকৃতি দিতে এবং মানসিক অবসাদকে গুরুত্ব দিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বহুবছর সময় লেগেছে। দীপেন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্ররা চিরাচরিত মূল্যবোধ ও কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যবোধের সেটের মধ্যে দিয়েই নিজেদের চেতনা লালন করেছে। অথচ, উপরিউক্ত সবক'টি নীতি-মূল্যবোধ বর্তমান সময়ে এসে পাচ্ছে। সমকামিতা, কুমারীর মাতৃত্ব 'অপরাধ' না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণায় মদ্যপান চারিত্রিক স্থলন বলে মানা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যও এমন মনে করেন। বিশেষতঃ কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কমিউনিস্টদের নৈতিকতা, মূল্যবোধে এই বিষয়গুলি গুরুতর বলে বিবেচিত হত- মণিমোহনের মূল্যবোধ আহত হয় যখন তার বালক সন্তান টিনটিনের কমিকস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাডকের সঙ্গে মদ খাওয়ার কথা বলে, গরিব না-হয়ে বাঁচার কথা বলে।²⁰⁸ ভোগ্যপণ্যের উপভোক্তা হওয়া 'কমিউনিস্ট মূল্যবোধ'-এর পরিপন্থী, এমন ধারণা ছিল দীপেন্দ্রনাথের। 'বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)', 'গগন ঠাকুরের সিঁড়ি' দু'টি উপন্যাসেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। 'বিবাহবার্ষিকী' এবং 'শোকমিছিল (১৯৭৩)'-এ কমিউনিস্ট প্রট্যাগনিস্ট পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব ভুগছে পার্টির ভাঙন (১৯৬৪) ও পার্টির নীতি-কৌশলগত অবস্থানের জন্য।²⁰⁹ এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য কোনও ধর্মীয় পুস্তক মেনে আসছে না। কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যক্তিগত বোঝাপড়া এবং ব্যক্তিগত বিচারের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে আসছে। যৌনতা বিষয়ে ভারতীয় তথা বাঙালি আখ্যানকারেরা শ্লীল-অশ্লীল, রুচি-কুরুচি, সৌন্দর্য-কলুষিত ইত্যাদি দ্বন্দ্ব ভোগেন- তাঁদের এই মূল্যবোধ উপনিবেশিত অবস্থান থেকে উদ্ভূত। বাংলার মার্ক্সবাদীরা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ থেকে এসেছিলেন, ফলে 'নিচুমানুষ'/'অ-ভদ্রসমাজের' ভাষাকে গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যাখ্যান ছিল, কারণ তাঁদের মূল্যবোধে এই ভাষা খাপ খায় না। যৌনাচারের বাস্তবিক অভিব্যক্তিগুলি উপরোক্ত দ্বন্দ্ব ভোগার পরে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সাহিত্যবোধের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। ইংরেজদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, শ্লীলতাবোধ, ভাষাপ্রকল্প ইত্যাদি তৈরি করে নিয়েছিল 'একদল যৌক্তিক ভদ্রবেশী সাধুভাষী মধ্যশ্রেণি'কে।²¹⁰ ইলিয়াসের আখ্যানে যৌনতা

কোনও কুশীলবের অন্য শারীরবৃত্তীয় আচরণ কিংবা মানসিক প্রবাহের মতোই স্বাভাবিক, উপরিউক্ত মধ্যশ্রেণির চোখে যা দৃশ্যীয় ভাবনার প্রকাশ। ক্ষমতা মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যৌনাচারকেও নিয়ন্ত্রণ করছে, একটা নৈতিক খোপে আটকে দিচ্ছে। ইলিয়াস সেই খোপ থেকে আখ্যানের প্রথামাফিক কথনকে বের ক’রে আনছেন। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর ওসমান স্বমেহন করে রানুকে কল্পনা ক’রে। অসুস্থ সমাজে নিঃসঙ্গ একজন মানুষ স্বমেহন করছে, এভাবেই বিষয়টি দেখতে চেয়েছেন ইলিয়াস। (সাক্ষাৎকার ৪০)

‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে ক্ষমতাকাঠামোর তৈরি ক’রে দেওয়া আরেকটি যৌনহকে অন্তর্ঘাত ঘটান ইলিয়াস। কুলসুম তমিজের বাপের থেকে শারীরিকভাবে বেশি আকৃষ্ট হয় সৎ ছেলে তমিজের প্রতি। তমিজের বাপের শরীরের প্রতি কুলসুমের নিষ্পৃহ দৃষ্টি যৌনাঙ্গের সূত্র ধরে আসে- এই ভাষাটি প্রচলিত সাহিত্য-নৈতিকতায় অন্তর্ঘাত ঘটায়- “লুঙ্গি আরেকটু ওপরে উঠলেই বুড়ার কালো কুচকুচে বিচির ওপর ন্যাতানো নুখানাও বেরিয়ে পড়বে। ওটা দেখে লাভ কী কুলসুমের।” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ১৭) তমিজের বাপের আধো-ঘুম আধো-জাগরণে দেখা স্বপ্ন আর পাওনা শোলোক নিয়ে তার আগ্রহ। একইসঙ্গে তমিজের বাপের সঙ্গে না-হওয়া সঙ্গম আর ‘শূন্য কোল’-এর দ্বন্দ্ব তার অস্থিরতা প্রকট করে।²¹¹ একদা ‘প্রগতিবাদী’ সাহিত্যসংগ্রহের যে নীতিবোধ মাটো, চুঘতাইয়ের লেখা আখ্যানকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলেছিল, সেই নীতিবোধের অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে তমিজের সঙ্গে তার সৎ মা কুলসুমের মিলনদৃশ্য বর্ণিত হয়। তমিজের বাপের খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তার শরীরের গন্ধ তখন শুধুই উপলক্ষ্য মাত্র। তমিজের বাপের সঙ্গে তমিজকে গুলিয়ে ফেলে কুলসুম, কুলসুমের বুক থেকে তমিজ তার ‘বাপের গতরের ওম’ নিতে চায়। সামাজিক সম্পর্ক না, দু’জন নারী-পুরুষের অনুমোদনসাপেক্ষ যৌনতার স্বাধীনতা এখানে প্রাধান্য পায়। এহেন সমাজকথিত অনৈতিক যৌনাচারের কথনে মৃত তমিজের বাপকে আখ্যানের বাস্তবতায় হাজির করে কথক- “আর তমিজের বাপ অনেক দূরে কাংলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয় তমিজের তবন আর কুলসুমের শাড়ি।” (ইলিয়াস ১৯৯৮, ২৫৫) মৃত তমিজের বাপের গরহাজির থেকেও হাজির

থাকা সমাজনির্দেশিত ‘অনৈতিক’কে নৈতিক ন্যায্যতা দেয় না বরং তাকে খানিক ঠাট্টা করে। ইলিয়াস যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধে সমাজকে দেখছেন, সেখানে বিবাহকে ‘পজেসিভনেস’ হিসাবে দেখছেন এবং এমন সমাজ চাইছেন যেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কে কোনও বাধা থাকবে না।²¹² দু’জনের পারস্পরিক অনুমোদন থাকলে তাদের মিলনে কোনও সংস্কার, পাপবোধ অপরাধবোধ ইত্যাদি বাধা হয়ে না-দাঁড়াক, এটিই ইলিয়াসের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ। পূর্ববর্তী প্রগতিশীল বামপন্থী সাহিত্যিকদের থেকে তাঁর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এই উপাদানের ক্ষেত্রে তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ধৌলি’ গল্পে দলিত প্রান্তিক ধৌলি উচ্চবর্গের দ্বারা শোষিত হয়ে গণিকার পেশা বেছে নেয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ কর্তৃক নির্ধারিত যৌনতার খোপ ভেঙ্গেচুরে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জন করে। মহাশ্বেতা অহেতুক শ্লীল-অশ্লীল, রুচি-কুরুচির দ্বন্দ্ব না ভুগে ধৌলিকে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে আঘাত করেছেন। ফ্যাঁতাডুদের মধ্যে ডিএস এবং পুরন্দর ভাটের অবদমিত যৌনতার প্রকাশ ঘটে যথাক্রমে তাদের আচরণে এবং কবিতায়। রাজনৈতিকভাবে অশুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক বৈষম্যে ভরপুর একটা সমাজে তাদের ভাষা ভদ্রজনের নীতি-মূল্যবোধের অন্তর্ঘাত হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বামপন্থী মূল্যবোধের উপাদানগুলিও তাদের ওপর প্রযুক্ত হয় না; তাদের দায়ও নেই বামপন্থী মূল্যবোধকে ধারণ করার। বরং প্রচলিত ব্যবস্থার নীতি-মূল্যবোধকে ঠাট্টা, খিল্লি করতেই তারা সদাতৎপর। মহাশ্বেতা, ইলিয়াস, দেবেশ, নবাবুগের মতো কতিপয় লেখক আখ্যানে নীতি-মূল্যবোধের ওই প্রচলিত উপস্থাপনায় সচেতন অন্তর্ঘাত ঘটান।

বসাই টুডু ও রুহিতন কুর্মি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে একই বছরে (১৯৭৭) নির্মিত দু’ই আদিবাসী অ-ভদ্রলোক অ-মধ্যবিত্ত চরিত্র। আগের অধ্যায়ে ওই দু’টি উপন্যাস নিয়ে কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণ রেখেছি। রুহিতন কুর্মির সঙ্গে বসাই টুডুর মিল এটাই যে, সাংগঠনিক পরিসরে দু’জনেই একা হয়ে যায় এবং পার্টির প্রতি নিষ্ঠা আনুগত্যে দু’জনেরই খামতি ছিল না কোনও। কিন্তু, বসাই টুডু পার্টি পরিসরের বিরুদ্ধে দ্রোহঘোষণা করে, শ্রেণিচেতনার বিকাশে

পার্টির মতাদর্শের সঙ্গে অনুশীলনের বিরাট ফাঁক বুঝতে পারে। কিন্তু, রুহিতন কুর্মিকে সেই সচেতনতার সুযোগ দেন না সমরেশ। দু'জনেই একই সময়ে দ্রোহী, যদিও তাদের আখ্যানস্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্র আলাদা (যথাক্রমে পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান)। রুহিতনের চিত্রায়ণ তাই একপেশে হয়ে যায়, কারণ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও তার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বের বহুস্তর ছুঁতে পারে না। তার সাঁওতাল জাতি-পরিচিতি কমিউনিস্ট পার্টির ভদ্রলোক-বাবুদের টিপ্পনির শিকার হয়, বসাইকেও বারবার এহেন টিপ্পনি ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। কিন্তু, বসাই তার সাঁওতাল-পরিচিতির গর্বকেই হাতিয়ার ক'রে তোলে, কমিউনিস্ট মতাদর্শে নতুন পথের দল গড়ে তোলে। রুহিতনের এই উত্তরণ নেই, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ যেভাবে নকশাল আন্দোলনকে দেখাতে অভ্যস্ত, সেভাবেই রুহিতনের আখ্যান পরিণতি পায়। বসাই তার শ্রেণি ও জাতি পরিচিকে মেলাতে পারে বলেই সাঁওতাল জনজাতির কাছে কিংবদন্তীসম হয়ে ওঠে, পাঁচবার 'মরেও' তার মৃত্যু হয় না। কিন্তু, রুহিতন এই পরিচিতিগুলির রাজনৈতিক স্পষ্টতা অর্জন করতে পারেনা বলেই ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। রুহিতনের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়া তার ওই নিঃসঙ্গতাকে প্রকট ক'রে তোলে, তাকে সামাজিক পরিসরে বিবর্জিত ক'রে তোলে; কিন্তু, কুষ্ঠরোগ না হলেও রুহিতনের রাজনৈতিক-সামাজিক একাকীত্ব কিছুমাত্র লঘু হতো না। বসাই সৎ, মতাদর্শনিষ্ঠ কালী সাঁতরাকেও তার শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ী সমালোচনা করতে পারে, সামন্ত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে প্রশ্নজর্জর করতে পারে- তাতেই তার দ্রোহপথের নবোন্মোচন হয়। কিন্তু, রুহিতনের সঙ্গে দিবা চৌধুরী বা খেলুর সম্পর্ক শেষাবধি আজ্ঞাকারী-আজ্ঞাবহ হয়েই থাকে- রুহিতন ট্রাজিক চরিত্র হয়ে রয়ে যায়, তার রাজনৈতিক বিবর্তন হয় না। বসাই টুডুর চেতনা ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক পরিসরের গভীর থেকে উঠে আসে বলেই ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বগুলি তার বক্তব্যে প্রকাশ পায়- শ্রেণি-প্রতর্কের সঙ্গে বর্ণ-প্রতর্ককে চিহ্নিত ক'রে দেয় সে- “বামুন কায়েত খেতমজুর হয় না। হলে খেতমজুর সমাজেও ছুয়াছুত হতো।” (দেবী ১৯৮০, ২৬) নিজের সাঁওতাল জাতিপরিচিতিকে কোনওভাবেই ভুলতে চায় না সে, বরং শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সেই

পরিচিতির উদ্‌যাপনও চায়। সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েও বসাই নকশালী নয়- নকশাল আন্দোলনের মধ্যবিত্ত রোম্যান্টিকতা ছেঁটে ফেলতে চায় সে। তাই ভদ্রলোক-পরিসরের সাহিত্য এবং বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই তা উৎক্রম ঘটায়। হয়তো ষাট-সত্তর দশকের দ্রোহের প্রতি মহাশ্বেতা ও সমরেশের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যেই এমনটা হয়। পার্থক্যের এই ভিত্তিগুলি বাদ দিলে রুহিতন ও বসাই দু'জনেই কিন্তু সৎ, আদর্শবান, পার্টিকাঠামোর প্রতি নিষ্ঠ (বসাইয়ের দ্রোহের আগে পর্যন্ত) এবং শাসকবিরোধী। বসাই টুডু পার্টির জেলানেতৃত্ব সামন্তকে একবার নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রাণে বাঁচায় এবং আরেকবার সামন্ত বস্মেতে পার্টি-মিটিঙে যাবে বলে বসাই নিজের একমাত্র সম্বল সাইকেল বেচে পঞ্চাশ টাকা এনে দেয় কারণ পার্টি অফিসে টাকা ছিল না।²¹³

‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর আনোয়ার ব্যক্তিগতভাবে সৎ, তত্ত্বনিষ্ঠ। ভোটের মাধ্যমে না বরং সর্বাঙ্গিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কৃষক-শ্রমজীবীর অধিকার রক্ষার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে বলে তার বিশ্বাস। আনোয়ার শহরে যে ভূমিকায় তাত্ত্বিক আলোচনা চালায়, গ্রামে মতাদর্শগত অনুশীলনে তা মসৃণ পথে এগোয় না। চেংটু তাকে তার সামাজিক-অবস্থান ও শ্রেণি-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ক’রে দেয়- বসাই টুডু যেভাবে কালী সাঁতরাকে সচেতন করে। “ধরেন আপনেও বড়োলোকের ঘরের ছেলে, তাইও বড়োলোক” (ইলিয়াস ২০১৫, ১৯৯) আনোয়ার একথায় রেগে যায় না কারণ খয়রার গাজি বিপ্লবতত্ত্বানুযায়ী তার শত্রু হলেও তারা দু'জনেই উচ্চ সামাজিক-অবস্থানের ভদ্রলোক বৃত্তের। চেংটু তার সহযোদ্ধা ভদ্রলোক আনোয়ারকে দায়িত্ব দেয় তার শ্রেণিশত্রু ভদ্রলোক খয়রার গাজিকে নজরবন্দি রাখতে। আনোয়ারের শহুরে বুদ্ধি গ্রামীণ রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানের প্যাঁচ ধরতে অপারগ। তাই খয়রার গাজীকে গৃহবন্দী থাকার নির্দেশ দেওয়ার পরে সে নিজেই হতবাক হয়ে যায় তার বড়চাচার সঙ্গে খয়রার গাজীর ভদ্রলোকসুলভ শ্রেণিবন্ধুত্বের প্রকাশ দেখে। (২০২) আনোয়ারের বদলে লেখক ইলিয়াসের পছন্দের নির্মাণ আলিবিবস্ত্র।

ফ্যাঁতাডুদের রাজনীতিগত বিশুদ্ধি (Political Correctness) নেই। তারা সমাজনির্মিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মেনে চলে না। আবার, প্রধান তিন ফ্যাঁতাডুর মধ্যে এই বিষয়ে অমিল প্রচুর। মদন ডিএসকে বিভিন্ন সময় বলে, “ফ্যাঁতাডুরা অ্যাটাক করে, ভাঙচুর করে, নোংরা করে। বাট, নেভার চুরি” (২৪), “ফ্যাঁতাডুরা চুরি করে না” (৫৭) এবং ডিএস চুরি জোচ্চুরি ক’রে উপার্জন করার বাসনা প্রকাশ করলে মদন তাকে ধমকায়। ডিএস শেয়ারব্যবসা না বুঝলেও শেয়ারের দালালি করে এবং হাতটানের স্বভাবে খুচরো জিনিসপত্র সরায়।²¹⁴ ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর হাড্ডি খিজির কিছু উপরি-আয়ের জন্য মহাজনের মালপত্র সরায়।²¹⁵ রিক্তার গুদাম থেকে স্কু-ড্রাইভার, বল বেয়ারিং, সাইকেলের চেন ইত্যাদি ছুটকো জিনিস চুরি ক’রে বাজারে বেচে রোজগারের ইচ্ছের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা দু’টি- আর্থিকভাবে সম্পন্ন হওয়া এবং মহাজন রহমতউল্লার প্রতি ক্ষোভ মেটানো। নৈতিক-অনৈতিক নিয়ে খিজির চিন্তাশ্রিত নয়। ফ্যাঁতাডুদের মধ্যে মদনের নির্দিষ্ট উপার্জনপন্থা ও স্থায়ী আয় নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে অর্থাগম হয় তার। চোরবাজার থেকে কেনা পুরনো গ্রামাফোন কোনও বিত্তবানকে পুনর্বিক্রয় ক’রে²¹⁶, ‘আদার কত করে হন্দর চলেচে’ তার খোঁজখবর রাখে বড়বাজারে গিয়ে²¹⁷, বোঁদপড়া পুকুরে ‘জায়েন্ট কই’ ধরে এবং গৌড়ি-ত্যালাপিয়া ধরে চড়া দামে বাজারে বেচে দেয়, মোটরগাড়ির নম্বর মিলিয়ে জোড়বেজোড় খেলে টাকা কামায়। ডিএস মেজাজ খারাপ থাকলে শ্রমজীবী ফলওয়ালির সঙ্গে ইচ্ছে ক’রে ঝামেলা বাধায় বা পান-সিগারেটের দোকানের ছোট ব্যবসাদারকে অকারণে খিস্তি করে।²¹⁸ শ্রেণিবোধের কোনও উন্মেষ তার মধ্যে হয়না। নারীদের প্রতি সম্মানবোধও তার মধ্যে নেই, তাই রাস্তাঘাটে মেয়েদের কনুই মারা বা মৌখিকভাবে অপমান করা তার অভ্যাসগত প্রবৃত্তি। তিন-ফ্যাঁতাডুর প্রধান মদন ডিএসের ‘মেয়েদের প্রতি ছুকছুকানি’-তে অনুমোদন দেয় না। কিন্তু, সাহিত্য সম্মেলনে অনেক অনুরোধের পরেও পুরন্দরকে কবিতা পড়তে না দেওয়ায় মিস মালতীলতাকে ডিএস যখন “আমরা মা-বোনদের ইজ্জত দিতে জানি। তাই আপনার মতো বেঁড়েখানকিকে বেঁড়েখানকি বললাম না” (ভট্টাচার্য ২০০৬, ৮৪) অপমান করে, তা মদনের অনুমোদন পায়। প্রগতিবাদী সাহিত্যে কিংবা মার্ক্সবাদী সাহিত্যধারায় একজন শ্রেণিবোধসম্পন্ন

আদর্শ প্রটাগনিস্ট এমন ‘বিচ্যুত’ নয়। কিন্তু, নবাবুণ ফ্যাতাডু-চোক্তারদের নিয়ে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের প্রকল্পনা করছেন না; গোলকায়িত সমাজে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত এবং শ্রেণিবোধহীন আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকদের প্রটাগনিস্ট বানিয়ে রাজনৈতিক লড়াই লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব তাদের মাথায় গেঁড়ে বসে আছে সামাজিক অধঃক্ষেপ হিসেবে। চোক্তারদের নেতা ভদি তার স্ত্রী বেচামণিকে বলে, “ব্যাটাছেলের ব্যাপারে নাক গলাবে না কতবার বলেছি।” (২৪২) কিন্তু বেচামণির ‘নাক গলানো’ ছাড়া চোক্তার+ফ্যাতাডুর অন্তর্ঘাতী পরিকল্পনা সাফল্য পেত কি? ওই সংলাপের সুত্রেই বেচামণি ভদিকে ‘ফের... ফের সেই অশৈল’ বলে প্রত্যুত্তর দিতে পারে। কথকের বর্ণনায় বেচামণি “একেই বেজায় মোটা তায় পাটভাঙ্গা লাল বেনারসি পরেছে বলে খোলতাই আরও বেড়েছে” এবং “বেচামণির মুখে সেই মহামায়া সুলভ হাসি” (২৪২)। বেচামণির মুখে মহামায়া সুলভ হাসি থাকে বলেই ফ্যাতাডুরা অভয় পায় এবং চোক্তারদের কার্যকারণ, অন্তর্ঘাতের নীলনকশা পোক্ত হয়। বেচামণি ভদিকে ‘গদি’ বলে কারণ, ‘সোয়ামির নাম মুখে আনতে নেই’। স্বামীর নাম মুখে না আনার পিতৃতান্ত্রিক নিয়ম মানার আড়ালে থেকে যায় ‘গদির বটকেরা’ বলে ঠাট্টা করা- বেচামণি ভদির সামনে মাথায় কাপড় দেয় না বা তাকে ‘আপনি-আজ্ঞে’ করে না। বেচামণি দেশি বা বিদেশি নারীবাদী তত্ত্ব পড়েনি, ‘নারীবাদ কী’ তা জানার পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত নয় সে। বেচামণি-ভদিরা উচ্চবর্গীয় পরিমণ্ডলে নারীবাদী অনুশীলনের আওতায় বাস করে না। কিন্তু চলতি পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের প্যারোডি বানিয়ে নিতে জানে ‘সফিস্টিকেশনের’ তোয়াক্কা না ক’রে। ‘কাঙাল মালসাট’-এর নারীরা ‘সাবভার্সিভ এবং সাটল’ এবং বেচামণি ফ্যাতাডু+চোক্তার মিলিত দ্রোহের নেপথ্যের ক্যানভাস।²¹⁹ যে ভদি বেচামণিকে “আহাহা, এ হল গে মদাদের ব্যাপার। বলি আর তুমি সাতকাহন করে বেড়াও” (৩৫০) বলে, সেই ভদিই বেচামণির সঙ্গে যৌথমালিকানায় অস্ত্রকারখানা খুলতে চেয়ে সরকারকে কার্ড দেয়। রাজনীতিগত বিশুদ্ধির প্রকল্পনায় ভাষা সবথেকে উল্লেখযোগ্য উপাদান- নবাবুণ মান্য ভাষার বিশুদ্ধি সচেতনভাবে গুলিয়ে দেন। যে অর্থমন্ত্রী উচ্চশিক্ষিত এবং মান্যভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত, সেই অর্থমন্ত্রীর মুখ দিয়ে ‘লে হালুয়া’-র মতো অপভাষা বেরিয়ে আসে।

ফ্যাতাডুদের নীতিবোধ, মূল্যবোধের সঙ্গে প্রমিতভাষ্য মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোক বাঙালির পদে পদে সংঘাত, কারণ কথক ‘বেবুন থেকে বাবু’ হয়ে ওঠা অথবা হতে হতে মাঝপথে আটকে যাওয়া বেবুনবাবুদের সাংস্কৃতিক নীতিবোধ এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে প্রথম থেকেই সন্দিহান। বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও লেখক-শিল্পী অর্থাৎ সমাজে নীতিকথা, মূল্যবোধের জ্ঞান ছড়িয়ে দেন যাঁরা, কথক তাঁদের ভূয়ো শান্তিনিকেতন-প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাদের নীতি-মূল্যবোধের ভণ্ডামি উন্মোচন (expose) ক’রে দিতে চাইছে। প্রতিটি অধ্যায়ে কথকের এহেন উন্মোচন-প্রকল্প আখ্যানস্তরে ক্রিয়াশীল থাকছে। ফলে, ফ্যাতাডু-চোজারদের প্রতিস্পর্ধী মূল্যবোধ এবং প্রথাভাঙ্গা নৈতিকতা আধিপত্য করছে। চোজার-ফ্যাতাডুরা সেবাকেন্দ্রের নাম ঠিক করে ‘মৃত্যুদূত নার্সিং হোম’, ভদি ঘর ভাড়া দেয় ‘বিবিধ অশুভ কাজ’-এ, ভিক্টোরিয়ার কিউরেটর কাবলে সেক্স ভকিলের ‘এক্সক্লুসিভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট’ পায়, কথক বাঙালির নীতি-মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও বামফ্রন্ট সরকার উভয়কেই পদে পদে খিল্লি করতে থাকে। সমাজব্যবস্থা বদলের মহান মতাদর্শগত সংগ্রামে ফ্যাতাডু-চোজাররা ব্রতী হয় নি। ফ্যাতাডুদের ক্রিয়াকলাপ ‘সংগ্রাম’ নয়, বরং ‘তান্ডব’। তারা এমন এক তাণ্ডবের উত্তরাধিকার বহন করছে যেখানে ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত, অসুখী, বখরা-না-পাওয়া, সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকিত মঞ্চে ঠাই-না-পাওয়া, ভোটে-হারা বিক্ষুব্ধ মানুষেরা ভণ্ডলবাদী এক নৈরাজ্যের তাণ্ডব শুরু করছে।²²⁰ উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে দেশি শাসকদের দ্বারা শাসিত মানুষের মনে একপ্রকার মূল্যবোধ-নৈতিকতা তৈরি হয়, যা ঔপনিবেশিক জমানার শাসকদের তৈরি নীতি-মূল্যবোধের থেকে আলাদা। ‘কাঙাল মালসাট’-এর কথক দেশি শাসক এবং শাসক-বশংবদদের তৈরি নীতি-মূল্যবোধের ধারাটিকেও প্রত্যাহ্বান জানায়। বেগম জনসন, দণ্ডবায়সেরা উত্তর-ঔপনিবেশি মূল্যবোধ-নৈতিকতার পাঠগুলিকে পুনর্পাঠের দ্বারা উন্মোচন করতে চায়। আখ্যানে কমরেড আচার্যসহ বামপন্থী শাসনের প্রতিনিধিদের ফাঁপা মূল্যবোধ ঠাট্টার বিষয় হয়ে ওঠে। ফ্যাতাডুদের সঙ্গে ভদ্রলোক কমিউনিস্টদের নীতিবোধ এক না হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যে ফ্যাতাডুদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম) পার্টির শাসনামলে। একদিকে ভুবনায়িত-উদারিকৃত আর্থ-রাজনৈতিক

চাপ, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের শাসকের উচ্চবর্গীয় মতাদর্শবাহী সংস্কৃতি কার্যকরী করার আর্থ-রাজনৈতিক চাপ- শহুরে নিম্নবর্গ ফ্যাতাডুদের হুল্লোড়-প্রত্যাখ্যান-উদযাপন এই দু'য়ের বিরুদ্ধেই।

সেট-তত্ত্ব, পাঠকের রাজনীতি এবং বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি

গণিতের সেট-তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যের রসাস্বাদন কি যুক্ত? উপন্যাসের নান্দনিকতা তথা যথার্থ রসাস্বাদন দু'টি বিষয়ের সম্পর্কের ওপরে নির্ভরশীল- ভাষা ও পাঠক। আরও নির্দিষ্ট ক'রে বললে, ভাষা দ্বারা নির্মিত আখ্যানের সঙ্গে পাঠকের সামাজিক অবস্থান থেকে পঠিত উপন্যাসের সম্পর্ক। কিন্তু, এই দু'টিই পরিবর্তনশীল। কল্পনাকে আখ্যানে রূপান্তরিত করার তথা উপন্যাসে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিতে পরিবর্তন হয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের দ্বারা। আর, পাঠকেরও বিভিন্নতা থাকে। সময়ভেদে পাঠকের পাঠাভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হয়। পাঠকের নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান থাকে। উপন্যাসের যে ভাষা, যে কল্পনা ও উপন্যাসের যে উপাদান পাঠক পড়ছে, তার প্রতিফলন পাঠকের সামাজিক অবস্থানের ওপরে নির্ভরশীল। বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাস পাঠের সময়। ইয়াউস ও ও অন্যান্য প্রতিগ্রহণ-তাত্ত্বিকেরা পূর্ব পাঠাভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু, পাঠকের সামাজিক অবস্থানের গুরুত্বও যথেষ্ট। রাজনৈতিক উপন্যাসের কাল্পনিকতা ও বাস্তবের সামঞ্জস্য বিচারে এটি গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক' ভেবে সন্তুষ্ট হতে পারে না, বরং বাস্তবের সঙ্গে এবং নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চায়। সেটাই প্রত্যেক পাঠকের কাছে উপন্যাসের রসাস্বাদন। এই সূত্রে উল্লেখ্য তপোধীর ভট্টাচার্যের মতামত, ঔপনিবেশিক পর্যায়ের উপন্যাসের আলোচনায়। 'উচ্চবর্গীয় চেতনার আশ্রয়' হিসেবে ঔপন্যাসিক দ্বারা নির্মিত কল্পনারঞ্জিত বাস্তবের মধ্যে আখ্যানবৃত্তের সন্ধান চলেছে। ঔপন্যাসিক ও পাঠক দু'য়ের সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রভাব সামগ্রিক সাহিত্যে পড়েছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে,

রাজা দুয্যন্তের দ্রুতগামী রথের সমান দ্রুততর ধাবমান আশ্রম মৃগের মতো এই ‘ঔপন্যাসিক’ কথাবস্তুও সামাজিক বাস্তবতার মাটি স্পর্শ করেন। এর পরিবেশক ও ভোক্তা- উভয়েই ম্যাকলে পরিকল্পিত সেইসব সাহেব হয়ে যাওয়া পরগাছা মানুষেরা যাঁরা শয়নে স্বপনে চলনে বলনে স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতির জমি থেকে নিজেদের শেকড় উপড়ে নিতে উদগ্রীব। (ভট্টাচার্য ১৯৯৫, ৪১)

পরিবেশক ও ভোক্তা বলতে তপোধীর লেখক ও পাঠকের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। তবে, শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক পর্বে নয়, লেখক ও পাঠকের সামাজিক অবস্থান ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়েও থেকেছে। বস্তুতঃ ‘আধুনিকতা’র অন্যতম শর্তই এটি। পাঠকের পাঠ-স্বাধীনতার কথা এবং তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, পাঠকের নিজস্ব প্রত্যাশা ও উপন্যাস গ্রহণ-বর্জনের দায়িত্ব থাকলেও সম্ভবদ্ব্যতা নেই^{২২১}। ‘পাঠক ও লেখকে দ্বন্দ্ব বাধলে’ সেই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু, সিরাজুলও পাঠকের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণি অবস্থানের প্রসঙ্গ আনেন নি তাঁর আলোচনায়। পাঠকের অবস্থানের প্রসঙ্গে গণিতের সেট-তত্ত্বের অবতারণা এইজন্যেই প্রয়োজন যে, লেখকের সঙ্গে পাঠকের সেট-সাবসেটের সম্পর্ক থাকে। পাঠক রাজনৈতিক উপন্যাসের রসাস্বাদনে আখ্যানের সত্যকে বাস্তবের সত্যের সঙ্গে মেলাতে চায়, আখ্যানস্থিত জনসমাজের গভীর আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে নিতে চায়। সময়ভেদে পাঠকের পাঠ-অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয় কারণ, বাস্তবের সত্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার বাস্তবতায় ঘটা আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি তার প্রতিক্রিয়ায় বদল আসে। পাঠক আখ্যানপাঠের বাইরের জগতে অসংখ্য উপাদানের সমাহারে তৈরি এবং সেই উপাদানগুলি নিয়েই পাঠকের নিজস্ব সেট তৈরি হয়। লেখকও তেমনই আখ্যানরচনার বাইরের জগতে অসংখ্য উপাদান দ্বারা গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ সেট। ওই লেখকের সেট আর পাঠকের সেট যে যে উপাদানে মিলে যায়, সেই ইন্টারসেকশন অংশে উপন্যাসটি পঠিত হচ্ছে এবং লেখক-পাঠকের সেতুবন্ধন হচ্ছে আখ্যানটির মাধ্যমে। বাংলা

উপন্যাসের মূল পাঠক ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অস্তিত্বশীল। তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা, পাঠরুচি এবং বহু দশকের শিক্ষালাভ এই পাঠকবর্গের নির্মাণ করেছে। নিম্নবিত্ত হলেও ‘ভদ্রলোক’ বলে পরিগণিত হওয়ার অন্যতম শর্ত পাঠরুচি- ভদ্রলোক উচ্চবর্গের নির্দিষ্ট ক’রে দেওয়া পাঠরুচি অনুযায়ী সাহিত্যসংগ্রহ ও সাহিত্যপঠনে মানিয়ে নেওয়া।²²² তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের তথা উপন্যাসের প্রধান ভোক্তা। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এহেন পাঠকবর্গকে এড়িয়ে আপাত-পাঠকের উল্লেখ করছেন। “তাকে ধরে এগোলে তবেই হয়তো আগদুয়ার ছেড়ে একেবারে বাংলা উপন্যাসের খাশকামরায় ঢোকা যাবে, প্রাতিষ্ঠানিক আখ্যানচুক্তির একটা আভাস মিলবে।” (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২, ২৪) শিবাজী আপাত-পাঠকের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বাস্তবের নির্মাণ আর আখ্যানের নির্মাণে পার্থক্য করছেন। বলছেন যে, কথক মূলত আপাত-পাঠকের সঙ্গে আলাপ-সংলাপ চালায়- আপাত-পাঠক উদ্ভূত হয় পাঠের গতিপ্রকৃতির নিজস্ব যুক্তিতে।²²³ লেখকের নিজস্ব দায় থাকে পাঠক নির্মাণ করার। যে দায় বিশেষতঃ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের,²²⁴ কারণ সেই যুগে ‘উপন্যাস’ নামক সংরূপটি সদ্য নির্মিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠককে উপন্যাসমুখী করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের পাঠরুচি গড়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্ররা। আখ্যানকথনের আঙ্গিক বদলে নিতে হয়েছিল- পাঠকের উদ্দেশ্যে লেখকের বার্তা যাচ্ছে আখ্যানের কথকের স্বরের মধ্যে দিয়ে। এই বার্তা নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং পাঠভঙ্গি নির্দেশ ক’রে দিচ্ছে।²²⁵ উপন্যাসের ভাষাতে বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আখ্যানবিশ্বে নবায়ন ঘটছে, পুরনো আখ্যানবিশ্বে পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের ফলে লেখক ও পাঠকের মধ্যেও কি একধরনের আপস সাধিত হচ্ছে না, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে ‘প্রাতিষ্ঠানিক আখ্যানচুক্তি’ বলছেন? এই আখ্যানচুক্তি অনুযায়ী পাঠক কাদের আখ্যান পড়তে চান তা বুঝে সেরকম লেখেন লেখক; আর, লেখকের থেকে নির্দিষ্ট আখ্যানপরিসর প্রত্যাশা করেই পাঠমুখী হন পাঠক। নান্দনিকতার পরিসর নির্মিত হয় এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে- আত্ম ও অপর কীভাবে আখ্যানস্থ হবে তা নির্ধারিত হয়- কুশীলবদের বাচনভঙ্গি ও স্বর নির্ধারিত হয়- উদ্দিষ্ট পাঠকের মনমতো শ্রেণি (class) ও সামাজিক অবস্থানের (social status) নায়ক নির্ধারিত হয়।

লেখকের সামাজিক ও শ্রেণিঅবস্থানের সেটের সঙ্গে পাঠকের সামাজিক ও শ্রেণিঅবস্থানের সেটের ইন্টারসেকশন অংশ এটি। এই প্রক্রিয়া সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী চলতে থাকে। তাতে বদল আসে, কিছু সূত্র অবিকল থাকে এবং লেখক-পাঠক সমঝোতা চলতে থাকে। রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন সমঝোতা বা আখ্যানচুক্তি থাকে, তাই ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত প্রোটোগনিস্টের জয়জয়কার চলতে থাকে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পাঠকসমাজ তাদের স্ববৃত্তের কোনও প্রতিকল্পকে আখ্যানের কেন্দ্রে দেখতে প্রত্যাশা করেন- লেখকও তেমন কুশীলব, তেমন বাচনভঙ্গি, তেমন আত্ম-অপর দ্বন্দ্বই পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো সকল যুগের সকল লেখকদের পাঠকনির্মাণের দায়বদ্ধতা আছে তা নয়, কিন্তু পাঠাভ্যাসের প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান অধিকাংশ। ক্লটিং কদাচিৎ মানিক, সতীনাথ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মহাশ্বেতা, দেবেশ রায়, ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো লেখকেরা অমন আখ্যানচুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। যে ইন্টারসেকশন অংশে পাঠক ও লেখকের সমঝোতার স্বস্তিক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, সেই স্বস্তিক্ষেত্রকে প্রত্যাহ্বান জানান। পাঠকসমাজের একটি অংশ তাঁদের লেখা আখ্যানে নিজেদের জীবনের বহু সেটের কোনও-কোনও উপাদানের মিল পান। পাঠকের সামাজিক জীবনের রাজনৈতিক অভ্যাস পাঠকের রাজনৈতিক উপন্যাস-পাঠের অভ্যাসের কোনও কোনও উপাদানের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কি নতুন এক আখ্যানচুক্তি তৈরি হয়? এর কোনও সাধারণীকৃত (geberalised) রূপ বা জনপ্রিয়তার সার্বিক বিচার না-ও থাকতে পারে।

লেখা এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থাকে। রোলাঁ বার্থ যেমন বলেছেন যে, পড়াটা পাঠকের দায়িত্ব এবং তার পাঠার্থসন্ধান পাঠকেরই দায়। গৌতম ভদ্র বার্থের পাঠতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে মিলিয়ে দেখেছেন, যেখানে আখ্যানলীলায় লেখকও একজন পাঠক। আখ্যানে বিন্যস্ত লেখকের পড়াটা পাঠকের পাঠবোধে প্রতিসরিত হয়, কিন্তু লেখকের অভিপ্রায়ই একমাত্র মান্য ও সিদ্ধ এমন ধারণার বিরোধিতা করছেন বার্থ।²²⁶ ফলে, প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য-সমালোচনা বা পাঠনির্দেশের স্বার্থে আঘাত করছে বার্থের তত্ত্ব। প্রাতিষ্ঠানিক

সমালোচনা নিরপেক্ষতার ভান করে, কিন্তু আদৌ তা নিরপেক্ষ কি? অরাজনৈতিক তো একেবারেই নয়। প্রতিটি পাঠ্যের যেমন নিজস্ব রাজনীতি আছে, তেমনই সমালোচনারও রাজনীতি আছে। ‘প্রামাণ্য’ বলে সমালোচনার যে বৈচারিক মাপকাঠিগুলি ঠিক ক’রে দেওয়া হয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বলা হলেও, আদৌ তা নয়। বার্থ তাই জোর দিচ্ছেন পাঠকের নিজস্ব আবিষ্কারের ওপরে, আর সেই পাঠসুখের বর্ণনা সঙ্গমাত্মক শব্দ ‘জুঁসাস’ দ্বারা করছেন বার্থ। নিবিড় ও অন্তরঙ্গ পাঠের মধ্যে দিয়ে, পাঠের কোনও বিশেষ আবিষ্কারে শীর্ষসুখের আনন্দ লাভ করে পাঠক। প্রতিষ্ঠানসম্মত চর্চার পথ মসৃণ হতে পারে, অথবা অপ্রত্যাশিতের দোর খুলে যেতে পারে।²²⁷ সাংস্কৃতিক চিন্তনের ধরাবাঁধা ছকে পাঠের যে স্বস্তিক্ষেত্র তৈরি হয়, তার বিপরীতে থাকে পাঠকসত্তাকে নাড়িয়ে দেওয়া প্রচলিত পাঠাভ্যাসকে অস্বস্তিতে ফেলা পাঠের মুহূর্ত। পাঠকের মনেই যে কোনও পাঠ্য প্রতিফলিত হয়, তার সার্থক-অসার্থক নির্ণীত হয়। আর, পাঠ্যের বা পাঠের যেমন নিজস্ব রাজনীতি আছে, তেমনই পাঠকেরও নির্দিষ্ট মতাদর্শ ও রাজনীতি রয়েছে। ভারতীয় রসতত্ত্ব অনুযায়ী পাঠকই সর্বসর্বা, পাঠকের রসভুক্তি হয়। রসাস্বাদনের পদ্ধতিতে ‘সামাজিক’ ও ‘সহৃদয়’ শব্দদু’টি আনন্দবর্ধন, অভিনবগুণ থেকে উনিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিকরা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। “শব্দব্যঞ্জনার জন্য কবির হার্দিক অনুভবটি সহৃদয়ের মনে স্পন্দিত হয়ে সাড়া জাগায়, এই সাড়া জাগানোতেই সিদ্ধির রসোত্তীর্ণতা। কাব্য আস্বাদন ‘হৃদয়সংবাদী’ হলেই রস অভিব্যক্ত হয়।” (ভদ্র ২০১১, ৬৯) কবি/লেখকহৃদয়ের সঙ্গে পাঠকহৃদয়ের আদানপ্রদানের পরিসর উন্মুক্ত হয় এই ‘সহৃদয়তা’ দিয়েই। অপর শব্দটি ‘সামাজিক’, যার তাৎপর্য শুধু সমাজসম্পর্কিত বা সামূহিকতার দ্যোতনা নয়, বরং বহু লোকের জমায়েত অর্থেও ব্যবহৃত। দৃশ্যকাব্যের অভিনয় দেখতে প্রেক্ষাগৃহে জড়ো হওয়া দর্শকদের একীভূত মানসের উদ্দেশে ভরত শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন।²²⁸ একবিংশ শতকের পাঠকের ক্ষেত্রে এই ‘সামাজিক’ শব্দের অর্থদ্যোতনা বদলেছে অনেকটাই। কাব্য তথা সাহিত্যের পাঠমাধ্যম বদলেছে- কাব্যের অভিনয় দেখতে নাট্যাঙ্গনে জড়ো হওয়া সমস্ত দর্শকের একীভূত মানসে সাধারণীকৃত (generalized) কোনও রসভুক্তি ঘটান প্রক্রিয়া বদলেছে। সাহিত্য

পঠনের বিষয়- একসঙ্গে অনেকে বসে একই সাহিত্যপাঠ করছেন, আধুনিক সামাজিক পরিসরে এমনটা হয় না। কিন্তু, নির্দিষ্ট কোনও পাঠ্য পাঠের রস কাল-স্থান ব্যতিরেকে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে। ডমরু চরিতের অদ্ভুত রস একশ বছর পরের কোনও পাঠকের কাছেও অদ্ভুত রসের স্বাদ নিয়ে আসবে কিংবা ‘কাঙাল মালসাট’ প্রথম প্রকাশের কুড়ি বছর পরেও একইরকম অদ্ভুত রসভুক্তি ঘটাবে পাঠকের। ভরত কিংবা অভিনবগুপ্তা নির্বিশেষ দর্শক/পাঠকের কথা বলছেন। অর্থাৎ দর্শক একক উপভোক্তা নন এবং সকল দর্শকের মনে সদৃশ রসভাব জাগিয়ে তোলাই লেখক ও অভিনেতাদের উদ্দেশ্য।²²⁹ কাব্যপাঠের শুরুতে কিংবা কোনও প্রেক্ষাগৃহে দৃশ্যকাব্য দর্শনের আগে বিভিন্ন দর্শক/পাঠক ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু, কাব্যপাঠের পরে কিংবা দৃশ্যকাব্যের অভিনয়টি দেখার পরে রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ায় তাঁদের সেই বিভিন্নতা মুছে গিয়ে একঘনতার বিশেষ সাধারণীকরণ ঘটে। কিন্তু, আধুনিক পাঠপ্রবণতায় যদি তেমনটা না ঘটে? রোমান্টিক পর্বের সাহিত্যপাঠের সময় বা বিশেষ কোনও সাহিত্য-আন্দোলনে সৃষ্ট সাহিত্যপাঠে রসের একঘনতা ঘটতে পারে। কিন্তু, রাজনৈতিক সাহিত্য ও রাজনৈতিক আখ্যানপাঠের সময় কি সকল পাঠকের মননে রসাস্বাদনের একঘনতার সাধারণীকরণ হতে পারে? লেখকের উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে ওই সাধারণীকৃত রসভুক্তির, কিন্তু পাঠকের সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি অবস্থান, লিঙ্গ অবস্থান, ধর্মীয় অবস্থান এবং জাতি/বর্ণগত অবস্থানের পার্থক্য কি মুছে যায় সাহিত্যপাঠের রসভুক্তিতে? ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র বাহেবাবুর সমান সামাজিক অবস্থানের পাঠক, কমিউনিস্ট কর্মী বিশ্বের সমান শ্রেণিবোধের পাঠক এবং চ্যারকেটু-খেতখেতুর সম সামাজিক অবস্থানের পাঠকের মননে কীভাবে অভিন্ন রসভুক্তি ঘটবে? রুনু গুহনিয়োগীর ‘সাদা আমি কালো আমি’ এবং অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা-নটার সূর্য’ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক কোনও পাঠক এবং ষাট-সত্তর দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হওয়া কোনও পাঠকের অভিন্ন ‘তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা’র শর্তে পঠিত হতে পারে কি? পাঠক যদি উপন্যাস-পাঠের পূর্বে দক্ষিণপন্থী মতাদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তাহলে ষাট-সত্তর দশকের বামপন্থী রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাস তাঁর ভাল লাগবে না। আর, ভাল লাগলেও সেই উপন্যাসগুলিই ভাল লাগবে, যেগুলির বয়ান রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের পুনরুচ্চারণ। কমিউনিস্ট দ্রোহীরা সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, মণীষীদের মূর্তি ভাঙ্গাই তাদের একমাত্র রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনী রাজধর্ম পালন ক’রে আর্থ-সামাজিক অশান্তিকে শান্ত করেছে- এই বয়ানের পুনরুৎপাদক রাজনৈতিক আখ্যানই তাঁদের পছন্দ হবে। পাঠকের সামাজিক অবস্থান যদি উচ্চবর্গীয় উচ্চবিত্ত হয়, তাহলে বাঘারু কিংবা কেলুর আখ্যানে তাঁর বড়জোর সহানুভূতি জাগতে পারে কিন্তু যে উন্নয়নের ঠেলায় বাঘারু, মাদারির মা, কেলুরা বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই উন্নয়নের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হবে কি? উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোক পাঠক বসাই টুডু, মঘা ডোমেদের উচ্চারণে এবং বিরসা, বসাইদের বাবুশিক্ষার প্রতি সঘৃণিত প্রত্যাখ্যানে তন্ময়ীভূত যোগ্যতার শর্তে উত্তীর্ণ হবেন না। আধিপত্যকারী লিঙ্গাবস্থানের (পুরুষতান্ত্রিক) মতাদর্শ সচেতন বা অবচেতনে বিশ্বাস করেন যে পাঠক, রাধিয়া-ভগবতী-সুমা-নিমিয়াদের রাষ্ট্রবাহিনীকর্তৃক ধর্ষণ তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে, জজসাহেব যেমন অবিশ্বাস করেছিলেন। ‘ভারতীয় নারী জনসমক্ষে আদালতে নিজের ধর্ষণের বিবরণ দিতে পারে না’- এই সংখ্যাগরিষ্ঠের জনতোষী প্রতর্ক তো অনেক পাঠকই বিশ্বাস করে, তাঁদের কাছে ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র রাজনীতি বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেবেশ রায় তথ্য-নথি-প্রতিবেদনের জোরালো বাস্তবতায় গণধর্ষণের সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন অথবা পাঠককে সেই ঘটনা বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন। কিন্তু, উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোক পাঠক যিনি উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগাধ আস্থা রাখেন, তিনি উপন্যাসটি পড়ে যে রসাস্বাদন করবেন, সেই একই রসাস্বাদন কি একজন নিপীড়িত পাঠক (যিনি নিজে কোনও সময় ধর্ষণের শিকার) করবেন? উপরিউক্ত ওই ‘সামাজিক’ ও ‘সহৃদয়’ শব্দদুটি কি অভিন্ন শর্তে এই দুই পাঠকের রসভুক্তি ঘটাতে পারে? পারে না বলেই পাঠকের বিভিন্নতা পাঠ্যকে প্রভাবিত করে।

লেখকের ক্ষেত্রে অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতা (positional objectivity) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের আখ্যাননির্মাণে মহাশ্বেতা দেবী এবং কর্ণেল সুরেশ সিংয়ের অবস্থানের পার্থক্য থাকে। তেমনই মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে শোভেন্দ্রশেখর হাঁসদার অবস্থানগত

নৈর্ব্যক্তিকতার বাস্তব তফাৎ থাকেই। মহাশ্বেতা দেবী তথাকথিত ‘দিকু’ সমাজের লেখিকা হয়েও তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সহমর্মিতার অবস্থান থেকে আদিবাসী সমাজের গভীরতা স্পর্শ ক’রে আখ্যানরচনা করেছেন²³⁰। এক্ষেত্রে তাঁকে নিজের দিকুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাহ্বান জানাতে হয়েছে এবং আখ্যানের বহুমাত্রিক স্বরে উচ্চবর্ণীয় সমাজের আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান ক’রে বর্গচ্যুত (de-elite) হতে হয়েছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও তিনি না-আদিবাসী। কখনও অমূল্য আব্রাহামের বয়ানে কখনও কালী সাঁতারার বয়ানে তা প্রকাশ পায়। “সে বসাইয়ের কথা বসাই হয়ে বুঝতে পারবে না। কেননা সে আদিবাসী নয়” লেখক মহাশ্বেতাকে এই না-সত্তাটিকে চিহ্নিত করতে হয়েছে- কারণ আদিবাসী হয়ে জন্মানোর পরের বঞ্চনাবোধের শরিক “আপার-কাস্ট কোনো বর্ণহিন্দু হতে পারে না।” এবং অমূল্য আব্রাহাম জানে সে বিরসাইট না, তাই বিরসাইটদের মধ্যে বহিরাগত থেকেও সে তাদের অন্তঃস্থলের প্রোথিত বিশ্বাসের কাহিনি খুঁজতে চায়। শোভেন্দ্রশেখর আদিবাসী সমাজের অন্তর্গত। তাঁর এবং তাঁর বকলমে কথক মঙ্গল মুর্মুর অবস্থানে নৈর্ব্যক্তিকতার থেকেও বিষয়ীভূত-তন্ময়তা অধিক। সেই অবস্থানগত পার্থক্য ভাষার বিন্যাসে এবং বহুস্বরে ধরা পড়ে। শোভেন্দ্রশেখর বহিস্রমাজের কেউ নন বলেই তাঁকে অমূল্য আব্রাহাম কিংবা কালী সাঁতারার অবস্থানকে ন্যায্যতা দিতে হয় না। কালী বা অমূল্যরা মূল প্রোটোগনিস্টের স্বরে সঙ্গত দেয়, তাঁদের দ্রোহচিন্তায় যুক্তি-তথ্য আরোপ ক’রে পাঠকের কাছে তাঁদের (মূল প্রোটোগনিস্টদের) বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তোলে। মঙ্গল মুর্মু সরাসরি পাঠকের সঙ্গে আলাপন চালায়। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এহেন অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যতিরেকে বসাই টুডুর প্রশ্নগুলির সঙ্গে মঙ্গল মুর্মুর প্রশ্নগুলির তফাৎ নেই। মহাশ্বেতা দেবী না-আদিবাসী হয়েও আদিবাসীদের স্বর বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তুলতে পেরেছেন ভদ্রলোক উচ্চবর্ণীয় পাঠকসমাজের সামনে। লেভি স্ট্রাউস ইঙ্গিত করেছিলেন যে, কোনও জনজাতির রাজনৈতিক দাবি, ভূমির দাবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জনজাতিটির বহির্জগতে তাদের সম্পর্কে ছড়ানো প্রথা-ঐতিহ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করা এবং জনজাতিটির অন্তর্জগতে ব্যাপ্ত নিজেদের প্রথা-ঐতিহ্য সংগ্রহের মধ্যে তফাৎ রয়েছে।²³¹ মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের অন্তর্জগত থেকে উপন্যাসের

উপাদান সংগ্রহ করেছেন। নিজের সামাজিক-অবস্থান এবং শ্রেণিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে করতে 'বাবুশিক্ষায় সাঁওতাল মুতে দেয়' এমন ভাষাপ্রয়োগে সংশয় রাখেননি কোনো। 'মুণ্ডা কেনও দিকুদের মতো ভাত খাবে না?' প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা পাঠকের অবস্থানগত নির্লিপ্তিতে আঘাত করে। ভব্যসভ্য সামাজিক চালচলনের প্রত্যাশার গণ্ডিতে সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ, স্তিমিত রাখার হিসেব ওলোটপালট করেন মহাশ্বেতা- বস্তুতঃ উচ্চবর্গ নির্মিত অমন গণ্ডিকেই প্রত্যাখ্যান করে পাঠকের প্রত্যাশার গণ্ডি উন্মুক্ত ক'রে দেন। শঙ্খ ঘোষ এমন সাধনাকে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে বড় কাজ বলেছেন।²³² মহাশ্বেতার পূর্বোক্ত উপন্যাস-গল্পের প্রোটোগনিস্টরা বেঠবেগার, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক- তাঁর কাহিনিগুলি মূলতঃ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের পটভূমি-নির্ভর- উচ্চবর্গের ও উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে অসন্তোষ-দ্রোহ কাহিনিগুলিকে অভিমুখ দেয়। নিজের সামাজিক ও শ্রেণি-অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে দেশের ব্যাপক মানুষের সংগ্রামের দ্বন্দ্বিক পরিসরকে আখ্যানস্থ করলেন মহাশ্বেতা। নিছক প্রগতিশীল সাহিত্য না, নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় সমকালীন নির্দিষ্ট সমাজ-দ্বন্দ্বগুলিকে আখ্যানে প্রতিফলিত করলেন এবং নতুন দ্বন্দ্ব উদ্ভীর্ণ করলেন তিনি। 'সমকাল (১৯৭৭)' পত্রিকায় নতুন প্রগতি সাহিত্যের তথা বিপ্লবী সাহিত্যের যে রূপরেখা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে শ্রেণিসংগ্রামের ব্যাপক ও জটিল রূপভাষ্যের মধ্যে দিয়ে, মহাশ্বেতার লেখায় প্রগতি সাহিত্যের বিবর্তনের সেই দিশা পাওয়া যায়।²³³ দেবেশ রায় বাঘারু, কেলু, খেতখেতু, চ্যারকেটু, মাদারির মায়ের আখ্যান লেখেন যখন, সেখানেও বিচার্য অবস্থাগত নৈর্ব্যক্তিকতা। দেবেশকে 'বৃত্তান্ত'গুলির শুরুতে ও শেষে স্বীকার ক'রে নিতে হয় অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতার সীমাবদ্ধতা। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র উৎসর্গ অংশে চারজনের নামের পরে লেখা থাকে- "এই বৃত্তান্ত তারা কোনোদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারে জীবনের পর জীবন বাঁচবে।" আখ্যানের গতিপথে কথকের সঙ্গে বাঘারু'র স্বরের পার্থক্য এবং বাঘারু'র না-ভাষার সঙ্গে কথকের সুবিস্তৃত বিবরণের ভাষার দূরত্ব প্রকট হয়ে যায় ক্রমশঃ। আখ্যানরচনার 'কাল্পনিক' পরিসরের শেষে পাঠকের কাছে স্বীকার ক'রে নিতেই হয়- "ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মত, তারা জানে না, ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-

সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা যায়।” (রায় ২০১৩, ৪৯১) লেখক তাঁর জ্ঞানকাণ্ডের বিশালতায় এবং পাঠকদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে ‘দারিদ্র্যসীমা’, ‘পশ্চাদপদ অংশ’ এবং অন্যান্য জটিল-অর্থবহ শব্দে মাদারির মা কিংবা বাঘারুদের বিবরণ দিলেও, সেসব শব্দ মাদারির মা কিংবা বাঘারুদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। লেখক, আখ্যানস্থ কথক, পাঠক এরা কেউই মাদারির মায়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের দোসর নয়। অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তি থেকে যায়ই তাদের; তা দিয়ে মাদারির মা বা বাঘারুদের বিষয়ীসত্তাভূত অবস্থান প্রকৃতিার্থে বোঝা অসম্ভব বলেই কি এমন স্বেচ্ছা-দূরত্ব রচনা করেন দেবেশ? ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ আখ্যানের কথক একইভাবে নিজের অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচয় আলাদাভাবে দেন। সতীনাথ ভাদুড়ির ‘টোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসে তাৎমা, ধাঙড়দের থেকে লেখক সতীনাথের আর্থ-সামাজিক দূরত্ব অনেক, কিন্তু সেই দূরত্ব তাৎমাটোলি ধাঙড়টোলির আখ্যানরচনায় বাধা হতে পারেনি, তা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু এই পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনটুকুই ‘টোঁড়াইচরিত মানস’-এর মূল কথা নয়। স্বদেশি আন্দলনের বিভিন্ন মত ও পথের দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে ব্যক্তিসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করতে পারছেন সতীনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তির বিকাশের পথ খুঁজে পাননি- রবীন্দ্রনাথের বহু সময় লেগেছিল বাঙালির দৈনন্দিনকে বাংলা উপন্যাসের বিষয় ক’রে তুলতে- ব্যক্তির বিকাশ ও স্বদেশবোধের বিকাশ পারস্পরিক আধার-আধেয় হয়ে উঠতে পারেনি তাঁদের উপন্যাসে। দেবেশ রায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপাঠ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশধারণায় বিপরীত পাঠ খুঁজে পাচ্ছেন কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের বাঙালির আত্মজিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের সময়ে ভারতীয়ের স্বদেশজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।²³⁴ সতীনাথ ভাদুড়ির ‘জাগরী’ ও ‘টোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসদ্বয়ে স্বদেশময় ব্যক্তিজিজ্ঞাসা মুখ্য হয়ে উঠছে।²³⁵ টোঁড়াইয়ের আখ্যান শুধু দেশের স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণের ইতিহাস বলছে না বরং দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইতিহাস খুঁজছে- আর, সেই ইতিহাস খুঁজছে নিম্নবর্গীয় টোঁড়াই-রামিয়া-রেবতীদের চোখ দিয়ে। তার নিম্নবর্গোচিত বিশ্বাস, সংস্কার এবং অবস্থানের জন্যই কি টোঁড়াই ‘গান্ধী বাওয়া’-র প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ হতে পারে না?

আবেগ বনাম বুদ্ধি, প্রেম বনাম ঘৃণা এবং সামাজিক সমস্বর বনাম ব্যক্তিস্বর- এই দ্বন্দ্বগুলি আখ্যানে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এমন এক লেখকের হাতে যিনি উক্ত নিম্নবর্ণীয় সমাজের বহিরাগত একজন। কিন্তু, ইতিহাস আর ভাষাকে চেনাবৃত্তের বাইরে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে তিনি ঢোঁড়াইকে জৈববুদ্ধিজীবী (organic intellectual) হিসেবে নির্মাণ করেন- যে ঢোঁড়াই নিম্নবর্ণীয় দাপটে ইতিহাসের পার্শ্বচরিত্র থেকে প্রধান পাত্র হয়ে ওঠে- যে ঢোঁড়াইয়ের ‘নিজের রামায়ণখানের’ সন্ধানে লেখক তাকে নবায়নের চালিকাশক্তি ক’রে তোলেন।²³⁶

লেখককে ‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া’-র আক্ষরিক অনুশীলন করতে হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হয়েও মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে বৃহত্তর জনগণকে দেখতে চাইলেন না। সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্তের দ্বারা নির্মিত, সহমর্মী মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা এবং মধ্যবিত্ত দ্বারা প্রশংসিত সাহিত্যদৃষ্টিভঙ্গির বাইরে দাঁড়িয়ে ইলিয়াস প্রচলিত কাঠামো ভাঙতে উদ্যোগী হলেন। ইলিয়াসের আখ্যানে সৃষ্ট জগৎ ভাল নাকি মন্দ, ইলিয়াসের সৃষ্ট নিম্নবর্ণীয় কুশীলবদের সামাজিক নীতিবোধ মার্জিত নাকি অমার্জিত, সে প্রশ্ন অবাস্তব; কিন্তু পাঠকের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ-রুচি বারবার তাতে আহত হয়। আলাগা মৌখিক সমবেদনা জানানোর অথবা সৃষ্ট জগতের নিম্নবর্ণের প্রতি দয়াধর্ম বা আলাগা পিরিত দেখানোর জায়গা থাকবে না মধ্যবিত্ত মানসিকতার পাঠকের।²³⁷ যে দু’টি উপাদানকে ইলিয়াস কঠোরভাবে বর্জন করলেন, তা হচ্ছে মধ্যবিত্তের সাহিত্যভাষা এবং মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। ইলিয়াস কখনোই তমিজ বা খিজিরের শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না। চেংটু, আলিবক্স, বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কেরামত আলিরা ব্যক্তি ইলিয়াসের সামাজিক অবস্থানের থেকে নিম্নকোটের বাসিন্দা। অথচ, খিজির, চেংটু, বৈকুণ্ঠ ও তমিজদের সংস্কৃতি, ভাষা, আচরণ ইত্যাদি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। ইলিয়াস তাঁদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের যথাসম্ভব বাস্তবিক উপস্থাপনা করলেন নিজের অবস্থানজনিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁদের শ্রেণিচেতনা-চিন্তাভাবনা-আবেগের স্তরভেদ বুঝতে চেয়ে। ইলিয়াসের সাহিত্যের ভাষা অশ্লীল, অপরিশীলিত বলে অভিযোগ উঠেছে। কারণ ইলিয়াস মধ্যবিত্তের সাহিত্যের নিজস্ব শব্দভান্ডার ত্যাগ ক’রে নতুন শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলতে ব্রতী

ছিলেন। সেই নতুন শব্দভাণ্ডার সাহিত্যে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব পাবে কিনা, সেটা বিচার্য না; তাদের অন্তর্ভুক্তির পরিসর বিচার্য এবং শব্দগুলির প্রায়োগিক পরিসর বিচার্য। এই শব্দভাণ্ডারের প্রাচুর্যে থিস্তি আছে, আটপৌরে শব্দ আছে, পাড়া বা গলির লজ্জ, শহুরে প্রবাদ-প্রবচন, গাঁয়ো প্রবাদ আছে, মুদ্রাদোষে বেরনো শব্দ আছে এবং প্রচলিত সাহিত্যধর্মী শব্দ আছে। মধ্যবিত্ত, শহুরে, রুচিশীল, ভদ্রলোকরা কি বাস্তব জীবনে থিস্তি দেন না বা অপশব্দ প্রয়োগ ক’রে কথা বলেন না? বলেন। কিন্তু, সাহিত্যভাষাকে তার থেকে আলাদা রাখেন বা খুব সন্তর্পণে মেপে সংলাপভুক্ত করেন। ইলিয়াস ভাষাপ্রয়োগে এই রাখটাক রাখলেন না। ‘অশ্লীল’ শব্দ ব্যবহারকে শহুরে জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন যাপনসংগ্রামের ফলে উদ্ভূত স্বভাবের অংশ হিসেবে দেখলেন। ঢাকাইয়াদের স্বভাবে আবেগে অভিভূত হওয়ার থেকেও কিছু অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে অভিভূত ভাবকে ‘নিউট্রালাইজ’ করা দীর্ঘদিনের শহুরে মানসিকতার অভ্যাস বলে উল্লেখ করছেন।²³⁸ “ইলিয়াস সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন তাদেরই ভাষা যারা নিজেরাই নিজেদের দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছে, যারা মধ্যবিত্তের সমস্ত সংস্কৃতি থেকে দূরে” (হক ২০০৩, ১১২) এই কুশীলবদের কাছে মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোক সংস্কৃতি বহনের দায় নেই। খিজির তাই নির্ভর হয়ে মিলিটারির প্রতি, রহমতউল্লাহ প্রতি ‘অশালীন’ ভাষাপ্রয়োগ ক’রে শোষণের বিরুদ্ধতা করে। চেংটু-আলিবক্স-করমালিরা আনোয়ারের তত্ত্বানুগত মূল্যবোধ এড়িয়ে নিজেদের শোষণমুক্তির উচ্চকিত পথ বেছে নেয়। লেখকের অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতা জরুরি এবং ইলিয়াস সেই নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বলেই ১৯৬৯-র জাতীয় গণঅভ্যুত্থান নিয়ে গদগদ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েনি। চেংটু-করমালিদের জোতদারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি জাতিসত্তার আন্দোলনের সম্পর্ক খুঁজে পাননি বলে ইলিয়াস ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে ‘গ্লোরিফাই’ করতে চাননি। নিজে শহুরে বৃত্তের প্রতিনিধি হয়েও জাতীয়তাবাদী নির্মাণের আবেগে গা-ভাসিয়ে নিম্নবিত্ত-নির্বিত্তের জীবনযাপনকে ভুলে যাননি।²³⁹ বৃহত্তর জনজীবনের শোষণ, বঞ্চনা, ক্ষোভ নিয়ে লিখতে গেলে সহানুভূতি এবং করুণার আবেগবাপ্পে প্রকৃত বাস্তব ঢাকা পড়ে যায়-ইলিয়াস নিজবৃত্তের সেই মোহ কাটিয়ে উঠছেন। “কোটি কোটি শোষিত-বঞ্চিত অত্যাচারিতের

দৈনন্দিন জগতে আছে প্রচন্ড কোলাহল, নিদারুণ কৌতুক, জীবন সেখানে আবরণহীন চাঁচাছোলা চেহারায় দেখা দেয়, ন্যাকামি হৃৎকাতরতা জীবনের দাপটে শুকিয়ে যায়, কিছুতেই প্রশয় পায় না।” (হক ২০০৩, ১১৪) ইলিয়াস বিপ্লবের মতাদর্শ প্রচার না করেও, কুশীলবদের আদর্শ বিপ্লবী না বানিয়েও এবং মহৎ মানবতাবাদের প্রচারক না হয়েও এই বিষয়গুলিকে অনায়াসে সাহিত্যের জগত ক’রে তুলেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর মতো আদিবাসী জগত তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য নয়, দেবেশ রায়ের মতো প্রান্তিকদের প্রান্তিকতম মানুষের জগত তাঁর সাহিত্যে নেই; শহুরে জগত ও গ্রামীণ জগতের না-অচেনা পরিসরকে তিনি আখ্যানপট হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু, সেই আখ্যানপটের বহুস্তরীয় জগতের প্রতিটি উপাদানকে সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করছেন।²⁴⁰ অকিঞ্চিৎকর কুশীলবরা সেই বহুস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র হয়ে উঠছে। উপন্যাসের বিকল্প পথ বেরিয়ে আসছে। ফলে, পাঠক উপন্যাসের সেই নতুন পথের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। পাঠকের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অনেকগুলি সেট আখ্যানের কুশীলবদের সেটে মিলছে, অনেকগুলি মিলছে না। পাঠক সাহিত্যের কাছে আসে, কারণ যে বৃত্তিগুলির ব্যবহারে তার দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কগঠন, সেই বৃত্তিগুলি তীব্র হয় সাহিত্যপাঠের দ্বারা। সাহিত্যপাঠের বাইরে তথা ‘পাঠক’ হওয়ার বাইরে ব্যক্তির নিজস্ব যাপন আছে, বহির্জগতের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের আদানপ্রদান রয়েছে। আর্থিক ও সামাজিক যে বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে পাঠকের যাত্রা চলে, তার উপাদানগুলি পাঠককে প্রভাবিত করে, পাঠক তাই সেই উপাদানগুলির সঙ্গে সাহিত্যপাঠনে প্রাপ্ত উপাদানগুলি মিলিয়ে নিতে চায়। সাহিত্য থেকেই মানুষ নিজের অবস্থানটি দেখতে পায় অর্থাৎ কে/কী তার প্রতিপক্ষ, কার/কিসের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ, কার/কোথায় তার সহযোগিতা ইত্যাদি সাহিত্যের ভেতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।²⁴¹

একজন পাঠক অনেকগুলি সেটে বিভক্ত হয়ে থাকে। অথবা, অনেকগুলি সেট জুড়ে জুড়ে তার অবস্থান চিহ্নিত হয়। ওই সেটগুলির উপাদানগুলি তার পাঠরুচিতে ও পাঠাভ্যাসে প্রভাব ফেলে। কোনও পাঠক উচ্চবর্ণ হিন্দু, মধ্যবিত্ত, বংশপরম্পরায় উচ্চশিক্ষিত, ধ্রুপদী

সাহিত্যপাঠক ইত্যাদি সেটের উপাদানগুলি ধারণ করলেও ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ উপন্যাসের পাঠ তার প্রিয় হতে পারে যদি সে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সেটেও থাকে। ‘কাঙাল মালসাট’ উপন্যাসটি যে পাঠকদের প্রিয়, তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন সেটের একটা কমন ইন্টারসেকশন পয়েন্ট রয়েছে- প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা। হয়তো সেই পাঠকের সঙ্গে ফ্যাটাডুদের আর্থ-সাংস্কৃতিক অবস্থানের মিল নেই কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানবিরোধী উপাদানগুলিতে তাঁর সেটের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা কিংবা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনবিরোধিতা হতে পারে। ‘কাঙাল মালসাট’-এ ঔপনিবেশিক ইতিহাসপাঠের সূত্রগুলি ওলোটপালট করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু নিছক ইতিহাস-পুনর্পাঠের জন্য কোনও পাঠক উপন্যাসটি পড়েন না (যদি না তিনি গবেষণাতুল্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পাঠ করেন)। মিথোলজির সঙ্গে ইতিহাসের আদানপ্রদান খুঁজতে গিয়ে লেভি স্ট্রাউস ইতিহাসকে মিথের থেকে আলাদা করে দেখতে চাইছেন না, বরং মিথোলজির দায়িত্ব হিসেবে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র উদ্ধারের কথা বলছেন। কিন্তু একইসঙ্গে সময়পর্বের দূরত্বজনিত তফাতের কথা বলছেন, “some difference depending, of course, on our political preferences” (Strauss 2005, 18) সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মিথ ও ইতিহাসের বিভাজনরেখা ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। শাসকের প্রত্যক্ষ নির্দেশে মতাদর্শগত রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্রগুলি (ISA) সেই কাজ করছে। প্রধানতঃ হিন্দুগৌরব পুনরুদ্ধারের সাংস্কৃতিক নব্যজাতীয়তাবাদী প্রকল্পনা ডানা মেলছে। ফলে, একজন পাঠকের চেতনা যে সমস্ত সেটের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। রাজনৈতিক রুচির ওপরে নির্ভর করে যে, পাঠক কোন ধরনের ইতিহাস-মিথ আদানপ্রদান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। কোন উপাখ্যানকে প্রামাণ্য বলে মনে করবে, তা নির্ভর করে। হিন্দু-উচ্চবর্গ পাঠক বাংলা উপন্যাস-সংরূপের উদয়কালে নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশির যুদ্ধ’ কাব্যকে ইতিহাস বলে মেছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’-কে ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’-র ইতিহাস বলে মেনেছিল।

কোনও একটা ইন্টারসেকটিং সেটে পাঠকের সঙ্গে লেখকের কিছু উপাদান মিলে যায়। সেখানে লেখাটির প্রতি ভাললাগা (কখনও লেখকের প্রতিও) জন্মায়। আর, যে সেটগুলিতে পাঠকের সঙ্গে লেখকের কোনও সাধারণ উপাদান নেই, সেখানে অপছন্দ। লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগ রক্ষা জরুরি- লেখক নিজের অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতা পার হয়ে আখ্যানস্থ বিষয়-কুশীলব-ঘটনাকে পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য ক’রে তলেন। পাঠকের পছন্দের লেখক হয়ে ওঠার পদ্ধতি কি এভাবেই নির্মিত হয়? “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গি এখনো অচেনা থেকে যায় কেনও আমাদের, তার তুলনায় বেশ সক্রিয় কেনও তারাশঙ্করের ধারাবিবরণী” (রায় ২০০৬, ৯৯) লেখক-পাঠক সংযোগ নিয়ে ‘উপন্যাসচিন্তা’ প্রবন্ধে মতামত রাখছেন দেবেশ রায়। বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিককে এক হাইফেনে যুক্ত করেছেন তাঁদের ভাষার ব্যবহারে ও কাহিনির নির্মাণে ‘অপ্রতিভ, গ্রামীণ, সরল, অসহজ’ বিশেষণগুলি খুঁজে পেয়ে। কিন্তু, একইসঙ্গে মানিকের উপন্যাসে ভাষা আর নির্মিতির তির্যক বিন্যাসে আত্মীয়তা সবচেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও পাঠকের সঙ্গে সংযোগহীনতা আবিষ্কার করছেন।²⁴² এই সংযোগহীনতার কারণ কি সিংহভাগ পাঠকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নয়? তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেখানো গ্রাম শহুরে মধ্যবিত্তের পক্ষে নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখতে চাওয়া গ্রামের প্রতিচ্ছবি- সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পতনের যুগে তাঁর উপন্যাসগুলি অবক্ষয়ের স্থিরচিত্র আখ্যানবদ্ধ করে। তাঁর বহু উপন্যাসের নায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় (অধিকাংশই কংগ্রেসী), আখ্যানপটে রাজনৈতিক চেতনার অভাব নেই। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্তর্সংঘাত, স্বাধীনতা আন্দোলনের জটিল দ্বন্দ্বমুখর গতিপথ কিংবা রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় জর্জরিত ইতিহাসে ব্যক্তি ও স্বদেশবোধের প্রশ্নমুখর বিকাশ তাঁর লেখায় অনুপস্থিত।²⁴³ বিভূতিভূষণের পাঠক-জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি শহুরে পাঠকের অজ্ঞাত জীবনের প্রতি মোহকে জাগিয়ে তোলে। বেদনাবোধ, হারানো স্মৃতির ব্যথা এবং নিম্নবিত্ত-ভদ্রলোকের চোখে দেখা অনাধুনিক জীবনে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পাঠকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না। লেখক নিজে এবং তাঁর আখ্যানের পাঠক আখ্যানগুলি পড়ার পরে বেদনাভারাতুর হৃদয়ে নিজেদের দৈনন্দিনে ফিরে আসতে পারে। আখ্যানের আন্তঃ চেতনা তাঁর বাস্তবতাবোধকে

প্রশ্নবিদ্ধ ক’রে আখ্যান থেকে দৈনন্দিনে ফিরে আসার পথকে দূরত্ব ক’রে দেয় না। কিন্তু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তা করে। ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পের গ্রামসমাজ, ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন?’ গল্পের গ্রামীণ বন্দোবস্ত তারাক্ষর-বিভূতিভূষণের দেখানো গ্রামসমাজের মতো না; এই আখ্যানগুলি পাঠকের গ্রাম-দেখতে-চাওয়া নিরাপদ দূরত্বকে বিঘ্নিত করে। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের আখ্যানপট শহুরে ভদ্রলোক পাঠকের কাছে অজ্ঞাত-জগৎ এবং সেই অজ্ঞাত-জগৎ থেকে দৈনন্দিনে ফিরে আসার নৈর্ব্যক্তিক-নির্লিপ্ত পরিসর ততটা নির্লিপ্ত-নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’-তে দেখানো গ্রামসমাজ ভদ্রলোক পাঠকের গ্রাম-দেখতে-চাওয়া আকাঙ্ক্ষায় ভাঙুর ঘটিয়ে দেয়। পাঠক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আখ্যানস্থ কালখণ্ডে (১৯৪০-র দশক) যাতায়াত করতে পারে না, তার অভ্যস্ত প্রত্যাশিত পাঠপ্রক্রিয়া নিরাপদ থাকে না, শুধুমাত্র বেদনাবহ হৃদয় আর স্মৃতিকামুক (nostalgic) হয়ে পড়ায় পাঠকের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। তারাক্ষরের রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভেতরকার প্রশ্ন এবং স্বদেশবোধের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশ্নগুলি না-থাকায় একপ্রকার স্বস্তিক্ষেত্র অনুভব করে পাঠক- ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ পাঠকে সেই স্বস্তিক্ষেত্র দেয় না। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ একমুখী স্বদেশবোধের কথা বলে না, অন্তর্সংঘাতহীন কোনও দলের কথা বলে না। খিজিরের জাতীয়তাবাদ আর আনোয়ারের জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান-ওসমান যেভাবে সামাজিক শত্রুকে চিহ্নিত করতে চায় তার সঙ্গে খিজিরের আর্থ-রাজনৈতিক শত্রুকে চিহ্নিত করার মূলগত পার্থক্য রয়েছে- চেংটুর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে আনোয়ারের আধুনিক-সাংস্কৃতিক চেতনার অনপন্যে ব্যবধান তাদের তত্ত্বে-অনুশীলনে ফারাক গড়ে দেয়। অথচ এই সবক’টি বিষয়ই ঘটছে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন জাতীয়তাবাদী দ্রোহের স্ফূরণ হতে চলেছে। এমন ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিবোধ ছাড়া কি স্বদেশময় ব্যক্তিজিজ্ঞাসা সম্ভব? ইতিহাসজারিত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণ সম্ভব? উপন্যাসপটের মহৎ সময়কে পাঠকের চেতনায় প্রোথিত করা সম্ভব? ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর পাঠক উপন্যাসপাঠের পরে একমুখীন স্বদেশবোধে বা একদিশাদর্শী জাতীয়তাবাদে আবিষ্ট থাকতে

পারেন না। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো আদিবাসী সমাজে প্রবেশ করতে আখ্যানপাঠক অস্বস্তি বোধ করে না, কিংবা অস্বস্তি বোধ করলেও আখ্যানপাঠের পরে তার রাজনৈতিক স্থিতি টালমাটাল হয় না বা তার অধিকারভোগী সামাজিক-অবস্থানের (privileged) মূল ধরে টানাটানি চলে না। ‘বসাই টুডু’-র আখ্যান, দোপ্দি মেঝেনের কাহিনি পড়তে গেলে তা হয়। পাঠক স্বীয় সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের স্বস্তিক্ষেত্রে নিরাপদবোধ করে না। তবু যে ভদ্রলোক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকের ‘অরণ্যের অধিকার’ বা ‘অগ্নিগর্ভ’ পড়তে ভাল লাগে, তার ক্ষেত্রে দু’টি সাধারণীকৃত সেটের উপাদান মিলে যেতে পারে। প্রথমতঃ পাঠক যদি শাসকবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করেন এবং রাষ্ট্রনির্মিত স্বদেশধারণাকে প্রত্যাখ্যান ক’রে স্বদেশানুসন্ধান করতে চান, তাহলে বিরসার বিস্মৃতপ্রায় দ্রোহ অথবা বসাই-দোপ্দিদের সোচ্চার প্রশ্নগুলির সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ মিথভিত্তিক গল্পকাহিনির স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে দোদুল্যমান এক আধোচেনা জগতের সঙ্গে সমষ্টিগত মগ্নচেতন্যের সত্যকে খুঁজতে পারেন পাঠক। পরাজিত নায়কের ট্রাজেডিতে ‘মহাভারত’-এর কর্ণের সঙ্গে (যে কর্ণকে ‘পথের পাঁচালি’-র অপু কল্পনা করত অথবা ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’-এর কর্ণ) কিংবা ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-র ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বিরসার মিল, বসাই টুডুর মিল। এঁরা নায়কোচিত কিন্তু অন্যায় উপায়ে এঁদের দমন করা হয়েছে- এঁরা বহুদূরের অথচ এঁদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায় কোনও না-কোনও মিথাস্থিত কাহিনি বা মুখফেরতা আখ্যানের স্মৃতিপথে- “deeply implanted in the memory of the race”²⁴⁴ মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তার আখ্যান ছড়িয়ে পড়ছে এবং নতুন দ্রোহের মধ্যে দিয়ে বিস্মৃত নায়ক পুনর্নির্মিত হচ্ছে- পাঠক তাকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতে পারছে না কিন্তু আর্কেটাইপাল মোটফ-ইমেজে তাকে আপন ক’রে নিচ্ছে- পাঠকের অন্তর্লীন চেতনায় এমন ‘দূরের তবু কাছের’ পাঠের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। ইতিহাসের পাঠে দ্রোহী অথচ পরাজিত নায়কদের অবয়বে সব দেশে সব জাতিতে কিছু সমধর্মিতা আছে। ‘হারবার্ট’-এর বিনু, ‘হাজার চুরাশির মা’-এর ব্রতী, ‘দ্রৌপদী’ গল্পের দোপ্দি দ্রোহী আর্কেটাইপে অভিন্ন- প্রাচীন স্মৃতির টুকরো টুকরো অংশ তাতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে। সত্তর দশকের পরে জন্মানো পাঠক

নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে অথবা ষাট-সত্তর দশকের বামপন্থী আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি, মুখফেরতা কাহিনি, জীবনাপেক্ষা বড় (larger than life) রাজনৈতিক কিংবদন্তীর কাহিনি এবং সত্য-অসত্য-কল্পনা মেশানো কাহিনি শোনার পরে রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাস পড়লে না-দেখা সময়খন্ডের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করে- “We have forgotten their faces and their voices; we say that they are strange to us. Yet there is something in us which leaps at the sight of them, a cry of the blood which tells us we have known them always.” (Murray 1914, 26) পাঠকের শ্রেণিগত অবস্থানজনিত অস্বস্তির থেকেও আখ্যানগুলির প্রতি একাত্মবোধ বড় হয়ে উঠতে পারে।

-
- ¹ তপোধীর ভট্টাচার্য, তাপস ভৌমিক সম্পা. *কোরক, প্রাক্-শারদ সংখ্যা*, ১৪১৫, কলকাতা, পৃ- ২৬
- ² সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ‘আমি ও বনবিহারী’, *উপন্যাস সমগ্র ১*, আজকাল, ২০০৬, পৃ- ১১
- ³ মুনিরা সুলতানা, ‘অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবনঃ দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, *জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ আর্টস, ভলিউম ১০, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০*, পৃ- ৮৮-৮৯
- ⁴ তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের সময়*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯, পৃ- ২৫০
- ⁵ Mario Prayer, ‘Freedom in the River: Bengali Bhadrakalok Consciousness in Manik Bandyopadhyay’s Padmanadir Majhi, Nature and the Human Person in India’, suppl. Rivista degli Studi Orientali, Nuova Serie, vol. 2/2015, pp. 165-180
- ⁶ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ- ৩২৪-২৫
- ⁷ তপোধীর ভট্টাচার্য, ‘তিতাস-কথা ও অন্যান্যঃ পুনঃপাঠের প্রস্তাবনা’, http://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/Magazine/Content/SRM01P_TitasKatha.pdf
- ⁸ রণজিৎ গুহ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১০, পৃ- ৩৩
- ⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subaltern>, accessed on 22/01/2023

¹⁰ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, International Publishers, 11th printing 1992, pp. 52-55

¹¹ Ibid., pp. 12-13, 206-09

¹² পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, পৃ- ৩-৪

¹³ রণজিৎ গুহ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, পৃ- ২৮-২৯

¹⁴ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃ- ১১-১২

¹⁵ জহর সেন মজুমদার, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ- ১৩

¹⁶ Gayatri Chakraborty Spivak, 'Subaltern Studies: Deconstructing Historiography', *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*, Methuen, New York and London, 1987, pp. 197-221

¹⁷ Stephen Morton, *Gayatri Chakraborty Spivak*, Routledge, London, 2003, p. 2

¹⁸ Gayatri Chakraborty Spivak, 'Can the Subaltern Speak', *Marxism and the Interpretation of Culture*. Ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg, MacMillan, London, 1988, p. 288

¹⁹ Stephen Morton, *Gayatri Chakraborty Spivak*, pp. 66-67

²⁰ এই নিয়ে লেখা হল 'The White Man's Burden', ১৮৯৯ সালে। লিখলেন রুডিয়ার্ড কিপলিং।

²¹ Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, Penguin, London, 1990, p. 31

²² বিল অ্যাশক্রফট স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়পর্বকে ঔপনিবেশিকতাবাদ বলছেন এবং লিখছেন যে, উপনিবেশিকতার দিন থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়পর্বে সাম্রাজ্যবাদী দূষণপ্রক্রিয়ায়

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলি যেভাবে অরভাবিত হয়েছে সেটা উপনিবেশোত্তরতার অন্তর্ভুক্ত। Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures*. 2nd ed. London: Routledge, 2002, p. 2

²³ Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 39

²⁴ Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *The Empire Writes Back*, p. 207

²⁵ তদেব, পৃ- ১৯৮

²⁶ স্পিভাক ১৯৮৭ সালে গল্পটির ইংরাজি অনুবাদ করেন। দ্রষ্টব্য *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*, pp. 222-240

²⁷ Gayatri Chakravorty Spivak, 'A Literary Representation of the Subaltern: A Woman's Text from the Third World', *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*, pp. 241 – 268

²⁸ Nivedita Majumdar, *The World in a Grain of Sand: Postcolonial Literature and Radical Universalism*, Verso, London New York, 2021, p. 48

²⁹ Gayatri Chakravorty Spivak, 'can the Subaltern speak?', p. 293

³⁰ Gayatri Chakravorty Spivak, *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak*. Ed. Donna Landry and Gerald Mac Lean, Routledge, New York, pp. 290-91

³¹ জহর সেন মজুমদার, নিম্নবর্ণের বিশ্বায়ন, পৃ- ২৮-২৯

³² Sumit Sarkar, "The Decline of the Subaltern in subaltern Studies", *Writing Social History*, Oxford University Press, Delhi, 1997, pp. 82-108

³³ সুমিত সরকার দু'টি শব্দ ব্যবহার করছেন- 'fragmentary' ও 'context' এবং এই প্রবণতাকে উত্তরাধুনিক প্রবণতা হিসেবে দায়ী করছেন। Sumit Sarkar, *The Decline of Subaltern in the Subaltern Studies, Writing Social History*, p. 45

³⁴ তদেব, পৃ- ৫৪

³⁵ তদেব, পৃ- ১০২

³⁶ তদেব, পৃ- ১০৫

³⁷ Nivedita Majumdar, *The World in a Grain of Sand*, op. cit., pp. 20-58

³⁸ তদেব, পৃ- ১৪৭-১৫০

³⁹ জিতেন মাস্টার মঘাইদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন, তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চান। জিতেন তাঁর প্রগতিশীল চেতনা থেকেই ডোম-চাঁড়াল-দুসাদদের মৌলিক অধিকার তথা জলের অধিকার নিয়ে সরব হন। মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ১৮৯-৯১।

⁴⁰ সন্তোষ পূজারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বার্ষিক আয় ষাট হাজার টাকা। তার বহু বেনামী জমি। সে চোলাই বিক্রি করে, মেয়ে পাচার করে তবু প্রশাসনের খাতায় সে 'শিক্ষিত ও সজ্জন', তদেব, পৃ- ১৯৫-৬

⁴¹ কোচবিহার, জলপাইগুড়ির রাজবংশী মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী নৃত্যরতা কালীর ঘাম থেকে মাসান ঠাকুর মাটিতে জন্ম নেয়। মাসানের অনেকগুলি রূপান্তর, যথা- ভুলা, নাজা, ছুচিয়া, উংরিয়া, কুহলিয়া ইত্যাদি। মাসান মূলতঃ মানুষকে অমনোযোগী বিভ্রান্ত ক'রে তাকে বিপথে চালিত করে কিংবা ক্ষতি করে। নাজা মাসানের দেখা পাওয়া অবধারিত মৃত্যুর সামিল, কুহলিয়া মাসান গান গেয়ে বিভ্রান্ত করে, অঙ্গিয়া মাসান বিভিন্ন অঙ্গধারণ ক'রে ক্ষতি করে এবং ভুলা মাসান একা ব্যক্তিকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। সূত্র- মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার দেবতা, অপদেবতা ও লোকদেবতা*, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১, পৃ- ২০৫-২১১

⁴² দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশার্স, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ- ১১৮-২৮

⁴³ তদেব, পৃ- ১২৪

⁴⁴ তদেব, পৃ- ১১৬-১৭, ১২৬-২৭

⁴⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ২৩২-৩৪

⁴⁶ তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ- ৬২-৬৩ তপোব্রত ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির বিশ্লেষণে রাইচরণের প্রত্নচৈতন্যে শিশুর ফিরে আসা খুঁজে পেয়েছেন এবং বিভিন্ন আর্কেটাইপাল ইমেজ খুঁজে পেয়েছেন।

⁴⁷ উল্লেখ্য, অগণিত বাংলা কবিতা, উপন্যাস ও বাংলা চলচ্চিত্রে সাঁওতাল জনজাতির গান ও নাচের অনুষ্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। 'শাল-মহুয়ার দেশ' বাঙালি কবিদের শহুরে বৃত্ত থেকে পালানোর চিত্রকল্প গড়ে দিয়েছে।

⁴⁸ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, *কখনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস*, ভাষাবন্ধন, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৩৪

⁴⁹ Seymour Chatman, *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Films*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1980, p. 151

⁵⁰ Ibid. pp. 147-49

⁵¹ Wayne C. Booth, *The Rhetoric of Fiction*, University of Chicago Press, Chicago, IL, 1983, pp. 70-71

⁵² Gustav Freytag, *Technique of the Drama: An Exposition of Dramatic Composition and Art*, trans. by Elias J MacEvan, Bibliobazaar, Chaleston: SC, 2009, PDF

-
- ⁵³ Teresa Bridgeman, 'Time and Space,' in *The Cambridge Companion to Narrative*, ed. by David Herman, Cambridge University Press, Cambridge: UK, 2007, pp. 52-65
- ⁵⁴ Seymour Benjamin Chatman, *Reading Narrative Fiction*, Macmillan, New York, 1993, p. 21
- ⁵⁵ *Encyclopedia of Narrative Theory*, Ed. By David Herman, Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan, Routledge, London and New York, Taylor & Francis e-Library, 2010, p. 524
- ⁵⁶ F. K. Stanzel, *A Theory of Narrative*, Trans by. Charlotte Goedsche, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, . 15
- ⁵⁷ স্ট্যাঞ্জেল, তদেব, ১৯৮৬, পৃ- ২০
- ⁵⁸ স্ট্যাঞ্জেলের মতে, 'This change is another reason for not speaking of free indirect style but of figural narrative situation when referring to narrative of this kind' (Stanzel 1986, 198)
- ⁵⁹ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, *কথা গঠন*, সৃজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ১৪৪
- ⁶⁰ মনোরঞ্জন বিশ্বাস, 'এক অশ্বারোহী ও নিঃসঙ্গ শব্দ', কঙ্ক পত্রিকা দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, সম্পা. স্বপন পাভা ও উৎপল সাহা, কলকাতা, ১৪২১, পৃ- ২২৩
- ⁶¹ দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ- ১৯৬
- ⁶² Bronwen Thomas, *Narrative: The Basics*, Routledge, London & New York, 2016, 52-55
- ⁶³ অমিতাভ দাস, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ৩৪-৩৫

⁶⁴ জেরার্ড জেনেটের ‘ন্যারেটিভ ডিসকোর্স’-র আলোচনায় ব্রনওয়েন থমাস, *Narrative: The basics*, Routledge, 2016, pp. 37-38

⁶⁵ অমিতাভ দাস, *আখ্যানতত্ত্ব*, পৃ- ৪৫

⁶⁶ Prabuddha Ghosh, ‘Failure as Resistance of ‘Hero(es)’’: Selected Bengali Texts’, *MZU Journal of Literature and Cultural Studies*, Vol. V Issue 1, June 2018, pp. 132-33

⁶⁷ Houston Taylor, ‘Out of Order: A Discussion of Nonlinear Narrative structure’, 2011, <https://litreactor.com/columns/out-of-order-a-discussion-of-nonlinear-narrative-structure>, accessed on 21/01/2023

⁶⁸ M. M. Bakhtin, *The Dialogic Imagination: Four Essays*, Ed. By Michael Holquist, Trans. By Caryl Emerson and Michael Holquist, University of Texas Press, Austin, Seventh Paperback Printing, 1990, PDF, pp. 7, 27

⁶⁹ তদেব, পৃ- ৩০

⁷⁰ সব্যসাচী সেন, ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার ভাষা ও যৌনতা সম্পর্কিত কিছু কথাবার্তা’, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বইমেলা ২০১৮, পৃ- ২৭৮-৭৯

⁷¹ Mika Lähteenmäki, ‘Stalin’s critique of the idea of the class character of language, The Linguistic Discussion of 1950 : 70 Years Later’, *Epistemologica et historiographica linguistica Lausannensia*, No. 2, Ed. By E. Velmezova, Nauchno-izdatelskij Centr Indrik, 2020, pp. 75-84

⁷² রণজিৎ গুহ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, সম্পা. নির্মাল্য আচার্য, ‘এক্ষণ পত্রিকা’, ১৫ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৯, পৃ- ১৫-১৬

⁷³ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৭ সাল, পৃ- ১২৭-১২৯। মঙ্গল মুর্মু মিশনারীদের ভূমিকা, দিকুদের ভূমিকা সম্পর্কে যা বলে, তা মিলে যায় আখ্যানের এই অংশে। মহাশ্বেতার লেখায় জোর পড়ে বেঠবেগারী আর খেতমজুরির ওপরে; শোভেন্দ্রশেখরের আখ্যানে কৃষিজমি লুণ্ঠের সঙ্গে কয়লাখাদান এবং খনিভিত্তিক শোষণের ওপরেও জোর পড়ে।

⁷⁴ উচ্চবর্ণের ব্যক্তির দ্বারা রচিত নিম্নবর্ণের দ্রোহের ইতিহাসে কী কী সমস্যা থাকতে পারে, রণজিৎ গুহ তা আলোচনা করছেন। বিদেশি উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী হলে তাঁর লেখা শাসকদের অভিজ্ঞতায় আত্মীকৃত হবে এবং দেশি উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী হলে তাঁর লেখা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের চিন্তা ও কাজে আত্মীকৃত হবে। রণজিৎ গুহ, *নিম্নবর্ণের ইতিহাস*, পৃ- ১৭।

⁷⁵ মহাশ্বেতা বিরসাকে ‘মডার্ন ম্যান’ হিসেবে দেখছেন। একদিকে সে মিশনারি ইন্সকুলে পড়েছে, ধর্মান্তরিত হয়েছিল একদা, অন্যদিকে পরে সে মুনাফাখোর শাসকদের স্বরূপ বুঝতে পেরে শাসক+ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। সময়ের নাড়ি বুঝতে পারাই আধুনিকতার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তার অরণ্যচেতনার সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল এবং দ্রোহপদ্ধতিতে মুখফেরতা আখ্যানবিশ্বের মিশেল তাকে ‘মডার্ন ম্যান’ ক’রে তুলেছে বলে মহাশ্বেতার বিশ্বাস। *অরণ্যের অধিকার*, ১৪১৮, ভূমিকা, পৃ- ১৪-১৫

⁷⁶ Claude Lévi-Strauss, *Myth and Meaning*, Routledge Classics, London, 2001, pp. 15-16

⁷⁷ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার বিষুঃ বসুর নেওয়া, প্রথম প্রকাশ লিরিক পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বইমেলা ২০১৮, ৭৩

⁷⁸ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, *নিম্নবর্ণের ইতিহাস*, পৃ- ৪-৫

⁷⁹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ২০৬-২০৯ এবং ২৩৪-২৩৬

⁸⁰ Claude Lévi-Strauss, *Myth and Meaning*, p. 16

⁸¹ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর মূল উদ্দেশ্য ছিল কাংলাহার বিলের দখল নিজের অধীনে রাখা যাতে আর্থ-সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ‘মা ভবানী’র পূজা চালু ক’রে মাঝিপাড়ার মানুষদের পোড়াদহ মেলা থেকে সরানো এবং টাউনের ভদ্রলোকদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বাড়ানো তার উদ্দেশ্য ছিল। জোতদার শরাফত মন্ডল হিন্দু নায়েবের সঙ্গী হয়। কারণ, ধর্মীয় বিভাজন থাকলেও তাদের দু’জনের শ্রেণিস্বার্থ অভিন্ন। এই উদ্দেশ্যেই নায়েববাবু ইতিহাস ও মুখফেরতা আখ্যানের সীমারেখা ঝাপসা ক’রে দেন নিজের শিক্ষিত ভদ্রলোক উচ্চবর্গ ইমেজকে কাজে লাগিয়ে। ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ২০৯-১০

⁸² লেভি-স্ট্রাউস একে বলছে ‘mini-myth’ যেটা ক্ষুদ্র, নিবিড় কিন্তু তার মধ্যে মিথের সব উপাদানই রয়েছে।

⁸³ Claude Lévi-Strauss, *Myth and Meaning*, পৃ- 17-18

⁸⁴ বসাই টুডু কালী সাঁতরাকে বলে যে, যেখানে আইনের পথে গেলে কাজ হবে, সেখানে আইনি সহায়তা নেবে। আর, যেখানে জোতদার-প্রশাসন জোট আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে, সেখানে ‘আঙুল বাঁকাবে’ বসাই।

⁸⁵ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ১২৯-৩০

⁸⁶ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ‘ভূমিকা’, *বসাই টুডু ইংরেজি সংস্করণ*, থিমা বুকস্, কলকাতা, ২০০২, পৃ- XVIII

⁸⁷ দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, দে’জ পাবলিশার্স, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ- ১৭০

⁸⁸ Nivedita Majumdar, *The World in a Grain of Sand*, pp. 145-47

⁸⁹ Hansda Sowvendra Shekhar, *The Adivasi will not Dance*, Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd., Delhi, p. 2015

⁹⁰ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫১ ও ১২৯

⁹¹ ২০২২ সালে যে আদিবাসী নারী ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন, তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর নাম দ্রৌপদী মুর্মু। আদিবাসীদের ওপরে হওয়া রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মাত্রা কিছুমাত্র কমে নি এই ঘটনার পরে।

⁹² মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ৪৩-৪৪

⁹³ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ‘ভূমিকা’, বসাই টুডু ইংরেজি সংস্করণ, পৃ- XV

⁹⁴ Foucault, Michel [1975] (1979): *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books, PDF

⁹⁵ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসঃ দ্বন্দ্বিক দর্পণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, মে ১৯৯৬, পৃ- ১০৫

⁹⁶ দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৬-১৯৫

⁹⁷ অরুণ সেন, ‘দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত’, কঙ্ক পত্রিকা, কলকাতা, চতুর্দশ সংখ্যা, অগাস্ট ২০১৪, পৃ- ১৪৭-১৮৭

⁹⁸ কুকুরের সাড়া ও বাঘারুর সঙ্গীলাভ অধ্যায়ে বাঘারুর সঙ্গে কুকুরের নিবিড় সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। ১৪৬-৪৯

⁹⁹ পাখি জাগে, বাঘারুর জাগে শীর্ষক অধ্যায়ে পাখির হুবহু ডাকে পাখিকে দোসর ক’রে নেয় বাঘারুর। ১৫৯-৬১

¹⁰⁰ Cheryll Glotfelty, Introduction, Glotfelty, Cheryll & Fromm, Harold Edited, *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, The University of Georgia Press, Athens. 1996, 'Introduction', p. xix

¹⁰¹ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশার্স, ষোড়শ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ১৮৬

¹⁰² দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, পৃ- ১৫৪-৫৫

¹⁰³ Prabuddha Ghosh, 'Voice and Crises of the Subalterns and Nature: An Eco-critical Reading of Debesh Ray's Two Bengali Novels', *Café Dissensus*, Issue 54, August 31, 2010, last accessed 7th December, 2022

¹⁰⁴ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ- ১৪২-৪৪

¹⁰⁵ তদেব, পৃ- ১৭৫

¹⁰⁶ বাঘের সঙ্গে লড়ার জন্য বাঘারু, গাছে চড়ার দক্ষতার জন্য গাছারু, অরণ্যের সঙ্গে হৃদয়তার জন্য ফরেস্টুয়া, মহিষের সঙ্গে হৃদয়তার জন্য মইষাল ইত্যাদি। লেখক এই নামকরণগুলি বিস্তৃত করতে কোনও কার্পণ্য করেননি শব্দ খরচে।

¹⁰⁷ Nivedita Majumdar, *The World in a Grain of sand*, pp. 151-52

¹⁰⁸ অরুণ সেন, 'দেবেশ রায়ের বৃত্তান্ত', কঙ্ক পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫৮-৫৯

¹⁰⁹ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৫৬-৫৮

¹¹⁰ ঈশ্বিতা হালদার, 'বাঘারু ও মাদারির মা বিষয়ক দু'চারটি কথা', দিশা পত্রিকা, সম্পা. পার্থ মল্লিক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ- ১২১-১৩৭

¹¹¹ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ- ৪৮৮-৮৯

¹¹² দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, পৃ- ১৬৫

¹¹³ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ৯-১০

-
- ¹¹⁴ তদেব, পৃ- ৮
- ¹¹⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ১৭৯
- ¹¹⁶ ইলিয়াসের সঙ্গে শাহাদুজ্জামানের সাক্ষাৎকার, লিরিক পত্রিকা, পুনর্মুদ্রণ বাঘের বাচ্চা পত্রিকা
ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর ২৪ পরগণা, বইমেলা ২০১৮, পৃ- ৫৮
- ¹¹⁷ ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ২১৭-১৮
- ¹¹⁸ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট দে'জ পাবলিশার্স*, কলকাতা, ২০০৪, পৃ- ১০-১১
- ¹¹⁹ নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, পৃ- ২৮
- ¹²⁰ অরূপ কুমার দাস, হারবার্ট উপন্যাসের রাজনীতি, অক্ষরেখা, সম্পা. নীলকমল সরকার (এই
সংখ্যার সম্পা. রাজীব চৌধুরী), ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ১১৫
- ¹²¹ নবারুণের সঙ্গে দেবেশ রায়ের সাক্ষাৎকার, অক্ষরেখা, পৃ- ২৫৫
- ¹²² দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গল্প সমগ্র*, সম্পাদনা অনিশ্চয় চক্রবর্তী, একুশ শতক, কলকাতা,
জানুয়ারি ২০০৫, পৃ- ৪৩৪-৩৫
- ¹²³ তদেব, পৃ- ৪৪৩-৪৫। অজয়ের নেতৃত্বে যুবদলের অ্যাকশন স্কোয়াড বিজয়দের ধরতে যায়।
তখন বিনয়ভূষণের সামনে অজয় ও বিজয় খুন হয়।
- ¹²⁴ এ.বি তথা অশোক বসুর ভাষা পার্টির চরমপন্থী নেতৃত্বের ভাষার অবিকল প্রতিরূপ। ধর্মঘট
ক'রে কিছু হবে না, আইনি লড়াই ছাড়া জেল ভেঙে বেরিয়ে আসবে ইত্যাদি বয়ান। 'অ্যাকশন...
খতম... বদলা' (৮৯) শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের জাগিয়ে তোলার একমাত্র পথ- এই
উচ্চারণ পার্টির মুখপত্রেও প্রকাশিত হত।
- ¹²⁵ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭০, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ৩১
- ¹²⁶ তদেব, পৃ- ৩০
- ¹²⁷ তদেব, পৃ- ১০৫
- ¹²⁸ তদেব, পৃ- ১২৭

-
- ¹²⁹ তদেব, ১৪৫-১৪৮। নারাণদার সঙ্গে এবি ও নিবারণের বিরোধের ভাষা আন্তঃপার্টি বিবাদের ইঙ্গিত দেয়। একইসঙ্গে নারাণদার তাত্ত্বিক এবং অনুশীলনগত রাজনৈতিক বোধ তার বক্তৃতার ভাষায় প্রকাশ পেতে থাকে।
- ¹³⁰ আখতারুজামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ১১৭-১১৮
- ¹³¹ Ipshita Chanda, *The Journey of the Namah: A Case Study, Work in Progress Vol 1*, CAS, Jadavpur University, Kolkata, 2011, pp. 36-38
- ¹³² তদেব, পৃ- ৪১-৪২
- ¹³³ তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের সময়*, পৃ- ৬৭
- ¹³⁴ গোপাল হালদার, ‘কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব’, মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক সম্পা. ধনঞ্জয় দাশ, ৪৫০-৫২
- ¹³⁵ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, *বসাই টুডু ইংরেজি সংস্করণ*, থিমা বুকস্, কলকাতা ২০০২, পৃ- XVII
- ¹³⁶ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৪-৪৫
- ¹³⁷ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ- ১২৯
- ¹³⁸ আখ্যানকথকও জানিয়ে দেন, “বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল কেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক মনে হওয়া” পৃ- ১৬৪
- ¹³⁹ বসাই টুডুও বলে, “পাইপগান করবু? গুলি ছুটাবু? কেনে? কুঁচ ফল নাই? সাপ নাই?” মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ১১
- ¹⁴⁰ রণজিৎ গুহ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫-১৬
- ¹⁴¹ হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ভাষা-আন্দোলন পটভূমি গ্রন্থমালা ৫, ১৯৯০, পৃ- ১-২
- ¹⁴² তদেব, পৃ- ৩

¹⁴³ তদেব, পৃ- ৭-৮

¹⁴⁴ আবু ইসহাকের এই উপন্যাসটি নওবাহার পত্রিকায় ১৯৫০-৫১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

¹⁴⁵ আবু ইসহাক, *সূর্য দীঘল বাড়ি*, চিরায়ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ- ৯

¹⁴⁶ তদেব, পৃ- ১৫-১৬

¹⁴⁷ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ- ১৫৫

¹⁴⁸ এই সম্মেলন থেকে চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুত্র- বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক, পৃ- ১০৩-৪ ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানেও এমন সম্মেলনে তেভাগার কথা ওঠে। কেরামতের গানে তেভাগা আন্দোলনের ঘোষণা কৃষকদের খোয়াব দেখায়। পৃ- ১৫৫-১৬১

¹⁴⁹ তদেব, পৃ- ১২০-১২২। মুসলমান ভদ্রলোকদের বিপদ নিয়ে আলোচনায় প্রকৃত ইসলাম এবং ভুল ইসলাম প্রতর্ক উঠে আসে তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনায়। সাদেক উকিলের প্রশ্ন, “ইসলামে কি জোতদারদের ধান লুটপাট করা জায়েজ করা হয়েছে?” মজিদ সরকার এবং শামসুদ্দিন ডাক্তারের অভিব্যক্তিও এক।

¹⁵⁰ কথকের স্বরে ব্যঙ্গের সুর স্পষ্ট হয়, “তিন হাজার বিঘা জমির মালিকের সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সবাই খুব চিন্তিত” এই বাক্যে। কুশীলবদের তেভাগাবিরোধী বয়ানের ফাঁকে কথকের এমন স্বর অন্তর্ঘাতি। পৃ- ১১৯

¹⁵¹ বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, চিরায়ত প্রকাশন, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ- ৯৬

¹⁵² বদরুদ্দীন উমর এই রণনীতিকে তেভাগার পক্ষে ক্ষতিকারক আখ্যা দিয়েছেন। শ্রেণি সংগ্রামের মতাদর্শকে সরিয়ে রেখে লিহ-কংগ্রেসের সঙ্গে আপস ক’রে নেওয়া মধ্যবিত্ত রাজনীতিকে জয়ী করেছে ও কৃষকদের সর্বনাশ করেছে বলে তাঁর অভিমত। তেভাগা

আন্দোলনকে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামন্ততন্ত্রবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিমুখ দেওয়া যায়নি এই জন্যই। তদেব, পৃ- ৯৮-৯৯

¹⁵³ সতীশ মুক্তার বলে যে, মুসলিমরা তিন-চারটে বিয়ে করে অনেক বাচ্চা পয়দা করে। অনিল সান্যালের দাদা চিঠিতে নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের অমার্জিত কুলাঙ্গার বলে। তাদের কাছে মহমেডান আর বারবেরিয়ান সমার্থক। পৃ- ২৩২-৩৫

¹⁵⁴ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ- ৩৯১-৯২

¹⁵⁵ অপারেশন বর্গার পরেও গয়ানাথ নামে ও বেনামে প্রচুর জমির মালিক হয়ে থাকে। বাঘারুর মতো ক্ষেতমজুরদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে তিস্তাপারের বিস্তীর্ণ জমির দখলদারি বজায় রাখে সে। অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকেই সে বাঁধের বিরোধিতা করে।

¹⁵⁶ দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ- ৩৯০-৯১

¹⁵⁷ দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, পৃ- ১৩৬

¹⁵⁸ তদেব, পৃ- ১৩৪-৪৪

¹⁵⁹ তদেব, পৃ- ১৪৫

¹⁶⁰ আলতাফ পারভেজ, যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ, প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৯, ৩৮-৩৯

¹⁶¹ ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে ‘ফেডারেশনে সভাপতির বিবৃতি’ শিরোনামে এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়। সূত্র- আলতাফ পারভেজ, তদেব, পৃ- ৩৯

¹⁶² তদেব, পৃ- ৫৮

¹⁶³ দেবেশ রায়, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০, পৃ- ১০৩৬-৩৭

-
- ¹⁶⁴ Jogendra Nath Mandal's resignation letter to Liaquat Ali Khan, Dr. Shyama Prasad Mookerjee Research Foundation, <https://www.spmrf.org/wp-content/uploads/2020/01/J-N-Mandal-Resignation-Letter.pdf>
- ¹⁶⁵ দেবেশ রায়, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, পৃ- ১০৪৭-৫৫
- ¹⁶⁶ আলতাফ পারভেজ, যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ, পৃ- ৬১-৬২
- ¹⁶⁷ দেবেশ রায়, বরিশালের যোগেন মণ্ডল, পৃ- ১০৫৭
- ¹⁶⁸ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ৩০-৩৫
- ¹⁶⁹ যতীন সরকার, *বাঙালি সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ- ১৪৪-৪৫
- ¹⁷⁰ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ২০৮-২১০
- ¹⁷¹ তদেব, পৃ- ২৬৬
- ¹⁷² শহীদ ইকবাল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসঃ মানুষ ও কথাশিল্প*, অশ্বেষা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ- ৭২-৭৬
- ¹⁷³ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ২৪৩
- ¹⁷⁴ তদেব, পৃ- ২০৬-০৭
- ¹⁷⁵ তদেব, পৃ- ২০৯-২১১
- ¹⁷⁶ ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার শাহাদুজ্জামানের নেওয়া, লিরিক পত্রিকা, ১৯৯১, সম্পা. এজাজ ইউসুফী, পুনর্মুদ্রণ বাঘের বাচ্চা পত্রিকা ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বইমেলা ২০১৮, পৃ- ৬৩
- ¹⁷⁷ জোতদারের নয়, যে চাষ করে, জমি তার- এই নীতি মেনে নিপীড়িত বর্গাদারদের মধ্যে জমি বণ্টন করার কর্মসূচি নেয় আলিবক্স, আনোয়ারের দল। সরকারি সমাধানসূত্র নয়, কৃষকরা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা লাগু করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। পৃ- ২৪৬-৪৭
- ¹⁷⁸ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার শাহাদুজ্জামানের নেওয়া, পৃ- ৫৭

¹⁷⁹ মণিমোহন উপন্যাসের শেষলগ্নে গ্রামে গিয়ে সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী (wholetimer) কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। শহুরে মধ্যবিত্ত তথা নিজবর্গের পার্টিকর্মীদের ক্রিয়াকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়েই সে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মধ্যবিত্ত-পরিবৃত আলোচনাসভায়।

¹⁸⁰ মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ১৪-১৬

¹⁸¹ বিশ্বর চেতনাপ্রবাহে বারবার ধাক্কা দিতে থাকে মিছিলের অধিকার এবং মিছিলের ‘মালিকানা’ বিষয়ক প্রশ্ন। তার দলের লোক থেকে বাহেবাবুর লোক বনে যাওয়ার হতাশা ও অভিমান তার ভাষায় প্রকাশ পায়। লাল বাগুর প্রতি ভালবাসা এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতি অভিমান যুগপৎ প্রকাশ পায়। দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, পৃ- ১৬৭-৭০

¹⁸² বসাইকে তার সহযোদ্ধা সাঁওতালরা সবাই ‘কমরেট’ বলে এবং বসাইও কালীকে ওভাবে সম্বোধন করে। দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- পৃ- ২১

¹⁸³ দেবেশ রায়, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, দে’জ পরিবর্ধিত সংস্করণ, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ- ১৭০

¹⁸⁴ সহরাই এবং অন্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা বাহেবাবুর কাছে জমি বন্ধক রাখবে জেনেও বিশ্ব তাদের আটকাতে পারে নি। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কাছে বেঁচে থাকাটাই আশু কর্তব্য ছিল। তাদের পেটে ভাত ছিল না, চাষের বিছন ছিল না, গাই-বলদ কিংবা হাল ছিল না। বিশ্ব তাদের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা ক’রে দিতে পারেনি বা সরকারি রিলিফ জোগাড় ক’রে দিতে পারেনি। পৃ- ১৬৬

¹⁸⁵ মুসলিম লিগের কর্মী বলে পাকিস্তানে কোরান আর সুন্না অনুসারে শাসন চলবে। মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি সব বন্দোবস্ত থাকবে।

¹⁸⁶ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ১২২-২৩

¹⁸⁷ তদেব, পৃ- ১১৮-১২৪

- ¹⁸⁸ মুসলিম লিগের প্রগতিশীল অংশের চাপে ১৯৪৭ সালের ২১শে জানুয়ারি ‘বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল’-র খসড়া পাশ হয়। চাষের জমিতে ভাগচাষীর দখলীস্বত্ব এবং ভাগচাষীর ফসলের ২/৩ অংশ অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু খসড়াটি বিলে পরিণত হয়নি মুসলিম লিগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের চাপে। বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক, পৃ- ৯৬-৯৮
- ¹⁸⁹ স্থানীয় মুসলিম লিগ নেতাদের মধ্যে একমাত্র ইসমাইল নিম্নবর্গীয় কৃষকদের প্রতি বিরূপ নয় এবং হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের কথা বলে।
- ¹⁹⁰ নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ- ১১৬
- ¹⁹¹ তদেব, পৃ- ১১৩-১১৪
- ¹⁹² ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার শাহাদুজ্জামানের সঙ্গে, পৃ- ৫৮
- ¹⁹³ Georg Lukács, ‘The Role of Morality in Communist Production’, *Political Writings, 1919-1929*, Ed. by Rodney Livingstone, Transcribed by Brian Reid, N.L.B. 1972, marxists.org, accessed on 3/1/2023
- ¹⁹⁴ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ‘বিবিধ প্রসঙ্গে’, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসঃ সাহিত্য ও সমাজভাবনা*, সম্পা. পৃথ্বীশ সাহা, সমবেত প্রয়াস, ঢাকা, পৃ- ৫১
- ¹⁹⁵ Subhoranjan Dasgupta, ‘The Cultural Battle’, *From Popular Movements to Rebellion: The Naxalite Decade*, Ed. By Ranabir Samaddar, Social Science Press, New Delhi, 2018, pp. 273-74
- ¹⁹⁶ মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ- ২২-২৩
- ¹⁹⁷ রণজিৎ গুহ, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পা. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ- ৩৯
- ¹⁹⁸ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, তৃতীয় সংস্করণ ষোড়শ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ- ২০৪-১১

¹⁹⁹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বিবিধ প্রসঙ্গ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সাহিত্য ও সমাজভাবনা, পৃ- ৫০

²⁰⁰ K. Marx, "Critique of the Gotha Programme", in *K. Marx, F. Engels Selected Works Vol. 3*, Progress Publishers, Moscow, 1970, pp. 13-30, marxists.org 1999

²⁰¹ Andzrej Kobylinski, *The Marxist Concept of Revolutionary Morality According to Leon Trotsky*, Acta Moralia Tyrnaviensia 7 (2017), p. 116

²⁰² Michael Rosen, *The Marxist Critique of Morality and the Theory of Ideology*, source unknown, PDF

²⁰³ Leon Trotsky, Their Morals and Ours, The New International, Vol. 4 No. 6, June 1938, pp. 167-168

²⁰⁴ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সংস্কৃতির ভাঙা সেতু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঃ সাহিত্য ও সমাজভাবনা, সম্পা. পৃথ্বীশ সাহা, সমবেত প্রয়াস, ঢাকা, পৃ- ৫০

²⁰⁵ পাওলো পাসোলিনির উদ্ধৃতি, সূত্র- Naomi greene, *Pasolini: Cinema as Heresy*, Princeton University Press, Princeton NJ, 1990, p. iii

²⁰⁶ K. Marx, "Critique of the Gotha Programme", in *K. Marx, F. Engels Selected Works Vol. 3*, Progress Publishers, Moscow, 1970, pp. 13-30, marxists.org 1999

²⁰⁷ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গগন ঠাকুরের সিঁড়ি', *উপন্যাস সমগ্র*, একুশ শতক সংস্করণ, মার্চ ২০০৮, ২২৫

²⁰⁸ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিবাহবার্ষিকী', *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ২৬১-৬২

²⁰⁹ বিনয়ভূষণ ইদ্রিসের সঙ্গে সম্পর্কহেদ, পার্টির ভাঙ্গন নিয়ে স্মৃতিচারণে আত্মসমালোচনায় ভোগেন। মণিমোহন প্রাক-জরুরি অবস্থায় নিজের পার্টির নীতিগত অবস্থান এবং জরুরি অবস্থার সময় সিপিআইএমের অবস্থান বিষয়ে নীতিগত দোলাচলে ভোগেন। মণিমোহনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের কথোপকথনে এই দোলাচল বর্ণিত হয়েছে।

²¹⁰ সব্যসাচী সেন, ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনার ভাষা ও যৌনতা সম্পর্কিত কিছু কথাবার্তা’, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বইমেলা ২০১৮, পৃ- ২৭৭-৭৮

²¹¹ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, পৃ- ১৭

²¹² ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার শাহাদুজ্জামানের সঙ্গে, পৃ- ৩৯-৪২

²¹³ তাকে সাইকেলটি কিনে দিয়েছিল তার ক্ষেতমজুর কমরেডরা। মহাশ্বেতা দেবী, *অগ্নিগর্ভ*, পৃ- ৩৭

²¹⁴ রাস্তার বোমাবাজি থেকে বাঁচতে একটি বাসনের দোকানে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে একটা রেকাবি, একটা ছাঁকনি ও দু’টো চামচ চুরি করে ডিএস। নবারুণ ভট্টাচার্য, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচার*, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ২০০৪, ৩৪

²¹⁵ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই*, পৃ- ৪৪-৪৫

²¹⁶ নবারুণ ভট্টাচার্য, *ফ্যাতাডুর বোম্বাচার*, বিশ্বকাপে ফ্যাতাডু, পৃ- ৫৮

²¹⁷ তদেব, পৃ- ১০৪

²¹⁸ নবারুণ ভট্টাচার্য, কাঙাল মালসাট, *উপন্যাস সমগ্র*, পৃ- ৩৬২

²¹⁹ অধীশা সরকার, ‘নবারুণ-আখ্যানের অ-সাধারণ নারীদের একটি সাধারণ পাঠ’, *নবারুণ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, অর্ক চট্টোপাধ্যায় ও অদ্বয় চৌধুরী সম্পা. বৈভাষিক প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ- ২৫১-২৫২

- ²²⁰ সত্রাজিৎ গোস্বামী, 'নবারণি ভাষা অথবা ফ্যাতাডু ভাষ্যঃ একটি নড়বড়ে প্রতিবেদন', অক্ষরেখা, সম্পা. নীলকমল সরকার, উক্ত সংখ্যার সম্পাদনা রাজীব চৌধুরী, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ- ১০৬
- ²²¹ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *নির্বাচিত সাহিত্যসমালোচনা*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ- ৭০
- ²²² রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জার্নাল সত্তর'-এ এমন পাঠরূটি এবং বইয়ে ঠাসা আলমারির উল্লেখ করছেন। আলমারিটি তাঁদের পরিবারকে অতিনিম্নবিত্ত বস্তির অন্যান্য ঘরের থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখত। উনিশ শতকীয় স্মৃতিসমৃদ্ধ বইঠাসা আলমারিটিতে বিপ্লবী সাহিত্য লুকিয়ে রাখতেন কথক। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জার্নাল সত্তর', ১৯৭০, চর্চাপদ, ২০১৪, পৃ- ১৭৫-৭৬
- ²²³ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'টোঁড়াই-এর আগে-পরে', *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ- ২২-২৪
- ²²⁴ তদেব, পৃ- ২৮
- ²²⁵ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে এমনই সন্মাসরি পাঠকের উদ্দেশে বহু বাক্য রয়েছে। 'আনন্দমঠ'-এ পাঠককে রাজনীতি, ইতিহাস ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক গৌরবের প্রত্যক্ষ পাঠ দেওয়া হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত পাঠকের (implied reader) মাধ্যমে।
- ²²⁶ গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?*, ছাতিম বুক্‌স্, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৬৩-৬৪
- ²²⁷ তদেব, পৃ- ৬১
- ²²⁸ তদেব, পৃ- ৭০
- ²²⁹ সর্বসামাজিকানামেকঘনতৈব প্রতিপত্তেঃ অর্থাৎ সব সামাজিক দর্শক একঘন হয়ে জাব্যের রসোপলব্ধি করেন। "রসিক নাট্যদর্শকের 'সামাজিক একঘনতার' অভিজ্ঞতাই তো কাব্যপাঠকের সকলসহৃদয়সংবাদশালিতা... সহৃদয় হবার শর্ত 'তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা'।" তদেব, পৃ- ৭১-৭২

²³⁰ মহাশ্বেতা দেবী, ‘কিছু লেখালেখির পেছনে’, সাহিত্যচিন্তা পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৯১, রচনাসমগ্র
অষ্টম খণ্ড, বৈশাখ ১৪১০, পৃ- ৩২৫

²³¹ Claude Levi-Strauss, *Myth and Meaning*, p. 16

²³² শঙ্খ ঘোষ, ‘মহাশ্বেতা দেবীঃ গণ্ডি ভাঙা মানুষ’, সানন্দা পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ- ৭৫

²³³ নির্মল ঘোষ, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ,
কলকাতা, ২০১৬, পৃ- ৭৫-৭৬

²³⁴ দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, দে’জ পাবলিশার্স, প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণ,
কলকাতা, ২০০৬, পৃ- ১৬১

²³⁵ তদেব, ১৬২-৬৩

²³⁶ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে ‘ওরা’, পৃ- ২৪-২৫

²³⁷ হাসান আজিজুল হক, ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াসঃ সাহিত্যের নতুন সীমানা’, *কথা লেখা কথা*,
সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, গুতি- ১১৩

²³⁸ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কথাবার্তা, শাহদুজ্জামানের নেওয়া সাক্ষাৎকার, পৃ- ৩৭

²³⁹ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইলিয়াস। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকে নেগেটিভ
অর্থে দেখতে চাননি, গ্লোরিফাইও করতে চাননি। অবজেক্টিভভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে
দেখাবার চেষ্টা করবেন, এই আশা ছিল। শাহদুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বাঘের বাচ্চা
ইলিয়াস সংখ্যা, ২০১৮, পৃ- ৫৩-৬৩

²⁴⁰ ইলিয়াসের নিজের কথায়, নিম্নবর্ণের কথা তিনি ইচ্ছে ক’রে আখ্যানে আরোপ করেননি।
আখ্যানের স্বাভাবিকতায় তা চলে এসেছে। সাব-অলটার্নদের জীবন দূর থেকে দেখে লেখার
সাহস ওঁর নেই। ওঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তিনি। সূত্র- বিষ্ণু বসুর নেওয়া
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার, পুনর্মুদ্রণ, বাঘের বাচ্চা ইলিয়াস সংখ্যা, বইমেলা ২০১৮,
পৃ- ৭৫

²⁴¹ হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার, কথা পত্রিকা, সম্পা. দীপক চৌধুরী ও নুরুল কবির, বগুড়া, ডিসেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ- ২১

²⁴² দেবেশ রায়, *উপন্যাসচিন্তা*, উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ- ৯৮-৯৯

²⁴³ দেবেশ রায়, 'উপন্যাসে স্বদেশজিজ্ঞাসাঃ 'ধুলোমাটি', তদেব, পৃ- ১৬২-৬২

²⁴⁴ Gilbert Murray, *Hamlet and Orestes: A Study in Traditional Types*, Oxford University Press, New York, 1914, p. 26

উপসংহার

উপন্যাস ও রাজনীতির সম্পর্কের ছুঁমার্গ বা মতাদর্শগত জবরদস্তির ঘনিষ্ঠতা পেরিয়ে এসে এটুকু স্বীকার করা যায় যে, উপন্যাস ও রাজনীতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে সাহিত্যগত রাজনীতি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সামগ্রিক বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তনপথের হৃদিশ কীভাবে পাওয়া যায়- এই অনুসন্ধান করতে করতে অভিসন্দর্ভটি এগিয়েছে। উপন্যাসের রাজনীতি উপন্যাস সংরূপ নির্মাণের প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল এবং বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা ক্রিয়াশীল থেকেছে। উপন্যাস কাদের কথা বলবে? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী ঠিক ক'রে নিলেন যে, উপন্যাস মধ্যবিত্তের বা উচ্চবিত্তের স্যাঁতস্যাঁতে বেদনা নিয়ে কথা বলবে না আর। আখ্যানের গতিপথে মধ্যবিত্তের সংকটের কথা এলেও, প্রাধান্য পাবে নির্বিত্তের ও নিম্নবর্গের সংকট। রাজনৈতিক আখ্যানের কেন্দ্রে অ-ভদ্রলোক, নিম্নবর্গীয় প্রোটাগনিস্ট থাকবে। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং অন্যান্য বর্গের সঙ্গে তাঁদের বর্গের দ্বন্দ্বগুলি প্রাধান্য পাবে। বসাই টুডু এবং দ্রৌপদী সেজন্য 'অগ্নিগর্ভ' আখ্যানে ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের আর্থ-রাজনৈতিক বয়ান প্রত্যাখ্যান ক'রে কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। তেভাগা আন্দোলন ও দেশভাগের সংকটে নিম্নবর্গীয় তমিজ, বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কেরামত আলি, তমিজের বাপের আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নভঙ্গ-বয়ান উপস্থাপিত হয়। ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দেশভাগ-দাঙ্গা এবং তেভাগা আন্দোলনের বয়ানকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁদের বয়ান প্রতিষ্ঠিত করেন ইলিয়াস। ফ্যাতাডুরা বিশ্বায়ন-উদারিকরণের যুগের পশ্চিমবঙ্গে শহুরে নিম্নবর্গের উদ্যাপনকে সাহিত্যপরিসরে প্রতিষ্ঠা দেয়। ভদ্রলোকের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের বিরোধ, উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং শাসক-মতাদর্শ মেনে চলা ভাষা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাদের হুল্লোড়ময় নৈরাজ্য। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, গল্প, রিপোর্টাজ সময়ের রাজনীতিকে ধারণ ক'রে ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু,

‘শোকমিছিল’, ‘বিবাহবার্ষিকী’, ‘গগন ঠাকুরের সিঁড়ি’ আখ্যানগুলির পটভূমি রাজনীতিজারিত কলকাতা শহর। ‘শোকমিছিল’ ‘গল্প সংকলন’-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি উপন্যাসোপম বড়গল্প, যার মধ্যে উপন্যাসের পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানবিশিষ্ট রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্ত এসব আখ্যানের কেন্দ্রীয় কুশীলব। রাজনীতি অন্তিম বিচারে মানবিক সম্পর্কের একটি রূপ- সামাজিক সত্তা ও পারিবারিক সত্তার দ্বন্দ্ব পাটি ও পরিবার কুশীলবদের অস্তিত্বের নির্ধারক হয়ে ওঠে- দীপেন্দ্রনাথের লেখা আখ্যান এই সন্দর্ভের গভীরে অনুসন্ধান করতে করতে এগোয়। শিল্পের মূল বিষয় হচ্ছে সংশয়। মীমাংসা ক’রে দেওয়া কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়া উপন্যাসের কাজ না। সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলি এই সংশয় ধারণ করেই নির্মিত হয়েছে। ‘ব্যক্তি’র বিকাশ উপন্যাসকে অন্যান্য সাহিত্যসংরূপ থেকে স্বতন্ত্র করে। সেই বিকাশের পথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলির সঙ্গে সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ বহুস্তরীয় দ্বন্দ্বের মিথস্ক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই আলোচনাগুলি জরুরি হয়ে উঠেছে।

সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে লেখা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং ষাট-সত্তর দশকের ছাত্রযুব আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন প্রাধান্যকারী বিষয় হয়ে উঠেছে। উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তি ও পরিবারের দ্বন্দ্ব, শাসক বনাম দ্রোহীদের দ্বন্দ্ব, উক্ত সময়ের রাজনীতি থেকে পরবর্তী সময়ের বামপন্থী রাজনীতির বিবর্তন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমবদল, উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মতাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট ইত্যাদি মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। যেক’টি প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে অন্যতম- (১) মধ্যবিত্ত মেধাবী প্রোটাগনিস্ট সত্তর দশকের রাজনীতির প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ। (২) সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের স্থিতি ধ্বংস করছে রাজনীতি। (৩) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নঞর্থক রূপটি প্রধান। (৪) নকশালবাড়ি রাজনীতি

ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক সন্ত্রাসমূলক রাজনীতিতে ছাত্রযুবদের নৈরাজ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। (৫)

ভদ্রলোকবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোড়ন তুলেছিল এবং তাদের প্রতিক্রিয়াই আখ্যানের মূল আলোচ্য। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক-শ্রমিকের দ্রোহকে বিচার করার প্রবণতার আধিক্য। বাণিজ্যিক পত্রিকা ও বাণিজ্যিক হাউস প্রণীত বিভিন্ন উপন্যাসে এবং তথাকথিত অবাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু উপন্যাসে উপর্যুক্ত প্রবণতাগুলির পুনরুৎপাদন হয়ে চলেছে। নবারণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আটটা নটার সূর্য’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’ সত্তরদশক-পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার চেনা ধাঁচকে প্রত্যাহ্বান জানায়। দীপেন্দ্রনাথের ‘শোকমিছিল’ এবং ‘বিবাহবার্ষিকী’ অনুশীলনগত রাজনৈতিক মতাদর্শের নঞর্থক এবং সদর্থক রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে। মতাদর্শের যে রূপটি চৈতন্য জাগরণে অভিমুখ দেয় এবং জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ। হত্যার বীভৎসা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিহিংসা পেরিয়ে জনগণের চেতনার সম্প্রসারণের দৃষ্টিকোণে জোর দেওয়াকে আখ্যানের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত করেন দীপেন্দ্রনাথ। ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ উপন্যাসে রুহিতন কুমারী তার আদিবাসী জাতিসত্তার পরিচিতিতে ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে- মতাদর্শগত রাজনৈতিক ভিত আখ্যানে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে ব্যক্তিগত হতাশা-পরাজয় মুখ্য হয়ে ওঠে। ‘অগ্নিগর্ভ’-র বসাই টুডু এবং দোপদী মেঝেনের আদিবাসী সত্তার পরিচিতি এবং শ্রেণি-রাজনীতি পরিপূরক হয়ে ওঠে- রুহিতন কুমারীর মতো হতাশ, নিঃসঙ্গ নয় তারা। নিপীড়িত জনজাতির জৈব-নেতৃত্ব হয়ে ওঠে বসাই, দোপদী। কিন্তু রুহিতন কুমারীর এমন নির্মাণ করেন নি আখ্যানকার। এই বিপ্রতীপ অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা দিতে বসাই টুডুর উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি এবং ‘দ্রৌপদী’-র অন্তর্ঘাতী বাচন আখ্যানের রাজনৈতিক ভিত নির্মাণ করে। দেবেশ রায়ের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৯৮০-র দশকের নিস্তরঙ্গ নিরাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ‘বিষয়ীসত্তা’ হয়ে আখ্যানকে দিশা দিতে সক্ষম হয়। রাজনীতিজারিত ইতিহাসধৃত সময়ে ব্যক্তিমানুষকে খোঁজাই যদি উপন্যাসের অস্বিষ্ট হয়, তাহলে সেই কাজটিই

করেন দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ, নবারুণ, আখতারুজ্জামান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানকে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ রাখেন না। চেংটু, আলিবক্সদের রাজনৈতিক ভাষ্য প্রত্যন্ত জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটায়। ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস দেশভাগ ও দাঙ্গাবিষয়ক ছকেবাঁধা আখ্যান পরিসরকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে নিম্নবর্ণের ভাষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৬-৪৭ সালের রাজনীতি শুধু হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক, নঞর্থক, রক্তপাতপ্রবণ, হিন্দু বনাম মুসলমান ছিল না। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের স্বার্থান্বেষী দ্বন্দ্বের সমান্তরালে তেভাগার রাজনীতি, কৃষকের মুক্তির রাজনীতি এবং উচ্চবর্ণীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধ-রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল। নিরাজনৈতিক আখ্যানের আধিপত্যের যুগে উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকদের লেখা আখ্যানে রাজনৈতিক উপাদানগুলি সময়ের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। শাসক মতাদর্শ সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই উপন্যাসগুলি শাসক-মতাদর্শ-নিয়ন্ত্রিত ছক ভেঙে দেয়। আখ্যানের গড়নগঠন, ভাষা, বিষয়বস্তু সবকটি ছক কীভাবে প্রত্যাহ্বায়িত হয়, সন্দর্ভে তা বিশ্লেষণ করেছি।

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল পাঠক নির্মাণের রাজনীতিও। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উচ্চবর্ণীয় সংজ্ঞায়ন অনুযায়ী ‘শিক্ষিত’, ‘মার্জিত’, ‘ভদ্রলোক’ পাঠকবর্গ নির্মাণ করা হল। এঁরাই পরবর্তী শতকে সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছেন এবং শাসকের মনোমতো এক উচ্চবর্ণ সাহিত্যবৃত্তকে প্রজন্মান্তরে বহমান রেখেছেন। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণে ভদ্রলোক-হিন্দু-মধ্যবিত্ত কুশীলবের প্রাধান্য এবং সমবর্ণীয় পাঠকশ্রেণি তৈরি হয়েছে। উপন্যাসে ‘আত্ম-অপর’ বিভেদ স্পষ্ট হয়েছে। ভদ্রজনের সাহিত্যভাষা গড়ে নেওয়া ও সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে ওই বর্ণের প্রয়োজনমতো। উপনিবেশিত আধুনিকতা এবং সংস্কারাশ্রয়ী-প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার দ্বন্দ্ব জারিত ‘ব্যক্তি’-র অনুসন্ধান চলেছে রাজনৈতিক উপন্যাসেও। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে

সাহিত্যক্ষেত্রেও বৃহত্তর মুসলমান সমাজের অভিমান এবং বঞ্চনাবোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে বহুদশক ধরে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের এবং ঔপন্যাসিকদের বিকাশ হয়েছে তুলনামূলক দেরিতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বয়ান যতই তুলে ধরা হোক, বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র পরিচিতি হয়েই ছিল এবং উপন্যাসে হিন্দু এবং/বনাম মুসলমান এই প্রতর্ক ছিলই। সাহিত্যের রাজনীতি ও রাজনৈতিক সাহিত্যও এই স্বাতন্ত্র্য ও বিভেদকে ধারণ করেই এগিয়েছে। ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সময়ে বাঙালির চেতনা এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগ প্রস্তাবের সময়ে বাঙালির চেতনাবিশ্বে বিপুল রাজনৈতিক-ধর্মীয় বদল ঘটে গেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের দাঙ্গাবিপন্ন মুহূর্তে প্রথম সারির বাঙলা দৈনিকগুলি হিন্দু মধ্যবিত্তের সংকট নিয়েই চিন্তা করেছে। ততদিনে ‘বন্দে মাতরম’ সাহিত্যের ভাষা থেকে রাজনৈতিক বয়ান ও হিন্দুত্ববাদের হিংসাত্মক শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পাকিস্তানপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবে। বাঙলা ভাগের প্রাক্কালে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি, কলকাতাকেন্দ্রিক দৈনিক পত্রিকা এবং সাহিত্য পত্রিকা ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের সংকটের ওপরে যাবতীয় গুরুত্ব নিবদ্ধ করেছিল। অবহেলিত থেকে গেছিল নিম্নবর্ণের ভাষ্য এবং আকাজ্জার সাহিত্যগত প্রতিফলন। ‘তেভাগা’-র মতো সর্বাঙ্গকৃষকদ্রোহে শুধু বর্গাদাররা নয়, ক্ষেতমজুররাও যোগদান করেছিলেন। তার থেকে মধ্যবিত্তের সংকটকে আলাদা রাখতে তৎপর ছিল এরা। একই দশকে পাকিস্তানবাদী রাজনীতি বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে এবং ভদ্রলোক-কেন্দ্রিক হিন্দু-আধিপত্যের সাহিত্যের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে শ্রেণিরাজনীতির দ্বন্দ্বিক সমীকরণ ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাসে তৎকালীন সময়পর্বে নতুন আলোকপাত করল। লোকায়ত ধর্মবোধ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপ্রবণতাকে প্রত্যাশ্রয় জানাতে পারে, তা আখ্যানের বিভিন্ন স্তরে প্রতীয়মান হল। দেশভাগের পরে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিম্নবর্ণীদের রাজনৈতিক আকাজ্জা ক্ষমতাকাঠামোর চাপে লঘু হতে থাকল, ফলে আখ্যানের কুশীলবদের খোয়াব বদলে যেতে লাগল। ‘খোয়াবনামা’ আখ্যানে এই রাজনীতি স্পষ্ট। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস (বিশেষতঃ ‘চিলেকোঠার সেপাই’) ও বাংলাদেশের (তার

আগে পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসকে হুবহু এক কাতারে ফেলা যায় না। দু'টি স্থানের রাজনীতি, গণআন্দোলনের ধরন এবং পাঠক-লেখক বিকাশের বিবর্তনে তফাৎ রয়েছে। মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ, রাজনৈতিক উপাদানসমূহ এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাসেও কিছু তফাৎ রয়েছে। কিন্তু, সাদৃশ্যও রয়েছে প্রচুর-সামগ্রিক বাঙলা সাহিত্যের রাজনীতি ও বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তন অনুসন্ধানে তা গুরুত্বপূর্ণ।

সতীনাথ ভাদুড়িই সম্ভবতঃ প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক, যিনি বাংলা ভাষায় অ-বাঙালি কেন্দ্রিক উপন্যাস লিখলেন নিম্নবর্ণের যাপন নিয়ে এবং উপন্যাসের পটভূমি স্থাপিত করলেন বাংলার বাইরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। আখ্যানস্থ পরিসরে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবৃন্দের প্রবেশধিকার থাকল না অথবা সেই প্রবেশ আধিপত্যমূলক হল না। নিম্নবর্ণের যাপন, লোকাচার, বিশ্বাস এবং ঐহিক-দেবত্বে উত্তরণ অবতরণের ভাষা আখ্যানের প্রতিটি পরত নির্মাণ করল। 'টোঁড়াইচরিত মানস' বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত গড়নগঠনকে প্রত্যাখ্যান ক'রে কাহিনি বিন্যাসের নতুন রাজনীতির প্রস্তাবনা করল। কয়েক দশক পরে বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলুদের স্বরে ভারতবর্ষের প্রান্তিকতমদের সঙ্গে ভদ্র-সুধীজনের অনপনেয় দূরত্ব, বোধগম্যতার ফারাকগুলি প্রতীয়মান হল। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রজন এতকাল বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলুকে যে ছকে দেখতে চেয়েছে ও দেখাতে চেয়েছে, তাতে অন্তর্ঘাত ঘটল। এতদিনের পাঠকবৃন্দের ও লেখকবৃন্দের জ্ঞান এবং অনুসন্ধানের যে নিরুপায় সীমাবদ্ধতা, তারই প্রতীক বাঘারু, মাদারির মা, চ্যারকেটুরা। 'আঞ্চলিক উপন্যাস' তকমা দিয়ে মূলবৃন্দের উপন্যাসের থেকে ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাসকে প্রান্তিক ক'রে দেওয়ার ভদ্রলোকীয় চেষ্টা বহু দশকের। যে আখ্যানে শহুরে মধ্যবিত্তের যাপন, তাদের আকাজ্জা-ব্যর্থতা, তাদের প্রমিত-অপ্রমিত মূল্যবোধ এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদান নেই, সেগুলিকেই 'আঞ্চলিক' বর্গভুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'টোঁড়াইচরিত মানস' এই প্রবণতার রাজনীতিকে

প্রত্যাঙ্গান জানায়। এই উপন্যাসগুলির আখ্যানস্থ কেন্দ্রীয় মানুষদের অনুভূতি ‘অসংস্কৃত’ নয় এবং মান্যভাষা-উপভাষার উল্লাসিক মেরুকরণ দিয়ে আখ্যানগুলির বহুস্তরীয় ভাষাবিন্যাসকে মাপা যায় না। উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলি নিছক ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ নয় কারণ শুধুমাত্র দেশকালপরিধিকে বাইরে থেকে আধার হিসেবে চিহ্নিত করেই কথকের ও আখ্যানের দায় ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বরং তা অন্তর্বস্তুর গভীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। আঞ্চলিকতা ও উপন্যাসের অন্তর্বস্তু যেখানে রাজনৈতিক অনুশীলনের সঙ্গে একীভূত, সেই আখ্যানকে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ বর্গে জোর ক’রে টেনে আনা সাহিত্যের রাজনীতির এক বিশেষ বাচন। কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক দিয়ে ‘অপর’জনের সাহিত্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রচলিত। এতদিনের কেন্দ্র-প্রান্ত সমালোচনাতত্ত্ব বিপন্ন হয় যখন ‘বাইরের থেকেও বাইরে’ অবস্থান সূচিত হয় কেনুদের। বৃত্তান্তের প্রোটোগনিস্টরা যদি প্রান্তের বাইরে চলে যায়, তাহলে কেন্দ্রই বা রক্ষা পাবে কী করে?

সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্য ও সংস্কৃতিগত বৈষম্যের জন্য আধিপত্যকারী গোষ্ঠী ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চস্থানে থাকা গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণি নিজেদের শাসনের স্বার্থে ভাষার প্রমিত-অপ্রমিত, শিষ্ট-অশিষ্ট, ভালশব্দ-অপশব্দ ইত্যাদি বয়ান প্রতিষ্ঠা ক’রে ‘মান্য’ ভাষাপ্রকল্প গড়ে নিতে চায়। সন্দর্ভে আলোচিত বাংলা উপন্যাসগুলির ভাষা শুধুমাত্র প্রমিত, মান্য, প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার গণ্ডিতে আটকে থাকছে না। সত্তর দশকের পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে কুশীলবদের শ্রমজারিত ও সংস্কৃতিজারিত চেতনার ভাষা প্রাধান্য পেলে- ‘মান্য সাহিত্যভাষা’-র গণ্ডি ভেঙ্গেচুরে প্রসারিত করল। মহাশ্বেতা, দেবেশ, আখতারুজ্জামানের উপন্যাসে দেশীয় নাগরিকদের বহুস্তর থেকে উঠে আসা বহুমাত্রিক ভাষা উপন্যাসের পরিসরে অনায়াসে মিশে গেছে। ‘উপভাষা’, ‘অপশব্দ’ ইত্যাদি যাবতীয় তকমাকে অগ্রাহ্য ক’রে ভাষার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। মধ্যবিত্তের, ভদ্রজনের এঁচে দেওয়া ভাষার নিয়মনীতি সচেতনভাবে অবজ্ঞা ক’রে ও লঙ্ঘন ক’রে শিল্পসংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছেন সন্দর্ভে

আলোচিত ঔপন্যাসিকরা। বহুস্তর, বহুশ্রেণি, বহুবর্ণে বিভক্ত দেশজ মানুষের প্রত্যেকের চেতনার মানে বিভিন্নতা আছে বলেই আখ্যানের ভাষা রাজনীতিগত বিশুদ্ধি মেনে কুশীলবদের মুখে বসতে পারে না। ফ্যাতাডুদের ভাষা মান্যভাষার নিয়মনীতিতে অন্তর্ঘাত ঘটায়। মার্ক্সীয় সাহিত্যের ভাষাপ্রকল্পেও তা ‘বেমানান’। নবারুণ, দেবেশ, ইলিয়াস মার্ক্সবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁদের সাহিত্যের ভাষা প্রথাগত মার্ক্সীয় সাহিত্যের ছুঁমার্গকে তোয়াক্বা করে না। বসাই টুডুর রুক্ষ, অমার্জিত, অপ্রমিত ভাষা প্রগতিশীল ছাঁদে এঁটে থাকে না, ঔপনিবেশিক আখ্যানপ্রকল্পে আঁটে না এবং কথক-ভাষা-সত্য এই ত্রিস্তম্ভের নবায়ন ঘটিয়ে দেয়। নিছক কিছু বিশিষ্ট-শব্দবন্ধ (jargon) বা বাচনভঙ্গি না, সমগ্র ভাষাকাঠামোর বহুমাত্রিক সত্তা প্রতিফলিত হচ্ছে এঁদের লেখায়। ভাষার রাজনীতিকে উপন্যাসে স্পষ্ট করছেন সন্দর্ভে মূলতঃ আলোচিত চার জন লেখকই- কিন্তু, আমাদের চেনা-জানা দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতচিহ্নকরণ ঘটিয়ে। ‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘অগ্নিগর্ভ’, ‘কাঙাল মালসাট’ ইত্যাদি উপন্যাসের কথক নিরপেক্ষ নিষ্পৃহ অবস্থান পালন করছে না। কথকের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যযোজনা, বিষাদপূর্ণ রসিকতা (dark humour) এবং পর্যবেক্ষণের গভীরতা আখ্যানকে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা দিচ্ছে। আখ্যানকৌশলে দৃষ্টিকোণের ব্যবহার বদলে অন্তর্ঘাতী কথন নির্মিত হয়। কথকের দৃষ্টিভঙ্গি কথনবিশ্বের একমাত্র পরিচায়ক হয়ে থাকছে না।

সংস্কৃতিচর্চা ও ভাষা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর শ্রমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলেই এগুলি উপরিকাঠামোর অংশ না, বরং উৎপাদনের সঙ্গে অঙ্গঙ্গী। মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রকাশভঙ্গি, ভাষা-সংস্কৃতির উপাদানগুলির তফাৎ রয়েছে। এবং, ভাষার প্রতিরোধ রয়েছে। বহুস্তরীয় সমাজের নিষ্ঠা পর্যবেক্ষক এগুলি অনুধাবন ও উপস্থাপনা করেন। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কমুনিস’ উপন্যাসে দ্রোহযাপনের ভাষায় বেলেঘাটার রাস্তা জড় থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠে, শহরের রাতের নিজস্ব ভাষা মূর্ত হয়। ‘খোয়াবনামা’-র ভাষা শোলোক, খোয়াব, গণসঙ্গীত ও প্রবহমান মুখফেরতা কাহিনি দ্বারা পুষ্ট হয়। উচ্চবর্ণীয় বাচন ও ইতিহাসনির্মাণের প্রতিস্পর্ধী বাচন এই

উপাদানগুলি থেকে গড়ে ওঠে। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর হাড়ি খিজিরের ভাষা মহাজনের বিরোধিতা থেকে রাষ্ট্রবিরোধিতায় উত্তীর্ণ হয়। জুস্মনের মায়ের ভাষার বহুস্তরীয় গঠন থেকে প্রতিবাদী সত্তার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যভাষায় ‘কাঁউটার কর, লেঃ কাঁউটার কর’ এক হিংসাত্মক ভাষা, যা শ্রেণিবৈষম্যমূলক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক ও বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ন্যায্যতা দেয়। বসাই টুডু সরাসরি বাবুশিক্ষা, বাবুসংস্কৃতির বিরুদ্ধবাচন হাজির করে। তার শরীরী ভাষার ‘হিংস্র’ অভিব্যক্তি, তার যুদ্ধকৌশল সূচিত করার দ্রোহাত্মক ভাষা শ্রেণিশোষণ ও বর্ণশোষণ টিকিয়ে রাখার প্রাতিষ্ঠানিক বাচনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র আখ্যানের কালক্রম একরৈখিক না। রণজয়ের বিপর্যস্ত চিন্তাসূত্র এবং স্মৃতিজারিত দ্রোহভাষা নব্বই দশকের সর্বব্যাপী বিশ্বায়িত সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ ক’রে চলে। রাজনৈতিক দ্রোহসত্তাবিশিষ্ট রণজয়ের স্বর অন্যান্য মূল কুশীলবের স্বরের থেকে স্বতন্ত্র। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র বাঘারুর প্রতিটি ‘না’ এক প্রত্যাখ্যানের ভাষার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করায়। ভদ্রলোকীয় অভিধানে যে প্রমিত ভাষা নেই, উচ্চবর্গের আর্থ-রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে ভাষা বেমানান, এমনকি বৃত্তান্তের শেষ পাতায় লেখক নিজেও যে ভাষা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেন সর্বজ্ঞ কথকের অবস্থান ভেঙে, সেই ভাষা প্রগতিবাদী থেকে রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের পথে উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকে। উপন্যাসের নবায়নের (Novelization) যে লক্ষণগুলি আখ্যানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ভাষার নিয়ত নবীকরণের হৃদিশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে নমনীয় এবং উদার, তাতে নির্দিষ্ট সাহিত্যভাষার বহির্জগৎ থেকে বহুস্তরীয় বহুস্বরের শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিংশ শতকের প্রথমপর্বে রাজনৈতিক উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ধারা ও স্বদেশচিন্তা প্রধান হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে প্রগতিবাদী সাহিত্যচিন্তা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধরনধারনে গুণগত বিবর্তনের তত্ত্ব সংযোজন করল। ষাট-সত্তর দশকে সংঘটিত আর্থ-

রাজনৈতিক দ্রোহচেষ্টা বিবর্তনের উপাদানগুলিকে নতুন রূপদান করল। এই সন্দর্ভে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবন, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং সক্রিয়/নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচ্য না। দেবেশ রায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিআই-র কতটা একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন, কিংবা নবারণ নকশালপন্থী রাজনীতিকে কতদূর পর্যন্ত প্রকাশ্য সমর্থন করতেন, কিংবা ইলিয়াস কতটা সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি করতেন- সেসব অনুসন্ধান অবাস্তব। তাঁদের রচিত রাজনৈতিক উপন্যাস কোন কালস্থানিকতার উপস্থাপনা করছে, উপন্যাসের চরিত্ররা কীভাবে সময়ের রাজনীতির অন্বেষণে নির্মিত হচ্ছে এবং উপন্যাসের রাজনীতিতে আখ্যানগুলি কোন নতুন অভিমুখের হৃদয় দিচ্ছে, সেগুলোই সমালোচ্য।

প্রগতিবাদী সাহিত্যধারা বাংলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান সংযোজিত করেছে। বাঙালি বামপন্থী ঔপন্যাসিকদের মার্ক্সীয়বোধ সমসত্ত্ব না, নিজেদের মতো ক’রে মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বুঝে তাঁরা উপন্যাসে, কবিতায়, গল্পে প্রয়োগ করেছেন। ফলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সাবিত্রী রায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে প্রগতিবাদী ও মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ভিন্ন। ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্বজ উপন্যাসনীতিতে বদল ঘটিয়েছে। উপন্যাস নামক সংস্কৃতির ভেতর থেকে বদল আসছে- প্রগতিবাদী সাহিত্যধারা বা আগের মার্ক্সীয় সাহিত্যঘরানা থেকে তার উপাদানগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। ইলিয়াস, মহাশ্বেতা বা দেবেশ কেউই মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছেপূরণ (wishful thinking)-এর কৌশল প্রয়োগ করেন না। ফলে রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কনির্মাণের পদ্ধতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকবদল হচ্ছে। প্রগতিবাদী পর্বে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের পর্বে নির্দিষ্ট গড়নগঠন বেছে নিয়েছিলেন ঔপন্যাসিকরা। নায়কনির্মাণের নির্দিষ্ট নীতিকৌশল ঔপন্যাসিকেরা বেছে নিয়েছিলেন। সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস সেই নীতিকৌশলকে বিবর্তিত করল। বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাতে যুক্ত হল। আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটোগনিস্ট হিসেবে চিরাচরিত নায়কোচিত

উপাদানগুলি ঝরে যাচ্ছে খিজির, তমিজ, দ্রোণাচার্য, হারবার্ট ও ফ্যাতাডুদের নির্মাণে। উপন্যাস অনেক বিরোধভাসের সম্ভাবনার প্রকাশ। এই বিরোধভাস প্রোটোগনিস্টদের মধ্যেও থাকে। ‘খোয়াবনামা’-র তমিজ আখ্যানের শুরু থেকেই শ্রেণিসচেতন, সংগ্রামকাজী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার চেতনার স্তর একরৈখিক গতিতে এগোয়নি। তেভাগা আন্দোলনরত বর্গাচাষীদের প্রথমে ‘উপদ্রব’ মনে করলেও, আখ্যানের গতিপথে তার চেতনার স্তর উন্মীত হয়েছে। পেশাবদল হয়েছে, শ্রেণিসচেতনতা এসেছে, কৃষিকেন্দ্রিক আকাজ্জার বদল হয়েছে এবং লড়াইবিমুখ থেকে লড়াকু কৃষকে পরিণত হয়েছে। ওসমানের অনেক মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতার সঙ্গে শাসকবিরোধী অতিসক্রিয় আচরণের বিরোধ তৈরি হয়। ওসমানের কামনা-বাসনা, স্মৃতিকামুকতা এবং প্রলাপবদ্ধ দুর্বলতা চিলেকোঠার এক নিধিরাম সর্দারের অসহায়তাকে প্রকট করে। লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত খিজির মহাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রে রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করতে পারে কিন্তু সেই খিজিরের বহু আচরণ পুরুষতান্ত্রিক, সে চুরি করে। খিজিরের সঙ্গে জুম্মনের মায়ের সম্পর্ক মধ্যবিত্তসুলভ ভালবাসা-ঝগড়ার ছক ভেঙে বেরিয়ে আসে। আদর্শ প্রগতিবাদী বা মার্ক্সবাদীর মতো লিঙ্গসাম্যের ধারণা কিংবা নাস্তিকতার আদর্শ ইলিয়াসের আখ্যানের কুশীলবদের মধ্যে নেই। তাদের শ্রেণিচেতনা এবং দ্রোহস্বর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবহের দ্বন্দ্বের ভাঙন-গড়নের মধ্যে দিয়ে অবয়ব পাচ্ছে। ভূমি-সংস্কার ও বামফ্রন্ট শাসনের বাস্তবতার ভেতর থেকে চ্যারকেটু-খেতখেতুর অসহায় কৃষকসত্তা বেরিয়ে পড়ে। গয়ানাথ জোতদারের উৎপাদন-মালিকানা এবং বাঘারুর ভূমিহীন দাসত্ব আধুনিক রাজনৈতিক আবহে বিরোধভাস তৈরি করে। উন্নয়নের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ, উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের বিরোধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের বিরোধ এবং ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে প্রান্তিকতমের বিরোধ ‘বৃত্তান্ত’গুলির শিরদাঁড়া। উপন্যাসের পুরনো মডেল দিয়ে এই দেশজ অন্বেষণকে ধরা যায় না বলেই উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকরা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নবায়নের কৌশল খুঁজেছেন। ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে একদিকে মৃত বাবুয়ানি অন্যদিকে শহরের আধুনিকমুখী

বদলের বিরোধভাস- মৃত বিনুর মতাদর্শের প্রতি হারবার্টের 'ট্রিবিউট' এবং যুক্তি-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে 'মৃতের সহিত কথোপকথন' সমানতালে চলে। ঔপন্যাসিক মতাদর্শ ও একবাচনিক আখ্যানকৌশল দিয়ে এইসব চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঔপন্যাসিক সংশয়ে ভোগেন জ্যাস্ত কুশীলব নির্মাণে। আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির আখ্যানস্থ প্রতিফলন সেই সংশয় প্রকট করে। মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের নিরন্তর রণক্ষেত্র হিসেবে উপন্যাসের বিবর্তন ঘটছে পুরনো উপন্যাসচেতনাকে বদলাতে বদলাতে। বসাই টুডু কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিগত বিচারের একমাত্রিক পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বর্ণগত শোষণের অনুশীলনকে প্রত্যাখ্যান জানাচ্ছেন। অমূল্য আব্রাহাম, কালী সাঁতরা অনেক সংশয় পেরোতে পেরোতে অবস্থান নিতে চাইছেন- তাতে রাজনৈতিক উপন্যাসের সজীবতা বাড়ছে। খিজিরের উত্তরণ ঘটে দিশাহীন শ্রেণিচেতনাহীন 'ব্যক্তি' থেকে শাসকবিরোধী সামূহিক দ্রোহের 'প্রতিনিধি' হিসেবে, এমনকি আদর্শের জন্যে সে প্রাণও দেয়। তবু, তার ভাষা-আচরণ-চেতনা সমাজতান্ত্রিক মডেলের থেকে অনেক বেশি নৈরাজ্যবাদপ্রবণ। ফ্যাটাডুরা শহরে নিম্নবর্ণের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়েও শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিভূ নন। তাঁদের ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি উপনিবেশিত মূল্যবোধকে (ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ) এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধকে প্রবল আক্রমণ করে। অথচ তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের খাপে কিংবা প্রগতিবাদের খোপেও আঁটে না। ভদ্রলোকের জন্যে নির্মিত এবং ভদ্রলোকদ্বারা পালিত নৈতিকতা-মূল্যবোধ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকে দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন রেখেছে। বামপন্থী ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট আখ্যানে এই নৈতিকতা-মূল্যবোধের উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অবিকল থেকেছে। শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে আখ্যানে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা। আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখা আখ্যান। কিন্তু, আখ্যানের প্রোটোগনিস্টরা মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোকসুলভ নৈতিকতা-মূল্যবোধ আঁকড়ে থেকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নবর্ণীয় কুশীলবদের দেখতে চেয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনীতিসচেতন, আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বসচেতন কাহিনিকারের

লেখা আখ্যানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধিপত্যকারী। ভাষাব্যবহারে, কুশীলবদের দ্বন্দ্বনির্মাণে এবং আখ্যানের বাচনিক পরিসরে এহেন প্রথাগত উপন্যাসনির্মাণের কৌশল অনুসৃত হয়েছে। ইলিয়াস, মহাশ্বেতা, নবারণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের নির্মিত নৈতিকতা-মূল্যবোধের গাণ্ডি অনেকাংশে প্রত্যাহ্বায়িত হয়েছে। ভাষায়, কুশীলবদের পারস্পরিক সম্পর্কনির্মাণে এবং সার্বিক বাচনিক পরিসরে উচ্চবর্ণের নৈতিকতা-মূল্যবোধের উপাদানগুলি প্রস্ফুট হয়েছে।

উপন্যাসগুলিতে আধুনিক রাজনীতির দ্বন্দ্বগুলি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসে, সেটাই বিচার্য। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রোটোগনিস্টরা কমিউনিস্ট মতাদর্শের নিষ্ঠা অনুশীলন করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক সমসাময়িকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। মণিমোহন ভোগবাদের সর্বগ্রাসী আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রভাবে আতঙ্কিত হয়েও নিজের বাড়িতে তা ঠেকাতে পারে না। মণিমোহনের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার পার্টির অনুশীলনের ফারাক প্রতীয়মান হয় আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে কথপকথনে উদ্ভূত দ্বন্দ্বে। ‘শোকমিছিল’-এ পার্টি, পরিবার, রাজনীতি এবং ব্যক্তি সবকিছুই দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক সময়ের স্পর্শে ভাঙনমুখী। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-র রণজয় মতাদর্শ এবং মার্ক্সীয় পাঠরুচি দিয়ে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অসম প্রতিরোধের স্তর নির্মাণ ক’রে নেয় বিশ্বায়িত নব্বই দশকের মাঝামাঝি। ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর আনোয়ারের তত্ত্ববিশ্ব গ্রামীণ রাজনৈতিক অনুশীলনের পরিসরে তাল মেলাতে পারে না। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ এবং ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে উন্নয়নের সঙ্গে নিপীড়িত শোষিত জনগণের দ্বন্দ্বের রূপ স্পষ্ট হচ্ছে। আধুনিক রাজনীতির এই সার্বিক দ্বন্দ্বিক পরিসর আখ্যানে ধরা থাকছে। ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপস্থিতি আশির দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের দ্রোহচেষ্টার ভাষ্য তুলে ধরে- বিশ্বনাথের দ্বন্দ্ব প্রকট হয় বিযুক্তি ও সংযুক্তির মধ্যে দিয়ে। ‘বৃত্তান্ত’গুলির অন্যতম উপজীব্য পরিবেশবাদী-রাজনীতির প্রতর্ক। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-তে তিস্তাকে কেন্দ্র ক’রে রাজনীতি আবর্তিত হয়, একইসঙ্গে বাঘারু তার শরীর, অনুভূতিমালা এবং

ইন্দ্রিয়সচেতনতা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী হয়ে যায়। ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’-র কথকের বর্ণনায় একটি মিছিল, খেতখেতুর হাঁটা এবং একটি নিরন্ন পরিবারের খাদ্যসন্ধান প্রাকৃতিক থেকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের শব্দে-ভাষায় যাতায়াত করতে থাকে। পরিবেশবাদী সমালোচনা আখ্যানের মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানের পাশাপাশি মানুষ ও না-মানুষের সম্পর্কের আদানপ্রদানও খোঁজে। বৃত্তান্তগুলিতে এই খোঁজ পাওয়া যায়।

‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসের না-একরৈখিক সময়রেখায় স্মৃতিপথ ধরে আখ্যানের যাতায়াত চলে। পশ্চাদ-উদ্ভাস এবং স্মৃতিকথনের কৌশল ব্যবহৃত হয় আখ্যানে। রণজয়ের বিপর্যস্ত মানসিক পরিস্থিতিতে দৃষ্টিভ্রম এবং স্মৃতি-উদ্ভাস যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু, অধিকাংশ উপন্যাসে যেমন অভিমুখহীন স্মৃতিকামুকতা আধিপত্যকারী হয়, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে তেমন না। ষাট-সত্তর দশকের রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে লেখা বহু রাজনৈতিক উপন্যাসে অভিমুখহীন স্মৃতিজর্জর কাহিনি ব্যক্ত হয়। ছাঁদবদ্ধ কাহিনিপটে প্রটাগনিস্টের স্মৃতিরোমন্থন এবং ব্যক্তিগত অরাজনৈতিক বা নিরাজনৈতিক টানাপড়েন মুখ্য হয়ে ওঠে। নবাবুগের আখ্যানের প্রোটাগনিস্টরা তার বিপ্রতীপ রাজনৈতিক অভিমুখ নির্দেশ করতে চায়। রণজয়ের মানসিক বৈকল্য এবং স্মৃতিরোমন্থন প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। নব্বই দশকের উদারীকৃত-বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রতিরোধের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধ উপাদানগুলি জেগে থাকে। পাঠপ্রবণতা, সশস্ত্র প্রস্তুতি, যুদ্ধের নীতি-কৌশল এবং আত্মসমালোচনা রণজয়কে নিরাজনৈতিক সময়ের রাজনীতিদর্শী ক’রে তোলে।

রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ‘হিংসা (violence)’ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। ষাট-সত্তর দশকের আগে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক হিংসার প্রাবল্য কম। হিংসাবর্ণনার ভাষা, হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে কুশীলবদের সংযুক্তি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক হিংসায় শাসক ও দ্রোহীদের ভূমিকা- এগুলি রাজনৈতিক উপন্যাসের রাজনীতিকে প্রভাবিত

করছে। নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে দ্রোহীদের অকারণ হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, মূর্তি-ভাঙ্গা, ব্যক্তিহত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। সন্দর্ভে আলোচিত ঔপন্যাসিকদের আখ্যানে হিংসা ও সন্ত্রাসের একপেশে সংজ্ঞায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী ভূমিকা আখ্যানবদ্ধ হয়েছে। ব্রতীদের খুনের বর্ণনায়, রণজয়ের ওপরে হওয়া নির্যাতনের বর্ণনায়, দোপদী মেঝেনের ওপরে হওয়া নির্যাতনের বর্ণনায়, নিরুপম-পাঞ্চগলী-দ্রোণদের ওপরে হওয়া অত্যাচারের বর্ণনাগুলি রাষ্ট্রের বয়ানগুলির বিরুদ্ধ-বয়ান হাজির করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির চাপিয়ে দেওয়া পুরুষতান্ত্রিক বাচন এবং শোষণকে-ন্যায্যতা-দেওয়া বাচন যেভাবে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল থাকে, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী উপন্যাস যেভাবে দ্রোহসময়কে চিনতে শেখায়, সন্দর্ভে আলোচিত একাধিক উপন্যাস তার বিরুদ্ধ-বাচনের উপাদানগুলি উপস্থিত করে। এক্ষেত্রে কথকের দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবানুগ বিবরণ, আখ্যানের ভাষা ইত্যাদির পাশাপাশি তথ্যাশ্রয়ী আখ্যানের নীতিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্যে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস-গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি- (ক) বাস্তবের রক্তমাংসের কোনও মানুষের নাম ও কর্মকাণ্ড সরাসরি তথ্যসহ আখ্যানে উপস্থাপন। (খ) সাল-তারিখের উল্লেখ, যে সাল-তারিখ বাস্তবের পাতা থেকে তুলে আনা; অর্থাৎ পাঠক আখ্যানে উল্লিখিত ঘটনার সাল-তারিখ নিয়ে খোঁজ করলে, তা সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, সর্বজনবিদিত ঘটনা বা সর্বজনমান্য ব্যক্তির জীবনের সাল-তারিখের হিসেব নয়। বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা, ‘তুচ্ছাতিতুচ্ছ’ ব্যক্তি বা নিপীড়িত কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও কাহিনি সাল-তারিখ-প্রামাণ্য তথ্য সমেত আখ্যানে অন্তর্ভুক্ত। (গ) সংবাদপত্রের কোনও খবর বা প্রতিবেদন বা প্রকাশিত প্রবন্ধ সরাসরি আখ্যানে উল্লেখ করা। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ বাস্তবতার ভিত্তিতে, এটা ধরে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। (ঘ) বাস্তবে লেখা কোনও চিঠি, সরকারি বিবৃতি, প্রামাণ্য দলিল, ব্যক্তিগত দিনলিপি অথবা সাক্ষাৎকার সরাসরি আখ্যানে উপস্থাপনা কিংবা কুশীলবদের বাচনে তার ন্যায্যতাপ্রাপ্তি। মহাশ্বেতা দেবীর ‘অগ্নিগর্ভ’-র মধ্যেও তথ্য দিয়ে

আখ্যানের কাল্পনিকতাকে নাকচ করা অথবা কথকের স্বরকে ন্যায্যতা (justify) দেওয়ার চেষ্টা প্রতীয়মান। দেবেশ রায়ের ‘সময় অসময়ের বৃত্তান্ত’-তে আদালতের ফাইল ও পুলিশি নথির সরাসরি উল্লেখ এবং সাল-তারিখের বাস্তবানুসারী উল্লেখ রয়েছে। ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে অধিকাররক্ষা সমিতির নথি ও বই থেকে ঘটনার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। ‘আটটা নটার সূর্য’ উপন্যাসে রাজনৈতিক নথি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের চিঠি এবং প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। তথ্যাশ্রয়ী আখ্যানে প্রচলিত পন্থার বাস্তব ও সত্যের ধারণার উপস্থাপনা থেকে সরে এসে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাস্তবতা, ব্যক্তিগত সত্যোপলব্ধি, ব্যক্তির সত্য ইত্যাদি তুলে ধরছে। তথ্য যখন কাল্পনিকতার থেকেও আরও বেশি কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, তখন কাল্পনিকতা ও তথ্যধর্মীতার নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে আখ্যানে। উত্তর-সত্য যুগে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- রাজনৈতিক উপন্যাস শাসকশ্রেণির মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান ক’রে বিশেষ কোনও ঘটনাকে আখ্যানস্থ করতে চাইলে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসকৌশল প্রয়োজনীয় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

‘হারবার্ট’ উপন্যাসের শেষে পোঁছে ‘কোথায় কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে...’ বাক্যটিকে আরোপিত মনে হয়। কারণ, উপন্যাসটির আখ্যানভাগ যে অজস্র পাঠসম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিল, তা সঙ্কুচিত হয়ে আসে। নির্দিষ্ট অভিমুখে ইঙ্গিত করতে থাকে। ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটি আখ্যানান্তে পোঁছে এমন সঙ্কোচনের পথে হাঁটে না বরং প্রসারিত ক’রে দেয় পাঠসম্ভাবনার দিগন্ত। ওসমান কোন দিকে যাবে তা বলে দেওয়ার ক্ষমতা লেখকের নেই। লেখক ওসমান নামক কুশীলবের চরিত্রনির্মাণের যাবতীয় প্রস্তুতিপর্বের শেষে চরিত্রটিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু সম্ভাবনাময় আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছেড়ে দিচ্ছেন। আখ্যানের মুক্ত সমাপ্তি মূল বিবেচ্য হয়ে উঠছে। দেবেশ রায়ের ‘বৃত্তান্ত’গুলিতেও এমন মুক্ত সমাপ্তি রয়েছে। আখ্যানের শেষে বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলু প্রত্যেকে পথে থাকছে। এদের প্রত্যেকের নতুনতর যাত্রার তথা বিরামহীন চলার ইঙ্গিতে আখ্যান শেষ হচ্ছে।

‘চিলেকোঠার সেপাই’ ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের দলিল। কিন্তু তা একমুখী স্বদেশবোধের কথা বলে নি, অন্তর্সংঘাতহীন কোনও দলের কথা বলে নি এবং সমাজের বহুস্তরীয় সংকটকে আখ্যানবদ্ধ করেছে। খিজিরের জাতীয়তাবাদ আর আনোয়ারের জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। ওসমান যেভাবে সামাজিক শত্রুকে চিহ্নিত করতে চায় তার সঙ্গে খিজিরের আর্থ-রাজনৈতিক শত্রুকে চিহ্নিত করার মূলগত পার্থক্য রয়েছে। চেংটুর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে আনোয়ারের আধুনিক-সাংস্কৃতিক চেতনার অনপনয়ে ব্যবধান তাদের তত্ত্ব-অনুশীলনে ফারাক গড়ে দেয়। অথচ এই সবক’টি বিষয়ই ঘটছে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন জাতীয়তাবাদী দ্রোহের স্ফূরণ হতে চলেছে। এমন ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিবোধ ছাড়া কি স্বদেশময় ব্যক্তিজিজ্ঞাসা সম্ভব? ইতিহাসজারিত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণ সম্ভব? উপন্যাসপটের মহৎ সময়কে পাঠকের চেতনায় প্রোথিত করা সম্ভব? ‘চিলেকোঠার সেপাই’-এর পাঠক উপন্যাসপাঠের পরে একমুখীন স্বদেশবোধে বা একদিশাদর্শী জাতীয়তাবাদে আবিষ্ট থাকতে পারেন না। সন্দর্ভের অন্যতম প্রধান আলোচ্য রাজনৈতিক উপন্যাসে মিথ ও মুখফেরতা কাহিনির তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ। মুখফেরতা কাহিনি ও মিথের বিস্তার আধুনিক উপন্যাসরীতির বিপরীতে দেশজ অভিজ্ঞান হয়ে থাকে। উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসচেতনা ও ধর্মবোধের পাল্টাপ্রস্তাব উঠে আসে এর মধ্যে দিয়ে। ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘খোয়াবনামা’, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে এমন প্রস্তাব প্রতিরোধের ভাষ্য নির্মাণ করেছে। এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস ও মুখফেরতা আখ্যানের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মিথের ব্যবহার এখানে কোনও বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়, বরং তা ইতিহাসের খোলা মুখের দিকে ইঙ্গিত করে। অতীতের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় ঐতিহাসিক অতীতের কিছু কিছু ভাবকল্প পুনর্নির্মিত হয়ে বাচনেরও নবায়ন ঘটিয়ে দেয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শাসকশ্রেণির ধর্মবিশ্বাস এবং অধীনস্থ শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস এক হলেও, তাদের চরিত্র ও আকার আলাদা, এমনকি তা বিরোধী রূপেরও হতে পারে। ‘অরণ্যের অধিকার’-এ বিরসা মুণ্ডার ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করেন

যে মুগ্ধরা, তাঁরা একাধারে ব্রিটিশ এবং দিকুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েন। ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে বাজিকরদের লোকাযত ধর্ম আধিপত্যকারী ধর্মগুলির থেকে আলাদা- মূলধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মূলধারার কাছে অসহায় সমর্পণ দুইই ত্রিাশীল থাকে। বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাধা পেরিয়ে শারিবার ‘হামরা বাজিকর’ উচ্চারণ রাজনৈতিক উচ্চারণ হয়ে ওঠে। ‘খোয়াবনামা’-র হিন্দু নায়েবের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় হিন্দু বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কেষ্ঠ পালদের দ্বন্দ্ব ইতিহাসনির্মাণ ও মিথনির্মাণের পথ ধরে আসে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মুখফেরতা কাহিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয়চেতনার সঙ্গে জটিল দ্বন্দ্ব ও কুশীলবদের সংশয়ে আখ্যানের শিরদাঁড়া হয়ে থাকে। অসংখ্য বিরোধভাস এবং জটিল দ্বন্দ্বের নির্মাণ করতে করতে রাজনৈতিক উপন্যাস এগোতে থাকে। নিরাজনৈতিক সাহিত্যের বাড়বাড়ন্তের যুগে এবং উত্তর-সত্য পর্বে শাসক-মতাদর্শের আধিপত্যের যুগে সন্দর্ভে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ নতুন অভিমুখের সন্ধান দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *খোয়াবনামা*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *চিলেকোঠার সেপাই*, প্রতিভাস, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *উপন্যাস সমগ্র*, একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *গল্প সমগ্র*, সম্পা. অনিশ্চয় চক্রবর্তী, একুশ শতক, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫

ভট্টাচার্য, নবারুণ, *উপন্যাস সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

ভট্টাচার্য, নবারুণ, *হারবার্ট*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

রায়, দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ২০১৩

রায়, দেবেশ, *মফস্বলি বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯

রায়, দেবেশ, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

সহায়ক গ্রন্থ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরি, সম্পা. শাহদুজ্জামান, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

আজাদ, হুমায়ুন, *ভাষা আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, *ভাষা-আন্দোলন পটভূমি গ্রন্থমালা ৫*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

আজাদ হুমায়ুন, *ভাষা-আন্দোলনঃ সাহিত্যিক পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলার সাহিত্য*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২

আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬

আফজল, মোহাম্মদ খান, *মহাস্থান গড়ের ইতিহাস*, প্রকাশক- মকবুলার রহমান খন্দকার, বগুড়া, ১৯৭৯

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩

আহমদ, আবুল মনসুর, *বাংলাদেশের কালচার*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৮

অ্যারিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, অনুবাদ- শিশিরকুমার দাশ, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫৭

ইকবাল শহীদ, *বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৭-২০১৫)*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১৮

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭

উমর বদরুদ্দীন, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯

উমর বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তিন খণ্ড)*, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা

ওসমান, শওকত, *১৯৭১ স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা

ওসমান শওকত, *স্মৃতিকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

কার্পেণ্ডিয়ার আলোহো, রচনাসংগ্রহ, অনুবাদক- মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

কামালী, সাদ, চলতি রীতি ঘরোয়া মেজাজ, ধ্রুবপদ, ঢাকা, ২০১০

কুমার কাঞ্চন, নকশালবাড়ি ও সাহিত্য, সারা ভারত বিপ্লবী সাংস্কৃতিক লিগ, হালিশহর, ২০০৬

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, স্রোতের সঙ্গে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ সাল

গোস্বামী, অচ্যুত, বাংলা উপন্যাসের ধারা, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬১

ঘটক, ঋত্বিককুমার, নিজের পায়ে নিজের পথে, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, কলকাতা, নভেম্বর ২০১০

ঘোষ, তপোব্রত, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮

ঘোষ, নির্মল, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৬

ঘোষ, ফটিক চাঁদ, নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

ঘোষ, বিনয়, জনসভার সাহিত্য, বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২ সাল

ঘোষ, বিনয়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), বুকক্লাব, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০০

ঘোষ বিনয়, মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট, কলকাতা, ১৯৭৭

ঘোষ, মন্মথনাথ, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, মুদ্রক ও প্রকাশক প্রিয়নাথ দাস, কলকাতা, ১৯১৪

ঘোষ, মৃণালকান্তি, *পরলোকের কথা*, ১৯৩৩, ইন্টারনেট আর্কাইভ, পিডিএফ

ঘোষ, সুনীতি কুমার, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি*, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ২০০১

চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার*, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৬৭

চক্রবর্তী, বারিদবরণ, *বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

চক্রবর্তী, মৃগাক্ষশেখর, *বাংলার দেবতা, অপদেবতা ও লোকদেবতা*, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১

চক্রবর্তী, সিতাংশুশেখর, *সত্তরের চলচিত্র*, আশাবরী পাবলিকেশন, হাওড়া

চক্রবর্তী, সুধীর, *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯০

চক্রবর্তী, সুমিতা, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮

চট্টোপাধ্যায়, কুণাল, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রথেসিভ, কলকাতা, ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ*, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, সম্পা. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৪৫ সাল

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, *পথের দাবী*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, নবম সংস্করণ, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৩৬৫

চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, *উপন্যাস সমগ্র ১*, আজকাল, কলকাতা, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, *বিপ্লব ও রাজমোহন*, মিনিবুক, কলকাতা, ১৯৬৯

- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৫২ সাল
- চট্টোপাধ্যায় হীরেন, *বাংলা উপন্যাসের রূপরীতি*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৮ সাল
- চৌধুরী, অমিতাভ, *রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৩
- চৌধুরী নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১
- চৌধুরী, রমা, *বেদান্ত ও সুফী দর্শন*, প্রাচ্য বাণীমন্দির, কলকাতা, ১৯৪৪
- চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মধ্যবিত্ত*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭
- জহির শহীদুল, *শহীদুল জহির সমগ্র*, সম্পা. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০১৩
- জোয়ারদার, জয়ন্ত, *এভাবেই এগোয়*, বুক মার্ক, কলকাতা, ১৯৭৮
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *আপন কথা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ই-বুক সংস্করণ, কলকাতা, ২০২০
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ সাল
- দাশগুপ্ত, অশীন, *প্রবন্ধ সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
- নাথ, প্রিয়কান্ত, *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৭
- দাশ, শিশির কুমার, *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৬
- দাশগুপ্ত, অশীন, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, প্রবন্ধ সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
- দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব*, ইন্দাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০
- দাস, অরূপকুমার, *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাঙালী কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

দেবী, মহাশ্বেতা, *অগ্নিগর্ভ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৭ সাল

দেবী মহাশ্বেতা, *অরণ্যের অধিকার*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ সাল (২০১১)

দেবী, মহাশ্বেতা, *আজকের লেখাঃ কি ও কেন*, প্রস্তুতিপর্ব, ১৯৮৬

দেবী, মহাশ্বেতা, *হাজার চুরাশির মা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, PDF

নাথ, প্রিয়কান্ত, *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৭

পাণ্ডে, শুভলক্ষ্মী, *ঘাট-সত্তরে নদীয়াঃ নকশালবাড়ির নির্মাণ*, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০০০

পাল, রবিন, *উপন্যাসের বর্ণময় ভুবন*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২য় খণ্ড*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬২ সাল

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *রচনাসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *রচনাসমগ্র*, অষ্টম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব, *১৯৭০- কমুনিস ও জার্নাল ৭০*, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, *শরদিন্দু অমনিবাস*, দ্বাদশ খণ্ড, সম্পা. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৩ সাল

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাসঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, প্রথম প্রকাশ ২৪শে মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৬৭ সাল

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বাংলা উপন্যাস*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, *দাঙ্গার ইতিহাস*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগঃ স্মৃতি আর সত্তা*, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, ১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসঃ দ্বন্দ্বিক দর্পণ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, মে ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৩

বসু, প্রদীপ, *নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণঃ কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা*, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

বসু, বাদল, *'পিওন থেকে প্রকাশক'*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, PDF

বসু, সমরেশ, *মহাকালের রথের ঘোড়া*, সপ্তম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮

বাগচী, দিলীপ, *নকশালবাড়ীর প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র*, PDF

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০

বিশ্বাস, মহীতোষ, পায়ে পায়ে পথ, প্রকাশক- রেখা বিশ্বাস, পরিবেশক- দে বুক স্টোর,
কলকাতা, ১৯৬১

বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, প্রথম খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, কলকাতা,
২০০৬

বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, তুলি-কলম, কলকাতা,
২০০৩

ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য, কখনতত্ত্ব ও বাংলা উপন্যাস, ভাষাবন্ধন, কলকাতা, ২০১১

ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য, কথা গঠন, সৃজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

ভট্টাচার্য, অরূপকুমার, আঞ্চলিকতাঃ বাংলা উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭

ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০২

ভট্টাচার্য, জ্যোতি, জীবন, ধর্ম ও রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০

ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের সাতকাহন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩

ভট্টাচার্য তপোধীর, আধুনিকতাঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৫

ভট্টাচার্য, তপোধীর, বাখতিনঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬

ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯

ভট্টাচার্য, নবারণ, অন্ধবেড়াল ও অন্যান্য গল্প, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯

ভট্টাচার্য, নবাবু, *আনাড়ির নাড়িঙ্গান*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

ভট্টাচার্য, নবাবু, *কথাবার্তা*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫

ভট্টাচার্য, নবাবু, *ফাতাডুর কুস্তীপাক*, ভাষাবন্ধন, কলকাতা, PDF

ভট্টাচার্য, নবাবু, *ফাতাডুর বোম্বাচাক*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪

ভট্টাচার্য, নবাবু, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ, কলকাতা, ২০১০

ভট্টাচার্য, মণিভূষণ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭

ভট্টাচার্য, মালিনী, *নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬

ভদ্র, গৌতম, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?*, ছাতিম বুকস, কলকাতা, জুন ২০১১

ভাদুড়ী, সতীনাথ, *ঢোঁড়াই চরিত মানস*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১

ভাদুড়ী, সতীনাথ, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৭৩

ভাদুড়ী, সতীনাথ, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৭৩

ভাদুড়ী সতীনাথ, *সতীনাথ ভাদুড়ির নির্বাচিত রচনা*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ, *মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৮৭

মজুমদার, সমরেশ, *কালবেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তদশ মুদ্রণ, ২০০৪

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৮

মিত্র, প্যারীচাঁদ, *প্যারীচাঁদ মিত্র রচনাবলী*, সম্পাদনা অলোক রায়, সোপান, কলকাতা, ২০১৮

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের প্রতিমা*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৭
সাল

মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, *আটটা নটার সূর্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩

মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, *অশ্বনামাঃ সংস্কৃতির ঘোড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, *কঙ্কাবতী*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৪ সাল

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসমগ্র ২য় খণ্ড*, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পা.,
গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৯৭৪

মুখোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ প্রণীত, *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসংগ্রহ*, আনিসুজ্জামান সম্পা., সাহিত্যপ্রকাশ,
ঢাকা, ২০০১

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত, *বিভাজনের পটভূমি*, *বিভাজনের পশ্চাৎপটঃ বঙ্গভঙ্গ*, রিডার্স লাইব্রেরি,
কলকাতা, ২০১৩

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, *বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ*, শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, চুঁচুড়া,
১৩২৭ সাল

মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত, হুগলি,
১৩০২ সাল

মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *ছায়াময়*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮

মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *নবীগঞ্জের দৈত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, PDF

মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, *মোহন রায়ের বাঁশি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, PDF

মুখোপাধ্যায় শীর্ষেন্দু, *শ্যাওলা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪

মুখোপাধ্যায় হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬১

মুসা মনসুর, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৮১ সাল

ম্যুন্সেন, হানা ক্যাথেরিন, *‘ফুলমাণি ও করুণার বিবরণ’*, প্রথম প্রকাশ ব্রিটিশ মিশনারি কর্তৃক, ১৮৫২, PDF

মোস্তাফা, গোলাম, *প্রবন্ধ সংকলন*, সম্পা. মহফুজা খাতুন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৩৭৫

রক্ষিত, সৈকত, *মাড়াই কল*, বাগর্থ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪

রায়, গৌতম, *আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বাঙালি মুসলমান*, লালন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১

রায়, দেবেশ, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩

রায়, দেবেশ, *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

রায়, দেবেশ, *উপন্যাসের বিবিধ সংকট*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৮

রায়, দেবেশ, *গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০

রায়, দেবেশ, *প্রতিবেদন*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭

রায়, দেবেশ, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

রায়, রজতকান্ত, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৬০

রায়, সাবিত্রী, *পাকা ধানের গান*, মিত্রালয়, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৪৬

রায়, সাবিত্রী, *স্বরলিপি*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫২

রায়চৌধুরী, ভারতজ্যোতি, *সাতচল্লিশ থেকে সত্তরঃ এবং আগে পরে*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৮

লাহিড়ী, রণবীর, *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান*, চর্চাপদ, কলকাতা, ২০১১

শ রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, চতুর্থ সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪১৯ সাল

শহিদুল্লাহ, রুদ্দ মহম্মদ, *রচনাসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পা. অসীম সাহা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

শাহাদুজ্জামান, *একজন কমলানৈবু*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭

শ্রীপাত্ত, *কলকাতা*, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, আনন্দ পাবলিশার্স সংস্করণ ১৯৯৯, কলকাতা, ই-বুক ২০২০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মধ্যবিভ*, সংহতি, ১৪১৭, ৩৪৩

সিংহ, উদয়নারায়ণ, *সাহিত্যের ভাষা ও ভাষার সাহিত্য*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১০

সেন, অভিজিৎ, *রহ চণ্ডালের হাড়*, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০

সেন, অরুণ, *দুই বাঙালি এক বাঙালি*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৬

সেন, অশোক, *ইতিহাসের ঠিকঠিকানা*, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫

সেন, মণিকুন্তলা, *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৯ সাল

সেন, রুশতী, *সমকালের গল্প উপন্যাসে প্রত্যাখ্যানের ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

সেন, সমর, *বাবুবৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

সেনগুপ্ত, মিহির, *বিষাদবৃক্ষ*, সুবর্ণরেখা, ২০০৩

সেনমজুমদার, জহর, *নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭

হক, এনামুল, *বঙ্গে সূফী-প্রভাব*, র'য়ামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫

হালদার, গোপাল, *সতীনাথ ভাদুড়িঃ সাহিত্য ও সাধনা*, কলকাতা অয়ন, কলকাতা, ১৯৭৮

হিকমত, নাজিম, *কবিতা*, অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঙ্গল পাবলিশিং কোং, কলকাতা, ১৯৫২

হোসেন, সেখ মোফাজ্জাল, *নবাবগের আখ্যান বিশ্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০১১,

হোসেন, সেলিনা, *কাঁটাতারে প্রজাপতি*, একটি ইত্যাদি, ঢাকা, ১৯৮৯

Ali Mehr, *The Women of the PWA: The Politics and Writings of Rashid Jahan and Qurratulain Hyder*, College of William and Mary, 2018

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London & New York, 2006

Angel Jose, Garcia Landa, *Narrative Theory*, University of Zaragoza, online edition 2005

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures*. 2nd ed. London: Routledge, 2002

Aristotle, *Politics*, Trans. By Benjamin Jowett, Batoche Books, Kitchener, 1999

Bakhtin, M. M, *Problems of Dostoevsky's Poetics*, Ed. and translated by Caryl Emerson, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984

Bakhtin, Mikhail. M, *Rabelais and His World*, Trans. By Helene Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington, 1984

Bakhtin, M. M, *The Dialogic Imagination: Four Essays* by M. M. Bakhtin Ed. by Michael Holquist Trans. By Caryl Emerson and Michael Holquist, University of Texas Press, Austin, 1981

Banerjee Sumanta, *In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement in India*, Subarnarekha, Calcutta, 1980

Barthes, Roland, *S/Z*, Translated by Richard Miller, Blackwell Publishing, UK, Original 1972, Latest 2002

Baudrillard, Jean, *Simulacra and simulation*, Trans. by S. F. Glaser, Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1994, (Original work published 1981)

Baudrillard, Jean, *The Consumer Society: Myths and Structures*, Sage Publications, New Delhi, 1999

Bhaba Homi K, 'Dissemination: Time, Narrative and the margins of the modern nation' in *The location of culture*, Routledge, London & New York, 1994

Bhalla Surjit S, *Second Among Equals: The Middle Class Kingdoms of India and China*, Oxus Research & Investments, New Delhi, 2007, PDF

Bhattacharya, Tithi, *The Sentinels of Culture Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85)*, Oxford University Press, Oxford, 2005

Blotner, Joseph, *The political novel*, Doubleday, United States, 1955, Reprint E-book, Project Gutenberg, 2022

Booth, Wayne C, *The Rhetoric of Fiction*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1983

Carey, W. W, *Dialogues intended to facilitate the acquiring of Bengalee Language*, 3rd Edition, The Mission Press, Calcutta, 1818

Catron, Louis, *The Director's Vision: Play Direction from Analysis to Production*, Waveland Press Inc., 1989

Chanda, Ipshita, *The Journey of the Namah: A Case Study*, CAS, Comparative Literature, Jadavpur University, March 2011

Chandra, Asit Nath, *The Sannyasi Rebellion*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1977

Chatman, Seymour Benjamin, *Reading Narrative Fiction*, Macmillan, New York, 1993

Chatman, Seymour, *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Films*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1980

Chatterji, Joya, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge University Press, New York, 2000

Chatterji, Suniti Kumar, *The Origin and Development of Bengali Language*, part 1, Calcutta University Press, 1926

Coppola, Carlo, *Urdu Poetry 1935-1970: The Progressive Episode* Oxford University Press, Karachi, 2017

Cuddon, J. A, *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, Penguin Books, 1999

Damodaran, Sumangala. *The Radical Impulse: Music in the Tradition of the Indian People's Theatre Association*. Tulika Books, 2017

Das, Sisir Kumar, *A History of Indian Literature 1800-1910 Western Impact: Indian Response*, Sahitya Akademi, 2012

Dasgupta, Shashibhusan, *Obscure Religious Cults*, Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1969

Dasgupta, Subhoranjan, *People, Politics and Protests III Marxian Literary Debates and Discourses*, Mahanirban Calcutta Research Group, Kolkata, 2016

Dasgupta, Subhoranjan, *Elegy and Dreams: Akhtaruzzaman Elias' creative commitment*, University Press Limited, Dhaka, 2018

Derrida Jacques, *The Politics of Friendship*, Trans. By George Collins, Verso, London-New York, 2005

Devy, Ganesh N, *A Nomad called thief: reflections of Adivasi silence*, Orient Longman, Delhi, 2006

Eagleton, Terry, *Ideology: An Introduction*, Verso, London-New York, 1991.
PDF

Eagleton, Terry, *Marxism and Literary Criticism*, Routledge Classics, 2002

Eaton, Richard, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760*, University of California, 1993

Engels, Friedrich, *Origin of the Family, Private Property, and the State*, Trans. By Alick West, 1942, Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2000, PDF

Fanon, Frantz, *The Wretched of the Earth*, Trans. By Constance Farrington, Grove Press, New York, 1963

Fanon, Frantz, *The Wretched of the Earth*, Penguin, London, 1990, PDF

Faulkner, William, *Requiem for a Nun*, First Publication 1951, Vintage, 2019, E-Book

Flis, Leonora, *Factual Fictions: Narrative Truth and Contemporary American Documentary Novel*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010

Foley, Barbara, *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1986

Foucault, Michel [1975] (1979): *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books

Ghandy, Kobad, *Questions of freedom and people's emancipation*, Ekti Aprachalito Udyog, Kolkata, 2015

Gopal, Priyamvati, *Marxism, Modernity and Postcolonial Studies*, Cambridge University Press, 2002

Gordon, Avery F., *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination*, University of Minnesota Press, 2nd edition, Minneapolis, 2008

Gorky, Radek, *Bukharin, Zhdanov and others "Soviet Writers' Congress 1934,"* page 25-69, Lawrence & Wishart, 1977. First published in 1935

Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, International Publishers, 11th printing 1992

Gray, Martin, *A Dictionary of Literary Terms*, York Press, Beirut, 1985

Grierson, G. A, *Linguistic Survey of India, Vol. 5, Part 1*, Office of the Superintendent, Government Printing, India, 1903

Guha Ranajit, *On Some Aspects of Historiography of Colonial India, Subaltern Studies 1, Writings on South Asian History and Society*, Oxford University Press, Delhi, 1982

Hansda, Sowvendra Shekhar, *The Adivasi Will Not Dance*, Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd., New Delhi, 2015

Herman, David, *Basic Elements of Narrative*, Chichester, Wiley-Blackwell, UK, 2009

Howe, Irving, *Politics and the Novel*, Horizon Press, New York, 1957

Hunter, W. W, *A statistical account of Bengal Vol. II*, Turner & Co., London, 1875

Hunter, W. W, *The Annals of Rural Bengal, Vol. 1*, Smith Elder & Co., London, 1872

Jameson, Fredric, *The Political Unconscious: Narrative as a socially symbolic act*, Routledge, London and New York, 1983

Kaushik, Asha, *Politics, Aesthetics and Culture*, Manohar Publishers, New Delhi, 1988

Kothari, Rajni, *Politics in India*, Orient Longman, New Delhi, 1970

Kristeva, Julia, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Ed. Leon S. Roudiez. Trans. Thomas Gora et al. New York: Columbia University Press, 1980

Kristeva, Julia, *Word, Dialogue, and Novel. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art* . Ed. Leon S. Roudiez. Trans. Thomas Gora et al. New York: Columbia University Press, 1980

Kundera, Milan, *The Book of Laughter and Forgetting*, Translated by Michael Henry Hein, Penguin Books, 1981, PDF

Langbein, John H, *Torture and the Law of Proof*, University of Chicago Press, Chicago, 1977

Lee Lemon, *A Glossary for the study of English*, Third Impression, Oxford University Press, Delhi, 1988

Lenin, V.I, *The State and Revolution: The Marxist Theory of the State & the Tasks of the Proletariat in the Revolution*, Originally published 1918, Transcription by Zodiac and Brian Baggins, Lenin Internet Archive (marxists.org) 1999, PDF

Lévi-Strauss, Claude, *Myth and Meaning*, Routledge Classics, London, 2001

Lukacs, Georg, *The Theory of The Novel*, Trans. From German by Anna Bostock, The Merlin press, London, 1971

Macherey, Pierre, *A Theory of Literary Production*, Routledge, London, 2006

Majumdar, Nivedita, *The World in a Grain of Sand: Postcolonial Literature and Radical Universalism*, Verso, London New York, 2021

Majumdar Swapan. *Comparative Literature Indian Dimensions*, Calcutta: Papyrus, 1987

Manto, Saadat Hasan, *Lazzat-e Sang*, Naya Idara, Lahore, 1956

Marquez, Gabriel Garcia, *One Hundred Years of Solitude*, Translated by Gregory Rabassa, Avon Books, New York, 1971, PDF

McCoy, Alfred, *A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror*, University of Wisconsin- Madison News, New York, 2006

McHale B, *Postmodernist Fiction*, Methuen, Cambridge, 1987

Milne, Gordon, *The American Political Novel*, University of Oklahoma Press, Norman, 1966

Morris Pam. *The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev, Voloshinov*, Bloomsbury, 1997

Morton, Stephen, *Gayatri Chakraborty Spivak*, Routledge, London, 2003

Narayan, Badri, *Documenting Dissent: Contesting Fables, Contested Memories and Dalit Political Discourse*, Indian Institute of Advanced Study, 2001

Orwell, George, *George Orwell Essays*, Ed. By M. G. Nayar, Macmillan India Ltd., Delhi, 1980

Pichova, Hana, *The Art of Memory in Exile*, Southern Illinois University Press, 2002

Ranciere, Jacques, *'The Politics of Literature'. In The Politics of Literature*, tr. Julie Rose, Polity, Cambridge, 2011

Rees Daniel, *Hunger and Modern Writing*, Modern Academic Publishing, Universität zu Köln, Köln, 2016

Ribas-Casasayas, Alberto and Amanda L. Petersen, *Theories of the Ghost in a Transhispanic Context*, Santa Clara University, 2015

Sarkar Sumit, *Popular Movements and Middle Class Leadership in Late Colonial India*, CSSS, Kolkata, KPB, 1983

Sarkar, Sumit, *Writing Social History*, Oxford University Press, Delhi, 1997

Scheingold, Stuart A, *The Political Novel*, Bloomsbury Publishing, USA, 2010

Sen Atryee, *Torture and Laughter: Naxal insurgency, custodial violence, and inmate resistance in a women's correctional facility in 1970s Calcutta*, Modern Asian Studies 52, Cambridge University Press, 2018

Sen, Soumen, *Folklore Tradition Urbanity*, Anjali Publishers, 2010

Shakespeare, William, *The Tragedy of Hamlet: Prince of Denmark*, Edited by Barbara A. Mowat and Paul Werstine, Folger Shakespeare Library, PDF

Singer Wendy, *Creating Histories: Oral Narratives and the Politics of History Making*, Oxford University Press, Delhi, 1997

Sinha Roy, Mallarika, *Sexual Economies of Caste and Gender The Case of Naxalbari (1967-1975)*, Tata Institute of Social Sciences, June 2016

Speare, Morris Edmund, *The political Novel: Its development in England and America*, Oxford University Press, New York, 1924

Spivak, Gayatri Chakraborty, *Subaltern Studies: Deconstructing Historiography, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*, Methuen, New York and London, 1987

Stalin, Joseph, *Marxism and problems of linguistics*, Foreign Language Press, Peking, 1st Edition, 1972

Stanzel, F. K, *A Theory of Narrative*, Trans by. Charlotte Goedsche, Cambridge University Press, Cambridge, 1986

Stendhal, *The Charterhouse of Parma (1839)*, Ed. By Edmund Gosse, William Heinemann, London, 1901

Thiong'O, Ngugi Wa, *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature*, James Currey: Oxford, EAEP: Nairobi, Heinmann: Portsmouth, 2003

Thomas, Bronwen, *Narrative: The Basics*, Routledge, London & New York, 2016

Voloshinov, V. N, *Marxism and the Philosophy of Language*, Trans. By Ladslav Mateka and I. R. Titunik, Seminar Press, New York and London, 1973

White, Hayden, *Historical text as literary artifact. Tropics of Discourse*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1978

White, Hayden, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1973

White, Hayden, *The Practical Past*, Northwestern University Press, Illinois, 2014

Wilding, Michael, *Political Fictions*, Routledge and Kegan Paul, London, 1980

Zaheer, Sajjad, *Roshnai*, Translated by Amina Azfar, The Light: The History of the Movement for Progressive Literature in the Indo-Pakistan Sub Continent, Oxford University Press, Karachi, 2007

সম্পাদিত গ্রন্থ

অজয় বসুরায় ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *জেল থেকে মাকে*, বর্ণনা, কলকাতা, ১৯৭৭

অদ্রীশ বিশ্বাস ও প্রবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, *সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটো একটা কথা যা আমরা জানি*, লিরিকাল বুকস, কলকাতা, ২০২০

অমৃতলোক সাহিত্য পরিষৎ, মেদিনীপুর, জানুয়ারি ২০০৫

ঘোষ, বিজিত, সম্পা. *নকশাল আন্দোলনের গল্প*, পুনশ্চ, কলকাতা

চক্রবর্তী, দীপংকর সম্পা. *বাংলাদেশ প্রসঙ্গে*, অনীক, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

চৌধুরী অদ্বয় ও অর্ক চট্টোপাধ্যায় সম্পা. *নবাবুর্গ ভট্টাচার্যঃ মনন ও দর্শন*, বৈভাষিক, কলকাতা, ২০২১

চৌধুরী, কমল সম্পা. *বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৯

দাশ ধনঞ্জয় সম্পা. *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক [অখণ্ড]*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

দাস বেলা ও বিশ্বতোষ চৌধুরী সম্পা. *বাংলা আখ্যানঃ বহুমাত্রিক পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১১

নাগ, অরুণ সম্পা. *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *প্রতিবাদের গল্পঃ নকশালবাড়ি*, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৮

ফাদার দ্যতিয়েন সম্পা. *উইলিয়াম কেরির ইতিহাসমালা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১

বসু, রাজশেখর সংকলিত *চলন্তিকাঃ আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ

বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পা. *বটতলার বই, প্রথম খণ্ড*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০০

বিশ্বাস অদ্রীশ সম্পা. *বটতলার বই, দ্বিতীয় খণ্ড*, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০০

ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা., *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১০

মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, সম্পা. *তারাক্ষরঃ দেশ কাল সাহিত্য*, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৬৫ সাল

মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার সম্পা. *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮

মজুমদার, মঞ্জু কুমার সম্পা. *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ২০০০

মামুন মুনতাসীর সম্পা. *বাংলাদেশঃ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ (১৭৬৩-১৯৫০)*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সম্পা. *বিভাজনের পশ্চাৎপটঃ বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭*, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৩

মোশেল বাসুদেব সম্পা. *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য*, বুকস্‌ওয়ে, কলকাতা, ২০০৮

রফিক, শেখ সম্পা. *ইলা মিত্রের জবানবন্দি*, বিপ্লবীদের কথা, ঢাকা, ২০১৩

রায়, অলোক সম্পা. *সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য*, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২

রুদ্র, সুব্রত সম্পা. *গণসংগীত সংগ্রহ*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯০

সান্যাল শংকর ও তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত দিলীপ বাগচি স্মারক গ্রন্থ, দিলীপ বাগচিঃ ‘গণনাট্য, গণসঙ্গীতঃ কিছু ভাবনাচিন্তা’, কলকাতা, ২০১৩

সিকদার, অশোকুমার সম্পা. *নির্বাচিত এক্ষণ ১*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা. *প্রগতি*, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ১৯৩৭

সেন অঞ্জন ও সিংহ উদয়নারায়ণ সম্পা. *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব*, গাঙ্গেয়পত্র, কলকাতা, ১৩৯৭

সেন সুকুমার ও সেন সুভদ্রকুমার সম্পা. *উপছায়া*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৪

Abrams, M. H, & Geoffrey Galt Harpham Ed., *A Glossary of Literary Terms*, ninth edition, Wordsworth Cengage Learning, Boston, 2009

Blanco, Maria del Pilar and Esther Peeren Ed. *The Spectralities Reader*, Bloomsbury Academic, New York, 2013

Bloom, Harold Ed. *Gabriel Garcia Marquez*, updated edition, Chelsea House Publishers, New York, 2007

Bottomore Tom (Ed.), *A Dictionary of Marxist Thought*, Maya Blackwell, New Delhi, 2000

Calcagno, Alfred, Sebastian Dullien, Alejandro Márquez-Velázquez, Nicolas Maystre & Jan Prieue Ed. *International Comparisons*, United Nations, New York and Geneva, 2016

Chakraborty Dasgupta, Subha ed. *Genology*, DSA, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata, 2004

Chanda, Ipshita. ed., *Historiography*, DSA, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata, 1994

Clark, Katrina and Michael Holquist Ed., *Mikhail Bakhtin*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1984

Glotfelty, Cheryll & Fromm, Harold Edited, *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, The University of Georgia Press, Athens. 1996

Guhathakurta Meghna and Willen Van Schendel Ed. *The Bangladesh Reader: History, Culture and Politics*, Duke University Press, Durham and London, 2013

Haque, Muhammad Emanul, Ed. *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume*, Dacca, 1966

Hart Stephen M & Ouyang Wen-Chin Edited. *A Companion to Magical Realism*, Tamesis, woodbridge, 2005

Herman, David Ed. *The Cambridge Companion to Narrative*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007

Herman David, Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan Ed. *Encyclopedia of Narrative Theory*, Routledge, London and New York, Taylor & Francis e-Library, 2010,

Joyce Patrick Ed. *Class*, Oxford University Press, New York, 1995

Landry, Donna and Gerald Mac Lean Ed. *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak*. Routledge, New York

Losada Goya Jose manual and Marta Guirao Ochoa Ed. *Myth and Subversion in the Contemporary Novel*, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2012

Maria del Pilar Blanco and Esther Peeren, "Introduction," in *The Spectralities Reader*, ed. Blanco and Peeren, Bloomsbury Academic, New York, 2013

McKeon, Michael Ed. *The Theory of the Novel: A Historical Approach*, The John Hopkins University Press, Baltimore & London, 2000

Melville, Peter Ed., *The Encyclopaedia of the Novel*, Blackwell Publishing Ltd., 2011

Nair, P. Thankappan (compiled), *Calcutta in the 18th Century: Impression of Travellers*, Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1984

Nelson, Cary and Lawrence Grossberg Ed. *Marxism and the Interpretation of Culture*. MacMillan, London, 1988

Ray, Amit S, *The Enigma of the "Indian Model" of Development, Rethinking Development Strategies after the Financial Crisis– Volume II: Country Studies and International Comparisons*, Edited by Alfredo Calcagno, et al. United Nations, New York and Geneva, 2016

Richardson, J, *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport, CT: Greenwood, 1986

Samaddar Ranabir Ed. *From Popular Movements to Rebellion: The Naxalite Decade*, Social Science Press, New Delhi, 2018

Sen, Narendra Nath, Ed. And published *GAZETTEER OF INDIA, West Bengal*, Puruliya, West Bengal District Gazetteers, Calcutta, 1985

Snell, K. D. M Ed., *The Regional Novel in Britain and Ireland*, Cambridge University Press, First Published 1998, Digitally Printed Version 2008

Sontag, Susan Ed. *A Roland Barthes Reader*, trans. by Stephen Heath
(London: Vintage, 1994)

Zepenttek, Totosy de, & I-Chun Wang Ed., *Perspectives on Identity, Migration and Displacement*, Nattional Sun Yat-sen University, Taiwan, 2010

Zizek, Slavoj Ed. *Mapping Ideology*, Verso, 1994. PDF

পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা

অক্ষরেখা পত্রিকা, সম্পা. নীলকমল সরকার, (বিশেষ সংখ্যাটির সম্পা. রাজীব চৌধুরী),
কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

অনীক, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, সম্পা. দীপংকর চক্রবর্তী, বহরমপুর, ১৯৭৭

অনীক, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, সম্পা. দীপংকর চক্রবর্তী, ১৯৭৭

আখ্যান ১, নবরূপ ভট্টাচার্যের হারবার্টস আলোচনাপত্র, আমেদ, আফসার ও অনিশ্চয় চক্রবর্তী
সম্পা. মার্চ ১৯৯৬

আচার্য অনিল সম্পা. সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অগাস্ট, ১৯৪৩

অনুষ্টুপ শারদীয়, দীপেন্দ্রনাথ স্মারক ক্রোড়পত্র, সম্পা. অনিল আচার্য, কলকাতা, ১৯১০

উত্তরাধিকার পত্রিকা, বাংলা গল্প সংখ্যা, ১৯৯৬

‘এক্ষণ’ পত্রিকা, ‘সম্পা. নির্মাল্য আচার্য, ১৫ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৯

এবং জলার্ক দেশব্রতী সংকলন ৩, সম্পা. স্বপন দাস অধিকারী, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

এবং জলার্ক দেশব্রতী সংকলন ৭, সম্পা. স্বপন দাস অধিকারী, জানুয়ারী-জুন ২০০৩

এবং জলার্ক, সঙ্গীত সমাজ ইতিহাস, সম্পা. স্বপন দাস অধিকারী, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১০

এবং প্রান্তিক, সম্পা. সৌরভ বর্মন, বর্ষ ৯ সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর ২০২২, কলকাতা

এবং মুশায়েরাঃ উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. সুবল সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-ডিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, কলকাতা

এম. মুনজুরুল হক, 'বাঙলা ভাষা আন্দোলনঃ বায়ান্ন-পূর্ব পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, শীত সংখ্যা, খণ্ড ৩৮, ডিসেম্বর ২০২০, ১৬৯-২০১

ঐকতান পত্রিকা, সম্পা- সমরেশ বসাক, বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩২

ঐতিহ্য- দ্য হেরিটেজ, সম্পা. নন্দিতা ভট্টাচার্য গোস্বামী, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২, গুয়াহাটি, ২০২২

কঙ্ক পত্রিকা, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, স্বপন পাণ্ডা ও উৎপল সাহা সম্পা., শ্রাবণ ১৪২১ অগাস্ট ২০১৪

'কলস্রোতা', বুলবুল পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪৩

কোরক, প্রাক্-শারদ সংখ্যা, সম্পা. তাপস ভৌমিক, কলকাতা, ১৪১৫

কোরক শারদীয়া, সম্পা. তাপস ভৌমিক, ১৩৯৭

চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ সম্পা.সংবীক্ষণ, ২০০৩

জনপদ প্রয়াস, অভিজিৎ সেন সংখ্যা, বইমেলা, ২০০৬

দত্তগুপ্ত শোভনলাল, 'রাজনীতি ও মৌলিকতা', চর্চা, সম্পা. অসীমকুমার হালদার ও মৃণ্ময়
প্রামাণিক, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৭

দিবারাত্রির কাব্য, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পা. আফিফ ফুয়াদ, জুলাই-
সেপ্টেম্বর/অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৭

দিশা পত্রিকা, সম্পা. পার্থ মল্লিক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪

দেশ পত্রিকা, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৩ সাল

দেশ পত্রিকা, ১৭ই আশ্বিন ১৩৫৪, সম্পা. শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

দেশ পত্রিকা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৬৫

দেশ পত্রিকা, ২রা এপ্রিল ১৯৮৭

দেশ পত্রিকা, সম্পা. সুমন সেনগুপ্ত ২রা জুন ২০১৮

দেশ পত্রিকা, ১৭ জুন ২০১৯

দেশব্রতী, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০

দেশব্রতী, ১৩ই জুলাই ১৯৬৭।

দেশব্রতী, ১০ই অগাস্ট, ১৯৬৭

দেশব্রতী, ২রা নভেম্বর ১৯৬৭

দেশব্রতী, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭০

দেশব্রতী, মে-জুন ১৯৭০

দেশব্রতী, ২৮ মে - ৪ জুন, ১৯৭০

দেশব্রতী, ৫ই অগাস্ট ১৯৭০

দেশব্রতী, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

পরিকথা পত্রিকা, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ, সম্পা. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ
পরগণা, সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫

পরিচয়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, সম্পা. দেবেশ রায়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৭৯

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা 'তেভাগা সংখ্যা', প্রধান সম্পা. তরুণ ভট্টাচার্য, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, তথ্য ও
সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, মে ১৯৯৭

প্রতিভা পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় ও সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৭৪

প্রথমত পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৬

প্রবাসী পত্রিকা, পুরনো গল্প, ৪র্থ সংখ্যা

প্রস্তুতি পত্রিকা, জুলাই, ১৯৭৪

বাঘের বাচ্চা ৪, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, সম্পা. স্বপনরঞ্জন হালদার, উত্তর চব্বিশ
পরগণা, বইমেলা ২০১৮

বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকা, ১৮ই নভেম্বর, ২০১৮

বিজ্ঞাপনপর্ব, সম্পা. রবিন ঘোষ, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১-২, কার্তিক ১৩৯৬

ভাষাবন্ধনঃ নবাবুর্গ সংখ্যা, সম্পা. তথাগত ভট্টাচার্য, ত্রয়োদশ বর্ষ, কলকাতা, ২০১৫

মার্কসবাদী, চতুর্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯

'রুনা সাদা না, রুনা কালো', এবং বিসংবাদ, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৭, PDF

শারদীয় দেশ, সুপ্রিয় চৌধুরী, দ্রোহজ, ১৪২১

শারদীয় 'দেশ', স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, কম্পাস, ১৪২২, পিডিএফ

সমকাল, অগাস্ট, ১৯৭৭।

সমকালীন, সম্পা. আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ষোড়শ বর্ষ, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭৫ সাল

সানন্দা পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯৭

সুলতানা, মুনিরা, 'অন্তহীন বৃত্তান্তে জীবনঃ দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', জগন্নাথ

ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ আর্টস, ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

সিপিআই (এম এল)-এর প্রচারপত্র, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭০

সৈয়দ আলী আহসান, 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলা সাহিত্যের ধারা', মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম

সংখ্যা, অগাস্ট ১৯৫১

সৈয়দ সামসুল ইসলাম, 'আনন্দমঠ', আল ইসলাহ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪০

Alam, Javeed, 'State and the Making of Communist Politics in India 1947-57',

Economic and Political Weekly , Nov. 9, 1991, Vol. 26, No. 45 (Nov. 9, 1991),

pp. 2573-2577+2579-2583

Bandyopadhyay, Sarbani, 'Caste and Politics in Bengal', Economic and

Political Weekly, DECEMBER 15, 2012, Vol. 47, No. 50 (DECEMBER 15, 2012)

Bhattacharya, Ananda, 'Reconsidering the Sannyasi Rebellion', Social

Scientist Vol. 40 No. 3/4 March-April 2012

Bhattacharya, Sabyasachi, 'History from Below', *Social Scientist* , Apr., 1983, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1983), pp. 3-20

Bhattacharya, Sourit, 'The Question of Literary Form: Realism in the Poetry and Theater of the 1943 Bengal Famine'. Ulanowicz, A and Basu, M Eds. *The Aesthetics and Politics of Global Hunger*, pp. 57-88. UK: Palgrave Macmillan, 2017

Bokil, Milind, 'De-Notified and Nomadic Tribes: A perspective', *Economic and Political Weekly*, 2002. Jstor

Calcutta Police Gazette, 2nd January, 1971

Chakraborti, Aritra, 'Reading and Resistance in the Works of Nabarun Bhattacharya', *Sanglap: Journal of Literary and Cultural Inquiry*, Vol 2: Issue 1 (Supplement), 2015

Chakrabarty, Dipesh, 'Remembered Villages: Representation of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of the Partition', *Economic and Political Weekly*, Vol. 31, No. 32 (Aug. 10, 1996), pp. 2143-2151

Coppola, Carlo, '*Premchand's address to the first meeting of the All-India Progressive Writers Association: Some Speculations*', *Journal of South Asian Literature*, Vol. 21, No. 2, Essay on Premchand (Summer, Fall 1986), pp. 21-39

Davidson, J. F, "Political Science and Political Fiction", *The American Political Science Review*, LV 4, (Dec. 1961), p.856

Dasgupta, Atis, 'Some Aspects of the Santal Rebellion of 1855—56', *Social Scientist*, Vol. 41, No. 9/10 (September-October 2013), pp. 69-74

Dewasiri, Nirmal Ranjith, 'Mainstreaming Radical Politics in Sri Lanka: The case of JVP post-1977', *PCD Journal* Vol. II, No. 1 2010, 69-94

Dutt, Bahar, 'Livelihood Strategies of a Nomadic Hunting Community of Eastern Rajasthan, Nomadic Peoples', *New Series*, Vol. 8, No. 2, Special Issue: Whither South Asian Pastoralism? (2004), pp. 260-273, Jstor

Eugene B, McCarthy, 'Rhythm and Narrative Method in Achebe's "Things Fall Apart"', *NOVEL: A Forum on Fiction* Vol. 18, No. 3 (Spring, 1985), pp. 243-256 (14 pages), Duke University Press, 1985

Ghosh, Prabuddha, 'Voice and Crises of the Subalterns and Nature: An Eco-critical Reading of Debesh Ray's Two Bengali Novels', *Café Dissensus*, Issue 54, August 31, 2010

Gupta Suman, 'Indian "Commercial Fiction" in English', *the Publishing Industry and Youth Culture*, *Economic and Political Weekly* , Vol. 47, No. 5 (FEBRUARY 4, 2012), pp. 46-53

Hariharan, Githa, 'When Body speaks', *World Literature Today*, Vol. 91, No. 2 (March/April 2017), pp. 16-20

Jalil, Rakhshanda, 'Loving Progress, Liking Modernity, Hating Manto', *Social Scientist*, November–December 2012, Vol. 40, No. 11/12 (November–December 2012), 47

Jha Paramchand. '*Exile, Alienation and cultural tradition: V. S Naipaul's Half a Life*', *The Indian Journal of English Studies*, Vol. 39

Kabithiyal N and DangWal S, '*MIKHAIL BAKHTIN AND DISCOURSE ON GENRE NOVEL*', *IJELR*, Vol. 3 Issue 1, 2016

Kelly, Michael, "French Intellectuals and Zhdanovism", *French Cultural Studies*, vol. 8, no. 22, 1997, pp. 017–028

Kelly, Michael, Gorky, 'Aragon and Socialist Realism', *The Crane Bag*, Vol. 7, No. 1, *Socialism & Culture*, 1983, pp. 108-111

Kelsey, Darren, 'The Myth of the City Trickster: Storytelling, Bankers and Ideology' in the Mail Online, *Journal Of Political Ideologies*, 19(3), 2014, pp. 307-330.

King, Anthony, 'A critique of Baudrillard's hyperreality: towards a sociology of postmodernism, *Philosophy & Social Criticism*', vol.24, no.6, *SAGE journals*, 1998, 47-66, doi.org/10.1177/019145379802400603

Krätli, S. and Dyer, C. 'Mobile Pastoralism and Education: Strategic options' *International Institute for Environment Development, Education for Nomads Working Papers* 1, UK: IIED, October 2009

Krishnamurthy, Aruna, 'The Revolutionary Man in Naxalite Literature', Journal for the Study of Radicalism , Vol. 11, No. 1 (Spring 2017), 145-8

Lahiri Ashok, 'The Middle Class and Economic Reforms', Economic and Political Weekly, MARCH 15, 2014, Vol. 49, No. 11 (MARCH 15, 2014), pp. 37-44

Lähteenmäki, Mika, 'Stalin's critique of the idea of the class character of language, The Linguistic Discussion of 1950: 70 Years Later', Epistemologica et historiographica linguistica Lausannensia, No. 2, Ed. By E. Velmezova, Nauchno-izdatelskij Centr Indrik, 2020

Lal, Vinay, 'Subaltern Studies and Its Critics: Debates over Indian History: A Review', History and Theory, Wiley for Wesleyan University, Vol. 40, No. 1 (Feb. 2001), pp. 135-148

Law Commission of India, Implementation of 'United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' through Legislation, Report No. 273, October 2017

Marik, Soma, C'ritiques of Nation and Gender in South Asia: Akhtaruzzaman Elias' Khwabnama and Savitri Roy's Trisrota and Swaralipi', Sahitya, Journal of the Comparative Literature Association of India, Vol 8, Septmber 2019, 102

Mato Jakup, Rinush Idrizi, Vangjush Ziko, Anastas Kapurani, '*Socialist Realism*', Revolutionary Democracy Vol. VI, No. 2, September 2000

Mazi-Leskovar, Darza, 'Documentary Novel and Literary Journalism in the USA and Slovenia', *Journal of Modern Literature* Vol. 26 Num. 2, 184

McCarthy, B. Eugene, 'Rhythm and Narrative Method in Achebe's "Things Fall Apart"', *NOVEL: A Forum on Fiction*, Vol. 18, No. 3 (Spring, 1985), Duke University Press, pp. 243-256

McMurray R George, 'Reality and Myth in García Márquez' "Cien años de soledad", *The Bulletin of the Rocky Mountain Modern Language Association*, Vol. 23, No. 4 (Dec., 1969), pp. 175-181

McEwan, Cheryl, 'A very modern ghost: postcolonialism and the politics of enchantment', *Environment and Planning D: Society and Space*, volume 26, 2008

Mukhopadhyay, Ashoke Kumar, 'Through the Eyes of the Police: Naxalites in Calcutta in the 1970s', *Economic and Political Weekly*, Jul. 22-28, 2006, Vol. 41, No. 29 (Jul. 22-28, 2006), pp. 3227-3233

MZU *Journal of Literature and Cultural Studies*, Vol. V Issue 1, June 2018

Nandy, Ashish, 'The Making and Unmaking of Political Cultures in India', *Daedalus*, Vol. 102, No. 1, Post-Traditional Societies (Winter, 1973), MIT Press, pp. 115-137

National Campaign Against Torture, '*India: Annual Report on Torture 2019*', New Delhi, 26th June 2020, PDF

Ohio State Law Journal, 'Legal consequences of the Third degree', Ohio State Law Journal, Vol. 9 No.3, Ohio State University College of Law, 1948

O'Keefe Arthur Shattuck, 'The role of Politics in Gabriel Garcia Marquez's One Hundred Years of Solitude', Gakuen Integrated Education Center, Special Feature on International Subjects, No. 931, 2018, pp. 53-60

Pandey, Gyanendra, 'Community and Violence: Recalling Partition, Economic and Political Weekly', Vol. 32, No. 32 (Aug. 9-15, 1997), pp. 2037-2039+2041-2045

Parrington John, 'In Perspective: Valentine Voloshinov', INTERNATIONAL SOCIALISM, quarterly journal of the Socialist Workers Party (Britain) Issue 75, July 1997.

Prakash, Gyan, 'Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography', Comparative Studies in Society and History, Apr., 1990, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1990), pp. 383-408

Prayer, Mario, 'Freedom in the River: Bengali Bhadrak Lok Consciousness in Manik Bandyopadhyay's Padmanadir Majhi', Nature and the Human Person in India, suppl. Rivista degli Studi Orientali, Nuova Serie, Pisa Roma, vol. 2/2015, pp. 165-180

Report on Left Deviation Inside the CPI, (approved by the CC) June 1950

Revolutionary Democracy, Vol. VI, No. 2, September 2000

Samaddar Ranabir, 'Whatever Has Happened to Caste in West Bengal?', Economic and Political Weekly , SEPTEMBER 7, 2013, Vol. 48, No. 36 (SEPTEMBER 7, 2013), pp. 77-79

Sengupta, Chandan, 'Conceptualizing Globalization: issues and Implications', Economic & Political Weekly, Vol. 36, No. 33 (Aug. 18-24, 2001), pp. 3137-3143

Simpkins, Scott, 'Magical Strategies: The Supplement of Realism', Twentieth Century Literature, Summer, 1988, Vol. 34, No. 2 (Summer, 1988), Duke University Press, pp. 140-154

Sinha Roy, 'Mallarika, During West Bengal's Naxalbari Movement, Women Were Not Merely in the Background', The Wire, 4th October 2018.

Sinha Roy Mallarika, 'Rethinking female militancy in postcolonial Bengal', Feminist Review, No. 101, conflict, Sage Publications, Ltd. 2012, pp. 124-131

Sinha Roy Mallarika, 'Sexual Economies of Caste and Gender: The Case of Naxalbari (1967-1975)', TISS Working Paper No. 11, Tata Institute of Social Sciences, June 2016, PDF

'The Report of the Advisory committee on the Revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes', Govt. of India, Department of Social Security, 1965, pp- 42-61

Tosic, Jelica. '*Ecocriticism- Interdisciplinary Study of Literature and Environment*', Working and Living Environmental Protection Vol. III, No. 1, Facta Universitatis, 2006

Utley, Francis Lee, 'An Operational Definition', The Journal of American Folklore, Vol. 74, No. 293 (Jul.-Sep. 1961), pp. 193-206

Zekulin, Gleb, 'Review of Istoriya Russkoi Sovetskoi Literatury (A History of Russian Soviet Literature)' by A. I. Metchenko, L. M. Polyak, L. I, Soviet Studies, Taylor & Francis, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1960), pp. 432-442

অনলাইন পত্রিকা ও জার্নাল

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার কাঠি', পরিচয়, ১৩২২
<https://www.tagoreweb.in/Essays/porichay-187/sonar-kathi-1185>, accessed on 5th January, 2022

অর্ণব শানজিদ, 'সাহিত্যে নকশাল আন্দোলন', এপ্রিল ২৫, ২০১৭,
<https://lalshongbad.wordpress.com/2017/04/25/নকশাল-সাহিত্য-2/>, accessed on 25th June, 2021

আহমদ, চৌধুরী মুফাদ, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের না লেখা উপন্যাস', প্রথম আলো, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, <https://www.prothomalo.com/onnoalo/>, accessed on 24th December, 2020

ঘোষ, প্রবুদ্ধ, ‘আপোষ কিংবা দ্রোহঃ স্বস্তিক্ষেত্র না থাকাই ভাল’, অপরজন পত্রিকা, অগাস্ট ২০১৯, <https://aparjan.wpcomstaging.com/2019/08/31/august2019-prghes/>, accessed on 8th July, 2020

চট্টোপাধ্যায়, কুণাল, ‘আম্বেদকর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ’, ইতিহাসের আড্ডা, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২০, <https://www.itihasadadda.in/ambekar/>, accessed on 10th december, 2020

‘নবারণ ভট্টাচার্য ফিচারিং ঋত্বিক কুমার ঘটক’, লাল জীপের ডায়েরি, <https://laljiperdiary.wordpress.com/2014/08/05>, accessed on 10th July, 2021

বৃন্দলেখক, ‘কাদের মোল্লার আসল নকল: একটি নির্মোহ অনুসন্ধান’, ২০১৩, bdnews24.com, <https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/14020>, accessed on 13th August, 2021.

ভট্টাচার্য, তপোধীর, ‘তিতাস-কথা ও অন্যান্যঃ পুনঃপাঠের প্রস্তাবনা’, http://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/Magazine/Content/SRMV01P_TitasKatha.pdf, accessed on 30th May, 2022

মজুমদার, চারু, ‘জনৈক কমরেডকে লেখা চিঠি’, <https://lalshongbad.wordpress.com/2017/03/03/>, accessed on 12th October, 2021

‘সাহিত্যে নকশাল আন্দোলন’, <https://lalshongbad.wordpress.com/2017/04/25/নকশাল-সাহিত্য-2/>, accessed 25th July, 2021

সেনগুপ্ত, মিহির, ‘সাক্ষাৎকার’, পরবাস পত্রিকা, সংখ্যা ৭৪, মার্চ ২০১৯,
<https://www.parabaas.com/PB74/LEKHA/bMihir74.shtml>, accessed 10th

September 2021

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subaltern>, accessed on
22/01/2023

Ashraf, Ajaz, ‘The Ashis Nandy interview: ‘People didn’t have the moral
sanction to kill even during the Partition’, 10th August, 2017,
<https://scroll.in/article/846679/>, accessed on 6th February, 2020

‘Baba Tilka Majhi (1750-1785), Biography and Life History’,
<https://www.ambedkaritetoday.com/2019/11/tilka-manjhi.html>, accessed on
29th October, 2020

Drabble, Margaret Ed., *Regional Novel*, Oxford Reference,
[https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.201108031004
11209;jsessionid=F1EFB74E95EA843690C7BDDDD443080](https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100411209;jsessionid=F1EFB74E95EA843690C7BDDDD443080), accessed on 14th
April, 2022

‘Engels to Franz Mehring’, Trans, by Donna Torr, International Publishers,
1968,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1893/letters/93_07_14.htm

‘Engels to Margaret Harkness (April, 1888)’, Transcribed by Dougal McNeill
in 2000,

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/letters/88_04_15.htm,

accessed on 5th March, 2019

Gorky, Maxim, 'Soviet Literature, Speech Delivered in August 1934',

Transcribed by Jose Braz for the Marxists Internet Archive

Hanisch, Carol, 'The personal is political', 1969,

<http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>, accessed on 25/05/2020

Kautilya, Arthashastra, Translated into English by R Shamasastri; Chapter

VIII, Book IV:

https://ia802703.us.archive.org/13/items/Arthasastra_English_Translation/

accessed on 4/11/2021.

Karl Marx, '*The Poverty of Philosophy (1847)*', Trans. By Institute of

Marxism Leninism, 1955, Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 1999,

[https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-](https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-philosophy/index.htm)

[philosophy/index.htm](https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-philosophy/index.htm)

Khan, Abid, 'Ismat Chughtai: Telling it like it is', 8th March 2020,

<https://www.peepultree.world/livehistoryindia/story/people/ismat-chughtai>,

accessed on 18th July, 2022

Mao Tse Tung, 'U.S. Imperialism is a Paper Tiger', July 14, 1956, selected

works of Mao Tse Tung, Transcription by the Maoist Documentation

Project. HTML revised 2004 by Marxists.org,

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_52.htm, accessed on 10th October, 2021

Mao Tse-Tung, 'Yenan Lecture on Art and Literature', May 1942, Transcription by the Maoist Documentation Project, https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-3/mswv3_08.htm, accessed on 3rd December, 2021.

Marquez, Gabriel Garcia, 'La soledad de America Latina', Nobel Lecture, 8th December, 1982, <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1982/marquez/lecture/>, accessed on 31st March, 2020

Marx Karl, 'The Poverty of Philosophy', Chapter Two: The Metaphysics of Political Economy, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/poverty-philosophy/ch02.htm>, accessed on 30th October, 2020

Mato, Jakup, 'Socialist Realism "Foreign Literature", Part Two', Ilford, Translated from the Albanian by William Bland, 1987, Vol. VI, No. 2, September 2000 <https://revolutionarydemocracy.org/rdv6n2/socialreal.htm>, accessed on 18th July, 2022

Orwell George, 'Why I Write', London, 1946, https://orwell.ru/library/essays/wiw/english/e_wiw#:~:text=Desire%20to%20

[push%20the%20world,is%20itself%20a%20political%20attitude](#), accessed on 3rd June 2020

Richardson, Samuel, Clarissa Harlowe History of a young lady, Preface, last updated on January 2013, <https://www.gutenberg.org/files/9296/9296-h/9296-h.htm>

Robinson Andrew, 'In Theory Bakhtin: Dialogism, Polyphony and Heteroglossia', Ceasefire Magazine, July, 2011, <https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-bakhtin-1/>, accessed on 20th September, 2017

Roy Arundhati. '*The Greater Common Good*', 1999, <http://www.narmada.org/gcg/gcg.html>, accessed on 4/8/2018

Smiley, Jane, 'Toni Morrison's Beloved: ghosts of a brutal past', The Guardian, 2006, <https://www.theguardian.com/books/2006/jul/08/fiction.tonimorrison>, accessed on 18th June, 2020

Sundarayya P, 'My Resignation', India Publishers & Distributors, New Delhi, 1991, <https://www.revolutionarydemocracy.org/archive/resig.htm>, accessed on 25th June, 2020

Taylor, Houston, 'Out of Order: A Discussion of Nonlinear Narrative structure', 2011, <https://litreactor.com/columns/out-of-order-a-discussion-of-nonlinear-narrative-structure>, accessed on 21/01/2023

William James, 'The stream of Consciousness', 1892,
<http://webpace.ship.edu/cgboer/jamesselection.html>, accessed on 3rd
September, 2017

http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/SSC/ssc_1601/uponnash.pdf,
accessed on 10th September, 2021

সহায়ক উপন্যাস ও গল্প

ইন্দু সাহা, 'কিষণ বৌ', হরপ্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯২

লাইপম্যান হাইনৎস, 'অগ্নিগর্ভ', অনুবাদ অশোক গুহ, র‌্যাডিকাল বুক ক্লাব, কলকাতা, ১৯৪৬

অন্যান্য

দাশগুপ্ত, শুভরঞ্জন, সাক্ষাৎকারঃ চিন্মোহন সেহানবীশ, কলকাতা, ১৯৮৫

সংবাদপত্র-

অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭

আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকা, ১৮ই নভেম্বর, ২০১৮

The Hindu Business Line, September 18, 2013

Times of India, February 12, 2019

The Wire, 15th January, 2022